দশ পুতুল

নির্বাচিত দশটি উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলি কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

সূচীপত্র

অভিনেত্রী

□●□

এই বিচিত্র কাহিনী শুনিয়ে গেল আমাকে বাপ্পা বোস। বাপ্পা বোস নাম আপনাদের অচেনা নয়। যাত্রাজগতে বাপ্পা বোস নামকরা মানুষ। বাপ্পারাওয়ের পার্ট করে বাপ্পা বোসই হয়ে গেল। মঞ্জরী অপেরা লিখবার সময় অনেকজনের কাছে বাপ্পা বোসের নাম শুনেছি। কিন্তু বাপ্পার দেখা তখন পাইনি। আজ থেকে দশ-বারো বছর আগের কথা। সেবার পুজোর সময় মঞ্জরী অপেবায় উপন্যাস লিখেছিলাম যাত্রাদলের জীবন ও কাহিনী নিয়ে। পুজোর সময় আমাদের নতুন বিষয় বা কি নিয়ে লিখব এই নিয়ে জীবন ও সমাজের চার দিক চার কোণ খোঁজাখুঁজির একটা তাড়া পড়ে যায়। সেবার যাত্রাদলের কথা মনে পড়েছিল। গোরাবাবু ও মঞ্জরীকে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি, গোরাবাবুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমারও সম্পর্ক ছিল। রীতুবাবুকেও জানতাম, তিনি অবশ্য পরের কালের লোক। অলকা বাবুল একালের।

থাক, 'মঞ্জরী অপেরা' নিয়ে কথা থাক। কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপা হরফে বহুবিধ কৌশলে আজকাল কোন কিছুর বিজ্ঞাপন বা আত্মপ্রশংসা করার রেওয়াজ হয়েছে; এরপরও কিছু লিখতে গেলে সেই দোষে দোষী হতে হবে।

তবে এইটুকু বলতে হয় যে, সকলেই, (এই দেখুন বিজ্ঞাপন হয়ে.গেল) সকলে নয়, যাঁরা পড়েছেন তাঁদের অনেক জনে প্রশ্ন করেছেন—'যাত্রা দল বা যাত্রা পার্টি সম্বন্ধে এত জানলেন কেমন করে?' এর মধ্যে যাঁরা অন্তরঙ্গ এবং কিছুটা পদস্থ তাঁরা (তাঁদের রসিকতা করে কথা বলা স্বভাব—কারণ রসিকজন প্রমাণিত হন এর দ্বারা)—কি মশায় যাত্রার দলে কখনও ভিড়েছিলেন নাকি? মেয়ে-যাত্রার দলে?

তাঁদের নানান জনকে নানান উত্তর দিয়েছি। কড়া মিঠে ঝাল তেতো সব রকমই ছিল তার মধ্যে। সে সব আমার পক্ষে প্রীতিপদ হয়নি। কিন্তু এই সূত্রে যাত্রা পার্টির অনেকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; তাঁরা আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলেন, পুরনো কালের অ্যাক্টর প্রভাসবাবু ফণি বিদ্যাবিনোদ থেকে একালের স্বপনকুমার পর্যন্ত। যাত্রা থিয়েটার দুই দলেই কাজ করেছেন জয়নারায়ণ, তিনি তো আমাকে মঞ্জরী অপেরার সুরটিই ধরিয়েছিলেন। কয়েকজন, যাত্রাদলের ছেলে যাদের বলি, তারাও এসেছিল। তারা আমাদের গ্রামের বাড়িতে ভিড় করে এসেছিল। তাদের সঙ্গে বইখানার কোন সম্পর্ক ঘটেনি। বই পড়েনি তারা,—তবে নামটা শুনেছে। দলের বড় অ্যাক্টরদের মধ্যে মঞ্জরী অপেরা নিয়ে কথা হয়। মঞ্জরী তাদের কাছে রাজকন্যা। থাক এইখানেই

ও কথা। এরপর কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে। আরও কথা আছে—সে-সব কথাও এই পর্যন্ত এসে থাক। ঐ সব কথা বাদ দিয়ে যে কথাটা বলব সেটা হলো এই যে—এতে করে কিন্তু গ্রামের লোকের কাছে আমার খাতির বেড়ে গেল—এ কথাটা চাপা রাখব না। তারা হর্ষোৎফুল্ল মুখে বেশ একটু উদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—জানেন আমদপুরে বিজয়া অপেরা এসেছিল—আমরা ভেবেছিলাম একরাত্রি গান শুনব। ওদের বললাম তো বললে—লাভপুরে উনি আছেন? থাকলে আমরা নিশ্চয় যাব। যা দেবেন বা নাই দিলেন কিছু, গাওনা আমরা করে আসতাম। ওঁকে শোনানো হত তো! কিন্তু উনি নেই যখন তখন আর না। আমাদের বায়না আছে পরশু বর্ধমানে। বড্ড হুজ্জোত হবে। সে মশাই পোষাবে না।

এই সূত্রে আলাপ হয়ে গেছে অনেকের সঙ্গে। সত্যস্বরে সোনাইদীঘির ভাবনা কাজী-খ্যাত দিলীপ, বিদ্যাসাগরের পার্ট করলেন যিনি তিনি—আরও নতুন কালের নতুন ভাবনা যাঁরা যাত্রার দলে এনেছেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ হলো। রবীন্দ্রসদনে বিদ্যাসাগর পালার বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়েছিলাম। এইখানে অর্থাৎ সেদিন রবীন্দ্রসদনেই বাপ্পা বোসকে প্রথম দেখলাম। একটি বিধবা মেয়ের পার্ট করলে সে সেদিন।

আশ্চর্য পার্ট করলে। যেমন মানান মানিয়েছিল তেমনি কি তার মেয়েদের মতো কণ্ঠস্বর—তেমনি বাচনভঙ্গি।

মেয়েটির বয়স মোটামুটি বাইশ-তেইশ হওয়া উচিত তার কথাবার্তা অনুযায়ী, তা কিছু বেশিই লাগছিল; তা লাগুক বেমানান লাগছিল না। গোঁফ-দাড়ির সবুজ দাগ (কালো দাগ পেন্ট দিয়ে ঢাকলে সবুজ লাগে) পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। আর অভিনয়ে সেকালের তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, প্রভার অভিনয়ের ঢঙ থাকলেও অনুকরণ নয় আর সে-কেলে বলেও মনে হচ্ছিল না। বলা ভাল যে এই যাত্রার দলটিতে মেয়েদের ভূমিকা এখনও পুরুষেই করে। এবং যা করে তা যে মেয়েদের থেকে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। ছবিরানী শতদল এদের নারীরূপ এবং নারী ভূমিকায় অভিনয় দেখে বড় বড় থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেসকে আমি ফিসফিস করে বলতে শুনেছি—আশ্চর্য! লজ্জাও পেতে দেখেছি ওদের মেকআপ করা নারীসৌন্দর্যের কাছে। কণ্ঠস্বরে পর্যন্ত পুরুষসত্তার কোন আভাস মেলে না। বিদ্যাসাগবে প্রথম অঙ্কেই এই মেয়ের পার্ট একেবারে যেন হোমের আগুনের মতো জ্বলে উঠল। শেষ দৃশ্যে ঘৃতধারা আহুতি ঢেলে দিল।

এরপরই আমি ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম ফিরব বলে, সত্যি সত্যিই তাড়াতাড়ি ছিল।

গাড়িতে উঠছি তখন পিছন থেকে কে যেন বললে—আমি একটা কথা বলছিলাম।

আমি এবং আমাকে যাঁরা গাড়িতে উঠিয়ে দেবার সম্ভ্রম দেখাচ্ছিলেন তাঁরা সকলেই ফিরে তাকালাম। একজন বললেন—কে হে? পেছন ডাক কেন বলতো?

একজন খুব অপ্রস্তুত মুখে বললে—না মানে—।

—না, মানেটা কি? কাণ্ডজ্ঞানরহিতের মতো কাণ্ড যত সব!

যে অপকর্মটি বা এই অন্যায় কর্মটি করেছিল সে যাত্রাদলেরই কেউই হবে। সে আরও অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললে—আমাদের ইন্দুরানীদা—

—কি? ইন্দুরানীদা কি?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কে?

আমি জানি—আমার বোঝা উচিত ছিল যে যে-সব যাত্রার দলে ছেলেরা বা পুরুষেরা মেয়ের পার্ট করে তারা রানীবালা ধরনের শব্দ তাদের নামের সঙ্গে লাগিয়ে ছবিলাল ছবিরানী হয়, হরিকুমার হরিবালা হয়, এটা একালের রেওয়াজ। একটা উদ্দেশ্য স্পষ্ট—সেটা হলো বিজ্ঞাপনের সুবিধা। তবে এরা যেমনটি সাজে যেমনটি পার্ট করে, সে চলাফেরায় কথা বলার ঢঙে কণ্ঠস্বরের ভল্যুমে সুরে কোনক্রমেই বুঝবার জো থাকে না যে এ মেয়ে সাজা-মেয়ে, সত্যিকারের মেয়ে নয়। 'ইন্দুরানীদা' এক্ষেত্রে তেমনি কেউ এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তবু প্রশ্নটা করে ফেললাম।

প্রশ্নকর্তা বললে—ওই যে বিধবা মেয়েটির পার্ট করলে! ওঁর নাম তো ইন্দুভূষণ! সলজ্জ হেসে সে মুখ নোয়ালে। সে মানে যে লোকটি ইন্দুরানীর নামোল্লেখ করেছিল সে।

আমি রসিকতা করে বললাম—সংবরণ করতে পারলাম না নিজেকে। বললাম—ইন্দুভূষণ থেকে ইন্দুরানী কেন? ইন্দুবালা কি ইন্দুমতী কি মুখী হলেই তো পারতো।

একজন বললে—মুখী হলে ভাল হতো—মানে হত চাঁদবদনী। বিজ্ঞাপনে ওজন বাড়তো। কথা শেষ করে সে টেনে টেনে খি-খি-খি শব্দে হাসতে লাগলো।

আর একজন বললে—তা মুখখানা গোলালো বটে।

—ওকে যৌবনে দেখনি ভাই—দেখলে গোলালো বলতে না—বলতে সত্যি সত্যি চাঁদ।

—দেখিনি কে বললে?

—দেখেছ?

—দেখেছি। ওর আর একটা নাম আছে সেটা জানি। সেই নামেই ও বাজারে চলে। বাপ্পা বোসের বাপ্পারাওয়ের পার্ট পর্যন্ত দেখেছি। শিশিরবাবুর সীতার পর ও লব সেজে অ্যামেচার থিয়েটার মাতিয়ে দিয়েছিল। চিনি না?

বাপ্পা বোস—নামটা আমারও পরিচিত। আমিও জানি।

অনেকে বলেন—নাম হওয়া উচিত ছিল ওর 'লব বোস'। বাপ্পারাও ওর দেখিনি, ক'জনই বা দেখেছে! তবে লব নামে তো জীবন গাঙ্গুলীর পেটেন্ট রাইট কি কপি রাইট জন্মে গেছে!

বিতর্ক যাই থাক নামটা লোকটি কোনদিন অর্জন করেছিল—এবং তার গৌরব অসামান্য বা অনন্যসাধারণ না হলেও সাধারণ বা সামান্য নয়। একটা অখ্যাত নাটকের পার্ট, হয়তো বইখানার নামই বাপ্পারাও, বাপ্পারাওই হিরো; এইবার ভাবুন নাটকখানা

বেঁচে নেই কিন্তু নাটকের পার্ট করেছিল কোন একটি তরুণ যুবক, সে এমন পার্ট করেছিল যে তার গৌরবে সেই যুবকটিকে অবলম্বন করে নাটকের নামটা বেঁচে রইল। বাপ্পারাও ইতিহাসের নাম। সে-নামের সঙ্গে এই লোকটির কোন সম্পর্ক নেই। এ কথাটিও তার সঙ্গে মনে-না-রাখলে বিচারটা ঠিক হবে না। বাপ্পারাও নাটক আমি দেখিনি। নাট্যকারের নামও জানি না—তবে তার নায়কের পার্ট করে ওই নাম পাওয়া লোকটির কথা আমি শুনেছি; এই কথাটিই সেই মুহূর্তে আমার মনের সকল অবজ্ঞা বা পরিহাসকে যেন তিরস্কার করেছিল। যাক সে কথা। সেদিন যা ঘটেছিল তাই বলি।

এই সময়েই মেয়ের পোশাকেই বাপ্পা বোস রবীন্দ্রসদনের উত্তর দিকের প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে এসে যে কখন দাঁড়াল তা খেয়াল করিনি, বেশ একটি মনোরম কথোপকথনের মধ্যে মগ্ন হয়ে গিছলাম। সচেতন করে দিলে সেই প্রথম জন যে ইন্দুরানীদার বার্তাবহ হয়ে এসে আমাকে ঠিক গাড়িতে উঠবার মুখে পেছন ডেকেছিল। সে বললে—এই যে উনি এসে গিয়েছেন।

ওর কথাতেই মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। মনে হলো একটি বিধবা মেয়ে। চোখাচোখি হতেই আমাকে প্রণাম করলে। পরমুহূর্তেই চিনলাম এই সেই যাত্রার দলের বিধবা মেয়েটির ভূমিকার অভিনেতা বা অভিনেত্রী—। বাপ্পা বোস বা ইন্দুরানী।

হেঁট হয়ে আমার পায়ে হাত ঠেকিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং কপালে মাথায় হাত ঠেকিয়ে নিয়ে হেসে বললে—ক'দ্দিন থেকে যে ইচ্ছে আপনাকে প্রণাম করব! ওঃ আজ ইচ্ছেটা পূর্ণ হলো।

একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে বা পারত সেদিন? হেসেই বলেছিলাম—কেন?

সে বললে—আপনার দুই পুরুষে বিমলা করেছি—পথের ডাকে নিখিলেশের মা করেছি—দ্বীপান্তরে পদ্ম করেছি—।

—তাই না কি? সত্য সত্যই এবার ওকে আমার ভাল লাগল। মনে হলো অচেনা কোন আপনজন এসে পরিচয় দিয়ে বললে—আমি আপনার আপনজন। হয়তো পরিচয়ের ক্ষেত্রে সে আমার "সইয়ের বউয়ের বকুল-ফুলের বোনপো বউয়ের বোনঝি-বউ" কিন্তু তা হলেও চারি পাশের সম্পর্কহীন জনদের মধ্যে তার দাবিটাই সব থেকে বড় বা বেশি মনে হওয়াটা তো অস্বাভাবিক নয়!

আরও বহুজন যেমন দেখা হলে হেসে কেমন আছেন প্রশ্ন করে—'একদিন যাব আপনার ওখানে' বলেই সাক্ষাৎকারে যবনিকাপাত করে দেয় ঠিক সেইভাবেই সেও বললে—একদিন যাব আপনার ওখানে।

হেসে বলেছিলাম—বেশ তো! এসো! খুশি হব। রঙ্গের সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশিয়ে গম্ভীর অথচ স্মিত মুখেই বলেছিলাম।

—আমি যাই। পার্ট আসছে। বলে সে চলে গিছল স্টেজের দিকে।

আমি চলে এসেছিলাম এবং সত্য বলতে কি কিছুকালের মধ্যেই বাপ্পা বোস কি

ইন্দুরানীকে একেবারেই ভুলে গিছলাম। অবশ্য একটা কথা বলতে হবে যে বাপ্পা বা ইন্দুরানী কিন্তু তার কথা রেখেছিল—একদিন সে আমার বাড়িতে এসেছিল দেখা করতে কিন্তু আমি বাড়ি ছিলাম না; সে আমার এক নাতিকে বলে গিছল—বলো বাপ্পা বোস যে যাত্রায় পার্ট করে সে এসেছিল।

আমার নাতিরা অত্যন্ত আধুনিক, তারা ক্রিকেট ফুটবল যাত্রা থিয়েটার সিনেমা মিউজিক কনফারেন্স থেকে রাজনীতির আধুনিকতম সংবাদ রাখে; তারা বাপ্পা বোসকে চেনে, তারা মহা উৎসাহের সঙ্গে খবরটা দিয়েছিল।—দাদু, যাত্রাদলের অ্যাক্টর বাপ্পা বোস এসেছিল। বললে আর একদিন আসবে।

নাতির এই উৎসাহে আমি বেশ একটু শক্ত হয়ে গিয়েছিলাম আপনাআপনি।

তারপব আবাব সব স্তব্ধ। অর্থাৎ বাপ্পা বোস এবং আমার মধ্যে যে সংবাদ তাতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। সেটা সাধারণ পূর্ণচ্ছেদ নয়। প্যারা শেষের পূর্ণচ্ছেদও নয—সমাপ্তি বললে তাও হতে পারত; কিন্তু তা হলো না। কারণ অকস্মাৎ বাপ্পা বোসের নামটা বাংলাদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠল। একটি যাত্রার দল, না, যাত্রা পার্টি বলাই ভাল, তারা নতুন পালা খুললে; 'তরুণ বহ্নি'; এর বিষয়বস্তু হলো 'বিংশ শতাব্দীতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম'। এবং সেই নাটকে ক্ষুদিরামের পার্ট করে এই বাপ্পা বোস একেবারে বিখ্যাত হয়ে গেল।

লোকে বললে—দারুণ! একেবারে ফাটিয়ে দিযেছে।

'বিদায় দে মা ঘুরে আসি'—গানখানা যা গেয়েছে সে, তার রেশ একবার শুনে অনেক দিন কাটে না। লোকে কেঁদে আকুল হয়েছে।

আমি শুনিনি, গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনেছি শ্রেষ্ঠ গাযিকার গাওয়া সে গান, ছেলেবেলায় আমাদের দেশে বাজীকরেরা ঢোলক বাজিয়ে এ গান গাইত শুনেছি; কিন্তু যাত্রার দলে বাপ্পা বোসের গাওয়া গান শুনিনি; এবং ভেবেও ঠিক পাইনি এমন একটি বয়স্ক লোককে ক্ষুদিরাম মানালো কি করে?

* * *

এর জবাবটা বাপ্পা বোসই দিযেছিল। বলেছিল—বাপরে! ক্ষুদিরাম অনেক আছে সংসারে। কিন্তু ওই ক্ষুদিরাম—ওই নাম কি কেউ নিতে পাবে নাকি, পার্ট করে কি ক্ষুদিরাম হওয়া যায়?

হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিল—একালের ছেলের দল চাঁটি মেরে মাথায় টাক পডিয়ে দেবে না; বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে না? সর্বনাশ!

আবার গম্ভীর হয়ে উঠেছিল হঠাৎ এবং বলেছিল—দেখুন আমাদের দেশে একটা কথা আছে—'অপরাধে ফেটে মরে যাবে';—তাই হবে—ফেটে মরে যেতে হবে।

আরও একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলেছিল—দেখুন—আমার লাক্ বলতে হবে, না হলে ক্ষুদিরামের পার্ট আমার জুটত না। ক্ষুদিরাম আমার যাত্রা লাইফের শ্রেষ্ঠ পার্ট নয়। অনেক ভাল পার্ট করেছি। কিন্তু ক্ষুদিরামের পার্ট পাওয়া আমার শ্রেষ্ঠ সম্মান।

বছর কয়েক পরের কথা। যাত্রা জগতে এইসব নতুন হিড়িক আসার পর। হঠাৎ বাপ্পা বোসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেদিন তাকে সহজ চেহারায় দেখলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই ভাল লাগল। বেশ মিষ্টি চেহারা এবং তার এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। যেন তেঁতুল দিয়ে কি ভীম দিয়ে মেজে ঘসে চকচকে করে তোলা একটি আধুলি কি টাকা যার উপর ওই রুপোর চাকচিক্য ঝকমকানি ছাড়া সন তারিখ বা কোনও কারুর মুখের ছাপ কিচ্ছুরই চিহ্ন নেই। মাজা-ঘষা চেহারা, পোশাক পরিচ্ছদও পরিচ্ছন্ন, কেশবিন্যাসেও আধুনিক কিন্তু কুরুচি কোথাও নেই। বয়স তিরিশ হতে পারে কিছু কমও হতে পারে—আবার কেউ যদি বলে চল্লিশের ওপর তাও হতে পারে। পয়সার সঙ্গে তুলনা করলে অন্যায় হবে। বাপ্পা বোস কিন্তু তামার পয়সা থেকে মূল্যবান। বয়সের কথা তুলে থেমে গেলাম।

বেশ লজ্জিতভাবে হেসে বাপ্পা বোস নিজেই বললে—আমার বয়স এখন আটচল্লিশ চলছে। হঠাৎ সলজ্জ হাসিটুকু সকৌতুক হাসি হয়ে উঠল—যেন ইলেকট্রিক আলোকসজ্জার লাল আলোর সারি নিভে সাদা আলো জ্বলে উঠল—বললে—প্রায় এক বছর দশ মাস ধরে চলছে—আটচল্লিশ বছর—মাস দুই পরেই পঞ্চাশ হবে।

তার মানে ঊনপঞ্চাশ চলছে। বাপ্পা বোসের রসজ্ঞানের পরিচয় যেটুকু পেলাম তাতে চিত্ত আমার প্রসন্ন হয়ে উঠল।

থাক। গুছিয়ে বলি।

লাভপুর আমার বাড়ি, সিউড়ী জেলার হেডকোয়ার্টার। মধ্যে আমদপুর রেলওয়ে জংশনও বটে আবার বড় ব্যবসার জায়গাও বটে; দশ-বারোটা চাল কল আছে—তেল কল আছে একটি কোম্পানির—বড় বড় মহাজনী গদি আছে; কিন্তু এসব থেকেও আমদপুরের বেশি নাম উঠে-যাওয়া চিনির কলের জন্য। বিরাট একটা সুগার মিল তৈরি হয়ে এবং কয়েক বছর চলে অনেক কোটি টাকা জলে ফেলে উঠে গেছে।

সেইখানে এসেছিল যাত্রার দল। ওখানে একটা এক্‌জিবিশন হচ্ছিল। আজকাল যাত্রাগান হয় টিকিট বিক্রি করে। টিকিট বিক্রি হয় খুব। থিয়েটার থেকে বেশি। চারিদিকে দর্শক বসে। বাইরেটা টিন দিয়ে ঘেরা। দর্শক হয় চার-পাঁচ হাজার। মাইক থাকে। পালা সব নতুন যুগের। 'একখানা রুটি' 'তিনটে পয়সা' থেকে হিটলার লেনিন পর্যন্ত। এই সময়টায় আমি গ্রামে ছিলাম, আমদপুরের কর্তৃপক্ষ আমাকে নিমন্ত্রণও করেছিল। যাত্রাদলের থেকেও লোক এসেছিল নেমন্তন্ন করতে। কিন্তু আমার যাওয়া ঘটেনি। পরদিন সকালবেলা গ্রামের ক'জন উৎসাহী যুবক এল—একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে। আজকালকার ছেলেরা সব শিক্ষিত ছেলে; আমাদের গ্রামে অনেক বি-এ এম-এ পাস করা ভাল ছাত্রও আছে; এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আছে, সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট আছে, ঈশান স্কলার আছে, নামকরা ডাক্তার আছে; বাইরের প্রফেসররাও আছে। তখনও কলেজটা ছিল। তারা একটা চমৎকার ড্রাফটও করে এনেছিল; চমৎকার চাতুর্যপূর্ণ মুসাবিদা—লিখেছিল—আপনারা আমদপুরে যাত্রাগান করেছেন—তার প্রশংসায় আমাদের বালক বৃদ্ধ এবং মেয়েরা গান শুনবার জন্য

উন্মুখ হয়ে উঠেছে। আমারও শোনার আগ্রহ আছে। এখন আপনারা যদি আমদপুরে গাওয়া শেষ করে যাবার পথে এখানে একরাত্রি গাওনা করে যান তা হলে সুখী হব। সেই সঙ্গে একটি পল্লীগ্রামের মানুষদের সাধ্যের কথা স্মরণ রাখতে বলি। আমাদের গ্রামে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অর্থ আমদপুরের তুলনায় অনেক কম আসে একথা আপনাদের বলতে হবে না বলেই মনে করি—এবং এ পালাগান মেলায় টিকিট বিক্রি করেও নয়; গ্রামের মধ্যে চাঁদা করে হবে—সর্বসাধারণে দেখবে।

ইতি—।

মনে মনে ওদের তারিফ করেই দস্তখত করে দিলাম। চিঠিখানা নিয়ে ওরা উঠছে এমন সময় প্রবেশ করল সুন্দর সুবেশ একটি তরুণ এবং তার সঙ্গে আরও দু'-তিনজন যারা চেহারায় পোশাকের এবং চুলের বিন্যাসে একেবারে যাত্রা-থিয়েটার পার্টির ছাপমারা চেহারা। এই তরুণটি কিন্তু তা নয়।

এই তরুণটিই বাপ্পা বোস। সে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রম করেই বললে—আমরা আসছি আমদপুর থেকে। যাত্রা পার্টির লোক আমরা।

এবার হেঁট হয়ে প্রণাম করে বললে—আমাকে বোধ হয় চিনতে পারলেন না। পারবার কথাও নয়।

ততক্ষণে আমার গ্রামের ছেলেদের ফিসফাস কথার মধ্য থেকে বারকয়েকই বাপ্পা বোস নামটি উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আমি সেই নারীবেশীর সঙ্গে এই পুরুষবেশীকে জ্যামিতির কোন সূত্র অনুযায়ীই মেলাতে পারছি না, তবুও স্মৃতিশক্তির বা বুদ্ধিমত্তার তারিফ নেবার জন্যই বোধ হয় (তাছাড়া আর কি হতে পারে?) বলে ফেললাম—বাপ্পা বোস?

সে হেসে বললে—আপনি শুনে বলছেন। এঁরা ফিসফিস করে নামটা বলছিলেন—আমার কানেও এসেছে। আমাকে কোথায় দেখেছেন বলুন!

মনে ছিল; বললাম, রবীন্দ্রসদনে—

সে আর একবার আমার পায়ের উপর চট করে হাত ঠেকিয়ে বললে—এটা সত্যিই মনে আছে আপনার। কিন্তু আমাকে তা থেকে চিনবেন কি করে! আমি তো মেয়ে সেজেই আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

প্রশ্নটা আপনাআপনিই এল—মুখ থেকে বেরিয়ে গেল প্রায়। বললাম—আচ্ছা তোমার ভয়েস তো একেবারে অবিকল ফিমেল ভয়েস বলে মনে হয়েছিল।

বাপ্পা বোস বলেছিল—ঠিকই মনে আছে আপনার, ফিমেল পার্ট করবার জন্যে ওটা আমার তৈরি করা ভয়েস। সেদিন ফিমেল পার্ট করতে করতে বেরিয়ে এসেছিলাম তো—পার্ট পরেও ছিল, তাই ভয়ে সে ব্রেক আর দিইনি! অনেকটা গানের গলার মতো। আপনাকে ওর কথা আর বলব কি? আপনি তো নিজেই সীতার পার্টে এমনি গলা তৈরি করেছিলেন। হাসলে সে। আমি বিস্মিত হলাম।

আপাদমস্তক তাকে একবার দেখে নিলাম। চমৎকার চোখ-জুড়ানো চেহারা। চেহারা পোশাক মার্জনা সবই। আমাদের দেশে একসময় 'নটো' শব্দটা অসম্মানজনক বিশেষণ

ছিল, নটো নটেরই অপভ্রংশ। এবং আমার জীবনে এই শ্রেণীর তরুণ এবং যুবক তো কম দেখিনি! কিন্তু আমার সীতার পার্ট করার কথা জানল কি করে?

আমাদের লাভপুরের থিয়েটারের নাম বাংলার নাট্যান্দোলনের ইতিহাসে উল্লিখিত হবেই। ঢাকার বলধা জমিদারের থিয়েটার, নিমতিতা কাঞ্চনতলার চৌধুরীবাবুদের থিয়েটার, অগ্রদ্বীপের বাবুদের থিয়েটার, মহারাজা কাশিমবাজারের শখের থিয়েটার—তার মধ্যে লাভপুরের থিয়েটারও ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে আছে। লাভপুরের থিয়েটারে আমি নিজে নারীভূমিকায় অভিনয় করেছি। সীতার পার্টে প্রশংসা হয়েছিল আমার। কিন্তু সে তো আজকের কথা নয়। বাপ্পা বোসের আপাদমস্তক দেখেও ঠিক করতে পারলাম না সে-বার্তা এই বাপ্পা বোস জানল কি করে?

অনুচ্চারিত প্রশ্নটার আভাস বোধ করি সে চোখ দিয়ে পেয়েছিল—আমার দৃষ্টি থেকে ঠিক মানে করে বুঝে নিয়েছিল; উত্তর সে নিজে থেকেই দিয়েছিল—বলেছিল—আমার বয়স তখন খুব কম—বছর আষ্টেক বয়স হবে—তখনকার কথা। আপনি সীতা, অমরবাবু রাম, চন্দ্রবাবু লক্ষ্মণ, সত্যবাবু লব, ধীরেনবাবু দুর্মুখ।

এবার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না—বললাম—আট বছর বয়সে দেখেছ তার এত মনে আছে তোমার?

বাপ্পা বোস বললে—আপনার অনুমতি নিয়ে বসছি।

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—বসো বসো বসো। আমার ত্রুটি হয়ে গেছে। কিছু মনে করো না। তোমার কথাবার্তা শুনে এবং তোমাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

লোহার চেয়ার পাতাই ছিল—বাগানের মধ্যে একটা বাঁধানো বেদীও আছে—একটা ছত্রিওলা বসবার জায়গা আছে, তার মধ্যে বেছে নিয়ে বসল সে বাঁধানো বেদীর উপর। বললে—আপনার তো পাঁচ বছর বয়সে মামার বাড়ির কথা মনে আছে যে বাড়িতে আর কখনও যাননি।

প্রায় চমকে উঠলাম। বললাম—তা আছে। পাটনায় মহেন্দ্রূ বলে একটা মহল্লা আছে, সেই মহল্লায় একটা বাড়ি। পাঁচ বছর বয়সে গিছলাম। তারপর আর যাইনি। কিন্তু ঠিক ঠিক মনে আছে। সে কথা তুমি জানলে কি করে?

সে বললে—আপনার আত্মজীবনী মানে সাহিত্যজীবনে পড়েছি বোধ হয়। কিংবা অন্য কোথাও। একটু হাসলে। তারপর বললে—আজ আমাদের যাত্রা দেখতে আসুন। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

আমার গ্রামের ছেলেরা দাঁড়িয়েই ছিল—তারা বললে—উনি যে আপনাদের নিমন্ত্রণ করে এইমাত্র চিঠি লিখে আমাদের হাতে দিলেন—আমরা নিয়ে যাচ্ছিলাম আমদপুরে আপনাদের ওখানে।

চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলে তারা।

বাপ্পা বোস বললে—বেশ কথা। নিমন্ত্রণ নিলাম আমরা।

ছেলেটি বললে, কত লাগবে বলুন?

কত লাগবে এ কথা তো নয় এখানে—কত পারবেন কত দেবেন তাই কথা। আর তার জন্যে কি আটকায়?

আমার ভাণ্ডারী এবং ভৃত্য তার সঙ্গে হয়তো সকল প্রয়োজনের কাণ্ডারী রাম ট্রেতে চা সাজিয়ে নিয়ে এল।

বাপ্পা বোস বেদী থেকে উঠে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে কাছে বসল। বললে, অনেকদিন থেকে বাসনা—আপনার কাছে আসব। আপনার প্রতি আমার একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে।

বললাম, চা খাবে একটু অপেক্ষা কর। কারণ রাম চায়ের সঙ্গে টা দেবে—আনছে এ আমি জানতাম; আমি তাকে ইশারা করে বলে দিয়েছি চা দেবার সময়। বলতে বলতেই রাম মিষ্টি এবং বিস্কুট নিয়ে হাজির হয়ে গেল।

বাপ্পা বোস বা অন্যেরা না বললে না।

বাপ্পা বিস্কুট চিবুতে চিবুতে বললে—বৈঠকখানা বাড়ির অনেক কিছু পালটেছেন—না?

আবার তাকালাম তার দিকে। প্রশ্ন ছিল তার মধ্যে।

সে বললে—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছব হযে গেল—মানে নাইনটিন ফরটি-ওয়ানে সেবার রাসের সময় আপনাদের এখানে থিয়েটার করে গিযেছি আমি। আপনিও নেমেছিলেন সেবার। আমি তখন সব দেখে গিযেছিলাম। বাড়িটার তখন প্রায় ভাঙা ভগ্ন—.সব যেন জঙ্গল হযে গিয়েছিল। আপনি তখন গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এই রকম একটা গুজব ছিল এখানে। সে সময হঠাৎ এসে পড়েছিলেন। থিযেটারের পার্টের লোক আসেনি। আপনি সন্ধ্যেবেলা পার্ট নিয়ে পার্ট করে দিলেন। কর্ণার্জুনে শকুনি আর বিধাযকবাবুর মাটির ঘরে বড় জামাইযেব পার্ট। আমি নিয়তির পার্ট করেছিলাম আর মাটির ঘরে ছোট মেয়ের পার্ট। মনে পড়ছে আপনার?

চমকে উঠলাম। বলছে কি? পড়ছে মানে? কথাগুলি শুনবামাত্র আশ্চর্য একটা ছবি ভেসে উঠল মনেব মধ্যে। আমাদের থিযেটার স্টেজের সামনে পাকা রাস্তাটার উপর একজন ঘোড়সওয়ার এসে লাগাম টেনে ধরে ঘোড়াটাকে রুখে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল রাস্তার উপর এবং হাত তুলে চিৎকার কবে বললে 'আমি এসেছি, আমি এসেছি।'

সোনার বালা পরা হাত। গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, পরনে একখানা মেয়েছেলের চওড়া পাড় শাড়ি। হাতে-মুখে পেন্ট, চোখে কাজল, কপালে কুমকুমের টিপ, ব্র্যাকব্রাশ করা লম্বা বাবরি চুল। মুখ দেখে মনোহারিণী একজন তরুণী বলেই মনে হয়েছিল। ওখানকার স্টেজের উপর তখন প্রায় 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' ধরনের ব্যাপার চলছে। আমাকে ডেকে এনেছে বাড়ি থেকে। থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। অ্যাক্টর আসেনি।

বাপ্পা বোস ঠিক বলেছে—আমি তখন দেশ ছেড়েছি, প্রতিজ্ঞা করে না ছাড়লেও মনে মনে এমনই একটা কার্যকারণসঞ্জাত বেদনা ও ক্ষোভ এবং কল্পনা আছে। সে

অনেক কথা। সে বলতে গেলে আমার গ্রামের 'ইতিকথা' বলতে হবে। এবং তা বলতে গেলে বাপ্পার কথা বলা হবে না। মোট কথা তখন কলকাতাপ্রবাসী আমি। বৎসরে একবার তাও সববার যাইনে। ভাইরা থাকেন ওখানে। সে-সময় কোন একটা বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামে থিয়েটার হবে শুনেছি মাত্র, কোন সম্পর্ক বা উৎসাহ রাখিনি। আমি তখন পুরো নাট্যকার হয়েছি। কালিন্দী নাট্যনিকেতনে অভিনয় হয়ে গেছে—দুই পুরুষ হবে; নাট্যভারতী নিয়ে রেখেছে—সেটা তাদের আগামী বই। সুতরাং আমার অহংকার অনেক। গ্রামের লোকেরা যারা এটাকে আমলই দিতে চায় না তারাই ড্রামাটিক ক্লাবের কর্তা। তারাই সব আয়োজন করেছে। বাইরে থেকে অ্যাক্টর আনবার ব্যবস্থা করেই সব স্থির করা হয়েছে।

আমাদের গ্রামে বড় জমিদার এবং ব্যবসাদার ছিলেন অন্য এক বাঁড়ুজ্জেরা, তাঁদের কলিয়ারী আছে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসা আছে, ইনসিওরেন্স আছে—আরও সব অনেক রকম আছে। এঁদের বাড়িরই ছেলে ছিলেন স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়: রাতকানা, প্রহসন, বীররাজা, নবাবী আমল নাটক লিখেছিলেন। এ থিয়েটার ইনিই স্থাপন করেছিলেন। এবং এ পর্যন্ত পাকা স্টেজ অডিটোরিয়াম করবার জন্যে এঁরাই সব থেকে বড ডোনার। বাকি যাঁরা তাঁরাও এদের বাড়িরই আত্মীয় জামাই বা ভাগ্নে। এঁরাই আজও অর্থাৎ ১৯৪১ পর্যন্ত অভিনয়ের খরচও দিয়ে থাকেন। কিন্তু গণতন্ত্র ভয়ানক ব্যাপার। যুগটা গণতন্ত্রের সুতরাং গণতন্ত্র সমর্থক যাঁরা তাঁরা এঁদের কর্তৃত্বের ঘোরতর বিরোধী। বলা বাহুল্য আমি একজন গণতন্ত্র-উপাসক, স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলাম। গোড়ায় অর্থাৎ জীবনের প্রথম দিকে আঠার-উনিশ বছর বয়স থেকে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত এ থিয়েটারে আমি একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলাম। সীতার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম সেই সময়। থাক সে কথা। এর বেশি প্রয়োজনও নেই বাপ্পা বোসের গল্পের ক্ষেত্রে।

সেবার রাসের সময় তখনকার যাঁরা কর্তৃপক্ষ তাঁরা অর্থাৎ বাঁড়ুজ্জে বাড়ির ক'টি ছেলে তাঁদের কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে পার্ট দিয়ে কর্ণার্জুন এবং মাটির ঘর অভিনয় করছিলেন; সেই দিনই অভিনয়; কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত শকুনির এবং মাটির ঘরের বড় জামাইয়ের পার্টের লোক ইনসিওরেন্স কোম্পানির একজন এজেন্ট তিনি এসে পৌঁছুলেন না। আর পৌঁছুল না নিয়তির পার্টের এবং মাটির ঘরের ছোট মেয়ের পার্টের লোক। অর্থাৎ রোমান্টিক নায়িকা গাইয়ে তরুণীর পার্টের লোক। অ্যামেচার থিয়েটারে সব থেকে দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী গোছের ব্যাপার। শুধু অ্যামেচার বা কেন পেশাদার থিয়েটারেও সুকণ্ঠি গায়িকার ভূমিকার মেয়ে দু'জন একজনের বেশি থাকে না। থাকে না মানে মেলে না। শুনলাম এ ছেলেটি নাকি সদ্য উঠতি ছেলে, গলায় মধু ঢালা আছে, তার উপর ভারী মিষ্টি চেহারা। সব থেকে বড় কথা ছেলেটি ম্যাট্রিক পাস করা ছেলে। নাম ইন্দুভূষণ বোস। একসময় নাকি আমাদের গ্রামে ছিল, তার বাপ ছিল আমাদের গ্রামের রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। বছর তিনেক আমাদের গ্রামে ছিল। এখানকার প্রাইমারী ইস্কুলে পড়ত। ছেলেটি এখন থিয়েটার করেই বেড়ায়।

ইতিহাস তার যা শুনলাম সে খানিকটা যেন সচরাচর থেকে স্বতন্ত্র। ছেলেটি ভদ্র নম্র এবং তার থেকেও বেশি এই যে সে ম্যাট্রিক পাস এবং এখনও পড়াশুনার চর্চা করে। এখন তার থিয়েটারে পার্ট করাই প্রায় পেশা, অথবা থিয়েটারে পার্ট করতে পারার জন্যই ওর চাকরি, তবুও থিয়েটার করে চাকরি করেও সে পড়াশুনোর অবকাশ পায় বা অবকাশ করে নেয়। পড়াশুনো সাহিত্য নাটক সঙ্গীতের বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—কোন কলিয়ারীতে থাকে এবং সেখানে ওভারশিয়ারী বা ওভারম্যানশিপ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

ছেলেটির বাবাকে নামেই চিনেছিলাম। স্টেশন মাস্টার ছিলেন। মিষ্ট স্বভাবের লোক। ছেলেটিকেও আবছা মনে পড়ল—ফুটফুটে সুন্দর দেখতে অতি মধুকণ্ঠ একটি ছেলে; বাপ বৈষ্ণব ছিলেন; ছেলেটি বাপের সঙ্গে কীর্তন গাইত।

আমার বেশি করে মনে পড়ল—আমি ওকে সে সময় স্বদেশী মিটিংয়ে গান গাইবার কথা বলেছিলাম কিন্তু ওর বাপ হাত জোড় করেছিলেন।

স্পষ্ট সব মনে পড়ল না তবুও যেন একটু চেষ্টাতেই চিনে যাওয়ার মতো মনে পড়ল। শুনলাম, মাস্টার এখান থেকে যাওয়ার পর চেষ্টা করে কাটোয়ায় বদলী হয়েছিলেন। ছেলেটি সেখানেই পড়ত। ছেলেটি যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে সেইবারই তার বাপ মারা গেলেন। ছেলেটি পাশ করলে কিন্তু গোটা সংসারটা অনাথ হয়ে গেল।

তবে অনাথেরও নাকি নাথ আছেন। আর আছে মানুষের ভাগ্য। ভগবান এবং ভাগ্য তার ব্যবস্থা করেই তাকে সুন্দর চেহারা এবং অপরূপ কণ্ঠস্বর দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তাই তার কাজে লাগল। বর্ধমান জেলায় বৈকুণ্ঠপুরের বাবুরা কলিয়ারীর এবং জমিদারির মালিক। তাঁদের গ্রামে থিয়েটার আছে—সেই থিয়েটারে এই গাইয়ে ফিমেল পার্ট করবার জন্য বাবুরা তাকে তাঁদের কলিয়ারীতে চাকরি দিয়েছেন। শুধু বৈকুণ্ঠপুরেই নয়, কলিয়ারী অঞ্চলেও তার এর জন্য খুব খাতির। ছেলেটিরও এদিক দিয়ে খুব নেশা। সে ফিমেল পার্ট করবার জন্য নিজের সরঞ্জাম পর্যন্ত বানিয়ে নিয়েছে। মাথার চুল, কানের দুল, হাতের চুড়ি, সে আবার দু'তিন রকম, গিল্টির হার এবং কাঁচের পুঁতির মালা, নাকের নাকচাবি, গলার হার, ভুরু আঁকবার চোখ আঁকবার কালি এবং তুলি বা কাঠি, লিপস্টিক, সুন্দর শৌখিন কাঁচুলি বডিস ব্লাউস ভাল রুজ এ সব একটি ছোট শৌখিন চামড়ার ব্যাগে বয়ে নিয়ে বেড়াতো।

কলিয়ারীতে সুপরিচিত এই ছেলেটির নিয়তির পার্ট দেখে মুগ্ধ হয়েই আমাদের গ্রামের বাবুরা ওকে বেশ সুন্দর, হয়তো তারও বেশি, সুমনোহর একটি দক্ষিণার বিনিময়ে রাসের সময় ওই দুটি পার্টের জন্য তাকে অগ্রীম টাকাও কিছু দিয়েছিলেন। কলকাতায় এঁদের ব্যবসায়ের আপিসে একটা রিহারস্যালের আড্ডা—এখানেও একটা আড্ডা আছে। কলকাতার আড্ডায় দু'চার দিন রিহারস্যালও দিয়ে গেছে। এবং কথা দিয়েছে অভিনয়ের দিন সন্ধ্যার সময় ঠিক এসে হাজির হবে। তার আগে আসা হবে না। তার আগের দিন ধানবাদ রেলওয়ে ইনস্টিটুটে তটিনীর বিচার নাটকে

নায়িকা তটিনীর ভূমিকায় অভিনয় করার কথা তার। এঁরা বলেছিলেন দু'দিন আগে এখানে আসতে কিন্তু তা সম্ভব হয়নি এই জন্যই। সেখানে নাকি তার কোন বিশেষ প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। কিন্তু সন্ধ্যার ট্রেন চলে গেল—অভিনয়ের দু' দু'জন বড় বড় ভূমিকার লোক নেই,—সুতরাং অভিনয় অসম্ভব হয়ে ওঠাই উচিত ছিল—তাইই স্বাভাবিক—কিন্তু এ সংসারে নতুন বা নবীন যারা তারা অসাধ্যসাধন করতে পারে।

তিনজন নবীন প্রথম থিয়েটারে নামছিল সেবার। এবং তারা হলো কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পুরুষ। কলেজ জীবন শেষ করে সবে আপিসে ঢুকেছে, সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারে। একজন সাজবেন কৃষ্ণ, একজন সাজবেন প্রধানা নায়িকা পদ্মাবতী আর একজন বিকর্ণ, একসিনেব যে পার্টটি কবে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায রাতারাতি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁরাই উপায় বের কবলেন। আমাকে এসে ধরলেন—শকুনির এবং জামাইয়ের পার্ট করে দিতে হবে। এ বিষযে আমার একটা খ্যাতি আছে, একবাব বইখানা পড়ে নিযে এবং প্রম্পট শুনে একবার বলে নিয়ে বড় পার্ট চালিয়ে দিতে পারি। এর আগে একবাব নয দু' দু'বাব চালিযে দিযেছি, তার উপর কর্ণার্জুনে একসময় শকুনির পার্ট আমি কবেছি—সুতবাং আমাকে এসে তারা ধরে নিয়ে গেল—তাদের এই উদ্যমকে সার্থক কবতে ঘাড আমাকে পাততেই হবে। নিয়তি এবং মাটির ঘরের ছোট মেয়ের পার্টেব কথা তাবা খুব ভাবছে না কারণ আমাদের পুরনো আমলের কর্ণার্জুনেব 'নিয়তি' আজও বিদ্যমান। সে একটি স্থানীয যাত্রাদলের মেয়ের পার্টের লোক। লোকটির গ্রাম্যতা দোষ আছে। তাছাড়া এখন তার চুল পাকতে শুরু করেছে। তবে পার্ট সে এখনও করে। দাঁতও একটা ভেঙেছে কিন্তু তার উপায় নেই। নিয়তির পার্ট সে ভাল করবে। গলা তাব মোটা হয়ে গেছে—তা হোক—গাইয়ে সে ভাল। মাটির ঘরে ছোট মেয়ের পার্ট তাকে মানাবে না, কুমারী মেয়ের পার্ট তার জন্যও ভাবনা নেই, গান বাদ দিয়ে এব পার্টে কাঁইচি চালিযে ও পার্ট চালিযে দেবাব লোক আছে। কাঁইচি চালনায আমাদেব ক্লাবের নাম ছিল।

এমনি বিপদ আর একবাব ঘটেছিল। এমনি গাইয়ে নাযিকার পার্ট দেওয়া হয়েছিল একজন কলকাতাব ছেলেকে, সে এই নাবী ভূমিকায় অভিনয করে বিখ্যাত হয়েছিল। একালের কলকাতার বড বড অভিনেতাবা সে ছেলেকে জানতেন,—নাম ছিল তার 'বিধু'—অনেকে রহস্য করে বিধুমুখী বলতেন; এই বিধু সেবার পার্ট করব বলে কথা দিয়ে টাকা নিযেও শেষ পর্যন্ত আসেনি—কিন্তু তাতে আমরা দমিনি, প্রমথ বলে আর একটি বিখ্যাত মেয়ে ভূমিকায় অভিনয় করা ছেলেকে বেগম সাজিয়ে দাঁড করিয়ে দিযে বই চালানো হযেছিল; বেগমের পার্টে হাঁ, না, বাদশাদের জয় হোক, আপনার যা অভিরুচি এই কয়টা কথা ছাড়া বাকিটা সব কাঁইচি চালিয়ে কেটে ছেঁটে দেওয়া হয়েছিল। আমরা অহংকার করে বলতে পারি অপারেশন ওয়াজ ভেরী সাকসেসফুল স্টিল দি পেশেন্ট ডিডন্ট ডাই; লোকে নাম করেছিল অভিনয় দেখে—বলেছিল—'সুন্দর করেছে বাপু।' এবারও সেই পুরাতন পরীক্ষিত পথটিই ধরা হবে ঠিক কবে বইখানা খুলে বসা হয়েছিল, আমি লেখক মানুষ বলে আমাকেই

দিয়েছিল বইখানা, অস্ত্র অর্থাৎ ফাউন্টেন পেন আমার পকেটেই ছিল। পুরনো নিয়তির অভিনেতাও এসেছিল, উদ্যোক্তাদের বলছিল—কিছু কিছু কেটে ছোট করে দাও। মনে তো নেই। এরপর আমাকে বলেছিল—দিন আপনিই কেটে দিন। দুটো সিনে কলমের ডগা দিয়ে ছুরির কাজই চালিয়ে অন্য একটা সিনে চোখ বুলাচ্ছি এমন সময় এই বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

সামনে রাস্তার উপর চিৎকার শুনলাম—আমি এসেছি আমি এসেছি।

সামনে অডিটোরিয়ামের কোলেই পাকা রাস্তার উপর সোনার বালা পরা হাতখানা তুলে একজন ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে বললে—আমি এসেছি। হাতে-মুখে পেন্ট, চোখে কাজল অথবা কালি দিয়ে আঁকা চোখের রেখা, ভুরুও লম্বা করে টানা, কপালের মাঝখানে কুমকুমের টিপ, পিছনে ফেলা লম্বা লম্বা চুল, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, পরনে চওড়া পাড় লাল পেড়ে শাড়ি পরে অর্ধনারীশ্বরের মতো যেন আবির্ভূত হলো।

সকলে বলে উঠেছিল—এসেছে! এসেছে! এসেছে!

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কে? ও কে?

—ওই তো ইন্দুভূষণ—নিয়তির পার্ট করবে—

ঘোড়াটার লাগাম একটা গাছের ডালে বেঁধে একটা সিগারেট ধরিয়ে হন্‌হন্ করে এসে লাফিয়ে স্টেজের উপর উঠে বললে—বাপস্। যা করে এসেছি—। ধানবাদে ট্রেন ফেল হয়ে গেল, গুডস ট্রেনে আসানসোল এসে একখানা ট্রাকে এসেছি আমদপুর। সেখানে ছোট লাইন ফেল হয়ে গেল। কি করব, গরুর গাড়ি আসছিল মালপত্তর নিয়ে। তাতে উঠে বসলাম। কিছু দূর এসে দেখলাম খুব আস্তে যাচ্ছে। মাঠে ঘোড়া চরছিল। খোঁজ করে এক শেখ সাহেবের বাড়ি গিয়ে বললাম—ঘোড়াটা ভাড়া দাও, লাভপুরে বাবুদের থিয়েটারে যাব—ওখান থেকে নিয়ে আসবে। আমার এই পোশাক দেখে পেন্ট দেখে শেখ খুব খুশি, বললে—নিয়ে যাও ঘোড়া—আমার লোক যাচ্ছে সঙ্গে, সে থিয়েটার দেখে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি আসবে।

এরপর আচমকা কেউ আমার নাম করে আমাকে চিনিয়ে দিতেই ইন্দু শান্ত স্থির এবং কিছুটা যেন লাজুক হয়ে গিছল।

পার্ট সে দারুণ করেছিল। যেমন নিয়তি তেমনি ওই মাটির ঘরের পার্ট। তার কিন্তু [illegible] থেকে ভাল লেগেছিল আমার পার্ট। বিশেষ করে মাটির ঘরে ওই বড় জামাইয়ের পার্টটি। শকুনির পার্টে আমার নাম ছিল ওখানে। ও পার্ট আমি শকুনির পার্টের মূল অভিনেতা নরেশবাবুর সঙ্গে আমাদের ওখানেই করেছিলাম। নরেশবাবু ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের পার্ট করেছিলেন।

এ সব কথা আজকের নয়—আজ ১৯৬০ সাল আর সেটা ছিল ১৯৪১। এর মধ্যে আমার জীবনে কম জলস্রোত প্রবাহিত হয়নি। সেই স্রোতোপ্রবাহে এই ইন্দুভূষণের মতো একটি ছেলের কোথায় কোন দিগন্তরে ভেসে গিয়ে লাগার কথা বা জলতলে পঙ্কশয্যায় সমাধি নেওয়ারই কথা; কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম বাপ্পা বোস এতদিন
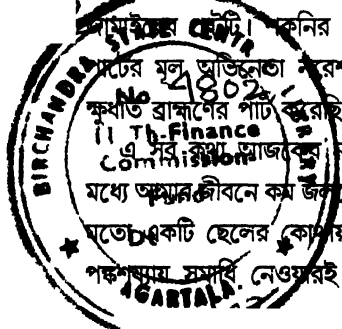
পর কথাটা মনে পড়িয়ে দিতেই মুখে-হাতে পেন্ট মাখা, কুমকুমের টিপ পরা, হাতে বালা পরা সেই বিচিত্র ইন্দু যেন স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে উঠে বললে—আমি এসেছি।

গল্প উপন্যাসের চলিত ব্যাকরণ মতে বোধ করি দোষ হয়ে গেল। ব্যাকরণ লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং পাঠককেও খানিকটা এলোমেলো গল্প বলার গোলমালে ফেলা হচ্ছে।

গল্প উপন্যাসের কথকতা বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে করা উচিত। আমি বলতে এসেছি এই বাপ্পা বোস বা ইন্দুর কাছে শোনা একটি গল্প (না গল্প নয় একটি ঘটনা এবং তার সঙ্গে একটি জীবনের কথা)। কিন্তু এ পর্যন্ত নিজের কথা এবং বাপ্পা বোসের কথা বলে চলেছি। পাঠকদের কাছে একটু মার্জনা চেয়ে নিযে এ সম্পর্কে একটু কৈফিয়ৎ দিতে চাই। সেটা হলো এই গল্পটি আমি শুনে লিখছি। অসম্ভব-সম্ভবের দায় বাপ্পা বোসের, তবে আমি যখন লিখছি তখন নিন্দার ভাগী আমাকে অবশ্যই হতে হবে। আমি কিছুটা বিচার কবে নিযেই লিখছি। আমি এসব ঘটনাব কথা জানি। এদের আমি চিনি। যাক এখন বাপ্পা বোসের বলা গল্পটাই শুরু করি।

* * *

বাপ্পা বোস আমার জানা আমার চেনা। এবং নিতান্ত বাল্যকালের বাপ্পাকে, বাপ্পা তখন আমাদের ছোট লাইনের স্টেশন মাস্টারের আট বছরের ছেলে 'ইন্দু', (ডাকনাম ছিল বোধ হয়—থাক ডাকনাম) তাকেও অনেকে চেনে—কিন্তু বাপ্পা সে চেনাকে আমল দিলে না। বাপ্পা এখন অপেরা পার্টিটার প্রধান নয়, তবে সে 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' তাতে সন্দেহ নেই। পূর্বেই বলেছি ওর চেহারায জলুস আছে লাবণ্য আছে, কথায়-বার্তায় একালের মানুষের সম্ভ্রম এবং রুচি আছে তার সঙ্গে আরও একটু কিছু আছে—সেটা হলো বড় হওয়ার একটা বিনয় ও অহংকার দুইই। বাপ্পারা পরের দিন সকালে দল নিয়ে আমাদের গ্রামে এল। গ্রামের তরফ থেকে আমার জবানিতে লেখা নিমন্ত্রণ ওদের দলের সকলেই নাকি খুশির সঙ্গে গ্রহণ করেছে। দু'দিক থেকেই পরস্পরের প্রতি বেশ একটি হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল যাতে অভিনয় একদিনের বদলে দু'দিন হলো। এবং আমার গ্রামের লোকেরা গোটা দলটার জন্যে যে সম্মান এবং সৎকারে আপ্যায়িত করলে তাতে সত্য সত্যই শিল্পী ও লেখক হিসেবে আমি পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলাম—তার সঙ্গে বাপ্পা বোসও খুব খুশি হয়েছিল।

গ্রামের সব থেকে উৎকৃষ্ট বাড়িখানা বাঁড়ুজ্জেবাবুদের জামাইয়ের। খালিই পড়েছিল সেখানা। তাঁরা এখানে আর আসেনই না, তবু বাড়িখানিকে খুব যত্নে রেখেছেন; সেই বাড়িতে মেয়েদের এবং বিশিষ্ট অভিনেতাদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল—তার সঙ্গে সাধারণ যাঁরা তাদের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছিল ওই বাঁড়ুজ্জেবাবুদের ঠাকুরবাড়িতে, বিশ ফুট লম্বা দু'খানা ঘরে। খাওয়াদাওয়ার জায়গাও ওইখানেই।

গাওনা আমাদের থিয়েটার স্টেজে, পাকা স্টেজ পাকা অডিটোরিয়ম, এখানে

অভিনয় করেও আনন্দ এবং অভিনয় দেখেও আনন্দ। এছাড়া আব একটা জিনিস আছে যেটাকে বলা চলে 'আরও কিছু।' সেটা ওই 'আবও কিছুই'—ওর আব অন্য নাম নেই। সেই উপকবণ সেই বাঁধিযে সেই খাইয়ে কিন্তু বাঁধিয়ে বান্না কবলে এমন সুশৃঙ্খলে ও খুশিতে যে তেমনটি সচবাচব হয় না এবং যাবা খাইয়ে তাবাও পবম পবিতৃপ্তি পেলে তেমনিভাবেই উতবে গিয়েছিল সব।

বাপ্পা এখানকাব স্টেজে অভিনয় কবে গেছে, এ গ্রামে বাল্যকালে তিন-চাব বছব থেকেছে, (সে কথাটা অবশ্য প্রকাশ কবতে আমাকে বাবণ কবেছে) এখানকাব সব তাব জানা-চেনা, এখানকাব মেজাজ সে বোঝে—সে সব দেখে শুনে আমাকে বলল—যে সম্মান আপনি আমাকে কবলেন দাদা, আমাব কথা ফুবিযে যাচ্ছে—দাদা আমি বলতে পাবছি না।

আমাদেব গ্রাম বাংলাদেশে একখানি নামকবা গ্রাম। ধনে মানে গুণে কাঞ্চন কৌলিন্যেব যুগে একটি বিশেষ নাম অর্জন কবেছিল। অভিনযেব ক্ষেত্রে আমাদেব গ্রামেব থিয়েটাবেব অভিনয কলকাতাব থিযেটাবেব কাছে খাটো ছিল না, তুলনায় নিষ্প্রভ ছিল না বললেই ভুল বোঝান যাবে। স্বর্গীয় নির্মলাশববাবু একজন নাট্যকাবই ছিলেন না শুধু, খুব বড দবেব অভিনেতাও ছিলেন। কলকাতাব সেকালেব গিরীশবাবু থেকে এ কালেব শিশিবকুমাব, নবেশচন্দ্র, তিনকড়িবাবু এখানে এসেছেন। অপবেশবাবু এখানে এসে থাকতেন। বসবাজ অমৃতলাল, নাট্যকাব অধ্যাপক মন্মথবাবু, ক্ষীবোদপ্রসাদ, এবা এসেছেন থেকেছেন, অভিনয দেখেছেন। এমন কি আমাদেব চিবকুমাব সভাব অভিনযেব প্রশংসা শুনে স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ আমাদেব অভিনয দেখতে চেযেছিলেন। তাঁকে দেখানোব সৌভাগ্য আমাদেব হয়নি তবে বিশ্বভাবতীব উদ্যোগে শ্রীনিকেতনেব অনুবোধে আমবা কলকাতায চিবকুমাব সভা অভিনয কবে টাকা তুলে দিয়েছিলাম। সেবাব আমাদেব মঞ্চসজ্জা কবে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনেব শিল্পীবা।

এমন একখানি গ্রামে এসে অভিনয কবে সুখ্যাতি এবং তাব সঙ্গে আত্মীযতাব সমাদব যাত্রাদলটিব সকল জনকেই বিগলিত কবেছিল। কিন্তু সব থেকে বেশি অভিভূত এবং আকৃষ্ট হযেছিল বাপ্পা বোস। সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবতে গিযে কথা খুঁজে পেলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িযে বইল তাবপব বললে—আমি যদি আপনাব এখানে থাকি দাদা ? অসুবিধে হবে ?"

আপনা-আপনি মুখ থেকে বেবিযে গেল—সে কি ? অসুবিধে হবে কেন ? কোন অসুবিধে হবে না।

অসুবিধে হবাব কথা সত্যিই নয। হাল আমলেব রুচি অনুযাযী অতিথিদেব জন্যে বাথরুমসুদ্ধ ঘবেব ব্যবস্থা আমাব ওখানে ছিল। এবং ঘবদোব পবিষ্কাবও ছিল। সেই ঘবেই এসে উঠল বাপ্পা বোস। যে বাড়িটায ওদেব থাকাব ব্যবস্থা হযেছিল সে বাড়িখানা আমাব বাড়ি থেকে একশো-দেড়শো হাতেব মধ্যেই ; তাব ব্যাগ আব একটা হোল্ডঅল বাঁধা বিছানা নিযে এল ওদেব দলেবই একজন, বোধ হয অভিনেতা নয, গতবে খাটিয়ে দলেব লোক।

বিছানাটা তক্তপোশের উপর বিছিয়ে দিলে ওই লোকটিই। বাপ্পা বোস ছোট একটা টেবিলেব উপব তাব ব্যাগটা এটা-ওটা বের কবে সাজিয়ে বাখতে বাখতে বললে— আপনাব বীতুবাবু কিন্তু অসাধাবণ। দু'চাবটে মেলে কিন্তু মনে হয় এ মানুষ না থাকলে যাত্রাব দলই চলত না। গোবাবাবু ঠিক সত্যি নয়। ও বোধ হয় আপনি কল্পনায় এঁকেছেন।

হেসে বললাম—কেন হে? নাট্যজগতে যখন থেকেই এই পতিতা সমাজ থেকে নায়িকা নেওয়া হচ্ছে তখন থেকে নায়কেবা তো বলতে গেলে শতকবা পঁচাত্তবজন গোবাবাবু!

সে আমাব মুখেব দিকে তাকালে—বললে—তা বটে। সেটা আব অস্বীকাব কববে কে? তবে সে কথা আমি বলছি না। মানে—।

হঠাৎ থেমে গিয়ে সে বললে—আমাব ওপব বাগ কবছেন না তো দাদা?

হেসেই আংশিক সত্য গোপন কবেই বললাম—না। তোমাদেব জীবন নিয়ে লিখেছি তোমবা ভালমন্দ বলবে না তো কে বলবে? বাগ কবব কেন?

আমাব আপ্যায়ন বা সমাদবপূর্ণ স্বীকৃতিতে বাপ্পা খানিকটা অভিভূত হয়ে গেছিল নিশ্চয়। না হলে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে পায়েব ধুলো নিয়ে খুব উৎসাহ এবং উচ্ছ্বাসেব সঙ্গে বললে—এই জীবনটা যা লিখেছেন সে একেবাবে মাবভেলাস! মানে— আশ্চর্য! ওই যে গোবাবাবুব চলে যাওয়াব পব বাণী জাহ্নবী বীতুবাবু আব মঞ্জবীব মধ্যে পার্টে এ ওকে মাবছে ও একে মাবছে, আবাব একজন দুজনকে মেবে বেড়ে উঠতে চাচ্ছে। সাইটে আমি এ দেখেছি। গল্প আছে তাও শুনেছি সব। শিশিবকুমাবেব সামনে দেশ ভবা মানে মঙ্গলী পুরোহিত আব কাফ্রী সর্দাব এ দুটো পার্ট যাবাই কবে তাদেব মধ্যেও এ বেড়াবেড়ি লাগে। আমি শিশিববাবুব আব অহীন্দ্রবাবুব দেখেছি। এ দুটো অ্যাক্টব একজন অ্যাকট্রেস নিয়ে এক কাণ্ড কবেছেন।

প্রশ্রয় যেন বেশ খানিকটা বেশি হয়ে গেছে মনে হলো আমাব। আমি মাঝখানে ছেদ টেনে দিয়ে বললাম—বস একটু, তোমাব চা আনছে না কেন দেখি। তুমি সব গুছিয়ে নাও এব মধ্যে।

বাম!— বাম— বলে শ্রীমান বামকে দেখতে ডাকতেই বেবিয়ে গেলাম আমি।

বাম চায়েব ট্রে নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে বললাম— সব দেখেশুনে দিয়ে আসবি। যেন কোন অযত্ন না হয়।

বাম চলে গেল। আমি বাগানেব মধ্যে নিমগাছতলাব ছায়াব নিচে যে চব্বিশ ঘণ্টাই আসবটি পাতা থাকে আমাব, সেইখানে আমাব আবামেব ক্যাম্বিসেব চেয়াবখানায় বসলাম।

চায়েব কাপটা হাতে কবেই বেবিয়ে এল বাপ্পা বোস। বললে—কি পালা হবে বলুন?

বিব্রত হলাম। এ বয়সে নাটক শুনবাব ছবি দেখবাব খেলা দেখবাব বাসনাগুলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। কোন বই বা পালা শুনবাব জন্যেও ঠিক এতখানি অগ্রসব

হইনি। হয়েছি এখানকার লোকের কাছে এবং এই যাত্রাদলের লোকগুলির কাছে তাদের আপনজন বা তাদের কাছে ভালমানুষ সাজবার জন্য। আমি তো জানি সন্ধ্যেবেলা আসরে গিয়ে বসব, ঘণ্টাখানেক থেকে শরীরের অজুহাতে চলে আসব। সুতরাং কি পালা হবে আমি কি বলব। উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললাম—তোমরা কি শোনাতে চাও বল।

বাপ্পা বললে—আমি শোনাতে চাই সিরাজদ্দৌলা। ওটাই আমার খুব ফেবারিট পার্ট। নাটকও খুব ভাল।

বললাম—তাই হোক, তা হলে।

সে বললে—আপনাকে কিন্তু সবটা শুনতে হবে।

ওকে একটু প্যাঁচে ফেলে নিবস্ত কববা'ব জন্যেই বললাম— শুনতাম হে, যদি তুমি ফিমেল পার্ট কবতে। কথাটা বলে একটু হাসলাম—যেন প্রয়োজন মতো ব্যাপাবটাকে হাস্যপরিহাসে পরিণত কবতে পাবি। কিন্তু সেদিক দিযেই সে গেল না। সে বললে—ভাল, প্রথমেই—মানে কনসার্টেব সঙ্গে সঙ্গে মেযে সেজে নাচ দেব একখানা।

শুধু বিস্মিত নয়, আমাকে চঞ্চল করে দিল বাপ্পা। কতকাল আগে এখানে সে দুটো ফিমেল পার্ট করে গিছল। তাব খুব স্পষ্ট ছবি আমাব মনে নেই। তার থেকে বেশি মনে আছে তার সেই কোঁচা করে কাছা দিয়ে শাড়ি পবা, গাযে গেরুযা পাঞ্জাবি দেওয়া, পেন্ট করা মুখ, এক হাতে বালা পরা সেই চেহারা।

এ একেবারে আলাদা রঙ আলাদা ঢঙ আলাদা সব।

যাত্রার কনসার্টটি থামল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের বাঁশীতে একখানি গানের সুর বেজে উঠল; বাঁশীর সঙ্গে বেহালা এবং হারমোনিযাম। সুরটা খু-ব যেন চেনাচেনা মনে হলো। মনে হলো এ সুরে গান আমি আমার অক্ষম গলাতেও গেয়েছি। হঠাৎ দেখি আসরে প্রবেশ পথে গাঢ লাল বঙের জমি কালো পাড শাড়ি আর তারই সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউজ পরে মাটির কলসী কাঁখে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে; অপূর্ব সুন্দর রঙ করেছে মুখখানা। রঙ বলে ধরা যায় না। চুলও তাই। এলো চুলের রাশ পড়ে রযেছে পিঠে। এক হাত কবে রেশমী চুড়ি নামক কাচেব চুড়ি। চোখে কটাক্ষ, ঠোঁটে হাসি; সে হাসি যেন কথা বলে। একটু হেলে বাঁ কাঁখে কলসী রেখে ডান হাতের তর্জনী আঙুলটি ডান চিবুকে ঠেকিযে দাঁড়াল। গানের সুর বেজে চলেছিল বাঁশীতে বেহালায়। তারই সঙ্গে ধরতার মুখে গলার সুর মিলল। ঝট্ করে এবার মনে পড়ে গেল—"হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়!

কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়,
আহা যৌবন বড মধুময়!
হেসে নাও—"

পাযে ঘুঙুর ছিল না। যেন একটি পল্লীযুবতী নির্জন দীঘির ঘাটে কলসীতে জল

ভরতে এসে এই শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে শব্দহীন পদপাতে সারা দেহের ও মনের বাসনাকে ব্যক্ত করছে আপন মনে আশ্চর্য প্রসন্ন আনন্দে।

আমার মনে পড়ে গেল সেকালের এক মহৎ নাট্যকারের এবং গীতিকারের নাম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ডি-এল রায়। তাঁর অমর রোমান্টিক প্রহসন—বিরহ। এ গান বিরহ্ নাটিকায় গোলাপীর গান। গোলাপী উচ্ছলা পল্লীযুবতী—তার স্বামী তাকে ছেলেবেলা বিয়ে করে পলাতক। গোলাপী ঝিগিরি করে বাবুদের বাড়ি। চঞ্চলা উচ্ছলা মেয়েটির বদনাম অনেক। কিন্তু সে বদনামের ভয় গোলাপীর উল্লাসকে দমিত করতে পারে না।

এ বই যে কতবার আমাদের স্টেজে হয়েছে তার সংখ্যার কথা বলতে পারব না—তবে সে অনেকবার। আমাদের ওখানকার যারা এই গাইয়ে নাচিয়ে মেয়ের পার্ট করবার জন্য মাইনে করা থিয়েটারের ছেলে হিসেবে থাকত—যারা এই বাপ্পা বোসেরই মতো, তাদের মধ্যে কয়েকজনই করেছে গোলাপীর পার্ট, কিন্তু রাধাচরণ ভটচাজের মতো এ পার্ট কেউ করতে পারেনি। বাপ্পা বোসের সাজপোশাক মেকআপ এবং নাচের ভঙ্গির মধ্যে এমন কি ওই যে কলসী কাঁখে হেলে দাঁড়ানো ছাঁদ তার মধ্যেও যেন রাধা ভটচাজকে দেখতে পেলাম। শুধু দেখতে পেলাম বললেই সবটা বলা হলো না—মনের মধ্যে যেন সেই কবে অতীত-হয়ে-যাওয়া ছেলেবেলা আবেগময় হয়ে জেগে উঠল। যেন একটা দীঘির বুকের গভীর তলার পাঁকের মধ্যে থেকে একটা আলোড়ন উঠল। অবশ্য রাধাচরণ যেমনটি করেছিল তেমনটিই ছিল সেকালের পেশাদার থিয়েটারের দেওয়া মডেল। অর্থাৎ সেকালে, তাই বা কেন, একালেও বটে, পাবলিক থিয়েটারে নাটকের পার্টগুলি যেমন-যেমন করে তেমনটিই তার মডেল দাঁড়িয়ে যায়। তবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম সেই পুরনো ছন্দ পুরনো ভঙ্গি দেখে। বাপ্পা বোস গানটা শেষ করে কলসীতে জল ভরার অভিনয় করে কলসী কাঁখে তুলে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। দর্শকেরা হাততালি দিয়ে সিটি মেরে উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল।

এরপরই ঢুকল একদল বাঁদী। তারাও এসে নাচগানের আসর জমালে। স্পষ্ট বোঝা গেল যে মূল নাটকের সঙ্গে এরও ঠিক যোগ নেই। ও নাচগানও জোর করে গুঁজে দেওয়া ব্যাপার বা কাণ্ড। তবে হঠাৎ একসময় ওরা নাচগান থামিয়ে (অবশ্য নাচগানের ব্যাকরণসম্মত একটা ছেদে) সন্ত্রস্ত হওয়ার অভিনয় করে বললে—ও মা—এ যে নবাব আসছে লো! নতুন নবাব সাহেব।

একজন বললে—দেখ দেখ কি রকম করে হাঁটছেন দেখ?

—হ্যাঁ। যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছেন। —চুপ। চুপ কর না ছুঁড়ীরা। চুপি চুপি একপাশ দিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আয়। ধরা পড়লে গর্দান যাবে। নয়তো চাবুকের ঘায়ে পিঠের চামড়া কাটবে—।

তারা চলে গেল। প্রবেশ করলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। একটি আঠারো-উনিশ বছরের তরুণ বলে ঠিক মনে হলো না—তবে পঁচিশের বেশি বয়সও মনে হলো না। নবীন লাবণ্য তার রূপসজ্জার গুণে চোখ সত্যিই জুড়িয়ে দিল। অল্প অল্প দাড়ি,

মিহি এক জোড়া গোঁফ—ভাবী মিষ্টি মনে হলো আজকের নায়কটিকে। আমি নিবিষ্ট দৃষ্টিতে খুঁজে দেখছিলাম অল্পক্ষণ আগের গোলাপীর সঙ্গে এই তরুণ নবাবটির কোন সাদৃশ্য মিলিয়ে পাওয়া যায় কি না।

নাঃ। পাওয়া গেল না। ততক্ষণে বাপ্পা বোস আরম্ভ কবে দিয়েছে "বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান নবাব আলিবর্দী খাঁ—আমার প্রতিপালক আমার গুরু, আমার পরম শ্রদ্ধার মাতামহ—হজরত, আমি শপথ করছি তোমার চরণ স্পর্শ করে।"

একেবারে শচীন সেনগুপ্ত মশাযের নাটকখানিকে সামনে রেখে নকল করেছে। তা করুক। নাটকে আলেযা আসতেই জমে গেল। না—তাই বা কেন বলছি; সিরাজদ্দৌলা এসে নতজানু হযে বসে, "বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান নবাব আলিবর্দী খাঁ" আরম্ভ করতেই সাবা দর্শকমণ্ডলী চুপ করে স্তব্ধ হযে গিয়েছিল।

বাপ্পাকে সত্যিই আঠাবো বছরেব নবাব সিরাজদ্দৌলা মনে হচ্ছিল; চমৎকাব মানিয়েছিল তাকে।

শুধু মানানোব কথা বলে অভিনয সম্পর্কে কিছু না বললে মনে হবে অভিনয ভালো হয়নি; অভিনযও বড ভালো কবেছিল বাপ্পা বোস। বাপ্পা বোস গতকাল আমাকে তাব বযস বলেছিল আটচল্লিশ (আসলে উনপঞ্চাশ) কিন্তু বিনা মেক আপে দেখে মনে হয়েছিল পঁযত্রিশ বা চল্লিশ, মেক আপ নিয়ে দেখতে মনে হচ্ছিল পঁচিশ—কিন্তু সে যখন ছেলেমানুষেব ঢঙে একটু আধটু লাফালাফির ভঙ্গিতে পা ফেলছিল, হাত নাড়ছিল, তখন মনে হচ্ছিল ওর বয়স সতের-আঠারোই বটে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিই যেন হয়ে গিয়েছিল। পার্টও করলে সে ভাল, বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে যেখানে সে মবতে মরতে বাংলার হিন্দু মুসলমানের কাছে মিনতি জানালে—বললে—দেশকে বিদেশী বণিযাব কাছে বিকিযে দিযো না--

লোকে কাঁদলে, মেযেদেব সে কান্নাব কথা তো বলবাব নয।

বাপ্পা বোসকে আমি সরাসবি জিজ্ঞেসা কবলাম—বিবহে গোলাপীব পার্টও তুমি কবেছ?

ওইটেই আমার প্রথম পার্ট দাদা!

ওই তোমার প্রথম পার্ট? তবে বাপ্পা বোস নাম কেন?

বাপ্পা বোস অনেক পরে হয়েছি—পার্টটায় খুব নাম হয়েছিল। যাত্রাদলে বাপ্পারাওই হলো বোধ হয় খুব সাকসেসফুল ঐতিহাসিক নাটক। নামটা ঐ থেকেই রটে থাকবে। আমিও ঠিক বলতে পারব না। তবে এবপর থেকে যাত্রা দলের লোকে ঐ নামটা দিয়েছিল। একটু হাসলে সে।

আমি বললাম আমাদের স্টেজে রাধাচবণ ভটচাজ এই পার্ট কবত। তোমার পার্ট দেখে বারবার তাকে মনে পড়ছিল।

চুপ করে গেল বাপ্পা বোস। বেশ কিছুক্ষণ আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে রইল।

অভিনয় শেষ হওয়ার পব আমার বাড়ির সেই বাগানের মাঝখানে বাঁধানো উঠোনে

বসে কথা বলছিলাম। রাত্রি তখন বারোটার কাছাকাছি। বাপ্পা আমার এখানেই আছে, এখানেই খাবে। আমি একা সেবার। গৃহিণী প্রতিবারই সঙ্গে যান, সেবার যাননি। সুতরাং রাত্রি বারোটার সময় অভিনয়ের পর খানিকটা আবিষ্ট হয়ে বসে থাকবার পক্ষে এবং মধ্যে মধ্যে টুকরো টুকরো বাক্যালাপ করে ক্লান্তিভরে খানিকটা আলস্য বিলাস করবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না।

হঠাৎ বাপ্পা বোস হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের টিন এবং দেশলাই টেনে নিয়ে বললে—একটা সিগারেট নেব দাদা?

বললাম—নাও। কিন্তু একটু আশ্চর্য হলাম। বাপ্পা সিগারেট খায় না। মদ খায়, আমার সামনে খায়নি—কিন্তু গন্ধ পেয়েছি। সিগারেট খাওয়াও দেখিনি, গন্ধও পাইনি।

সিগারেট ধরিয়ে বললে—ওই গোলাপীর পার্ট করেই আমি যাত্রাদলের আসামী হয়ে গেলাম দাদা। না হলে—হয়তো—।

একটু থেমে থেকে বললে—হয়তো কেন, নিশ্চয় করে বলতে পারি আমি অন্য কিছু হতাম। যাত্রাদলের ছেলেকে তখনকার দিনে কেমন একটা যেন নিচু চোখে দেখার মতো কিছু ছিল। বাবা বেঁচে থাকতে ভাবতাম—পড়াশুনা করে বড় চাকরি করব, নয়তো উকিল মোক্তার কিছু হব। নয়তো মাস্টার। গানের গলা জন্মাবধিই ভাল—একবার শুনেই গান শিখতে পারি। গলায় অবিকল তালে মানে সুর যেন আপনাআপনি উঠে যায়। গানে ঝোঁক ছিল তবু কোনদিন যাত্রা-থিয়েটারে ঢুকব মনে করিনি। ছেলেও খারাপ ছিলাম না পড়াশোনায়। ভালই ছিলাম। ম্যাট্রিক পাস করলাম—করলাম ফার্স্ট ডিভিশনে। ছুটে পোস্টাপিস থেকে খবরটা নিয়ে স্টেশনে এলাম—বাবা তখন কাটোয়া স্টেশনে স্টেশন মাস্টার, এসে দেখি বাবা কাজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এই রকম ভাগ্য-উল্টে-যাওয়া নাটকেই হয়। সচরাচর দিনরাত্রির কালে মানুষের সংসারে বড় দেখি না একটা। সেদিন কেঁদেছিলাম কি বলে জানেন? কাঁদতে কাঁদতে অবুঝের মতো বলেছিলাম—আমি পাস করেছি বলে তুমি রাগ করে চলে গেলে বাবা? আমি পাস চাই না। আমি পাস চাই না। হে ভগবান বাঁচিয়ে দাও বাবাকে।

আর একটা সিগারেট ধরালে বাপ্পা বোস। গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলে। ভার হয়ে এসেছিল কথাগুলি বলতে বলতে।

বাপ্পা বোসের কথাবার্তা ভাল। নাটক যারা করে তাদের কথাবার্তায় দুটো মহল আছে। হয়তো সবারই আছে, তবে নাটক যারা করে তাদের মহল দুটোর পার্থক্য অত্যন্ত বেশি। ভিতর মহলে মানে আপনাআপনির ভিতরে কলহ কোলাহল স্বার্থ নিয়ে টানাটানি, প্রশংসা নিয়ে কাড়াকাড়ি, অন্যদের প্রশংসায় গাত্রদাহের উত্তাপ, বিকারগ্রস্তের মতো গালাগালির কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি—সে এক অসহনীয় ব্যাপার। অন্যদিকে ভাল কথা তাদের অনেক মুখস্থ থাকে, কিন্তু সেগুলি অভিনয়ের আসরের বাইরে কাজে লাগে না। সম্ভবত তারা কাজেই লাগাতে পারে না বললেই ঠিক বলা হবে। যে অভিনেতা অভিনয়ের আসরে রক্তাক্ত অর্থাৎ রং মেখে তলোয়ার হাতে,—

"মূর্খ তুমি, মাটি কাটি লভি কোহিনূর
সে রত্ন ফেলিয়া হায় কেবা ঘরে ফিরে যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর" বলে বক্তৃতা করে, তাকেই কোন স্বদেশী বক্তৃতার আসরে দাঁড় করিয়ে দিলে তার গলা বুক শুকিয়ে যায়। হয়তো 'আমি পারব না' বলে বসেই পড়ে। বাপ্পা বোস কিন্তু তা নয়। সে বক্তৃতা অর্থাৎ স্বদেশ অথবা সমাজ বা সাহিত্য নিয়ে বক্তৃতা কেমন দেয় তা বলতে পারব না তবে গল্প সে চমৎকার বলে।

বললে—আপনাকে সেই তখন থেকে—মানে যখন আসরে গোলাপীর পালা শেষ করে ফিরে এলাম তখন থেকেই ভাবছি আপনাকে বলব। এবং জিজ্ঞাসাও করব—আমার মন বিচার করে বলুন তো আমার এই কাউকে না-বলা কথাটা আপনাকে বলবার জন্যেই কি আজ গোলাপী সেজে নেচে এলাম? কে জানে? নিজেই আমি জানি না। বুঝতেও পারছি না। তবে আমার এ কথাটুকু আপনাকে বললে শান্তি পাব এটা যেন মনে হচ্ছে।

বাবা মারা গেলেন। আমি বাবার বড় ছেলে। রোগা রোগা ছোটখাটো চেহারা। চেহারায় মিষ্টতা ছিল। ম্যাট্রিক পাস করেছি। বাবার সম্বল প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। তাও ধার করে বোনটার বিয়ে দিয়েছিলেন কিছু দিন আগে। যেটা বাকি আছে পাব—তার পরিমাণ খুব বেশি না। ছোট লাইনের স্টেশনে মাইনে ছিল ষাট-সোত্তোর টাকা। তবে স্টেশন মাস্টারীতে উপরি ছিল। এই নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। আর চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কাল হলো আমার ছোটখাটো চেহারা। সকলেই বলে—এ যে নেহাত ছেলেমানুষ হে! এ আবার চাকরি করবে কি?

ছোট লাইনে বাবার কলীগেরা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু হলো না কিছু। কি করব!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাতখানা উল্টে দিলে। ভারী ললিত ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়ে বাপ্পা। একটি বিষণ্ণ বেদনা যেন ওর ওই হাত নাড়া থেকেই ঝরে পড়ল।

—আমি কি করব? ভেবেচিন্তে আমাদের গাঁয়ের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিতের পাঠশালায় ছোট পণ্ডিত হলাম। পাঠশালায় সরকারী গ্র্যান্ট ছিল পাঁচ টাকা আর ছেলেদের মাইনে থেকে হবার কথা কুড়ি-বাইশ টাকা কিন্তু আদায় হত পনের-আঠারো এই রকম। পণ্ডিত বললে—তোকে আট টাকা হিসেবে দেব তার বেশি পারব না। তবে আমি মরে গেলে তুই পাঠশালা পাবি। আমার ছেলে তো পাঠশালা করবে না।

রাজী হয়ে গেলাম। বাবার জমি ছিল বিঘে আষ্টেক। ধান পেতাম মণ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। সংসারটা খুঁড়িয়ে চলতে লাগল।

১৯৩৪ সাল সেটা। আপনার নিশ্চয় মনে থাকবে তখনকার কালের কথা; তখন তো আপনি স্বদেশী করে বেড়ান, দেশে থাকেন; তখন ঘরে ধানপান থাকলে কুড়ি-পঁচিশ টাকাতে সংসার চলে যেত।

মাস ছয়েক পর আমাদের গ্রামের থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরের পাঁচপাড়া গ্রামের মহেশ্বর মিশ্র আমার কাছে লোক পাঠালেন। তাঁর রামায়ণের দল ছিল—সেই দলে

আমি যদি গান করি তাহলে রাত্রি পিছু দু'টাকা করে দেবেন তিনি। সামনেই একটা বায়না ছিল তাঁর দোলের সময় কাটোয়ার ওপারে অগ্রদ্বীপের বাবুদের ঠাকুরবাড়িতে। বায়নাটা এক মাসের, তার মানে তিরিশ দুগুণে ষাট টাকা এক মাসে। পাঠশালার পণ্ডিতমশাই বললেন—তা যা না। আমি চালিয়ে নেব রে এ মাসটা। আর রামায়ণ গাইবি—হয়তো তোর এতেই ভাগ্য খুলে যাবে।

তাই গেলাম।

হেসে বললে—রাম নাম গাইতেই গানের জগতে ঢুকলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি কি জানেন—রাম নাম সত্য হ্যায় এতে ভুল নেই। মানুষ ও নামে স্বর্গে যায় কি না জানি না, জলে শিলা ভাসে কি না জানি না—তবে ইন্দু বোসেব কপাল ওতেই খুলে গেছল এ আমি মুক্তকণ্ঠে বলি।

হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে বার দুয়েক মাথা ঝাঁকি দিয়ে লম্বা লম্বা চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিয়ে বললে—রামায়ণের দলে ঢুকে মাস কয়েকের মধ্যে হলো কি জানেন, হলো এই—আমার গলা ছিল গানের, গান শুনেই শিখে নেবার মতো একটা সহজাত বোধও ছিল আমার, যেন একটি প্রদীপে তেল ছিল সলতে ছিল; আমি নিজে প্রদীপ আর সুন্দর গলাটি তেল আর ওই গান বুঝতে পারা, শিখতে পারার শক্তি ওটি সলতে—তাতে মূল গায়েন মহেশ্বর মিশ্র নিজের বিদ্যেব আলো থেকে আলো জ্বেলে দিলে। সে মনে হলো হাজার বাতি জ্বলে গেল একখানা রাজপুরীর রাজলক্ষ্মীর দালানে।

আশ্চর্য গাইয়ে ছিলেন মহেশ্বর মিশ্র, গান শেখাতে পারতেন আরও ভাল, গলাও তাঁর এককালে ভাল ছিল; শুনেছি বড বড় যাত্রাদলে জুড়িতে গান গাইতেন—জুড়ি উঠে গেলে বিবেকটিবেক সাজতেন। আপনার মঞ্জরী অপেরাব যোগামাস্টার আর কি। তবে মহেশ্বর মিশ্র মানুষটি অন্যরকম।

একটু মিষ্ট হেসে—যেন মহেশ্বর মিশ্রকে মনে করে মনে মনে খুশি হয়ে বললে—ধর্মে দেবতায় খুব অনুরাগ, পুজো না করে জল খান না। শান্তশিষ্ট লোক। ধরা ধরা গলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মেজাজে কথা বলেন। খুব কৃপণ। রামায়ণ গাইতে গেলে সিধে পেতাম। রান্না করে খেতাম। তা থেকেও তিনি চাল-ডাল বাঁচাতেন। রোজই কিছুটা কিছুটা তুলে রেখে শেষ দিনে দোকানে বেচে দিতেন। কিন্তু তারও কিছু কিছু ভাগ দিতেন সকলকে। মধ্যে মধ্যে হাসতে হাসতে রামায়ণ দলের সেই বিখ্যাত গল্পটি বলতেন—সেই "আঁচীলে পাঁচীলে বেড়ায় তার নামটি কি?"

আরও একটা দোষ ছিল—ভারী মামলাবাজ ছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক। তাঁর নিন্দে করব না। তিনি আমাকে গান শিখিয়েছিলেন। এক বছর তাঁর দলে থেকে গানে আমার একটা বোধ জন্মাল। উনি আমাকে রামায়ণের দলের প্রয়োজনের গান শেখালেন, কীর্তন মানে পদাবলীও কিছু কিছু শেখালেন। আর আমি বাইরে থেকে ঘাট থেকে মাঠ থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে শহর থেকে বাজার থেকে, গ্রামোফোন শুনে শিখলাম নতুন কালের গান। "ভালো যদি বাসো সখা মুখে বলো না" থেকে

হাল আমলের—“কে বিদেশী মন উদাসী” পর্যন্ত। ১৯৩৪ সাল তখন। তার সঙ্গে ডি. এল. রায়ের “এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো।” রবীন্দ্রনাথের গানও শিখেছি। “অমল ধবল পালে,” “রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী”—আরও অনেক গান।

মহেশ্বর মিশ্র বিবক্ত হতেন। কিন্তু আমাকে ঠেকাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ভাগ্য টানছিল না এইটেই স্বাভাবিক গতি—কালের হুকুম বা হাওয়া তা আমি জানিনে। সব থেকে বেশি ভাল লেগেছে এবং শিখেছি—ধনধান্যে পুষ্পে ভরা; বঙ্গ আমার জননী আমার; অয়ি ভুবনমনমোহিনী; একবার তোরা মা বলিয়া ডাক; দুর্গম গিরি কান্তার মরু; শিকল পরা ছল; এসব শিখেছি খুব যত্ন করে। জেলে যাইনি—স্বদেশী করার সাহস ছিল না তবুও “কারার ওই লৌহকপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট” গানখানাও শেখা হয়ে গেছে এবং মাঠে ময়দানে সন্ধ্যেবেলা কি গরমের দিন রাত্রিবেলা দু' চারজন বন্ধুর সঙ্গে প্রাণ খুলে এইসব গান গাই।

এরই মধ্যে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো গ্রামোফোনের সঙ্গে। ১৯৩৪ সালের শেষ—তখন রেডিযো ঠিক হয়েছিল কি না মনে করতে পারছি না। হয়ে থাকলেও সে না হওয়ারই সামিল। গ্রামোফোন অনেকদিন হয়েছে কিন্তু তাও দুর্লভ সামগ্রী। মানে বেশ সঙ্গতিপন্ন বাড়ি ভিন্ন গ্রামোফোন কিনত না কেউ। পাঁচ সাত কি দশখানা গ্রামে একটা কি দুটো বাড়িতে সেকালের চোঙওলা গ্রামোফোন ছিল। চৌকো বাক্স সাইজ গ্রামোফোন সবে উঠেছে। সেই একটা গ্রামোফোন এল আমাদের পাশের বাড়িতে। নিয়ে এল ওই বাড়ির নতুন জামাই।

এগুলো কালের সঙ্গে এসেছিল, মানে এই গ্রামোফোন, একালের গান—এইগুলোর কথা বলছি—এ নিয়ে কোন প্রশ্ন আমার নেই। কিন্তু স্বদেশের সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। স্বদেশকুমার ঘোষাল। যেমন নামটা সেদিন বিচিত্র এবং বিস্ময়কর মনে হয়েছিল তেমনি তার চেহারাখানাও ছিল আশ্চর্য ধারালো এবং ঝকমকে।

কাটোয়াতেই দেখা হয়েছিল।

মহেশ্বর মিশ্র মশায় সেবারও দোলে বায়না পেয়েছিলেন—দল নিয়ে রামায়ণ গাইতে গিয়েছিলেন। দলের সঙ্গে আমিও ছিলাম। এবং আমার জন্য দলের সেবার দক্ষিণা বেড়েছে। আমাবও আদর-কদর দুই বেড়েছে।

কাটোয়াতে সেদিন বিকেলে স্বদেশী মিটিং হচ্ছিল। কাটোয়ার কংগ্রেস নেতা (সেকালের) ডাক্তাব গুণীবাবু আছেন—বক্তৃতা করতে এসেছেন কলকাতা থেকে দু'জন বড় নেতা। সেই বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।

আরম্ভ হলো গান দিয়ে। ডি. এল. রায়ের ওই গান—'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা—'। গাইলে ওই ছেলেটি। তখনও মাইক হয়নি। একজন বলে দিলেন—সভা আরম্ভ হচ্ছে, উদ্বোধন গান গাইছেন 'স্বদেশ ঘোষাল'। নামটা শুনে চমক লেগে গেল। কি সুন্দর নাম! তারপরই হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর লোকজনের

কোলাহল ছাপিয়ে বেজে উঠল ঠিক সানাইয়ের মতো। সানাইয়ের মতো জোরালো মিষ্টি গলা।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম কিন্তু ভারী দুঃখ হলো। আমার গলাখানা যদি এমনি হত! আমার গলা খুব মিষ্টি, লোকে প্রশংসা করে বলে বাঁশের বাঁশির মতো—তা বাড়িয়ে বলা হয় না। কিন্তু এই তো পুরুষের গলা। সানাই বাজছে যেন—

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা—

তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।

আমিও তার সঙ্গে সুর মেলালাম মিহি সুরে। আরম্ভ করেছিলাম গুনগুন করে কিন্তু ঠিক তো নিজেকে সম্বরণ করতে পারিনি, একসময় গলা বেশ স্পষ্ট উঁচু হয়ে উঠেছিল। সভার শেষ পর্যন্ত থাকিনি। চলে আসতে হয়েছিল। সন্ধ্যের সময় রামায়ণের আসর আছে। সভার শেষ দিকে কাটোয়ারই একজন বক্তৃতা করছিলেন। লোকজনেবাও ভাঙছিল। আমি বেরিয়ে আসছি। সেই ছেলেটি আমার হাত ধরে বললে—শোন।

—আমাকে বলছেন? আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

—হ্যাঁ। তুমিই তো আমার গানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলে? আমার নাম স্বদেশকুমার ঘোষাল। তোমার নাম কি?

তিন মিনিটে পরিচয় হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটে বন্ধু হয়ে গেলাম। আমি ওকে নিমন্ত্রণ করলাম রামায়ণ শুনবার জন্যে। বললে—রাত্রে কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে খাবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায়?

—গুণীবাবুর বাড়িতে। তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব। কেমন?

বললাম—বেশ।

সেদিন রাত্রে রামায়ণের আসর থেকেই সে আমাকে নিয়ে গেল ডাক্তার গুণেন্দ্রবাবুর বাড়ি। সেখানে খেয়ে গুণেনবাবুর বাড়িতেই রইলাম রাত্রিটা। অর্ধেক রাত্রিরও বেশি গল্প করলাম। গল্প করলাম আর কৈ—শুনলাম। স্বদেশই গল্প করলে।

স্বদেশ আমার থেকে বড়। দু'বছরের বড়। কিন্তু কথাবার্তা বলে মনে হলো অনেক বড় সে আমার থেকে। এরই মধ্যে ১৯৩০ সালে জেল খেটেছে। এখন দেশের কাজ করে বেড়ায়। দেশের কাজ এই গান। সভায় সভায় গান করে। বড় বড় কনফারেন্সেও গান গেয়েছে সে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে গানও করলে।

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে। আর—কারার ওই লৌহকপাট গান দু'খানা সে সেদিন গেয়েছিল। আমিও জানতাম আমার সুরে ভুল ছিল, সংশোধন করে নিলাম।

সকালবেলা বললে—এই রামায়ণের দলেই কাটাবে?

বললাম—কি করব বল, চাকরি তো পেলাম না। ইচ্ছে আছে পাঠশালায় আছি প্রাইভেটে আই-এ দেব, তারপর—।

তারপর তো সব ঘষা কাঁচের ওপারের মতো সব ঝাপসা! চুপ করে গেলাম।

সেবার পুজোর পর হঠাৎ একজন ভদ্রলোক এলেন একদিন বৈকুণ্ঠপুর থেকে স্বদেশের চিঠি নিয়ে। এঁর সঙ্গে তুমি চলে এস, তোমার জন্যে চাকরি ঠিক করেছি।

বৈকুণ্ঠপুর আমি জানি। বৈকুণ্ঠপুর গিয়েছি আমি। বৈকুণ্ঠপুরের চৌধুরীবাবুদের সঙ্গে আমাদের গ্রামের রায়বাহাদুরের গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বৈকুণ্ঠপুরের চৌধুরীরা রায়বাহাদুরের ভক্ত। রায়বাহাদুর খেতাবেরও তাঁরা অভিলাষী ছিলেন তার জন্য যে পথে চলতে হবে সে পথে রায়বাহাদুরেরা অগ্রগামী পথিক, চৌধুরীরা সেইহেতু এঁদেরকে বিশেষ করে রায়বাহাদুরকে অনুসরণ করতেন। তার সঙ্গে লাভপুরের রায়বাহাদুরের মধ্যে যে একটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সাধনা ছিল, যার জোরে তিনি, কি সরকারী মহলে কি সাধারণ্যে, নাট্যকার সাহিত্যিক অভিনেতা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় বোদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্মানিত হতেন। লাভপুরের রায়বাহাদুরের নাটক আছে, সে নাটক কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তাঁর বাড়িতে সুসজ্জিত অতিথিভবন অর্থাৎ গেস্টহাউসে জেলার সদর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সাহেব, এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসারেরা যেমন আসতেন তেমনি কলকাতার রঙ্গমঞ্চের কর্তারা অভিনেতারা নাট্যকারেরা সাহিত্যিকেরাও আসতেন দল বেঁধে। কথাটা আগেই বলেছি, বলেছি যে—অমৃতলাল বসু, মন্মথ বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র, শিশিরকুমার এঁরা এসেছেন, থেকেছেন, বিশ্রাম নিয়েছেন, ছিপে মাছ ধরেছেন, হৈ হৈ করেছেন, নাটক পাঠের গানবাজনার আসর পড়েছে, সে প্রায় মর্ত্যলোকে স্বর্গ নেমে আসার মতো ব্যাপার। শুনেছি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ দু'তিনখানি নাটকও এখানে লিখে শেষ করেছিলেন। আমাদের লাভপুরে সাহিত্য সভাও ছিল। সুতরাং শুধু ধনীনন্দন এবং বিদেশীদের একান্ত অনুগত বলে খেতাবধারীদের প্রতি একটা ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞা আছে সেটা লাভপুরের রায়বাহাদুরকে নাগাল পায়নি। বরং শ্রদ্ধাই পেতেন তিনি। এর জন্য সরকারী কর্মচারীরাও কিঞ্চিৎ বিনত ছিলেন তাঁর কাছে। নাট্যকার, সাহিত্যকার, অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য তাঁরাও উৎসুক ছিলেন এবং তখনও শিরোমণি রবীন্দ্রনাথ জীবিত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের থিয়েটারের চিরকুমার সভা দেখতে চেয়েছিলেন। কথাটা কবি স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেই। জিজ্ঞাসাও করেছিলেন 'তুমিও অভিনয় কর না কি?' যাক সে সব কথা। সে সব কথা লাভপুরের কথা, আমার কথা, বাপ্পার গল্পের কথা নয়। তবে বৈকুণ্ঠপুরের কথা বাপ্পার গল্পের কথা। বৈকুণ্ঠপুরকে আমি জানি। ওখানকার চৌধুরীবাড়ির প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী দুই ভাই—নিরঞ্জন এবং পুরঞ্জনকে আমি চিনি। ওঁরা লাভপুরের থিয়েটারে পার্ট করতে আসতেন। তারপর ধীরে ধীরে নিজেদের বৈকুণ্ঠপুরেও থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঠিক আমাদের গ্রামের মতো। প্রথমে স্টেজ বেঁধে শামিয়ানা খাটিয়ে তারপর একটা বাঁধা স্টেজ গড়ে তুলেছিলেন। এর জন্য তাঁরা জমিদারিতে খাজনার উপর টাকায় এক আনা হারে একটা চাঁদাও আদায় করেছিলেন।

খাঁটি জমিদার কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আধুনিক। এক কথাতে বোঝানো যাবে,—সেটা হলো এই যে, সাহেবসুবোদের সঙ্গে সেকালে যখন দেখা করতে যেতেন সদরে বা সভা সমিতিতে, তখন চোগা চাপকান পরতেন না, উৎকৃষ্ট বিলিতি কাপড়ের এবং সাযেবী দোকানে তৈরি স্যুট পরতেন। পাইপে সিগারেট খেতেন। তবে মাথায় হ্যাট চড়াতেন না—পাগড়ি পরতেন। এ পাগড়ি শোলার তৈরি কাঠামোব উপর সিল্ক দিয়ে মোড়া। বাড়িতে ঘোড়া ছিল গোটা চারেক, গাড়িও ছিল, ববার টাযার গাড়ি। ১৯২৮।২৯ সালে আমি যখন গিছলাম তখন তাঁরা মোটর কিনবেন কিনবেন করছেন।

গ্রামে ইস্কুল করেছেন, একটি দাতব্য চিকিৎসালযও দিযেছেন। এসব তাঁদেব বাবার কীর্তি। এঁরা এই থিযেটার কবেছেন। থিযেটারটা প্রথম কবেছিলেন থিযেটারের শখে। নাটকেব হিবো সে তো ঈশ্বর সম্রাট বিদ্রোহী বিপ্লবী শহীদ ছাড়া হয না। বাস্তবে এ তো দুস্তব তপস্যা সাপেক্ষ। পরমভাগ্য সাপেক্ষ। যুগ যুগ ধবে কোটি কোটি মানুষ এই একটি মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা করে আসে। নাটকাভিনযেব আসবে বঙ মেখে সেজেগুজে সেই মানুষ হয়ে যাওয়া এ তো আলাদ্দিনের প্রদীপ পেলেও হয় না। আলাদ্দিনেব প্রদীপেব দৈত্যটা ধনবত্ন আহাব বিহাবেব সামগ্রী জোগাতে পারতো। অতি দীন দবিদ্রকে সে ধনী কবে দিতে পাবতো কিন্তু তাকে ইতিহাসেব বিখ্যাত মানুষ তো কবে দিতে পারতো না। নাটকের আসরে অন্তত এক বাত্রিব জন্য অনাযাসে তা হওয়া যায। নিরঞ্জন, পুবঞ্জন দুই ভাইই অভিনয করতে পারতেন। কিন্তু ওঁদেব দলে দু'একজন ওদের থেকে ভাল অ্যাক্টবও ছিলেন। তা থাকলেও নিবঞ্জন, পুরঞ্জন ইচ্ছেমতো পার্টটি পেতেন, জোব কবে নিতেন না---দলেব সকলে উপযাচক হযে দিত। এ ছাড়া নাটক লেখাব ঝোঁক ছিল বড়জনেব। থিযেটোবটা ধীরে ধীরে বাঁশে বাঁধা স্টেজেব পালা শেষ করে পাকা স্টেজ তাবপর পাকা অডিটোবিযামের পালা পর্যন্ত চলেছে আমি জানি। ওখানে দুই পক্ষ অভিনয যখন হযেছিল তখন আমার পাবিণত বযস, তখনই এসব খববগুলো পেযেছিলাম। পুবঞ্জন এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে। তখন তারও বযস বেড়েছে। তবু তিনিই কববেন সুশোভন। সিবিও কমিক পার্ট পুরঞ্জন সত্যিই ভাল করতেন।

* * *

বাপ্পাব কথায কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

বাপ্পা বললে—বৈকুণ্ঠপুরের বাবুদের বাড়িব ঐশ্বর্য দেখে সেদিন লাইট বেলওযের গরীব স্টেশন মাস্টারের কিশোব ছেলেটি বেশ একটু বিস্মিত হযেছিল। বাইরে থেকে দেখেই যে বিস্ময সেই বিস্ময়ের কথা বলেছি। অনেকগুলো পাকা দোতলা বাড়ি নিযে বাবুদের এলাকা। পথেঘাটে জন সাত আট লাল শালুর পাগড়ি বাঁধা লাঠিধারী বরকন্দাজ দেখতে পেলাম। গ্রামে ঢুকছি, স্টেশন থেকে ওদের গ্রাম মাইল দেড়েক। ছোট স্টেশন। গরুর গাড়ি খুঁজলে মেলে। তাছাড়া কোন যান নেই। যারা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তাদের অনেকে বাইসিকল চড়ছে তখন। সে সবই শখের ব্যাপার।

লোকজন হেঁটেই যায় আসে। পর্দা তো তখনও ছিল—মধ্যবিত্ত গেরস্ত বাড়ির মেয়েছেলে ছই দেওয়া গাড়িতে যেত। হেঁটেই যাচ্ছিলাম—হঠাৎ সামনের দিক থেকে মানে বৈকুণ্ঠপুর থেকে একটা ঘোড়ায়টানা একখানা টমটম একটা বাঁকের ওপরে ঠং ঠং শব্দে শৌখিন বেল বাজিয়ে দেখা দিল।

গাড়িতে যাচ্ছিলেন খোদ বড়বাবু। কর্মচারী বললে বড়বাবু। সে হেঁট হয়ে নমস্কার করলে। আমাকেও বললে প্রণাম করতে। কর্মচারীর সঙ্গে আমাকে দেখে বাশ টেনে ঘোড়াটাকে বাগ মানিয়ে গাড়ি থামিযে বললেন – এই ছোক্‌রা না কি ?

আমার আপাদমস্তক দেখে নিলেন, সে দেখা একরকমের দেখা। আমি একটু ভয় পেযে গিছলাম সেদিন। তারপব প্রশ্ন করলেন—তোমার হাইট কত হে ?

সতের-আঠারো বছরের ছেলের প্রশ্নটার সঠিক অর্থ ধরতে পারার কথা নয়। ধবতে পাবেনি সেদিনের বামায়ণের দলেব ছেলেটি। তাই উত্তরের বদলে সে জিজ্ঞাসা করেছিল—আজ্ঞে ?

হেসে বড়বাবু বলেছিলেন --লম্বা কতখানি তুমি মাথায জান ?

—আজ্ঞে না।

—তুমি তো ম্যাট্রিক পাস কবেছ ? করনি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। করেছি।

—তবে ? এত নার্ভাস কেন ?

ইন্দু সেদিন মাথা হেঁট করে চুপ কবে ছিল। উত্তর সে কি দেবে ?

বড়বাবু এবপরই বলেছিলেন--নাঃ, মানাবে খুব ভাল। চমৎকাব হাইট, ছিপছিপে দেহখানা আছে। তারপরই বললেন- দাড়ি কামাও তো ? ক'দিন অন্তর কামাও ?

ইন্দু এ প্রশ্নেরও উত্তব দেয়নি। কিছু লজ্জা পেয়েছিল।

এরপরই বড়বাবু বলেছিলেন মাথার চুল এত ছোট করে ছাঁট কেন ?

এবও কোন উত্তর সে দেয়নি। মানে দিতে পারেনি, ইচ্ছে কবে উত্তব দেয়নি এ তো হতে পারে না। বড়বাবু বলেছিলেন নিযে যাও, ভারতবাবুব বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো। ওখানেই থাকবে।

* * *

ওই স্বদেশ ছেলেটির দাদা ভারতবাবু। ভারতচন্দ্র ঘোষাল। ইন্দু অবাক হযে গিয়েছিল ভারতবাবুকে দেখে। স্বদেশের থেকে অনেক উজ্জ্বল। কাঁচাপাকা চুল, লালচে গৌব গায়ের রঙ, ছোটখাটো রোগা মানুষ। একখানা পা হাঁটুব নীচে থেকে কাটা। বাড়ির বাইরের টিনে ছাওয়া বারান্দায় একখানা সস্তা ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ারে বসেছিলেন। সামনে টেবিলের উপর একটা টাইপবাইটার, অন্য একটা টেবিলে বই কাগজ সাজানো আছে।

ইন্দুকে দেখে বলেছিলেন— আচ্ছা তুমিই ইন্দুভূষণ ? আমি স্বদেশের দাদা !

ভারতবাবুর মুখের মধ্যে চোখের মধ্যে সহজ আত্মীয়তার একটি পরিচয় অথবা

আমন্ত্রণ যেন মাখানো ছিল। গলার স্বরে তার প্রকাশ আরও সুস্পষ্ট। 'আমি স্বদেশের দাদা' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন "তোমারও দাদা" কথাটা বলা হয়ে গেছে।

ইন্দু তাকে প্রণাম করেছিল।

ভারতবাবু বলেছিলেন—তুমি বস। স্বদেশ আসবে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসবে।

এরপর অত্যন্ত দ্রুত খট খট আওয়াজ তুলে টাইপ করতে লাগলেন। একখানা কাগজ টাইপরাইটার থেকে টেনে বের করে নিয়ে আর একখানা কাগজ পরাতে পরাতে বললেন—তোমার গানের যে প্রশংসা স্বদেশ করছিল। বলছিল—যেমনই গাইয়ে মেয়ে হোক দাদা, সেও লজ্জা পাবে ইন্দুর গলার কাছে। যত মিষ্টি তত 'ক মিহি কাজ খেলে ওর গলায়!

প্রশংসায় এবং স্নেহে সমাদরে সিক্ত হয়ে লজ্জিত এবং অভিভূত দুইই হয়েছিল ছেলেটি। এই মুহূর্তেই দুটি মহিলা স্নান করে ভিজে কাপড়ে কাঁখে জলভরা কলসী নিয়ে বারান্দাটার পাশেই বাড়ি ঢুকবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। একজন প্রৌঢ়া অন্যজনটি তরুণী যুবতী।

তরুণী যুবতীটির পরনে ছিল লাল রঙের জমি কালাপাড় তাঁতের শাড়ি, একরাশ ভিজে চুল, মোটা টেপেন দুধের মতো সাঁথিটি তার সব থেকে সুন্দর লেগেছিল আমার। সিঁথিতে সিদুর ডগডগ করছে। হাতে শাঁখা নোয়া আর একগাছি করে মোটা বালা। একেলে সরু বালা নয়। অনন্ত বালার বালা।

বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল, ভারতবাবু বললেন—এই দিক দিয়ে যাও মা—স্বদেশ একটু বাইরে গেছে ওপাড়ায়।

* * *

ইন্দু একটু গম্ভীর নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল খানিক ক্ষণ

রাত্রি তখন গভীর হয়েছে। অমরকণ্টকের পেছনে পদ্মর একটু বেশ ঝাঁঝ রেস থেমে যেতেই ঝিঁঝির ডাক নিস্তব্ধতা একটানা হয়ে চলেছে একটা প্রপাতের মতো সেই ধ্বনিপ্রবাহ কানের মধ্যে বয়ে পড়ল।

কৃষ্ণপক্ষ চলছিল তখন।

ওপরে পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য কোটি তারার দীপ্তি ঝলমল করছে। নীচে চারপাশে ঝিঁঝির ডাক, মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল যে রাত অনেক হয়েছে।

আমি নিজে একটা সিগারেট ধরালাম, প্যাকেটটা ওর দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে বললাম—নাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে সে সিগারেটটা নিলে। তারপর বললে—এই ছবিটা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রয়ে গেছে। ওই লাল রঙের জমি কষকষে নীলাভ কালাপাড় শাড়ি পরা একটি মেয়ে, কাঁখে কলসী, সিঁথিতে সিদুর, পরিপূর্ণ যৌবনা, একটু দীর্ঘাঙ্গী, পিঠে একরাশি চুল!

একটু দৃষ্টি বেঁকিয়ে সে আমার দিকে তাকালে। এমন শান্ত অথচ বিস্মিত দৃষ্টি

আমি দেখিনি। আমাব দিকে তাকিয়েই বইল। আমি লজ্জা পেয়ে মুখ নামালাম। সে কিন্তু দৃষ্টি ফেবালে না। প্রৌঢা বলে উঠলেন—বাঃ ভাবী মিষ্টি চেহাবা তো ছেলেটিব! কে বে ভাবত?

আমাব আব লজ্জাব শেষ বইল না প্রৌঢাব এই প্রশংসায়। এবাব মেয়েটিব মুখে হাসি দেখা দিল। সে হাসিতে যেন আমি আবও ছোট হয়ে গেলাম।

মেয়েটি আমাব থেকে বয়সে বড। অন্তত চাব পাঁচ কি ছ' বছবেব বড।

ভাবতবাবু বললে—ওব নাম ইন্দুভূষণ বোস। আমাব স্বদেশেব আবিষ্কাব।

ভাবতবাবু আমাকে বলেছিলেন – আমাব মা আব আমাব বোন।

আমি তাডাতাড প্রণাম কববাব জন্য উঠেছিলাম। কিন্তু ভাবতবাবুব মা আমাব অভিপ্রায় বুঝে বলেছিলেন—না বাবা, তোমাব পথেব কাপড। আমবা নেয়ে এলাম তো। এখন না। পবে প্রণাম কবো।

তাবা ভিতবে চলে গেলেন। ভাবতবাবু বললেন – একটু কিছু খাবাবটাবাব আব চা পাঠিয়ে দিয়ো মা।

চা খাবাব দিয়ে গেল ওই মেয়েটিই। তেল মেখে মুড়ি, ছোলাভজা আদা নুন একটু গুড় তাব সঙ্গে গ্রামেব তৈবি বসগোল্লা।

ভাবতবাবু বললেন — বিনু, আমাকে একটু চা দিলি নে যে!

অত্যন্ত শান্ত মৃদু কণ্ঠে সে বললে— তুমি খাবে? বেশি হয়ে যাবে না? কালও অম্বলের জন্যে পেট বিষ বিষ করেছিল বলছিলে!

তা করেছিল। আজ বোধ হয় করবে না।

আশ্চর্য মিষ্ট মৃদু হাসি তাব মুখে ফুটে উঠল, বললে — দিচ্ছি এনে। জানতে পাবলে মা কিন্তু আমাকে বকবে।

– মা জানতে পাববে না।

—আমাকে জিজ্ঞেস কবলে কি বলব আমি?

—দাদাব জন্যে মিথ্যে বলতে বলছি না, সত্য গোপন কবতে বলছি।

না। তা আমি পাবব না।

ঠিক এই সময়টিতেই উচ্চকণ্ঠে যাকে হৈ হৈ কবা বলে তাই কবে বাস্তাব কিছুটা দূবে স্বদেশ আবির্ভূত হলো।

আমাব মনে আছে তাব অভ্যর্থনাব সবটুকু। বামায়ণেব সেই লাইন ক'টা। বামায়ণেব তো নয়, বামায়ণকে ঠাট্টা তর্জমা কবা সেই চাব লাইন!

আটীলে পাঁচীলে বেড়ায় তাব নামটি কি?

জয় জয় বাম বাম জয় জয় সীতাবাম!
ভাগেব সময় ছ-আনা দশ আনা আমবা জানি কি?
জয় জয় বাম বাম বামো হে বামো হে!
আজি হতে হলোবে ভাই সমান সমান।
জয় বাম জয় বাম সীতাবাম সীতাবাম।
আটীলে পাঁচীলে বেড়ায় বীব হনুমান।

তুমি তা হলে এসে গেছ? ভেবি গুড ভেবি গুড! এই বিণী আমাকে চা দে। মুড়ি খেয়েছি। চা দে!

এবাব মেয়েটি বললে—দেখ দাদা! আমাকে আবাব বিণী বলে ডাকছে!

ভাবতবাবু বলেছিলেন—অত্যন্ত অন্যায। বিশেষ কবে ইন্দুব সামনে এটা প্রায় বিনুনী ধবে টান মেবে ডাকাব সামিল। তুমি ক্ষমা চাও, দিদি বলে নমো কবো। ইউ মাস্ট।

বিণী মেযেটি খুব লজ্জা পেযেছিল এতে। বলেছিল—যাও তাই বলেছি আমি? সাবা মুখখানা বাঙা কবে সে চলে গিছল বাড়িব ভিতব।

আবাব চুপ কবলো বাপ্পা, বুঝলাম মনে মনে সে ছবি দেখছে।

আবাব আবম্ভ কবলে। ঝিঁঝিঁব ডাকেব মধ্যেই টুপটাপ কবে ঢেলা ফেলাব মতো কযটা কথা ছুড়ে দিলে। আপনি কোন্ সালে গিছলেন বৈকুণ্ঠপুব? ভাবতবাবুকে দেখেননি আপনি

মনে মনে হিসেব কবে নিযে বললাম—ছাব্বিশ সাতাশ সাল হবে।

না। তা হলে ভাবতবাবুকে দেখবেন কি কবে? ওবা বৈকুণ্ঠপুবে এসেছিলেন তিবিশ সালেব পব

কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললে—আশ্চর্য একটি সংসাব। ওখানকাব মানুষ ওবা নয। ওদেব বাড়ি কালনা সাবডিভিশনে। বাপ ছিলেন গবীব ইস্কুল মাস্টাব কিন্তু মনেব মধ্যে বাজত্ব ছিল দেশ ভক্তিব। ছেলেদেব নাম বেখেছিলেন—ভাবতকুমাব, স্বদেশকুমাব। মেযে হযেছিল দুটি, বেঁচে ওই একটি, তিনটেব মধ্যে একটি বেঁচেছে বলে সমাদব ছিল ভাযেদেব বোন পাকলেব মতো। নামই ছিল তিনটে। বাপ বেখেছিল স্বাধীনতা কিন্তু স্বাধীনা স্বাধীনি নাকচ হযে গিছল। আব একটা ইতিহাসেব দুর্গাবতী। তাও ধোপে টেকেনি।

মা দিয়েছিল বিণী বা বিনোদিনী নাম—সেই নামটাই মুখে মুখে ফিবত। ছেলেবা টকটকে বঙেব অধিকাবী—বাঙালিব তবুণেব মতো চেহাবা, আব তাব সঙ্গে সুকণ্ঠেব আব গানে জন্মগত বোধেব অধিকাবী। বড ভাবত আই এ পাস কবল—তিবিশ সাল সেটা। স্বদেশ অকস্মাৎ একদিন নিখোঁজ হলো, সকালবেলা পাওযা গেল না, বাত্রে কোথায চলে গেছে। একদিন পব খবব মিলল চলে গেছে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিতে। যাবাব কথা ভাবতেব, তাব আব যাওযা হলো না। এবপব একদিন বিণীব শ্বশুববাড়ি থেকে দুঃসংবাদ এল নতুন জামাই ব্যাঙ্কেব চেক জাল কবে ধবা পডেছে। মাত্র মাস কযেক আগে মেযেব বিযে হযেছিল। এই বৈকুণ্ঠপুবেই ছিল জামাইযেব বাড়ি। সাবা সংসাবে একা একটি ছেলে। বিযেব সময পর্যন্ত মা ছিল। মা মাবা যাওযাব পব ঘটল এই দুর্ঘটনা। বউ তাকে বাঁধতে পাবেনি।

বাপ্পা বললে—অত্যন্ত শান্ত অত্যন্ত নম্র অত্যন্ত বিষন্ন এবং পবিত্র। ওই সংসাবে

ওই বাপ-মা-ওই ভাইদের মধ্যে এমনিভাবেই গড়ে উঠেছিল। এটা যে কোনদিন ওর পক্ষে কষ্টের কারণ হতে পারে তাই বা কে ভাবতে পারত বলুন।

ছেলেটি বাড়ি থেকে বর্ধমানে যেত চাকরিতে। বৈকুণ্ঠপুর এখন বর্ধমানের একটা পাড়ার সামিল হয়ে গেছে। সেকালে সাইকেলে যেত, আসত। ন'টায় খেয়ে সাইকেলে রওনা হত, সাড়ে ন'টায় পৌঁছে যেতো। বাড়ি ফিরত সন্ধ্যে বেলা। নতুন বউ হাত পা মুখ ধুতে জল গামছা দিয়ে বাতাস করে চা-জলখাবার খাইয়ে তার মন পেল না।

শুনেছি খুব রোম্যান্টিক ছিল। বউ খুব ভাল গান গায়, ভারত স্বদেশের বোন, তার কণ্ঠস্বরও খুব সুন্দর ছিল; জামাই চাইত একটা-দুটো গান গায় বউ। বউ কাঠ হয়ে যেত।

জামাই বৈকুণ্ঠপুরের ছেলে, থিয়েটারে পার্ট করত। কিন্তু পার্ট করত সে ভিলেনের তাও নিম্নশ্রেণীর। চেহারাখানা ছিল দুর্দান্ত। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, গোলগোল চোখ। কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ। বউ কাঁদত; ওই ভিলেনের পার্ট কববার জন্যে কাঁদত। এই অবস্থার মধ্যে জামাই আকৃষ্ট হলো বর্ধমানের মহাজনটুলীর এক তরুণী বারবনিতার দিকে।

"জীবনের উল্লাস বাসরে বিলাস রজনীতে এমন প্রমত্তা সহচরী নাকি বিরল।" শুনেছি নাকি মদ্যপান করে সে মদের গ্লাস মাথায় নিয়ে নাচত। এবং বারবনিতা হিসেবে সে ছিল নিষ্ঠাবতী ব্যবসায়িনী। অর্থ পেলে সে কাউকে বিমুখ করত না। সেই অর্থই সে তাকে দিতে লাগল। প্রথমে ঘরের ধান বেচলে তারপর জমি বাঁধা রেখে ঋণ করলে। কেউ জানতেও পারলে না, ঋণ দিলে ব্যাঙ্ক। অবশেষে একদা আবিষ্কার করে বসল কতকগুলি অ্যাকাউন্ট আছে যা নিয়ে কেউ নাড়েও না, চাড়েও না। সেই কবে ব্যাঙ্কের চেক বই ইস্যু হয়েছে তারপর আর কোন খোঁজ নেই। এর মধ্যে দুটি মেয়ের নামের হিসাব বেছে নিয়ে কিছুটা সংবাদ সংগ্রহ করে দেখে সেই অ্যাকাউন্টে জাল সই করে ডুপ্লিকেট চেক বই বের করে টাকা বের করতে আরম্ভ করলে।

টাকাটা দুই বিধবার টাকা।

শেষ জীবনের সম্বল হিসাবে গচ্ছিত রেখেছিল ব্যাঙ্কে। যক্ষের ধনের মতোই মজুত রেখেছিল, হাত দেয়নি।

বেশই চলেছিল কিছুদিন। তারপরই ধরা পড়ে গেল। হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে নিয়ে গেল। দুর্গাবতী স্বাধীনতা নামগুলোকে সেইদিন সত্য সত্যই মিথ্যে করে দিয়ে বিনোদিনী নিতান্তই অসহায়া লতার মতো ধূলায় লুটিয়ে পড়ল।

খবরটা পেয়ে ঘোষাল মাস্টার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। আর জ্ঞান হলো না। বাপ মারা গেলেন।

বাপ্পা বললে—ভারতদা বলেছিলেন, দেখ ইন্দু, আমার চালান যাবার কথা জেলখানায় নয়তো কংগ্রেস আপিসে। আমার সঙ্গের যারা তাদের দু'একজন আবার আন্দামানে গেছে। আমাকে আমার ভাগ্য যেন এখানে নিয়ে এল। বাবা মারা গেলেন। এখানে কেস চলছে গোপেনের, জালিয়াতির মকর্দমা। সেসনস্ কেস। এখানে বিণী একা। বিণীর স্বামী গোপেনরা ছিল দুই ভাই। আপন ভাই নয়, সৎ ভাই। সৎমা সৎভাই এদের সঙ্গে বিণীর বরের ছিল দুরন্ত অবনাবনি, সে প্রায় মুখ না দেখাদেখির মতো ব্যাপার। গোপেন বলত—সৎমা বাপকে বশীকরণ করেছিল। তার যা কিছু নগদ টাকা ছিল সে সব ওই সৎমা নিয়েছে তাকে ফাঁকি দিযে। ভাই তপেন, সে ঘরেই থাকত, নিজের ভাগের জমিজেরাত, আর ওই নগদ টাকায় গ্রামে এবং আশপাশ অঞ্চলটায় সুদে টাকা খাটাতো। সে লাগল মামলায় যাতে গোপেনের জেল হয় তার জন্য।

ভারতদা বলতে বলতে শিউরে উঠতেন-—বলতেন—সবের মূলে তার মা, এমন মন্থরার মতো মেয়েছেলে মানুষ আমি দেখিনি। তপেন ওই মায়ের যোগ্য ছেলে। পাষণ্ড ! অজগরের মতো কুটিল।

কথা মিথ্যে বলেননি ভারতদা। তপেনের পাষণ্ডতার সে চেহারা আমিও দেখেছি দাদা। বলব সে কথা পরে।

ভারতদা বলেছিলেন, সেই কারণে বাবাব শ্রাদ্ধ সেরেই এখানে আসতে হলো আমাকে। খবরটা পাঠালেন এখানকার বাবুরাই। বডবাবুই খবর পাঠিয়েছিলেন।

সেই দেখাশুনো করতে এলাম, তারপর ভাগ্য যে কি পাকচক্রে জড়ালে, সে জড়ানো আষ্টেপৃষ্ঠে পাকে পাকে শত পাকে। শেষ পর্যন্ত অক্ষম পঙ্গু করে এই ফেলে রেখেছেন।

* * *

ভারতচন্দ্র এখানে এলেন ভগ্নীপতির মকর্দমার তদ্বির করতে। বডবাবু তাঁকে বললেন-—তোমরা এখানে কেউ এখন কিছুদিন থাক। না হলে তপেন যে কি করবে তা কেউ বলতে পারে না।

কযেকদিন পর মাঠের দিকে বেড়াতে গিযে সন্ধ্যেব আকাশেব দিকে তাকিয়ে মেঘের উপর সূর্যাস্তের রঙের খেলা দেখে সে প্রায নিজেকে হাবিয়ে ফেলেছিলাম। নির্জন মাঠ, আর সে মাঠ, দিগন্তবিস্তার। অনেক দূরে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে দামোদরের চর—-এদিকে ডানদিকে দেখা যাচ্ছে গাছপালার সবুজের উপর মহারাজার একশো আট শিব মন্দিরের চূড়াগুলি। আলো যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতেই ঘন লাল হয়ে গেছে। আমি গান ধরেছিলাম—'অয়ি ভুবনমনমোহিনী'। পরের দিন রটনা হলো আমি গ্রামে মাঠে গান গেয়ে বেড়াই। এ গাঁয়ের কোন মেয়েকে মোহিনী বলে ডাকি গান গেয়ে।

বড়বাবু ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—গান গাইতে পার না কি ?

ভারতবাবু বলেছিলেন—পারি একটু একটু।

বড়বাবু তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি গান গেয়েছিলে? কি? মনমোহিনী-টোহিনী নাকি শুনলাম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী।'

— ও তো স্বদেশী গান। রবিবাবুর গান!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গাও তো। শোনাও তো! শোনা যাক এর মধ্যে খারাপ-টারাপ কি আছে? গাও।

প্রথম কলি গাইতেই বললেন —দাঁড়াও দাঁড়াও। ওরে হারমোনিয়ামটা আন তো।

হারমোনিয়াম ধরেছিলেন বড়বাবু নিজে। গান হয়ে গেলে বলেছিলেন—তুমি তো গুণী লোক হে!—অ্যাঁ! এ তো দুর্লভ কণ্ঠস্বর! কিন্তু এর মধ্যে তো কোনপ্রকার মন্দ কিছুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না।

হল এই; তপেনের দলের আনা অভিযোগ নাকচ হয়ে গেল। এবং ভারতবাবুর চাকরি হয়ে গেল এখানকার স্কুলে।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন— কতদূর পড়েছ?

—আই-এ পাস করেছি।

—আই-এ পাস করেছ? সে তো সাংঘাতিক হয়ে গেল তাহলে?

কথাটার অর্থ বুঝতে পারেননি ভারতচন্দ্র।

বড়বাবু বলেছিলেন—থিয়েটার করতে পার? করেছ কখনও?

—না, করিনি কখনও। পারি কি না জানি না। তবে না পারব কেন? রেসিটেশন তো ভাল করি।

—সন্ধ্যেবেলা নাটক থেকে খানিকটা অংশ বলিয়ে দেখে বড়বাবু বলেছিলেন- দেখ, আমার থিয়েটার আছে। আমি নাটক লিখি। নাটক দিয়ে দেশের সমাজের অনেক উপকার হয়। আমি ঐ দিয়ে দেশসেবা করি। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে পার্ট কর তা হলে একটা চাকরি দিতে পারি আমি। ইস্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট টীচারের পোস্ট খালি আছে। চল্লিশ টাকা মাইনে। কোয়ালিফিকেশন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট মানে আই-এ। করবে?

ভারতচন্দ্রের চাকরি হলো কিন্তু মাস কয়েকের বেশি টিকল না। কোথা থেকে কে উপরে দরখাস্ত দিলে যে, ভারত স্বদেশীওলা, তার ভাই স্বদেশকুমার লবণ সত্যাগ্রহ করে জেলে রয়েছে। ভারতচন্দ্র ইস্কুলে ছেলেদের স্বদেশী গান শেখায়।

ইস্কুলের চাকরিটা থাকল না, গেল। সত্যিই প্রমাণ হয়ে গেল যে ভারতচন্দ্র ডি. এল. রায়ের মেবার পাহাড়ের গানগুলো বাড়িতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে মক্স করে।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় শিখরে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির।

তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ গর্ব দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় নাটকের মহড়া চলছিল। ভারতচন্দ্রকে দেওয়া হয়েছিল—চারণের

পার্ট। তার থেকেও বেশি দায়িত্ব ছিল ভারতের; গোটা নাটকখানার গানের সুর কলকাতা গিয়ে শিখে এসে সে অন্যদের শেখাচ্ছিল।

পুলিস এনকোয়ারি হলো। পুলিস তখনও পর্যন্ত বাবুদের হাতে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছোটবাবু। বড়বাবু অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তবুও ১৯৩: সালের প্রথম সে সময়টা, সে সময় নাটকটা বন্ধ হয়ে গেল, ইনস্পেকটারের চাপে ভারতের চাকরিটাও গেল স্কুল থেকে।

তা যাক। বড়বাবু ভারতকুমারকে নতুন চাকরি দিলেন। ওঁর নিজের নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, স্টেজে তুলবেন এবার, তিনি নতুন চাকরি তৈরি করলেন। ওদের কলকাতায় চালের গদী আছে, একটা রাইস মিল আছে, কয়লার জমি কিনেছেন। ভারতচন্দ্রকে হেডক্লার্ক করলেন। ইংরেজীতে চিঠি লেখার কাজ, টাইপ করার কাজ হলো তাঁর। তার সঙ্গে জমিদারী সেরেস্তায় যে চিঠি সাহেবসুবোকে লিখতে হয় সেই চিঠি লেখার কাজ হলো তার। তার সঙ্গে বড়বাবুর ছেলেকে পড়ানোর ভারও দিলেন হলো। মাইনে পাঁচ টাকা বাড়ল। পয়তাল্লিশ টাকা।

ওদিকে গোপেন ভটচাযের কেস চলছে। কেসে কোন আশা নেই। জেল হবেই মনে হচ্ছে। তবু লড়তে হচ্ছে কেস। খবরটা শুনে বিনি যেন কেমন হয়ে গেল। চুপচাপ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে সারাটা দিন। এখন গোপেনের জেল হলে যে কি হবে তাই ভাবে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় তার আগে যদি ও মরে যায় তবে বোধ হয় বেঁচে যাবে।

আর আমার দশা দেখ।

হঠাৎ একখানা পা নষ্ট হয়ে গেল। চিরদিনের মতো খোঁড়া হয়ে গেলাম।

সে এক বিচিত্র হাসি। সে হাসির জাতকুলই আলাদা। এবং এ হাসি ক্বচিৎ কারুর মুখে দেখা যায়।

গল্প বলা বন্ধ হয়ে গেল। বাপ্পা যেন কিছু ভুলে গেছে বলে মনে হলো।

না। ভুলে যায়নি। ও যে গল্প বলা ছেড়ে ভাবছিল। কিছু মনে করছিল। সেটা যে গল্প বা গল্পের সূত্র নয় তা বুঝতে পারলাম এর পরের কথা থেকে।

একটু মনে করে নিয়ে বাপ্পা বললে— দেখুন দাদা, বৈকুণ্ঠপুরের বড়বাবু একখানা নাটক লিখেছিলেন— বিজয়িনী নাম দিয়ে। পৌরাণিক নাটক। মদন ভস্ম হয়ে গেল তারপর মদন জন্মালো শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন হয়ে। প্রদ্যুম্নকে সুতিকাগৃহ থেকে লুকিয়ে চুরি করে আনলে শম্বর দৈত্য। তার কারণ শম্বরকে দৈববাণী হয়েছিল যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মাবেন যে সন্তান সে সন্তান হলো নবজন্মে কামদেব, তিনি হবেন তোমার হন্তা। যাই হোক, শম্বর সেই সন্তানকে মারতে গিয়েও মারতে পারলে না। তার রূপে মোহিত হয়ে গেল। তখন তাকে আপন সন্তানের মতো পালন করবে মনস্থ করে নিজের পুরীর দিকে চলে এসে সিংহদ্বারে উপস্থিত হলো। দেখলে সেখানে একটি কিশোরী বা সদ্য উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারী দাঁড়িয়ে। কি তার রূপ কি তার মাধুরী। সে বললে—আমি অনাথিনী, তুমি মহান দৈত্যরাজ, তোমার

কাছে আমি আশ্রয় চাইতে এসেছি। কন্যা হিসেবে আমাকে আশ্রয় দাও মহাভাগ। শম্বর তৎক্ষণাৎ তাকে আশ্রয় দিয়ে বললেন, আমার পুরী অন্ধকার ছিল মা। তুমি তার মধ্যে আলো জ্বালো। অবস্থান কর লক্ষ্মীর মতো। মেয়েটি অন্য কেউ নয়; মেয়েটি হলো মদনদেবের প্রিয়তমা রতি। সে এসেছে, দেবতারা তাকে পাঠিয়েছে, এই দৈত্যপালিত সন্তানটিকে তার পূর্বজন্মের স্মৃতিতে জাগ্রত করতে হবে। তাই মদনকে দিয়ে প্রবেশের ঠিক সঠিকক্ষণে সে এসে উপস্থিত হয়েছে। মায়া আর মোহ। মমতা আর প্রেম। এতেই ধন্য পৃথিবী। মায়াবতী অর্থাৎ রতি দুই হাত পেতে ওই শিশু কামদেবকে গ্রহণ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসি দেখে শম্বর বলছে, কথাগুলি আশ্চর্য ভাল। অন্তত আমার তো মনে হয়েছিল তাই। বৈকুণ্ঠপুরের বড়বাবু লেখক হিসেবে কিছু নন—তবে মধ্যে মধ্যে দু'চারটে চমৎকার জায়গা আছে।

রতি বা মায়াবতীর পার্ট আমাকে করতে হত। ভাল পার্ট।

আমি বললাম – তোমার তো দেখছি স্মৃতিশক্তি খুব ভাল।

হেসে বাপ্পা বললে —না হলে পরিত্রাণ কোথা বলুন? পেটের ভাতের দায় যে!

আমি বললাম—কথাগুলি বল। সে তো বললে না।

—বলছি দাদা। বলতে গেলে একসঙ্গে অনেক কথা অনেক ছবি মনের মধ্যে জেগে ওঠে ভিড় করে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাপ্পা বললে —মায়াবতী শিশু মদনের মুখপানে তাকিয়ে এক বিচিত্র হাসি হাসলে। শম্বর দৈত্য সেই হাসি দেখে বলছে—

—এ কি? এ কি? এ কি হাসি হাসিছ বালিকা!

কে শিখালো? কোথায় শিখিলে তুমি এ হাসি হাসিতে?

মায়াবতী বলছে, তখন সে ভয় পেয়েছে, বললে

কেন পিতা? কি হাসি হেসেছি আমি?

কি দেখেছ হাসিতে আমার? আমি তো জানি না।

শম্বর বলছে- –

নাহি ভয়, ভয়ার্ত বালিকা। কন্যা বলে দিয়েছি অভয়।
নাহি জান কি হাসি হেসেছ। কি দেখিলাম - কেমনে বুঝাব?
মনে হলো চন্দ্রচূড় ললাটের চন্দ্রকলাখানি -
তোমার অধর ওষ্ঠে করিতেছে খেলা।
পরক্ষণে মনে হলো - নহে-নহে-নহে।
মদন দহন করা রুদ্রের ললাট বহ্নি—
চকিত আভাসে যেন খেলিয়া মিলায়ে গেল
মৃত্যুনীল শিখার নর্তনে।

আবৃত্তি শেষ করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। আমি মনে মনে উপমাটিকে তারিফই করছিলাম। এরই মধ্যে বাপ্পা আবার আরম্ভ করলে- –এই হাসি মধ্যে মধ্যে হাসতেন ভারতদা।

আবাব চুপ কবে গেল বাপ্পা। বুঝতে পাবছিলাম- —ওব মনেব মধ্যে ভাবতবাবুব এই ছবিটা খুব স্পষ্ট হযে উঠেছে।

বাপ্পা বললে— বোধ হয এ হাসি কেউ ইচ্ছে কবে বা অভিনয কবে হাসতে পাবে না। না-হেসে হাসানো যায়, না-কেঁদে কাঁদানোও যায; অভিনয কবে কাঁদা হাসা তো যন্ত্রেব মতো যায়। এ হাসি যায না। ভাবতদাব পাখানা শুকিয়ে গেল কেন শুনুন। ভাবতদাকে নাচ শিখতে হলো থিযেটাবেব জন্যে।

ভাবতদা বলেছিলেন, —ইন্দু, চাকবি হয তো থিযেটাবেব জন্যেই হলো কিন্তু এতে এমন একটা নেশা পড়ল যে সে বলাব নয। সে নেশা যে নিযতিব ছলনা তা জানতাম না। ওতেই, অন্তত ওবই ছুতো ধবেই আমাব সর্বনাশ এল। একটুক্ষণ চুপ কবে থেকে ভাবতদা আবাব বলেছিলেন –

এখানকাব বড়বাবু ছোটবাবু মনিব হযেও আমাকে অনেকটা বন্ধুব মতো দেখছিলেন। বড়বাবু নাটক লিখেছিলেন 'বিজযিনী'—নাটকখানা কপি কবতে দিযেছিলেন আমাকে—আমি কপি কবতে গিযে, কযেকটা জাযগায দেখলাম ভুল বযেছে, কিছু কিছু জাযগা খাবাপ হযেছে, সেগুলো তাঁকে দেখিযে বললাম, বেশ সম্মানেব সঙ্গেই বললাম—এগুলো বদলে দিলে হয না? বড়বাবু আমাব মুখেব দিকে অনেকক্ষণ তাকিযে বইলেন– তবপব বললেন, হ্যা বদলে দাও। তাবপব সন্ধ্যেবেলা নিজেব খাস কামবায পবিবর্তনগুলো শুনে খুব খুশি হযে বললেন —ভাবত মাস্টাব, তোমাকে মাস্টাব বলব ভাই আজ থেকে। শুধু আমাব ছেলেব নয, আমাব মাস্টাবীও কবতে হবে বুঝেছ! আমি ভাই বিষযী ঘবেব ছেলে– লেখাপড়ায ছেলেবেলা থেকেই মাঠো। ভালই লাগত না। কিন্তু নভেল নাটক পড়েছি। থিযেটাবে টিযেটাবে খুব ঝোঁক। আব ভাই লিখতে আমি পাবি। কিন্তু ওই মেজে ঘষে দিতে হবে। বুঝেছ।

তাবপব বড়বাবু ছিলেন ভাল বাজিযে আমি গাইতাম তিনি বাজাতেন। প্রায বন্ধু হযে গিছলাম। ছোট ভাই পুবঞ্জন ভাল সাবও কর্মক পর্ব বকতেন। ইউনিযন বোর্ড কবতেন। অল্প অল্প পান দোষও ছিল কিন্তু লোক অবও ভাল ছিলেন। শুধু জমিদাবী মর্যাদা অক্ষুণ্ন বাখা নিযেই ছিল মাবামাবি। সেই মাবামাবিতে একদিন থিযেটাবেব গাইযে নাচিযে অ্যাক্টবেব সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হযে গে । ভদ্রলোকটি কলকাতাব ছেলে, অ্যামেচাব থিযেটাবে নাচগানেব ফিমেল . . কবে বেড়ায।

দু'জনে একসঙ্গে কিছু পান কবে তকবাব কবতে শুব কবেছিলেন। তকবাবেব মুখে সিধুবাবু বলেছিল যান, যান মশায, বনগাযে শেযালবাজা হযে বসে যা খুশি তাই বলছেন। সে আপনাব ওই প্রজাবা মানবে, আমবা না। ও বকম জমিদাব শেযাল ঢেব দেখেছি বাবা –

কথা আব শেষ হযনি, পুবঞ্জনবাব ঠাস কবে গালে এক চড় কষিযে দিযেছিলেন।

সিধু শোধটা নিল খুব ভেবেচিন্তে। যাকে বলে সুপবিকল্পিত পথে। প্রথমটা দেখালে যে সে এতে কিছু মনে কবেনি। ওটা হযে গেছে গেছে। এমন হযে যায। বড়বাবু

তাও ছোটবাবুকে এবং তাকে ডেকে একটা মিটমাট করে দিলেন। কিছু না, কিছু হয়নি বলে দু'জনেই হাসলেন। ছোটবাবুকে হাসতে হলো। কারণ সামনেই তখন প্লে। মানে নাটকাভিনয় হবে। বড়দিন সামনে। বড়দিনের সময় বৈকুণ্ঠপুরে বাবুদের ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট কনফারেন্স হবে। সভাপতি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। কনফারেন্স ওপেন করবেন বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার। তাঁর নাম ছিল দুর্দান্ত কুক্ সাহেব।

কুক্ সাহেব নাকি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সময় বিশুদ্ধ বাংলায় বলেছেন—আমি যাইতে আনন্দিত হইব এবং নৃত্যগীত অভিনয় দেখিয়ে আরও অধিক আনন্দিত হইব। বৈকুণ্ঠপুর বাবুরা কালচার্ড লোক আছেন। থিয়েটার করেন।

থিয়েটারের কথা চলছিল, সেটা পাকা হয়ে গেল ওখানেই। এবং ওখানেই কেউ বলে দিয়েছিল বড়বাবুকে, দেখবেন মশাই নিজের পাতা ফাঁদে যেন নিজেরা জড়িয়ে না পড়েন। এ ব্যাটা পাষণ্ড ঐতিহাসিক নাটক দেখলেই তার থেকে স্বদেশী মানে ইংরেজবিদ্বেষ খুঁজে বের করে। তা পারলে ব্যাটা রক্ষে রাখবে না। জালে পড়া শুয়োর হরিণকে যেভাবে বাঁশ পিটিয়ে মারে সেইভাবে মারবে। ব্যাটা আস্ত জল্লাদ!

বড়বাবু গুরু এবং আদর্শ রায়বাহাদুর নাটক নির্বাচন করে দিয়েছিলেন!- ডি. এল. রায়ের 'বিরহ' প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন 'বিজয়িনী' – বড়বাবুর পৌরাণিক নাটক।

বিরহতে 'গোলাপী'র ভূমিকা আর বিজয়িনীতে মায়াবতী অর্থাৎ রতির ভূমিকায় নামবে সিধু। সিধু পুরো একমাস আগে বৈকুণ্ঠপুর এসেছে। গোলাপীর পার্ট তার তৈরি পার্ট। মায়াবতীর পার্টে সে রিহারস্যাল দিচ্ছে।

ভারতদা আবার এই বিচিত্র হাসি হেসে বললেন—বিজয়িনীতে আমি প্রদ্যুম্ন। আর বিরহতে আমি গোলাপীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী।

খুব সমারোহ করে আয়োজন চলছিল। বিজয়িনীর জন্যে পরিশ্রমের আর শেষ রাখা হচ্ছে না। বড়বাবুর গুরু এবং আদর্শ রায়বাহাদুর মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর এসে দিন চারেক থেকে পার্টগুলির রীডিং দিয়ে রিহারস্যাল চালু করে দিয়ে গেছেন। পার্ট সব তৈরি হয়ে গেছে।

সেদিন তেইশে ডিসেম্বর। সেসনস্ কোর্টে সে দিন রায় বের হবে গোপেন জামাইয়ের।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাপ্পা বললে—ভারতদা বলতে বলতে বুক চেপে ধরতেন। কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে যেতেন।

সেদিন বলবার সময় চুপ করে গিছলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন— কোর্টে রায় বেরিয়ে গেল বেলা বারোটায়। একেবারে দীর্ঘদিনের মেয়াদ। ছ'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। আমি কি করব ভেবে পেলাম না। উকীল বললে—জেল হবে এ জানা কথা। তবে এত লম্বা মেয়াদ হবে বুঝিনি। হাইকোর্ট করুন—কমে যাবে; বছর দুই তো কমবেই।

সারাটা দিন মা সর্বমঙ্গলার বাড়িতে গিয়ে বসে রইলাম আর মাকে ডাকলাম। আমার ভয় হচ্ছিল বোনটা পাগল হয়ে যাবে।

ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করিনে বলে মনে করতাম। কিন্তু সেদিন সর্বমঙ্গলার বাড়ি মাথা ঠুকে এলাম। বৈকুণ্ঠপুব ফিরলাম সন্ধ্যেবেলায়। সন্ধ্যের অন্ধকারে গলি গলি ঘুরে কাউকে মুখ না দেখিয়ে বাড়ি ঢুকলাম চুপি চুপি।

মা কাঁদছিলেন। চোরের মাযের কান্নার মতো কান্না তো। নিঝুম আধ আঁধাবি বাড়িটার ভিতরে কান্নার একটি ক্ষীণ করুণ সুর উঠেছিল।

ঠাওর করে দেখলাম---বিণী সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

বিষণ্ন দৃষ্টিতে সামনেব দিকে তাকিযে বোবার মতো বসে আছে।

ডাকলাম---বিণী!

বিণী কথা বললে না। নডল না। চোখেব পাতাও পডল না।

মা বললে---খবর আমরা পেযেছি বাবা। ঠাকুব দালানে কাঁসর ঘণ্টা বাজিযে খবর জানিযে দিযেছে ওবা।

ওবা হলো গোপেনেব সৎমা আব সৎভাই।

মা বললে--তবু ভাল বাব' যে নিজে বডবাবু এসে ওদেব ছি ছি কবে গেলেন। পাডাব লোক ডেকেছিল হরিব লুটেব অছিলা কবে। এমন সময বডবাবু বললেন---ছি ছি! একটুকু চক্ষুলজ্জাও নেই তোমাদের। এই কথায লোকজনেবা বাডি যায।

বিণী এবাব এতক্ষণে নডল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁডাল এবং কথা বললে। মৃদুস্বরে বললে --মুখ হাত ধোও দাদা। জলটল তোলা নেই, তুমি তুলে নাও। আমি চা কবছি। মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন--- হ্যা বাবা চা খেযে তুমি একবাব বাবুদেব বাডিতে যাও। এর মধ্যে ওবা তিন-চাববাব তোমাব খোঁজে লোক পাঠিযেছে, শেষবারে বডবাবু এসেছিলেন নিজে। হয তো তত্ত্ব কববার জন্যও বটে। কিন্তু কোন জরুরী কাজ আছে। বলেও গেলেন--- ভাবত এসেই যেন আমার ওখানে যায। শুনছি থিযেটারের দলেব সিধু বলে ছেলেটিকে পাওয' যাচ্ছে না।

পাওয়া যাচ্ছে না নয; সিধু পালিয়েছে। সেদিন তেইশে, সামনে একদিন পব ২৫শে থিয়েটার, সিধু আজ দশটার সময খাওয়াদাওয়া করে শরীর অসুখেব অছিলায় ঘরের দরজা বন্ধ কবে শুযেছিল। বিকেলে দেখা গেল ঘরের দোর ভেজানো এবং শীতের দিনে একটা পাশ বালিশকে বিছানায় শুইয়ে লেপ ঢাকা দিয়ে রেখে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘর-বাহির দুইদিকেই অন্ধকারে বেখে নিরুদ্দেশ হযেছে। সত্যটা এখানে আবিষ্কৃত হযনি; সত্যটা এসেছে বর্ধমান স্টেশন থেকে। থিয়েটারেরই একজন সভ্য বর্ধমান স্টেশনে গিছল কি কাজে। সেখানে এক নম্বব প্ল্যাটফর্মে একখানা আপ এক্সপ্রেস ট্রেন ছেডে চলে গেল তাব সামনে দিয়ে, হঠাৎ চলন্ত ট্রেনের একখানা কামরা থেকে মুখ এবং দুই হাত বের করে সিধু কলা দেখিয়ে দাঁত ভেঙিয়ে বলছে---বলিস শেয়ালদের---আমি বাঘের এলাকায় যাচ্ছি! লোকটি ফিরে এসে ছোটবাবুকে বলে।

ছোটবাবু সিধুর খবরটা যাচাই করে নিয়ে বড়বাবুকে খবর দিয়েছে। এবং সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। এখন হবে কি?

কথা অনেক রকম হচ্ছিল। কলকাতায় গিয়ে গোলাপীর পার্ট করার লোক খোঁজা থেকে আরম্ভ করে নানারকম। কিন্তু পার্ট তো শুধু বিরহে গোলাপীর পার্টই নয়, পার্ট যে বড়বাবুর নাটকেরও আছে। নায়িকা মায়াবতী পার্ট তো আগাগোড়া, এবং এ নাটক তো বৈকুণ্ঠপুরের থিয়েটারের দলের লোক ছাড়া কেউ নামও শোনেনি। মধ্যে একদিন সময়, এ পার্ট একাদনে কে করবে? [illegible]র্টে গান আছে। নাচও আছে।

ভারতবাবু সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ও পার্ট দুটো আমি করে দিতে পারি। গানে এখনও আমি মেয়েলী গলা বের করতে পারি। তবে নাচটা হবে না।

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল।

বড়বাবু বলেছিলেন—মেয়েলী গলা করে গান গাও তো শুনি। আন তো রে হারমোনিয়ম।

ভারত গান গেয়েছিল।

ওই গোলাপীর গানখানাই গেয়ে শুনিয়েছিল।

বড়বাবু বলেছিলেন—সুন্দর হয়েছে। মধুর গলাটা ঢ্যাকঢেকে। তুমি প্র্যাকটিস করে নাও ভাই। কিন্তু রতির পার্ট?

—ভাববেন না, ও বইয়ের সব পার্ট আমার মুখস্থ। বই আমি কপি করেছি। কিন্তু নাচ?

বড়বাবু বলেছিলেন—[illegible] হবে। আমি তোমাকে নাচ শেখাব। আমি নাচ জানি। এককালে শিখেছিলাম। ঠিক আছে পুরঞ্জন করুক ভারতের পার্ট। আর পুরঞ্জনের পার্ট করব আমি।

সেই সন্ধ্যাবেলা থেকে নাচ শেখা শুরু হলো।

এক দুই তিন। এক দুই তিন। এক দুই তিন চার।

কল্পা বললে—ভারতদার চোখ দুটো বলতে বলতে জলে ভরে গেল। ভারতদা চোখের জল মুছে বললেন—ইন্দু, বড়বাবুর উৎসাহ আর ক্লান্তিহীন খাটার দৃষ্টান্ত দেখে আমি সব ভুলে গেলাম। বিনীর দুর্ভাগ্যের কথা মনে রইল না, সেদিন রাত্রি, পরের দিন রাত্রি, তিন বেলা বাঙালীর ছেলে ভাত খেলাম না, বড়বাবুর সঙ্গে নাচলাম। বড়বাবু নাচ জানতেন। সত্যিই জানতেন। এককালে আবদালা করেছেন। করেছেন এখানে নয় কলকাতায়। তিনি সমানে পরিশ্রম করে ২৫শে সকালবেলা বললেন—যাও, আজ সারাদিন ঘুমোও। স্নান করে ভাত খাও। সুস্থ হও।

বললেন—তুমি গান জান, [illegible] নাচ তোমার শিখতে কতক্ষণ!

তাই করলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় হলো 'বিরহ'। বিরহে খুব প্রশংসা হলো। হবারই কথা। বিরহে

গোলাপীব পার্টে নাচেব সঙ্গে চোখেব ঈশাবাব একটা ভালগাবিটি যেন পার্টটাব ট্র্যাডিশন হযে গেছে। আমি তা কবিনি। তাব পবদিন বতিব পার্টেও প্রচুব প্রশংসা পেলাম। ওতে একটা নাচ আছে। সেও কলসী কাঁখে সবোববেব ঘাটে ঠিক ওই গোলাপীব ভঙ্গিতেই দাঁড়িযে মৃদু মৃদু অঙ্গ হিল্লোলে নাচাব কথা। তাও নাচলাম। এবপব থিযেটাবে মজলাম। নাচ শিখতে লাগলাম।

তখন সর্বনাশ হযে গেছে।

প্রথম অভিনযেব সময পাযে একটা পেবেক ফুটে গেল। পেবেকটা টেনে বেব কবে দিযে ব্যান্ডেজ বাঁধলাম। তাই নিযে নাচলাম। পার্ট কবলাম। থিযেটাব শেষ হলো। পেবেক ফোটা জাইটা একটু টাটালো তবপব পাকলো, ডাক্তাব ছুবি চালালে। ভাল হযে গেল। শুধু একটু একটু ব্যথা বযে গেল। মধ্যে মধ্যে ব্যথাটা বাড়ত। তাবপব একটা স্থাযী ঘোড়াতে দাড়াল।

কবালাম অনেক। ডাক্তাবী কবালাম। দু'বাব তিনবাব অপাবেশন হলো। শেষে বললে হাড়ে যক্ষ্মা হযেছে। পা হাটুব নীচে থেকে কেটে ফেলতে হবে। প্রথম কাটাতে পাবিনি। ভয হযেছিল। চাদশী কবালাম।

বড়বাবু ছোটবাবু দুই ভাইকে আমাব সম্বন্ধে যা কবাবাব ওবাই কবিযেছেন। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হলো না। হলো আমাব প্রাণ সংশয। জ্বব হতে লাগল। এখানকাব ডাক্তাবখানাব ডাক্তাব ভয পেলে। বললে হাড়েব বিষ হয তো এবাব লাংস কি ইন্টেস্টাইনে ধবে যাবে। কলকাতায এসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম। ডাক্তাবেবা পাখানা হাটুব নীচ থেকে কেটে বাদ দিযে দিলেন।

ভাবতদা বললেন নাচ আমি ভালই শিখেছিলাম এক বছবে। পাযে পেবেক ফোটাব পব একত্রিশ সালটা এই পাযেব ব্যথা নিযেই চালিযেছি, এই নিযেই নেচেছি, গেযেছি, হেঁটেছি, সব কবেছি, বত্রিশ সালে খোঁড়া হলাম। তাতেও পার্ট কবেছি। তেত্রিশ সালে পা কাটা হলো। এখন খোঁড়া হযে পড়ে আছি।

থিযেটাবটাই আমাব প্রাণ, ওইটে নিযেই পড়ে আছি। আব এই বোনটা যাবাই এখানে আইবে আসে, অবশ্য যিমেল পার্টেব লোকই, তবাই এসে আমায ভাভাতে চায। কিন্তু —।

কিন্তু দুর্ভাগ্যেব মধ্যে আশ্চর্যভাবে একটা সৌভাগ্য আছে আমাব। বড়বাবুব ভালবাসা। উনি বই লেখেন, নাটক লেখায আশ্চর্য ঝোক। মানুষটিও সদাশয। আমাব পা কাটা গেল, উনি বললেন ভাবত, আমাব থিযেটাবে নাচতে গিযেই তোমাব পাযে পেবেক ফুটে পা গেল— তুমি খোঁড়া হযে গেলে। আমাব আপসোসেব আব শেষ নেই। আমি তোমাকে দশ বিঘে খাস জমি খাজনা বন্দোবস্ত কবে দিচ্ছি, ভাগে দিযে যে উৎপন্নটা পাবে তা থেকে অন্তত তোমাব অন্নেব সংস্থান হযে যাবে। আব চাকাব তোমাব থাকবে। যাবে না। থিযেটাব আমি ওঠাব না ভাবত। থিযেটাব যাতে থাকে তাব জন্যে দেবোত্তবে পাকা ব্যবস্থা কবব আমি।

একটু চুপ কবে থেকে ভাবতদা বলেছিলেন —আপনাদেব অনুগ্রহ আমাব চিবদিন

মনে থাকবে বড়বাবু। আমাকে দুটো বছর নিশ্চিন্ত করে রাখুন—আমি টাইপ করতে জানি—আপনাদের টাইপের কাজ করে দেব। বাচ্চা ছেলেদের পড়াতেও পারব; ইংরিজীতে পত্রটত্র লেখার ক্লার্কের কাজ করব। থিয়েটার করা ঘুচে গেল—

বড়বাবু বাধা দিয়ে বলেছিলেন—না যায়নি! অন্তত আমি যতদিন নাটক লিখব—ততদিন থিয়েটার নিয়ে থাকতে হবে তোমাকে। নিজে নাই বা নামলে। আমি যতদিন নাটক লিখব—ততদিন তোমাকে আমার চাই।

ভারতদা চুপ করে ছিলেন। কি বলবেন?

বড়বাবু বলেছিলেন, শোন, আমি হিসেব করে দেখেছি—জমিদারের ঘরে জন্মেছি, জমিদারী ভোগ করছি, তার জন্যে ইংরেজদের খয়ের খাঁ হতে হয়েছে। ইংরেজের empire-এর সামিয়ানাটার ছোট বড় খুঁটির মধ্যে ছোট খুঁটি হয়ে সামিয়ানা ধরে আছি। প্রজা ঠেঙাই, তাদের চুষে খাই; ব্যবসা করি—লাভ করি, কলিয়ারীতে কুলী খাটাই—মামলা-মকদ্দমা করি, তার জন্যে মিথ্যে বলি, সে সব পাপের জন্য কর্তারা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে গিছলেন। কথাগুলো আমার নয় আমার ঠাকুরদাদার, তিনি হয় তো তাঁর বাবার কাছে শুনেছিলেন। আমি শুনেছি আমার বাবার কাছে। আমার বাবার ঠাকুরদা চাকরি করতেন পঞ্চকোটের রাজাদের এস্টেটে। পঞ্চকোট জানো তো? মানভূমের বন অঞ্চলের সেই পুরনো আমলের রাজা। মাইকেল মধুসূদন ম্যানেজারী করেছিলেন। সরল বদরাগী ছত্রি রাজা। তাদের ঠকিয়ে সম্পত্তি করেছিলেন বাবার পিতামহ। হিসেব নিকেশে ধরা পড়লেন বাবার পিতামহ। রাজা প্রথম হুকুম দিয়েছিলেন—মেরে ফেল। সম্পত্তি সব দলিল করে লিখিয়ে নাও। তারপর বললেন—না। ডাক লোকটাকে। বাবার পিতামহকে ডেকে বললেন—তুই লোকটা বেইমান। লোকে চুরি করে—তুই দিনে ডাকাতি করেছিস। প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে তুই বাড়িতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করবি, যদি প্রতিষ্ঠা করিস তবে তোকে ছেড়ে দেব। ওঁদেরই হলো বাগবাজারের মদনমোহন। রাজারা বৈষ্ণব, খুব ভক্তিমান। বাবার পিতামহ তাই কথা দিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন। ছেলেদের বলে গিয়েছিলেন—বাবা ঠাকুরে বিশ্বাস রেখো ভক্তি করো—করে জমিদারী করো। দাঙ্গা ফৌজদারী মামলা মকদ্দমা করবে ওই ওঁর কাছে জানিয়ে করো। বুঝেছ, এত বড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যত অপরাধ পাপ নরহত্যা স্বজনহত্যা এমন কি শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্ম বধের পাপ অপরাধ সব আগুনে তুলোর মতো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমরা তা মেনে চলি ভারত। বিশ্বাস আমরা করি। কিন্তু একালে বঙ্গভঙ্গের পর থেকে দেশের সেবায় কিছু না করার অপরাধটা আমাকে বড্ড লজ্জা দেয়, মনে হয় পাপ হচ্ছে। আমি কলকাতায় থাকতে বিলিতী কাপড় পুড়িয়েছি। রাখীবন্ধনের দিনে রাখী বেঁধেছি।

হেসে বলেছিলেন—একখানা স্বদেশী কাপড়ের দোকান করেছিলাম। আর এ অঞ্চলে তাঁতীদের ভাল তাঁতের কাপড় বুনবার জন্য টাকা দাদন করেছিলাম। মনে মনে আরও কল্পনা করতাম। তা' সে সব একদিনে গুটিয়ে দিতে হলো। এস-ডি-ও বাবাকে ডেকে বললে—চৌধুরী, তোমার ছেলে এসব কি করছে? স্বদেশী কাপড়ের

দোকান—তাঁতীদের দাদন। মতলব কি? কালেক্টরসাহেব বলছিলেন—ছোকরা কি চায়? বোমা করবে এরপর? বাস উঠে গেল। তাঁতীদের দাদন আদায় হলো। হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিয়েছিল বাবা, ছাড়েনি। কিন্তু দোকানের কাপড় সব একদিন ম্যাজিস্ট্রেট এসে গরীবদের ডেকে দান করে গেলেন।

বাবার মৃত্যুর পর প্রথম করেছি লাইব্রেরি। তারপর এই থিয়েটার। জান দেশ কি, দেশকে ভালবাসা কি বস্তু এ শিখেছি বই পড়ে আর থিয়েটার দেখে। স্টার থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য আর মিনার্ভায় রাণাপ্রতাপ, মেবারপতন এই বই ক'খানা দেখে আমি যেন দেশ দেশ করে পাগল হয়ে গিছলাম। ক্রমে ক্রমে বয়স বেড়েছে, পাকা জমিদার হয়েছি, খয়ের-খাঁ-গিরি করছি কিন্তু দেশকে ভুলতে পারিনি ভাই। শেষে রায়বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ হলো। ওঁর থিয়েটার আছে। ওই থিয়েটারে পার্ট কবতে লাগলাম। শেষে গ্রামে থিয়েটার করলাম। নিজেরা মুখে বলে দেশপ্রেম প্রচার করতে না পারি—থিয়েটারের প্লের মধ্যে দিয়ে তো পারব। প্রপিতামহ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—গোবিন্দকে তিনি বলতেন পতিতপাবন। আমাদের থিয়েটারের নাম দিয়েছি আমি 'বিজযা থিযেটাব'। কেন জান? ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্যে 'বিজয়া' হলেন সাক্ষাৎ দেশমাতৃকা। কেউ জানে না। জানলে রক্ষে থাকবে না। পুলিসের দারোগা থেকে পুলিস সাহেব, সার্কল অফিসার থেকে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত নানারকম ছুতোনাতা করে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে। একটা সত্যি ঘটনার কথা বলি শোন। লাভপুরে বাযবাহাদুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে নাম দিয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম থিযেটার'। সে তখনও বোমার মামলা হয়নি। তারপর যেই না আলিপুর বম্ব কেস হলো অমনি সেটা মুছে লিখে দেওযা হলো 'অন্নপূর্ণা থিয়েটার'।

—ভারতদা বলেছিলেন—আমি বডবাবুব হৃদযের যে পরিচয সেদিন পেলাম ইন্দু, তাতে আমি যেন আমাকে হারিযে ফেলেছিলাম। বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছিল কান্নায। কান্না আসবার কারণ আমার দুর্ভাগ্যেব জন্যও বটে, আবার বডবাবু নিরঞ্জন চৌধুরীর আমাব প্রতি আশ্চর্য স্নেহের জন্যও বটে। চোখ থেকে আমার জল গডিয়ে এসেছিল। বডবাবুও কেঁদে ফেলেছিলেন আমার চোখের জল দেখে।

সে মুখখানা আমার চোখেব উপর আজও ভাসছে ইন্দু। বডবাবুকে তো দেখেছিস, মুখখানা সুন্দর না? ওর হাসি দেখেছিস কান্না দেখিসনি। কাঁদলে খারাপই দেখায়। কিন্তু সেদিন সে কান্নায় হাঁ করা চোখের দু'পাশ কোঁচকানো মুখখানা এমন করুণ মনে হযেছিল কি বলব তোকে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ইচ্ছে ছিল তোমাকে নিয়ে দু'খানা বই করব—প্রতাপাদিত্যে করব আমি প্রতাপ তুমি বিজয়া, আর রাণা প্রতাপে আমি শক্ত সিংহ তুমি দৌলতোন্নিসা। তা—। থিয়েটার আমি ওঠাবো না। তোমাকেও আমি ছেড়ে দেব না। তুমি এক কাজ কর, টাইপটা ভাল করে শেখ. বাড়িতে বসেই শেখা হবে। আর তুমি আই-এ পাস, তুমি মোক্তারশিপটার জন্যে আইন পড়ে নাও। তুমি ম্যানেজার হবে আমাদের এস্টেটেব। বসে বসে কাজ করবে। পায়ের জন্যে আটকাবে না।

—কি কবব? তাই বা কেন বলছি ইন্দু, এই নিয়ে খুশি হয়েই বয়েছি ভাই। আমাব জীবনে তো ভবিষ্যৎ নেই। থাকবাব মধ্যে বয়েছে ভাইটা, সেটাব মতি তো একেবাবে দিগদিগন্তব হাবা তেপান্তবেব দিকে। জেল খেটে এল আবাব জেলে যাবাব জন্যে পথ খুজছে, লডাইয়ে ঘোডা, লডাইযেব বাজনাব জন্যে কান পেতে থাকে, বাজনা না শুনতে পেলে পা ঠোকে— ও তাই। এখন মিটিংয়ে মিটিংয়ে গান গেয়ে বেডায। আব আছে এই বোনটা। ওবও অবস্থা প্রায তাই তবু গোপেন ফিবে এলে যদি কোনমতে ওদেব সংসাব পেতে দিতে পাবি তাবই একটা মাত্র প্রত্যাশা আমাব আছে। ওকে আমাব ভয় কবে। ওব মুখে কথা নেই, হাসি নেই, বিষন্ন অথচ কোন দুঃখও যেন নেই। ওব যেন কিছুই নেই।

এ ছাডা তোদেব মনে থিযেটাবেব ছেলেদেব নিয়ে আমাব সংসাব বে। পাঁচ ছ'জন আছে মাইনে কবা লোক। ড্যান্সিং মাস্টাব একজন আছে। লোকটা ভাল না। তবু কি কবব, ওই ছাডা ড্যান্সিং মাস্টাব মেলে না। আবও ক'জন এখানকাব ছেলে আছে ফিমেল পার্ট কবে তাবা বাবুদেব এস্টেটে কাজ কবে। পনেব কুডি টাকা মাইনে। সব থেকে ঝঞ্ঝাট গাইয়ে ফিমেল পার্টেব লোক নিয়ে। এদেব মতো বউগুলে বজ্জাৎ আব হয না। আব যদি ভালো হয তাহলে তাদেব বাযনাক্কা জোগাতে মন জোগাতে জীবনান্ত আসে, দুই এক বছব থেকে তাবপব চলে যায। এবাব দিন সাতেক আগে গাইয়ে ফিমেল পার্ট যে কবত সে পালিযেছে ইস্কুলেব প্রাইজ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এস ডি ও, এস পি, সব দল বেধে আসছে। এস ডি ও বলেছে বডবাবুকে যে, তাকে খেতাব দেওযাব একটা কথা উঠেছে। এই এখানে থিযেটাব দেখিযে, ইস্কুল হাসপাতাল ইনস্পেকশন কবিযে, দামোদবেব ধাবে পিকনিক কবিযে একটা ভাল গোছেব খাতিব দেখানো হবে। সাহেবদেব দেখাতে সেই স্টক প্লে বিবহ আব বিজযিনী। নির্দোষ। দেশ, দেশপ্রেম ইত্যাদিব নামগন্ধ নেই। সেই পুবনো সমস্যা সন্তোষ বলে যে ছেলেটা গোলাপী আব বতি কবত সে পালিয়েছে।

কলকাতায় খোজ কবে যাদেব পাওযা গেছে তাবা থিযেটাবেব বাজাবে পুবনো লোক, এদেব অনেক দাবি, অনেক বাযনাক্কা। বিবহও আজকাল বড হয না, বিজযিনী তো এখানকাব বই, বডবাবুব লেখা। এবা এসে বই এব গান গাইবে না অন্য গান গেয়ে নাচটা চালাবে, আব পার্টেব সময পার্ট বলবে না বলবে —হুঁ হা না আব কো অ্যাক্টবেব কাছে এসে কানেব কাছে বলবে আপনি বলে যান। ওতেই হবে। বই ডুবল কি খাবাপ হলো তো তাদেব কি যায় আসে? তবে অন্য গান গেয়ে নেচে মোটমাট জমিয়ে একবকম কবে দেবে। বড ভাবনায় পডেছিলাম। ওই সব লোকেব অন্য বিপদও আছে।

হঠাৎ সেদিন স্বদেশ বললে—দাদা, কাটোয়ায় মিটিং কবতে গিছলাম, সেখানে একটি চমৎকাব ছেলেকে দেখলাম। সুন্দব দেখতে, তেমনি সুন্দব গলা। আব ধেবে পাখি নয়। জাতও ভাল। ম্যাট্রিক পাস কবেছে ফার্স্ট ডিভিশনে। চাকবি ঠিক মনেব মতো পায়নি, ছোটখাটো দেখতে, মনে হয় বড্ড ছেলেমানুষ। ঘাডেব উপব সংসাব।

মা ভাই বোন, সম্বলেব মধ্যে সামান্য কিছু জমি। বাডি কাটোযাব কাছেই। এখন গ্রামেব পাঠশালায বুডো পণ্ডিতেব অ্যাসিস্ট্যান্টেব কাজ কবে, পণ্ডিত বলতে গেলে কিছুই কবে না, অক্ষম হযেছে। ওকে যৎসামান্য দিযে কাজ কবিযে নেয। আব বলে পাঠশালাটা আমি তোকেই দিযে যাব। তাব সঙ্গে বছবখানেক একটা বামাযণেব দলে মূলগাযেনেব কোলেব কাছে দাঁডিযে গান কবে। জন্ম থেকে ছেলেটা গাইযে ছেলে। যেমন স্বব তেমান সুবজ্ঞান, তালমানেও সে ওস্তাদ ছেলে। তাছাডা একটা কথা দাদা। আমি আলাপ কবে বুঝেছি ছেলেটি চবিত্রেব দিক থেকে খুব ভাল ছেলে। ওকে এনে তুমি বাবুদেব বলে ওদেব কাববাবটাববাবে একটা চাকবি কবে দাও, যদি তুমি বলে কযে ওদেব বাইযবীতে ঢুকিয়ে দিতে পাব তাহলে ওবও মঙ্গল হবে —তোমাবও ভাল হবে দাদা।

বাপ্পা আবাব থেমে গেল।

বাইবে আব এক দিকে তাকালে। বুঝতে পাবলাম, ভেবে নিচ্ছে এবপবেব কথাগুলো। শুধু ভেবে নিচ্ছেই না, তাব সঙ্গে ভাবছে কেমনভাবে বলবে, আবও ভাবছে বোধ হয কতটা বলবে।

পাশেব আকাশে চাঁদ উঠছে, বাত্রি আডাইটেব পব চাঁদ ওঠাব কথা। কৃষ্ণপক্ষেব বাত্রি। পৃথিবীব গাযে নীল আকাশে জ্যোৎস্নাব পাণ্ডুব আলো ছডিযে পডেছে একটু একটু লালচে বঙ মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নাব। কিছুক্ষণেব মধ্যেই কেটে যাবে লালচে আমেজটা। আমাব বাডিব পুব দিকে আমাদেব গ্রামেব পুবনো তালপুকুব। চাবপাশে বসতি হযে গেছে এখন, তাহলেও পাবেব একগুলো তালগাছ এখনও আছে, একটা অশ্বত্থ গাছ আছে ওদিকে, আছে আবও কযেকটা বড ধবনেব গাছ, একসঙ্গে কটি পবিবাবেব মতো জোট বেঁধে একটা ঝোপঝাড তৈবি কবে দিযে আছে। তাবই কোন একটা ডালে বাসা বাসা থেকে কা কা শব্দ কবে একটা কাক ডেকে উঠল। আমি জ্যোৎস্নাব দিকে তাকিযে দেখছিলাম এটা, কাকটা হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভ্রমবশে ডেকে উঠল কিনা সত্যিই বাবডো জ্যোৎস্না হযেছে কিনা। আকাশে একবাব ঝলমল নদী পুব দিকে আসছে।

বাপ্পা বললে দেখুন, এক একটি মানুষকে আশ্চর্য মানুষ। এ মানুষ কখনও ছোট হয না, ছোট হতে পাবে না। সেদিন সমস্ত কথা বলে আমাকে অকপটে বললেন কি জানেন? বললেন ভাই ইন্দু, তোমাব কাছে কোন কথা লুকোবো না আমি। খুলেই বলব। দেখ এই গাইযে মেযেব পার্টেব লোক যেই আসুক তাব ওপবেই আমাব অন্ন, আমাব চাকবি নির্ভব কবছে। এবা বডলোক, এঁদেব থিযেটাবেব শখ। আমাব এখানে চাকবি সেই সূত্রে। বডবাবু আমাকে ভালবাসেন। আমি টাইপ কবি, বই নকল কবি, জমিদাবী ব্যবসা এসবেব ব্যাপাবেও আমাব পবামর্শ নেন। কিন্তু এই থিযেটাবেব দবকাবটাই বড দবকাব। কোন গাইয়ে লোক এসে যদি আমাকে তাডাবাব জন্যে উঠে পডে লাগে তাহলে আমাব চাকবি চলে যাবে, থাকবে না।

জমিটাও থাকবে না। জমিটা আমাকে দিয়েছেন বটে, কিন্তু দলিল করে দেননি। আমার কাছে খাজনাও নেন না, রসিদও দেন না। আমি ভোগ করছি। যেদিন চাকরি যাবে সেদিন জমিও চলে যাবে। তাই আমি চাই ভাই তোর মতো ছেলে। সচ্চরিত্র ছেলে চাই।

একটু চুপ করে থেকে ভারতদা বলেছিলেন— আর এক বিপদ আমার কি জানিস? আমার বোন ওই বিণী।

বিণীর নাম করেই ভারতদা চুপ করে গেলেন আবাব। কান খাড়া করে যেন কিছু শুনলেন। তারপর বললেন—সব থেকে বড সমস্যা আমাব ওকে নিয়ে। আমার বাবা ছিলেন কালনা ইস্কুলের বাংলা ইতিহাসের মাস্টাব, সে আমলের নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস। মধ্য বযসে কালনা ইস্কুলের থার্ড মাস্টারের কাছে স্বদেশীতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাড়িতে বড কড়ালোক ছিলেন। আমরা ছেলেবেলা থেকে তিন ভাই-বোনে ঠিক আব সব দশজনের মতো গডে উঠিনি। গোডাতেই বলছি, বৈকুণ্ঠপুর থিযেটারে নাচতে গিযে আমার পা খোঁড়া হয়ে এখানে আটকে না পডলে ওই স্বদেশেব মতোই স্বদেশী করে বেডাতাম। স্বদেশ তো স্বদেশী করে বেডাচ্ছে চোখেই দেখছ। বিণী—

ওর ভাল নাম বাবা দিযেছিলেন —স্বাধীনতা দেবী। ওটা কানে এমন কটমট ঠেকেছিল যে টেকেনি। তারপর রেখেছিলেন দুর্গাবতী। তাও টেকেনি। বোধ হয ওর সঙ্গে মেলেনি বলে টেকেনি। বিণী নামটা ডাকনাম। ওব চুল একরাশ। বেণী বাঁধত, আমিই বেণী ধরে টেনে টেনে বলতাম—বিনুনি বিনুনি বিনুনি। তা থেকে বিণী, বিণী থেকে বিনোদিনী হযে গেছে। বাইরে বড নরম বড শান্ত রে। কিন্তু ভেতরে ঠাণ্ডা ইস্পাতের মতো ওর একটা চেহারা আছে। যা ভাঙে তবু নোয়ায় না। কোন কিছুব সঙ্গে ওব আপোস নেই। ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে মাযের কাছে শিখেছে নিষেধের শিক্ষা। আমরা পরাধীন, আমরা হতভাগ্য জাত—আমাদের হাসতে নেই, আমাদের ভাল খেতে নেই, আমাদের ভাল পরতে নেই।

ওর গলাও খুব ভাল গলা রে। আমাদের মতো গাইতে পারে। কিন্তু ওর গান যা শুনবার শুনেছি কালনায়। তখন ওর বিয়ে হয়নি। বাবা তখন বেঁচে। বাবার সামনে আমরা তিন ভাই-বোন স্তোত্র পাঠ করতাম—গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী। আমরা ভাই-বোনেরা মিলে অবসর সময়ে স্বদেশী গান গাইতাম। যাত্রার আসরে শেখা নাচের সখীদের গান আমরা গেয়েছি কিন্তু ও কখনও গাযনি। গাইলে বলত —দাদা এই গান গাইছ তুমি? বলে দেব বাবাকে।

বাবা সে সময় গল্প বলতেন এনার্কিস্ট দলের। ১৯১৪।১৫।১৬ সালের বিপ্লবীদের কর্তা যাঁরা ছিলেন তাঁরা ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো মানুষ। নিজেদের কথা ছেড়েও দলের কেউ সেকালে সিনেমা বায়স্কোপ দেখবার ইচ্ছে করলে বলতেন—টিকিটের দামটা দাও দেশের ভাণ্ডারে জমা হবে। বিণী তাই শিখেছিল। কখনও ডাল ভাত মোটা তরকারি ছাড়া খায়নি—আজও খায় না। মোটা তাঁতের

কাপড ছাড়া পবে না। আজ যে লাল বংযেব তাঁতেব শাড়ি তাব পবনে দেখলে, ও কাপডখানা তাঁতে বুনেছে স্বদেশ। স্বদেশ খুব ভাল তাঁত বোনে।

বড ভাল মেয়ে। ফুলেব মতো নবম পবিত্র তাও শুধু পুজো হবাব জন্য। মালা গাথাব জন্য নয়। বিযে দেওয়াটা বেলাযই ভুল হযে গেল। ভুল আমবা কবিনি। ভুল কবেছিলেন বাবা। বর্ধমান এসেছিলেন ট্রেজাবীতে ইস্কুলেব কি একটা গ্র্যান্টেব টাকা ভাঙাতে। কালনা বর্ধমান জেলা। বর্ধমানেব কালেক্টবেট ট্রেজাবীতে ভাঙাতে হযেছিল।

বর্ধমানেব বড [illegible] সেই পুবনো আমলেব পাকে ভবা বজবজে ড্রেনে একখানা গরুর গাডি কাত হযে পড়ে গিছল, শুধু গাড়িখানাব একটা চাকা নয়, একটা গরু মেত। গরুটাব প্রায় হাটু পর্যন্ত পাবে বসে গিছল। লোক জমেছিল অনেক কিন্তু কেউ হাত লাগাচ্ছিল না। গাড়োযানটা মিনতি কবছিল জনে জনে —একটু ধবে দিন।

বাবাব তখন বযস [illegible] কাছে। বাবা ভাবছিলেন তিনি হাত লাগাবেন কি না। তিনি লাগাতেন হাত কিন্তু ভয তাব কাগজপত্রেব জন্য। হঠাৎ কালোবঙ সবল চেহাবাব একটি [illegible] এসে জামাটা খুলে ফেলে লেগে গেল। তাব দেখে আবও দু'জন [illegible] গেল। [illegible] মধ্যেই পাক মেখে গরু এবং গাড়িটা তুলে দিযে সেই জোযান ছেলেটি [illegible] পাক মাখা হাত দু'খানা বাড়িযে বলেছিল কাব আঁচলে হাত মুছব [illegible]।

সকলেই সবে পালাচ্ছিল [illegible] সে হাসছিল। আমাব বাবা তাঁব উড়ুনী চাদবখানা এগিযে দিযে বলেছিলেন নাও মোছ বাবা। আমাব চাদবে মোছ।

বাবাব ধাবণা হযেছিল [illegible] পাকে পড়া এই ভীমদর্শন ছেলেটি—

ভবতদা বলেছিলেন ভীমদর্শন কথাটা বাবাব কথা। কালো বঙ, শক্ত, বেশ খানিকটা [illegible] চেহাবা গোপেনেব। আমবা বিযেব পব খুত খুত কবেছিলাম, বাবা তাই বলেছিলেন— বাবা গঙ্গাব উৎস গোমুখ গহ্বব যে পাহাড়ে সে পাহাড়েব [illegible] চেহাবাও অন্য পাথবেব মতোই কালো আব দেখে ভয হবাব মতোই বাে। কিন্তু বাবা, আমি দেখেছি বাবা, আমি চিনেছি, ওব মধ্যে গঙ্গাব ধাবা লুকোনো আছে। দেখবে তোমবা।

বিণীকে তাই বলেও দিযেছিলেন বিযেব সময।

বিণী তা মানতে চেষ্টাও কবেছিল। কিন্তু— ।

বছব দুযেক চলেছিল শান্তিতে। শান্তিতে হযতো নয, একটা চুপচাপ অবস্থাব মধ্যে সব ঢাকা ছিল। পবস্পবের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটি হত কি না, বিণীব চোখেব জল ঝবত কিনা তা বিণী জানে। কিন্তু বলেনি কোনদিন। মনে হত সেই বিণী। সেই শান্ত সেই কম কথা বলা বাইবে নবম ভেতবে শক্ত বিণী।

বিস্ময তবু লাগল।

লাগল এই জন্যে যে বিযেব পবও বিণী নতুন শ্রীতে ঝলমলিযে উঠল না, তাব ঠোঁটে হাসি শব্দ কবে বেজে উঠল না, বিণীব চলাফেবাব মধ্যেও কোন পবিবর্তন

দেখা গেল না। না-হলো মন্থর না-হলো চঞ্চল। এসব আমাদের চোখেও পড়েনি, পড়েছিল মায়ের চোখে। মা বলেছিলেন—এ কি হলো ? তুই একটু কথা কয়ে দেখবি ভারত ? ও তো আমার কাছে মুখ খুলবে না!

ভারতদা মাকে বলেছিলেন—কেন তুমি এমন উতলা হচ্ছ মা ? কেন এমন ভাবছ আমি তো বুঝতে পারছি না।

মা বলেছিলেন-—আমিই বা কি করে তোদের বোঝাবো রে ? তোরা একে বেটাছেলে তার ওপর তোর বাপের ছেলে।

বিণীকে আমি খুব সংকোচের সঙ্গেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

বিণী বলেছিল—আমি খুব ভক্তি করি দাদা। কেন ? ও কিছু বলেছে তোমাকে ?

—না না, গোপেন কিছু তো বলেনি।

—তবে ?

—মানে ? মানে জিজ্ঞাসা করছি। তোকে তো হাসতে-টাসতে দেখি না!

—হাসি ? কেন ? হাসবার কিছু হলে তো হাসি!

—বিনা কারণেও তো হাসে রে লোকে।

—না, তা আমি হাসি না।

সে এক আশ্চর্য বিষণ্ন হাসি হেসেছিল বিণী সেদিন। ওই যে হাসির কথা বড়বাবুর নাটকে আছে। সেই হাসি। 'চন্দ্রচূড় ললাটের চন্দ্রকলাখানি, অধর ওষ্ঠের মাঝে করিতেছে খেলা। পরক্ষণেই মনে হয়, নহে নহে নহে। মদন দহন করা রুদ্রের ললাটে বহ্নি চকিত আভাসে যেন খেলিয়া হাসিয়া গেল মৃত্যুহীন শিখার নর্তনে।'

বাপ্পা বললে, ও লাইন ক'টা ভারতদার লেখা, বৈকুণ্ঠপুরের বড়বাবুর নয়। আর ভারতদা ওই হাসির কথা ওইভাবে লিখেছিলেন বিণীর হাসি দেখে তাতে আমার সন্দেহ নেই। ও পার্ট আমি করেছি। ওই হাসি হাসতে চেষ্টা আমাকে করতে হয়েছে। কিন্তু আমি হাসতে পারিনি।

আর আশ্চর্য এই হাসি ওই মেয়েটি প্রায়ই হাসত।

বোধ হয় চন্দ্রচূড় শিবের কপালের যে এক কলা চাঁদ, তাই হলো রুদ্রশিবের কপালের মৃত্যুনীল অগ্নিশিখা। দুই-ই এক।

একটা অদ্ভুত ধরনের ধ্বক করে একমুহূর্তে খালাস করে দেওয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাপ্পা বললে—যাকগে দাদা। আমার কাছে তো ও হাসির মানের কোন হদিস নেই, ওর মধ্যে কি আছে তার কূলকিনারা নেই। কাব্য আমার মুখস্থ-করা মূলধনের মতো। কাব্য থাক। এখন, যা ঘটল তাই বলি। ওই গোলাপীর পার্ট করার কথা।

ভারতদার কাছে সব কথা শুনলাম, শুনলাম একটা পুতুলের মতো বসে ; নড়লাম না, চড়লাম না, অবাক হয়ে শুনলাম। উত্তর কি দেব ? শুধু বললাম, আমি পারব ?

ওই পার্টটা যার করবার কথা সে থিয়েটারের 'পুরনো পাপী, ঝানু আসামী'।

ওই কথা দুটো সেই প্রথম শিখলাম। ভারতদা বলেছিলেন। তিনিই আমাকে গান শিখিয়েছিলেন, পার্ট শিখিয়েছিলেন। আর নাচ শিখিয়েছিল বর্ধমান শহবেব নামকরা ড্যান্সিং মাস্টার পিয়াবা মাস্টাব। বর্ধমানের পিয়াবা মাস্টার তখন আব নিজে নাচত না, ওব নিজেব একটা 'ড্যান্সি ব্যাচ' ছিল। গোটা আষ্টেক মিষ্টি গলা গাইয়ে ছেলে নিযে তাদেব নাচ শিখিযে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ো জেলায় অ্যামেচার থিযেটারে ঠিক চুক্তি কবে নাচেব পালাগুলো চালিযে দিত। আপনি তো জানেন আপনাদের ওখানেও ড্যান্সিং ব্যাচ আসত। এদের চলতি নাটকগুলোব গান তৈবি থাকত।

আবু হোসেন, আলিবাবা, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত নাটকগুলোব নাচগান ওদেব তৈরি থাকত। গাইতও ভাল। পিযাবা মাস্টাব মাস্টাবও ভাল ছিল। যত ভালবাসত ছেলেগুলোকে তত ঠ্যাঙাতো। একখানা বেত হাতে দাঁড়িযে থাকত সামনে, নিজে নেচে দেখিযে দিযে বলত এমনি কবে নাচবি। খড়ি দিযে দাগ কেটে দিত এখান থেকে এখান, এক দুই তিন এই কোমব বেকল, এই হাত এই হলো। নাচ শিক্ষাব যা ধাবা আব কি। তবে পিয়াবা মাস্টাবেব কাছে ভুল হলে আব বক্ষে থাকত না। ওই বেত দিযে যে পাখানা ভুল পডত সেই পাযের উপব পডত শপাং কবে। নয় তো পিঠে। আর ভাল হলে বহুত আচ্ছা বে বাচ্চা বলে ছেলেটাকে জাপটে জড়িয়ে ধবে চুমো খেযে দিত। নাচ শেখানো হয তো দেখেছেন কিন্তু পিয়ারা মাস্টাবেব নাচ শেখানো নিশ্চয দেখেননি। সে দেখবাব জিনিস। নিজে নেচে দেখাতো তো বটেই তাবপবে উইংসেব ফাক থেকে হঠাৎ চেঁচিযে উঠত, এই নয়না— । ছেলেগুলো কটাক্ষ হানত। হঠাৎ চেচাত এই— এ ই মজা দোলা। ছেলেগুলো নিতম্বিনীব মতো নিতম্ব দুলিযে যৌবনেব ঢেউ তুলে দিত।

আবও একবকম কবে ইশাবায ডাইবেকশন দিত। শিস্ দিযে। মোট কথা পিয়াবা মাস্টাব পাকা লোক। প্রথম কৈশোব থেকে নাচগান শিখে থিয়েটাবে যাত্রায সখীব দলে থেকে যৌবনকালে সোলো ড্যান্স দিত। ওব নাচেব কাছে মেয়েদেব নাচ মলিন মনে হত। লোকে বলে ওব মা ছিল বর্ধমানেব মহাজনটুলীব নামকবা খ্যামটাউলী। ওব মা অকালে মারা গেলে ও ওইসব খ্যামটাউলীদেব কাছে পেটভাতায চাকবি কবত ছেলেবেলায়। তখনই ওব নাচ গানেব প্রথম শিক্ষা। বাবো বছবে ও ঢুকেছিল যাত্রাব দলে। ষোল বছরে ভবা যুবতীব পার্ট কবত।

আমাকে প্রথম দিনই দেখে বলেছিল, এ্যা! এ তো ছোড়া দেখছি খাসা ছোঁড়া বে! ছুঁড়ি সাজলে তো মাথা ঘুবিযে দিবি!

আমি চুপ কবে ছিলাম। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। খানিকটা যেন হাঁপ ধবে গিছল।

পিয়ারা মাস্টাব বলেই চলেছিল, শালা গোলাপীর পার্ট আমি প্রথম করেছিলাম বর্ধমানে রেলওয়ে বাবুদেব ওখানে। সে এক হাবামী খচ্চব ফিবিঙ্গি লাইন ইনসপেক্টর ব্যাটা পাঁড় মাতাল আমাব চোখমারা খেয়ে তো ঘাযেল। হাত ধবে টানাটানি, শেষে পবচুলো খুলে দেখাই যে আমি মেয়ে নই তবে ব্যাটা ক্ষান্ত দেয়।

পিয়ারা মাস্টারেব নাচ আমি শিখতে পারব না সে প্রথম দিন বলে দিয়েছিলাম। সেই নিযে প্রায ঝগডা বেঁধে গিযেছিল শেষ পর্যন্ত।

ভাবতদা অনেক বুঝিযেও আমাকে পিযাবা সাহেবের ছাত্রত্ব গ্রহণ করাতে পাবেননি। পিযারা সাহেবকেও বাজী করাতে পাবেননি তাব নাচেব পবিকল্পনার কিছুটা কাটছাঁট কবতে। আমাব পাযে ঘুঙুবও যেন বেতালা বেসুবো হবার জন্যে ধনুকভাঙা পণ ধবেছিল।

বডবাবু পর্যন্ত বিবক্ত হযেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটা বড অন্যায কবলে ভাবত। তুমি মিথ্যে আমাকে স্তোক না দিলেই পাবতে। তুমি কেন বললে বলতো যে ওব দ্বাবাই হবে, ইন্দু ঠিক পাববে। আমি ঠিক তৈবি কবে দেব।

ভাবতদা সেদিন লজ্জিত না হযে পাবেননি। আমি তখন নেহাত ছেলেমানুষ, সবে আসছি বামাযণেব দল থেকে, সীতাবামেব নাম কবে গান কবি, পাযে নূপুব বেঁধে বাজিযে বাজিযে চামব দুলিযে নাচি। তাব থেকে কাচুলি পবে মেযে সেজে বঙ মেখে বঙীন কাপড পবে কটাক্ষ হেনে মুচাক হেসে হেসে ঘুঙুবেব ঝুমঝুম বোল তুলে নাচাব আসবে নামা তো কম দূবেও নয, কম আলাদা কথাও নয। ব্যাপাবটা চুকেই যেত সেইখানে। সেইদিনই কথাও হলো কলকাতায কোন একজনেব কাছে লোক পাঠাবাব। সে অন্তত গোলাপীব পার্টটা কবে দিযে যাবে।

পিযাবা মাস্টাব বললে—তাব থেকে আমাব ড্যান্সিং ব্যাচেব একটাকে নামিযে দি। ছোঁডাটা নাচবে আব গোলাপী সেজে গানটা এ গাইবে।

বাত্রে এব মীমাংসা কবে দিল স্বদেশ।

স্বদেশ বললে—দাদা তুমি এই কথাগুলো শুনে এলে, উত্তব দিলে না?

ভাবত বলেছিলেন—কি উত্তব দেব?

—কি উত্তব দেবে? কেন? একটু ভেবে দেখ কি উত্তব দেবে। পিযাবা মাস্টাবটা ভালগাব লোক, ভালগাব রুচি, আমাদেব থিযেটাবেবও রুচি তথৈবচ। ভেবে দেখ না, গোলাপী মেযেটা একজন ভদ্রলোকেব বাডি ঝিগিবি কবে, বাসন মাজে, ঘব ধোয, জল আনে, ঝাটপাট দেয, সে গরীব গেবস্তেব মেযে, সে নিজে নাচওলী নয, তাব মা নাচওলী নয, তাব গলা আছে, সে একলা নির্জন পেলে গান গায, মনেব কথা সুবে বলে কিন্তু ঘুঙুব তাব নেই, সে পাযে ঘুঙুব বেধে পুকুবঘাটে গিযে ঘুঙুব বাজিযে কোমব দুলিযে 'বাদশা বেগম ঝমঝমাঝম বাজিযে চলেছি'ব মতো ঘুঙুব বাজিযে নাচে না, কটাক্ষও হানে না। বডবাবু নাটক লেখেন, তাব এটুকু কমনসেন্স নিশ্চয থাকবে। বলে দেখ তুমি। বিবহ যখন প্লে হযেছিল তখন স্টেজেব একটা যুগ ছিল। ধব যাত্রাদলে একসময জুডিব যোগ ছিল। এখন উঠে গেছে। স্টেজে যখন বিবহ হযেছিল তখন গোলাপী না নাচলেই অঙ্গহীন হত। এখন সে যুগ চলে গেছে, এখন গোলাপী একটি গ্রাম্য মেযে, বেশ একটু চঞ্চলা চপলা উচ্ছলা। এই পর্যন্ত, তাব বেশি নয। এ গোলাপীকে মোটা তাঁতেব শাডি পবিযে নামাও। গযনা শাঁখা নোযা কিংবা কাঁচেব চুডি আব গিল্টিব হার ছাডা কিছু না।

সেই আমার নাটকের প্রথম পাঠ দাদা।

স্বদেশ ছেলেটি ভারতদা থেকেও আমার অদৃষ্টের শক্তিশালী গ্রহ দাদা। ওই আমাকে কাটোয়া থেকে টেনে নিয়ে এল বৈকুণ্ঠপুর। রামায়ণের দল থেকে থিয়েটারের দলে। আশ্চর্য সহজ তর্কযুক্তি দিয়ে যে পার্টটা আমার পাবার কথা নয় সেইটে আমাকে দেওয়ালে এবং যেমনটি সে বললে—তেমনটিকেই সকলে একবাক্যে সমর্থন করে বললে—বেশ তো দেখুন না, এইভাবেই রিহারস্যাল দেখুন কেমন লাগে!

স্বদেশ বললে—তাহলে ওইভাবে দেখবেন না। ওকে গোলাপী সাজিয়ে তবে দেখুন!

তাই-ই দেখা হয়েছিল। থিয়েটারের পোশাক চুল পেন্ট এসব আসত কলকাতা থেকে, যা সব থেকে ভাল তাই আসত। তবে থিয়েটারের মোটামুটি কিছু নিজস্ব ড্রেস চুল ছিল, তা থেকেই আমাকে গোলাপী সাজিয়ে দিয়েছিলেন বড়বাবু নিজে। শাড়িখানা ছিল নীলাম্বরী। সাজিয়েগুজিয়ে আমাকে কলসী হাতে দিয়ে বললেন—দাঁড়াও দেখি ছোকরা, একটু হেলে, কলসীটা কাঁখে নাও। হ্যাঁ। একটু একটু মুচকে মুচকে হাসো। তুমি তো ম্যাট্রিক পাস করেছ হে ফার্স্ট ডিভিশনে—গানখানার মানে তো বুঝতে পারছ—

হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়!
কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়!
ফোটে ফুল গন্ধ ছোটে তায়—
তুলে নেও এখনই সে ঝরে যাবে হায়—
এলে মলয় পবন ক'দিন রয়?
আহা যৌবন বড় মধুময়!

বুঝতে পারছ তো। এখন কথাগুলো বলছ তুমি নিজেকেই। মানে গোলাপী নিজেকেই বলছে। এক কাজ কর। এই যে বড় আয়নাখানা, এই আয়নাখানার সামনে দাঁড়াও। নিজের ছবি ওই দেখ—ওকেই বল।

* * *

থেমে গেল বাপ্পা বোস।

উত্তেজনার সঙ্গে সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে আমাকে বললে—নিজের ওই মেয়ে-রূপের দিকে তাকিয়ে আমার যে সে কি হয়ে গেল তা আপনাকে কি বলব?

—হ্যাঁ, আপনাকে বলতে পারব না, বুঝাতে পারব না। আপনি তো ফিমেল পার্ট করেছেন। আপনার এমন কখনও হয়নি?

একটু প্রগলভতা বলে মনে হয়েছিল। কিছুটা উত্তাপ যেন—হঠাৎ জ্বলে ওঠা দেশলাই কাঠির মতো জ্বলে উঠতেও চেয়েছিল। কিন্তু বাপ্পা বোস উচ্ছ্বসিত হয়ে

বলে উঠল—সে আপনাকে বলব কি —আমি আয়নায় আমার ওই গোলাপী সাজা মূর্তিটির প্রেমে পড়ে গেলাম। আমি একটু হাসলাম—একটু বেঁকিয়ে দৃষ্টি হেনে দৃষ্টি দিয়ে কথা বললাম। মনে আছে তখন ভাবতদা গানখানা ধরে একবার শেষ করে এনেছেন প্রায়—দ্বিতীয়বারে তার সঙ্গে আমিও ধরব গান। ভাবতদা গাইছেন—"এলে মলয় পাবন ক'দিন রয় ? আহা যৌবন বড় মধুময়!" আমি মনে মনে ওই তেরচা দৃষ্টিটাকে নাচিয়ে ইংগিতে বলেছিলাম "বুঝেছ সখী!"

সব থেকে বড় কথা কি জানেন! আমার মেয়ে রূপের দিকে তাকিয়ে আমি একবিন্দু লজ্জা পেলাম না। আর একমুহূর্তে সব শেখা হয়ে গেল। আমার মধ্যে যা কিছু লুকিয়ে ছিল তা বেরিয়ে এল, যা ঘুমিয়েছিল তা জেগে উঠল।

ব্যাটা পিয়ারা মাস্টার বসে দেখছিল—সে বলে উঠল- ওরে শালারে। এ যে দেখি কেউটের ডেঁকা বাবা। ডিম ফুটেই দোখ ফণা ধরে দাঁড়িয়েছে! তবে হ্যাঁ জাত ভাল। আমাকে একটা খারাপ গাল দিয়ে বলেছিল ওটার ফণার চক্রখানায় বিউটি আছে বড়বাবু! খাসা করবে পার্ট। স্বদেশবাবু জিন্দাবাদ! শালা না নেচে চমক মেরে চলেই কাম ফতে করে দেবে।

* * *

ঠিক তাই হয়েছিল।

আমার একটা নেশা জেগেছিল। চোখ বুজলে আমার সেই গোলাপী সাজা ছবি দেখতে পেতাম। স্বপ্নেও দেখেছি। মধ্যে মধ্যে একলা ঘরে একখানা আয়না সামনে ধরে নিজের সঙ্গে মুচকে হেসে কথা কয়েছি। তারপর অভিনয়ের দিন গোলাপী যখন সাজলাম তখন আর কিছু মনে রইল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার হাসলাম, বারবার নিজেকে ইশারা করলাম। বুকের ভিতরটা উদ্বেগে যেন ভরে উঠল।

পার্ট করে গেলাম একেবারে সব ভুলে গিয়ে।

থিয়েটার চলছে, তখন স্টেজের ভেতর কানাকানি কথা চলছে, আমার প্রশংসা। ভারতদা খোঁড়া পা নিয়ে চেয়ারে বসে আছেন, আমার দিকে খুশি মুখে চেয়ে। বড়বাবু পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন। স্বদেশ সামনের সারিতে বসে বাহবা দিচ্ছে। পিয়ারা মাস্টার শালা থেকে শুরু করে নানা অশ্লীল গাল দিচ্ছে আমাকে, ওইটেই ওর প্রশংসা।

ছোটবাবু রামকান্ত মানে গোলাপীর নিরুদ্দেশ হওয়া স্বামীর পার্ট করছিলেন, ছোটবাবু একটু রঙে ছিলেন – মানে মদ খেয়ে পার্ট করছিলেন। স্টেজে ঢুকবার সময় একবার বললেন – এস শ্রীমতী গোলাপী, পার্ট এসেছে। পার্ট হ্যাজ কাম। পার্ট সেরে বেরুবার সময় বললেন—মাই ডার্লিং রে!

আমার কান দুটো আগুনের মতো গরম হয়ে উঠেছিল। হাত পা থেকে ঘাম ঝরছিল।

থিয়েটারের ড্রপ পড়ছে তখন আমাকে জাপটে ধরে বললেন তুই যদি সত্যি মেয়ে হতিস ডার্লিং – তাহলে আজই তোকে নিয়ে ভাগতাম আমি।

ওদিকে তখন সাহেব এসে গ্রীনরুমে ঢুকছেন।

বলা হয়নি ; এবারও সেই সাহেব আসার পালা ছিল। সাহেব-সুবোরা এসেছিলেন দল বেধে। পিক্‌নিক করবেন। দামোদরে বালিহাঁস এসেছে, হাঁস শিকার করবেন। আর বড়বাবুর নাটক দেখবেন।

এমন ক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠপুরে দু'খানা বাঁধা নাটক। বিরহ আর বিজয়িনী।

আমি জানতাম না যে এই গোলাপীর পার্ট—সেদিন যা আমি একটা আশ্চর্য নেশার ঘোরের মধ্যে দিয়ে করে গেলাম, তাই আমার জীবনের—

থেমে গেল বাপ্পা।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম।

বাপ্পা হঠাৎ আবার শুরু করলে—পাঠশালার পণ্ডিত—রামায়ণের গান থেকে বৈকুণ্ঠপুরের বাবুদের থিয়েটারে পার্ট করলাম।

গোলাপীর পার্ট আমার প্রথম পার্ট।

চুপ করে গেল আবার বাপ্পা বোস। আবার বললে— বড়বাবু চাকরি দিতে চাইলেন। বললেন—এখানে থাক। সেরেস্তায় কাজ শেখ আর আমাদের মায়ের শ্রাদ্ধের টাকা থেকে ক'টা নাইট ইস্কুল দেওয়া আছে তার একটাতে মাস্টারী কর, চাকরি হবে তোমার ভারতের আন্ডারে। খেতে পাবে আর মাইনে পাবে পঁচিশ টাকা। ভারতদা বললেন— না। ওর ভবিষ্যৎটা এমনভাবে দুমড়ে দেবেন না। ওকে কলিয়ারীতে চাকরি দিন। চাকরি করবে আর ওভারশিয়ারী পড়বে।

এ কথাটা ওই বিরহ প্লের রাত্রিরই কথা।

কথাগুলো বললে ভারতদাকে স্বদেশ। বললে—তুমি বল বড়বাবুকে। অ্যামেচার থিয়েটারে মেয়ে সেজে পার্ট—সে আর ক'দিনের ব্যাপার? তারপর কি হবে? তার থেকে তো ওর রামায়ণের দল ভাল, পাঠশালার পণ্ডিতিও ভাল। বুড়ো বয়স পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারবে।

বড়বাবু কখন যে ভারতদা, স্বদেশ আর আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারিনি। বড়বাবুর বিরহ নাটকে গোবিন্দ মুখুয্যে নায়ক সাজতেন। অভিনয় করতেন খুব ভাল। আমরা সামনে একখানা হাই বেঞ্চের উপর চায়ের সঙ্গে লুচি মাংস নিয়ে বসে খাচ্ছি। খেতে খেতেই কথা হচ্ছিল। ভারতদা বলছিলেন, বড়বাবু বলেছেন, বলো ওকে চাকরি ওর হয়ে গেল। এখানে থাকবে, তোমার আন্ডারে কাজ করবে। ফাইল রাখবে। রেকর্ড রাখবে। সন্ধ্যেবেলা নাইট স্কুলগুলো ঘুরে দেখবে। মানে ইনস্‌পেকশন। আর থিয়েটার। তুমি ওকে মনের মতো করে গড়ে তুলবে।

আমি খুশিই হয়েছিলাম। আমার খারাপ লাগেনি। বেশ একটা রঙীন জীবনের স্বপ্ন যেন দেখতে শুরু করেছিলাম। সকলেই তাকাচ্ছে আমার দিকে। চোখে তাদের একটা যেন ভালবাসার নেশার ঘোর। মনে মনে আমি তখনও গোলাপী হয়ে রয়েছি। আমার কানের কাছে ভারতদা আস্তে আস্তে কথাগুলি বলেই যাচ্ছেন। কথাগুলো

বলে বললেন—তুই তাই থেকে যা ইন্দু। তুই থাকলে আমার ভাল লাগবে রে! আর এরা লোক ভাল।

স্বদেশ বসেছিল আমার আর এক পাশে। সে বললে- -না—না—না। এ তুমি কি করে দিচ্ছ ওর? এতে ওর কি হবে? থিয়েটারে যাত্রায় মেয়ে সাজার চাকরি ক'দিনের? দশটা বছর যেতে না যেতে মুখের চেহারা হবে বুড়ুটে বুড়ুটে; হনু দুটো উঠে চোয়াড় মতো দেখাবে। তখন বাবুরা বলবেন-—যাও পথ দেখ। ওর লজ্জা থাকলে ও নিজেই বলবে—বাবুমশায় আমি বাড়ি যাই, আর আমাকে গোলাপী মানাচ্ছে না।

আমি এবার বাধা দিলাম। কথায় বাধা দিয়ে বললাম, না হে ভাই, না। তুমি ম্যাজিক দেখবে? তোমার গোলাপী-বেশ দেখে এতকাল পরে আজও আমার ভাল লেগেছে। তবে হাঁ, ষোল বছরের ষোড়শী আর আজ মনে হয় না, বাইশ চব্বিশ বছরের যৌবনবতী সুন্দরী, একটু হাস্য লাস্যময়ী মেয়ে হিসেবে খাসা মানিয়েছিল তোমাকে! ওঃ তোমার ওই বড় বড় চোখ দুটো সত্যি সত্যি ভ্রমর চোখ হয়ে উঠেছিল। এবং দুটি তিনটি কটাক্ষ, সে একেবারে মারাত্মক।

আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বাপ্পা বললে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কমপ্লিমেন্ট হয়ে রইল। কি বলব আপনাকে এতকাল পরে বুড়ো বয়সে আপনার মুখে গোলাপী রূপের প্রশংসা শুনে আমার কান দুটো গরম হয়ে উঠল।

একটু থেমে থেকে, বোধ করি একটু ভেবে নিয়ে বাপ্পা বললে তবে আজকাল যা সব মেকআপের কস্‌মেটিক্‌স্ উঠেছে তাতে, ম্যাজিক বললেন না? ওই ম্যাজিক করে দেয়। আমার মেকআপ বাক্সে খুব ভাল পদার্থ ছাড়া রাখি না। ও শিক্ষা দিয়ে গেছে আমাকে মায়াবতী যাত্রাউলী। এই বছর আষ্টেক আগে। চল্লিশ পার হয়েছি। কপালে রেখাগুলো বেশ যেন দাগ কেটে কেটে ফুটে উঠেছে। মেয়ে সেজে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের ছবি দেখে যেন মনে রঙ ধরে না। কটাক্ষের কথা বললেন না; বললেন গোলাপীর কটাক্ষ দু'তিনটি মারাত্মক হয়েছিল। সে কটাক্ষ হানতে গিয়ে লজ্জা পাই। এটা অনেকদিন পরের কথা অবশ্য—তখন কদর আমার পড়তির মুখে। বয়স বেড়েছে। গোঁফ দাড়ি কম কিন্তু বয়েসের তো একটা ছাপ আছে। তবে গান গাইতে পারি --সে দু'রকম গলাতেই পারি, মেয়েলী গলাতেও পারি।

হেসে বললে আজ তো শুনলেন। আবার পুরুষালী গলাও আছে একটা। এই ধরুন মদন কি কৃষ্ণ কি অভিমন্যু মানে কিশোর নায়ক হলে আমার জুড়ি নেই। সে আমি মেরে বেরিয়ে যাবই।

পার্টও আমি ভাল করি, গান আমার আরও ভাল --কিন্তু গাইয়ে নায়িকা হিসেবে ঠিক মানায় না, আবার পুরুষ হিরো সাজতে হলে পার্ট আপনার বরাত দিয়ে করাতে হয়। তখনই দেখা হল্লো মায়াবতীর সঙ্গে। যাত্রাউলী মায়াবতী।

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললে—আমার থেকে সে বয়েসে বড়। তার সঙ্গে পার্ট করার একটা ইচ্ছে আমার ছিল। যাত্রার বাজারে মায়াবতীর নাম ছিল মায়াবতী নয় মায়াবিনী, কেউ কেউ বলত মায়াবিনী মায়াবতী। নাচেগানে ছলায়কলায় যাকে বলে অঘটনপটিয়সী তাই। কিন্তু আমি যখন যাত্রার বাজারে এলাম বৈকুণ্ঠপুরের বাবুদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে, তখন মায়াবতী নেই, কেউ তার নাম শোনেনি। ভাগ্য আমাকে যাত্রার দলে যেন ঘাড় ধরে নিয়ে এল কিম্বা তাড়িয়ে নিয়ে এল। তাড়িয়েই নিয়ে এল, ওইটেই ঠিক। আমি একদিন ঘর ছাড়লাম, আপনার জন মা-ভাই-বোন এদের ছাড়লাম, বাবুদের দেওয়া চাকরি ছাড়লাম। সব ছেড়ে, সে একদিন রাত্রে কলকাতায় এসে উঠলাম। যাত্রার দলে ঢুকব।

কপালে আঙুল ঠেকিয়ে বাপ্পা বললে—সবই এই বুঝলেন। এ ছাড়া আর কিছু নেই। বুঝলেন না, বাবুরা আমাকে ভাল চাকরিই দিয়েছিলেন। যা বলেছিল স্বদেশ তাই। কলিয়ারীতে চাকরি, জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, মাইনে তিরিশ টাকা, তার সঙ্গে ওভারশিয়ারী পড়ার সুযোগ। ছোটবাবু নিজে কলিয়ারীতে এসে ম্যানেজারকে বলে দিয়ে গেলেন একটু নজর রাখবার জন্যে। একখানি ভাল ঘর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। বছরখানেক বড ভাল ছিলাম। ওভারশিয়ারবাবু বুড়ো মানুষ, কিন্তু রসিক—তবে বেয়াডা রকমের রসিক—

একটু হেসে বললে—ধার্মিক রসিক ব্যক্তি। সন্ধ্যেবেলা গান শোনাতে হত। শ্যামা বিষয়ক। ভেউ ভেউ করে কাঁদত। আমাকে বলত—আমি সন্ন্যাসী হব—তুই আমার চেলা হ। বুঝলি আমি কালী কালী বলব—তুই গান করবি। ভক্ত একেবারে ভেঙে পড়বে। মোটামুটি বেশ ছিলাম দাদা। মনে আশা ছিল, একদিন ওভারশিয়ারী পাস করব তারপর ম্যানেজার। সেকেন্ড ক্লাস তারপর ফার্স্ট ক্লাস। হাজারের ওপর মাইনে। মধ্যে মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর আসতাম। কলিয়ারী থেকে কোন কিছু উপলক্ষ্যে লোক আসবার হলে আমিই আসতাম।

বৈকুণ্ঠপুর এলে ভারতদার বাড়িতে থাকতাম।

ভারতদা আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, কি শিখলাম।

বলতাম ওভারশিয়ারী কতটা শিখলাম তার কথা। ভারতদা বলতেন বইটই পড়িস ? নতুন গান কি কি তুলেছিস তার খবর বল।

একবার এসে শুনলাম স্বদেশ নাকি একজন বিধবাকে বিয়ে করেছে। মেয়েটি স্বদেশী-করা মেয়ে।

ভারতদার মা কাঁদলেন আমার কাছে! বললেন—স্বদেশ বিয়েই যদি করবে তবে স্বজাতি স্বঘরে কুমারী মেয়ে বিয়ে করলেই তো পারতো! এ কি করলে বল তো! এই কি স্বদেশী-করা ?

ভারতদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমারই হয়েছে বিপদ রে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন—বেশি বিপদ হয়েছে বিণীকে নিয়ে। মেয়েটা পাথর হয়ে গেছে।

আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—জেলখানায় গোপেনের খুব অসুখ। ওকে দেখতে যেতে বললাম, ও গেল না। বললে কি জানিস—কি হবে দাদা? আমি যাব না। সংসারে কে কার বল? ব্যস ওই মুখ বন্ধ করেছে।

বিনোদিনী দিদিকে দেখলাম। বিণীদি বারান্দায় খুটিতে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে ছিলেন।

আমি প্রণাম করতে গেলাম। উনি বললেন থাক। সে কণ্ঠস্বর এমন রূঢ় যে তাকে লংঘন করা চলে না। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম অবাক হয়ে। সে মুখ এমন কঠিন, তার দৃষ্টি এত শুকনো যে আমি দু'পা পিছিয়ে গেলাম। বললাম বিণীদি আমি ইন্দ!

বিনোদিনী বললে— হ্যা। বাইরে বস গিয়ে। জলখাবার দিয়ে আসছি।

মাসখানেক পর কলিয়ারীতে খবর পেলাম ভবতদা লিখলেন বিণী বিধবা হয়েছে।

বিধবা বিণীদিকে দেখলাম পরের বার গিয়ে। থান কাপড় পরে আভরণশূন্য দু'খানা হাতে আর একপিঠ রুক্ষ চুল নিয়ে বিণীদি আরও শক্ত কঠিন হয়ে গেছে। ওঃ! তারপর। চুপ করে গেল বাপ্পা বোস।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বললে এরপর পড়ের বাবে মাথায় দেখলাম চোখ দুটো বন্ধ করে মনে মনে যেন ছবি স্মরণ করে বললে। বিনোদিনীর কি রূপ। বিণীদির সামনের দাত দুটি উঁচু একটু বড়ো শ্যামবর্ণ কিন্তু তবু সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির কি রূপ কি তনু লাবণ্য!

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

চুপ করে গেল বাপ্পা বোস

আমি কলকাতায় চলে এলাম কলিয়ারীর সকাল ছেড়ে। লোকে বলেছিল ভূত ঘাড়ে চেপেছে।

হেসে বাপ্পা বললে ভূত হবে, কিন্তু আমি ভাল কি জানি না। আমি জানি এই আমার নিয়তি। নিয়তি না মানেন তো বলব এইটেই আমার জীবনের পথ ছিল। নিয়তি ভাগ্য মুচকে মুচকে হাসতে লাগল গোলাপীর মতোই এবং ডাকতে লাগল এই পথে। আর আমি যেন অমোঘ মোহের বশেই এই পথে এলাম।

তার জন্যে আমার কোন অনুশোচনা নেই। কোন ক্ষোভ বা পরিতাপ নেই। আমি যা পেয়েছি তাতেই আমি তুষ্ট এ কথা বলছিনে দাদা। আমি কেন দুর্গাদাস হলাম না কেন উত্তমকুমার হলাম না তার জন্য আমার ক্ষোভ আছে। কিন্তু কেন আমি কলিয়ারী ম্যানেজার হলাম না, বা কলিয়ারী ম্যানেজার হয়ে টাকা জমিয়ে কলিয়ারীর প্রোপ্রাইটর হলাম না এ নিয়ে কোন ক্ষোভ আমার নেই। না তা আমার নেই।

আবার একটা সিগারেট নিয়ে ধরালে সে। এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টেনেই চলেছিল। আকাশে তারা দেখে দেখে কিছু ভাবছিল। আমার চোখে ঘুম নামছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম – বাপ্পা।

বাপ্পা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটের

আগুন থেকে সিগাবেট ধবিযে বললে—আমাব অভিনয জীবনে ওই গোলাপীব পার্টই প্রথম পার্ট। একটু চুপ কবে থেকে বললে—যেদিন কলকাতায পালিযে এলাম—মথুব শা'ব যাত্রা পার্টিতে গিযে ঢুকলাম—সেদিন ওদেব কাছে এই গোলাপীব গান গেযে কলসী কাখে নেচে নাচ দেখিযে যাত্রাতে ঢুকেছিলাম।

আবাব একটু পব বললে—আপনি আজ আবাব ফিমেল পার্ট দেখতে চাইলেন তাই গোলাপীব পার্টই দেখালাম। বেটাছেলে যখন নেচে গেযে মেযেব পার্ট কবে লোককে মুগ্ধ কবে দেয তখনই তব হয সত্যিকাবেব মেযেদেব উপব টেক্কা মেবে জিতে যাওযা। না হলে বিদ্যাসাগবে সেই বিধবা মেযেব পার্টটা তো দেখেছেন। ওসব পার্টে কিছুতেই আভযেন্স ভোলে না যে, যে পার্ট কবছে ও বেটাছেলে মেযে সেজেছে।

চুপ কবলে বাপ্পা বোস। সিগাবেট টানছিল উৎকণ্ঠা পীড়িত অস্থিব মানুষেব মতো। চাবপাশে পোড়া সিগাবেটেব টুকবো ছড়িযে পড়ে বযেছে। কোনও কোন টুকবোটা শেষ পর্যন্ত জ্বলছে। পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। মাথাব উপব দিযে একটা [illegible] উড়ে গেল, পাখাব আওযাজ পেলাম। হঠাৎ সামনেব সুদীর্ঘ দেবদারু গাছটাব কোন ডালে কোন পাখিব ছানাব আর্তনাদ উঠল। পেঁচাতে বোধ কবি আক্রমণ কবে থাকবে। আমি বললাম—এবাব তাহলে উঠি। বাত্রি আব বেশি নেই।

বাপ্পা বললে—একটু বসুন। আব একটু আছে।

বসলাম। বাপ্পা সেই আকাশেব দিকেই তাকিযেছিল। অনেকক্ষণ পব সে বলে উঠল—বৈকুণ্ঠপুব থেকে এমনি শেষবাত্রে পালিযে এসেছিলাম। এমনি কৃষ্ণপক্ষেব বাত্রি—শেষ বাত্রে একফালি চাঁদ উঠেছিল। নক্ষত্রগুলো [illegible] হযে যাচ্ছিল। আমি বৈকুণ্ঠপুব থেকে এক [illegible] অন্য এক গ্রামে প্রায ছুটতে ছুটতে পালিযে এসেছিলাম বর্ধমান স্টেশন। সেখান থেকে একেবাবে হাওড়া। পিছন ফিবে তাকাইনি। ভয হচ্ছিল—দেখব বৈকুণ্ঠপুবেব প্রান্তেব বাস্তাব ধাবে কলসী কাঁখে দাঁড়িযে আছে গোলাপী।

* * *

সোটা চৈত্র মাস। পুজো মুখে ইস্কুলেব সময।

আমাব ওভাবশয়ালী পবীক্ষা একেবাবে সামনে—মাত্র মাস দুই সময আছে মাঝখানে। হঠাৎ নোটিশ এল বৈকুণ্ঠপুবে অভিযোগ উপলক্ষ্য সাহেব সম্বর্ধনা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেব বিদায অভিনন্দন। সাহেব চলে যাচ্ছেন, যাচ্ছেন একেবাবে ভাগ্যবৃদ্ধিব কেন্দ্রে। খাস ইংবেজ এবং প্রবীণ আই সি এস বাইটার্স বিল্ডিংযে হোম ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছেন সেক্রেটাবি হযে। সাহেবকে যাবাব সময খুশি এবং পবিতুষ্ট কবে দিতে চান। সুতবাং ইস্কুলেব প্রাইজ বিতবণ কবাবেন তাকে দিযে, তাব সঙ্গে সাহেবেব গুণকীর্তন কবে শতাযু কামনা কবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কবা হবে তাকে। সেই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাতে হবে টি পার্টি; বাত্রে অভিনয। ব্যাপাব একদিনেব নয, দু'দিনেব। দ্বিতীয দিনে অশেষ অভিনন্দনেব বিশেষ অনুষ্ঠান অর্থাৎ যাব শেষ নেই এমন অভিনন্দন। সে মহিলা

সমিতি থেকে শুরু করে বৈকুণ্ঠপুর অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাব পর্যন্ত অন্তত দশখানি মানপত্রের ব্যবস্থা হয়েছিল। মানপত্রগুলি কাগজ এবং কাপড়ে ছাপানো কয়েকটি স্তবস্তুতির পংক্তি বা শ্লোক কি প্যারাগ্রাফই ছিল না—সেগুলি স্বর্ণখচিত রৌপ্যফলকে বা রৌপ্যপাত্রে খোদাই করা ছিল, যেখানেই সাহেব থাকুন বা থাকবেন, সেখানেই বৈকুণ্ঠপুরের বাবুদের কথা মনে করিয়ে দেবে এতে কোন সংশয় ছিল না।

এমন ক্ষেত্রে নতুন বই অভিনয় করবার সময়ও ছিল না এবং নিরাপদও ছিল না। বিরহ আর বিজয়িনী বৈকুণ্ঠপুরের স্টক প্লে। বিরহ হাসির বই—সাহেবরা এমন বই খুব পছন্দ করে। আর বিজয়িনী বইখানিও বড় রোমান্টিক। তারপর খোদ বড়বাবুর লেখা। কোথাও কোন স্থানে রাজনীতির এতটুকু গন্ধ নেই। নিরাপদ পৌরাণিক বই। নাটক হয়েও অপেরার মতো গান আছে। বিশেষ করে ছদ্মবেশিনী রতি আর প্রদ্যুম্নরূপে মদনের গান—খুব জমাট বই। কমেডি। বইখানা জমাটও খুব। আগে আগে যে ক'বার সাহেবদের দেখানো হয়েছে, প্রতিবারেই সাহেবরা খুব প্রশংসা করে গেছেন।

আমার নামে বড়বাবুর চিঠি এল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন. চৌধুরী লিখেছেন—You are hereby directed to come to the head office at Baikunthapur immediately for some urgent business to be completed here within fifteen days

ভারতদা চিঠি লিখলেন—ইন্দু, আমি এবার বিছানায় পড়ে আছি। তুই চলে আয়, না এলে নাচের ছেলেগুলোকে কোন মতেই মনের মতো করে নেওয়া যাবে না। আমাদের পিয়ারা মাস্টার যা খুশি তাই চালাবে। এবার নাকি সাহেব বড়বাবুকে রায়বাহাদুর খেতাব দেবার জন্য লিখে যাবে। সাহেব ভাল বাংলা বোঝে, নিজে নাকি একজন নামকরা ইংরেজ কবি। উনি লিখবেন—নিরঞ্জন চৌধরী একজন প্রজাদরদী দরিদ্রদরদী বিদ্যোৎসাহী এবং সমাজসেবী জমিদার, তার সঙ্গে তিনি একজন বাঙালী নাট্যকার। সুতরাং খুব জরুরী, তুই অবিলম্বে চলে আয়।

আমি চলে এলাম বৈকুণ্ঠপুর। তখন সামনে আমার ওভারশিয়ারী পরীক্ষা হলেও থিয়েটারে পার্ট করবার একটা নেশা লেগেছে। কলিয়ারী ফিল্ডে তখন এখান-সেখান থেকে ডাক আসে। খাতির করে। তাছাড়া সেই নেশার ঘোর যেন বেড়েছে। নিজে ফিমেল পার্টের মেকআপ নিয়ে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে হাসি, তাকে সখী বলে ডাকি।

এর একটা আশ্চর্য নেশা আছে। সেইবারই আপনাদের এখানে এসেছিলাম সেই ঘোড়ায় চড়ে গিল্টির বালা হাতে দিয়ে।

নিয়তি তখন তার সুতোয় টান দিয়ে এই পথে টানছে।

* * *

বর্ধমানে তখনও ঘোড়ার গাড়ির ভিড় ছিল। বেলা দেড়টায় নেমে একখানা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছিলাম।

তখন আমি বেশ বাবু হয়েছি। রঙীন জীবনের বোধ হয় একটা বিলাসিতা আছে। জীবনে নানা দিক থেকে রঙ এসে লাগে, সে কথা তো আপনাকে বলতে হবে না, আপনি জানেন; আমি এইটুকু সাহস করে বলছি যে, যেদিকে কি যে পথে হেঁটে মানুষ রঙ্গমঞ্চের অভিনযের জীবনে পৌঁছে যায় সে জীবনে রঙ যেন বেশি বেশি ছড়ানো আছে। আগের কালে নাকি বড় বড় জমিদার বাড়িতে হোলিতে নাচের আসর পড়ত।

বাপ্পা বোস বললে—ভারতদাব কাছে শুনেছি, বৈকুণ্ঠপুরের বড়বাবু বলেছিলেন তাকে। নাটমন্দিরে প্রথম সতরঞ্চ পেতে আসর বিছানো হত, তারপর নাচের যেটুকু আসব, সেইটুকুতেই দু'আঙুল পুরু করে আবীর ঢেলে সমান করে বিছিযে তার উপব মিহি লাল রঙের চাদর পাতা হত।

উপরে ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে বাতি জ্বলত। শামাদানগুলির ফানুসগুলিও হত রঙীন। লালই বেশি। তারপর ওই আবীবের উপর চাদর বিছানো আসরে নাচওয়ালীর ঘুঙুর বাধা পা পড়ত। ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম থেকে পা যত পড়ত দ্রুত এবং জোরে ততই নীচে থেকে উপর দিকে আবীর উঠত লাল কুযাশাব মতো কি ধোঁযার মতো। আসরটা নাটমন্দিবের ছাদ থেকে নীচেব মেঝে পর্যন্ত লাল হযে যেত। যাবা নাচত তারা রঙে রঙীন হত, যাবা শুনত তারাও রঙীন হযে উঠত। সব লাল সব রঙীন।

ভাবতদা সেবার আমাকে দেখে এই গল্পটাই বলেছিলেন। আমি প্রথমেই গিযে উঠলাম ভারতদাব বাড়ি। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ, সামনে সংক্রান্তি, বেলা দুপুর গড়াচ্ছে, ভারতদা আমার হোল্ডঅল আমার চামড়াব স্যুটকেস আমাব গাযের বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পাযের জুতো সব কিছুব উপর চোখ বুলিযে আমার জামা রুমালে লাগানো সেন্টের গন্ধ শুঁকে হেসে বললেন, বড্ড বাবু হযে গেছিস বে ইন্দু!

লজ্জা পেযেছিলাম। মাথা নীচু করে অপ্রতিভের মতো হেসেছিলেম। তাছাড়া কি করারই বা ছিল।

ভাবতদা হেসে বলেছিলেন— সুন্দরও হয়েছিস রে। এই তো কার্তিকে বাস গেছে। তখন যেন গাযে রঙ ধরেছিল তবে সেটা চোখে পড়ার মতো নয। এবার এই ছ'মাসেব মধ্যে তা আঙুলখানেক কি তারও বেশি বেড়ে গেছিস। গোঁফের রেখাটি বেশ স্পষ্ট হয়েছে। কলিয়ারীতে থেকেও রঙ ফবসা হযেছে।

আবারও হেসে বলেছিলেন—আর বছরখানেক বছব দুযেক পর বোধ হয তোকে ফিমেল পার্টে মানাবে না।

তাবপর বলেছিলেন—বাড়িতে টাকাকড়ি নিযমিত দিস তো?

তা আমি দিতাম। সে খবর ভারতদাও রাখতেন। বৈকুণ্ঠপুর বর্ধমান থেকে আমার গ্রাম বেশি দূর নয, বর্ধমান কাটোয়া ছোট লাইনেব ট্রেনে ঘণ্টা দুই লাগে; সেজ ভাইটা মধ্যে মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর আসত দাযেটায়ে ঠেকে। আসত ভারতদার কাছে, ভারতদা দাযের কথা জানাতেন বড়বাবুর কাছে। একবার বাকি খাজনার নালিশ করেছিল জমিদার, শো টাকাব ডিক্রি, বড়বাবু শুনে কাটা দিযে আমার মাইনে থেকে কেটে দিযেছিলেন।

আর একবার এসেছিল ক্লাসে ফেল করে পড়া ছেড়ে চাকরির জন্যে। বড়বাবু সেটা দেননি। বলেছিলেন বাড়ি গিয়ে চাষবাস করো। এই থিয়েটারের সময়ও ভাইটা এসেছিল থিয়েটার দেখতে। থিয়েটারে ঢুকবাব মতলব তারও ছিল। কিন্তু আমার মূলধন তার ছিল না।

যাকগে। যা বলছিলাম, ভাবতদা জানতেন যে, আমি বাড়িতে টাকা নিয়মিতই পাঠাই। উত্তবে আমি বললামও তাই। বললাম —তাহলে আপনি খবব পেতেন না ?

একটু চুপ কবে থেকে ভাবতদা বললেন, তা পেতাম। কিন্তু ভয করে। কেন কবে বা কবছে জানিস। তোব গাযে মনে যে বঙটা ধবেছে দেখছি তাই- —দেখে ভয কবছে। বঙ সব জীবনেই আছে। সে সন্ন্যাসীব জীবনেও আছে, বৈষ্ণব বৈরাগীব জীবনেও আছে। কিন্তু এই বঙচঙ মেখে সাজগোজ কবে এই যে যাত্রা থিযেটাবেব জীবন, এ জীবনে বঙ হোলিব দিনেব বঙেব আসবেব মতো।

আমি চুপ কবেই ছিলাম। কি বলব।

ভাবতদা বলেছিলেন, আমাব উপব বাগ কবলি না তো ?

ঘাড নেড়ে জানিয়েছিলাম—না। অথচ বাগ আমাব হযেছিল। মনে মনে ঠিক কবেছিলাম সন্ধ্যেবেলা বাবুদেব ওখানে চলে যাব।

ভাবতদা বলেছিলেন, বাস্তাঘাটে কাদা আলকাতবা মাখা সস্তা বঙ মাড়া হোলিব কথা বলছি না, ইন্দু, বলছি বাবুদেব বাড়িতে পুবনো কালেব হোলিব আসবেব কথা। জানিস ? এঁদেব বাড়িতে সে কালে আবীবেব আসব হত। মণ দশেক আবীব আসত ; সেই আবীবে আতব মাখানো হত, তাব সঙ্গে গোলাপজল, তাবপব

ওই গল্পটা বলেছিলেন ভাবতদা।

মনে হয়েছিল আমাকে একটু খুশি কবতে চেয়েছিলেন ভাবতদা। কিন্তু না।

একটু চুপ কবে থেকে বাপ্পা বললে- ভাত খেতে খেতে বললেন কথাটা ভাবতদা। আমাদেব কথাব মধ্যেই বাইরে থেকে মেয়েব গলায কথা শুনলাম, দাদা।

একটু রুক্ষ এবং বিবক্ত কণ্ঠস্বব। ভাবতদা চমকে উঠে বললেন- বিণী !

— কতক্ষণ ভাত আগলে বসে থাকব বল ?

ভাবতদা বললেন —ও হো হো ! বড্ড ভুল হযে গেছে! চল তুই খেযে নিবি চল ভাই। তুই বোধ হয জানিস নে। মাযেব ডান দিকটা পড়ে গেছে। বাড়িতে বিণী একা। ওব শবীব ভাল যায না। দেখে এখন ওকে চেনাই যায না! চল, খেয়ে নিবি চল।

—স্নান কবতাম যে দাদা !

—সে বিকেলে কি বাত্রে কববি। এখন খেয়ে নে। বিণীকে ছুটি দে। তোব জন্যে আমিও বসে আছি, আমি খাইনি বলে বিণীও খাযনি। তুই ববং মুখ হাত ধুয়ে নে, নিযে খেতে বস।

খেতে বসে চমকে উঠলেম বিণীদিকে দেখে। বিণীদির চেহারা যেন কত পাল্টে

গেছে। লম্বা মনে হলো—বোগা হযে গেছেন। মুখেব চেহাবা কোথায় পাল্টেছে প্রথম বুঝিনি। পবে বুঝলাম বিণীদি চুল কেটে ফেলেছেন।

থান কাপড পবে বিণীদি একদৃষ্টে উঠোনেব কোন একটা কিছুব দিকে তাকিয়ে দাঁডিযে ছিলেন বান্নাঘবেব দবজাব পাশে। আমি বাববাব তাব দিকে তাকিযে ভাবছিলাম বিণীদি কোথায পাল্টেছেন। হঠাৎ বিণীদিব দৃষ্টি আমাব দৃষ্টিব সঙ্গে মিলল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টেই তাকিযে বইলেন তাবপব এক সময মাথাব ঘোমটাটা খসে কাঁধেব উপব পডতেই দেখলাম বিণীদিব চুল কাটা। কাঁধেব ওপব আব নেই। বিণীদি খসে-পড়া ঘোমটাটা আবাব মাথাব উপব তুলে দিযে ঘবেব মধ্যে ঢুকে গেলেন।

আমি বলেই ফেললাম —বিণীদি চুলগুলো কেটে ফেলেছেন ? সেই অমন সুন্দব চুলেব বাশ ?

ভাবতদা বললেন —আমাদেব দেশ আমাদেব সমাজ যে ইন্দু! ওব দেওবেবা ওই চুলেব জন্য নানান খাবাপ কথা বলছিল। তাই একদিন নিজেই বঁটি দিযে কেটে ফেললো।

… মি বঁটি দিযে ?

হ্যাঁ। খুব ধাবালো বঁটি ছিল একটা। সেইটে নিযে বাঁ হাতে চুলেব মুঠো মাথাব উপবে তুলে ধবে বটি দিযে কাটছিল। মা দেখে চিৎকাব কবেছিল। তাবপব কাঁইচি দিযে আমি কেটে দি।

বুকটা আমাব টনটন কবে উঠেছিল বিণীদিব চুল কাটাব কথা শুনে।

বিণীদিকে কেমন যেন আমাব একটা ভয কি সংকোচ একটা কিছু ছিল। ভাবতদা সেই যে বলতেন বিষন্ন করুণ স্তব্ধ বেদনাব মৌন গভীবতাব মধ্যেই হলো ওব জীবন। ঠিক তাই মনে হত। আবও কিছু মনে হত আমাব। কোথাও যেন আগুন আছে। চুপচাপ মুখ বুজে কাজ কবে যেতেন। মাযেব সঙ্গে আগে কথা বলতেন শুনতে পেতাম। মা এখন পক্ষাঘাতে পডে আছেন, বোবাব মতো চিৎকাব কবেন। বিণীদি কথা বলেন না। যখন বলেন তখন একটা কথা উচ্চ চিৎকাব কবে বলেই থেমে যান। আমাব ভয কবত।

দুটো একটা কথা বলতেন – তুমি চান কব।

কিম্বা খাবে কখন বল তো!

স্বদেশেব কথা উঠলে টর্চেব শিখাব মতো জ্বলে উঠেই নিভে যেত।

কখনও বিণীদিকে জিজ্ঞাসা কবতে পাবিনি আমাব পার্ট কেমন লেগেছে।

এবাব বিণীদি আমাকে বললেন - তোমাব পার্ট এবাব খুব ভাল হয়েছে ইন্দু!

বিস্মযেব অবধি বইল না। আনন্দেব সীমা বইল না। বললাম—ভাল লেগেছে আপনাব ?

বিণীদি বলেছিলেন— মেযেদেব এমন সুন্দব গোলাপী মানাতো না!

আমাব মনে পডে গেল গ্রীনরুমেব বড আযনাটাতে আমাব গোলাপী সাজা ছবি।

না, ছবি নয় ; ছবি হাত-পা নাড়ে না, হাসিব সঙ্গে হাসে না, কটাক্ষ কবাব উত্তবে কটাক্ষ হানে না। আয়নাব প্রতিবিম্ব মানুষেব বচনা কবা বিচিত্র মায়াব মায়াবিনী।

সে মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল আমাব দিকে তাকিয়ে।

বিনীদি এবই মধ্যে কখন চলে গিছলেন। আমাব যখন মোহ ভাঙল তখন তিনি ছিলেন না।

বলতে চেয়েছিলাম চুলগুলো কেন কাটলেন বিনীদি? বলুক না, যে যা বলে বলুক। কথাটা বলবাব ইচ্ছে মনেব মধ্যে বীজ থেকে ওঠা চাবাব মতো গজিয়েছে সেই প্রথম দিনই। পাতাব পব পাতা মেলে বাড়ছেও নিত্য নিত্য। আজ বলবাব জন্য চেষ্টা কবলাম। কিন্তু হলো না।

সেই বাত্রেই আমি বৈকুণ্ঠপুব ছেড়ে চলে এলাম।

পালিয়ে এলাম। চোবেব মতো। না চোবেব মতো নয়। ভীরু কাপুরুষেব মতো। না তাই বা কেন হবে? তাও না।

ভবতদাব বোন বিনীদি। তাব জীবন —।

না, জীবন নয়। জীবন কি কবে বলব?

তাব সামাজিক চবিত্র, তাব শত কৃচ্ছ্রসাধন কবে শত দুঃখ ববণ কবে অর্জন কবা পুণ্যবল, তাব গৌবব, এসবেব গায়ে আমাব বঙমাখা হাতেব স্পর্শ দিয়ে ছাপ একে দেওয়া কি উচিত হত?

না হত না।

সেইজন্যে পালালাম। শেষ বাত্রে। ঠিক আজকেব বাত্রিব মতোই বাত্রিটা বলে বেশ মনে পড়ছে। সেদিনও ছিল এমনি কৃষ্ণপক্ষেব শেষেব দিকেব কোন তিথি। আকাশেব দিকে তাকালে বলল্লা। তাবপব বললে, দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী হবে আজ। চতুর্দশী নয়। হ্যাঁ, এমনি দু'কলা কি তিন কলা চাঁদ ছিল আকাশে। ছোট ছোট অনুজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো মিলিয়ে গেছে। পুব আকাশে ঘষা ঘষা ভাব দেখা দিয়েছে। চাঁদ খুব উজ্জ্বল নয়। এমনই ছিল সে বাত্রিটা। আকাশেব দিকে সে তাকিয়েই ছিল। আমিও তাকালাম আকাশেব দিকে।

আকাশে বাদুড় উড়ছিল। কোন গাছে প্যাঁচা ডাকছিল।

কোথাও সাপে ধবা কি প্যাঁচায় ধবা কি বনবেড়ালে ধবা পাখিব ছানা চেঁচাচ্ছিল। গ্রামেব ধাবেব বটগাছটায় চৈত্র মাসেব মাতাল কোকিল চেঁচিয়েই চলেছিল। পঞ্চমেব তান।

এবই মধ্যে উঠে আমি—।

আমাব মনে হলো অন্ধকাবেব মধ্যে আমাব সেই গোলাপী সাজা আমি কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে আমাবই দিকে তাকিয়ে হাসছে।

আমি আমাব জামাটা পবে নিয়ে জুতো জোড়াটা হাতে নিয়ে মাথাব কাছে একটা ছোট ব্যাগ ছিল সেটা নিয়ে আস্তে আস্তে দবজা খুলে পালালাম। ছুটলাম। ছুটে

গ্রাম পেরিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটা দিলাম। এসে উঠলাম বর্ধমান। সেখান থেকে কলকাতা।

দাদা আমার ভয়ের আর শেষ ছিল না।

আমার নিজেকে সম্বরণ করবার শক্তি ছিল না—না, ছিল না। অথচ আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম; আমি তখন পুরুষ।

বাপ্পা বোস থেমে গেল।

আর একটু পরে বললে—বিণীকে আমি ভালবেসেছিলাম। পালিয়ে আসা ছাড়া আমার পথ ছিল না।

বিণীকে আমি ভয় করতাম প্রথমটা। কিন্তু সেটা ভয় নয়। ভালবাসাই সেটা। বুঝতে পারলাম সেই দিন। চুল কাটা রোগা আগুনের মতো জ্বলন্ত বিণী আমাকে প্রশংসা করে বললে মেয়েদেরও এমন সুন্দর গোলাপী মানাতো না। এই এতটুকুর মধ্যেই যেন একটা মস্ত নাটক লুকোনো ছিল। ওই একটা ছোট্ট কথার মধ্যে যেন অনেক কথা লুকোনো ছিল।

ভাগ্যকে কেউ এড়াতে পারে না।

আপনি শুনে হয় তো হাসবেন। আপনারা মানে বড়লোকেরা—লেখক, সায়েন্টিস্ট, পণ্ডিত, এরা সব ভাগ্যটাগ্য মানেন না। খুঁজেপেতে, কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বের করার মতো কারণ বের করেন। তাই বা কেন, এ কালে অধিকাংশ লোকেই ভাগ্য মানে না। আমি কিন্তু মানি। আমার ভাগ্য অ-দৃষ্ট নয় দাদা। আমার ভাগ্য দৃষ্ট, তাকে আমি দেখতে পাই। সে আমার আগে চলে এবং ফাঁদ পেতে পেতে চলে—আমি সেই ফাঁদে পা দিয়ে জড়িয়ে পড়ে জট পাকিয়ে পাকিয়ে চলি।

মথুর শা'র যাত্রার দলে 'হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়' গানটা গেয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। পার্ট বলালে তাও বললাম। খানিকটা করা পার্ট ওদের শুনিয়ে দিলাম। বড়বাবুর বিজয়িনী বইতে করতাম রতির পার্ট, তাই বললাম। ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা; চারবার করা পার্ট আমার মুখস্থ ছিল ছেলেবেলায় ইস্কুলের পড়ার মতো; আবৃত্তিও হয়েছিল ভাল, সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেল। কালটা চল্লিশের আগে, যুদ্ধ আরম্ভ সদ্য হয়েছে কি হব হব করছে কিন্তু আমাদের দেশে তার বিশেষ সাড়া-শব্দ নেই। একশো এগারো মাইল রাস্তার ট্রেন ভাড়া তখনও এক টাকা ন'আনা, পোস্টকার্ড তখন তিন পয়সা, খাম বোধ হয় পাঁচ কি ছ'পয়সা। খামে চিঠি লিখতাম না, লিখবার লোক ছিল না।

মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে হলো—তিনটে নতুন বই হচ্ছিল তার তিনটেতেই পার্ট আমি পেলাম। তিনটে পার্টেই ওই গাইয়ে হিরোইনদের পার্ট। ওই রতির মতো গোলাপীর মতো পার্ট। প্রথম বছরেই, দলের লোকেরা বলত—'মরশুম', প্রথম মরশুমেই নাম হয়ে গেল আমার। গান আর চেহারার প্রশংসাই বেশি—পার্ট করার প্রশংসা সেও

কম না, তবু তুলনায় প্রথম দুটোর কথাই বলত বেশি। দলে গুরুও মিলে গেল ভাল। অল্প বয়েস, বছর বত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, দলের হিরো। মদ খেতেন, নারীতে ভয়ানক আসক্তি ছিল। অধিকাংশ দিনই রাত্রিকালে হারিয়ে যেতেন। তবে কোন স্থানে এক হপ্তার বেশি আট্‌কা থাকতেন না। বলতেন—

এমন নায়িকা কোথা, যে পারে বাঁধিতে মোরে,
আমি যে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অসংখ্য পুরুষ মাঝে—।
ভ্রমরের মতো আমি পুষ্প মধুর নিঃশেষে করিয়া পান--
চলে যাই পুষ্পান্তরে।

কিন্তু আমাকে মদ খেতে কোন দিন বলেননি। বারবার বারণ করেছেন---বলতেন—খবরদার ইন্দু। আমাকে বলতেন ইন্দুমুখী। সখী বলে ডাকতেন। বলতেন—-খবরদার সখী, খবরদার। ও বিষ খাসনে। কদাচ না। আর মেয়েদের বাজারের রাস্তা মাড়াবি নে। তোকে শেষ করে দেবে।

কাহিনীতে ছেদ টেনে আমাকে (লেখককে) লক্ষ্য করে হঠাৎ বললে বাপ্পা বোস, অনেকটা আপনার মঞ্জরী অপেরার রীতুবাবুর মতো। তবে রীতুবাবুর মতো এতখানি উদার নয়। একটা দোষ ছিল—মার হাতের দোষ। হঠাৎ মারতে আরম্ভ করত। দেহে শক্তি ছিল; ডন বৈঠকীও করত। তবে মদ খেতো তো। নিয়মিত কিছু করত না কিন্তু তাতেই দেহখানা যেমন শক্ত ছিল তেমনি গড়নখানাও ভাল ছিল। ধাঁই করে হঠাৎ চড় বা ঘুষি মেরে বসত। মারত মেয়েদের বেশি। দলে মেয়ে ছিল না। যাত্রার দলে মেয়েরা তখনও ঢোকেনি। দলের মালিকপক্ষ ঝঞ্ঝাটের ভয়ে মেয়ে অ্যাক্ট্রেস নিতেন না। আমাদের কর্তা বলতেন—সুন্দ উপসুন্দ তিলোত্তমা নিয়ে যাত্রায় পেলে করি সেই ভাল। আসরের বাইরে ও নিয়ে কারবার আমাদের বাবাদেরও সাধ্যি নাই। ইনিও যাত্রার দলে মেয়ে নেবার খুব বিরোধী ছিলেন। মানে আমার গুরুর কথা বলছি।

আমি বললাম— তা এতক্ষণে বুঝলাম কিন্তু তাঁর নামটা বলো।

বাপ্পা বললে—কৃষ্ণবিনোদ নাম। যাত্রা দলের অর্জুন সেকালের। উনি এখনও বেঁচে আছেন। এ সবের পালা-টালা শেষ করে প্রায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। যাত্রার দলে মস্ত নাম হয়েছিল। উনি বলতেন—-মেয়েরা পার্ট করতেই পারে না। ওদের যা কিছু পার্ট তা সাধারণ জীবনে। সবই ওদের পার্ট। ভাইফোঁটা দেয় তার পার্ট করে, ফুলশয্যায় আসে সেও পার্ট করে, ও তোমার সাবিত্রী ব্রত, হরিচরণ ব্রত করে তাও পার্ট করে, ভাত রাঁধতে গিয়ে ফোস্কা পড়ায়, তরকারি ছুঁকতে গিয়ে দুটোর জায়গায় চারটে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে নিজে কেশে সারা হয়, যারা আশেপাশে থাকে তাদের কাশায়। কি লঙ্কার বীজ ফাটিয়ে হাতে ফেলে, কি মিষ্টি বেশি দেয় তাও পার্ট করে। ঘোমটার ফাঁক থেকে তাকায় সে তো আঠাবো আনা পার্ট। কিন্তু আসরে নামলে

কি স্টেজে নামলে আলোনা আ-তেলা নিছক হবিষ্যির মতো ব্যাপার। দূর দূর। তারাসুন্দরী কুসুমকুমারী তিনকড়ি প্রভা-টভা ও ওই একটা করেই। দুটো হয় না।

উনিই আমার নাম দিয়েছিলেন বাপ্পা বোস।

বাপ্পারাও নাটকখানা আনলেন উনিই। আর আমাকে দিলেন ছেলে বাপ্পার পার্ট। বড় বাপ্পা উনি নিজে করেছিলেন।

সেটা দু'বছর পর। গুরু দলেব ম্যানেজার হয়ে গেলেন। সর্বেসর্বা। বাপ্পারাও বইখানা তিনি আমার জন্যেই নিয়েছিলেন। একজন নতুন নাট্যকার পেয়েছিলেন মিনার্ভা থিযেটাবেব সামনে ফুটপাথের উপর। ভদ্রলোক বইখানার পাণ্ডুলিপি বগলে নিয়ে সন্ধ্যে থেকে মিনার্ভাব সামনে দাঁড়িযে থাকত ; মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হলে বিডন স্কোযাবের মধ্যে ঢুকে কোন বেঞ্চে বসে বিশ্রাম করে নিত।

কৃষ্ণবিনোদদাব কযেকটা সন্ধ্যের আসব এবং রাত্রিব বাসর ছিল। বিডন স্কোযাবের সামনের গলিগুলোব মধ্যে। সেখানেই আলাপ। বইখানা শুনে ওঁর ভারী পছন্দ হয়েছিল ; পাঁচ অঙ্কের প্রথম তিন অঙ্কে বাপ্পা ছোট। প্রথম অঙ্কে একেবাবে শিশু। পার্ট ছিল বাপ্পার মাযের। তারপর দু' অঙ্ক বাপ্পা কিশোব। তাবপর যৌবনের শেষ থেকে শেষ। সে বাপ্পা দিগ্বিজযী নারীবিলাসী। কাবুল কান্দাহার বলখ বাদাকশন বিজযী বাপ্পারাও সে প্রায দিবাবাত্রি নাবীবেষ্টিত হযে বসে থাকে। কেষ্টবিনোদদার পার্টটা খুব পছন্দ হযেছিল। বলতেন—প্রাণেব কথা খুলে লিখেছে আমার। একটা জাযগায ছিল—

> "বেহেস্ত চাহি না আমি। বেহেস্তেব
> কোন প্রযোজন? কোন সুখ আছে সেথা?
> কোন গান আছে কোন আলো আছে—
> কোন নারী আছে সেথা, যারা—
> দুনিযার মাটিব বুকের এই সুখ, এই গান,
> এই আলো, এই মাটি জল পুষ্পপেলবতা দিযে গড়া।
> জ্যোৎস্নার চেযে স্নিগ্ধ এই ধবার নাবীব চেযে মিষ্ট।
> দীপ্ততর? স্বর্গ? মন্দাকিনী? বৈজয়ন্তী ধাম?
> মেনকা উর্বশী? সোমরস? পাবিজাত?
> কি হবে এসবে মোর? ধরণার রমণীয়
> নযনের লবণাক্ত জলে সিন্ধু উথলায়।
> মদিব কটাক্ষে হাস্যে, শুক্লপক্ষ কলায কলায়---
> বিকশিযা উঠে প্রতিপদ হতে সেই পূর্ণিমা অবধি।
> এ কোথায় পাবে বল উর্বশী মেনকা?

এসব জাযগায় যখন অ্যাকটিং করতেন কেষ্টবিনোদদা তখন আসব মাতাল হযে যেত। পার্টটা অনেকটা নিজের মতো করিযে নিয়েছিলেন। তা হলেও আমার যেটুকু কিশোর বাপ্পারাওয়েব পার্ট সেটুকু লোকেব আরও ভাল লাগত। বাপ্পাবাও থেকে

বাপ্পা বোস নামই হয়ে গেল আমার। কেষ্টবিনোদদা খুশি খুব হননি। আবার অখুশিও হয়নি ঠিক। তবে আমাকে ডেকে বলেছিলেন—

—তুই শালা সাবধান হয়ে যা রে ছোঁড়া। বুঝলি ?

আমি কিছুই বুঝিনি, হাঁ করে দাঁড়িয়েই ছিলাম। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করছিল ভয়ে। কেষ্টবিনোদদা আমাব কাছে ছিলেন দেবতার মতো। আমার আশ্রয়দাতা, ভয়ত্রাতা, শিক্ষাদাতা, সব ছিলেন কেষ্টবিনোদদা।

একটা ছেদ দিয়ে একটু ভেবে নিয়ে বাপ্পা বোস বললে—কয়েকটা কথা বলেনি। এই দু'বছরের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল—

আপনাআপনিই ঘটে যাওযার মতো ঘটে যাওয়া। আমার কোন হাত ছিল না; অথচ ঘটে গেল—এবং ঘটে গিয়ে আমাকে আমার জীবনপথে একলা দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল। আমাদের বাড়িঘর পৈতৃক জমি যা কিছু ছিল তা সব নিলেম হয়ে গেল বাকি খাজনার দাযে। সেটা ডেকে নিলে আমার ভগ্নীপতি। একটা বোন ছিল, সেটা বড হযে উঠেছিল, হঠাৎ তার বিয়ে হযে গিযেছিল, আমার জ্যাঠতুতো বোনেব দরুন ভগ্নীপতিব সঙ্গে বিযে হযে গিযেছিল বিনা পণে। জ্যাঠতুতো বোন মারা গিযেছিল একটি ছেলে ও একটি মেযে রেখে। লোকটি নিজে ছিল কাটোযার মহাজনের গদির কর্মচারী। আইন-আদালত করাই ছিল তার কাজ। মা আমাকে লিখলেন--'টাকা পাঠাও, জমি নিলেমে উঠেছে।' আমি টাকা পাঠালাম, মা টাকাটা জামাইযেব হাতে দিলেন। জামাই সেই টাকাটার সঙ্গে নিজের টাকাকডি জোগান দিয়ে জমি বাডি সব ডেকে নিলে।

একটা সিগাবেট ধরিয়ে বাপ্পা বোস বললে—এটা ঘটেছিল, বৈকুণ্ঠপুরের ওদের কলিযারীতে চাকরি করার সময়ে। টাকাটা পাঠিয়ে নিশ্চিন্তই ছিলাম। বোনেব বিয়ে হওযার খবব পেয়ে খুশি হইনি। হঠাৎ বিযে হযে গিয়েছিল। লোকটির বযস বেশি, খুব ফোঁটা তিলক কাটে; মামলা-মকদ্দমার ঘুণ; লোকে বলত নিশি মিত্তিরেব হাডে পাশা হয; উকিল-মোক্তারের কান কাটার মতো ক্ষুরধার বুদ্ধি ধরে নিশি।

আমার জ্যাঠামশায় আমাদের হিতৈষী ছিলেন না। জ্যাঠতুতো বোন মারা গেলে তার গহনাব কিছুটা গাযেব করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিশি জামাই উকিল-মোক্তারের কানকাটা নিশি; সে আমার মায়ের সঙ্গে যোগসাজস করে তাঁকে সাক্ষী মেনে মকদ্দমা করে গয়না উদ্ধার করেছিল। প্রত্যুপকার করে বিয়ে করেছিল মায়ের কন্যাটিকে। তারপর এই আমাদের জমি-বাড়ির বাকি খাজনার মামলায় সব ভার নিজে নিয়ে মাকে বললে সম্পত্তিটাকে শুদ্ধ করেনি। নীলাম করিয়ে আপনার নামে ডেকেনি। শ্বশুরের শুনি আরও পাওনাদার আছে।

মা রাজী হয়েছিল এক কথাতেই।

মেয়েরা বোধ হয় মেয়েদের পক্ষপাতী বেশি। মা আমার তখন মেয়ে-জামাই নিয়ে প্রায় হরগৌরী কি লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায় মজেছেন।

ভাল করে বেনাম করতে বা বেনাম যাতে ধরা না যায় তাই করতে সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত ডাক হলো নিশি জামাইয়ের নামে।

প্রায় বছর খানেক পরে যখন জানলাম—তখন নীলাম শুদ্ধ হয়ে গেছে। নিশি জামাই জমি দখল করে নিয়েছে। মা নীরবে বিনা বাক্যব্যয়ে কন্যার ঘরে গিয়ে পাকশালের ভার নিয়েছেন। মেজ ভাইটা একদিন মায়ের কপাল লক্ষ্য করে হাতের গেলাস ছুঁড়েছিল ; মা কপাল কেটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ভাইটা সেই অবধি নিরুদ্দেশ।

শেষের এগুলো যখন ঘটে তখন আমি কলকাতায় যাত্রার দলে এসে ঢুকেছি।

এদিকে বৈকুণ্ঠপুরে ঘটে গেছে ইন্দ্রপাত।

বড়বাবু হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। ছোটবাবু মদ খেতেন লুকিয়ে, এখন দুরন্ত মাতাল হয়েছেন। বড়বাবুর ছেলেরা অন্য মতের লোক। শুধু ব্যবসা বোঝেন। তাঁরা থিয়েটার উঠিয়ে দিয়েছেন। থিয়েটার উঠে গেছে। ভারতদা তার মাকে নিয়ে কাশীবাসী হয়েছেন। বোন বিণী নেই।

সে নাকি নিরুদ্দেশ হয়েছে।

ড্যান্সিং মাস্টার পিয়ারা মাস্টারের সঙ্গে একদিন রাত্রে উঠে কোথায় চলে গেছে।

স্বদেশ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে চরকা আর তাঁত খুলে আশ্রম করেছেন। কারবারটা খদ্দরের নয়—রেশমের। বাকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের ওদিকে তার আশ্রম।

আর এই দু'বছরে আমি কেষ্টবিনোদদার হাত ধরে বেশ নাম করে ফেললাম। নাম হলো কিন্তু কেষ্টবিনোদদা বললেন—তুই সাবধান হ—ইন্দু।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন দাদা ?

কেষ্টবিনোদদা বললে—তুই গোলাপী থেকে বাপ্পারাও হয়ে গেলি। মানে বুঝিস্ ? দিন কতক পর মেয়ের পার্ট করতে তোরও মন উঠবে না। আর যাত্রা দলের কর্তারাও দিতে চাইবে না। শিখণ্ডীর অবস্থা হবে রে।

সেই ভাসলাম, বৈকুণ্ঠপুরের ঘাট থেকে নোঙর ছিঁড়ে কাণ্ডারীহীন নৌকোর মতো যাত্রার এই স্রোতে ভাসলাম। ঘরদোর নীলেম হয়ে গিয়েছিল। নিয়েছিল ভগ্নীপতি, কিন্তু সেটা কোন সান্ত্বনা ছিল না। ভাইটা চোর হয়ে গেছে। মানে লোক ঠকিয়ে খায়। তার থেকে এ খুব ভালো লাগল। লাগল কেন— লেগে রয়েছে। যাকে সঙ্গে যাওয়া বলে সেই সঙ্গে গিয়েছি। যাতে মানুষের সাফল্য আসে তাতেই সে মজে দাদা। সেইটেই বোধ হয় তার পথ। এক এক সময় মনে হয় এই পথের জন্যই বিধাতা আমাকে তৈরি করেছিলেন।

কেষ্টবিনোদদা বলতেন—তুই শালা একচল্লিশ বছরে যেদিন পা দিবি, তার মানে চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার রাত্রে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে বাস খতম করে দিবি নিজেকে। খবরদার এর বেশি একদিন আর বাঁচিস নে। তোর আর মেয়ে সাজবার বয়স থাকবে

না। তোকে আর কেউ নেবে না। তুই শালার কাছে হেরে গিয়ে তোকে চড় মেরে অপমান করেছি আজ ; ওটা হয়ে গেছে বুঝলি ; হবারই কথা। কেষ্টবিনোদ কখনও পার্ট করতে গিয়ে হারেনি। তোব কাছে হারলাম। আমি চলে যাচ্ছি এ দল থেকে। না হয় তুই চলে যা। তোর চাকরির অভাব হবে না। বিশেষ করে এই কাণ্ড ঘটবার পর বড় বড় দলগুলো তোকে লুফে নেবে। তুই চলে যা। নয় তো আমি যাব। কিছু মনে করিস নে। কেষ্টবিনোদের হার তোর সব থেকে বড় জিৎ। কিন্তু ওই বললাম, চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচিস নে।

বলতে বলতেই বলেছিলেন—তাই বা কেন রে ; শোন এক কাজ করবি। একখানা ফার্স্ট ক্লাস আয়না কিনবি। রোজ সকালে উঠে মুখ দেখবি। যেদিন দেখবি মুখে দাগ পড়তে শুরু করেছে সেই দিন থেকে সাবধান হবি। তারপর যেদিন দেখবি রঙমাখা মুখ দেখে চিৎপুর, হাড়কাটা কি পটোপাড়ার গলির মুখের মেয়েগুলোর মুখ মনে পড়ছে সেইদিন বাস করে দিবি। বুঝলি! পুরুষ সাজতে তুই যাসনি—পুরুষ গড়েছেন তোকে ভগবান ভুল করে। তোকে প্রদ্যুম্নের পার্ট দিলে তুই আমার সামনে দাঁড়াতে পারতিস নে। আমি হারতাম না এমন করে।

ঘটনাটা ঘটল বাপ্পারাও নাম হলো যেবার তার পরের বারে বাপ্পারাও-এর পার্টে আমার নাম-যশ হলো দেখে আমার লোভ হলো। অমনি কিশোরের পার্ট করব। সকলকে মেরে বেরিয়ে যাব। আমার মনে পড়ে গেল বিজয়িনী নাটকখানার কথা। বৈকুণ্ঠপুরের বড়বাবুর লেখা 'বিজয়িনী'।

মদনের জন্মান্তর।

মদন ভস্মের পর রতির বিলাপে শিব করুণার্দ্র হয়ে মনে মনে আশীর্বাদ করলেন—মদন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে দেবী রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। এবং বধ করবেন শম্বরাসুরকে। সেই সময় রতির সঙ্গে হবে তার পুনর্মিলন। রতি অনন্ত মুকুলিত যৌবনা চির কিশোরী। প্রদ্যুম্ন তাকে পেয়েই বুঝতে পারবেন তিনি কামদেবতা ; রতি তাঁর চিরসঙ্গিনী।

বৈকুণ্ঠপুরে আমি করছিলাম রতির পার্ট। ছোটবাবু করতেন প্রদ্যুম্নের পার্ট। বইখানার পাণ্ডুলিপিখানা সেবার মানে যেবার পালিয়ে এলাম বৈকুণ্ঠপুর থেকে সেবার থিয়েটারের পর বইখানা নকল করবার জন্যে আমাকে দিয়েছিলেন ভারতদা। পুরনোগুলোতে কাটাকুটি হয়েছিল অনেক। বইখানা, যে ব্যাগটা হাতে নিয়ে সেদিন শেষ রাত্রে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সেই ব্যাগের মধ্যে ছিল—আমি সেটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। মিথ্যে বলব না, মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হত আমার লেখা বলে বইখানাকে চালিয়ে দিই। বড়বাবু থাকতে অবশ্য এমন ভাবিনি কোন দিন ; বড়বাবুর মৃত্যুর পর মধ্যে মধ্যে মনে হত।

সেবার, বাপ্পারাও-এর পর বছর খাতাখানা ভাল করে নকল করে ওই কেষ্টবিনোদদার হাতে দিয়ে বললাম—দেখ তো বিনোদদা কেমন লাগে! কেষ্টদা পড়ে লাফিয়ে উঠে

অশ্লীল গাল দিয়ে বলেছিল এ তো একেবারে ফায়ার রে শ্লা। এ বইয়ের পার্টে তোকে আমি যাত্রা দলের নারী সুন্দরী করে দেব রে! তুই শ্লা রতি মায়াবতী আর আমি এ বইয়ে করব মদন প্রদ্যুম্ন। বুঝলি!

আমার ইচ্ছে ছিল আমি করব প্রদ্যুম্নের পার্ট। রতির সঙ্গে ডুয়েট গান আছে। নাচলে নাচাও যায়। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরে প্রদ্যুম্ন নাচত না। বড়বাবু নাটক বুঝতেন—সত্যিকারের গুণী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভারতদা ছিলেন। ওঁরা বলতেন—ছোটবাবুকে ঠিক প্রদ্যুম্ন মানায় না। বলতেন সদ্য কৈশোর অতিক্রম করেছেন, ষোল পার হয়েছেন, সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কামদেবতা জাগছেন। দু'চোখে স্বপ্নভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন চির যুবতী রতি মায়াবতীকে। ঠিক বৃন্দাবনের ব্রজলীলার কৃষ্ণ কিশোরের প্রতিচ্ছবি। এমনই একজন কাউকে পাওয়া যেত। ভারতদার কাছে শুনে শিখে অনেক কিছু জেনেছিলাম বুঝেছিলাম। ভারতদা বলতেন এইখানটা এই রকম হলে ঠিক হয়। ছোটবাবু অন্য রকম করেন। আমার ইচ্ছে ছিল আমি সেই রকমটি ঠিক করব। কিন্তু কেষ্টবিনোদদা ধরলেন তিনি করবেন প্রদ্যুম্নের পার্ট।

আমি বললাম—না-না, আপনি শম্বরাসুর। শম্বর করবে কে? ও পার্ট দুর্দান্ত পার্ট। ও আপনি ছাড়া হয় না।

কেষ্টবিনোদদা বলেছিলেন, ও তোর যে কোন একটা শম্বর হরিণ হলেই পারবে রে। শম্বর হরিণ না পাস রামছাগল হলেই চলবে। গলার মধ্যে ছাগলের বাচ্চার গলা কাঁপানো ম্যা-ম্যা ডাক হলেই হবে। এখানে বাঘের বাচ্চা হলো—প্রদ্যুম্ন। মদ্দা বাঘের প্রথম বাঘিনী নিয়ে ঝগড়া। বুঝলি না! বসন্তটসন্ত নিয়ে কাব্যি করার পার্ট নয়! তোদের সে যেটা বড়বাবু জানত না সে কি লিখেছে।

কেষ্টবিনোদদা, বলেছি তো মানুষটা শিক্ষাটিক্ষা কি রুচিটুচির ধার ধারত না। বুঝেছেন। মুখেও বলত— ধম্ম কথা হলে মাফ্ করো মাণিক। ওতে আমি নেই। পোষাবে না।

গম্ভীর হয়ে বলত—

> ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য কিছু নাহি মানি।
> অর্থহীন প্রলাপ বচন। তোর ধর্ম
> মোর নয় মোর ধর্ম সেও তোর নয়!
> শার্দুল ঈশ্বরে ডাকে হে বিধাতা—
> মৃগ এনে দাও। মৃগ যে আমার খাদ্য
> সে তো প্রভু তোমার বিধান! মৃগ বলে—
> পাপাত্মা রাক্ষস ব্যাঘ্র; আমারে বাঁচাও
> প্রভু তার তীক্ষ্ণ নখ দন্ত হতে।

কেষ্টবিনোদদা যখন অশ্লীল ভাবনায় বা আনন্দে মজে থাকত তখন অনর্গল বলত এই সব কথা। আমাকে বলেছিল—ওরে তোকে রতি সাজিয়ে আমি প্রদ্যুম্ন সেজে কি একটা পালা করি দেখ না। তোকে এমন সাজাবো এমন পার্ট করাবো যে—।

বলতো বাচ্চা ছেলে থেকে বুড়োরা পর্যন্ত একেবারে পাগল হয়ে যাবে। আর অশ্লীল মেয়েরা সে অল্পবয়সী বুড়ীরা পর্যন্ত মনের সঙ্গিনী সখী মনে করবে। আর আমার মানে প্রদ্যুম্নকে দেখে চুড়ি পরা হাতের হাততালি পড়বে। দেখবি।

খাটলেও খুব। খরচও করলে খুব। সে সময় সীতা কর্ণার্জুনে নীল সবুজ পেন্ট উঠেছিল। হালকা সবুজ কচি কলাপাতা রঙের পেন্ট মেখে রাম সাজতেন শিশির ভাদুড়ী মশাই। কর্ণার্জুনে কৃষ্ণ নীল রঙের পেন্ট করত। সেই দেখে কৃষ্ণের ছেলে প্রদ্যুম্ন হিসেবে হালকা নীল পেন্ট মেখে মেকআপ ক.রেছিল কেষ্টবিনোদদা। মানিয়েছিল ভালোই কিন্তু যা হবে ভেবেছিল তা হয়নি। কেষ্টবিনোদদা প্রদ্যুম্ন বেশে আসরে ঢুকেই ঘা খেলেন ছোকরা শ্রোতাদের কাছে। কেউ বলে উঠেছিল এই মেরেছে রে। এই বুড়োটা আবার মদন হয নাকি? ভাগ্। সঙ্গে সঙ্গে তার দলটা। ওদিকে মেয়ের আসর থেকে কে বললে--মরণ! এ কি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান কুলীন মদন না কি?

এরপর রতি সেজে আমি যখন তাব সামনে একটু হেলে ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে ফুলের সাজি হাতে দাঁড়িয়ে বললাম--

হে কুমার, ওগো শিবতোষ;
শিব রোষে কন্দর্প হয়েছে ভস্ম--
সেই শিব প্রসন্ন তোমার পরে
কন্দর্পও পরাজিত তোমার রূপের কাছে।
কি হেরিছ এমন করিয়া?
প্রদ্যুম্নের কথা আছে--
কে তুমি রহস্যময়ী চির অবগুণ্ঠনে আবৃতা?
সেই শিশুকাল হতে তোমার সেবায় লালনে -
লালিত বর্ধিত আমি। বাল্য ও কৈশোরে
কতদিন কতবার দেখিতে চেয়েছি দেবী
তোমার ওই বদন কমল—কিন্তু—ও গুণ্ঠন
কখনও খোলেনি! বল। কেবা তুমি?

এইখানটাই বইখানার সব থেকে ভাল দুরন্ত জমাটি। রতি এইখানে তার পরিচয় দেবে, সে খুব কৌশল করে পরিচয়। তার থেকেই প্রদ্যুম্নের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়বে। এইখানটায় আমাব পার্টের কাছে কেষ্টবিনোদদা যেন ভড়কে গিয়ে থ মেরে গেল। লোকে খুব খারাপ বললে না কিন্তু ক্ল্যাপ যা পাবার তা আমিই পেলাম, কেষ্টদা পেলে না।

দুর্দান্ত ড্রামা। ভারতদা বলতেন—কালিদাসের কুমারসম্ভবের গোটা মদন ভস্ম সর্গটা অনুবাদ করে দেওয়া আছে। কিছুটা বলবে প্রদ্যুম্ন কিছুটা মায়াবতী মানে রতি। তার সঙ্গে নাচগান। মায়াবতীর গায়ের উপর একটা পা পর্যন্ত আলখাল্লা ধরনের জামা থাকত, মুখে মাথায় থাকত লালপেড়ে একটা ঘোমটা। এইখানেই মায়াবতী অবগুণ্ঠন খুলে দিয়ে মৃদু হেসে বলে—

—"বল প্রিয় বল—তুমি বল কেবা আমি!

বল!" তারপর গায়ের আলখাল্লাটা খুলে ফেলে দেয় রতি। ভিতরে থাকে রতির...রতি বেশ।

সে অনেক ব্যাপার। রতির ইশারায় বসন্ত আসবে ফুলবালারা আসবে। তারা ফুলের গয়নায় সাজায় রতিকে তার পর প্রদ্যুম্নের মনে পড়বে পূর্বজন্ম। শিবের সেই ভীষণ রোষ, সে জায়গাটা খুব সুন্দর। রতি তার পরই বলবে—

মনে কর রতির সে করুণ ক্রন্দন।
পৃথিবীর যত ফুল সব ফুল ঝরে গেল—
ফুলের সৌরভ যত সমস্ত শুষ্ক হয়ে
কটু গন্ধে হলো পরিণত। সংগীত কর্কশ হলো।
আস্বাদন তিক্ত হলো—ফলের মাঝারে—
মেঘ শুধু বজ্রগর্ভ হয়ে বিশ্বের অরণ্যশীর্ষে
হানি৷ আঘাত। জলধারা বাষ্প হলো
মার্তন্ডের কঠোর শোষণে।

সে অনেক। মানে রতি আর প্রদ্যুম্নতে কে হারে কে জেতে এই রকম ব্যাপার। ভেতরে একটু ব্যাপার ছিল। বুঝিয়ে বললে অন্যে বুঝবে না কিন্তু আপনি বুঝবেন। তখন প্রবোধ গুহের কাছে বড়বাবু যেতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল—ওখানে নাটকখানা হয়। রতির পার্টটা নীহারবালার জন্যে তৈরি করেছিলেন। প্রদ্যুম্ন অহীনবাবু কি দুর্গাবাবু এমনি কেউ করবেন। করলে কিন্তু দেখবার মতো ব্যাপার হত। তবে শম্বরের পার্ট বড়বাবু করতেন ওখানে। বেশি চেঁচাতেন একটু। কিন্তু ভাল করতেন। ও পার্ট পাবলিক হলে শিশিরবাবু ছিলেন যোগ্য লোক।

রতি আর প্রদ্যুম্ন বৈকুণ্ঠপুরে ছোটবাবুর সঙ্গে আমি করতাম। বইখানা যাত্রার আসরে তার থেকে জমল অনেক বেশি, কিন্তু প্রদ্যুম্নের পার্টে কেষ্টবিনোদদা ওই সিনটায় একেবারে যেন ডুবে গেল আমার কাছে।

ফল যা হলো তা আমি ভাবতে পারিনি। আমি কেন কেউই ভাবতে পারেনি যে কেষ্টবিনোদদা এমন করবে।

ওই সিনের পর আসর থেকে ফিরে গ্রীনরুমে এসেই এক চড় মেরে বসল আমার গালে। সে সজোর এক চড়। প্রচণ্ড চড়। কেন তুই ওখানটা এমন করলি? কেন? আমি সে আমচকা চড় সামলাতে পারিনি, ঘুরে পড়ে গিছলাম। খানিকক্ষণ হুঁশও ছিল না। খানিকক্ষণ মানে সে বেশ খানিকক্ষণ। আসর জুড়িয়ে যাবে বলে একটা ড্যান্স ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

শেষ পর্যন্ত পালা শেষ হলো। হলো খানিকটা বাদ-সাদ দিয়ে। না দিয়ে উপায় ছিল না। চড় মেরেই কেষ্টবিনোদদা যেন পাথর হয়ে গেল। হ্যাঁ-ও নাই, না-ও নাই, যেন কোন সাড়াও নাই। মানুষটা এমন হাঁকডাকের মানুষ, আসরে তার অ্যাকটিং ছাড়া তার গলার আওয়াজ আর কেউ শুনলে না। চা খেলে না, মদের বোতল

বেশকারীদের জিম্মা থাকত তা জিম্মাই থাকল—একবার চাইলে না। শুধু সিগারেট খেয়ে গেল। সে সিগারেটের পর সিগারেট। রাত্রি বারোটা হয়ে গিছল যাত্রা ভাঙতে; বারোটা থেকে সকাল পর্যন্ত বাসায় ফিরে সিগারেট টেনে গেল। সকালবেলা সকলে উঠলে বললে—আমাকে ফারখত দিতে হবে।

কারুর কথা রাখলে না। আমারও না। চড়খানা খেয়ে বেহুঁশ হয়েছিলাম, খুব লেগেছিল এটা ঠিক, ও তো মিথ্যে সাক্ষী দেয় না। কিন্তু কেষ্টবিনোদ দাদার এই ক্ষমা চাওয়া, দল থেকে জবাব দিয়ে এই চলে যাওয়াটা তার থেকেও আমাকে অনেক বেশি দুঃখ দিয়েছিল। ভারতদার পরে কেষ্টবিনোদ দাদাকে পেয়েছিলাম। ভারত দাদা ছিলেন আমার কাছে দেবতা। বৈকুণ্ঠপুরের বড়বাবু ছোটবাবুর দাদা ছিলেন কিন্তু মনে হত যেন ঠাকুরদাদার মতো ভারী দাদা ছিলেন। যখন হাসি তামাসা রঙ্গরস করতেন তখন ঠিক আপনার দুষ্টপুরুষের বড়বাবু। মুখের যাঁতাফাঁতা থাকত না। খুব খোস মেজাজে থাকলে ভাইকে শাসন করে বলতেন—বেশি চ্যাঙডামি করবি তো ছোট বউমাকে বলে দেব। ছোটবাবুর মেজাজ খারাপ, তাকে নরম করবার জন্যে বলে উঠলেন—বুঝেছি। ওরে ছোট, আজ ছোট বউমা বুঝি নথ-ঝামটা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঘর থেকে বেরোবার সময়? আবার যখন গম্ভীর হলেন তখন সে যেন হিমালয়। নাড়ায় কার সাধ্যি। ভারতদা এতখানি ওজনের মানুষ ছিলেন না। এর থেকে অনেক হাল্কা। আর এতখানি গাম্ভীর্যের বড় ভাব ছিল না। বয়সেও বড়বাবুর থেকে ছোট ছিলেন। আর পড়াশোনায় নিজেদের বংশের ধারাতেও আলাদা মানুষ ছিলেন বড়বাবু থেকে। বই পড়ে শোনাতেন। বলছিলাম তো বাবর পাঠের কথা। ভারতদা কুমারসম্ভবের মদন ভস্মের সর্গটা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। মানে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সব থেকে পবিত্র ছিল তার বিষণ্ণতা। বিষণ্ণভাব সবটাই ছিল তাঁর ওই বোনটিকে মানে বিণীকে নিয়ে। বিণীকে একটু হাসাতে চাইতেন তাকে তোষামোদ করতেন রসিকতা করতেন সে যে কি বিষণ্ন কি বলব আপনাকে।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাপ্পা বললে—কেষ্টদা ছিলেন আমার ঘরোয়া বড় দাদা। মানে তাসপাশার সঙ্গী। গানের আসরে আমি গাইলাম তো উনি তবলচীর কাছ থেকে বাঁয়া তবলা কেড়ে নিয়ে বললেন—আমি বাজাব। তুই সব।

নষ্ট চাঁদের দিন যে দাদারা ভাইদের নিয়ে পরের বাড়ির কলার কাঁদি কাটে, ক্ষেতেখামারে উপদ্রব করে সেই দাদার দাদা। অ্যাকটিং প্রকৃত বলতে কেষ্টবিনোদদার কাছেই শিখেছি। বিশেষ করে যাত্রার আসরের অ্যাকটিং।

আর দুটো জিনিস আমাকে অভ্যেস করিয়েছিলেন। প্রথম সিগারেট না-খাওয়ার একটা প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন আমাকে। বলেছিলেন আমার এই কথাটা মানিস ইন্দু, সিগারেট খেয়ে এমন গলাখানা টালখাওয়া চাকার মতো খ্যাসখেঁসে করে তুলিস নে। আর একটা কথা শোন। সব দিক দিয়ে তাকাবি, দক্ষিণদিকে তাকাবি নে শালা।

হঠাৎ থেমে একটু হেসে বাপ্পা বললে—শালা বলত না, আরও অশ্লীল গালাগাল রপ্ত ছিল কেষ্টদার। আর সে খাসা নির্বিকারভাবে বলে যেতেন কেষ্টবিনোদ।

অশ্লীল একটা গাল দিয়ে বলতেন—খবরদার বাজারের মেয়েমানুষের দিকে তাকাবি নে। ওদের ছুঁস নে। এই আমার দশা দেখ। আমোদ অনেক করলাম রে। মদের বোতল থেকে মেয়েমানুষের দেহ রূপ, ঘুঙুর-গান—শালা ঠিক যাত্রার আসর। শালা সকালবেলা টিচিংফাঁক কোথাকার কি? যে আবুহোসেন কে সেই আবুহোসেন। আস্তে আস্তে খালি পকেটে পায়ে হেঁটে বাসায় এসে হাঁকি—ইন্দু রে এক কাপ কড়া করে চা করত। বিয়ে করবি তো ভালবেসে বিয়ে করবি। মদটাও বেশি খাসনে। মোটা হয়ে যাবি। মোটা হয়ে গেলে আর ছিপছিপে ছুঁই মাছের মতো I mean তন্বী তরুণী বিশের নীচে বয়সিনীর মতো চার্ম আর তোর থাকবে না। মনে রাখিস বাবাধন তোর মূলধন দুটি ওই তেঁতুল দিয়ে মেজে ঝকঝকে করা সন তারিখ উঠে যাওয়া পওয়ার মতো চেহারা, রঙ মেখে চোখ আঁকলেই হয়ে গেল- -পবচলো পবতে বাঁক। মোটা হলে তোর দিকে কেউ তাকাবেও না। আসরে ঢুকলে ছেঁড়ারা চোখ বন্ধ করে বলবে—চোখ বোজ! চোখ বোজ! মার্তাঙ্গনীর জগঝম্প নৃত্য, চোখ বোজ।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল কেষ্টবিনোদদা। বলেছিল—আমার কথাবার্তাই এমনি তা তো জানিস। আজ গম্ভীরভাবে বলে গেলাম—মদ সিগারেট খাস নে। মেয়ে সাজবার চেহারা নষ্ট হবে, গানের গলা যাবে। মেয়েদের পার্টেই তোর একসেলেন্স। মেয়েদের পার্ট ছাড়া পুরুষের পার্ট কদাচ নামিস নে। কেষ্ট অভিমন্যু —মহাভারতের আঠারো পর্বে একটা একটা দুটে। মেয়েদের পার্ট ছাড়া করিস নে। মেয়ে যাত্রার দলে যাস নে।

আর এই একশো টাকা তুই নে। রাখ। পোস্টাপিসে একটা অ্যাকাউন্ট পত্তন করিস। তাতে কিছু কিছু জমিয়ে জমিয়ে যাস, বুঝলি। এটা তোকে চড মারার দাম আমি দিচ্ছি না। আমি দিচ্ছি বড় দাদা যেমন দেয়। হ্যাঁ।

চাকরি কেষ্টবিনোদ দাদার যেন তোলা ছিল।

সকালবেলা ওই কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেল, বিকেলে ফিরে এল অমৃত নাট্য সমাজের দলে চাকরি নিয়ে। মথুর শাহে যা পেতো তা থেকে একশো বেশি মাইনে হলো। তবে আমারও মাইনে বাড়ল। মথুর শাহের দলের মেয়ের পার্টের লোকেদের মধ্যে সব থেকে বেশি ছিল মোহিনীরানীর। আমার মাইনে তার সমান হয়ে গেল। মাসে আড়াইশো। নাম হলো ইন্দুরানী।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাপ্পা বললে- -এক মিনিট। বলে চলে গেল তার ঘরের মধ্যে। দেশে আমার বাড়ি যেটা আমি ভাগে পেয়েছি সেটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সেটাকে যথাসম্ভব রিমডেলিং করে নিয়েছি। জানালার পরদা দেওয়া আছে এখন। আমার পছন্দসই রঙটা হলো গেরুয়া, তাছাড়া বীরভূমের ধুলোর রঙও তাই। সেই কারণে গেরুয়া রঙ এখানে খুব বড় বিবর্ণ দেখায় না। এখানে ইলেকট্রিক লাইটও হয়েছে। লাইটটা জ্বাললে বাপ্পা বোস। তার ছায়া পড়ল পরদায়। জানালাটার ঠিক উল্টোদিকের দেওয়ালে আলো জ্বলছিল। যা হলো দেখলাম। বাপ্পা ফিরে এল। আসতেই বাতাসে

কিছুর গন্ধ পেলাম। মুখে এলাচও চিবুচ্ছিল বাপ্পা। এবং গোপনও করলে না। সে কবার মতো মনও ওর নেই এবং গোপন করলে লৌকিক সম্মান যেটা পাওয়া যায় তার উপবও ওব লোভ নেই। একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরিয়ে হেসে বললে—দাদা মজার কথা কি জানেন! সেইটেই বলব এবার। এর ঠিক আট বছব পব। এই কেষ্টবিনোদ দাদাই আমাকে দিযে পুরুষের পার্ট করালেন। আর ওই বিজযিনী নাটকেই আমাকে দিলেন সেই প্রদ্যুম্নেব পার্ট। মাযাবতী যাত্রা দলের বিখ্যাত অভিনেত্রী মোহিনী সুন্দরী।

কি মজাব কাণ্ড! এই আট বছবেব মধ্যে কেষ্টবিনোদদা এ দল ও দল সে দলে বাঘের মতো ঘুবতে ঘুবতে অবশেষে মোহিনী অপেরাতে এসে ফাঁদে পড়ে গেছে। যাত্রাব দলের আসামীদেব মধ্যে যারা এই সব খবর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত তারা বসিকতা করে গান গাইত "এবাব কেদো বাঘ পড়েছে জালে।"

নিত্য নূতন বা নূতন বিলাসী কেষ্টবিনোদদা। কখনও কোন মেযেব ফাঁদে মাস ছযেকের বেশি থাকেননি। তাও নাগাড়ে একটানা নয। আমাকে তো সেই আট বছব আগে গণেশ অপেবা ছেড়ে যাওযাব দিন বলেছিলেন—আমাব বাসায আব তোব থাকা হবে না। তুই আপনাব একটা আড্ডা দেখে নে। বলিস তো দেখ বিযেটিযে গোছের একটা দিযে তোব সংসার একটা পেতে দি!

আমি কোন উত্তর না দিয়ে জিনিসপত্তর গুটিযে নিযে চলে গিছলাম। একটা আধা হোটেল আধা মেসে গিযে উঠেছিলাম। বন্ধুবান্ধব আমাব তখন অনেক। মালিকদেরও সুনজবে চলছে। ম্যানেজার জিজ্ঞেস কবেছিলেন—'কেন বে'; আমাকে তিনি তুই-ই বলতেন। চাব বছব হযে গেছে তো! লোকও ভাল ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কেন রে বাড়ি দেশ ঘর মা ভাই এসব নেই নাকি তোব? এ্যা? আমি বলেছিলাম—না। কোথায যাব? ভগ্নিপতিটিব কথা মনে হলে দুনিযা বিষ হযে যেতো। আমার ভাইটা নাকি মধ্যে ফিবে এসেছিল, এসেছিল একটা বউ নিযে। কিন্তু নিশি জামাই বউটা বেজাত অজাতেব মেযে অপবাদ দিযে ভাইটাকে জাত গিযেছে বলে তাড়িযেছে। মা তাতে কথা কযনি।

মেযে-জামাই নিযে সাবা জীবনটাই মশগুল হযে কাটিযে শেষটায বছব খানেক হয়েছে গেছে নবদ্বীপে। আমি এখন মাসে তিরিশ-পঁযত্রিশ টাকা দি! কিন্তু সে থাক।

কথা কেষ্টবিনোদদার আর আমার।

কেষ্টবিনোদদা গণেশ অপেবা ছেড়ে গিয়ে দুটো-তিনটে বছব সে একেবাবে ভীষণ কাণ্ড করে ফেলেছিল। লোকটা তো জাত অ্যাকটর। গোটা কযেক পার্ট যা করেছিল না—সে কি বলব আপনাকে। থিযেটাব জগতে যেমন চন্দ্রগুপ্তের চাণক্য, সাজাহানে ঔরংজীব, প্রফুল্লতে যোগেশ, যাত্রার দলে কেষ্টবিনোদদাদাব কযেকটা পার্ট আপনার ঠিক সেই রকম। মাইনে উঠেছিল আটশো টাকা। আর যা হুকুম করেন তাই।

আমারও তখন উঠতি পালা। উঠেই চলেছি। একটু একটু কবে দেহ ভারী হযে আসছে, মাথায কিছু বেড়েছি। আপনার মনে আছে আমি বলেছি—আমি যেদিন

প্রথম বৈকুণ্ঠপুর ঢুকি সেদিন পথে বড়বাবুকে দেখেছিলাম, উনি টমটমে স্টেশন যাচ্ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমার হাইট কত হে? বলতে পারিনি সেদিন। আমার হাইট তখন জুতোসুদ্ধ পাঁচ ফুট থেকে একটু কম ছিল। ক্রমে ক্রমে বেড়ে তখন হাইট আমার পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির কাছাকাছি। তার বেশি না। ঠিক খুকী খুকী মানে কিশোরী তরুণীর পার্টে কেমন যেন মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি কিন্তু দলের লোকে বলে খাসা মানাচ্ছে। একটু ভারী লাগছে, তা লাগুক। মাইনে আমারও বেড়েছে। আড়াইশো-তিনশো ছাড়িয়ে চারের ঘরের দিকে চলছে অঙ্কটা।

এদিকে দেশ কালের বদল হচ্ছে যেন ঝড়ে পাতা উড়ে উল্টে উল্টে চলেছে। আবার বৃহৎ বৃহৎ ফলগুলো ঝরে পড়ছে। দুর্গাবাবু, শিশিরবাবু, ছবিবাবু চলে গেলেন, থিয়েটার জগৎ অন্ধকার হলো। অহীনবাবু রইলেন কিন্তু অভিনয় ছেড়ে দিলেন। যাত্রা দলেও তাই। বই, পুরনো বই চলে না। পৌরাণিক অচল হয়ে গেল। পৌরাণিক থেকে ঐতিহাসিক, তা থেকে সামাজিক চলতে লাগল। যাত্রার দলে পুরুষের মেয়ে সাজার রেওয়াজ উঠে যেতে লাগল। থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে ফিরোজাবালা- টালারা যাত্রায় ঢুকল। তার সঙ্গে চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, ঘোষ, বোসদের মেয়েরাও যাত্রার দলে আসছে। মেয়েরা মেয়ের পার্ট না করলে দল আর চলবে না রব উঠেছে। অ্যামেচার থিয়েটারে পর্যন্ত তাই। মেয়েরা পয়সা নিয়ে পার্ট করে দিয়ে আসে। এরই মধ্যে জনাকয়েক মাত্র আমরা আছি যারা পুরুষ হয়েও মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করি। মোট কথা চারশো টাকায় উঠেও সামনে পা বাড়াবার জায়গা নেই গোছের ব্যাপার। ঘন কুয়াশা জমে রয়েছে কিছুই দেখা যায় না বোঝা যায় না; কুয়াশায় ঢাকা সামনের স্থানটুকুর তলায় যে অতল গহ্বর নেই এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

হঠাৎ শুনলাম কেষ্টবিনোদদা জালে পড়েছেন।

মায়ারানী অপেরার মালিক হয়ে বসেছেন। নাঃ মায়ারানী অপেরার মালিকের মালিক হয়ে বসেছেন। বাজারে মায়ারানীকে মেয়েতে পুরুষে বলে রাক্ষসী মায়া। অকস্মাৎ একদা আবির্ভূতা হয়েছিল খোলার চাল পাড়ার একটি দেহ কেনাবেচার বাজারে। সেখানেই সে পা দিয়ে জয় করেছিল সারা বাজার। সারা বাজার অবশ্য প্রকাণ্ড বড় ব্যাপার। এবং দেশ ভাগ আর স্বাধীনতার পরের যে কালটা সে কালটায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটা আরও প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। হোটেল রেস্তোরাঁ, মাসাজ ক্লিনিক থেকে টালীগঞ্জ ময়দান পর্যন্ত বাজারটা হিমালয়ের বিস্তৃতি নিয়ে বসে আছে। সে ঠিক নয়। আমাদের যাত্রার আসরে আর যে বাজারটায় কেষ্টবিনোদদার মতো খদ্দেররা ঘোরেন ফেরেন, তার সবটাই সে জয় করে ফেলেছিল। তাই বা কেন, শোনা যেত যাকে সে ধরত তাকে সে নিঃস্ব করে ছেড়ে দিত। প্রথম এসে পড়েছিল এক বণিক বাড়ির ছেলের হাতে। ছেলেটা ছ'মাস যেতে না যেতে যাকে বলে অতলে তলিয়ে যাওয়া তাই গেল। এমন পাগল হলো এই মায়ারানী রাক্ষসীর মায়ায় যে ঘরবাড়ি ছাড়লে, বউয়ের গহনা কেড়ে এনে একে সাজালে; পাঁচ-সাতখানা বাড়ি ছিল ছোকরার, একখানা বাড়ি লিখে দিলে। এরপর বউটা একদিন গাড়ি করে মায়ার বাড়ি এসে

মাযাকে ঝাঁটা-পেটা কবে স্বামীকে টেনে তুলে নিযে গেল। স্বামী তখন বেহোঁশ ছিল। হোঁশ থাকলে কি হত বলা যায না। স্বামী হোঁশ ফিবে পেয়েই চলে এল মাযাব বাড়ি। মাযা এবাব পাযেব চটি খুলে তাকে পিটিযে বিদেয কবলে। ছেলেটা বাড়ি ফিবে এসে গলায় দড়ি দিলে।

এবপব একলাই দিন কাটাচ্ছিল মাযা. মধ্যে এল থিযেটাবে। থিযেটাবে ঢুকেছিল মাস কযেকেব জন্যে। থিযেটাব মানে. স্টাব. মিনার্ভা. বঙমহল. বিশ্বরূপা বাদ দিয়ে যে সব থিযেটাব উঠছে পড়ছে. জ্বলছে নিভছে, তাবই একটায পার্ট কবেছিল। কবেছিল নাচগানেব পার্ট। বাবু জুটতে দেবি হযনি। বাবু বেশ পযসাওলা লোকই জুটেছিল. বছব দু'তিন কেটেছিল তাব থিযেটাবে। ওখান থেকে এল যাত্রায। যাত্রায না এলেও চলত ওব কিন্তু ওব মন মানেনি। নাচগান পার্ট কবাব উপব ওব একটা নেশা ছিল। এ নেশা ভযানক নেশা। এ যাদেব পেযে বসে তাদেব বোধ হয মৃত্যুকাল. অন্তত শেষ বযস পর্যন্ত ছাড়ে না। থিযেটাবেব সঙ্গে বনল না। বনল না ওই নাচগানেব পার্ট. বঙ মেখে উর্বশী মেনকা সাজাব পার্ট না থাকাব জন্যে।

আব একটা ব্যাপাব ছিল. কথাটা বাইবেব লোকও বলে আবাব মাযাবানীও ঘুবিযে ফিবিযে স্বীকাব কবে যে হিবোব সঙ্গে প্রেম না হলে তাব চাকবি বজায থাকে না। থিযেটাবে হিবোব সঙ্গে ঝগড়া হলো আব নাচগানেব পার্ট বইল না, নাটকে সুতবাং মাযা থিযেটাব ছাড়ল। এবই মধ্যে একদিন এসে নাক ওব ঘবে উঠল কেষ্টবিনোদদা। ওবে আনলে মাযাবানীব যিনি বক্ষক তিনি, অর্থাৎ ওই অঞ্চলেব পাসপোর্ট বাবু।

প্রবৃদ্ধ বযস্ক লোক। কেষ্টবিনোদেবই সমবযসী। কলকাতাব বড়লোক ঘবেব বাবু। সে আমলী চালচলন এবং জামদাবী উচ্ছেদ বিল পাস হওযাব পবও বজায বেখেছিলেন। মধ্যে মধ্যে ওদেব বাড়িতে আসব পেতে যাত্রা দলেব ওপাবাং হত. সেই সূত্রে কেষ্টব সঙ্গে পবিচয।

তিনি কেষ্টবিনোদকে ডেকে এনে বললেন— —দেখুন বিনোদবাবু মেযেটা ধবেছে একটা থিযেটাব খোল। আব নাচগান সাজ পোশাক পবা নাচা কবা। থিযেটাব আমবা কখনও কবিনি। অন্য অনেক ব্যবসা কবেছি আজও কবছি। তবে থিযেটাব কবলে যে ডুবে মবতে হবে সে আমি দিব্যচক্ষুতে দর্শন কবছি। অথচ মেযেটা আমাকে এমন কবে পেযে বসেছে যে ওকে না আমি বলতে পাবছি না। শেষ পর্যন্ত ঠিক কবেছি একটা যাত্রাব দল ওকে কবে দিযে আমি ওকে ছেড়ে দেব। আপনাকে আমি জানি। এ-পথে আপনি পাসপোর্টধাবী নামকবা পথিক। যাত্রাব দল নিযেও বটে. আবাব মেযেটাব প্রসঙ্গ নিযেও বটে। আপনি দলটি গড়ে দেন। তাবপব যদি ওব বক্ষক হযে থাকেন তো সে বহুৎ আচ্ছা। না হলে, আপনি চলে যাবেন আপনাব পথে, ও আব কাউকে ধবে চলবে। তাতে ওব কৃতিত্ব আছে সুতবাং যে কেউ হোক বুঝতে পাবে যে তাতে তাব বোধ কবি বিন্দুমাত্র দুঃখ হয না। শোনা যায মাযাবতীব পাখি পোষাব একটা শখ আছে। শুধু মাযাবতী কেন. এই ব্যবসাযেব ব্যবসাযিনীদেব অধিকাংশেবই এই শখ থাকে। বেড়াল, কুকুব, পাখি ওদেব খুব

আপনজন। পাখিবা কথা কয। মায়াবতীব একটি কবে মযনা থাকত। মবত ফেলে দিত, আবাব কিনত; আবাব বুলি শেখাত, আবাব মবত আবাব ফেলে দিত। আবাব কিনত। জীবনে ওব বক্ষক পুরুষেবা তেমনি।

কেষ্টবিনোদ এ কথায বাজী হযে গিযেছিলেন এবং পত্তন হযেছিল মায়াবানী অপেবাব। প্রথম মালিক ছিলেন মযাব প্রৌঢ বাবুটি। এক বছবেই দলটাকে জমিযে তুলে নাম ছড়িযে দিযেছিল কেষ্টবিনোদেব কেবামতি। কেষ্টবিনোদেব নিশ্চয কিন্তু মাযাবানীব নাচগান এবং রূপ যৌবনেব খ্যাতিটা কম ছিল না তাব মধ্যে। দ্বিতীয বছবে তিনটে বই নিযে চষে বেডালে আসাম আব চা বাগান অঞ্চল। দ্বিতীয বছবেব শেষে মাযাবানীব বাবু সব সংশ্রব ছেডে দিলেন। দান কবে দিলেন মেযেটিকে। মেযেটি কেষ্টবিনোদেব হাত ধবে যাত্রাব আসবে বড়ো বন্দী সেজে ওকে পালা শুরু কবলে।

তখন ওদেব বে [illegible] কি ?

[illegible] আমাব সঙ্গে কেষ্টবিনোদেব আব দেখা হয়নি। আমি কলকাতা ছেড়ে নবদ্বীপে গিযে পডেছিলাম। জানেন কিনা জানি না, বাংলা যাত্রাদলের একটা আড্ডা হলো নবদ্বীপ। বড বড যাত্রাব দল এখান থেকে গড়ে উঠেছে। নবদ্বীপে [illegible] মাযেব সঙ্গে বছবখানেক বাস কবেছিলাম এই সমযে। [illegible] যাত্রা দলেবই লোক হয়ে গেছি।

[illegible] সূর্য ওঠে সন্ধ্যায, অস্ত যায সকালবেলায, যাবা [illegible] দেখে পড়ো বাসাবাড়িব ভাঙা মেঝেব উপব শুযে [illegible] ঘুমিয়ে [illegible] তাদেব তো চেনেন আপনি। আমি তাদেবই [illegible] তখন মেযেবা আসতে শুরু কবেছে। [illegible] কেমন [illegible] কুলীন মেযেদেবও খুব ভালবাসাব [illegible] হচ্ছে। [illegible] মুগ্ধ [illegible] মতো [illegible] কাছে আমাব [illegible] কথাতেই অম্বলাভ্যাসা [illegible] ছিল না।

[illegible] কেষ্ট [illegible] কথা বলি। কেষ্টবিনোদেব যখন খুব বমবম ঝমঝম কবে চলছে চৌঘুডি চড়ে ছুটছে তখন ওব কথাই শুনেছি। ওব চলন্ত বথেব চাকাব দাগ দেখেছি পথেব উপব, বথেব চাকায ওড়ানো ধুলো ওডতে দেখেছি কিন্তু ওব সঙ্গে দেখা হয়নি। আমিও দেখা কবিনি। দেখা কবতে চাইনি। কাবণ ছিল। কাবণটা বলি, বলতে হবে। কেষ্টবিনোদ আমাকে চড মেবেছিল তাব জন্যে আমাব অভিমান ছিল কেষ্টবিনোদেব ওপব কিন্তু বাগ আক্রোশ ছিল না। ওব কাছে আমি অনেক উপকাব পেযেছি, অনেক শিখেছি। যে ক'বছব একসঙ্গে ছিলাম সে ক'বছব কেষ্টবিনোদেব বাসাতেই থেকেছি। আমি তাব সেবা কবেছি, চাকবেব মতো বলেন চাকবেব মতো, ছোট ভাইযেব মতো বলেন তাই। আমাবও সেবা উনি কবেছেন। একদিন খুব জ্বব হযেছিল, প্রায ১০৪।৫ ডিগ্রী। অজ্ঞানেব মতো পডেছিলাম। কেষ্টবিনোদ মাথার শিযবে বসেছিল। তাব উপব বাগেব আগুন জ্বালবাব মতো খডকুটো। কোথায

ছিল যে আগুন জ্বলবে! কেষ্টবিনোদও তাই বলেছিল চাকরি ছাড়ার সময়, বলেছি সে কথা। কিন্তু সেটা সত্য তার মনের কথা নয়। আমি শুনেছি যে-দলে কেষ্টবিনোদ থাকত, সে-দলে আমার কথা উঠলে কেষ্টবিনোদ বলত তা হলে আমি নেই। আমি তা হলে চলে যাব।

দু'দশটা সত্যিকারের দুঃখ দেওয়ার মতো খারাপ কথাও বলত। আমার গানের নিন্দে করত, খুঁত ধরত। চেহারা মানান নিয়ে খারাপ কথা বলত। সব থেকে খারাপ কথা বলত—বলত, যাত্রার দলে নিঁখুত মেয়ে সেজে গান গেয়ে আমি দু'চার জায়গায় নাকি ভদ্রঘরের মেয়েদের মনের খিড়কীব দরজায় গিয়ে টোকা মারি, বলি "সই একটু দোর খোল না ভাই, দুটো মনের কথা কই!" আর সরলা শিক্ষা সভ্যতায় বঞ্চিত ব্রাত্য মেয়েদের নিয়ে তো যা করি তার আর কথাই নেই।

এগুলো মিথ্যে অবশ্য বলেনি কেষ্টবিনোদ। যাত্রা দলের ঝানু লোক। এগুলো সত্যিই ঘটে। যে-সব ছেলেরা কিম্বা বযসচোরা লোকেরা মেয়েদের পার্ট করে তারা মেয়ে দর্শকদের সমাদর একটু বেশি পায়।

বৈকুণ্ঠপুবে ক্ষুদিরাম মালাকার ছিল, আমারই সঙ্গে মেযে সাজতো নাচতো, আমার থেকে বযসে বড় ছিল আর পিয়ারা মাস্টারের হাতেগড়া ছেলে ছিল; তার ধাতটা ছিল আলাদা। বিরহ নাটকে আমি গোলাপী আব ক্ষুদিরাম চপলা সাজতাঁ। থিযেটারের পর কিশোরী মেয়েরা-বউয়েবা তা বেশ বয়স হওয়া মেযেরাও বটে, ঠাট্টা কবত আমাদের। ক্ষুদিরামকে বলত "ও চপলা তোমার বরটি গেল কোথা?" ক্ষুদিরাম ছুটে মারতে যেত। শেষ পর্যন্ত চারু বলে একটা মেযেব অপবাদই রটে গেল ক্ষুদিরামের সঙ্গে। সে অপবাদের জন্যে চারুব শ্বশুরবাডি ঘুচে গেল, স্বামী আবার বিয়ে কবলে। আমাকে মেয়েরা খেপাতো, বলত—"লাজুকমুখী ও গোলাপী রামকান্তে ডাকব নাকি?" আমাব সহায় ছিল ভারতদা। আমাকে ঘিরে ছিল চারদিকে আর আমার মাথার উপব ছিল একসঙ্গে দাদার মতো গুরুর মতো।

হঠাৎ চুপ করে গেল বাপ্পা। যেন দমকা হাওযায় আলো নিভে গিযে অন্ধকার হয়ে যাওযার মতো হঠাৎ বাপ্পা চুপ করে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আবার আজকের শেষ রাত্রিব নিস্তব্ধতা জেগে উঠে থম্‌থম্ করতে লাগল। তবে এখন আর বাদুড কি প্যাঁচা ডাকছে না। অন্য একটা শব্দ কিছু আছে। সে কালে বলত রাত্রির পাখার শব্দ। একালে রাত্রি পাখার ভর দিয়ে চলে না। তবুও শেষ বাত্রিব নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা শব্দ থাকে। ঝিঁঝির ডাক বেজেই চলে। কৃষ্ণপক্ষের একাদশী কি দ্বাদশী ছিল, চাঁদ উঠে পূর্ব আকাশের প্রথম পাদ ছুঁই ছুঁই করছে। পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় আকাশকে ফ্যাকাশে করে তুলেছে। বাড়ির ধারে শালপুকুর পাডের তালগাছের ছায়া পডেছে আমাদের উপরে। দেখলাম, বাপ্পা শুধু নিস্তব্ধ নীরব হয়েই যায়নি, তার সঙ্গে যেন স্থিরের চেয়েও কিছু বেশি স্থির হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে স্থির। তাতে পলক পড়ছে না। তাকিয়ে দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না যে, লোকটি বর্তমানের কিছু দেখছে না।

দেখছে হয় তো অতীতকে অথবা ভবিষ্যৎকে, ভবিষ্যৎ নয়, এমন গল্পটির ক্ষেত্রে অতীতই হতে বাধ্য।

আমি ডাকলাম—বাপ্পা!

বাপ্পা সাড়া দিলে—উঁ।

বললাম—রাত্রি আর বাকি নেই হে।

সে বললে—হ্যাঁ। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে বললে—আসছি আমি। ঘরের মধ্যে গিয়ে সে ফিরে এল। ফিরে এসে নিজের চেয়ারখানায় বসে বললে—বলতে বলতে থেমে গেলাম। মনে হলো আমার জীবনের একটি গোপন ঘটনার কথা। ঘটনাটা বাদ দিয়ে গিয়েছি। তখনও বলতে বলতে থেমে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে অনেক চেষ্টা করেও কথা বলতে পারিনি। বাদ দিয়ে বলেছি। বলতে বলতে আরও দু'দুবার থমকেছি। বলতে চেয়েছি। বলি বলি করেও পারিনি।

একটুক্ষণ আবার এরপরও চুপ করে থেকে বাপ্পা বললে—বৈকুণ্ঠপুর থেকে রাত্রে উঠে আমি পালিয়ে এসেছিলাম। চোরের মতো।

আমি বললাম—তুমি ভারতবাবুর বিধবা বোন বিণীকে ভালবেসেছিলে।

বাপ্পা বললে—হ্যাঁ।

আমি বললাম—সে তুমি বলেছ। গোপন তো করনি।

—করিনি। কিন্তু কতটুকু বলেছি।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাপ্পা বললে—নাটকে গানে নভেলে ভালবাসার কথা আমরা সাজিয়ে সাজিয়ে বলি। জীবনে ভালবাসা কিন্তু ঘটনায় ঘটনায় ঘটে ঘটে যায়। সেদিন যা ঘটেছিল সেই কথাটাই বলা হয়নি। বলিনি। অথচ—।

—ওই ক্ষুদিরামের কথা বলাম, চারুর সঙ্গে অপবাদ দিয়েছিল লোকে। মেয়েটা সদ্য বিবাহিতা কিশোরী; চৌদ্দ কি পনের বয়স। রূপও ছিল মেয়েটার। তার থেকেও বেশি ছিল যৌবন। সে যেন কল্পনায় ভাবনায় ক্ষুদিরামের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে গিছল। অথচ দেহের দিক থেকে কিছু ঘটেনি। আমি ভালবেসেছিলাম—বিণীকে—।

কবে প্রথম ভালবেসেছিলাম—তা জানি না।

তবে—আশ্চর্য ক'টা ছবি আমার মনে আছে।

সদ্য বিধবা হয়েছেন বিণীদি। কলিযারী থেকে বৈকুণ্ঠপুর গিয়ে ভারতদার বাড়িই উঠতাম। দেখলাম থান কাপড় পরে একরাশ রুক্ষু এলো চুল পিঠে ফেলে আভরণ শূন্য দু'খানা খালি হাতে বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কপালে সিঁদুরের বিন্দুটি নেই। বিণীদি যেন আরও শক্ত হযে উঠেছেন। দেখে ভয় হয়েছিল। কিন্তু তবু সে বিণীদির সে রূপ কি রূপ! কি লাবণ্য! শ্যামবর্ণ রঙ, সামনের দাঁত দুটি একটু একটু উঁচু; ওঃ আমার সারা দেহমন যেন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল!

দ্বিতীয় ছবিটা শেষের বারের ছবি—।

সেবার এসেই দেখলাম বিণীদি চুল কেটে ফেলেছেন। একটু যেন রোগা হয়ে গেছেন, ঈষৎ কৃশাঙ্গী দেখাচ্ছে।

বুকেব ভিতবটা টনটন কবে উঠেছিল। এমন সুন্দব চুল এমন অপরূপ রূপ! বিষণ্ণ করুণ স্তব্ধ।

আমিও তাব সামনে স্তব্ধ হযে দাঁড়িযে বলতে চেষ্টা কবেছিলাম- -বাববাব চেষ্টা কবেছিলাম-- কেন আপনি চুল কাটলেন বিণীদি ? কি সুন্দব চুল ছিল আপনাব! কিন্তু বলতে পাবিনি! ভয হত বিণীদিকে।

একটুক্ষণ চুপ কবে থেকে গুছিযে নিযে বললে বাপ্পা—বোধ হয ভয আমাব নিজেকেও ছিল। দুবন্ত ভয ছিল। নিজেকে সম্বরণ করতে পাবব না -এই ভয আব বিণীদি আমাকে একেবাবে পছন্দ কবেন না —এই দুটো ভয মিশে আব একটা বিচিত্র চেহাবাব ভয সৃষ্টি হযে আমাকে আচ্ছন্ন কবে বাখত। বিণীদিব কাছ থেকে সভযে দূবে সবে যেতম।

ভাবতদা বলতেন -জীবনটা ওর ব্যর্থ হয়ে গেল -ওকে কি দোষ দেব ? কিন্তু আমিই বা কবব কি ? আমি ওবে কতবাব বলি চল চলে যাই এখান থেকে। তুই নতুন কবে পড়াশোনা কব। তা কববে না। না! প্রযোজন নেই। বলেছি ভুলে যা তোর এই বিযেব কথা. তুই বিযে কব। কিন্তু এমন কবে তাকায যে আমাকে যেন ভস্ম কবে দিতে চায। স্বদেশ বিধবা হযে কবেছে বলে তাব এ বাড়ি ঢুকতে বাবণ। তাব মুখ দেখবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন ভাবতদা- -কোন কোন দিন দু'চাব ফোঁটা জলও ঝবে পড়ত।

নীবব এবং আশ্চর্য বকম বিষণ্ণ বিণীদি ক্রমশ যেন বোবা হচ্ছিলেন। এবং চুপ কবে থাকাব ধবন ও ধাঁচটা আপনাআপনিই পাল্টাচ্ছিল।

আমাব সঙ্গে কথা ছিল— দুটো। চান কববে কখন ?

আব খাবাব সময শেষকালে এসে দাঁড়াতেন কিছু নেবে ?

ভাবতদাব সঙ্গে একসঙ্গে থাকলে কথাগুলো ভাবতদাকেই বলতেন। শেষ আমাকে বলতেন—-তুমি ?

আমি কোনদিন কিছু চাইনি। ভাবতদা কিছু নিলে সেটা বাধ্য হযে আমাকে নিতে হত। আমাকে জিজ্ঞাসা না কবে দিযে যেতেন।

কখনও কখনও আপন মনে আগুন ছড়ানোব মতো তপ্ত কথা আপন মনে বলে যেতেন বলতেন ভাবতদাকেই, কিন্তু আমাকেও তাব আঁচ লাগত। বলতেন--খেযে নিযে আমাকে খালাস দাও। তোমাদেব বঙ্গ বস হাসি গান বিবহ প্রেম আছে তাই নিযে নাটক কবছ, কব। কিন্তু আমাকে দগ্ধাও কেন ?

তাব মা পঙ্গু হযে যাবাব পব থেকে জীবনেব সব মমতা এবং সব ক্রোধ যেন ওই মাযেব উপবই গিযে পড়েছিল। প্যাবালিসিসে ডান দিকটা পঙ্গু হযে গিছল; একথা এড়িযে গিয়ে হয়ে পড়েছিল দুর্বোধ্য। মাযেব চিৎকাব শুনে মনে হত বুঝি কোন জন্তু যন্ত্রণায় কিংবা বাগে চিৎকাব কবছে। প্রথম প্রথম ছুটে যেতেন বিণীদি, উত্তব দিতে দিতে ছুটতেন—যাই -যাই। এই তো আসছি। বাবাঃ—

ক্রমে দেখলাম—বদলাল উত্তরের ধারা। শেষবাব যখন গেলাম—তখন মায়েব চিৎকারেব উত্তবে বিণীদিও চিৎকাব করে উঠলেন—যাই। বুকে পাথব একখানা—।

চাপিযে দিইগে যাইটা বললেন না, উত্তপ্ত পদক্ষেপে চলে গেলেন। অথবা চিৎকাব কবে উঠলেন --তুমি মব। শবীবটা আমাব—। থেমে গেলেন। জুডোকটা আব বললেন না।

ভাবতদাব সঙ্গে কথা বলতে দপ্ কবে চোখ দুটো জ্বলে উঠত। তাবপবই মুখ ঘুবিযে চলে যেতেন।

বোগা হচ্ছিলেন দিন দিন। সে যেন আগুনেব শিখাব মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে ফুবিযে আসছেন মনে হত। অন্তত আমাব মনে হত।

ভাল আমি বেসেছিলাম অনেক দিন, বুঝতে পারিনি। সেবাব আমাব বুকেব মধ্যে পুরুষেব সনাতন কামনা-বাসনাগুলো বোধ হয জেগেছিল। দেহেও সেরেছিলাম, বোধ হয রূপেও ফুটে উঠেছিলাম। ভাবতদা দেখে বলেছিলেন--তাই তো এ ছ'মাসেব মধ্যে তুই দেখি পাল্টে গিয়েছিস ইন্দু।"

খুটি ধবে দাঁড়িয়েছিলেন বিণীদি। বটি দিয়ে চুলগুলো কেটেছে বিণীদি, লম্বায অসমান চুলগুলো কাঁধেব উপব পড়েছিল। তাতে তাঁব রূপ কমেনি। দাঁত দুটি একটু উঁচু, শ্যামবর্ণ গাযেব বং, থান কাপড় পবা বোগা শীর্ণ দেহ বিণীদি আমাব দিকে তাকিযে দেখে, খুটিটা ছেড়ে দিয়ে ঘবেব ভিতবে চলে গিছলেন।

আমাব বুকেব ভিতব বাসনাব আলোড়ন উঠেছিল।

শুধু একটা কথাই মনেব মধ্যে বাবেবাবে গুঞ্জবন কবে উঠেছিল— কি রূপ! কি রূপ! বিণীদিব একি রূপ!

একটি কথা বলবাব জন্যে সারা হযে উঠেছিলাম কিন্তু কথা কইবাব ছুতো খুঁজে পাইনি বা তৈবি কবে নিতেও পাবিনি।

হঠাৎ কথা বিণীদিই বললেন-- নিজে থেকে।

সেই পুরনো- 'চান কব।' কিংবা -'কি নেবে বল'—কথা দুটোব কোনটা নয। ও দুটো কথা ছিল না। ঘাড়তে যেমন ঘন্টা বাজায আধঘন্টা বাজায -ও কথা দুটোও তাই ছিল।

অভিনয ভাল হয়েছিল। বড়বাবু খুশি হযে বলছিলেন— ইন্দু তোব মাইনে এপ্রিল থেকে দশ টাকা কবে বাড়ল। টাকাটা কিন্তু তুই হাতে পাবি নে। আমি তোকে কিছু জমি কবে দেব- -এই ক্যানেলেব ধাবে। ওই টাকাটা আব কিছু কিছু মাস মাস কেটে দিব। বাড়ি একখানা কবে ফেল—তাবপব বিযে কব।

অভিনয—সেই সাহেবদেব মনোবঞ্জনেব জন্য। সাহেববা খুশি হযেছেন। আমিও খুশি হযেছি। দ্বিতীয দিন বাত্রে হলো বিসর্জনী মানে 'মদন বতি মিলন'। আমি গোলাপী আর বতি কবেছি। বাত্রে এসে ভাবতদাব সঙ্গে শুয়েছি।

সকালে উঠে মুখ-হাত ধোব বলে তোয়ালে কাঁধে বাইরে এসে দাঁড়ালাম—ওদিক

থেকে স্নান করে থান কাপড় পরা বিণীদি বেরিয়ে এলেন আর একখানা ঘর থেকে। আমার মুখে তখনও রঙ লেগে রয়েছে, চোখে কাজল রয়েছে, ভুরু আঁকা রয়েছে।

বিণীদি বলে উঠলেন—তোমার পার্ট কাল খুব ভাল হয়েছে—ইন্দু।

সারা অঙ্গে আমার বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গেল। মুখ নামাতে গিয়ে না নামিয়ে উঁচু মুখে বিণীদির দিকে তাকিয়ে বললাম—আপনার ভাল লেগেছে?

ছবিতে সূক্ষ্ম লাইনে আঁকা ঠোঁটের এক আশ্চর্য হাসি হেসে বিণীদি বলেছিলেন—কি মানিয়েছিল তোমাকে! কোন মেয়ে যদি সাজত তাহলে এমন মানাত না!

আমার মনে পড়ে গেল গ্রীনরুমের বড় আয়নাটায় দেখা আমার গোলাপী সাজা আমিকে—এবং রতি সাজা সেই প্রতিবিম্বকে।

বিণীদি চলে গেলেন। আমি ভাবছিলাম আমি বলব—বিণীদি, এর আগে পর্যন্ত আপনি কখনও আমার পার্ট সম্বন্ধে কিছু বলেননি। ভালও না—মন্দও না। কিন্তু সে আর আমার বলা হলো না।

না-হোক। ওতেই আমি প্রমত্ত হয়ে গেলাম। প্রমত্ত বলা ঠিক হলো না—খুশিতে আমি মাতাল হয়ে গেলাম।

বুঝলাম আমি বিণীদিকে ভালবেসেছি। তা কেন—ওকে আমি চিরকাল ভালবাসি। কিন্তু সে কথা বলব কি করে।

সারা দিন আরও ক'বার চোখাচোখি হলো কিন্তু বিণীদির ঠোঁটে সে হাসির রেখা আর দেখা দিল না। শুধু চোখে চোখ মিলতেও বিণীদি মুখ ফিরিয়ে নিলে না কি চোখ নামালে না। চোখ ফেরালাম—চোখ নামালাম আমিই। দু'দিন থিয়েটার গেছে শেষরাত্রে এসে শুয়েছি। সকাল মানে দশটা নাগাদ আবার স্টেজে গিয়ে রিহারস্যাল দিয়েছি। বিকেলে ফিরেছি। আবার সন্ধ্যেতে থিয়েটারের আসর। পরের দিন ঘুমের দিন। অগাধ ঘুম—আর নিরন্তর স্বপ্নরাজ্যের মেলা। কানের মধ্যে যেন অর্কেস্ট্রা বাজে গান হয়, বড় ভাল লাগে, জেগে উঠলে বা জাগিয়ে দিলে শরীর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। সেদিন কিন্তু আমার ঘুম এল না। চুপ করে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে রইলাম, চোখের উপর ভাসতে লাগল—গ্রীনরুমের আয়নায় দেখা আমারই রতি সাজা মোহিনী মূর্তি। বারকয়েক বাইরে এলাম—বারকয়েক বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের জানালা খুলে বাইরের উঠানে চোখ পাতলাম। কানকে উৎসুক উদ্‌গ্রীব করে তুললাম। বিণীদিকে দেখলাম। বৈশাখের পয়লা। দুপুরবেলা ঢাক বাজিয়ে শিঙে বাজিয়ে বুড়ো শিব জলে গেলেন। ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ উঠল সেইদিন বোধ হয় প্রথম। গ্রামের মেয়েরা ছাড়া সকলেই গেল ভক্ত নাচ দেখতে। ভারতদা বাড়ি ছিলেন না, বড়বাবু তাঁকে সঙ্গে করে বর্ধমানে গেছেন। পয়লা বৈশাখ স্বদেশী-মতে নিউইয়ারস ডে করা হবে। ডি-এম প্রভৃতির সঙ্গে কয়েকটা কাজ আছে তাও সারা হবে। তারপর সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরবেন। এসব ক্ষেত্রে ভারতদা ভিন্ন ওঁদের হয় না। জানালা-দরজা বন্ধ করা প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি জানালার গায়ে একটা ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে দেখলাম বিণীদি সে

এক নিষ্পলক চোখে স্থিব দৃষ্টিতে বৈশাখেব সেই ঘষা কাচেব মতো আকাশেব দিকে তাকিয়ে আছেন।

একবাব দেখলাম কযেকটা ঘুটি নিয়ে লুফে লুফে খেলা কবছেন।

তাবপব দেখলাম শুযে পড়েছেন। বাঁধানো দাওয়াব উপব—হাতেব তালপাখাব আড দিযে চোখ ঢেকে শুযে—বোধ হয ঘুমিযে পড়েছেন।

বাত্রে খাওযাদাওযা ছিল। বৈকুণ্ঠপুবে থিযেটাবেব ওটা ছিল বেওযাজ। অভিনয শেষ হযে গেলে ঠিক পবেব দিন ডিনাব বলুন ফিস্ট বলুন—মাইফেল বলুন একটা হত। পোলাও বা খিচুড়িব সঙ্গে খাসীব মাংস – বাবুদেব পুকুবেব বোহিত মৎস্য— আব বর্ধমানেব মিহিদানা — সীতাভোগ, শক্তিগড়েব ল্যাংচা এই নিযে হত মাইফেল। তাব সঙ্গে নাটকেব কথা।

আমি চুপ কবে বসে ছিলাম। আমাব বুকে একটা উদ্বেগ যেন চেপে বসে গিযেছে তখন। সেই উদ্বেগটা আব কিছু নয— সে উদ্বেগ — বিনীদি।

প্রশংসা আমাবই হলো বেশি। তবু আমি আড়ষ্ট হযে বইলাম। সে একটা আশ্চর্য যন্ত্রণা। একটা কান্না যেন বুকেব ভেতব কোন্ গভীব থেকে গভীবে আমাকে বিষন্ন কবে ফেলেছিল।

সবাই বললে —আমাব শবীব খাবাপ। আমি কিছু বলিনি। আমাব মাইনে বাড়ল – বড়বাবু বললেন একটি ভাল কাযস্থ মেযে থাকলে দেখো হে। আমি ববকর্তা। এবপব সকলেব আগে বম কবে খাইযে আমাকে ছেড়ে দিলেন। ভাবতদা কর্মকর্তা, ওব সঙ্গেই প্রতিবাব সকলেব শেষে যাই। এবাব ভাবতদা পকেট থেকে চাবি বেব কবে দিযে বললেন তুই শুযে পড় গিযে। আমি গিযে তোকে ডাকব, তুই দবজা খুলে দিবি। কিংবা আমি আজ যাবই না। এখানেই শুযে পড়ব। চমৎকাব বাতাস এখানে।

* * *

অনেক বাত্রে ভাবতদা আব আমি বিহাবস্যাল সেবে বাড়ি আসতাম। বিনীদিকে কষ্ট দিতে চাইতেন না ভাবতদা। ব্যবস্থা ছিল সদব দিকে বাইবেব দবজাটায তালা লাগিযে চাবি নিযে আসাব। শুধু বাইবেব দবজাই নয – ভাবতদাব ঘব এবং আমাব ঘব, দুটো ঘবেবও দবজায তালা দেওযা থাকত। বাত্রে বাড়ি ফিবে চাবি খুলে বাড়ি ঢুকতেন ভাবতদা, তাব সঙ্গে আমি।

সেদিন আমি একলা বাড়ি ফিবে দবজাব তালা খুলে বাড়ি ঢুকলাম। নিস্তব্ধ বাড়িটাব উঠানে একটা চাঁপাগাছ ছিল। চাপা ফুলেব গন্ধ পেযে গাছতলায বসে একবাব দাঁড়িযে গাছটাব দিকে তাকিযেই তাকালাম বাড়িটাব দিকে। অঘোবে ঘুমোচ্ছে বিনীদিবা। তাব মা আব সে! অথবা অন্ধকাব ঘবে খোলা জানালাব ভেতব দিযে বাইবেব দিকে তাকিয়ে কত কিছু ভাবছে। কি ভাবছে? কে জানে? চুলগুলো কেটে ফেলেছে বিনীদি—খালি হাত, থান কাপড় পবে বোগা হযে গেছে -

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

আমাব ঘবখানা নিচেবতলায় চাপাগাছটাব সামনেই। আমাব ঘবখানাব বন্ধ দবজাব কাঠেব ফাঁক দিয়ে একটি দীর্ঘ বক্তাভ আলোব ছটা এসে বাবান্দা পাব হয়ে উঠানেব খানিকটা পর্যন্ত লম্বা একটা দড়িব মতো পড়ে বয়েছে। আমাব ঘবে আলো জ্বলছে! কেন?

একটা গান ছিল, গেয়েছিলাম একটা বইয়ে।

'বুকে আমাব শাওন আঁধাব গভীব গবজন।' বুকখানা আমাব ধড় ধড় ধড় ধড় কবে উঠেছিল। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম বাবান্দাব সিঁড়িব নীচে। দেখলাম আলোব বেখাটা স্পষ্ট। অনুজ্জ্বল নয়। আসছে দবজাটাব দুটো পাল্লাব জোড়েব মুখ থেকে। একটি সরু বেখা। উপবে উঠে গিয়ে দবজাব ফাঁকে চোখ পাতলাম।

মুহূর্তে যেন অসাড় অবসন্ন হয়ে গেলাম।

ঘবেব ভিতবটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। একটা হ্যাবিকেন জ্বলছে, স্তিমিত জ্যোতিতে নয়। উজ্জ্বল শিখায়।

তাবই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি আশ্চর্য রূপসী মেয়ে।

আমাব তক্তপোশটাব সামনে ছোট একটি টেবিল পাতা, সেই টেবিলটাব উপব আমাবই নতুন কেনা বেশ বড় সাইজেব আয়না সামনে রেখে নিজেকে দেখছে। আমাব মেক-আপ বাক্সটা খোলা পড়ে বয়েছে। সম্ভবত পাউডাব স্নো মেখেছে তাব আভাস পাওয়া যাচ্ছে গন্ধে। পবনে তাবেব সেই গোলাপ বঙেব কালো পাড় শাড়িখানা যেখানা পবে আমি গোলাপী সেজেছিলাম। হাতে দু'গাছা বালাও পবেছে। ও ও আমাব। গিল্টিব গহনা।

ঘনঘোব মেঘেব মধ্যে যেমন মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উঠে ঘূবপাক খায়, আমাব বুকেব ভিতবটা তেমনিভাবে আবর্তিত হচ্ছিল উথলে উথলে উঠছিল। আমাব জ্ঞান যেন চলে যাচ্ছে—আমি যেন আমাকে হাবাচ্ছি তখন। একবাব কি মনে হয়েছিল জানেন? মনে হয়েছিল- ও আমাবই ছবি। গ্রীনরুমেব সেই বড় আয়নাটায় যেটা ফুটে ওঠে। স্থান-কাল হাবিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল গ্রীনরুমেই দাঁড়িয়ে আছি।

ঘবেব ভিতব মেয়েটি একবাব দবজাব দিকে ফিবে দাঁড়াল। পিছনে তাব ওদিকেব দেওয়াল। হেঁট হয়ে একটা কলসী সে কাঁখে তুলে নিয়ে একটু হেলে দাঁড়াল। তাবপব মুচকে একটু হাসলে আয়নাব দিকে তাকিয়ে। এবং অত্যন্ত মৃদুস্ববে গান ধবলে— সে তাব ঠোঁট নড়া দেখে বুঝলাম। গোলাপীব গানখানাই সে গাইছিল।

হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়।

এবং একটি মৃদু দোলনে সাবা কমনীয় তনুখানকে দোলায় দুলিয়ে দিলে। আয়নাব মধ্যে প্রতিফলিত নিজেব প্রতিবিম্বেব দিকে চেয়ে তাব চোখ কথা কয়ে কয়ে উঠতে লাগল।

আমার সাবা শবীবে আব একটা উল্টো জোয়াব বইতে শুরু কবল। বোধ হয় জন্তুব মতো হয়ে উঠছি। ক্রুব কুটিল জন্তুব মতো। হঠাৎ একটা তুড়ি দিয়ে ফেললাম।

নিস্তব্ধ রাত্রি, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। তার মধ্যে তুড়ির শব্দটা অব্যর্থ লক্ষ্য তীরের মতো তার কানে পৌঁচেছিল। মুহূর্তে সে চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাঁখের কলসীটা রেখে দিয়ে সে পা টিপে টিপে এসে দরজার ঠিক ওপাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকেছিল। আমি দু'পা পিছিয়ে এসেছিলাম।

মৃদুস্বরে ফিসফিস একটা শব্দ যেন একবার উঠেছিল --কে ?

আমি উত্তর দিতে চেয়েও পারিনি।

কতক্ষণ তা বলতে পারব না। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। আমি বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মূর্তির মতো। ওপাশে ঘরের ভিতরে বিনীদি দাড়িয়ে রইল গোলাপী সেজে। ওই একবার---'কে ?' প্রশ্ন করা ছাড়া আর কোন কথা বললে না।

একসময় জন্তুর মতো চিৎকার করে উঠল তার মা। কাছে একটা ঝি তার থাকত কিন্তু এক এক সময় মেয়ে না এলে মা শান্তও হত না, চিৎকারও থামত না।

দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে গেল।

বিনীদি নীরবে আমার দিকে না তাকিয়ে চলে গেল মায়ের ঘরের দিকে। আমি এই মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে আমার হাত দু'খানা প্রসারিত করেছিলাম —তার দিকে

চাপা গলায় বলেছিলাম-- বিনীদি—

সে বলেছিল- ছুঁয়ো না আমাকে। সে যেন কোন সাপের গর্জন।

আমি কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মধ্যে ঢুকে জল খেয়ে শুধু মাথাটা দু'হাতে ধরে বসেই ছিলাম। বসেই ছিলাম।

সারা রাত্রিই পার হয়ে গেল।

ভারতদা এলেন না। বারবার বাইরে এসে উঠোনে ঘুরলাম। একসময় শেয়াল প্যাঁচা বাদুড় ডাকলে- -। বুঝলাম রাত্রির শেষ প্রহর। আমি আমার ছোট হাতব্যাগটা আর মেকআপ বাক্সটা তুলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটলাম। পিছন ফিরে তাকাইনি। মনে হচ্ছিল গোলাপীর পোশাকে সেজে গ্রামের পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে আছে বিনীদি।

এসে গণেশ অপেরায় আশ্রয় পেলাম। তার সঙ্গে পেয়েছিলাম কেষ্টবিনোদদাকে। সেই কেষ্টবিনোদদা, আমাকে চড় মেরে গণেশ অপেরা ছেড়ে চলে গেল অন্য দলে। আট বছর এ দল ও দল করার পর হঠাৎ 'কেষ্টবিনোদ' পড়ল।

পড়ল মানে তার দল সে নিজে তার সঙ্গে ওই মায়াবাদী সবাইকেই এবং সব কিছুকেই বাতিল করে দিলে দর্শকে।

কেষ্টবিনোদের পতন, এ যাত্রা দলের সবার কাছেই বিস্ময় মনে হয়েছিল। কেষ্টবিনোদের কংস, গয়াসুরে রুক্মাঙ্গদের হরিবাসরে রুক্মাঙ্গদের পার্ট যারা দেখেছে তারা এ সংবাদে সবিস্ময়ে বলে---আরে বাপরে! বাপরে! সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে, তা হলে আমাদের হবে কি ?

কেউ কেউ যাঁরা যাত্রা জগতের বিশিষ্ট গুণী লোক তাঁরা বলেন—বাবা—দেশটায় দুনিয়াটায় কি ঘটল কত উত্থানপতন হয়ে গেল তা দেখতে পাও না, বল, বাপরে কেষ্টবিনোদের এই হলে আমাদের হবে কি? হবে, যা হবার ঠিক হয়ে যাবে, কেউ ওল্টাতে পারবে না। ইংরেজ দেশ থেকে চলে গেল, শালা নিজামের হারেমের কেনা বাঁদীগুলো রাতারাতি খালাস হয়ে গেল—সকালবেলা তারা "দেখ সখী দেখ, চোখ চেয়ে দেখ শিশিরে হইল অস্ত।" বলে গান ধরে বেরিয়ে পড়ল পথে পথে। যাত্রা দলের অ্যাক্টরগুলোর পরনে এখন আর কাপড় নেই—চাঁদনীর পেন্টুলেন উঠেছে। তার পরেও বলছে—কেষ্টবিনোদের এই হলো। এই তো হয। এই নিযম। উঠেছিল—পড়বে না। তবে—।

কেউ কেউ আবও ভেবেচিন্তে বলে—তবে উনি যদি ওই সব পৌরাণিক ভক্তিচচ্চড়িগুলো না-করে মডার্ন ড্রামা ঐতিহাসিকটাসিকও কবতেন আর নিজের ওই মেলোড্রামা কবা অ্যাকটিং পাল্টাতেন—তা হলে এমনটা কখনই হত না। তার উপব ওই মাযা—বাবা মহামাযার মাযা। লাগ ভেলকী লাগ লাগ!

এমনি সমযে একদিন—হঠাৎ বিচিত্রভাবে দেখা হযে গেল কেষ্টবিনোদেব সঙ্গে। ডালপালা শুকিযে আসা—দুশো-পাঁচশো বছব বযসের বিশাল কাণ্ড বটগাছেব মতো চেহারা হয়েছে তখন কেষ্টবিনোদের।

বিপদে পড়েছে কেষ্টবিনোদ। চরম বিপদ।

আমি তখন মডার্ন অপেরায রয়েছি; যে বছব 'বিদ্যাসাগর' বই উদ্বোধনের জন্য আপনি এসেছিলেন ববীন্দ্রসদনে সেই বছব। আপনাব সঙ্গে সেই আলাপেব মাস তিনেক পর। আমাদের মডার্ন অপেরা তখন তিন তিনখানা বাঘা বাঘা বই নামিযেছে। একখানা বিদ্যাসাগর, একখান্যা হলো 'রক্তের স্বাদ নোনা', অন্য খানা ঐতিহাসিক। একদিকে ফিরিঙ্গী আর একদিকে মোগল আব একদিকে বাঙালী। তাও তাবা বাজা জমিদাব নয। একটি গেরস্ত মেযে আব একটি ছেলে। সেই মেযের পার্ট আমার। দুর্দান্ত বই। বাঙালীব জয হচ্ছে। মজাও আছে, পোর্তুগীজ সাহেব মুড়ি খাচ্ছে পেঁযাজ কামড়ে কামড়ে। বাজারে মডার্ন অপেরার দারুণ নাম সেবাব। আমরা গাওনায বেরিযেছি কযলার অঞ্চলে।

রাসের সময ঝরিযায রাজবাড়িতে খুব ধুমধাম। নাগাড় উৎসব। কীর্তন ঢপ কৃষ্ণযাত্রা খ্যামটা নাচ বাই নাচ—অপেরা যাত্রা চলছে একটার পর একটা। গোটা অঞ্চলের কলিযারী প্রোপ্রাইটর, ম্যানেজার, বাবুটাবুদের অন্তত বিশিষ্টদের নেমন্তন্ন হযেছে। হুইস্কী, ব্র্যান্ডি, রম থেকে ধ্যানেশ্বরী পর্যন্ত সে অঢেল ব্যবস্থা। সেখানে আমাদের গাওনা শনি, রবি, সোম। আমবা ধানবাদে গিযে পৌঁছলাম—শুক্রবার সকাল দশটার সময়। সেদিন সন্ধ্যায ধানবাদ রেল ইনস্টুটে বাযনা হয়েছে আমাদের। শুক্রবার ধানবাদ থেকে শনিবার সকালে যাব ঝরিযা।

ওদিকে ঝরিয়ায গত দু'দিন মায়াবতী অপেরার গাওনা গেছে, সেদিন মানে ওই শুক্রবাব এখানে মাযাবতী অপেরার শেষ অভিনয়।

ঝরিয়ার আসর প্রসিদ্ধ আসর। রাজাদের অঢেল পয়সা। কলিয়ারীর রয়াল্টি। ইংরেজ সাহেব, কাচ্চি, মাড়োয়ারী, গুজরাতী, বাঙালী ধনীরা রাজাদের কাছে জোড়হস্ত। রাজারা এদেশের সরল মানুষ। বিলাসের আর শেষ নাই। বড় বড় বাড়ি—ঠাকুরবাড়ি আস্তাবল-টাস্তাবল নিয়ে সে সত্যিই রাজকীয় ব্যাপার। দক্ষিণে এবং ভাল অ্যাক্টরদের পুরস্কার সেও এলাহী কাণ্ড।

কেষ্টবিনোদদার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তখন সাত বছর পূর্ণ হয়ে চলছে আট বছর। খবরটা শুনে অবধি মনে মনে একটা ইচ্ছে যেন গর্তের মধ্যে সাপের মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল—সময় করে ঝাঁ করে গিয়ে কেষ্টবিনোদের সঙ্গে দেখা করে আসব। কেষ্টবিনোদ এখন নিশ্চয় সেই কেষ্টবিনোদ নয়। বয়স ষাটের কাছে পৌঁচেছে। যাত্রার আসরে সে খ্যাতি নেই। দলের অবস্থাও তেমনি। লোকজন ভাল নেই। যারা আছে—তারাও সন্তুষ্ট নয়। সমস্ত মূলধনের মূল একমাত্র নাকি মায়াবতী মেয়েটি নিজে। আর একটা নাচের মেয়ে দলে আছে, সেটা নাকি আসরে রঙ ধরায়। এই অবস্থায় কেষ্টবিনোদ রয়েছে কেমন—এটা জানবার বড় আগ্রহ ছিল আমার। বিদ্যাসাগরে আমার পার্ট তো দেখেছেন। ওর থেকেও ভাল করেছিলাম—ঐতিহাসিক নাটকখানায় ওই বাঙালী মেয়ে হিরোইনের পার্টটা। সেবার বলতে গেলে আমার ফর্ম টপে উঠেছে। মাইনে উঠেছে আটশোতে। দেখা করে বেশ মিছরির ছুরি চালিয়ে চালিয়ে বলব—কেমন আছ বল — কেষ্টদা! আমি ভাই এখনও মেয়ের পার্টে চালিযে যাচ্ছি। এখন তোমার হালচালটা বল।

সেই পুরনো কালের কেষ্টবিনোদদার মুখখানা আমার মনের চোখের সামনে শুকিয়ে যেত।

দলের ম্যানেজারকে জি[illegible]সাবাদ করে নিয়ে একটা টাইমটেবল গোছের করে নিয়েছিলাম। মায়াবতী মেয়ে যাত্রা ঝরেতে গাওনা শেষ করবে শুক্রবার রাত্রে এগারটা নাগাদ। ধানবাদে আমাদের সন্ধ্যায় বায়[illegible]। কিন্তু ধানবাদের নাটকে আমার নামলেও চলে না-নামলেও চলে। দলের পুরনো বই। এ বইয়ের পুরনো হিরোইন আছে—আর ভালই করে। সুতরাং আমি যদি সন্ধ্যেতেই ঝরে গিয়ে যাত্রার আসরে যাত্রা শুনতে বসি তবে কেমন হয়?

ধানবাদ স্টেশনে নেমেই কেষ্টবিনোদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাওলা পুরনো [illegible]গাছের মতো মনে হলো। চুলগুলো পেকে গেছে, কিছু উঠে গেছে। আগে নিজের চুলেই চালাতো কেষ্টবিনোদ, সে চুল কখনও করত হিন্দু কার্লিং কখনও করত মুঘলই কার্লিং। এখন মাঝখানে মস্ত টাক। সামনেটায় ঠিক কপালের মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপের মতো একগুচ্ছ কাঁচাপাকা চুল। মুখে রেখা পড়েছে। রাত্রের পেন্ট মোছা হয়নি, পেন্টের জন্যে ওই রেখাগুলো যেন বেশি উৎকটভাবে প্রকট মনে হচ্ছে। দাঁত মনে হলো বাঁধানো। আধ ময়লা একটা বোতাম ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরে ত্রিভুবনের উৎকণ্ঠা উদ্বেগ যন্ত্রণা মাথায় করেই যেন দাঁড়িয়ে ছিল। জীবনের আসল অবস্থার এমন সুস্পষ্ট প্রতিফলন আর দেখা যায় না।

আমাদেব ম্যানেজাবেব ডান হাতখানা জডিয়ে ধবলে কেষ্টবিনোদ। কিছু বললে। কি বললে শুনতে পেলাম না, একটু দূবেই ছিলাম। হন্ হন্ কবে এগিযে গিযে ওখানে কেষ্টবিনোদেব পিছনে দাঁড়িযে শুনলাম কেষ্টবিনোদেব গলা কাপছে। কান্নাব যোপানিতে কাপছে। বললে – আমাকে বাচাও ভাই। না হলে আত্মহত্যা কবা ছাড়া আমাব আব পথ থাকবে না।

আমি সামনে এসে দাড়ালাম। কেষ্টদাব ধৈর্যেব বাধ ভেঙে গেল। সে হাউ হাউ কবে কেঁদে উঠল।

— বাপ্পা! ভুহ!

মাযাবতী অপেবা বিপদে পড়েছে। যাত্রা দলেব পক্ষে এতবড অপমান আব হয না। মাযাবতী অপেবাব পত্তনেব পব থেকে আজ পর্যন্ত ঝবিযাব বাডবাডিতে বাসে গাওনা কবে থাকে। বাজা সাহেব কাকা সাহেব এমাব সাহেব প্রভৃতিবা মাযাবতীব যাত্রাব ভক্ত। গত কযেক বছব থেকে যাত্রাব রুচি, নাটক, অভিনযেব ধাবা পাল্টাবাব পব থেকে মাযাবতী দেশেব আসবে একটু একটু কবে জনপ্রিযতা হাবাচ্ছিল। গত বৎসব এখানেও বেশ খানিকটা নিন্দে এবং কুডিযেছিল, তাব জন্য বকশিশ টকাশিশ হাতেব মুঠো থেকে খসে হযে পড়েই ক্ষান্ত হযনি। কিছু কিছু মন্দ কথাও শুনিযেছিল। এবাব বাযনাব সময বলেও এসেছিল বাডবাডিব বাযনাকাবী কর্মচাবী যে, দেখবেন মশায গতবাবেব মতন যেন না হয। কিন্তু তাই হযেছে, ববং তাব থেকে অনেক খাবাপ হযেছে অভিনয। প্রথম ভাল অভিনেতা নেই। এক আছে প্রবীণ বযস্ক অ্যাক্টব, যাদেব চলতিদলে দব কমেছে। আব আছে একেবাবে নতুন যাবা কম মাইনেতে শুধু খোবাক জলপান নিযে কাজ কবছে। নাটক তেমনি বেছে বেছে ধবেছিল কেষ্টবিনোদ। নিজেব পার্ট আব ওব মাযাবতী নাম্নী সুবসিকা সুন্দবী গাযিকাটিব পার্ট দিযেই প্রায সবগুলো ভর্তি। তাব উপব বেশভূষা, চুল দাড়ি এব পুবনো হযে গেছে। এই নিযে শুরু। এব জন্যে মাযাবতী অপেবা টিটকিবিব প্রায প্রত্যেক আসবেই খাচ্ছিল। ঝবিযায সেটা চবমে উঠল, একজন দর্শক অবশ্যই অপ্রকৃতিস্থ, সে দেববাজ ইন্দ্রেব অভিনেতাব জামাটা টেনে ছিড়ে দিযে বলেছে—এই এমন দুর্গন্ধওযালা জামা পবে ইন্দ্রত্ব ফলাতে এসেছ বাবু? চালাকি কববাব জাযগা পাওনি?

দেখাদেখি এসব বোগ বাডে ছোযাচে বোগেব মতো। এবপব নাবদেব দাড়ি টেনে খুলে দিচ্ছিল। কাবণ সেগুলো মডার্ন ক্রেপেব দাড়ি নয। সেই সেকেলে কাপড়ে বসানো তাবেব ফ্রেমে গাথা দাড়ি। যাব বযস অন্তত দশ বাবো বছব।

এবপব দলেব মধ্যে আসামীদেব গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ঝগডা বেধেছে। একটা ঝগডা আছে—মালিকপক্ষ এবং সমস্ত আসামী নিযে। পোশাক চুল নিযে কেলেঙ্কাবীব জন্য কেষ্টবিনোদ আব মাযাবতী ঠিক কবেছিল—কিন্তু পোশাক চুল বানীগঞ্জ থেকে ভাডা কবে আনবে। আসামীবা বলছে— তা আনতে পাব কিন্তু ভাডা গাওনাব টাকা থেকে বাদ যাবে না। সে দিতে হবে মালিকদেব। এব উপবেও এবাব বাজাবা বকশিশ

দেবেন না গুজবটা এমন রটে গেছে যে—আসামীরা বলছে—ঝাঁটা মারো শালা দলের মুখে! গাইব না আমরা।

তৎসত্ত্বেও কোন রকমে পালা আরম্ভ হয়েছিল। পালা ছিল, 'তরণীসেন'। রাবণ কেষ্টবিনোদ। সরমা—মায়াবতী। তরণী একটি মেয়ে। সীতা ছিল কাঁদো কাঁদো মুখ অন্য একটি মেয়ে। প্লে চলছিল কোনরকমে। আসরে লোকজন খুব বেশি ছিল না। যারা ছিল তারা কেষ্টবিনোদ এবং মায়াবতীর জন্যেই ছিল। ওরা প্রাণপণ চেষ্টাও করছিল। তার জন্য সরমা সেজেও মধ্যখানে মায়াবতী উর্বশী সেজে একটা নাচ পর্যন্ত দিয়েছিল। এরই মধ্যে বিভীষণ তরণীসেন পার্ট করতে করতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেন হেসেছিল। আসরে দর্শকেরা চটেছিল। আর চটেছিল রাম। যাত্রার দলের দুটো জীবন—গ্রীনরুমের জীবনে তরণীসেন সেজেছিল যে মেয়েটি সে ছিল রামের প্রণয়িনী। রাম তরণীকে সাবধান করে দিয়েছিল—প্রথম বার, দ্বিতীয় বারে সরাসরি একেবারে গালে কষিয়ে দিয়েছিল একটি খাল চড। তারপরই হৈ-হৈ এবং হাঙ্গামা। তরণীসেন-সাজা মেয়েটি আকারে-প্রকারে একটু ভারী মেয়ে। পুরুষালী পার্ট ভাল করে। চড় খেয়েই সে গর্জে উঠল—খোঁচা খাওয়া বাঘিনীর মতো না হোক, সাপিনীর মতো নিশ্চয়। মাথায় পাগড়ী আর পুরুষের পরচুলো টেনে খুলে ফেলে দিয়ে বলেছিল—আমি কি কারুর কেনা বাঁদী না—তুই আমার সাতপাকের ভাতার যে চড় মারবি? আমাকে যাত্রা দলের ছেলে পেয়েছিস নাকি?

এতেই প্লে বন্ধ থেকেছিল সে প্রায় আধঘণ্টা। মিথ্যা অসুস্থ হওয়া খবর ঘোষণা করে, প্রাণপণে কনসার্ট বাজিয়ে—অবশেষে সরমার পার্ট করছিল যে মায়ারানী—সে পোশাক পাল্টে উর্বশী সেজে নেচে হাঙ্গামা হওয়ার মতো সময় পার করে—বাকিটা টেনে-টুনে চালিয়েছে। তবে সে প্লেকে আর প্লে বলে না। লোকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করেছে। প্লের পর রাত্রে চারিদিকের নানান কলহ কচকচি এবং অপমানজনক কথা শুনে—জন পাঁচ-সাত লোক রাত্রি থাকতেই উঠে পালিয়ে গেছে। ঝরিয়া থেকে ধানবাদ হয়ে কোথাও পালিয়েছে। দলের ফ্লুটওয়ালা ফ্লুট নিয়ে পালিয়েছে। রাম পালিয়েছে, তরণীসেন মেয়েটা পালিয়েছে। সকালে উঠে কেষ্টবিনোদ এবং দলের বাকি লোকেদের কাছে ত্রিভুবন অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই খবরটা রটে যাবার পর থেকে নানান কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে—কেষ্টবিনোদকে নাটমন্দিরের খুঁটিতে বেঁধে কোঁড়া লাগাবে কুমার সাহেব। কেউ বলছে সাজ-পোশাক বায়া তবলা ঢোল ঘুঙুরটুঙুর সব কেড়ে নিয়ে পিছনে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে স্টেশনে তাড়িয়ে রেখে যাবে। টাকাকড়ি কিছু দেবে না। কেউ কেউ আরও খারাপ কথা বলছে। শোনা যাচ্ছে বাজারের একদল লোক নাকি গুজগাজ করছে যে স্টেশনে বের করে দিলে তারা মেয়েগুলোকে আটকে রাখবে।

কেষ্টবিনোদ ছুটে এসেছে ধানবাদ। যদি পলাতক যারা তাদের ধরতে পারা যায়, আর তা না যায় তো আমাদের মডার্ন অপেরার কাছে প্রার্থনা জানাতে

এসেছে—আজকের মতো মান রক্ষা করে দাও ভাই। আমার সারা জীবন যাত্রার দলে কাটল। যাত্রার দলই আমার ঘরবাড়ি হয়ে গেছে। আমার মান রক্ষা কর।

ম্যানেজার ভাবছিলেন। উপায়ের কথাই ভাবছিলেন। এমনই সময়—আমি তাঁর পিছন দিক থেকে সামনে এসে দাঁড়ালাম।

ভারী দুঃখ হচ্ছিল বুড়োর জন্যে। সেই কেষ্টবিনোদের আজ এই হাল! বললাম—কেষ্টদা! তুমি? তোমার এই দশা?

কেষ্টদা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।—বাপ্পা! তুই!

হ্যাঁ আমি।

কেষ্টদা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কোনরকমে আমার দলের মানটা রক্ষা করতে পারিস ভাই? ম্যানেজার ভাই?

কিভাবে মান রক্ষা করা যায় কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ম্যানেজার বললে-—বাযনাটা আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা আমাদের একটা ইউনিট নিয়ে গাওনা করে দি। যা পাব—তাই-ই নেব। আপনারা দু'দিনের টাকা নিয়ে চলে যান।

কেষ্টদা বললে—না। তা হওয়া আর না হওয়া দুই-ই সমান। মায়াবতী অপেরার মান তাতে থাকবে না। আর হয়তো রাজারাও তা শুনবে না। তাঁদের আব্বার মাযার নাচগানের পার্ট দেখাবার বরাত আছে। আমার দলের সব থেকে নামী বই। বিজয়িনী।

আমাদের মডার্ন অপেরার হিরো পরিচালক—গগীবাবু বললেন—বলে উঠলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। ও বই আপনাদের ভাল বই বটে। আমি দেখেছি। মায়াবতীর ও পার্টের নামডাক শুনে—লুকিয়ে গিয়ে দেখে এসেছি। তা ঐ বই হওয়া তো কঠিন নয়। আপনি শম্বর করেছিলেন—খুব ভাল হযেছিল। মায়াবতীর তুলনা নেই। প্রদ্যুম্ন একটু কাঁচা—কিন্তু কাঁচা ওদের তুলনায কাঁচা নইলে বেশ ভাল। জমেও ছিল খুব! রতি রয়েছে শম্বব রযেছ প্রদ্যুম্ন—

কেষ্টবিনোদ বললে—সে চলে গেছে। তরণীসেন সেজেছিল যে মেযেটা সেই করত প্রদ্যুম্ন। তার সঙ্গে পালিয়েছে বিপিন চাটুজ্যে, কাল সেজেছিল রাম। আজ তার শ্রীকৃষ্ণ করবার কথা।

গগীবাবু বললেন—কে? বিপিন চাটুজ্যে! রাম সেজে কাল তরণীসেনকে চড মেরে হাঙ্গামাটাঙ্গামা বাধিয়ে দিযে শেষে দু'জনে উধাও!

কেষ্টবিনোদ সে এক বিচিত্র জাতেব হাসি হেসে বললে —আরে ভাই গগী—ওর উত্তর কে দেবে? আমার কথা নিয়ে কতদিন নিজেকে জিজ্ঞাসা করি—বলি এটা কি করলে! বিযে না সাদী না, ঘব না দোর না, দিব্যি জীবন চলছিল পথে পথে। সন্ধ্যা যেখানে হয়েছে—সেখানে একটি বাসর পেতেছি, সকালে বাসর ভেঙে এক রাত্রির প্রেয়সীর কাছে বিদায় নিয়ে সিঁদুর মুছিয়ে দিয়ে আবার চলেছি। নারী আমার কাছে ছিল ফুলের মালা। সন্ধ্যায় গলায় পরে সকালে ছিঁড়ে ফেলেছি। কিন্তু এ কি হলো—কোন্ মোহিনী মায়ায় পডলাম আমি—।

একজন কেউ বললে—রাক্ষসী মায়া জাদুকরীর জাদু!

কেষ্টবিনোদ বললে—তা হবে। আমি বলব না যে—না তা নয়।

এমনভাবে কথা কয়েকটা বললে কেষ্টবিনোদদা—যে এর উত্তরে আর কোন কথাও কারও মুখ থেকে বের হলো না। ভিড়ের মধ্যে যাদের মুখ লুকোনো ছিল—তাদের মুখ থেকেও না। গগীবাবু হঠাৎ গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে একটা সাড়া জাগিয়ে বললে—থাক ওসব কথা কেষ্টদা। আপনি বয়সে বড। তরুণীর সঙ্গে জডিয়েছেন—একটু কড়াপাক সইতে হবে। এখন রোদ্দুর চডছে। বলুন—কিভাবে সঙ্কটের অবসান করতে পারি!

—দু'জন লোক চাই। প্রদ্যুম্ন আর কৃষ্ণ। আর চাই পোশাক চুল আর তার সঙ্গে একখানা ক্ল্যারিওনেট বাঁশি। প্রদ্যুম্নের জন্যে বাপ্পাকে দিন। এই বইয়ের যে কোন পার্ট ওর মুখস্থ আছে।

একটু হেসে বললে—বিজয়িনী নাটকখানার নাট্যকার আমি নই। নাট্যকার কেউ একজন জমিদাববাবুদের কেউ—তাঁদের থিয়েটার ছিল। বাপ্পা সেখানে ফিমেল পার্ট কবত। বতির পার্ট ছিল ওব। ও কলকাতায় এসে মথুর শার দলে ঢুকল। ওকে বাপ্পার পার্ট দিলাম। ও আমাকে নাটকখানা দিলে। ও সেজেছিল রতি। আমি ওকে সাজিয়েছিলাম। ওর ইচ্ছে ছিল প্রদ্যুম্ন করে। কিন্তু আমার নেশা লেগেছিল—ওকে রতি সাজিয়ে আমি প্রদ্যুম্ন করব। কিন্তু করতে গিয়ে দেখলাম—ভুল হয়েছে। প্রদ্যুম্ন আমাকে মানাল না। আর প্রেমের জায়গাগুলোয দেখলাম—আমি অচল। এমন অপমান বোধ করেছিলাম যে, গ্রীনরুমে এসে সামান্য ছুতোতে ওর গালে এক চড কষিয়ে দিয়েছিলাম। ব্যাস—সেই ছেড়ে দিলাম মথুব শা। নতুন কবে মাযাবতী অপেরায় বিজয়িনী খুলে অবধি আমি শম্বর সাজি। মায়াবতী করে রতির পার্ট। প্রদ্যুম্ন করত লীলা। ওই যে মেয়েটা পালিযেছে। কোনরকমে চালাত। তা'ছাড়া মেয়ের মুখ তো। মেযের গলা তো। মদন রতির মতো চলে যেত।

আমাদেব ম্যানেজার বললে—ইন্দুবাবুকে ছাড়লে আমাদের চলবে?

গগীবাবু বললেন—চলবে। চালিয়ে নিতে হবে। এখন আর মডার্ন অপেবা, মায়াবতী অপেরা নেই। এখন যাত্রা দলের মান-মর্যাদা। বুঝেছেন না। ইন্দু ভাই তুই যাবি। বুঝলি। আর কে যাবে— ?

কেষ্টবিনোদ আমার হাতখানা চেপে ধরলে হাতখানা তার ঘামছিল। হাতের উত্তাপে যেন জ্বরের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

ধানবাদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসবার পথে কেষ্টদা বললে—তুই বরং আমার সঙ্গেই চল ঝরিয়াতে। আমাদের ওখানেই খাওয়াদাওয়া করবি। মায়ার সঙ্গেও একটু পরিচয় করে নিবি। ভাল হবে। মেয়েটা তো ভাল নয়। বড্ড আড়ি মেবে পার্ট করা স্বভাব।

আমি বললাম—না দাদা, এখানে এখন জিরিয়েটিরিয়ে নি। ওবেলা যাব। সাজপোশাক চুল এসব বেছে নিয়ে যেতে হবে। পোশাকের বাক্স খোলাতে হবে।—

কেষ্টবিনোদ বললেন—এইটে তোর আমার কাছে পাওনা ছিল ইন্দু। বুঝলি!

মায়াবতী অপেরার ব্যাপারটার গুরুত্ব আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। ধানবাদ স্টেশনে মনে হয়েছিল—কেষ্টবিনোদ একটু বাড়িয়ে বলছে। কিন্তু তা নয়। কেষ্টবিনোদ লজ্জায় সবটা প্রকাশ করতে পারেনি। ধানবাদে আমাদের বাসায় ঝরিয়ার লোক এসেছিল খোঁজ নিতে। আমরা সব ঠিকঠিক দল এনেছি কি না। এবং আমাদের সাজপোশাকটোশাক—নতুন ঝকঝকেটকে কি না' কারণ মায়াবতী অপেরার বিশ্রী অভিনয় আর খারাপ পোশাক দেখে সকলে খুব বিরক্ত হয়েছে। শুধু রাজবাড়ি নয়—বাজারের লোকেরাও চটে আছে। মস্তানেরা তো হাত পাকাচ্ছে। যাত্রার খুঁত পেলে হয়—মাশুল আদায় করে নেবে। ঝরিয়া কয়লার মস্ত বাজার। নানান দেশের লোকের বাস। তারপর স্বাধীনতার পর থেকে ধানবাদ ঝরিয়া স্ফীতকায় দৈত্যশিশুর মতো হাত-পা বিস্তার করে বেড়ে উঠছে। লোক তো অনেক।

শুনে ম্যানেজার দ্বিধা করলেন। কিন্তু গগীবাবু বললেন—না—না—না। তা হয় না। তা হতে পারে না। বাপ্পা ভয় পাসনে ভাই। কেষ্টবিনোদ যাত্রা দলে তোর প্রথম গুরু। খবরদার—বুড়োর অপমান দাঁড়িয়ে দেখবি নে। আর শোন ম্যানেজার—আজ কেষ্টবিনোদ ঘুঁটের মতো পুড়বে আব তুমি কাঁচা গোবরের মতো হাসবে—তাতে আর যাই হোক ধম্ম থাকবে না!

সন্ধ্যের আগে থেকে মাযা অপেরার লোক এসে বসেছিল। আমাদেব নিযে যাবে। পোশাক-আশাক নিয়ে আমরা বেশ একটি ছোট দল বেঁধেই গিয়ে জমলাম—একেবাবে রাজামহাশয়দের ঠাকুরবাডির দরজায। যাত্রার জন্য বিস্তীর্ণ আসর পাতা হয়েছে। আসরেব সঙ্গে লাগাও একখানা ঘরে যাত্রা দলের গ্রীনরুম। বেশকারীরা মেকআপম্যান একজন আর দু'জন—গালে হাত দিয়ে বসে আছে। সেইখানে গিয়ে আমরা নামলাম। আমাদের ড্রেসার আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিছলাম। ভাল ঝকমকে ড্রেস—চুল।

খবর পেয়ে ছুটে এল কেষ্টবিনোদদা। দেখলাম এগারটা থেকে এই সাড়ে ছ'টা-সাতটাব মধ্যে কেষ্টবিনোদের চেহারা হয়েছে যেন—শিকড় কেটে একদিনে শুকিয়ে যাওয়া একটা গাছের মতো। মুখ-চোখ বসে গেছে। স্নানটান কবেনি। দাড়ি কামায়নি। আমায দেখে বললে—এসেছিস। আমি যে কি দুর্ভাবনায় পডেছিলাম। ওরে আজ যদি এই খেয়া ঘাটে ঢোকে—-ঘাটে লাগাতে পারি নৌকো তাহলে এর কথা কাল কইব।

এরই মধ্যে দলের লোকেরা এসে গ্রীনরুমে জমায়েত হয়ে গেল। কেষ্টদা বললে—বাজিয়েরা কনসার্ট দল—চলে যাও আসরে। একটা ঘণ্টা দিয়ে দাও। ফার্স্ট বেল। হ্যাঁ। এই দিকটায় তোমরা বস ভাই বাপ্পা। এই চেয়ার-টেবিল তুমি নাও। হ্যাঁ।

আমি চেয়ারখানায় বসে সামনের টেবিলে মেকআপ বাক্সটা রেখে পার্টটাকে মনে করে নেবার চেষ্টা করলাম। রতির পার্ট করেছি বোধ হয় আটবার। আজও সব মুখস্থ

আছে। প্রদ্যুম্নের কথাও মনে রয়েছে কিন্তু কেমন যেন একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ধানবাদে সারাটা দিনের মধ্যে এইরকমই হয়েছে যতবার পার্টটা মনে করতে গেছি ততবার। বিনোদদাকে বললাম—বইখানা একবার দাও দিকি চোখ বুলিয়েনি।

কেষ্টবিনোদদা হৈচৈ করে চেঁচিয়ে গোল বাধিয়ে তুললে!—বইখানা। বইখানা কোথায় গেল? অরে সতীশ! শিবকেষ্ট!

সতীশ সেই সব লোকেদের একজন—যারা আলুর মতো সব কিছুতেই লাগে। যাত্রার দলে চাকরির নেশা—শুধু নাটকের জন্যে নযতো কোন নায়িকার নেশায়। ঘর-বাড়ি নেই। থাকলে সম্পর্ক নেই। ছ'টা মাস দলের সঙ্গে ফেরে প্রম্‌টিং করে, ঘণ্টা বাজায়, চাকরের কাজ করে, জল তোলে—জিনিসপত্র রাখে। আর ছ'মাস কলকাতায় ফুটপাথেব ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। সতীশ এসে বললে—বই তো একখানা আসরে গিয়েছে। আর একখানা—সে তো উনি রেখেছেন—

উনি—উনি—উনি। উনি আমার মাথা কিনেছেন।

উনি অর্থাৎ দলের হিরোইন মায়ারানী নিজে। যাত্রার দলের মালিক কেষ্টবিনোদ, কিন্তু ড্রেস চুল হারমোনিযম বাঁযা তবলার মালিক—মাযারানী। এমন পাকা ব্যবস্থাটা করে দিযে গিছলেন সেই প্রবীণ ব্যবসাযী ব্যক্তিটি যিনি তরুণী মায়ারানীকে হজম করতে না পেবে কেষ্টবিনোদকে ডেকে তব হাতে ওকে তুলে দিয়েছিলেন।

সে সব কথা থাক। তবে এটা বুঝলাম যে কেষ্টবিনোদের অবস্থা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে গিযে পৌঁচেছে—সেই "অমিয়সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল" হযে দাঁডিযেছে। এবং সেই মেয়েটি সহজ ও সোজা মেয়ে নয।

ঠিক এমনই সময়ে গ্রীনরুমটার ডানদিকেব দেওয়ালেব দরজাটা খুলে বেবিযে এল একটি মেয়ে।

দবজার ছিটকিনির খড়াৎ শব্দ হতেই বিনোদদা চুপ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। ঠোঁট দুটো নড়ে বেরিযে এল দুটি কথা—ওই আসছে।

আমি দবজার মুখেব দিকে তাকালাম। পর্দাখানা তুলে বেরিযে এল মাযারানী। আমি চমকে উঠলাম। কষকষে কালো একপিঠ চুল, শ্যাম্পু করা নয,—তারই ঘেরের মধ্যে আশ্চর্য সুন্দর একখানি মুখ। মুখে পেন্ট নেওযা হযে গেছে। মরালীর মতো গলাখানি। ধ্যানে আছে, পীনোন্নত পয়োধরা ঠিক তাই। ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের ব্লাউজের ভিতরে ব্রেসিয়ারেব বন্ধন যৌবনকে লোভনীয় করে তুলেছে। আমাদের সেই সেকেলে সনাতন একখানা দামী কালোপাড ফরাসডাঙ্গার শাড়ি পবনে—মেযেটি এসে দাঁড়াল। ঠোঁট দুটি লিপস্টিকের রংযে অনুরঞ্জিত হয়ে সত্যি সত্যিই দুটি পাকা বিম্বফলের মতো টুসটুসে হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এ কে? এ কে? এ কে?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মাথার মধ্যে সহস্র দিক থেকে সেই এক প্রশ্ন—এ কে? কে বল তো? এ যে বড় চেনা মনে হচ্ছে। চেনা মানুষকে দেখে সঠিক চিনতে না-পারার একটা উদ্বেগ আছে। বেশি বাড়লে সেটা যন্ত্রণা দেয়। এ কে?

এ কে? এত সুন্দর একটি মনোহারিণী নারী তাকে চিনি অথচ মনে করতে পারছি না, মনে হচ্ছে নিরুদ্দেশ হয়ে হারিয়ে-যাওয়া আপনজনকে নাগালের মধ্যে পেয়েও ছুঁতে পারছি না; সে চেনা-না-দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এ যেন মরে ফুরিয়ে যাওয়ার চেয়েও বিয়োগান্ত। এ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে না মানুষ, নিস্তব্ধ উদ্বেগে গুম্‌রে সারা হয়ে যায়। আশ্চর্য রূপ—আশ্চর্য রূপসী। অন্তত আমার তাই মনে হলো।

পুরনো সেই খাতাখানা। সেই বৈকুণ্ঠপুর থেকে যেখানা এনে কেষ্টবিনোদদাকে দিয়েছিলাম সেইখানা, তিনি আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার তো শুনেছি বইখানা আগাগোড়া মুখস্থ। এই নিন।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলাম। চেনা। বড্ড চেনা। কে?

—আপনিই তো রতি করেছিলেন!

এবার বললাম—এ সব কথা আপনাকে কে বললে?

—আমাদের ডিরেকটার কেষ্টবিনোদবাবু। প্রদ্যুম্ন সাজতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছিলেন আপনার হাতে—আজও আমাকে খুব সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন—ডুবে যাবে। খুব সাবধান!

—কিন্তু তুমি কে বল তো? তুমি---?

আমি সামলাতে পারলাম না, বলে ফেললাম।

সে বললে—চোখে-মুখে অপরিসীম বিস্ময় মেখে সে উত্তর দিলে---এ্যাঁ?

যেন প্রশ্নটার মাথামুণ্ডু এমন কি সাধারণ অর্থও সে বুঝতে পারছে না।

আমি বললাম—আপনাকে বড্ড আমার চেনা মনে হচ্ছে! কেন বলুন তো?

—তা কি করে বলব বলুন! তবে আপনাকে তো আমি চিনি! আপনাকে আমি সুরঞ্জন অপেরায় বাংলার মসনদে—বেগমের পার্ট করতে দেখেছি। ওঃ সে কি পার্ট!

পরক্ষণেই একধরনের বিচিত্র হাসিতে যেন ফুল ফোটার মতো ফুটে উঠে বললে—আজ আমি মাথায় মাথায় ভাবছি—, আপনার সামনে দাঁড়াতে পারব তো?

সে বলে যাচ্ছিল আমি শুনছিলাম—কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম—কে?

পাশেই বসে কেষ্টবিনোদ মেকআপ নিচ্ছিল। তার পার্ট প্রায় সারা নাটকখানা জুড়ে। কেষ্টবিনোদদা রূঢ়স্বরে বললে—যাও না—কাপড়চোপড়গুলো বদলে ড্রেস পরে নাও না। শুরুতেই তো তোমার।

মায়াও রুক্ষস্বরে উত্তর দিল—যাচ্ছি। তোমার স্বভাব আর কখনও পাল্টাবে না।

কেষ্টবিনোদ বললে—না পাল্টাবে না। কেন পাল্টাবে? তবে ভুল আমার। সেই বেনেবাড়ির ছেলেটির গলায় দড়ি দেওয়ার ব্যাপার আমি জানতাম। জেনেও তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম।

—ভুল শুধরে নিতে পার এখনও। এখনও সময় আছে। তবে একটা কথা তোমাকে বলি। দেখ, জীবনে যে পথে ভগবান আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাঁর দায় শেষ করেছেন—সেই পথে চলাই আমার ধর্ম! এপথের নিয়ম দেখলাম, আমাদের একজন

ধরেন, কয়েকদিন নিয়ে খেলা করেন—তারপর একদিন আর আসেন না। কালীঘাট পটোপাড়ায় শুরু করেছিলাম জীবন—সেখান থেকে হাড়কাটায় এনেছিল ভূপেশবাবু, সে গয়নাগাঁটি দিয়েছিল—দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তার বউ আমাকে ঝাঁটা মারলে—কেড়ে নিয়ে গেল স্বামীকে। কিন্তু রাখতে পারলে না। পালিয়ে এল আমার কাছে—আমি তাকে জুতো মারলাম। সে গিয়ে গলায় দড়ি দিলে! সে দোষ তুমি আমাকে দিচ্ছ। তোমরা এমনই বটে! বলতে বলতে সে চলে গেল।

সমস্ত আবহাওয়াটা এমন কদর্য এমন অস্বস্তিকর এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল যে—আমার বুকেব মধ্যে মনে হচ্ছিল—আকাশজোড়া মেঘের মতো—উদ্বেগের পুঞ্জ জমে উঠে মেঘের মতোই ফুলছিল ফাঁপছিল। আমি কেষ্টবিনোদকে বললাম—এ সব কি করছ কেষ্টবিনোদদা তোমরা? এইভাবে যদি আজও প্লে মাটি কর তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে তা মনে করে দেখো। আমবা ভিন্ন দলেব লোক এসেছি তোমাদের সাহায্য করতে, যদি ঝগড়া করে প্লে মাটি কর তাহলে বল—আমরা খসে যাই।

কেষ্টদা শম্বর দৈত্যের গোঁফটা হাতের তেলোয় রেখে— নিস্পন্দের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—দেখ—মেয়েটার আশ্চর্য মোহ রে। শীলবাবু আমার থেকে বয়সে বড। তিনি বিচক্ষণ লোক। বলেছিলেন—বিনোদবাবু, মেয়েটা আশ্চর্য মেয়ে—যৌবন ওর অফুরন্ত, তার সঙ্গে অফুরন্ত ওর বুকের আগুন। আমার জীবনে ওকে ঠিক ধরল না। ওকে নিয়ে ভাসতে পারে এমন লোক না-হলে ও মেয়ে তাকে নিয়ে নিজেও স্বস্তিতে থাকবে না—অন্যকেও স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। আপনি নিজে ইচ্ছে করে ভেসেছেন দারযায। যাত্রা অভিনয় নিয়ে আছেন। মেয়েটাও ভালবাসে নাচগান—বোধ হয় অ্যাকটিংও পারে। আমি যাত্রার দল একটা গডে দিচ্ছি বুঝেছেন—ওকে নিয়ে দেখুন—ভাগ্যে কি ফলে?

ওদিকে আর একটা ঘণ্টা বেজে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে আসরে কনসার্ট বেজে উঠল। একজন লোক এসে কেষ্টবিনোদকে বললে—আরম্ভ হচ্ছে। দৈববাণীটা আপনি পড়ে দেবেন তো?

—হ্যাঁ। যাই। গোঁফটা লাগিয়ে নিলে কেষ্টদা। এবং বেরিয়ে চলে গেল। ওদিকে মেয়েদের গ্রীনরুমের দরজাটাও খুলে গেল এবার, পর্দাটা ঠেলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল—বিপর্যস্ত বেশা রতি-রূপিণী মায়া আমার দিকে তাকালে এবং একটু হাসলে। একমুহূর্তের জন্য দাঁড়ালে। মৃদুস্বরে বললে—এখনও ভাবছেন?

হ্যাঁ তখনও ভাবছিলাম। তবে এবার দেখলাম রতিবেশের মধ্যে সেই চেনা-মুখ যেন পাল্টে গেছে।

ভাবছিলাম—কে?

—"রক্ষা কর। রক্ষা কর। হে শঙ্কর, হে মহারুদ্র, হে প্রলয়ঙ্কর, হে মহাকাল—। সম্বরণ কর, তোমার ক্রোধ সম্বরণ কর প্রভু।"

অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেছে তখন।

পুষ্প-ধন্বা কামদেব কন্দর্প মদন
ভস্ম হয়ে গেল হায় পিনাকীর ললাট বহ্নিতে।
রতি কাঁদে পড়িয়া ধূলায় নতমুখী উমা ফিরে যায়—
নিষ্ঠুর লজ্জায়। অকাল বসন্তে ফোটা ফুলগুলি
ঝরে পড়ে গেল শুকাইয়া। এরপর কি হবে উপায়?

রতি প্রবেশ করে বলবে—

এরপর আমি দিব অভিশাপ; রৌদ্রে রসে প্রমত্ত পিনাকী—
তপস্যার অহংকারে অহঙ্কৃত প্রলয়ের অধিপতি তুমি—
সব তুমি। তবু নাহি তব অধিকার সৃষ্টিমাঝে
অনাথিনী করিতে রতিরে। আমি রতি—চির আয়ুষ্মতী আমি
সেই অমোঘ বিধানে—যে বিধানে তুমি রুদ্র প্রলয় দেবতা।
আমি তোমা দিব অভিশাপ!

বাপ্পা বোস বললে—মেয়েটির কণ্ঠস্বর আশ্চর্য মিষ্ট। গলার আওযাজের মধ্যে সুরের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। কান্না যেন ঝরে ঝরে পড়ছিল। আমি জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সেজেছেও খুব ভাল। তেমনি মেক-আপ সেন্স। একেবারে বিষাদ প্রতিমার মতো দাঁড়িযে আছে আসরের মাঝখানে।

আসরে লোক তখনও পর্যন্ত খুব বেশি ছিল না। পরপর দু'দিন খারাপ গাওনার কথা শুনেছে এখানকার প্রায় সকল লোকেই। কাজেই খুব একটা আকর্ষণ ছিল না। কিছু অতিমাত্রায় আনন্দ পাগল মানুষ যারা তারা এসেছে, ছেলেপুলেরা এসেছে, রাজবাড়ির লোকজন আছে। আর আছে দুষ্ট বদমাস একদল লোক। যারা একটা অজুহাতের অপেক্ষায় দাঁডিয়ে আছে; অজুহাত পেলেই তারা হাঙ্গামা হুজ্জোত আরম্ভ করবে। কিন্তু আসরখানা এরই মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বিপর্যস্ত বেশবাস—যেন ধুলোয়-লুটিয়ে কাঁদা রতির বিষণ্ণ মূর্তিখানিকে সকরুণ স্নেহে সকলেই সমাদর করে ফেলেছে।

বাপ্পা বললে—জানেন—রিসেপশন বলে একটা কথা আছে। মানে আসরের নামমাত্র দর্শক তাকে নিলে কেমন করে। গোড়াতেই যাকে নিলে—যাকে ভাল লাগল দর্শকের—তার জয় জয়কার। মেয়েটা জয় করে নিয়েছে প্রথম নেমেই—। সে যখন অভিসম্পাত দিলে—

নারীর চরণতলে বুক পেতে দাও তুমি—
আজ তুমি হলে ব্রহ্মচারী। দিই অভিশাপ—
যে উমারে ফিরাইয়া দিলে—আজ সেই সে উমার
দুয়ারে দাঁড়াবে গিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া। তারপর
স্মরণ করিবে তুমি মদন রতিরে। আরও হবে।
মদনে করেছ ভস্ম—

এবার মরিবে রতি। সৃষ্টি বন্ধ্যা হবে, ফুল
শুকাইবে, ফল হবে বীজহীন—নবজন্ম হবে না সৃষ্টিতে।

হাততালি পড়ে গেল। বলেছেও ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হলো। কেষ্টবিনোদ আসরের বাইরে থেকে দৈববাণী করলে।

ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও বালা। যা দিয়েছ শাপ—
সে শাপ মাথায় করি নিনু। উমার কুটীর দ্বারে
ভিক্ষার্থী হইব। মদন মরেনি দেবী। তার হারায়েছে তনু শুধু।
নবরূপে নবজন্মে আসিবে সে এ বিশ্বধরায়।
দ্বাপরে দ্বারকাপুরে বিষ্ণু অবতার শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ
রুক্মিণী রমণ। রুক্মিণীর গর্ভে আর কৃষ্ণের ঔরসে
জন্মিবেন নবজন্মে—কন্দর্প অতনু।
শিব বরে বধিবেন শম্বর অসুরে
অজেয় সে জন।

ব্রহ্মা এসে বিহুল রতিব মাথায় হাত দিয়ে বললেন—

ওঠো দেবী এইবার শুরু করো তপস্যা তোমার।
—তপস্যা আমার? চতুর্মুখ পিতামহ তপস্যা
আমার? রতির তপস্যা—আসিয়াছ ব্যঙ্গ করিবারে?
—ব্যঙ্গ! কার সাধ্য ব্যঙ্গ করে তোমা দেবী?
তুমি রতি—এ সৃষ্টির উৎসমূলে সমস্ত ভুলায়ে
দেওয়া—পরামানন্দ তুমি। অতনুর তনু লাভ
লাগি—তোমার তপস্যা চাই।

"চলে এস মা চলে এস। শম্বরাসুর আসছে। সে ঐ দৈববাণী শুনেছে। ওরই পুরীতে তুমি বন্দিনী হয়ে বসবাস করবে। তুমি রতি, তোমার রূপ-যৌবন চিরস্থির থাকবে। কোনদিন জরা তোমাকে স্পর্শ করবে না। শম্বরাসুর চুরি করবে কৃষ্ণের পুত্রকে। তাকে রক্ষা করবেন মহামায়া। তাকে লালন করে বড় করবে তুমি। ষোল বৎসরে কৃষ্ণপুত্র যৌবনে প্রবেশ করলে তোমার ব্রত উদ্‌যাপিত হবে। এস চলে এস। ওই শোন বায়ুপথে অসুররাজ শম্বর আসছে। এস এস।"

ওরা চলে এল—তারপর প্রবেশ করলে শম্বর। কেষ্টবিনোদ। কেষ্টবিনোদের গলাখানা দরাজ গলা। কিন্তু এই দু'তিন দিনের উৎকণ্ঠায় অনিয়মে—কার্তিক মাসের শেষের রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে একটু ধরা-ধরা, অনেকটা যেন চাকার ঘষেঘষে যাওয়ার মতো কর্কশ হয়ে উঠেছিল—তবু বুড়ো বেশ বলে গেল।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম দাদা যে—লোকে বলে বুড়োর ফর্মটা গেছে। গাঁক

গাঁক কবাটা ওব স্বভাব, বেশি চেঁচায, আচমকা ধমক দিয়ে আগে কো-অ্যাকটবকে ভড়কে দিত। সে সবগুলো আছে—তবে সেদিন একেবাবে প্রাণ দিযে ও পার্ট কবছিল।

—শুনেছ শম্ববাসুব দেবতাব বাণী শিব দৈববাণী—
শম্ববে বধিতে মদন হযেছে ভস্ম, অতনু লভিবে তনু
কৃষ্ণেব ঔবসে, লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীব কোলে—।
সে সংবাদ শুনিযাছি আমি। আজি হতে বিনিদ্র
বহিনু জাগি—
সোদনেব লাগি - যেদিন দ্বাবকাধামে শঙ্খধ্বনি
ধ্বনিযা উঠিবে —আকাশ কবিযা স্পর্শ।
তাবপব ?
তাবপব শম্ববেব মৃত্যু নাই, শম্বব অমব।

অভিনয তখন ধবে গেছে। আমি শম্ববেব পার্ট শুনে মনে কবাছলাম বড়বাবুকে। বতিব পার্টে মাযা মেযে হলেও এখানটা আমাব থেকে ভাল কবেনি। তবে মন্দও কবেনি।

— বই কেমন হচ্ছে বলুন তো ? আপনি শুনলেন ?

জানালাব ধাবে দাঁড়িযে দেখছিলাম। পিছন ফিবে দেখলাম - মাযাবানী আসব থেকে ফিবছে। আমাকে জানালাব ধাবে দাঁড়িযে থাকতে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞাসা কবলে। আমি তাব দিকে ফিবে তাকালাম। বলতে গেলাম ভাল হচ্ছে, কিন্তু বলতে পাবলাম না। মুখেব দিকে তাকিযেই বইলাম। আবাব যেন এই বাত সাজা চেহাবাব মধ্যেও পবিচিত মুখেব আদল ভেসে উঠেছে।

মাযা বললে - ড্রেস চেঞ্জ আছে। পার্টটায বড় হাঙ্গামা।

শম্ববেব সঙ্গে ভিখাবিণী বেশে দেখা হবে বতিব।

কেষ্টদা ব্যস্ত হযে ঘবে ঢুকল। সে এক পাগলেব মতো ব্যস্ততা। প্লে জমে গেছে। প্লে জমে গেছে। খুব সাবধান। কেউ যেন খাবাপ না কবে। নেশাটেশা কব না বাবা। খবরদাব। বাজা সাহেব কুমাব সাহেবদেব কাছে খবব গেছে - আজ মাযা অপেবা খুব জমিযেছে। আসবাব জন্য বলেছে। টেলিযোনে কোলিযাবীব বাবুবা খবব নিচ্ছে। যাবা তড়পাই কবছিল তাবা থেমে গেছে। খুব সাবধান।

—তুমি সাবধান হও বুঝলে। সাবধান সবাই হয— হও না তুমি। মদেব বোতলে চুমুক না-দিযে তুমিই নাম না। মিছি মিছি -- সাবধান সাবধান কবে চেঁচাচ্ছ ! মেকআপ বদলে বেবিয়ে এল মাযারানী। বতিব বিধবা বেশ ?

— কি বললে ?

— যা বলেছি তা ঠিক বুঝেছ তুমি। পার্ট কবছ তা এত গাঁগাঁ কবে চেঁচাচ্ছ কেন ? গম্ভীব হয়ে অল্প চেঁচিয়ে পার্ট হয না ? জমাট প্লেখানাকে তো তুমি সুব চড়াতে গিযে সেতাবেব তাব ছেঁড়া কবে দিলে।

—মাযা !—চিৎকাব কবে উঠল কেষ্টবিনোদ।

আমি একদৃষ্টে দেখছিলাম মায়ার নতুন মেকআপ। আমি যেন দেখছিলাম আমিই রতি সেজে আসরে যাচ্ছি। বৈকুণ্ঠপুর স্টেজের গ্রীনরুমে বড় আয়না ছিল একখানা, সেই আয়নায় নিজের ঠিক এমনি মেকআপ করা প্রতিবিম্ব ভেসে উঠত। কতবার মুচকে হেসে —তাকে ইশারা করে বলেছি—।

একটা গানের কলি বলতাম মনে মনে। কোন মানে ছিল না। 'সখিরে—মরমে পরশে তারই গান।' এই পোশাকটা ভারতদার ডিজাইনের পোশাক। বর্ধমানের দর্জি করে দিয়েছিল। সাদা মিহি পাতলা কাপড়ের বোরখার মতো একটা আলখাল্লা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত। বেরিয়ে থাকে শুধু হাত দুটো। যাত্রার প্রথম আমলে মূল গায়েনরা দূতী সাজতেন এই পোশাক পরে। শুধু দূতী কেন, নায়িকারাও পরতেন। ডিজাইনটা বোরখা থেকেই নেওয়া। খুব জরীটরী দেওয়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝলমলে পোশাক। এ পালায় রতির এই আলখাল্লাটা ছিল পাতলা কালো রঙের অর্গান্ডির তৈরি। অলঙ্করণের মধ্যে ছিল একটি সাদা জরীর ফিতে পাড়। মথুরা শহরেও আমি এই পার্ট করেছি, ওই পোশাক বরাত দিয়ে তৈরি করিয়েছি। আমার মনে হচ্ছিল —এ রতি মায়ারানী নয় এ রতি আমারই প্রতিবিম্ব।

বলতে সংকোচ করব না, তখন আমার মাথার মধ্যে আলো জ্বলছে— আমি মদ একটু খেয়েছি। মাথাটা চন্‌চন্‌ করছে।

এরই মধ্যে কখন যে উচ্চস্বরে 'মায়া' বলে চেঁচিয়ে কেষ্টবিনোদ তার হাত চেপে ধরেছে আমি খেয়াল করিনি। এত জোরে কেষ্টবিনোদ তার হাত চেপে ধরেছে যে যন্ত্রণায় মায়ার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। আমি দেখলাম মায়া মুখ বিকৃত করেও অন্য হাতখানা তুলেছে, সে হাতে তার একখানা পাতলা পিতলের রেকাবী। ভিক্ষা চাইবার সময় সেই থালাখানাই পাতে। থালাখানা হাল্কা কিন্তু ধারালো। মারলে, কেষ্টবিনোদের যেখানে লাগবে সেখানটা যে কেটে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। রক্তপাত হয়ে যাবে।

না না। বলে চিৎকার করে ওদের মাঝখানে পড়লাম। থালাখানা আমার মাথায় পড়ল। একটু লাগল— কিন্তু তেমন কিছু না। বললাম ছি ছি ছি! ছাড়। ছাড়।

পরস্পরকে ছেড়ে দিলে ওরা।

কেষ্টবিনোদ ড্রেসারের কাছে গিয়ে বললে— পিঠে টেলপিস বেঁধে দে। আর পুতুলটা। স্যালুলয়েডের মস্ত প্রমাণী পুতুল। সদ্যোজাত প্রদ্যুম্ন। পুতুলটাকে ওই টেলপিসে জড়িয়ে নিয়ে বুকে ধরে নিয়ে যাবে সে। দেখলাম কেষ্টবিনোদের পা কাঁপছে।

প্রদ্যুম্নকে হরণ করে নিয়ে শূন্যপথে চলতে চলতে বলছে কেষ্টবিনোদ—হে শম্ভু হে শঙ্কর হে পিনাকী— হে দেবতা।

সে একেবারে প্রাণফাটানো ডাক।

আমি বসেছিলাম— একখানা টিনের চেয়ারে। ছদ্মবেশিনী রতি সাজা মায়া দাঁড়িয়েছিল। চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলে রাখছিল। শুধু কেষ্টবিনোদ তার অপমান করেছে বলেই নয়— —তার হাতের থালাখানা আমার মাথায় লেগেছে তার জন্য তার আর লজ্জা-ক্ষোভের শেষ ছিল না।

কেষ্টবিনোদের ওই ধরা গলায় প্রাণফাটানো—হে শঙ্কর হে পিনাকী—হে দেবতা ডাক শুনে আমার শরীরে রোমাঞ্চ জেগে উঠেছিল। সে ডাক আশ্চর্য ডাক। আরে বাপরে। এসব ডাকের প্রতিধ্বনি যেন চারিপাশে একটা গুম গুম গুম শব্দ তুলে দিয়ে যায়। আমি তাকালাম মায়ার দিকে। দেখলাম মায়ার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে বিস্ময় জ্বলজ্বল করছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বললে—আমি যাই। আপনি সাজুন। সে চলে গেল। ওদিকে কেষ্টবিনোদ যেন কাঁদছে।

দৈত্যপুরীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়েছে—বেদনার্ত কণ্ঠে ওই শিশু প্রদ্যুম্নের মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে—

এ কি হলো—, আমার হৃদয় এমন কেন হলো ?
আমি দৈত্য বংশধর—কঠিন পাষাণ সম দৈত্যের হৃদয়।
হৃদয় কাঁপে না হত্যা দেখে দৈত্য রথ চক্রতলে
বাল বৃদ্ধ যুবা প্রৌঢ়—শিশু নারী নির্বিচারে
পিষ্ট হয়ে যায়। আপন সন্তানে হিরণ্য-কশিপু দৈত্য
ফেলে দিল অগ্নিকুণ্ডে, সমুদ্রের গভীর অতলে,
বিষধর মুখে, তবু কাঁপিল না প্রাণ—। আমারও
তো কভু কাঁপে নাই। আজ কেন কাঁপে ? কেন ?
কেন আমি ফেলিতে পাবি না এই শিশু শত্রুটিরে—
পর্বতের শৃঙ্গ হতে সমুদ্রের জলে !
যতবার ফেলিতে যাই ততবার বিচিত্র অর্থহীন হেসে
আমার মুখপানে চেয়ে দুই হাত বাড়ায়। কেন।
অথচ এই আমার শত্রু। আমার মৃত্যু এরই হাতে।
নাঃ এবার আর দুর্বলতা নয়।—এবার ফেলে দেবই ;
ওই পাহাড়ের পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।
বল দাও, নিষ্ঠুর কর, আমাকে নির্মম কর—হে রুদ্র
আমাকে ভয়ঙ্কর কর।

বলতে বলতে বেরিয়ে এসে আবার ঢুকল বিনোদ —না—পারলাম না ! হলো না। কিছুতেই নিজেকে এতখানি নিষ্ঠুর করতে পারলাম না। কিন্তু কি করব ? কি উপায় কে বলে দেবে ? হ্যাঁ এক উপায় আছে। একে আমি পুত্ররূপে মানুষ করব। ও আমাকে জানবে ওর পিতা। ওকে আমি দিনে-দিনে তিলতিল শিক্ষায় দৈত্য করে গড়ে তুলব। দেবতারা বলেছে—নারীর প্রণয় নিয়ে বিরোধ হবে আমার সঙ্গে এই কৃষ্ণপুত্রের। কিন্তু আমি যদি ওব পিতৃতুল্য হয়ে ওকে মানুষ করি, ওব যদি আমার পুত্র ছাড়া অন্য কোন পরিচয় না থাকে, তবে এক রমণীর প্রেম নিয়ে বিরোধ হবে কেন ? হ্যাঁ এই পথ—এই পথ।

—জয় হোক—স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে তব জয়ধ্বনি।
ধ্বনিত হউক ওগো দৈত্যরাজ—দুন্দুভি ধ্বনিত।

আমি ভিখারিণী তব পার্শ্বে ভিক্ষা লাগি
আসিয়াছি ওগো মহাভাগ।

বাপ্পা বোস বললে—বুঝলেন—আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। এই কথাগুলো আমি যেমন করে বলতাম—তেমনি করেই বললে—তবে যেন আমার থেকে ভাল বললে।

জানালায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কেষ্টবিনোদ মায়া শম্বর আর ছদ্মবেশিনী রতি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দৈত্যপুরীর সিংহদ্বারের সামনে। শম্বব শিশু প্রদ্যুম্নকে বুকে নিয়েই বললে—

কে তুমি রূপসীবালা ত্রিলোক মোহিনী—
নিতান্ত কিশোরী কন্যা, সদ্য নববধূ... ;
কিন্তু ম্লান কেন তব সীমন্তে সিন্দুর।
দিবসে চন্দ্রের মতো কেন বা নিষ্প্রভ তব
ললাটের টিপ! কেন হেন মলিন বসন—
কেন বালা আভরণহীনা? তুমি বল
তুমি ভিখারিণী। হায মাগো, তুমি ভিখারিণী
হলে ঐশ্বর্যেব অধিশ্বরী লক্ষ্মী লজ্জা পাবে।

এমনভাবে বললে কেষ্টবিনোদ যে সে যেন অন্তর নিংড়ে মাযা-মমতা তার সঙ্গে আবেগ উজাড করে ঢেলে দিযে বললে। সব শেষে বললে—

আমি দৈত্য বটে, কিন্তু মাগো দৈত্যেরাও দেবতার
চেয়ে সংযমী হইতে পারে। তপস্যা তাদের মতো
দেবতাবা করে নাই কভু। জন্মগত সৌভাগ্য তাদের।
শোন মা জ৹নী, দেবী, শিবভক্ত আমি,
পত্নী ছাড়া পৃথিবীর সব নারী জননী আমার।
কোন ভয নাই তব, বল৷ কিবা প্রার্থনা তোমার।

মায়া মুখ তুলে চাইলে, তাকিয়ে রইল শম্বরের দিকে। তাব সে চাউনি এক বিচিত্র জগতের চাউনি। তারপর মৃদুস্বরে বললে—আশ্রয়।

—দিলাম। ত্রিসত্য করিয়া কহি, দিলাম, দিলাম, দিলাম আশ্রয।

—তাতে যদি তোমার কোন বিপদ আসে দৈত্যরাজ?

আমার লাগিয়া যদি ত্রিভুবন রণে মেতে ওঠে?

—উঠুক। শমনে ডরি না আমি। তাছাড়াও
আমার শমন এই—আমি বক্ষে ধরে আছি।

—নাহি জানি কিবা কহিতেছ তুমি। কিন্তু দৈত্যরাজ—
এ সংসারে মৃত্যু ধ্রুব। সে মৃত্যু যদ্যাপি চায়
প্রবেশিতে পুরীতে তোমার ধরিয়া আমারই হাত।

—তবু তুমি আশ্রয় পেয়েছ বালা। শম্বর দৈত্যের
বাক্য অন্যথা হবে না।

রতি বলে উঠল—

জয় হোক জয় হোক জয় হোক দৈত্য অধিপতি—
তোমার এ জয়বার্তা চিরদিন ঘোষিবে ভুবন।

শেষ কথাগুলি এমনভাবে বললে মায়া যে—হাততালিতে আসর যেন ফেটে পড়ল। কে একজন বিশিষ্ট শ্রোতা সামনে বসে ছিল বলে উঠল সাবাস! সাবাস।

একজন সাহেব, অবশ্য বাঙালী সাহেব বললে – ভেরী গুড।

ভিড়ের ভিতর থেকে কে বললে—কাঁচপোকায় আরসোলা ধরলে রে! কথাটার ভিতরে কিছু মানে ছিল। সেটা বলি।—অভিনয় তখন– এ ওকে মারছে—ও একে মারছে গোছের ব্যাপার। এই জায়গাটায় রতি যা অ্যাকটিং করলে না—সে এমন মিষ্টি মিষ্টি হেসে লাস্য মিশিয়ে যেন মায়া বিস্তার করেই বললে জয় হোক জয় হোক জয় হোক দৈত্য অধিপতি। তোমার এ জয়বার্তা চিরদিন ঘোষিবে ভুবন। সব শেষকালের 'জয়বার্তা চিরদিন ঘোষিবে ভুবন', বলবার সময় এমনই ঠোঁট দুটি ঈষৎ একটু বেকিয়েছিল যে —সে যে ব্যঙ্গ করছে তা বুঝতে দর্শকদের এতটুকু কষ্ট হয়নি যে—রতি মায়াবতী নাম নিয়ে মায়া বিস্তার করে শম্বরকে আচ্ছন্ন করে যে ললে —সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেই শম্বর দৈত্য তাদের দৈত্যপুরে নিয়ে গেল।

মেয়েটা ব্যঙ্গ রস দিয়ে যে অ্যাকটিং করলে তার তুলনা নেই আমি টেবিলের সামনে বসে মেকআপ নিতে নিতেই শুনছিলাম। আসরের লাগোয়া গ্রীনরুম। প্রতিটি কথাই স্পষ্ট কানে আসছিল। হাততাল এবং হাসি ছাড়া কোন বিঘ্নব্যাঘাত ছিল না।

তখনও মেয়েটা বলছিল—

নাম মোর মায়াবতী, জন্মকাল হতে
আমার স্বামীর সঙ্গে আমি বিবাহিত।
বিধাতার বিধানের মতো মোরা এ সৃষ্টিতে
কাজ করে যাই। সেই মোর প্রিয়তম
সর্বক্ষণ সাথী মোর, কোথায় হারিয়ে গেল।
আকাশে বাতাসে আলোয় ইশারা পাই —
কিন্তু কোন পাই না উদ্দেশ। অবশেষে দৈত্যরাজ
একদা স্বপ্নের ঘোরে কে যেন বলিয়া গেল –
নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ কাল হইল বিগত। সমাগত
প্রসন্ন সময়। হারানো স্বামীর তব মিলিবে উদ্দেশ।

অবাক হয়ে আমি শুনছিলাম—মেয়েটি বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলে বিহ্বল কিংবা বোকা মানুষকে নিয় ব্যঙ্গ করবার মতো ভঙ্গিতে অভিনয় করে গেল। সে বড় নিষ্ঠুর বলে মনে হলো। কিন্তু স্থির বিদ্যুতের আলোর মতো একটা কিছু ছড়ালে যাতে দর্শকের চোখ ধেঁধে গেল। আমার যেন বারবার মনে হচ্ছিল এটা অভিনয় হচ্ছে না, এ যেন কেষ্টবিনোদের সঙ্গে ওই মেয়েটার একটা বোঝাপড়া হচ্ছে।

শম্বব বললে— হোক তব দুঃখ অবসান। নিবাশাব অন্ধকাব:
বেদনাব হিমার্ত শ’বী, শেষ হোক, শেষ হোক তব--
কবি আশীর্বাদ।

বতি বললে—

তাই তো এসেছি তব পাশে। তুমি তাবে
খুজে এনে দাও। স্বপ্ন মোবে বলে দিল
সে এসেছে, সুদীর্ঘ তপস্যা অন্তে ফিবেছে সে
জীবনে ভুবনে। এখন আমাবে তাবে
খুজে নিতে হবে। তুমি কি পাব না তাবে
খুজে এনে দিতে অনার্থিনী এই তব কন্যাটিব পাশে!
যেই জন মৃত্যুভযহীন —বক্ষে যে লইতে পাবে
কালভুজঙ্গম --কমল মৃণাল সম--সেই পাবে শুধু
সেই পাবে! তুমি পাব! দৈত্যবীব পাব তুমি ’

শেষ কথা ক’টা যেভাবে বাঁকা শাণানো ছুবিব মতো চালিযে গেল — তাতে আমি অবাক হলাম।

কেষ্টদা প্রায ক্ষেপে উঠেছিল সে অসুবেব মতো চিৎকাব কবে উঠল। হা— হা--হা কবে হেসে উঠল অকাবণে। যাত্রা থিযেটাবে ওই একটা মুষলবৎ অস্ত্র আছে—যা হাতে উঠলে— শত্রু মিত্র দুই নিশ্চিন্ত হয। পাগলেব মতো হাসি। হা হা হা হা কবে হাসে সে দু’হাত তিন হাত এমন কি পাঁচ সাত হাত লম্বাও কবে, প্লে জমুক বা না জমুক লোকে ভাম হযে যায এবং সভযে ভাবে—থামবে কতক্ষণে।

ওখানে অ্যাকটিং আছে--সে তাব বুকে ধবা পুতুলটাকে বেব কবে বতিব সামনে ধবে বলবে—

---আমি পাবি কি না ব’লা ? প্রশ্ন কব আমি পাবি কি না ’
এই দেখ —কৃষ্ণেব তনয— আমাবই এ কাল ভুজঙ্গম।
ইহ’বই দংশনে হবে মবণ আমাব। অন্যথায
শিব ববে অজেয অমব আমি। আমিই ধবিতে
পাবি বক্ষোপবি কাল ভুজঙ্গম! এবে এবে তুমি ধব দেখি---
এবে ধব তুমি—লালন কবহ এবে। বিবাহ কবিনি আমি।
পণ মোব ইন্দ্রে জয় করি, বসিব স্বর্গেব সেই
দিব্য সিংহাসনে—
শচী হবে পত্নী মোর। তুমি এরে কবহ পালন।
শুধু প্রতিশ্রুতি দাও—এরে তুমি বলিবে না এব পবিচয়।
বলিবে না কৃষ্ণেব ঔরসে জন্ম তার। রুক্মিণী তাহাব মাতা।
প্রদ্যুম্ন দিলাম নাম। শম্ববেব তনয প্রদ্যুম্ন।
জন্ম তাব দৈত্যকুলে।

আমি যাই খুজে আনি— নিরুদ্দেশ প্রিয়তমে তব।
বল — কি দেখে চিনিব ?

রতি বললে—

দেখিলেই আপনি চিনিবে — তখনই চিনিবে।
এমন রূপ সে কারও নাই। চিরদিন নবীন কিশোর—
কৈশোর ও যৌবনের মধ্যস্থলে সে যে চিরস্থির।
এমন প্রবল কেহ নাই। তার কাছে কন্দর্প লজ্জা পায়।
যখন দেখিবে তুমি তখনই চিনিবে মনে হবে
কালভুজঙ্গম কোন্ ঘুমন্ত তোমার বক্ষমাঝে
ফণা তুলি উঠে দাড়ায়েছে।

শম্বরাসুর বললে—

রে প্রহরী মুক্ত কর সিংহদ্বার!
যাও দেবী শম্বরের পরমাঝে
করহ প্রবেশ। আমি চলিলাম
তোমার হারানো জন সন্ধানের লাগি ?
তাহারে না লয়ে আমি আসিব না ফিরে।

গ্রীনরুমের মধ্যে এসে ঢুকল মেয়েটা যেন বিজয়িনীর মতো। কালো সেই আপাদমস্তক মোড়া আলখাল্লা পরে মেয়েটা যেন নিজের পোশাকটা দুলিয়ে দোলা লাগিয়ে চলে গেল। যাবার সময় যেতে যেতেই একবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে মচকে হেসে বললে কেমন হলো ?

বললাম — ভাল।

— সত্যি বলছেন ?

— মিথ্যে কেন বলব!

—এবার তো আপনার সঙ্গে

হ্যা।

— বাপরে। খুব ভয় পাচ্ছি আমি।

আমি একটু হাসলাম। কথাটার উত্তর দিতে ইচ্ছে হলো না। মেয়েটি আজ যে হারে কে-জেতে আজকের এই আসরে সেই পাল্লার খেলায় নেমেছে। নেশায় মেতে আছে। আমি জানি আসলে প্রতিযোগিতাটা আমার সঙ্গে। কারণ কেষ্টবিনোদের সঙ্গে তো ওর প্রতিযোগিতার কিছু নেই। শম্বর দৈত্য পালাটায় চালচিত্তিরের মতো শোভা বাড়িয়ে খাড়া থাকে, ওর সামনে নায়ক নায়িকা হলো রতি আর প্রদ্যুম্ন। মেয়েটা তারই জন্য তৈরি হচ্ছে। ও চলে গেল গ্রীনরুমের ভেতর। আমি ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। ভাবছিলাম। খাসা পার্ট করেছে মেয়েটা। কেষ্টদা এসে গ্রীনরুমে ঢুকল। এবং বলতে বলতেই ঢুকল—কোথায় ? মায়া ? মায়া কোথায় ?

কোনদিকে না তাকিযে সে মেয়েদেব গ্রীনরুমেব সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলে—মাযা! মায়া!

পর্দাখানা একটু সবিযে গলা পর্যন্ত মুখ বেব কবলে মাযা—কি বলছ কি?

—এ সব কি হচ্ছে?

—কি হচ্ছে?

—যেমন খুশি হচ্ছে তেমনি পার্ট কবে যাচ্ছ—ভাবছ কি?

—কি ভাবব! যেমন আসছে তেমনি কবছি। তুমি এমন ষাঁডেব মতো চেঁচালে কেন? এমন পাগলেব মতো হাসলে কেন?

—না হাসলে—তোমাব ওই শুক্‌নো বেঁকা কথা শুনে লোকে দুযো দিত। আমি নাটক লিখেছি—আমি ওখানে বতিব কথাগুলিকে মর্মান্তিক বেদনাব কথা হিসাবেই বসিযেছি। এব ওপবে তোমাব কোন কথা থাকতে পাবে না।

মবণ! নাট্যকাব! তুমি নাট্যকাব!

—মাযা!

যাও বলছি। বিবক্ত কবো না! প্লে হযে যাক, তাবপব হবে বোঝাপডা। বুঝেছ? এখন না। দোহাই তোমাব!

না। বোঝাপডাটা তাহলে এখুনি হযে যাক!

আমি আবাব বাধা দিলাম। মাঝখানে এসে পডলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যকে দোষ দিলাম। দুর্মতি হযেছিল যে কেষ্টবিনোদকে সাহায্য কবতে এসেছিলাম, আমি আবাব দু'জনেব মাঝখানে পডে বললাম—কবছেন কি আপনাবা?

তাই জিজ্ঞেস করুন ওই বুড়ো দামডাকে। বলেই সে মুখ ঢাকযে নিলে পর্দাব অন্তবালে। আমি কেষ্টবিনোদদাকে বললাম—এস,—মাথা গবম কবো না, চুপ কবে বস।

—আমাকে কি অপ্রস্তুত কবলে দেখলে? কেষ্টবিনোদদা নিষ্ফল আক্রোশে যেন ফুঁসছিল।

আমি বললাম—ও আজ কি পার্ট কবছে দেখছ না? তোমাদেব দলেব প্রেস্টিজেব জন্যে ও আজ মেতেছে—এটা ভাবছ না কেন?

কেষ্টদা চুপ কবে বইল, কথা বললে না।

বাইবে আসবে ঘণ্টা পডল। ড্রপেব পব তৃতীয অঙ্ক শুরু হবে। শুধু নাচ আব গান।

শম্ববেব দৈত্যপুবীতে আশ্চর্য সংঘটন ঘটেছে। বিচিত্রভাবে চিব বসন্তেব আবির্ভাব হযেছে। ফুলে ফুলময নগবী। ষড়ঋতুব পাঁচটি মাসে-তাবিখে আসে কিন্তু প্রকৃতিতে আসে না। বৈশাখ আসে গ্রীষ্ম নেই। সূর্যেব সে উত্তাপ নেই। সমুদ্রতটে আষাঢ-শ্রাবণ আসে কিন্তু আকাশে মেঘ ওঠে না। বর্ষণ হয না। শীত আসে না। বসন্ত যেন এখানে এসে পথ হাবিয়ে ক্লান্ত হযে কোন গাছতলায ঘুমিযে পডেছে। এক আধ

বছর নয়, ষোল বছব পূর্ণ হতে চলল। নাগবিকা নাগরিকেরা পটভূমি রচনা করে চলে যায়। নতুন কুমাবেব ষোল বছর পূর্ণ হবে। ষোল বছর মহারাজ শম্বব নিরুদ্দেশ।

এরপর দ্বাবকাধামে রুক্মিণী এবং শ্রীকৃষ্ণ। কথা বলছেন -। রুক্মিণী অনুযোগ করছেন—তাঁব সন্তান—প্রথম সন্তান একমাত্র সন্তান—যাদবশ্রেষ্ঠ যদুকুলপতি কৃষ্ণ কংসারীব প্রথম পুত্রকে দৈত্য অপহরণ করলে, তাব উদ্ধাব হলো না! এদেশের বীর্যকে ধিক। কোন সর্বজ্ঞ দৈবজ্ঞ গণনা কবে বলতে পাবলে না— কে এই কৃষ্ণপুত্রকে অপহরণ করেছে, কোথায় বেখেছে। এদেশেব সর্বজ্ঞ এবং দৈবজ্ঞদেব শাস্ত্র মিথ্যা। ভগবানকে আজ ষোল বছব পূজা করে আসছি, বলছি —আমাব হারানিধি ফিবিযে দাও ভগবান। ভগবান নিরুত্তব। কিন্তু সে তো বেচে আছে। স্বপ্নে তো সে আমাকে দেখা দেয—।

কৃষ্ণ বলছেন—

পূর্ণ হলো আজ প্রিযে ষোড়শ বৎসব। আমাদেব
প্রথম সন্তান অপহৃত হলো সূতিকা আগাবে
—মাতৃক্রোড হতে। কেহ জানিল না।
দেবতা বলিযাছিল—হে কৃষ্ণ অপেক্ষা কব
ষোড়শ বৎসব। সন্তান ফিবিবে তব।
কাল পূর্ণ হলো। পিতৃ-মাতৃ পাবচযহীন
সিংহের শাবক আজ মানস হ্রদেব জলে
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি খুঁজে পাবে নিজ পবিচয।
ধৈর্য ধব প্রিযতমে। শর্ববী বিগতপ্রায ঊযা সমাগত।

আমাদের মডার্ন অপেবাব সাজপোশাক খুব ভাল। সে আপনাব সত্যম্বব, গণেশ অপেরা, মথুর শা' যেমন পোশাক রাখত বা বাখে—তাব থেকে ভাল হবে তবু খারাপ হবে না। প্রতি বছব পোশাক তৈরি হয। চুলটুলগুলিও তেমনি। আমাব চুল আমার নিজের কাছে বাখতাম। পবের মাথায দেওয়া পরচুলো পবতে কেমন লাগে। মেকআপ বাক্সে পেন্টটেন্টগুলো আমি নিজে কিনতাম। ভাল জিনিস কিনতাম। খুব যত্ন করে সাজতাম। পুরুষের পার্ট কমই করেছি। ওই বাপ্পাবাও একবার, তা ছাড়া কৃষ্ণ করেছি অভিমন্যু করেছি। এবার প্রদ্যুম্নের পার্ট। প্রদ্যুম্ন অবিকল ছিলেন কৃষ্ণের মতো দেখতে।

একটু চুপ করে থেকে বাপ্পা বললে—এসব শিখিয়েছিলেন—ভারতদা। কোন পৌরাণিক বই হলে—পুরাণ থেকে উপখ্যানটা শুনিয়ে দিতেন। প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের মতো ছিলেন—এ খবরটা বিণীদি জিজ্ঞাসা কবতে ভারতদা বলেছিলেন। সেই প্রথম বার নামছি সাত দিনের নোটিশে। প্লেব পর বিণীদি জিজ্ঞাসা করেছিল—দাদা, প্রদ্যুম্ন তো কৃষ্ণেব মতো দেখতে ছিলেন। তাহলে ছোটবাবু প্রদ্যুম্ন সাজলে কিন্তু কৃষ্ণেব

মতো রঙ তো করলে না? ভারতদা বলেছিলেন—ওই রঙটা ছোটবাবুব সহ্য হয় না। প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের মতোই ছিলেন বটে।

সেদিন আমি প্রথম প্রদ্যুম্ন সাজছি। নিজেই নীলচে রঙ মেখে মেকআপ করেছি। কেষ্টবিনোদ তাকিয়ে দেখছে। একদৃষ্টে দেখছে আমাকে। আমাকে ও বলেছিল—ওরে পুরুষেব পার্ট তোর ভাগ্যে কোনদিন জুটবে না। মাপে খাটো জুতো যত দামেরই হোক কাজে লাগে না। মেয়ে সাজবাব চেহারাটা যত্ন করে বাঁচিয়ে বাখিস। শেষ বযসে খাণ্ডারনী হিরোইন-টিবোইন দেখে বই ধরবি, চলে যাবে। সেবার ও নিজে প্রদ্যুম্ন সেজে আমার বিপরীতে নিদারুণ মাব খেয়েছিল। আজ সেই কেষ্টবিনোদ তারই দলে তারই হিবোইনেব সঙ্গে আমাকে প্রদ্যুম্নের পার্ট দিচ্ছে। মনে মনে সে প্রতিশোধ—যে-প্রতিশোধে বাস্তব ক্ষতি হয সে প্রতিশোধের বাসনা আমার ছিল না—কিন্তু অন্য প্রতিশোধের বাসনা ছিল। অন্তত পার্ট খুব ভাল কবে দিযে কেষ্টবিনোদের সেই কথাটার শোধ নিই। সে বলত- ভগবান মেয়ে গডতে গডতে পুরুষ করেছে বে! বাঁজা মোচা বে!

মনে পর্ডছিল ভাবতদাকে—ছোটবাবুকে!

হঠাৎ চমকে উঠলাম। মনে পডল বিণীদিকে। দাঁত দুটি উঁচু শ্যামবর্ণা একটি আডষ্ট কঠিন মেয়ে!

কেষ্টবিনোদ বললে- খুব ভাল মেকআপ হয়েছে ভাই। তুই আব মেয়ের পার্ট কবিস নে বে। বুঝলি। ববাত দিযে পার্ট লিখিযে নে। পদ্মিনী লেখা না। অবি সিং খুব ভাল হবে।

আমি হাসলাম।

কেষ্টবিনোদ বললে—ওকে আমি বলে দেব—কোন আডি মাবলে—কুরুক্ষেত্র হবে।

আমি বললাম—না। কিচ্ছু বলতে হবে না বিনোদদা। রূপ বযস আমারও আছে গো এবং তা নিযে খেলতে আমিও জানি!

বেরিযে চলে এলাম গ্রীনরুম থেকে। দাডালাম আসবের পথেব মুখে। ষোল বছরের প্রদ্যুম্নেব সঙ্গে মন্ত্রী, পারিষদ, কোটাল, বিশিষ্ট নাগরিকেবা ঢুকবে। মন্ত্রী বলবে—কুমার প্রদ্যুম্ন—আজ আপনাব বযস ষোল বৎসর পূর্ণ হলো। মহারাজ শম্ববাসুর আপনার পিতা আপনাকে পুরঃ প্রবেশ করিযে কোন এক বিশেষ সন্ধানে স্বর্গমর্ত্যপাতালেব পথে নির্গত হযেছে। আজও তাঁব কোন সংবাদ পাই নাই। তবু আদেশ আছে—আপনাকে ষোল বৎসব পূর্ণ হলে—যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে। আগামীকাল আমরা সেই ক্রিয়া সম্পন্ন কবব। অদ্য তাব অভিষেক!

চোখে স্বপ্ন নিযে দাঁডানো বইযে লেখা আছে—দাদা—বাস্তবেও আছে। আমরা যারা অভিনেতা, যাবা প্রতি রাত্রিতে অভিনয়ে নামি—কি সপ্তাহে তিনবার চারবাব নাটক কবি—তারা ওগুলো দিব্যি আবিষ্কাবও করে অভ্যেসও করে। তবে—হ্যাঁ—নাটকের মধ্যে মগ্ন না হযে গেলে তা হয় না। অপরেশবাবুর 'ইরানেব

রানী' নামে একখানা নাটক ছিল—তাতে রানীর পার্ট করতেন, মারা গেছেন কৃষ্ণভামিনী। বিচারের একটা দৃশ্য আছে—সেই দৃশ্যে যে পার্টটা তিনি নির্বাক থেকে করে যেতেন তার তুলনা হয় না।

তেমনি দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছি। চোখের পলক পড়ছে না। চোখে পড়ছে না কোন মানুষের মুখ। নাটকের কথা ছাড়া কোন কথা মনেও পড়ছে না। প্রদ্যুম্ন বলছে--

সচিবপ্রবর বয়সে আপনি জ্যেষ্ঠ প্রবীণ। ধার্মিক।
আমার প্রণাম লহ। বয়সের অধিকার শ্রেষ্ঠ অধিকার।
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে আমারে।
কিন্তু দেব—
আমার রয়েছে প্রশ্ন। দৈত্যরাজ শঙ্কর আজীবন
ব্রহ্মচারী। তবে আমার পিতা কে? কেবা মাতা
মোর?

মন্ত্রী বলবে—

নাহি জানি কুমার প্রদ্যুম্ন। প্রয়োজনও নাই। তবে
শুনিয়াছি বিধাতার অভিপ্রায়ে এ বিশ্বজগতে
বিশ্ববিধানের অঙ্গ সম তপস্বী শম্বরাসুর
তোমা পুত্র লাভ করি বক্ষে ধরিয়াছে।

প্রদ্যুম্ন বলবে—

কেবা ওই নারী, যে আমারে করেছে লালন।
রূপেও অপরূপা নারী, মুখ ঢাকা সযত্ন গুণ্ঠনে।
অবয়ব আভাসে প্রকাশ।
বাসন্তী পূর্ণিমা রাত্রি একমাত্র তুলনা তাহার।
জ্যোৎস্নায় ঝলমল, পুষ্পগন্ধ মদির মলয়—
স্নিগ্ধ; কোকিলের পঞ্চতানে সংগীত মধুর।
কেন তার মুখখানি এমন গুণ্ঠনে ঢাকা?
কেবা সে আমার? প্রণাম করিতে গেলে
দূরে সরে যায়। কাঁদে মাঝে মাঝে।
কে সে?

মন্ত্রী বলেন—

নাহি জানি হে কুমার কেবা সেই রহস্যরূপিণী।
শুধু বুঝি এইটুকু এ নহে সামান্যা নারী।
ওই স্থির রূপ ও মাধুরী এ নহেক ক্ষয়শীল
মর্ত্য উপাদানে গড়া। ও নারীর নাহি ছিল
শৈশব কখনও—না আসিবে প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্য।
চিরন্তনী কিশোরীর মতো স্থির হয়ে

রয়েছে সে—এই দৈত্যপুরে। নিদ্রা নাহি যায়
জেগে থাকে শিয়রে তোমার। দৈত্যরাজ
আদেশ করিয়া গেছে—কেহ যেন কোন প্রশ্ন
না করে উহারে!

প্রদ্যুম্ন বলবে—

বুঝিলাম সব। আমার এ সযত্নে লুকানো পরিচয়
আমারেই বাহির করিতে হবে।

মন্ত্রী বলবে—

নহে যুবরাজ, তোমার যে পরিচয় দৈত্যেন্দ্র শম্বর
রত্নরাজ মুকুটের সহ দিযাছেন, তাই শুধু তাই
তব পরিচয। দৈত্যেন্দ্র শম্বরাসুব শিবভক্ত
আজন্ম কুমার ব্রহ্মচারী—মানস সন্তান তুমি তার।

—কিন্তু মন যে ভরে না মন্ত্রীবর।
—মনেরে বুঝাও যুবরাজ! দৈত্যেন্দ্র শম্বরাসুর
পুণ্যবান তপঃপরায়ণ দেবতার চেযে। তাহার
মানসপুত্র তুমি, দেবতার চেযে বড।

—ভাল কথা তাই হোক। মনেরে বুঝাব মোর!
শম্বরের মন হতে উৎপন্ন হযেছি আমি—
তাঁহার মানসপুত্র।

মন্ত্রীরা—কুমাব প্রদ্যুম্নের জয—জয় কুমার প্রদ্যুম্নের বলে লোকজনদেব নিয়ে চলে গেল। প্রদ্যুম্ন উদ্যানের বাঁধা ঘাটে এল—

—ওরে মন—তুই বোঝ, বুঝে দেখ!
শিবব্রত তপঃসিদ্ধ শম্বরের মন হতে জন্ম তোর
তাহাব মানসপুত্র; এব চেয়ে কোন ভাগ্য কার ভাগ্য
বড হতে পারে?

তারপর নিচেব দিকে মুখ করে—পার্ট আছে—

—রজত দর্পণ সম শান্ত স্বচ্ছ সবসীর নীরে
তুমি কে হে? হেন অপরূপ রূপ তুমি কোথা
পেলে? তুমি কে হে? কি বলিছ? কুমার
প্রদ্যুম্ন তব নাম—আজিকে ষোড়শ বর্ষে উপনীত
তুমি?
কিন্তু হায় প্রিয়া নাহি তব। কিন্তু কি করিবে
বন্ধু!

মদন হয়েছে ভস্ম—এ বিশ্বেব ষড ঋতু হতে বসন্ত সে
গেছে নির্বাসনে। বতি কেঁদে ধূলায লুটায।
প্রেমহীন শুষ্কধবাতল। তবু তবু বন্ধু প্রিয়াবে
তোমাব
আমি খুঁজে এনে দেব।

এই সময শঙ্খ বেজে উঠল—একটি সুন্দব গানেব সুব বেজে উঠল। প্রদ্যুম্ন বলবে—

—কি হলো ? শঙ্খ— ? ও—আমাব জন্মেব মুহূর্ত এল !
কিন্তু এই গান—এই স্বব এই সুব—পাখিবা
কোথায গেল ?
ফুলেবা ফুটিল, ভ্রমবেবা উঠিল গুঞ্জবী। কেন কেন ?
এমন হইল কেন ? সাথে সাথে মনো মাঝে সম—
কে যেন কহিছে কথা ? কে বলিছে—কি বলিছে ?
সেই পুবাতন প্রশ্ন—
কে আমি ? কে আমি ? ওবে বে অবোধ মন
এমন অবোধ প্রশ্ন কেন তোব ?

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই উত্তব ভেসে এল—আমি বলে দেব কুমাব প্রদ্যুম্ন ?

প্রদ্যুম্ন চমকে উঠে তাকিযে দেখবে—বতি অথবা মাযাবতী দাঁডিযে ঘাটেব পথে। কাঁখে তাব কলসী, অন্যহাতে তাব মালা চন্দন সাজানো থালা।

আমি চমকে উঠলাম। এ কি হলো ? এ কে ? পেযাজবঙা একখানি শাডি পবে কাঁখে কলসী নিযে একটু হেলে দাডিযে মুচকে মুচকে হাসছে—, বতি ? মাযাবতী ? মাযাবানী ? কিন্তু সে প্রশ্ন সমাধানেব মতো সময ছিল না তখন। প্লে তখন আগুনেব মতো জমে উঠেছে। নাটকেবও চবম জাযগা— অভিনযেবও তাই। এখানেই ক্লাইম্যাক্স। গোটা আসবটা ইতিমধ্যে কখন যে লোকে লোকে ভবে উঠেছে তাব হিসেব আমি অন্তত বাখিনি। বোধ হয লোকমুখে বাজাবে খবব গিযে বাজাবেব লোক এসেছে। বিভিন্ন কলিযাবী টেলিফোনে খবব নিযে এসে জমেছে।

আমি অবাক বিস্মযে তাকিযেছিলাম—বতিব দিকে । না—একে আমি চিনি। সেই যেন কত চেনা কত চেনা মানুষটা আবাব দাডিযে হাসছে ! কিন্তু কে ? পেঁযাজবঙা শাডিটাব উপব সেই সাদা অর্গান্ডিব আপাদমস্তক ঢাকা আলখাল্লাব আববণীটা ওকে যেন ঠিক চিনতে দিচ্ছে না।

বাপ্পা বললে—পার্ট বলতে ভুল হযে গেল।

মেযেটা আশ্চর্য মেযে —এক পা এগিযে একটা মুভমেন্ট দিযে নিযে বললে আমি বলে দেব কুমাব প্রদ্যুম্ন ?

প্রদ্যুম্ন বলবে-

তুমি মাযাবতী, তুমি মাযাবতী—
হে বহস্যময়ী—তাব আগে বল দেখি—

তুমি কেবা ? তুমি কে ? ধাত্রী সম তুমি মোরে
করেছ লালন। তবু তুমি খোল নাই ওই তব
রহস্যের বিচিত্র গুণ্ঠন। বল তুমি—-তুমি কে ?

রতি বললে—

আমার এ মুখপানে চেয়ে দেখ দেখি।
দেখ চেয়ে—

—-কি করে দেখিব ? গুণ্ঠনে আবৃত কবি রেখেছ নিজেরে
উন্মোচন কর তুমি গুণ্ঠন তোমার।
কব উন্মোচন।

—-হায়। হায রে পুরুষ।
আপনার গুণ্ঠন মোচন
আপনি কবিতে নাই নারীরে কখনও —।
পুরুষের জাগ্রত যৌবন দুরন্ত সে ঝড়ের মতন
এসে—-আবরণ কবে উন্মোচন। কন্দর্পেব
পুষ্পবাণে জর্জরিত তনু পুরুষ উত্তাল হলে
বতি এসে বিছায আসব।

প্রদ্যুম্ন ছুটে গিয়ে তার গুণ্ঠনের আঁচল ধবে টেনে ধববে—-। একটি বাঁকা কটাক্ষ হেনে- অবগুণ্ঠন ফেলে দিযে দাঁডাবে রতি। পেঁযাজরঙা শাড়িখানা পরে মাযাবতী—-বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিযে বললে-

— দেখ— দেখ— ভাল কবে চেযে দেখ।
আমাব এ কমল কুসুম আননের পানে
ভাল করে চেযে দেখ সখা। দেখ সেথা
লেখা আছে মোর পরিচয, পড়ে দেখ।
আমাব চোখেব পানে চাও
আমাব এ বিহ্বল দৃষ্টির [illegible] দেখ প্রাতাবন্ব তব।
দেখ চেযে আপনাবে চেন —-আমাবেও চেন।

বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে হলো ওব, ও হাঁটু গেডে বসে পডল। যেন প্রার্থনা কবছে। নিজেকে ঢেলে দিচ্ছে। মনে হলো আত্মসমর্পণ করছে।

ওদিকে তব এফেক্ট হলো এমন যে হাততালিতে গোটা আসরখানা যেন ভেঙে পড়ল। আমি প্রায বেকুব হযে গিছলাম। কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। মেযেটাই উপায করলে সে নিজেই উঠে দাঁডাল কলসী কাঁখে নিযে। সেই ছেলে দাশুরে বললে —

—আজ তুমি জেগেছ যৌবনে
আপনার স্বকীয় অস্তিত্বে আজ প্রতিষ্ঠিত তুমি।
ওই দেখ বসন্ত এসেছে ফিরে দীর্ঘদিন পরে।
পাখিরা গাহিছে গান শোনো। বাতাস দক্ষিণ
হতে বয়। ফুলেরা উঠিল ফুটে থরে থরে।
এবে মনে কর—হিমালয়ে শিলাসন পরি
সতীর বিরহ দুঃখে ব্যথিত শঙ্কর মগ্ন তপস্যায়
মহাকাল স্তব্ধ হলো— জরাজীর্ণ হইল পৃথিবী—
খণ্ডকালে স্তব্ধ মহাকাল, নবকাল-নবীনতা—
অবলুপ্ত হলো। মনে কর—বসন্ত সখার
নিজস্ব উদ্যানে—চিরন্তন যুবক-যুবতী দোঁহে
ফুলসাজে—মগ্ন ছিল মধুর খেলায়
কি নাম তাদের তুমি জান কি কুমার?

প্রদ্যুম্ন বলে উঠবে—
সে তো যেন তুমি আর আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ—
তুমি আর আমি। ফুলহারে ফুলের বলয়ে—
ফুলের মুকুটে দোঁহে সেজেছিনু— । বিশ্বভুবনের
প্রাণবীজ বিভক্ত দুইটি দলে, কাম আর রতি
দুটি ভাগ। সেই প্রাণবীজ লাগি শিব আর শিবানীর
তৃষ্ণা জেগেছিল। মনে পড়িতেছে। হ্যাঁ, মনে পড়িতেছে।

রতি হেসেই বলে- —এর উত্তর হেসে বলারই কথা। কিন্তু এই মাহ। যে বিচিত্র হাসি হেসে বললে—

মনে পড়িয়াছে? চিনিয়াছ মোরে?
কাম আর রতি—রতি আর কাম—
ওগো রতিপতি—আজ ষোড়শ বর্ষের তৃষ্ণা
রতির বুকের মাঝে সৃজিয়াছে উষ্ণ প্রস্রবণ।
আজি আমি পেয়েছি তোমায়—পুনরায়।
ষোলটি বছর ধরি তিলে তিলে গড়িয়াছি
তোমা—ওগো মোর প্রিয়তম—পতি।
শোন প্রিয় মোরা দোঁহে চিরন্তন যুবকযুবতী—
সুস্থির যৌবনাসনে হিন্দোলায় দুলে যাই,
দোল খাই।

* * *

এ জায়গাটা আগে আগে সিরিয়াসভাবেই করা হয়েছে। আমি রতি সেজেও তাই

করতাম। কেষ্টবিনোদ যা বলেছিল—তাতে মায়ারানীও তাই করেছে আজকের আগে পর্যন্ত। আজই কেষ্টবিনোদ বলেছিল—ওই জায়গাটায় সাবধান হ্স বাপ্পা। ওখানটা মাগী খুব ভাল করে রে। কাঁদে। ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকায়। যেন মিনতি করে। আমি তার জন্যেই তৈরি ছিলাম। কিন্তু না—মেয়েটা ও পথেই হাঁটল না।

আজ সে প্রথম থেকেই আনন্দে আহ্লাদে ডগমগ করছে। যেন প্রিয় মনোহরণে তার সর্ববিধ আয়ুধে সজ্জিত হয়ে সে একটির পর একটি প্রয়োগ করছে।

কলসী কাঁখে তার সেই অল্প হেলে দাঁড়ানো, মৃদু মৃদু হাসি, আজও মনে পড়ছে। হঠাৎ দেহখানায সে হিল্লোল জাগিযে তুলল।

আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। চোখের সামনে যেন পৃথিবীর বঙ পাল্টাচ্ছিল। মনে পডছিল বৈকুণ্ঠপুর। সেই আয়নায় নিজের ছবি। ঠিক এমনি ঠিক এমনি। হঠাৎ মনে পডল আর একটা ছবি। বিণী স্নো পাউডাব লিপস্টিক মেখে এমনি শাড়ি পরে একলা বন্ধ ঘরের মধ্যে মৃদু গান গেয়ে নাচছে। চমকে উঠলাম, এ কে? একি বিণী?

সব শেষে ওর হাত ধরে বেরিয়ে আসছি আসর থেকে। ওর হাত আগুনেব মতো উত্তপ্ত---আমার হাত তখনও ঠাণ্ডা---তবে উত্তাপ যেন জাগছে। সে আমাব হাত চেপে ধরে বললে---হায় পুরুষ! তবু চিনিলে না?

আমি বললাম—চিনেছি!

--মিছে কথা!

—না। তুমি বিণী!

বাপ্পা বোস চুপ করলে। আমি যেন মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম। ওদিকে পাখিরা প্রভাতী কলরব তুলে ডাকতে শুরু করেছে। দূরে বসে চাকর ধীরেন ঢুলছে। দূরে এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। বাগানে সেদিন অনেক ফুল ফুটেছিল। মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে জেনেও মনে করতে চেষ্টা করলাম যে আজ ওই গল্পটির জন্যই বাগানে এত ফুল ফুটেছে। এত প্রজাপতি জমেছে। বাপ্পা বোসকে ভাগ্যবান বলে মনে হলো—ও ওই এমনি একটি প্রাণময়ী রতির সঙ্গে প্রদ্যুম্নের পাট করেছে। তার থেকেও সে ভাগ্যবান, বিণীকে সে ফিরে পেয়েছে! আবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে—এবং যখন দেখা হয়েছে—তখন পর্যন্ত বিণীর দেহখানা নিয়ে যতবারই মালা গাঁথা হয়ে থাক---বিণী তাব প্রাণশক্তিতে কামনাতে এতটুকু মলিন বা বাসী হয়নি!

হঠাৎ কি মনে হলো—প্রশ্ন করে বসলাম—একটা প্রশ্ন রয়ে গেল যে!

হেসে বাপ্পা বললে—মায়াবিণী সম্পর্কে তো? মায়ারানীর মায়া বিনোদিনীর বিণী এই দুটো যোগ করে ওর নতুন নামটা লোকে দিয়েছে।

----সে এখন কোন দলে থাকে?

—-কোন দলে না। ওই ঝরিয়া থেকেই তার জীবন বদলাল। পরের দিন সকালে

ওরা কলকাতা চলে এল। আসবার সময় ও আমাকে বলেছিল—দেখ—কলকাতায় ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না। যদি না দেখা কর—তবে সেবার মরিনি, এবার মরব। সেবার তুমি চলে আসার কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পেরেছিলাম—তুমি আমাকে ফেলে পালিযেছ। ভেবেছিলাম তোমার উপর শোধ নিতে নিজে মরব। মরতেও গিছলাম। ওই স্নানের পুকুরের ঘাটে। ঘাটের পাশে কল্কে ফুলের বীজ ছিল, বেটে খাব ভেবে বাটছিলাম। হঠাৎ পেয়ারা মাস্টার এসে দাঁড়াল। তারই সঙ্গে পালিয়ে এলাম বর্ধমান। তারপর সে অনেক কাণ্ড। পেয়ারা মাস্টার স্বামীর সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রি করিযে বর্ধমানে জাঁকিয়ে বসেছিল। থ্যামটার দল খুলেছিল।

আমাকে নাচগান শিখিযেছিল। গান আমাদের বংশে আছে। শিখতে দেরি হযনি। তার উপর লোকটা ছিল খুব চালাক---বুঝত সুঝত খুব। আমার সামনের দাঁত দুটো উঁচু ছিল, একটু একটু বেরিয়ে থাকত। পেযাবা মাস্টার আমার দাঁত তুলিয়ে দাঁত বাঁধিযে দিলে। আমার রূপে খুঁত ছিল—সে খুঁত ঘুচে গিয়ে আমি সুন্দরী হলাম। বিশ্বাস কর---সেদিন আযনাতে নিজের ছবি দেখবার সময মনে হয়েছিল তোমাকে। আমার ছবিটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম---তুমি বিণীর ছবি না তুমি বাপ্পা 'গোলাপী সেজেছ! এরপর তুমি যদি না-এস—তাহলে আমি মরব। যদি মরতে না পারি তাহলে নিশ্চয় জেনো—নিজেকে আমি—মানুষের মধ্যে যারা জন্তু জানোযার তাদের কাছে বিলিয়ে দেব।

কলকাতায ফিরলাম দিন পনের পর। ফেরার কথা ছিল না। কিন্তু থাকতে পারিনি। কাজ আছে বলে কলকাতা ফিরলাম, সটান ওর বাড়িতে গেলাম। দেখলাম সর্বাঙ্গে কালশিটে। কপালে একটা কাটার দাগ। কেষ্টবিনোদ ওকে শেষ প্রহার দিয়ে দলেব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে কাশী। ক্ষতবিক্ষত প্রহারজর্জর দেহ নিযে ও আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

আকাশে আলো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল।

পাখিদের কলকাকলি প্রকৃতির হাসির মতো বেজে চলেছিল।

সুন্দর গল্পটির আমেজে সব মধুর মনে হচ্ছিল।

আমি বললাম -আমি একটা নাম দিচ্ছি -বলো। নামটি তাকে বললাম চুপি চুপি।

হেসে বাপ্পা বললে— ওই নামেই আমি তাকে ডাকি। সে আর কেউ জানে না।

- - --

একটি চড়ুই পাখি ও
কালো মেয়ে

□●□

সমস্তটাই চোখের উপর ঘটছিল, আনন্দ চোখ মেলে দেখার জন্যই দেখছিল। সেই চোখ চাওয়া অবস্থাতেই চোখের উপরেই কি এসে পড়ল ঝপ করে। ঠিক নাক এবং ডান চোখের সংযোগস্থলে। বেশ বড় একটা কিছু। তাতে যেন কাটা আছে। এবং সবেগে এসে পড়ল। কয়েকটা কাঁটা যেন চোখে বিঁধে গেল আনন্দের। পিন কুশনের মতো একটা জিনিস— পিনের ডগাগুলি যেন বেরিয়ে আছে। আনন্দ আকস্মিক আঘাতে শুধু চমকেই উঠল না, একটা ক্রুদ্ধ এবং কাতর চিৎকার করে উঠল—ওঃ!

রবিবার দিন বিকেল বেলা, প্রায় পৌনে চারটে। চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, শীত গেছে, গরমের আমেজ উঠেছে, দুপুরে ঘুমুতে ভাল লাগছে কিন্তু রৌদ্রে জ্বালা বা তাপ এখনও ফোটেনি। তবুও গ্রীষ্ম দুপুরে যে একটা থমথমে ভাব ওঠে সেটা দেখা দিয়েছে, সেইটে কাটছে এখন। পাখিগুলো বাইরে কলকল করতে শুরু করেছে, দুপুরের ঝিমুনি কাটিয়ে উড়তে শুরু করেছে। ইলেকট্রিকের তারের উপর কয়েকটা কাক তারস্বরে কা কা ডাক ধরেছে। কয়েকটা শালিক কিচিরমিচির করছে। আর চড়ুইয়ের দল ফুর ফুর করে উড়ছেই উড়ছেই।

কলকাতার বাইরে আগে শহরতলী বলা চলত, কিন্তু এখন শহরের সামিলই। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন স্কীমে নতুন শহরই গড়ে উঠেছে, মাঝখানে একটা পার্ককে বেড় দিয়ে মসৃণ রাস্তার পাশে পাশে নতুন বাড়ি। বালিগঞ্জ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর মতো সবগুলোই বড় বাড়ি নয়, ছোট বড় মাঝারি একতলা ছোট বাড়ি থেকে চারতলা বাড়ি, খান দুই পাঁচতলা বাড়িও উঠেছে। এরই মধ্যে ছোট একখানা একতলা বাড়ির ভাড়াটে আনন্দ। বাড়িটা একতলা এবং ছোট হলেও ফ্যাশনে কায়দা করনে খাটো নয়। সব থেকে বিশেষত্ব বাড়িটার জানালা। আটফুট চারফুট একটা জানালা দক্ষিণের দেওয়ালে এবং তারপরই পচিশ ফুট রাস্তা, তার ওপারে পার্ক। পার্কের চারিদিকে দেবদারু গাছের সারি। দু' চারটে শিমূল জাতীয় গাছ। সব মিলয়ে শহর এবং পল্লীর মুক্ত আকাশ ও মাটিতে গাছপালার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে একটি মেশামেশি আছে। গাছপালার মধ্যে পাখি —সে শকুন থেকে চড়ুই পর্যন্ত। কীটপতঙ্গও যথেষ্ট। মশার তো কথাই নেই, রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে ভোঁ করে গুবরে পোকা ঘরে ঢুকে মাথা ঠুকে ঠক করে মেঝেয় যখন পড়ে তখন আনন্দকে চমকে উঠতে হয়। এ পর্যন্ত দু'খানা ছবি তার একদম বরবাদ হয়ে গেছে। চমকানিতে হাতের তুলি লাফিয়ে এমন বেমক্কা রঙের টান মেরে দিলে যে —তাকে আর কিছুতেই শোধরানো গেল না। শোনা যায় সাপও আছে। কোণে—অর্থাৎ ঘরের কোণে ব্যাঙ তো আছেই। আকাশে

মেঘ হলেই কোণ থেকে কর্‌র্‌ শব্দ করে ডেকে ওঠে। রাত্রে পাশের ফ্যাক্টরির কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে শেয়াল ডাকে নিত্য নিয়মিত।

আজ বিকেলে একটু সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে উঠেছিল আনন্দ। কমার্সিয়াল আর্টিস্ট আনন্দ কাল শনিবার কাজ করেছিল। রবিবার ও ঘুমোয়, আজ ভেবেছিল বেশি করে ঘুমুবে। ঠিক করেছিল সন্ধ্যাতেও আর বের হবে না। কিন্তু তবুও ঘুম ভাঙল সকাল-সকাল। ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে। কাল বিকেল বেলা মিশন রোয়ের একটা আপিসে গিয়েছিল, সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু আর মিশন রোয়ের জংশনে তখন ট্রাফিক জাম হয়ে গেছে। সে আর প্রায় নড়ে না। সে যাচ্ছিল ট্যাক্সিতে। বড়বাজার থানার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা কাপালীটোলার সঙ্গে মিশেছে, সেই রাস্তা ধরে বেরিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। ফিরিঙ্গি মেয়ে। হাঁটুর উপরে ওঠা খাটো ফ্রক, মুখে ব্রণ, সে ব্রণগুলো রঙেও ঢাকা পড়েনি। বগলে ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতে সিগারেট। বেশভূষায় রকমে অশ্লীলতাকে সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছে এবং সেটা তার বড় বড় চোখ আর এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের জন্যে অত্যন্ত খাপ খেয়েছিল। নিজে আর্টিস্ট আনন্দ, সে বলতে পারে—এ ছেড়ে অন্য যে কোন রকম মেক-আপ হোক, ওকে এর থেকে ভালো মানাতো না। সে দামী ঝলমলে হলেও না। সুশীলা সাজে মনে মনে ওকে সাজিয়েও আনন্দ দেখেছে, কিন্তু তার থেকে করুণ ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না—এটা সে নিশ্চয় করে বলতে পারে। সংসারে প্রত্যেক মানুষের একটা করে স্টাইল আছে; এইটেই ওর স্টাইল। আনন্দ কপাল কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনার মনেই কতকটা স্থান-কাল বিস্মৃত হয়েই, মৃদুস্বরে বলে উঠেছিল—হুঁ! মেয়েটা শুনতে পায়নি নিশ্চয়, কিন্তু ড্রাইভারটা পেয়েছিল। বুড়ো শিখ ড্রাইভার। সেও মেয়েটাকে দেখছিল, আনন্দের ছোট্ট 'হুঁ' শব্দটি শুনে তার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীরভাবেই বলেছিল, চৌরঙ্গি যাতি হ্যায়! ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটা সিগারেট টেনে উপর দিকে মুখ তুলে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোতে ঝড়ো হাওয়ায় আমেজ লাগিয়ে ওই জাম ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাড়িগুলোকে পার হয়ে ওপারে উঠে আর একবার ধোঁয়া উড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। এবার ধোঁয়া ছেড়েছিল জাম ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর দিকে। ট্যাক্সি প্রাইভেট বাস লরীগুলো তারস্বরে হর্ন দিচ্ছিল; বোধ করি তাদের মুখেই ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে মেয়েটা ব্যঙ্গ করে গেল।

আনন্দ সকৌতুকে মৃদু শিস দিয়ে উঠেছিল।

বুড়ো শিখও হেসে বলেছিল, বহুত্‌ মজেমে হ্যায়।

আনন্দ আর কথা বলবার সময় পায়নি। সামনে একখানা বাসে এবং একখানা প্রাইভেটে কাছ ঘেঁষে এসে গায়ে গায়ে লাগিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক শব্দ তুলেছিল যে, চমকে উঠেছিল সে। প্রাইভেটখানার বাঁ দিকে মাডগার্ড চড় চড় শব্দে ছেড়ে গেল। মনটা চলে গেল ওইদিকে।

এবপব আব মনে হয়নি মেয়েটাকে। এবপব সে মিশন বোযে যে আপিসে কাজ ছিল সেখানে গেছে, তাবপব সন্ধ্যাতে তাদেব আড্ডায় গেছে। আড্ডা মানে একটা নিবিবিলি বাব। সেখানে তাদেব সমাজেব—হ্যাঁ সমাজ ছাড়া আব কি বলতে পাবে—আর্টিস্ট জার্নালিস্ট সাহিত্যিক সিনেমা পাবলিসিটিব লোক এবা মোটামুটি এক গোষ্ঠী না হোক এক সমাজ, এদেবই কিছু লোক— এক্ষেত্রে এক গোষ্ঠী বলা যায় —তাবা এসে জমে। আড্ডা মদ্যপান একসঙ্গে চলে। মদেব গ্লাসেব টুং টাং শব্দেব সঙ্গে বসিকতাব প্রতিযোগিতায় তাবই মধ্যে মাঝে মাঝে প্রাণেব কথা —সব নিয়ে চমৎকাব জমে ওঠে। আবাব ওই গোষ্ঠীব মধ্যে থেকে ছোট ছোট দল—বাত্রিব সঙ্গে দানা বাধে। তাবপব দলগুলি খসে। এমনি এক দলে পড়ে কাল এবপব হৈ হৈ কবেছে বাবোটা পর্যন্ত। চুম্বক অবশ্যই ছিল। স্বজাতীয়া অর্থাৎ বাঙালিনীব নৃত্য—কোন এক গুপ্ত বাবে। এব মধ্যে এই মেয়েটা যেন আসেইনি। একবাব আধবাব চকিতেব জন্যে ওব দূববর্তিনী সেই ট্রাফিকেব দিকে যেয়া ছাড়া ছবিটা যেন ধোঁয়া ছেড়েই পিছন যিবে ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েছিল। বাত্রে বাড়ি ফিবতে একটা হয়েছিল। এসেই শুয়ে পড়েছিল। চাকব জানে - শনিবাব বাবু বাড়িতে খায় না, সে খেয়ে দেয়ে শুয়েছিল—আনন্দ চাবী খুলে ঘবে ঢুকেছিল। ঘুম আসতে দেবি হয়নি। গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছে। বাত্রেও ঘুমেব মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু দুপুবেলা স্বপ্ন দেখলে এবং সাড়ে তিনটে হতে হতে তাব ঘুম ভাঙল। প্রথমেই মন বলেছিল —বেবিয়ে পড়। থানাব পাশে বাস্তাটাব মোড়েব মাথায় দাড়িয়ে থাকলেই দেখা মিলবে। কিন্তু শবীবটা কেমন যেন ভাবী মনে হলো—যে মুহূর্তে তাব মনে পড়ল যে, কাল যা পেয়েছিল সবই প্রায় শেষ কবেছে কাল। বাড়িতেও টাকা নেই। আজ ববিবাব ব্যাঙ্কও বন্ধ। শুধু ব্যাঙ্ক নয়—সব আপিসই বন্ধ। এসে সে দাঁড়িয়েছিল আটফুট বাই চাবফুট জানালাটাব সামনে।

চৈত্রমাসেব সাড়ে তিনটে। বোদ প্রসন্ন। তাত নেই। পার্কেব গাছগুলোব উপব পড়েছে পশ্চিমদিক থেকে। পার্কটাব চাবদিকে বাস্তা। ওপাবেব বাস্তায় ওয়ানওয়ে কবে শহবেব যত উত্তবমুখী গাড়িগুলো যায়। সাব সাব প্রাইভেট কাব, ট্যাক্সি, বাস, লবি ঝবে ঝবে ছুটছে। কিছুটা পবে পবেব মুখে যেমন যেমন ট্রাফিক ছাড়ছে তেমনি এক এক ঝাক গাড়ি চলছে। চোখ তাব সেইদিকে পড়ল। কিন্তু মন তাব খুত খুত কবছে। যাওয়া হবে না ? মেয়েটা [illegible]। একবাব গিয়ে আড়াও শুধু ওকে দেখে এলে কি হয় ? কিন্তু [illegible]। না। পকেটে টাকা না থাকলে অস্বস্তি অনুভব কবে আনন্দ। চাকবটাব কাছে আব কত [illegible] পাওয়া যেতে পাবে ? এই তো সাতদিন [illegible] তাকে দিয়েই মনিঅর্ডাবেব ফর্ম লিখিয়েছে। চাল্লশ টাকা বাড়ি [illegible] পয়ঁত্রিশ টাকা। [illegible] পাচ টাকা। বাজাব খবচ, নিত্য খবচ [illegible] যে [illegible] ওব হাতে বিশ পচিশ টাকা [illegible]

থাক [illegible] আগামী কাল। আগামী কাল। সেই চুম্বক চুম্বক

অ্যান্ড টুমরো। এপারে তার বাসাটার ধারের রাস্তাটা নির্জন। বাড়িও কম। এপথে গাড়ি নেই। এখন সাড়ে তিনটেতে লোকজনও নেই। চৈত্রমাসে দেবদারু গাছগুলোর সব নতুন পাতা। কাঁচা সবুজ। বাতাসে দুলছে আর রোদের ছটায় পাতার কাঁচা রঙের পালিশ থেকে কাঁপানো ছটা বাজিয়ে ঝিলিকের একটা ঝিলিমিলি—ঝিকিমিকি তুলেছে। কয়েকটা শিমূল জাতীয় গাছের পাতা ঝরে গেছে নিঃশেষে। শুকিয়ে যাওয়া মতো ডালগুলোয় বড় বড লাল ফুল ফুটেছে। ক'টা কাক পথে নেমেছে, রাস্তার উপর থেকে কিছু খুঁটে খাচ্ছে। ও—। বেলা দশটা নাগাদ ফুটো ময়লা ফেল্দা গাড়িটা গেছে রাস্তার উপর দিয়ে মযলার ছড়া ছড়িয়ে। ক'টা চড়ুই পার্কের ধারে রাস্তার পাশে ধুলোস্নান করছে। কলকল কচকচ করে ঝটপট করে মারামারি করতে করতে চার-পাঁচটা শালিক উড়ে যাচ্ছে। দুটোয় জড়াজড়ি করে ধপ করে মাটিতে পড়ল। চড়ুইগুলো আশেপাশে কোথায অজস্র ক্রিচ-ক্রিচ ক্রি-র্-র্ র্, ক্রি-র্ র্-র্ করছেই করছে। চীনে চড়ুই নির্বংশ করেছে। এখানে করে না? মার্ক্সিস্ট সে নয়। কম্যুনিস্টদের প্রেমেও সে পড়েনি, কিন্তু চীনের এইটেই তার ভাল লাগে।

কম্যুনিস্ট সে নয, কোনও বাদ বা বাদানুবাদের ধাব সে ধাবে না। এখানকাব কম্যুনিজমকে সে বাদ বলে না—বলে অনুবাদ। সেই হিসেবে সে বলে—ও সব বাদানুবাদে আমি নেই। তবে চীন রাশিযাকে তারিফ করি—তাব কারণ তারা ঈশ্বর নামক কল্পনাটিকে ধুয়ে-মুছে দিযেছে। জীবনের সমস্ত পথে বাধা ওই কল্পনার প্রস্তরখণ্ড! আর চীনকে তারিফ করি তারা চড়ুই আর মাছি নির্মূল করেছে বলে।

অকস্মাৎ একটা কাক একটা বড দেবদারু গাছেব মাথা থেকে ছোঁ মারলে! এঁকে-বেঁকে আশ্চর্য গতিতে ছোঁ মারা ওদের। একটা চড়ুই—! সেটাও আশ্চর্য গতিতে ছোট দেবদারু গাছটাব পত্রপল্লবেব ভিতরে জলের মধ্যে মাছের মতো পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাকটা গতিবেগ সামলাতে এসে ইলেকট্রিক তারের উপর বসল।

পার্কটার ভিতরে কর্পোরেশনেব ছোট অফিসটার ওখানে একদল ঝাড়ুদার জমেছে। গোলমাল করছে। ওধারে বাস চলা ওয়ানওযে রাস্তাটায একটা বাস লম্বা একটা ক্যাঁ-চ শব্দ তুলে ব্রেক কষে দাঁড়াল। পিছনে সারিবন্দী গাড়ি।

শিমূল জাতীয় পত্রহীন ফুল-ফোটা গাছটায কয়েকটা ছেলেমেযে ঢেলা ছুঁড়ছে ফুল পাড়বে। বাচ্চা ছেলেমেযে। আজ রবিবার বিকেলে পার্কে বেশ ভিড হয়। পার্কটার একদিকে খানিকটা মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট। হবেক রকম সাজে-গোজে সেজেগুজে মেযেরা আসবে। কত রকম কাপড়পবা সত্তর বছরের বৃদ্ধা থেকে প্রৌঢ়া যুবতী কিশোরী বালিকা। নানারকম পোশাক—নানান খোঁপা—চুল বাঁধা—নানান চেহারা। এক প্রৌঢ়া আসেন—তিনি নিত্যই আসেন—কারণ যেদিনই আনন্দ বিকেলে বাসায় থাকে সেইদিনই সে তাঁকে দেখে—নাতি-টাতি জাতীয় একটি শিশুকে কোলে নিয়ে পার্কে ঢুকছেন। তাঁর সাজসজ্জা, কেশ পারিপাট্য দেখে সে চমৎকৃত হয। মুখে পাউডারের পাফ না থাক স্নো-ঘষা হাত যে মুখে বুলোন তাতে সন্দেহ নেই। এককালে সুন্দরী

ছিলেন। ও দেখে আনন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারে—মহিলাটি মনে মনে আজও যৌবন বনে বিচরণ করেন। কৌতুক অনুভব করে সে।

সেদিন বারের আড্ডায় এক অনতিক্রান্তযৌবনা সমাজ-রমণী জাতীয় একটি মেয়েকে দেখে তাব এক বন্ধু বলেছিল—চেন ওকে? ওই যে রূপালি চুলিনী সিগারেট পাইপহস্তা? উনি স্বনামধন্যা—।

আনন্দ বিস্মিত হয়েছিল বিখ্যাত মহিলাটির নাম শুনে। অবশ্য তিনি বারে বসেননি, তিনি একটা সেলুন থেকে বেরিয়েছিলেন। আনন্দ সেই কথার সূত্র ধরে এই মহিলাটির কথা বলেছিল।

বন্ধু বলেছিল—তুই বীটনিক না অ্যাংরি ইয়ংমেন রে?

—কেন?

—যে ভাবে দুনিয়াকে দেখছিস, বিচার করছিস—তাই বলছি।

সে বলেছিল—যা বল। তবে আমি নিজে দুটোর একটাও নই। আমি আনন্দ রায়। আমি ইস্কাপনকে ইস্কাপনই বলি। সে বিবি হলেও খাতির করে মুখের চারিপাশে লাল শেড দিই নে। কিংবা মুখে ইন্ডিয়ান রেজ লাগাইনে। আইভরি ব্ল্যাক ব্যবহার করি। সেক্স সত্য, মানুষ যত সত্য তত সত্য। এটা আমি জানি এবং মানি, কারণ আমি একজন মডার্ন মনুষ্য। এবং আমি নারীজাতিকে ভয়ও করিনে বা তার পশ্চাতেও উন্মত্তবৎ ছুটিনে। সংসারে নারীজাতির মধ্যে একটি নারী আছেন যিনি আমার মা। ভগ্নী নেই। বাকি নারীজাতিকে ভাগ করি বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতীর মধ্যে। তাঁরা সবাই নারী। তাঁদের দেখি রূপ, দেখি ব্যবহার, বিচার করি। যিনি লভ্যা তাঁকে রুচিতে না বাধলে লাভ করতে চাই। কিন্তু প্রেম করে নয়—বিনিময়ে। তবে কেউ যদি সাময়িক প্রেমে বিশ্বাস করতে পারেন তার সঙ্গে সাময়িক প্রেমেও আমার বাধা নেই।

বন্ধু বলেছিল—বাপ্স্। তুই তো লীডার রে বাবা—

—নো। সহস্রের মধ্যে বলব না—তবে আমি শতজনের একজন। তুমিও তাই। ও-ও তাই।

—গুড। উই আর অল বার্ডস অফ দি সেম ফেদার।

সে বলেছিল—উই আর অল ক্রোজ। কাক পক্ষী। কারণ কাকই সব থেকে বেশি এবং সাধারণ। এবং কাকদের কোনও বিষয়ে কোনও প্রেজুডিস্ নেই। এবং দারুণ ঐক্য তাদের মধ্যে। শালিকও কমন—কিন্তু শালিক আমরা নই, কারণ তারা বড্ড বেশি কলহ মারামারি করে—যা আমরা করিনে।

কাক-চরিত্র সে ছেলেবেলা থেকেই জানে। কিন্তু এখানে এসে অবধি এই পার্কটার জন্য এবং এখানকার খোলা ড্রেনের জন্য কাকেদের আধিক্য হেতু কাক-চরিত্র আরও ভাল করে অধ্যয়ন কবতে পেবেছে।

থাক। আজ কাক-চরিত্র আর নারীচিত্র দেখেই বিকেলটা কাটুক। না। দেবদারুর কচি পাতায় পড়ন্ত সূর্যের আলোর খেলাটা হঠাৎ যেন মনোহারিণী হয়ে উঠল। বাঃ!

পশ্চিম আকাশে মেঘ ছায়া ফেলেছে। তাইতে শেড পড়েছে। প্রদীপ্তবর্ণা আলো এই ছায়ায় উজ্জ্বল শ্যামাশ্রী হয়ে উঠেছে।

খিল খিল হাসির শব্দে নির্জন পথটা চমকে জেগে উঠল। নারীকণ্ঠ।

আলোর রূপ আছে—কিন্তু কায়া নেই; কায়ার আকর্ষণ আছে। সে চোখ ফেরালে। হুঁ। আরম্ভ হলো নারী অভিযান। একদল মেয়ে—সম্ভবত একই বাড়ির—আসছে। সে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। সপ্তরথিনী না সপ্তসমুদ্র! না, সমুদ্র নারী নয়। চারটি যুবতী—তার মধ্যে একটি বিবাহিতা। মাথায় ডোনাল্ড খোঁপা। তিনজন বিশ থেকে ষোলর মধ্যে ডবল বেণী সিংগল বেণী এলো খোঁপা বাঁধা। তিনটির দুটি বালিকা—একটি বছর তিনেকের। ওদের ববছাঁটা চুল।

—বাবু! চা করব?—হরিয়া চাকর।

—নিশ্চয়।

—রাত্রে?

—বাড়িতে খাব। নিবিমিষ। বুঝলি?

—হুঁ।

ছাতা—লেডিজ ছাতা আসছে! এ দল পার হয়ে গেল প্রায়। কিন্তু আনন্দের সব ঔৎসুক্য ধাবিত হলো ছাতার দিকে। ছাতার দিকে নয় ছত্রধারিণীর দিকে।

দীর্ঘাঙ্গ সুকৃষ্ণা। মানে সুন্দর কৃষ্ণা। আনন্দ রায় এই পাড়ায় নতুন এসেছে। মাসখানেক। মেয়েটি ঘড়ির কাঁটার মতো সকালে একবার বিকেলে একবার এমনই ছাতায় নিজের মুখ ঢেকে চলে যায়। পার্কের যাত্রিনী ও নয়। মুখ ঠিক দেখেনি তবে দেখেছে ওর কালো রঙ আর কালো চুল। একরাশি কালো চুল, এবং সে কেশরাশির ওর দীর্ঘাঙ্গীত্বের সঙ্গে সমতা রেখে দীর্ঘ। হয়তো একটু বেশি। কোমর ছাড়িয়েও নিচে নেমে থাকে। এই বিশেষ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মেয়েটি সচেতন—স্যাম্পু করে খুলেই রাখে। ক্বচিৎ দেখা যায় মুক্তকেশী কৃষ্ণার পটভূমি কৃষ্ণ মেঘমালা আজ দুলছে না, ফুলছে না। আর একটি বিশেষত্ব ওর হাঁটার ভঙ্গি। দীর্ঘাঙ্গীদের পায়ের দিকটাই দীর্ঘতর হয়, সুতরাং পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত দীর্ঘ। কৃষ্ণা কিন্তু দীর্ঘ পায়ে খাটো খাটো করে খুব দ্রুত ছন্দে চলে। তাতে একটি নৃত্যভঙ্গির সৃষ্টি হয়। মেয়েটির নাচ জানা নিশ্চিত।

ময়নাপাড়ার মাঠে মেঘ এলে কালো মেয়ের মতো আকাশের দিকে চেয়ে বারেক তার দিকে তাকিয়ে গাইটিকে ডাকবার জায়গাও এ নয়, কথাও ওর অবশ্যই নয়—কিন্তু কোনওদিনই কোনও কারণে ছাতাটিকে সোজার বদলে ঘাড়ে ফেলে আকাশের দিকেও তাকালে না, কোনও ভাই-বোনকেও ডাকলে না, তার দিকেও তাকালে না। ওর চোখ কালো হরিণ চোখ কি না সে দেখা আনন্দের আর হলো না। মধ্যে মধ্যে মনে হয় দেখলে ছবি এঁকে কোনও কালিওয়ালা কোম্পানিকে বেচে আসতে পারত। ক্যাপসন দিত—'যতই কালো হোক্'। উঁহু। ক্যাপসন দিত—'চিকন ছাঁদে লেখা আমার এমনই কালো হোক্'।

অবশ্য ঔৎসুক্য থাকলেও মনোযোগ আকর্ষণেব কোনও চেষ্টাই কোনওদিন কবেনি আনন্দ। ওব নিজেবও যে সে মাঠ চাই। আনন্দেব সে মাঠ চৌবঙ্গীপাড়া। আজ কিন্তু ইচ্ছে হলো সজোবে 'হবিযা' বলে চিৎকাব কবে ওঠে। না, থাক। ছত্রধাবিণী চলে এসেছে তাব জানালাব সামনে। হাতেব কনুই আব সঞ্চবমান পাযেব পাতা দু'খানিব অগ্রভাগ ছাড়া আব কিছু দেখা যায না। সাদা কাপড। একহাতে ছাতা, অন্য হাতে খাতা বা বই। কাজেই কনুই ছাড়া গোটা হাত দু'খানাও দেখা যায না। ব্লাউজটা উজ্জ্বল জবদা বঙেব।

আবে! কি হলো ? একটা কাক ছো মেবে নেমে এসেছে ওব ছাতাব উপবে! কি কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে ঘটল ঘটনাটি— একটা পিন কুশনেব মতো কিছু এসে সজোবে লাগল আনন্দেব ডান ভুরু চোখ এবং নাক ও ভুরুব সংযোগস্থলে। ক'টা পিনেব ডগা যেন বিঁধে গেল। নিষ্ঠুবভাবে বিঁধে গেল। মুহূর্তে ডান হাতখানা আপনা-আপনি উঠে বস্তুটাকে চেপে ধবলে এবং মুখ থেকে যন্ত্রণাকাতব এবং ক্ষুব্ধ চিৎকাব বেবিযে গেল অঃ। এবং টেনে ছাড়িযে নিল বস্তুটাকে। বিঁধে যেন আটকে গিযেছিল। নবম। উষ্ণ। হাতেব মুঠোব মধ্যে সে স্পন্দন অনুভব কবছে! হৃদস্পন্দনেব সঙ্গে কম্পন।—কি ?

কি ? একটা চড়ূই পাখি। আনন্দেব দৃষ্টি যখন ছত্রধাবিণীব ছত্রেব কালো কাপড থেকে মাটিব দিকে ওব চুল, ওব জবদা বঙেব ব্লাউজেব হাতা, কনুই, ধবধবে পাডহীন কাপডেব বেড বেযে স্যান্ডেল পবা পাদুযেব পাতাব দিকে বিচবণ কবছিল, তখন কাক শালিক চড়ুই প্রভৃতি পক্ষীবাজ্যেব নিযমানুযাযী তাদেব জীবনযাত্রা চলেছিল স্বাভাবিকভাবে। ইলেকট্রিক পোস্টে বসে থাকা একটা কাক একটা উডন্ত চড়ুইকে লক্ষ্য কবে ছোঁ মেবে নেমে এসেছিল,—চড়ুইটা প্রাণভযে উন্মাদেব মতো সম্মুখে ওই জানালাটাব দিকে উডছিল, কাবণ আব কোনও আশ্রয সামনে ছিল না। ওদিকে কাকটা ছো মেবে এসে ঝোক সামলাতে না পেবে ছত্রধাবিণীব ছত্রপ্রান্তে পাখাব ঝাপটা মেবে উপবে উঠে গিযেছিল —এদিকে চড়ুইটা উন্মাদ পলাযনেব বেগে এসে শিকেব ফাঁক দিযে ঘবে ঢুকে --আনন্দেব চোখেব উপব ও নাক ভ্রূব সন্ধিস্থলে ঝপ কবে পডে নখ দিযে আঁকডে ধবেছিল।

আনন্দ নিষ্ঠুবভাবে টিপে ধবলে চড়ুইটাকে। টিপেই মেবে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে টপ টপ কবে দু' ফোটা বক্ত ঝবে এসে পডল তাব পাঞ্জাবিব উপব। ঘবেব ভিতবে দেওয়ালে টাঙানো আযনায তাব ছবি পডেছে। চোখেব কোণ থেকে বক্ত গডিযে আসছে। মুখখানা দৃঢ় কঠোব নির্মম হযে উঠেছে। দাঁতেব উপব দাঁত শক্ত হযে বসছে। হাতেব মুঠোও শক্ত হচ্ছে।

— ইস্, এ যে চোখ থেকে বক্ত পডছে আপনাব! মিষ্ট উদ্বিগ্ন নাবী কণ্ঠস্বব! ওই ছত্রধাবিণী কৃষ্ণাব। আনন্দ ফিবে তাকালে। হেসে বললে—হ্যাঁ। একটা চড়ুই।

হাতেব মুঠোটা খুলে দেখাল সে। তালুব উপব চড়ুইটা হতচেতন হয়ে পড়ে আছে।

পা দুটো মুড়ে বেঁকে গেছে। চোখ দুটো স্তিমিত। মধ্যে মধ্যে শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আবার আনন্দ মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে। বেশ মুখ। লম্বা ধরনের মুখ। টিকলো নাক। চোখ দুটো আয়ত নয় কিন্তু টানা লম্বা। পাতলা ঠোঁট। মসৃণ মুখ। নিরীহ, শান্ত। সে তার কথাব পুনরুক্তি করে প্রশ্ন করলে—চড়ুই!

—হ্যাঁ চড়ুই। একটা কাক ছোঁ মেরেছিল— সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আপনার ছাতায়—

—হ্যাঁ। চমকে উঠেছিলাম আমি। ছাতাটা একপাশে বেঁকিয়ে দেখলাম কাকটা উড়ে যাচ্ছে—আর আপনি চোখে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন। তাবপরই দেখি রক্ত পড়ছে আপনার চোখ থেকে।

—চড়ুই প্রাণের ভয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সামলাতে পারেনি—পাশ কাটাতে পারেনি বোধ হয় শিকগুলোব জন্যে। ঝপ করে এসে পড়েছে চোখের উপর।

সে আবার তাকালে—চড়ুইটার দিকে। এবার চোখ মেলেছে—তাকাচ্ছে। কালো চকচকে দুটি চোখ। দু' ফোঁটা টলটলে কালির ফোঁটার মতো। আশ্চর্যভাবে মনটা তার করুণার কোমলতায় ভবে উঠেছে। রূঢ়ভাবে সেটাকে টিপে ধবাব জন্য যেন মনে একটু লজ্জা হচ্ছে। বেদনাও অনুভব কবছে। আহা বেচারা প্রাণেব ভয়ে তপ্ত খোলা থেকে লাফিয়ে আগুনে পডাব মতো তার মুখেব উপর এসে পড়েছে মাথা ঠুকে। এবার নড়ছে।

মেয়েটি জানালাব ওপাশ থেকে বললে আপনি বক্তটা ধুয়ে ফেলুন। না—ববং ডাক্তাবকে দেখান। চোখেব ভিতবে কিছু—

— চোখেব ভিতবে?—সে আয়নাটাব দিকে তাকালে। ঠিক কোণ থেকেই বক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু চোখেব ভিতরে নয়। শুধু জ্বালা কবছে, বিন্দু বিন্দু করে রক্তও জমে জমে গড়াচ্ছে- কিন্তু কোনও বেদনা নেই। কিন্তু—কিন্তু— । আয়নাব মধ্যে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়ে গেল সে। এই মিনিট খানেক আগে, বক্তের প্রথম ফোঁটাটা জামায় পড়তেই চড়ুইটাকে হাতেব মুঠোয় টিপে ধবে যখন কি হয়েছে দেখবার জন্য আয়নাব দিকে তাকিয়েছিল – তখনকাব ছবিটা তাব মনে পড়ে গেল। রূঢ় হিংস্র নিষ্ঠুর একজনকে দেখেছিল সে। তার বদলে এ কে? শান্ত কোমল প্রসন্ন একটি মানুষ।

বাইরে থেকে মেয়েটি প্রশ্ন কবলে—চোখে ক্ষত হয়েছে?

একটু হেসে সে বললে—না। তাব মুখের দিকে সে আবার তাকালে। কালো লম্বা মেয়েটি—একটা শীর্ণা, লম্বাটে মুখ সরু কিন্তু টানা চোখ। ওই চোখের লম্বা টান এবং ওই একবাশ দীর্ঘ চুল ছাড়া শ্রী কোথাও নেই। তবু বেশ লাগল তাকে।

মেয়েটি বলেই যাচ্ছিল—তা হোক। চোখের ভিতর কিছু হয়নি—সে আপনার লাক্। কিন্তু পাখির নখ—বিষ থাকে শুনেছি। তাছাড়া পাখি তো ডালে পাতায় পথের ধুলোয় নোংরায় অহরহ ঘুরছে বসছে, বিষ লেগে নিশ্চয় থাকে। ওটা আপনি ধুয়ে ফেলুন। মানে আইডিন-টাইডিন দিয়ে। ডাক্তার দেখালেই ভাল কববেন।

আনন্দ বললে—ধন্যবাদ। হ্যাঁ তাই দেখাব।

বলে সে পাখিটার দিকে তাকালে। সেটা এখনও ধাক্কা সামলাতে পারেনি। উঠবার—পাখা ঝেড়ে উড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

মরে যাবে নাকি ? ভারী কষ্ট লাগল। সে বললে—এটাকে একটু জল দি!

—আপনি আর্টিস্ট—না ? হেসে বললে মেয়েটি। তারপর বললে— ওটাকে বরং কোনও তাকে তুলে দিন—সামলে উঠবে। জল দেবেন—হয়তো নাকে ঠোঁটে বেশি জল পড়লে দম বন্ধ হবে নয় বুকে আটকাবে। আচ্ছা—নমস্কার।

চলে গেল সে। খাটো পাদক্ষেপে। লম্বা পা দু'খানি পর পর ফেলে সে ছাতাটিতে নিজের মুখখানি যথাসম্ভব ঢেকে চলে গেল।

হরিয়া চা নিয়ে এল। তাকে বললে টিংচার আইডিন আছে রে ? হরিয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে—কি হইল ?

—কিছু হইল। কেটে গেল। একটু জল আর টিংচার আইডিন আন তো। চায়ের কাপটা সে হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললে—বাঃ, বেড়ে চা করেছিস তো।

বাইরে আলো যেন লালচে হচ্ছে। আকাশের মেঘে সূর্যের পড়ন্ত আলোয় রক্তসন্ধ্যার ছটা ফুটছে। মেয়েটি বেশ! বাইরে মেঘের দল আসছে এদিক ওদিক দু'দিক থেকে। আনন্দ একমনে কিছু ভাবতে লাগল। রক্তসন্ধ্যার পটভূমিতে শালো দীর্ঘাঙ্গী সুদীর্ঘ এলোকেশী, লম্বা টানা সরু চোখ।

* * *

পরের দিন তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। আনন্দ উঠল। একটু যেন জর্জর যন্ত্রণা সারা মুখে। যন্ত্রণার কেন্দ্রবিন্দু চোখের কোণ, ভুরু ও নাকের সংযোগস্থল। হাত দিয়ে দেখল। ফুলেছে না কি ? একটু আয়নার দিকে তাকালে। হ্যা, একটু ফুলেছে। রাত্রে বুঝতে পারেনি। রাত্রে খুব গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছে। টিংচার আইডিন লাগিয়ে কিছুক্ষণ জানালার ধারে সেই পূর্বের মতো দাঁড়িয়েছিল। মনটা খুব প্রসন্ন, তার থেকেও বেশি উল্লসিত, খুব খুশি হয়ে গেছে। বাইরের দিকে খুশি হয়ে তাকিয়েছিল কিন্তু কিছুই দেখেনি মানে ঠিক দেখেনি- কারুর দিকে মন আকৃষ্ট হয়নি। সেই প্রৌঢ়া পক্ককেশা বিলাসিনী গেলেন, কোলে নাতি হাতে পান— মনে সে কোনও কৌতুক অনুভব করেনি। একদল ছোট মেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে ভাব আলাপ হয়েছে, তারা এসে চলে গেছে। কি যেন বলেও ছিল সে বলেছিল হুঁ। কিসের উত্তরে হুঁ বলেছিল মনে নেই। রক্তসন্ধ্যা গাঢ় হয়েছিল, কাঁচ পাতার ঝিকিমিকিতে লাল আভা একটু মেরেছিল বোধ হয়, সেদিকেও ভাল করে তাকায়নি। ভাবছিল— বেড়ে রোমান্সটুকু হয়ে গেল। এরপর ? বিয়ে ? রাম কহো! ও পথে আনন্দ হাঁটেনি—হাঁটবে না। একটু খেলা ? তা মন্দ হয় না। মন অনেক দূর ছোটে। সে এ পাড়ায় থেকে হয় না। তবে ? অন্য পাড়ায় উঠে গিয়ে তবে হয়। যা দেশ!

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

আনন্দের থিয়েটারের ঝোঁক আছে। সে অবশ্য সিরিও-কমিক পার্ট করে। সিরিয়াস পার্ট করতে পারে না। হাসি পায়। অবশ্য তার একারই নয়——এ যুগের সব তরুণেরই তাই। তরুণ-তরুণী——সব। তবুও চন্দ্রগুপ্ত নাটকের 'কি বিচিত্র এই দেশ' ভাল লেগেছিল ছেলেবেলায়। সেটা আজও লাগে। সোজা বাঁকা সব কথাতেই দেশের কথা উঠলে এই কোটেশন দেয় সে।

এ দেশের একটি মেয়ে একটি ছেলে পরস্পরের হাস্যে লাস্যে রসিকতায় সঙ্গ সাহচর্যে কয়েকদিনের জন্যে মিলবে খেলবে, আবার ছাড়াছাড়ি হবে ভুলবে——এ হবার উপায় নেই। কাল তবুও মন বাঁধ মানেনি। রোমান্সহীন দেশ, বিয়ের আগে বর-কনেতে আগে দেখা হত না। সাত পাকের সময়ে আজও পানে মুখ ঢেকে কনে শুভদৃষ্টি করতে আসে। বিংশ শতাব্দীর এটা ষাট বছর পার হলো, গোটা দেশে আজও ঘুঁটেতে উনোন ধরে। দামোদর প্রজেক্ট—- ইলেকট্রিসিটির প্রসার করতে গিয়ে দেখা গেল, দামোদরের জল কমে গেছে। এ দেশে এখনও রোমান্স পত্রযোগে –বড়জোর আপিসে সহকর্মী-সহকর্মিণীর মধ্যে—-তাও আপিসের পরে ধর্মতলায় কার্জন পার্কে কাগজ পেতে মাঠে বসে গোটা কয়েক আধো আধো কথার বিনিময়, একটু যাকে বলে –অনুচ্চ খাটো হাসিতে তাও সম্পূর্ণ হয়ে ফুলস্টপ পর্যন্ত এগোয় না, অন্য কেউ তাকালেই সেই তাকানোর কথা সেমিকোলনেই শেষ। সুতরাং আজকের এই চড়ুইয়ের নখে দু' ফোঁটা নাকের কোণের রক্তপাত দেখে একটি তরুণী মেয়ের অকৃত্রিম সহানুভূতিতে এগিয়ে আসা কি সোজা রোমান্স! আনন্দের মন আপনিই ছুটেছিল- - -স্বাভাবিকভাবেই। মনে মনে কাল বিকেলে ওকে নিয়ে ময়দানে বেড়িয়েছে, হাতে হাত রেখে পাশাপাশি বসেছে। রাত্রে - -জেটীর উপর রেস্টুরেন্টে বসেছে।

মনটা তার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এমন দিনে তার কাছে টাকা নেই! কখন আপনার অজ্ঞাতসারেই ডেকে ফেলেছিল —হরিয়া।

হরিয়া সাড়া দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে,- যাই। এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল।- -কি?

-ও! হ্যাঁ। মানে, তোর কাছে টাকাকড়ি আছে? কুড়িটে টাকা—-

-- অতো নাই। দশ টাকা আছে।

-- দশ টাকা?- —আচ্ছা তাই দে। না হলে যা বাজারে। বিলিতী মদের দোকান বের করে নিবি খুঁজে, বুঝলি? একটা রম হুইস্কী পাঁইট নিয়ে আসবি। বুঝলি? আর ভাল করে মাংস বানাবি।

হরিয়া চলে গিয়েছিল। সে এবার গতি পেয়েছিল দেহে মনে। সর্বাগ্রে দেখতে গিয়েছিল চড়ুইটাকে। কই? চড়ুইটা কোথায় গেল? কই, উড়ে তো জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়নি। ঘরখানা অপরাহ্নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হচ্ছে ক্রমশ। এরই মধ্যে আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। জানালার সামনেটায় খানিকটা মেঝেতে খানিকটা আলো যেন এলিয়ে শুয়ে পড়েছে মাটির উপর। উপর দিকটা চারিপাশ

বেশ কালো দেখাচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে সুইচটা টিপে আলো জ্বাললে। কোথায় গেলেন তিনি ?

সঙ্গে সঙ্গে—চ্রি-বি-ক—শব্দ কবে চড়ুইটা উড়ল, ওই আলোটাবই বাঁকা হোল্ডাবটাব উপব থেকে। ওই যে! তাক থেকে উড়ে গিয়ে কখন আলোটাব উপব বসেছিল। আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠতেই চমকে উঠে উড়ছে। ভয় পেয়েছে। বেচাবা!

সাবা ঘবখানায় উড়ে পাক দিয়ে গিয়ে বসল একেবাবে ঘবেব দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইলেকট্রিক লাইনেব বিটেব উপব। কাঁপছে। নখ দিয়ে বিটেব কাঠ আঁকড়ে ধবে দেওযালেব কোণে যেন লেগে আছে। একটু সকৰুণ হেসে আবাব সে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল। থাক।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই হবিষ ফিবে এসেছিল। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই বোতল খুলে খানিকটা খেয়ে সিগাবেট ধবিয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল। নেশা ধবতে দেবি হয়নি। হবিষব তুলনা হয না। অদ্ভুত, স্পেলন্‌ডিড্, ওযান্ডাবফুল। মুখবোচক খাদ্যগুলি তৈবি কবে ডিসে পবিপাটি কবে সাজিয়ে দিয়েছিল।

গান সে গাইতে পাবে না। তবুও মৌজেব মুখে— বেশ গলা ছেড়েই গান ধবেছিল

'কালো তা সে যতই কালো হোক—

দেখেছি তাব কালো হবিণ চোখ'।'

কিছুক্ষণ পব মনে পড়েছিল—কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে ? কালো কেশে বাঙা কুসুম । নাঃ—তাবাশঙ্কব এখানে ফেল। হযনি।

প্রমত্ত আনন্দেব এলোমেলো চিন্তাগুলো চঞ্চল চড়ুই পাখিব মতোই মনেব গাছেব মধ্যে লাফিয়ে এ ডাল ও ডাল কবেই যেন ফিবছিল। বাইবে একটা ববফওযালা হাঁকছিল—ব্রোফ! তাকে ব্যঙ্গ না কবেই সে তাব নকল কবেছিল—ব্রোফ! তাবপবই সে নকল কবেছিল চড়ুইযেব ডাক—ক্রি বি চ! হযতো বা দুটো শব্দেব বফলায একটাব সঙ্গে অন্যটাব কোথাও মিল পেয়েছিল।

হঠাৎ মনে প্রশ্ন হযেছিল —চড়ুইটা কি ?

নাবী অথবা— ? কি ? সে চেনে, চড়ুইযেব কোনটা পুরুষ কোনটা মেয়ে। পুরুষ চড়ুইগুলো লালচে হয, গলাব নিচে একটা কালো বংযেব ত্রিভুজ দাগ থাকে। বেশ ঘন কালো। মেয়েগুলো ধূসব হয, মানে একটু ফর্সা, গলায কালো দাগেব হাবেব মতো একটা বেড থাকে। ডাকেবও পার্থক্য আছে। এটা কি ? নাবী ? নিশ্চয। না—ভাল কবে দেখেনি তখন। আছে নাকি এখনও ? বেবিয়ে গেল কখন ? সে উঠে খুঁজতে শুৰু কবেছিল। কই ? কোণটা দেখেছিল সর্বাগ্রে। তাবপব আলোব হোল্ডাবটা। তাবপব এদিক ওদিক। কই ? পাযনি দেখতে।

পালিয়ে গেল ?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল 'ওবে বাজহংস জন্মি দ্বিজবংশে এমন নিষ্ঠুব কেন হলি বে' ? —ভুল হলো নাকি ? হোক্। সে ছাব আকে লাইনে ভুল না হলেই হলো।

রাজহংসের ছবিতে—। থম্‌কে গিয়েছিল আনন্দ! ই-য়ে-স! হয়েছে! ইউরেকা! ইউরেকা!

—হ-রি-যা! হরিয়া।

হরিযার পেটেন্ট উত্তর—যাই। এবং মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল। —কি?

— রঙ তুলি দে! ছবি আঁকাব কাগজ—

—ছবি আঁকবে—এখন?

—এখুনিই।

ছবি আঁকবে সে। চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে। না—চটকদূত ও কৃষ্ণা। একটা জানালা—তার শিকে বসে আছে চটকদূত, বা পাখা মেলে এসে সদ্য বসছে। কালো— না কৃষ্ণা পথে থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়েছে; একটা পা এইদিকে বাড়িযে দেবে। ইউরেকা!

হরিয়া বলে উঠল পিছনে রঙ তুলি কাগজ-রাখা দেওয়াল আলমারির কাছ থেকে- -চড়ুই পাখিটা!

—চড়ুই পাখি?

- হঁ। সেই বিকেল বেলার পাখিটা হবে।

—কোথায়?

—এই যে, আলমারির তাকে রঙের বাস্‌কোটার উপর বসি রইছে।

—বসি বইছে?- -আনন্দ অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠে পড়ল। বললে—ওড়াসনি। থাক।

— রঙের বাস্‌কোটার উপিরে বসি রইছে যে!

—থাক। রঙের বাকসো নাড়িস নে। থাক ছবি আঁকা। সরে আয তুই!

হরিয়া সরে এল। আনন্দ এগুলো না বেশি, দূর থেকে দেখলে।—ধূসর রঙ, গলায কালো একটি বেড শুধু কালো হারের মতো। ত্রিভুজ নয়।—দূতী! দূতী!

দূত হলে আজ ওটাকে ওই বোতলের পানীয়ের সঙ্গে রোস্ট করে খেয়ে নিত আনন্দ।

কিন্তু দূতী—সখী তুমি থাক। তুমি থাক

— হরিয়া।

—অঁ।

—পাঁউরুটি আছে?

—আছে।

—খানিকটা ভেঙে গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দে। সেই বিকেল বেলা থেকে ঘরে ঢুকেছে, বেরোয়নি তো, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। আর রঙের একটা ছোট বাটিতে জল দে একটু। এ্যা?

হেসে হরিয়া বললে—রাত্তিরে উরা কানা হয়ে যায়। খাবে না।

—তুই দে তো! আলো থাকলে কানা হবে কেন? রাবিশ কোথাকার।

মুচকি হাসতে হাসতে হরিয়া চলে গেল। হরিয়া মনিবকে জানে। দিনেব মনিব রাত্রিকালের মনিব আলাদা। সে দু'জনকেই চেনে।

আনন্দ দূব থেকেই সস্নেহে মমতার দৃষ্টিতে চড়ুইটার দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট জীবটি। এতটুকু! ওঃ, ওই কৃষ্ণা যদি সেই শঙ্কিত সহানুভূতি মাখানো কণ্ঠে, তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে—ইস্, আপনার চোখ থেকে রক্ত পড়ছে যে!—কথা ক'টি না বলত তাহলে মুঠোয় টিপে ধরে মেবে ফেলত সে। মনে পড়ছে, মাটিতে সজোবে আছড়ে ফেলে দেবাব হিংস্র অভিপ্রায় গর্তের মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ সাপের বের হবাব মতো পাক দিয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ওই কথা ক'টি এবং বলাব সুবটি, তার সঙ্গে নাবী কণ্ঠটি বাঁশের বাঁশীর মতো বেজে উঠে সাপটাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

সে মৃদুস্বরে পাখিটাকে বলেছিল—Ask your God to bless her—not me She is—কালো? তা সে যতই কালো হোক—আমি দেখেছি তাব কালো-হরিণ চোখ!

হবিযা ফিবে এসেছিল পাঁউরুটিব গুঁড়ো এবং জল নিযে।

—দুধ তো আমাদেব নেই। চাযের জন্যে—সেও তো পাউডাব মিল্ক। তাই একটু কবে দে না। না। থাক। ওই থাক এখন।

—খাবে না। রাততিরি যে—! হাসলে হরিযা।

—তুই এত ফ্যাক্ ফ্যাক্ কবে হাসিস কেন বল্ তো?

হবিযা বলেছিল—খাবার হযে গেছে। রাত্তিরি ইগাবোটা বেজে গেল।

বোতলটাব দিকে তাকিযে দেখেছিল আনন্দ। সব শেষ হযে গেছে। রাত্রি এগাবোটা। সুতবাং সে বলেছিল—দে, তাই দে।

খেযে-দেযে বিছানায পড়বামাত্র ঘুমিযে পড়েছিল। শেষ রাত্রে তেষ্টা পেযে উঠে জল খেযে আবাব শুযেছিল। তখনই ক্ষতস্থানটা একটু টন টন কবছে বলে মনে হযেছিল। কিন্তু তখন ওটা হুইস্কীব প্রভাবে কিনা ঠাওব হয়নি। একটা সাবিডন খেযে শুযে পড়েছিল। তখন থেকে এখন বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত নাগাড়ে ঘুমিযেছে।

সকালবেলা উঠে মনে হয়েছে ব্যথাব কথা। মুখ ধুতে গিযে হাত লেগে টন টন কবে উঠেছে। আযনায় দেখে দেখলে একটু ফুলেছে। বেশি না--সামান্যই। তবু ফুলেছে। কালো মেযেটিকে মনে পড়ল।

* * *

চড়ুই পাখিটাকেও মনে পড়ল। সে পিছনেব দিকে আলমাবিটাব দিকে ঘুবে তাকালে—নেই, পাখিটা উড়ে গেছে। আলমাবিটাব কাছে গিযে দাঁড়াল। এঃ, রঙের বাক্সটাব উপবটা মযলা করে দিযে গেছে। পাঁউরুটিব গুঁড়োগুলি তেমনিই ছড়ানো আছে। জলটা উল্টে পড়েছে।—যাক্, গেছে ভালই হযেছে। আবুহোসেনের বাদশাহীব মতো এইসব উদ্ভট কল্পনা রোমান্টিসিজম্ একরাত্রির স্বপ্নের মতোই হওয়া উচিত।

আবার মনে পড়ল কালো মেয়েটিকে। কোন্‌খানে ওর রূপ দেখেছিল—ভাবতে চেষ্টা করলে সে। রাবিশ্‌। কোথাও একফোঁটা রূপ নেই মেয়েটার। শুধু চুল। এবং সরু অথচ লম্বা টানা চোখ দুটিতে ফোঁটারও একটু, সিকি ফোঁটা শ্রী আছে।

সহমরণের দেশ—সতী বাতিকের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে হয়, ঘোমটা বর্মাচ্ছাদিতা, অন্তঃপুর দুর্গবাসিনী নারীকুল যেখানে—সেখানে অনন্তকাল ধরেই স্বাধীন প্রেমের দুর্ভিক্ষ! সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কঙ্কাল একজন; ডাস্টবিনের চারিপাশে ঘোরার মতো চৌরঙ্গীর বারে ও ধারে ঘোরে; কালকের সেই রঙ মাখা ব্রণওয়ালা ফিরিঙ্গী মেয়েটাকে দেখে চঞ্চল হয়, রোমান্স খোঁজে, এমনই যার আসল স্বরূপ—সে ওই কালো একটি মেয়েকে দেখে আদ্ধেক রাত্রি মদ খেয়ে নানান কল্পনা করবে তার আর আশ্চর্য কি। যাক সকালে নেশা কেটে আসল বাস্তববাদী মডার্ন মনুষ্যটি কবর ঠেলে উঠেছে এই সৌভাগ্য। গুড লাক্‌, আনন্দ, গুড লাক্‌!

ওঃ, কাজ কত!

ক'খানা বইয়েব কভার ডিজাইন। সুধীন মুখুজ্জের তাগাদায় কলেজ স্ট্রীট মুখো হবার জো নেই। উইলিয়ামস-এর ওষুধের প্যাকেট এবং খোলের ডিজাইনগুলো না দিয়ে কারু কাজ নয়। তার ভাতঘর।

—-হরিযা। হরি— হ-রি-যা—-

কোথায় গেল? বাজার? তাহলে চা-টা নিজেই করে নিতে হয়। পারে সে সব। সব পারে। করেছেও তা। আজ পঁযত্রিশ বছব বয়সে সে বাসা কবেছে, হরিয়াকে রেখেছে। মাসে চাব-পাঁচশো সে রোজগাব করে, কিন্তু দু'বছর আগে পর্যন্তও এসব ভাবতে পারেনি সে। ভাগ্য ছাডা একে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনেক কাজ আছে। নিজেই চা করে খাবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকল সে। চা খেয়ে বাথরুমে গেল। স্নান সেরে নেবে, মাথাটা মধ্যে নেশার প্রতিক্রিয়ায় কেমন একটা অস্বস্তি বয়েছে। মনের ভিতরটাও যেন অপরিচ্ছন্ন ঝাঁট না-দেওয়া না-মোছা ঘরের মতো হয়ে রযেছে। শুধু অপরিচ্ছন্নতাই নয। সারারাত্রি বদ্ধ ঘরের মতো একটা ভ্যাপসানি যেন মেজাজকে ভার কবে রেখেছে। স্নান করলেই পরিচ্ছন্ন হবে মন। জানালা খুলে দেওয়া ঘরের মতো আলোয় বাতাসে উজ্জ্বল এবং হাল্কা হয়ে উঠবে। কাজ ওই সাফা হাল্কা মন ছাডা হয় না। নইলে মনের কাজে তার ছাপ পডবেই। রঙ তুলি নিয়ে কাজ তার, সে তো জানে—তুলি ছেড়ে অন্য কাজে হাত দেবার আগে হাত ধুতে হবে। নইলে আঙুলে লাগা কালি কাপড় জামা থেকে মুখে পর্যন্ত লাগতে পারে। আবার তুলি ধরবার আগেও হাত ধুতে হবে। নইলে কোথায় কোন্‌ আঙুলের কোণে বা হাতের তালুর কোথাও লেগে থাকা দেওয়ালের রঙ বা মেঝের ময়লা নয়তো ঘামের ছোপ কাগজে ক্যানভাসে পডবে, রঙের সঙ্গে মিশবে।

স্নানঘরে ঢুকে ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে স্নান করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল একালে সে স্নানের সময় মন্ত্র আওড়াতো—ওঁ সূর্য্যস্যমেতি মন্ত্রস্য প্রকৃতিচ্ছন্দ অপো দেবতা—। তারপরে ওসব ছেড়ে দিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো ভঙ্গিতে আউড়ে যেতো—যে

করবে পুণ্যি তাকে শাপমন্যি—যে করবে পাপ তাকে আশীর্বাদ—বিনা আশীর্বাদেই সে সাত বেটাব বাপ। মনে পডতেই হাসি পেল।

ওঃ! জলের ধারা ঝরঝর কবে মাথায় গাযে ঝরে পডতেই মনটা হাল্কা হয়ে গেছে।

ঘর থকে বেরিযে এসে চুল আঁচডে কাজে বসল। মুহূর্তে আনন্দ পাল্টে গেল। এ আনন্দ আর এক আনন্দ। আনন্দ নিজেও তা জানে। একটা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানুষকে দেখা যায়। একটা মানুষের মধ্যে দুটো তিনটে চারটে—এমন কি পঞ্চ-পাণ্ডবের বসবাস সম্ভব। ধার্মিক, সত্যবাদী, ঔদরিক, ক্রোধী, নারীবিলাসী, মিলিটারি এক্সপার্ট, অশ্ববিদ, একালে মোটরবিদ্ হতে পারে, জ্যোতিষবিদ—একটা মানুষই হতে পারে। আবার সেই বর্বর যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত সব যুগেব মানুষই এই যুগের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। দুর্যোধনেরা একশো ভাই—কিন্তু আসলে ওরা একটি। ওদের ভাগ্যে দ্রৌপদী জুটতেই পারে না।

রাম্ কহো। ছোডো। ও সব চিন্তা ছাডো। উঠ শিশু মুখ ধোও পব নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ। কাগজ নিযে বোর্ডে এঁটে সে রঙের পাত্র এবং তুলি তুলে নিলে।

হরিয়া এসে দাঁডাল।—জলখাবার দি।

—কি করেছিস ?

—ডিম ভেজেছি।

—তাব সঙ্গে রুটি দু' টুকরো। বাস্।

—মিষ্টি ?

—না। কাল যা খাইযেছিস!

—লোক এসিছে। বাইরে দাঁডায় আছে। একখানা কাগজ দিলে সে। আনন্দ পডলে।

জর্দাওলা বামেশ্বর। জর্দা বেচে বিখ্যাত হযেছে, পয়সা করেছে। এখন কৌটোয় প্যাকেটে রঙীন মোডক কব্রবে। টাকা অগ্রীম দিযে গেছে। কাজটা হযনি। মনটা খিঁচডে উঠল। ভুরু কুঁচকে ফুটে উঠল সেই বিরক্তি। কিন্তু উপায় নেই—তিনমাস টাকা নিযে রেখেছে। মুহূর্ত ভেবে নিযে বললে—যা, বলগে আপনার কাজই করছে। কাল এসে নিয়ে যাবেন। এখন দেখা করতে গেলে সময় যাবে। আপনার কাজই নষ্ট হবে।

হরিয়া চলে গেল। আনন্দ বললে—রাবিশ! চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। হয়েছে। একটি পদ্ম—তার মধ্যে জর্দার কৌটো। একটি মেয়ে, তার একহাতে পান অন্য হাতটি—ডানহাতটি বাডিযেছে জর্দা নেবার জন্যে। নিচে লেখা হবে—ও হরি! রামেশ্বরের জর্দা! আমি ভেবেছি পদ্ম! ওই যে বিলাসিনী স্থূলকায়া পক্ককেশী সুরূপা সুহাসিনী গরবিনী ধনি পার্কে আসেন নিত্য—ওকেই এঁকে দেবে।

খুশি হয়ে নিজেই বললে—গুড। ভেরি গুড!

কাগজের উপর পেন্সিল চালিয়ে স্কেচ শুরু করলে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে মগ্ন হয়ে গেল। এ বেলাতেই সারতে হবে এটাকে। এ বেলাতেই! ওবেলা থেকে উইলিয়মস কোম্পানির কাজ!

সে আনন্দ পাবে। পাবে সে। তার সে হিম্মৎ আছে।

ওঃ এক সময়—একদিনে পাঁচটা স্কেচ শেষ করে কাগজে জোগান দিয়েছে। ১৯৪৩।৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের সময়।

আজও সে শক্তি তার আছে। পেন্সিল তর তর করে চলেছে।

প্রৌঢ়ার মুখখানা একটু ভেবে নিলে। হ্যাঁ। গালে একটা কি দুটো পান পোরা আছে। একদিকের গাল আরের মতো ফুলেছে। কিন্তু তবুও সৌন্দর্যহানি হয়নি।

ঠিক আসছে। আজও সে শক্তি তার আছে।

তবে সে দিনের সে ক্ষোভ সে জ্বালা আজ তেমনটি নেই। আছে কিন্তু উগ্রতার উত্তাপে ঠিক তাই নয়। ফারাব। সেদিন ছিল শুধু আগুন। আজ আগুন জল একসঙ্গে। স্টীম হচ্ছে—এঞ্জিন চলছে। সেদিন ছিল ঘরের মাথায় মাথায় বৈশাখের দুপুরের ছুটন্ত অগ্নিবর্ণ ধুলো ঘোড়ার পাল। লাগাম বাঁধা নয়। বন্য উন্মত্ত খুরে খুরে মাঠ ক্ষেতের ধুলো ওড়া ঝড়ের মতো। মন্বন্তর নেই আর। দুর্ভিক্ষ নেই। অভাব আছে। তিরিশ টাকা চালের মণ, চার পাঁচ টাকা মাছ—তা হোক, অভাবই বলতে হবে, দুর্ভিক্ষ নয়। ইংরেজ চলে গেছে। দেশ স্বাধীন। তার রোজগার আজ তিন চারশো। সেদিন তার তিরিশ টাকা রোজের টাকাও আয় ছিল না।

উনিশ বছর বয়স। আশ্রয়হীন। মামার বাড়িতে ছেলেবেলা বড় হয়েছিল। আরও ছেলেবেলা পাঁচ বছর বয়সে বাপ মারা গিয়েছিল। নিতান্তই কেরানী চাকরে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের হাজার আড়াই টাকা নিয়ে মা এসেছিল মামাদের আশ্রয়ে। মা মামাদের ভাত রান্না করত, ভগবানকে ডাকত, স্বামী অর্থাৎ তার বাপকে গাল দিত, সঙ্গে সঙ্গে তাকে এবং তার ছোটকে। বড় ভাই ভাল ছেলে, বি. এ. পাশ করে খড়্গপুরে রেলে ঢুকেছে। সে দাদার থেকে তিন বছরের ছোট, ম্যাট্রিক বার দুই ফেল করে ইস্কুল ছেড়ে প্রাইভেট দেবে বলে ঘরে বসে আছে। ঠিক বসে আছে নয়, এই ছবি দেখে ছবি কপি করছে। শ্লেটে করত। কাগজেও করত। একদিন মামার বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। বাড়ির ড্রেন পায়খানা নিয়মিত সাফ করে না বলে উগ্রচণ্ডী মামী রানীয়া জমাদারনীকে শাসন করতে গিয়েছিল। মাথায় খাটো মুখখানা খাপচো তাতে বসন্তের দাগ, মাথার চুলগুলো কাফ্রি ধরনের রানীয়ার। মামী উগ্রচণ্ডা হলে প্রচণ্ডা চামুণ্ডা। মামী বকাবকিতে হেরে একখানা ঘুঁটে ছুঁড়ে রানীয়াকে মেরেছিল; মুহূর্তে ক্ষিপ্তা রানীয়া তার মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে তাকে তেড়েছিল। মামী রান্নাঘরে ঢুকেছিল নিরাপদ স্থান ভেবে, কিন্তু রানীয়া তা মানেনি। সে ঝাঁটা উদ্যত করে ঘরে ঢুকতে পা বাড়িয়েছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখে মামী তুলেছিল আঁশবঁটি। তারপর কাণ্ড

অনেক দূর এগিয়েছিল, প্রায় এদিকে কোর্টের বার লাইব্রেরি ওদিকে মিউনিসিপালিটির কমিশনার মিটিং পর্যন্ত।

মামী মামাতো ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। মায়ের সঙ্গে ভাবটা যে কি—তা সে আজও ঠিক অনুমান করতে পারে না। তবে মা তার উপর সন্তুষ্ট ছিল না, গালাগাল মাও কম করত না।

দু' দু'বার ফেল করার পর মামা-মামী বারবার বলত —আবার পড়া কেন? বেশ তো প্রাইভেট দিবি তো সে তো চাকরি নিয়েও দিতে পারবি। মিথ্যে ঘরে বসে অন্নধ্বংস কেন? আর তোকে ভাত দিতে পারব না।

সে বলত, —আমার মা তোমাদের ঘরে বিনা মাইনেতে ভাত বাঁধে। কাপড় পর্যন্ত দাও না। মা কেনে পরে বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা থেকে। আমার অন্ন মায়ের মাইনে থেকে হয়।

মা বলত—তুই মর মর মর!

—মরব। তার আগে বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার ভাগ আমাকে মিটিয়ে দাও। ভাইকে বল, ধার বলে যা নিয়েছে ফেরে দিতে। ধার —ভাত! টাকার সুদ দেয় তোমার ভাই!

সে যে এমনটা কেন হয়েছিল বলতে পারে না। তবে হয়েছিল। এরই মধ্যে সে এই মামী বানীয়া কাণ্ডটা নিয়ে একটা ছবি—ছবি অবশ্য সাদা কাগজের উপর কালিতে এবং পেন্সিলে- এঁকে দিয়েছিল ওখানকার হাতে লেখা পত্রিকায়। নাম দিয়েছিল—উগ্রচণ্ডা ও চামুণ্ডা। একদিকে সারিবদ্ধ উকীল মোক্তার ভদ্রলোক, অন্যদিকে সারিবদ্ধ জমাদারেরা।

ছবিটার তারিফ হয়েছিল। ওখানকার নেতা (বামপন্থী) তাকে ডেকে বলেছিলেন—ভাল হয়েছে। ওটা আমি কলকাতার কাগজে ছেপে দেব।

বিপদ হলো ওইখানে।

ছাপা হতেই নজরে পড়ল লোকের। তাতেও কিছু হত না, কিন্তু মামী এবং বানীয়াকে স্পষ্ট চেনা গিয়েছিল।

ফল বিপর্যয়।

মা মাথা ঠুকে কপাল ফাটিয়েছিল। মামা মামাতো দু'ভাই তার সঙ্গে তার নিজের দাদা, গুডফ্রাইডের ছুটিতে দাদাও বাড়ি এসেছিল, সব মিলে চারজনে তাকে ধরে প্রহার করেছিল। সে মার খেয়ে নীরবেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই এসেছে। বাস্। আর ফেরেনি। ফিরবেও না কোনদিন।

কলকাতায় তাকে প্রথমটা সাহায্য করেছিলেন সেই বামপন্থী নেতাটি। বেশিদিন সাহায্য করতে হয়নি, মাস কয়েক। সে তখন কলকাতায় ঘুরে ঘুরে দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকত। সাদায় কালোয় ছবি।

জয়নাল সাহেব তখন ওই ছবির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুলো। সাদা কালো ছেড়ে রঙ ধরলে। মেসে থাকত। মেস

থেকে বোর্ডিং—একলা একটা রুমে। তারপর নিজের একখানা ঘর। নিজে রান্না। তারপর এসেছে হরিয়া।

সে তখন ছিল ফায়ার। এখন জ্বলে আগুনে স্টীম।

—খেলেন নাই!

হরিয়ার কণ্ঠস্বরে তার ধ্যান ভাঙল।—কি ?

—খাবার।

—কখন দিলি ? বলে দিতে হয় তো!

—বললাম যি ?

—বলেছিলি কি ? তা হলে শুনতে পাইনি আমি। দুধটা একটু গরম করে আন।

কাজ করতে বসে এমনই ডুবে যায় আনন্দ। কিছুক্ষণ কাজ করে সেটাকে সে সরিয়ে রেখে দিলে। টাকা চাই। কিছু স্কেচ নিয়ে উইলিয়মসে যেতে হবে, দেখিয়ে টাকা আনতে হবে। না। আবার সেটাকেই টেনে নিলে। ওটাকেই শেষ করে দেবে সে আজ। একখানা চেক্ নিয়ে হরিয়াকে দেবে—ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনুক। কাজে অসৎ হলে চলবে না। যেখানে খুশি মিথ্যে বলো, কাজের ক্ষেত্রে মিথ্যে কথা বলো না। অন্তত—খুব বড়োর কাছে বলো না—আর একদম ছোটোর কাছে বলো না। মাঝারিদের কাছে বলতে পারো, দরকার হলে বলো। আবার তুলি চালাতে লাগল। টানে টানে বিলাসিনী প্রৌঢ়া স্থূলাঙ্গী ফুটে উঠেছে। হঠাৎ ক্রি-রিচ-ক্রি ক্রি, ক্রিরির ক্রিরির-ক্রিচ-ক্রিচ-ক্রিচ শব্দের সঙ্গে পাখার ফরর্ ফরর্ শব্দে সে চমকে উঠল। হ্যাঁ চমকেই উঠল। চড়ুইটা ঘরে এসে ঢুকেছে। মুখ তুলে সে দেখলে। হ্যাঁ—সেইটে এসেছে। সেইটেই। মাদী চড়ুই। ধূসর রঙ, গলায় সরু একটা কালো বেড হারের মতো।

—তুমি আবার এসেছ? কি সংবাদ ? আজ কে তাড়া দিলে ?

—কেউ না ?—না ?—ওই যে একদল। একটা লালচে চড়ুই গলায় কালো ত্রিভুজ—এসে জানালার শিকে বসেছে। ওই নরাধম তোমার পশ্চাদ্ধাবন করেছে! এবং তুমি ওকে পছন্দ কর না। অথবা এটা তোমার প্রণয়লীলার একটি অঙ্গ। আমাকে তুমি নারীরক্ষক বীর ভেবেছ! তোমার এ প্রকার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ!—যাও, তুমি যাও হে!

আনন্দ ডান হাতের তুলিটা উস্কে নারীলোলুপ পুরুষ চড়ুইটাকে তাড়া দিলে। তাতে সেটাই শুধু উড়ে গেল না, এটাও ত্রস্ত হয়ে ঘরময় দু'পাক উড়ে—ফুড়ুৎ করে জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। আবার সে কাজে মন দিলে। তুলি নিয়ে বসল। চলতে লাগল তুলি। কিন্তু মন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তুলি রেখে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। এগারটা বেজে গেছে। রোদ আজ চড়া মনে হচ্ছে। গরম হাওয়া আসছে। বাইরে, পার্কের ওদিকটার বড় ওয়ানওয়ে রোডে লরী বাস প্রাইভেট চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। একবার একঝাঁক, তারপর একটু বিরতি, আবার একঝাঁক। দেখ—দেখ—দেখ—। একটা বাস আর একটাকে ওভারটেক্ করছে। লাগল বোধ

হয়। না—বেরিয়ে গেল। প্রথম বাসখানাই—ডাইনে চেপে—পিছনেরটার পথ মেরে জোরে বেরিযে গেল।

একখানা বাস থেকে হবিযা নামল। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরছে।

হরিয়া তার জীবনের একটা সম্পদ। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে গেছে।

আঃ! আবাব তার কানের পাশ দিযে চড়ুইটা ঘরে ঢুকল। মরেছে—এটা কি ভেবেছে! পাখিতেও কি ভাবে না কি? ভাবে বইকি! নইলে তাকে গ্রাহ্য না করেই ঘরে ঢুকল কি হিসেবে?—অবশ্য হতে পারে, ওরা মানুষদেরই গ্রাহ্য করে না, বা মানুষকে জানে এই বলে যে—ওরা গ্রাহ্য কববার মতো জন্তুই নয। শুধু ঘরটাকে ওর চেনা হয়েছে এবং নিরাপদ স্থান বা মনোরম স্থান বলে ধারণা হয়েছে।

হায় হায় হায়! তুমি জানো না, কার ঘরে তুমি ঢুকেছ—এইবার জানালা ক'টি বন্ধ করে, তোমাকে তাড়া দিয়ে এখুনি ধরে ফেলে মেবে ফেলতে পারি। মরা তুমিকে ছুঁড়ে কোন কাককে দিযে দিতে পারি, অথবা তোমাকে ভেজে খেয়েও ফেলতে পারি। অবশ্য—তাহলে হবিযাকে এখুনি পাঠাতে হবে মদের দোকানে। কিন্তু তার সময় এ নয।

চড়ুইটা উড়ছে। ওই ঘরের কোণে বসল। আবার উড়ল। হোল্ডারে বসল—আবার উড়ল। এবারও কোণে বসল। আবাব উড়ল—কালকের আলমাবিতে বসল।

চিরিক—চিরিক। চিক—চিক—চিক—!

সঙ্গে সঙ্গে লেজটা নাচছে। গলাব কাছটায কাঁপছে। মাথাটা চঞ্চল ভঙ্গিতে নড়ছে। এপাশ-ওপাশ—কখনও উপরের দিকে তাকাচ্ছে। কখনও নীচের দিকে। মধ্যে মধ্যে ঠোঁট ঘষছে। লাফাচ্ছে নাচার মতো।

সামনের দেওয়ালে ব্রাকেটে একটা পুরনো ক্লক ঘড়িতে ঢং শব্দ কবে সাড়ে এগারটা বাজলে সে ফিরে এসে কাজে বসল। বসেই সে শুনলে—ক্রিরিচ—এবং ফ্রর-র্। পাখিটা পালাল। ঘব থেকে বেরিযে গেলে—ওই পাখার আওয়াজে বোঝা যায়। ঘরের মধ্যে পাখার ফ্ররর শব্দ—বাইরে গেলেই হাল্কা হযে পড়ে। সিনেমার ফেড আউট।

সিনেমার পাবলিসিটি অফিসার বন্ধুটি এক নম্বরেব চালিযাৎ। সেদিন সিনেমা ড্যান্সার বলে একটা সস্তা বাবে নিযে যা দেখালে!

তার থেকে বউবাজারবাসিনী ব্রণশোভিতাবদনী ফিরিঙ্গিনী মেম-সাহেব লিপস্টিক রুজে এবং সিগাবেটের ধোঁয়া ওড়ানোর কায়দায় ন্যুইযর্কবাসিনী।

রাবিশ! হঠাও ও সব চিন্তা। হট্ যাও। রামেশ্বরের জর্দার পালায পর্দা নিক্ষেপ আজ করতেই হবে। তুলি চলতে লাগল। ঢং ঢং কবে ঘণ্টা বাজল। সে কাজ করেই চলেছে। ঢং—সাড়ে বারোটা। ঢং—একটা। ঢং—দেড়টা।

হবিয়া এসে দাঁড়াল—খাবার দিব?

—এ্যাঁ।

—দেড়টা বাজি গেল।

—বাজুক।

আবার ঢং ঢং। দুটো। হরিয়া এসে দাঁড়াল। মনিবের একাগ্র মনে তুলি চালানো দেখে ফিরে গেল। আরও কিছুক্ষণ পর আনন্দ কাজ শেষ করে উঠল। রামেশ্বরের জর্দা খতম।—হরিয়া! খাবার! ঘড়ির দিকে তাকাল—দুটো পনেরো। গরম হাওয়া বইছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ওঃ। নিজেই সে জানালার পাল্লা টেনে দিতে লাগল।

ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ!

তার সঙ্গে ফ্ররর্ ফ্ররর্ শব্দে ঘরখানাকে মুখরিত করে চড়ুই উড়ছে। সেই চড়ুইটা। ধূসর রঙ, গলায় হারের মতো কালো বেড—ত্রিভুজওয়ালাদের থেকে আকার একটু বড় কিন্তু দেখতে সুন্দর। সেই নারীটি। কখন এসে আবার ঘরে ঢুকেছে। বাইরের রৌদ্রে উত্তাপ এখন, সব পাখি এমন কি কাকগুলোও গাছের পল্লবের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ধুঁকছে। সবারই গলার কাছটায় ধুক্ ধুক্ করছে। ইনি—কালকের পরিচয়ে ঘরখানিকে জেনে এর মধ্যে এসে বসেছিলেন। বাইরে থেকে ঘর অনেক ঠাণ্ডা।

উড়ছে। ও ভাবছে—জানালা বন্ধ করছে যখন তখন ওকে ধরবে। অথবা অন্ধকারের ভয়।

খানিকটা ভয় দেখালে কি হয়? ভয় কেন? যাক। বন্ধই থাক না ঘরে। শ্রীমতী যখন আনন্দ রায়ের ঘরে ঢুকেছে, তখন কলঙ্ক না নিয়েই ফিরে যাবে? থাক। বিকেলে উঠে আনন্দ জানালা খুলে দেবে তখন বেরিয়ে যাবে। বাইরটা তখন ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। পুরুষ চড়ুইয়েরা কল কল করবে। কলঙ্কিনী বলবে। সে বন্ধ করে দিলে জানালাটা। অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা ফর ফর করে উড়ে অসহায় বন্দিনীর মতো কোনো কোণে আশ্রয় নিলে। আনন্দ শুয়ে পড়ে বিছানার পাশে রাখা টেবিল ফ্যানটার সুইচ অন্ করে দিলে। ঘরে সিলিং ফ্যান রাখেনি আনন্দ। টেবিল ফ্যান রেখেছে। খুব গরমের সময় ভিতর দিকে বারান্দায় শুয়ে টেবিল ফ্যানটা খুলে দিতে পারে। ফ্যানটা ওঁ-ওঁ শব্দ করে ঘুরতে লাগল—আঃ।

চড়ুইটা এখন খুব মৃদু একটা শব্দ করছে—চিনিক্ চিনিক্। চিনিক্ চিনিক্।

ওটা বোধ হয় ক্লান্তি বা অসহায় অবস্থার শব্দ। বেরুবার উপায় নেই। হেসে আনন্দ বললে—ছেড়ে দিতে পারি তোমাকে, যদি সেই কালো মেয়ে, যার দূতী হয়ে এসেছিলে, সে যদি আসে। বুঝেছ? সে চারটের সময় যাবে তখন জানালা খুলে দেব, তুমি গিয়ে তাকে ডাকবে। একটু হাসল সে। তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবতে ভাবতেই ঘুমোল—সকাল সকাল উঠতে হবে। কিছুকাল কলেজ স্ট্রীট যায়নি। ওখানটা ঘুরে মিশন রো। উইলিয়মসকে বলে আসবে দু'-তিন দিনের মধ্যেই আদ্ধেক কাজ সে দেবে।

বউবাজার থানার সামনেটা মনে ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ব্রণমুখী, খাটো ফ্রক পরা, সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে নিক্ষেপকারিণী কার দিকে

সিগারেটের ধোঁয়া ছোড়ে? সে খুশি হবে যদি সে ঈশ্বরের দিকে ছোড়ে। ওরই মধ্যেই তো নীতির গুদাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রলুব্ধ হয়ে নীতি মরালিটি—সিগারেট খেতে শিখুক না।

ঘুম কিন্তু ভাঙল দেরিতে। পাঁচটার কাছাকাছি। ঘুম ভেঙেই প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসল। ক'টা বাজল। ঘড়ির সাদা ডায়েলটা দিনের বেলা দরজা-জানালা বন্ধ সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে। পাঁচটা বাজতে দু' তিন মিনিট। এঃ! ছত্রধারিণী মুক্তকেশী দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণা চলে গেছে। বউবাজারের থানার সামনে দিয়ে ব্রণমুখীও সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেছে। কলেজ স্ট্রীটে যেতে যেতে দোকানে দোকানে ক্যাশ মেলাবার পালা পড়বে। উইলিয়মসের জু সাহেব হয়তো বেরিয়ে যাচ্ছে। না গেলেও সে যাবামাত্র বলবে—সরি রয়! আমি উঠছি। দেরিতে এসেছ। কাল ফার্স্ট আওয়ারে এস। স্কেচ দেখব। বাই-বাই!

টং টং শব্দ উঠতে লাগল, পাঁচটা বাজছে।

সিগারেট বের করে মুখে পুরলে সে, দেশলাইয়ের কাঠি বের করলে। হঠাৎ চিরিক, চঞ্চল চিক-চিক-চিকের সঙ্গে পাখার শব্দ উঠল। চতুর চড়ুই তো। ঠিক বুঝেছে, উঠে বসেছে! বলছে, কথা রাখ, জানালা খোলো, যেতে দাও এবার। যা করলে—

আরে। আরে! তাতো না। উড়ে গিয়ে ঘড়িটার মাথায় বসেছে। টং—টং—টং—টং শব্দে বেজে চলেছে আর চড়ুইটা ঠোঁট দিয়ে ঘড়িটায় ঠোক্কর মারছে।

সবিস্ময় কৌতুকে আনন্দ সেই দিকে তাকিয়েই রইল—বা রে!

ঘড়িটার বাজনা থামল—পাঁচটা ঘণ্টা ফুরিয়ে গেল। চড়ুই আরও বার কয়েক ওটাতে ঠোক্কর মেরে থামল, ঘাড় কাত করে কয়েক সেকেন্ড, অন্তত বিশ সেকেন্ড তাকিয়ে দেখল, তারপর আবার ফ্ররর্ শব্দে পাখা মেলে জানালার গায়ের শিকে বসল। বাইরের পড়ন্ত বেলা ওকে ডাকছে! প্রাণ ওর ছটফট করছে।

ক্রিরিচ্—ক্রি-রিচ—ক্রিচ—ক্রিচ—ক্রিরিচ—

তারপর থেকে মৃদু কিরিচ—কিরিচ।

আহা হা। সিগারেট না ধরিয়েই আনন্দ উঠল। জানালাটার কাছে যেতেই পাখিটা উড়ে গিয়ে বসল আলোর হোল্ডারে। আনন্দ জানালার এক পাট খুলতেই একটি সুউচ্চ সুদীর্ঘ ক্রি-রি-রি-চ ডেকে—একটি সোজা রেখা টেনে মুহূর্তে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আঃ, বেচারা বাঁচল। একটু হেসে আনন্দ সিগারেট ধরিয়ে ডাকলে—হরিয়া।

—যাই। হরিয়া 'যাইটি' বলে ভারী চমৎকার। একটি সুর আছে। তার সঙ্গে সস্নেহ আনুগত্য।

—আসতে হবে না—চা নিয়ে আয়।

জানালার বাকি পাল্লাগুলি এবার খুলে দিলে আনন্দ।

পড়ন্ত বেলায় দেবদারুর কচি পাতায় আলো চিকচিক করছে। আজ একটা হাওয়া এর মধ্যেই উঠেছে—কলকাতার সুবিখ্যাত সমুদ্রস্পর্শবহ বাতাস। গ্রীষ্মের আরাম।

আজ প্রথম উঠেছে। তবে তো আজ ময়দানে যেতেই হবে। আকাশ পবিষ্কাব। হবিযা—চা আন, জলদি।

শিমূল ফুল জাতীয় লাল ফুলগুলো আলোতে চকচক কবছে। একটা ফুল খসল। ফুটবল নিযে একটু কি একফালি খোলা জাযগাব সন্ধানে বাচ্চা ছেলেব দল চলেছে। পার্কে ওদেব খেলতে দেয় না। ওপাশে জিমখানাব মাঠে বডদেব খেলাব আসব। তাবা—ওই যে একদল যাচ্ছেন—সিগাবেট ফুঁকছে, হেসে ঢলে পডছে, এ ওকে ঠেলছে এবং পার্কেব ওদিকটায মেযেদেব দেখে এসে তাই নিযে গ্যাঁজানো বসিকতাব স্বাদে মুখ পাক্লাচ্ছে। এযুগে এটা—এ যুগেই বা কেন—সব যুগেই আদিকাল থেকে আদিবস আছেই। তাবা নিজেবাও কবে। সেও কবে। ঘবে বসে ভাবনাব মধ্যেও কবে। পাখি সবাই—এগুলো নেহাতই কউযা। কাক। ওই একদল মেযে আসছে। স্কুলেব ডবল বেণী; যুবতী হযেছে, সেই স্বপ্নেব ঘোব লেগেছে। সবে শাডি ধবেছে। দুটো মেযেব এলো চুল। ছোট্ট বাচ্চা একটা ওদেব পিছনে ট্রাইসিকিল চডে আসছে, সঙ্গে মা — মা একটা প্যাবাম্বুলেটব ঠেলছে। এব'ব ছেঁডাবা ফোনিযে বোধহয উপচে পডবে। এবাব একজনকে একজন ঠেলা দেবে। প্রাণপণ জোবে ঠেলা মাববে, হযতো সে পডতে পডতে সামলাবে এবং হঠাৎ খুব বেগে গিযে উচ্চ বীব চিৎকাবে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কববে। ভগবান আশ্রিত এদেশেব নীতিজ্ঞান সিগাবেট ধবলে বাঁচতো, খায না বলে ঘবেব কোণে লুকিযে গাজা খায। তাব ফলে এই অবস্থা।

পাশেব একটা গলিপথ থেকে ছাতা মাথায দিযে লাঠি হাতে থপথপে বৃদ্ধটি বেবিযেছে। ধপধপে সাদা বং- চুল ভুরু সব সাদা। ভুরুগুলো খুব বড। বিচিত্র দেখায। থপথপ কবে হাটে। যখন বেব হয তখন ছাতা লাঠি ছাডা বেব হয না। ওকে দেখে আনন্দ বুঝতে পাবে জবা দেখে গৌতম বুদ্ধ এত বিচলিত হয়েছিল কেন? বৃদ্ধেব শবযাত্রা তাকে যেন দেখতে না হয। তাহলে কে বলতে পাবে গৌতমেব তৃতীয পাদে সে পা বাখছে না। বাকি থাকবে ...্যাসী —। এদেশে ভাল সন্ন্যাসীবও অভাব নেই। তাহলেই সেও নির্বাণকামী হযে বেবিযে পডবে।

—চা এনেছি।

হবিযা পিছনে দাঁডিযে ডাকছে। ফিবে দাডাল সে। টিপযেব উপব ডাইজেস্টিভ বিস্কুট আব চা নামিযে দিযে হবিযা দাডিযে আছে। হবিবতে হবিযা যাকে বলে অপবাজেয। এমন পবিচ্ছন্ন এবং আধুনি'' দুবস্ত হবিযা যে এইটুকু প্রশংসা ওব সম্পর্কে কিছুই নয।

বিছানায এসে বসল আনন্দ, বললে—যাব হবিযা নেই তাব কেউ নেই।

খুশিতে হবিযাব এক ধবনেব দাত বেব কবে নিঃশব্দ হাসি আছে। হাসলে হবিযাব গালেব খাজ দুটো চমৎকাব হয। মধ্যে মধ্যে ভাবে আনন্দ।

একটা মেযেছেলে এসেছিল।

— মেযেছেলে?

— হ, কালো মেযে একটা—বোজ ছাতা মাথায় দিযে যায

—ও। এঃ—

একঝলক চা পড়ে গেছে আনন্দের কাপ থেকে। হরিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল পড়ে-যাওয়া চা মুছতে নিজের গামছাটা নিয়ে। আনন্দ বললে—থাক না।

—না, দাগ ধরে যাবে।

—কি বলছিল সে?

—শুধোচ্ছিল, বাবু কেমন আছে। চোখের কোণটা পাখির নখে কাটিল—তা মুখ টুক ফুলিছে কিনা। জ্বর টর হয়েছে কিনা।

—তুই কি বললি?

বললাম, না কিছুই হয় নাই।

— তা কেন বললি? এই তো একটু ফুলে রয়েছে?

অপ্রতিভ হয়ে গেল হরিয়া, মাথা চুলকে একটু হেসে বললে—সকালে তো বললে না। ডাক্তার দেখালে না। ওষুধ লাগালে না। তাই—। দাঁত ক'টা বের করে হাসির একটা ভঙ্গি করে সে চুপ করলে।

এর উত্তর আনন্দও খুঁজে পেলে না। একটু চুপ করে থেকে বললে—আমায় ডাকালনে কেন?

— ঘুমাচ্ছিলে। সকাল থেকে দুটো পর্যন্ত কাজ করিছ। খুব ঘুমাচ্ছিলে, নাক ডাকছিল। আর মেয়েটা বললে— ডাকতে হবে নাই। দরবার কিছু নাই। কেমন আছেন তাই শুধাচ্ছি। ভাল আছেন, ঘুমাচ্ছেন, কাজ করেছেন সকাল থেকে—ঠিক আছে।

চুপ করে বসে রইল আনন্দ। একটু দাঁড়িয়ে থেকে হরিয়া চলে গেল। চড়ইটা আবার কখন এসে ঘরময় একটা পাক মেরে ডাকল—চিরিক! চিরিক! চিরিক! চিরিক! বিরক্ত হয়ে আনন্দ বললে—জ্বালালে তো এটা! ভাগ! ভাগ!

হরিয়া ফিরে এসে দাঁড়াল। তার কাজ আছে, আনন্দ বাইরে বের হবে, প্যান্ট জামা বের করে দিতে হবে। স্যুটকেস খুলে সে বলল— কালো প্যান্টটা দিব?

দে।

—নতুন হাওয়াইটা দি?

—দে। যা ইচ্ছে দে। বিরক্ত করিস নে।

হরিয়া প্যান্ট সার্ট পাট খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রেখে গেল। আনন্দ বসে রইল। চুপ করে বসে রইল। কেমন হয়ে গেল যেন। বাইরে দুটো বিপরীত রঙে মিলে সাদা রঙ হয় না। কালোও হয় না। সাদা কালো দুটোতে মেশালে কালচে হয়, সাদাটা কমজোরী হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মনে তার থেকেও বিচিত্র কিছু হয়। রঙছুট রঙ, বর্ণহীন রঙ তো নেই—বাইরের জগতে হয় না। মন কিন্তু সব রঙছুট হয়ে শূন্যরঙা হয়ে যায়। সাদাও না, কালোও না। ভালও না, মন্দও না। উল্লসিতও না, বিষণ্ণও না। তেমনি হয়ে গেছে তার মন। মেয়েটি তার খোঁজ করে গেছে। তাকে কিন্তু ডেকে দিতেও বলেনি, অর্থাৎ আগ্রহও ছিল না। ভাল খারাপ দুই মিশে মন এমনি হয়ে গেল। কল্পনাতেও মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করতে পারছে না।

বাইরে কারা চিৎকার করে হরিবোল দিয়ে উঠল। বিকট চিৎকার—বল হরি—হরিবো-—ল। বল হরি, হরি—বো—ল। বল হরি—হরি—বোল। নাগাড় চিৎকার করে চলেছে। বিরক্ত হয়েই সে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ছ'টা চ্যাংড়াতে একটা মড়া নিয়ে চলেছে। খুব দুঃস্থ কেউ মরেছে। খাটিয়াও জোটেনি। এরা পাড়ার বাউণ্ডুলে, মহানন্দে বিকট চিৎকারে হরিবোল দিয়ে মরণের কথা মনে পড়িয়ে ভয় দেখিযে ওরা চলে। অমৃতের উপাসক ওরা। মৃতসঞ্জীবনীরও উপাসক বটে তাতে সন্দেহ নেই। কবিরাজখানায় পাওয়া যায়।

র‍্যাবিশ। জানালাটা বন্ধ করে দিলে সে বিরক্তি ভরে।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্ররর্ শব্দে ঘরখানার স্তব্ধতা ভঙ্গ হলো। সঙ্গে সঙ্গে দুপুরের মতোই সেই আতঙ্কিত চ্রিরিক, চ্রিরিক, চ্রিরিক, চ্রিরিক। চড়ুইটা আবার কখন এসে ঢুকেছে। না, বেরিয়েই যায়নি? লক্ষ্য তো করেনি আনন্দ! এ তো জ্বালাতন করলে!

যা—যা—। একপাল্লা জানালা সে খুলে দিলে।

পাখিটা বেরিয়ে গেল না, ওই খোলা পাল্লাটারই মাথায় বসল।—চ্রিরিক—চ্রিরিক। আনন্দের বিরক্তিটা একটু দ্রবীভূত হয়ে গেল চড়ুইটার ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ও ভেবেছে কি? হঠাৎ আনন্দ সম্ভবত ঘরে কেউ নেই বলেই পাখিটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে—কি? দুপুরবেলা দরজা-জানালা বন্ধ করে তোমাকে আটকে রেখোছলাম— আমার সঙ্গে দুপুর বাস কবেছ বলে দাবি করছ না কি?

—চ্রিক চ্রিক চ্রিক।

- কি? কালকে মুঠোয় চেপে তোমাকে ঘায়েল করেছিলাম?

মৃদুস্বরে পাখিটা ডাকলে—চিনিক্। চিনিক্।

—উ—। হুঁ হুঁ। ভাল।

ঢং—ঢং—ঢং ছ'টা বাজছে। পাখিটা চ্রি-বি-ক শব্দ করে চঞ্চল চকিত গতিতে ঘবের মধ্যে ঢুকে ঘড়িটার উপর একটু উড়ে ঘড়িটার মাথায় বসল এক ঘণ্টা আগের মতো। তারপর নেমে বসল ব্র্যাকেটের উপব।

ঢং ঢং ঢং-—

—চ্রিক—চ্রিক—চ্রিক—। ছ'টা বাজা শেষ করে ঘড়িটা শুধু পেন্ডুলামেব শব্দ করছে। পাখিটা বার তিনেক আবার চ্রিক চ্রিক শব্দ করে থামল। তারপর ঘড়িটার পেন্ডুলাম ঢাকা কাঁচটায দু'-তিনটে ঠোক্কর দিয়ে একটি দীর্ঘ চ্রি—রি—ক শব্দ কবে বেরিযে গেল।

শিশুর হাসি অথবা ফুলভরা গাছ দেখে যে হাসি সকালের আলোর স্পর্শে ফুল ফোটার মতো মানুষের মুখে ফুটে ওঠে—সেই হাসি মুখে মেখে আনন্দ চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিকেলের রোদ্দুরে সন্ধ্যার শেড্ পড়েছে।

পার্কের গাছগুলির পাতা কলকাতার প্রসিদ্ধ বৈকালিক ঝড়ো হাওযায় লুটোপুটি খাচ্ছে। পত্রহীন শিমূল জাতীয় গাছ থেকে সে হাওয়ায় ফুল খসছে। সেই ফুল কুড়োচ্ছে

ক'টি ছেলেমেযে। একটি যুবতী যেতে যেতে ফুলগাছটাব তলায় গিযে একটা ফুল কুডিযে তাব ডোনাট খোপায গুঁজলে। হেসে ফেললে আনন্দ। 'কালো চুলে বাঙা কোসোম হেবেছ কি নযনে'। মনে পডে গেল তাব। কিন্তু এ মেয়ে সুন্দবী, অন্তত গৌবাঙ্গী।

এঃ! কালো কৃষ্ণাঙ্গী মেযেটি এসে ফিবে গেছে!

—গেলে না? সন্ধ্যা হয়ে গেল! হবিযা এসেছে।

মুখ না ফিবিযেই আনন্দ বললে—না।

—যাবে না?

—না।

– চা কবব?

—কব।

হবিয' চলে গেল। আনন্দ তাকিযেই বইল সামনেব দিকে। পার্কেব ওপাশেব বড বাস্তাব উপব বাস যাচ্ছে, আলো জ্বেলে যাচ্ছে। ক'টায লাইটিংযেব টাইম? সম্ভবত ছ'টায। বাস্তাব আলোগুলো কখন জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে অন্ধকাব ঘনিযে আসায বুঝতে পাবা যাচ্ছে। এই ঘনিযে আসা অন্ধকাবেব মধ্যে সাবিবদ্ধ গাডিগুলিব চলন্ত আলো, বিশেষ কবে ওই ওমাথাব বাকটায আশ্চর্য গতিশীল কাঁপেব খেলা শুরু কবে দিযেছে। সব থেকে মনোহবী হযেছে বাকেব মাথায গাডিগুলিব গতিব মন্থবতা। পিচেব বাস্তাব উপব আলোগুলিব প্রতিবিম্ব পডেছে। এ এক আশ্চর্য শোভা। মধ্যে মধ্যে পার্কেব গাছগুলিব আডাল। বা বা বা!

হবিযা চা নিয়ে এল।—চা!

চাযেব কাপে চুমুক দিযে আনন্দ বললে,—বাইবেব বাবান্দায ইজিচেযাবটা পেতে দে।

—দিচ্ছি। চা-টা কেমন? নতুন দিযেছে দুকানদাব।

—ভাল না খুব। প্যাকেট চা আনবি। ও সব লুজ চাযেব আজকেবটা ভাল হবে, কালকেবটা পচা হবে।

—উ বললে কি না খুব ভাল চা। ফিবত দিযে আসব। আমি বলে বেখেছি।

—তাই দিস।

তবুও হবিযা দাঁডিযে বইল। হবিযাব—শুধু হবিয়াব কেন, হবিযা মধুযা যদুযা থেকে হবিনাথ যদুনাথ এমন কি মাধবেন্দ্র যাদবেন্দ্র পর্যন্ত সকলেবই স্বভাব হলো কোন সঙ্কোচেব কথা থাকলে বলতে এসেও বলতে না পেবে এইভাবে দাঁডিযে থাকা। তবে হবিয়াব কথা আলাদা। ও মনিবেব সঙ্গব জন্যও অনেক সময় দাঁডিযে থাকে। এমন ক্ষেত্রে আনন্দ যদি বলে, কিছু বলছিস্? তাতে হবিয়া বোকা হয়ে হেসে বলে, না এমনিই। আনন্দ হাসে। আজও আনন্দ বললে—কিছু বলছিস্?

তাতে হবিযা বললে—মান্‌সো আনব?

—আনবি? তা আন।

হরিয়া বললে—আর—

—কি ?

– -ব্রান্ডির দুকানে যেতে হবে নাকি ? উ তো আটটাতে বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে গেলে না ?

—না।

হরিয়া চলে গেল।

আনন্দ আবার ডাকলে—শোন, হরিয়া।

—যাই।

একটু পর এল হরিয়া। হরিয়া শৌখিন লোক। বাইরে সে কখনও প্যান্ট হাওয়াই সার্ট ছাড়া বের হয় না। বাংলা বই পড়ে। ইংরেজী শিক্ষা পড়ে। ইংরেজী লেখা মক্‌সো করে। বছরে একবার ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে ইংরেজীতে চিঠি লেখে, My dear Babu, I come home I well. Mother well. Go very soon সব থেকে ভাল লেখে শেষকালে you Pronam.

হরিয়া সেজেগুজেই এল। বললে—বাইরে চেয়ার দিলাম।

—শোন। ব্রান্ডির দোকানে যাবি। পাঁইট না। ছোট কোয়ার্টার পাওয়া যায়, তাই আনবি।

—হুঁ।

—শিগ্‌গির ফিরবি। আর একটা ঝোলা নিয়ে যা। হাতে করে আনিস নে। এখানকার লোক সব দেখে!

বাইরে বসে সে ওই পার্কের ওদিকের বড় রাস্তাটার বাকের মুখে মোটরের চলন্ত আলোর আশ্চর্য শোভার দিকে তাকিয়েছিল। এই রূপের খেলাটি এর আগে সে না দেখেছে এমন নয়, কিন্তু আজই সে খেলা আনন্দের মনে ধরা পড়েছে। বিস্ময় বোধ করছে যে, এর আগে সে দেখেও দেখতে পায়নি। তবে সে সন্ধ্যেতে তো প্রায়দিনই বাসায় থাকে না। কাল ছিল। কিন্তু কাল মেজাজ ছিল অন্য মেজাজ। কালো মেয়ের মুখ—তার সহানুভূতি মাখানো কথা; এ দুটো নিতান্তই কাল্‌চে চোরাবালি;—তার উপর মদের নেশার পাগলামি বশে কার্ডবোর্ডের গলিঘুঁচি— কোন কোনার এবং তারই সঙ্গে চিলেকোঠাওলা বাড়ি বানাতেই মত্ত ছিল। আজ বাড়িটা নেই, উড়েই যাক, আর ডুবেই যাক, গেছে। আজ চোখে পড়েছে। আজও মনটা মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে বাইরে বের হবার জন্য। হোটেলের বারে বন্ধুরা এতক্ষণ এসে জমে গেছে। বাক্যের অসিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। যশোদাদা—অশ্লীল রসিকতার আমীর। এক একখানি ছাড়ছে—আর মদের গ্লাসের মদের নেশায় বুঁদ হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট নট যশোদা দুলাল সেন ? জার্নালিস্ট, সাহিত্যিক, লেফ্‌টিস্ট, পেন-ইংক আর্টিস্টও বটে। থিয়েটারের দূতও সাজে। তবে কিছু মূল্যবান কথা বলে যশোদাদা।—আশিকো পতা কাঁহা ? দিন কঁহি, রাত কঁহি। খাতা কেয়া ? পিতা

কেয়া?—পিতা জরুর দারু। যো মিলতা সোহি খাতা। না মিলে তো ভুখে মরে। পিয়ারী ক্যায়সা? গোরী তো গোরী, কালী তো কালী। যো নয়ী সোহি ভালি। আজ যো ভালি—কাল সো নহি; এই হলো সাচ্চা মডার্ন মানুষ। পথে চলে যশোদাদা আপন মনে কথা বলতে বলতে, নিঃশব্দে কথা বলে, হাসে, চোখ পাকায়, ভ্যাঙায়, কিন্তু আশ্চর্য, হাত ছোঁড়ে না, সে সস্তা প্যাঁচ নাকি সিনেমা বা থিয়েটারের নাটকে করে, একজনেব নাকে ছোঁড়া হাত লাগিয়ে দিযে, তাকে রাগিয়ে খানিকটা কমিক করিয়ে লোক হাসায়। যশোদাদা খুব মুখ নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আপন মনে কথা বলতে বলতে পথ চলছে—তুমি হঠাৎ সামনে এসে গেলে, দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে—কি যশোদাদা?

সঙ্গে সঙ্গে যশোদাদা আত্মস্থ। মুহূর্তে একমুখ হেসে বলল—আরে! ছোট্ট এবং দ্রুত উচ্চারিত একটি—আরে!

—কি ব্যাপার? আপন মনে, মুখ নেড়ে নেড়ে—

—তবে আর 'আরে' বললাম কেন? মনে হলো একটা প্রেতাত্মা আসছে। মন্ত্র পড়ছিলুম, তা দেখি চোখের ভুল। প্রেতাত্মা নয় দুবাত্মা। মানে তুই। শ্রীমান আনন্দ।

হঠাৎ উঠে পড়ল আনন্দ। ঘরে গিয়ে পোশাক পরতে লাগল। প্যান্টটা বড ভাল কেটেছে! ক্রীম রঙের হাওয়াইটা—, না সাদা শার্ট পরে টাই বাঁধলে আঁজ। মুখখানা তোয়ালে দিয়ে ভাল করে ঘষে একটু ভ্যানিসিং ক্রীম মেখে নিলে! তারপর বুরুশটা চালিযে সামনের চুলগুলোকে ফাঁপিয়ে দিলে। গুড্। নট্ শুধু আনন্দ, বাট্ আনন্দকুমার। অক্ষরে অক্ষরে—মানে আক্ষরিক অর্থে সত্য। নিজেকে বেশ সুন্দব লাগছে পোশাকটায। বিপদ করেছে নাকটায—বড্ড ধাবালো। এমনি মন্দ লাগে না, কিন্তু ফটোতে নাকটা যেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে যায়। নিজের ছবিকেই সে বললে—নো হোপ্ সার। সিনেমা জগতে কুমার হয়ে নায়ক সাজবার নো হোপ্। তাতে দুঃখ করো না। ছবিতে মিছে অভিনয করে কি করবে? ছোড দো। পথে নেমে পড। বিংশ শতাব্দী। আজাদ হিন্দোস্তান। নয়া জিন্দিগী। সিঁথি টু চৌরঙ্গী—এমন কি রাজভবন অ্যাসেম্বলি হাউস পর্যন্ত অবাধ গতি। চৌরঙ্গীতে আনন্দলোক বানিয়ে খাও দাও আর যশোদাদা বলে—'মজেমে রহো। খাও পিও, পরদেশ যাও, ঘুমো, মহব্বতি করো, হররোজ নয়া মহব্বতি, বাস্। বাস্ এক রোজ মর্ যাও।' শেষে বলেন—জীবন রঙীন গ্যাস বেলুন। সুতোয় বাঁধা তে-কোণা। কেটে ভেসে পড়। ওঠ ওঠ, ভেসে বেড়াও। সুখ তাতেই! তারপর—ফট্। মানে কেটে গেলে। গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশল। কট্টুট রবার এসে পডল ধুলো-মাটির ধরণীতে। বাস মিশে গেল।

বায়ুমণ্ডলে ভাসতে বেরিয়ে পডল আনন্দ—হরিযা ফেরবামাত্র। ব্যাঙ্ক থেকে আনা টাকার দশটা রেখে বাদবাকি সবই প্যান্টের পকেটে পুরলে। হঠাৎ কি মনে হলো—জরদাওয়ালার ছবিটা নিলে। ও লোকটাকে দিয়ে যাবে। একটা বিজ্ঞাপন হবে—হ্যাঁ, কথার মানুষ বটে। নিজে এসে পৌঁছে দিয়ে যায়। এক ঢোক খেয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এখান থেকে বাস ধরাই এক হাঙ্গামা। রাবিশ! জীবনটাই হাঙ্গামা

করে তুলেছে এরা। সমাজ গভর্নমেন্ট—সব—সব মিলেছে, জোট বেঁধেছে। সাধে মানুষ চেঁচায়, বলে—সব ররবাদ। সব ররবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

বাসও চলছে হরদম। ভিড়েরও অন্ত নেই। আপিস ভেঙেছে কখন। আপিসের পর সব এদিক ওদিক সুখের সন্ধানে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে ফিরছে। বাড়িতে অভাব-অশান্তি-অনটন অসুখ যন্ত্রণার শেষ নেই। স্ট্যান্ডে লোক দাঁড়িয়ে এক গাদা— সব চলছে। বাড়ির আবহাওয়া থেকে পালাচ্ছে।

সব ররবাদ।

ওদিক থেকে একখানা বাস এসে দাঁড়াল। লোক নামছে। এ দিকের বাসে সে উঠে বসল। হঠাৎ নজরে পড়ল লম্বা কালো মেয়ে— হাতে বেঁটে ছাতা। বাড়ি ফিরছে। রাত্রে ছাতা মাথায় দেয়নি, নতমুখী হয়ে চলেছে।

নামবে ? না। পেটের মধ্যে ঢোক্‌টা চন চন করছে। বারিশ। চলো—। মনে মনে বলতে বলতেই বাসখানা ছেড়ে দিলে। ওই চলছে—লম্বা পা খাটো খাটো করে ফেলে চলছে। হ্যাঁ, স্টাইল একটা আবিষ্কার করেছে বটে। রূপ না থাকলে স্টাইল ভিন্ন বাঁচো কি করে ?

কালো মেয়ে তার উপর ঢ্যাঙা। চলনটা ওর স্টাইলই বটে। তবে নিজে থেকে ওটা ও আবিষ্কার এবং আয়ত্ত করেনি। ধমকে শাসনে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধমক এবং শাসনের জন্যে আয়ত্ত হয়ে এখন ওইটেই ওর অকৃত্রিম চলনে দাঁড়িয়েছে। লম্বা পায়ে দীর্ঘপদক্ষেপে যখন ও চলত আট দশ বছর বয়সে তখন মা ধমকাতো। একে তো রং কাঠকয়লা তারপর ঢ্যাঙা তালগাছ। পাগুলো সরু সরু তাতে চলছে এই পা ফেলে। যেন হার্ডাগলে কাদাখোঁচা পাখি চলছে। খাটো —পায়ের চলন খাটো। ছোট করে ফেল। তখন ফ্রক রত। ফ্রকে ওকে খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু শাড়ি! পাবে কোথায় ? জুটবে কি থেকে ? বাপ ইস্কুল মাস্টারি করত, তাও নীচের ক্লাসের মাস্টার। মাইনে ছিল ষাট, তারপর যুদ্ধের সময় কিছু বেড়েছিল মাগ্‌গি ভাতা হিসেবে। দেশ স্বাধীন হতে সাড়ে তিনেকবুই হয়েছিল। সংসার বড় ছিল না, একছেলে একমেয়ে, মেয়েই ছোট। সুবাহর মধ্যে সিঁথিতে বাড়ি ওদের দু'পুরুষের, বাড়ি ভাড়া লাগত না। চলে যেত কোনরকমে। মা অবশ্যি মনসা পজার কথার মনসার মতো বিষ ঢালত, খেতো আবার উগলাতো। শ্যামলীর ইস্কুল মাস্টার বাপ কালো মেয়ের নাম রেখেছিলো শ্যামলী। বাপকে মা বলতো- পোড়াকাঠ। বাপ মেয়ের মতোই কালো এবং লম্বা ছিল, ছেলেও তাই কিন্তু ছেলের কালো রং তখনও সমাজে সংসারে সমস্যা ছিল না। শ্যামলীর বাপ হেসে বলতো—দেখ আমাকে মদনমোহন বলতে বলছি না, তবে পোড়াকাঠ শব্দটা একটু সরস করে বলতে পার না। আমারও ভাল লাগে, পাঁচজনের কাছেও তোমাকে পতিনিন্দার দোষভাগিনী হতে হয় না। শুকনো কাঠ তাকে শুষ্কং কাষ্ঠংও বলা যায় আবার নীরস তরুবরও বলা যায়। কালাচাঁদ বললে তো পার। কাঠ বলতেই যদি চাও তবে তমাল তরুও বলতে পার।

মা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। আর একটা সম্বোধন তার ছিল —সেটা মড়ুইপোড়া।

তিনি ওই নাম দিয়ে শুরু করতেন—মড়ুইপোড়ার বাক্যি শোন। মড়ুইপোড়া কালাচাঁদ! সে কৃষ্ণের শতনাম থেকেও বড় একটা গালাগাল পর্ব।

বাপ মারা গেল হার্টফেল করে, শ্যামলী তখন ষোল বছরের। উনিশশো বাহান্ন সালে মাথায় প্রায় চার ফুট ন-দশ ইঞ্চি হয়ে উঠেছে। ইস্কুলে পড়ত। ছাত্রী হিসেবে মাঝারি, তবুও দরিদ্র ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে এবং পুরনো বাসিন্দে বটে —তার জন্যে ইস্কুলে ফ্রিশিপ জুটেছিল। মা এই সময়টায় উঠতে বসতে তাকে ধমকে ধমকে এই চলনে অভ্যস্ত করেছিলেন। বাড়ির উঠোনে তাকে নিজের চোখের সামনে হাঁটিয়ে অভ্যাস করাতেন। তখন শাড়ি পেয়েছে। বাপ সাদা মিলের শাড়ি কিনে দিতেন। তাই পরত। বাপ মারা গেল, শ্যামলী ফেল করলে ম্যাট্রিকে; মা তাকে হেসেলে ঢোকালে, আর ভাইকে বললে—যেমন তেমন করে যা হোক একটা পাত্তর জোটা। বিয়ে তো দিতে হবে। ভাইও ম্যাট্রিক ফেল, তবলা বাজনায় খুব ভাল হাত, তবলা বাজায় থিয়েটারে, কলকাতার মিউজিক সেন্টারে তবলা শেখায়, মধ্যে মধ্যে সিনেমায় লম্বা সিটকে মানুষের পার্ট করে। তার সময়ও ছিল না—তাগিদও ছিল না। এবং মায়ের থেকে বুদ্ধি একটু বেশি। বিয়ের চেষ্টা সে করেনি। চমৎকার কাজ একটা তাকে জুটিয়ে দিয়েছিল। কোথেকে কে বুদ্ধি দিয়েছিল শ্যামলী জানে না, তবে একদিন কাপড়কাচা সাবানের এক মালিক ভদ্রলোকের বাড়ি তাকে নিয়ে গিয়ে সাবান ক্যানভার্সিংয়ের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। কালো মেয়ে, ধবধবে সাদা কাপড় জামা পরে লোকের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে এবং এই সাবানের গুণ বর্ণনা করতে হবে। হাল আমলে এসব সাবানের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে যাতে সাবান খানিকটা জলে ফেলে হাত দিয়ে নাড়া দিলেই ফেনা হয় এবং তার মধ্যে কাপড় ফেলে দিয়ে কিছু ডুবিয়ে রেখে তুলে নিংড়ে নাও, বাস হয়ে গেল। একেবারে বকের পালক হয়ে যাবে। সাবানটার নামও দিয়েছে কোম্পানি 'বলাকা'।

তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় বের হয় শ্যামলী। সতের বছর থেকে এখন চব্বিশ পার হতে চলেছে। উনিশশো ষাট সাল; আট বছরে শ্যামলী চাকরির পথে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। একটা হলো, সকালে বা ভর্তি দুপুরে গৃহস্থ বাড়িতে ক্যানভার্সিং এ গেলে বিপরীত ফল হয়। সকালে কাজকর্ম —আফিস ইস্কুলের ব্যবস্থা— দুপুরে মেয়েদের খাওয়া বিশ্রাম, এর মধ্যে গেলেই তাদের মেজাজ বেগড়ায়। সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা তাদের মেজাজ ভাল থাকে। ব্যাটাছেলেদের কাছে সে তার কালো চেহারা নিয়ে গেলে তারা চটে। মেয়েরা খুশিও হয় করুণাও করে। ছাতাটা সে নিজেকে আড়াল দেবার জন্যে ব্যবহার শুরু করেনি—করেছিল রোদ্দুরের জন্যে। ব্যবহার করতে করতে সে বুঝেছে এতে মাথায় রোদ লাগে না, কালো মুখ ঘামে চকচক করে আরও খারাপ দেখায় না তো বটেই তা ছাড়াও পথচারীরা একটু তাকায় তার দিকে। তাকে দেখতে চেষ্টা করে এবং দু'-চার জন ঔৎসুক্যবশত খানিকটা পথ পিছন পিছন কি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। হাতে-পায়ের কালো রং সবাই দেখতে পায়, সে কালো জেনেও সঙ্গ নেয়—তার ওই চলনের স্টাইলের জন্যে।

লোকে এজন্যে ব্যঙ্গও করে কেউ—বাপরে, কেউ ছোট্ট একটি—হুঁঃ, কেউ—মাইগাড, কেউ কিছু কেউ কিছু, যারা একদিন দেখেছে, তারা—ওইরে! বা ওই যায়!—বলে ওঠে। তাতে প্রথম প্রথম সে আহত হত, নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ শুনে এক একদিন তখন জলও আসত চোখে কিন্তু এখন আর আসে না; বরং একটু কৌতুকই অনুভব করে। বাংলা বইও সে পড়ে। পড়ে শুনে জীবনের সূক্ষ্মবোধগুলিও তার কিছু কিছু জেগেছে। সে জানে এর থেকে মর্মান্তিক লজ্জা, হয়তো অপমান কোন মেয়ের পক্ষে হতে পারে না, তবুও সে আত্মসংবরণ করতে পারে না,—ছাতা মাথায় দিয়ে—এই চলনেই হাঁটে। তবে তার চুলের রাশি দেখে তারিফ সবাই করে। চুল সে অধিকাংশ দিনই এলো রাখে। ডোনাটে খোপা এত বড় হয় যে তাকে আরও বিশ্রী করে তোলে। এলো খোপাও একটি তালের মতো হয়। মধ্যে মধ্যে একটা বেণী করে ডগার দিকটা এলিয়ে দেয়। তেল সে মাখে না, তাতে কালো রঙ চক্ চক্ করে— খারাপ দেখায়।

বাংলা 'কবি' বইটা তার খুব ভাল লাগে। তার কারণ কবির নায়িকা ঠাকুরঝি তারই মতো কালো মেয়ে। আর ভাল লাগে শরদিন্দুবাবুর একটি গল্প। তাতে ধনী বিদ্বান নায়ক ছদ্ম পরিচয়ে দুটি মেয়েকে পড়াতে এসে সুন্দরটিকে ফেলে কালো মেয়েটিকেই পছন্দ করে বিয়ে করলে। সে কালো মেয়েরও তারই মতো একরাশি চুল। সে মেয়ে নিজেকে উপেক্ষিতা ভেবে যখন টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছিল তখনই নায়ক এসে বললে কর্তাদের মত নিয়ে এসেছি, এখন তোমার মত চাই। কিন্তু কাঁদছ কেন? আর যদিই কাঁদছ তবে চুল এলিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদো। কারণ কবি কালিদাস বলেছেন কাঁদতেই যদি হয় তবে চুল এলিয়ে কাঁদো।

সে চুল এলোই রাখে। কিন্তু কাঁদবার অবকাশ হয়নি, হবে না। তবুও সে এটুকু ছাড়তে পারে না। মধ্যে মধ্যে কটূক্তি শুনে ভাবে ছি। তারপর ভুলে যায়। এ সেই অতি দরিদ্রের নিয়মিত চার আনা দামের লটারীর টিকিট কাটা! কোন বারই পায় না এবং তার ভাগ্যকেও সে স্থির জানে কখনও পাবে না তবু কিনেই যায়, কিনেই যায়। লজ্জা তার রূপ, লজ্জা তার দারিদ্র্যে, লজ্জা তার এই ভাবে হাঁটা, লজ্জা তার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের স্তব করা, সব জড়িয়ে গোটা জীবনটাই তার লজ্জা— তার সঙ্গে এ লজ্জাটাকেও সে মাথায় করে নিয়েছে।

মধ্যে মধ্যে দুষ্ট মানুষ আসে। কুৎসিত প্রস্তাব নিয়ে। সে কিন্তু তাও নিতে পারে না। কালনাগিনীর মতো ফোঁস করে ওঠে। চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলে।

কয়েক বারই এমন ঘটেছে।

নিজেকে তারপর প্রশ্ন করেছে, তাহলে এমন করে হাটে কেন? এমন ছাতা ঢেকে চলেই বা কেন? বর্ষার সময় নীলচে প্ল্যাস্টিকের বর্ষাতি আর টুপি পরে। কোম্পানি অর্ধেক দাম দিয়েছে। তার উপরেও সে ছাতা ঢাকা দেয়।

তার আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর সে পায়নি, দিতে পারেনি।

না—এও সে চায় না। আবার ওইটুকুও ছাড়তে পারবে না।

এই সব কারণে সে কখনও চৌরঙ্গীর দিকে হাঁটে না। সন্ধ্যের পর তো নয়ই।

সন্ধ্যের পর এক ঘণ্টা আর একটা কাজ করে সে। সাবান কোম্পানির বুড়ো ম্যানেজারের বাচ্চা নাতিকে পড়াতে হয়। পনের টাকা দেন বৃদ্ধ। আটটায় সে বাড়ি ফিরে আসে।

* * *

পথে পড়ে এই ভদ্রলোকের বাড়ি। নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে, বাগান ভেঙে বসতি বসেছে, পথঘাট আলো ঝকঝকে সব বাড়ি। মাঝখানে পার্ক রেখে নতুন এইখানটা একেবারে বালিগঞ্জের মতো হয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শী পুরনো বাসিন্দেরা এখানকার জায়গা বিক্রি করে ক্রমে ক্রমে উত্তরে সরছে। ওরা এখনও বাড়ি বিক্রি করেনি। বিক্রি হযে যেতো কিন্তু এক খুড়ো আছে, তার বাপের সহোদর, সে সন্ন্যেসী হযে গেছে। মধ্যে মধ্যে আসে, মরেনি বলে কেউ কেনে না। তার মা দিনরাতই বলে—মরে না। আবার মধ্যে মধ্যে বলে—তা মরেনি বলেই আছে, নইলে বাদল তো বিক্রি করে দিয়ে টাকা নিযে সরে পড়ত। পথে বসতে হত। মেয়ের বিয়ের ভরসা আর করে না মা। বরং এই তার ভাল হয়েছে। বাদল তবলা বাজায, রোজগারও করে কিন্তু তার অনেকটাই যায তার বাইরের টানে। নইলে ভাল। নেশা কবে না, বাবুগিবিও নেই, শুধু থিয়েটারেব নাচিয়ে আশার ওখানে আড্ডা তার পাকা। ভোরবেলা বাড়ি ফেরে, বারোটা পর্যন্ত থাকে, খেয়ে-দেয়েই বেরিযে যায়। বলে থিয়েটারে যাচ্ছে। কিন্তু আশার বাড়ি দিবানিদ্রা দেয গিয়ে। সেখান থেকে থিয়েটারে। আর সিনেমার কাজে ডাক থাকলে তো কথাই নেই—দশটাতেই বেবিযে যায। মাসে পঞ্চাশ টাকা দেয, তার বেশি সে দেয না। বললে—চুপ কবেই থাকে। বেশি বললে বলে—একটা পেট একবেলা পঞ্চাশ টাকার বেশি কি লাগে বল? আর শ্যামলীর তো একটা পথ আমিই কবে দিযেছি। ও তো মাসে ক্যানভাসিংয়ে টুইশনি করে পচাত্তর আশী টাকা পায়।

এরপরও কথা বললে—পরের দিন থেকে আসাই বন্ধ করে। খুঁজতে যেতে হয় শ্যামলীকে। আনন্দেব বাসার ধার দিযে পথটাই ভাল পথ, চওডা পথ, ভদ্র পথ। এই পথেই সে যায আসে। তাছাডা এ পথ দিয়ে যেতেও তার ভাল লাগে। বাংলা বইযেব সে ক্ষুধার্ত পাঠিকা, বই সে গোগ্রাসে গেলে। এ পথে ক'জন লেখক এসে বাড়ি করেছেন বাসা নিয়েছেন। তাদের বাড়ির ধার দিযে যেতেও ভাল লাগে। মধ্যে মধ্যে দেখতেও পায়। কেউ বারান্দায বসে থাকেন। কাউকে দেখা যায় জানালার মধ্যে দিযে। কাছে যেতে বা গিয়ে আলাপ করতে সাহস পায না। তাদের বাড়িগুলি পার হযে আরও খানকটা এগিয়ে একতলা একখানি ছোট বাড়ি, সেই বাড়িতে এসেছেন এই ভদ্রলোক, তারপরই পার্ক শেষ। ওদিকে একটা বড রাস্তা চলে গেছে এ রাস্তাটা তার সঙ্গেই মিশেছে জ্যামিতির সমকোণ সৃষ্টির ঊর্ধ্ব রেখার মতো। সে রাস্তাটা সোজা পার হলেই পুরনো কালেব পাড়া শুরু। ছোট অপ্রশস্ত রাস্তা। আঁকাবাঁকা। দু' পাশে পচা ড্রেন। এরই মধ্যে দিযে গিয়ে তাদের নোনাধরা পলেস্তারা খসা পুরনো বাড়ি। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ। ফাটা খোয়া ওঠা উঠোনে দূর্বাঘাস মথো ঘাস। যেখানে

সান আছে সেখানে শ্যাওলা। তার দু'পাশে ঘর। একদিকে একখানা ছাদ-ফাটা দরদালান, তার কোলে দু'খানা ঘর, অন্যদিকে একখানা ছাদ-ফাটা দরদালান, তার কোলে দু'খানা ঘর, অন্যদিকে একখানা বান্নাঘর, একটা ভাঙা চাল। অন্য একদিকে খাটা পাইখানা। অন্য একদিকে পাঁচিল।

এই নতুন একতলা বাড়িটা নাকি এক অভিনেত্রীব। তার বাড়ি হচ্ছে খবরটা দিয়েছিল তার দাদা। সেদিন খুব আগ্রহ হযেছিল তার। দাদাব দৌলতে থিয়েটারটা দেখতে পায় মধ্যে মধ্যে। এই অভিনেত্রীব অভিনয সে দেখেছে। নামও তার খুব। পথ দিযে যেতে আসতে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য কবত আব কত বাকি। একদিন শেষ হলো। যেতে যেতে থমকে দাঁড়িযে কাছ থেকে দেখত। বাস্তাব উপবেই বাড়ি, দেখতে অসুবিধা ছিল না। দাঁড়িযে দেখত কি বড একটা জানালা। আব তাব কোলে প্রায ছোট্ট একটা ঘরের মতোই চৌকো একটি বারান্দা। বাবান্দা ঘিবে গ্রিলের মতো বেডা পডল। পর্দা ফেলে দিলেই ঘর। চমৎকাব। দাঁড়িযে দেখত আব নতুন বঙেব গন্ধ শুঁকত। ভাবী মিষ্টি লাগে তাব। তাবপব বাড়ি বন্ধই বইল। দাদা বললে সুভদ্রা দেবী এখানে আসবে না বাস কবতে। ভাডা দেবে বাড়ি। হতাশ হযেছিল। যাঃ। ইনি এলে হাজাব হোক মেযেছেলে কাছে যেতে পাবত, দাদাব সূত্র ধবেও আলাপ করত। একজন বিখ্যাত লোকেব সঙ্গে আলাপ হত। নিজেব জীবন তো সবটাই দৈন্য। সে তো মুছবাব নয। কোন সম্বলই তো নেই তাব। শুধু মধ্যে মধ্যে মনে হয এ আব ভাল লাগছে না! কপোবেশনে টিকেদাবী কবে তাব পবিচিত একটি বন্ধু, তার জন্যে দবখাস্ত কবলে হয। কখনও ভাবে নার্স হলে হয। কিন্তু সে হয না। হবেও না। বড নিরুৎসব ঠেকে জীবন। তবু এই বিখ্যাত মহিলাব সঙ্গে দেখা হলে ভাল লাগত। তাঁকে ধবে অভিনয শিখতে পাবত। কা[illegible] বঙ আটকায না পেটেব দৌলতে। তা এলেন না তিনি। হঠাৎ একদিন দেখা গেল এই মাস দেডেক আগে বাড়িতে লোক এসেছে। সে ছাতাব আডাল থেকেই দেখলে বাবান্দাটায টবেব গাছ ঝুলিযে দিযেছে। ছবি টাঙানো হচ্ছে। অনেক ছবি। একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পবা উস্কোখুস্কো চুল মানুষ ছবি টাঙাচ্ছে।

তাবপব শুনলে লোকটি নাকি শিল্পী। ছবি আঁকে। ছোট গেটটায বেশ চমৎকাব কবে কাঠেব প্লেটে লেখা আনন্দ বায়— আর্টিস্ট। নাম সে শোনেনি। শিল্পেব খোঁজ সে বড একটা বাখে না। সামর্থ্যই বা কোথায আর অবসবই বা কোথায? তবে ছবি সে ভালবাসে। মাসিক পত্রে ক্যালেন্ডাবে আঁকা ছবি খুব ভাল লাগলে বাঁধিযে ঘবে টাঙায। সেও সহজ ব্যাপাব নয। ফ্রেম কাঁচ বাঁধাই খবচ আছে। বাড়িতে মাযেব পুজোব জাযগায ঠাকুবেব ছবি আছে। অনেক ঠাকুব। সে বেছে বেছে প্রাকৃতিক দৃশ্য পেলে বাড়িব পুবনো আমলেব ফ্রেমেব কাঁচ নিযে পুবনো ছবি ফেলে দিযে নিজেই বাঁধিযে টাঙায। শিল্পীদেব মধ্যে নন্দলাল বসু, যামিনী বায, দেবীপ্রসাদ বাযচৌধবী, গোপাল ঘোষেব নাম শুনেছে। অবনীন্দ্রনাথেব নাম সব থেকে উঁচুতে তা ও জানে। সন্ধ্যাবেলা ফার্মেব ম্যানেজাবেব বাড়িতে তাঁর নাতিকে পডাতে গিযে

কাগজ পড়তে পায়। রবিবারের কাগজে সাপ্তাহিকীর পাতাগুলি বাড়ি নিয়ে এসে খুঁটিয়ে পড়ে। তারই মধ্যে এদের কথা অনেক থাকে। আনন্দ রায় নতুন। এ কালের ছবি সব সে বুঝতে পারে না। তবুও দু'-চারটে ভাল লাগে রঙের জন্য। আনন্দ রায়ের জানালা প্রায় বন্ধ থাকে। বাইরের বারান্দায় ছবিগুলো সে তিনটের সময় বেরুবার পথে কয়েক দিনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে। ছবিগুলো কেমন জড়ানো জটিল, বেশ কিছুক্ষণ না দেখলে বোঝা যায় না, হেঁয়ালির মতো। কিন্তু রঙ বড় ঝক্‌মকে। লাল নীল গাঢ় হলুদে যেন ঝলমল করে। আরও ভাল লাগে সাজানোর ব্যাপারটা। কি চমৎকার সাজানোর ভঙ্গি। কটিই বা জিনিস। একটা উঁচু টুলে একটা এবড়ো-খেবড়ো বিচিত্র কাঠের গুঁড়ি, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় একটা জন্তু! কাছে গেলে বুঝতে পারে কাঠের গুঁড়িতে ত্রিভুজের মতো তিনটে খোঁদড় তার দুটোতে চোখ আঁকা, একটাতে মুখ। দুটো টুলের উপর দুটি ফুলের টব। বারান্দায় ছাজার মাথায় কয়েকটা ঝোলান টব। মাঝখানে দু'খানি চেয়ার একটি ছোট্ট টেবিল। টেবিলে একটা বেশ ফাপা বাঁশের ফুলদানী। বাঁশই তবে মাঝখানে চমৎকার নক্সা আঁকা। বোধহয় নিজেই এঁকেছে। দেখে কতদিন ভেবেছে এ সব তো সস্তা জিনিস, এ দিয়ে তাদের একখানা ঘর, যেখানা নামে দাদার জন্য, আসলে পড়ে থাকে----সে ঘরখানা এমনই করে সাজানো যায় না। তাতেও মায়ের বাধা, হাঁ-হাঁ করে উঠবে। পুরনো আমলের ভাঙা খাট, তার তলায় ভাঙা কুলো, ভাঙা চ্যাঙারি, ঘুটের ঝুড়ি, বাজ্যের জিনিস। সে সব বস্তুগুলির প্রত্যেকটি মায়ের বুকের এক একখানি পাঁজরা! অথচ নিত্য দেখে যায় আর এমনই একটি বাসনা, গোপন বাসনা বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে যায়, কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্য নয়; এখান থেকে রেল পুল পার হয়ে ওপারে খালের পুল পর্যন্ত যেতে যেতেই শেষ হয়ে যায়। আপনা-আপনিই ভুলে যায়। আর একটি আফসোস জাগে সেটা বন্ধ বড় জানালাটা। সেই প্রথম দিন সে আনন্দ রায়কে ছবি টাঙাতে দেখেছে তার পর আর দেখেনি। উস্কোখুস্কো রুক্ষ বড় বড় চুল, বেশ লম্বা চেহারা, একটু রোগা। মুখখানা কেমন কড়া, চোখের কোণে কালি, লোকটাকে ভয়ও করে আবার মন্দও লাগে না। ভালই লেগেছিল। ব্যাটাছেলের চেহারা ননীগোপাল হলে মানাবে কেন? আনন্দ রায়কে আর দেখেনি, এই কাল পর্যন্ত আর জানালাটাও খোলা দেখেনি। ওই ঘরখানাতে একটু উঁকি মেরে ওর দেখবার ইচ্ছে ছিল। এবং আনন্দ রায়কে ভাল করে একটু দেখতে। তা হয়নি। এই কাল হয়ে গেল সে সুযোগ। ছাতা আড়াল দিয়ে চলে বটে সে কিন্তু ওর মধ্যে থেকে বাইরের দুই পাশ, সামনের সব কিছুই সে দেখে নেবার একটি সুকৌশল আবিষ্কার করে নিয়েছে সেই ঈশপের গল্পের তৃষ্ণার্ত কাকপক্ষীটির মতো। সে যেমন জল খেতে এসে একটা পাত্রের কানায় বসে দেখলে জল অনেক নীচে তার ঠোঁটের নাগালের বাইরে, তখন সে যেমন নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে পাত্রের তলায় ফেলে জলকে নাগালের মধ্যে এনেছিল তেমনি সেও তার এই বিশেষ ভঙ্গির চলনের দোলার সঙ্গে ছাতাটিকে এক একবার এমনভাবে অল্প পিছনের দিকে চকিতের জন্য ফেলে যে আশপাশ সামনের সবকিছু দেখে নিতে

পারে। কাল সে একটু দূর থেকেই প্রথমটা দেখেছিল জানালার পাল্লা বাইরের দিকে খোলা রয়েছে। মনটা কৌতূহলী এবং খুশি হয়ে উঠেছিল। এবং আরও একবার ছাতাটা পিছনে ফেলে দেখে না নিয়ে পারেনি। দ্রুত চলন আরও একটু দ্রুত করে হেঁটেছিল। তার পরের বার দেখতে পেয়েছিল আনন্দকে। সে দেখেছিল ভদ্রলোকের চোখ তার দিকেই। বুকটা একবার ধড়াস করে উঠে ঢিব ঢিব করতে শুরু করেছিল। মনে ঠিক কি হয়েছিল বলতে পারবে না, হয়তো লজ্জা হয়তো তার কালো রোগা মুখখানাকে ভাল করে ঢাকবার জন্যেই সে ছাতাটা একটু বেশি নামিয়ে নিজেকে ঢাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘটল কাণ্ডটা। কাকটা একেবারে সামনে ছোঁ মেরে এসে পড়ল, চড়ুইটা চকিত, একটি জোরে ছোড়া কিছুর মতো আগেই বেরিয়ে গেছে। আবছা দেখেছিল ঠিক নয়, মনে হয়েছিল। তার পিছনে কাকটা কালো পাখায় শব্দ তুলে আশ্চর্য একটা আঁকাবাঁকা গতিতে ছাতার কিনারা ঘেঁষে চলে গেল। চমকে উঠে স্বাভাবিকভাবেই ছাতাটা একেবারে পিছনে ঠেলে দিয়ে নিজেকে অনাবৃত করে দিলে-—মাঃ! সঙ্গে সঙ্গে শুনলে-—অঃ শব্দ! ক্ষুব্ধ এবং যন্ত্রণা-কাতর একটি মোটা গলার অঃ! উঃ! এবং আঃ! যেন মিশে গেছে একসঙ্গে। সে তাকালে সেই দিকে, সেই জানালাটার দিকে। শিউরে উঠল সে! ইস্! – শিল্পী আনন্দ রায়ের চোখ থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে। কেউ বোধ হয় ঢেলা ছুড়েছিল কাকটার দিকে, সেটা ছুটে গিয়ে আনন্দ রায়ের চোখে লেগেছে। তাই বোধ হয় কাকটা ঢেলা এড়িয়ে এমন গোত্তা খেয়ে নিচে নেমে এঁকেবেঁকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল। আনন্দ রায়ের চোখে রক্ত পড়তে দেখে ঢেলা লেগেছে বলে শিউরে উঠে বলে উঠেছিল—-ইস্! আপনার চোখ থেকে যে রক্ত পড়ছে! ঠিক কি বলেছিল মনে নেই। কিন্তু আনন্দ রায় যখন হাতের তালুর উপরে চড়ুইটা দেখিয়ে একটু হেসে বলেছিল একটা চড়ুই! সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। একটা পিঁপড়ে হঠাৎ কামড়ালে মানুষ চমকে উঠে সেটাকে টিপে ধরে মেরে দেয়। কেউ আগে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারপর দেখে কঠিন আক্রোশে মেঝের উপর দলে দেয়। লোকটি বিচিত্র। হেসে বেশ স্নেহের সঙ্গে বললে-—চড়ুই। তাকে জল দিয়ে বাঁচাতে ব্যস্ত হলো। সযত্নে কোথায় যেন তুলে রেখে দিলে। তার ইচ্ছে হয়েছিল— ঘরে গিয়ে চোখটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এতটা সে পারেনি। লজ্জা পেয়েছিল। আর বলবার কথা না পেয়ে চলে গিয়েছিল। রাত্রে কাল ফিরবার সময়ও সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল খোঁজ নিয়ে যাবে--ডাক্তার দেখিয়েছেন কিনা। যা হোক —সে তার ওই 'একটা চড়ুই' কথাতেই সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু লজ্জায় পারেনি। কি ভাববেন? তাছাড়া পাড়ার লোক, তারা তো এতেই নানান রটনা করে। নাম দিয়েছে দালাল কালী। আর তাকে নিয়ে যে সব গল্প তৈরি করে তা শুনে তার মতো ক্যানভাসার মেয়েও লজ্জা পায়।

আজ দুপুরবেলা জানালা বন্ধ ছিল। ভেবেছিল কি লোক, বেরিয়ে গেছেন এই চোখ নিয়েই! তবে ভাল নিশ্চয় আছেন অনুমান করতে হয়নি। ভাল না থাকলে বেরুলেন কি করে? হাসপাতাল টাসপাতাল যেতে হয়নি তো? না এতদূর হবে

না। একটু দাঁড়িয়ে সে এসে কড়া নেড়েছিল। চাকরটা তো আছেই। তাকে জিজ্ঞাসা করে যাই। বাড়িতে না থাকলে বাড়ির ভিতরটা দেখতে চাইবে? না। সে থাক। চাকরটা যদি বলে হুকুম নাই। তার থেকে জিজ্ঞাসা করে আর দুটো খবর নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু উনি ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন এবং ভাল আছেন শুনেই পালিয়েছিল। থাক বাবা।

বাড়ি ফিরবার পথে সে আবার দাঁড়াল।

জানালাটা খোলা আছে তবে ভিতরটা অন্ধকার। এপাশের চারফুট গলিটার ভিতরের রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়ে আলো বেরুচ্ছে। চাকরটা রয়েছে—রান্না-বান্না করছে। আনন্দ রায় নেই। চলে গেছেন বেরিয়ে। হয়তো সিনেমায় হয়তো তাঁদের আড্ডায় কিংবা হয়তো কোন আত্মীয়ের বাড়ি নয়তো শ্বশুরবাড়ি। কলকাতাতেই শ্বশুরবাড়ি, বউ এখন সেখানে গেছেন। বাসায় কোন মেয়েছেলে নেই। একা থাকেন। একলা কেন থাকেন কে জানে? কেউ নেই? হতে পারে। না পারে না। কেউ নেই তো বাসা কেন? কার জন্যে বাসা? দিব্যি তো ভাল ভাল মেস আছে, বোর্ডিং আছে, আজকাল হোটেল রয়েছে। সেখানে তো বিনা ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারেন। বাসার তো ঝঞ্ঝাট আছে। রান্নাবান্না নিয়ে একটা সংসার। একটা চাকর। নিশ্চয় বাসায় থাকবার মতো কেউ আছে। ঘরখানা দেখতে পেলে ঠিক ধরতে পারত। তবে সে বেশ অনুমান করতে পারে ঘরখানার পাশাপাশি দুটো খাট জোড়া দেওয়া আছে। নইলে ছোট হোক দু'খানা ঘরের কি প্রয়োজন! ভাবতে ভাবতেই সে চলতে শুরু করেছিল।

বড় রাস্তা পার হয়ে গলিপথে ঢুকল। গ্যাসের বাতি ঘুচে ইলেকট্রিক হয়ে জীবনে ঐশ্বর্য বেড়েছে। কথাটা শুনতে ভাল লাগে, যখন প্রথম ইলেকট্রিক আসে তখন সবাই বলেছিল বাচলাম। সেও খুশি হয়েছিল। এ তো তার আমলেই হলো। তখন সদ্য বাবা মারা গেছেন। কিন্তু আলো হয়ে দুঃখ আরও বেড়েছে। গ্যাসের আলো যতগুলো ছিল ততগুলো তো দেয়নি। পথ আরও অন্ধকার হয়েছে। অন্য লোকেরা অনেকে বাড়িতে ইলেকট্রিক নিয়ে সুখ পেয়েছে নিশ্চয়, সুইচ্ টিপলেই আলো, উজ্জ্বল আলো। কিন্তু তাদের মতো লোকের বাড়িতে এখনও সেই হ্যারিকেন আর চিমনী।

এঃ! কিসের পচা গন্ধ উঠছে। কোথায় ইঁদুর পচে পড়ে আছে' দুর্গন্ধ বারো মাস চব্বিশ ঘণ্টা; নর্দমাগুলোই এখানে ছেলেদের পাইখানা।

পিছন থেকে শিস উঠেছে।

পাড়ায় কতকগুলো চ্যাংড়া আছে। একেবারে জানোয়ার! আজ তো শুধু শিস। অন্যদিন ছড়া বলে। গান ধরে। তাদের দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা থাকে 'ভাল বাসি গো'! প্রথম প্রথম রাগ হত। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলত। একবার সে একটু দূরের বাড়ির রোয়াকে আড্ডাবাজ ছেলেদের কাছে গিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল এ সব আপনাদের কি ব্যবহার? লজ্জা করে না? কি ভেবেছেন, বাবা মারা গেছেন বলে আমাদের কেউ নেই? আমরা পাড়ার পুরনো বাসিন্দে। আমি তাদের কাছে যাচ্ছি।

মা চিৎকার করত—পাড়ায় কি মানুষ আছে! সমাজ আছে!

তারা তার পিছনে হো-হো করে হেসেছিল। তখন দাঙ্গার পর বোমা ফাটানোর সময়। একদিন তাদের দরজায় বোমাও ফাটিয়েছিল কেউ। সয়ে যেতে হয়েছে। তবে আগের থেকে এখন অনেক কম। বোমাবাজেরা তখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। এখনও মধ্যে মধ্যে প্রেমপত্র পায়। সে আব চঞ্চল হয় না। প্রথম পড়েই ছিঁড়তে যায়। কিন্তু হাত দুটো সক্রিয় হয় না, একটু ধরে থেকে ভাবে পুলিশের কাছে যাবে। তারপর একটু পর আর একবার পড়ে। এবার হাসি পায়। তারপর আস্তে আস্তে কোনটা ছিঁড়ে দেয় কোনটা নর্দমায় ফেলে দেয়।

বাড়ির দরজায় এসে সে কড়া নাড়লে—মা।

ভিতর থেকে মায়ের বকুনি শুরু হয়ে গেল।—তুই আবার আজ একখানা নতুন কাপড় ভেঙেছিস! কালকের কাপড়খানা বিছানায় বালিশের নিচে পাট করা রয়েছে। এ তোর কি রকম ব্যাভার! ওই তো ছিরি!

সে হাসলে। কি উত্তর দেবে?

—আব ওসব কি বিচ্ছিরি বই পড়িস তুই! তিনটে বোন একটা ছোঁড়াকে নিয়ে সারারাত ধরে টানাটানি—মরণ। বিকেল বেলা। কোমরের ব্যথায় মরি। রান্না চাপাতে পারলুম না। শুয়েই বা করি কি? তোর বালিশের নিচে বই থাকে—নিতে গিয়ে দেখি কাপড়খানা। বইটা নিয়ে পড়ে ঘেন্নায় বাঁচিনে।

—চল। ভেতরে যেতে দাও। হেসেই সে বললে।

—আগে উত্তর দে কথার।

—উত্তর? বই পড়ে বা নিত্য নতুন কাপড় পরে যদি খারাপ হতাম মা—তবে অনেক দিন আগেই হতাম। বযস আমার চব্বিশ পার হয়ে গেল।

মা সরে দাঁড়াল।

* * *

চারদিন পর। চারদিন জানালাটা বন্ধই ছিল। পাঁচদিনের দিন শ্যামলী দেখলে জানালাটা খোলা। যেখান থেকে প্রথম সে দেখতে পেলে সেখানেই সে আপনা-আপনি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বুকটা স্পন্দিত হযে উঠল। আনন্দ রায় ফিরে এসেছে।

পুরী চলে গিয়েছিল। সেই যেদিন সে ওঁর চাকরের কাছে ওঁর খোঁজ নিয়েছিল অর্থাৎ ওঁর চোখে আঘাত লাগবার পরের দিন। উনি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন; সেইদিন রাত্রেই উনি পুরী চলে গিযেছিলেন।

তার পরের দিন সকালেই সে বাজারে গিয়েছিল। দাদা ফিরে আসে ভোরবেলায় আশার বাড়ি থেকে; এলেই চা দিতে হয়, চা টা খেয়ে দাদাই বাজারে যায়। সেদিন দাদা ফেরেইনি। সে-কথা অবিশ্যি আগের দিন বলেই গিয়েছিল দাদা। আর বলে না গেলেই বা কি হত!

বাজারে দেখা হয়ে গিয়েছিল আনন্দ রায়ের চাকরের সঙ্গে। দু'জনেই কুমড়োর

ফালি কিনছিল। চাকবটি দাঁড়িয়েছিল সামনে। ভিড ছিল। ঠেলে ঢোকা ঠিক ভাল লাগছিল না। পিছনে দাঁড়িযে ভাবছিল, দু'-তিনবাব মৃদুস্ববে সামনেব লোককে বলেছিল—দয়া কবে একটু সববেন ? শুনছেন ?

কিন্তু শোনেনি কেউ। শুনেছিল ওই চাকবটি, সে কথা শুনে পিছন ফিবে তাকে দেখে চিনেই বলেছিল—আপনি কুমড়ো নিবেন ?

সকৃতজ্ঞ হেসে সে বলেছিল—হ্যাঁ। বড্ড ভিড।

—আমাকে দিন। আমিও কিনব।

পযসা সে দিযেছিল। চাকবটি শুধু কুমড়ো কিনে দিযে ক্ষান্ত হর্যান, কুমড়োব ফালিটা তাব থলেতে ফেলে দিযে বলেছিল—আব কি নিবেন ? ভিড সবখানেই।

শ্যামলীব লজ্জা হযেছিল সামান্য বাজাবেব কথা বলতে। সলজ্জভাবেই বলেছিল—সামান্য বাজাব। একপো বেগুন, একপো আলু, শাক আব একপো ছোট কুচো মাছে— আব খানায। থাক, সে আমি কিনে নিচ্ছি। তুমি বেগুন আব আলুটা কিনে দাও।

পয়সা হাতে দিতে দিতে বলেছিল—তোমাব বাবু কুমড়ো খান নাকি ?

—বাবু নাই আজ।

—কোথায গেলেন ? নেমন্তন্ন ?

—না। কাল বাত্রে পুবী চলে গেল।

—পুবী ?

—হঁ। সনঝেতে বেবিযে গেল, একঘণ্টা পব ফিবে এল ট্যাক্সিতে —বললে বিছানা বেঁধে দে, পুবী যাচ্ছি। আবও সব বন্ধুলোক গেল।

একটু হেসেছিল শ্যামলী। আর্টিস্ট লোক। বোজগাব ভালই কবেন, যাবেন নাই বা কেন ? জিনিসগুলি কিনে এনে চাকবটি যখন দিলে—তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবেই সে বলেছিল—কি উপকাব যে কবলে তুমি।

—কি কবলাম ?

—অনেক উপকাব কবলে। তোমাব নাম কি ?

—হবি। বাবু বলে হবিযা। একটু হেসে মৃদুস্ববে বললে—মাঝে মাঝে হবিযা বাজা।

—খুব ভালবাসেন বাবু। না ? তুমিও বাসো।

—বাবু যে খুব ভাল লোক।

—বড়লোক। ছবি এঁকে অনেক পয়সা পান। না ?

—তা পায। তবে খুব খবচ কবে।

—কেন ? ওঁব স্ত্রী বাবণ কবেন না ?

—বাবু তো বিয়ে কর্বেনি।

—বিযে কবেননি ?

—না। উ আব বিয়া কববেও নাই।

চুপ করে গিয়েছিল শ্যামলী। তাকে চুপ করে থাকতে দেখেই হরিয়া বলেছিল—আমি যাই।

—আচ্ছা। তুমি বড় ভাল লোক।

সে হেসে চলে গিয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল শ্যামলী। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল— সে দাঁড়িয়েই আছে। ব্যস্ত হয়ে সে মাছ কিনতে এগিয়ে গিয়েছিল।

সেদিনই সাড়ে তিনটের সময় হরিয়াকে দেখেছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে বলেছিল—দাঁড়িয়ে আছ ?

— হ্যা আপনি যাচ্ছেন ?

তারপর তিনদিন আর দেখা হয়নি। বাজারেও না —বাসার বাইরের বারান্দাতেও হরি দাঁড়িয়েছিল না। আজ হঠাৎ দেখলে, আনন্দ রায়ের শোবার ঘরের জানালা খোলা। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আপনা আপনি।

আবার চলতে শুরু করলে। খোঁজ করে যাবে ? বলবে, আশ্চর্য মানুষ আপনি ? চোখের ওই কাটাকুটো নিয়েই চলে গেলেন ? আর কিছু নয়, চোখ জিনিস তো! কিন্তু ?

কিন্তু কি ভাববেন, কি বলবেন ?

আবার সে দাড়াল। ছাতাটা একটু উপরে ঠেলে দিয়ে সর্বাগ্রে পিছনের দিকে তাকালে। বেশি ভয় তার নিজের পাড়ার পরিচিত লোকদের। নেই কেউ। সামনেও না, পাশে পার্কটাতেও না। সামনে অনেক দূরে দু'জনে আসছে। গ্রীষ্ম এই ক'দিনেই বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ নরম হয়েছে। মাঝে মাঝে চটির তলায় কিছু যেন নরম নরম অনুভব করছে। যাবে ? চলতে চলতে তার দ্রুত চলন মন্থর হয়ে এল। কিন্তু বুকটা স্পন্দিত হচ্ছে দ্রুততর গতিতে। না যাবে না, থাক! গলাটা তার যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেছে।

* * *

আনন্দ রায় ঘরে ইজিচেয়ারটায় শুয়েছিল। ঘরের পাল্লাহীন দেওয়াল-আলমারির বইয়ের মাথায় বসে চড়ুইটা ডাকছে চ্রি রি ক। বেশ একটুক্ষণ ছেদের পর আবার চ্রি রি ক। বইয়ের তাকের মাথায় পা দুটো সম্পূর্ণ ভেঙে একেবারে বুক পেতে বসে আছে। সম্ভবত ওইটেই ওদের শোওয়া। দুপুরে পাখিরাও বিশ্রাম করে। পত্র-পল্লবের মধ্যে এমনি করে বসে নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে থাকে। ইনি ঘরটাকে কিংবা আনন্দকে ভালবাসে। এখানে এসে নিরাপদ স্থানটি আবিষ্কার করে জেঁকে বসেছেন। খেয়াল ঠিক নয়, ওরা ঘরের আনাচ কানাচ, দেওয়ালের ফোঁকর-ভেন্টিলেটার, পাড়াগাঁয়ে চালের ছাঁচে, এমন কি ঘরের মধ্যে আলমারির তাকে বইয়ের মাথায় জায়গা বেছেছেন দেখছে আনন্দ।

পুরী থেকে ফিরে ঘরে ঢুকবার সময়ই ওর কথা মনে হয়েছিল প্রথম। চড়ুই

প্রেয়সী আছেন তো! না এই ক'দিনের অদর্শনেই অধিকাংশ সময় জানালা বন্ধ দেখে সরে পড়েছেন! সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ওই পুরনো পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কালো মেয়ে! একটু হেসে নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করছিল—প্রেমে পড়লে যে! পুরীতে এ ক'দিন সমুদ্রতীরে এ নিয়ে অনেক সরস পরিহাস-মুখর ঘণ্টা কেটেছে তাদের। আজও নিজেকে পরিহাস করলে না, এ সময় তাকে কোথায় পাবে?

ঘরে ঢুকে চড়ুইটার কথা জিজ্ঞেস করতে হয়নি। হরিয়া ঘরের জানালাটা খুলে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে খোলা জানালাটার মাথায এসে বসে তাকে অভ্যর্থনা করেছে—চিরিক। চিরিক। চিরিক। চিক-চ্রিক-চ্রিক!

আনন্দ বলেছিল—এই যে! এসেছ।

হরিয়া বেডিংটা খুলছিল। সে মনিবের কথায় তার দিকে তাকিয়ে মনিবের দৃষ্টি এবং চড়ুই পাখিটাকে দেখেই বলেছিল—ভারী জ্বালাচ্ছে পাখিটা! খড-কুটো আনছে—

—খড়-কুটো আনছে?

—হ্যাঁ। ফেলে দি রোজ, আবার দেখি আবার এনেছে। ওই আলমারির বইয়ের মাথায় জড়ো করে। আজ সকালেও ফেলে দিযেছি।

পাখিটা ছোট পাখার ফ্ররর্ শব্দ করে গিয়ে বইয়ের মাথায বসল। একবার ঠোঁট ঠোকরালে। নাচনের মতো বার কয়েক লাফিয়ে লাফিযে চাবপাশ ঘুরে ফ্ররর্ করে বেরিয়ে গেল। আনন্দ হরিয়াকে প্রশ্ন করলে—ঘরে ঢোকে কি করে? জানালা খুলে রাখিস নাকি?

—সকালে একবার খুলি, খানিকক্ষণ খুলে রাখি, আর খুলি একবার সন্ধার সময়। তখন জানালা দিয়ে আসে। আর বন্ধ থাকলে কি হবে ওই যে পিছন দিকের দেওয়ালে ভারার বাঁশের গর্তটা ইপার উপার ফুটা রইছে, পলেস্তারার সময় বন্ধ করেনি—ওই ফাঁক দিয়া ঢুকছে।

ফ্ররর্ শব্দ করে চড়ুইটা ঘরে ঢুকে জানালার মাঝখানের আড়ার পাটির উপর বসলো। মুখে একটা লম্বা শুকনো ঘাস। তারপর সটান গিযে বসলো আলমারির মাথায়।

—ওই দেখেন—আবার আনিছে। ধ্যাৎ-ধ্যাৎ!

—থাক।

—নোঙরা করেছে।

—করুক।

পাখিটা বইয়ের তাকের মাথায় কুটোটা রেখে ঠোঁট এবং পায়ের নখ দিয়ে কারিগরী করে বিছিয়ে ডেকে উঠল—চ্রি-রি-ক। চ্রি-রি-ক।

তারপর ফ্ররর্ শব্দ তুলে উড়ে গেল। আনন্দ ইজিচেয়ারটায় বসে হেসে একটু একটু দোল খেতে লাগল। ক্যাম্বিসের ডেক চেয়ারটা একটু নতুন ধরনের, রকিং চেয়ারের মতো দোলে।

হরিয়া চলে গেল চা আনতে।

আবার পাখিটা এল, এবারও একটা সরু কাঠি। আবার উড়ে গেল। আবার এল ঘাস নিয়ে। আবার গেল। প্রতিবারই ডেকে কিছু বলে গেল।

হেসে আনন্দ বললে—কি বলছ? ইনকিলাব জিন্দাবাদ! না ভালবাসি তাইতো আসি! তা এস! যখন একদিন তোমাকে নারীমুখ দেখে তুমি নারী বলে টিপে আছড়ে মারতে গিয়ে মারিনি, তারপর দুপুরটা জবরদস্তি করে বন্ধ ঘরে আটকে রেখে কলঙ্কিনী করেছি তখন মানতে হবে তোমার ঘর বাঁধার দাবি।

পাখিটা চিক-চিক-চিক করে ডাকছিল। এবার একটু চুপ করে ওই বইয়ের মাথায় জিরিয়ে নেবার জন্যে বুক পেড়ে বসল। বসে ডাকলে চিনিক চিনিক। শান্ত অথবা ক্লান্ত ডাক। পুরীর কথা মনে পড়ে গেল।

পুরীতে একদিন সমুদ্রের ধারে চড়ুই এবং ওই কালো মেয়ে, ওর নাম দিয়েছে ও কৃষ্ণা, ওদেব গল্প বলেছিল। কৃষ্ণাকে নিয়ে পরিহাস করছিল নীরদ। যশোদাদা বলেছিলেন—দেখ নীরদ তোকে গল্পের প্লট দিচ্ছি—লেখ দেখি, দের্খবি ফু দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবি। কিন্তু তুই কি লিখবি?

—বলুন না। নিশ্চয় লিখব মনে লাগলে।

—মনে লাগবে না।

—কি করে জানলেন?

—চীন আসবে যে গল্পে।

আনন্দ বলেছিল—বলুন আমি লিখব। নীরদ না লিখুক।

—পারবি? তুই পেন ইঙ্কে ছবি এঁকে গল্প কর।

—আগে বলুন।

—ধর, চীনে হুকুম হয়েছে চড়ুই বরবাদ। বিলকুল মার ডালো। কেমন? এখন একজন শিল্পীর ঘরে একটা চড়ুই এসে ঢুকেছে। অবিশ্যি আর্টিস্টের অজ্ঞাতসারেই। পাক্কা রাষ্ট্রভক্ত। নীরদের মতো আধা নয়। তারপর সে একদিন দেখতে পেল চড়ুইটাকে। কিন্তু মানুষ তো। রাত্রের অন্ধকারে চড়ুইটাকে মারতে গেল—কিন্তু কি হলো, মারতে পারলে না। কি হলো মানে—দেখতে পেল তার বাসায় দুটি ডিম। সে তখন একটা ছোট্ট খাঁচায়—চড়ুই-এর ডিমসুদ্ধ বাসা তার সঙ্গে চড়ুইটাকে পুরে দিয়ে লুকিয়ে রাখলে। খেতে দিত—জল দিত। কিন্তু ছোট্ট খাঁচাটার একটা কাঠির শলা ছিল পচা। সেটা ভেঙে সে একদিন বেরিয়ে পড়ল। বাইরে পল্টনের লোক মারবার জন্য তাড়া করতেই—ধর এয়ারগান ছুঁড়তে সেটা মিস্ করল। পাখিটা উড়ল। একেবারে তোর চড়ুইয়ের মতোই উড়ে এসে ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তখন সেপাইরা ঢুকল আর্টিস্টের ঘরে। খুঁজে দেখতে গিয়ে বের করলে খাঁচাটা। খাঁচায় তখন আর একটি চড়ুই নয়—তখন দুটি বাচ্চা হয়েছে। বুঝলি। তার খাঁচা এবং আর্টিস্টকে ধরে নিয়ে গেল। হুকুম হলো আর্টিস্টকে—তুমি মার নিজে হাতে। সে বললে—না পারব না। হুকুম হলো—শুট্ হিম।

নীরদ বলেছিল—এটা কি গল্প হলো ? অ্যামেরিকায় লিখে পাঠাও যশোদাদা—, ইংরেজী ভাল লেখো, ওরা লুফে নেবে এবং মোটা টাকা দেবে।

আনন্দ বলেছে—আমি লিখব বা ছবিতে গল্প বলব। তবে উইথ সাম অল্টারেশন। সেটা হলো—কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প। গল্পটা বলছে বন্দী আর্টিস্ট—ছেঁড়া কাপড় পাতলুন। এ্যাঁ ? এবং শেষটা হচ্ছে—সে যখন না বলছে—তখন হুকুম হলো পাঁচ বছর হার্ড লেবার কন্‌সেন্‌স্ট্রেশন ক্যাম্প।

পুরীর প্রমোদ পর্বটায় কিন্তু এতেই ছেদ পড়ে গেল হঠাৎ। মধ্য রাত্রে দুর্ঘটনায বাসর ভাঙার মতো। নীরদ ক্রুদ্ধ হয়ে আনন্দকে বললে—দেখ না তোর ওই কৃষ্ণা তোকে নিয়ে কেমন একখানা ঝাড়ি, দেখবি। তোদের এই পচা সমাজ—একেবারে খুলে দেব পর্দা।

সূত্র এ থেকেই।

বাদানুবাদ থেকে শেষ পর্যন্ত আনন্দ একটা ঘুষি মেরেছে নীরদকে। নীরদ রোগা প্যাকাটি কুঁজো।— সামান্য মদ খেলেই কাত হয়ে পড়ে এবং চেঁচায়।

পড়ে পড়েও সে কৃষ্ণাকে গাল দিচ্ছিল পেটি বুর্জোয়া ঘরের হার্লট বলে। গোড়ায় মদের নেশার ঘোরে এবং রসাধিক্যে বলে ফেলেছিল কতকগুলি লোভাতুর কুৎসিৎ কথা। যার মধ্যে খানকি শব্দটাও ব্যবহার করে ফেলেছিল। আনন্দ সহ্য করতে পারেনি। প্রথমে মেরেছিল এক চড়। তাতেও থামেনি নীরদ—তখন মেরেছে ঘুষি।

এরপরই পালা ভাঙল।

আনন্দই বললে—আমি আজই চলব যশোদাদা।

যশোদাদাও অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—সবাই। আজই সন্ধেতে, এক্সপ্রেসে না হয়—প্যাসেঞ্জারে। জগন্নাথ মন্দির একবার যাবি নাকি ?

আনন্দ বলেছিল—না।

আজ ভোরে এসে নেমেছে।

হরিয়া চা নিয়ে এল। আনন্দ একটু পাঁউরুটির টুকরো গুঁড়ো করে বইগুলোর মাথায় ছড়িয়ে দিলে। তারপর খেতে বসল।

চড়ুই ফিরে এসে পাঁউরুটি গুঁড়ো পেয়ে খেয়ে লেজ নাচাতে লাগল। অথবা ঠুকরে খেতে গেলেই ওর লেজ নাচে।

রাত্রে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ঘুম হয়নি। তবুও জানালাটা খুলেই শুয়েছিল আনন্দ। পাখিটা তখনও ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে—নীড় নির্মাণে ব্যস্ততার ব্যগ্রতার ওর সীমা নেই। সম্ভবত ডিম পাড়ার সময় খুব কাছে এসেছে। দেওয়ালের ওই ছিদ্রটা দিয়ে কুটো ঘাস মুখে নিয়ে আসায় নিশ্চয় অনেক অসুবিধে।

কিন্তু গরম হাওয়ার জন্য নিজের অসুবিধে কম হয়নি। ঘুমটা ভেঙে গেল পৌনে তিনটেতেই। পাখিটাও বাসায় বুক পেড়ে শুয়ে ঘুম ভেঙে উঠেছে। ডাকছে—মৃদু শান্ত ক্লান্ত বিষণ্ন কণ্ঠে—চিনিক, চিনিক। অনেকক্ষণ বাদে বাদে। কালো মুগদানার

মতো চোখ দুটো কখনও খুলছে আবার বন্ধ করছে। নিদ্রাজড়িমা জড়িত নয়নে চাচ্ছেন শ্রীমতী।

ঘড়ির দিকে তাকালে আনন্দ—দুটো আটচল্লিশ।

আনন্দ পাখিটাকে বললে—কি ? কি বলছ ? তোমার কথা তো অনেক শুনলাম। তার কথা বল কিছু। তুমিই তো দূত ! সে আসছে ! ভালো আছে তো ? কাল এসেছিল ?

চিনিক চিনিক। তারপর ভাঁজা পা সোজা করে উঠে বার দুই গা ঝাড়া দিয়ে সরব বা সহজ চ্রিরিক-চ্রিরিক-চ্রিক—ডাক দিয়ে সোজা টানে ফ্ররর্ শব্দ তুলে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

আনন্দ উঠে জানালার কাছে দাঁড়াল।

রোদে ঝাঁঝ হয়ে তাপ বেড়ে আজ নিশ্চয় একশোর উপরে। দেবদারুর কচি পাতাগুলো আম্‌লে গেছে। এই ক'দিনের মধ্যে শিমূল জাতীয় গাছগুলোর অনেক ফুল ঝরে গেছে, দু'-চারটে শুকনো-দেখতে ডালের ডগায় কচি পাতা বেরিয়েছে। রাস্তায় কেউ নেই। গরম হাওয়া মুখে লাগছে। ক'দিন পুরীর পর এখানে রোদের উত্তাপ বিশ্রী রকম ঝলসানো মনে হচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। দুটো পঞ্চাশ। সে ফিরে এসে আবার চেয়ারে শুলো। চোখ বুঁজলো।

নাঃ। শুয়ে থাকা যায় না। ক'দিনের ছুটির পর আজ কাজের তাড়া ছেলেবেলায় ইস্কুল টাস্কের মতো তাগিদ নিয়ে এসেছে। উঠে সে রঙ তুলি কাগজ নিয়ে বসল—উইলিযমসের কাজ দিতেই হবে।

চ্রিরিক। চ্রিক। চিরিক। পাখিটা আসছে যাচ্ছে।

টং—টং—টং। চ্রিক। চ্রিক! আনন্দ সকৌতুকে ঘড়িটার দিকে তাকাল। হেসে উঠল। চড়ুইটা হেরে গেছে। বাজনা শেষ হবার পর গিয়ে বসেছে ব্র্যাকেটে! ডাকছে—চ্রিক চ্রিক-চ্রিক। তাকিয়ে আছে ঘড়িটার দিকে। আর বাজছে না। বেচারা! কয়েক মুহূর্ত ব্যর্থ অপেক্ষা করে সে উড়ে গেল—চিব্রিক।

আবার একবার উঠল আনন্দ। নাঃ। ওই শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নাঃ। এই তো তিনটে। সে ফিরে এসে বসল আবার। আঁকতে লাগল।

পাকস্থলীর ছবি আঁকছিল মাল্টিভিটামিনের জন্যে। সেটাকে সরিয়ে দিলে। নতুন কাগজ নিয়ে আঁকতে লাগল। মাদারস টনিক। একটি মেয়ের কোলে একটি ছেলে—স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। সাঁওতাল মেয়ে আঁকবে। কালো মেয়ে—মুখখানা ঠিক কি মনে পড়ছে ? যা পড়ছে তাতে তো কালো কুরূপা বলে মনে হচ্ছে না। তাই আঁকবে সে। তুলির টান দিয়ে সে হঠাৎ গুন্‌গুনিয়ে গান ধরে দিলে—'দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কালো ? তা সে যতই কালো হোক।'

হঠাৎ বাইরে সশব্দে কিছু পড়ল। চেয়ার একখানা ? কে ফেললে ? বারান্দার দিকের জানালাটা সে খুলে ফেললে। বাইরে এই ঝাঁঝেই দেওয়াল ঘেঁষে হরিয়া ঘুমুচ্ছে। চেয়ারখানা উল্টে গেছে, আর তার পাশেই পা হাত দিয়ে চেপে ধরে নুয়ে পড়েছে কালো মেয়েটি। হাতের ছাতাটা পাশে পড়ে আছে। বেশ লেগেছে তাতে সন্দেহ

নেই। জানালা খোলাব শব্দ পেযে, মুখ তুলে আনন্দকে দেখে তার মুখ হয়ে গেছে ধরা পডা চোবেব মতো। তবু হাসতে চেষ্টা কবছে।

আনন্দ ব্যস্ত হযেই বললে—লেগেছে খুব ? কোথায় লাগল ?

সে অপবাধীর মতো বললে—পাযে লেগে চেযাবখানা উল্টে গেল।

আনন্দ বললে—হবিযাটা একটা ইডিযট। এমন সামনে চেযাবগুলো বাখবে! এই হরিযা! এই!

হবিযা উঠে বসল।—অঁ।

আনন্দ ঘুবে সামনেব ঘবেব দবজা খুলে বেবিযে এসে বললে—কোথায লেগেছে ?

—হাঁটুতে চেযাবখানাব কোণাটায লেগে গেল। দোষ আমাবই। বলে সে চেযাবখানাকে তুলতে গেল। আনন্দ কেডে নিযে নিজে তুলে বললে—এখনও কন কন কবছে ?

ম্লান হেসে মেযেটি বললে—কম লেগেছে। বলে সে হাত ছেডে দিয়ে দাঁডাতে চেষ্টা কবেই একটি ছোট উঃ শব্দ কবে আবাব চেপে ধবলে পা খানা!

আনন্দ বললে—ও লোহাব চেযাবেব কোণ লেগেছে হাঁটুতে। দেখুন তো বিপদ! হাঁটু জাযগাটা ভাবী খাবাপ। ভঙ্গ তো ছোট ছোট হাড থাকে। ভেঙে না গিযে থাকলে হয। হবিযা, তুই চট কবে গিযে খানিকটা ববফ নিযে আয তো। আপনি ভেতবে এসে বসুন।

—থাক, এইখানেই বসছি আমি।

—না না। এখানে বসবেন কি ? এই তো সামনে বসবাব ঘব। এখানে কি গবম দেখছেন!

হেসে শ্যামলী বললে—এই গবমে আমাকে বোজ বেরুতে হয, গবমে কষ্ট হয না আমাব।

—হয। আপনাবও হয। সহ্য কবেন। আজ আমাব এখানে এসে হাটুতে লাগালেন, আব বাইবে বসবেন সে হয না। তাছাডা এখানে বরফ ঘষবেন কি টিপবেন বাস্তায় লোক জমবে। চলুন ভেতবে চলুন।

আব আপত্তি কবলে না। শ্যামলী আস্তে আস্তে খুঁডিযে পা ফেলে এসে ঘবে ঢুকল। আনন্দ বললে—ধবব ?

প্রায যেন আর্তস্ববে শ্যামলী বলে উঠল—না—না—না। দোহাই আপনাব। আনন্দ ধবল না বটে কিন্তু শ্যামলী ঘবে ঢুকবামাত্র ড্রইংরুমে বেতেব সোফাসেটেব একখানা চেযাব ঠেলে এগিযে এনে সামনে ধবে বললে—বসুন। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আঘাতটি সামান্য হযনি। বসুন।

শ্যামলী তা অনুভব কবছিল। বিনা বাক্যেই সে চেযাবখানায বসতেই আনন্দ বললে—পা দুটো একটু তুলে আলগা কবে বাখুন, আমি টেনে ভিতবে নিচ্ছি। এটা একেবাবে দবজাব সামনে।

শ্যামলী ধীরে ধীবে কেমন হযে যাচ্ছে। এমন সমাদব কেউ তাকে কবে না।

সে সামান্য ক্যানভাসার। সে একটি শ্রীহীন কালো মেয়ে। সে অর্ধশিক্ষিতা নিতান্ত সামান্য ঘরের মেয়ে। এত সমাদর তো কেউ করেনি। তরুণের দল পাড়ায় তাকে ব্যঙ্গ করে, অশ্লীল ইঙ্গিত করে, পাড়ার বাইরে ভদ্রবেশী তরুণ প্রৌঢ়রাও পিছন নেয়—ইঙ্গিত করে। তাতে সে অভ্যস্ত—এতে সে অভ্যস্ত নয়। বড় অস্বস্তিবোধ করছে সে। আবার কি যে ভালো লাগছে। ডান হাতে হাঁটুটা চেপে ধরে সে বসে রইল মাথা হেঁট করে। মাথা সে তুলতে পারছে না আনন্দের চোখে চোখ পড়বে বলে। মধ্যে মধ্যে তার কান্না পাচ্ছে।

আনন্দ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তার চুলের রাশির দিকে। একরাশি রুক্ষ কালো চুল। ফেঁপে ফুলে—তার অবনত দেহখানাকে ঢেকে রেখেছে। ভাল লাগছে। তার জীবনে এ এক নতুন স্বাদ। একটি মেয়েকে এমন কাছে পাওয়া নতুন নয়! কিন্তু এমনভাবে এই করুণা, এই স্নেহের সঙ্গে কাছে পাওয়া নতুন। তার মনের প্যালেটে কালো রং আর সাদা রং যেন মিশে নতুন রঙ হচ্ছে। আকাশের মতো নীল রঙ হয়ে উঠেছে। কখনও বেশি কালো পড়ে কালচে হচ্ছে। কখনও সাদা বেশি এসে তাকে চোখ জুড়ানো নীলাভ করে তুলছে। হঠাৎ একসময় সে তার মাথায় হাত দিল। চমকে উঠল শ্যামলী। আনন্দ বললে - যন্ত্রণা খুব বেশি হচ্ছে ?

মাথাটা না-এর ভঙ্গিতে দুলে উঠল।

-- তবে এমন করে বসেছেন ? মনে হচ্ছে যেন যন্ত্রণা হচ্ছে সেটা দেখাতে চাচ্ছেন না।

এবার ম্লান হেসে মুখ তুললে শ্যামলী। মনোরম মিথ্যা এমন সুখের আনন্দের পরিবেশে বোধ হয় মন জুড়িয়ে দেয়। যাতে সবটাকে আরও মধুর করে তোলে। এক্ষেত্রে আনন্দের করুণাই শ্যামলীর কাছে সে মাধুরী উৎস- মধু। সে বললে—-ভাবছি আজ আর কাজে যেতে পারব না। হয়তো দু'-তিন দিনই আটকে থাকতে হবে। যেখানে কাজ করি সেখানে তারা কি বলবে ? ম্লান হাসিটুকু আরও একটু বিষণ্ণতায় যেন সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো মনে হলো।

- --পা-খানা ধরে একটু টেনে দেব ? হয়তো কমে যাবে।

—-না— না।

হরিয়া বরফ নিয়ে এল।-- বরফ এনেছি।

আনন্দ বললে—ভেঙে নিয়ে আয়। আর তোয়ালে দে।

শ্যামলী হঠাৎ বলে উঠল— আপনার ঘরখানি এত সুন্দর করে সাজানো।

—ভাল লাগছে ?

—খুব। এমন আমি দেখিনি।

—-অথচ খুব সহজ। সস্তাও খুব। খরচ বেশি নয় মোটেই। রূপ উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, তাকে পরিচ্ছন্নতায় সাজানো। এই যে আজ আপনি পাড়হীন সাদা কাপড়খানি পরেছেন আর জরদা ব্লাউস—এতে যে আপনাকে সুন্দর লাগছে, একখানা বেনারসী পরলেও তা লাগত না। আপনার নিজের তো সে রুচি রয়েছে।

শ্যামলীর মুখখানা কেমন দেখালো সে শ্যামলী জানে না, কিন্তু সারা অন্তর তার শরতের অজস্র সাদা ফুলে ভরা মালতীলতার মতো হয়ে উঠল। একটা মালতীলতার গাছ তাদের বাড়িতে আছে উঠোনের কোণের গাছটাকে জড়িয়ে।

আনন্দের কিন্তু ভারী ভাল লাগলো। মেয়েটির তো আশ্চর্য একটি লুকনো শ্রী আছে। কিছুটা পুষ্টি আর কিছুটা মার্জনা প্রসাধন হলে ও সত্যিই সুন্দর মেয়ে। চোখ দুটি সরু কিন্তু টানা। ভারী সুন্দর। কিন্তু হরিণ চোখ নয। এ চোখ নারীব! হরিণেরও নয় পুরুষেবও নয। খানিকটা লাল রঙ—দেহে রক্ত পুষ্টি—আব খানিকটা নীলাভ সাদা রঙ।

হবিয়া একটা গামলায় বরফ ভেঙে নিযে এল, তোযালেটা চেযারের হাতায নামিযে দিলে। আনন্দ বললে—ঘরের দরজা বন্ধ করে দে হরিয়া। আমরা বাইবে যাচ্ছি। আপনি বরফটা ওখানে ঘষুন। কেমন? দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে।

আনন্দ নিজের শোবার এবং কাজ কববার ঘবে এসে জানালার ধাবে দাঁড়ালো। মনটা খুশিতে ভরে আছে। বাইবে অপরাহ্ণ নামছে। কাক শালিক পথে নেমেছে, আকাশে উড়ছে, ইলেকট্রিক তারে বসেছে। ডাকছে। চড়ুইগুলোব অজস্র কিচকিচিনিতে ভরে দিযেছে আশ-পাশ। তিনি কই? তিনি! দূতী? নাঃ, সে ঘবে নেই। ঢং ঢং করে চারটে বাজল। ঘরের মধ্যে পাখাব শব্দ হলো না, ঘড়ির কাঁচে ছোট ঠোঁটের ঠোক্কর উঠল না, ক্রিরিচ—ক্রিচ-ক্রিচ শব্দ কবে কেউ ডাকল না। সে নেই। আরে আবে এই যে, তার কানেব পাশ দিযে পাখাব ফ্ররর্ শব্দ হলো। তাব সঙ্গে ক্রিরিচ। তার পিছনে আর একটা। গলায কালো ত্রিভুজ। সেটা জানালার ধার পর্যন্ত এসে আনন্দকে দেখে গোঁত্তা খেযে ঘুরল। সামনেব ইলেকট্রিক পোস্টের উপর বসে লেজ নাচিয়ে ডাকতে লাগল। ঘরের মধ্যে দূতী তখন আপন বাসায গিয়ে বসে ডাকছে ক্রিচ-ক্রিচ—। ওর তাড়ায পালিয়ে এসেছে। ওটা পুরুষ।

তাব অন্তব বঙটা কেটে দু'ভাগ হযে যাচ্ছে। তারই মধ্যে সে চিন্তায মগ্ন হযে গেল। কত এলোমেলো চিন্তা কল্পনা। সামনেব বাস্তায তখন লোক চলাচল শুরু হযেছে। কিন্তু সে আনন্দের চোখে পড়ল না। ঘরেব মধ্যে থেকে পাখিটা বেরিয়ে গেল, আবার এল, আবার গেল। সেদিকেও তার মন আকৃষ্ট হলো না। খেলাটা অর্থহীন। না। অর্থ আছে একটা। এই তো জীবনেব স্বরূপ! এর উপব এত নানারকম রং চড়ানোব কিছু মানে আছে? একবার মনে হয, নেই। একবার মনে হয়, আছে। না—নেই। মানুষই চড়িযেছে। মানুষই সেটা ধরে ফেলেছে। তার মনে সাদা কালোয় মিলে যে শূন্য আকাশের নীল অলীক রহস্যের সৃষ্টি করেছিল সেটা কেটে যাচ্ছে।

—হরি! হরি!—ওঘর থেকে মিষ্ট নারী কণ্ঠের সসঙ্কোচ ডাকে আনন্দের চিন্তা ভেঙে গেল। সে এসে ও-ঘরেব ও এ-ঘরের মধ্যের দরজাটায একটু শব্দ করে বললে—ডাকছেন? ভিতরে যাব?

—হ্যাঁ! আমি এইবার যাব।

দরজাটা খুলে আনন্দ ঘরে ঢুকল। বললে—কমল ব্যথা?

দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলী। হেসে বললে—খুব কমে গেছে। দেখছেন না উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি! দু' পা ফেলে বললে—একটু খোঁড়াতে হচ্ছে কিন্তু চলতে পারব।

—চলতে পারবেন হয়তো, কিন্তু চলবেন না!

—আপনি আমাকে আপনি বলছেন আমার কিন্তু ভারী লজ্জা করছে। আপনি বড়, সবদিক দিয়ে। আপনার মতো ভালো লোক আমি দেখিনি! পরের জন্যে—কে আমি কোথাকার নগণ্য মেয়ে—তাকে যে যত্ন করলেন—

—এই দেখুন! সেদিন আমার চোখে দু'ফোঁটা রক্ত দেখে যে উৎকণ্ঠা আর মমতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন—এ তার থেকে বেশি নয়।

—কি বলছেন! কি করেছিলাম আমি?

—সুযোগ পেলে হয়তো করতেন।

—তা করতাম। এবং নিজেকে ধন্য মানতাম। আপনি একজন শিল্পী। কত বড মানুষ!

—কত বড মানুষ! সেও মেপে ফেলেছেন?

—ফেলিনি? ও মাপ কি লুকোয়? হাতের চড়ুই পাখিটা? একটা চড়ুইয়ের ওপর এত করুণা। আমি দেখিনি শুনিনি।

হেসে আনন্দ বললে—সে আমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে। দেওয়াল আলমারির পাল্লা নেই, বইয়ের থাকের উপর সে খড়কুটো এনে দিব্যি গেড়ে বসেছে।

—সত্যি?

—দেখবেন?

—না। দেখবে বললে তবে দেখব।

—আচ্ছা এস, দেখ। সে হয়তো ঘরেই রয়েছে।

চড়ুইটা ঘরে ছিল না। আনন্দ দেখালে—ওই দেখে বইয়ের মাথায় খড-কুটোর গাদা।

—তাই তো।

চড়ুইটা কুটো মুখে এনে তাদেব পাশ দিয়ে পাখার শব্দ করে উড়ে গিয়ে বাসায় বসল। শ্যামলী বললে—ও মা! তারপর বললে—যে সুন্দর সাজানো ঘর, আর ঘরের মালিকের যে দয়া তাতে ও লোভ সামলাতে পারেনি।

যাবার সময় আনন্দ বললে—আজ থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু।

—বন্ধু! আবার তেমনি শ্রী ফুটে উঠল তার মুখে। আপনি বন্ধু, আমার?

—বাধা কি? আপনার খারাপ লাগে?

—না।

—তবে?

মুখখানা এবার একটু নত হয়ে পড়ল। হাসলে। ম্লান হাসি। বললে—এখানকার লোকদের আপনি জানেন না। তারা—

—লোকের কথা সবখানে সমান। এখান-সেখান নেই। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কি ? ও গ্রাহ্য করলে জীবনে শুধু না-পাওয়ার দুঃখই বোঝা হয়।

—তা বটে, তবে, বন্ধুত্ব হোক, জমুক তারপর হবে।

—আচ্ছা,—একটু হাসলে আনন্দ তারপর বললে—এবার আপনার নামটি বলুন।

—আমাকে আপনি নাই বললেন।

আনন্দও বললে এবার—বলব, বন্ধুত্ব হোক আগে। আপনার—একটা নাম আমার দেওয়া আছে। মাস দেড়েকের মধ্যে যেদিন বাড়িতে থেকেছি সেইদিনই আপনাকে ছাতায় মুখ ঢেকে যেতে দেখেছি। ছাতা দেখেই চিনতে পারি। চলার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। তার থেকেও আপনার চুলের শোভা দেখে মনে মনে তারিফ করি।

লজ্জায় আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল শ্যামলী। এমন সব কথা শোনবার ভাগ্য তার হবে এ তার কল্পনারও অতীত। সে যেন ভিতরে ভিতরে থর-থর করে কাঁপছে, স্পর্শাতুর লজ্জাবতী লতার মতো সব স্নায়ুগুলি নুয়ে পড়ছে। সে বললে--আমার নাম শ্যামলী।

আনন্দ বলতে গেল—আমি রেখেছিলাম সুকৃষ্ণা। কিন্তু বলতে গিয়েও বললে না। বললে—আমি রেখেছিলাম কাজল। ও নামটা আমার ভাবী মিষ্টি লাগে।

শ্যামলী আর একটু হেসে কোন কথা না বলে চলে গেল। সত্যিই কাজল নামটি ভারী মিষ্টি।

আনন্দ দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামলী একটু খুঁড়িয়ে চলছে। বেচারা কালো মেয়ে! আনন্দের সমস্ত অন্তরটা একটি আনন্দে ভরে উঠেছে। উল্লাস—পরিচ্ছন্ন উল্লাস। পুরীর ঘটনার পর ওর মন আজ অত্যন্ত সংযত।

সেই উল্লাসে সে এ-ঘরে এল। চড়ুই দূতীকে বলবে—তোমার দৌত্যের অপমান করিনি সখী। চড়ুই নেই। বাইরে কোথায় নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ বাইরে বেড়াবার জন্যে সে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠল। আজ সে যথেষ্ট পরিমাণে পান করবে। টাকা আছে। পুরী যাওয়ার সময় চেক দিয়ে যশোদাদার কাছে টাকা নিয়েছিল। বাবে যাবে।

কিন্তু হলো না। বেরুবার আগেই ঝড় এল। প্রবল ঝড়। সে সেজে বেরুতে যাচ্ছিল। আকাশের অবস্থা দেখে দাঁড়াল। ঝড় তখন দূরে উঠেছে—হু-হু করে আসছে। সে বসল বাইরে চেয়ারখানায়। পার্কের দেবদারু গাছের মাথাগুলো পুবমুখো হয়ে নুয়ে পড়ল। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। হরিয়া ছুটল জানালা বন্ধ করতে। হঠাৎ আনন্দ উঠল এবং ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললে—দাঁড়া-দাঁড়া। সে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে তাকালে আলমারির দিকে। ওই যে। চড়ুইটা বুক পেড়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। আলোর ছটা পেয়ে সেটা এবার ডেকে উঠল—সেই মৃদু স্বরের মিহি শব্দ—চিনিক্-চিনিক্।

আনন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বাইরে বসল। ঝড় দেখতে বসল। একটু পরে বৃষ্টি এল। বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। হরিয়া বললে—বাইরে বেরুবে না ?

—না। বৃষ্টির জলে ভিজে পিচের পথের উপর ওপারের রাস্তাটায় বাস কার চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। সামনের হেডলাইটগুলি জ্বলছে—নীচে ভিজে পিচের উপর তার প্রতিবিম্বও চলছে—দুটো আলো চারটে হয়েছে। পার্কের মধ্যে জমা জলে ছটা পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় সে চঞ্চল হয়ে উঠে ভাবলে—বেরুব। উৎসাহ সংগ্রহের জন্যে ব্রণমুখী ফিরিঙ্গী মেয়েটা কোন বার-টেবিলে বসে সিগারেট খাচ্ছে কল্পনা করতে চেষ্টা করলে। আবছা ঝাপসা ছবি উঠে উঠে মিলিয়ে গেল। শ্যামলীকে মনে পড়তে লাগল। কল্পনা করলে শ্যামলীর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে জেটীর উপর রেস্তোরাঁয় বসে গল্প করছে। শ্যামলীর মুখে পুষ্টির রক্তাভা, মার্জনা, প্রসাধনের শুভ্রতা। তার পরনে কি রঙের কাপড়? ফিকে জরদা ব্লাউস—গাঢ় লাল কি ফিকে নীল। না! ফিকে নীলাভ শুভ্র পাড়হীন শাড়ি-ব্লাউস, গাঢ় হলদে সোনার মতো নয়তো জরদা রঙের। শ্যামলীর সিঁথিতে কি— ? না, সুপ্রচুর ফাঁপানো রুক্ষ চুলের মাঝখানে সাদা টোয়াইন সুতোর মতো সিঁথি— সেখানে কোন দাগ নেই। বন্ধু এবং বান্ধবী। পার্কের ওপাশের রাস্তাটার বাঁকে কয়েকখানা কার বা ট্যাক্সি উত্তরমুখে ঢুকে বাঁয়ে বেঁকে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। দুটি করে আলো, ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল আলো। পরের পর। পরের পর। রাস্তার জল শুকিয়েছে। তবু পিচের উপর আভা পড়ছে লম্বা হয়ে। পার্কের ভিতরে ভিজে ঘাসে জমা আলোগুলো জেগে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় মনে হলো—না। এ ভালো লাগছে না।—ওরে হরিয়া। তুই যা একবার, রিক্‌সা ট্যাক্সি যা পাস নিয়ে আয়। শ্যামলী কাজল থাক, সে আনন্দ উল্লাস কিন্তু বার ভিন্ন হয় না। বৃষ্টিতে বারের আসব জমে ভাল।

দুই

সেদিনও বৃষ্টি হয়েছিল। চার মাস পর। বর্ষার বর্ষণ। তবে কলকাতার রাস্তা জলে ডুবে দুর্গম দুস্তর পারাবার হয়ে ওঠেনি। আকাশে কিন্তু মেঘ এসেছে সেজেগুজে। নিবিড় কালো মেঘ। আনন্দ ট্যাক্সি করেই ফিরল। রাত্রি তখন এগারটা বেজে গেছে। গাড়িটা পার্কের পুব মাথায় ঢুকে পশ্চিম দিকে ধনুকের ভিতর দিকের বাঁকের মতো রাস্তাটার মোড় নিচ্ছিল, আনন্দ বললে—নেহি সর্দারজী, ডাহিনাসে সিধা চলিয়ে।

আনন্দের কণ্ঠস্বর জড়িত। মদ খেয়েছে।

কিছুদূর উত্তরমুখে এসে বাঁয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে বাসায় উঠবে। মোড়টায় এসে সে বললে—রোখিয়ে তো।

—হিঁয়েই উতরেঙ্গে সাব?

নামতে গিয়ে আনন্দ অনুভব করলে পায়ে জোর কম হয়ে পড়েছে। মদ বেশি খেয়েছে। শুধু তাই নয়, মদ বেশ কিছুদিন পর খেয়েছে। কিছুদিন মদ সে খায়নি। অনেকদিন পর কতটায় ঠিক থাকতে পারবে তা ঠিক বুঝতে পারেনি। এবং মেজাজে সে ক্ষুব্ধ ছিল, নিষ্ফল ক্ষোভ। রাগ হয়েছিল নিজের উপর। শ্যামলী! শ্যামলী তাকে

অপমান করেছে, তাকে ফেলে তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, নিষ্ঠুর কথা বলেছে। অপমানের এবং ব্যর্থতার ক্ষোভে সে একটা বারে বসে মদ খেয়েছে।

এই কয়েক মাসের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক গতিতে তারা অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছিল। সেই যেদিন শ্যামলীর পায়ে আঘাত লাগে তার পরদিন তার অনেক কাজ ছিল, বেরুনো উচিত ছিল বারোটার মধ্যে। বেরোযনি। চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। কালো মেয়ে কাজল—সে নাম দিয়েছে—তাব সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করেছে। না, বন্ধুত্বের চেয়েও কিছু বেশি তার তলায ছিল। জোড কলমের মতো। সনাতনই বল আর আদিমই বল একটি নারী এবং একটি পুরুষের মধ্যে চোখাচোখি হলে বিদ্যুতের গতিতে যে একটি অদৃশ্য শিহ্বন বযে যায পবস্পরের, অঙ্গের দিকে মনের দিকে চুম্বকের লোহা আকর্ষণের মতো সেই আসল গাছের মাথাটা কেটে স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা বন্ধুত্ব যে কোন একটাব ডাল কেটে বাঁধা হয। কোন ঝডে ওই জোড ভেঙে জোড়া দেওযা ডালটা যখন ভাঙে তখন আসল গাছটা ডাল মেলে গজায। ও গাছটা অক্ষয়বটের মতো, দূর্বাঘাসের মতো। ওর মৃত্যু নেই। জীবনই ওর শেকড। ওটা ছিল, অন্যে অস্বীকাব করে করুক, আনন্দ অস্বীকাব করে না। সে নতুন কালেব নতুন মানুষ, সে পুবনো কালের সব সংস্কারকে কাটিযেছে। সে ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলে। তবে হ্যাঁ, সে মানুষ। মানুষ মানুষীকে যেকালে বলপ্রযোগে অপহরণ করত সে কালকে অনেক পিছনে রেখে এসেছে। সে জয করে তাব মনকে আগে, মন দিতে এলে দেহ দিতে হয়। এখানে পাখি আর খাঁচা, ভ্রমরা আর সোনার কৌটো পৃথক নয। খাঁচা খুললে কৌটো খুললেও ওরা উড়ে পালায় না। সেদিন তাব করুণা সত্য, অকপটরূপে সত্য, তাকে যে কলুষিত বলবে সে ভ্রান্ত, তাকে যত্ন করাব মধ্যে তার শিক্ষা সত্য স্বভাবও সভ্য। একজন পুরুষ কেউ এমনভাবে হাঁটুতে লাগালে এমনিই যত্ন করত। তবে হ্যাঁ, সে মানুষী নাবী বলেই তাকে করুণা করে তাকে যত্ন করে অনেক বেশি খুশি—না শব্দটা খুশি নয—পুলকিত হয়েছিল। আগ্রহ অবশ্যই অনেক বেশি দেখিযেছিল। তাকে ভাল লেগেছিল, কালো মেয়েটির মধ্যে সে রূপ আবিষ্কার করেছিল শিল্পীর চোখে। এবং তার রুচি-পছন্দে সে রূপ ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে কথা বলে আরও খুশি হযেছিল। ওর কথার মধ্যে তার প্রতি গাঢ প্রশংসার মুগ্ধতা, তার নম্রতা, সব থেকে বেশি তার সরল মিষ্টতা, না তারও থেকে বেশি কিছু যেন—হয়তো তাব নাম অনুরাগ এবং নিজের বিনীত রূপ-গুণের দারিদ্র্যবোধ আনন্দের আরও ভাল লেগেছিল। স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর মতো নমনীয় ভঙ্গিগুলি। এ কার না ভাল লাগে? মেয়েটি সেদিন চলে গেল, বাড়ি ফিরে গেল; তারপর সারা বিকেল সে তার ভাবনা ভেবেছিল। তার মনে রঙের স্পর্শ লেগেছিল। কাজ না থাকলে বা কোন কাজের আগে রঙ তুলি নিযে সে কাগজে দাগের পর দাগ টেনে চলে, এ বঙ ও রঙ সে রঙ। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সময় কেউ যেমন আকাশে

তুলির দাগের উপর তুলির দাগ টানে, রঙ বদলায়, তেমনিভাবেই মনের আকাশে সে নানান রঙেব দাগ টেনেছিল।

মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় করেছিল আপন কল্পনার মধ্যে।

যেন সে পথে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছে তার জানালার সামনে—কি করছেন? আজ বাইরে বেরুননি? শরীর ভাল আছে তো? না, কাজ করছেন? ছবি আঁকছেন? কি ছবি আঁকছেন? সে বলেছে—আপনি কাল পায়ে লাগিয়ে গেলেন তাই দাঁড়িয়ে আছি, পথের দিকে চেয়ে রর্যেছি, দের্খছি আপনি বেরুতে পাবলেন কিনা।

—তাই নাকি! না না। আমি ভাল আছি। এই তো কাজে বেরিয়েছি। একটু কন্‌কন্ করছে। কাল এখান থেকে গিযে আরও অনেকক্ষণ বরফ ঘষেছি। মা রেগে খুন। বললে—সেঁক দে। আমি শুনিনি। এখানে উপকাব যা পেযেছিল'ম।

—দাঁড়ান না, তা হ'লে আমিও বের হই। একসঙ্গে যাই। আসুন না একটু বসুন, আমি তৈরী হযে নিই। চা-টাও খেয়েনি। হরিয়া দরজা খুলে দে। আর চা কর।

হরিয়া দবজা খুলে দিল। সে একটু ইতস্তত করেই এল ভেতবে।

ঢুকে বললে—যে সুন্দর সাজানো ঘর আপনার। আপনিই মন টানে। আচ্ছা ছবিগুলি তো সব আপনার?

—অধিকাংশই। দু'-একখানা বন্ধুবান্ধবেব আছে।

—এখানা?

- ওখানা আমাব।

—কি সুন্দর!

—দেখুন, সবগুলি—এঘব ওঘরে। বলুন সব থেকে কোন্‌খানা ভাল। আমি মুখ-হাত ধুযে পোশাক পবেনি।

আনন্দ পোশাক বাছাই করে। বেছে বেছে সাদা সিল্কেব হাফ-শার্ট আব গাঢ় নীলচে ডেক্রনের প্যান্ট নিযে বাথরুমে চলে গেল।

ঘবে চড়ুই পাখি বাসায় বসে আছে, এখনও তাব দিনের বিশ্রামেব জড়তা ভাঙেনি। মৃদুস্ববে থেমে থেমে ডাকছে—চিনিক! চিনিক! আনন্দ তখন এমনই মগ্ন যে কৌতুকবশে সে ডাকেব কোন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেনি। বাথরুম থেকে পোশাক পালটে ফিরে দেখলে কাজল, হ্যা সেদিন সে কাজলই বলেছিল মনে মনে; কাজল তখন তার শোবাব ঘরে বর্ষার ছবির দিকে তাকিযে আছে, একদৃষ্টে দেখছে। আনন্দ একসময ষড়ঋতুর ছবি এঁকেছিল দু'খানা। ছবিখানা সত্যিই ভাল হযেছে। কালো একটি মেযে মাথায জলের ঘড়া নিযে আকাশ থেকে মাটিতে নামছে। তার রাশি রাশি সুদীর্ঘ চুল, মেযেটি দীর্ঘাঙ্গীও বটে। চোখদুটি লম্বা টানা। সম্ভবত কাজল ওব সঙ্গে নিজের মিল দেখতে পেয়েছে। মিল সত্যই নেই—অথচ একটা মিল আছে?

সে হেসে বললে—কি দেখছেন! আপনার সঙ্গে মিল আছে, না?

লজ্জাবতীর মতো নম্রতার আবেশ লাগল ওর সর্বাঙ্গে, বললে—আমার সঙ্গে? আমি এমনই সুন্দর? ছবিখানি কিন্তু সত্যিই সুন্দর।

—একখানা এঁকে আপনাকে দেব। শুধু দিন দুই ঘণ্টাখানেক করে আমার সামনে সিটিং দিতে হবে।

—কি করব নিয়ে?

— ঘর সাজাবেন।

---ঘর? সে ঘর আপনি দেখেননি।

—ঘব যেমনই হোক। সাজালেই সেজে ওঠে। আচ্ছা আমি নিজে সাজিযে দিযে আসব।

—ওরে মা! আমার জননীকে আপনি জানেন না।

হরিযা চা দিযে যায। চা-বিস্কুট। অনেক অনুবোধে একখানা বিস্কুট তুলে নিযে মুখ ফিরিযে খায কাজল, তারপর বেরিয়ে যায।

এমনি কল্পনা সে করেছিল। মিলেও গিযেছিল। এই কল্পনাব পর প্রায কয়েক দিনের মধ্যে বাস্তবে তাই ঘটে গিযেছিল ঠিক ঠিক। অমিল শুধু তাবিখের। ঠিক পরদিন, অর্থাৎ আঘাত লাগাব পবদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কবেও দীর্ঘাঙ্গী ছত্রধারিণীকে দেখতে পাযনি। সেদিন ওর ইচ্ছে হযেছিল, খোজ নিতে, ওপাডাব দিকে ঘুবেও এসেছিল কিন্তু কাবও কাছে ওর বাডি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেনি। সঙ্কোচ যা আনন্দের প্রকৃতিতে নেই, সেটা যে সেদিন কোথা থেকে এসেছিল তা সে বুঝতে পারেনি। সেদিন সন্ধ্যাতে বেরিযেও বারে গিয়ে মদ খাযনি। যশোদাদা প্রশ্ন করেছিলেন—কি হলো রে? এ্যা?

—কিছু না। শরীবটা ভাল নেই।

সে—-মানে লেখক বন্ধু, যাব সঙ্গে পুরীতে ঝগডা হযেছিল- -নেশাব মধ্যে ওর নামটা কিছুতেই মনে পডছে না। লোকটাকে আদৌ পছন্দ করে না আনন্দ। সেই বন্ধুটি বলেছিল—মন?

উত্তর দেয়নি আনন্দ। যশোদাদা ওদের মিটমাট অবশ্য কবিযে দিয়েছিলেন, মিটমাট করে সে কিছুক্ষণ পরই উঠে চলে এসেছিল। সেদিনও ট্যাক্সি করে ফিরেছিল। এই মোডেই গাডি দাঁড করিযে ভেবেছিল, কিসের সঙ্কোচ? যাবে সে। কিন্তু পারেনি।

পবের দিন সে গিয়েছিল' ওব মা বিস্মিত হয়েছিল। আপনি কি করে চিনলেন শ্যামলীকে? বলেছিল—আমি ওঁদের আপিসের কতকগুলো সাবানের নমুনা দেখতে চেযেছিলাম। ওরা আমার কাছে ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। হঠাৎ চেয়ারের কোণে ধাক্কা লাগল হাঁটুতে। আমি ডাক্তার দেখাতে বলেছিলাম। পাডাতে থাকি, আমার বাড়িতে লাগালেন—তাই খোঁজ করতে এসেছি।

শ্যামলী, না, কাজল তখন বাজারে গিয়েছিল। দেখা হয়নি, ফিরে এসেছিল। বাজারে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সেটা পারেনি। আবার কেমন সঙ্কোচ হয়েছিল। এত লোকের সামনে! বলে এসেছিল—বলবেন ওঁকে, আমি খোঁজ করে গেছি। সকালে ন'টাতেই সে বেরিয়েছিল। উইলিয়াম্‌সের সাহেব খুশি হয়েছিলেন তার কাজে। তার আগের রাত্রে বার থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে প্রায় সারা রাত্রি কাজ করে কাজ

প্রায় শেষ করেছিল। পেমেন্ট পেয়েছিল। ফিরেছিল বেলা একটায়। স্নান করে খেয়ে উঠে সে ঘুমোয়নি। জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। অনুমান করেছিল আজ সকালে যখন বাজারে যেতে পেরেছে তখন নিশ্চয় কাজে বেরুবে।

রৌদ্র প্রখরতর হয়ে উঠেছে। পথ জনহীন, সামনের পার্কে একদল হিন্দুস্থানী আজ পিক্‌নিক্ করতে এসেছে। ওপারে বাস কার লরী চলছে। গাছের পাতাগুলি ম্লান কিন্তু ঝকমক করছে রৌদ্রের ছটায়। পাখিরা স্তব্ধ। তার ঘরের মধ্যে চড়ুইটা নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রয়েছে। চোখ দুটি বন্ধ।

সে হঠাৎ তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল – কি গো ? বলতে পার –আসবে ?

পাখিটা চমকে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠেছিল।

চমকে উঠলে যে ? সংবাদ দাও।

পাখিটা আরও চকিত হয়ে লম্বা চি রিক শব্দ করে বেরিয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু আবার মিনিট দুই তিনের মধ্যে ফিরে বাসায় বসেছিল। আনন্দ আর ওকে নিয়ে কৌতুক করেনি। থাক– নিরীহ কৃষ্ণের জীব। থাক।

এর বহুক্ষণ পরেই দেখা গিয়েছিল ছোট্ট লোডজ ছাতা। আজ কিন্তু চলনটা ঠিক তেমন দ্রুত নয়। তারপর যা সে কল্পনা করেছিল তাই। না– যা ঘটেছিল তাই মনে পড়েছে, মনে হচ্ছে এমনি কল্পনাই করেছিল।

সেদিন একসঙ্গেই দু'জনে বেরিয়েছিল। একসঙ্গে চলার শুরু। মনে পড়ছে চলার সময় দু'জনেই চলেনি—আরও দু'জন চলেছিল। অপরাহ্ণ বেলা, পশ্চিম মুখে চলেছিল তারা দু'জনে– –আর দু'জন পিছনে আসছিল। কথা বলছিল কাজল, সে শুনেছিল। ওই তার মায়ের কথা থেকে শুরু করে তার জীবনের সব কথা-- বেদনার কথাই বেশি। তাই বলে সাধারণ মানুষ, সংসারে এত দুঃখ আমার, তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ো না, করুণার আবরণ দিয়ে ঢাকা দাও। এইটেই সব নয়, কথার সঙ্গে সুখের কথাও বলেছিল দুটো-একটা। ওদের ভাঙা বাড়ির ছাদে কটি টবের ফুলগাছের কথা, আর পাশের বাড়ির মালতীলতাটার কথা ; যার শিকড় মাল্লিকের বাড়িতে কিন্তু লতাটা এসে উঠেছে তাদের বাড়ির উঠানের গাছটায় এবং সব ফুলগুলিই ফোটায়, সব শোভা সব গন্ধ ঢালে তাদের বাড়িতে। বলেছিল পুরনো আমলের বাড়ি দু'জনদেরই। উঠানের মাঝখানে পাঁচিল আর আমাদের বাড়িটাই পুবদিকে। ওরা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু লতাটা পুবদিকের গাছটার টান ছাড়তে পারে না।

পরের দিনই কিছু বেল ফুল এনেছিল সে। ভিজে রুমালে খুব আলতো করে বেঁধে কাপড়ের আঁচলে ঢেকে এনেছিল। বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, হরি! হরি! সেদিনও আনন্দ বাড়িতে ছিল। কিন্তু ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভাঙেনি। পার্কের দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল। শ্যামলী ভেবেছিল আনন্দ বাড়ি নেই। কিন্তু ডাক শুনবামাত্র আনন্দের পাতলা হয়ে আসা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হরিয়ার ঘুম ভাঙবার আগেই

সে ধড়মড করে উঠে বসবার ঘরের দরজা খুলে সামনের দরজাটা খুলে দিয়েছিল। আসুন।

মুহূর্তের মধ্যে চড়ুইটা পাখায় ফ্ররর্ শব্দ করে বেরিয়ে গিয়েছিল ওই দরজা দিয়েই। বেচারার বের হবার সময় হয়ে গেছে তবু জানালা খোলা পায়নি। এই ঘরের দরজা খোলার সঙ্গে আলোর ঝলকের ইশারা অনুসরণ করে বেরিয়ে বাঁচল! কাজল বলেছিল—আপনার জন্যে আমার গাছের—ওমা সেই চড়ুইটা বুঝি? ঘরে বন্ধ ছিল?

হেসে দুঃসাহসী আনন্দ বলেছিল—আপনার সাড়া পেয়ে লজ্জায় ছুটে পালাল। বেচারা ধরা পড়ে গেছে। আরও বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বলেনি। বলা উচিত হবে না বলেই বলেনি। কাজল ঠিক ধবতে পারেনি ইঙ্গিতটুকু। সে নিজের অসমাপ্ত কথাটাই শেষ করেছিল। কাল আমাব টবের গাছের কথা বলেছিলাম, খুব সুন্দর মতিযা বেল। ভোববেলা উঠে তুলে একটা বাটিতে একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। মা তো একটি ফুল তুলতে দেয না, নিজে চান করে ফুলগুলি তুলে দেয। সব পুজোতে। বলি—বেশ, দেবতাকে দিলে বেশ করলে, এখন আশীর্বাদী হিসেবেও দাও, বিছানাব মাথায—প্লেটে বেখে দি। তাও না। সন্ধ্যাব সময় সব গুটিয়ে উঠোনের এক জাযগায় একটা গর্ত মতো আছে, তার মধ্যে ফেলে দেবে।

সত্যই মতিয়া বেলগুলি সুন্দর। যেমন বড় নিটোল গডন তেমনি রঙ তেমনি গন্ধ।

আনন্দেব ইচ্ছে হযেছিল বলে—তুমি তো মালা গাঁথার কল্পনা কর না—গাঁথো না, তাহলে মায়ের দেবতার দাবি মানতে না। গাঁথো না! কিন্তু বলেনি।

* * *

হঠাৎ আনন্দের জীবনে যেন একটা নতুন খেলা শুরু হয়ে গেল। মেয়েটি আসে—কথা বলে, ফুল দিযে যায। আনন্দ ওকে বলে—কই ছবি আঁকবার সিটিং কবে দেবেন?

মেয়েটি হাসে। বলে, খেপেছেন আপনি!

—কেন?

মেয়েটি বলে—জানি না। আমি পালালাম।

আনন্দ ওর সঙ্গ নেয। শ্যামবাজার পর্যন্ত এক বাসে যায়, তারপর ফিরে আসে।

বেশ লাগে—খেলার মতো—!

হ্যাঁ খেলাই। এ খেলা তার ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল বলেই সে সন্ধ্যায় আর বারে যাচ্ছে না। ব্রণমুখী ফিরিঙ্গিনীকে উইলিয়ামস কোম্পানির আপিসে যাবার পথে অনেকদিন দেখেছে, তার দিকে তাকিয়ে দেখেছেও, কিন্তু সে তাকে টানতে পারেনি। তার রূপ আনন্দের চোখে ঠেকে না তা নয়। নিশ্চয় ঠেকে, ভাল লাগে। একসময় তার মনের কল্পনা ছিল সে যদি জীবনে বান্ধবী পাতায় তবে এই ফিরিঙ্গী মেয়েকেই বান্ধবী করবে। ওদের মধ্যে দুটো রূপ আছে—পূর্ব-পশ্চিম দুই। ওরা

জীবনের খেলাকে খেলা বলে নিতেও জানে। সে খেলোয়াড়ী মন ওদের আছে। কিন্তু তার মধ্যেও ওদের পাওনার হিসেবটা বড়। এবং খেলাটাকে এমন হিসেবের ব্যাপার করে তোলে যে মন তৃপ্তি পায় না। এই কালো মেয়েকেও সে দিয়েছে অনেক। এই ক'মাসে অনেক জিনিস দিয়েছে। তা সে খুশি হয়ে নিয়েছে। কিন্তু টাকা সেও দেয়নি, এও চায়নি। কিন্তু খেলাও তো দু'জনে হয় না। দু'জনে খেলতে গেলেই চারজন হয়। দিনের বেলা তো হয়ই। রোদ পূর্বদিকে থাকলে অন্য দু'জন পশ্চিমদিকে, পশ্চিমদিকে থাকলে পূর্বদিকে, দুপুরবেলা হলে পায়ের তলায় চারজন তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেলে যায়।

মন দিয়ে দেখলে সে বড় মজার খেলা। বসে আছ দু'জনে—বেশ ব্যবধান রেখে, অথচ অন্তরে ইচ্ছে হচ্ছে আরও কাছাকাছি বসি—তখন হয়তো দেখবে ছায়া দুটো প্রায় গায়ে গায়ে মিশে গেছে। তোমার হাত এদিকে—ওর হাতও এদিকে বেশ কিছুটা দূরে—সূর্য্য আকাশে তেরচাভাবে আলো ফেলে হাতের উপর হাতখানি রাখিয়ে দিয়েছে—কিংবা জড়িয়ে দিয়েছে। সে নিজে শিল্পী এবং তার মন অত্যন্ত সচেতন বলেই এ ছায়ার খেলা তার চোখে পড়েছে। শুধু তাই নয় তার মনেও ঠিক সে এইভাবে কায়া আর ছায়ার খেলা খেলে যাচ্ছিল। যুবক সে—এ যুগের যুবক—তার যৌবন অর্থ দিয়ে যৌবন ভোগের ব্যাপারে দোষ দেখে না।— সে কালেও যারা দোষ দেখত—নানা বিধিনিষেধের মুখে মানত, তারাই কাজে তাকে লঙ্ঘন করে—গোপনে আড়ালে বীভৎস ব্যভিচার করত এবং পরের দিন ভাল ভাল কথা বলত এমন কি গঙ্গাস্নান করত। তা সে নয়; তার সব প্রকাশ্য, সে ধার কিছুর ধারে না—শুধু আইনগত বাধা এড়িয়ে চলে; এই বিকিকিনির খেলা সে বেশ কিছু দিনই খেলেছে; তার জন্য গ্লানি বোধ সে করে না, নিজেকে কারুর চেয়ে খাটোও মনে করে না। কিন্তু একটা নতুন তৃষ্ণা যেন জেগেছে—এই কালো লম্বা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়ে। টাকা দিয়ে দেহ কেনা নয়—মন কেনা। না মন কেনা নয়, মন জেতা। ভারী মিষ্টি লাগছে খেলাটা।

একটা মমতা! হ্যাঁ একটা মমতা। না—মমতাও নয়। প্রথম প্রথম উদ্দেশ্যটার মধ্যে কুটিল এবং জটিল কিছু না থাক—খুব সোজা সহজও ছিল না। একটা খেলার ইচ্ছা ছিল। কাঙাল মেয়ের কাঙালীপনা এবং মেয়ের মধ্যে চিরন্তন কালের যে সত্য নারী-পুরুষ সাহচর্যে উত্তপ্ত হয়ে বিগলিত হয়—তার সন্ধান করবার জন্য কৌতূহল লেগেছিল। ভেবেছিল—তাকে আবিষ্কার করেই বলবে—ওগো মেয়ে তোমাকে আমি খুঁজি—মানে পুরুষ বরাবর খোঁজে—কিন্তু এই দেউলে কালো রূপের আবরণের মধ্যে তোমাকে পেতে আমার আর ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু কয়েকদিন একসঙ্গে শ্যামবাজার পর্যন্ত যাওয়ার ফলে—মনের মধ্যে আরও কিছু যেন জাগল। ভাল লাগল—মেয়েটির সারল্য। সোজা মন সহজ মন। মনটি অনুদ্ধত বিনীত বটে কিন্তু ঠিক যেন কাঙাল নয়। ভাললাগার স্বরূপটা বেশ চিরে চিরে কেটে কেটে দেখলে আনন্দ। মনে হলো একটা করুণা নামক বস্তু কেমন করে বর্ষার জলে-ভেজা শুকনো ডাঙা দূর্বাঘাসের

মতো মাথা তুলে একটু সবুজ আভা ফুটিয়েছে। মনকে সে সাবধান করেছিল। উঁহু—এ ভাল নয়। সে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছে। এমন কি পুরীর কাণ্ডটার জন্য সে লজ্জিত এবং অনুতপ্তও হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল—-অন্যায়টা তো তারই। বন্ধুই তো ঠিক ধরেছিল। রসিকতা স্বভাবটাই সোজা জিনিসকে বাঁকা করা, সূচালো করা। সূচালো বাঁকা কিছু বিঁধলে টানলেই বেরিয়ে আসে না—খানিকটা ছাড়িয়ে নিয়ে তবে ছাড়ে। এবং এর রসটা মিষ্টি নয়, নোন্তা। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটেতে জ্বালা ধরায়। ওখানে পটুতার সঙ্গে—মুখ বেঁকিয়ে বাকা কাঁটাকে বের করে দিতে হয়। রাগ করে ও সোজা টান মেরে গেঁথে গিয়েছিল। মনে মনে সতর্ক হবার সংকল্প করে পরের দিন আগেভাগেই বেরিয়ে পড়েছিল। রাত্রে ফিরেছিল একটার পর। বেশ প্রমত্ত অবস্থায়। বার থেকে বেরিয়ে—ট্যাক্সি করে ঘুরেছিল। পার্ক স্ট্রীট -ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট ঘুরে অনেক বাঙালিনী এবং ফিরিঙ্গিনীর দেখা পেয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রণমুখীকে খুঁজে পায়নি।

সকালে ঘুমিয়েছিল আটটা পর্যন্ত!

স্নান করে মাথাটা সুস্থ করে কাজে মন দিয়েছিল। একবারও জানালার দিকে তাকায়নি। চড়ুই পাখিটার আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না। ওর কুটো মুখে করে আসা-যাওয়ার বিরাম নেই! একসময় তার রাগ হলো। সে কাজ করছিল—ঘরের মাঝখানে বসে, জানালাটাকে টেবিলের সামনে রেখেছিল বটে কিন্তু নিজে বসেছিল অনেকটা পিছন হয়ে। একসময় পাখিটার মুখ থেকে একটুকরো ঘাস খসে স্কেচের উপর পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে পাখিটাকে খেদিয়ে দিয়ে -বইয়ের তাকের উপর থেকে কুটো দিয়ে আধ গড়া বাসাটাকেই ভেঙে দিয়ে এসে কাজ করতে বসেছিল। নিশ্চিন্ত মনে কাজ করছিল, মনটা অনেকটা একাগ্র হয়েছিল; পাখিটা আবার এসে বাসাটার অবস্থা দেখে সে যে এক কি ধরনের ডাক ডাকতে শুরু করেছিল—সে যে না শুনেছে তাকে বোঝানো যাবে না। ঘরময় বার দুয়েক সেই ডাক ডেকে উড়ে গিয়ে জানালার মাঝের পাটাটার উপর উপুর হয়ে বসে কয়েকবার ডেকে উড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর আসেনি। কিছুক্ষণ পর কেমন একটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হয়েছিল আনন্দেরই। ওই একটা ক্ষুদ্র জীব- -বেচারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে এখানে তার আশ্বাসে এবং প্রশ্রয়ে বাসাটুকু করেছিল। তার উপর এই ক্রোধ—ছি-ছি ছি। সে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছিল।

কই—চড়ুইটা কই? অসংখ্য চড়ুই উড়ে বেড়াচ্ছে—পার্কের গাছে, তার জানালার সামনের দেবদারু গাছটায়। ইলেকট্রিকের তারেও কয়েকটা বসে রয়েছে। কাক শালিক উড়ছে। এ ওকে তাড়া করছে। গাছগুলোর ডালপালা পাতা বাতাসে দুলছে। অনেক উপরের আকাশে চিল উড়ছে অনেকগুলো। তার মধ্যে শকুনিও রয়েছে। নামছে ওই কোণটায়। সম্ভবত কিছু মরেছে। ও দিকটায় পাতিপুকুরের পড়ো জমিগুলো। সেই গন্ধওয়ালা খালটার ধার বোধ হয়! ওইখানটায় হবে।

হঠাৎ ঘণ্টা অর্থাৎ পেটা ঘড়ি বেজে উঠল। জলের কলে ঘড়ি পিটে ঘণ্টা ঘোষণা

করছে। এক দুই, তিন, চার, বেশ জোড়া মিলিয়ে ঘণ্টা বাজায়। জোড়া মিলিয়েই ঘণ্টা শেষ হলো। তা হলে দশটা! আটটায় তো সে উঠেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। হ্যাঁ দশটা। ঘড়িটাও বাজতে শুরু করেছে। কয়েক মিনিট স্লো হয়েছে তা হলে। কিংবা জলের কলেই দু' মিনিট আগে বাজিয়েছে। কলে আর মানুষে অনেক তফাৎ। মানুষ অধীর হয়, কল তা হয় না। তবে তেল না পেলে—বেগড়ায় বটে। কিন্তু তার ঘড়ি বেগড়ায়নি।

হঠাৎ সে মনে মনে চমকে উঠল।

জানালাটা বন্ধ করতে হবে। লেডিজ ছাতা দেখা যাবে এক্ষুনি। জানালাটা বন্ধ করে দিলে আনন্দ। খোলা দেখলেই লেডিজ ছাতা থমকে দাঁড়াবে। কিংবা এসে বারান্দায় উঠবে। সে সাহস তার হয়েছে! হরিয়াকে ডাকবে।—বাবু রয়েছেন? কি কবছেন? ছবি আঁকছেন বুঝি? হয় তো বলবে—একবার খবর দাও না। কি আঁকছেন দেখি! কিংবা বলবে—ফুল এনেছিলাম—দেব!

সে হতে সে দেবে না! জীবনে বিকিকিনিটাই ভাল। নগদ বিকিকিনি। বিকিকিনি সবই। তবে ধার আর নগদ। ধারে দেওয়া-নেওয়ার বাঁধন পড়ে। এ কালে—'আজ নগদ কাল ধার' এ বোর্ডটা দোকানেও বাতিল হয়ে গেছে।

আনন্দ ডাকলে—-হরিয়া!

—যাই।

এসে দাঁড়াল হরিয়া। নীরবে। ওটা ওর স্বভাব।

আনন্দ বললে—শোন—ওই—এ যদি আসে না—

—কে?

—ওই যে সেই মেয়েটি রে!

হরিয়া বললে—বাজারে দেখা হলো সে শুধাচ্ছিল।

—কি শুধাচ্ছিল?

—বাবু কেমন আছেন? কাল দেখলাম না! কাজে গিছলেন বুঝি?

—কি বললি?

—বললাম—হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলে—আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

বলছিল—কখন ফিরল বাবু? রাতে যখন ফিরলাম— তখনও তো জানালা বন্ধ ছিল।

—হুঁ। বললি তো অনেক রাতে?

—হুঁ বললাম।

— বেশ করেছিস। এখন যদি আসে-যায় সে এই সময়—বলবি—আমি বেরিয়ে গিয়েছি বুঝলি!

—হুঁ।

চলে গেল হরিয়া। আনন্দ জানালা-বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ঘুমের রেশ অনুভব করলে। কাল অনেক রাত্রি জেগেছে। অন্ধকার হলেই ঘুমের আমেজ আসছে। সে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে—টেবিল ফ্যানটা মাথার গোড়ায় দে।

হরিয়া বললে—একটা টাঙানো পাখা কেন। দিব্যি ঘুরবে।

—না। ওতে মশারি খাটিয়ে হাওয়া মেলে না।

ঘুমিয়ে পড়ল সে।

হরিয়া তাকে ডেকে তুললে খাবার সময়। টেবিলে চায়ের প্লেটে মতিয়া বেল রয়েছে। একটু হাসলে সে! তারপর মনে হলো—লুকোচুরি খেলছেই বা কেন সে? সোজা কেনাবেচার কথা—বলতেই তো পারে।

তাই বলবে সে! খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেল সে। সন্ধ্যেতে সকালেই ফিরলে। একটা কোয়ার্টার পাঁইট কিনে নিয়েই ফিরেছিল। খেয়ে সে সামনের বারান্দায় টেবিল ফ্যানটা খুলে একটা নীলবাল্বের স্ট্যান্ডিং ল্যাম্প জ্বেলে বসে রইল। কিন্তু মেয়েটিকে তো ফিরতে দেখলে না সে। দেহে মনে সে বেশ প্রফুল্ল ছিল। ঘুমিয়ে শরীর সুস্থ হয়েছে। সারা দিনে কাজ করেছে অনেক। তারপর সন্ধ্যের সময় থেকে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। কিন্তু সে কই?

হঠাৎ একসময় উঠে নির্জন রাস্তাটায় পায়চারি করতে করতে কখন যে ওদের বাড়ির ধার পর্যন্ত গিয়ে পড়ল—তা তার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই থমকে দাঁড়াল।

যাবে না কি ওদের বাড়ি? গিয়ে ডাকবে—শ্যামলীদেবী আছেন? কাজল বলে ডাকা চলবে না। না। মুখে মদের গন্ধ উঠছে। পাড়ার ছোঁড়ারাও ভাল নয়। ওর মাও অত্যন্ত খট্‌বোগা! ফিবে এল সে।

এসেই মনে হলো—আবার বেরুবে সে, বারে যাবে। এ যেন কেমন সব ফাঁকা শূন্য হয়ে গেছে। জীবনটার রঙ হারিয়ে যাচ্ছে! সে ডাকলে—হরিয়া!

—যাই।

—আমি বেরুচ্ছি। বলে সে ঘরে ঢুকে স্যুট পরলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল সে নিজেকে। হঠাৎ আয়নার ভিতর দেখলে পিছনের দেওয়ালের আলমারিতে বইয়ের থাকের উপর চড়ুইটা বসে আছে। নিশ্চিত হয়ে বুকটা পেড়ে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে।

ভাল লাগল তার। যাক কৃষ্ণের জীবটি ফিরেছে। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি তার নাই কিন্তু জীবটির প্রতি করুণা আছে। হাসলে একটু।

হেঁটেই বেরিয়ে গেল। বাস ধরে শ্যামবাজার যাবে। সেখান থেকে ট্যাক্সি নেবে। শ্যামবাজারে এসে ট্যাক্সিতে চড়ে কিছুদূব গিয়েই বললে—ঘুরিয়ে নাও ট্যাক্সি। জরুরী কাজ ভুলে এসেছি। চল!

ঘণ্টাখানেক না যেতেই ফিরল সে।—শরীরটা যেন অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘরে এসে হরিয়াকে বললে —খেতে দে!

পরের দিন সে দশটা নাই বাজতে বাইরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে শুরু করলে। ঢং ঢং করে ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজছে, আজ কলের ঘড়িতে এখনও বাজেনি। চড়ুই পাখিটা চ্রিক-চ্রিক শব্দ করছে। এরপর ঘড়ির কাঁচে ঠোকরাবে। বলবে বোধ হয়, থামলে কেন? আনন্দের দৃষ্টি কিন্তু সামনের দিকে। অর্থাৎ পূর্বদিকে।—ওই—ওই—লেডিজ ছাতা!

সে বসেই রইল। বুকের স্পন্দন খানিকটা বেড়ে গেল। একবার মন বললে— এ করছ কি? মনই উত্তর দিলে—কেন? যা কাল থেকে ভেবে রেখেছি তাই করব। সোজাসুজি বলব। দেখ আমি এ যুগের অতি আধুনিক। তুমি যদি অতি আধুনিকা হতে পার—তবেই আলাপের জেরটা চলুক। নইলে বল, এখানেই শেষ হোক পালা।

মনের সঙ্গে মনের কথা শেষ হতে-না-হতে ছাতা কাছে এল। ছাতাটা মধ্যে মধ্যে পিছনে হেলছে। মানে সে তাকে দেখেছে। ওর নিজের মনের কথা ওইখানেই খেই হারিয়ে শেষ হয়ে গেল। চাঞ্চল্যের মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, যেন কথা বলবার জন্যেই উঠে দাঁড়াল।

সেও থামল। এবং হাসল। কাজলের দাঁতগুলি বড় সুগঠিত। ঝিকমিক করে ওঠে। কালোমেঘের বুকে হাল্কা বিদ্যুতের মতো হাসিটা দাঁতের সারির সাদা ঝিলিক হেনে ফুটে ওঠে। সেই আগে বললে—খুব কাজ করছেন বুঝি?

মিথ্যে বলতে বিব্রত হলো আনন্দ। মিথ্যে সে বলে না। তবে বলতে কোন প্রেজুডিস তার নেই। কিন্তু অনভ্যাসে থতমত খেতে হয়। বললে—হ্যাঁ। কাজ করছিলাম। তবে খুব না।

—রাতে বুঝি খুব বেড়ান?

সে তাকালে তার মুখের দিকে অত্যন্ত সহজ মুখ সরল দৃষ্টি। আনন্দ বললে—হ্যাঁ, পরশু একটার পর ফিরেছি। হোটেলে গিয়েছিলাম।

কাজল এতেও হাসলে। বললে—হোটেল খুব ভাল লাগে বুঝি? আর্টিস্ট লোক তো। বিস্মিত হলো আনন্দ। এ তো বিচিত্র মেয়ে। যে কথাটা বললে তাতে হোটেল যাওয়া সম্পর্কে তার তো কোন গা ঘিন-ঘিন করা মনোভাবের পরিচয় নেই। এ দেশের অর্ধশিক্ষিতা মেয়ে...! তবে কি সে ওই মেয়েদের দলে গিয়ে পড়েছে যারা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রুটির টানে, পেটের দায়ে, লোভের আকর্ষণে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যের পর গিয়ে পৌঁছয় এসপ্লানেডে?

—রাগ করলেন?

—কেন?

—কথাটা বললাম বলে?

—না। হাসলে আনন্দ। তারপর হঠাৎ ঝপ করে জিজ্ঞাসা করে বসল—

—হোটেল দেখেছেন? গেছেন কখনও?

—ওই সব জায়গায় এত আলো এত জাঁকজমক, যেখানে চায়ের কাপ আটআনা সেখানে আমি কোথায় যাব? তবে অবাক হয়ে বাইরে থেকে দেখেছি!

—যাবেন ?

—না।

—কেন ? আমি নিয়ে যাব।

—না। একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি হঠাৎ বললে—দেখুন ক্যানভাসারি করি পেটের দায়ে। জীবনে না আছে অর্থ না আছে রূপ না আছে গুণ। কোন রকমে কবে খাই। ক্যানভাসারি করতে গিয়ে হোটেলে যাওয়া লোকেদের দেখেছি। তারা তো ভাল লোক নয়! অন্তত আমাব পক্ষে। একটি বিষন্ন হাসি ফুটে উঠল তাব মুখে।

আনন্দের কথা হাবিয়ে গেল। হোটেলে যাওযার কথা বলবার জন্যে একটু লজ্জা হলো তার। মেয়েটি বললে—আমি যাই। ক'টা বাজল ?

হাতঘড়ি দেখে আনন্দ বললে—সাড়ে দশটা।

—বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমি যাই।

আনন্দ কিছু বলতে পারলে না। কাজল চলে গেল। কযেক মিনিট দাঁড়িযে থেকে আনন্দ ঘরে ঢুকে যত তাড়াতাড়ি পাবে পোশাক বদলে বেবিযে পড়তে চাইলে। সে যাবে, ওকে গিয়ে বাসস্ট্যান্ডে ধরবে। বলবে—আমাকে মাপ করুন।

আনন্দের ব্যস্ততায চড়ুই পাখিটা চঞ্চল হয়ে ফর ফব কবে ঘবময় পাক খেতে লাগল। আনন্দের নজরে পড়ল আবার সকাল থেকে কুটো কুড়িয়ে এনে বইযেব থাকের মাথায় জড়ো কবে বাসা বাঁধছে। একটু হাসলে। বুঝলে কাল সে বাসাটা ভেঙে দিয়েছিল বলেই আজ পাখিটা আনন্দেব ব্যস্ত হয়ে ঘোবা-ফেরা দেখে ভয় পেয়েছে। সে হেসে বললে—ভয় নেই চড়ুই সখী। ভয নেই। বাঁধো তুমি, বাসা বাঁধো।

খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে সে বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি এসে দেখলে—কাজল বাসে বসে আছে। বাস ছাড়ছে। সে হাত তুলে হাঁকলে—রোখো ভাই রোখো! এই!

বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। সে বাসস্ট্যান্ডে এসে হাঁপাতে লাগল। ভাবছিল—কি করবে ? ফিরে যাবে ? পরের বাসে গিযে তো ওকে ধরতে পারবে না।

ওই বাসটা চলে যাচ্ছে। ওই দূরে—পবের স্টপে থেমেছে! পরের বাসখানা হাঁকছে—শ্যামবাজার—শ্যামবাজাব!

ও—কি ? পরের স্টপে কালো মেয়ে নেমে পড়েছে। ওই তো—ওই তো! ওই ফিরে আসছে।

বোকা মেয়ে। ও এখানে আসতে আসতে এখানাও ছেড়ে চলে যাবে! কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে আনন্দ তার জন্যেই ছুটে এসেছে। ও নেমে পড়েছে।

একখানা রিক্সা ডেকে সে চড়ে বসল—চল্। যা নিবি দেব। পথে ওই ও দাঁড়িয়েছে, রিক্সায় আনন্দ আসছে—তা দেখেছে কাজল। পথে রিক্সা থামিয়ে আনন্দ বললে—উঠুন।

সে স্বচ্ছন্দে উঠে বসল। বললে—কই বললেন না তো যে আপনি বেরুবেন!

আনন্দ বললে—না। কিন্তু আপনি আসবার পরই আমার মনে হলো—আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাওয়া উচিত।

বিস্মিত হয়ে সে বললে—কেন ? আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন ? কিছু তো হয়নি।

—হয়েছে। আপনাকে হোটেলে যেতে বলিনি ? আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

কাজল চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তাবপর বললে—দেখুন, পাড়ার খারাপ ছেলেরা থেকে পথে আপিসে দোকানে নানান জনেই নিত্যই এমন কথা ইশারায় বলে—স্পষ্টও বলে। শোনাটা সয়ে গেছে। তবে আপনার কথাটা তো সে ভাবে আমি নিইনি। হোটেল দেখাতে চেয়েছেন, তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি, ওখানকার খাবারেব কত নামডাক—গরীব মেয়ে তাই যাইনি—খাওয়াতে চেয়েছেন। এই ভাবেই নিযেছিলাম। সাধারণ মানুষ তো নন আপনি! সে আমি ওই ছোট ঘটনাটি থেকেই বুঝেছি। ওই চড়ুইটার প্রতি যে মমতা দেখেছি! একটু চুপ করে থেকে সে আবাব বললে—নইলে এমন সাহস করে আপনার সঙ্গে মিশতে পারি? ভাবি কি জানেন—ভাবি—সামান্য একটা চড়ুইকে যে এমন ভালবাসে—সে আমার মতো মেযে কালো মূর্খ হলেও—মানুষ ভেবে নিশ্চয় ভালবাসবে।

চড়ুই পাখিটার প্রতি আনন্দ মনে মনে কৃতজ্ঞ হলো। পরক্ষণেই সত্যটা মনে পড়ল। বললে—যদি বলি—চড়ুই পাখিটা সেদিন আপনার জন্যেই বেঁচেছে!

—তার মানে ?

—তাব মানে, যেমন ওটা এসে ঝপ কবে চোখের উপর পড়ে নখ দিযে চোখের কোণ বিঁধে ধরলে—অমনি ওকে নিষ্ঠুর আক্রোশেই ধবেছিলাম হাতেব মুঠোতে চেপে। টিপে ওটাকে পিষে আছাড় মেরেই ফেলতাম কিন্তু সেই মুহূর্তেই আপনি বলে উঠলেন—আঃ—এ যে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে! কথাগুলো ঠিক মনে নেই কিন্তু এমন মিষ্টি মমতার সুর শুনে আপনার মুখের দিকে তাকালাম—দেখলাম সেখানেও কত মাযা কত উৎকণ্ঠা। আমি আব পাখিটাকে মাবতে পাবলাম না। দেখলাম আমাব হাতেব চাপেই মব মব হযেছে। তখন ওকে বাঁচাতে ইচ্ছে হলো।

শ্যামলী চুপ কবে বইল। একটু পবে বললে—না-না। আপনাব মনেই ওসব ছিল। আমি না ডাকলেও, না এসে পড়লেও—এই ই কবতেন! প্রথম আঘাতেব ঝোঁকে আক্রোশ হয, বাগ হয়। কিন্তু যার দয়া-মমতা আছে, হৃদয আছে তার সে সব পরমুহূর্তেই জেগে ওঠে। নইলে আমার মতো সামান্য কালো একটা গবীব ক্যানভাসার মেয়ের স্নেহ-ভালবাসাব দাম আপনাব কাছে কতটুকু ?

—অনেকটুকু! আপনি জানেন না। বলে আনন্দ সামনেব দিকে চেয়ে বইল। ওর বিচিত্র মন। মন মনের সঙ্গে কথা কয এক একজন মানুষের। আনন্দেব মন—সেই মানুষেব মন। মন বললে, সেন্টিমেন্টাল হযে পড়েছে। মনই ধমক দিলে—কথা বলো না থাম। কোন মেযের সঙ্গে কথা বলে এমন আনন্দ তো হয়নি কোন দিন। এ কথা কাটাকাটির বাণ-যুদ্ধ নয়, তলোয়ার খেলা নয় ; এতে হার-জিতের খেলাই নেই। এ মেয়ে তা খেলে না বলেই—মনকে অভিভূত করে গভীরে কি যেন স্পর্শ

করে; সেটা হৃদয় হলে হৃদয়। হৃদয় স্পর্শ করা আর কথার মারপ্যাঁচে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ানো আলাদা ব্যাপার!

রিক্সায় ওরা দু'জনেই চুপ হয়ে বসেছিল। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বাস, ট্রাক, মোটর, গরুর গাড়ি, ঠেলার ভিড়ে রাস্তা প্রায় জাম হয়ে গেছে! ওদের কিন্তু কেউ দেখছে না। একটি ছেলে এক মেয়ে রিক্সায় চলেছে—এ একটা সাধারণ ব্যাপার!

হঠাৎ ওরা সচেতন হলো। একটা মোষের গাড়ির সঙ্গে একটা মোটর কারের ধাক্কা লেগেছে। বিশেষ কিছু নয়, জখম কেউ হয়নি, মোটর কারটাই মোষের গাড়ির লিগের সঙ্গে দরজার ঘেঁষ লাগিয়ে জখম হয়েছে! শ্যামলী বলে উঠল—যাক—কারুর লাগেনি।

আনন্দ কথা বললে না।

শ্যামলী আবার বললে—নতুন মোটর, দরজাটা কি হলো দেখুন! এঃ!

আনন্দ এবারও কথা বললে না।

শ্যামলী বললে—কি ভাবছেন বলুন তো!

আনন্দ ফিরে তাকালে ওর দিকে। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইল! শ্যামলী লজ্জা পেলে! আনন্দ বললে—আজ থেকে আমরা বন্ধু, কেমন?

—বন্ধু? আমি আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ, আরও একদিন বোধ হয় বলেছি। আজ পাকা হয়ে গেল।

শ্যামলী হঠাৎ চোখ বুজল। একটা আবেগ ওকে বিচলিত করে তুলেছে! আনন্দ ওর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে—আজ থেকে আমরা আপনি নই। তুমি।

ঘাড় নাড়লে শ্যামলী—না।

আনন্দ বললে—আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

এবার শ্যামলী বলল—না—আপনাকে আমি তুমি বলতে পারব না।

—পারবে! আজ না পার কাল পারবে।

—জানি না।

—আমি তোমাকে তুমি বলব।

শ্যামলী হাসলে—সে হাসি অত্যন্ত মিষ্ট—বললে—খুব ভাল লাগবে আমার।

আরও কতকটা দূর ওরা পরস্পরে হাতে হাত রেখে চুপচাপ চলল। তারপর আনন্দ বললে—তুমি আরও পড়—কাজল। তোমাকে কাজল বলব কেমন?

সলজ্জ হেসে ঘাড় নেড়ে কাজল জানালে—হ্যাঁ তাই বলো! তারপর বললে—পড়ব? কি করে পড়ব? পড়ার খরচ কোথায় পাব? খাবই বা কি?

—ব্যবস্থা আমি করব।

—না। টাকা নিতে আমি পারব না।

—আমি তোমাকে একটা ভাল চাকরি দেখে দেব।

—ভাল চাকরি?

—হ্যাঁ।

—সে খুব ভাল হবে। কাজলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রিক্সা তখন শ্যামবাজারে এসে পড়েছে।

পরের দিন—কাজল আবার অনেকগুলি ফুল মতিয়া বেল ওকে এনে দিল। নিজেই প্লেটে সাজিয়ে—আনন্দে কাজের টেবিলেব পাশে একটি টিপয়ের উপর রেখে দিলে। আনন্দ হাসলে। আনন্দের হাসি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য মন মনে মনে বললে—মালা গেঁথে আনতে পারলে না?

ঘড়িতে দশটা বাজতে শুরু করল। চড়ুই পাখিটা এসে ব্রাকেটে বসে লেজ নাড়িয়ে চিরিক—চিরিক শব্দে ডাকতে লাগল।

কাজল বললে—আবে এটা তো বেশ!

আনন্দের আব কথাটা বলা হলো না। সেও হেসে বলল—হ্যাঁ- ও বেশ।

* * *

ওই কথাটা মালার কথাটা বললে আনন্দ সেদিন। বন্ধুত্ব পাতানোর অনেক দিন পব। ভিক্টোবিযা মেমোরিযালের সামনে।

কাজল বললে ওর বাড়িব ফুলের কথা।

আনন্দ বললে—মালাব কথা। বললে—ফুল হলো ঝবে গেল। আমাব টেবিলে সাজিযে দিলে শোভা হযেই বইল। মালা গাঁথতে তো পারলে না।

কাজল সলজ্জভাবে হেসে বলেছিল, বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিযে বলেছিল- -বেশ গাথব। পরবে তো!

—পবালে নিশ্চয পবব। বান্ধবীব মালা পবব না। কিন্তু ববমাল্য করতে চেযো না।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল —বেশ তাই —তাতেই যদি খুশি হও তবে তাই হবে!

কালকের কথা। এর মধ্যে কিন্তু বেশ কিছু দিন চলে গেছে। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পাব হয়ে গেল। চাব-পাঁচ মাস চলে গেল। এর মধ্যে ঘটেছে অনেক কিছু ছোটখাটো, বড একটা ঘটেছে। ক্যানভাসারি ছেড়ে দিয়ে কাজল উইলিযামস্ কোম্পানির আপিসে রেকর্ড কীপারের চাকরি করছে। সেখানে রেকর্ডরুমে বসে থাকে—আর বই পড়ে। ডাক পডলে ফাইল খুঁজে হাতে নিযে উঠে যায় হাসিমুখে। ঠোঁটে ওকে লিপস্টিক মাখতে হয়। চুল ওর সম্পদ। তার কায়দা ওর পুরাতন। ভাল শাড়ি-জামা পরতে হয়। ইংরাজীটাও দুরস্ত হয়েছে।

কাজটা কবে দিয়েছে আনন্দই।

উইলিয়ামস্ কোম্পানির সাহেব আনন্দের প্রকৃতিব জন্যে এবং তার কাজের জন্যে তাকে ভালবাসে। সাহেবকে আনন্দ বলেছিল।—একটি মেয়েকে একটি কাজ দিতে পার সাহেব?

জু সাহেব দিলদবিয়া মেজাজেব লোক। সে বসিকতা কবেছিল। বলেছিল—তোমার তো কেউ নেই। কাব জন্যে কাজ চাচ্ছ ?

—ফ্রেন্ডও কি থাকবে না সাহেব !

—গার্ল ফ্রেন্ড ?

—যদি বলি হ্যাঁ।

—তাহলে দেব। নিশ্চয দেব। কি কাজ কবতে পাববে ?

—বড কাজ পাববে না সাহেব। ম্যাট্রিক ফেল

সাহেব তাকে বেকর্ড ডিপার্টমেন্টে কাজ দিযেছিল বুড়ো বেকর্ড-কীপাবেব অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। মাইনে সব নিযে একশো দশ টাকা।

শ্যামলী অবশ্য ইন্টাবভ্যুতে সাহেবকে খুশি কবেছিল। সাহেব বলেছিল আনন্দকে—ভেবী সার্প ইন্টেলিজেন্ট, তাব থেকেও বেশি বয—চার্মিং বিহেভিযাব। শী ইজ এ গুড গার্ল। যা ভেবেছিলাম তা নয। তুমি ওকে বিযে কববে ?

—না—না সাহেব। সে সব নয।

শ্যামলী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবেছে অনেক। তাতে তাব ক্রুটি হয়নি। তাব জন্যে কৃতজ্ঞতা সে কোনদিন চাযনি, কোন মূল্যও কামনা কবেনি। শুধু ভাল লেগেছে তাই সে কবেছে। তাব বেশি কিছু নয।

* * *

এব পব থেকে দু'জনেব বন্ধুত্ব বল বন্ধুত্ব প্রীতি বল প্রীতি, প্রেম বলতে আনন্দেব আপত্তি আছে। ফুলেব মালা যাতে ববমাল্য না হয় সে দিকে ও সতত জাগ্রত। মেযেটিব উপকাব কবতে ওব ভাল লেগেছে। হয় তো করুণা। কিংবা মমতা। তাছাডা ওকে যেন ও নতুন কবে গডছে। একটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তিকে ও যেন ঘষে মেজে বঙ দিযে পবিপূর্ণ কবে তুলছে। খেলাই সে শুরু কবেছিল—খেলা এখনও খেলাই আছে কিন্তু খেলাব বকমটা পাল্টেছে। আনন্দই ওকে সাজতে শিখিয়েছে, রুচি শিখিযেছে। কিছু কিছু পোশাকও উপহাব দিয়েছে। কিন্তু শ্যামলীব নিজেবও গুণ আছে, সামান্য পোশাককে রুচিব সঙ্গে পবে দুইযে মিলে, অসামান্য নিশ্চয নয়, তবে বেশ সুশোভনা হতে পাবে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে যে ইংবেজীটুকু শ্যামলী—না—কাজল শিখেছিল—এবং যা ও ক্যানভাসাবি ও টিউশনি কবতে গিযে ভুলে গিযেছিল—সেটুকুও আনন্দই আবাব সাহায্য কবে বপ্ত কবে দিযেছে। জানাজানিও হযে গেছে পাডায এবং মায়েব কাছে। পাডাব ছেলেবা ওব সাজসজ্জায এমন সুচারু ভোল বদলেব জন্যে এবং লিপস্টিকেব জন্য বলে মেমসাহেব। তবে সাহেব কোম্পানিব চাকবি, এটা ওকে একটা ইজ্জত দিযেছে।

আনন্দ মধ্যে মধ্যে ওদেব বাড়িও যায। শ্যামলী না—কাজল—সকালে আপিস যাবাব সময় নিত্যই যায় আনন্দেব কাছে।

পাড়ায় জানে আনন্দ ওব উপবওয়ালা। সাহেব কোম্পানিব বাঁধা আর্টিস্ট আনন্দ

এখন ওর সঙ্গে আর শ্যামবাজার যায় না। এখন ওর সঙ্গে দেখা হয় নিত্য বিকেলে। ওইটেই পাকা বন্দোবস্ত হয়েছে। ওদের দেখা হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান এসপ্ল্যানেডে ট্রামের দোতলা ঘরটার নীচে। ওখান থেকে কোনদিন সিনেমায় যায়, কোনদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে। আনন্দ ওকে নিজের জীবনের কথা বলেছে। শ্যামলীও বলেছে। ওর জীবনের কথা আর কি? শুধু দুঃখ-কষ্টের কথা। অপমানের কথা। আনন্দ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—ভালবাসনি কাউকে?

সেদিন গঙ্গার ধারে বসেছিল ওরা। কাজল খিল খিল করে হেসে বলেছিল—আমি তো দুনিয়াসুদ্ধ লোককেই ভালবাসতে চাই। কিন্তু কালো মূর্খ মেয়েকে ভালবাসতে দেয় কে? বন্ধুই জীবনে আমার একজন, প্রথম ও শেষ। সে তুমি! বান্ধবীও সেই। যাদের সঙ্গে হয়েছিল—তারা বিয়ে হয়ে কে কোথায চলে গেছে। আমি পড়ে আছি একলা।

কাজলের ছবিও এঁকেছিল আনন্দ। কাজল তার সামনে বসে থেকেছে ছবি আঁকাবার জন্য। সে ছবি একজিবিশনে নাম করেছে, প্রাইজ পেয়েছে। সে বলে—আমি ধন্য হযে গেছি। কিন্তু তার জন্য আনন্দ তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল, সে নেয়নি। কিছুতেই নেয়নি।

বলেছিল—আমার রূপ নেই। ও রূপ যা ছবিতে তুমি দিয়েছ তা তোমার দেওয়া, তোমার সৃষ্টি। আমি ধন্য হয়েছি ছবি আঁকিযে। কিন্তু ওর জন্যে টাকা নিলে তোমার কাছে আমি দাঁড়াতে পারব না। আমি কেনা হয়ে যাব।

— ছবিটা যে পাঁচশো টাকায় বিক্রি হয়েছে কাজল।

—তা হোক। তুমি বরং আমাকে একখানা শাড়ি কিনে দিয়ো।

শাডি সে নিযেছে। কিন্তু সেও ছ'খানা এন্ডিল রুমাল তাকে উপহার দিয়েছে। সে তাকে ফুল দেয়, রুমাল দেয়, ছোটখাটো জিনিস নিতান্তই মূল্যের দিক থেকে নগণ্য—এ তাকে দেয। মাটির পুতুল তার ভাল লাগলে তাও দিয়েছে।

কাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ওরা বেডাচ্ছিল। একটু বেলা ছিল। আষাঢ় মাসের বেলা। বেলফুলের মালা, চাঁপাফুল, যুঁইয়ের গোড়ে বিক্রি হচ্ছিল। কাজল বলেছিল—আঃ আজকাল যা আমার টবের গাছে ফুল দিচ্ছে কি বলব তোমাকে! এই বড বড এবং অজস্র ফুটছে।

সে খপ্ করে সুযোগটা ধরেছিল। না। ঠিক সুযোগ সে ধরেনি। সুযোগ সে নেয় না। হ্যাঁ—সঙ্কোচ একটা ছিল যেটা কাটিয়ে নিতে পেরেছিল। মানুষের জীবনে যেটা ন্যায্য পাওনা সেটা দাও বলবার একটা সময় আছে, সেই সময়টা এসেছিল অকস্মাৎ, শ্যামলীই যেন এনে দিয়েছিল সে সময়। সে বলেছিল বেল ফুলের কথা।

—আজকাল যা আমার টবের গাছে ফুল দিচ্ছে কি বলব তোমাকে! এই বড বড় এবং অজস্র।

সে বলে উঠেছিল—মা সেগুলি গর্তে ফেলে পচাচ্ছে তো।

—হ্যাঁ। আমি আব কি কবব? আগে তোমার ওখানে দিয়ে আসতাম। এখন ববাবব চলে আসি।

—মালা গাঁথলেই পাব।

—কি হবে?

—পববে।

—মা ঝাড়ু মাববে।

—তাহলে পবাতে পাব।

—পববে? তুমি?

—বান্ধবী দিলে বন্ধু অবশ্য পববে। বন্ধুত্বেব মালা বন্ধনেব নয়। পাব পবাতে?

বক্র কটাক্ষ হেনে কাজল বলেছিল—পাবি না? নিশ্চয পাবি! পববে" আনব কাল!

—এনো। কালকেব সন্ধ্যাটি হযে থাকবে স্মবণীয চিবদিনেব মতো। কথা বইল?

—কথা বইল।

—দেখব।

ওবা বাড়ি ফিবল একসঙ্গে কিন্তু নীববে। কাজল দু'চাবটে কথা যাও বললে আনন্দ তাব উত্তব দিলে না।

পাড়ায় এসে আনন্দেব বাড়িব সামনে দু'জনে থমকে দাঁড়াল। আনন্দ বললে- কাল।

হেসে কাজল বললে—হ্যা কাল। কিন্তু তোমাব কি হলো বলতো? সাবা পথ চুপ কবে এলে?

আনন্দ বললে—কি হবে? ভাবছি কাল আমাব বান্ধবীকে আমি কি দেব?

—তোমাব দেওযাব সীমা আছে?

—ওসব কথা কাল হবে।

—বেশ—বেশ। কাল। কাল। কাল। কাল।

—হ্যাঁ, কাল আমাদেব চিবকাল স্মবণীয থাকবে।

—আচ্ছা।

আনন্দ এসে ঘবে ঢুকল। কান তাব ঝাঁ-ঝাঁ কবছে। বুকেব ভিতবটা স্পন্দিত হচ্ছে।

ঘবে পায়চাবি কবতে কবতে সে ডাকলে—হবিযা!

হবিযা এসে দাঁড়াল।—কি?

—অনেক দিন আগে বড বোতল একটা ছিল। তাতে খানিকটা ছিল। ছিল না?

—হুঁ। আছে।

—দে সেটা।

প্রায তিনমাস পব আনন্দ মদ খেলে।

পবদিন সকাল থেকে কেমন অধীব হয়ে বইল সে। বিকেল ছ'টা কখন হবে।

আজকের এই অধীর উল্লাস একটু বিচিত্র ধরনের। এমন সে কখনও অনুভব করেনি। কাজল তাকে মালা পরাবে। একটা যেন আশ্চর্য কিছু। মালা পরে কি করবে জানে না। কিছু করবে। এ যেন একটা গান—তাকে কেউ শোনাচ্ছে। সকাল থেকে—তাই বা কেন—কাল রাত্রি থেকেই কেউ শুরু করেছে গান।

জীবনের গান। জীবন তার ধন্য হয়েছে। একটি নারীকে সে জয় করেছে। তার থেকে তার রূপান্তর হয়েছে। অন্ধকার রাত্রি এসে জীবনকে তিমির নিবিড় নিশীথিনীর মতো আবৃত করে তার সকল আবরণকে হরণ করে নিয়েছে। প্রভাত হয়েছে তবু সে আলো সে তিমির নিশীথিনীর যবনিকা ভেদ করতে পারেনি। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সে সেই আদিম কালের মানুষেব মতো অভিসারের জন্য সেজেছে। সন্ধ্যার জন্য জপ করেছে।

সারাটা দিন কোন কাজে মন বসেনি। শুধু মন আকৃষ্ট করতে পেরেছিল—চড়ুই পাখিটা। আজ এই দু'মাসের মধ্যে সে পাখিটার দিকে মন দিতে পারেনি। তাকে সে ভুলেই গিযেছিল। সে আছে, সে থাকত, উড়ত, ডাকত, বেরিযে যেত, ফিরে আসত, ঘডি বাজবার সময ঘরে থাকলে ঘডিটার ব্র্যাকেটে বসে চ্রিক-চ্রিক করে ডাকত, ভাযেলে ঠোকরাতো। আনন্দ ঘরে থাকলেও তা দেখত কিন্তু সে চিঠি সেই দেখা নয়। হরিযা ঘোরে ফেরে—সে যেমন দেখে—তেমনি। একটি করুণা ছিল কিন্তু তার বিশেয কোন আবেদন ছিল না। যে ভিক্ষুক তার দুর্দশার জন্যে প্রথম দিন যে করুণা আকর্ষণ করে যে উত্তাপ তার মধ্যে থাকে, তার পবে সে যখন নিত্য এসে দাঁডায তখন যেমন দান পেলেও তার সে সরসতা আর থাকে না—এ তেমনি। আজ সকালে দী· দিন পর সে চড়ুইটাকে অবলম্বন করেই দিনটা কাটিয়ে দিয়েছিল। অনেক রসিকতা অনেক কথা সে তার সঙ্গে বলেছিল। দুপুরবেলা একটু শুযেছিল। কিন্তু আধঘণ্টা অন্তর তার ঘু॰ ভেঙেছে। ক'টা বাজল। ঘডির দিকে তাকাবার আগে কান পেতে শুনেছে মৃদু চিনিক চিনিক শব্দ উঠছে কিনা। চড়ুই পাখির ঘড়ির দরকার নেই। তার ঘুম ঠিক সময় ভাঙে। চড়ুইটার প্রথম চিনিক ডাক শুনেই সে উঠে জানালা খুলেছিল। রোদ তখনও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘড়িতে তিনটে বাজতে দশ মিনিট। তার পরও আডাই ঘণ্টা। হঠাৎ তার নজরে পডেছিল চড়ুই সখীর সখা জুটেছে। এর মধ্যে চড়ুই পাখির ডিম হয়েছিল কিন্তু ডিম দুটো ভেঙে গেছে। সখার সঙ্গে তার খেলা দেখে তার নেশা লেগেছিল।

পাঁচটার সময় বেরিয়েছিল সে তাব সব থেকে সুন্দর পোশাকটি পরে। দোকান থেকে পাখা এসেছে। হরিয়া বলেছিল, ওটা খাটাই! সিলিং ফ্যান একটা। টেবিল ফ্যানটায় চলছে না।

সে বলেছিল—থাক আজ। আজ সময় নেই আমার। কাল আসতে বলে দে।

পৌনে ছ'টায় গিযে দাঁড়িয়েছিল এসপ্ল্যানেডে ট্রাম টার্মিনাসে। অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল ট্যাক্সি নিয়ে যায় উইলিয়ামস্ কোম্পানির আপিসে।

কিন্তু কাজল বলেছে—না। আপিসে তুমি আমাব সঙ্গে কথা বলো না। হলে আমাব লজ্জা তোমাকে নিয়ে নয় অন্য জনেব কথা সইবে না।

ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিটেই এসেছিল কাজল। তাব পোশাকও ছিল আনন্দেব রুচিমতো তাবই দেওযা। গাঢ় লাল ব্লাউজ, ফিকে নীল পাডহীন শাড়ি। হেসে বলেছিল—এসেছি।

সেও বলেছিল—আমি অনেক আগে এসেছি নেবাব জন্যে।

নীববে পথ চলেছিল। কথা যেন মনে মনে চলছে। অন্তত—চল। আনন্দেব তাই মনে হযেছিল। এসে বসেছিল গঙ্গাব ধাবে নির্জনে। হাঁটতে হাঁটতে যেতে অন্ধকাব হযে এসেছিল। অনেকটা দূব গিয়েছিল। যেখানেই দাঁডায় সেখানেই যেন মানুষ। কখনও সে বলেছে—আব একটু চল। কখনও কাজল বলেছে—এখানে ওই সব লোক বয়েছে। শেষে মনেব মতো নির্জন জাযগা পেযে বসেছিল দু'জনে।

—এই নাও। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি অ্যালুমিনিযমেব কৌটো থেকে বেব কবে খুলেছিল কৌটো। মুহূর্তে মধুব গন্ধে ভবে উঠেছিল আনন্দেব নিঃশ্বাস। মালা বেব কবে বলেছিল—

—নাও, পব।

—না। তুমি পবিয়ে দাও।

— আনন্দ!

—কি ?

—না, তুমি পব।

— না। পবিযে দাও। নইলে দাও আমি তোমায পবিযে দি। নইলে থাক।

—বাবাঃ! আচ্ছা জেদী লোক তুমি। যা ধববে তুমি ছাডবে না। পবিয়ে দিযেছিল মালা সে তাব গলায। —বলেছিল ধন্য বন্ধু।

—এবাব আমি পবিযে দি।

—না। তুমি পবে থাক। আমি সেইজন্যে গেঁথেছি।

—না।

—না।

মুহূর্তে উদ্দাম আবর্ত বাঁধভাঙা জলেব মতোই যেন কল্লোল তুলে ছুটেছিল বুক তোলপাড কবে। সে দুই হাত বাডিযে তাকে জডিয়ে ধবে নিজেব দিকে আকর্ষণ কবেছিল। কিন্তু আশ্চর্য! কাজল আর্তকণ্ঠে চিৎকাব কবে উঠেছিল—আনন্দ!

—চুপ কব, চেঁচিয়ো না। কাজল।

কিন্তু সে থামেনি, আর্তকণ্ঠেই বলেছিল— আনন্দ। না না না। দু'হাত দিয়ে তাব মুখ ঠেলে দিয়েছিল। নিজেকে ছাডাতে চেযেছিল। কিন্তু আনন্দ তাকে ছাড়তে চায়নি। অকস্মাৎ কি কবে একটা হাত ছাডিয়ে কাজল তাকে চড় মেবেছে, খামচে দিয়েছে। প্রায় চিৎকাব কবে উঠেছে।

ঘাটের উপর মোটরের থামবার শব্দ হয়েছিল এই মুহূর্তটিতে। ছেড়ে দিয়েছিল আনন্দ। কাজল উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল। ছি—ছি—ছি! ছি তোমাকে! বলে সে অন্ধকারের মধ্যেই কাপড় ঠিক করে নিয়ে হন্ হন্ করে ঢাল থেকে উপরে উঠে এসেছিল। আনন্দ কয়েক মুহূর্ত পর উঠে তার পিছন ধরেছিল। সে এর শোধ নেবে। কিছুদূর এসেই গঙ্গার ধারে জনসমাগমের মধ্যে কাজল মিশে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে এসেছিল একটা ট্যাক্সি ধরে। এসে উঠেছিল বারে। বারে মদ খেয়ে সে গোটা ময়দান ঘুরেছে ট্যাক্সিতে কাজলের সন্ধানে নয়। অন্যের সন্ধানে। যবনিকা পড়ুক। মাথায় আগুন জ্বলছে। ফিরেছে রাত্রে। রাত্রি প্রায় বারোটা। কাজলদের পাড়ার রাস্তাটার মোড়ে গাড়িকে থামতে বলে সে নামতে গিয়ে দেখল পা ঠিক নেই। তাছাড়া রাত্রি বারোটা। বললে—চলো! থোড়া দূর। বাঁয়ে রাস্তেসে।

হরিয়া তাকে ধরে নামালে। শুইয়ে দিলে। আনন্দ বললে—শুইয়ে দে।

হরিয়া শোওয়াতে গিয়ে বললে—সে এসেছিল।

—কাল শুনব। আজ যেতে দে।

সকালে উঠল সে ক্ষোভে ক্রোধে জ্বালাধরা অন্তর নিয়ে। সমস্ত কিছুর প্রতি নিষ্ঠুর আক্রোশে তার মন ভরে উঠেছে। ভুল! সে ভুল করেছে এতদিন। সকালবেলা চা দিতে এসে হরিয়া বললে—কাল রাতে সে এসেছিল। চিঠি লিখে গেল। বললে, বাবুকে দিয়ো।

—চিঠি? কে? কে লিখে গেছে—কে?

লেখা দেখে মনটা আরও জ্বলে গেল। কাজল, না শ্যামলী। সেই কালো ভিখিরী মেয়েটা। সেই। তিরস্কার করেছে। হয়তো ভয় দেখিয়েছে। ছিঁড়ে ফেলে দিতে গেল সে। কিন্তু কি ভেবে সে খুললে--চিঠিখানা খুললে। কি লিখেছে সে।

প্রিয়তম আনন্দ,

আত্মহত্যা ছাড়া আমার পথ নেই. ভুল করেই, হয়তো অভ্যাসবশে তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে তোমাকে আঘাত করেছিলাম। পালিয়ে এসেছিলাম। এসপ্লানেডে এসে বুঝতে পারলাম তোমাকে হারাচ্ছি আমি। তোমাকে হারিয়ে কি করে বাঁচব আমি? এই ভালবাসা তো কাউকে বাসিনি আমি। বিশ্বাস কর। আমাকেও তুমি ছাড়া কেউ দয়া করে তো ভালবাসেনি। ভোগ হয়তো করতে চেয়েছিলো। কিন্তু বাবার কাছে শিক্ষায় তা পারিনি। সে আত্মহত্যা। সেই কারণেই, সেই অভ্যাসেই আজ তোমার প্রতি এমন রূঢ় হয়েছি। কিন্তু তারপর?

তোমাকে হারিয়ে কি করে বাঁচব? বুঝতে পারছি, নিশ্চয় বুঝছি তোমাকে হারিয়ে বাঁচতে পারব না আমি। আত্মহত্যা করতে হবে। বাঁচতে না পারলেই আত্মহত্যা করতে হবে। তাই ভেবে ফিরে তোমার বাসায় এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, বলব—আমাকে নাও। যা ইচ্ছে হয় কর। আমি ঢেলে দিলাম নিজেকে। আত্মহত্যা যদি করতে হয় আনন্দ তা হলে তোমাকে পেয়েই মরব। সে মরণে সুখ পাব। কিন্তু তুমি ফিরলে

না। আজ ফিরে যাচ্ছি। কাল আসব। আত্মসমর্পণ করতে আসব। দুপুরবেলা আসব। তুমি বাসর সাজিয়ে রেখো—এটা আমার সাধ।

—কাজল

আনন্দের ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মন আক্রোশে পরিতৃপ্তিতে উল্লাসে ভরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা বাসনা যেন ফেনিল হয়ে উঠল। সে আসবে। সে আসবে। এই জীবন। দিস ইজ লাইফ।

—হরিয়া!

—আঁ।

—মিস্ত্রী ডাক। পাখাটা টাঙা। আমি আসছি।

সে বেরিয়ে গিযে বাজার থেকে কিনে আনলে ফুল, নতুন বিছানার চাদর বালিশ। কিনে আনলে মদ! হয়তো কাজল শেষ মির্নাত কববে। বলবে বিয়ে কর! না। মদ খেয়ে সে শক্ত হবে। উল্লসিত হলো। ট্যাক্সিতে বসেই সে মদ খেলে খানিকটা। একটুক্ষণের মধ্যেই মাথাটা রমবম করে উঠল। ঘরে ঢুকে হরিয়াকে বললে—নতুন চাদর পাত! ফুলগুলো সে ফুলদানিতে সাজিযে দিলে। হরিয়াকে বললে—খাবার শিগ্‌গির তৈরি কর।

—বেরুবে?

—না।

—দশটার পর কাজল আসবে। বুঝলি? তুই আজ দুপুবে সিনেমায যাবি।

সে আসবে! সে আসবে! সে আর একটু মদ খেলে।

বেলা বারোটার সময় সে খেয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। মাথায় নতুন সিলিং ফ্যান, নতুন শয্যা। চারিদিকে রজনীগন্ধার ঝাড। সে আসবে। আয়নায় নিজেকে দেখলে। থম থম করছে তার মুখ। প্রদীপ্ত উল্লাসে উগ্র হয়ে উঠেছে। উঠুক। সে পুরুষ! নীল আলোটা জ্বেলে ঘরেব জানালা বন্ধ কবে দিল সে। নীলাভ অন্ধকাব হোক। ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। অকস্মাৎ শব্দ উঠল—

—চ্রি-রি-ক। চ্রিক্-চ্রিক্! চ্রিক্।

পাখার ফ্ররর্ শব্দ তুলে চড়ুইটা বাসা থেকে বেরিযে ঘরময় উডতে লাগল।

এসে বসল কোণে। সেখান থেকে উড়ে হোল্ডারে। সেখান থেকে ঘরময় বেড়াতে লাগল—আতঙ্কিতেব মতো। এখনও ওর জানালা বন্ধের সময় হয়নি। ও বাইরে যাবে! হঠাৎ তার মাথায় এসে ধাক্কা খেলে। কিন্তু সেবারেব মতো নয়। সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে গেল। উডতে লাগল।

সে আসবে। চড়ুইটার উপব নিষ্ঠুর আক্রোশ হলো তার। সে এক পা এগুলো জানালা খুলে দিতে। পরমুহূর্তেই ঘুরল। আপদ! জ্বালালে! দীর্ঘদিন থেকে জ্বালাচ্ছে। সে ঘুরে এগিয়ে গেল এবং পাখার সুইচটা টিপে দিলে। বোঁ-ও শব্দে ঘুরে উঠল পাখাটা। প্রথমে ধীরে তারপর জোরে। পাখিটা দিশাহারার মতো উড়ছে। পাখাটা

নতুন। সে এক ভয়। উড়ছে। আনন্দ তাকিয়ে আছে। খট করে একটা শব্দ হলো। তারপর একটা পিন্ কুশন মাটিতে পড়ার শব্দ। পড়েছে। মদের উত্তেজনায় উত্তেজিত আনন্দ—পাখিটাকে কুড়িয়ে নিলে। থরথর করে কাঁপছে পাখিটা। তার সেই স্পন্দন আনন্দের শিরায় স্নায়ুতে যেন কেমন অস্বস্তিকর ঠেকছে। সে টিপে ধরলে। ঠোঁটের উপর নিজের দাঁতও টিপে বসল সঙ্গে সঙ্গে। সোজা হয়ে উঠতে গিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ও কে? ও কে? ওই আয়নার মধ্যে! আদিম অরণ্যচারী হিংস্র মুখ রেখায় রেখায় বীভৎস। ও কে? আনন্দ!—এই জন্তুটা তার মধ্যে ছিল! এই জন্তু সে! এমন জন্তু? তার হাতখানা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। পাখিটার রক্ত! গরম। বড় বেশি গবম। এও গরম! ভয় পাচ্ছে আনন্দ আয়নার মধ্যে মূর্তিটা দেখে। নীলাভ অন্ধকারের মধ্যে ওই ভয়ঙ্কর হিংস্র মানুষ,—ওঃ! সে চোখ বন্ধ কবে বারবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে যেন সজোরে সবেগে অস্বীকার করে বললে না—না—না।

—হরি!

চমকে উঠল আনন্দ।

পরমুহূর্তে আবার ডাক এল—আনন্দ!

আনন্দ মরা পাখিটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বীভৎস—বক্তাক্ত হাত। মরা পাখিটার চোখ দুটো আশ্চর্য কালো এবং করুণ! ওঃ!

—আনন্দ, আমি এসেছি।

আনন্দ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—না—না—না। ফিরে যাও। তুমি ফিরে যাও! আনন্দ পাগল হয়ে গেছে ভয়ে, দুরন্ত ভয়ে!

—রাগ করো না তুমি আনন্দ!

আনন্দ চিৎকার করে বললে—না--না—না।

হঠাৎ সে থেমে গেল। দৃষ্টি শূন্য হয়ে গেল।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল রবিবর্মার একটা ছবির কথা। ছেলেবেলায় দেখেছিল। জটায়ুবধ। রাবণ হিংস্র নিষ্ঠুব জন্তুর ভঙ্গিতে পৈশাচিক আনন্দ; চোখে ক্রোধ, নিষ্ঠুর কৌতুক; হাতে তলোয়ার, জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করেছে, বিরাট জটায়ু পড়েছে। বেপথু সীতা কাঁপছে।

সে কি রাবণ? চড়ুইটা কি ছোট থেকে বড হযে উঠেছে? প্রকাণ্ড বড? জটায়ু? ও ঘরে কাজল থর থর করে কাঁপছে?

না—না। সে রাবণ? হতে পারে না। পারবে না। রামও হতে চায় না। কাজলও সীতা নয়। কিন্তু পাখিটা—

পরমুহূর্তে হাতের মরা পাখিটার দিকে সে তাকাল। আঃ মেরে ফেললে সে? এমন নিরীহ জীবটাকে অবলীলাক্রমে মেরে ফেললে! কি করে মারলে? কিন্তু একি? অকস্মাৎ তার একি হলো! হু-হু করে জল বেরিয়ে আসছে। অজস্র অশ্রু। একটা ছোট পাখির এত রক্ত?

ওদিকে বাইরে একটি ক্যাঁচ শব্দ উঠল। বেরিয়ে যাচ্ছে সে। সে ডাকলে- -কাজল ! কাজল ! আবেগ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ধরা গলায় উঠছে বুকের মধ্যে।

—আনন্দ।

দরজা খুলে দিলে আনন্দ। কাজল বাইরে দাঁড়িয়ে।

—তুমি কাঁদছ আনন্দ !

—পাখিটাকে মেরে ফেললাম কাজল।

—তার জন্যে কাঁদছ ?

—কাঁদছি।

অবাক হয়ে গেল কাজল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

আনন্দ চোখ মুছে বললে—শোন।

—কি ?

—তুমি বাড়ি যাও কাজল এখন। না। চল আমি তোমার সঙ্গে তোমার মায়েব কাছে যাই। তোমায় চেয়ে নিয়ে আসি। আমাকে তুমি বিয়ে কববে তো কাজল ? বন্ধুত্ব নয়। বিয়ে। যে বিয়েতে মৃত্যু পর্যন্ত বিচ্ছেদ নেই।

কাজল এবাব কেঁদে ফেলল। নীবব অশ্রু। দবদব ধাবায তার সাবা মুখ ভেসে যেতে লাগল। আনন্দ কি বিচ্ছেদহীন মিলনেব কল্পনায বিভোব হযে উঠেছে!

মহানগরী

□●□

মহানগরী। স্বর্গলোকের ইন্দ্রপুরীর নাম বৈজয়ন্তী। সেখানে অন্ধকার নাই—আলোর রাজত্ব। সেখানে দুঃখ নাই শুধু সুখ আছে। সেখানে অশান্তি নাই—শুধু শান্তি আছে। সেখানে অতৃপ্তি নাই—শুধু তৃপ্তি আছে। সেখানে দৈন্য নাই, পরম ঐশ্বর্যে ঝলমল করছে সে পুরী। সেখানে জরামরণ নাই, আছে অনন্ত যৌবন এবং অমরত্ব। হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পাপ নাই, প্রেমের রাজত্ব, প্রীতির নিলয়, পুণ্যের পবিত্রতায় নিষ্কলুষ, পবিত্র। তাই ধ্বংস নাই; মানুষ বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেলেও স্বর্গপুরী থাকবে।

এ মহানগরী মাটির বুকের উপর রচনা করেছে মানুষ। সম্ভবত ওই বৈজয়ন্তীর মতোই একটি পুরী রচনা করবার কল্পনায় সে সভ্যতার উন্মেষেব প্রথম দিন থেকে পুরুষানুক্রমে বিভোর হয়ে আছে। ভাঙছে-গড়ছে, গড়ছে-ভাঙছে। অনিচ্ছায় ভাঙে, স্বেচ্ছায় ভাঙে। প্রকৃতিব মধ্যে চলে ভাঙাগড়া, শীতের পর আসে গ্রীষ্ম—গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা—আকাশে ওঠে কালবৈশাখীর ঝড়, ঝড় আনে মেঘ- -মেঘের বর্ষণে আসে প্রলয় প্লাবনের মতো বন্যা—সেই ঝড়ে নগর ভাঙে, বন্যায় ডুবে যায়, পলিমাটি চাপিয়ে দিয়ে যায় স্তরে স্তরে। ঝড় বন্যার সঙ্গে আছে আগুন। নগরকে যে দীপমালা মানুষ পরায়—তারই আগুন লাগে, যে অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন মানুষ করে জীবনেব প্রয়োজনে— সেই আগুন লাগে। আগেকার কালে আসত লুণ্ঠনকাবী দস্যুদল —আসত নিষ্ঠুর অভিযানকারীর দল—তারা আগুন লাগিয়ে দিত—নগরীর মাথায় মাথায়, সম্পদভরা নগরীর ঘরে, নগর পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মানুষ কিন্তু আবার গড়ত। এই নূতন গঠনে তার রূপ হত অভিনব, উজ্জ্বলতর। তার জীবনের আধুনিকতম আবিষ্কারকে সে কাজে লাগাত। আজকালকাব অভিযানকারী আগেকার কালেব মতো ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে বর্শাফলকে মানুষের মুণ্ড গেঁথে দাউ দাউ কবে জ্বালানো মশাল হাতে নগরে ঢুকে আগুন লাগায় না। মাথার উপরে ওড়ে এরোপ্লেন—তাই থেকে ফেলে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোবক বোমা—বিপুল শব্দ করে বিস্ফোরণ হয়—মানুষের সাধের রচিত নগবীর ঘরবাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ধুলো হয়ে ভেঙে পড়ে, ইনসেন্ডারী বোমায় আগুন লাগে। যেকালের কথা বলছি তখন অ্যাটমবম তৈরি হয়নি, যুদ্ধ তখনও লাগেনি; সুতরাং অ্যাটমবমের কথা থাক। আগুনে পুড়ে বোমায় ভেঙে নগর ধ্বংস হয়; মনে হয় এ আর কখনও গড়ে উঠবে না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের উপর আবার মানুষ গড়ে সমৃদ্ধতর নগব। আগুনের পর আছে ভূমিকম্প—তারপর আছে মহামারী—মানুষের সৃষ্ট আবর্জনা থেকে উদ্ভব হয় মৃত্যুরোগের। মহামারীতে নগব হয় জনশূন্য— খাঁ-খাঁ করে।

ইতিহাসে গল্প আছে—গৌতম বুদ্ধ কুশীনগরে মহানির্বাণ লাভের জন্য যাত্রাপথে গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটল বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে আনন্দকে বলেছিলেন—আনন্দ শোন, আমি দেখতে পাচ্ছি—ভাবীকালে এইখানে গড়ে উঠবে এক মহানগরী। কিন্তু উত্তরকালে অগ্নিদাহে এবং জলপ্লাবনে সে নগর ধ্বংস হয়ে যাবে।

বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ অবশ্য হয় নাই। অজাতশত্রুর পত্তন করা পাটলীপুত্র ভারতবর্ষের রাজধানী হয়েছিল একদিন, সে নগর ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়েছিল। মাটির তলা থেকে আজ তাকে খুঁড়ে বের করছে মানুষ। কিন্তু পাটলীপুত্র একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ইতিহাসের অজ্ঞাত এক অধ্যায়ের পরে আবার পাটলীপুত্র গড়ে তুলেছিল মানুষ, মুসলমানের রাজত্বে পাটনা ভেঙেছে গড়েছে, আবার ইংরেজের আমলে ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে আজ সে নূতন করে গড়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর স্বর্গলোক কলকাতা মহানগরী। সমগ্র দেশের ভাবীকাল এইখানে রচিত হচ্ছে, বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এইখানেই হয় এ দেশের মানুষের ভাববিনিময়, লেনদেনের বোঝাপড়া। বিমল এ মহানগরীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই সে পল্লীকে পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে, এইখানেই সে বাস করবে, এইখানেই তার স্থান তাকে করে নিতে হবে।

বিমল গাছতলায় একটি বেঞ্চে বসে ছিল। সেখান থেকে উঠে ধীরে ধীরে এল এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপোয়। পিছনে স্ট্র্যান্ডের ওধারে গঙ্গায় জাহাজের স্টীমারের বাঁশী বাজছে। গঙ্গার ধারে মিলে ভোঁ বাজল। খিদিরপুর বেহালা আলিপুরের ট্রামগুলো আসছে বিপুল গতিতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ এবং ঘণ্টার শব্দ উঠছে। চৌরঙ্গি ধরে চলেছে বাস, মোটর, লরী; হর্ন বাজছে, ইঞ্জিন গোঙাচ্ছে। কোথাও বোধ হয় কোন হোটেলে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। পার্কটার মোড়েই বিক্রি করছে ঘুগনি, দইবড়া, পকৌড়ি, গরম ভাজা বাদাম, আলুর চপ। কাগজওয়ালারা সান্ধ্য সংস্করণ কাগজ বিক্রি করছে। কয়েকজন রেসের বই নিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে। উত্তরে সাততলা বাড়িটার মাথার উপরে গোলকের মাথায় খুব জোরালো একটা বাল্ব জ্বলছে, ধর্মতলার মোড়ে গিসগিস করছে লোক, আলো ঝলমল করছে, উত্তর পশ্চিম কোণে খাবারের দোকানটার মাথায় ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে।

— শুনুন।

ফিরে তাকিয়ে দেখেই বিমল বিরক্ত হলো। বিশ বাইশ কি চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে ডাকছে। আধুনিক রুচি অনুযায়ী কাপড় চোপড় পরা, পায়ে স্যান্ডেল, হাতে একটা ব্যাগ। সে তাকে ডাকছিল শুনুন।

মেয়েটির সঠিক পরিচয় না জানলেও মেয়েটিকে সে প্রায় নিত্যই এখানে দেখে। এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। তারপর অদৃশ্য হয় তাকে নিয়ে। শুধু ওই মেয়েটি একা নয়, আরও অনেকে আসে। কালীঘাটের ট্রাম থেকে একটি মেয়ে নামে, উল্কার মতো গতিতে, ভিড় চিরে চলে হন্ হন্

করে। পাশ থেকে কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। সামনে গিয়ে গতিরোধ করে দাঁড়ালে তবে সে দাড়ায়। তারপর গিয়ে ওঠে কোন রেস্তোরাঁয় অথবা ওঠে ট্যাক্সিতে অথবা ঘুরে পশ্চিম মুখে চলতে থাকে ইডেন গার্ডেনের দিকে।

বিরক্ত হয়েই সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি এর পরেই যে কথা বললে তাতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, সে বললে—আপনিই তো বিমলবাবু?

চমকে উঠল বিমল। মেয়েটি তার নাম জানলে কেমন করে! শঙ্কিত হলো সে। ব্ল্যাকমেলিংয়ের কোন ফন্দি নয় তো? কিন্তু তাকে ব্ল্যাকমেল করে ফল কি? শত্রুই বা তার এমন কে আছে? ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে বললে—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এল। কাছে আসতেই বিমল তাকে দেখে আরও একটু বিস্মিত হলো। যাকে সে ভেবেছিল এ তো সে নয়। একে কখনও দেখেছে বলে মনে হলো না। মেয়েটি বললে—আপনাকে আমি রেডিয়ো আপিসে দেখেছি। আজ বিকেল বেলায় আপনি গিয়েছিলেন। আপনি গল্প পড়লেন সেখানে। আপনার নাম বললে। পড়া শেষ করে আপনি বাইরের অপিসে এসে চেক নিলেন, আপনাকে তখনই দেখেছি আমি।

—তা তো বুঝলুম। কিন্তু আপনি সেখানে কেন গিয়েছিলেন? আমাকেই বা আপনার প্রয়োজন কিসের?

—আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—বিপদ? কি বিপদ?

—কলকাতায় এসেছি আমি। আমার বাড়ি ঢাকায়। রেডিয়োতে গান করেন—ওখানে খুবই প্রতিপত্তি আছে বলে শোনা যায়— অরুণ রায়, চেনেন আপনি? চুল কোঁকড়া, খুব ফরসা রঙ।

—চিনি বৈ কি!

—তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমার গান শুনে তিনি বলেছিলেন কলকাতায় এলে আমি অনেক বড় ফিল্ড পাব। রেডিয়োতে তিনি প্রোগ্রাম করে দেবেন—সিনেমাতে বলে দেবেন, সেখানে আমি স্কোপ পাব। আমি তাই এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে—

মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ফেললে—কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে বললে—আমার কোন আশ্রয় পর্যন্ত নেই। আমি—আমি—। আর সে কথা বলতে পারলে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—সে কি? স্তম্ভিত হয়ে গেল বিমল।

—আজ রাত্রিটার মতো আমায় কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

বিমল একটু চিন্তায় পড়ল। ঠিক বুঝতে পারছে না সে। মেয়েটি যার নাম করছে সেই অরুণ রায়কে সে জানে। অনেকেই জানে কলকাতা শহরে। বিশেষ করে

ফ্যাশানেবল সোসাইটিতে। কখনও ধুতি-পাঞ্জাবি, কখনও সুট, কখনও পায়জামা-আচকান, কখনও পাঞ্জাবি ও চুস্ত পায়জামা পড়ে বেড়ায়, মোটরেই দেখা যায় বেশির ভাগ। সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে কিসে সে বিশেষজ্ঞ নয়! কোন্ দলে সে মেশে না! তার পাশে অহরহ কোন না কোন তরুণী বান্ধবী থাকেই। যাকে বলে আলট্রামডার্ন। বাপ দিল্লীতে বড় চাকুরে। সম্ভবত পুত্রের যোগ্য বাপ-মা। সম্প্রতি কোন বিখ্যাত শিল্পীর বাড়িতে তাকে দেখেছিল বিমল, তার সঙ্গে ছিল পাঞ্জাবিনীর পোশাকপরা এক তরুণী—পরিচয়ে জেনেছিল সে অরুণ রায়ের সহোদরা, তাদের সঙ্গে ছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ভদ্রলোক, সে হলো অরুণের ভগ্নীপতি। কোন বিখ্যাত সমালোচকের আসরে তাকে দেখেছিল, সেখানে ছিল একটি ভিন্ন-প্রদেশবাসিনী কবিযশপ্রার্থিনী এক বান্ধবী। মেট্রো সিনেমার দরজায় দেখেছিল—সঙ্গে ছিল একটি অ্যাংলোইন্ডিয়ান মেয়ে, সে নাকি ভারতীয় নৃত্যে পটিয়সী। অরুণ রায় খ্যাতিমান এবং সকল কর্মে পারঙ্গম।

মেয়েটি বললে—আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?

বিমল স্পষ্টই বললে—দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না। আপনি যে কাহিনী বললেন—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে—কাহিনী নয়, সম্পূর্ণ সত্য। হাতের ব্যাগ খুলে সে একখানি পত্র বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বললে—পড়ে দেখুন, অরুণবাবুর পত্র।

বিমল পত্রখানি হাতে নিয়েও পড়লে না, বললে—কিন্তু আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করব? এখানে আমি একা থাকি একখানি ঘরে, খাই হোটেলে—আপনার ব্যবস্থা কোথায় করতে পারি ভেবে তো পাচ্ছি না। আপনি উঠেছিলেন কোথায়?

—হোটেলে। মেয়েটি তিক্ত হাসি হাসলে। বললে—খরচপত্র দিয়ে অরুণবাবু হোটেলে ঘরভাড়া করে রেখেছিলেন। স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়েও এসেছিলেন। তারপর—। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল মেয়েটি। তারপর বললে—হোটেল থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এসেছি।

—দেশে চলে গেলেন না কেন?

—না। দেশে আমি ফিরব না। সে বারবার ঘাড় নেড়ে তার সংকল্পের দৃঢ়তার ইঙ্গিত প্রকাশ করলে।—দেশে আমার কেউ নেই; আশ্রয় আমাকে খুঁজে নিতেই হবে। মানুষের উপর বিশ্বাস করে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই খুব বড় ধাক্কা খেয়েছি। বড় অসহায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে আপনাকে ধরেছি। একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ বললে—নইলে—নইলে—। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। তারপর বললে—সাহিত্যিকদের দুর্নামের কথাও আমার অজানা নয়। তবু এ দুর্নামে তাদের ক্ষতি হয় এবং ওই অরুণ রায় কি—হঠাৎ থেমে সে এসপ্ল্যানেডের গেটটার থামের গায়ে লাগানো একখানি সিনেমার পোস্টারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই লোকটা—

—কে? বিস্মিত হয়ে বিমল প্রশ্ন করলে। কোন্ লোকটা?

—ওই যে পোস্টারে ছবি রয়েছে। লোকটার নাম করতেও ঘেন্না হচ্ছে আমার।

'অভিসারিকা' নামক নবতম চিত্রাবদানের পোস্টারে নায়ক রতন রায়ের হাসি মুখ দেখা যাচ্ছিল। আদর্শবাদী যুবকের ভূমিকায় রতন রায়কে দেখা যাবে। আগামী ২রা মার্চ ১৯৩৭ সালে শুভ উদ্বোধন হবে ছবির। দিনটি শুভদিন তাতে সন্দেহ নাই।

মেয়েটি বললে—অরুণ রায় কি ওই লোকটার সঙ্গে তাঁদের তুলনা আমি করি না। তাছাড়া—এ সব বিষয়ে আপনার সুনামের কথাই শুনেছি। লেখা পড়ে বিশ্বাস করতে ভরসা হয়। তাই অসঙ্কোচেই উপযাচিকা হয়ে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। রাত্রিটার মতো কোন ভদ্রলোকের অন্দরমহলে আমাকে আশ্রয় দেখে দিতে হবে আপনাকে। এরই মধ্যে কতকগুলো গুণ্ডা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

বিমল শেষ কথাটায় চকিত হয়ে উঠল। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেই বললে—আসুন। কালীঘাটের ট্রাম।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল কালীঘাটের ট্রাম। সে উঠে পডল। পিছন পিছন মেয়েটিও উঠল। বিমল তাকে লেডিস্ সিটে বসিয়ে দিয়ে সামনের সিটটায় বসল। ১৯৩৭ সালের কথা—কলকাতায় এত ভিড ছিল না তখন, ট্রামখানা খালিই যাচ্ছিল। সিটে বসে বিমল তার হাতের চিঠিখানা মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলে, বললে—রাখুন আপনার চিঠি।

—না পড়ুন আপনি। আমি চাই চিঠিখানা আপনি পড়েন। খামখানা ঘুরিয়ে দেখে বিমল চিঠিখানা পকেটে রাখলে। মেয়েটির নাম—অরুণা ঘোষ।

দুই

চৌরঙ্গির ভিজে পিচঢালা পথ আলোর ছটায় কালো অজগরের মসৃণ পিঠের মতো চকচক করছে। পশ্চিমদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে; শীতের বাদলায় ময়দান আজ জনহীন। পূর্বদিকে ফুটপাথেও লোকের ভিড নাই। দোকানের শো-কেসগুলি আলোর প্রাচুর্যে ঝকমক করছে, বড়দিনের রঙীন কাগজের সজ্জা এখনও খুলে ফেলা হয়নি। ট্রামেও খুব ভিড ছিল না। যারা ছিল তারাও সকলেই প্রায় নেমে গেল ভবানীপুরে, যদুবাবুর বাজার থেকে পূর্ণ থিয়েটারের মোড পর্যন্ত। এদিকটায় লোকজনের ভিড় কিছুটা রয়েছে।

মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে জানালার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে। অরুণা ঘোষ, মেয়েটির চিঠিতে ওই নাম লেখা রয়েছে। কি ভাবছে ও-ই জানে। অনেক উদ্বেগের পর একটা আশ্রয় পেয়ে পথশ্রান্ত পথিকের গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ার মতো অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এমনও হতে পারে, অথবা নিরাশ্রয় অবস্থার উদ্বেগে অধীর হয়ে এই অপরিচিত আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে এখন তার ভবিষ্যতের ভালমন্দ বিচার করছে স্তব্ধ হয়ে—এমনও হতে পারে। বিমল ভাবছিল। ভাবছিল কোথায় তাকে নিয়ে

যাবে। তার কয়েকজন সম্পদশালী আত্মীয়স্বজন আছেন। একটা রাত্রির মতো আশ্রয় দিতে তাঁরা অস্বীকার করবেন না। কিন্তু—। এই সম্পদ-সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিমল জীবনে দূরে রেখেই চলতে চায়। এই মানুষগুলির মনোভাব বিচিত্র, উদারতা আছে কিন্তু সে উদারতা চেষ্টাকৃত, স্বভাবস্ফূর্ত নয়, উপকার করেন কিন্তু চিরদিন মনে করে রাখেন উপকার করেছি বলে, প্রত্যুপকারেও এ শোধ হয় না; টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে শোধ নিয়েও বলে থাকেন বিপদের সময় টাকাটা আমিই দিয়েছিলাম। শিক্ষাও এদের আছে—বি-এ, এম-এ পাশও করেছে বংশধরেরা, বাড়ির বহিরঙ্গে সাহেবীআনা প্রকট, সাহিত্য-আলোচনায়, জীবনের আচার-বিচারের সমালোচনায়, নারীর অধিকার এবং নরনারীর সম্পর্কের গণ্ডী বিচারে যে সব ভাল ভাল কথা বলে থাকেন সে সব শুনে বিমলের মনে প্রথম প্রথম আক্ষেপ হত, মনে হত এঁদের কত পিছনেই না পড়ে আছে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে হৃদয়ঙ্গম করেছে মিথ্যাভাষণে এমন অদ্ভুত পটুত্ব শ্রেণীগত সংস্কৃতি হিসেবে এ দেশের অন্য কোন শ্রেণী আয়ত্ত করতে পারেনি। মনের মধ্যে আসলে এই শ্রেণীর মানুষগুলি যত সন্দিগ্ধ তত সংকীর্ণ, রঙ্গমঞ্চে কুললক্ষ্মীর ভূমিকায় রঙমাখা লালপেড়ে শাড়িপরা অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করলে তবেই স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁদের ওখানে নিয়ে গেলে স্থান তাঁরা দেবেন, সমাদর করেই স্থান দেবেন কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে কুৎসিত সন্দেহ, স্বভাব অনুযায়ী জেগে উঠবে তাকে স্থির সত্য বলে প্রচার করবার জন্য একমুখ অধীর পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। মিথ্যানিন্দাকে বিমল ভয় অবশ্য করে না কিন্তু অকারণে তার অবকাশ দিতে সে চায় না কাউকে।

হাজরা রোড পার হয়ে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোয় ট্রাম দাঁড়াল। বিমল উঠল—মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ডাকল—উঠুন। এবার নামতে হবে। চকিত হয়ে মেয়েটি বললে—ও। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠল।

বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে দু'পাশে অসংখ্য ছোট রাস্তা। নূতন যুগে তৈরি শহরের এক অংশে গলি-পথ নাই। এ যুগে গলি-পথ অচল। পিচ দেওয়া ঝকঝকে তকতকে রাস্তাগুলি—সুপ্রশস্ত না হলেও প্রশস্ত। তারই মধ্যে একটা রাস্তা ধরে একটা ছোট পাঁচ মাথায় এসে দাঁড়াল বিমল। একদিকে একটা বিস্তীর্ণ বস্তী। প্লটের মালিকরা বাড়ি না করে বস্তী তুলে ভাড়া দিয়েছেন। হিসেব করে দেখেছেন—এতেই সুদ পোষায় বেশি।

অরুণা প্রশ্ন করলে—কোন্ দিকে আপনাব বাসা?

বিমল পশ্চিম দিকটা অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিলে।

—ও যে বস্তী!

হেসে বিমল বললে—ওরই প্রান্তসীমায় থাকি। এই যে বস্তীর উত্তর দিকের রাস্তাটা—ওইটেই বস্তী এবং বাসার মধ্যে বাউন্ডারি লাইন হয়ে রয়েছে। এ পাশে এই যে বাড়িগুলো—এই সারিরই বাড়িগুলোর মধ্যে একটা বাড়ির একখানা ঘর নিয়ে থাকি আমি।

—আমাকে কোথায় রাখবেন ? মেয়েটি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বিমলের চট করে মনে পড়ে গেল তার স্বর্গত বন্ধু সাহিত্যিক রবীন্দ্র মৈত্রের নাটক—মানময়ী গার্লস স্কুলের একটা কথা। নিঃসম্পর্কিয় একটি পুরুষ ও নারী মনের জোর থাকলে—একই ঘরে ট্রেনের এক কম্পার্টমেন্টের সহযাত্রীর মতো রাত্রিটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু রসিকতা করবার প্রলোভন ত্যাগ করলে সে। কথাটা মনে হতেই ঠোঁটে যে হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল—সেটুকু সে গোপন করলে না, হাসিমুখেই বলে—ভাবছি সেই কথা।

তারপর বললে—আসুন।

একটু দূরে একটা কয়লার ডিপো—তার সঙ্গে ছোট একটি মুদীখানা। সেখানে গিয়ে বিমল ডাকলে—চিত্ত! সঙ্গে সঙ্গে একখানা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—বসুন।

বিমলের গ্রামবাসী চিত্তরঞ্জন। বয়সে বিমলের কনিষ্ঠ—ছোটখাটো মানুষ, দেখে মনে হয় পনের-ষোল বছরের ছেলে, কানে খাটো; আপন চেষ্টায় গড়ে তুলেছে এই মুদীখানা—কয়লার ডিপো। একদল লরীর মালিকের সঙ্গেও খানিকটা ভাগে কারবার আছে, নিজে একখানা লরী ড্রাইভ করে, মাল বইবার অর্ডারও সংগ্রহ করে, তার জন্য একটা বখরা পায় সে। ভাল ঘরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়া শেখে নাই। প্রথম যৌবনে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসী হয়ে আর্য্যাবর্ত ঘুরেছে। মধ্যপথে গেরুয়া ছেড়ে ড্রাইভারি করেছিল। দেশে ফিরে ফিরিওয়ালার ব্যবসা করেছিল। সে ছেড়ে—প্রাইভেট ট্যাক্সীর ড্রাইভারি করতে গিয়ে পেশোয়ারীদের স্মাগ্‌লিং-এর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিল। নূতন মাস্টার বুইক গাড়ি নিয়ে কলকাতা থেকে যেত দুর্গাপুরের জঙ্গলের মধ্যে এক গোপন আড্ডায়, সেখান থেকে মাল নিয়ে রাত্রি দুপুরে ফিরত আড্ডায়। তার পাশে বসে থাকত একজন—কোমরে ছোরা, হাতে রিভলবার নিয়ে। কপটতা প্রকাশ করলে তখন সে ক্ষমা করে না, তার জন্যে ছুরি বার করে বসে প্রকাশ্যেই এবং তার জন্যে কোন ভয় নাই তার।

চিত্তরঞ্জন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভিতর থেকে উত্তর দিলে—দাদা! আসুন—আসুন—আসুন। এই রাত্রে ? বলতে বলতেই সে এগিয়ে এসে অরুণাকে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আপনি ? কি চান— ?

বিমল বললে—ওঁর জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। উনি বড় বিপদে পড়েছেন, রাত্রিটার জন্য তোমার বাড়িতে আশ্রয় দিতে পার ?

চিত্ত অরুণার মুখের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, বললে—কিছু মনে করবেন না। কাল সন্ধ্যাবেলা আপনি হোটেল উজ্জয়িনীতে ছিলেন না ? অ্যাক্টর রতনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন পশ্চিম দিকের খোলা বারান্দায় উত্তর দিকের কোণটায়— !

অরুণার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। চিত্ত বললে—ভুল হচ্ছে কি না জানি না। আমি ওই হোটেলটায় কয়লা সাপ্লাই করি কি না। ম্যানেজার চেয়ার-টেবিল সাজাবার ব্যবস্থা করছিলেন, আমার তাড়াতাড়ি ছিল—সেখানেই গেলাম। ঠিক আপনার মতো—

অরুণা এবার বললে—হ্যাঁ আমিই।

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—আপনিই! তাই তো বলি—এত ভুলই কি হবে আমার? তা হোটেল থেকে চলে এলেন কেন?

বিমল বললে—সে অনেক কথা চিত্ত। তবে উনি চলে এসেছেন—না এসে উপায় ছিল না। হঠাৎ আমায় রেডিয়ো আপিসে দেখে আমার পরিচয় পেয়ে আমায় একটু আশ্রয়ের জন্যে ধরেছেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত্রিটার মতো আশ্রয় করে দিতে হবে। আমার তো ওই একখানি ঘর। অবশ্য ওঁকে ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার দোকানে থাকতে পারি।

—উঁহু! ঘাড় নাড়লে চিত্ত। বললে—কথা উঠবে। যারা ওকে দেখবে আপনার ঘরে, তারা নানা কথা বলবে।

বিমল বললে—আমি বলছিলাম ওঁকে যদি রাত্রিটার মতো বউমার কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দাও—তুমি আমার ঘরে থাক।

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—সর্বনাশ। আপনার বউমাটিকে তো জানেন না। সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। ওঁর চৌদ্দপুরুষ - আমার চৌদ্দদুগুণে আঠাশ পুরুষ—আপনার হয়তো বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে সে ঘাড় নাড়তে লাগল।

—বাবু! ডিপোর কুলী একজন এসে দাঁড়াল।

প্রশ্নের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে তার মুখের দিকে চাইলে চিত্ত। কানে খাটো চিত্ত ছোটখাটো প্রশ্নোত্তর ইঙ্গিতেই সেরে নেয় স্বাভাবিক নিয়মে। কুলীটা বললে—বাবুলোক ডাকছে।

বিমল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। সে জানে ডিপোটার ভিতর দিকে কুলীদের ঘরে প্রায়ই চিত্ত এবং তার কয়েকজন বন্ধুর নৈশ আড্ডা বসে থাকে। এবং সে আড্ডায় চলে পান-ভোজন। গোপনতা নাই, তবে সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে ঘরের ভিতরেই বসে, গ্রীষ্মকালে ডিপোর কয়লার স্তূপের আড়াল দিয়ে খোলা জায়গায় পাতে প্যাকিং কেসের টেবিল এবং কয়েকটা মোড়া ও টুল। চিত্ত এখুনি গিয়ে মদ্যপান করে আসবে—তারপর অসঙ্কোচেই ফিরে এসে ক্রম শিথিলবন্ধন রসনায় কথা বলতে শুরু করবে। সুতরাং সে ব্যস্ত হয়ে বললে—তা হলে ওকে আমি আমার ঘরটাই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি তোমার এই মুদীখানাতেই শোব। বুঝলে!

চিত্ত বললে—দাঁড়ান দাঁড়ান। পাঁচ মিনিট। আমি আসছি। সে রাস্তায় নেমে পড়ল। বললে—এলাম বলে।

—কোথায় যাবে?

—আসছি।

অরুণা কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আমি আপনাকে বড় বিব্রত করলাম।

বিমল কোন উত্তর দিলে না। বিব্রত হয়েছে সে কথা স্বীকার না করে বিনয় দেখাবার মতো ঔদার্য তার ছিল না।

অরুণা বললে—আমি বুঝতে পারছি, হোটেল ছেড়ে চলে আসা আমার উচিত হয়নি। কাল সকালে বেরিয়ে যা হয় করাই বোধ হয় ঠিক হত। কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রতনবাবু যে রকম উৎপাত শুরু করেছিলেন—তাতে থাকতে ভরসা পেলাম না। সঙ্গে টাকাকড়িরও বেশি ছিল না, সম্বলের মধ্যে কয়েকগাছা চুড়ি বিক্রি করলাম দায়ে পড়ে, হোটেলের দেনা মিটিয়ে যা থাকল তাতে অন্য হোটেলে উঠতে ভয় পেলাম। তা-ছাড়া—

বিমলের কোন সাড়া না পেয়ে মেয়েটি আর বলতে উৎসাহ পেল না তবু মনে মনে সে আহত হলো। একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে নীরব হয়ে গেল।

চিত্ত এসে এই সময়টিতেই বললে—আসুন। একটা ব্যবস্থা করেছি।

অরুণা তাকালে তার মুখের দিকে, তার মুখ থেকে বিমলের মুখের দিকে। তার দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্ন ছিল। সে জানতে চাইছিল—আশ্রয় স্থানটির বিবরণ। বুঝতে চাইছিল—সে স্থান গ্রহণ করা যেতে পারে কি না!

বিমল প্রশ্ন করলে—কোথায় ব্যবস্থা করলে?

চিত্ত বললে—পাড়াতে তিন-চারটি বিধবা বেডায় দেখেছেন, বেশ আপ-টু-ডেট সাজপোশাক করে, পাডার ছোঁড়ারা যাদের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকায়।

—হ্যাঁ। কিন্তু তারা কে? কি করে তারা?

চিত্ত হাসলে। বললে—আগে বিধবা মেয়েরা কাশী যেত। লোকেও পাঠাত—খারাপ মেয়েদের, আবার যার কোথাও নাই—সে যেত কাশী, বিশ্বনাথ রক্ষাকর্তা—আর খেতেও পেত—ছত্র ছিল—মঠ ছিল। এখন আর কাশী যায় না। আসে কলকাতায়, তীর্থ বলুন তীর্থ—নরক বলুন নরক—যা খোঁজে পায়। এ বিধবা চারটি থাকে একটি বাড়িতে—আমার বাড়িওয়ালার বাড়ির পাশেই এক ভদ্রলোক থাকেন, তিনিই তাঁর বাড়িতে দু'খানা কামরা ভাড়া দিয়েছেন। ওদের একজন তাঁর নিজের লোকও বটেন। বাড়িতে একটা সেলাইয়ের কল আছে, দোকান থেকে কাটা কাপড় নিয়ে এসে সেলাই করে দেয়, পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ঘোরে, বালিশের ওয়াড়, টেবিল ক্লথ, পর্দা তৈরি করে বিক্রি করে। আমার সঙ্গে জানাশোনা আছে—আমি অর্ডার-টর্ডার যোগাড় করে দি। তাঁদের ওখানে গিযে বললাম। তা তাঁরা রাজী আছেন, তবে বাড়িটি পাকা—মেঝে বস্তী। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?

অরুণার চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল।—না-না-না। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব—

বাধা দিয়ে চিত্ত বললে—বিমলদাকে দেন ধন্যবাদ। উনি যদি সঙ্গে করে না আনতেন আপনাকে—তা হলে—। কিছু মনে করবেন না যেন। ঐ হোটেলটায় ওই অ্যাক্টর রতনলালের সঙ্গে দেখার পর আমার বিশ্বাসই হত না—আপনি ভদ্রঘরের কি ভদ্রমেয়ে বলে। তবে উনি যখন এসেছেন—তখন আরও খারাপ দেখলেও বিশ্বাস করব আমি।

পাশের গলির মুখে লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। বললে—কই চিত্তবাবু কে আসবেন?

চমৎকার দেখতে মেয়েটি। দীর্ঘাঙ্গী, বড় বড় চোখ—টিকালো নাক—বেশ মর্যাদাময়ী সুশ্রী মেয়ে। তেমনি সপ্রতিভ—অরুণাকে দেখে বললে—আসুন ভাই।

বিমলের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে সাহসই হয়নি, ইচ্ছে থাকলেও। আজকে এঁর দৌলতে সে সুযোগ হলো।

বিমল প্রতিনমস্কার করলে। বললে—আপনাদের কথা চিত্ত আমাকে বলেছে, আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। সত্যিই শ্রদ্ধা করি।

তিন

প্রকাণ্ড বস্তী। সাধারণত বস্তী বলতে যা আমরা বুঝে থাকি, বস্তীর আবহাওয়া বস্তীর মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কল্পনা, আমাদের শিক্ষিত সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনকে একসঙ্গে ভয় ঘৃণা এবং রোমাঞ্চকর বিস্ময়কে জাগিয়ে তোলে—এ বস্তী সে বস্তী নয়। ছিটে বেড়ার এবং কাঠের ফ্রেমে গাঁথা টিনের দেওয়ালের উপর খাপরা বা টিনের চালওয়ালা বাড়ির বসতিকে আমরা বস্তী বলে থাকি বটে, তবে এ বসতিটিকে বস্তী না বলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের পল্লী বলাই উচিত।

দালালগিন্নী হিরণবাবুর মা—এই বস্তী বা বসতি স্থাপনের মূল। তিন পাশের পাকা বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে তখন এখানে বস্তী পত্তনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ আন্দোলন মাটির নীচের এক মুঠো ছোলার মতো চাপ বেঁধে অঙ্কুরিত হয়ে মাথা ঠেলে উঠেছিল। দালালগিন্নীর এই বাড়িখানা দেখে সে আন্দোলনের মোড় ফিরে গেল। তাঁরা বললেন—এই ধরনের বস্তি—যাকে বস্তী বলা যায় না—তা হতে দিতে আপত্তি নাই। জায়গাটির মালিকও ব্যবসায়ের মধ্যে নতুন পথ দেখলেন। খারাপ দিকটা অনেক ভেবে দেখলেন। দেখলেন, এইসব অসচ্ছল অবস্থার লোকগুলির কাছে ভাড়া আদায় করা কষ্টকর। বাকি পড়বার সম্ভাবনা বেশি। এরা আইন জানে এবং দেখায়। সমস্ত বিবেচনা করেও তিনি দালালগিন্নীর পন্থানুসরণ করলেন। কারণ আইন জানলেও এবং দেখালেও এরা অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্বল। থানায় এবং আদালতে যার পয়সা আছে তার বিরুদ্ধে আইন দেখিয়ে কোন লাভ হয় না। আইন এবং বে-আইন এই দুয়ের মধ্যে যে ছিদ্রপথ আছে সেই পথে যাতায়াতে তিনি অভ্যস্ত। এবং তাঁর নিজের বাড়ির সামনেই পড়বে এই বস্তী। এই বস্তীতেই একদিন এই দালালগিন্নী একটি বিধবা মেয়েকে দেখলেন। মেয়েটির নাম লাবণ্য। সন্তানহীনা—আত্মীয়হীনা—বিধবা হবার পর কলকাতায় এসেছিল অবলা শিক্ষাশ্রমে শিক্ষার্থিনী হয়ে। বৎসরখানেক থাকার পর—সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন জীবিকার্জনের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্লাউজ-সায়া-সেমিজ সেলাই করে গৃহস্থ বাড়ির বরাত মতো। দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টভাবেই বলেছিলেন—তাড়িয়ে দিলে কেন?

লাবণ্যের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। লাবণ্যের মুখের গঠনে দীপ্তি আছে, বড় বড়

চোখ, টিকালো নাক, ধারালো ঠোঁট, রাগ বা ক্ষোভের রক্তোচ্ছ্বাসে মনে হয় শিখার মতো জ্বলে উঠছে। লাবণ্য খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—সে অনেক কথা।

দালালগিন্নী আর কোন প্রশ্ন করেন নাই। তারপরও কয়েকদিন নিত্য দেখাশুনা হয়েছিল একই পথের এখানে বা ওখানে। দালালগিন্নী একই প্রশ্ন করেছেন—হেসে সস্নেহে প্রশ্ন করেছেন—কেমন সুবিধে হচ্ছে ?

মেয়েটি কোনদিন বলত—হচ্ছে একরকম। কোনদিন চোখমুখ দীপ্ত করে বলত—ও সব জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন তো ? কি বলব ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দালালগিন্নী প্রশ্ন করেছিলেন—কোথায় আছ আজকাল ?

—প্রথম ওই কয়লার ডিপো কবেন চিত্তবাবু। উনিই আমাকে এখানে একটা বস্তীতে আধাভদ্র আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন। ওই যে ওদিকে গয়লাদের বস্তী রয়েছে ওই গয়লাদের বস্তীতে রয়েছি। একটি বাঙালী ব্রাহ্মণের মেয়ে একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে ঘর-সংসার পাতিয়ে রয়েছে, ছেলে মেয়ে জামাই নিয়ে থাকে, তাদের বাড়িতেই একখানা কুঠুরী ভাড়া নিয়েছি। দেখেছেন বোধ হয় তাকে, খুব মোটা, গলায় সোনার হার, পোশাকে বিধবা, সকালে পিতলের বালতিতে দুধ নিযে যায়। সঙ্গে থাকে কয়েকটা বড় লোমওয়ালা ছাগল। ছাগলের দুধও বেচে থাকে।

দুগ্ধব্যবসায়িনী সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে দালালগিন্নী তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—সময় করে একদিন আমার বাড়ি এসো না কেন ? আসবে ?

—আসব না কেন ? আপনার সময় হলে আজই যেতে পারি।

—কাজের ক্ষতি হবে না ?

—কাজ ? হাসলে লাবণ্য। বললে—ঘরে থাকতে পারি না বলেই বাইরে বেরিয়ে আসি, বাইরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি বলে মরতে ইচ্ছে করে। ঘরে গোয়ালিনীর সংসারে ঝগড়া—অশ্লীল কথা থেকে ঝাঁটা পর্যন্ত। বাইরে অভদ্র পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে পাশ ঘেঁষে যাবার ছলে মৃদুস্বরে আহ্বান—কখনও কখনও ইঙ্গিতময় স্পর্শ পর্যন্ত। কাজ পেলেও ঘরে থাকতে পারি না বলে কাজ শেষ হয় না, বাইরে ঘুরতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি বলে কাজ যোগাড়ও হয় না। বলে না জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ—আমার সেই অবস্থা।

দালালগিন্নী তখনই তাকে নিয়ে ফিরলেন। লাবণ্য সেইদিনই এ বাড়িতে এসেছে। লাবণ্যের ভাগ্যক্রমে তখন বাড়িতে দু'খানা ঘরের চত্বরটা খালিই ছিল। তারই একখানা ঘর তাকে দিয়ে বলেছিলেন—আমার ঘর দু'খানা তো পড়ে রয়েছে, তুমি থাক। সঙ্গতি হলে ভাড়া দিয়ো।

দালালগিন্নীর মমতা আন্তরিক। তিনি নিজে প্রথম জীবন থেকেই স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছেন—লোক চরিত্র তিনি জানেন এবং কথাবার্তা চালচলন থেকে ভালমন্দ তিনি বুঝতে পারেন, মেয়েটিকে তিনি অবিশ্বাসও করেন নাই। কিন্তু এই দুটি কারণেই তিনি লাবণ্যকে ঘরে স্থান দেন নাই। সম্প্রতি তিনি নিজের বিধবা কন্যাটি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রবধূটির নিজের অধিকার সম্পর্কে

ক্রমবর্ধমান সচেতনতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছে ভাবীকালে তাঁর অবর্তমানে বধূ পূর্ণ গৃহিণীত্বে আসীন হলে মেয়ের অবস্থা কি হবে এই চিন্তা তিনি না করে পারেন না। লাবণ্যকে তিনি নিয়ে এলেন, মেয়ে অমলাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য।

মাসখানেক যেতে না যেতে লাবণ্য আর একটি বিধবা তরুণীকে নিয়ে এল, আরও কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন; তারপর কিছুদিনের মধ্যে এল আর একজন। তখন দু'খানা ঘরই তারা ভাড়া নিলে—তারপর কিস্তীবন্দীতে কিনলে একটা সেলাইয়ের কল। ক্রমশ পিক্টোগ্রাফেব সরঞ্জাম, পশম বোনার কুরুশ-কাঁটা, ব্যাগ তৈরির চামড়ার উপর কারুকার্য করবার সরঞ্জাম এনে মাঝখানে ঘর ছেড়ে—রাস্তার দিকের দু'খানা ঘর ভাড়া নিলে; এর জন্য প্রচলিত ভাড়ার উপর পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিলে নিজে থেকেই। ক্রমে তিনজনের সঙ্গে আরও একজন এসে পুষ্ট করলে। দালালগিন্নীর মেয়ে অমলা ও চত্বরে থাকলেও সেও এখন একজন। অমলার বড় মেয়ে রানী বড় হয়ে উঠেছে, সেও কাজকর্মের অবসরে এখানে আসে, শেখে। কট্‌কট্‌ কট্‌কট্‌ শব্দে সেলাইযের কল চলে— মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলে, কাজেব কথাই বেশি, মধ্যে মধ্যে হাস্য-পরিহাসও চলে। তার অধিকাংশই তাদের দৈনন্দিন কক্ষপথে আগন্তুক কোন বিভ্রান্ত পথিকেব হোঁচোট খাওয়া বা পা পিছলে যাওয়া অথবা দুটি বিপরীত মুখ বিভ্রান্তের পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার কাহিনীকে অবলম্বন করেই চলে। পবস্পরেব প্রতি সরল বাক্যবাণও বর্ষণ করে। কখনও কখনও মৃদুহাস্য অকস্মাৎ কলহাস্যে ভেঙে পড়ে। মধ্যে মধ্যে বাইরেব দরজায় কড়া নাড়ে। ঝি দরজা খুলে দেয়, লাবণ্য উঠে যায় সামনের ঘরে। সামনেব ঘরখানিতে এককানি লম্বা টেবিলের উপরে কিছু কিছু সব রকম কাজের নমুনা সাজানো থাকে। খানচারেক সস্তা দামেব চেয়ারও আছে। আগন্তুক অধিকাংশই দোকানের লোক; দোকানদারেবাই এখন এদের কাছে জিনিস-পত্র নিয়ে থাকে। লাবণ্যই বেশির ভাগ সময কথাবার্তা বলে। মধ্যে মধ্যে আসে চিত্ত—কখনও কয়লার দাম, মুদীর দোকানের জিনিসের দাম নিয়ে যায়, কখনও নূতন অর্ডার আনে। কখনও এর্মানই এসে বলে—একটু চা খাওয়াও লাবণ্যদিদি। কখনও এসে বলে—একটা ছোকরা ঘুরঘুর করছিল। ছোঁড়াটার কান মলে দিয়েছে মহাবীর। পার্সটাও কেড়ে নিয়েছে—সে কথাটা লাবণ্যকে অবশ্য বলে না। লাবণ্যও পুলকিত হয় না। কখনও চিত্ত সংবাদ নিয়ে আসে, চোরাই ছিটের থানের নমুনাও বার করে দেয়।

কখনও কখনও আসে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দু'জন ভদ্রলোক, একজন প্রৌঢ় একজন তরুণ। এরা দু'জনেই শিল্পী। ডিজাইন নিয়ে আসে। ব্লাউস, ফ্রক, সায়া, টেবিল ক্লথ, বালিসের ওয়াড, বালিসের ঢাকা প্রভৃতির উপর কারুকার্যের নক্সার নমুনা।

অরুণা এদের মধ্যে এসে সমস্ত দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল। অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত কল চলল! আজকের গল্প সবই অরুণাকে নিয়ে। অরুণাকে প্রশ্ন করেছিল

ওরা। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা করলে না, তারা অসঙ্কোচে নিজেদের কথা বলে অরুণার সঙ্কোচ কাটিয়ে দিলে। গল্প বলা এবং শোনার মধ্য দিয়ে পরস্পরের কাহিনী শোনা হয়ে গেল। লাবণ্যদের এই বেঁচে থাকার টিঁকে থাকার বিস্ময়কর অথচ অতি সহজ দ্বন্দ্বের কথা শুনে অরুণা প্রায় অভিভূত হয়ে গেল। সে বললে—আপনাকে দিদি বলব ভাই লাবণ্যদিদি।

লাবণ্য বললে—ইচ্ছে হলে বলতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে ভাই সবাই সখী। প্রাণের কথা মনের কথা কারও কাছে কেউ গোপন করি না।

অরুণা হেসে বললে—তা হলে প্রাণের কথা বলি। আমি আপনার কাছেই থাকতে চাই।

লাবণ্য হাসলে।

অরুণা বললে—আপনার মনের কথা তো বললেন না?

লাবণ্য বললে—তুমি লেখাপড়া শিখেছ ভাই। তুমি কি দর্জির কাজ নিয়ে থাকতে পারবে? আর কেনই বা তা থাকবে? লেখাপড়া জানলে আমিই কি এই নিয়ে থাকতাম?

অরুণা হেসে বললে—আই-এ পর্যন্ত পড়েছি, এ কি লেখাপড়া জানা? তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া?

—তা ছাড়া—একটু দ্বিধা করেই বললে অরুণা—লাবণ্যদি, আপনার রূপ আছে আপনি বুঝতে পারেন না—যাদের রূপ নেই তাদের লেখাপড়া জানলেও চাকরি পাওয়ার কত কষ্ট। কালো মেয়ের সঙ্গে লোকে প্রেম করতে চায় কিন্তু বিয়ে—ওবে বাপরে—কালো মেয়ে তখন কালনাগিনী হয়ে ওঠে তাদের চোখে। বলে, ওরে বাব্বা! কি চক্রান্ত! নাগপাশে জড়িয়ে ফেলে দংশাতে চায়।

তিনটি মেয়েই হেসে উঠল। লাবণ্য হাসল না।

অরুণা বললে—ও আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি লাবণ্যদি। তবে যদি তাড়িয়ে দেন সে আলাদা কথা।

লাবণ্য বললে—ভেবে দেখ।

পরদিন সকালে উঠেছিল অরুণাই সকলের আগে। লেপের মধ্যে শুয়েই সে শিয়রের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজ বোধ হয় বাদলা কাটবে। কুয়াশা জমে উঠছে পৃথিবীর বুকে কিন্তু আকাশে মেঘ কাটা কাটা হয়ে দ্রুত ভেসে চলেছে। সে ভাবছিল গত রাত্রির কথা। রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনের আবেগের ঘনত্ব অনেকটা লঘু হয়ে এসেছে। কয়েকদিন দুশ্চিন্তা এবং বিপদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল কাল। এখন ভাবছিল ভবিষ্যতের কথা। লাবণ্যের গত রাত্রির কথাটাই তার সত্য বলে মনে হচ্ছে। সারা জীবন সে এই দর্জির কাজ নিয়ে থাকবে কি করে? কেনই বা থাকবে!

ঠিক এই মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লাবণ্য। স্মিত হাসিমুখে সে বললে—উঠেছ ? রাত্রে ঘুম হয়েছিল ?

হেসে অরুণা বললে—হয়েছিল। শরীরটা হাল্কা বোধ হচ্ছে।

লাবণ্য বললে—কাল রাত্রে ভেবে দেখলাম অরুণা, এখানে থাকাই তোমার ভাল। হোক না দর্জির কাজ! চাকরির চেয়ে অনেক ভাল। আর তোমাকে পেলে অনেক কাজ করতে পারব। বড় বড সাহেবী দোকানে তুমি যদি আমাদের কাজ নিয়ে গিয়ে চালাতে পার—তবেই আমরা উন্নতি করতে পারব।

অরুণা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, উত্তর দিলে না।

লাবণ্য বললে—মতের বদল করেছ নাকি ?

অরুণা বললে—বিমলবাবুর সঙ্গে আজ একবার পরামর্শ করব।

লাবণ্য বললে—ওঁকে আজ ওবেলায় এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ কর না। আমাদের এই সব দেখানোও হবে—পরামর্শ নেওয়াও হবে।

চার

মহানগরীর প্রভাত। আজকের সকালটি কুয়াশায় ঢাকা তীক্ষ্ণ শীতকাতর।

বিমল এরই মধ্যে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিল ; এটি তার অভ্যাস। মহানগরীর এই নূতন অঞ্চলটিতে সমাজের নবোদিত অভিজাত বা আভিজাত্যের কোঠায় নতুন প্রমোশনপ্রাপ্ত শ্রেণীর সংখ্যাই বেশি। বনিয়াদী অভিজাত যাঁরা তাঁরা অনেক আগেই পুরাতন মহানগরীর শ্রেষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে বহুকাল আগেই এসে বাস করছেন। নতুন কালে ব্যবসায়ে, চাকরিতে অর্থ উপার্জন করে তার সঙ্গে নূতন কালের বাঙালীজনোচিত সাহেবীয়ানা অর্থাৎ সস্তা মডার্ন কালচার আয়ত্ত করে পুরানো কলকাতা থেকে সরে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। উপনিবেশ স্থাপনকর্তারা অধিকাংশই প্রৌঢ়—অনেকেই খেতাবধারী ; রাজা, স্যার প্রভৃতি উপাধির সংখ্যা কম—রায়বাহাদুর অনেক। ডেপুটি, ডি-এস-পি, সাবজজেরা খেতাব এবং পেনসন নিয়ে এই উপনিবেশে সমাজপতি হয়ে বসেছেন। বাত, ডিসপেপসিয়া, এ দুটো রোগও তাঁদের মধ্যে খেতাব এবং পেনসনের মতো সাধারণ। এর প্রতিকারের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে—হন হন করে—একলা এবং দল বেঁধে লেক থেকে আরম্ভ করে পার্ক পর্যন্ত প্রাতর্ভ্রমণকারীর ভিড় জমে যায়। এঁদের উত্তরপুরুষ অর্থাৎ নবীনেরা পার্কে পার্কে টেনিস ক্লাব করেছেন : নিখুঁত পরিচ্ছদে তাঁরাও শীতের ভোরে একদফা টেনিস খেলেন। একটু রোদ চাড়া দিলে—খাওয়া-দাওয়া সেরে পার্কে আসেন অন্য দল, তাঁরা খেলেন ক্রিকেট। থলে হাতে বাজারযাত্রী গৃহস্বামীদের সংখ্যা এখানে কম। যাঁরা আছেন তাঁরা বড় রাস্তা ধরে হাঁটেন না, গলিপথে হাঁটেন ; দারিদ্র্যগত মানসিক জটিলতা, ব্যাধিতে অধিকাংশই এঁরা ব্যাধিগ্রস্ত। অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই বাজার করান চাকর দিয়ে, ভোজন বিলাসী এবং কঠোর হিসাবীরা বাজারে যান চাকর সঙ্গে নিয়ে। কেউ কেউ যান মোটরে, তাঁরা লেকমার্কেট ছেড়ে যদুবাবুর বাজারেই যান।

যাক এত সব কথা। আজ কুয়াশা এবং শীতের জন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক কম। কুয়াশার মধ্যে বিমলের কিন্তু ঘুরবার পথটা বেড়ে গিয়েছিল। নিয়মিত সে ওঠে মহানগরীর ঘুম ভেঙে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রি অবসানে মহানগরীতে জীবনের জাগরণ-সঙ্গীত পাখির কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও শোনা যায় না, মহানগরীর নিজের ধ্বনি আছে। ধর্মজগতের সভ্যতায় হিন্দুরা বেদগান করতেন, ইসলাম জগতে আজান আজও ওঠে, মহানগরীর কালে—একসঙ্গে বাষ্প অথবা বিদ্যুৎচালিত বাঁশী বাজাতে থাকে। গঙ্গার বুকে, খিদিরপুর ডকে, গঙ্গার কূলে কূলে এপারে-ওপাবে মিলে মহানগরীর বুকের মধ্যে ছড়ানো ছোট-বড় ফ্যাক্টরিতে বাঁশী বাজে। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ির চাকার লোহার হালেব শব্দ ওঠে, ট্রামেব ঘর্ঘরধ্বনি জেগে ওঠে, বড় বড় ট্রাক, এবং মোটব বাসগুলিব স্টার্ট নেওয়ার শব্দ ওঠে। মানুষেব মধ্যে হোস পাইপ এবং মই কাঁধে ছুটতে থাকে কর্পোবেশনেব উড়িয়া কর্মীব দল। রাস্তায় জল দেয়, আলো নিভিয়ে ফেবে। এ অঞ্চলে পথে গ্যাসলাইট নাই বললেই হয়; মই কাঁধে আলো নেভানো বড় একটা দেখা যায় না।

বিমল চলতে শুরু করেছিল। সময় সম্বন্ধে খেয়াল হলো—কুয়াশা কেটে, সূর্যেব আলো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পরাব পর। ফিরবাব পথে 'দাদাব দোকান,' রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপরেই। এটি তার চা খাওয়াব আড্ডা। দাদা এ অঞ্চলে দোকানদাব হিসাবে সর্বজন পরিচিত; স্টেশনারী জিনিসেব দাম বড় বেশি, চা ও খাবাব তেমনি অখাদ্য কিন্তু তবু দাদাকে অবহেলা করবাব উপায় নাই, কাবণ দু'দিকে দু'শো গজের মধ্যে আব কোন দোকান নাই।

দাদা বিমলকে চেনে লেখক বলে, যথাযোগ্য সমাদরও করে, নমস্কাব জানিয়ে সম্মান জানায়, ভাল দেখে চেয়ারখানা এগিয়ে দেয়, দোকানের ছোকবাদেব বলে—দেখিস, নিমকি বেছে দিস, চা যেন ভাল হয়। নইলে—। হাসতে শুরু করে দাদা—হেসে বলে—নইলে দেবেন কোন লেখাব মধ্যে এইসা ঢুকিয়ে—বাপস্! তারপর একটু কাছে এগিয়ে এসে বলে—এ—মানে কে— যেন বলছিল, এই—বাবুকে নিয়ে কি একটা লিখেছেন!

—কই না তো! বিমল নিস্পৃহভাবেই বলল, সে জানে এই অন্তরঙ্গতাব হেতু। এইবার এই অন্তরঙ্গতার সুযোগে মৃদুস্বরে সে বলবে—চা-নিমকির দামটা দিন তো দাদা—রুটিওয়ালাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—টাকা কিছু শর্ট আছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের দারিদ্র্যের খ্যাতি দাদার কাছে পর্যন্ত পৌঁচেছে। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উত্তরদিকেই অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের মস্তবড় বাড়ি, তাঁর মোটরখানাকে দাদা চেনে। কিন্তু শরৎচন্দ্র হিসেবে ভুল বলেই সকলে বিশ্বাস করে। ও কি রকম হয়ে গিয়েছে, নইলে লিখে টাকা হয়? দাদা এগুলি শিখেছে এ অঞ্চলের অভিজাত বাড়ির ছেলেদের কাছে। যারা নাকি শরৎচন্দ্রের দর্জিপাড়ার দাদার বালীগঞ্জী সংস্করণ। সাহিত্যসভা করে এরা, সাহিত্যিকদের সভাপতি করে সম্মান দেয়, আবেগভরে আবৃত্তিও করে—'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান,' আবার দরিদ্র সাহিত্যিকদের সম্পর্কে

সাধারণ আলোচনায় বলে, ভ্যাগাবন্ডস্ লোফারস্। মধ্যে মধ্যে দু' চারটে মিথ্যে গল্পও বানিয়ে ফেলে বলে—আমাদের বাড়ি গিয়েছিল বাবার কাছে, টাকা ধার করতে। ফাদার সিম্প্‌লি বলে দিলেন—এই পাঁচটা টাকা দিচ্ছি ধার নয়, একেবারে। কারণ ধার দিলে আপনি শোধ দেবেন না এবং আপনার সঙ্গসুখ থেকে আমি বঞ্চিত হব। এমনি অনেক অনেক গল্প। দাদা সেইগুলি শুনেছে এবং সুকৌশলে দামটি আগে আদায় করে নেবার এই চতুর পন্থা আবিষ্কার করেছে। খেয়ে শেষে যদি লেখক মশাই বলেই বসেন—দামটা আজ রইল—তবে জামা টেনে ধরাটা সম্ভবপর হবে না। ধরলে—যে ছেলেরা ঐ সব গল্প করে তারাই দাদার উপর চড়াও হয়ে উঠবে। বিমল খাবারের দামটি একটি সিকি—টেবিলের উপর রেখে দিলে বিনা বাক্যব্যয়ে। ছোকরাটাও এনে নামিয়ে দিলে নিমকির ডিশটা!

রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছেন বিখ্যাত প্রফেসর—একখানা বই বগলে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। লেকের ধারে খুব মন্থর পদক্ষেপে বই পড়তে পড়তেও তাঁকে বেড়াতে দেখেছে বিমল। পড়াটা তাঁর কৃত্রিম নয়—লোক দেখানোও নয়—সে কথা বিমল জানে।

বাসায় ফিরে দেখলে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে দুটি গল্প লিখতে শুরু করেছে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, বিমলের ভক্ত। একটি ছেলের বাপ কোন্ জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—কলকাতায় বাড়ি আছে, অপরটি মেসে থেকে পড়ে। প্রথম ছেলেটি সাহিত্যিকদের সহিত সুপরিচিত হবার জন্য সাধ্যসাধনা করে সাহিত্যিকদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসে—চায়ে খাবারে আদরে—আপ্যায়িত করেন তার মা। ছেলের চেয়েও মা অনেক বেশি সাহিত্যানুরাগিণী, রোমাঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেক লেখকের লেখা পড়েন—কবিতা গল্প উপন্যাস—নাটক—সব—সব। সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনাও পড়েন। তাঁরও অনেক অনুরোধ আজ পর্যন্ত অনেকবার এসেছে কিন্তু বিমল আজও তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই। ছেলে দুটিকে দেখে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে বললে—কি খবর?

ছেলেটি হেসে বললে—আজ ওবেলা নির্মল রায় আসছেন—আপনাকে আজ যেতেই হবে, মা বলেছেন—

সঙ্গী ছেলেটি বললে—সুনীল একটা গল্প লিখেছে—পড়বে।

বিমল বললে—তোমার লেখাটা আমাকে দিয়ো, পড়ে দেখব কিন্তু যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে টেনে নিলে একটা ফাইবারের সুটকেস। এইটাই তার লেখার ডেস্ক। একসারসাইজ বুক তার উপরে রাখাই ছিল, পাশে ছিল দোয়াত এবং কলম। আজও ফাউন্টেন পেন কেনে নাই বিমল। এ দিক দিয়ে সে গান্ধীপন্থী; বিলাসের পর্যায়ে ফেলে সে ফাউন্টেন পেনকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল লাবণ্য এবং অরুণা। স্মিত হাসিমুখে লাবণ্য বললে—লিখছেন?

বিমল মুখ তুলে তাকালে।

—একটু বিরক্ত করব।

বাধ্য হয়ে বিমলকে আহ্বান জানাতে হলো—আসুন।

সমস্ত ঘরটাই প্রায় খালি। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট—দু'জন বসবার মতো—পুরানো আমলের ভেলভেট মোড়া কৌচ। এখানা চিত্ত জোর করে তাকে কিনে দিয়েছে—আলিপুরের নীলামী মালের আড়ৎদারদের কাছ থেকে ওই কৌচখানা আর একখানা ডেক চেয়ার।

ঘরের একদিকে তার সুটকেস আর ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের উপরেই থাকে তার বিছানা। মেঝেতে বিছানো থাকে একখানা মাদুর, তার উপরে বসে সে লেখে!

লাবণ্য বললে—আপনি নীচে বসবেন, আমরা কৌচে বসব এ কি হয়!

বিমল হেসে বললে—নিশ্চয় হয়—আপনারা অতিথি।

—না আমরা ভক্ত।

বিমল উঠে কোণে ঠেসানো ডেক চেয়ার টেনে পেড়ে নিয়ে বসে বললে—এইবার বসুন। বলুন কি খবর?

—আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চায়েব নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

গোড়া থেকেই বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। নিমন্ত্রণের কথায় তার অস্বস্তি ঘন হয়ে উঠল। বললে—হঠাৎ নিমন্ত্রণ কেন বলুন তো?

অরুণা বললে—আমার নিজের কিছু বলবার আছে আপনাকে, লাবণ্যদিদিদেব অনেক কথা আছে। তা-ছাড়া আপনাকে কিছুক্ষণ পেতেও চান নিজেদের মধ্যে।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কথা যা আছে সে এখনই বলুন না। তার জন্য নিমন্ত্রণ কেন?

লাবণ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে। তারপর হঠাৎ বললে—আমাদের ওখানে যেতে আপনার কি সংকোচ বা আপত্তি আছে?

বিমল বললে—আপত্তি নেই কিন্তু সংকোচ থাকলেও কি আপনি রাগ করবেন? ওটা যে বুদ্ধিমানের ভূতের ভয়ের মতো। যুক্তিবাদী বুদ্ধি বলে—ভূত নেই যখন তখন ভূতের ভয় কেন? মন বলে আমি নিরুপায়, ভয়টা মূলোর মতো দাঁত মেলে কুলোর মতো কান নেড়ে—তালগাছের মতো লম্বা হয়ে খোনা গলায় হুঁ-হুঁ করে হাসছে, বুদ্ধি তোমার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে।

অরুণা হেসে উঠল। লাবণ্যও না হেসে পারলে না।

বিমল বললে—আচ্ছা যাব। নিমন্ত্রণ নিলাম আপনাদের। কিন্তু কথাটা কি বলে রাখলে সুবিধা হত না? ভেবে রাখতে পারতাম।

—বল অরুণা। তোমার কথাতেই সমস্যা আছে। আমাদের কথায় সমস্যা নাই। আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের কথা বলব। সুখ নাই—দুঃখ। তবে দুঃখের মধ্যেও অনেক হাসির কথা আছে। সেটা চায়ের আসরেই হবে।

অরুণা বললে তার সমস্যার কথা। কাল রাত্রে ওঁদের কথা শুনে—ওঁদের কাজকর্ম

দেখে বলেছিলাম—লাবণ্যদি, আমি আপনাদের মধ্যেই থাকব। লাবণ্যদি বলেছিলেন তুমি লেখাপড়া শিখেছ—গান গাইতে পার—তুমি এ দর্জির কাজ নিয়ে কেন থাকবে? আজ সকালে লাবণ্যদি বললেন—রাত্রে ভেবে দেখেছি তোমার এখানে থাকাই ভাল। কিন্তু সকালে উঠে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে লাবণ্যদি যা বলেছিলেন, তাই ঠিক। এ কাজ নিয়ে থেকে কি করব?

বিমল খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—কাল রাত্রে লাবণ্য দেবী যা বলেছিলেন, আজ সকালে আপনার মনে যা হয়েছে সেইটাই আমার মতে ঠিক।

লাবণ্যের চোখে এক বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। অস্বাভাবিক দীপ্তি তার মধ্যে। অরুণা তার দিকে তাকিয়ে একটু শঙ্কার সঙ্গেই ডাকলে—লাবণ্যদি।

লাবণ্য উত্তর দিলে না।

বিমল বুঝতে পারলে লাবণ্যকে। সে বললে—এই মহানগরীর জীবন—আমাদের সে কালের স্বপ্নে তুষ্টির জীবন নয়। মন্থর গতির জীবন নয়, দ্রুতগতির জীবন। কেরোসিন ল্যাম্পের জীবন নয়, ইলেক্‌ট্রিক লাইটের জীবন।

তারপর বললে—জানেন, এককালে গান্ধীজীর আদর্শে অনুরাগী ছিলাম। ভাবতাম—গ্রামই একমাত্র সত্য, মহানগরীকে ভয় করতাম, মনে করতাম এই মহানগরেই হবে মানুষের সমাধি। আজ মনে হয়—এই মহানগরেই হবে মানুষের সাধনার সার্থকতা। সে কালে শ্মশানে যেমন হত সাধকের শক্তি-সাধনার সিদ্ধি।

পাঁচ

নিমন্ত্রণটা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হলো বটে কিন্তু মনে মনে বিমল অপ্রসন্নই হলো। এই মেয়ে দুটির সঙ্গে এমনভাবে চা-মিষ্টান্ন সহযোগে আলাপ করতে মন যেন সঙ্কোচ অনুভব করছে। বাঙালী জীবনেরই এটা একটা জটিলতা! এই জটিলতা পশ্চিমবঙ্গের পল্লীসমাজে অত্যন্ত বেশি। আলোকপ্রাপ্ত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষাকৃত সহজ মেলামেশা প্রচলিত হয়েছে বটে কিন্তু এই সমাজের লেখকদের লেখাতে দেখা যায় একটি তরুণ ও একটি তরুণী কোন একটি ঘটনার সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়; আলাপ হবার অপেক্ষা! অর্থাৎ তাঁদের সমাজেও 'ঘি এবং আগুনের প্রবাদটা আজও সত্য। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে রক্তসম্পর্ককে বাদ দিয়ে বান্ধব ও বান্ধবী সম্পর্ক গড়ে তোলবার মতো শিক্ষা ও রুচিকে মন দিয়ে আজও গ্রহণ করতে বাঙালী পারেনি অথচ সে যুগে যে সভ্যতার ভিত্তিতে এই মহানগরী গড়ে উঠেছে তাতে স্ত্রী এবং পুরুষকে চলতে হবে কর্মপথে সহযাত্রিনীর মতো, হাঁটতে হবে একই ফুটপাতে, মিলতে হবে একই কর্মক্ষেত্রে। যুক্তির দিক দিয়ে বিমল ঐ কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে কিন্তু মানতে পারে না। শিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বন্দ্বে আজও তার সংস্কার এ ক্ষেত্রে প্রবলতর।

হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। এসে উপস্থিত হলো বন্ধু নীরেন। শ্রী নামক মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। এরই মধ্যে তার স্নান আহার সব সারা হয়ে গেছে,

আপিসে চলেছে। কাগজ বের হবে, আর মাত্র কয়েকদিন আছে। কাজের চাপ এখন বেশি। বিমল তাকে দেখে খুশি হলো। মনে মনে সে যেন তাকেই কামনা করছিল।

নীরেন ধপ্ করে সেই ভাঙা সোফাটায় বসে পড়ে বললে—লেখা আছে? ভাল গল্প—খুব ভাল গল্প?

—গল্প কি হবে?

—চাই। খুব ভাল গল্প।

—কেন? এ মাসে তো রমেন বসুর গল্প দেবার কথা।

একটু চুপ করে থেকে নীরেন বললে—রমেনকে তো জানিস নে। লেখা শেষ করতে পারবে না জানিয়েছে। দিতে পারবি?

একটু ভেবে বিমল বললে—গল্প একটা ভেবে রেখেছি। চেষ্টা করে দেখতে পারি। রমেনবাবুর একটা গল্প পড়েই লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। অভিজাত বংশ নিয়ে রমেনবাবু গল্প লিখেছেন। আমার ভাল লাগেনি, এদেশের অভিজাতের জাতকে রমেনবাবু জানেন না।

আবার একটু হেসে বললে—নীল রক্ত শব্দটা ব্যবহাব করেছেন! Blue blood হয়তো ওদেশের অভিজাতদের শিরায় বয়ে থাকে, আমাদের দেশে কিন্তু নীল রক্ত চলে না!

—তবে বসে যা লিখতে। আমি রাত্রে আসব। উঠলাম।

নীরেন উঠল। বিমল খাতা-কলম টেনে বসলে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই নীরেন আবার ফিরল। বলল—তোকে সত্য কথাটা বলে যাই। রমেন গল্প দিয়েছে কিন্তু সে গল্প পছন্দ হয়নি সুরেশবাবুর। আমি বললাম—বিমলকে বলে দেখতে পারি যদি বলেন। খানিকটা ভাবলেন—ভেবে সুরেশবাবু বললেন, দেখতে পার। ওর স্টাইল ভাল নয় কিন্তু ওর বলবার কথা অনেক আছে। ভরসা সেইখানে।

মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো বাড়ি। নূতন কালের রাস্তা এবং আশপাশের জমি বাড়ির উঠান থেকে হাত দুয়েক উঁচু হয়ে উঠেছে। চকমিলানো বাড়ি। দোতলার কাঠের বারান্দায় কাঠের রেলিং। পরপর তিনটি মহল। বড় হলে পুরানো আমলের ভাবী আসবাব। মেঝেতে পাতা কার্পেটের পশম উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সুতোর দড়ির বিনুনী, তারও মধ্যে মধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছে: কড়িবর্গায় দীর্ঘকাল রং পড়েনি, বহুকালের ক্ষয়ে যাওয়া দু'চারখানা কড়ি ফেটে নুয়ে পড়েছে। কতকগুলো টালি ভেঙে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছাদের জমানো খোয়ার দৃষ্টিকটু চেহারা। পলেস্তারা খসে গিয়েছে বহুস্থানেই। দেওয়ালে ফাটল ধরেছে; জানালা-দরজাগুলোর খড়খড়ি ভেঙেছে, কব্জা খসেছে। ওই দেওয়ালের ফাটল এবং জানালার ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে হু-হু করে। বর্ষার রাত্রি, বাইরে মৃদু বর্ষণের সঙ্গে উতলা বাতাস বইছে প্রবল বেগে! সেই বাতাস ঢুকছে ঘরে—শিসের মতো শব্দ করে। কড়িতে বাঁধ লোহার শিকল এবং হুকে ঝুলানো পুরানো কালের

কয়েকটা ঝাড়লণ্ঠন সেই বাতাসে দুলছে, কলসে কলসে আঘাত খেয়ে টুং টাং শব্দ উঠছে। এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে শব্দ শুনে মনে হবে, কে যেন গুন্ গুন্ করে এক অতি করুণ বিষণ্ণ সঙ্গীত গেয়ে চলেছে।

ঘরে জ্বলছে একটি কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প, চিমনীর মাথাটা ভাঙা এবং কালো হয়ে উঠেছে শিখার কালিতে। পুরানো আলো। কলের দোষে—পলতের জীর্ণতা এবং অপরিচ্ছন্নতার জন্যে শিখায় কালি উঠছে। এত বড় হলে ওই একটা দশবাতির জোরের লালচে আলো—অপর্যাপ্ত এবং অস্পষ্টতার জন্য কেমন একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। এই আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে ঘরখানার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক দীর্ঘাকৃতি শীর্ণ মানুষ ; খাঁড়ার মতো নাক, আয়তচোখে বিহ্বল উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি ঘুরছেন ; দেহের বর্ণ পাংশু পীতাভ ; কবরের পাথরের আবেষ্টনীর তলায় যে ঘাস, তার রঙের সঙ্গে এ রঙের তুলনা দেওয়া যায়। লাল্চে দশবাতির আলো তাঁর মুখ এবং অনাবৃত হাত দু'খানির উপর পড়ে ম্লান মনে হচ্ছে। মাথার চুল নাই, টাক পড়েছে, পিছনে পাশে স্বল্প-খুঁটিয়ে ছাঁটা সাদা চুল—মূর্তিটির উপর সব চেয়ে বড় মহিমা আরোপ করেছে।

বহু-বিভক্ত এই বাড়ির সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ইনি। আজই এটর্নির আপিসে গিয়ে এই বাড়ির বিক্রি কোবালায় সই করে এসেছেন। কিনেছেন এক মিলওয়ালা। জীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি ভাঙা লোহার টুকরো কুড়িযে। এই বাড়ি ভেঙে নূতন বাড়ি করবেন তিনি। ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাগ করে পাঁচতলা বাড়ি।

না বিক্রি করে উপায় ছিল না। কয়েকজন অংশীদার অনেক আগেই তাদের অংশ এঁকেই বিক্রি করেছে। অন্য দিকে তাঁদের দেনাও হয়ে উঠেছে আকণ্ঠ। চিন্তায়, তাগাদার অপমানে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

আর কিসের জন্য কার জন্য এই ভগ্ন প্রাসাদকে ধরে রাখবেন ? ছোট ভাই ব্যারিস্টার হয়ে এসে—মেম বিয়ে করে—রেস এবং মদের দেনায় তলিয়ে গিয়েছে। তাঁর বড় ছেলে জোচ্চোর, সে তার বংশের দান দেহমহিমা এবং রূপকে মূলধন করে দেশে দেশে জাল রাজা সেজে প্রতারণার ব্যবসা ফেঁদে বেড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে রয়েছে। মেজ ছেলে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে বাস করছে, ধনী পিতার একমাত্র কুরূপা কন্যাকে বিবাহ করে আত্মরক্ষা করেছে। ছোট ছেলেটার ভরসা তিনি করেছিলেন। বংশোচিত দীর্ঘ অগ্নি-শিখার মতো চেহারা, প্রদীপ্ত বুদ্ধি, উজ্জ্বল ছাত্রজীবন—মিহিরকে দেখে তাঁর ভরসা হয়েছিল মনে। কিন্তু মিহির নেমেছে পথের ধুলোয়, কংগ্রেসী ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে—চিৎকার করে হেঁটে চলে ধর্মঘটী মজুরদের শোভাযাত্রার পুরোভাগে। পূর্বপুরুষদের গাল দেয়। বলে—'ইংরেজ রাজত্ব যারা কায়েম করেছিল, বিদেশী বেণিয়াদের বেণিয়ানি করে, তাদের অবস্থার দিকে চেয়ে দেখ, ভাঙা জাহাজের মতো পুরানো—পড়োপড়ো বড় বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখ ; তারা মরছে। তাদের জায়গা দিয়ে উঠেছে—নূতন বাণিয়াদের দল।

তিনি হাসেন—বিষণ্ণ হাসি।

অক্ষম উচ্চাভিলাষী ক্রোধ! কিন্তু মিহিরের লজ্জা হয় না—ওই হতভাগ্য নোংরা ছোটলোকদের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়াতে?

মধ্যে মধ্যে পুলিশ আসে। প্রথম যেদিন পুলিশ আসে মিহিরের সম্পর্কে খোঁজ নিতে সেদিনের কথা তাঁর মনে আছে। অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর স্মৃতির মধ্যে। চার বছর আগে দিল্লী থেকে এসেছিল ভারত-বিখ্যাত বাঈজী। প্রৌঢ়া বাঈজী স্থূলকায় মেদবাহুল্যে তার মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তিনি চোখ বুজে বসে এই ঘরেই গান শুনছিলেন। অল্প কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন নিমন্ত্রিত। ঝাড়লণ্ঠনে সেদিনও জ্বলছিল বিজলী বাতি। এক একটি ঝাড়ে প্রায় দু'শো-আড়াই শো বাতির প্রভা। তিনটে ঝাড় জ্বলছিল। বেহাগ আলাপ চলছিল। অপূর্ব সে রাগিণীর আলাপ; প্রৌঢ় বাঈয়ের কণ্ঠের স্বরমাধুর্য, সেই মাধুর্যের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাধনার অপরূপ কারুকৌশল। হঠাৎ এল চাকর। কানে কানে এসে বললে—ডাকছেন জ্ঞাতি ভাই, পুলিশ এসেছে নিচে। চমকে উঠলেন। ইচ্ছে হলো চাকরটাকে গুলি করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে বললেন—বসতে বলো, গান শেষ হোক, যাচ্ছি।

হঠাৎ দমকা বর্ষার বাতাসের একটা ঝটকায় সশব্দে একটা জানালার একখানা ভাঙা কাঁচ কাঠ ছেড়ে ছিটকে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আলোটা। তিনি বিরক্ত হয়ে সুইচবোর্ডের স্থানটার দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তিন মাস আগে অর্থাভাবে ইলেক্ট্রিক কনেকশন কেটে দিয়েছে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

নীচে একটা ঘোড়া মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে উঠছে। বুড়ো ঘোড়াটাকে আজও রেখেছেন তিনি। আর আছে ভাঙা ব্রুহাম একখানা। আস্তাবলের দরজায় তেরপলের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছে; নূতন কেনার সামর্থ্য নাই; জলের ছাটে বাতাসের দমকায় কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। বাড়িতে বন্দুক একটা আজও আছে! কার্টিজ নাই। থাকলে আজ ওটাকে গুলি করে মেরে নিশ্চিন্ত হতেন তিনি। আজ এই মুহূর্তে তিনি নিশ্চয় মারতে পারতেন।

বাইরে শব্দ উঠছে সিঁড়িতে। বেশ জোয়ান মানুষের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের শব্দ। কাঠের সিঁড়ি কাঁপছে। বুঝেছেন তিনি কে এল এই দুর্যোগের মধ্যে। হ্যাঁ সে-ই। বাইরের বারান্দায় মৃদু কম্পন উঠছে। তিনি ডাকলেন—মিহির!

—বাবা। একি—আলো নিভে গেছে? ফস্ করে দেশলাই জ্বাললে মিহির।

তাঁর ইচ্ছা হলো চিৎকার করে ওঠেন, কিন্তু সে অভ্যাস তাঁর নয়, মুহূর্তে নিজেকে সম্বরণ করে মৃদুস্বরে বললেন—না।

—আলো জ্বালব না?

—থাক।

বিমলের লেখায় বাধা পড়ল। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একটি বলিষ্ঠ যুবক। তার দিকে তাকিয়ে বিমল চমকে উঠল। তার গল্পের মিহির—রক্তমাংসের দেহ নিয়ে তার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। মিহির তার কল্পনার মানুষ নয়। সত্যিকারের মানুষ।

তাদের বাড়ি, তাদের ইতিবৃত্ত, তার বাপ ও সে বাস্তব সংসারের জীবন্ত মানুষ। তাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তার মামার বাড়ির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক জীবনে যে দলের সঙ্গে একদা জড়িত ছিল, মিহির আজ সেই দলের সভ্য। পুরাতন দলের আদর্শবাদে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নেতাদের একজন ছাড়া অন্যরা আজ নানা দলে মিশে গেছেন।

মিহির বললে—গোপেন দাদা আপনার কাছে পাঠালেন।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ।

বাইরে থেকে নারীকণ্ঠে কেউ ডাকলে—বিমলবাবু! সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসে দাঁড়াল—লাবণ্য।

বাইরে বেলা পড়ে এসেছে; ঘরের মধ্যে আলো কম হয়েছে। মিহির সুইচটা টিপে আলো জ্বাললে।

আর কেউ আসছে। ভারী পায়ের শব্দ উঠছে। ভ্রূ-কুঁচকে বিমল প্রতীক্ষা করে রইল। লাবণ্য সঙ্কুচিত হয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

—বিমলদা! কাকে এনেছি দেখুন। চিত্তরঞ্জন এসে দাঁড়াল। তার পিছনে এসে দাঁড়াল তার গ্রামবাসী, প্রায় সমবয়সীও, কালীনাথ—কলকাতার আই-বি অফিসার।

ছয়

খাস বিলিতী পদ্ধতিতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অনুকরণে তৈরি—সার চার্লস টেগার্টের হাতে গড়া—বাংলাদেশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিশ বাহিনী। অদ্ভুত শক্তিশালী এবং তেমনি কার্যদক্ষ। কর্মচারীগুলির মন এবং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। কালীনাথ কেন্দ্রীয় আই-বি-তে পূর্ববঙ্গের একটা জেলার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর। ওই জেলাটির সঙ্গে এখানক র যোগসূত্র রাখাই তার কাজ—এবং ওই জেলার যে সমস্ত বিপ্লববাদী কলকাতায় থাকে বা আসে-যায় তাদের কার্যকলাপের সন্ধান রাখাই তার ডিউটি। ওই জেলার সঙ্গে সংশ্রবহীন কলকাতার দলের কর্মীদের চেনা বা জানার কথা, তার নয়। মিহির যে দলের অন্তর্ভুক্ত সে দলের কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার মধ্যেই আবদ্ধ। দলটি ভেঙে-ভেঙে এখন অত্যন্ত একটি ছোট দলে দাঁড়িয়েছে, কর্মী হিসাবে মিহিরও নূতন, বাংলাদেশের পুলিশেরা যাকে বলে পুরনো পাপী—সেই গৌরবজনক আখ্যা লাভ করতে এখনও পারেনি। মিহিরকে দেখে তবু কালীনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

বিমল মিহিরকে বললে—বলবেন আমি দেখা করব।

মিহির কালীনাথকে সন্দেহ করে নাই। সে বললে—আমাকে কিন্তু বলেছেন—নিয়ে যেতে।

—কিন্তু—। বিমল একটু দ্বিধা করলে, লেখাটা শেষ করতে হবে। কালীনাথ

দাঁড়িয়ে আছে—লাবণ্য দাঁড়িয়ে আছে, সে ফিরে তাকালে পিছনের দিকে যেখানে লাবণ্য দরজার পাশে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কালীনাথ হঠাৎ মিহিরকে প্রশ্ন করলে—আপনার নাম মিহির বোস না? দর্জিপাড়ার কার্তিক বোসের ছেলে?

মিহির একটু বিস্মিত হয়েই উত্তর দিলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীনাথ এবার প্রশ্ন করলে—ও মেয়েটি কে? উনিও বুঝি—

বিমল মধ্যপথেই বাধা দিয়ে বললে—থামো কালীদা। এ ছাড়া আর কথা খুঁজে পেলে না?

চিত্ত তাড়াতাড়ি বললে—উনি আমাদের পাড়ারই মেয়ে, এখানে একটি সমিতি করেছেন, কয়েকজন মিলে। তাই দেখাবার জন্য বিমলদাকে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করেছেন।

—ডাকতে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। লাবণ্য এবার দেওয়ালের কাছ থেকে সরে এসে সকলের সামনাসামনি দাঁড়াল। বললে, আমি যাই। উনি তো এখন খুব ব্যস্ত আছেন।

কালীনাথ না থাকলে বিমল এতে নিষ্কৃতি পেল বোধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত—সঙ্গে সঙ্গে একটু বেদনাও হয়তো অনুভব করতো এইমাত্র। কিন্তু কালীনাথের সন্দিগ্ধ হাসির রেখা তাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুললে, সে বললে—দাঁড়ান, আমি যাব আপনার সঙ্গে। ফিরে সে মিহিরকে বললে—আমি আপনার সঙ্গেই যেতে পারি, যদি আপনি একটু অপেক্ষা করেন। মানে এঁদের এখানে চা খেয়ে যাব আমি। আপত্তি যদি না থাকে তবে আমার সঙ্গে আসুন—চা খাবেন।

মিহির একটু হেসে বললে—চলুন।

বিমল কালীনাথকে বললে—আমায় যেতে হবে কালীদা।

কালীনাথ কিছু বলবার পূর্বেই চিত্ত বললে—আপনি যান, আমি ঘরে তালা দিয়ে যাব। কালীদা একটু বসবে এখানে। আমার ওখানটা তো খোলা মাঠ। এরপর খুব কাছে সরে এসে—ফিস-ফিস করে বললে—কালীদাকে একটু বিয়ার খাওয়াব।

বিমল কোন উত্তর দিল না, প্যাসেজটা অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। লাবণ্য এবং মিহির তার অনুসরণ করলে।

আহারের পরিচর্যার পারিপাট্য হোটেলেও থাকে, বরং হোটেলে যে পারিপাট্য সম্ভবপর সে পারিপাট্য অন্তত কোন সাধারণ বাড়িতে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে নিষ্ঠা এবং মমতার স্পষ্ট পরিচয় মেয়েদের হাতে বাড়ির আয়োজনে পাওয়া যায়—পারিপাট্য সত্ত্বেও হোটেলে তা পাওয়া অসম্ভব। বিমল বিস্মিত হয়ে গেল—এখানে যেন দুয়েরই সমন্বয় হয়েছে। টেবিলের উপরে ধবধবে সাদা চাদর, জানালাগুলিতে সাদা পর্দা, দেওয়াল ঘেঁষে তক্তপোষ একখানি, তার উপরে ধবধবে সাদা চাদর বিছানো, টেবিলের উপরেও কাঁচের গ্লাসে টকটকে লাল সার্টিনের তৈরি ফুল, ফুলগুলির চারপাশে সবুজ সার্টিনের পাতা; দেওয়ালের কোনখানে কোন ছবি

বা ক্যালেন্ডার নাই, সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটি শুভ্র শুচিতা যেন ঝলমল করছে ঘরখানির মধ্যে। ঘরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিমল বললে—বাঃ।

একটু স্মিত হাসি ফুটে উঠল লাবণ্যের মুখে।

মিহ্রিও বললে—সুন্দর!

লাবণ্য বললে—আধঘণ্টা সময় দিতে হবে অন্তত। খাবার তৈরি করতে পনের মিনিট, আপনারা বসুন। আমি বসলে তো চলবে না। খাবারগুলো ভেজে নিই। আমি বরং অরুণাকে পাঠিয়ে দিই। লাবণ্য চলে গেল ভিতরে।

বিমল তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল; মনে হলো এই শুভ্রশুচি ঘরখানির একটা অংশ যেন ঘরখানাকে অঙ্গহীন করে দিয়ে চলে গেল! লাবণ্যের পরিচ্ছদের মধ্যেও এই শুভ্রতার দীপ্তি, গায়ে তার ফুলহাতা সাদা লংক্লথের ব্লাউজ, পরনে ধোয়া থান কাপড়, সে যেন এই ঘরখানির মর্মকথার মতো ঘরখানিকে মুখর করে সজীব করে রেখেছিল। বিমল প্রসন্ন পরিতৃপ্তচিত্ত নিয়ে বসল। মিহ্রিও বসল।

মিহ্রি বললে—ইনি কে? চমৎকার রুচি।

বিমল উত্তর দেবার পূর্বে অরুণা এসে ঘরে ঢুকল। বিমল তাকে সম্বর্ধনা করে বললে—আসুন।

অরুণা একটু হেসে নমস্কার করে বললে—লাবণ্যদি বললেন, আপনি চলে যাবেন এখুনি।

—হ্যাঁ জরুরী তাগিদ রয়েছে। ইনি এসেছেন তাগিদ নিয়ে। এঁর সঙ্গেই যেতে হবে। বসুন আপনি।

অরুণা বসল না। টেবিলের প্রান্তভাগটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন কিছু চিন্তা করছে অথবা কিছু বলতে চাচ্ছে। বিমল তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব অনুমান করে, সঙ্কোচ কাটাতে সাহায্য করবার জন্যেই প্রশ্ন করলে—কি ঠিক করলেন?

অরুণা জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না। মিহ্রি বললে—কোন কথা যদি থাকে বিমলবাবু, আমি একটু না হয় বাইরে যাই।

বিমল সঙ্কোচ অনুভব করলেও অরুণা সঙ্কুচিত হলো না, তার মুখে-চোখে বরং উৎসাহের একটি চকিত দীপ্তিই ফুটে উঠল; তারপর সে বললে—পাঁচ মিনিট! মিহ্রি বাইরে যেতেই সে চেয়ারে বসে পড়ে বললে—সারাদিন আমি ভেবে দেখলাম বিমলবাবু এখানে এইভাবে আমি—। বক্তব্যের শেষ অংশটুকু সে অসম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে—না। না সে হয় না।

একটু চুপ করে থেকে বিমল বললে—কিন্তু কি করবেন?

অরুণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। তারপর বললে—আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন না? ফিল্মে কি গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডে গান দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না?

—না। বিমল ঘাড় নেড়ে কায়মনোবাক্যে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললে—না। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—ফিল্মে যদি ঢুকতে চান—তবে সুযোগ পেয়ে

ছেড়ে দিলেন কেন? রতনবাবুর মতো নামকরা ফিল্ম এক্টরের সঙ্গে আলাপ রাখলে—যে কোন মুহূর্তে আপনি কন্ট্রাক্ট পেতে পারেন।

অরুণা চমকে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল বিমল—চমকানির সঙ্গে মেয়েটির সর্বশরীর শিউরে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে গলার সাড়া জানিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মিহির। বলল—বাধ্য হয়ে বাধা দিলাম আপনাদের কথায়। বাইরে একটি লোক ঘুরছে—উঁকি মেরে আপনাদের দেখলে কয়েকবার। অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হলো।

বিমলের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কালীনাথের কথা মনে হলো। সে কি এরই মধ্যে স্পাই লাগিয়ে দিলে তার উপর! কিন্তু তাই ব' কেমন করে হবে? এই মুহূর্তে স্পাই? সে উঠে দাঁড়াল, বললে—কোথায়?

বেরিয়ে এসে সে দরজায় দাঁড়াল। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের লোক—কিংবা তার চেয়েও কমবয়স হতে পারে কিন্তু যুবক বলা চলে না, দাঁড়িয়ে আছে। কোল-কুঁজো, শীর্ণ, পরনে ময়লা কাপড, ময়লা একটা জামা, ছেঁড়া স্যান্ডেল, মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া একমাথা রুখু চুল, মুখে গোঁফ-দাড়ি অল্প, কিন্তু তাও খোঁচা খোঁচা হয়ে বড হয়ে শ্রীহীন লোকটিকে আরও বিশ্রী করে তুলেছে, চোখে পুরু লেন্সেব একটা চশমা—লোকটিকে দেখলেই মন কেমন বিরূপ হয়ে ওঠে। ভীরু অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বললে—আমি লাবণ্য দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—কি নাম আপনার? কি দরকাব আপনার?

—কে? পিছনে ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে লাবণ্য।

বিমল মুখ ফিরিয়ে দেখলে লাবণ্য এরই মধ্যে খাবারের থালা হাতে ঘরে এসে ঢুকেছে। সে বললে—একটি লোক আপনাকে খুঁজছে। দরজাব মুখটা ছেড়ে সবে দাঁড়াল বিমল। খোলা দরজার পথে ওই কুৎসিত অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিটিকে দেখে লাবণ্যের মুখ প্রসন্ন হাসিতে সুস্মিত হয়ে উঠল—কয়েক পা এগিয়ে এসে সে সস্নেহ সম্ভাষণ জানিয়ে বললে—পিনাকী? এস—এস।

অপ্রতিভের মতো একটু হেসে পিনাকী বললে—হ্যাঁ। নমস্কার করলে সে।

লাবণ্য তাকে প্রতিনমস্কার কবলে না। আবার বললে—এস। ভেতরে এস।

—যাব? এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে যাক।

—না-না। কথাবার্তা নয়, খাওয়া-দাওয়া। এঁদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছি। এস, তুমিও এস। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন সাহিত্যিক বিমলবাবু। ইনি এঁর বন্ধু। আর ইনি হলেন পিনাকী ঘোষ, শিল্পী একজন। আমাদেব খুব উপকারী বন্ধু। আমাদেব ফ্রক ব্লাউস বেডশীট বালিশের ওয়াডের উপর ডিজাইন এঁকে দেন। ভারী চমৎকার ডিজাইন করেন। ছবিও আঁকেন খুব সুন্দর।

অপরাধীর মতো পিনাকী বললে—আমার একখানা ছবি 'বঙ্গভূমি' মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। কিন্তু নতুন আর্টিস্টেব অসুবিধে তো জানেন। মানে নতুন কিছুকে সহজে তো লোকে নেয় না। তারপর অপ্রতিভের মতো হেসে বললে—খুব গরীব আমি।

বেঁচে থাকতে হবে তো। তাই কমার্শিয়াল আর্ট করছি সঙ্গে সঙ্গে। এঁরা কিছু কিছু ডিজাইন নেন—

লাবণ্য বাধা দিয়ে বললে—সব ডিজাইনই তোমার। এবার মেঘ-বিদ্যুৎ ডিজাইনটা খুব ভাল হয়েছে, খুব আদর করে নিয়েছে দোকানদারেরা।

হাসতে লাগল পিনাকী।

—বস—খাও। বসুন বিমলবাবু, আপনিও বসুন। বড় একটা থালা থেকে গরম নিমকি সে কাঁচের প্লেটে পরিবেশন করতে লাগল। বিমল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল পিনাকীকে। পুরু লেন্সের ভিতরে চোখদুটিকে ঠিক ঠাওর করা যায় না, তবুও সমস্ত কিছু মিলিয়ে পীড়িত অপরিচ্ছন্ন মলিন অবয়ব এবং বেশভূষার মধ্যে একটি উদাসী অথবা উপবাসী মানবাত্মা যেন উঁকি মারছে ওই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। বাইরের অপরিচ্ছন্নতা এবং ভঙ্গির এই দীনতার জন্য লোকটির উপর ঘৃণা বা বিরক্তি অর্থাৎ একটা বিরুদ্ধভাব মানুষের মনে জাগবেই—তবুও লোকটির জন্য অন্তর করুণায় ভরে উঠবে।

লাবণ্য বললে—খান।

পিনাকী চোখ বন্ধ করে গব্ গব্ করে খাচ্ছে। বিমল হেসে একখানা নিমকি মুখে তুললে। লাবণ্যের একজন সহকর্মিণী একটা থালায় গরম সিঙাড়া ভেজে নিয়ে এল।

লাবণ্য বললে—এ আমাদের মলিনা। বানে ভেসে চারটি কুটো আমরা চরে এসে একসঙ্গেই ঠেকেছি, মলিনা—আমাদের এক কুটো। তারপর অরুণার দিকে তাকিয়ে বললে—পঞ্চম কুটো আমাদের অরুণা; কিন্তু ও এখনও দুলছে, একটা চরের কুটোর সঙ্গে আটকেছে, অন্য মাথাটা স্রোতের টানে ছুটতে চাচ্ছে। কি হলো?

এতক্ষণে পিনাকী চোখ খুলে অরুণার দিকে তাকালে—বললে—এঁর কথা বলছেন বুঝি? ঘাড় ঝুঁকে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে।

অরুণার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। লাবণ্য বললে—পিনাকী, তোমার সহজ বুদ্ধি কখনও হবে না। এমন করে কি দেখছ তুমি?

পিনাকী বললে—দেখছিলাম, বলে সে থেমে গেল, তারপর অপ্রতিভের মতো বললে—মানে, মনে হলো ওঁকে যেন কোথায় দেখেছি। আবার একটু থেমে বললে—জানেন, আমার আঁকা বিজ্ঞাপনের একটা ছবি আছে, খুব বিষন্ন মেয়ের মুখের ছবি, বন্ধ্যা মেয়ে আর কি; সেই ছবির মুখের সঙ্গে খুব মিল আছে। তাই মনে হচ্ছিল—চেনা মুখ। আবার একটু ভেবে বললে—ছেলেবেলায় আমার এক দিদি মারা গেছেন, বিজ্ঞাপনে এসেছিল দিদির মুখ। দিদির মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের মিল রয়েছে আর কি। এবার বেশ বুদ্ধিমানের মতো খানিকটা হাসলে সে।

এবার চা নিয়ে এল চরে ভেসে এসে লাগা আর দুটি কুটো। তাদের পিছনে দরজার ওপাশে এসে দাঁড়াল বাড়ির মালিক দালালগিন্নী এবং তাঁর মেয়ে। লাবণ্য পরিচয় করিয়ে দিলে। বিমল কিন্তু কথা বাড়াল না। বললে—আজকে কথাবার্তার

সুবিধে হলো না। আমায় জরুরী কাজে এক জায়গায় যেতে হবে। কথার শেষে সে হাত জোড় করলে।

লাবণ্য হেসে বললে—আমাদের আর কথা কি? আপনারা মানী লোক, অনেক বড়লোকেরা আপনাদের কথা শোনে। একটু বলে দেবেন আমাদের এখানকার কথা। একটু বিজ্ঞাপন আর কি। কথা ছিল অরুণার। ওর কথা শেষ হয়েছে?

বিমল বললে—হ্যাঁ। আমার যা বলবার আমি বলে দিয়েছি। আচ্ছা আসি। চলুন মিহিরবাবু।

সত্যিই তো, আর কি বলতে পারতো বিমল! করুণার্দ্র হয়ে অরুণাকে নিয়ে ফিল্মওয়ালা বা গ্রামোফোন কোম্পানির দোরে দোরে ঘুরতে পারতো। নিজেকে বিপন্ন করে নিজের উপার্জন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারতো যতদিন না সে নিজে উপার্জনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সাময়িকভাবে সে নিজেকে জড়াতে পারতো অরুণার সঙ্গে। নিজের জীবনের যাত্রাপথের গতিকে মন্থর করতে হত বা সাময়িকভাবে পথের ধারে অরুণার সঙ্গে ভাগে গাছতলায় মুসাফেরখানা বানাতে হত। সে তা পারে না। মানুষকে চলতে হবে একা। এতকাল পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষকে আশ্রয় করে চলে এসেছে। সে এককাল ছিল, কৃষিপ্রধান গ্রাম, পুরুষে করেছে চাষ। মেয়েরা রচেছে ঘর, পুরুষে কেটেছে ধান—মেয়েরা ভেঙেছে চাল, রেঁধেছে ভাত, কেটেছে সুতো—পুরুষে বুনেছে কাপড়। আজ মহানগরীতে সে ধারা অচল হয়ে উঠেছে। সে ধারা ধরে চলতে গেলে মর্মান্তিক কেরানি জীবনকে অবলম্বন করতে হবে। অন্ধকূপের মতো আশ্রয়ে—পাততে হবে সংসার, আলো নাই, বাতাস নাই, পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়াল, গাঁথনীর ফাঁকে ফাঁকে ক্ষয় রোগের জীবাণু বদ্ধ বাতাসের মধ্যে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করতে হবে তাদের; উঠানে মাটির তলবাহী নর্দমার মুখের বদ্ধ ঝাঁঝরিটায় কলেরা টাইফয়েডের বীজ; মরবে তোমার শিশু। এ পৃথিবীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে নরনারীর মিলিত জীবনের সাধের মাশুল হিসেবে। না—তা পারে না—পারবে না। সে অধিকারই নাই তার। হঠাৎ পায়ে একটা হোঁচোট খেলে বিমল।

মিহির বললে—দেখবেন, রাস্তা বড় খারাপ।

রাস্তা খারাপই বটে। বালিগঞ্জের দক্ষিণে ঢাকুরিয়ার দিকে চলেছে তারা। দু'পাশে জঙ্গল, নারকেল বাগান, পুরনো বাড়ি, বজবজে জলে ভর্তি ড্রেন—কোথাও কোথাও কাঁচা। রাস্তার আলো অপর্যাপ্ত। মধ্যে মধ্যে দু'চারটে ছোটখাটো দোকান, কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। নেহাত ছোট দোকানে জ্বলছে কেরোসিনের কুপী। মধ্যে মধ্যে হিন্দুস্থানী গোয়ালা বা ধোবাদের জটলা হচ্ছে; উড়িয়ারা ঢোলক বাজিয়ে গান করছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে চারিদিকে।

বিমল লজ্জিত হয়েছিল, নিজের কাছেই সে নিজে লজ্জা পেয়েছিল। কেন সে অরুণাকে সাহায্য করার কথা ভাবতে গিয়ে তাকে নিয়ে সংসার বাঁধার কল্পনা করলে?

ছি! জীবনের পথে চলতে কত পুরুষ কত নারীর সঙ্গে দেখা হবে, হয় তো খানিকটা পথ পাশাপাশি চলতেও হবে; সে তো অনিবার্য। কথাও বলতে হবে, কথা বলতে গিয়ে সঙ্গীতের রেশও বাজতে পারে কানে, তার ফলে মিতালিও হতে পারে। তাতে কি? আবার যে দিন সে যাবে এক পথে—ও যাবে অন্য পথে—সে দিন হাসিমুখেই চলবে বিপরীত পথে। চোখে দু'এক ফোঁটা জল আসে—পড়বে ঝরে।

—দাঁড়ান। মিহির পাশে একটু এগিয়েই চলছিল নীরবে, সবল সুস্থ দীর্ঘাকৃতি তরুণ ছেলেটির পদক্ষেপে কঠিন শব্দ বেজে উঠছিল নির্জন অন্ধকার শহরতলীর পথে। সে হঠাৎ বললে—দাঁড়ান।

—কেন?

মৃদুস্বরে বললে মিহির—একখানা মোটর টর্চ ফেলে কি যেন দেখছে।

অদূরে অন্ধকারের মধ্যে একখানা মোটর দাঁড়িয়েছিল। পিছনের লাল আলোটাও জ্বলছে না সুতরাং অন্যমনস্ক বিমলের চোখে পড়ে নাই। গাড়ির ভিতর থেকে টর্চ ফেলে পাশে কিছু যেন দেখছেন আরোহীরা। গাড়ির দরজা খুলে কয়েকজন নামলেন। বিমল মিহিরকে বললে—আমি আপনাকে বলিনি, আমি একটু অন্যায় করেছি।

—কি?

—আমার বাসায় ওই যে লোকটি আপনাব নাম জিজ্ঞাসা করলে—ও হচ্ছে আমার গ্রামের লোক আই-বি ইন্সপেক্টর।

—আই-বি ইন্সপেক্টর? একটু চমকে উঠল মিহির।

—হ্যাঁ, আমার বোধ হয় আজ আপনার সঙ্গে আসা উচিত ছিল না। আপনাকে বিদায় করে দিয়ে, ওকে আটকে রাখলেই ভাল করতাম আমি।

মিহিব বললে—না—না। তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। গোপেনদা তো লুকিয়ে নেই যে পুলিশ ফলো করলে কোন ক্ষতি হবে। এ তো কোন গোপন ব্যাপার নয়।

—তবে মোটর দেখে দাঁড়ালেন কেন?

মিহির হেসে বললে—প্রথমটা দাঁডিযেছিলাম অভ্যাসে। তারপর দাঁডিয়েছি—যাঁরা নেমেছেন তাঁদের একজন আমার কাকা।

—আপনার কাকা?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি বিক্রি হয়েছে। আপনি তো সে জানেন। এক বছর টাইম দিয়েছে খরিদ্দার বাড়ি তৈরি করে নেবার জন্যে। সম্ভবত কাকা এসেছেন জমি দেখতে। এখানকার জমি বিক্রি হবে। ওখানে একটা সাইনবোর্ড আছে 'ল্যান্ড ফর সেল'। একটু থেমে বললে—কাকার চোখে ঠিক পডতে চাই না।

টর্চটা এগিয়ে গেল—রাস্তার পাশের পতিত জাযগাটার মধ্যে। মস্ত একটা নারকেল বাগান, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ছিটে বেড়ার বাড়ি।

মিহির বললে—এইবার আসুন। গাড়িটার এদিক দিয়ে আড়াল দিয়ে চলে যাওয়া যাবে।

গাড়িটাকে পাশে রেখে একটা বাঁক. ঘুরে পুরানো একতলা একটা বাড়ির মধ্যে মিহির তাকে নিয়ে গেল। বিমলের বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। গোপেন মুখার্জী প্রাচীন কালের বিপ্লবী নেতা। এককালে বিমল তাঁকে গুরু বলে পূজা করেছে। তাঁর দেখা পাবার জন্য কত ব্যগ্রতা ছিল। বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগীদের মধ্যে এমন বিরাট সাহস মাত্র কয়েকজনের ছাড়া আর কারও ছিল না। সিংহের মতো সবল দেহ। খালি গায়ে—সে বিরাট বুকের পাটা—সে ক্ষীণ কটি—বাঘের থাবার মতো হাতের পাঞ্জা—চশমায় ঢাকা—ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ, মাথায বড বড চুল—তাঁর সেকালের মূর্তি স্পষ্ট মনে পডছে তার। একটা ঘরের মধ্যে এক কোণে চুপ করে বসে থাকতেন তিনি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা কইতে কখনও পারেনি বিমল, কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট কিন্তু কথা বলতেন মৃদুস্বরে। শেষবার সে তাঁকে অনুরোধ করেছিল তার গ্রামে তার বাডিতে যাবার জন্য। তখন তিনি অ্যাবস্কন্ড করে ফিরছিলেন। তার অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—না। কলকাতা ছেড়ে গেলে কাজ চলবে না।

সাত

মহানগরী কলকাতা ইংরেজ শক্তির কেন্দ্রস্থল; মহানগরী কলকাতা ভারতীয় বিপ্লববাদের জন্মস্থল। মহানগরীর অন্তর জগতে লক্ষ লক্ষ পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সংঘাতে কলরোল উঠছে অবিশ্রান্ত—বিপুল শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, আকাশ স্পর্শ করতে চাচ্ছে সে দ্বন্দ্ব, তার আঘাত ছডিযে পড়েছে ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তে।

আজও ঠিক সেইভাবে—সেই এক কোণে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন গোপেনদা। বিমলকে দেখে একটু হেসে নীরবে হাতখানি তুলে রাখলেন নিজেব সামনে—অর্থাৎ বস এইখানে।

বাঘের থাবার মতো বলিষ্ঠ এবং প্রশস্ত হাতের মধ্যে সস্নেহে তুলে নিলেন বিমলের হাতখানি; একটু মিষ্টহাসি হেসে গোপেনদা বললেন—বিখ্যাত লোক হয়েছ এখন—এ্যাঁ?

একটু কুণ্ঠিত হলো বিমল, সে বুঝতে পারলে না গোপেনদা কি বলতে চাচ্ছেন, তবে কথার সুরের মধ্যে এবং তাকে গ্রহণের ভঙ্গিতে স্নেহের ভরসা রয়েছে; তাছাডা প্রশংসা বস্তুটাই এমন যে অকুণ্ঠিতভাবে গলাধঃকরণ করা যায়; সমাজ-চলিত রীতির অভ্যাসে—নতুন বউয়ের মতো মুখ নামিয়ে রক্তিম মুখে আস্বাদন করতেই হয়। বিমল একটু হেসে মুখ নামালে।

গোপেনদা বললেন—তুমি তো জান—আমি নাটক-নভেল পডি না। তোমার লেখা আমি পড়িনি, তবে লোকে নাম করে শুনেছি; কাগজে সমালোচনা পড়েছি। ভারী আনন্দ হয়। হঠাৎ একজন আমাকে তোমার একটা লেখা পডে শোনালেন।

গোপেনদা সোজা হয়ে বসলেন। কণ্ঠস্বর বেশ একটু উস্কে দেওয়া প্রদীপের শিখায়

মতো প্রখরতর হয়ে উঠল। বললেন—গল্পট শুনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলম। গল্পটার নাম আমি ভুলে গেছি। একটি কুষ্ঠারোগগ্রস্তা পাঠশালা পণ্ডিতের স্ত্রীকে নিয়ে গল্প।

বিমল বললে—হ্যাঁ, 'সারথি' পত্রিকায় বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ। সেদিন তোমায় সামনে পেলে আমি তিরস্কার করতাম।

বিমল চুপ করে রইল।

গোপেনদা বললেন—আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবারও বিমল চুপ করে রইল।

গোপেনদা বললেন—আমার পাশের বাড়িতে ঠিক ওই ব্যাপার ঘটে গেল। নিতান্ত দরিদ্র কেরানি-ভদ্রলোক—যক্ষ্মা হয়েছিল, স্ত্রী দেবীর মতো সেবা করছিলেন, হঠাৎ একমাত্র ছেলে, তাকে ধরল ওই রোগে। গোপেনদা চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন—ভদ্রমহিলা যেন পাগল হয়ে গেলেন, সেই রাত্রেই ভদ্রলোকটি মারা গেলেন। আমার সন্দেহ হয়—। গোপেনদার চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল—খানিকটা অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন—যখন ঘটনাটার কথা মনে হয়—তখনই তোমার ওই গল্পটার কথা মনে পড়ে।

এর উত্তরেই বা বিমল কি বলবে? গোপেনদা বললেন—ওই ব্যাপারেই তোমাকে ডেকেছি। ভদ্রমহিলাটি তাঁর রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিবেশী হয়ে জড়িয়ে পড়েছি। তাছাড়া ভদ্রলোকটিকে বড় ভালবাসতাম আমি।

বিমল অস্বস্তিকর বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। এই ব্যাপারে গোপেনদা তাকে ডেকেছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অরুণার কথা। অরুণাকে নিয়ে সে অকারণে অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে অস্বাস্ত ভোগ করছে। যে জলে ডোবে সে প্রাণের আকুলতায় পাশে যাকে পায় তাকেই আশ্রয় হিসেবে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। কিন্তু যাকে আশ্রয় করে—জীবনও যে যায় তাতে· বাঁচে না কেউ— ডুবে মরে দু'জনেই। বিপুল শক্তির অধিকারী যে—সে-ই তীরে উঠতে পারে বিপন্নজনকে পিঠে নিয়ে।

গোপেনদা বললেন—তোমাদের গ্রামের শ্রীচন্দ্রবাবু, যিনি বালিগঞ্জেই থাকেন—তাঁর কাছে একবার যেতে হবে তোমাকে। সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি আজ।

বিমল এবার আরও বিস্মিত হলো। শ্রীচন্দ্রবাবু মস্ত ধনী লোক। নানা ব্যবসায়ে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছেন। বালিগঞ্জের নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

গোপেনদা বলেই গেলেন—শ্রীচন্দ্রবাবুই এই বাড়িখানা এবং আশপাশের বাগান সব কিনেছেন। বুঝছ তো, শহর বাড়ছে, সস্তায় জমি কিনে ব্যবসা করছেন। বাড়িখানা ভদ্রলোকের পৈতৃক বাড়িই ছিল, তিনি বিক্রি করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে। কথা ছিল জায়গাটা ভেঙেচুরে ডেভেলপ করে প্লট করে বিক্রির সময় ছোট একটা প্লট এঁদের এমনি দেবেন। দলিলে কিছু লেখা নেই অবশ্য।

হাসলেন একটু গোপেনদা। বিমল প্রশ্ন করলে—এখন বুঝি দিতে চাচ্ছেন না?

গোপেনদা বললেন—দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন তোলার পথই বন্ধ হয়ে গেছে শুনছি। শ্রীচন্দ্রবাবু নাকি আবার গোটা সম্পত্তিটাই বিক্রি করে দিয়েছেন এক লিমিটেড কোম্পানিকে। তারা নোটিশ দিয়েছে—বাড়ি ভাঙবে তারা, বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

গোপেনদা বললেন—কি ভাবছ? যেতে কি তোমার আপত্তি আছে?

—আপত্তি? না আপত্তি নয়। তবে ভাবছি গিয়ে ফল হবে না।

—ফল হবে না? গোপেনদার চোখ দুটি অকস্মাৎ জ্বলে উঠল। একটুখানি চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই?

শঙ্কিত হয়ে উঠল বিমল—পুরাণে অবশ্য শোনা যায়—মদোদ্ধত স্ফীতকলেবর বিন্ধ্য তপস্বী অগস্ত্য সম্মুখে উপস্থিত হতেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করেছিল, অগস্ত্য বলেছিলেন—কোটি কোটি মানুষের আলো ও বায়ুর পথরোধ করে আর মাথা তুলো না; বিন্ধ্য আর মাথা তোলে নাই। কিন্তু এ যুগে সে হবার নয়। না হলে ফল হবে সংঘর্ষ। গোপেনদা কি প্রত্যাখ্যানকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন!

বিমল বললে—আপনি যাবেন?

—কেন যাব না? সংসারে লিখিত প্রতিশ্রুতিরই দাম আছে? মুখের প্রতিশ্রুতির কোন দাম নাই?

—আগে আমি যাই, আপনার নাম আমি করব। শ্রীচন্দ্রবাবু কি বলেন শুনি। তারপর প্রয়োজন হয় তো যাবেন?

একটু চিন্তা করে গোপেনদা বললেন—বেশ। তা হলে কালই খবর দেবে আমাকে।

—তা হলে আমি উঠি গোপেনদা।

—দাঁড়াও, আমিও যাব। মিহির।

পাশের ঘরে মিহির বসেছিল। সে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে গোপেনদা বললেন—চল।

মিহির কুণ্ঠিত হয়ে বললে—এই রাত্রেই যাবেন? কাল দিনের বেলা—

—নাঃ। চল রাত্রেই ভাল। গোপেনদা উঠে দাঁড়ালেন। আলোয়ানখানা তুলে নিয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে বিমলকে বললেন, চল। তারপর হেসে বললেন, এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে রাত্রে কাজ করতে যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশি। তবু যেন তুমি পেঁচার সঙ্গে তুলনা করো না বিমল।

বিমল বললে, আমি তান্ত্রিকের দেশের লোক দাদা। অমাবস্যায় শ্মশানে যাঁরা শক্তির সাধনা করেন তাঁদের কথা আমার কাছে অজানা নয়।

মুহূর্তে গোপেনদার চোখ দুটো ঝকমকিয়ে উঠল। উষ্ণ হাত দিয়ে বিমলের হাত দুটো চেপে ধরলেন তিনি।

বাসায় প্যাসেজের মুখে হঠাৎ বিমলের মনে হলো, কালীনাথের কথা সে বললে, দাঁড়ান দাদা।

—কেন ? কি ব্যাপার ?

—বলছি। আসছি আমি। হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল সে। কালীনাথ চলে গেছে, ঘরের তালা বন্ধ। চাবি চিত্তর কাছে। সে বেরিয়ে এসে বললে, দাঁড়ান চাবিটা নিয়ে আসি।

মিহির বললে, আজ থাক বিমলবাবু। অনেক দেরি হয়ে যাবে। বসলে গোপেনদা গল্পই করবেন।

হা-হা করে হেসে উঠলেন গোপেনদা। হেসে বললেন, ওরে শয়তান, আমি বুঝি গল্পই করি ! না—না, বিমল চাবি আন তুমি।

বিমল বুঝলে গোপেনদার অভিপ্রায়, সম্ভবত সে ক্ষুণ্ণ হবে বলেই গোপেনদা দেরি হওয়ার যুক্তিটা উপেক্ষা করেও তার ঘরে কিছুক্ষণ বসতে চাচ্ছেন। সে বললে—না গোপেনদা, মিহিরবাবু সত্যিই বলছেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে আপনার। আজ থাক।

—থাকবে ?

—হ্যাঁ, অন্যদিনে আসবেন। সেদিন—আপনাকে কিছু খাওয়াব। গল্প করব। চলুন আজ আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

—চল। তবে কথা রইল, খাওয়াবে। আচ্ছা কালই আসব আমি। তোমার তো শ্রীচন্দ্রবাবুর কথা নিয়ে আমার ওখানে যাবার কথা। তোমায় যেতে হবে না, আমিই আসব। মিহির মনে করে দিয়ো।

মোড় পর্যন্ত এসে গোপেনদা দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি বুঝিয়ে বলো শ্রীচন্দ্রবাবুকে। ভাল করে বুঝিয়ে বলো।

বিমল কোন উত্তর দিল না। মিহির বললে—আপনাদের মিথ্যে চেষ্টা হবে গোপেনদা। কোনও ফল হবে না। আমি জানি—এদের আমি জানি।

গোপেনদা বললেন—জানি ; তোরা হয়ত এদের জানিস না, আমি জানি—এই সভ্যতার এই নিয়ম। এ নিয়ম মানে আইনের কথা বলছি—সে তো শ্রীচন্দ্রবাবুরা করেনি, করেছে গভর্নমেন্ট , কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট জমি অ্যাকোয়ার করে তাকে ডেভেলপ করে চড়া দামে বিক্রি করছে। শহর বাড়ছে, শহরের এই ধর্ম। বন কেটে শহর বাড়ছে, সমুদ্রের গর্ভ পূর্ণ করে শহর বাড়ছে, বম্বেতে মেরিন ড্রাইভ তৈরি হচ্ছে দেখে এসেছি। আবার দরিদ্র মানুষের বসতি কৃষিক্ষেত্র ভেঙে শহর বাড়ছে। কিন্তু—

সশব্দে একখানা ট্রাম এসে দাঁড়াল। গোপেনদা বললেন —আচ্ছা কাল আসব।

ট্রামে চড়ে বসলেন গোপেনদা ও মিহির। বিমল ফিরল। প্রচণ্ড শব্দ করে একখানা লরী আসছে। সরে দাঁড়াল বিমল। বড় বড় লোহার বীম বোঝাই করে নিয়ে চলেছে লরীখানা। গতির ঝাঁকানিতে লোহাগুলো সশব্দে নড়ছে। সেই জন্য এমন প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। বাড়ি তৈরি হবে, লোহার কড়ি চলল। মহানগরী প্রসারিত হচ্ছে। যত জঙ্গলে ঘেরা দরিদ্রের পল্লীভবন ভেঙে তৈরি হবে দীপমালায় উজ্জ্বল—আরামের উপকরণ-সমৃদ্ধ—শ্রীসম্পদে ঝলমল পুরী।

চিৎকার করছে—কে?

হৈ-হৈ চিৎকার উঠছে। কি হলো? বিমল চমকে উঠল এবার। কেউ যেন ছুটে আসছে।—ছুটে গেল একটা লোক। তার পিছনে বিশ-পঁচিশ জন লোক ছুটছে। খুন—খুন। ছোরা মেরেছে। ছোরা।

মহানগরীর রাত্রি। এমন একটি রাত্রিও বোধ হয় মহানগরীর ইতিহাসে নাই যেদিন মানুষের দেহের তাজা রক্ত মাটির বুকে না পড়ে।

চাবি নেবার জন্য সে চিত্তর ডিপোর সামনে এসে দাঁড়াল। চিত্তর ডিপোতেই লোক জমে রয়েছে।

—কি ব্যাপার চিত্ত? খুন?

ঘাড় নেড়ে চিত্ত বললে—বেঁচে গেছে। হাত দিয়ে আটকেছিল—হাতে লেগেছে। লাবণ্যদির বাড়িতে এক ছোকরা, ছবি আঁকে, পাগলাটে ধরন, অতি গো-বেচারা লোক, বেঁচে গেছে খুব।

এবার নজর পড়ল, সেই শিল্পী পিনাকী বসে আছে হাতখানা ধরে, একজন তুলো দিয়ে বাঁধছে।

আট

মহানগরীর ইতিকথায় ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। স্বাভাবিকও বটে, যে ভাবের ব্যবস্থায় মহানগরীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে স্বাভাবিক বললে সত্যই বলা হবে, মহানগরীর অপমান করা হবে না।

ব্যাপারটা ঘটেছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে আকস্মিকভাবে।

পিনাকী বিদায় নিচ্ছিল লাবণ্যদের কাছে। এক লাবণ্য ছাড়া পাগল পিনাকী অপর মেয়েগুলির কাছে কৌতুকের মানুষ। সদাই অপ্রস্তুত হতভম্ব শিল্পীটিকে বেশি করে অপ্রস্তুত করে মেয়েরা আমোদ পায়। পিনাকী বাইরের সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছিল...মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। লাবণ্য ছিল ভিতরে। অরুণাও এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কথা হচ্ছিল সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে। সমাজ সম্বন্ধে কথা হলেই ক্ষেপে ওঠে পিনাকী। শান্ত বিনীত কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে ওঠে, তার মুখ-চোখের ভীরুভাব কেটে যায়, সে তার মাথার বড় বড় চুল অধীরভাবে টানে এবং সমাজকে ভেঙে ফেলবার শপথ গ্রহণ করে। সেই সুযোগে মেয়েরা কেউ বিধবা বিবাহের কথা তুলে দেয়। অর্থাৎ সকলেরই ধারণা পিনাকী লাবণ্যকে ভালবাসে। মেয়েদের ঐদিক দিয়ে একটা সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে। এক দৃষ্টিতেই বুঝতে পারে কোন্ পুরুষের দৃষ্টি কাকে দেখে রঙীন হয়ে উঠছে। লাবণ্যকেও এ নিয়ে তারা মধ্যে মধ্যে পরিহাস করে থাকে কিন্তু লাবণ্যের সঙ্গে পরিহাস জমে না। তার সহজ গাম্ভীর্যের স্পর্শে এসে তটের উপর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ভেঙে নেমে যাওয়ার মতো মিলিয়ে যায়। এই কারণে পিনাকীকে নিয়েই তারা একটু বেশি করে পড়ে।

ঠিক এই সময়েই রাস্তার ওপারের বাজারটার পিছন দিকের নিম্নস্তরের বস্তীর

ভিতর থেকে দুটি লোক বেরিয়ে এদের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ভদ্র বেশভূষা, চলার ভঙ্গিতে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য। ওরা ওই বস্তীর বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। লাবণ্য-ও এদের একটু একটু চেনে। এ পাড়ার রাস্তায় মধ্যে মধ্যে লাবণ্যকে বিরক্ত করে থাকে। দেখা হলেই খানিকটা পিছু নিয়ে চলে; কখনও শিস্ দিয়ে ওঠে, কখনও অকস্মাৎ চোখে চোখ পড়লে ইঙ্গিত করে থাকে। লাবণ্য এদের দেখলে, যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে, সে-রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে; যে ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর না হয় সে ক্ষেত্রে অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে চোখ নামিয়ে পথ চলে। খানিকটা অনুসরণ করেই ওরা ক্লান্ত বা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। লোক দুটি পেশাদার গুণ্ডা নয়, কাজ-কর্ম করে, কিন্তু মহানগরীর জীবনধারায় সঞ্চারিত এ ব্যাধির বিষে জর্জরভাবে সংক্রামিত। ওদের ধারণা লাবণ্যদের ধরনের অভিভাবকহীন মেয়েরা...যাদের ভরণপোষণের ভার নেবার কেউ নেই, জীবিকার দায়ে যারা এমন পথে পথে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা কখনও ভাল মেয়ে হতে পারে না। স্বাধীনভাবে মেয়েদের জীবিকা উপার্জনের একটি পথই তাদের চোখে পড়ে। সে এই পথ। তারা জানে মেয়েদের মূলধন একমাত্র দেহ। দেহের শক্তিতে মেয়েরা ভাত রান্না করে, ঝিয়ের কাজ করে, দিন-মজুরী খাটে অথবা দেহ ভাঙিয়ে তারা জীবিকা উপার্জন করে। বি-এ, এম-এ, পাশ করে যারা চাকরী করে খেটে খায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া অপর কোনরকম বুদ্ধিগত পন্থায় মেয়েরা জীবিকার্জন করতে পাবে এ ধারণা তাদের নাই। এটা শুধু তাদের মন্দত্ব ঢাকবার ছদ্মাবরণ। স্নো ক্রীম পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক রূপকে ঢেকে তাকে উজ্জ্বল করে তোলার মতোই এই জীবিকার্জনের চেষ্টাটা তাদের মন্দত্ব ঢাকার একটা পালিশ বা প্রলেপ।

আজ এই সন্ধ্যায় অভিসার-রাগময় সময়ে মেয়েগুলিকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে এবং পিনাকীর সঙ্গে চপলপরিহাসমুখর অবস্থায় দেখবামাত্র তাদের মনে হলো আজ তারা এদের চাতুরী ছলনা ধরে ফেলেছে। তারা মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেই সরাসরি এসে পিনাকীর পিছনে দাঁড়াল। মেয়েগুলি চকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। অরুণা সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখছিল এতক্ষণ, সে প্রশ্ন করলে—কে? কে আপনারা? কি চান?

একজন হেসে বলে উঠল—আজ তো ধরে ফেলেছি বাবা।

অপরজন হেসে উঠল। পিনাকী সবিস্ময়ে এদের দিকে ফিরে দাঁড়াল হাসির শব্দ শুনে এবং কথা শুনে লাবণ্য ঘরের ভিতর থেকে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে অরুণা?

—দু'জন লোক।

—লোক? লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি চান এখানে?

—তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল। শীর্ণ কুব্জদেহ পিনাকী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল—স্কাউন্ড্রেল।

মুহূর্তে লোকটির হাতের ছুরি ঝলসে উঠল, ছোরা নয়, স্প্রিং-দেওয়া পিতলের বাঁটের ছুরি। স্প্রিং টিপলেই ফলাটা বেরিয়ে পড়ে। মেয়েরা চিৎকার করে উঠল। লাবণ্য হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে টেনে নিলে পিনাকীকে, পিনাকী হাত তুলেছিল আত্মরক্ষার জন্য, সেই হাতে ছুরিটা গেল বিঁধে। এর পরই লোক দুটো পালিয়ে গেল।

বিমল বিস্মিত হয়ে গেল পিনাকীর এমন সাহসের পরিচয় পেয়ে। পিনাকী অপ্রতিভের মতো হাসতে লাগল। বললে—ও সব লোকগুলো এমনিই হয়। যে কেউ সাহস করে রুখে দাঁড়ালেই ছুটে পালায়। আমি দেখেছি, ওদের জানি আমি।

—জানেন ? সবিস্ময়ে চিত্ত বললে—জানেন ওদের আপনি ?

—হ্যাঁ। আরও বারদুয়েক ওদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। একবার পিঠে ছুরি মেরেছিল। পিঠে হাত বুলিয়ে পিনাকী বললে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ধারে গাছগুলোর তলা দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে—সেই রাস্তার উপর। পিঠে দাগ আছে এখনও। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। সাহস করে দাঁড়ালেই ওরা ভয় পায়, পালায়। সন্ধ্যের অন্ধকার ছিল নইলে বোধ হয় ছুরি মারতে পারত না। এমনিই ভয়ে পালাত।

চিত্ত হেসে বললে—পালায়। কিন্তু ছুরি বসিয়েও দিয়ে যায়। আপনার তো এই তালপাতার সেপাইয়ের মতো শরীর, সেবার পিঠে ছুরি খেয়ে বেঁচেছেন—এবারে খুব ফস্কে গিয়ে হাতে লেগেছে কিন্তু এরপর বুকে পিঠে বিঁধে হাসপাতালে যাবার সময় হবে না। এ রকম গোঁয়ার্তুমি আর করবেন না। শুধু হাতে এগুবেন না। আমিও অবিশ্যি দুর্বল মানুষ কিন্তু হাতিয়ার আমার সঙ্গে থাকে। ওটি না নিয়ে আমি এক পা বাড়াই না।

তারপর সে আক্ষেপ করে বললে—লোকটাকে চড় না মেরে যদি চিৎকার করে ডাকতেন মশায়! আঃ! এই তো প্রায় দোরের কাছে বললেই হয়। হারামী দুটোকে আজ আঃ! বসে আছি আমরা—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভোঁ করে দৌড়ে পালাল।

—চিত্তদা।

—কে ? লাবণ্যদি ? চিত্ত ডিপোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রাস্তার উপর। লাবণ্যই। লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে—পিনাকীকে আজ মেসে ফিরতে দেবেন না। আমি বিছানা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার ডিপোতেই একটু জায়গা করে যদি—

—ডিপোতে ? এখানে তো কুলীরা থাকে, চারিদিকে কয়লা আর কালি—

—না না। আমি বেশ চলে যাব। আপনি কিছু ভাববেন না। পিনাকী উঠে দাঁড়াল ব্যস্ত হয়ে।

—না। দৃঢ়স্বরে বললে লাবণ্য। রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। তাছাড়া তোমার মতো আধ-কানা আধ-পাগলা মানুষ, পথে যদি লোক দুটো কোথাও লুকিয়ে থাকে—কি ?

না। যাওয়া হবে না তোমার। এখানে অসুবিধা হলে বিমলবাবুর ওখানে থাকবে, আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে। তিনি কখনও না বলবেন না।

বিমল বিস্মিত নিস্তব্ধ হয়ে বসে ভাবছিল পিনাকীর কথা। অপ্রতিভ নিষ্প্রভ এই জীর্ণদেহে পিনাকীর এই সাহসটা কি? চিত্তর শরীর এমনি দুর্বল কিন্তু জীবনে এমন আবেষ্টনীর মধ্যে সে পড়েছে যে এই দুঃসাহস তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে ব্যাধির মতো। ক্ষেত্র ছিল অনুকূল। শিক্ষার অভাব, নেশায় আসক্তি, দুর্দান্ত লোকদের সাহচর্য দুঃসাহসকে জাগিয়ে তুলেছে গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় বাতাসের সাহায্যে শুকনো কাঠের আগুনের মতো। কিন্তু পিনাকীর এ দুঃসাহস কি করে হলো?

লাবণ্যের কথা শুনে সে বেরিয়ে এসে নমস্কার করে বললে—আমি এখানেই রয়েছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। এই রাত্রে পিনাকীবাবুর যাওয়া ঠিক হবে না। উনি আমার কাছে থাকবেন। তবে—একটু লজ্জিত ভাবেই বললে—ওঁব জন্যে খাবার পাঠিয়ে দেবেন। মানে আমি তো পাইস হোটেলে খাই।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি এক্ষুণি নিযে আসছি।

পিনাকীর জামাকাপড় অপরিচ্ছন্ন ময়লা, একটা দুর্গন্ধও তাতে আছে কিন্তু পুলওভার এবং শার্টটা খুলতেই এমন দুর্গন্ধ অনুভব করলে বিমল যে মনে হলো তার বমি হয়ে যাবে এখনি। পিনাকীর গায়ের গেঞ্জীটার দুর্গন্ধ এতক্ষণ জামা দুটোর তলায় চাপা ছিল। অসংখ্য ছিদ্রভরা প্রায় রান্নাঘর নিকানো ন্যাতার মতো ময়লা এবং চটচটে একটা গেঞ্জী। বোধ হয় নতুন কিনে পরেছে, আজও কাচা হয়নি, একদিনের জন্যও গায়ের থেকে নামেনি। কিন্তু বলবেই বা কি করে?

বিছানার উপর বসে সে বিড়ি খাচ্ছিল। ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে খুব আরাম করে বিড়িটা উপভোগ করছিল। হঠাৎ বললে—আপনি বেশ আরামে আছেন, চমৎকার ঘরখানি। ছোট্ট, বেশ ঝকঝকে তকতকে—তেমনি নির্জন। I am monarch of all I survey—একলা ঘর না হলে লেখা কি ছবি আঁকা হয়?

বিমল বললে—কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

— আমাকে?

—হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না যেন।

অপ্রতিভ নির্বোধের মতো তার মুখের দিকে চেয়ে পিনাকী বললে—মনে করব কেন? কি মনে করব?

একটু ইতস্তত করে বিমল বললে—গেঞ্জীটা খুলে ফেলুন গা থেকে। বড—

—হ্যা—বড্ড দুর্গন্ধ। অপ্রতিভের মতো পিনাকী গেঞ্জীটা টেনে নাকের কাছে তুলে শুঁকলে—বড্ড দুর্গন্ধ। ছিঁড়েও গেছে। মানে একটাই গেঞ্জী কি না। ওটা আর কাচা হয় না। বলতে বলতেই সে খুলে ফেললে গেঞ্জীটা। তারপর একবার ভাল করে দেখে আর একবার শুঁকে বললে—এটাকে তা হলে বাইরের ঘরে রেখে দি। সে উঠে বাইরে রেখে এল গেঞ্জীটা—দরজার ওদিকে সিঁড়ির উপর।

বিমলের কোন কথা বলবার শক্তি ছিল না। সে বিস্ময়ে বেদনায় বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল—পিনাকীর দেহ দেখে। পাঁজরার প্রতিটি হাড় গোনা যায়, বোধ হয় ভাল করে লক্ষ্য করলে—হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনিও দেখা যাবে চামড়ার উপর। শুধু তাই নয়—পিঠে একটা সাংঘাতিক চিহ্ন—যেন দগদগ করছে।

পিনাকী ফিরে বিছানার উপর বসে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে তার দৃষ্টির অর্থ। হেসে বললে, আমার শরীর দেখছেন?

—আপনার শরীর এত খারাপ!

—এত খারাপ ছিল না আগে। অপ্রতিভের মতো হাসলে পিনাকী,—ওই পিঠে ছোরা মেরেছিল—তারপর থেকেই শরীরটা বেশি খারাপ হয়ে গেল। মানে আর সারাতে পারলাম না। আমার ছবি একেবারেই কেউ নিতে চায় না! ভাগ্যিস লাবণ্যদিদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—উনিই আমার বড় খরিদ্দার। দশটাকা-বারোটাকা মাসে পাই ওঁর কাছ থেকে।

—পিঠে ওই দাগটা বুঝি সেই ছোরার দাগ?

—হ্যাঁ। আর খানিকটা ঢুকলে বাঁচতাম না। ডাক্তাররা বললে। হাসতে লাগল পিনাকী।

হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে বিমল প্রশ্ন করলে—মিউজিয়মের সামনে রাস্তার ওপাশে গাছের তলায় সন্ধ্যের সময় যান কেন? জায়গাটা তো খুব ভাল নয়।

—না। জায়গাটা খুব খারাপ। তবে ওখানে সূর্যাস্তেব সময় ফোর্টের ছবিটা খুব ভাল লাগে। গরমের সময়, ওখানে গাছতলায় বসে সূর্যাস্ত দেখে বসেই ছিলাম। ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা শব্দ শুনে। কেউ যেন আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় কেউ যেন বললে—চুপ। চেঁচালে জানে মেরে দেব। আমি লাফিয়ে উঠে গাছের ওপাশ থেকে এসে লোকটাব ঘাড চেপে ধরলাম। লোকটা ঝাঁকি মেরে ফেলে দিলে আমাকে। আমি উপুড হয়ে পডেছিলাম, হাত বাডিয়ে পা চেপে ধরলাম। অন্য লোকটি চিৎকার করতে লাগল—এ লোকটা আমার পিঠে ছোরা মারলে।

একটু থেমে শার্টটা তুলে পকেট খুঁজলে পিনাকী; দুটো পকেটই খুঁজলে। বললে—এ হে—বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

—সিগারেট খান। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে বিমল।

—সিগারেট আমার পোষায় না দাদা। বিড়ি না হলে গলায় সানায় না।

—চুরুট আছে, খাবেন?

—চুরুট? মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিনাকীর।—ওঃ—জীবনের বিলাস কামনাব মধ্যে ওইটে একটা। চুরুট খাব আমি। বুঝলেন?

সুটকেস খুলে চুরুট বার করতে গিয়ে বিমল একটু ভাবলে—তারপর চুরুটের সঙ্গে একটা নতুন গেঞ্জী বার করে পিনাকীর হাতে দিলে, বললে—শীতকাল, খালি গায়ে রাতে সুড় সুড় করবে। এটা পরে ফেলুন। আর এই নিন চুরুট।

—নতুন গেঞ্জী! খুব নরম। এটা গায়ে দেব?

—হ্যাঁ গায়ে দিন—চুরুটটা ধরান।

—আপনি আমাকে—আপনি বলবে না। গেঞ্জীটা গায়ে দিয়ে চুরুট ধরিয়ে সে বললে—আজকের দিনটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। বুঝলেন? চিরকাল মনে থাকবে। লাবণ্যদি এত স্নেহ করলেন, নিজের হাতে বিছানা করে দিয়ে গেলেন, আপনি গেঞ্জী দিলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হলো, তারপর এই চুরুট। আমার বিছানাটা খুব ময়লা আর খুব শক্ত—চমৎকার বিছানাটি।

বিমল উঠে আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছিল। পিনাকী বললে—আর একটু থাক। চুরুটটা খেয়েনি। ধোঁয়া না দেখতে পেলে আরামটা পুরো হবে না। গলগলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখব তবে তো!

পিনাকীই উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

বিমল তখনও ভাবছিল পিনাকীর কথা। পিনাকীর মাথার মধ্যে গণ্ডগোল আছে। হয়তো আতঙ্ক অনুভব করায় স্নায়ুশিরাগুলি দুর্বল, অথবা ওর রক্তের ধারার মধ্যে একটা দুর্দান্তপনার সূক্ষ্ম স্রোত প্রবহমান রয়েছে। হয় তো সেই অপরাধপ্রবণতাও হতে পারে।

—ঘুমালেন দাদা?

—কিছু বলছেন?

—এই দেখুন। আবার আপনি বলছেন?

হেসে বিমল বললে—অভ্যেস হয়নি এখনও। কিছু বলছ?

—আর একটা স্মরণীয় দিনের কথা মনে পড়ছে। আমার জীবন—কিই বা জীবন! তাতে বলবার মতো, স্মরণ করবার মতো দিন আর আসবে কি করে? কিন্তু এসেছিল একটি দিন! সে দিনটির মতো দিন বোধ হয় আর আসবে না। আমার বয়স তখন চৌদ্দ-পনের বছর। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে ভলান্টিয়ার হয়েছিলাম। গান্ধীজী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একদিন বিপ্লববাদীরা দেখা করলে। আমি ঢুকে পড়েছিলাম, এক কোণে বসেছিলাম। মহাত্মাজী বলছিলেন অহিংসার কথা। বলতে গিয়ে, বুঝাতে গিয়ে বললেন—বুঝলেন দাদা, থম থম করছে সমস্ত আসরটা—আস্তে আস্তে গান্ধীজী কথা বলছেন, সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনছে, অনেকের মনে বিরুদ্ধ যুক্তি ধারালো ছুরির মতো উঁচিয়ে উঠে ঝকমক করছে, তাঁদের চোখের চাউনি হয়ে উঠেছে ছোট, ভুরু কপাল উঠেছে কুঁচকে; ওঃ সে যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গান্ধীজী আঙুল দেখিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—আমার অহিংসা দুর্বলের নয়, আমার অহিংসা আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি নির্ভয়ে দাঁড়াবার শক্তি দেবে। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি স্থির হয়ে তার দিকে তাকাব। আমার বুকটা গুর গুর করে কেঁপে উঠল। মনে হলো মৃত্যু বুঝি খুব কাছে—হয়তো আমারই পাশে—কিম্বা গান্ধীজীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছে। শরীরের রোঁয়া খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

বিমলের শরীরও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে কথা বলতে পারলে না। পিনাকী

বললে—ওই কথাটি রোজ আমার মনে পড়ে! জানেন—এই যে দু'বার ছুরি খেলাম, দু'বারই আমার মনে পড়েছে কথাটি।

ভোরবেলা দরজার কড়া নড়ে উঠল, বিমল তখন উঠেছে। মুখ-হাত ধুয়ে সে বিব্রত হয়ে বসে ছিল—ভাবছিল বেড়াতে বেরুবার কথা। পিনাকী এখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে; ওই শীর্ণ দেহ—ওতেও ওর নাক ডাকছে। সম্ভবত আরামটা হয়েছে বেশি। কিন্তু এই ভোরে কডা নেড়ে ডাকছে কে?

দরজা খুলতেই দেখলে দাঁড়িয়ে আছে লাবণ্য। তার পিছনে অরুণা। হাতে কেটলি, চায়ের কাপ।

—এ কি? এই সকালে চা নিয়ে খাওয়াতে এসেছেন?

লাবণ্য বললে—আপনি খুব সকালে বেরিয়ে দোকানে চা খেতে যান—সে আমি জানি। তার আগেই আসব বলে এলাম। কিন্তু পিনাকী এখনও ঘুমুচ্ছে? পিনাকী! পিনাকী!

পিনাকী চোখ মেলে চাইলে। তারপর ধডমড় করে উঠে বসল। বললে—লাবণ্যদি!

—ওঠ, মুখ ধুয়ে চা খাও। তারপর চল হাতটা খুলে গরম জলে ধুযে ভাল করে বেঁধে দেব।

চারিদিকে সিটি বাজতে লাগল। মহানগরী ঘুম ভাঙাবার আহ্বান জানাচ্ছে। ওরা চলে যেতেই বিমল গল্পটা শেষ করতে বসল।

নয়

রাত্রি তিনটে বাজল।

পাশের বাড়ির দোতলাতে একটা বড দেওযাল-ঘড়ি আছে। যার শব্দ শীতের রাত্রে দরজা বন্ধ থাকলেও শোনা যায়। বিমল ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করল। চোখ জ্বালা করছে, হাতের শিরায় টান ধরেছে। আজ সারাটা দিনই লিখছে। গল্পটা শেষ করতে হবে। বাংলা মাসের সংক্রান্তি আজ। হিরণদের কাগজ লেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। বিমলের অনুরোধে সম্পাদক অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছেন। বিমলের উপর ক্রমশ তাঁর আস্থা বাড়ছে। আগামীকাল পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন বলেছেন। কিন্তু বিমল আজই লেখাটা শেষ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। কালকের দিনটা তার নিষ্ফলা দিন গিয়েছে। লাবণ্য, অরুণার নিমন্ত্রণ, কালীনাথের আকস্মিক আবির্ভাব, গোপেনদার ডাক, পিনাকীর ছুরি খাওয়া এবং রাত্রিটা তাকে নিয়ে কাটানো—এই সব নানা ঘটনার মধ্যে লেখার কাজ তার কিছুই হয়নি। লেখা দূরে থাক, গল্পটা নিয়ে সে ভাবতেও পারেনি। আজ সকালে পিনাকীকে বিদায় করে সে লিখতে বসেছে। স্নান করেনি, লিখেই চলেছে। মধ্যে মধ্যে এই ভাবে সে লেখে। এ লেখায় যত যন্ত্রণা তত আনন্দ। আবিষ্ট মস্তিষ্কের অন্তরালে দৈহিক সচেতনতা ক্লান্ত কাতর হয়ে থামতে চায়, কিন্তু থামবার উপায় নাই। চলচ্ছক্তিহীন তৃষ্ণার্ত যেমন বুকে হেঁটে এগিয়ে চলে দূরবর্তী পদ্মদীঘির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে,

ঠিক তেমনি ভাবেই লেখা লিখেই চলে। মধ্যে মধ্যে কলম রেখে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী আঙুল দুটি টেনে মটকে নিতে হয়, মধ্যে মধ্যে চা খায়, বাঁ পাশে থাকে থাকে বিড়ির বান্ডিল ও দেশলাই, একটার পর একটা ধরায়, কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দেয়। সেই চায়ের জন্যই সে ফ্লাস্ক কিনেছে, নইলে চা খাবার জন্য বার বার উঠে দোকানে যেতে হয়। এর সঙ্গে থাকে একটা পাঁউরুটি আর দু'-চার পয়সার মাখন। নিতান্ত ক্লান্ত হলে—এক একবার উঠে রাস্তায় খানিকটা ঘুরে আসে—সেই সময় ফ্লাস্কটা নতুন চায়ে ভর্তি করে আনে।

চুমুক দিয়ে বিমলের চা আর ভাল লাগল না। বুকের ভিতরটায় কেমন যেন প্রদাহ অনুভব করছে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সে কুঁজো থেকে গড়িয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তৃপ্তি পেলে। বিড়ি খেতে ইচ্ছে হলো না। একটু চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

শেষ রাত্রে স্তব্ধ মহানগরী। রূপকথার জনহীন পুরীর মতো মনে হচ্ছে। অন্তত এ অঞ্চলটা মনে হচ্ছে। এ অঞ্চলে এমন কোন কারখানা নাই যা দিনরাত্রি চলে। খবরের কাগজেব আপিস থাকলে এতক্ষণে রোটারী চলতে শুরু করত। স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজারের মেশিনরুম এতক্ষণে মুখর হয়ে উঠেছে। বসুমতীবও রোটারী আছে। এ ছাড়া আর সব বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। হাসপাতালে রোগী দু' একজন জেগে আছে। নার্স ঢুলছে। হাঁপানীর রোগীরা উঠে বসে কাশছে, হাঁপাচ্ছে। চোরেরাও আর জেগে নাই; তারা নৈশ অভিযান সেরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেহপণ্যাদের পল্লীতেও তাণ্ডবের আসর ঝিমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

হঠাৎ সে উঠল। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাজপথের উপর। চিক্ চিক্ শব্দ করে চকিত হয়ে ছুটে পালাল একটা ছুঁচো। তার পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড বড় ইঁদুর।

পল্লীগ্রাম হলে হয় তো দেখা যেত সাপ। কিম্বা ঝাঁপ্ শব্দ করে লাফ দিয়ে পালাত একটা 'ঢাউস বেড়াল'। মাথাব উপর দিয়ে উড়ে যেত বাদুড়। গাছ থেকে ডাকত পেঁচা। আর ডাকত অসংখ্য ঝিঁঝি এবং লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ।

খাঁ-খাঁ করছে জনহীন রাজপথ। দু' ধারে গ্যাসের বাতি জ্বলছে, মধ্যে মধ্যে দু' একটার শিখা কাঁপছে—লালচে হয়ে উঠছে তাদের শিখা, ম্যান্টাল ভেঙে গেছে। কালো পিচ দেওয়া পথের রঙ মনে হচ্ছে ইস্পাতের মতো। শীতের রাতে ছাইগাদায় শুয়ে আছে পথবিহারী কুকুর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে বিমল। তারপর ফিরে এসে আবার লিখতে বসল। মিহিরের বাবাকে নিয়ে গল্প। কিছু দিন আগে সে তাঁকে দেখেছিল, বর্ষার রাতে ভাঙা ফাটলধরা পুরনো ড্রয়িংরুমে পায়চারি করতে। সেই দিনই তিনি বিক্রি করেছিলেন তাঁর বাড়ি। লালচে কেরোসিনের আলো পড়েছিল তাঁর পীত পাণ্ডুর দেহবর্ণের উপর। অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল তাঁর চোখে। অতীতকালের স্বপ্ন দেখছিলেন বোধ হয়। অন্তত তাই মনে হয়েছিল বিমলের। তাঁর জীবন আজও শেষ হয়নি কিন্তু গল্প তাকে শেষ করতে হবে। তাই সে ভাবছিল। পুরানো বাড়িখানা

ভাঙতে শুরু করেছে এইটুকু সে জানে। মিহিরের বাবা কোথায় তাও জানে না। মিহিরকেও সে জিজ্ঞেস করতে পারেনি। তাই তাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে।

হঠাৎ মনে পড়ল তার নিজের বাপের কথা। মনে পড়ল তাঁর শেষ জীবনে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় মহলটি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি আর বাইরে বড় একটা বের হতেন না। দিনে থাকতেন পুজো-অর্চনা নিয়ে, শাস্ত্রপাঠও করতেন, গভীর রাত্রে তিনি গিয়ে উঠতেন ছাদে। মনে পড়ছে কতদিন ঘুম ভেঙে গিয়ে সে শুনতে পেত ছাদের উপর ভারী পায়ের খড়মের শব্দ বাজছে খট-খট, খট-খট। মধ্যে মধ্যে শব্দ বন্ধ হত। সে শুনেছে, তার মা বলতেন—আর তিনি তাকিয়ে থাকতেন উত্তর দিকের দূরের গাছপালার দিকে; রাত্রির অন্ধকারে গাছপালা স্পষ্ট দেখা যেত না। কিন্তু তিনি নাকি বলতেন, ওই ডিহি শ্যামপুরের অশ্বত্থগাছের মাথা, ঐ তারাসায়রের পাড়ের শালবনের শোভা, দেখতে পাচ্ছ?

হাতে কলম তুলে নিয়ে সে লিখতে বসল।

"শেষ রাত্রির মহানগরী। নিস্তব্ধ, কিন্তু আলোকিত। জনহীন পথঘাট। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন তৈরি বিশাল প্রশস্ত কংক্রিট করা পথের ধারে জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিক আলোর সারি। সেই পথের ধারেই একটা বিশাল পুরানো ধ্বংসস্তূপ। অর্ধেক ভাঙা হয়েছে—ছাদ নাই, দরজা-জানালা ছাড়ানো হয়ে গেছে। একদিকে সাজিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ভাঙা ইট এবং পুরনো চুন-সুরকীর গাদা পড়ে আছে।

তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ; পীত পাণ্ডুর বর্ণ, শীর্ণ দেহ, চোখে মৃতের দৃষ্টির মতো স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি। বিশাল পুরানো বাড়িটার প্রাণপুরুষ, অতীতকালের যক্ষ, মুক্তি পেয়েও বিব্রত হয়ে পড়েছে; মাথার উপরে গ্রহতারকার দীপ্তময় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ভাবছে কোথায় যাবে? মধ্যে মধ্যে নিজের পাঁজরায় হাত বুলায়, মনে হয় পাঁজরাগুলি ভেঙে গেছে—বুকের মধ্যে জমে উঠেছে অস্থিপঞ্জরের ভগ্নস্তূপ, ঠিক এই চুন-সুরকীর ভগ্নস্তূপের মতোই। কদর্য লাগে নূতন কালের ইমারতগুলি, গড়িয়ে আসে চোখ থেকে জলের ধারা। রাত্রি শেষ হয়ে আসে। অকস্মাৎ একসময় বড় বস্তীর ধারের ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি নিভে যায় এক সঙ্গে। আবছা অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে যায়। তারপর ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটতে থাকে কিন্তু মূর্তিকে আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সে মূর্তি মিলিয়ে গেছে বোধ হয়। সকালে শুধু দেখা যায় ওই ইট চুন-সুরকীর স্তূপের উপর পড়ে আছে ছেঁড়া একটা শালের টুকরো, জীর্ণ পুরানো শালের আঁচলার খানিকটা। মজুরের মেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, ছেলেদের খেলা করতে দেবে।

সকালবেলা ওদিকে মিহির বের হয় তার কাজে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ পদক্ষেপে সে চলে—ডকের ওখানে তাকে সাড়ে সাতটায় পৌঁছুতেই হবে। সে এখন কাজ নিয়েছে ডকের নূতন কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টে।"

শ্রী পত্রিকার সম্পাদক কঠিন ধাতুতে গড়া মানুষ। মোটা নাক, বড় বড় চোখ, বলিষ্ঠ চেহারা, যেমন হাস্যরসিক তেমনি অপ্রিয়ভাষী। এই দু'য়ের যেখানে সংমিশ্রণ

হয় সেখানে লোকটির জুড়ি মেলা ভার। আর একটি দুর্লভ গুণ মজলিসী শক্তি। সকাল আটটা থেকে চেয়ার জুড়ে বসেন—খাওয়া নাই স্নান নাই ঘর নাই সংসার নাই, আছে শুধু কাগজের আপিস আর লেখকের দল, একদল আসে একদল যায়, গল্পলেখক, প্রবন্ধলেখক, চিত্রশিল্পী, প্রফেসর, ধনীর সন্তান মায় রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত।

চায়ের পেয়ালা খালি বা ভর্তি টেবিলের উপর আছেই। মধ্যে মধ্যে টোস্ট-ডিম আসে। কখনও চলে নূতন কালের সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা, কখনও চলে নূতন কালের প্রশস্তি; অর্থাৎ যখন যাদের দল ভারী থাকে তখনই চলে তাদের মতের উচ্চ ঘোষণা।

সম্পাদক বিজয়বাবু কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ মত প্রকাশ করেন না, শুধু হুঁ-হাঁ করে যান মধ্যে মধ্যে, সুযোগ পেলেই রসিকতা করে হাসির উল্লাসে জমিয়ে তোলেন আসরকে। মধ্যে মধ্যে লোকটির অকপট চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সে কিন্তু কদাচিৎ।

গল্পটি নিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকল বিমল। এঁদের এই আসরে প্রত্যেকেই তার চেয়ে খ্যাতিমান। এবং সকলেই এই গ্রাম্য লোকটির প্রতি বেশ একটু অবজ্ঞা পোষণ করে থাকেন। সে বিমল জানে। কিন্তু তাকে জয় করতেই হবে। জেনে শুনেও সে আসে লেখা নিয়ে, চেষ্টা করে সম্পাদককে একা পেতে। একা তাঁকে শুনিয়ে লেখাটি তাঁর হাতে দিয়ে চলে যায়। অনেক সময় দলের ভিড় এসে পডলে চুপ করে একপাশে বসে থাকে। এদের তরল উচ্ছ্বসিত সংস্কৃতি-বিলাস চোখ মেলে চেয়ে দেখে। মজার কথা হচ্ছে—বিমল এই কবি ও গল্প লেখকদেব সকলের চেয়েই বয়সে বড়, কিন্তু সে এখানে বসে থাকে সকলের কনিষ্ঠের মতো।

শুধু নীরেন তার একমাত্র সমবয়সী এ দিক দিয়ে—অর্থাৎ এই অবজ্ঞাত সহকারী সম্পাদকটিই তার একমাত্র অন্তরঙ্গ। আর সম্পাদক বিজয়বাবু অন্তরঙ্গ না হলেও তাকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এক ক্ষেত্রে বিমলের কাছে বিজয়বাবুকে ঠকতে হয়েছে।

শ্রী পত্রিকা প্রথম বের হচ্ছে সেই সময়ের কথা। এই আপিসেই বিজয়বাবু প্রত্যেককেই লিখতে অনুরোধ করলেন তাঁর কাগজে, শুধু বিমলকে অনুরোধ করলেন না। কথা দু' চারটে বললেন—অবশ্য—তাও আরও দু' চারটে সিঙারা কচুরী নেবার অনুরোধ জানিয়ে। সিঙারা কচুরী বিমল খেলে না কিন্তু উঠেও গেল না আসর থেকে। সেই আসরেই ঠিক হয়ে গেল প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকা। গল্প লিখবেন স্থির হলো বিখ্যাত গল্পলেখক সূর্য লাহিড়ী এবং কমল রায়। আসরের শেষে উঠে গেল বিমল। সন্ধ্যায় নীরেন তার বাসায় এসে তার কাছে কাতরভাবেই ক্ষমা চাইলে, সে-ই তাকে একরকম জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওই আসরে। প্রত্যক্ষভাবে বিজয়বাবুর সঙ্গে বিমলের আলাপও সেই প্রথম। বিমল হেসে সেদিন নীরেনকে বলেছিল—বস, ও সব কথা ছেড়ে দে। কাল রাত্রি থেকে একটা লেখা শুরু করেছি, শুনবি? শেষ হয়নি তবু শোন না খানিকটা—।

লেখা যতদূর হয়েছিল পড়া শেষ হতেই নীরেন তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—লেখাটা শেষ কর। আর আমায় না বলে কোথাও দিবি না বল ?

—দেব না ?

—ওরে তুই যেন হঠাৎ সোনার কাঠি খুঁজে পেয়েছিস। লিখে ফেল বিমল—লিখে ফেল।

সত্যিই সোনার কাঠি হঠাৎ খুঁজে পাওয়া। লেখা শেষ করে সে নিজেও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। লেখাটার শেষের দিকে বিজয়বাবুর প্রত্যাখ্যানজনিত ক্ষোভটাই হয়তো সে সোনার কাঠি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

নীরেন গল্পটা চেয়ে নিয়ে গিয়ে শুনিয়েছিল বিজয়বাবুকে। বিজয়বাবু লেখাটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে এসে বিমলের টিনের ঘরে হাজির হয়েছিলেন। বলেছিলেন লেখাটি আমায় দিতে হবে। এই প্রথম সংখ্যাতেই ছাপব আমি, সূর্যবাবুর লেখা দ্বিতীয় সংখ্যায় যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পনেরোটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন—শ্রীতে আপনাকে লিখতে হবে, নিয়মিতভাবে লিখতে হবে। আপিসের আসরে যাবেন।

আসরে সে আসে, চুপ করে একপাশে বসে থাকে, শোনে। বড় বড় কথা, অধিকাংশই ইউরোপীয় সাহিত্যের কোটেশন। মোটামুটি ওপরখৈয়ামী ধারা—জীবন এক পেয়ালা আনন্দরস, তার উপর জমে আছে বেদনার ফেনা।

তাকে দেখেই বিজয়বাবু বললেন—আপনার জন্যে বসে আছি। বসুন। ওরে চা নিয়ে আয়। পড়ুন লেখা পড়ুন।

লেখাটি হাতে দিয়ে বিমল বললে—আপনি দেখুন। আমার শক্তি নেই আর। ঘুমে চোখের পাতা ভেঙে পড়ছে। চাও খাব না, কাল থেকে দিনরাত চা খেয়ে আছি।

বিজয়বাবু মজলিসে উপস্থিত লোকগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন—থাক এখন।

—আমি উঠি।

—না। ভিতরের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে নিন খানিকটা।

একখানা বইয়ে ঠাসা ঘর, বিজয়বাবুর লাইব্রেরি, তারই মধ্যে একটা ক্যাম্প-খাটে একটা বিছানা পাতাই আছে। মধ্যে মধ্যে বিজয়বাবু এখানেই রাত্রি কাটিয়ে থাকেন। পত্রিকা বের হবার আগে দু'দিন থাকতেই হয়, তা ছাড়াও থাকেন—কবিতা লেখার নেশা চাপলে সেদিন আর বাড়ি যান না। আর দু' চার দিন থাকেন ; বইয়ের আলমারির ফাঁকে প্রকাণ্ড বিয়ারের বোতল রাখা রয়েছে। আলমারির পিছনে আরও দু' চারটে ছোট বোতল খুঁজলে পাওয়া যাবে। জটিল চরিত্রের লোক বিজয়বাবু। লেখক দলের এক গোষ্ঠী আছে যাদের নিয়ে এই হৈ হৈ করে বেড়ানোও তাঁর জীবনের একটা দিক।

বিয়ারের বোতলটার দিকে তাকিয়ে বিজয়বাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিজয়বাবু ডেকে তার ঘুম ভাঙালেন। বিমলের মুখের উপরেই সিলিং থেকে ঝুলছে ষাট ক্যান্ডেল পাওয়ার ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব, আলোটা জ্বলছে। তীব্র আলো, চোখে লাগল। বিজয়বাবু বললেন—উঠুন। রাত্রি ন'টা বাজে। নীরেন!

নীরেন উত্তর দিলে—যাই।

পাশে বাথরুমের দিকে দেখিয়ে বিজয়বাবু বললেন—যান, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন।

মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে এসে বিমল দেখলে—নীরেন এসেছে, টেবিলের উপরে তিনটে প্লেটে ডবল ডিমের মামলেট—আর চা।

বিজয়বাবু বললেন—খেয়ে নিন। তারপর গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনব।

বিমল শঙ্কিত হলো। পড়তে পড়তে তা হলে কি সে নিজেই বুঝতে পারবে লেখাটা ভাল হয়নি?

বিজয়বাবু তাড়া দিলেন—পড়ুন।

সঙ্কোচ রেখে বিমল খাতাটা টেনে নিলে। ব্যর্থ হয়ে থাকে—তাতেই বা কি? বইতে পারবে সে ব্যর্থতাব বোঝা। পডতে আরম্ভ করলে সে।

—মহানগরী কলকাতার এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের প্রায দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি।

গল্প শেষ করলে বিমল। বিজযবাবু বড বড চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে চেযে রযেছেন তার দিকে। চোখে শিরার জাল রক্তাভ হযে উঠেছে। মনে হচ্ছে নেশা করেছেন তিনি। নীরেনও চুপ করে বসে রযেছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিজয়বাবু বললেন—দিন লেখা।

নীরেন আবার হেসে ব৽.লে—বড জবর লিখেছিস রে বিম্‌লা।

গভীর স্বরে বিজযবাবু বললেন—জবর মানে? বাংলা সাহিত্যেব পাঁচটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে এটি একটি। যাও দিযে এস প্রেসে। কম্পোজিটার বসে আছে। কাল সকালে শেষ হওযা চাই।

নীরেন চলে যেতেই বিজয়বাবু বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে?

বিমল তাঁর মুখের দিকে তাকালে।

বিজয়বাবু বললেন—আপনি সকলেব সামনে এমন চুপ করে বসে থাকেন কেন? ওদের সামনে লেখা পড়তে চান না—!

বিমল তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। বিজয়বাবু বিস্মিত হলেন তার দৃষ্টি দেখে। এমন দৃষ্টি যে এই লোকটির চোখে ফুটতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল না। কথা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

বিমল বললে—হয়তো আমারই দোষ। ওঁরা ভাবেন দুঃখের ফেনা মাথায় করে জীবন এক পেয়ালা আনন্দ। আমি তা ভাবতে পারি না বিজয়বাবু।

চমকে উঠলেন বিজয়বাবু। এতখানি গভীর-গম্ভীর উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিমল বললে—ওই ধারায় যদি আমাকে ভাবতে বলেন তবে আমি বলব সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বটপাতা মাথায় দিয়ে আনন্দের ধ্যান করব আমি।

বিজয়বাবু আবার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বিমলের দিকে। এ যেন নতুন করে পরিচয় হচ্ছে তাঁদের উভয়ের মধ্যে।

হঠাৎ কাঠের সিঁড়িতে একদল লোকের জুতোর শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের হাসি। বিমল প্রশ্ন করলে—এত রাত্রে কারা?

বিজয়বাবু গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বিরজাদের দল আসছে। বিরজা বিখ্যাত গল্পলেখক, নকুল তার ভক্ত কবি, রতন—বাংলা সাহিত্যের নবীনতম লেখক—বিজয়বাবু ওকে বলেন ডার্ক হর্স, ভূপেন এবং আরও কয়েকজন। লম্বা বাবরী চুল আঙুলে জড়িয়ে পাক দিতে দিতে ভূপেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছে। চমৎকার আবৃত্তি করে ভূপেন, পড়াশুনাও তেমনি প্রচুর। আরও একটি গুণ আছে ভূপেনের। জীবন তার খোলা খাতা। সে ভালবাসে এক অভিনেত্রীকে। স্ত্রী-পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করে সে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার ভূমিকা রচনা করছে। মধ্যে মধ্যে দশ দিন বারো দিন একাদিক্রমে সেখানেই থাকে, সকলকেই ঠিকানা দিয়ে রেখেছে—'দরকার হলে বাড়িতে না পেলে সেখানে পাবে আমাকে।' অসঙ্কোচে বলে সে। এর জন্য বিমল ভূপেনকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু ওই ভূপেনই যখন এসে বলে, 'কিছু টাকা আমায় আজ দিতেই হবে বিজয়বাবু। বাড়িতে বউ বিয়ের বেনারসী পরে রান্না করছে অর্থাৎ কাপড় না কিনলেই নয়। টাকাটা অবশ্য অ্যাডভান্স।' তখন বিমল ক্ষুব্ধ হয়।

বিমল উঠল, বিজয়বাবুকে বললে—চললাম আমি তা হলে।

এককালে ভারতবর্ষে সাহিত্য রচনার কেন্দ্র ছিল বনভূমি। দেবতার স্তবগান রচনা করতেন ব্রাহ্মণেরা। তারপর রাজার সভায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কবিরা। রাজার স্তবগান মিশিয়েছিলেন তাঁরা দেবতার স্তবের সঙ্গে। মুসলমান আমলে হিন্দু কবিরা গ্রামে পাতার কুটীরে বসে গান রচনা করে গানের দল নিয়ে বেড়াতেন। এ কালে মহানগরীতে সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হয়েছে। ছাপাখানা বসেছে, প্রকাশকেরা দোকান খুলেছে, কবি-লেখকদের রচনা বই হয়ে বেরুচ্ছে—বিক্রি হচ্ছে সর্বসাধারণের মধ্যে। অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের কথা এসেছে। মুক্ত হয়েছে রাজার স্তবগান করার লজ্জা থেকে। রাজা গুণী হলে গুণীর গুণগানে লজ্জা নাই। কিন্তু রাজার গুণগান আশ্রয়ের জন্য—অন্নের জন্য—সে যে দাসত্ব, চাটুকারবৃত্তি! চাই জীবনের জয়গান। যে জীবন মাটির তলায় বীজ ফাটিয়ে উদ্গত অঙ্কুরের মতো আকাশলোকে আলোক স্নানে যাত্রা করতে চায় বনস্পতির মতো সেই জীবনের জয়গান। মাটির কঠিন আস্তরণকে চৌচির করে ফাটিয়ে ঠেলে পথ করে নেওয়ার কষ্টে প্রাণান্তকর বেদনায় জর্জর অথচ আনন্দের তপস্যায় বিভোর সেই জীবনের গান; সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা বাধা বিঘ্নকে ঠেলে সে উঠতে চাচ্ছে। দিকে দিকে তার অভিব্যক্তি। যত দুর্বার গতি তার, তত বিরাট বাধা তার সম্মুখে, যত কঠিন বাধা তার পথে তত বিপুল জয় তার, সুখ

এবং দুঃখ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে দিন এবং রাত্রি, আলোক এবং অন্ধকারের মতো। এই বেদনা এই আনন্দ মর্মে মর্মে অনুভব না করলে কি সে গাইতে পারে এই গান?

হন্ হন্ করে হেঁটেই চলেছিল বিমল। মনের খুশিতে এবং উত্তেজনায় ভাবতে ভাবতেই চলেছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মনোহরপুকুর রোড। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে সে থমকে দাঁড়াল। একখানা শ্যামবাজারের ট্রামে জানালার ধারে অরুণা বসে রয়েছে। অরুণার ওপাশে কে? পিনাকী? ঝাঁকড়া চুল, পুরু চশমার একখানা কাঁচ দেখা যাচ্ছে। পিনাকীই তো!

চৌরঙ্গী পার হয়ে বিমল এসপ্ল্যানেড এল। অরুণা এবং পিনাকীই বটে। পিনাকী অপ্রতিভের মতো হেসে ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে নমস্কার করলে। বললে—ওঁকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম চাকরির জন্যে।

অরুণা বললে—একটা অনাথ আশ্রমে ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

গম্ভীরভাবে বললে কথাটা, বাজ্যের ভাবনার ছায়া নেমেছে অরুণার মুখে। গম্ভীর মুখে সে ময়দানের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললে—আমি অনেক ভাবলাম, ওখানে ওই ভাবে দর্জির কাজ—। কথাটা শেষ না করে সে ঘাড় নাড়লে বারবার।—পারবে না, সে তা পারবে না।

পথে ভবানীপুর চক্রবেড়ের ধারে বিমল নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। এইখানে একটা পাইস হোটেল আছে, সেখানে খেয়ে বাসায় ফিরবে। অরুণা কোন কথা বললে না, সে ভাবছে। পিনাকী একটু হাসলে।

খেয়ে বাসায় ফিরে দরজা খুলতে গিয়ে সে চমকে উঠল। কে বসে রয়েছে দরজায়?

—কে?

—আমি, পিনাকী।

—হ্যাঁ। আজ একটু শোব এখানে। ট্রামে উঠতে গিয়ে দেখি পকেটে একদম পয়সা নেই। একখানা দু' টাকার নোট যেন ছিল। কিন্তু—

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বিমল অনুভব করলে সে অপ্রতিভের মতো হাসছে।

—লাবণ্যদির কাছে গেলে দিতেন কিন্তু বড্ড বকতেন। আমারও লজ্জা লাগল।

বিমল হেসে বললে—ওঠ দরজা খুলি।

দশ

পিনাকীর মাথাটা বোধ হয় খারাপ।

সমস্ত রাত্রিটাই প্রায় বকেছে। আপন মনে নয়, নিজে বকেছে এবং বিমলকে শুনিয়েছে। বিমল শুনবে না আর নিজে সে বকে যাবে—তা হবে না। বিমল যতবার চেষ্টা করেছে ততবার সে ডেকেছে, ঘুমুলেন না কি?

সাড়া না দিলেও সে ক্ষান্ত হয় নাই—আবার ডেকেছে—বিমলবাবু!

তাতেও সাড়া না দিলে—উঠে আলো জ্বেলে গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছে—বিমলবাবু!

একবার বিরক্তি প্রকাশ করে বিমল বলেছিল—পিনাকী, এবার তুমি আমাকে সত্যিই বিরক্ত করে তুলেছ।

—তা হলে আমি বাইরে গিয়ে বসি, সিঁড়িটায় বসে চুরুট খাই?

—এই শীতের রাত্রে? তুমি পাগল না কি? শুয়ে পড়।

—আমার ঘুম আসছে না বিমলবাবু। অপ্রতিভের মতো সে হাসলে।

—কি? তোমার হলো কি?

কি যে হয়েছে—এই কথাটা এখনও পর্যন্ত বললে না পিনাকী এবং ঠিক বুঝতেও পারেনি বিমল। কথা আরম্ভ করেছিল সে অরুণার চাকরি প্রসঙ্গ নিয়ে। তার বুদ্ধি, তার দৃঢ়তা, তাব সাহস সম্পর্কে শত-উচ্ছ্বাসময় প্রশংসা করেই এসেছে এতক্ষণ। অনাথ আশ্রমে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদের জন্যে সে তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে—আশ্রমের অধ্যক্ষ নাকি বলেছেন—আপনি—আমাদের তো কুমারী হলে চলবে না, বিবাহিতা হওয়া চাই, শুধু বিবাহিতা নয়, সধবা হতে হবে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অধ্যক্ষের মুখের দিকে চেয়ে অরুণা বলেছে—কেন বলুন তো?

—এই নিয়ম করে রেখেছেন কর্তৃপক্ষ।

এর উত্তরে অরুণা এই নিয়মের যে ব্যাখ্যা করেছে অধ্যক্ষটির মুখের উপর--সে শুনে পিনাকী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। বলতে বলতে উত্তেজনায় বিছানাব উপবে উঠে বসে শতমুখ হয়ে বলে—অদ্ভুত মেয়ে, বিমলবাবু—অদ্ভুত মেয়ে। বললে কি জানেন! বললে—সার্কাসে বাঘ-সিংহকে আফিং খাওয়ায শুনেছি, আপনারা শিক্ষয়িত্রীদের স্বামীদের কি খাওয়ান? কথাটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। অরুণা হেসে বললে—সার্কাসে অবশ্য চাবুকও মারে আফিংয়ের সঙ্গে। এখানে হয় তো চাবুকই চালান আপনারা। কারণ শিক্ষয়িত্রীদের স্বামীরা কখনই বাঘের জাত নয়, গরু-গাধার জাত। বলেই বেরিয়ে এল। সমস্ত রাস্তাটা আমি অরুণার সেই বেরিয়ে আসবার সময়ের মূর্তি ভেবেছি। বুঝছেন—ভেবেছি ঠিক নয় ধ্যান করেছি। কল্পনা করেছি কালো বিদ্যুতের রূপ। কালো বিদ্যুৎ মনে ভাবা যায়—কিন্তু ছবিতে আঁকা যায় না।

বিমল এবার পাশ ফিরে শুয়ে বললে—আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড পিনাকী। ঘুম না আসে তো—অন্ধকারে শুয়ে ভাবো—কি ভাবে কালো বিদ্যুৎকে রূপ দিতে পার। আমার ঘুম পাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার ডাকলে—ঘুমুলেন নাকি? শেষ পর্যন্ত উঠে আলো জ্বেলে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে—বিমলবাবু।

সকালে উঠে বিমল বিস্মিত হয়ে গেল। পিনাকী সত্যই দরজার বাইরে সিঁড়িতে বসে আছে। বিমলকে দেখেই সে বললে—আমি বাসায় যাচ্ছি বিমলবাবু।

—বাসায় যাচ্ছ? কিন্তু সারা রাত্রি তুমি এই বাইরে বসেছিলে নাকি?

অপ্রতিভের মতো হেসে বললে—ঘরের মধ্যে মনে হলো বড্ড গরম। ঘুম কিছুতেই এল না। বাইরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আরাম পেলাম। খানিকটা ঘুমও হয়েছিল।

উঠে ঘরের মধ্যে কম্বলটা রেখে—নমস্কার করে সে বললে—চললাম। কাল রাত্রে বড্ড বিরক্ত করেছি আপনাকে।

বিমলের মনে পড়ে গেল—কাল রাত্রে পয়সার অভাবে পিনাকী বাসায় ফিরতে পারে নাই। এতটা রাত্রে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আবার ওদিকের ট্রাম যদি না পায় এই জন্যে বিমল পয়সা দিয়ে তাকে যেতে বলে নাই। কথাটা মনে পড়তেই সে পিনাকীকে ডেকে বললে—দাঁড়াও। শোন।

পিনাকী বললে—বলুন। ভারী তাড়া রয়েছে আমার।

একটাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বিমল বললে—সারারাত্রি ঘুমোওনি। হেঁটে যেয়ো না। ট্রামে বা বাসে যাও।

নোটটা হাতে নিয়ে সে বিমলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বিমল তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দেবার জন্যই ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু পিনাকী দরজায় এসে ডাকলে, বিমলবাবু।

—কি? আবার ফিরলে যে! এদিকে তাড়াতাড়ি আছে বলছিলে।

অকুণ্ঠিতভাবেই পিনাকী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমাকে আর চারটে টাকা দেবেন? মানে পাঁচ টাকা ধার চাচ্ছি।

বিমল সন্তুষ্ট হলো না। কপাল কুঁচকে উঠল তার। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলে সে।

পিনাকী বললে—খুব দরকার আমার। পেলেই দিয়ে দেব আপনাকে, না পারি বইয়ের কভার ডিজাইন করে দেব আপনার। দেবেন?

বিমল কোন কথা না বলে চারটে টাকা এনে পিনাকীর হাতে দিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। টাকা দিতে হওয়ায় মন তার বিরূপ হয়ে উঠল পিনাকীর উপর। ছোকরা যাকে বলে কুগ্রহের মতো এসে তার জীবনযাত্রার নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। ও যেদিন আসে সে দিন আর সকালে বেড়ানো হয় না। বেলা অনেক হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটা বাজে। তবু ভাল যে আজ তার কোন তাগিদের কাজ নাই।

প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতে বেরুবার মুখেই চিত্ত বললে—কাল সন্ধ্যের পর মিহিরবাবু বলে সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন দাদা।

—মিহিরবাবু!

—হ্যাঁ। আপনার দরজার গোড়া থেকে ফিরছেন—আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আমি দেখেই চিনেছি—সেই সেদিনের ভদ্রলোক। কালীকাকা বলেছিল—দর্জিপাড়ার বোসেদের বাড়ির ছেলে। আমাকে কিন্তু চিনতে পারেনি ভদ্রলোক। কয়লা চালছিলাম নিজেই, একেবারে কুলির মতো চেহারা হয়েছিল। আমি বললাম—বিমলবাবুকে চান বুঝি? কিন্তু তার তো ফিরতে দেরি হবে। আমাকে বললে আমি বলতে পারি। বলুন কি দরকার?

চিত্তরঞ্জন কথা বলতে শুরু করলে থামতে চায় না। একজন কেউ অনর্গল কানের

পাশে নিতান্ত নিরসভাবে বকে গেলে মানুষ যে কি যন্ত্রণা অনুভব করে—চিত্ত নিজে বুঝতে পারে না, বেচারী কানে কালা। ওকে থামিয়ে না দিলে ও বকেই যাবে। বিমল তাকে বাধা দিয়ে বললে—বুঝতে পেরেছি। আজ বিকেলে আসবেন বলে গেছেন তো!

চিত্ত কথা শোনে মুখের দিকে তাকিয়ে, অর্ধেক শুনে বোঝে—অর্ধেক বোঝে ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গি দেখে। বিমল মাঝখানে অতর্কিতভাবে কথা বলার জন্যে সে সতর্ক ছিল না তাই কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নাই। সে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলে—কি বলছেন?

বিমল নিজেই ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে স্পষ্ট কিন্তু অনুচ্চ স্বরে বললে—আজ বিকেলে আসবেন বলে গেছেন তো?

চিত্ত ঘাড় নাড়লে—অর্থাৎ—না।

—তবে?

—আসবেন না বলে গিয়েছেন।

—আসবেন না?

—না। ভদ্রলোকের বাবা মারা গিয়েছেন কি না। বোধ হয় অশৌচের মধ্যে আসতে অসুবিধা হবে।

—বাবা মারা গিয়েছেন? চমকে উঠল বিমল। বিশাল প্রাচীন ফাটলধরা জীর্ণ প্রাসাদের মধ্যে একটি শীর্ণ বিবর্ণদেহ মানুষের ছবি ভেসে উঠল তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে। রক্তাভ কেরোসিন ল্যাম্পের অপর্যাপ্ত কম্পিত আলোয় আলোকিত প্রশস্ত ধূলিমলিন ঘরের মধ্যে স্ফটিকের চোখের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে মন্থর ক্লান্ত পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার ঊনবিংশ শতকের সভ্যতা আভিজাত্যের জীর্ণ প্রতিভূদের অন্যতম ব্যক্তি চলে গেছেন।

চিত্ত বললে—হার্টফেল করে মারা গেছেন বোধ হয়। অদ্ভুত মৃত্যু! বুয়েচেন কি না!

—কে বললে তোমাকে?

—শ্রীচন্দ্রবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। ওখানেই শুনলাম। বোসেদের বাড়িটা কিনেছে যারা তাদের কাছ থেকে ওই বাড়ির পুরনো মেটিরিয়েল কিনেছেন শ্রীচন্দ্রবাবুরা। ওঁরা আজকাল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ব্যবসা করছেন জানেন তো। কাঁকুলের ওই দিকে অনেক জমি কিনে রাস্তা করে প্লটে-প্লটে ভাগ করে বিক্রি করেছেন; দু'-চারখানা বাড়ি করেও বিক্রি করছেন; অনেক ব্যাপার আছে। পুরনো মেটিরিয়েলের ইট দরজা জানালা লাগাবেন সেই সব কাজে; ভাঙা ইট-চুন-সুরকী দিয়ে রাস্তাঘাট তৈরি করবেন। বাড়িটার মেটিরিয়েল কিনবেন তিরিশ হাজারে—তা মাল যা মিলবে তাতে অন্তত পঁয়ষট্টি-সত্তর হাজারের মার নাই, বুয়েচেন কি না, আর বাপ্‌রে—কড়ি বরগা দরজা জানালা—সে কত! আর সে সব কাঠ কি? ফার্স্টক্লাস টীক—এ রকম টীক আজকাল আর জন্মায় না।

বিমল চিত্তর হাত ধরে তাকে সচেতন করে দিয়ে বললে—আঃ চিত্ত, বোস মশায়ের কথা বল। শ্রীচন্দ্রবাবুর ভাগ্য ভাল, কাঠ কেন, বাড়ির ধুলোর মুঠোও তাঁকে পয়সা দেবে। সে কথা থাক।

চিত্ত বললে—পরশু সকালে লোকে দেখে বোস মশাই ওই ভাঙা বাড়ির ইট কাঠ ধুলোর গাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

চমকে ওঠে বিমল।

কালই সে তার গল্পটা শেষ করেছে—লিখেছে—শেষরাত্রির মহানগরী। আলোকিত কিন্তু জনহীন, প্রাণহীন যক্ষপুরীর মতো। নতুন প্রশস্ত পথের ধারে বিশাল বাড়ির ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে পীত পাণ্ডুরবর্ণ, শীর্ণ দেহ, চোখে স্ফটিক চক্ষুর মতো স্থির ভাবলেশহীন দৃষ্টি, শুভ্রকেশ একটি মানুষ; ধ্বংসস্তূপে পরিণত বিশাল বাড়িটার প্রাণপুরুষ, অতীতকালের যক্ষ যেন।

চিত্ত বলেই চলেছিল—নানা জনে তো নানা গুজব নানা জল্পনা-কল্পনা করছিল, কেউ বলে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ বলে বাড়ির কোথাও গুপ্তধন আছে, তারই সন্ধানে এসেছিলেন—অন্য মন্দ লোকে তক্কে তক্কে ছিল—খুন করে গিয়েছে। শেষে মর্গে গেল—ডাক্তারেরা রিপোর্ট দিয়েছে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন।

গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে বিমল।

চিত্ত বললে—শ্রীচন্দ্রবাবুরা এখন ভারী বিপদে পড়েছেন। বুয়েচেন কি না। একটু হাসলে চিত্ত।—মানে, কুলিরা কেউ বাড়ি ভাঙতে আসবে না। এর মধ্যে গুজব রটে গিয়েছে যে, ওই বুড়োবাবু ভূত হয়ে রাত্রে ঘুরে বেড়ায় আর বাড়ির ইট কাঠ আগলায়। তার এক কারণও ঘটে গিয়েছে—বুয়েচেন কি না; হয়েছে কি—কাল লরীতে কাঠ বোঝাই করে আনতে গিয়ে একখানা মোটা কড়ি হাত ফস্‌কে একটা কুলির পায়ে পড়ে একেবারে ছাতু হয়ে গিয়েছে। বাস্। আর যায় কোথা! সব একেবারে দে ছুট। এখন শ্রীচন্দ্রবাবুরা মহা মুস্কিলে পড়েছেন, কাজকর্ম সব বন্ধ। ওদিকে পাড়ার সব বওয়াটের দল যে যাচ্ছে তাকেই বলছে—রাত্রে সে কি আওয়াজ রে বাবা, খচ-খচ খট-খট ঘুরেই বেড়াচ্ছে সারা রাত্রি। তাই এখন শ্রীচন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে ধরেছেন—চিত্ত তোর লরী নিয়ে তুই বাপু কাজ আরম্ভ কর—তাহলে দেখাদেখি লোক আসবে।

বিমলের ভাল লাগছিল না এসব কথা, তার মনের মধ্যে এখন দুটি বিপরীত ভাবনার দ্বন্দ্ব চলছিল। তার গল্পের মধ্যে ওই অভিজাত বংশীয়ের যে শোচনীয় মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে—যা কাকতালীয়ের মতো অতি নিষ্ঠুর সত্য পরিণতির সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে—তার জন্য মনে মনে কুণ্ঠা বোধ করছিল, ভাবছিল গল্পটি মিহির এবং ওদের আত্মীয়স্বজনের চোখে পড়লে তারা কি মনে করবে? তারা কখনই বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না যে, কল্পনা এমন আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে, তারা ভাববে—তাদের বংশের কুৎসা প্রচারের জন্যই সে এমন করেছে। আবার তার কল্পনা এমনভাবে সত্যের সঙ্গে মিলে যাওয়াতেও সে আশ্চর্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে।

তার ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্তেই সে নীরেনের কাছে ছুটে গিয়ে কথাটা বলে আসে। জানিয়ে আসে তার দৃষ্টি কেমনভাবে সত্যদৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সে অকস্মাৎ হন্ হন্ করে চলতে শুরু করে বললে—আমি চললাম চিত্ত, আমার অনেক কাজ আছে।

চিত্ত ডাকলে, শুনুন শুনুন।

—কি ?

—সব কথাই যে বলা হয়নি।

—কি ? আর কি কথা ?

—শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে যেতে বলেছিলেন আপনাকে। গিয়েছিলেন নাকি আপনি ?

—কেন বল তো ? কথাটা প্রকাশ করতে চাইলে না বিমল ; চিত্ত কতটা জেনেছে সেটাই আগে জানতে চাইলে। চিত্তকে অবিশ্বাস নাই তার কিন্তু অসাবধানতাবশত সে যদি কথাটা বলে বেড়ায়, বিশেষ করে কালীনাথের কাছে তবে ক্ষতি হবে।

চিত্ত বললে—যদি গিয়েছিলেন তো গিয়েছিলেন। না গিয়েছেন তো যাওয়ার দরকার নেই। মিহিরবাবু বলতে বলে দিয়েছিলেন আপনাকে।

—ঠিক শুনেছ তো তুমি ?

এবার চিত্ত হেসে উঠল, বললে—কানে খাটো বলে বলছেন ?

বিমল হেসে ফেললে, বললে—তা বলছি বৈকি। তুমি রাগ করো না যেন।

চিত্ত বললে—কালাকে কালা বললে কালারা রাগ করে কিন্তু আমি করি না।

—তা হলে তুমি ঠিক কালা নও।

এই রসিকতায় চিত্ত প্রচুর হাসতে শুরু করে দিলে। খানিকটা হেসে একটু সংযত হয়ে বললে—তার মানে আপনি বলছেন আমি কালা নই, কালা সেজে থাকি। মানে আমি কালা বলে লোকে গোপন কথাও তো আমার সামনে ফিস ফিস করে বলে না, চেঁচিয়ে বলে—আমি দিব্যি শুনি।

আবার সে প্রচুর হাসতে শুরু করে দিল। বিমল খানিকটা না হেসে পারলে না ; তারপর বললে—আচ্ছা চললাম।

—শুনুন—শুনুন। তবে মজার কথা বলি শুনুন। কাল ঠিক তাই হয়েছে। মধ্যে মধ্যে আমি বেশ শুনতে পাই। মানে বেশি গ্রীষ্ম হলে কি বেশি বর্ষা হলে আমি কানে একদম শুনতে পাই না। কানের পাশে ঢাক বাজালেও না, বেশি শীতেও না ; কানে যেন ঝাঁপ ধরে থাকে। কিন্তু না-গরম না-শীতে মানে ঠাণ্ডা আরামের দিন হলে বেশ শুনতে পাই, সে একেবারে সহজ মানুষের মতো। এই তো এখন এত কথা বললেন—বেশ শুনতে পাচ্ছি।

হেসে বাধা দিয়ে বিমল বললে—এত কথা কিন্তু আমি বলিনি চিত্ত। কথা সব তুমি বলেছ।

চিত্ত আবার হাসতে শুরু করে দিলে। বললে—ওই আমার স্বভাব। কথা বলি না তো বলি না। বলতে আরম্ভ করলে আর থামি না। এখন কালকের কথাটা বলি শুনুন। শ্রীচন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে আর আমি কি করব, চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু

কানে এই বসন্তের আমেজ পড়েছে এখন বেশ শুনতে পাই। আমি শুনতে পাচ্ছি না মনে করে শ্রীচন্দ্রবাবু একজন পার্টনারের সঙ্গে কাল অনেক কথা বলে গেলেন। আমি তা দিব্যি শুনেছি। কাঁকুলেতে কলোনী করছেন না? ওখানে এক বিধবার বাড়ি নিয়ে ফৌজদারী করেছেন, এ নিয়ে হাঙ্গামাতে পড়েছেন। পাড়ার ছেলেরা এমন মারপিট করেছে ওদের লোকদের যে, গাঁইতি শাবল ফেলে যে যার দৌড় মেরেছে—তাই বলছিল—আমার সামনেই বলছিল, মনে করেছিল আমি শুনতে পাচ্ছি না। বলছিল—ওদিকে ভূত এদিকে ভূতের বাড়া—পাড়ার যত বওয়াটে ছেলে।

বিমল বুঝতে পারলে—গোপেনদা ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

চিত্ত আবার হাসতে লাগল—হাসতে হাসতেই বললে—বুয়েচেন—আমি এমন মুখ করে রইলাম যে কার বাবার সাধ্যি বলে আমার কানে কিছু ঢুকছে। অথচ হাসিতে পেট আমার কব্ কব্ করছে কাদাজলের মাগুর মাছের মতো। মনে মনে হাসি আর বলি—বাছাধন, পাড়াগাঁ থেকে এসে কলকাতায় জেঁকে বসে ব্যবসা ফেঁদেছ। এইবার ফাঁদে নিজেই পড়েছ। এ সব বাবা কলকাত্তাই ছেলে, গাঁইয়া নয়। এরা বাবা পীরকে মানে না। মামদোর বাড়া এরা।

বিমল আবার যেতে উদ্যত হলো। চিত্ত এবার তাকে না থামিয়ে তার সঙ্গ নিলে। বিব্রত হয়ে বিমল বললে—ডিপোয় যাবে না?

—ডিপো তো আছেই, চলুন আপনার সঙ্গে যাই খানিকটা। কোথায় যাচ্ছেন?

—দাদার দোকানে, চা খেতে।

—দাদার দোকানে? ওই চোরটার দোকানে? যান আপনি, ওখানে আমি যাব না।

দাদার সঙ্গে চিত্তর ঝগড়া হয়ে গেছে কয়লার দাম নিয়ে। দাদা প্রতিবারই অভিযোগ করে—কয়লা খারাপ। সেই অজুহাতে অন্তত মণকরা দুটো পয়সাও না কেটে দাম দেয় না।

চিত্ত বলে—চেয়ে নাও দুটো পয়সা দিচ্ছি। কিন্তু জবরদস্তি কি ভাঁওতা দিয়ে এক আধলা নিতে দেব না।

দাদা বলে—খারাপ জিনিস দিয়ে ভাল জিনিসের দাম নেবে—সে দেব কেন?

এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। সেই ঝগড়ার কারণে বিমল আজ চিত্তর কবল থেকে নিষ্কৃতি পেলে।

দাদার দোকানে চা খেয়ে বেরিয়ে পথে সে নেমেছে এমন সময় একখানা মোটর তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা এগিয়েই ব্রেক কষে সশব্দে থেমে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বের করে শ্রীচন্দ্রবাবু তাকে ডাকলেন—বিমল, বিমল।

বিমলকে এগিয়ে যেতে হলো। গাড়ির মধ্যে শ্রীচন্দ্রবাবু একা নন—কালীনাথও রয়েছে। কালীনাথকে দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—এস, গাড়ির মধ্যে এস।

—কোথায়?

—আরে এস না। শ্রীচন্দ্রবাবুর বাড়িতে যাব—চা খাব—গল্প করব খানিকটা। কালীনাথ বললে।

—আমার কাজ আছে কালীকাকা। লেখা দিতে হবে।

শ্রীচন্দ্রবাবু হেসে উঠে বললেন—আরে বাপ্‌রে! সাহিত্যিকেরাও কাজের লোক হয়ে উঠল। কি সর্বনাশ! আমাদের রুটি এইবার মারা গেল দেখছি।

হেসে বিমল বললে—আপনারা রুটি খান না শ্রীচন্দ্রবাবু—লুচি খান। ভাতও খান না, পোলাও খান। সুতরাং ভাগ্যে যদি রুটি কি ভাত জোটে তবুও আপনাদের পাতে আমাদের হাত পৌঁছবে না।

আবার হা—হা করে হেসে উঠলেন শ্রীচন্দ্রবাবু। বললেন, সাহিত্যিকেরা কথা বলতে পারে বটে।

কালীনাথ আই-বি ইন্‌স্পেক্টর—দেশের লোককে বিশেষ করে যে লোকেরা এগিয়ে হাঁটে তাদের শাসন করে দমিয়ে রাখাটাই তার অভ্যাস, অভ্যাসমত সে সরাসরি বললে—তোমার সঙ্গে তো গোপেন মুখুজ্জের আলাপ আছে। একটা কাজ করে দিতে পার? শ্রীচন্দ্রবাবুর সঙ্গে তিনি ঝগড়া বাধাচ্ছেন কেন বলতে পার?

কালীনাথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বিমল বললে—আমি কেমন করে সে কথা বলব বল?

—আরে এই সেদিন তো তুমি তাঁর ওখানে গিয়েছিলে। কীর্তি বোসের ছেলে—মিহির এসেছিল তোমাকে ডাকতে। তুমি জান না? বলেননি তোমাকে গোপেনবাবু? শ্রীচন্দ্রবাবু আমাদের দেশের লোক, গোপেনবাবু নিশ্চয় সে কথা জানে—বলেনি?

ধীরে ধীরে কালীনাথের ভিতরের পুলিশ-পুঙ্গব বেরিয়ে আসছে। গোপেনদার সম্পর্কে কথা আরম্ভ করেছিল 'জানেন—বলেন' বলে—এইবার 'জানে—বলে' শুরু করেছে।

বিমল বললে—না, জানি না আমি কিছু, তিনি এ সম্পর্কে আমায় কিছু বলেননি।

—তবে কি জন্যে ডেকেছিলেন?

অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল বিমল এবার,—বললে—আমায় যে তুমি জেরা আরম্ভ করলে? সত্যিই কোন এনকোয়ারি করছ না কি?

শ্রীচন্দ্রবাবু ব্যবসায়ী লোক। তিনি বলে উঠলেন—আরে না—না! তুমি যে একেবারে রেগে গেলে। উঠে এস—রাগ কর না। হাতটা তিনি ধরে ফেললেন বিমলের।

কালীনাথ বললে—সাহিত্যিকেরা ভয়ানক সেন্টিমেন্টাল। এই জন্যেই ওরা কিছু করতে পারে না।

শ্রীচন্দ্রবাবু ব্যাপারটা নিয়ে আর অগ্রসর হতে চান না। মিটিয়ে ফেলতে চান। চিত্ত যখনকার কথা শুনে এসেছিল—তখন থেকে ব্যাপারটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ একটা অভাবনীয় মোড় ফিরতে চাচ্ছে।

কালই অংশীদারেরা একটা নূতন খবর পেয়েছেন। খবর পেয়েছেন প্রচুর অর্থ

নিয়ে কয়েকটি জমি ও বাড়ি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান টালীগঞ্জ ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে বিত্তশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য সুরম্য নির্জন বাসপল্লী গড়তে উদ্যত হয়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা করেছেন—তাঁরা কেবল সিনেমা আর্টিস্টদের জন্য আমেরিকার অনুকরণে স্বতন্ত্র পল্লী গড়ে তুলবেন। সেখানে যে সব তারকারা নিজেরা বাড়ি করবেন—তাঁদের জমি বিক্রি করবেন, প্রয়োজন হলে—কন্ট্রাক্ট নিয়ে নিজেরাই বাড়ি তৈরি করে দেবেন; যাঁরা বাড়ি নিয়ে থাকবেন—তাঁদের আধুনিকতম ফ্যাশনের—সর্বোত্তম আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে বাড়ি তৈরি করে ভাড়া দেবেন। কয়েকটি সিনেমা কোম্পানিকেও তাঁরা স্টুডিয়ো করবার জন্য প্রলুব্ধ করেছেন।

একটি প্রতিষ্ঠান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি কিনে রাখছেন। এই সব সংবাদ পেয়ে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন মহানগরী হতে যাচ্ছে এবং হবেই। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট—করপোরেশন—তাদের এলাকা গণ্ডীবদ্ধ করলেও সে গণ্ডীর শাসন মানবে না সে। এই সব আলোচনা করে এঁরা স্থির করেছেন—আরও দূরে অর্থাৎ শহরতলীর প্রান্তভাগে সস্তায় অনেক বেশি জমি তাঁরা কিনে ফেলবেন। কাঁকুলিয়ায় যে জমিটা কেনা হয়েছিল সেটাকে উন্নত করে এখন যে দাম তার দাঁড়িয়েছে তাতে বিক্রি করলে যথেষ্ট লাভ হবে। সেই টাকাটা এখন ওদিকে ফেলতে পারলে ভবিষ্যতে কল্পনাতীত লাভ হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য এক মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠানকে কাঁকুলিয়ার অবিক্রিত জমিটা সবই একসঙ্গে বেচে দেবেন। কালই তার কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। এখন গোপেনবাবু ওখানকার ছেলেদের নিয়ে যে উৎপাত শুরু করেছে—সেটা একটা বাড়ি নিয়ে হলেও গোটা জমিটার সত্ত্ব নিয়ে সন্দিহান করে তুলবে ক্রেতাকে। সেইজন্যেই এটাকে মিটিয়ে ফেলতে চান শ্রীচন্দ্রবাবুরা। ভোরবেলা উঠেই শ্রীচন্দ্রবাবু গিয়েছিলেন কালীনাথের কাছে। আই-বি ইন্‌স্পেক্টর কালীনাথ গোপেনবাবুদের মতো লোকেদের কায়দা করতে জানে—ওদের গুপ্ত তথ্যও অবগত ওরা। অজগরের সামনে যেতে গেলে ওঝা নিয়ে যাওয়া সঙ্গত এবং নিরাপদ। কিন্তু কালীনাথ জানে, সাপের ওঝার মতোই জানে, তার মন্ত্রতন্ত্র সব মিছে, সরকারী পরওয়ানার দণ্ডটি না থাকলে গোপেনবাবুর সামনে সে শ্রীচন্দ্রের মতোই অসহায়। তাই পথে বিমলকে দেখে ওকেই ডেকে কাজটা উদ্ধার করে নিতে চাচ্ছে। অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন শ্রীচন্দ্রবাবু। যাদবপুরে ওদের একটা কলোনী আছে। পূর্বের শর্তমত সেখানে একটা আড়াই কাঠা প্লট ভদ্রমহিলাকে দিতে রাজী আছেন, শুধু তাই নয় এখানকার জমির দামের সঙ্গে—ওখানকার জমির দামের তফাৎ হিসাবে ওই জমির উপর সিমেন্টের মেঝে, টিনের দেওয়াল, টিনের চাল দিয়ে একখানি দু' কুঠরী ঘরও তৈরি করে দেবেন পনের দিনের মধ্যে। ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়িতে চলে যেতে হবে। অর্থাৎ এখানকার বাড়ির দখল ছেড়ে দিতে হবে।

কালীনাথ বললে—তুমি গিয়ে গোপেনবাবুকে বুঝিয়ে বল। বুঝেছ? মামলা-মকদ্দমায় তো ফল হবে না। লেখা যখন কিছু নেই তখন আইনে পাবেন

না। ওর ওই ছেলের পাল ক্ষেপিয়ে বিশেষ ফল হবে না। তাতে যদি না শোনে তখন আমি যাব।

শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—আমার গাড়িতে যাও তুমি।

কালীনাথ বেরিয়ে এসে যাবার সময় মৃদুস্বরে বললে—আমার নামটাম করিসনে যেন?

নিরীহের মতো বিমল বললে—করব না?

—না। বুঝলি না—এটা তো আমার official ব্যাপার নয়।

হেসে বিমল বললে—বুঝেছি।

গোপেনদা অরাজী হবেন কেন এতে? তিনি বললেন—এ তো ভাল কথা। তবে দলিলটা আগে করে দিন। আমার বন্ধু এক উকিলকে বলে দিচ্ছি—সে সব করে নেবে এঁর তরফ থেকে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—এ ভালই হলো। কি বলিস? এদের মতো পরিবারের পক্ষে শহরের মধ্যে থাকা অসম্ভব। তার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়ায় এর চেয়ে অনেকটা আরামে থাকবে।

আবার খানিকটা পরে বললেন—একটু হেসেই বললেন—আর শেষ পর্যন্ত সেই যেতেই হবে।

তারপর আবার গম্ভীরভাবে বললেন—যে দিক দিয়েই ভাবি না কেন, শহরে আর ওদের থাকার অধিকারও নেই। নাই মানলাম—ধনী-দরিদ্রের ভেদ—অক্ষম এবং সক্ষমের ভেদ তো মানতেই হবে। একটি পঙ্গু অসুস্থ ছেলে—আর একটি বিধবা হিস্টিরিক মেয়ে—কি করবে শহরে?

বিমল চুপ করেই বসেছিল। এর মধ্যে নিজের বক্তব্য তার কি থাকতে পারে! সে শুধু ভাবছিল এই মহানগরীর কথা।

গোপেনদা বললেন—তুমি বস একটু, আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার কথা বলে আসি। তাঁর মতটা নেওয়ারও তো প্রযোজন আছে।

বিমল বেরিয়ে এসে খালি বারান্দাটায় একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। কোথায় কেউ বা কারা কিছু কাটছে। শব্দ উঠছে। দূরে দেখা যাচ্ছে—একটা নতুন বাড়ির তেতলায় গাঁথনী চলছে, কপিকলে দড়ি ঝুলিয়ে ঝুড়িতে ইট তুলছে টেনে, খন্ খন্ কর্ণির শব্দ হচ্ছে। অকস্মাৎ একটা মড়মড় শব্দ উঠল—শব্দ লক্ষ্য করে বিমল দেখতে পেলে একটা নারকেল গাছ পড়ছে—শূন্য পথে ক্রমবর্ধমান বেগে তার ঘন সবুজ পাতায় ভরা মাথাটা মাটির দিকে নেমে আসছে।

দুম্ করে একটা শব্দ হলো।

মহানগরী দ্বিপ্রহর ঘোষণা করছে। একটা বাজল।

নির্জন দুপুরের প্রথম রৌদ্রচ্ছটার দিকে তাকিয়ে বিমল দিবাস্বপ্ন দেখছিল। নারকেল গাছগুলি একের পর এক কাটা পড়ছে। শহরের এই প্রান্তসীমার পল্লীটিকে মানুষ অনেক কাল আগে ফলের জন্য ছায়ার জন্য ঝড়কে রুখবার জন্য যে উদ্ভিদপ্রজা

পত্তন করেছিল—তাকে শহরের বিস্তৃতির প্রয়োজনে কেটে ফেলেছে। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লরী বোঝাই হয়ে চলেছে—শহরের আবর্জনা ভাঙা বাড়ির ধুলো টুকরো ইট একটা লরীতে গেল। লম্বা কোঁকড়ানো চুলের মতো লোহার পাড়ের ছাঁট—ওগুলোকেও ফেলা হবে ওই আবর্জনা এবং টুকরো ইট ধুলোর মতো সুরকীর স্তূপের সঙ্গে। ডোবা খানা খন্দ বন্ধ করে সমান করা হচ্ছে। যেখানে নারকেল গাছগুলি কাটা পরছে সেখানে আগে ছিল কোন এক সৌখীন ধনীর সখের বাগান, বাগানের মধ্যে মধ্যআয়তনের একটি চমৎকার পুকুর ছিল—সেটাও বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। পুকুরের কি প্রয়োজন মহানগরীর মধ্যে? অকারণে কেন বিঘে দেড়েক জায়গা অধিকার করে থাকবে? জলের জন্য এখানে পুকুরের প্রয়োজন নাই। মাটির তলায় তলায় চলে গেছে এখানে জল সরবরাহের পাইপ। ভোর পাঁচটার পরেই কলের মুখে জল এখানে।

বিমল পল্লীর মানুষ, এবং সে পল্লী ভারতবর্ষের পল্লী। তাই ওই গাছগুলির জন্য সে গভীর বেদনা অনুভব করলে। বাহিরের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তৃপ্তিতে, অন্নব্যবস্থার প্রাচুর্যের লোভে, এ দেশের মানুষ শহরে আসে—থাকে—অনেকে বাসও করে কিন্তু অন্তরে অন্তরে—পল্লীর প্রতি একটি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে তারা। যারা নিজেরা বাড়ি করে এখানে—তাদেরও শতকরা আশীজন পল্লীর বাড়িটি রক্ষা করে যায়। কেউ বা যত্ন করে রক্ষা করে—মধ্যে মধ্যে যায়—ঝাড়ামোছা মেরামত করায়। কেউ বা অবহেলার মধ্যেই বাড়িটাকে রেখে দেয়। দু' দশ বছর অন্তর সেখানে গিয়ে দেওয়ালের গা থেকে বট-পাকুড়ের গাছ কাটিয়ে তার উপর বালি-চুন লাগাবার ব্যবস্থা করে। মনে মনে সংকল্পও করে এবার সুযোগ পেলেই এখানে এসে থাকবে কয়েক মাস; মুক্ত শীতল বায়ু—অবারিত সূর্যস্নেহ—ভূমিলক্ষ্মীর অকৃপণ সতেজ প্রসাদ প্রাণ ভরে উপভোগ করবে। কিন্তু মহানগরীর কুহকে যে একবার পড়েছে তার পরিত্রাণ নাই। ছেড়ে গেলেও সে তাকে টেনে নিয়ে আসে। এখানে এলে পড়ে যেতে হয় দ্রুততম গতি ধাবমান জীবনপ্রবাহের মধ্যে। তখন সে স্রোত কেটে পাশে তীরে ওঠা আর হয়ে ওঠে না।

বিমলের স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে বাস্তব ছবি লুপ্ত হয়ে গিয়ে মহানগরীর নতুন রূপ ফুটে উঠছিল। পিচঢালা মসৃণ রাজপথ সরল ও সমান্তরাল রেখায় চলে গিয়েছে—তার দু'ধারে নতুন বাড়ির সারি, ছোট-বড় নানা আকারের নানা রঙের। ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প-পোস্টের সারি—দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে, চৌরাস্তায় অথবা তেরাস্তার মোড়ে পল্লীটির প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের দোকান—মুদীর, মনিহারীর দোকান, চায়ের রেস্তোরাঁ, লন্ড্রী, ছোটখাটো ওষুধের দোকান—তার মালিক সম্ভবতই হবে তরুণ কোন ডাক্তার যে সদ্য সদ্য পাশ করে পসারের চেষ্টা করছে।

বিমলের স্বপ্নভঙ্গ করে হঠাৎ বেজে উঠল কারখানার বাঁশী। অত্যন্ত নিকটে কোথাও বাজছে। কাছেই কোথাও কারখানা আছে। বিমল উঠে দেখতে চেষ্টা করলে—কারখানার লোহার চিমনীর মাথা কোথাও দেখা যায় কি না। দেখা গেল না। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রেললাইনের ধার বরাবর ঘন ঘন পল্লবের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সম্ভবত। গাছগুলো

ভবিষ্যতে থাকবে না। সে স্পষ্ট দেখতে পেলে প্রসারিত হয়ে চলেছে মহানগরী। গাছগুলো কাটা পড়ে যাচ্ছে। বস্তী ভেঙে গড়ে উঠছে নব উপনিবেশ। পল্লী অঞ্চল থেকে দলে দলে চলে আসছে নবযুগের দুঃসাহসী অভিযানকারীর দল। তারা সেখানে বাসা বাঁধছে। তার মধ্যেও কিন্তু থাকবে ওই কারখানাটি। ও থাকবেই। হয়ত ওরই দৌলতে ওখানকার পারিপার্শ্বিক আরো জমজমাট হয়ে উঠবে। বড় বাজারই একটা গড়ে উঠবে।

গোপেনদা বেরিয়ে এলেন এতক্ষণে। তিনি বললেন—তোমার খানিকটা কষ্ট হলো।

বিমল হাসলে।

—কি করব বল ? ভদ্রমহিলা কিছুতেই রাজী হতে চান না। বলেন আমার শ্বশুরের ভিটে। হাসলেন গোপেনদা। বললেন—শহরের মাটি বীর-ভোগ্য না হোক বণিকভোগ্য। ভাগ্যান্বেষিণী বাস্তববাদিনী আধুনিকা। অথবা কি বলতে পার। গত্যন্তর গ্রহণই বল আর মনিব বদলানোই বল হাসিমুখে করে যায়। গরীবের ঘর থেকে বেরিয়ে বলে—বাঁচলাম। সে উনি কিছুতেই বুঝবেন না।

বিমল বললে—তা হলে ওঁদের কি বলব ?

—বলবে, রাজী হয়েছেন। এই প্রস্তাবই পাকা হয়ে রইল। আমার বন্ধু উকীল এরপর সমস্ত ব্যবস্থা করে নেবেন।

বিমল প্রশ্ন করল—দেখবেন, কোন গোলমাল হবে না তো ?

—না। অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করে এনেছি। শেষ কথাই আদায় করতাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁদতে শুরু করে দিলেন—আমার শ্বশুরের ভিটে। একবার ক্ষেপে উঠে বললেন—এই মাটিতে আমি চোখের জল ফেলে যাচ্ছি। এই জল আগুন হয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে তার সংসাব যে এখানে বাড়ি করবে।

তারপর বললেন—চল তোমার সঙ্গে আমিও যাই। আজ আর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। মিহিরের ওখানে যাব। সে আবার অশৌচের মধ্যে পড়েছে—তার উপর বাপের টাকা নিয়ে লাঠালাঠি লাগবাব সম্ভাবনা আছে ভাইযে-ভাইয়ে। বড ভাই নিশ্চয় আসবে ভাগ নিতে।

পথে চলতে চলতে বললেন—ওখান থেকে যেতে হবে খিদিরপুবে। মিহির আটকে পড়ে মুস্কিল হয়েছে আমার। সেবার নিয়ে কাজ অত্যন্ত কঠিন। অনেক কষ্টে ওদের যে মনটুকু পেলে—একদিনে একটি গাফিলতিতে সব চলে গেল। তাছাড়া আরও দলগুলো চেষ্টা করছে। করপোরেশন-ইলেকশন এসেছে তো।

বিমলের হাসি পেল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলে সে। ধনিকভোগ্যা মহানগরীতে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে করপোরেশন-ইলেকশন ; শ্রমিকদের প্রতিনিধি! পরিকল্পনা ভাল। রাবণরাজা স্বর্গপুরী পর্যন্ত সিঁড়ি তৈরি করে স্বর্গলোকে গণতন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন—তারই পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে চিরকাল। এ কথা বললে গোপেনদা ক্ষুন্ন হবেন—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন তার উপর। গোপেনদার স্বপ্ন সম্পর্কে আদর্শ সম্পর্কে তার মনে যতই রহস্য-কৌতুক জেগে উঠুক—গোপেনদার ওই ইলেকশনে সাফল্যের

কামনা সে অন্তর দিয়েই করে। গোপেনদার এটা পাওনা। সন্ন্যাসী যারা ঈশ্বর সন্ধানে ঘর ছাড়ে—কৃচ্ছ্রসাধন করে, তারা ঈশ্বর না পেলে ততটা বঞ্চিত হয় না, যতটা বঞ্চিত হয় শেষ বয়সে একটি আশ্রয়—অন্তুতপক্ষে গঙ্গার ধারে একটি গাছতলায় ছোট একটি কুঁড়েতে সিঁদুর মাখানো পাথরের সামনে একটি পাকা আসন—না পেলে।

পথের মাঝখানে গোপেনদা বললেন—চা খাবে ?

—চা ? এই দুপুরে ? না দাদা।

—তবে তুমি চল, আমি এককাপ চা আর টোস্ট খেয়েনি। মিহিরের ওখানে তো হবিষ্যি !

শ্রীচন্দ্রবাবু খুশিই হলেন। বিমলের লেখা সম্পর্কে গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন—অনেক মারাত্মক রকম ভুল উক্তি করলেন, মধ্যে মধ্যে দু' চারটে রসিকতাও কবলেন, যা থেকে খুব খুশি হওয়াব ভাবটা ব্যক্ত হয়ে পড়ল। কালীনাথও তাতে ফোড়ন দিলে।

শ্রীচন্দ্র বললেন—আমি শুনেছি, বুঝেছ কালীনাথ—মেযেবা যা চিঠি লেখে বিমলকে ! ওঃ—সে সব চিঠি কি !

কালীনাথ বললে—তুমি শুনেছ—আমি দেখেছি !

—দেখেছ ? বল কি ?

—হ্যাঁ গো। জিজ্ঞাসা কর না। সেদিন হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এ দিক দিয়ে। পথে হাবামজাদা চিত্তব সঙ্গে দেখা। চিত্ত বললে—বিয়াব খাওয়াতে হবে কালীদা। বললাম—পযসা নেই। চিত্ত বললে—তবে আমি খাওযাই তুমি খাও। কি কবি—বাজী হলাম। কিন্তু ওর ওই ডিপোয় কয়লাব ধুলোতে যেতে গা ঘিনঘিন কবল। চিত্তই নিযে গেল বিমলের ওখানে। গিয়ে দেখি একটি অল্পবযসী বিধবা মেয়ে—চমৎকাব দেখতে, দাঁড়িযে বয়েছে বিমলের দবজার সামনে। কি ব্যাপাব ; না—বিমলের চাযের নিমন্ত্রণ—ডাকতে এসেছে।

তাবপর বিমলেব দিকে চেযে কালীনাথ বললে—কি ব্যাপাব বলতো বাবাজী ? চার খাও খেযো—কিন্তু যেন টোপ গিলো না বাবা।

বিমলের সমস্ত অন্তরটা ঘিনঘিন করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধও হয়ে উঠল সে। কানের পাশ দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল, গবম হয়ে উঠেছে কান। জিভেব ডগায় অনেকগুলো কটু কথা শানের উপর ক্ষুরের মতো দ্রুত এবং চঞ্চলভাবে আসা-যাওয়া করতে লাগল তবুও সে আত্মসম্বরণ করলে।

শ্রীচন্দ্র ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। তিনি বললেন—তুমি বড ভাল্‌গার কালীনাথ।

কালীনাথ বললে—আমবা পুলিশ শ্রীচন্দ্র।

বিমল এবার বললে—কিন্তু পুলিশ হযে জন্মাওনি কালীকাকা, জন্মেছিলে মানুষ হযে।

কালীনাথ হেসে উঠল। বললে—তুই প্রেমে পড়ে গিযেছিস বিমল। রেগে উঠেছিস তুই।

শ্রীচন্দ্র বললেন—তাই প্রেমেই পড় বিমল। ওদের খাতা থেকে তোমার নামটা কাটা যাক।

কালীনাথ বললে—আজকাল প্রেমে পড়লে নাম কাটা যায় না হে। মেয়েটির নামসুদ্ধ লেখা হয়ে যায় খাতায়। প্রীতিলতা, কল্পনা—চিটাগাং আর্মারী রেইড কেসের মেয়ে-আসামীদের নাম শোননি ? লেবংয়ে লাটসাহেবকে গুলি করলে যে দল—তাদের মধ্যে উজ্জ্বলার নাম তো তুমি জান হে। পার্বতীপুরে দার্জিলিং মেল যখন সার্চ হয়—তখন তো তুমি গাড়িতে।

বিমল উঠে পড়ল। বললে—চললাম আমি।

কালীনাথ বললে—বস্ বস্। রাগছিস কেন ?

বিমল বললে—এখনও স্নান করিনি—আর বসা চলে ?

শ্রীচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বললেন—সে কি ? আমি জানি—তুমি—।

কথাটা কিন্তু লজ্জায় শেষ করতে পারলেন না। কারণ অস্নাত অভুক্তের যে ছাপটা বিমলের চেহারায় ফুটে উঠেছিল—সেইটাই তাঁকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গে স্তব্ধ করে দিলে। সামনের ঘড়িতে বাজছে দুটো। তিনি উঠে এসে বিমলের হাত ধরলেন। বললেন—স্নান কর, খাও। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।

বিমলের অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। কিছুতেই সে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলে না। তার মনে হলো যে ক্ষুধা এখন যা হোক কিছু গ্রাস করবার জন্য আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে—সে ক্ষুধাও এই নিমন্ত্রণের আহ্বানে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, তার গলায় এবং জিভে যেন অখাদ্যের নামে বমন আক্ষেপ জেগে উঠেছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করবে কি করে ? হঠাৎ সে বলে উঠল—উপায় নেই শ্রীচন্দ্রবাবু। আমার নিমন্ত্রণ আছে। তাঁরা আমার জন্য বসে থাকবেন।

—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে ? আমি টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি—বেলা হয়ে গেছে—

বাধা দিয়ে বিমল বললে—না, সে হয় না। তা ছাড়া সেখানে টেলিফোন নেই।

—বেশ তবে চল—তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না—না। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি ! কাছেই নিমন্ত্রণ। তা ছাড়া আমাকে স্নান করতে হবে।

—স্নান তুমি এখানেই করে নাও। আমি কাপড় দিতে বলছি।

—না না। শ্রীচন্দ্রদা।

—তা হবে না বিমল। আমি জানি আমার জন্যেই তোমার দেরি হয়ে গেছে। আরও জানি তুমি যেখানে থাক—সেখানে স্নানের জায়গা নেই। একটা টবে—তুমি রাস্তা থেকে জল ধরে নাও। জল আছে কি না জানি না। থাকলেও সে জল একেবারে অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

কালীনাথ চুপ করে বসে শুনছিল। সে এবারে বললে—ছেড়ে দাও শ্রীচন্দ্র, ওকে ছেড়ে দাও।

শ্রীচন্দ্রবাবু আবার বিমলের হাত ধরলেন। তাঁর এ আন্তরিকতা হয়তো সাময়িক, এবং এই সাময়িক আন্তরিকতাটুকুর উদ্ভব বিমলের প্রতি প্রীতিবশত নয়; সম্পদশালীদের প্রশংসালোলুপ মানসিকতার উপরেই এর ভিত্তি; তবুও আর প্রত্যাখ্যান করা তার রূঢ়তার সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠল না। সে মিষ্টি করেই বললে—ঝঞ্ঝাট বাড়ালেন আর কি। আমার কাপড় ছেড়ে—আপনার কাপড় পরে যাব, সমস্তক্ষণ সাবধানে থাকতে হবে—কোথায় কাঁটা কি খোঁচায় লেগে ছিঁড়বে, বিড়ি খেতে হবে সাবধানে—।

কালীনাথ সোফায় শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট মুখে পুরে দেশলাইয়ের কাঠি বের করতে করতে বললে—ভেরী ক্লেভার চ্যাপ।

বিমল তার কথার কোন উত্তর দিলে না।

এগার

স্নান করে কিন্তু সত্যিই খুব আরাম পেলে। সম্পদশালীরা যত সুখ উপভোগ করে এবং এই মহানগরীর স্বাচ্ছন্দ্য-ব্যবস্থার যত রকম আয়োজন আছে তার মধ্যে এই স্নানাগারের আরামটিই বিমলের কাছে সব চেয়ে কাম্য; এইটুকু বললেই যথেষ্ট হলো না—এই ব্যবস্থার প্রতি ওর লোভ আছে। অভিজাত শ্রীচন্দ্রবাবুর স্নানাগারে বড় টব, শাওয়ার বাথ, গরম জল ঠাণ্ডা জল; ব্যবস্থা অনেক। তার উপর নতুন তোয়ালে নতুন সুগন্ধ সাবান; সুগন্ধ তেল শাম্পু করার ব্যবস্থা—ত্রুটি কিছুরই নাই। কাপড় দিয়েছিল নতুন একখানি শান্তিপুরে ধুতি। সম্ভবত রসিকতা করে যে কথা বিমল বলেছিল—তার উত্তরে নিখুঁত ধনিকোচিত ব্যবস্থা।

স্নান করে বেরিয়ে আসতেই শ্রীচন্দ্রবাবু বললেন—নাও চল। কালীনাথকে পৌঁছুতে যাচ্ছি, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব, কোথায় তোমার নিমন্ত্রণ আছে।

কালীনাথ দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তা করব'র অবকাশ পর্যন্ত নাই। শ্রীচন্দ্রবাবু জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে অগ্রসর হলেন। বিমল বললে—আপনারা যান। আমি—

কালীনাথ তার হাত চেপে ধরলে। হেসে বললে—যাবি তো সেখানে। আয়। এত লজ্জা কিসের!

বিমলের মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। চিন্তা করবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল যেন। মধ্যে মধ্যে শুধু ইচ্ছে করতে লাগল, সে চলন্ত মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

কালীনাথ পথ দেখাচ্ছিল—ডাইনে। আবার ডাইনে। আবার ডাইনে। বাস্।

গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে লাবণ্যদের বাড়ির সামনে। নামল বিমল। মনে মনে ঠিক করলে ওরা গাড়ি নিয়ে চলে গেলে সেও ফিরে আসবে বাসায়। হোটেলে আর ভাত নাই, দোকান থেকে পুরী-তরকারি আনিয়ে নেবে। কিন্তু গাড়ি নড়ছে না। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কালীনাথ বললে—ডাক না—শ্রীচন্দ্র না দেখে নড়বে না।

মাথাটা ঘুরে উঠল বিমলের। ইচ্ছে হলো একখানা আধলা ইট নিয়ে ছুঁড়ে মারে ওদের। মোটরের স্টার্ট বন্ধ করে বসে ক্লেদাক্ত হাসি হাসছে।

লাবণ্যদের দরজা আপনি খুলে গেল। বেরিয়ে এল পিনাকী এবং অরুণা। তাদের পিছনে লাবণ্য। অবাক হয়ে গেল বিমল। পিনাকী আজ সাজসজ্জা করেছে, তার দেহের প্রতি অযত্ন এবং অপরিচ্ছন্নতার অন্তরালে যে তারুণ্য চাপা পড়েছিল—সে তারুণ্য আজ ফুটে বেরিয়েছে—বর্ষণ-পরিচ্ছন্ন গাঢ় নীল আকাশের ক্ষীণ-জ্যোতি নীলাভ তারাটির মতো। সে আজ চুল ছেঁটেছে—দাড়ি কামিয়েছে, বোধ হয় সাবান মেখে স্নান করেছে—তার উপর স্নোর চিহ্ন সুস্পষ্ট—গায়ে পাটভাঙা লংক্লথের চুড়িদার পাঞ্জাবি, পরনে ধোয়া ধুতি, পায়ে সাদা রঙের ফিতে দেওয়া স্যান্ডেল। একটি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অরুণার পোশাকে আতিশয্য নাই—কিন্তু পবিচ্ছন্নতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল—শুধু চুলে আজ তেল না দিয়ে হয় সাবান দিয়েছে নতুবা শাম্পু করেছে, রেশমের মতো নরম কালো চুলের রাশি ফেঁপে পড়ে আছে পিঠের উপর; এতে তার রূপ যেন বেড়ে গেছে। ওকে আর কালো মেয়ে বলে উপেক্ষা করা চলে না।

পিনাকী একটু হাসল। অপ্রতিভের হাসি নয়। সপ্রতিভ—মিষ্টি অথচ দীপ্তি হাসি হেসে বললে—বসন্ত এসেছে বিমলদা।

অরুণা লজ্জিত হলো একটু। সে বললে—জু-য়ে যাচ্ছি আমরা।

পিনাকী বললে—সন্ধ্যেবেলা সিনেমায় যাব। তবে সবই আপনার দৌলতে। সকাল বেলায় পাঁচটা টাকা না পেলে যে কি করতাম আমি—হঠাৎ সে বলে উঠল—হয়তো আত্মহত্যা করতাম কারুর মোটরের তলায় পড়ে। হাসতে হাসতে পিনাকী চলে গেল, অরুণা তার অনুগমন করলে। লাবণ্য সবিস্ময়ে দেখছিল বিমলকে এবং গাড়ির আরোহীদের।

কালীনাথ নমস্কার করে বললে—ওকে আমরাই আটকে রেখেছিলাম। ওর কোন দোষ নেই, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের খাওয়া-দাওয়ায় অনেক দেরি করে দিলাম।

বিমল এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বললে—অত্যন্ত অপবাধ করে ফেলেছি আপনার কাছে। বাড়ির মধ্যে চলুন—সব বলব.

শ্রীচন্দ্র বললে—চলি বিমল। ভাল-মন্দ খেতে খেতে আমাদেব স্মরণ করো ভাই।

বিমল তখন দবজার মুখে, লাবণ্য ঘরে ঢুকেছে। সে ওদের কথা শুনে বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এখনও খাননি?

বিমল বললে—বলছি। ঘরের মধ্যে একটা পা দিয়েও সে থমকে দাঁড়াল, তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে, শ্রীচন্দ্রের গাড়িখানা দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, সে অনেক কথা। অন্য সময় বলব। এখন আমি যাই।

লাবণ্য ভ্রূ-কুঞ্চিত করে মৃদু হেসে বললে—বসুন। অনেক কথার একটা কথা

বুঝতে পেরেছি। ওঁরা যা বললেন, তাতে মনে হয় আপনি ওঁদের বলেছেন, আপনি এখানে খাবেন। ব্যাপার কি বলুন তো?

বিমল বুঝতে পারল না কি বলবে।

লাবণ্য বললে, বলুন না কি ব্যাপার? ভদ্রলোক দুটির একজনকে তো সেদিন আপনার ওখানে দেখেছিলাম। অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল আমার।

—উনি আমার গ্রামের লোক, একজন আই-বি. ইন্‌স্পেক্টর।

—আই-বি. ইন্‌স্পেক্টর?

—হ্যাঁ, আর একজন এই পাড়ারই ধনী ব্যক্তি। উনিও আমার দেশের লোক।

—ওঁদের কাছে আপনি বলেছেন, এখানে খাবেন? হঠাৎ লাবণ্যের কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে উঠল। সে বললে, এটা কি হোটেল বিমলবাবু?

বিমল তার মুখের দিকে তাকালে, অভুক্ত অবস্থায় এই ধরনের তীক্ষ্ণ বাক্যের আঘাতে তার মাথার ভিতরটা ঝিম-ঝিম করে উঠল। মাথার মধ্যে রক্তের ধারা ঠেলে উঠছে। তবু সে নিজেকে সংযত করলে।

লাবণ্য বললে, দেখুন, আপনি আমাকে অত্যন্ত বিপদে ফেলেছেন। আপনি বুঝতে পারবেন না কত বড় বিপদ। কিছুক্ষণ আগে পিনাকী আর অরুণাকে নিয়ে ব্যাঙ্কের গিন্নীর বউয়ের সঙ্গে একদফা হয়ে গেছে। কুৎসিত ঝগড়া। আবার—। সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিমল উঠল। বললে—গোড়াতেই আপনার কাছে মার্জনা চেয়েছি। আবার চাচ্ছি। আমি থাকতেও আসিনি, খেতেও আসিনি। আপনার এখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে এ কথাও আমি বলিনি। নিতান্তই পাকচক্রে ঘটে গেছে, অত্যন্ত অবাঞ্ছিত অন্ন গলাধঃকরণ করার তিক্ততা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বলেছিলাম আমার নিমন্ত্রণ আছে। কালীনাথ—ওই আই-বি অফিসারটি—ধরে নিলে নিমন্ত্রণ আমার এখানে। সে-ই বললে, এখানে নিমন্ত্রণ বুঝি? আমি ভাবছিলাম কার বাড়ির নাম করব। কালীনাথের কথায় তাড়াতাড়ির মধ্যে সায় দিয়ে ফেললাম। ওরা ছাড়লে না, গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেল। নইলে এখানে আসতামও না। এসেছি, ওরা গেলেই চলে যাব বলেই এসেছি। এটুকুও অপরাধ হয়েছে এটা স্বীকার করছি।

লাবণ্য বললে—কিন্তু তাতে তো আমার ক্ষতিপূরণ হবে না বিমলবাবু।

—ক্ষতি?

—হ্যাঁ। ক্ষতি। ওঁদের হাসি ওঁদের কথার মধ্যে ওঁদের মনের ধারণা তো প্রকাশ হতে বাকি নেই। আমি অভিভাবকহীনা বিধবা—আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবই বা কেন আর ওঁরা এই ধরনের হাসি হাসবেনই বা কেন? এমন বিশ্বাস ওঁদের জন্মাল কেন?

বিমল একটু চুপ করে থেকে বললে—আপনি বিশ্বাস করুন, তাতে আমার কোন অপরাধই নেই।

—তবে কি অপরাধ আমার? আমি ওঁদের বলে এসেছি?

—আপনারও নয়। বিমল হাসলে। তারপর বললে—দোষ মানুষের মনের। বিশেষ করে শহরের লোকের মনের, বিশেষ করে আই-বি. কর্মচারী কালীনাথের মনের দৃষ্টির। যেদিন ও এসেছিল সেদিন আমার নিমন্ত্রণ ছিল আপনার এখানে। আপনি আমাকে ডাকতে গিয়েছিলেন যখন তখন ও দেখেছিল। সেই ভিত্তির উপর পুলিশের লোক কলঙ্কের মনুমেন্ট বানিয়ে তুলেছে। যাক, কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি চলি। নমস্কার।

সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লাবণ্যও এল পিছনে পিছনে। ঘরের দরজাটাই সে বন্ধ করছিল। হঠাৎ ঘরের ভিতরে একটি নারীকণ্ঠধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। কথাগুলি বিমলের কানে এসে পৌঁছল। কথাগুলি শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার চলবার শক্তিও যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

—তারপর লাবণ্যদি; ওই পিনাকী ছেলেটি না হয় অরুণাকে বিয়ে করতে চায়—সেই জন্যই এক ঘরে বসে হা-হা করে হাসছিল। কিন্তু এই ভদ্দরলোকটি? এর সঙ্গে যে এই ভর দুপুরে মান-অভিমানের পালা গাইলে—এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা কি শুনি?

লাবণ্য স্তম্ভিত বিমলের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি চলে যান। দাঁড়িয়ে এসব শুনবেন না। বলেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বিমল পা বাড়ালে। যেতে যেতেই শুনলে লাবণ্য উত্তর দিচ্ছে—এসব কুৎসিত কথার উত্তর আমি দেব না। তুমি যা খুশি তাই মনে করতে পার।

বিমলের যাওয়ার কথা দাদার দোকানে, কিছু খেতে হবে। কিছু অন্যমনস্কভাবে সে এসে উঠল নিজের ঘরে। দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে—আগন্তুকদের জন্য রাখা পুরনো ভাঙা সোফায় বসে পড়ল। মানুষের কদর্যতায় মন তার বিষিয়ে উঠেছে। একটা বিড়ি ধরালে। মনে পড়ল তার পল্লীগ্রামের কথা। পল্লীগ্রামে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে কুৎসিত মন নেই এমন নয়, আছে, যেখানে আছে সেখানে হয়তো এই মহানগরীর অধিবাসীদের চেয়ে বেশিই আছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভুল করে না। তারা বুদ্ধি দিয়ে অথবা অঙ্ক কষে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করে না। জীবজন্তুর মতো আশ্চর্য একটা বোধশক্তি আছে তাদের। তার মনে পড়ল লালবউয়ের কথা। অভিভাবকহীনা, সন্তানহীনা রূপসী গ্রাম্য ব্রাহ্মণবধূ। তার ভাই ছিল রমজান মের্দা। পাতানো ভাই। রমজান ছিল ভাল ঘরামী এবং পাকা বাসন চোর। শোনা যায়, এক বর্ষার রাত্রে রমজান এসেছিল লালবউয়ের বাড়ি চুরি করতে। বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি। রমজান উঠানে বাসনগুলি সন্তর্পণে গামছায় বাঁধছে এমন সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি। পুরুষ নাই বাড়িতে, রমজান নির্ভয়ে বৃষ্টি ধরবার প্রতীক্ষায় দাওয়ার এককোণে উঠে গিয়ে বসল। কয়েক মিনিট পরেই সে চমকে উঠল—দাওয়ার চালের কোণ থেকে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল তার মাথায়। সে সরে দাঁড়াল ঘরের দেওয়াল

ঘেঁষে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শুনতে পেল ঘরের মধ্যে খস-খস শব্দ। তার সঙ্গে গুন্‌গুন্‌ করে কান্নার আওয়াজও তার কানে এসে পৌঁছল। কান পেতে শুনে সে বুঝতে পারলে ঘরের মধ্যে জল পড়ছে, জল থেকে বাঁচবার জন্য বিধবা বউটি বিছানা টেনে সরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে আক্ষেপ করে কাঁদছে। রমজান আকাশের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ উদাস হয়ে গেল, তারপর একসময় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পথে মনে পড়ল গামছার কথা। আবার ফিরল। ফিরে গামছাখানা খুলে নিতে গিয়ে মনে হলো সে ছুঁয়েছে, এ বাসন পড়ে থাকলে কাল সকালে বিধবা বউটি নিজেই মাজবে। ব্রাহ্মণের ঘরের এঁটোকাঁটা ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচারের কড়াকড়ির কথা সে জানত। সে খানিকক্ষণ ভাবলে। ভেবে ঠিক করলে ওর শাস্ত্র ওর ধর্ম ওর কাছে তার নিজের ধর্ম নিজের শাস্ত্রের মতোই সত্য! কিন্তু সেই বা এঁটোবাসন মাজবে কেন? অবশেষে মুক্ত উঠানের উপর অবিশ্রান্ত বর্ষণের নীচে বাসনগুলোকে রেখে সে চলে গেল। দেবে ধুয়ে খোদাতালার দেওয়া বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির তো এই কাজ, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করাই তো তার ধর্ম।

পরের দিন সকালে সে দাঁড়াল লালবউয়ের দরজায়। সমস্ত রাত্রির বর্ষণ লালবউয়ের জীর্ণ চাল বিপর্যস্ত করে ঘরের মেটে মেঝেতে ডোবা তৈরি করে দিয়েছে। লালবউ বসেছিল গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

রমজান এসে সেলাম করে বললে— সালাম গো দিদি!

তারপর বললে—আল্লার নাম নিয়ে কই দিদিঠারাণ—আমারে সন্দ করবেন না। আমার আপন মায়ে আর আপনকাতে সমান দেখি তবু আপনারে দিদিই বলব। প্রথমেই 'বেরাইছে' মু থেকে—আপনি আমার দিদিই।

লালবউ সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

রমজান অকপটে বলে গেল গতরাত্রের কথা। পরিশেষে বললে—দিদিঠারাণ, আপনি আমারে ভাই বলেন। আমি ঘরখান আপনার ছাইয়া দি। খড় নাই, তালপাতা কেটে আনি—তাই দিয়া দিই ছাইয়া। দেখবেন রমজানের হাতে তালপাতার ছাউনি খড়ের ছাউনি থেকে ভাল হবে। বলেন আমার দিদি হলেন?

কেউ ছিল না সেখানে; শুধু ছিলেন তিনি যিনি সব সময়ে সর্বত্র থাকেন। তিনি হয়তো অহরহ ঘোষণাও করে থাকেন যা কিছু যেখানে ঘটে সব। কিন্তু শুনতে তো পায় না মানুষ। এ ঘোষণা বুঝতে পারে অনুমান করতে পাবে তারাই যাদের আছে ওই বোধশক্তি। পল্লীর মানুষেরা অনুমান করতে পেরেছিল। ওই একটি তরুণী রূপসী ব্রাহ্মণবধূ আর এক মুসলমান তরুণ ঘরামী সে সম্পর্ক পাতালে, যার সাক্ষী কেউ ছিল না তাকে বুঝতে অনুমান করতে। তাদের একদিন এক মুহূর্তের জন্যও ভুল হয়নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লালবউ আর রমজান ছিল দিদি আর ভাই। নিত্য রমজান দিদিকে নির্জলা খাঁটি দুধ জুগিয়ে এসেছে। রমজান জেলে গিয়েছে চুরি করে, রমজানের বউ দুধ জুগিয়ে গেছে ঠাকুরঝির জন্যে। লালবউ ভাইফোঁটার ফোটা দিয়েছে রমজানের কপালে, কাপড় দিয়েছে। যে বাড়িতে নিমন্ত্রণ হয়েছে সে

বাড়ির সন্দেশ মিঠাই লালবউ নিয়ে এসেছে আঁচলে পুরে, রমজানভাইকে দিয়েছে। রমজানের চুরির মালের সম্বন্ধে বারদুয়েক পুলিশ লালবউয়ের বাড়িও সার্চ করেছে। তবু একটা অপবাদের কথা কেউ কোনদিন মুখে উচ্চারণ করেনি।

মহানগরীর হিসাব অঙ্কের হিসাব। ফরমূলার উত্তর। বাহিরের জগৎ যত বিস্তৃত হয়ে চলেছে, উগ্র প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, হৃদয় হয়েছে তত সংকীর্ণ, মন হয়েছে তত বুদ্ধিবৃত্তিতীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ এবং অবিশ্বাসী।

হঠাৎ কারও জুতোর শব্দ বেজে উঠল বাঁধানো গলিটার মধ্যে। চকিত হয়ে একটু সোজা হয়ে বসল বিমল। সেই মুহূর্তে বিড়ির খানিকটা আগুন খসে পড়ল কাপড়ের উপর। প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সে এবার। সর্বনাশ! কাপড়খানা শ্রীচন্দ্রবাবুর, নতুন পাটভাঙা শান্তিপুরে কাপড়। পুড়ে গেলে শ্রীচন্দ্রবাবু হয়তো ওই অজুহাতে কাপড়খানা বিমলকে দানই করে ফেলবেন, বলবেন—ওটা অগ্নিসাক্ষী করেই দিয়েছিলাম তোমাকে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল। অগ্নিদেব তাঁর সাক্ষ্য জ্বলজ্বলে করে ফুটিয়ে রেখেছেন—পাছে মনের কথাটা ভুলে যাই। ও কি আমি ফিরিয়ে নিতে পারি?

বিড়িটা ফেলে দিয়ে সে দড়ির আলনা থেকে টেনে নিলে নিজের কাপড়খানা।

সেই মুহূর্তেই সেলাম করে দাঁড়াল শ্রী পত্রিকার আপিসের দারোয়ান।

—কি খবর?

—চিট্‌ঠি। হিরণবাবু ভেজিল।

হিরণ লিখছে—পত্রপাঠ চলে এসো। জরুরী দরকার। ক্ষতি হবে।

—থাক আজ খাওয়া! চল।

ব্যাপারটা জাঁকজমকের ব্যাপার এবং তাকে নিয়েই।

সমারোহ করে লেখক কয়েকজনকে ডেকে তার ওই গল্পটা পড়া হবে। পড়তে হবে তাকেই। বিজয়বাবু জাঁকিয়ে বসে আছেন এবং রসিকতায় মজলিস সরগরম করে তুলেছেন। বিমল যেতেই তাকে তার পাশের চেয়ারে বসিয়ে বললেন— গল্পটা পড়ুন। আপনার মুখে শুনবার জন্যে সব বসে আছে।

বিমল বসল, কিন্তু তার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। সে এদের সকলকেই শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এদের গল্প পড়ে শোনাতে তার প্রবৃত্তি নাই। কারণ সে জানে এরা প্রত্যেকে তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। হয়তো পড়তে শুরু করে মাঝখানেই তাকে থামতে হবে—অথবা শেষ করে যখন উঠবে তখন দু' একজন ছাড়া কেউ থাকবে না। সে দু' একজনেরও টাকার দরকার থাকবে—অ্যাডভান্স নেবে, সেই জন্য থাকবে।

বিরজা ঢুলছিল। এরই মধ্যে তার আফিংয়ের নেশা জমেছে। রতন রেসগাইড নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

কাব্য-পাগল, দীর্ঘকেশী ভূপেন আঙুলে চুল জড়াতে জড়াতে আপন মনেই ওমর খৈয়াম আবৃত্তি করে চলেছে। একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, কিছু আঙ্গুর-চোয়ানো সুরা আর প্রিয়া—এই হলেই স্বর্গ।

সদ্য প্রকাশিত কাগজখানা হাতে দিয়ে বিজয়বাবু বললেন—পড়ুন।

বিমল কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললে—পড়ার কি দরকার আছে? ছাপার অক্ষরে যখন বের হলো—তখন অবসর মতো পড়বেন সকলে।

বিজয়বাবু বললেন—আপনি তাহলে কিছুই জানেন না। সাহিত্যিকেরা কেউ কারও লেখা পড়েন না। পড়ুন, শোনাতে চাই আমি গল্পটা।

রতন রেসের বইটা বন্ধ করে বললে—পড়ুন। তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আমাকে একবার চারটের সময় দেবপ্রসাদ এন্ড সন্স-এ যেতে হবে।

বিরজা সমানে ঢুলছে, কিন্তু শুনছে সব, সে বললে—আমাকেও একবার যেতে হবে। পড়ুন মশায়।

বিজয়বাবু আবার তাগিদ দিলেন—পড়ুন।

বিমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পড়তে আরম্ভ করলে। অবজ্ঞার বিনিময়ে অশ্রদ্ধা দেখানোটাই আত্মম্ভরিতা চরিতার্থ করবার সব চেয়ে সস্তা এবং সহজ উপায়। সাহিত্যিক হিসাবে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা শক্তিমান, তাদের শক্তিকে সে নিজেও স্বীকার করে, সুতরাং অশ্রদ্ধা দেখিয়ে সে নিজেকে নিজের কাছে ছোট করবে কেন? সে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরখানি স্তব্ধ হয়ে গেল। মাথার উপরে ইলেক্‌ট্রিক পাখাব একটা একটানা শব্দ প্রবাহের মতো বয়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে দেশলাই জ্বালার শব্দ হচ্ছে, সিগারেট ধরাচ্ছেন; বিরজাবাবু নিজে সিগারেট ধরিয়ে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট খুলে টেবিলের উপর দিচ্ছেন, যার যখন ইচ্ছে বের করে ধরাচ্ছেন।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। বিজযবাবু বললেন—এক মিনিট। বাইরের আপিস ঘরে তিনি উঠে গেলেন।

বিমল এতক্ষণে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। স্তব্ধ হযে সকলে সিগারেট টেনেই চলেছেন। বতন আপন মনেই পায়ের ঠেলা দিয়ে চেযারে দোল খাচ্ছে, বিরজা বড় বড় চোখ দুটি মেলে চেযে রয়েছে বাইরের দিকে, ভূপেন চোখ বন্ধ করে একহাতে ধরে আছে চুলের গুচ্ছ, অন্য হাতে সিগারেটটা পুড়েই চলেছে। আর কয়েকজন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বিমলের মুখের দিকে।

বিমল দেখলে—সত্য করে প্রত্যক্ষ করলে বাংলার সাহিত্যিক সমাজকে। সকল তুচ্ছতা সকল ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে প্রতিভার মহিমায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে সাহিত্যবসের হবি গ্রহণ করছেন হোমশিখার মতো। যজ্ঞকাষ্ঠের অন্তর্নিহিত বহ্নিশিখার মতোই তাঁদের আত্মা যেন বেরিয়ে এসেছে মহিমান্বিত মূর্তিতে। সে মনে মনে তাঁদের প্রণাম জানালে।

বিজয়বাবু টেলিফোন রেখে ফিরে এসে চেপে বসলেন। বললেন—পড়ুন। বিমল আবার পড়তে শুরু করলে।

পড়া শেষ হলো। বিজয়বাবু হাঁকলেন—চা!

ভূপেন বললে, চা নয় মদ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন একটা রসের কারবারের পর ট্যানিক অ্যাসিডে নেশা ছুটে যাবে। গোটা আষ্টেক টাকা খরচ করুন বিমলবাবু।

—বিমলবাবু না, আমি। আমি পনেরো টাকা দিচ্ছি। চল তোমার সাকীর ওখানে, গান শুনব, কাটলেট খাব। রাজী ?

—রাজী।

—বিমলবাবু আপনাকেও যেতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয যেতে হবে। ভূপেন বললে।

বিমল হেসে বললে—যাব।

রতন অকস্মাৎ বলে উঠল—ভাল হয়েছে গল্পটি। সুন্দর হয়েছে। তারপর উঠে পড়ল সে, বললে—বিজয়দা, কথা আছে।

হেসে বিজযবাবু বললেন, কোন্ ঘোড়া ? বলেই নোটকেস খুলে দু'খানা দশটাকার নোট বের করে হাতে তুলে দিলেন।

বিমল হিরণের হাত টিপে ইশারা দিযে বাইবে এল। বললে, কিছু খেতে হবে। সারাদিন কিছু খাওয়া হযনি।

—সে কি!

—সে অনেক কথা।

পিছনে ভারী পায়ের শব্দ ধ্বনিত হযে উঠল কাঠের মেঝেতে। বতন বেরিযে আসছে। লম্বা-চওড়া কালো জোযান বতন—বাংলা সাহিত্যেব ডার্ক হর্স; কালো তেজি ঘোড়ার মতোই চলেছে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিযেও বতন আবার দাঁড়াল। বললে—ভাবী ভাল গল্প লিখেছেন বিমলবাবু। বাংলা সাহিত্যেব একটি শ্রেষ্ঠ গল্প।

বিমল একটু হাসল।

হিরণ বললে—আসবেন তো সন্ধ্যেবেলা ?

—দেখি। এখন তো যাব দেবপ্রসাদ এন্ড সন্স-এব ওখানে।

—ওরা আপনার একটা বই ছাপলে, না ?

—হ্যাঁ। ওদের 'জন্মভূমি' কাগজে একখানা বই ধারাবাহিকভাবে বেব হচ্ছে। সেটাও ওরা ছাপবে।

বিমল বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব রতনবাবু ?

—কি ?

—আমিও একখানা বই ওদের দিয়েছি। তাই জিজ্ঞাসা করছি। কি টার্মে দিলেন ?

আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। বিমলের মুখের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত কদর্যভাবে মুখ নেড়ে রতন বলে উঠল—আপনাকে বলব কেন ?

বলেই সে দ্রুতপদে নেমে গেল সিঁড়ি বেযে। কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই থমকে দাঁড়িযে হা হা করে হেসে উঠে বললে—ঠাট্টা করলাম। কিছু মনে করবেন না। তবে সকলকে তো সমান দেয না। আপনাকে আমাব সমান না দিতে পারে। সুতরাং শুনে কি করবেন ?

হিরণ বললে, চল। তুই যেমন! ঘটোৎকচটা এমনই বটে। ও একটা দুর্বার। শক্তিও যেমন, দম্ভও তেমনি।

অদৃষ্ট মানে না বিমল। কিন্তু এক একটা দিন এমনই দুঃখ কষ্ট অপমানের বোঝা নিয়ে আসে যে মানতে ইচ্ছে হয়। অবশ্য বাংলাদেশের লেখকদের পক্ষে নিছক সুখ-সম্মানের দিন কখনই আসে না। তবুও এক একটা দিনের দুঃখ কষ্ট অপমানের তুলনা হয় না। এ দিনটাও তেমনি একটা দিন বিমলের পক্ষে।

একটা রেস্তোরাঁয় খেয়ে শ্রী আপিসে ঢুকতেই একটা বুড়ো মুসলমান তাকে সেলাম জানিয়ে বললে—আপনি বিমলবাবু? প্রসন্নবাবু একখানা চিঠি দিয়েছেন। বহুকষ্টে পাত্তা পাইছি আপনার।

প্রসন্নবাবু একজন নামকরা সাহিত্যিক-কবি। বিমলের এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিজয়বাবুর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছে সম্প্রতি। এবং বিমলের সঙ্গে বিজয়বাবুর প্রীতি বর্তমানে ঘনীভূত হওয়ায় তিনি বিমলের উপর বিরূপ হয়েছেন। প্রসন্নবাবুর প্রেস থেকেই বিমলের প্রথম বই ছাপা হযেছে। মুসলমানটি সেই বইয়ের দপ্তরী, প্রসন্নবাবুরই দপ্তরী। প্রসন্নবাবুই বাংলাদেশের এক বড় প্রকাশককে অনুরোধ করে বইখানির প্রকাশক স্থির করে দিয়েছেন। তাঁরা একশো বই নিয়েছেন। বাকি বইয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি, তাঁদের গুদামে নূতন লেখকের রাবিশ রাখবার জায়গা নাই। সোনার ধান বোঝাই করে নেয় যে সোনার তরী—তাতে যাচাই করা কষ্টিপাথরে-কষা সোনা ভিন্ন অন্য কিছুকে ঠাঁই দেবেন কি করে?

যাক সে কথা। তার জন্যে আক্ষেপ নাই বিমলের। আজ প্রসন্নবাবুর পত্র নিয়ে দপ্তরী তার কাছে এসেছে টাকার জন্য। প্রকাশক আর বই নেননি, টাকাও দেননি। প্রসন্নবাবুর কাছে টাকা তার জমা আছে, ছাপার খরচ এবং কাগজের দাম দিয়েও তো কিছু থাকতে পারে, প্রসন্নবাবুর কাগজে সে লিখছে তার জন্যও সে কিছু প্রত্যাশা করে, কিন্তু সে সব হিসেব-নিকেশ সাপেক্ষ বলে প্রসন্নবাবু দপ্তরীকে তার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দপ্তরী বললে—তিনি চিঠিতেও লিখছেন, মুখেও বলে দিছেন তিনি কিছু জানেন না। এরপর সে একেবারে সোজা বলে দিলে—টাকা না-পালি পর আমি ছেঁড়া কাগজের দরে বেচ্যা দিমু কইলাম আপনারে।

বিমলের মুখ সাদা হযে গেল।

দপ্তরী বললে—প্রসন্নবাবুরে কইলাম তিনি কইলেন, আমি তো কথা বল্যাই দিছি কিছু জানি না, তুমি তার সাথে গিয়া কথা কও, তা বাদে যা খুশি করবারে পার। আমি কইতে যাব না কিছু।

—কত টাকা পাবে তুমি? হিরণ প্রশ্ন করলে।

দপ্তরী পকেট থেকে একটা বিল বার করলে।

—কি হিরণ? সিঁড়ির মাথায় কখন এসে দাঁড়িয়েছেন বিজয়বাবু।

হিরণ তাকালে বিমলের দিকে, সম্ভবত বলবার জন্য অনুমতি চাইলে। বিমল দাঁড়িয়ে রয়েছে মাটির পুতুলের মতো, তার বংশগত শিক্ষা-দীক্ষা তাকে বলছে—তুমি বল, দিক তাই বেচে দিক। তুমিও ছেড়ে দাও এই দুঃখ-দৈন্যের তপস্যা। তুমি অক্ষম

তুমি অলস তুমি ভীরু তাই তুমি এসেছ সাহিত্যের পথে, ঘরের কোণে বসে রচনা কর কল্পকথা, কলমের ডগায় খোঁচা মেরে মনে কর তুমি মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছ অন্যায়কে—মনে কর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করছ। ভেবে দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও মিথ্যা আত্মতৃপ্তি অনুভব কর।

বিজয়বাবু নেমে এলেন, প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি?

দপ্তরী উৎসাহিত হলো, সম্ভবত সাহিত্যিক সমাজের মাটির জীবনের পরিচয় সে ভাল করেই জানে—জানে একজন অপমানিত হলে এদের অন্য সকলে মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে। সে উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করে বললে—কাল সকালে আমি সব বই বেচ্যা দিব মশায়। গুদামে ওই বাজে মাল রাখবার ঠাঁই নাই আমার।

বিজয়বাবুর নাকের ডগাটা স্ফীত হয়ে উঠল। বড় বড় চোখে ফুটে উঠল কঠিন দৃষ্টি; তিনি দপ্তরীর দিকে বার দুয়েক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—তার হাত থেকে বিলখানা টেনে নিয়ে দেখলেন। তারপর নোটকেস তুলে ছ'খানা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন—ফেরত দাও চার টাকা। বিল ছাপ্পান্ন টাকার।

দপ্তরী বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে এটা প্রত্যাশা করে নাই। বিজয়বাবু আবার বললেন—থাক টাকাটা, নশো বই তুমি আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে। শ্যামবাজার। বুঝেছ?

তারপর বিমলের হাত ধরে বললেন—আসুন, আজ থেকে আমি আপনার পাবলিশার হলাম।

বিমল কোন কথা বলতে পারলে না। কিন্তু গভীর ভাবাবেগে তার অন্তরের মধ্যে পূর্ণ তিথির সমুদ্রের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। বিজয়বাবু হয়তো নিজেকে আজও আবিষ্কার করতে পারেন নাই কিন্তু সে আজ বিজয়বাবুকে আবিষ্কার করেছে।

চন্দ্রমুখী নামে দেহব্যবসায়িনী কেনাবেচার কদর্যতম হাটের মধ্যে দেবদাসকে ভালবেসেছিল। এমন ভালবেসেছিল যে, ব্যবসা ছেড়ে সে সন্ন্যাসিনী হয়েছিল। সমাজের মধ্যে যাদের স্থান নাই, যুগ-যুগান্তরের ঘৃণার ফুৎকার মানুষেরা যাদের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফুৎকারের আকণ্ঠগভীর একটা খণ্ড সমুদ্র তৈরি করে তুলেছে তাদের চারিপাশে—তাদের সঙ্গে পরিচয় মানুষের কম। মানুষ চরিত্রবান বলে নয়, এদের সঙ্গে পরিচয় কেনাবেচার রূঢ় বাস্তবতার মতো এমনি শুষ্ক এমনি উপর-উপর যে চন্দ্রমুখীকে বিশ্বাস করতে চায় না মানুষের মন। কিন্তু বিমল আজ চোখে দেখলে—চন্দ্রমুখী আছে। শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করলে মনে মনে।

মহানগরীর ডাস্টবিন এই পল্লী। জীবনের কুৎসিত তৃষ্ণা নিবারণের পল্লী। জীবনের যত কদর্যতা উগরে দিয়ে যায় মানুষ এখানে।

বিজয়বাবু বললেন—এ হলো অভিনব গয়াক্ষেত্র বিমলবাবু। মানুষের অন্তরের প্রেতলোক এখানে পিণ্ড গ্রহণ করে।

বিমল মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিল। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ করে

নাই। কৌতূহলও ছিল। ভূপেনের সাকী শ্রীমতীর ঘরে এসে তাকে দেখে তার কথা-কাহিনী শুনে তার মনে হলো আসা তার সার্থক হয়েছে। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখীকে সে দেখে গেল। তাঁর সে আবিষ্কারকে সে এতদিন শুধু বিস্ময়কর এবং সুন্দর—এর বেশি বুঝতে পারেনি—তাকে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে।

স্বাস্থ্যবতী শ্যামবর্ণা মেয়েটি। কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। কথাবার্তা বুদ্ধির বিচারে তেমন মার্জিত হয়তো নয় কিন্তু যত সংযত তত সম্ভ্রমপূর্ণ তত মিষ্ট। শ্রীমতী খ্যাতিসম্পন্না গায়িকা। অভিনয়েও সে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু গানের তুলনায় সে কিছু নয়। শ্রীমতীর কণ্ঠ সুধাক্ষরা। ভূপেনকে সত্যই দেবদাসের মতো ভালবেসেছে। তার প্রতি অনুরাগের পরিচয় শ্রীমতীর সর্বাঙ্গে, তারই রুচি অনুযায়ী সে বেশভূষা করেছে; ঘরে দুযাবের সর্বত্রও সেই পরিচয়—রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা গীতবিতান সাজিয়ে রেখেছে, শরৎচন্দ্রের বই কিনেছে, ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্রের ছবি টাঙানো, মাসিকপত্র থেকে কেটে বাঁধিয়ে রেখেছে যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছবি। চীনেমাটির বাসনে সাজিয়ে শ্রীমতী নামিয়ে দিল সিদ্ধ ডিম, ভেজিটেবল্ চপ, কাটলেট; ভূপেনের হাতে দিলে একটা বাটিতে খানিকটা সুপ। বললে—এটা খাও আগে। ভূপেনের সাহিত্যিক বন্ধুরা আসবে জেনে সে নিজে হাতে পরিচর্যা করে তৈরি করেছে সমস্ত খাবারগুলি।

তারপর আরম্ভ হলো গান—বিজয়বাবু বললেন—আপনি বসুন।

ভূপেন গেলাসে মদ ঢালছিল। সে বললে—আপনি কেন? ওকে 'তুমি' বলুন।

—ঠিক হ্যায়। আপসে ঠিক হো যায়গা।

বিরজা টেনে নিলে গেলাস। বললে—তুই বেটা বেশ আছিস। বলে হা হা করে হেসে উঠল।

ভূপেন বললে—তুই অত্যন্ত ভাল'ার বুঝলি! সে একে একে গ্লাস এগিয়ে দিল। বিজয়বাবু নিজে নিয়ে বিমলকে বললেন—আপনি একটু জিভে ঠেকান। বাস্।

বিমল কপালে ঠেকিয়ে রেখে দিলে।

সকলে তার দিকে তাকালে। বিজয়বাবু বললেন—ঠিক আছে। বিমলবাবুর ওই হয়েছে। ওর ভাগটা হিরণকে দাও। হিরণ না পারে, রেখে দাও—রতন আসবে। নাও—আরম্ভ কর গান।

শ্রীমতী গান আরম্ভ করলে। রবীন্দ্রনাথের গান। ভূপেন তাকে শিখিয়েছে। শ্রীমতী কীর্তন সবচেয়ে ভাল গায়। এমন কীর্তন-গায়িকা আধুনিক বাংলাদেশে বিরল। কিন্তু তবু সে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই বেশি ভালবাসে। গাইবার আগে সে ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ গানটা গাইব?

ভূপেন সকলের দিকে তাকিয়ে বললে—শুরু হোক রবীন্দ্রনাথে, শেষ হবে চণ্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতিতে। কি বলেন?

—ঠিক হ্যায়। বিজয়বাবু একটা কৃত্রিম কাপ্তেনী উৎসাহ নিয়ে অভিনয় করে চলেছেন।

ভূপেন বললে—আজ সুর বাঁধো আনন্দের তারে। আরম্ভ কর। 'আজ কি বারতা পেলরে'।

হারমোনিয়মে সুর বেজে উঠল, অতি মৃদু স্বরে বাজছে যন্ত্রটা; শ্রীমতীর কণ্ঠস্বরে যন্ত্রের সুর লজ্জা পায। মানায় একমাত্র বাঁশের বাঁশী। সে আরম্ভ করলে গান—

আজ কি বারতা পেলরে কিশলয়!
ওরা কার কথা কয় বনময়!
এসো কবি এসো মালা পরো, বাঁশী ধরো
হোক গানে গানে বিনিময।

গানের মধ্যেই ভূপেন উঠে সকলের গলায় পরিয়ে দিল একগাছি করে বেলফুলের মালা। সকলের আগে দিলে বিমলের গলায।

গানে গানে মনোলোকে সে এক সুরলোক সৃষ্টি করলে শ্রীমতী। সমস্ত দিনের সকল ক্লেদ সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল বিমলের।

মালাগাছি গলায দুলিয়েই সে বাড়ি ফিরল। অন্ধকারের মধ্যে মনে হলো ময়দানের গাছগুলির শাখার প্রান্তে প্রান্তে যেন মুকুলেরা উদ্‌গত হচ্ছে। গলার মালার গন্ধের সঙ্গেই মিশে আছে সে গন্ধ। মহানগরীকে সে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিলে, তাকে বন্দনা করলে।

মহানগরী না থাকলে শ্রীমতীকে কেউ জানত না। নিজেকে নিজেই জানত না হয়তো শ্রীমতী। দূর মুর্শিদাবাদের এক নগণ্য গ্রামে তার জন্ম; প্রাচীন নবাবী আমলের কতকগুলি দেহবিলাসী শেঠেরা এনে তাদের বসিয়েছিল সেখানে, দুস্থ অবস্থার মধ্যে তারা আজও সেই জীবন যাপন করছে। তারই মধ্যে উদ্ভব শ্রীমতীর। অল্পস্বল্প কীর্তন গাইতে শিখেছিল; গুণীজন-সন্ধানী মহানগরী তাকে আহ্বান জানালে—সে এল; মহানগরী তার জীবনের আর কোন বিচার করলে না, বিচার করলে গুণের। সেই বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে অকুণ্ঠচিত্তে তাকে দিলে সমাদরের আসন।

চিন্তায় তার ছেদ পড়ল। ট্রাম এসে পড়েছে রাসবিহারী অ্যাভিনুয়ে, দেশপ্রিয পার্ক পার হয়ে চলেছে। ডাবুর হাউসে আজ এত আলো কিসের? আলো গিয়ে পড়েছে পার্কের মধ্যে। একটা গাছে অজস্র সাদা রংয়ের ফুল ধরে আছে। আশ্চর্য, যাবার সময চোখে পড়েনি! মন—সবই মন। মন তখন চোখকে দেখতে দেয়নি। এখন মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল।

আজ কি বারতা পেলরে কিশলয়
ট্রাম থেকে নেমে পড়ল সে। গলায় মালাখানি দুলছে
ওরা কার কথা কয় বনময়!

গুঞ্জন করতে করতে এসে সে দরজা খুললে ঘরের। আলো জ্বাললে। আলোর মধ্যে নজরে পড়ল একখানা খাম পড়ে আছে। দরজার চৌকাঠের কাছে। দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেছে। ডাকের চিঠি নয়। কোন এক বাহক এসেছিল।

পত্রখানা তুলে নিয়ে সে খুলে ফেললে। কে লিখেছে! নামের জায়গাটাই আগে দেখলে। 'লাবণ্য'।

লাবণ্য লিখেছে। মনটা রূঢ় আঘাত পেল। ও বেলার জের টেনেছে লাবণ্য।

বার

দীর্ঘ পত্র। প্রায় পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা। বার কয়েক চিঠিখানা উল্টোপাল্টে দেখলে, দু' চারটে লাইন চোখে পড়ল। চিঠিখানা পড়বে কি পড়বে না ভেবে স্থির করতে পারছিল না বিমল। কয়েক জায়গায় অরুণার নাম রয়েছে। সম্ভবত অরুণাকে এনে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অভিযোগ করে থাকবে। এ অভিযোগ করবার অবশ্যই অধিকার আছে লাবণ্যের। আরও কিছুক্ষণ ভেবে সে চিঠিখানা পড়লে। চিঠির আরম্ভে কোন পাঠ নেই। সরাসরি লিখেছে—"ও বেলায় আপনাকে যে সব কথা বলেছি—এবং যে ব্যবহার করেছি তার জন্য নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেয়েছি, নিজেকেই অনেক তিরস্কার করেছি, কিন্তু তাতেও যেন অপরাধ ভার লাঘব হচ্ছে না। সেই জন্যই অনেক ভেবে আপনাকে পত্র লিখছি, পত্রযোগে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। সব চেয়ে দুঃখ হচ্ছে- -বেলা দুটোর পর আপনি অভুক্ত জেনেও আপনাকে ঘর থেকে একরকম বের করে দিয়েছি। মানুষের জীবন এবং চরিত্র নিয়ে আপনার কারবার, আপনি এ কথা নিশ্চয় জানেন যে, রাগ করে হোক, ঘৃণা করে হোক, আপনার জন না খেলে—মেয়েরা সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়ে থাকে; আমার দুঃখের এবং লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা নেই। আপনি খাননি এ কথা জেনেও আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করিনি উপরন্তু অপ্রিয় কটু কথা বলেছি। যে সময়ে আপনি এখান থেকে গেছেন তখন বোধ হয় আড়াইটে, তখন কলকাতার কোন হোটেলে ভাত ছিল না। সমস্তটা দিন আপনি নিশ্চয় উপবাসে কাটিয়েছেন। বন্ধু বা আত্মীয় ধনীজন বলে সেখানকার অন্নগ্রহণের অরুচিকর দায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য যদি বলে থাকেন—আমার এখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, তাতে লজ্জা পাওয়া বা বিরক্ত হওয়া আমার উচিত ছিল না। কিন্তু মনের অবস্থা আমার তখন এমনই ছিল যে এমনই একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল স্বাভাবিকভাবে। আমার কোন হাত ছিল না। আমি তখন নিজের উপর সমস্ত সংযম হারিয়ে বসেছিলাম। এর খানিকটা আভাস আপনি নিশ্চয় পেয়ে গেছেন। বাড়ির ভিতর থেকে ব্যাঙ্কের গিন্নীর পুত্রবধূ যা বলেছিলেন—সে আপনি শুনেছেন। "এই ভর দুপুরে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মান-অভিমানের পালা গাইলে—এঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি শুনি?' আপনার মনে আছে বোধ হয়! আমার সর্বাঙ্গে কদর্য কাদা মাখিয়ে দেবার যে প্রাণপণ চেষ্টা এই বউটি ক'দিন ধরে করছে—সে শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

যে দিন থেকে এই বাসায় এসেছি—সেই দিন থেকেই মেয়েটি এই ভাবে আমার পিছনে লেগে আছে। আমার মতো অভিভাবকহীনা অল্পবয়সী একটা বিধবা মেয়ে

এমনি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, এটা তার কাছে শুধু অবিশ্বাসের কথাই নয়—অসহ্যও বটে। মধ্যে মধ্যে সে বলে—যে সব মেয়েরা চাকরি করে, এমনি করে সেলাই-ফোঁড়ের ব্যবসা করে তারা আমার দু'চক্ষের বিষ। অথচ আশ্চর্যের কথা এই মেয়েটিই পাশের তিনতলা বাড়ির শিক্ষিতা বউটির কাছে নিত্য-নিয়মিতভাবে সেলাইযের কাজ শিখে আসে। শুধু তাই নয়, স্বামীর কাছে রাত্রে পডাশুনা শুরু কবেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

হয়তো আমার কিছু দোষ আছে। ওঁদের পারিবারিক মনোমালিন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িযে গেছি। বউটির শাশুডি তাঁর দুঃখের কথা আমার কাছে বলেন, আমি সান্ত্বনা দিযে থাকি, তার বিধবা ননদটি আমাদেব কাছে আসে—সেলাই শেখে। তার দুটি কুমারী মেয়েও আমার কাছে পড়ে।

ক্রমে ক্রমে এই বিরোধিতা বেড়েই চলেছে। আমার বহু পরিশ্রমের ফলে আরও তিনজন আমার মতোই হতভাগিনী এসে যোগ দিল, ধীরে ধীবে আমাদের কাজের আদব হলো, সঙ্গে সঙ্গে বউটিও হযে উঠল নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর। তার এই আক্রোশে ঘৃতাহুতি দিলেন আপনি। আরও একটু খুলে বলি। চিত্তদা আপনার দেশেব লোক, তাঁকে আপনি ভাল করেই জানেন। সবল দযালু মানুষ কিন্তু নেশা করেন এবং শুনেছি আবও অখ্যাতি আছে। যাই থাক—তিনি আমার কাছে একান্ত আপনারই জনের মতো। এই মানুষটির একটি অদ্ভুত সহজ দৃষ্টি আছে—যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষের ভালত্ব-মন্দত্ব এক নিমেষে চিনে নেন। তিনি অনেক সাহায্য করেছেন আমাকে। এই বধূটি তাঁব সঙ্গে জডিযে আমাদের নামে অপবাদ রটনা শুরু করেন। একদিন চিত্তদা বউটিব স্বামীকে রাস্তায় ধরে বলেন—'দেখুন—আপনার বউ যদি এমন কথা আর কোনদিন বলে—তবে আপনার দাঁত ভেঙে দেব। যতবার বলবে ততটি দাঁত আপনার যাবে।' চিত্তদাব কথায় এবং কাজে তফাৎ নেই। সে কথা এখানকার সকলেই জানে। ওই তিনতলাব মালিকবাবুটি কয়েকদিন আগেই সদর রাস্তার উপর একজন অপরিচিত লোকের হাতে কানমলা খেযেছিলেন। ঠিক দু'দিন আগেই চিত্তদা তাকে বলেছিলেন 'শহরে কে কার কড়ি ধারে, এমন মেজাজের জন্যে কার কাছে কোন দিন কানমলা খাবেন আপনি।' পাড়ার কযেকটি তরুণ প্রহার খেয়েছিল কয়লার ডিপোর কুলীদের কাছে। কাজেই তার শাসন-বাক্যকে উপেক্ষা কবতে সাহস করেননি বউটির স্বামী। স্ত্রীকে নিরস্ত করেছিলেন।

হঠাৎ আপনি নিয়ে এলেন অরুণাকে।

চিত্তদা আপনার নাম করে আমার এখানে অরুণাকে নিয়ে এলেন—আমি পরম ভাগ্য বলে মনে করলাম। এতদিন দূর থেকে আপনাকে দেখেছি—আর এবার অরুণার কল্যাণে আপনি কাছে এলেন। প্রথম দিন সেই আনন্দেই আপনাকে নিমন্ত্রণ করে উৎসব করতে চেয়েছিলাম। আপনাদের নামের একটা মোহ আছে। থাক সে কথা। না থাকবেই বা কেন? গোপন করব কেন? সাহিত্যিক শিল্পী দুর্নিবার আকর্ষণে সাধারণকে টানে। আমাকেও টানে, আমার মনে হয় আপনাদের কাছে গেলেই পাব

সকল দুঃখের সান্ত্বনা, সকল অভিমান ক্ষোভের অন্তর জুড়ানো স্নেহস্পর্শ; অনাত্মীয়তার রূঢ়তায় রূঢ় এই সংসারে আত্মীয়তার মাধুর্য সম্ভারে সম্ভারে জমা হয়ে আছে—আপনাদের কাছে; অসম্মানিত সাধারণ আমরা আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ে আপনাদের সম্মানের অংশ পাব। এই কারণেই তো ওই পিনাকীকে সহ্য করতে পেরেছিলাম। আমার ভাগ্য, আমার ভাগ্যে তো পরিহাস ছাড়া বিধাতার আর কোন দান নেই; পিনাকী আমাকে ভালবেসেছিল; অকপটে সে ভালবাসার কথা আমাকে পত্রযোগে জানাতেও সে সাহস করেছিল। তার সাহসই বলুন আর ধৃষ্টতাই বলুন—পরিণামে সে বিস্ময়কর। যাক সে কথা।

আপনি কাছে আসতেই আগুন ধরল। বউটি এবার প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অথচ সে আপনার লেখার খুব ভক্ত। তার স্বামী পাড়ার লাইব্রেরি থেকে যে বই নিয়ে আসেন তার মধ্যে আপনার বই-ই বেশি। প্রথম যেদিন আমার এখানে চা খেয়ে গেলেন—সেদিন সে স্তম্ভিত হয়ে রইল। পরের দিন থেকে আগ্নেয়গিরির মুখ নতুন করে খুলল। আপনার মনেই বকে যেত—কল্পনা করা কুৎসিত কথা। কান দিইনি। কিন্তু আজ পিনাকী ঘটালে বিস্ময়কর ঘটনা। বেলা সাড়ে এগারটায় সে এল অভিনব বেশে।—আপনি নিজের চোখেই তার সে অভিনব বেশ দেখেছেন। আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। চুল ছেঁটে—কামিয়ে প্রসাধন পরিচ্ছন্ন বেশে সে এসে দাঁড়াল—আমার মনে পড়ে গেল রূপকথার বুদ্ধু-ভূতুমের কাহিনী; রাজপুত্রেরা থাকত বানর আর পেঁচার খোলস পরে। সেই খোলস একদিন পুড়িয়ে দিলে তাদের ভাবী বউয়েরা। রাজপুত্রদের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। আমি হেসে তাকে সেই কথাই বললাম। বিনা ভূমিকায় সে আমায় বললে—ঠিক বলেছেন লাবণ্যদি; বড় ভাল বলেছেন। আমি প্রেমে পড়েছি—তাই আমার সকল ময়লা খোলস খসে গেছে। আমি অরুণাকে ভালবেসেছি। কাল সারারাত্রি আমি ভেবে দেখেছি। তাকে আমি ভালবাসি। অরুণাকে আমি বিয়ে করতে চাই লাবণ্যদি। তার চোখ-মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলতেও আমার সাহস হয়নি। বরং ভয় পেলাম আমি। পিনাকী বললে—আমি কোন আপত্তিই শুনব না আপনার। আপনাকে মত দিতেই হবে।

আমি বললাম—আমি তো অরুণার অভিভাবক নই পিনাকী, আমি কি বলব? এ কথার জবাব শুধু অরুণাই দিতে পারে।

বিনা বাক্যব্যয়ে পিনাকী উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম—শুধু একটি কথা বলব আমি পিনাকী, তুমি আমাকে দিদি বল—তাই বলব।

সে ঘুরে দাঁড়াল।

আমি তুললাম উপার্জনের কথা, আর্থিক সঙ্গতির কথা। বললাম—কোন্ ভরসায় বিয়ে করবে বলছ—সেটা ভাব। তুমি তাকে ভালবাস, সে-ও যদি তোমাকে ভালবাসে—তবে মনের কথা বলা-কওয়া করে—প্রতীক্ষা কর সুদিনের।

সে বললে—সুদিন তো আসতেও আছে যেতেও আছে লাবণ্যদি। কাল এসে—পরশুও তো চলে যেতে পারে। দুঃখের মুখ তাকিয়ে আজ যদি প্রেমকে

উপেক্ষা করি—তবে এর চেয়ে প্রেমের অপমান আর কি হতে পারে? কাল যখন সুদিন আসবে—তখন যদি প্রেমের এ আবেগ না থাকে!

পিনাকী হয় তো পাগল, হিসেবী লোক বিবেচক লোকের কাছে এ-কথাগুলি পাগলামীর কথা ছাড়া কিছুই নয়, উচ্চস্তরের লোকেরা হয় তো বলবেন—প্রেম তো শুধু ভোগের জন্যই নয়, প্রেম যে মানুষকে ত্যাগের পথেও নিয়ে যায়। আরও হয় তো বলবেন—প্রেমের আবেগ যদি সময়ক্ষেপে জুড়িয়েই যায়—তাতেই বা ক্ষতি কি—সেই তো বরং ভাল। আরও হযতো অনেক কথাই বলবেন—বলতে পারেন; বলুন যাঁর যা খুশি। আমি এর উত্তরে কিছু বলতে পারিনি। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, অরুণার সৌভাগ্যে আমার মন ভরে উঠেছিল, চোখে জলও এসেছিল।

তাকে আমি অরুণার কাছে নিয়ে গেলাম। বললাম—অরুণাকে তুমি বল। তাদের একঘরে রেখে চলে এলাম। শুনে আশ্চর্য হবেন –এর পর অকারণেই আমি কাঁদলাম।

কাঁদছিলাম, হঠাৎ বউটির গলায় শাখ বেজে উঠল। আগেকার কালে শাঁখ বাজত যুদ্ধক্ষেত্রে। চিৎকার করে আরম্ভ করলে––কুৎসিত কদর্য অভিযোগ। কদর্যতম অভিযোগ বিমলবাবু, বললে—ব্যবসায়ের একটা আড়াল তৈরি করে—আমরা পেতেছি একটা দেহব্যবসায়ের আসর। আমাকে বললে—। যাক সে কথা। অবশ্য অনেক শুনেছি এমন সব কথা! পথে বেরিয়ে পিছনে বলতে শুনেছি, দুই পাশে বলতে শুনেছি মানুষকে। তাদের কথাকে ঘৃণা করেছি, উপেক্ষা করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—এমন বিষ মেশানো কথা কখনও শুনিনি। একে কোন মতে উপেক্ষা করতে পারলাম না। প্রতিবাদ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে বাঁচালে পিনাকী আর অরুণা। তারা দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল––হাসিমুখে মাথা উঁচু করে। অরুণা বউটিকে বললে—কেন এমন ধারা কদর্য কথাগুলো বলছেন আপনি?

বউটি বললে—কদর্য? তোমাদের ওই কদর্য রসালাপের ভাষ্য কি গীতাভাষ্যের মতো পবিত্র হবে?

অরুণা বললে—আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ তো আপনিও করে থাকেন। ভালবাসার কথাও বলেন। তাকে কি আপনি কদর্য মনে করেন?

ফুঁসে উঠল মেয়েটি। বললে–– কি? আমরা স্বামী-স্ত্রী––নারায়ণ সাক্ষী করে—

বাধা দিয়ে অরুণা বললে—আমরাও স্বামী-স্ত্রী হতে চলেছি। অবিশ্যি নারায়ণ সাক্ষী রাখবার ভাগ্য হবে না, তবে রেজিস্ট্রি করে আমরা বিয়ে করব।

বউটি দমে গেল—তবু বললে—সে বিয়ে—আর এ বিয়ে—

আবার বাধা দিলে অরুণা। বললে—আইন মতে বিয়ে করছি, এ বিয়েকে গালাগালি দিলে আইনের ফ্যাসাদে পড়বেন আপনি।

মেয়েটিকে চুপ করতে হলো এরপর।

আমার মুখের দিকে চেয়ে অরুণা বললে—ওই বউটিই আমার সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলে লাবণ্যদি। ওকে আমার ঘটকী বিদেয় দিতে হবে। বলে সে হেসে উঠল।

তারপর ওরা মেতে উঠল সমারোহে। অকস্মাৎ ওদের চোখে ধরা পড়ল—কলকাতায়

বসন্ত এসেছে। পার্কে পার্কে ফুল ফুটেছে। খোলা ময়দানে দখিণা বাতাসের প্রবাহ বয়ে চলেছে। পিনাকী বললে—ডালিয়া ফুটেছে অপরূপ হয়ে—চিড়িয়াখানার বাগানে।

বউটির কথাগুলি ফিরিয়ে দিলে সুদে আসলে। হাসতে হাসতে চলে গেল সে বিজয়িনীর মতো। কিন্তু আমি? আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বউটির বাক্য-কণ্টকবিদ্ধ অন্তর নিয়ে। কাঁটা ফুটে বিঁধে থাকলে রক্ত ঝরে না—কিন্তু দুঃসহ বেদনা হয়। আমার অবস্থা হলো তেমনি। অরুণার জীবনে সকল কাঁটা গোলাপ হয়ে ফুটল—দক্ষিণা বাতাস তাদের ডাক দিলে—তারা চলে গেল। আমিই অরুণাকে সাজিয়ে দিলাম, অতীত জীবনের স্বামীসৌভাগ্যের অবশেষের মধ্যে কয়েকখানা শাড়ি আছে, তারই মধ্যে সবচেয়ে যেখানা ভাল তাই তাকে পরিয়েও দিলাম। আমার ভাগ্যে কাঁটা ফুল হয়ে ফুটবার নয়, জীবনে সে বিঁধেই রইল, প্রথম জীবন থেকে যত কাঁটা বিঁধে আছে তাতে তার অবস্থা শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মতো; কণ্টকশয্যায় অন্তর আমার শুয়ে পড়েছে আজ।

ঠিক এই সময় এলেন আপনি। প্রথমটায় অন্তর আমার পরম আগ্রহে সান্ত্বনার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম—ভীষ্ম যেমন অর্জুনের কাছে চেয়েছিলেন তৃষ্ণা মেটাবার উপযুক্ত ভোগবতীর জল, তেমনি চাইব আপনার কাছে সান্ত্বনার স্নেহ—নির্ঝরের শীতল স্নিগ্ধধারা। কিন্তু কি জানি কেন চাইতে পারলাম না। সঙ্কোচ হলো। তার পরিবর্তে আমার মনের সকল ক্ষোভ বেরিয়ে এল। আঘাত করলাম আপনাকে।"

এরপর অনেকটা অংশ লিখে বারবার দাগ টেনে সযত্নে কেটে দিয়েছে। কৌতূহল হলো বিমলের। কি লিখেছিল লাবণ্য? বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল তার। সে উঠে দাঁড়িয়ে আলোটার খুব কাছে গিয়ে তুলে ধরে চিঠির কাটা অংশটা পড়বার চেষ্টা করলে।

হাত তার কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানাও কাঁপছে। চোখের দৃষ্টিতে যেন কিছু ধরা পড়ছে না। কি লিখেছিল লাবণ্য? সে কি লিখেছিল—সে তাকে ভালবাসে?

কিছুই কিন্তু পড়া গেল না। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কেটেছে। পাথরের অথবা ধাতুফলকের উপরের লেখা যেমন উখো দিয়ে ঘষে ঘষে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তেমনিভাবে লেখার উপরে দাগ টেনে টেনে কেটেছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল বিমল।

অনেকক্ষণ পর শেষ অংশটা সে পড়লে।

"দুর্ভাগ্যের এইখানেই শেষ নয়। যে তিনজন সঙ্গিনী এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল—তিনটি বিধবাকে আপনি দেখেছিলেন নিশ্চয়, আশ্চর্যের কথা তারাও বিকেলে আমাকে জানালে তারা আর থাকবে না এখানে, অরুণা এবং আমি যে ভাবে কলঙ্কের ক্ষেত্র করে তুলেছি এই আসবটিকে—তাতে এখানে থাকলে ভবিষ্যতে তাদেরও কলঙ্কের ভাগ নিতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে মেয়েদের পক্ষে মরণই মঙ্গল। সুতরাং তারা চলে যাবে। নয়তো—। বুঝেছেন নিশ্চয় নয়তোর পর কি? আমি ভাবলাম। ভেবে ঠিক করলাম আমিই চলে যাব। আমি চলে যাচ্ছি। হয়তো জীবনে

আর দেখা হবে না। দেখা হলেও যে সব অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসবে আপনার জীবনে, আমার জীবনে তাতে হয়তো পরস্পরকে চিনতেই পারব না। হয়তো চিনতে পারলেও—পরিচয়কে স্বীকার করাও সম্ভবপর হবে না। ভাবুন তো যদি কোনদিন পথের ধারে আমাকে ভিক্ষুণীর বেশে ভিক্ষা করতে দেখেন তবে চিনতে পারা সম্ভবপর হবে কি!”

বিমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। এতখানি তেজ এত বড অভিমান এত সাহস যে মেয়ের সে মেযে না পারে কি? কোথায় গেল সে এই রাত্রে? যতই অসীম সাহসিনী হোক লাবণ্য রাত্রির মহানগরীকে সে জানে না। শিউরে উঠল সে। তাড়াতাড়ি সে বেরিযে এল ঘব থেকে। ছুটে গেল চিত্তরঞ্জনের দোকানে। রাত্রি অনেক হয়েছে। রাস্তা জনহীন। চিত্তর দোকান বন্ধ হযে গেছে। সে বারকযেক ডাকলে, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িযে থেকে সে ভাবলে, চিত্ত এখানে নেই, বাসাতে আছে, সেখানে গিযে চিত্তকে ডাকবে? অথবা লাবণ্যদের ওখানে গিয়ে চিত্তকে ডাকবে? অথবা লাবণ্যদের ওখানে গিযে লাবণ্যের নাম ধরেই ডাক দিয়ে যারা আছে তাদের কাছে জেনে নেবে লাবণ্যের সংবাদ! তাতে কলঙ্ক রটনার সম্ভাবনা আছে, হয়তো বাড়িসুদ্ধ লোকে কুৎসিত ভাষায কদর্য অভিযোগে অভিযুক্ত করবে। এমন কি দুষ্ট লোকের হাতে লাঞ্ছনাও ঘটতে পারে তার।

ঘটুক। যে যা বলে বলুক। সে তাদের সম্মুখীন হবে। সে বলবে—লাবণ্যকে সে ভালবাসে। তারা পরস্পবের কাছে বিবাহেব প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। লাবণ্য যদি এখনও না গিয়ে থাকে, তবে তাই না হয হবে। গ্রহণ করবে সে লাবণ্যকে তার জীবনে। সে আজ যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করছে, প্রিযার গণ্ডের তিলের বিনিময়ে বোখারা সমরখন্দ দান করার কল্পনা কবিব অতিশয়োক্তি নয়, ভাবাবেগ হয় তো বটে কিন্তু এ ভাবাবেগ জীবনে সত্য। বাস্তববুদ্ধিতে এই আবেগের সত্যকে যে লঙ্ঘন করে সে জীবনে হয়তো সমৃদ্ধি লাভ করে, সুনাম হয়তো অক্ষুণ্ণ থাকে কিন্তু আত্মাকে লাঞ্ছিত করে, পীড়িত করে, আত্মা তাকে অভিশম্পাত দেয—“আজীবন মরুতৃষ্ণায় তুমি তৃষিত হযে ফেরো।”

সে দৃঢপদেই অগ্রসর হলো। খানিকটা গিয়েই সে থমকে দাঁডাল। লাবণ্যের বাডির ওদিক থেকেই দু'জন কারা আসছে। এক মুহূর্ত পরেই সে তাদের চিনতে পাবলে। পিনাকী আর অরুণা।

তারা দু'জনেও থমকে দাঁড়াল বিমলকে দেখে। বিমল বললে—এ কি? এত রাত্রে কোথায় যাবে?

পিনাকি বললে—আমাদের আজ বাসর বিমলবাবু। বাসর পাততে চললাম। সে হেসে উঠল। তারপর বললে—গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানা—সেখান থেকে গঙ্গার ধারে ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়ে গেলাম সিনেমায়। ফিরে অরুণাকে পৌঁছে দিতে এসে দেখি দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে শুনলাম ওখানে অরুণার ঠাঁই হবে না। দরজা খুললেন না। বললেন—আছে একখানা কাপড়—সে এসে কাল নিয়ো।

—লাবণ্য ? লাবণ্য দেবী বললেন ?

অরুণা বললে—লাবণ্যদি নাকি ওখানে নেই শুনলাম। বললেন—সেও এখান থেকে চলে গেছে। কোথায় গেছেন জিজ্ঞেস করায় বললেন—

—কি বললেন ?

—পিনাকী বললে—কুৎসিত ভাবেই বললেন অবশ্য—বললেন—অরুণার কপালে চিত্রকর জুটেছে—তার কপালে সাহিত্যিক—বিমলবাবুর ওখানে খোঁজ কর গিয়ে।

অরুণা ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—লাবণ্যদি কোথায় ?

উত্তর দিলে পিনাকী—বললে—লাবণ্যদিকে আমি জানি অরুণা। বিমলবাবুর ওখানে তিনি যাবেন না। তারপর তার সেই স্বভাবগত অপ্রতিভের মতো হাসি হেসে পিনাকী বললে—সে ভাগ্য বিমলবাবুর নয়। লাবণ্যদি চলে গেছেন। চল।

তারা অগ্রসর হলো।

বিমল দাঁড়িয়েই রইল। তার প্রশ্ন করতে খেয়ালও হলো না—ওরা কোথায় যাচ্ছে ? সে ভাবছিল লাবণ্যের কথা। কোথায় গেল লাবণ্য ?

মনে পড়ল তার মহানগরীর এক বিশিষ্ট রূপের কথা। এই ধরিত্রী বহুরূপা। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে যখন অগ্ন্যুদ্গার হয়—তখন তার এক রূপ—সে তখন জ্বালামুখী। অরণ্যে গলিতপত্রের রাশি থেকে উত্থিত বাষ্পরাশি ও গাঢ় ছায়ার সংমিশ্রণে তার আর এক রূপ—মন্থর গমনে চলে অজগর, দন্ত নখর বিস্তার করে ফেরে শ্বাপদ ; পৃথিবীর সেখানে চামুণ্ডা রূপ। মরুভূমিতে তার আর এক রূপ। এই মহানগরীতে ধরিত্রীর সকল রূপ প্রতিবিম্বিত প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র মানবসমাজের উপরেই হয়েছে—কিন্তু সমাজ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই মহানগরীতে সে প্রতিফলন সব চেয়ে উগ্র— সব চেয়ে স্পষ্ট—সব চেয়ে প্রদীপ্ত।

লাবণ্য অভিমান করে চলে গেল— একবার ভাবলে না মহানগরীর রূঢ় উগ্র রূপের কথা। তার হৃদয়হীনতার কথা। প্রচণ্ড শক্তি না থাকলে এর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। সে শক্তি কি আছে লাবণ্যের ?

হঠাৎ এরই মধ্যে বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল। অভিমানের আবেগ, বেদনার ক্ষোভ যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে মানুষের জীবনে, বিশেষ করে নারীর জীবনে—তখন তাকে হার মানানো যায় না, অনায়াসে সে তখন জীবনের মূল্য দিয়েও জয়ের গৌরব অর্জন করতে চায় ; সকল ক্ষেত্রে জয়ের গৌরব হয় তো পায় না, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানিকে নিশ্চিতরূপে উপেক্ষা করতে পারে।

কাছেই লেক। কিছুদিন আগেই এই লেকে একটি মেয়ে এবং ছেলে ডুবে মরেছে। এই সব দৃষ্টান্তগুলি মানুষের কাছে পথচিহ্নহীন প্রান্তরে পদচিহ্নধারার মতো। লাবণ্যের এই পায়ের ছাপে পা ফেলে চলা বিচিত্র নয়।

হন্ হন্ করে সে চলল লেকের দিকে।

জ্যোৎস্নালোকিত লেক। ফাল্গুন মাস—এরই মধ্যে লেকের জলের উপরে ধোঁয়ার

মতো পাতলা কুয়াশার স্তর জেগে উঠেছে। জনহীন—চারিপাশ খাঁ খাঁ করছে। লেকের ধারের ক্লাবগুলিতেও কোন সাড়া নাই। লেকের মধ্যে দ্বীপগুলির গাছপালার মাথায় জ্যোৎস্না চক্‌চক্ করছে। মধ্যে মধ্যে মাছে সাড়া জাগাচ্ছে লেকের জলে।

ও কে? দূরে যেন সাদা মূর্তির মতো কেউ বসে আছে—একটা বেঞ্চে। এগিয়ে গেল সে।

লাবণ্য নয়। অরুণা এবং পিনাকী। চমকে উঠল তারা। বিমলও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।—এই লেকের ধারে কেন?

পিনাকী বললে—কি করব? এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব দু'জনে।

বিমল বললে—না। চল—আমার ওখানে চল।

পিনাকী রাজী হলো না। বললে—বড ভাল লাগছে। তারপর হেসে বললে—ও বুঝেছি। আপনি সন্দেহ করছেন আমরা মারাত্মক কিছু একটা করে বসব বলে। না না। সে ভয় করবেন না। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—আমরা মরব না।

বিমল অগত্যা ফিরল।

কিন্তু কোথায় গেল লাবণ্য?

সকালে যখন সে উঠল তখন মন তার উদাস হয়ে উঠেছে। লাবণ্যকে খুঁজে দেখবার মতো মনের আবেগ নাই কিন্তু সমস্ত কিছুর উপর থেকে তার আসক্তি চলে গেছে।

চিত্ত এসে হাজির হলো এই সময়ে। সে বললে—হ্যাঁ শুনেছি সব। আমার সঙ্গে দেখা করেনি লাবণ্যদি।

তারপর বলল—কে জানে কোথায় গেল। এই শহরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া কি সহজ?

আবার বললে—থাক। কতজন আসছে কতজন যাচ্ছে, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন আমি একটা খবর দিতে এসেছিলাম। কাল সন্ধ্যায় দু'জন ভদ্রলোক এসেছিলেন। আবার আসবেন আজ। কি যেন সব কাজের কথা আছে। আপনাকে তাঁদের চাই-ই।

আজ না হয়ে গতকাল বা আরও কয়েক দিন পরে হলে বিমল মনে মনে মহানগরীকে নমস্কার করে বলত—মহানগরী তোমার জয় হোক!

তের

ডাক দিয়েছেন এক ফিল্ম ডিরেক্টর। বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শক্তি'র সর্বাধ্যক্ষ প্রদোষ চৌধুরী একখানা চিরকুটে লিখে দিয়েছেন "বিমল, আমার বন্ধু বিখ্যাত শিল্পী এবং ফিল্ম ডিরেক্টর হীরু সেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমাদের কাগজে তোমার যে উপন্যাসটি বেরিয়েছে সেটি তাঁর ভাল লেগেছে। ইতি বুনোদা।"

প্রদোষ চৌধুরী বাংলাদেশে বুনো চৌধুরী নামে পরিচিত। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য

রেখে চেহারাটাকে চুলে দাড়িতে গোঁফে যথাসম্ভব বন্য করে রাখেন। খ্যাতনামা লোক। দেশের সকল আন্দোলনের মধ্যেই তিনি আছেন। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি সমস্ত কিছুর সঙ্গেই যোগ ঘনিষ্ঠ। মোটামুটি বেশ লোক। বিমল মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করলে প্রদোষ চৌধুরীর প্রতি।

হীরু সেন থাকেন টালিগঞ্জে। তাঁরই একজন সহকারী বুনো চৌধুরীর চিঠি নিয়ে সকালেই এসে বিমলের কাছে উপস্থিত হলো। বিমল মনে মনে প্রতীক্ষমান হয়েই ছিল। এর পর সে এখান থেকে সরে অন্য কোথাও যেতে চায়; যে কাজ নিয়ে রয়েছে তার চেযেও অধিকতর আকর্ষণ বিশিষ্ট কোন কাজ সে চায়। লাবণ্যকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল এবং আকস্মিকভাবে ওই ঘটনার যে পরিণতি ঘটল তাতে জীবনে একটা নাড়া খেয়ে গেছে। মনে মনে গভীর বেদনা অনুভব করেছে সে; মধ্যে মধ্যে লজ্জাও অনুভব করছে, দশের কাছে লজ্জা নয়—নিজের কাছে লজ্জা, নিজের অক্ষমতার জন্য নিজের কাপুরুষতার জন্য লজ্জা, মধ্যে মধ্যে অনুভব করছে যে, সে অত্যন্ত স্বার্থপর। লাবণ্যকে তার ভালই লেগেছিল, তার রূপ ভাল লেগেছিল, তার সাহসিকতাপূর্ণ উদ্যমকে ভাল লেগেছিল, তার মর্যাদাময়ী সংযত চিত্তকে ভাল লেগেছিল—তার ফলে সে তাকে ভালই বেসেছিল—যে ভালবাসাকে সে জোর করে অস্বীকার করেছে।

এর জন্য দায়ী এই মহানগরীর সভ্যতা। মহানগরীর সভ্যতার অনাড়ম্বর নীড়ের মধ্যে সুখ নাই শান্তি নাই। আদিমকাল থেকে মানুষ প্রেয়সীর জন্য সংগ্রহ করে এসেছে শাঁখের গহনা—পলা পুঁতির মালা; পল্লীর মধ্যে নববধূর জন্য বর আনে কাঁচের চুড়ি, রূপার হার, মহানগরীর রাস্তার পাশে পাশে সাজিয়ে রেখেছে মণিমুক্তা সোনার আভরণ, বহুমূল্য বিচিত্রবর্ণ বেশভূষা, গৃহসজ্জার শত সহস্র উপকরণ, এই মহানগরীর বুকে যখন বিচিত্র সংঘটনে দেখা হয় প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ার—তখনই প্রিয়াকে, প্রিয়ের মনেও সাধ জাগে এই নগরীর শ্রেষ্ঠ আভরণে শ্রেষ্ঠ সজ্জায় সাজাবে সে। তাকে নিয়ে সে যে নীড় রচনা করবে সে নীড়টিকে সাজিয়ে তুলবে সর্বোত্তম সুদৃশ্য এবং আরামপ্রদ উপকরণে। প্রিয়ার মনে সেই প্রত্যাশা জাগে—নিশ্চয় জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই এই মহানগরীর জীবনযুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে এবং নিজের সহায়হীন শক্তিকে স্মরণ করে মাথা নত করে সরে যায় পবস্পরের কাছ থেকে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রিয়ার অপেক্ষা প্রিয়েরই বেশি। নারীর ভয় দূর করে পুরুষ, তার সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় পৌরুষে। এই লজ্জা আজ আত্মগ্লানি হয়ে বিমলকে পীড়িত করে তুলেছিল। সে বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছে—কেন সে পিনাকীর অরুণার হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়ার মতো বেরিয়ে পড়তে পারলে না, কেন সে লাবণ্যকে নিয়ে ওদের মতো বাসর পাততে পারলে না আকাশের তলায়? মনের এই অবস্থায় সবচেয়ে অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই স্থানটি। মানুষের কুৎসামুখর রটনা কাল থেকে যে প্রখরতর হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল না। আরও লাবণ্য এখান থেকে অপমানিত হয়ে চলে যাওয়ার পর এ স্থানটিও তার ভাল লাগছে না। এ ছাড়া আরও আছে।

তার মাসিক আয় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশে উঠেছে। সে এখন স্বচ্ছন্দে মাসিক পাঁচটাকা ভাড়ার ঘর থেকে আট-দশ টাকা ভাড়ার ঘরে যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত ভদ্র পল্লী—টিনের চালের পরিবর্তে—পাকা ছাদওয়ালা ঘর দশ টাকায় নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

ঠিক এই কারণেই চিঠিখানা পেয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার জন্যই উঠে পড়ল। বললে—চলুন।

শিল্পী হীরু সেন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিদগ্ধ সমাজের মানুষ, বর্তমানে সে সমাজের গণ্ডীকেও অতিক্রম করে ফিল্ম ডিরেক্টর হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। হীরু সেনের চেহারায় শিল্পজনোচিত একটা ছাপ আছে। পোশাকে—চুলছাঁটায়—চোখের দৃষ্টিতে এই ছাপ তিনি সযত্নে পরিচর্যা করে ফুটিয়ে তুলেছেন। সিগার মুখে হীরু সেন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। নূতন একখানি ছবির জন্যে তিনি এক মাড়োয়ারী প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। সেই ছবির কথা ভাবছিলেন তিনি।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তিনি বিমলের দিকে তাকিযে বললেন—এসেছেন আপনি? ভাল হয়েছে। আমি কাজ আরম্ভ কবতে চাই কাল থেকে।

বিমল ঠিক এই ধরনের পরিচয়-ভূমিকাহীন আলাপ প্রত্যাশা করে নাই। সে বললে—প্রদোষবাবু আমাকে লিখেছেন—

বাধা দিয়ে হীরু সেন বললেন—হ্যাঁ আমি তাকে বলেছিলাম। আপনার একটা লেখা আমি পড়লাম, ভাল লেগেছে আমার।

বিমল বললে—ও গল্প থেকে ছবি কি ভাল হবে বলে মনে করেন আপনি?

—না। ও গল্প থেকে ছবি নয়। গল্প আমাব নিজের। গল্পটাকে ডেভেলপ করে ডায়লগ দিয়ে লিখবেন আপনি। আমি আপনাকে ডিরেকশন দেব অবশ্য। কাল থেকেই লেগে যান আপনি। এই দেখুন গল্পটা।

একখানা ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজে ইংরাজীতে টাইপ করা এক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গল্প। একটি ধনী তরুণ তার তরুণী বান্ধবীকে নিয়ে মোটরে গেছে পল্লীভ্রমণে। সেখানে মোটর খারাপ হলো। গাডিটা থেমে গিয়েছিল একটা গাছের তলায়। সেখানে গাড়িটা মেরামত করছে ছেলেটি, এমন সময় গাছ থেকে লাফিযে পডল একটি মেয়ে। নিছক পল্লীবালা। সে গাছের উপরেই ছিল—কাঁচা আমের লোভে উঠেছিল, এমন সময় এসে থামল গাড়ি, গাড়িটা যখন অনেকক্ষণ নড়ল না তখন সে না লাফিয়ে করে কি! সেই মেয়েটিই তাদের রাত্রে দিল আশ্রয। তারপর আরম্ভ হলো প্রেমের দ্বন্দ্ব। একদিকে পল্লীবালা, অন্যদিকে আধুনিকা, মধ্যস্থলে ধনী তরুণ। অবশেষে অবশ্যই জয় হলো পল্লীবালার। তারপর মিলন।

বিমল পডছে গল্পটা এমন সময় হীরু সেন বললেন—আমি এই এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম একটা Chese দিয়ে open করলে কেমন হয়! মনে করুন ওই গ্রাম্য মেয়েটি একেবারে full of vigour প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ মেয়ে তো—ও

ধরুন, আম পাড়তে গিয়ে একটি গ্রাম্য ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে মারলে এক চড় তার গালে—তারপর সে তাকে করলে তাড়া, মেয়েটি দৌড়ুল খাল ডিঙিয়ে বেড়া টপকে—ছুটল—এসে পড়ল একেবারে গাড়ির সামনে। শহরের সোফিস্টিকেটেড মেয়েটি আঁতকে পা পিছলে একটা খানায় পড়ে গেল। শহরের ছেলেটি মানে নায়ক রাগে লাল হয়ে গ্রাম্য মেয়েটিব সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি হেসেই খুন। খিল খিল করে হাসি—রুপোর ঘণ্টার আওয়াজের মতো হাসি। বুঝতে পারছেন—ছেলেটির মুখে রাজ্যের তেল-কালি লেগেছে আর কি!

বিমল অবাক হয়ে হীরু সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হীরু সেন বলেই চললেন—তাঁর কল্পনার কথা। বললেন—কোন কিছু লিখবার আগে কল্পনায় দেখে নেবেন—ছবিটা কেমন হচ্ছে। ভিসুয়েলাইজ করতে হবে। এই ভিসন না থাকলে ছবির কাজ হয় না।

বিমল এবার গল্প লেখা ফুলস্ক্যাপখানি নামিযে রেখে বললে—এই ধরনের গল্প আমি কখনও লিখিনি।

—লিখুন। লিখতে শিখুন। Film-এ এই হলো গল্পের ধারা। আপনাদের সাহিত্যের ধারা—ওই যে সব তত্ত্বকথা—ও সব ছবিতে চলে না। আমরা ধরি মানুষের আদিম অস্তিত্বকে, I mean individual-কে। Individual life-এ আছে শুধু Sex আর Hunger; Hungry People ছবি দেখে না। তাই ছবিতে Sex-টাই হচ্ছে বড। অবশ্য সাহিত্যেও Sex-এর স্থান ছোট নয়—ওই হলো আদিরস। অর্থাৎ first; first-ও বটে foremost-ও বটে।

বিমল বলল—আমি আপনাকে ভেবে বলব।

—ভেবে বলবেন?

—হ্যাঁ। ভাবতে হবে বই কি। এ কাজ আমার শক্তিতে কুলোবে কি না, রুচিতে ঠিক খাটবে কি না—ভেবে দেখে আপনাকে জানাব।

হীরু সেন তাব মুখেব দিকে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে বইলেন; তারপর বললেন—কিন্তু সাহিত্য কবে বাঁচতে হবে আপনাকে। এই শহরে থেকে শুধু সাহিত্য করে জীবিকার্জন কবা অসম্ভব। সুতবাং এই রকম একটা পথ আপনাকে নিতে হবে। খবরের কাগজেব চাকবি অথবা কিছু—অথবা এই film-এর কাজ। এ দিকে opening পাওয়া সহজ নয। পযসা এই দিকেই আছে। তা ছাড়া এই নতুন শিল্পটাকে আপনারা এসে যদি উন্নত করতে পারেন তবে সাহিত্যের চেয়ে অনেক বড় কাজ হবে। এক বছরে- -বিশ বছরের কাজ হতে পারে। একটা জাতকে গড়ে তোলার দাযিত্ব স্বীকার করতে হবে আপনাকে।

এ সব কথার জবাব দেবার ইচ্ছা হলো না বিমলের।

হীরু সেন বললেন—অবশ্য এই ছবির কাজে আপনাকে টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না আমি। কারণ contract হযে গেছে already। পরের ছবিতে আপনাকে পাইয়ে দেব। এ ছবিতে কোন উপায় নেই। আপনাকে আসতে হবে পর্যন্ত—মানে

ট্রাম-বাস ভাড়া পর্যন্ত আপনার। আমার এখানে দশটায় খেয়ে-দেয়ে আসবেন। ছ'টা পর্যন্ত কাজ। এর মধ্যে দু' চার কাপ চা আপনি পাবেন। তারপর হেসে বললেন—আমি খুব খোলাখুলি কথা বলি বিমলবাবু। আপনি অনেক কিছু প্রত্যাশা করবেন, শেষে আশাভঙ্গে আমার উপর দোষ দেবেন—এমন অস্পষ্টতা রেখে আমি কথা বলি না, বুঝলেন ?

বিমল হেসে ঘাড় নাড়লে। ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে সে বুঝেছে। এ কথা সে ঘরে ঢুকেই যেন অনুমান করেছিল। হীরু সেন নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার জ্বালিয়ে নিলেন—তারপর বললেন—তা হলে কাল থেকে লেগে যান। এ ট্রেনিং আপনার জীবনে কাজে লাগবে। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেই সব শিখে নিলে আপনার worth বাড়বে।

বিমল নমস্কার করে বললে—আমি তা হলে আসি।

—কাল দশটা থেকে, বুঝেছেন ? হীরু সেন জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন চুরুটটা। ওটাতে আর ধোঁয়া বের হচ্ছিল না।

বিমল ঘরের দরজার গোড়ায় এসে পড়েছিল, সে এতক্ষণে একটা বিড়ি খাওয়ার তাগিদ অনুভব করলে, পকেট থেকে বিড়ি বের করতে করতেই বেরিয়ে এল হীরু সেনের ঘর থেকে। নীচের দরজা অতিক্রম করে পথে নেমে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

হীরু সেনের কথাবার্তায় সে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছে। কৌতুক অনুভব করাই উচিত ছিল—কিন্তু তা অনুভব করা সম্ভবপর হয়নি। হীরু সেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার চোখে পড়েছে হীরু সেনের চারপাশের অবস্থা। গৃহসজ্জার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দারিদ্র্যের জীর্ণতার পরিচয় বিমলের চোখে পড়েছে। সবচেয়ে পীড়া দিয়েছে ঘর এবং সিঁড়ির পাশের দেওয়ালগুলি। পেরেকে কণ্টকিত দেওয়ালগুলি ময়লা থান কাপড়পরা দরিদ্র মেয়ের বৈধব্য-দশার মতো সকরুণ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে বিমলের চোখে। বিমল অনুমান করতে পারে শিল্পী হীরু সেনের সমৃদ্ধির সময় এই প্রত্যেক পেরেকে টাঙানো ছিল ভাল ভাল ছবি। কত নাম-করা বিদেশী শিল্পীর আঁকা ছবি, দেশের খ্যাতনামা শিল্পীর ছবি, হীরু সেনের নিজের আঁকা ছবি। সেগুলির আর একখানিও অবশিষ্ট নাই। কোথায় গিয়েছে সে অনুমান করতে বিমলের দ্বিধা হলো না। ঠিক এই কারণেই হীরু সেনের পারিশ্রমিক দিতে অক্ষমতার কথা শুনে সে বিস্মিত হয়নি। ঘরে ঢুকেই যেন অনুমান করেছিল অর্থকরী স্বাচ্ছল্যের প্রত্যাশা এখানে নাই।

খানিকটা দূর এসেছে এমন সময় পিছন থেকে তাকে কেউ ডাকলে। ফিরে দাঁড়াল বিমল। হীরু সেনের যে অ্যাসিস্ট্যান্টটি তার কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল—সে-ই এগিয়ে এল। বললে—উনি আবার আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

—বলুন।

—একটা কথা বললেন উনি। মানে ডিসিপ্লিনের জন্যে। ডিসিপ্লিনের জন্যে ওঁর সামনে smoke করা উচিত নয়।

বিমল স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—তার মানে?

অ্যাসিস্ট্যান্টটি বললে—ওঁর ঘর থেকে বের হবার সময় বিড়ি বের করেছিলেন।

—হ্যাঁ করেছিলাম।

—সেই জন্যেই কথাটা বলে দিলেন উনি।

—কিন্তু আমি তো—ওঁর কাজ আমি এখনও নিইনি। আর নিলেও উনি যখন কোন মাইনে দেবেন না—তখন মাইনে নেওয়া লোকের মতো আনুগত্য উনি প্রত্যাশা করেন কি করে?

অ্যাসিস্ট্যান্টটি এই উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সে হতভম্ব হয়ে গেল। কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না।

বিমল বললে—আপনি ওঁকে বলবেন, আমি এ কাজ করতে পারব না।

বাসার দরজায় এসে সে বিস্মিত হলো।

গোপেনদা বসে আছেন—প্রায় ফুটপাথের উপর। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্লটের সীমানা নির্দেশক C.I.T. লেখা একটা পাথরের উপর চুপ করে বসে আছেন। বিমলকে দেখেই বললেন—কোথায় গিয়েছিলে?

বিমল বললে—সিনেমা ডিরেক্টর হীরু সেনের লোক এসেছিল।

গোপেনদা তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন। বললেন—সিনেমা করতে যাচ্ছ? সর্বনাশ করল ওই সিনেমাগুলো।

বিমল ঘরের দরজা খুলে বললে—ঘরে আসুন। চা খাবেন?

—খাব। নিয়ে এস চা।

দাদার দোকান থেকে কেটলী করে চা এনে কাপে ঢেলে গোপেনদাকে এগিয়ে দিয়ে বললে—তারপর কি হুকুম বলুন।

গোপেনদা বললেন—প্রশংসা করতে এসেছি। তোমার গল্পটা খুব ভাল লেগেছে। মিহিরের বাবাকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছ সেইটের কথা বলছি। আর—। বিচিত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিমলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আমাদের একটা কাগজের ভার নিতে হবে তোমাকে। তুমি সমাজের সংঘাতটা ধরেছ। তাই তুমি কাগজের ভার নিলে আমি ভরসা করতে পারি। আমরা কিন্তু কোন টাকাকড়ি দিতে পারব না।

বিমল বললে—আপনাকে ভেবে বলব দাদা। কয়েকদিন আমাকে সময় দিন।

—কয়েক দিন?

—আমার মন চঞ্চল হয়ে রয়েছে এই হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো—এখানে থাকা আমার পক্ষে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটা বাসা বা মেস দেখে উঠে যেতে চাই।

—একটা মেস আছে। সেখানে থাকবে? সেখানে ছোট্ট একটা কুঠরী একা পেতে পারবে। সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

—কোথায়?

—বউবাজারে। তবে বাড়িটার একদিকে থাকে কয়েকঘর বাঈজী, অন্যদিকে মেস। যাবে সেখানে?

চৌদ্দ

বউবাজার স্ট্রীট। কলেজ স্ট্রীট এবং সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুয়ের মধ্যবর্তী অংশ। এরই উপর উত্তরদিকে প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি। ঠিক সামনে প্রকাণ্ড বড় একটা গির্জা। এ বাড়িটাও বিখ্যাত বাড়ি। এককালে এটাই ছিল বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সারভেন্টে'র আপিস। নিচের তলাটায় সবটাই এখন গুদাম, ঠিক রাস্তার উপরের ঘরখানাকে দু'ভাগ করে একটাতে হয়েছে জুতার দোকান, অন্যটা হলো আসবাবের দোকান। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বাড়ি, প্রায় মাঝখানে সিঁড়ি, তাই পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ বউবাজার থেকে বাড়িটায় ঢুকতে গেলে একটা গলির মধ্যে দিয়ে গিয়ে সদর দরজা পেতে হয়; সদর দরজার মুখেই কাঠের প্রশস্ত সিঁড়ি। বাইরে দরজার সামনে খানিকটা উঠানের মতো খালি ইটে বাঁধানো জায়গা, তার তিন দিকে বস্তীর ঘরের মতো সারি সারি ঘর; এখানে থাকে যত রিক্সাওয়ালা। উঠানে থাকে রিক্সাগুলি, খুপরীর মতো ঘরগুলিতে থাকে রিক্সাওয়ালারা।

দোতলায় ছ'খানা, তেতলায় ছ'খানা—বারোখানা ঘরে মানুষ বাস করে। প্রায় মাঝখানে সিঁড়ি, সুতরাং সিঁড়িই বাড়িখানাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। ঘরগুলি সাধারণ মাপের ঘর নয়, প্রকাণ্ড হল এক একখানি। দোতলায় তেতলায় রাস্তার দিকের চারখানি ঘরেই থাকে বাঈজী। বাঁয়ের অর্থাৎ পিছনের দিকে দুই তলায় চার-চার আটখানা ঘরে মেস হয়েছে। আটখানা ঘরে চারটি মেস। চারতলায় অর্থাৎ ছাদের উপর কাঠ দিয়ে তৈরি সারি সারি খুপরী ঘর, মেস এবং বাঈজীদের রান্না হয় এখানে, আরও কয়েকটা খুপরীতে থাকে কয়েকটি কৃশ্চান, যাদের ব্যঙ্গ করে সাধারণত বলা হয় চুনা গলির ফিরিঙ্গি।

বিমলকে মেস দেখাতে এনেছিল মিহির। গোপেনদা ভার দিয়েছেন মিহিরের উপর। দোতলার দুটি মেসের সঙ্গেই গোপেনদার সংযোগ আছে। একটি মেস সাধারণ মেস অর্থাৎ নানা ধরনের লোক এখানে থাকে। দালাল, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, একটু স্বচ্ছল অবস্থার কেরানী, দু' তিন জন অবস্থাপন্ন ছাত্র, গোটা দুয়েক বাড়তি জায়গাও আছে—মধ্যে মধ্যে মেসবাসীদের আত্মীয় বন্ধু আসেন—দু'দিন চারদিন থাকেন, আবার চলে যান। খাওয়া-দাওয়া ভাল, অল্প দামের হলেও খাট টেবিল চেয়ার নিয়ে আসবাবপত্র মেসের পক্ষে মূল্যবান বলতে হবে। সপ্তাহে তিনদিন রাত্রে ফাউলকারী, তিনদিন মটন, একদিন রাবড়ী। দিনে মাছ ছ'দিন—তাও ইলিস, রুই, ভেটকি প্রভৃতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে—এর উপরে মধ্যে মধ্যে আসে তপসে। একদিন দিনে পায়েস

মিষ্টি, রাতে নিরামিষ। অধিবাসীদের বিচিত্র গতিবিধি—শেয়ার মার্কেট ডালহৌসি তো কর্মক্ষেত্র, এছাড়া চাঙোয়া, ব্রিস্টল, মন্টিমার্লে থেকে ফুটবল মাঠের গ্যালারী, ফিল্ম স্টুডিয়ো এবং থিয়েটারের গ্রীনরুম পর্যন্ত যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়। সিগারেট ছাড়া বিড়ি এ মেসে নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে কড়া আইন আছে। এদের মেসের কর্তৃপক্ষের মধ্যে দু'একজন আছেন যাঁরা গোপেনদার ভক্ত, গোপেনদার সংকেত বহন করে নিয়ে যে আসে—তাঁরা তৎক্ষণাৎ সমাদরের সঙ্গে আত্মীয় পরিচয়ে ওই বাড়তি সিটে স্থান করে দেন। আত্মীয়ের খরচ নিজেরাই বহন করেন। প্রয়োজন হলে আত্মীয়কে টাকাও ধার দিয়ে থাকেন। মেসে টেলিফোন পর্যন্ত আছে। ম্যানেজারের নামে আছে, আগন্তুকের সম্পর্কে প্রয়োজন হলে গোপেনদার কাছ থেকে নির্দেশ আসে, প্রয়োজন হলে এঁরাও জেনে নেন ব্যক্তিটি সম্পর্কে এঁদের কর্তব্য।

বিমলের থাকবার ব্যবস্থা এ মেসে করেননি গোপেনদা, তা হলে মিহিরের আসবার প্রয়োজন হত না, তিনি টেলিফোনে বলে দিতে পারতেন। বিমল সম্পর্কে একটু বিচিত্র ধরনের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। সেই কারণেই মিহিরকে আসতে হয়েছে। বিমল থাকবে চারতলার ছাদের ওই সারিবন্দী রান্নাঘর ও ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের ঘরেরই একপাশের একটা ঘরে। ঘরখানা বাড়িওয়ালার নিজের প্রয়োজনে লাগে বলে ভাড়া দেওয়া হয় না। বাড়ি মেরামতের সময় ঘরটায় চুন-সিমেন্ট থাকে, প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠ, ইলেকট্রিক লাইনের কেসিং, তার, জাল, রঙ এই ধরনের জিনিস রাখা হয়, মেরামতের পর পড়ে থাকে রঙের খালি টিন, ভাঙা দরজা-জানালার দু' একটা টুকরো, পুরানো ইলেকট্রিক লাইন কেসিংয়ের অংশ, বাতিল সুইচবোর্ড, জলের পাইপের টুকরো, ক্ষয়ে যাওয়া জলের কলের কক; আরও দু' চারটে জিনিসও থাকে। মেরামতের পর কিছু দিন থাকে—তারপর ক্রমে ক্রমে জিনিসগুলি কমতে শুরু হয়। বাড়িওয়ালার দারোয়ান, সরকার এরা কিছু বিক্রি করে দেয়, মেসের ঠাকুর, চাকর এবং ওই ফিরিঙ্গি বাসিন্দারাও জানালাটা বিচিত্র কৌশলে খুলে—আঁকশি দিয়ে কতক কতক বের করে ঘরখানাকে পরিষ্কার করে ফেলে। বাড়িওয়ালা এ সবই জানেন কিন্তু—জুতো পরলে নখের কোণের ব্যথার মতো এ হলো বাড়ির মালিকানি সত্ত্বর অনিবার্য উপেক্ষণীয় ব্যাধি—এ নিয়ে কোনদিন প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে তিনি চেষ্টা করেন না। বাড়িওয়ালা কলকাতার প্রাচীন সম্পত্তিশালী বংশের সন্তান, স্বাভাবিকভাবেই মিহিরদের বাড়ির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে। আছে বলা অবশ্য ভুল, ছিল বলাই ঠিক। প্রবীণ বাড়িওয়ালা মিহিরকে চেনেন—স্নেহও করেন, সেই পরিচয়েই মিহির অনেকবার এসে এই ঘরখানি দু' মাস চার মাসের জন্য ভাড়া পেয়েছে। ভাড়া দশটাকা। ভাড়ার গোলমাল আজও কখনও হয়নি। সুতরাং মিহির এসে বললেই চাবিটি তার হাতে দিয়ে বলেন—ঘর বোধ হয় পরিষ্কারই আছে, দু' চারটে ভাঙা টিন কি কাঠের টুকরো থাকলে এক কোণে ঠেলে দিয়ো। অসুবিধে হলে—বের করে ফেলে দিয়ো, কেউ-না-কেউ বিক্রি করে দেবে।

মিহির ঘরখানা খুলে দিয়ে বললে—নেহাত খারাপ নয়, আপনি যেখানে ছিলেন—তার চেয়ে ভাল হবে। ঘরখানা বড়ও বটে।

—গৌরবে তো অনেক বড়। চারতলা।—আলো চাই—চাই মুক্তবায়ু। দাবিটা ষোল আনা মিটে গেল। হাসলে বিমল।

মিহির চকিত হয়ে বললে—ঘরখানা কি— ? মিহির অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ। রসিকতা, কৌতুকের অংশ তার জীবনে অত্যন্ত কম। তার উপর সদ্য পিতৃবিয়োগের আঘাতে সে স্বল্প অংশ আরও স্বল্প হয়ে গিয়েছে।

বিমল বললে—না-না। এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে—অন্তত বাংলাদেশের একজন নামহীন নূতন লেখক—এর চেয়ে ভাল কি কল্পনা করতে পারে বলুন? আমি ওটা রসিকতা করলাম।

এবার মিহির একটু হাসলে, বললে—আমি প্রায় মা কালীর মানসিক অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। একটু চুপ করে থেকে বললে—জীবনে আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছি না বিমলবাবু। এমন জটিল সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আপনি তো আমাদের বাড়ির কথা জানেন। আবার একটু হাসলে সে। হেসে বললে—বাবাকে নিয়ে যে গল্পটা লিখেছেন ভারী ভাল লেগেছে আমার। এর মধ্যে আমি কয়েকবারই পড়েছি। যখনই বাবার জন্য মন খারাপ হয়—গল্পটা পড়ি। যাক চলুন, এইবার আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দি।

দোতলার দ্বিতীয় মেসটায় বিমলেব খাবার ব্যবস্থা করেছে মিহিব। প্রথম মেসটার সঙ্গে বিমলের কোন সম্বন্ধ থাকে এ গোপেনদা চান না। তাঁর নিজের দলগত কোন সাবধানতা এর মধ্যে আছে কি নেই সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। সে নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেও বিমলের নিজের কাছেই নিজে অপরাধ অনুভব করে। মিহির বললে, ওদের সংশ্রবে আপনি পড়েন—এটা গোপেনদা চান না। ওদের কথা তো বলেছি আপনাকে। ওদের অধিকাংশ হলো snob, আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তা ছাড়া ওদের মেসেব চার্জ বেশি। এ মেসটা গরীব কেরানীদের মেস, চার্জ কম, এদের সাহিত্য সম্পর্কে অনুবাগ স্বল্প কিন্তু সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা করে। সাহিত্যিকেরা যে ওদের চেয়ে পণ্ডিত এটা ওরা বিশ্বাস কবে ধনীব ভাগ্যের মতো। আপনাকে বিরক্ত করবে না, তর্ক করবে না, বড জোর দু' চারখানা বই পডতে চাইবে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গল্প শুনতে চাইবে। হয তো আধুনিক নামকরা লেখকের কথাও শুনতে চাইবে। তবে একটি বিষযে সাবধান করে দি। কদাচ গোপেনদার নাম করবেন না কি কোন বিপ্লবী কর্মীর নাম করবেন না, তা হলে আপনাকে আর কাজকর্ম করতে দেবে না।

একটু থেমে হেসে আবার বললে—এবং গোটা কলকাতায় রটিযে দেবে যে, সাহিত্যিক বিমলবাবু উপরে সাহিত্যিক হলেও ভিতরে ভিতরে সাংঘাতিক অ্যানার্কিস্ট, টেররিস্ট, রেভল্যুশনারিস্ট, যেটা জিভের ডগায় আসবে বলে দেবে। আপনার সম্পর্কে গৌরব করেই বলবে, তার ফলে যদি পুলিশ আপনাকে ধরে তবে আপনার উপর

শ্রদ্ধা বাড়বে। কিন্তু শুধু যদি সার্চ করে ক্ষান্ত হয় তা হলে বিপদ, তখন আপনাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে।

বিমল বললে—জানি।

মিহির মেসের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, সকল ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেল। মেসটির সঙ্গে মিহিরের জানাশুনা বা যোগাযোগ বিচিত্র। ম্যানেজার তাকে খাতির করলে বাড়িওয়ালার মতো, অফিস-মাস্টারের মতো। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস এটি। মফঃস্বলের কোন ধনী ব্যবসায়ীর মালিকানা প্রতিষ্ঠান। হরেক রকম ব্যাপার। অর্ডার সাপ্লায়িং, স্টিভাডোর, কয়লাখনি, কন্ট্রাকটরি, ব্যাঙ্কিং এবং ইনসিওরেন্স। জন তিরিশেক কর্মচারী সমস্ত বিভাগের কাজ চালায়, তার মধ্যে বিশ জন থাকে এই মেসে। বাকি দশ জন কেউ বা বাসা করে থাকে, কারও বাড়ি কলকাতায়, কেউ কেউ অন্য মেসে থাকে। এই মেসের বাড়িভাড়া দেওয়া হয় আপিস থেকে, ঠাকুরের বেতনও আপিস দেয়। আপিস থেকে আরও একটা টাকা পাওয়া যায়—গেস্ট চার্জ হিসাবে,—তার জন্য মফঃস্বল থেকে মালিকের কর্মচারী যারা আসে—তারা থাকে খায়—চলে যায়। কোন বাইরের লোক নেওয়া সম্পর্কে আপিস থেকে নিষেধ আছে; তবে মিহিরবাবুর বন্ধুর সম্পর্কে স্বতন্ত্র কথা। বাড়িওয়ালার মতো এই প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গেও মিহিরদের পরিচয় পরিবারগত; মালিকদের একটি ছেলেও মিহিরের বন্ধু, সুতরাং পার্থিব জ্যামিতিক নিয়মানুযায়ী মিহির মালিকের পুত্রের মতোই শ্রদ্ধেয়। এবং মিহিরই এই ঘর দু'খানি ভাড়া করে দিয়েছে আপিসের মালিককে।

ম্যানেজার বললেও সে কথা—দেখুন দিকি, আপনার বন্ধুলোক—তার সম্বন্ধে কথা আছে? তা বেশ! খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললেন—তা ছাড়া উনি শুধু খাবেন আমাদের এখানে। থাকবেন তো আলাদাই, আমাদের মেসে তো থাকছেন না। তা বেশ!

মেসটি প্লেন লিভিংযের একটি চরম দৃষ্টান্তস্থল। দেওয়াল ঘেঁষে মাথার দিকে বাঁ পাশে একটি বা দুটি সুটকেশ—তাব পাশে মেঝের উপরেই মাদুর বা সতরঞ্চি বিছিয়ে সিট। আসবাব দূরের কথা—কাপড়-জামা রাখবার ব্যবস্থা এখানে দেওয়ালে পেরেক পুঁতে।

খাওয়ার ব্যবস্থা—ভাত ডাল তরকারি দুটো—আর দু'খণ্ড মাছ—তার সাইজ একেবারে মাপা। এর উপরে আপন আপন ব্যবস্থা যার যেমন খুশি করতে পারে, করেও। কয়েকজনই সকালে চা খেয়ে ফেরার পথে নিয়ে আসে চার পয়সার দই, সন্ধ্যায় ফেরার সময় চার পয়সার বা ছয় পয়সার রাবড়ী। দু' তিনজন আছে, তারা মধ্যে মধ্যে রেস্তোরাঁ থেকে কোয়ার্টার ডিশ কারী এনেও খেয়ে থাকে। মাসে একদিন হয় মেসবরাদ্দ মাংস। যাই হোক, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পাইস হোটেলের অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা থেকে অনেক ভাল; আরও একটা সুবিধা হলো—পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ—উভয় বঙ্গের লোকের রুচির দ্বন্দ্বের আশ্চর্যরকম একটা মীমাংসা আছে

এখানে। লঙ্কা এখানে পরিমিত। তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কার বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বাজাব থেকে কাঁচা লঙ্কা আসে যথেষ্ট, পরিমিত ঝালের বেশি ঝাল যার পক্ষে রুচিকব—সে যতগুলি ইচ্ছে কাঁচা লঙ্কা পাবে। এদিক থেকেও বিমল খানিকটা আরাম পেলে। শুধু অসুবিধা হলো একটি। দিনেব বেলা দশটা বাজামাত্র এখানে রান্নাঘবে অলক্লিযাব বেজে যায়। মেসেব ঠাকুব আপিস থেকে মাইনে পায় সাধারণ ঠাকুর থেকে ছ-সাত টাকা বেশি, তাব জন্য দশটা বাজতেই তাকে বের হতে হয় আপিসের কাজে।

একটু অসুবিধা স্বীকাব কবেই তাবও মীমাংসা হযে গেল। স্থিব হলো খাবাব ঢাকা দিযে সে উনোনেব উপব বেখে যাবে। বিমল প্রযোজন মতো নিজে নামিয়ে নেবে। চাকব একজন আছে, কিন্তু তাব ছোঁযা-নাড়া এ মেসে অচল। ম্যানেজাব নিজে জাতিতে সদ্গোপ এবং আব এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোব —যাব-তাব ছোঁযা নিজেবাও খান না, অন্য কাউকেও খেতে দেন না। এ বিষযে তাঁদেব পক্ষে আছে প্রবলতম সমর্থন যাকে অন্য কেউ উপেক্ষা কবতে সাহস কবে না। মালিকপক্ষেব সমর্থন আছে। মালিক ঠিক নয়, মালিকেব গৃহিণী এবং মালিকেব পুত্রেব। এবা দু'জন গোঁড়া হিন্দু। মালিক নিজে এসব মানে না। গৃহিণী স্বামীকে সংশোধন কবতে না পেবে পুত্রকে নিজেব মতো কবে গড়ে তুলেছে এবং তাদেব আযত্তাধীনে বযেছে বিশ্বসাম্রাজ্যেব যে খণ্ডটুকু তাব উপব চালিযেছে এই পাত্র সংস্কাব আন্দোলন। তবে যদি কেউ বাইবে অখাদ্য খায বা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচাব না কবে তাব জন্য আইনেব কোন কড়াকড়ি নেই। এমন কি কেউ যদি চাকব মাবফৎ ফাউল কাবী কি এগ্‌পোচ আনিযে বান্নাশালাব সঙ্গে সম্পর্ক না-বেখে খায তাতেও নিষেধ নাই। কাবণ সাম্রাজ্যবাদী হলেও যুগ এবং স্থান সম্পর্কে তাদেব চেতনা যথেষ্ট আছে। এটা বিংশ শতাব্দী এবং কলিকাতা মহানগবী। এখানে চাকবি গেলে মানুষ কষ্টে পড়ে কিন্তু আবাব পায এবং চাকবি গেলেই চাকবে মালিকে তফাৎ থাকে না। মেসেব ঘব ভাড়া, ঠাকুবেব মাইনে এই দুটো দিযে সংস্কাব আন্দোলন ওব বেশি আব চালানো যায না। শুধু বান্নাঘব উনান এবং বাসন সম্পর্কে আইন সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতবাং এ অসুবিধাটুকু স্বীকাব কবে নিলে বিমল।

ম্যানেজাব বললে—দেখবেন মশায, কেউ থাকবে না বলে চাকবকে ছোঁযানাড়া করাবেন না।

বিমল হেসে বললে—না। সে বিষযে নিশ্চিন্ত থাকুন। সে আমি কবব না।

—হ্যাঁ। ভদ্রলোক আপনি। তাব উপবে লেখক মানুষ—আপনি কববেন কেনে এমন ? তবে—। একটু চুপ কবে থেকে বললে, আপনাকে তো বলতে হবে না, পাপ মানে না আপন বাপ, ঠিক একদিন দাঁত বাব করে আপন চেহাবাটি 'দেখাযে' দেবে। প্রকাশ হযে পড়বেই।

ম্যানেজাবেব বাড়ি বর্ধমান জেলাব আসানসোল সাবডিভিশনে। বাঁকুড়াব সীমাব কাছাকাছি। ম্যানেজাবেব গুপ্তচব আছে। ওই যে তিনটি কালো মেম থাকে

এখানে—তাদেরই এক বৃদ্ধা ম্যানেজারের চর। বুড়ীকে সকলে আদর করে ম্যাগী বলে ডাকে। কথাটা মাগী। য-ফলার নেকটাই পরিয়ে চতুর রূপান্তরে কথাটাকে সাহেবী করে নেওয়া হয়েছে। ম্যানেজার ওকে বলে 'আন্টি' অর্থাৎ 'মাসী'। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ম্যানেজার রান্নাঘরে রান্নার তদ্বির করতে এসে আন্টির সঙ্গে গল্প করে। আন্টি তিনটে ভাষা জানে—ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা। তিনটেতেই সমান দখল। ম্যানেজারের পর্যায়ের বাঙালীরাও ঠিক ওই তিনটে ভাষা জানে এবং এক বাংলা ছাড়া বাকি দুটোতে ওই ম্যাগীর সমান দখল। সুতরাং কথাবার্তায় কোন অসুবিধা হয় না।

বুড়ীর সঙ্গেই প্রথম আলাপ হলো বিমলের। এখানেই একখানা তক্তপোশ, দুটো সেল্‌ফ, একখানা সস্তা ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ার কিনে ঘরখানায় আস্তানা পেতে ফেললে। মনোহরপুকুর রোডের জিনিসগুলো চিত্তর জিম্মায় রেখে এসেছে, সেগুলো সে তার সুবিধামতো একদিন পৌঁছে দেবে। লরীর ব্যবসায় আছে, লরী যেদিন এ অঞ্চলে ভাড়া পাবে সেদিন বোঝাই মালের সঙ্গে ত র সেই পুরনো সোফা আর চেয়ার- -এই দুটোকে শাকের আঁটির মতো এনে ফেলে দিয়ে যাবে। মেসের চাকরটার নাম পঞ্চানন, নিরীহ ধরনের মানুষ—বয়সে প্রৌঢ় [illegible] সাহায্য করলে। তার হাতে একটি সিকি দিয়ে বিমল ইজি চেয়ারটায় [illegible] মহানগরীর চারতলায় উপর কপাল তৃপ্তি নিয়ে বসে পড়ল। মনে মনে ধন্য [illegible], প্রণাম জানালে গোপেন দাদাকে।

বুড়ী ম্যাগী বারকয়েক তার সামনে দিয়ে পায়চারি করে অবশেষে তার কাছে এসে দাঁড়াল। গুড ইভনিং।

বিমলও প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে উঠে পড়ল।

বুড়ী বললে- —লিভ ইন দ্যাত রুম। [illegible] বুড়ী ম্যাগীর একটিও দাঁত নাই। চুলগুলো শনের নুড়ি হয়ে গেছে। [illegible] ধরনেই একটা ছোট লাটুর মতো গোজা খোপা বেঁধেছে। পরনে রঙীন [illegible] ঝুলে পা পর্যন্ত লম্বা সেমিজের মতো একটা জামা। গাউন সেমিজ যা খুশি [illegible] তাই বলা যায়। পায়ে একটা ছেড়া নেকড়ার চটি।

এর পর বুড়ী গল গল করে একগঙ্গা কথা বলে গেল। তার অল্প কয়েকটা বিচ্ছিন্ন শব্দ ছাড়া বিমল আর কিছু বুঝতে পারলে না। বিপদে পড়ল সে। ইংরিজীতে সে পারদর্শী নয় কিন্তু কাজ চালাতে কষ্ট হয় না, ইংরিজী বইও পড়েছে, তার মধ্যে গ্রাম্য প্রাকৃত চরিত্রের মুখের ভাষা—ডন্ নো জাতীয় সংলাপ পড়ে অনায়াসেই বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে তার দেশের অনুরূপ জনের মুখের 'মুই জেনে না' কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই মহানগরীর এই স্তরের কালো সাহেবদের সঙ্গে তার পরিচয় নূতন—তায় বুড়ী দন্তহীন, তার কথা অনুধাবন করা তার সাধ্যাতীত মনে হলো।

বুড়ী কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলিকে প্রকট করে বললে—অ্যাংলি ? গেতিং অ্যাংলি ?

এবার বিমল বুঝলে কথাটা। বুড়ী ধরে নিয়েছে বিমল তার কথা শুনে কষ্ট হয়ে নিরুত্তর রয়েছে। সে মিষ্ট করে বললে [illegible] নো—নো।

—নো ?

—না। বাট্ ইউ'ল প্লিজ এক্সকিউজ মি, আই অ্যাম সরি, আই কাণ্ট ফলো ইউ।

বুড়ী ব্যস্ত হয়ে উঠল, নো নো। নো ফলোয়িং ? বলেই সে তাড়াতাড়ি আপন ঘর থেকে একটা মোড়া এনে সামনে বসে বললে—ইউ সিত দাউন। মাই রুম বেরী দার্তি।

বিমল বুঝলে বুড়ী 'ফলো' কথাটা অন্য ভাবে ধরেছে। সে আবার বললে, আই কাণ্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ। তারপর হিন্দী করে বললে—সমঝমে নেহি আতা !

বুড়ী হেসে সারা হয়ে গেল। তারপর নিজের মুখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—নো তিথ ! বেরী ওল্ড। তারপর বিচিত্র বাংলায় বললে—বাংলা বুলি জানে। বাংলা বাত বোলো মহাশা। বলেই আবার হেসে খুন।

বিমলও হাসলে। বুড়ী আশ্চর্য রকমের অনাবিল হাসি হাসছে। বিমলের মনে তার স্পর্শ সংক্রামিত হয়েছে। হেসে বিমল বললে—বাঃ, তা হলে তো খুব জমবে। বাংলা জানেন আপনি ?

—জানে না ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে বুড়ী ; তারপর হেসে চুপি চুপি বললে—জানে। বোলে না।

—কেন ? বলেন না কেন ?

বুড়ী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বললে—সাহিব পিপিল দোস্ত লাইক ইত। দে হেত ইত। নেতিব নেতিব।

বিমল হাসলে। বুড়ী সত্য কথা বলেছে।

বুড়ী আবার বললে—ইউ হেত আস।

বিমল চমকে উঠল। বুড়ী ঠোঁট উলটে ক্ষোভের সঙ্গে বললে—মেস বাবুজ কল মি ম্যাগী। হামি জানে মহাশা ম্যাগী কিস্‌কে বোলে ! হঠাৎ ঘাড় নেড়ে বললে, বুড়ী মাগী বালী যাবি ? দি মাগীজ লিভ হিয়া, বিলো বিলো। হাতের আঙুল নীচের দিকে করে দেখিযে বাববার বুঝিযে দিলে বাঈজীদের কথা বললে সে। অর্থাৎ ম্যাগী কথাটার অর্থ সে জানে। তারপব বললে—ম্যানেজার দ্যাত ফেলা কল মি 'অস্তি' মাছী মাছী ? আই নো, নো ! হাসলে সে।

বিমল লজ্জায় নীরব হয়ে বসে রইল।

বুড়ীও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—পুওল উয়োম্যান। নো বদি ইন্ দি ওয়ালদ্। আই স্মাইল—লাফ। হাত দুটো উল্টে দিলে সে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বুড়ী বললে, ইউ দু হোয়াত ? কোন কাম করেন মহাশা। বিজিনেস ?

বিমল বললে—আই অ্যাম এ লিটারেটিওর। নভেলিস্ট।

—হোয়াত ?

—নভেলিস্ট, স্টোরি রাইটার। আই রাইট নভেলস, শর্ট স্টোরিস—

—তোরিজ নভেলস্? বুড়ীর বার্ধক্যম্লান হলুদ রংয়ের স্তিমিত চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।—ইউ রাইত স্তোরিজ? হোয়াত স্তোরিজ? ঘোস্তস?

—নো নো। আই রাইট স্টোরিজ অব রিয়েল লাইফ।

—ইউ গেত মনি? দে গিভ ইউ মনি?

—ইয়েস।

বুড়ী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—আই হ্যাভ নো মনি। আই নেভা বাই বুকজ! আই দোন্ত রিদ বুকজ! গত্ ওনলি ওয়ান বুক—হোলি বাইবেল! দোন্ত রিদ ইত। তাচ্ ইত্ অনদি হেদ। বুড়ী মাথায় হাত দিল। তারপর বুকে হাত দিয়ে বললে—অন দি ব্রেস্ত! কিস্ ইত।

বিমল বললে—হোয়াই ডোন্ট ইউ রিড ইওর হোলি বাইবেল?

—কান্ত রিদ। কান্ত সি। অলমোস্ত ফরগতন রিদিং। উদাসভাবে সে চেয়ে রইল সম্মুখের কলকাতার প্রাসাদশীর্ষময় শূন্যলোকের দিকে। সূর্য পশ্চিমের দিগন্তে বোধ হয় ঢলে পড়েছে। পশ্চিমে ডালহৌসি স্কোযারেব চারতলা-পাঁচতলা বিশাল বাড়িগুলির অন্তরালে দিগন্ত দেখা যায় না। জেনারেল পোস্ট আফিসের গম্বুজ, চার্চের মিনার, লাটসাহেবের বাড়ির গম্বুজ দেখে ওগুলিকে চেনা যায়। স্টেটস্ম্যান আপিসের পাশে ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথায় কালো গোলকটাকে দেখা যাচ্ছে। এদিকে জোড়া গির্জেব মাথা দেখে চেনা যায়। বউবাজার ধরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সামনে পূর্ব দিকে শেয়ালদার মোড়ে আর একটা গির্জে দেখা যাচ্ছে। এদিকে অর্থাৎ উত্তরে মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে।

মধ্য কলকাতার বউবাজার।

কলকাতার প্রাচীনতম স্থান। ইংরেজ মহানগরী নির্মাণকালে কি কল্পনা করেছে তার নিদর্শন এখানে চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। ওই গির্জের মাথা, বউবাজারের পাশে চার-চারটে গির্জের চূড়া। বিমলের সামনে বসে রয়েছে—

বুড়ী উঠে পড়ল হঠাৎ। বললে—আই গো নাও। আই গো। ইউ আর এ গ্রেত ম্যান। রাইত বুকজ! গেত মনি। গ্রেত ম্যান। ইওর নেম? আপনার নাম কি মহাশা—

—বিমল মুখার্জী।

—বিমল? গুড, বেরী সুইত। বেরী সুইত!

—এক্সকিউজ মি ইওর—

—মাই নেম? বুড়ী হেসে বললে—কল মি ম্যাগী অর অন্তি। দে অল কল মি দ্যাত।

বিমল বললে—নো। আই শ্যাল কল ইউ মা-মি।

মুহূর্ত কয়েকের জন্য বুড়ী যেন কেমন হয়ে গেল। তারপর আবার আগের মতোই বললে—ইয়েস। এনি নেম ইউ লাইক। দ্যাতস গুড। ইউ কল মি মা-মি, আই কল ইউ মাই সন্। দ্যাতস গুড। বলতে বলতে সে সকচিত হয়ে উঠল। সিঁড়িতে

জুতোর শব্দ উঠছে। একজন নয়, দু'জন-তিনজনও হতে পারে। বুড়ী ব্যস্ত হয়ে বললে অ—কেটি কামিং উইদ ফ্রেন্দস। অ—টি নট রেদি। অ—

ঠিক পরক্ষণেই এসে দাঁড়াল একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী কালো মেমসাহেব। তার সঙ্গে—বিমল বিস্মিত হলো—ডিরেক্টর হীরু সেনের দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পনের

হীরু সেনের সহকারীদের সহজে চেনার উপায় ছিল না। ওরা বিমলকে দেখে না চমকালে বিমল হয়তো ওদের চিনতেও পারত না এবং চিনতেও চাইত না। একেবারে বউবাজার অঞ্চলের ম্যাগী ও কেটিদের গোষ্ঠীর খাঁটী পিটার-গোমস সেজে এসেছে তারা। শুধু অবস্থাটা একটু ভাল বলে মনে হয়। সম্ভবত ফিল্ম কোম্পানির মেকআপ রুমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলেই সাজসজ্জা, ভঙ্গি এমন নিখুঁত হয়েছে। বিমলকে দেখে ওরা চমকে উঠতেই বিমল ওদের দিকে ভাল করে তাকালে। মনে হলো চেনামুখ। উপরের দিকটা অর্থাৎ কপালের উপর ফেল্ট হ্যাট বেশ একটু বেশি করে বেঁকিয়ে টানা থাকায় এবং চোখে রঙীন চশমা থাকায় উপরের দিকটা চেনা বলে মনে হয় না। কিন্তু নীচের দিকটা দেখে চেনা মনে হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওদেরই একজন হেসে টুপিটা কায়দা করে খুলে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে বললে—গুড্ ইভ্নিং মিস্টার মুকুজী? তারপরই সে চোখের চশমাটা খুলে ফেললে। তার দৃষ্টান্তে অপরজনও টুপি চশমা খুলে একটু হেসে বললে—আপনি এখানে?

বিমল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ওদের দু'জনের হাসি এবং প্রশ্নের অন্তর্নিহিত রঙ্গ বা ব্যঙ্গকৌতুকের সরসতা বাক্য কয়েকটির মূল অর্থকে অতিক্রম করে আরও অনেকগুণ অর্থবান হযে উঠেছে। বিমল একটু হেসে বলতে গেল—আমি এখানে ক্ষণিকের বা দুই দণ্ডের অতিথি নই—আমি—। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করলে, শুধু বললে—আমি এখানকার বাসিন্দা হয়েছি সম্প্রতি। নিজের ঘরখানা দেখিযে বললে—এই ঘরখানাই আমার বাসা এখন।

দু'জনেই ওরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। বিমল বললে—বসবেন? কিন্তু আমার ঘরে বসতে দেবার মতো আসন আর নেই।

একজন একটু ঢোক গিলে বললে—না। ব্যস্ত হবেন না আপনি।

ম্যাগীর মতোই কেটি বাংলা বুঝতে পারে। সে সবই বুঝছিল। প্রথমটায় বন্ধুদের সরস ব্যঙ্গ-কৌতুকে উদ্বুদ্ধ হতে দেখে সে অধিকতর সরস কিছু প্রত্যাশায় ঠোঁটের চাপের মধ্যে মৃদু হাসি শিথিল যোজনায় যোজিত করে প্রতীক্ষা করছিল। প্রত্যাশা করছিল এরা এইবারই বুঝি বলে—লেট মি ইনট্রোডিউস সুইট কেটি টু আওয়ার ইন্টিমেট ফ্রেন্ড এন্ড কমরেড। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ গিল্টী চটা সীসের বাটের মতো পরিণতি লাভ করতেই সে ভ্রূকুঞ্চিত করে গম্ভীর মুখে গট গট করে নিজের ঘরে গিয়ে দরজার তালা খুলতে খুলতে সরু গলায় চিৎকার করে উঠল—ম্যাগি! এ! ডোন্ট ইউ হিয়া—র? ম্যা গি!

বুড়ী নিজের ঘরের ভিতর থেকেই চিৎকার করে উঠল—হো-য়া-ই দু ইউ? ন্যাকড়া দিয়ে একটা ডিশ মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে এল। কেটি ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকেছে। বুড়ী খুব রেগে গেছে—সে নিজের জরাজীর্ণ দেহখানাকে অন্তরের ক্ষোভের তরঙ্গে আন্দোলিত করে অঙ্গ দুলিয়ে কেটির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।—হো-য়া-ই দু ইউ তক লাইক দ্যাত? মি এ মেদ সারবেন্ত? এঁ?

বুড়ীর সঙ্গে বিমলের গ্রামের কুঁদুলী পাঁচী পিসীর কোন পার্থক্য নাই।

হীরু সেনের সহকারীদের একজনের নাম রতু রায়, অপরজনের নাম মণ্টু বোস। রতুর আসল নাম রতন হলেও হতে পারে, মণ্টুর নাম অনুমান করার উপায় নাই। চিত্রজগতে ওই ধরনের কাটাছাঁটা নাম এক। স্টাইলও বটে এবং প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপনও বটে। সে কথা থাক। ওদের দু' জনের মুখেই একটু একটু ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে বললে—কেটিকে আমরা ছবিতে নেব। একটা ফিরিঙ্গী নার্সের পার্টে নামাব। হাসতে লাগল রতন রায়।

মণ্টু বোস বললে—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়। কিন্তু কতক্ষণ? পিসী যদি পাতের কাছ থেকে না ওঠে? আমি ওসব ভালবাসি না।

রতু বললে—এই মণ্টু!

—ও—নো। শুনুন স্যার। আমরা কেটির এখানে বেড়াতে এসেছি। আমাদের গার্ল ফ্রেন্ড; আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন! ডোণ্ট ড্রিঙ্ক মিল্ক উইথ ঝিনুক—। রাগ করবেন না যেন।

বিমল বললে—না-না। রাগ করব কেন? বেশ তো বান্ধবীব কাছে এসেছেন—তাতে—

বুড়ী কেটির সঙ্গে কথা শেষ করে গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরে গেল—হাউলিং—বার্কিং লাইক এ বিচ। কলিং মি ওল্‌দ উইচ—ইউ ব্ল্যাক ক্যাত—। ইউ দতার অব এ সোয়াইন—হালামজাদী—এক লোজ তুমি সমঝেগা।

বুড়ী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। টং—টং ঠং—ঠং শব্দে ঘরখানাকে মুখরিত করে তুললে। খুব ক্রুদ্ধ হয়েই কাজ করে যাচ্ছে বুড়ী। কাপ-ডিশ নামাচ্ছে—সাজাচ্ছে।

কেটি বুড়ীর গালাগালির জবাব দিল না কিন্তু তীক্ষ্ণস্বরে এদের দু'জনকে বললে—উইল ইউ কাম ইন অর টক ননসেন্স উইথ হিম অল দি টাইম?

মণ্টু বোস ঘরে গিয়ে ঢুকল। রতু বললে—আপনি এখানে কেন বাসা নিলেন স্যার? এত জায়গা থাকতে বৌবাজারে—চামড়ার গুদোমের গন্ধের মধ্যে—বাঈজী—ফিরিঙ্গী মাগীদের মধ্যে —আমি তো অবাক হয়ে গিয়েছি!

বিমল কপালে হাত দিয়ে বললে—অদৃষ্ট বলতে পারেন অথবা মহানগরীর আবর্তের আকর্ষণ বলতে পারেন। বাঈজীর কথা জানতাম—তারা একপাশে থাকে—মেস একপাশে। কেটিদের কথা জানতাম না। অবশ্য জানলেও প্রত্যাখ্যান করতাম না।

—এদের লাইফ স্টাডি করবেন বুঝি?

—না। না। নেহাৎ স্থান সমস্যাতেই সম্ভবত অদৃষ্টের ফেরে এসে পড়েছি এখানে।

মন্টু এবং কেটি বেরিয়ে এল, কেটি এবার মাথায় একটা রঙীন রুমাল বেঁধেছে এবং ঠোঁটে গালে আর এক পোঁচ রঙ চড়িয়েছে। সে দরজায় তালা বন্ধ করে ম্যাগীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মন্টু রতুকে হাত ধরে আকর্ষণ করে বিমলকে বললে—চললাম স্যার!

কেটি আগেই গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মন্টু হেসে বললে—কেটি আপনার উপর চটে গেছে। আমাকে বললে—হোয়াই হ্যাজ হি কাম হিয়ার? বললে, সব জাগামে তুমলোক যায়েগা তো হাম লোক কাঁহা যায়েগী?

হাসতে হাসতে তারা কেটির অনুসরণ করলে। সিঁড়ি থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে—ঈ—! হোয়াট—দি—হেল—ইউ আর টকিং? ঈ—

বুড়ী বেরিযে এসে কয়েক মুহূর্ত ওই সিঁড়ির দিকে চেযে রইল। তারপর বিমলেব কাছে এসে বললে, মাই সন্। গো-অ্যাওযে ফ্রম হিয়া। ব্যাদ্ প্লেস—বেরী ব্যাদ্। দ্যাত্ গাল্—দ্যাত্ কেটি—দতাল্ অব এ সোযাইন—হালামজাদী কুত্তি। বহুত কুত্তি হিঁয়া আতা হ্যায। দে আর বেরী বেরী ব্যাদ ম্যান। দেঞ্জারাস পিউপুল। কাম উইথ বিগ নাইফ। সাম্ তাইমস্ দে দ্রাঙ্ক। দ্যাত বিচ ওয়াজ কার্সিং ইউ। আস্কড মি—হোয়াই হি হিয়া? হোযাই দিসতাববিং আস? হোয়াই '' আ—! লাইক বহুরানী অব বহুবাজার! অল, অল হাল্ ফাদাবস্ পপাটি, হাল হাজব্যান্ড পপাটি।

বকতে বকতে ঘরে ঢুকে একটা সস্তা টি-পট হাতে বেরিযে এসে বললে—লুক—লুক হিয়া মাই সন্। ওযান পত ফুল তি—অল বরবাদ।

বুড়ী ওদেব জন্য চা কবেছিল—কিন্তু কেটি বন্ধুদের নিয়ে চলে গেল, পুরো এক টি-পট চা বরবাদ হযেছে।

বুড়ী কেটির কেউ নয়। মাসীর সইয়ের বোনপো বউযেব বোনঝি কি ও ধবনের সম্বন্ধ একটা আবিষ্কৃত হয়েছে জীবনের এত তরণীতে ভাসতে-ভাসতে। বুড়ীর নেই কেউ। জীবনে সে বিবাহই করেনি। বুড়ীর আসল নাম মিস অ্যানা কুক। প্রথম জীবনটা কেটেছে বহু উন্মাদনার মধ্যে। বউবাজাব সংলগ্ন কাপালীটোলায জন্মেছিল এক কুক পরিবারে। খালি পায়ে ফ্রক পবে কাপালীটোলা বউবাজার বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে খেলা করে ঘুরে বেড়িয়েছে। কাটা ঘুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে। পাদরীদের অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে পড়েছে। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে এসপ্ল্যানেডেও হাজির হয়েছিল। সেখান থেকে ইডেন গার্ডেন—গঙ্গাব ধার—কেল্লার আশেপাশে। তখন তার বয়স ষোল-সতের। কতজনেব সঙ্গে আলাপ হযেছে, কতজন টুপি খুলে ইঙ্গিতময় চোখ-মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছে—গুড ইভ্নিং মিস—। কতজন! কেল্লার গোবাব দল—তাদেব আসতে দেখলে ও এবং ওব সঙ্গিনীরা পবস্পরেব গা টিপে বলতো—ইয়া, দে আ-কামিং দি বয়েজ! কত জেন্টিলম্যান। ওব প্রথম যৌবনকালে মটর ছিল না, ছিল ফিটন। ফিটনে যেতে যেতে—জেন্টিলম্যান মৃদু হেসে টুপি খুলে সম্মান দেখাত, ওরাও হেসে পরস্পরের দিকে চাইত; ফিটন থেমে যেত; জেন্টিলম্যান নেমে আসত;

ফিটনে বেড়াবার হোটেলে খাবার নিমন্ত্রণ জানাত। আলোকোজ্জ্বল হোটেল, স্বর্ণাভ পানীয়ভরা কাঁচের গেলাস, নরম গদীআঁটা চেয়ার, কার্পেটপাতা সরু মেঝে, দেওয়ালে-দেওয়ালে আয়নায়-আয়নায় প্রতিবিম্ব, যন্ত্রসঙ্গীতের ঐক্যতান; তুষারশুভ্র দেহবর্ণ জেন্টিলম্যানের পাশে বসে কালো মেয়েটি ভুলে যেত কাপালীটোলার এঁদো গলি, মুর্গী-কুকুর অধ্যুষিত নোংরা উঠান, ময়লা বিছানার গন্ধ, ভাঙা দাগিধরা কাঁচের বাসন, আরও অনেক কিছু। মনে হত স্বর্গে এসেছে।

কাপালীটোলা থেকে—এলিয়ট রোড, সেখান থেকে এন্টালী, এন্টালী থেকে বউবাজারের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা সেরে এসেছে এখানে। এই চারতলার ছাদের উপর সঙ্কীর্ণ কাঠের ঘরে। কেটির সঙ্গে বৎসর দুয়েক আগে আলাপ হয়েছে। পথে আলাপ, কেটির শরীর তখন খুপ খারাপ, সবে বেরিয়েছে হাসপাতাল থেকে; আশ্রয় নাই, ঘুরে বেডাচ্ছিল—ভাবছিল কোথায় যাবে। বুড়ী অ্যানার সঙ্গে দেখা হলো হঠাৎ। তাকে দেখবামাত্র ম্যাগী তার অবস্থা বুঝতে পারলে। সে তাকে ডেকে নিজের ওই ছোট কুঠুরীতেই স্থান দিয়েছিল। কিছুদিন সে-ই তাকে খাওয়ালে। এখন কেটি স্বাস্থ্য ফিবে পেয়েছে, যৌবন তার এখন পরিপূর্ণ। বেশভূষায় যথেষ্ট খরচ করেও তার কিছু অর্থ বাচে। পূর্বের উপকারের কৃতজ্ঞতাবশেই কেটি এখন ম্যাগীর কাছে খায়। বন্ধুবান্ধব এলে ম্যাগী চা দেয়, কেক বা টোস্ট করে দেয়, আগে বরাত থাকলে মুর্গীর শুরুয়াও বানিযে দেয। উদ্বৃত্ত খাবার থেকেই ম্যাগীব চলে যায়। এব জন্য যে টাকাটা কেটি তাকে দেয সে তার বাঁচে, তার থেকে ঘরভাডাটা দেয়, কেটির ঘরদোরও সে গুছিযে-গাছিযে দিযে থাকে। তা বলে সে তার ঝি নয়, সেটা সে স্নেহবশেই করে। স্নেহবশে সে কেটিকে অনেক সদুপদেশ দিযে থাকে। সুস্থ শান্ত মুহূর্তে কেটির রুখু ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দন্তহীন মুখে স্নেহের হাসি হেসে বলে—কেটি মাই ডিযাবি—ইউ নতী গাল—লিছেন মি। বে—লি ব্যাদ—দিছ্ লাইফ; নো হ্যাপিনেছ, নো পীছ্! লুক মি, দিছ্ ওলদ্ আনহ্যাপি উয়োম্যান! লুক!

বলে—কেটি এ পথে শান্তি নেইরে, সুখ নেই আনন্দ নেই, নেই কিচ্ছু নেই। আমার দিকে চেয়ে দেখ, জরাজীর্ণ বৃদ্ধা হতভাগিনী আমার দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। সমাজে সকলে ঘৃণা করে, এই বাবুরা বলে ম্যাগী—তার অর্থ বেশ্যা, বলে মাসী—তার অর্থ তরুণী বেশ্যা নিয়ে ব্যবসায়িনী বৃদ্ধা বেশ্যা। দুঃখ দেখ, আজ আমি তোর ঝিয়ের বৃত্তিই অবলম্বন করেছি একরকম। কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখ।

নিজের সেই ঝলঝলে ঘাঘরাটার প্রান্ত টেনে তাকে দেখিয়ে বলে—দার্তি র‍্যাগ! লুক।

কেটি কোন কথা বলে না, সে উপুড় হযে বুকে বালিশ রেখে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে সামনে সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চের পাশের মেহগনি গাছের সারির মাথার দিকে। কখনও কখনও চার্চের মাথায় ক্রুশটার দিকে চায়।

 ম্যাগী তাকে বলে—এব চেয়ে বিযে করে ঘর বাঁধ। তুইও রোজগার কর, স্বামীও

বোজগাব করুক। এই সেদিন আমাব ছেলেবয়সেব সই মেবী এসেছিল, এই শবীর তাব, তেতলায উঠে হাঁপিয়ে সাবা; বেশ আছে, মুখে হাসি কত! তাব কানে এই মস্ত দুটো সোনাব বলইয়াবিং। হাতে দু'গাছা কবে চাবগাছা সোনাব চুডি। ফ্রকটা দেখলাম চমৎকাব দামী ছিটেব। সিল্ক সার্টিনেব পোশাকও ওব আছে। তাব ওলদম্যানকে কত বকলে আমাব কাছে। ছেলে হয়েছে, তাবা চাকবি কবছে, মধ্যে মধ্যে কত জিনিস দেয়, টাকা দেয; বউ হযেছে, নাতি-নাতনী হযেছে। ছোট বউটা কাছে থাকে। তাব বড ছেলেটাকে নিযে বগলস আর্ট' খডম পায়ে—এই বড ঝোলা হাতে বোজ সকালে বাজাবে যায়, দুপুবে পশম নিযে মাফলাব সোযেটাব বোনে। বললে—অ্যানি, বোনাব আব বিবাম নেই আমাব। তবে দুপুবটা কাটে ভাল। ববিবাবে সুন্দব পোশাক পবে সুন্দবী নাতনীগুলোকে নিযে চার্চে যায। নাতনীবা বড হযেছে, এইতো সামনেব লবেটোতে পডে, বডটি লবেটো সেবে নার্সিং শিখছে। মেজটি এবাব শেষ কববে লবেটোব পডা। তাবপব সে শিখবে টাইপবাইটিং। কাজেব তো অভাব নাই। টেলিফোন আপিসে চাকবি, বেলেব বুকিং আপিসে চাকবি এগুলো তো আমাদেবই জন্যে। বং যাদেব কটা তাবা অবিশ্যি খাতিব বেশি পায কিন্তু চেষ্টা কবলে তোকে জোগাড কবে দিতে পাবি কিছু না কিছু। বলিস তো আমি যাই সেন্ট জেভিয়াবেব ফাদাবেব কাছে! বলি— ফাদাব, বি ম্যার্সিফুল, তেক পিতি অন এ ফলেন গাল! বিপেনতেন্ত গাল। পুযোল ক্রিচাল। ইউ ত্রাই ফব হাব। প্লিজ প্লিজ ফা দাব!

কেটি চুপ কবে শুনতে শুনতে হঠাৎ চিৎকাব কবে ওঠে, স্টপ—ইউ, ইউ উইচ আই সে, ইউ স্টপ!

— হোযাত ?—চমকে ওঠে ম্যাগী।

—ডেভিল মে টেক ইউ, ডোন্ট ইউ হিয়াব ? স্টপ, আই সে ইউ স্টপ, ইউ ওল্ড হ্যাগ, ন্যাস্টি ক্রীচাব।

ম্যাগী ক্ষেপে যায—হোযাত ?

কেটি উঠে চুলটায বাব কযেক চিরুণী বুলিয়ে জুতো পাযে দিযে হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিযে খট খট কবে বাডি ছেডে চলে যায। বাত্রে ফেবে মত্ত অবস্থায। কেউ সঙ্গী এসে পৌঁছে দিযে যায়। বুডী সঙ্গে সঙ্গে ঘবেব দবজা খুলে বেবিযে আসে। বাত্রে ওব ঘুম ভাল হয না। কেটি যতক্ষণ বাইবে থাকে ততক্ষণ ঘুম আসেই না। একটা উদ্বেগ অনুভব কবে। হযতো থানায ধবে নিয়ে গেছে। অথবা হয়তো কেটি জখম হয়েছে। কাল হাসপাতাল থেকে খবব আসবে। কিংবা হয়তো কেটিব আব কোন খববই পাওয়া যাবে না। মর্গে কযেকদিন পচবে তাবপব যা হোক কোন পবিণতি লাভ কববে। হয়তো তাব হাডগুলো কোন ডোম কোন ছাত্রকে বিক্রি কবে দেবে। সে টেবিলেব উপব তার হাত অথবা পায়েব হাড ঠুকবে আর পডবে। কেটিব আত্মা বেদনায় অঝোব ঝবে কাঁদবে! বুড়ো বযসে ম্যাগী তাব শক্তিব সঙ্গে জীবনেব সকল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে! মহানগবীব জীবন অবিবল মন্থিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষেব শাসনত্রস্ত প্রবৃত্তি গুহাব অন্ধকাবে লুকিয়ে সকল গতিকে পিছন দিক থেকে টানছে।

দুই আকর্ষণে মন্থিত হচ্ছে জীবন, মহানগরীর জীবন। অমৃত উঠছে, বিষ উঠছে। সেই বিষে জর্জরিত হয়ে ম্যাগী পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই চারতলার কাঠের কুঠুরীর কোণে। কেটি ছুটে যায় ওই বিষের প্রলোভনে। তাই তার কেটির জন্য এত উৎকণ্ঠা। তাই কেটি এত গালাগালি দেওয়া সত্ত্বেও, সে ফিরে এলেই ম্যাগী সন্তর্পণে উঠে তাকে দেখে আবার শোয়। সে মত্ত হয়ে ফিরে এলে ম্যাগী বেরিয়ে আসে নিজের ঘর খুলে, কেটির ঘর খুলে তার সঙ্গীর সাহায্যে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সঙ্গীটাকে বিদায় করে দেয়। কেটিকে প্রাণভরে গাল দেয়, মাথায় জল দেয়, বাতাস করে, সময়ে সময়ে এই সুযোগে সে তাকে দু'চারটে চড় কষিয়েও দেয়। আবার সকালে কেটি উঠলেই তার ঘরে উঁকি মেরে বলে—ফিলিং ওয়েল?

কেটি একটু হাসে। ম্যাগী বলে—ওয়াশ ইওর হেড, ফেস। আন্দাস্তান্দ?

একটু পরেই চা রুটি এনে সামনে রেখে পাশে বসে। বলে—বেলী গুড হেলথ! দ্যাতস গুড—নাউ তেক তি।

বিমল উঠল। চা খাবার সময় হয়েছে। মেসে চায়ের ব্যবস্থা নাই। দোকানে গিয়ে সকলে খেয়ে আসে। সমৃদ্ধ অবস্থার বাবুদের মেসের বাবুরাও দোকানে যায়। চায়ের ব্যবস্থা রাখলে আপিসের ভাত হয় না। তাছাড়া মোড়ের মাথায় একটি ভাল চায়ের দোকান আছে, যার আকর্ষণই হলো সবচেয়ে বড়। চা থেকে খাবারদাবার চমৎকার তৈরি করে ওরা। পরিচ্ছন্নতাও প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে আছে রেস্তোরাঁ সমারোহের নেশা, নগরজীবনের এটা একটা বিলাস। যারা রেস্তোরাঁয় ঢোকেনি তাদের প্রথম ঢুকতে বাধ-বাধ ঠেকে। ঢুকলেই আর রক্ষা নাই। সে তাকে টানবেই।

এ মেসের বাবুরা সাধারণত ও রেস্তোরাঁয় যায় না। যায় পাশের একটা রেস্তোরাঁয়। সেটার জমজমাট কম। খাবার-দাবারের দামও কিছু কম। চপ-কাটলেট দু' পয়সা, কারির ডিশ দু' আনা, মটন চপ ব্রেস্ট কাটলেট বড় কেউ একটা খায় না—তা হলেও তার দামও কিছু কম। এ ছাড়া ওখানে ঢুকে এ মেসের বাবুরা মনে মনে একটা জটিলতার পাকে পাক খেতে থাকে যেন; ঘন ঘন চারিপাশের টেবিলে তাকায়, টেবিলের অধিকারীদের সাজসজ্জা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—গিলে করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, স্যুট, রকমারি চশমা, কারও মুখে চুরুট, কারও মুখে সিগারেট, এ সব দেখে নিজেদের লংক্লথের ইস্ত্রি, লাটখাওয়া পাঞ্জাবি ও সাবানকাচা কাপড়ের দিকে চেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, চা খেয়ে বিড়ি ধরাতে লজ্জা পায়। তাই তারা পাশেরটায় গিয়ে বসে। বিমল দুটোতেই যায় অবশ্য। যেদিন যেটার উপযুক্ত সামর্থ্য তার পকেটে থাকবে, সেদিন সেটাতে গিয়ে ঢুকবে।

একবার মনে হলো বুড়ী ম্যাগীর সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থাটা করে নিলে মন্দ হয় না। তেতলা সিঁড়ি ভেঙে যাওয়া-আসা, কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হাঁটা, অনেক সময়সাপেক্ষ। পরমুহূর্তে মনে হলো—না, একান্ত বাধ্য হয়ে এদের সঙ্গে যতটুকু জড়িয়ে না পড়ে উপায় নেই তার চেয়ে বেশি জড়ানো ঠিক হবে না। বুড়ী ম্যাগীও

আশ্চর্য, পূর্ণ এক টিপট চা তার নষ্টই হলো কিন্তু বিমলকে বললে না—এক কাপ তুমি খাও।

চা খেয়ে খানিকটা ঘুরে সে ফিরল। পাড়াটাকে চিনে নিতে চেষ্টা করলে। বেন্টিক স্ট্রীট লালবাজার থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনু পর্যন্ত প্রাচীন বউবাজার এখনও টিঁকে আছে। নানা জাতের সংমিশ্রণ এখানে, অভারতীয় অনেক, অবাঙালী প্রায় সবাই। বউবাজার স্ট্রীটের দুই পাশে অসংখ্য সরু গলি একেবেঁকে চলে গিয়েছে। এগুলি যেমন সংকীর্ণ, তেমনি অপরিচ্ছন্ন, তেমনি জীর্ণ, তেমনি বিশৃঙ্খল। উর্দুভাষাভাষী মুসলমান, ম্যাগী-কেটির গোষ্ঠী ফিরিঙ্গী, চীনেম্যান, জু, ইয়োরোপের আরও অনেক দেশের অধিবাসী দু'জন একজনকে এ অঞ্চলে খুঁজলে পাওয়া যায়। পাড়ার বাড়িগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর। বিংশ শতাব্দীতে ঊনবিংশ শতাব্দী যেন এই প্রাচীন অঞ্চলটার জীর্ণ ইঁট কাঠ পাথরে জড়িয়ে পড়ে আছে। এখানকার মানুষগুলির অধিকাংশের ওই অবস্থা। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলো নিভে গিয়েছে, বিংশ শতাব্দীর আলো— তার কল্যাণস্পর্শ যেটুকু, তা পায়নি তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারকে আশ্রয় করে রাত্রির মানুষের মতো জীবনযাপন করে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ গড়তে চেয়েছিল যে কলকাতা, তারই জীর্ণ টুকরো। আন্তর্জাতির ব্যবসার ক্ষেত্র স্থাপন করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, সে স্থাপন করতে চেয়েছিল ধর্মে সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ইংরেজের একান্ত অনুগত মানুষের বসতি। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বউবাজারে চার চারটে গির্জা। গির্জার সঙ্গে কৃশ্চান এবং ফিরিঙ্গীদের জন্যে স্কুল। সে নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করে দীক্ষাগুরু হতে চেয়েছিল; ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত করে শিক্ষাগুরু হতে চেয়েছিল, আপিসে, ডকে, রেলওয়েতে, কলকারখানায় তাদের চাকরি দিয়ে তাদের প্রভু হয়েছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভু; এদের দুর্দান্তপনা শিখিয়ে পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল এবং এদের দিয়েই বাঙালীকে, বাঙালীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে দমন করতে চেয়েছিল, দাস করতে চেয়েছিল।

কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে। ফিরবার পথে থমকে দাড়াল বিমল।

ফিরিঙ্গীকালীর বাড়িতে আরতি হচ্ছে। মাটির কালীমূর্তির সামনে প্রদীপ ঘুরিয়ে আরতি হচ্ছে। কয়েকটি বুড়ো বুড়ী ফিরিঙ্গী দাড়িয়ে আছে। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে গেঞ্জী, মাথায় হ্যাট। আরতির শেষে বুড়ো বুড়ীরা চলে গেল, একজন বুড়ী একটা পয়সা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মনে মনে বিড় বিড় করে কিছু বলে তবে গেল। ছেলেগুলো এখনও ঘুরঘুর করছে। এক এক টুকরো মিষ্টান্ন প্রসাদের জন্য বোধ হয়! ফিরিঙ্গীকালী, বিচিত্র নাম, হিন্দুদের উচ্চস্তরের লোকেরা অবজ্ঞার চোখেই দেখে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থেরা প্রণামও করে না। কিন্তু তারা জানে না—ফিরিঙ্গীকালী আসলে গির্জের দরজায় দাঁড়িয়ে হিন্দুদের রক্ষাকালীর মতো যুদ্ধ করে এসেছে।

সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুয়ের মোড়ে এসে দাঁড়াল বিমল। মহানগরীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবাদের আবিষ্কারের কল্যাণে সভ্যতার মধ্যে গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার

প্রবল দাবিতে প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল মসৃণ পথ চলে গিয়েছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অভিমুখে।

আশ্চর্য! ঊনবিংশ শতাব্দীর নগরীর অংশটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা সঙ্কুচিত হয়ে পিছনে হটে গিয়েছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর দু'পাশের স্থান অধিকার করে বড় বড় প্রাসাদ গড়ে তুলেছে মাড়োয়ারী ধনীরা। ওপাশে এগিয়ে এসেছে বাঙালী উচ্চবিত্তেরা, স্বচ্ছল মধ্যবিত্তেরা। ইংরেজ ধনীর স্থলে ভারতীয় অবাঙালী ধনীরা জয়লাভ করেছে। বাঙালীর স্থান অধিকার করেছে।

পথে আরও একটি কালীবাড়ি। সেখানেও আরতি হচ্ছে। সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চের ঠিক সামনেই। চার্চের অঙ্গীভূত সেন্ট জোসেফ স্কুলের কোথাও ছেলেমেয়েরা কোরাসে গান গাইছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে। চীনে-সাহেবরা দোকানে বসে লম্বা পাইপে ধূমপান করছে আরাম করে। এই এক জাত। এদের বোধ হয় কেউ হটাতে পারবে না। ধনশক্তি, সৈন্যশক্তি নিয়ে ওরা আসেনি, ধর্ম প্রচার করতে আসেনি, চীনা সংস্কৃতি বিস্তার করতে আসেনি, এসেছে নিজেদের শ্রমশক্তি আর কর্মনৈপুণ্য নিয়ে: কারও সঙ্গে তাই মানসিক দ্বন্দ্ব নাই, কেউ ওদের শত্রু বলে গ্রহণ করেনি, মিত্র বলেও সমাদর করে স্থান দেয়নি। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ওরা নিজেদের স্থান দখল করেছে। দখল করার মধ্যে দ্বন্দ্ব করে নাই, যে স্থানটা শূন্য হয়েছে সেই স্থানটা পূর্ণ করেছে। ক্ষয়িষ্ণু ফিরিঙ্গী এবং অপসৃয়মান অপর সম্প্রদায়ের স্থান পূর্ণ করে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে বউবাজার পর্যন্ত নিজেদের প্রসারিত করেছে। মহানগরীর জীবনে ওদের কর্মনৈপুণ্যের শ্রমশক্তির স্থান অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বকর্মা এ পুরীর অন্যতম দেবতা, ওবা তার অনুচর। সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চের পিছনে এমনি আর একটি সম্প্রদায় বস্তীর অন্ধকারে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে কলরব করছে। ওড়িয়া শ্রমিকেরা।

বিচিত্র উপলব্ধি নিয়ে সে আপন ঘরে ফিরল।

মেসগুলি তখন গুলজার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বাবু মেসের সভ্যেরা ফিরছে খেলার মাঠ থেকে, চাঙোয়া থেকে, সিনেমা থেকে, এসপ্ল্যানেড থেকে। এ মেসের বাবুরা ফিরছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা শুনে, গোলদীঘির চাবিপাশে পাক দিয়ে, হাড়কাটা গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বারকয়েক টহল দিয়ে।

জনকয়েক ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখবার মতো দৃশ্য বটে। চারতলার উপর থেকে রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে বিচিত্র। মধ্যলোকে আলোর সারি। তার অপর্যাপ্ত আলোকে অস্পষ্ট রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা দীর্ঘ সরল গহ্বর পথের মতো, দ্রুত সঞ্চারমান মটরের হেডলাইট ছুটে আসছে—বেঁকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে; যেন পাতাল-পুরীতে ছুটোছুটি করতে হাজার আলেয়া।

এখানে এসে এক অদ্ভুত সত্যকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। সেই কথাটাই সে ভাবছে। কলকাতায় ইংরেজ হেরে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অংশটা প্রত্যক্ষ—তাছাড়া আরও একটা যুদ্ধ চলে আসছে কতকাল ধরে। ইংরেজ সেখানে হারছে। ইংরেজ এই পাড়াটার

উত্তর সীমানায় সেকালে একটা কেল্লা গড়েছিল। স্কুল তৈরি করেছিল, অনুগত দাস তৈরি করবার কারখানা করেছিল। সে কারখানায় তারা বেদখল হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। সেটা সবারই চোখে পড়েছে। কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু-বউবাজারের মোড়ে সে দেখে এসেছে তারা কতটা পিছিয়েছে। কথাটা সে গোপেনদাকে বলবে। মিহিরকে বলবে।

পরদিন সকালে উঠে সে এই কথাটাই লিখতে বসল।

বাইরে থেকে কে বললে—মে আই কাম ইন?

বিমল চোখ তুলে চাইলে; কেটি দরজায় দাঁড়িয়ে। সে উঠে বললে—কাম ইন। ইজিচেয়ারটা দেখিযে দিয়ে বললে—টেক ইওর সীট প্লীজ।

কেটি বললে—আই হ্যাভ সামথিং টু টেল ইউ।

—ইয়েস, আই স্যাল বি—

—নো। আই নো, ইউ আর নট প্লিজড। আই নো।

সে বসল চেয়ারে।

বুড়ী ম্যাগী—এসে মুখ বাড়িয়ে হেসে বললে—গুড মর্নিং মাই সন্! তাবপবেই সবিস্ময়ে বললে—কেটি হিযা? গ্যাড! দোস্ত কোয়াল—কেটি—দোস্ত!

কেটি বিরক্ত হলো। বুড়ী বললে—বি ফ্রেন্দ। তারপর বললে—তি? তু কাপস্ অব তি? এঁ! একমুখ হেসে সে চলে গেল।

ম্যাগী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই কেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িযে বললে—ইউ লীভ্ দিস প্লেস?

বিমল তার দিকে তাকালে। কেটিব কপাল কুঞ্চিত, চোখের কোণে একটা বিরূপতার ছাপ।

—হোযাই? বিমল স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলে।

—ইফ ইউ স্টে—নো ফ্রেন্ডস্ কাম্ হিযার—ইউ লীভ!

—না। বিমলের কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ দৃঢ়তব হয়ে উঠল। কেটি নিষ্ফল আক্রোশে নিজের ঠোঁট দুটি কামড়ে ধরলে। কণ্ঠা ফুলে উঠেছে। চোখের দু'পাশে অসহায় ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ছে। বিমল অনুভব করলে, সে থাকলে কেটির ব্যবসা করা প্রায অসম্ভব হয়ে উঠবে। নিশ্চয় রতু আর মন্টুবাবু স্পষ্টভাযায় জানিয়ে গেছে, বিমল থাকলে তারা আর আসবে না। বিমলকে এ মেস ছাড়তে হবে, নইলে তারা অন্যত্র যাবে।

কেটি অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল—ইফ্ ইউ ডোন্ট গো, আই শ্যাল কীল ইউ!

বিমল স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললে—ডোন্ট শাউট্।

তার চিৎকারে ম্যাগী ছুটে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দন্তহীন মুখব্যাদান করে প্রাণপণে সন্ধির প্রস্তাব করে—দোস্ত কোযাল—ফ্রেন্দ্—তি হিয়া—তেক—

এক ধাক্কায় কেটি চায়ের পেয়ালা দুটো ফেলে দেয়। ভেঙে টুকরো টুকরো হযে যায় কাপ দুটি। ঘবময় গড়িয়ে পড়ে সদ্য তৈরি করা গরম চা।

—আই উইল কল হামফ্রে, হী উইল স্ট্যাব হীম—হী উইল কীল হীম। কেটির কণ্ঠস্বর সপ্তম স্বরে উঠে যায়।

বিমল ভর্ৎসনার সুরে বলে, ডোন্ট শাউট্—গো নাউ।

ম্যাগী মাঝখানে এসে উভয়ের বন্ধুত্বের সেতু গড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু কেটি ডান হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে, লেখার কাগজপত্র ওলটপালট করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। পাশের ঘর থেকে তার কান্নার অস্ফুট শব্দ ভেসে আসে—ম্যাগী তার পিছন পিছন গিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে—দোন্ত কাই মাই গাল—দোন্ত কাই।

বিমল নিঃশব্দে লেখার কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগল।

—কি ব্যাপার বিমলবাবু ?

বিমল মুখ তুলে দেখলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেসের ম্যানেজার দুলু বোস। বিমলের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

ষোল

খাঁটি বাঙালী ঘরের মেয়ে কেটি। ধর্মে কৃশ্চান অথচ খাঁটি বাঙালী বিমলের অজানা নয়। এঁদের অনেককে জানে। এঁদের দু' তিনজন তরুণ সাহিত্যিককেও সে জানে। নিজের দেশেও সে এঁদের দেখেছে। সে ঘরের মেয়ে? কেটির নাম কেতকী? সে বি-এ পর্যন্ত পড়েছে? শিক্ষিতা মেয়ে? তার এই পরিণতি? বিমলের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অবিশ্বাস করবারও উপায় ছিল না। শেষ কয়েকটি কথা কেটি খাঁটি বাঙলায় বিশুদ্ধ বাঙালী উচ্চারণে বলে গেল।—বোস থামতেই সে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলে—তারপর?

—তারপর? একটু দুঃখের হাসি হাসলেন বোস। সে হাসিটুকু তাঁর মুখে লেগেই রইল, বললেন—তারপর কেতকী থেকে হলো কেটি, শাড়ি-ব্লাউজ ছেড়ে ফ্রকগাউন পরলে, চুলের লম্বা বেণী কেটে ফেলে বব করলে, কপালে কুমকুমের টিপ ছেড়ে লিপস্টিক রুজ ধরলে। ধাক্কা খেতে খেতে এখানে এল, নিয়ে এল ওই ম্যাগী। ম্যাগী অবশ্য ওর আসল পরিচয় জানে না, সে ওকে নিজেদের জ্ঞাতিগোত্রই মনে করে। কেটি ওদিক দিয়ে পাকা অভিনেত্রী, আজও এক আমার কাছে ছাড়া বউবাজার অঞ্চলে আর কারও কাছে ধরা পড়েনি।

বিমল প্রশ্ন করে বসলে—আপনি ওকে ধরলেন কি করে? প্রশ্ন করেই সে লজ্জিত হলো। বললে—মাফ করবেন আমাকে—প্রশ্নটা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

বোস হেসে উঠলেন। বললেন—কিছু অন্যায় হয়নি। যতটা বলেছি তাতে যে কেউ হোক এ প্রশ্ন করতই। প্রশ্নটা এড়াতে গেলে কথাটা পাড়াই উচিত নয়। এ কথা গোপেনদা, মিহিরবাবু জানেন। আর আপনাকে বলছি। একসময় সন্দেহ হয়েছিল মেয়েটা পুলিশের স্পাই। আমাদের মেসটার সঙ্গে গোপেনদার সংশ্রব সন্দেহ করে তারাই একে এখানে পাঠিয়েছে। আমাদের মেসটার বিচিত্র ধারা-ধরনের কথা জানেন তো।

বিমল ঘাড় নেড়ে জানালে—সে জানে।

বোস বললেন—আমার জন্যেই এটা হয়েছে। আমার পরিচয়টা বলি শুনুন। পয়সাওলা বাপের ছেলে, আমার নাম দিলীপ ঘোস, ছেলেবয়সে সকলে ভাল ছেলেই বলত। স্বাস্থ্য দেখছেন তো, এমনি স্বাস্থ্য আমার ছেলেবয়েস থেকেই; তার উপর দুর্দান্ত মারহাত্যা আর ফুটবল ক্রিকেট হকিতে ভাল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলাম। পড়াশুনাতেও কোনবার ফেল করিনি। কাজেই গোপেনদাদের দল আমার উপর হাত দিলে। আমারও তরুণ বয়স, আমিও ঝুঁকে পড়লাম। তারপর কলকাতার কলেজে এলাম। তিরিশ সালে জেলও ঘুরে এলাম। তাবপর বছর খানেক ডিটেনশনে। সেখান থেকে আবার কলেজ। গোপেনদারা তখনও ডিটেনশনে। কলেজে ঢুকে, মানে ল কলেজে, খেলায় মাতলাম। বাস, কেরিয়ার খুলে গেল। কলেজের টিম থেকে নামজাদা বড় টিমে ঢুকে গেলাম। আমার সেন্টাব-হাফেব খেলা দেখে ছেলেরা হিরো বানিযে ফেললে, মেয়েরা প্রেমে পড়ে গেল, দিলীপ বোস থেকে নাম হয়ে গেল দুলু বোস।

—আপনিই খেলোয়াড় দুলু বোস ?

হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বোস বললেন—আপনি মশাই নেহাৎ গোঠছাড়া সাহিত্যিক। সাহিত্যিকদের খেলা দেখার বাতিক বিখ্যাত। খেলাব মাঠে বেলা দুটো থেকে তাঁরা বসে থাকেন, এখনও থাকেন বোধ হয়। সাহিত্যিকদের কাছে আমার পবিচয় দিতে হয় না। দেখলেই তাঁরা আমাকে চিনতে পারেন।

বিমল লজ্জিত হলো, বললে—খেলা আমি বড় একটা দেখি না, কিন্তু তবু আপনাকে চেনা উচিত ছিল আমার। আপনার ছবি অনেকবার দেখেছি।

—ছবি ? হো-হো করে হেসে উঠলেন দুলু বোস। ছবি দেখে না চেনার জন্যে নিশ্চয় আপনার অপরাধ নেই। ছবি যারা তোলে তারা আমাকে এমন সুপুরুষ বানিয়ে তোলে যে সে ছবি দেখে আসল আমাকে চেনাই যায় না।

বিমলও হেসে ফেললে।

ম্যাগী উঁকি মারলে এবার—মিস্তার বোস।

বোস মুহূর্তে পাল্টে গেলেন—ভুরু কুঁচকে বাংলাতেই বললেন—কি ?

—ওয়ান ওয়াদ। ওনলি ওয়ান ওযাদ। প্লিজ!

বোস তাকে ধমকালেন, বললেন—বাংলা, বাংলাতে বলো ম্যাগী।

ম্যাগী ঘরের দোবে দাঁড়িয়ে মিনতিভরে বললে—কেটির পর বহুত গোসা আপনি করবেন না বোসবাবু। আনফরচুনেত গাল।

—হ্যাঁ। হতভাগী! সে তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু আজকের ও কেলেঙ্কারিটা তুমি বাঁধালে কেন! ঝগড়ার জন্য তুমিও দায়ী।

—ফর দিস—মুকুর্জী, বোসবাবু, মুকুর্জীবাবুর লিয়ে। মুকুর্জী হামকে বললো মামী। আপনা বেটার মতুন ভালবাসলোঁ আমি। বোসবাবু, কেটি মুকুর্জীকে উপর গোসা করল। কাল রাতে মাতোয়ারা হয়ে আসলো, বহুত গাল দিলো মুকুর্জীকে। হামকে বললো হামফ্রেকে ডাকবে। আজ সকালে উ নিজুসে মুকুর্জীর ঘর। আই থট

বোসবাবু—দিস ইজ যাস্ট দি টাইম, কেটির সাথে মুকুর্জীর দোস্তি লাগাইয়ে দি। বাট্। হতাশ ভাবে সে ঘাড় নাড়লে। সি ইজ তেরিবল। আই কুদ নত রেজিস্ত মাইসেফ্। দ্যাতস মাই ফল্ত। মাই ফল্ত বোস, দোন্ত গেত অ্যাংরি উইথ পুযোর কেটি।

বোস হাসলেন। বললেন—আচ্ছা আচ্ছা। কেটিকে কিছু বলব না, তুমি যাও।

—প্লিজ, বোসবাবু প্লিজ! ম্যাগীর যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, আবারও সে মিনতি করলে।

—হ্যা। হ্যাঁ আমি কথা দিচ্ছি ম্যাগী। তুমি জান আমি কথার খেলাপ করি না। যাও, তুমি এখন যাও।

দন্তহীন মুখে তোষামোদের হাসি হেসে ম্যাগী বললে—আই নো, আই নো দ্যাত বোসবাবু। ইউ আ এ ম্যান অব ওযার্দ। এ ম্যান উইথ এ বিগ হাত, আই নো। চলে যেতে যেতে সে আবার ফিরে দাঁড়াল, বললে—তি?

—না না। তুমি যাও এখন ম্যাগী। দেখছ না কথা বলছি আমরা।

ম্যাগী চলে গেল। বোস বললেন—গরীবের জাতও নেই, ধর্মও নেই বিমলবাবু। ও যখন বলছিল—কেটির সঙ্গে মুখার্জীর ভাব করিয়ে দি, তখন আমার মনে পড়ে গেল শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের মোক্ষদা ঝিয়ের কথা। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীব পরিচয় করিযে দেওযাব সঙ্গে এর তফাৎ কোথায বলুন ত! যদি ভাব হত আপনার সঙ্গে কেটির—তবে দেখতেন ও মদ খেতে চাইত, এবং মদ খেযে চিৎকার করত যে মুকুর্জিব কাছে কেটির অ্যান্টি হিসেবে টাকা আদায করে তবে মদ মুখে তুলেছি। কোন তফাৎ নেই।

বিমল বললে—ম্যাগী কিন্তু কেটিকে সত্যিই ভালবাসে।

—তা বোধ হয় বাসে।

—বোধ হয? সন্দেহ করেন আপনি!

—খানিকটা।

—কেন বলুন তো!

—কেন! হাসলেন বোস। বললেন—কেটির দৌলতে আজ ওর ভাত জুটছে বিমলবাবু। কেটির নাগরদের কাছে টিপস্ই হলো ওব প্রধান উপার্জন। কেটি ওর কাছে খায়—লোকজন এলে চা-কেক-রুটি দেয়—তার থেকেই ওর আহার সংস্থান হয়। কাজেই কেটিকে ভালবাসার কতখান ওর প্রয়োজনের খাতিরে, কতখানি অকৃত্রিম এ কথা বলা শক্ত।

বিমল হেসে বললে—প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ মানুষের কাছে আসে দিলীপবাবু, তারপর প্রয়োজনের মেলামেশার মধ্যেই ভালবাসার শুরু হয়।

—অস্বীকার করি না। কয়লার মধ্যে শুনেছি হীরে পাওয়া যায়। কয়লাই কোন যাদুতে হঠাৎ খানিকটা জায়গায় হীরেতে পরিণত হয়। কিন্তু সে কদাচিৎ। আমার অভিজ্ঞতা অনেক। যাক ওসব কথা। এখন যা বলছিলাম। কি বলছিলাম! হ্যাঁ, কেটির কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলছিলাম। বলার খানিকটা দরকার আছে।

দিলীপ বোস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

—দিলীপ বোস দুলু বোস হয়ে গেল বিমলবাবু। খেলার পিছল মাঠে দৌড়ুতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেলাম। খেলায় স্লিপ জানেন তো, পড়ে তেমনিভাবে পিছলে একেবারে এসে খানায় পড়ে গেলাম বিমলবাবু। এমন বদঅভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে সে অভ্যাস আর কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দুলু বোস বললে—সব হারালে সব পাওয়া যায় বিমলবাবু—চরিত্র হারালে আর বোধ হয় পাওয়া যায় না। যারা দু'-চারজন পায় তারা অসাধাবণ। গোপেনদার মতো এমন ব্যক্তিত্ব এমন চবিত্র—তিনি ডিটেনশন থেকে ফিবে এসে আমায় শোধরাবার জন্যে অনেক করলেন—কিন্তু—। হতাশভাবে ঘাড নাডলে দুলু বোস—গোপেনদার চেষ্টাও ব্যর্থ হযেছে, দুলু বোস তার নিষ্কলুষ আত্মাকে ফিরে পায়নি।

—তবে এই কলুষ কাজে লাগল অন্য দিকে। ল কলেজে পডলাম বছর পাঁচেক—পবীক্ষা অবশ্য দিলাম না। তারপর আরম্ভ কবলাম ব্যবসা। দালালী। এই বদঅভ্যাসগুলো মূলধনে দাঁডাল। এক এক সময় নিজেই আশ্চর্য হযে ভাবি—মা লক্ষ্মী এই অনাচার সহ্য কবেন কি করে! অথচ প্রায় গোটা ব্যবসার ক্ষেত্রটাই যেন এই অনাচারের ইঙ্গিতে চলছে। ধরুন—নতুন কন্ট্রাক্ট পেতে হবে, আপিসেব বড সাহেবকে পার্টিতে নেমন্তন্ন করে আপ্যাযিত করতে হবে। পানীয না হলে পার্টি হয় না, তার সঙ্গে প্রচার নৃত্য দেখতে হয।

হাসলে দুলু বোস।

বিমল একটু চুপ কবে থেকে বললে—জীবনে সংসারী হবার চেষ্টা কবেন না কেন দিলীপবাবু?

নিভে-যাওযা সিগারটা আবার ধরিযে দুলু বোস উপরেব দিকে মুখ তুলে ধোঁযা ছেড়ে বোধ হয় ভেবে নিয়ে উত্তর দিলেন—সংসারে কোন মেযেকে দু' দিনেব বেশি তিন দিন ভালবাসতে পারি না বিমলবাবু। প্রথম দিন নেশা ধরায়, তাবপর দিন সে নেশায উন্মত্ত হয়ে উঠি, দু'দিন তাকে ভালবাসাব ভানে ভোগ করাব পব তৃতীয দিন সকালে সে নেশার একবিন্দু আব অবশিষ্ট থাকে না। নিজের উপরেও ঘৃণা জন্মে যায দিন কয়েকের জন্যে, সে কযেক দিন কৃচ্ছ্রসাধন কবি, তাবপব আবাব মেতে উঠি, নূতনের নেশায।

বিমল বললে—এ সম্ভবত এক ধরনেব ব্যাধি।

—তাতে সন্দেহ নেই। এ থেকে আমার পরিত্রাণ নেই বিমলবাবু। যাক্ – তাবপর শুনুন। গোপেনদা হাল ছেড়ে দিলেন। আমি নিজেই গোপেনদাকে বললাম—আমার উপর আর পণ্ডশ্রম করবেন না। তবু গোপেনদা সংশ্রব ছাড়লেন না। এই মেস করে দিলেন। বললেন—একটা উপকাব হবে আমার। কারও গা-ঢাকা দিয়ে থাকার দরকার হলে—নিরাপদেই থাকতে পারবে। সামনে বাঈজীরা থাকে, মেসের বাসিন্দারা রীতিমত বাবু লোক, মালিক দুলু বোস—চট্ করে নজর কাবও পড়বে না। এখানকার বিখ্যাত গুণ্ডারা খেলোয়াড দুলু বোসকে জানে—তার গায়ের শক্তি, ঘুষির জোবেব

কথাও জানে, টাকাপয়সার ব্যাপারে দিলদরিয়া মেজাজের কথাও জানে, ভালবাসে, ভক্তি করে, ভয়ও করে; কাজেই তারা আমাকে জানায় কে কোথায় উঁকিঝুঁকি মারছে। এই অবস্থায় একদিন ম্যাগী নিয়ে এল কেটিকে। রোগা—কালো মেয়েটাকে প্রথমে গ্রাহ্য করিনি। কিছু দিন যেতেই মেয়েটি স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে আমাদের সচকিত করে তুললে। মিহিরবাবু এখানে আসেন যান—তিনিই প্রথম বললেন—দিলীপবাবু, এ ফিরিঙ্গী মেয়েটা তো সন্দেহের কারণ হয়ে উঠল। আমার পিছনে ঘুরছে। সেইদিন সন্ধ্যের সময় আমি চৌরঙ্গীতে একটা হোটেলে ঢুকছি—দেখলাম মেয়েটা হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে—লক্ষ্য আমি। মিহিরের কথাটা মনে পড়ে গেল। সন্দেহ হলো, মেয়েটা বোধ হয পুলিশের স্পাই। মিহির আসে, আসে অবশ্য বাড়িওয়ালার বন্ধুপুত্র হিসেবে, ঘর ভাড়া দেওয়া-নেওয়ার অজুহাত নিয়ে। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণ। দুলু বোস আজকাল প্রতিটি সন্ধ্যা হোটেলে গেলাস রেখে বসে থাকে, ট্যাক্সিতে তাকে তরুণী সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখা যায় কিন্তু একদিন সে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিল। পুলিশের সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। মেয়েটা ফিরিঙ্গী, ঘুরছে মিহির এবং আমার পিছনে, কাজেই ওই কথাটাই মনে হলো। হোটেলে ঢুকলাম, কেটিও ঢুকল, সারাক্ষণ আমাকেই লক্ষ্য করলে। আমি উঠলাম, ও-ও উঠল, বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠছি, কেটি পিছনে এসে দাঁড়াল। বললে—আমায় একটু সঙ্গে নেবে? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে কঠিনভাবেই বললাম—কেন বল তো? ও বললে—আমাকে কি তুমি চিনতে পারছ না? আমরা একই বাড়িতে থাকি। আমায় সঙ্গে নিলে একসঙ্গেই বাড়ি ফিরতে পারব। উপেক্ষা করেই চলে এলাম। ট্যাক্সিটা ছাড়ছে সেই সময় ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ জ্বলছে। এসে জগুকে বললাম, জগু-গুণ্ডাকে চেনেন তো? এখানে কালীতলায় সিঁদুরের টিপ পরে বসে থাকে। সে আর করিম—এরা দু'জন হলো এ অঞ্চলটির মালিক। ওদের বললাম—ওর পিছনে থেকে খবর নিতে। খবর জগুয়া দিতে পারলে না—দিলে কেটি নিজেই। কয়েকদিন পর একদিন রাত্রে—ম্যাগীর চিৎকার আর হুটোপুটির শব্দ শুনে ছুটলাম ছাদে, দেখলাম একটা অ্যাংলোইন্ডিয়ান কেটিকে নির্মমভাবে ঘুষির পর ঘুষি মেরে চলেছে। আমি তাকে ধরলাম, সে আমাকে আক্রমণ করলে—লোকটা শক্তিমান কিন্তু মাতাল, আমি শক্তিতে তার চেয়ে কম ছিলাম না—তার পর সেদিন পানীয় পান করেছিলাম মাত্রা রেখে। লোকটা কয়েক মিনিট পরেই শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে ভাল করে দেখলাম লোকটাকে, চেনা লোক, ফুটবলের মাঠে হামফ্রেও নামকরা হাফব্যাক। মারামারিতে সিদ্ধহস্ত। আমার সঙ্গে মাঠে দু'-দশবার শক্তি-পরীক্ষা হয়ে গেছে; হামফ্রেও আমাকে চিনলে। বললে—বোস তুমি? তুমি এখানে? সে মার্জনা চেয়ে নেমে চলে গেল। আমি নীচে নামতে যাচ্ছি, কেটি এসে আমার হাত ধরলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটু মায়া হলো বিমলবাবু। ঘরে এসে বসলাম। মেয়েটা হঠাৎ পরিষ্কার বাংলায় বললে—বোস তুমি এত নিষ্ঠুর কেন?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি বাংলা এত ভাল বলতে পার?

কেটি বললে—আমি কেটি নই বোস—আমি কেতকী। আমি কৃশ্চান কিন্তু ফিরিঙ্গী নই। আমি বাঙালীর মেয়ে।

সতের

দুলু বোস কাঠের দেওযালের ছোট জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে— সেদিন ছিল শরৎকালের জ্যোৎস্নার রাত্রি। কেটি বললে—বোস, তুমি পাঁচ মিনিট বস। ম্যাগীর ঘবে গিযে কযেক মিনিট পলে সে ফিরল—একেবারে বাঙালী মেয়ের পোশাকে। সাদা ব্লাউজ, সাদা মিলেব শাড়ি, পায়ে শ্লিপার, কপালে কুমকুমের টিপ, মাথার চুলটা অবশ্য বব করা কিন্তু তাতেও সামনের দিকটায নিখুঁত বাঙালী ছাঁদ। বললে—দেখতো বোস আমি কেতকী কি না?

চোখে আমাব নেশা ধবে গেল। সাদা শাড়ির বেষ্টনীব মধ্যে শ্যামলা রঙের চিরকেলে মিষ্টি বাঙালী মেযে।

কেটির সঙ্গে সে অভিসারের রাত্রি আমাব চিবদিন মনে থাকবে। হুড খোলা ট্যাক্সি নিযে বেবিযে পডলাম। ডাযমন্ডহাববাবে একটা দোলনায বসে দোল খেতে খেতে ওকে বললাম—কেতকী তুমি এমন হলে কেন?

কেতকী বললে— আমার পোড়াকপাল বোস—আমি হতভাগী!

সম্ভ্রান্ত দেশী কৃশ্চান ঘরের মেযে। বাপ একটা বিলিতী ফার্মের একজন ছোট সাহেব। কেতকী তখন বি-এ পড়ছে। কুমকুমের টিপ পবে বেণী ঝুলিযে কলেজে যায়। কলেজের সভা-সমিতির পাণ্ডা। সভা-সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে। গান করে। নিজেই ও নিজেদের কয়েকজন অন্তরঙ্গের মধ্যে আইন করেছিল—বাংলা কথা বলবাব সময যে ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করবে—তাকে প্রতি শব্দের জন্য এক পযসা জবিমানা দিতে হবে। সেই সময হঠাৎ ঘটল এক কাণ্ড। ওদের কলেজের একটা অনুষ্ঠানে এলেন ছোটলাটমহিষী। সেপাই এল, সান্ত্রী এল, তাদের সঙ্গে এল একজন তরুণ ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী। আই-পি। লাটসাহেবের মেম যাবেন—দু'ধাবে পাহারা পড়েছে, পবিষ্কার পথ, সেই পথে একটি মেযে ব্যস্তভাবে ঢুকে কোন কাজে যাচ্ছিল। ছোকরা সাহেব—তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিলে। মুহূর্তে কেতকী এসে তার সামনে দাঁড়াল। রূঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলে। একে বৃটিশ সিংহশাবক—তার উপর বৃটিশ ভারতের আই-পি, টেগার্টের উত্তরাধিকারী—সে কালো মেয়ের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করবে কেন? সে ওকেও দিলে টেনে সরিয়ে। কেতকী চিৎকার করে বললে—এ অপমানের প্রতিবাদে আমরা এ সভা ছেড়ে চলে যাব। এস, সব বেরিযে এস। বেরিয়ে কেউ গেল না। কালটা তখন মেয়েদের পক্ষেও ভয়ঙ্কর হতে শুরু করেছে। বীণা দাস কনভোকেশনে গুলি ছুঁড়েছে। প্রীতিলতা—চাটগাঁয়ে গুলি খেয়ে মরেছে, মেয়েদের জন্যে জেলখানায় পলিটিক্যাল ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েও সকলে মাথা হেঁট করে যে যার জায়গায় বসে রইল; তাদের

চোখের উপর সাদা পোশাকে বাঙালী আই-বি বাবু নাম টুকবার জন্যে খাতা পেন্সিল বের করেছে—একা কেতকীই বেরিয়ে এল।

কেতকীর বাপ চটলেন। বললেন—আমরা কৃশ্চান সমাজ নিরপেক্ষ রয়েছি। না থেকে আমাদের উপায় নেই। তুমি এ কি করে এলে?

কেতকী বললে—এই অপমান সইতে হবে?

—নিশ্চয় না। তার প্রতিকার হত। আমরা সভা করে এর প্রতিবাদ করতাম।

কেতকী এ কথার কোন উত্তরই দিলে না। বাপের দিকে একবার বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল রাস্তার দিকের বারান্দায়। বাপ পিছনে পিছনে এসে বললেন—তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়?

—আই-বি আপিসে। ডি-আই-জির কাছে নিযে যাব। আমাদের বড়সাহেব একটা চিঠিও দিযেছেন। অ্যাপলজি চাইতে হবে তোমাকে।

কেতকী বললে—না।

—না? জানো এর ফল কি হবে?

কি ফল হবে সে কল্পনা করতে হলো না; ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তটিতেই একখানা মোটর এসে দাঁড়াল ওদের বাড়ির সামনে। সেই মোটর থেকে নামল সেই তরুণ বৃটিশ সিংহশিশু।

বাপ ব্যস্ত হয়ে নেমে গেলেন। কেতকীর বুকটা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, কিন্তু সে নিজে স্থির দৃঢ় করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে। ধীর পদক্ষেপে সে ঘরে ঢুকল। প্রতীক্ষা করে রইল—পুলিশের আহ্বানের। আহ্বান এল, বাপ হাসিমুখে ব্যস্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকে বললেন—কেটি শিগগির! শিগগির! কাপড়টা পাল্টে মাথাটা একটু আঁচড়ে আয় মা। মিস্টার মরিসন এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করবেন, ক্ষমা চাইবেন।

কেতকী কাপড় পাল্টালে না, চুল আঁচড়ালে না, সে সেই পোশাকেই এল। বিদ্রোহিনীর মন এবং রূপ নিয়েই এল। মরিসন উঠে দাঁড়িযে সম্বর্ধনা করে সবিনয়ে বললে—আমি সেদিন অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছিলাম। আমি জানতাম না যে আপনি কৃশ্চান। আমি ভেবেছিলাম কোন হিন্দু মেয়ে, যারা নাকি আজকাল সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত।

কেতকী তিক্ত হাসি হেসে বললে—কিন্তু তারাও মেয়ে। প্রাপ্য সম্মান তাদেরও প্রাপ্য।

মরিসন ওদিক দিয়েই গেল না। সে বিনীতভাবেই বললে—আপনি বিশ্বাস করুন মিস্ চৌধুরী, আমি অত্যন্ত লজ্জিত। কর্তব্য বড় কঠোর। সকল সময়ে মেজাজ ঠিক রাখা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমরা পুলিশের চাকরি করি কিন্তু আমরাও মানুষ। কঠোর পরিশ্রম, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করা—এ যে কি বিরক্তিকর আপনি অনুমান করতে পারবেন না মিস্ চৌধুরী। আর আমরা কি করব? হিন্দু

মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী—তারা কনভোকেশনে গুলি ছোঁড়ে। হয় তো এমন মেয়ে হাজারে একটা কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হয় হাজার জনের উপরেই। হাজার জনের যে কেউও একজন হতে পারে।

কেতকীর বাপ মরিসনের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কেতকীর মা চা কেক টোস্ট এনে টেবিলের উপর সাজিয়ে দিলে। মরিসন বললে—মিস্ চৌধুরী ক্ষমা না করলে আমি খাব না।

কেতকীকে ক্ষমা কবতে হলো। শুধু তাই নয ওই এক প্লেট থেকে খাবারের অংশ নিতে হলো। মনে মনে স্বীকার করতে হলো মরসিনের যুক্তিকে। এমন মেয়ে হাজারে হযতো একটা কিন্তু ওদের যে নজর রাখতে হয় হাজার জনের প্রত্যেকের উপর, সন্দেহ করতে হয প্রত্যেককে। হাজার জনের যে কেউ ঐ একজন হতে পারে।

মরসিন গল্প বলে আসব জমিয়ে তুললে। স্বল্পকালের পুলিশ জীবনের কযেকটি রোমাঞ্চকব অভিজ্ঞতার গল্প বললে সে। চমৎকাব গল্প বলতে পাবে তরুণ পুলিশ কর্মচারীটি! শুধু তাই নয—পরদিন সন্ধ্যায মবিসন পুলিশের পোশাকে না এসে সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাকে ওদেব বাড়ি এসে প্রমাণ করে দিলে সে প্রিয়দর্শন তরুণ।

মরিসন সেদিন অকপটে স্বীকার করে গেল কেতকীর মতো তেজস্বিনী মেযে সে বিলাতে খুব কম দেখেছে। এবং তারই এই তেজোদৃপ্ততার মধ্যে এমন একটি মনোমুগ্ধকর রূপ আছে যে রূপ অপার্থিব।

ভদ্রভাবে একটু লজ্জার সঙ্গেই বললে—মিস্ চৌধুরী, আশা করি আমার কথার কোন অন্যায় অর্থ আপনি করবেন না। বাববার আমার মনে হয়েছে আমি যদি চিত্রকর হতাম তবে আপনার রূপেব সেইমুহূর্তের ছবি এঁকে বাখতাম।

ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর রাত্রিব সদ্যফোটা কেয়াফুলেব মতই কেতকী স্নিগ্ধ মনোরমা হয়ে উঠল।

তারপর? তারপর কেতকী সাজলে কেটি।

চুল ছাঁটলে বব করে। লিপস্টিক রুজ পাউডারে বেশভূষার ভঙ্গিতে সে পুরোদস্তুর মেমসাহেব হয়ে উঠল। ইংরিজীতে কথা বলতে শুরু করলে, কেটির মা-বাপ আশান্বিত হয়ে উঠলেন মরিসনের প্রত্যাশায়। মরিসনের সঙ্গে চৌরঙ্গীপাড়ায় ঘুরতে লাগল কেটি।

হঠাৎ মরিসন দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে একদা জাহাজে চেপে বসল। সকলের অজ্ঞাতসারেই অবশ্য। কেটিরও অজ্ঞাতসারে। কেটি তখন অন্তর্বত্নী। সংবাদ যখন জানলে তখন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাপ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবার, কেটির উপরেই ক্ষিপ্ত হলেন। মা কপাল চাপড়ালেন, গাল দিলেন মেয়েকে—মরে যা—মরে যা তুই।

কেটি গেল পুলিশের একজন বড়কর্তার কাছে, ইংরেজ বড়কর্তা। তিনি বললেন—দেখ আমাদের সব সংবাদ রাখতে হয়। তোমার এবং মরিসনের খবরও আমার অজানা নয়। কিন্তু মেলামেশা ঘোরাফেরা তো তোমার একা মরিসনের সঙ্গেই আবদ্ধ ছিল না মিস্ চৌধুরী। এমন কি বিখ্যাত মুসলমান পুলিশ অফিসার মিঃ সামসুদ্দিনের সঙ্গেও তোমাকে ট্যাক্সিতে ঘুরতে দেখেছে লোকে। তুমি না বলতে পার না।

কেটি পুলিশ-অফিসে সংজ্ঞাহীনের মতো বসে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে নীরবে উঠে চলে এল। প্রতিবাদ করে বলল না সামসুদ্দিনকে মরিসনই অনুরোধ করেছিল—তুমি অনুগ্রহ করে তোমার গাড়িতে কেটিকে পৌঁছে দেবে? সামসুদ্দিন বলেছিল—আনন্দের সঙ্গে। কেটি রাজী হয়নি। মরিসন বলেছিল—লক্ষ্মীটি! আমার কাজ রয়েছে। তুমি জান কেটি পুলিশের কত কাজ। গাড়িতে সামসুদ্দিন তার অভিপ্রায় ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেও মুখের কথায় ব্যক্ত করতে সাহস করেনি। কেতকী সংযতভাবে মহীময়ীর মতো বসেছিল।

তারপর?

তারপর—গৃহত্যাগ। তারপর ভ্রূণহত্যা।

তারপর—আত্মগোপন করে নিষ্ঠুর আক্রোশে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মৃত্যু ওকে গ্রহণ করেনি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এল। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। আদালত ওর কাহিনী শুনে ওকে সতর্ক করে ছেড়ে দিলে।

তারপর ধাপে ধাপে পিছনে পড়ে কেটি এসেছে এইখানে। ম্যাগীর পাশের ঘরে।

কেটি সেদিন রাত্রে কেতকী হয়ে ফুটে উঠেছিল ডায়মন্ডহারবারের গঙ্গার কূলের কেয়াফুলের মতো—জীবনে এ তার দ্বিতীয় দিন ফোটা।

সেদিন কেতকী দিলীপ বোসকে বলেছিল—তুমি কি আমাকে তোমার বাড়ির দাসীর মতো থাকতে দেবে?

দুলু বোস বললে—বিমলবাবু, আমি ওকে বলেছিলাম—কেতকী, তুমি আমি এই মহানগরীর বলি। আমাদের ঘর বাঁধার নয়। আমাদের ঘর ভেঙে মহানগরী বাড়ে।

মহানগরীর বলি। বিমলবাবু আমরা মহানগরীর বলি।

দুলু বোসের সেই কথা ক'টি বিমলের কানে অহরহ বাজতে লাগল। দুলু বোসের কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস ছিল না, মুখের অভিব্যক্তিতেও না, সে বরং হেসেই কথাটা বলেছিল। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলু বোসের কণ্ঠস্বর যেন করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠতে লাগল বলে বিমলের মনে হতে লাগল। শুধু তাই নয়, দুলু বোসের কথা ক'টি যেন মহানগরীর আকাশে বাতাসে কর্মমুখর কলকোলাহলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হলো।

নীচে রিক্সাওয়ালাদের আড্ডায় বোধ হয় বচসা চলেছে; ক্রুদ্ধ চিৎকারের মধ্যে সে শুনতে পেলে ওই কথা। আমরা মহানগরীর বলি।

মেসের ঘরে গান ধরেছে—গানের ভাষা ভাল বুঝা যাচ্ছে না; চট্টগ্রামের ছেলে, কথায় চট্টগ্রামের টান বড় বেশি; তবে সুর শুনে মনে হয়, কোন উদ্দীপনাময় গানের

সুর। বিমলের মনে হলো তার মধ্যে ওই কথা ক'টি ধ্বনিত হচ্ছে। 'মহানগরীর আমরা বলি।'

এ পাশের বাঈজীদেব ঘরে আজ ধনী অতিথি এসেছে। বিকেল বেলা থেকে সমারোহ পড়ে গেছে। হিন্দুস্থানী চাকরটা বিশবার এল উপরে, দোকান থেকে পান, জরদা, সিগারেট, বেলফুলের মালা, সোডা, লেমনেড, খাবার, বরফের চাঁই কিনে এনে ছাদের এই রান্নাঘর থেকেই ট্রে থালা বের করে সাজিয়ে নিয়ে গেল। সারেঙ্গী বাজছে, তবলা বাঁধা হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ঘুঙুর নাড়াচাড়া হচ্ছে ; তার মধ্যেও ওই কথা।

মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষুধার তৃপ্তি হেতু বলি চাই—এরা তাই! একটি ভাববিচলিত মুহূর্তে বিমলের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই উপলব্ধি চিৎকার করে উঠল, তারই প্রতিধ্বনি ছড়িযে পড়ল কলকাতার কলরব কোলাহলের মধ্যে। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা।

দিবা দ্বিপ্রহরে বিদেশ যাত্রার আযোজন যখন প্রস্তুত—তখন অবুঝ বালিকা কন্যা এসে কাতরভাবে বললে—যেতে দেব না, যেতে নাহি দিব। স্নেহকাতরতার পবিত্র বেদনায় মুহূর্তে পিতা শুনতে পেলেন ধরিত্রীব আর্তনাদ—যেতে নাহি দিব ; তুচ্ছ তৃণটির জন্যও ধরিত্রীর যে বেদনাময় ক্রন্দন, বিরাট বনস্পতির জন্যও ঠিক সেই ক্রন্দন। এই ক্রন্দন ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডেব ব্যাপ্তিব মধ্যে পরিধির মধ্যে আর কোন ধ্বনি নাই, আর কোন অভিব্যক্তি নাই। বিমলেব কাছেও মহানগবীর সকল আযোজন সমস্ত পরিধির মধ্যে ঠিক তেমনি—আজ এই মুহূর্তে ওই কথাটিই অবিরাম স্রোত হয়ে বযে চলেছে।

একটা গভীব যন্ত্রণায সে যেন পঙ্গু হযে পড়েছে! মনে পড়ল বৎসর কযেক আগে দেশে একদা রাত্রে গ্রামপ্রান্তে বাউড়ীপল্লীর মধ্যে প্রচণ্ড কোলাহল শুনতে পেয়ে ছুটে গিযেছিল সেখানে ; মদ খেয়ে নেশায উন্মত্ত বাউড়ীদের ঝগড়া হচ্ছিল—লাঠি কাটারী দা নিযে ঝগড়া ; ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা কবেছিল সে—তার ফলে একজন নেশায় উন্মত্ত বাউড়ী প্রতিপক্ষ ভ্রম করে তার গলা টিপে ধরেছিল। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল ; সেই যন্ত্রণাব কথা মনে পড়ল। সে ভেবে পেলে না কোথায গেলে সে মুক্তি পাবে—শান্তি পাবে।

ভেবে পেলে না, তবু সে বেরিযে পড়ল। এখানে সামনে তার কেটির ঘর, পাশে ম্যাগী একটা কম-জোরের চিমনী জ্বেলে বসে আছে। কেটির ঘরে ইলেকট্রিক কনেকশন আছে কিন্তু ম্যাগীর ঘরে নেই। চিমনীর রক্তাভ আলো ম্যাগীব মুখের উপর পড়েছে, বার্ধক্যের রেখাজর্জর পাণ্ডুর মুখ, ঘোলাটে চোখ। মনে পড়ে গেল কালীপূজার রাত্রি। কার্তিক মাসের শেষ রাত্রে হাড়িকাঠে বাঁধা বলিগুলির কথা। পাটকাঠির লাল আলোর সামনে ভিজে গায়ে অন্যান্য বলির মধ্যে মেষটা ঠিক এমনি চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত!

সে বেরিযে পড়ল রাস্তায়। রাজপথের উপর হঠাৎ নজরে পড়ল একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে অরুণা আর পিনাকী। হাসি লেগে রযেছে দু'জনের মুখেই। দু'জনেই মহানগরীর প্রসাদ পেয়েছে। বিমল মনে মনে মহানগরীকে প্রণাম জানায়।

নিশিপদ্ম

□●□

প্রথম পর্ব

এক

আজকের নয়, অর্থাৎ ১৯৬০ সালের নয়, উনিশ-কুড়ি বছর আগের, ১৯৪২ সালের ঘটনা। বর্ধমানের নামকরা কীর্তনওয়ালী কাঞ্চনমালা নিঃস্ব অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। প্রথম ছিল দেহ-ব্যবসায়িনী খেমটাওয়ালী—তারপর হয়েছিল কীর্তনগায়িকা। বড় বড আসরে সে কীর্তন গান করে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিল। গ্রামোফোন রেকর্ডে তার গানও উঠেছিল—সে গান আজও কখনও সখনও শোনা যায়।

পাশে বসে কাঁদছিল তার মেয়ে—নাম মুক্তামালা, ডাকনাম মুক্তো। সুন্দরী মেয়ে; তার সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু একটি নয়, দুটি, দুটি চোখ। তের-চৌদ্দ বছর বয়স কিন্তু তার ওই চোখ যেন বলে দেয় সে আজও শিশু, মনের দিক থেকে বাড়েনি; এবং ওই চোখ দুটি দেখেই মানুষের মন স্নেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মায়ের পাশে একটি পা মাটির উপর ভেঁজে অন্য পাখানি উঁচু করে ভেঁজে সেই হাঁটুর উপর মাথা রেখে নীরবে কাঁদছিল। কোন ভাষা বা রব তো ছিলই না—বারেকের জন্যও সে ফোঁপায়নি, শুধু চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল হাঁটুর উপর—এক চোখের ধারা কাত-করা মুখের জন্য নাকের ডগা বেয়ে মাটিতে পড়েছিল টোপায় টোপায়।

কাঞ্চন কীর্তনওয়ালীর জ্ঞান ছিল টনটনে। ক্ষয়-রোগের রোগী; আন্ত্রিক ক্ষয়রোগ। প্রথমটা হয়েছিল পায়ের হাড়ে; ডাক্তারেরা বলেছিলেন টিবি অব বোন্‌স; কলকাতার মেডিকেল কলেজের ডাক্তারেরা পাখানা হাঁটুর নীচে থেকে কেটে দিতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তাতে কাঞ্চনমালা রাজী হয়নি। আলট্রা-ভায়লেট রে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল—তাতে ফল হয়নি—তারপর করেছিল হোমিওপ্যাথি; সেও যখন নিষ্ফল হলো তখন ক্ষতের চিকিৎসাটাকে বড় করে চাঁদসীর শরণাপন্ন হয়েছিল। চাঁদসীর চিকিৎসায় ক্ষতের মুখটা প্রায় বন্ধ হয়ে এল, কিন্তু ক্ষয়রোগ তার আক্রমণ স্থানান্তরিত করলে পেটে। দেড বৎসর রোগভোগে শরীর শীর্ণ হয়ে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাবার মতো হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল সমান সতেজ। বয়স কাঞ্চনমালার বেশি হয়নি—বছর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। সে কয়েকদিন ধরেই বেশ বুঝছে দিন তার বেশি নেই—বোধ করি সেই কারণেই কীর্তনগায়িকা কাঞ্চন তার বিশ্বাসমত নাম করে যাচ্ছে—গোবিন্দের।

ক'দিন ধরে এর আগে মুক্তামালাকে বলেছে তার নিজের জীবনের কথা। শুধু তাইই বলেনি, বলেছে—এই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছরের জীবনে সে কত দেখেছে, বলেছে—যা দেখেছে তা তার জীবনের ঘটনা থেকেও বিচিত্র। আর ভাগ্যক্রমে গুরুর কৃপায় যা পেয়েছে তা আবার যা দেখেছে তা থেকেও অপরূপ। তাই তার আজ আর কোন খেদ নেই।—মুক্তো রে, খেদ নেই আমার, কোন খেদ নেই। তোকে রেখে যাচ্ছি তাতেও খেদ নেই; ভয় নেই—কোন ভয় নেই। তবে—

চুপ করে ছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর বলেছিল—ওরে ভয় হচ্ছে কালের জন্য। কালের এমন চেহারা কখনও দেখিনি; শুনিনি; ভাবিনি। ওঃ! যেন সেই কালের স্বরূপ মনে মনে প্রত্যক্ষ করে সে ওঃ বলে শিউরে উঠল।

* * *

সে যেন চোখে দেখলে—১৯৪২ সালে—কাল থেকে কালান্তবে পদক্ষেপের লগ্নে তাণ্ডবছন্দে শূন্যলোকে ললিতবঙ্কিম ভঙ্গিমায় শূন্যে উত্তোলিত দক্ষিণপাদ মহাকাল নিমীলিত রক্তিম বামচক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছেন সম্মুখের দিকে। দক্ষিণপাদ শূন্যলোকে উত্তোলিত—বাম-পাদখানি বর্তমানকালে স্থিত—কিন্তু আনন্দসুধা প্রমত্ততায় অস্থির। টলছে—নিজে যেন দুলছেন ভারসাম্য রক্ষা করতে। তাতে পৃথিবী কাঁপছে; শূন্যলোকে তাণ্ডবের ছন্দ জেগেছে, সেই ছন্দে এসেছে আশ্বিনের সাইক্লোন; পিছনে পিছনে এসেছে মহামারী; প্রাণীজগতের চৈতন্যলোকেও বেজে উঠেছে তাঁর হাতের ডমরুধ্বনি। প্রতিধ্বনির মতো মানুষ বাজিয়েছে রণবাদ্য। নীলকণ্ঠের কণ্ঠগরলের মত্ততার ছোঁয়াচে মরণে তার নেশা লেগেছে, মরণে তার উল্লাস জেগেছে। মহাকালের হাতের আগুন থেকে আগুন সংগ্রহ করে পৃথিবীর বুকে শূন্যলোকে আগুন লাগিয়ে সেও নাচতে শুরু করেছে। জীবন হয়েছে তুবড়িব আগুনের ফোয়ারার মুখের ফুলকির মতো। মুহূর্তের জন্য ঝকমকিয়ে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে।

বড় বড় জমিদার—ভূসম্পত্তিবানদের বাড়ি ফাটছে—যার ফাটেনি তার বাড়িতে নোনা ধরেছে, শ্যাওলা পড়েছে। ব্যবসায়ীবা ফাঁপছে। আবার দু'চারজন রাতারাতি ফকির হচ্ছে। তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে রাতারাতি দু'চারজন পথের মানুষ লক্ষপতি হয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। মধ্যবিত্তেরা সব হারাচ্ছে। গরীবেরা পথে পড়ে মরছে। তার নিজের জীবন? শুধু তার নিজের নয়—তাদের—মানে সমস্ত বারবিলাসিনীদের সমাজজীবন? সে নিজে অবশ্য এদের থেকে খানিকটা—খানিকটা কেন—অনেকটাই পৃথক; তবু তার জীবনে তার আঘাত কম লাগেনি, বরং বেশি লেগেছে।

ওঃ—সে কত কথা, কত বিচিত্র কথা!

তার প্রথম জীবনে,—কত বয়স তখন? সাত-আট—তখন দেখেছে কলকাতা, বর্ধমান, সিউড়ি, বহরমপুর, পূর্ববঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, রংপুর বড় বড় শহরে, এ দেশের গ্রামের জমিদার বাড়িতে, ঝরিয়া রানীগঞ্জে কলিয়ারীতে—কত বায়না; খেমটানাচের আসর বসত। কত পালা পড়ত। ঝাড়লণ্ঠন, ঘোড়া, হাতি,

বজরা—সে সব কত ব্যাপার! সে সব কত গান! সন্ধ্যার আসরে একরকম গান, রাত্রি বারোটার পর আর একরকম গান। সে তার মায়ের আমল। মা খ্যামটা নাচত—কীর্তনও গাইত। বিয়ে সাদী অন্নপ্রাশন—এমন কি ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়িতে ছেলের পৈতেতেও খ্যামটা নাচ হয়েছে। মা বলে—কোথাকার ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময়—সাহেবদের দেখাবার জন্যে—খ্যামটা নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল—তার মায়ের তখনও সন্তান হয়নি—সে সেই আসরে নেচে এসেছিল।

আবার এই সব বাবুদের বাড়িতে—রাসে দোলে ঝুলনে ঢপ-কীর্তনের আসর হত। ওরই মধ্যে একদিন ঢপওয়ালীরাই খ্যামটা নাচত। শ্রাদ্ধে ঢপ-কীর্তন হত—তখন আর খ্যামটার আসর বসত না। কলকাতায় বাগানবাড়ি ছিল। এতে জমিদার, ব্যবসাদার, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার—সব জাতের মানুষের আনাগোনা। সে নিজেও বাগানবাড়ি দেখেছে, না-দেখা নয়। সে সব আবু-হোসেনি কাণ্ড। সে আলিবাবা নাটকে থিয়েটারে পার্টও করেছে। ওঃ! ওই নাটকে পার্ট করতে গিয়েই জীবনের মোড় ফিরল তার।

সে উনিশশো একুশ সাল। দেশে গান্ধী মহারাজ জেগেছেন। তাঁর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন হচ্ছে। দেশের মোড় ফিরল। যে ঢেউ বা যে জোয়ার বইছিল তাদের সমাজে, তাতে ভাঁটা পড়ল। সেই ভাঁটার টান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাদের সমাজে, জীবনে চড়া পড়েছে, বালি জেগেছে। নাচগানের আসরের চেহারা পাল্টাতে শুরু করলে। আজ এমন পাল্টেছে যে তাতে আর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ভদ্রঘরের মেয়েরা লেখাপড়ার সঙ্গে নাচগান শিখে আসরের সঙ্গে নাচগানের ঢং পাল্টে দিয়েছে। এবং বাড়িতে বায়না করে নাচগান শোনার রেওয়াজ উঠে গিয়ে থিয়েটার হলে টিকিট বিক্রি করে নাচগানের দিন এসেছে। বায়নাও আছে—নেই এমন নয়, সেও সভা হয়, সেই সভায় নাচিয়ে-গাইয়েরা যায়—দু'খানা-চারখানা গান গেয়ে, এক বা দু'দফা নেচে টাকা নিয়ে চলে আসে। বড়লোকের রক্ষিতা রাখার রেওয়াজ অবশ্য পালটায়নি, তবে তারও ধরন বদলেছে। এই বদলের মধ্যে মার খেয়েছে সে বেশি। কারণ কীর্তন, শ্যামাসংগীত এসব প্রায় উঠেই গেল। কীর্তন থাকলেও ঢপ-কীর্তন কেউ শোনে না। পান্না দাসী, বেদানা দাসী গেছে—তাদের পথ ধরে কাঞ্চনমালাও যাচ্ছে, যাচ্ছে কেন সেও গিয়েছে। তাতে তার খেদ নেই। কোন খেদ নেই। খেদ তার অনেক দিন ঘুচে গেছে। না-হলে এই যুবতী সুন্দরী মেয়ে মুক্তামালা মূলধন থাকতে তাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হত না। তা হোক—বিনা চিকিৎসায় সে মরুক—সে মুক্তামালাকে মূলধন করে তার দেহ বিক্রির টাকায় চিকিৎসা করিয়ে বাঁচতে চায় না; তার থেকে এ মৃত্যু তার মুক্তি। সে কি তাই পারে? তার গুরু তাকে দুটি দান দিয়ে গেছেন। ওই মুক্তামালা আর গোবিন্দভক্তি। পঙ্কের মধ্যে তার যে জীবন চাপা পড়েছিল তাকে তিনি পঙ্কজের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন।

কলকাতার রামবাগানে তার জন্ম। তার মা ছিল ব্রাহ্মণকন্যা, বাল-বিধবা। অদৃষ্টচক্রে, অথবা নিজের ভুলে কুলত্যাগ করে এসে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছিল রামবাগানে। মায়ের রূপ ছিল। নাচগান জানত না। ওই দেহের কারবারের ফল হিসেবে সে

এসেছিল মায়ের কোলে। সে একা নয়, আরও একটি মেয়ে—তার আর এক বোন—চাঁপা—চম্পকমালা। সে বড়। চাঁপা ছোট। চৌদ্দ-পনের বছর থেকেই মা তাকে নিয়ে শুরু করেছিল ব্যবসা। চাঁপা তখনও ছোট—এগারো-বারো বছর বয়স। তখন প্রথমবার যুদ্ধ লেগেছে—এই জার্মানী আর ইংলন্ডে। মাড়োয়ারী আর বাঙালী ব্যবসাদাররা বাগানবাড়িতে মেতেছে। এদিকে হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত, ওদিকে খড়দ' পর্যন্ত বাগানবাড়ি ছিল অনেক। শনিবার তারা সেখানে যেত—খাবারদাবার, মদ, পান, গোলাপজল সঙ্গে যেত—আর তাদের সমাজের দু'জন-চারজন মেয়ে। রবিবার রাত্রি দশটায় বা সোমবার ভোর ভোর ফিরত। অন্যবারে সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত তাদের রামবাগানেব বাসায় চলত ব্যবসা। তার রূপের মোহে পড়েছিল এক বাঙালীবাবু। সে তাকে আলাদা ঘর ভাড়া করে বছর তিনেক রেখেছিল—এবং সেই তাকে শিখিয়েছিল গানবাজনা—নাচ। ওস্তাদ রেখে দিয়েছিল। তিন বছর পর তাকে সেই বাবুই ঢুকিয়েছিল থিয়েটারে। সখীর দলে নাচত। অভিনয়ের দিন বাবু বসে থাকত সামনে—ফুলের তোড়া হাতে। সে স্টেজে বের হলে সেই তোড়া ছুঁড়ে দিত। তারপর থিয়েটার শেষ হলে বাড়ির ঘোড়ার গাড়িতে বাবুর সঙ্গে ফিরত বাসায়। তিন বছর পর সেই বাবুই তাকে ছেড়ে পড়ল চাঁপাকে নিয়ে। তাতে তার খুব আক্ষেপ ছিল না, কারণ ওই বাবুর এক বন্ধু তাকে নিয়ে বাসা বদলেছিল। তারপর সে হয়েছিল স্বাধীন। স্বেচ্ছাচারিণী। থিয়েটারে প্রেমিক কম জোটেনি। সে তখন সব থেকে ঝলমলে ফুল থিয়েটারের মধ্যে। চাঁপাও তখন থিয়েটারে ঢুকেছে। তারও নাম হচ্ছে। হঠাৎ এল জীবনের গতি-পরিবর্তন। আলিবাবা বই খুলেছিল বড়দিনের বাজারে। তখন বলত বড়দিনের বাজার। নানা জায়গা থেকে কলকাতায় আসত বড়লোকের দল। দিল্লী থেকে বড়লাটের সঙ্গে রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসাদার থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত। ময়দানে সার্কাসের তাঁবু পড়ত, থিয়েটারে থিয়েটারে নতুন বই খুলত। নাচগানের বই, অপেরার ওপর বেশি ঝোঁক ছিল। সেবার ভাল নতুন অপেরার অভাবে পুরনো আলিবাবা খুলেছিল তাদের থিয়েটার, সে পেয়েছিল মর্জিনার পার্ট। আবদাল্লার পার্ট করেছিল—বিখ্যাত ড্যান্সিং মাস্টার অ্যাক্টর মন্টু মাস্টার। সেদিন থিয়েটারে ঠাসা বিক্রি। গোটা সামনের সারিটায় বসেছিল একদল কালো মানুষ। সঙ্গে তাদের রাশি রাশি ফুল। থিয়েটারের ম্যানেজার—মালিক—দু'পাশে দাঁড়িয়ে তটস্থ হয়ে তাদের কখন কি দরকার দেখছে। স্টেজের ভিতরে গুঞ্জন উঠছিল—লালপাহাড়ীর রাজা এবং কুমার এসেছেন। সঙ্গে জন তিরিশেক পারিষদ। তাঁদেব সঙ্গে জন পঁচিশেক কয়লার ব্যবসাদার। লালপাহাড়ীর রাজা বন-পাহাড় অঞ্চলের রাজা। তাঁর এলাকাটা কয়লায় ভরতি। কয়লার জমির মালিক হিসেবে লাখে লাখে টাকা আসে তাঁদের। বিশ পঁচিশ তিরিশ লাখ। উজ্জ্বল পোশাক আর দু'হাতে আটটা আংটি—কানে মুক্তো, হীরের টপ্—গায়ের সেন্টের গন্ধে গোটা হাউসটা প্রতিমুহূর্তে তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করছিল। আর সে কি উল্লাস! কি হাততালি! কত এনকোর, একসেলেন্ট, বাহবা, বহুতাচ্ছা চিৎকার! তার পায়ের কাছে ঝুড়ি দুই-তিন ফুল পড়েছিল। তার ইচ্ছে হয়েছিল 'ছি-ছি

এত্তা জঞ্জাল' গানখানা বারবার গাইতে। 'বার বার লাগাতা ঝাড়ু তবভি এইসা হাল।' মনে বলেছিল তাই বটে। প্লে শেষ হয়-হয়—সে গ্রীনরুমে বসেই খবর পেয়েছিল রাজা আর কুমার তার ঠিকানা লিখে নিয়েছেন। সে মুখ মিচকে হেসেছিল। মরণ! রাজা আর কুমার একসঙ্গে ? যে খবর এনেছিল সে বলেছিল—রাজা-কুমার বাপ-বেটা নয়, খুড়ো-ভাইপো। বছর দুই-তিনের ছোটবড়। সব ওদের একসঙ্গে। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ সব। তীর্থ থেকে তাদের আলয় পর্যন্ত একসঙ্গে যাত্রা! কথাটা সত্যি। সেদিন থিয়েটারের অফ ডে। বাড়ির দরজায় মোটর এসে দাঁড়াল। তখন ১৯২০ সাল। মোটর দেশে এলেও দু' দশখানা। কয়লার পয়সায় রাজা-কুমার নতুন মোটর কিনেছেন সেইদিন। সেই মোটরে চেপে প্রথম এসেছেন তার দরজায।

তারপর সারারাত মাইফেল। রাজা কুমারেরা জন পাঁচেক; সুতরাং আরও সখীর প্রযোজন হয়েছিল। তাব মায়ের ব্যবস্থায় চাঁপা এসেছিল—এবং আরও তিনজন—তাদেব ওরাই এনেছিল বাছাই কবে। সে পডেছিল কুমারের নজরে। কুমারের খাতির রাজাব থেকে বেশি। সম্পর্কে সেই খুড়ো। তার দু'দিন পর কুমার আর বাজা দু'জনে এসেছিলেন, সঙ্গে একজন পাবিষদ। উপঢৌকন দিযেছিলেন হীরেব দুল—তাকে শুধু নয, চাঁপাকেও। এবং মোটবে চডিযে হাওযা খেযে ফিরবার সময ফারেব ওভাবকোট এবং জিবো পাওযাব সোনাব চশমা কিনে পরিযে একেবাবে বিবি সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই মায়ের কাছে প্রস্তাব কবেছিলেন—তাকে আব চাঁপাকে খুড়ো-ভাইপোতে লালপাহাডী নিযে যেতে চান; স্থযীভাবে। পাকা বাড়ি—বছরে ছ' হাজার টাকা তনখা—চাকর ঠাকুব দাবোযান — খাইখরচ—এসব আলাদা। অগ্রীম পাঁচ হাজাব টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে—যার নামে তারা চায তাব নামে। মাযেব নামে বলে মাযের নামে, মেযেদের নামে বলে তাই। এ ছাড়া গযনাগাঁটি যা দেবে—তা দেবে। তার সঙ্গে ওই ছ' হাজারেব কোন সম্পর্ক নেই। কাপডচোপড—সাযা ব্লাউজ বডিস এসব তো আছেই। মা সঙ্গে সঙ্গে বাজী হযেছিলেন— ছ' ছ' হাজাব—দুই মেযেব বারো হাজার—এ যে এক জাযগীর। এ কি ছাড়া যায়! এবপব বাজা-কুমারকে খুশি করে তাদেব মোহিনী মায়াব ফাঁদে ফেলে কলকাতায বাড়ি করিয়ে নিতে কতদিন লাগবে! টাকাটা দশ হাজাব মাযের নামেই ব্যাঙ্কে জমা হযেছিল। এবং তারা মাসখানেকের মধ্যেই লালপাহাডীর বাগানবাড়িতে গিযে বাস করতে শুরু করেছিল! সত্যিই সে রাজার ঐশ্বর্য। এবা সব পুরনো কালের বনদেশের রাজা। সে আমলে এসব বাড়ি ঘর ঐশ্বর্য কিছুই ছিল না। বাড়ি ছিল খাপবাব চালেব। চালচলন ছিল মোটামুটি। নতুন ইংরেজের আমল আর মাটির তলা থেকে কযলা বের হতে এরা হয়ে পড়ল অতুল ঐশ্বর্য আর বিপুল বিলাসের মালিক। কলকাতা শহরে যে ঐশ্বর্য যে বিলাস তার কিছুর অভাব রাখেননি বাজাসাহেব আর কুমারসাহেব। শালবনের মধ্যে বাগান তৈরি করে তার মধ্যে ছোট দোতলা প্রাসাদ। পাশে ঝিল, তাতে সুন্দর নৌকা। ইলেকট্রিক লাইট, দামী ভারী পর্দা, মেঝেতে কার্পেট, সোফা কুশন—তেমনি বাথরুম। মধ্যে বড় হলে নাচ-গানেব আসর! ঝি চাকর দাবোযান। বছর তিনেক এখানে

কেটেছিল। রাত্রে কুমারসাহেবের আসর বসত। প্রথমে গানবাজনা; তারপর মদ, তারপর বিলাসের পাশবিকতা। বাগান থেকে ঝিলে নৌকায় লুকোচুরি খেলা থেকে অনেক কিছু। তারপর মধ্যরাত্রি পার করে কুমারসাহেব চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠতেন—বাড়ি ফিরতেন। কোন কোন দিন এখানেই থেকে যেতেন। সকাল হত বেলা ন'টায়। তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে একদফা ওস্তাদের কাছে গান শিখত। কুমারসাহেব লোকটা তাদের সমশ্রেণীর মতো দেহসর্বস্ব পাশবিক চরিত্রের হলেও তার একটা কোমলবৃত্তি ছিল। লোকটার গানে শখ ছিল। গান শেখার প্রথম পর্ব শেষ করে দুপুর একটার পর স্নান খাওয়া সেরে আসত একটি ঘুমের পালা; বিকেলে পাঁচটায় উঠে গা ধুয়ে প্রসাধন সেরে সন্ধ্যায় আবার বসত ওস্তাদকে নিয়ে। যতক্ষণ কুমারসাহেব না আসতেন ততক্ষণ চলত। কুমার এসে বসতেই সে গান ছেড়ে গ্লাস পূর্ণ করে কুমারসাহেবের হাতে তুলে দিত। কুমারসাহেব বলতেন—আন—। অর্থাৎ বোতল গ্লাস। আর একটা গ্লাস ভরে সেটি তার হাতে তুলে দিত।—পিয়ো।

গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে পানের পর্ব শুরু হত। খাবারের থালা চাকরে—না চাকর নয়—বয়, বয় সাজিয়েই রাখত—তারা সেটা টেনে নিত।

চাঁপার বাগান বাসা ছিল আলাদা। বেশ খানিকটা দূর। মধ্যে মধ্যে দুপুরে চাঁপা আসত, নয়তো কাঞ্চন যেত; কখনও কখনও রাজাসাহেব নিমন্ত্রণ করলে কুমারসাহেব কাঞ্চনকে নিয়ে যেতেন। কখনও তার ওখান থেকে কুমারসাহেবের নিমন্ত্রণ যেত রাজাসাহেবের বাগানে চাঁপার বাসায়। গান-বাজনা খাওযাদাওযা সেরে তারা চলে যেত। গানবাজনায় রাজাসাহেবের শখ ছিল না—চাঁপার নিজেরও না। ওস্তাদ একজন ছিল, সে থাকতে হয় বলে ছিল। ওরা দু'জনেই ছিল স্থূলদেহসর্বস্ব। শুধু তাই নয়, রুচিটাও ছিল বড নিচু। কুৎসিত। রাজার একটা শখ ছিল শিকার। শিকারে চাঁপাও যেত। বন্দুক ছুঁড়তেও শিখেছিল। আরও অনেক কিছু শিখেছিল। রাজার মদে নেশা হত না। কোকেন খেত। চাঁপাও শিখেছিল। যাক— সে হতভাগীর কথা যাক।

তিন বছর পর ওখানেই তার অদৃষ্টক্রমে সে পেলে তার গুরুকে।

* * *

লালপাহাড়ীর রাজবাড়ি। রাজারা ওদেশের মানুষদের মতো ঘোর ঘন কৃষ্ণাঙ্গ হলেও জাতিতে ছিল ক্ষত্রিয়। বাড়িতে ঠাকুর ছিল। এবং ঠাকুরকে উপলক্ষ করে উৎসব হত। বড় বড় উৎসব। সে সব একটা বিরাট সমারোহ। কলকাতার যাত্রা—কখনও থিয়েটার, নামকরা বাঈজী, খেমটা, বড় বড় গাইয়ের জলসা। সারা রাজ্য জুড়ে কয়লার কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণ। সাহেব থেকে বাঙালী, কাচ্ছি, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী কুঠির মালিক ম্যানেজারদের উপস্থিতি ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। না-এলে কৈফিয়ত লাগত। কলকাতা থেকে উকীল ব্যারিস্টার অ্যাটর্নীরা আসত; দু' চারজন নামকরা লোকও আসত। পাটনা থেকে আসত। সরকারী কর্মচারীরা আসত। সমারোহের দুটো ভাগ ছিল। আর একটা ভাগে বসত কবির পাল্লা—ঝুমুর নাচ সাধারণ যাত্রার আসর।

এসব ছিল স্থানীয় লোকদের জন্য। গোটা লালপাহাড়ী শহরটায় দশ-পনের দিন ধরে দিনেরাত্রে মানুষের প্রায় বিশ্রাম থাকত না। রাত্রে ঝলমল করত আলো।

লালপাহাড়ীর রাজা বলতেন অহংকার করে—লালপাহাড়ী শহর ছোয়ে কলকাতাটো টুকরা ঠস্ পড়িছে। অর্থাৎ লালপাহাড়ী জমে ওঠায় কলকাতা কিছু নিষ্প্রভ হয়েছে। এই অহংকারের মর্যাদা রাখতে খরচখরচা এবং উৎসবের আয়োজনের বাকি রাখতেন না তাঁরা।

সব থেকে বড় উৎসব ছিল কালীপুজো, কালীপুজো থেকেই উৎসবের আরম্ভ। পনের দিন ধরে চলত কালীপুজোর উৎসব। তারপরই ছিল দোল—হোলি। রাজারা ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের দাবি করে, ওদের বাড়িতে দেবতা ছিলেন—কালী এবং কৃষ্ণ। কালীপুজো বৎসরে একবার। কার্তিকের অমাবস্যায় একসঙ্গে দেওয়ালি এবং শ্যামাপুজো। ফাল্গুনে বা চৈত্রে দোল হোলি—তারপর শ্রাবণে ছিল ঝুলন। এছাড়া ছোটখাটো উৎসব ছিল অনেক—কার্তিকে বা অগ্রহায়ণে রাস, পৌষ মাসে ওদেশের উৎসব বাঁধ্না। চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজন চড়ক। আষাঢ়ে রথযাত্রা।

কালীপুজোর উৎসব ছিল বিরাট বিপুল। দোলের উৎসব ছিল তার পরেই। কিন্তু দোলের উৎসবে ছিল মদ বেশি, রাজাসাহেব কুমারসাহেবের উল্লাস বেশি, তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে সে উৎসব ছিল তামসিক। কলকাতা থেকে আসত চার-পাঁচ দল খেমটা। ওখানকার শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে-গাইয়ে এবং রূপসীদের বেছে বেছে আনা হত। এক সপ্তাহ ধরে চলত রঙের খেলা—নাচের আসর—বিলাস—ব্যভিচারের পালা। ঠাকুরবাড়িতে প্রতিদলের জন্য একদিন সন্ধ্যায় আসর বসত; রাজাসাহেব কুমারসাহেব আধঘণ্টার জন্য সেখানে উপস্থিত থেকেই উঠে আসতেন। তারপর বাকি দল আর অন্তরঙ্গ পারিষদ এবং বিশিষ্ট অতিথি নিয়ে পালা বসত নানান স্থানে। কোন দিন কুমারসাহেবের বাগানে, কোন দিন রাজাসাহেবের বাগানে, কোন দিন কোন নির্জন শালবনে, কোন দিন কোন জোড় ঝর্ণার পাশে। পিকনিক থেকে শুরু, সন্ধ্যার পর সেখানেই আসর, উন্মুক্ত আকাশতলে পাথরের অসমতল বন্ধুর চত্বরে পাশবিক নৃত্য। এসবে তারাই ছিল গৃহিণী। এবং সাধারণ জীবনে রাজাসাহেব কুমারসাহেবের গৃহিণীদের যেমন তাঁদের সংসর্গের জন্য কোন কথা বলার অধিকার থাকে না—এই কয়েকটি দিন তাদেরও রাজাসাহেব কুমারসাহেবের স্বেচ্ছাচারে কোন কথা বলার অধিকার থাকত না। অবশ্য অধিকারই বা কি থাকতে পারত বা পারে এ ক্ষেত্রে। ব্যভিচার-সঙ্গিনী—বিশেষ করে যেখানে তারা মাসে মাসে তাদের দেহমূল্য গ্রহণ করত সেখানে—যে মূল্য দিয়ে ব্যভিচার করে—তার ব্যভিচারের সীমানায় গণ্ডী টানবে কি দিয়ে? তাদের ঠিক অর্থাৎ অকৃত্রিম বেদনাও ছিল না এতে। ভালবাসা ছিল না যে। কেনাবেচার কারবারে ভালবাসা অচল জিনিস। কৃষির সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হবে ভালবাসা ওখানে আগাছা। ও নিড়িয়ে তুলে না-ফেললে দেহ-ভাঙানো ফসলের চাষে ফলন ফলবে না। মায়েরা এ বিষয়ে মেয়েদের সেই ছেলেবেলা থেকে কানে মন্ত্রের মতো ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে। আর ভালবাসা হবে কার

সঙ্গে—ক্রীতদাসীর সঙ্গে ক্রেতার? ভালবাসা অনবুঝ অবুঝ; রাজকন্যা রাখালকে ভালবাসে—ভিখারিণী রাজপুত্রকে ভালবাসে। কিন্তু রাজপুত্র রাজকন্যাকে কুলগৌরব বিসর্জন দিতে হয়। না-হলে হয় না। কুমারসাহেব ধনগৌরব বংশগৌরব কখনও ভোলেননি। মনে আছে—যেদিন প্রথম দিন সে ওই লালপাহাড়ীর বাড়িতে ঢুকল সেদিন কুমারসাহেব তাকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে ড্রইংরুমে বসে বয়কে বলেছিলেন—পেগ দে। বাঈসাহেবকেও দে।

মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আবার বয়কে ডেকেছিলেন—বয়!

—হুজুর!

—আরে চাবুকটো যেন কেমোন লাগছে হে। দেখি—দেখি। আনতো-ব।

শংকরমাছের লেজের চাবুক। দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

সেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে—বার কয়েক শূন্যে আস্ফালন করে বলেছিলেন— না। ঠিক রইছে। দে, রেখে দে! তারপর কাঞ্চনকে বলেছিলেন—জানো হে, আগে যে মেয্যাটা ছিল না—ঐখানে—সি—

সে কথা অশ্লীল—সে অশ্লীলতা কুমারসাহেবের জিহ্বার বন্যভাষায় অশ্লীলতম হয়ে উঠেছিল। কথাটা হলো—পূর্বে যে এখানে ছিল তার কাছে তার কলকাতার একজন প্রিয়জন ছদ্ম পরিচয়ে আসা-যাওয়া করত। পরিচয় দিয়েছিল সে তার ভাই। টাকা নিতে আসত। যেদিন আসল পরিচয় পেয়েছিলেন কুমারসাহেব সেদিন তাকে এবং সেই মেয়েটিকে এই চাবুক দিয়ে চাবকেছিলেন। পিঠ কেটে রক্ত পড়েছিল। আটকে রেখে ক্ষত সামলে তাদের বিদায় করেছিলেন। বলেছিলেন—পিঠের দাগ পিঠে থাকল হে, উ আর দেখায়ো না কারুকে। দেখাযে যদি হুজ্জোত কর তবে কলকাতায় লোক আছে আ.মার—সাবাড় করে শেষ করে দিবেক। হঁ—সেই তখন থেকে ইটা উখানেই থেকে গেইছে। তা এখন উটা—এই বয়, উটা সামিলে রাখ হে—ওই আলমারিটোর পিছাতে রেখে দাও হে! হঁ!

অর্থাৎ তাকে বলে দিয়েছিলেন—তোমার দেহ আমি মাসিক পাঁচশো টাকা মূল্যে কিনেছি। ওর উপর আমার অধিকার। সে অধিকার ভালবাসার বলে রক্ষা করি না, চাবুকের জোরে রক্ষা করি। কিন্তু সে তো কুমারসাহেবকে টাকা দিয়ে কেনেনি, মন্ত্র পড়ে কেনেনি; এবং তার চাবুকও নেই। ওখানে ভালবাসার স্থান কোথায়? ভালবাসার কথাই ওঠে না, ওঠে আর একটা কথা। সেটা হলো—কুমারসাহেব যখন হোলির সময় অন্য নারী নিয়ে উল্লাস করতেন তখন একটা ভয় হত;—কুমারসাহেবের মতো মাসিক পাঁচশো টাকায় দেহক্রেতার আশ্রয় হারাবার ভয়। সেই ভয়টাই ছিল মনে, সেইটেই খানিকটা ঈর্ষা বা ক্ষোভের চেহারা নিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠত। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তারও মূল্য আছে—তাকে অস্বীকার করা চলে না। চাঁপা অনবুঝের মতো এই নিয়ে রাজাসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। রাজাসাহেব তার মুখে এমন করে হান্টারের বাঁট দিয়ে মেরেছিলেন যে তার ঠোঁট কেটে দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। সেলাই করতে হয়েছিল। রাজাসাহেব তাকে অবশ্য দাম দিয়েছিলেন।

একখানা খুব দামী মুক্তোর নথ। বলেছিলেন—উটাতে কাটা দাগটো ঢাকা পড়বেক। এই লে!

দোলের সময়টায় এই দ্বন্দ্বে পড়তে হত। মা বলত—দোলের ফাঁড়া!

মা থাকত কলকাতায মাস কয়েক, বিশেষ করে গরমের সময়টায়; লালপাহাড়ীতে প্রচণ্ড গরম। পাথর পাহাড়ের দেশ, তার উপর কয়লাকুঠির জন্য হাজার হাজার বয়লারের আঁচ—এবং লক্ষ কয়লাব অনির্বাণ চুল্লীর উত্তাপ ও কালো কালির মতো ধোঁযা! গরমের সময কোন কোন বছর তারাও কুমারসাহেব রাজাসাহেবের সঙ্গে পাহাড়ে কি সমুদ্রের ধারে যেত। মা আসত বর্ষা কাটিয়ে পুজোর পর কালীপুজোর আগে, ফিরত বৈশাখে। দোলের সময়টায মা লালপাহাডীতে থেকে মেয়েদের শান্ত রাখত, সামলাত।

ঝুলনেব উৎসবটি ছিল বড ভাল। চমৎকাব লাগত তাব। বর্ষার সময বলে শামিযানা খাটিয়ে মেলা বসিযে উৎসব কবা চলত না। এ সময়ে নাট-মন্দিবেব মধ্যেই উৎসবের গণ্ডী আবদ্ধ থাকত এবং উৎসব হত বড বড ওস্তাদ এবং বাঈদেব বৈঠকী গানের জলসায। কলকাতা কাশী লক্ষ্ণৌ অঞ্চল থেকে নামী ওস্তাদ এবং বাঈ আসত। সমঝদাব শ্রোতা বসত তিন দিকে—বাত্রি দেডটা-দুটো পর্যন্ত চলত গান। ধ্রুপদ খেযাল ঠুংবী ভজন কীর্তন; বীণা সেতাব এস্রাজ বেহালাব বাজনা। মদ না-হলে বাজবাডিব উৎসব হয না; মদ থাকত কিন্তু তাব পবিমাণ অত্যন্ত কম —অবশ্য লালপাহাডীব বাজবাডিব মাপ অনুযাযী। তাদেব স্থান হত ওই ওস্তাদ গাইয়েদেব একপাশে। চাঁপা গাইতে জানত কাজ-চালানো গোছেব। থিযেটাব যাত্রায সখীব ব্যাচে চলতে পাবত, হযতো বা দু'জন খেমটাওযালীব সাধাবণ আসবেও খানকযেক শেখা টপ্পা-গজল গেযে চালাতে পাবত, কিন্তু এ মজলিসে গান চলত না। সে ওস্তাদ বাঈদেব পানটা এগিযে দিত, আতবের তুলোটা তুলে ধরত, গোলাপফুলের বোকে বিলি কবত; গোলাপজল ছিটুতো; সে ছিল বাজাসাহেবের পিযাবী—ও অধিকারটা চাঁপাই পেত। সেও একপাশে থাকত। কুমাবসাহেব তাকে বলতেন—কাঞ্চন বিবি, তুমি ঠাকুবেব গান গেয়্যা দিযা কৌলিকটো সেরে দাও।

সে কোনবার গাইত ভজন। কোনবাব গাইত কীর্তন। প্রশংসাও পেত। কণ্ঠস্বর তার ভালই ছিল, গ্রামোফোন রেকর্ডে মানুষ তা তো স্বীকার কবে নিয়েছে। শেখাটাও তখন নিন্দেব ছিল না কিন্তু সে জানে কীর্তন বা ভজনেব আসল বস্তুটুকু তাব মধ্যে ছিল না। ও শুধু খোসা; রাঙা টুকটুকে পাকা আম আছে এক জাতেব—তাব সেই রাঙা খোসা শুধু। দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির আসরে একরাত্রিব নাগরেব কাছে যত্ন-শেখা ভালবাসার কথা বলার মতোই তার আসল দাম কিছু ছিল না।

এই ঝুলনের আসরেই তাব জীবনেব আবার মোড ফিরল।

সেবাব ঝুলনের আসর বসেছে- -তারিখ শ্রাবণেব বিশে। পূর্ণিমার চাঁদ আর মেঘে লুকোচুরির খেলা চলছিল আকাশে। কযেকদিন ধবে বাদলাব পব বিকেলবেলা থেকে মেঘ কাটছিল কিছুক্ষণের জন্য; আবার ছেয়ে আসছে আবার কাটছে। পূর্ণচাঁদের

আলো এখনি ঝলমল করে উঠছে আবার মেঘ আসছে—জ্যোৎস্না ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আসরের ব্যস্ততার মধ্যে মন চোখ ওই খেলার শোভায় যেন বাইরে ছুটে যাচ্ছিল। ভুল হচ্ছিল।

মনেরও খানিকটা ছুটি। সেবার রাজাসাহেব কুমারসাহেব দু'জনেই লালপাহাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না। বড় একটা সত্ত্বের মামলা চলছিল হাইকোর্টে—তার জন্যে দু'জনেই গিয়েছিলেন পাটনায়। সাহেব কোম্পানির সঙ্গে মামলা—বড় বড় উকীল ব্যারিস্টার নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত। মামলায় হার হলে তিন-চার লাখ টাকা যাবে।

ঝুলনের উৎসব সেবার নমো নমো করে সারবার ব্যবস্থা। বাঈ বায়না নাকচ হয়েছে টেলিগ্রামে। বড় ওস্তাদ এসেছিলেন মাত্র দু'জন। কলকাতা থেকে ঢপ-কীর্তনওয়ালীদের সঙ্গে বাঁধা বায়না অনেক দিন থেকে, তারা যথানিয়মে এসেছিল। আসরটা ফাঁকা ফাঁকাই ঠেকছিল। মন বাইরে যাবার অবকাশও পাচ্ছিল। রাজাসাহেব কুমারসাহেব গানের আসরে যে স্তরের মানুষই হোক—আসরে মজলিসে তাঁদের দাম আছে। অতি সহজে তামসিক রাজসিক উল্লাসে আসর জমিয়ে তুলতে পারেন। তাঁরা না-থাকতে শ্রোতার আসরও ফাঁকা ফাঁকা; বড় বড় কলিয়ারির মালিক ম্যানেজার এরা অনেকেই আসেনি। এসেছিল শুধু তারাই যাদের গানে অনুরাগ আছে। মধ্যবিত্ত লোকও বেশি ছিল সেবার। যথা নিয়মে সে মন্দিরের সামনে রাজবাড়ির মাইনে-করা নাম-সংকীর্তনের দলের সঙ্গে একখানা কীর্তন গেয়ে নিয়ে আসবে বসেছিল, চাঁপা ওদিকে পান আতর বিলি করছিল, লক্ষ্ণৌ-এর খাঁসাহেবের সংগতকারেরা তানপুরা পাখোয়াজ নিয়ে সুর বেঁধে নিয়েছে—খাঁসাহেব সুর ধরেছেন, এমন সময় খবর হয়েছিল কুমারসাহেব এসে পৌঁছেছেন। পাটনা থেকে মোটর হাঁকিয়ে চলে এসেছেন—খেয়াল হয়েছে—সঙ্গে গেস্ট। আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন। গেস্ট হাউসে মুখ-হাত ধুয়ে স্নান করছেন, কুমার গেছেন অন্দরে। স্নান সেরে কাপড়-চোপড় বদলে আধঘণ্টার মধ্যেই যাবেন। গান হচ্ছিল, বড় ওস্তাদের গান—কথাটা হৈচৈ করে নয় কানাকানি করে ছড়িয়ে পড়ল—প্রথম এল তার কানে—তাকে উঠতে হবে। কারণ, কি জানি মরজি হলে কুমারসাহেব যদি বাগানবাড়িতে যান! কে বলতে পারে!

ত্রস্ত হয়ে সে বাগানবাড়িতে ফিরেছিল। কিন্তু কুমার আসেননি। সে প্রতীক্ষা করছিল জানালার ধাবে দাঁড়িয়ে। মুগ্ধ হয়ে বর্ষণধৌত নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের ঝলমল জ্যোৎস্নার শোভা দেখছিল। মন যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তখনও মেঘ সম্পূর্ণ কাটেনি, কিন্তু ছিল চাঁদ থেকে অনেক দূরে রাত্রি প্রথম প্রহর। চাঁদ পূর্বদিকে উঠে খানিকটা মধ্যাকাশের দিকে এগিয়েছে; মেঘ জমে আছে দিগন্ত ঘেঁষে; মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে কিছু কিছু মেঘ খানা খানা হয়ে খুব দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মধ্যাকাশ ঝলমল করছে—যেন নীল রঙ থেকে ঠিকরে বা পিছলে পড়ছে আলো। ঘন সবুজ গাছের পাতায় জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করছে, মাটির বুকে, ঘাসের ভিজে পাতায় ছ'টা বাজছে, এখানে ওখানে পুকুরে খানায় ডোবায় জমা জলে চাঁদ ভাসছে। ঝকমক করছে জল গলা রুপোর মতো। দূরে নালায়, জোড়ে অর্থাৎ

ছোট পাহাড়ী নদীতে জলের ঢল নেমেছে, কলরোল উঠেছে। একটা ঝোরা দেখা যাচ্ছে, ছোট ঝোরা—তার জলও গলা রুপো হয়ে গেছে। এমন মনহারানো রাত, ভুবনভরানো জ্যোৎস্না সে জীবনে আর দেখেনি। সে ভুলেই গিয়েছিল কুমারসাহেবের কথা, আসরের কথা। মনে হচ্ছিল—বর্ষার বদলে অভিষিক্ত ঝিরঝিরে বাতাসে এমন রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওই ভিজে ঘাসে দেহ এলিয়ে দিয়ে নিষ্পলক হয়ে উপরে ওই চাঁদ-আঁকা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অথবা ওই ঘন বন ভরা পাহাড়ের মাথায় চড়ে হাত বাড়িয়ে চাঁদকে নাগাল পেতে চেষ্টা করে। এমনই আবোল-তাবোল অসম্ভব অর্থহীন কল্পনা। চিন্তাহীন কল্পনা, শুধু সাধ, চাঁদ-চাওয়া শিশুর মতো সাধ।

হঠাৎ চাকরের ডাকে বাস্তবে ফিবে এসেছিল সে। সে খবর এনেছিল—হুজুর তো বরাব্বর হুঁয়া ক্যা নাম হ্যায—জলসাকে আসরমে আগিহিস্। বিবিসাহেবকে পর হুকুম হুঁযা জানে কে লিযে! দারোযান খাড়া হ্যায় নিচে।

তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন টুটে গিযেছিল—আশ্চর্য, দেহমন চঞ্চল ত্রস্ত হযে উঠেছিল। যেতে বলেছেন? চল যাই! ও মা! দেরি হয়ে গেল হযতো!

নাটমন্দিরে তখন কার গান সবে শুরু হযেছে।—আ—!

কে গাইছে? কোন্ গাযক! আহা! বড মধুব কণ্ঠ! বাঃ!

* * *

অল্পবযসে মোব, শ্যামরসে জরজর,
না জানি কি হবে পরিণামে—
যদি নযন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি—
নযন মেলিয়া দেখি শ্যামে।

কীর্তন গাইছিলেন এক অচেনা গাযক। পাশে কুমারসাহেব বসে আছেন। আসরেব আশ্চর্য ব্যবস্থা। সুবেশ সুদর্শন গায়ক—আশ্চর্য দরদের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছেন। চোখ বন্ধ করে গাইছেন। গোটা আসরটা যেন স্তব্ধ, মগ্ন। কারুর হাতে সিগারেট নেই। কোথাও কোন ফিসফাস নেই। চাঁপা তাকে ইশারায চুপিচুপি একপাশে বসতে বললে। সে বসে পড়েছে বিস্ময়ের সঙ্গে। চাঁপা উচ্ছলা—তাব সব-তাতে হাসি, মুখে হাসি নেই। বসল বিস্ময়ের সঙ্গে এবং কিছুক্ষণেব মধ্যে অভিভূত হয়ে পডল। শেষ পর্যন্ত কাঁদল। মার্গসংগীতে যা আছে কীর্তনে তার সব আছে, কিন্তু তার কারু বড় নয়, তার ভাব বড। সেই জন্যে আখর আপনি আসে। গানের কথা বলেই কথার শেষ হয় না। ভাবের জোযার কথার ফেনা তুলে বেরিয়ে আসে। যখন তাতেও কুলোয় না তখন যে গায সেও কাঁদে, যে শোনে সেও কাঁদে। তফাতটা কি জান কাঞ্চন,—জ্ঞানী আর ভক্তে যা তফাত সেই তফাত।

অনেক দিন পব বলেছিলেন তার গুরু।

ওই উনিই তার গুরু। নাম তার করবে না। তার গুরু, তার স্বামী, তার সব। জীবনটাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। আজ যে এই অবস্থায় মরতেও কোন

খেদ নেই—এর মূলধন তিনিই দিয়ে গেছেন। মুক্তামালা—ও-ও তাঁর দান। ওর আর একটা নাম আছে—তাঁর দেওয়া নাম—মালতীমালা। শ্যাম-মনোহর গোবিন্দ মালতীমালায় পরিতৃপ্ত।

লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত, পণ্ডিত মানুষ, ভালঘরের ছেলে—একসময় প্রথম যৌবনে ছিলেন দুরন্ত সাহেব। পেশায় ছিলেন উকীল। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, লম্বা মানুষ, টিকলো নাক, শ্যামবর্ণ মানুষটির সারা দেহে যত কান্তি তত পৌরষ। তার উপর এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর। গানে জন্মগত অধিকার ছিল; গান তিনি যত্ন করে শিখেও ছিলেন। প্রথম বয়সে উল্লাস করে ঘুরেই বেড়াতেন। মেয়েরা তাঁর পিছনে ছুটেছে। বাপ মারা গিয়েছিলেন ছেলেবয়সে—মায়ের অঞ্চলের নিধি ছিলেন, লেখাপড়া শেষ করে উকীল হয়েও তিনি বিয়ে করেননি। মা পারেননি রাজী করাতে। তিনি বলতেন—জান—তখন সভ্যসমাজে বিলেতফেরত মহলে খুব খাতির জমিয়েছি, ওদের সমাজের ঘরের স্বাধীন জেনানাদের দেখে চোখে ঘোর লেগেছে। বিয়ে করতেও বেগ পেতে হত না। মেয়েরা আমার জন্যে পাগল এমন কথাটা আর বলব না—কিন্তু তাদের অধিকাংশের চোখের দৃষ্টিতে প্রেমের নিমন্ত্রণ দেখতাম। কিন্তু পছন্দ কাউকে হয়নি। মন যাকে চায়—যাকে পেলে সব পাওয়া হবে—সে কই?

হঠাৎ একদিন মনে হলো—তাকে দেখতে পেয়েছেন। মস্তবড় বিলেতফেরত ডাক্তারের মেয়ে। বাধা হলো—স্বজাতি নয়। তিনি কায়স্থ। তারা ব্রাহ্মণ। তাদের কাছে সে বাধা বাধাই নয় তখন। বাধা শুধু মায়ের কাছে।

বিলেতঘোরা মেয়ে। বাপের সঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেছে। এ দেশে বি-এ পাশ করেছিল। মারীচ হয়েছিল মায়ামৃগ—মায়ামৃগের অপর নাম স্বর্ণমৃগ। এ মেয়ে ছিল স্বর্ণমৃগী—মাযামৃগী। একে ধরা যায় না কিন্তু ধরা দেবার ভানে থমকে দাঁড়ায়; তার পিছনে না-ছুটিয়ে ছাড়ে না।

স্বর্ণমৃগী যে বাঁধা পড়েছিল। তাঁকে দেখে না ভুলে তো পারেনি। শেষ পর্যন্ত ধরা দিলে।

তিনি বলতেন—আশ্চর্য কাঞ্চন—সে মদ খায় দেখেও আমার মোহ ছুটল না, মোহ বাড়ল। মনে হলো জন্মজন্মান্তর ধরে একেই খুঁজে এসেছি।

তার বাপ অবশ্য তাকে [illegible] করেছিলেন। অমতও করেছিলেন। বলেছিলেন—দেখ—আমরা মেয়ের জন্যে পাত্র চাই আই-সি-এস্, আই-পি-এস্। আমি তেমনি করেই ওকে মানুষ করেছি। ওকে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলে দু'জনের কেউ সুখী হবে না। না, এতে মত আমি দেব না। দিতে পারি না।

কিন্তু তখন ওই স্বর্ণমৃগী বাঁধা পরেছে স্বেচ্ছায়। নেশায় পড়েছে। দড়ি হলো—গান শেখা।

ইনি বৎসরখানেক ধরে ছুতায়-নাতায় ছুটে যেতেন বম্বেতে। বম্বেতে প্র্যাকটিস করতেন কর্নেল সাহেব। শেষবার—সেবার পুজোর ছুটিতে বম্বেতে গেলেন; প্রথম

দিন ওদের বাড়িতে বেড়াতে যেতেই সে ঠোঁট মচকে বলেছিল—এসেছেন। আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি নৈনীতাল।

এর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে উঠেছিল।

সে ব্যঙ্গ করে বলেছিল—বেচারা!

উনি চলে এসেছিলেন হোটেলে। ভাবছিলেন—তিনিও নৈনীতাল যাবেন কি না।

পরের দিন ভেবেচিন্তে—না—নৈনীতাল যাবেন না, কন্যাকুমারী যাবেন এবং সেখান থেকে কলকাতা ফিরবেন স্থির করে টাইম্‌টেবল দেখছেন এমন সময় বেয়ারা খবর দিয়েছিল টেলিফোন আছে।

—টেলিফোন?

—হ্যাঁ—কোন মেমসাহেব কথা বলবেন।

—মেমসাহেব?

তবে সে? টেলিফোন তখন সুলভ হয়নি। তবে কর্নেল সাহেবের বাড়িতে টেলিফোন আছে। নিশ্চয় সে।

হ্যাঁ সেই। বলেছিল—কি করছেন? নৈনীতাল যাচ্ছেন না কি?

—না।

—না?

—হ্যাঁ। যাচ্ছি—কুমারিকা।

— ও বাবাঃ! আমি উত্তরে যাব বলে আপনি একেবারে উল্টোমুখে—দক্ষিণে? তা—কবে?

—সম্ভবত কাল।

—সম্ভবত কেন? Why not—certain?

—কারণ বার্থের চেষ্টা করব। পাওয়া চাই।

—পাবেন না।

—মানে?

—সে ফোনে বলা যায় না, আপনি আসুন না!

—সন্ধ্যের সময় চেষ্টা করব। এ বেলাটা মাফ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার শব্দ হয়েছিল। ইনি একটু অপ্রতিভ হয়ে ভাবছিলেন—হয়তো ঠিক হলো না। ও বেলায় যাবেন কিনা তাও বিবেচনা করেছিলেন। কারণ হয় শুনবেন বেরিয়ে গেছেন, নয় শুনবেন—শরীর খারাপ, শুয়ে আছেন—মাফ চেয়েছেন—এটা নিশ্চিত।

কিন্তু আধঘণ্টা যেতে-না-যেতে স্বর্ণমৃগী নিজেই এসে হাজির হয়েছিল। এবং বিনা ভূমিকায় বলেছিল—নৈনীতাল ক্যান্সেল করে দিলাম।

—ক্যান্সেল করে দিলেন? মানে?

—Yes, ওতে যা মানে হয় তাই। টিকিট রিফান্ডেড, হোটেলে arrangement cancelled—আমি যাচ্ছি না।

—কিন্তু কেন ?

—আমার ইচ্ছা—আমি সোসাইটিতে গ্যাদারিঙে গাইবার জন্যে চারখানা গান শিখতে চাই।

বাঁ হাতের চারটি চম্পককলির মতো আঙুল তুলে দেখিয়েছিল এবং একটি রহস্যময় মৃদু হাসি টেনে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল কোন যাদুকর বা যাদুকরীর মতো।

হাসি পাওয়ার কথা। কিন্তু এঁর হাসি পায়নি। অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিলেন স্বর্ণমৃগীর দিকে। মুখের হাসিটি একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল সে—এবং সে শেখাবেন আপনি।

ইনি সেটা অনুমান করেছিলেন, বলেছিলেন—বেশ তো।

—Thank you! কি বলব ? মাস্টার মশাই ?

—যা খুশি !

—কি চাই দক্ষিণা ?

ইনি বলেছিলেন—আপনাকে মালা পরাবার ফুল যোগাবার অধিকার দেবেন। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার। আপনি হবেন রানী।

স্বর্ণমৃগী মায়াময়ী অকস্মাৎ উঠে তাঁর বুকের উপর পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—আমাকে তুমি নাও। আমাকে তুমি নাও। নইলে আমি বাঁচব না।

শুধু কথা নয়, কথার সঙ্গে কান্না।

এরপর তার বাপের বাধা হয়নি। তাঁরা দু'জনে গোপনে বিয়ে করে মাদ্রাজে পালিয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে গয়া। গয়াতে ছিল এঁর বাড়ি—গয়াতেই করতেন প্র্যাকটিস।

তিনি বলতেন—গয়াতে পাটনাতে এ গল্প মোটামুটি জানে সকলে। কিন্তু জানা আর বোঝা তো এক নয়। লোকে হাসে ব্যঙ্গ করে, আমাকে বলে ক্লীব। নির্বীর্য। তা বলতে পারে। বলবারই কথা। কর্নেল চ্যাটার্জী—আমার শ্বশুরও আমাকে বলেছেন এ কথা। বিয়ের পর আমাকে বলেছিলেন—আমার কথা শুনলে না, বিয়ে করলে। কিন্তু এই কথাটা শুনো। আমার মেয়ে হরিণী নয় বাঘিনী, ময়ূরী নয় ঈগল। তুমি খুব সফ্ট (soft)—শক্ত হতে হবে। She is tigress—you be a tiger. কিন্তু—

পুরনো কথা বলতে বলতে তিনি হাসলেন ; আশ্চর্য হাসি। হঠাৎ চাঁদ মেঘে ঢেকে গেলে যে জ্যোৎস্না হয় সেই জ্যোৎস্নার মতো হাসি ; বলতেন—মানুষ কি বাঘ হতে পারে কাঞ্চন ? অন্তত যাকে ভালবেসেছি তার কাছে হতে পারি নে। তা পারিনি।

আবার কিছুক্ষণ থেমে বলতেন—তার জন্যে আমি মরতে পারতাম। বিয়ের পর গয়ায় এসে দেখলাম—এ তো তার থাকবার মতো বাড়ি নয়, ঠাঁই নয়, তাছাড়া বাড়িতে মা। আর গয়ার যে আয়—বাবার রেখে-যাওয়া যে টাকা তাতে তার শখ মিটিয়ে, আমার সাধ মিটিয়ে তাকে সাজিয়ে ক'দিন চলবে ? চলে এলাম পাটনা—হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করব। কদমকুঁয়ার দিকে বড় বাড়ি নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগলাম। মাস ছয়েক তার ভালই লেগেছিল। তারপর শুরু করলে আমার সঙ্গে ঝগড়া ! যুদ্ধ। আমি কখনও আঘাত করিনি, সয়েই গেছি। সে

রাগ করে আজ বম্বে, কাল কলকাতা ছুটতে লাগল। গরমের সময় পাহাড়। বাড়ি খালি। আমি একা। আমার তখন প্র্যাকটিস জমেছে। এর উপর মদের মাত্রা বাড়ল। তার বাপ তাকে গহনা দিয়েছিল—আমিও কম দিইনি! সেই নিয়ে একদিন সে চলে গেল। আর ফিরল না। বছর চারেক পর। পালাল এক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে। ইংল্যান্ডে চলে গেল। আমার সব ভেঙে গেল। পাটনায় থাকতে পারিনি। তখন লজ্জাবোধ হয়েছিল। প্র্যাকটিস তখন আমার জমাট তবুও চলে গেলাম ছেড়ে। কি হবে? গয়াতেও যেতে পারিনি—ভেবেচিন্তে আমাদের দেশ বর্ধমানে এলাম। তারপর শান্তি কোথায় খুঁজতে খুঁজতে পেলাম পদাবলী। নিজে গাইতে জানি। এবার বুকের দুঃখ দিয়ে পদাবলীর স্বাদ পেলাম; ভগবানের শ্রীঅঙ্গের সুরভি পেলাম। বারকযেক যেন তাঁর ইশারা ইঙ্গিত কৌতুক অনুভব করেছি। তখন থেকে কীর্তন গাই। একবার এসেছিলাম পাটনায় কেস নিয়ে। কলিয়ারির কেস। দাসসাহেব ব্যারিস্টার কীর্তন ভক্ত। পাটনায় গেলেই ওঁর বাড়ি যেতাম। কীর্তন গাইতাম। সেবার আলাপ হলো কুমারসাহেবের সঙ্গে। দাসসাহেবের বাডি গানের আসরে এসেছিলেন। গান শুনে ধরলেন—যেতেই হবে ওঁর বাড়ি, আজই, ঝুলনে—ওস্তাদ আসবে, জলসা হবে। না বলতে পারলাম না; ভগবানের আসর। চলে এসেছিলাম। ওস্তাদ খাঁসাহেব চিনতেন। তিনিও বললেন—গান বাবুজী, বহুৎ রোজ গান শুনিনি আপনার। কি করব? গাইলাম। এত বড গুণীর অনুরোধ। তাছাড়া সামনে মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ!

গুণীরা বাহবা দিযেছিল, তিনি গাইতে গাইতে কেঁদেছিলেন।

"কহিনু তোমার আগে দাগা পেলাম শ্যাম দাগে,
এ ছার জীবনে নাহি দায়।
তিল তুলসী দিয়া সমর্পণ কৈনু হিয়া
জনমের মতো রাঙা পায়।"

গাইতে গাইতে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ধাবা বযে গিযেছিল। কেঁদেছিল অনেকে—তার সঙ্গে সেও কেঁদেছিল। এক অনাস্বাদিত রস অনুভব করেছিল সে। সংগীতের ভাবরস যে এমন বস্তু তা সেদিন প্রথম অনুভব করেছিল সে।

পরের দিন ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেহ ছিল পরিচ্ছন্ন, মন ছিল কেমন উদাস প্রসন্ন। সেদিন ওই ওঁর জন্যেই গোটা আসরটাই যেন পবিত্র হয়ে উঠেছিল।

তাঁর গানের পর অবসর পেযে চাঁপা তাকে বলেছিল—মস্ত মানী লোক আর ভক্তলোক দিদি। আসরে গান গাইবার আগে বললে কি জানিস? বললে—একটি অনুরোধ করব হাতজোড করে। আমি কীর্তন গাইছি—ভগবানের নাম—সামনে গোবিন্দের মন্দির। এ আসরে আমাদের দেশের বিধানমতে ধূমপান করতে নেই। তাতে গান আর নামগান থাকে না—গান বিলাস হয। ব্যস—কুমার বললেন—নিশ্চয়। তারপর একেবারে ভোল পাল্টে গেল। নিরিমিষ নয়—একেবারে হবিষ্যির আসর।

শেষ কথাটা বলে সে হাসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাসতে পারেনি। হাসি যেন ঠোঁটের ডগায় এসেও আটকে গেল।

কুমারসাহেব মদ না খেয়ে থাকতে পারতেন না, তিনি উঠে গিয়ে মদ খেয়ে আর আসরে বসেননি—নাটমন্দিরের বাইরে চেয়ার নিয়ে আলাদা বসেছিলেন। উনি আরও গান গেয়েছিলেন। ওস্তাদের অনুরোধে তাদের পর হিন্দীতে বেহাগ গেয়েছিলেন—তাও ছিল রাধাকৃষ্ণের গান; তারপর ভজন; ঢপ-কীর্তনের সময় উঠে গিয়ে তাদের মধ্যে বসে দোয়ারকি করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনিই হয়েছিলেন মূল গায়ক।

গানের আসর শেষ হয়েছিল রাত্রি দেড়টায়। কুমারসাহেব অতিথিকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন গেস্ট হাউসে; সে ফিরে এসে তাঁর প্রতীক্ষা করে বসেছিল, বয়কে বলেছিল, মদের বোতল সোডা খানা সাজিয়ে রাখতে, কারণ সে লক্ষ্য করেছিল কুমারসাহেব ক'বার উঠে গিয়েছিলেন পানীয়ের ঘরে। যে ক'বার গিয়েছিলেন কুমারসাহেব তাতে তাঁর তেষ্টা মেটার কথা নয়। তিনি তেষ্টা নিয়ে আসবেন—এবং তেষ্টার ব্যবস্থা ঠিক নেই দেখলে চটে যাবেন। কিন্তু কুমার আর সেদিন আসেননি। তার নিজেরও গলা ভিজিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে হয়নি। মন যেন ভরপুর হয়েছিল। চোখের জল কিছুক্ষণ পড়লেই মনে হয় ভিজে মাটির মতো। মেঘলা-আকাশ দিনের মতো। সেই মন নিয়েই সে শুয়ে পড়েছিল। তার ঘুম সাধারণত ভাঙে একটু বেলায়, কিন্তু সেদিন ঘুম ভেঙেছিল ভোরে। তার কারণ ছিল। কানে এসে ঢুকেছিল তানপুরার ঝঙ্কারের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠের রাগিণী আলাপ। ভৈরবীতে আলাপ করেছিলেন। সে আলাপের বাণী শুধুই ছিল—"রাধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—রাধা রাধা রাধা কৃষ্ণ।"

ছোঁয়াচ লেগেছিল তারও মনে। সে নিজেও গুনগুন করতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণ পর ডেকেছিল তার নিজের ওস্তাদকে. ওস্তাদ বাগানবাড়িতেই থাকত। ওস্তাদকে বলেছিল—দেখুন তো ঠিক হচ্ছে কিনা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গান শেখার আসরটি জমে উঠেছিল। আসর ভেঙেছিল চাকরদের তাগিদে। বেলা হয়েছে অনেক। বিকেলবেলা কুমারসাহেবের হুকুম এসেছিল—আসর পাততে। অতিথিকে নিয়ে তিনি আসছেন।

বুকটা দুরদুর করে উঠেছিল। উনি আসবেন! উল্লাস ভয় দুই মিশে সে এক আশ্চর্য দুরুদুরু আবেগ। কত ভাবনা ভেবেছিল। উনি কি মদ খাবেন? উনি কি—?

সন্ধেবেলা কুমারসাহেব তাঁকে নিয়ে এলেন। বললেন—সকালে গান গেয়েছিলি তুই, উনি শুনেছেন। গলার সুখ্যাত করলেন—তো বললাম—চলুন শুনিয়ে দি!

মিষ্টি হেসে তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ, কণ্ঠস্বরটি ভাল! চমৎকার কণ্ঠস্বর। ঘষা-মাজাও হয়েছে—আরও দরকার অবশ্য।

কুমার বসেই মদ খেয়েছিলেন, তিনি খাননি। তাকে খেতে হয়েছিল। লজ্জা তার হয়েছিল। কিন্তু কুমারসাহেবের সামনে না বলার সাহস ছিল না।

তারপর কুমার বলেছিলেন—লে ধর গান ধর।

তিনিই বরাত করেছিলেন—যা তোমার খুব ভাল শেখা আছে তাই শোনাও।

শুরু করেছিল সে খেয়াল দিয়ে। ভালই গেয়েছিল। প্রশংসা করেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর কুমার তাঁকে ধরেছিলেন—আপনার একখানা হোক।

তিনিও ধরেছিলেন—খেয়াল। সেখানা শেষ হতেই সে বলেছিল—একটা কথা বলব ?

হেসে তিনি বলেছিলেন—বল।

একখানা কীর্তন—

তিনি শিউরে উঠে বলেছিলেন—না। কীর্তন এখানে হয় না।

ওই এক কথাতে সব কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন—দেখ—কীর্তনের গানের কথা সুর সব ভগবানের সঙ্গে ; মানুষের সঙ্গে নয়। শ্রোতা ওখানে উপলক্ষ্য। উপযুক্ত স্থান নইলে ও গান গাইতে নেই। গাইলেও আসে না। পয়সা নিয়ে আসর করে যারা কীর্তন গায়, মানুষকেই শোনায়—তাদের গানে সেই জন্য প্রাণ থাকে না। কণ্ঠে সুর, শিক্ষার জ্ঞান যতই থাক, মনে ভক্তি আর পবিত্রতা না থাকলে কীর্তন হয় না ; সে মিথ্যা গাওয়া হয়। তার থেকে অন্য কিছু শোন। একটু থেমে বলেছিলেন—মির্জা গালিবের গজল জান ? শোন—এমন গজল আর হয় না। মস্ত কবি। প্রেমিক পাগল কবি। প্রিয়ার জন্যই কেঁদে গেলেন সারা জীবন। আর মজা কি জান, ওঁর সেই প্রিয়া আত্মগোপন করে—ওঁর খুব কাছাকাছি বাড়িতে থেকে ওঁর খাওয়া পরা সেবা সব করে গেলেন—কিন্তু সামনে এলেন না। কেন জান ? উনি যদি সামনে ধরা দেন তো কবি হাতে স্বর্গ পাবেন—আর গান লিখবেন না। বলবেন—আবার কেন ? কিসের জন্য ? সুখের জন্যে গান কেন ? গান তো দুঃখের জন্যে। দুঃখ নইলে গান হয়—কাব্য হয় ? দেওয়ানা কবি। কাঁদছেন—কেউ বারণ করেছে—তা বলেছেন—এই যে হৃদয়—এ ইটও নয়, পাথরও নয় ; এ কাঁদে কাঁদবে—কাঁদব আমি হাজার বার—তোমরা আমাকে কেউ মানা করো না। ওগো আমাকে তোমরা কাঁদতে দাও !

"রুয়েঙ্গে হম্‌ হাজারো বার হমে কোই মানা না কিয়ো।" বলেই হারমোনিয়মের রিডের উপর অত্যন্ত হাল্কা অথচ অতিক্ষিপ্র চালনায় আঙুলগুলি বুলিয়ে সুরের একটি চকিত লহরী তুলে সা থেকে নি-য়ে পৌঁছে আবার ফিরে এসে মা-এ কণ্ঠ মিলিয়ে ধরলেন—আ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা যেন স্বরমাধুরীতে ভরে গেল। কণ্ঠস্বরে মিষ্টতা বহুজনেরই আছে ; অনেকে ঘষেমেজেও অর্থাৎ মার্জনা করেও সাধারণ স্বরকে মধুর করে তোলেন ; মধুর কণ্ঠস্বরও মার্জনায় মধুরতর হয়। কিন্তু সাধারণ মিষ্ট বস্তুর স্বাদে এবং মধুর স্বাদে একটি পার্থক্য আছে—মধুর স্বাদের মধ্যে সৌরভের আমেজ আছে, আভাস আছে ; তেমনি স্বরের মধ্যেও মাধুরীর পার্থক্য আছে ; এক দুর্লভ কণ্ঠস্বর আছে—যার মধ্যে পুষ্পসৌরভের আভাসের মতো একটু কিছু আছে। হয়তো এক একটি রসের সৌরভ। ওঁর কণ্ঠ তেমনি একটি দুর্লভ কণ্ঠ ছিল—এবং তাতে করুণ

রসের সৌরভের আমেজ। বেদনার গান হলে ওঁর গলা থেকে কান্না যেন ঝরে পড়ত।

'রুয়েঙ্গে হম্ হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।' কাঁদব আমি হাজার বার, ওগো, তোমরা আমাকে কেউ মানা করো না। মনে হলো সত্যি-সত্যিই তিনি কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছেন—আর সেই কান্নার দুঃখ থেকে মধু বল মধু—অপার তৃপ্তি বল তৃপ্তি—সুখ বল সুখ—আনন্দ বল আনন্দ—ঝরে পড়ছে এবং তা যারা শুনছে তাদের অন্তর টনটন করছে তবু অপার তৃপ্তি, অকল্পিত সুখ, আশ্চর্য আনন্দ অনুভব করছে।

হৃদয় তো মানুষের ইট নয় কাঠ নয় পাথর নয়, এই হৃদয় মানুষের বিচিত্র হৃদয়—এখানে কান্না পায়—কান্নাতেই সময়ে সময়ে শ্রেষ্ঠ সুখ, শ্রেষ্ঠ আনন্দ, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি।

ওঁর চোখে জলের ধারা ঝরতে চোখে দেখা যায়নি কিন্তু বুঝতে বাকি থাকেনি যে দরদর চোখের জলের ধারা ওঁর বুজে থাকা চোখের পাতার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইবার এবং সুরে ঢং-এ বৈচিত্র্যের ফুলঝুরি ফুটাবার অবকাশ যেমন গজলে আছে তেমন বুঝি আর কিছুতেই নেই; আর মানুষের মতো তাতেই মেতে ওঠে। সাধারণ গজল হলে কুমারসাহেব নাচতে শুরু করতেন কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বরে ওই বেদনার আমেজ, করুণ রসের সৌরভের আভাস উপেক্ষা করে নাচতে পারেননি। কিন্তু হায়, হায়, সাবাস, সাবাস, আহা—হা! এ করেছিলেন অনেক।

কাঞ্চন নিজে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

সে নিজে গান গাইত যে! বুঝত যে! তার উপর সে যে মেয়ে।

এমন গান! এমন কণ্ঠ! এত দরদ! তার উপর সে কসবীর মেয়ে হলেও তার হৃদয় ইটও নয় কাঠও নয় পাথরও নয়—তার হৃদয় নারীহৃদয়। হায় রে নারীহৃদয়! বাঁশির সুরে সে হৃদয় নিজেকে সমর্পণ করে দাসীত্ব বরণ করে নেয়।

এতকাল পরে রোগশয্যায় শুয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী আবেগ সম্বরণ করতে পারলে না। হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে গুনগুন করে সেই গজলের সুরটি ভাঁজতে চেষ্টা করলে। রুয়েঙ্গে হম হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।

কিন্তু মুক্তামালা বারণ করলে—থাক মা। একটু চুপ করে ঘুমোও।

মা কাঞ্চন বিচিত্র হাসি হেসে বললে—সেই আমি মরলাম।

দুই

বারণ যেই করুক আর যেমনভাবেই করুক—এই কথা বলতে শুরু করে কি থামা যায়? ও হলো বাঁধ-বাঁধা নদীর বাঁধ ভেঙে জল বের হতে শুরু হওয়ার মতো ব্যাপার। জল বের হতে শুরু হলে আর রক্ষা নেই। ভাঙনকে খুলে খুলে প্রশস্ত এবং গভীর করে নিয়ে সে বেরিয়ে চলে যাবে।

কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী খানিকটা চুপ করে ছিল; দেহটা ক্লান্ত হয়েছিল; মনটাও উদাস হয়েছিল; মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল—থাক মেয়ের কাছে এসব কথা না-বলাই ভাল। কিন্তু আসল কথাটা তো বলা হয়েই গেছে। আর যেটুকু আছে তার মধ্যে লজ্জার কি আছে, কলঙ্কের কি আছে? কিচ্ছু নেই—সে তো গৌরবের কথা। তার জীবনের তপস্যার কথা! সেকথা বলবে না কেন? সেকথা না বললে আসল কথা যে বলাই হবে না।

তিনি বলতেন—"কাঞ্চন, মানুষ হলো পুণ্যের সৃষ্টি। জন্ম থেকেই তার সন্ধান পুণ্যের, আনন্দের, অমৃতের। ভুল করে পাপ সে করে, পা পিছলে পাপের পঙ্কে পড়ে; ভুল ভাঙলেই সে ফিরে আসতে চায়—অনেক সময় লজ্জায় হতাশায় পারে না—কিন্তু পারলে তাকে পাপ ধরে রাখতে পারে না। পুণ্যের দরজা খোলা ফটক—ওর দরজা কখনও বন্ধ হয় না। পাপ হলো পাঁক, পুণ্য হলো জল। গঙ্গার দুই তীরে আকণ্ঠ পাঁক—ওই পাঁক থেকে একটু সরে ঠেলে গিয়ে গঙ্গার স্রোতে নামলে—সেই জলে সব ধুয়ে যায়, পায়ের তলায় বালি মেলে! সাগর-সঙ্গমে তীর্থের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।"

মানুষ ভগবানের পুণ্যের সৃষ্টি। তার দেহে সব আছে—কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ আছে, কিন্তু মনে আছে পুণ্য। পাপ করে তাই শান্তি নেই, সুখ নেই—আছে লজ্জা, আছে মনস্তাপ। এই কথাটিই সে বলবে যে মেয়েকে। এ কথা বলতে গেলে—নিজের পাপের কথা বলছে—পাপ থেকে পরিত্রাণেব কথাটা না বললে চলবে কেন?

মুক্তা তার পুণ্যের তপস্যার ফল।

মুক্তা তার জীবনের তপস্যা দেখেছে। তার পূজা দেখেছে—তার নামগান করা দেখেছে—তার ব্রত পালন দেখেছে। সে জেনে যারা এসেছে তারা বৈষ্ণব। কাঞ্চনমালা যে কোনকালে দেহব্যবসায়িনী ছিল—সে যে দেহব্যবসায়িনীর কন্যা এ তো সে জানতই না। সেইটুকুই যখন জেনেছে তখন বাকিটুকু না-বললে চলবে কেন?

কাঞ্চন বললে—জানিস—মুক্তো—আমি মরলাম সেদিন—সে কথাটা আমি লুকিয়েও রাখিনি—একরকম খোলাখুলি বলেছিলাম। তাঁর সামনে, কুমারের সামনে, ওস্তাদের সামনে, তবলচীর সামনে বলেছিলাম। অবিশ্যি গানে।

ওঁর গান শেষ হলে কুমারসাহেব বলেছিলেন—সে তু ইবার তুর একখানা গান শুনায়ে দে! শুধু গান লয়—নাচ সমেত। জানেন বোসসাহেব, কাঞ্চন থিয়েটারে নাচত—অ্যাক্টিং করত। ভাল! ভাল করত! ওঃ, মর্জিনার পার্টখানা যা চুটায়ে করেছিল—ওঃ সি যেন কলিজের ভিতরে রক্ত ছল্‌কায়ে ছল্‌কায়ে উঠত। শরীর যেন চম্‌কায়ে শিরশির করত। লে—গান কর—ঘুঙুর বাঁধ। মদের গেলাস লিবি নাকি মাথায়?

তিনি তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

হেসে বলেছিলেন—কিন্তু আমি যে নিরিমিষ্য বষ্টুম বোরেগী মানুষ কুমারসাহেব।

গানবাজনা ভালবাসি, ভগবানের নাম করতে আসতে বললেন, নামগান—তাই এসেছিলাম লালপাহাড়ীর ভগবানের দরবারে। সকালে এখানে এসেছি—কাঞ্চনের গলা শুনে। ও গান গাইছিল—গেস্ট হাউসে বসে শুনে ভাল লাগল—জিজ্ঞাসা করলাম—কে গাইছে? আপনি বললেন, ভাল বাঈ এখানে থাকে। শুনবেন? মদের গেলাস কিন্তু বেশি হয়ে যাবে। তুমি এমনি নাচ।

কুমার অপ্রস্তুত হননি—রাগও করেননি। ওটা তিনি পারতেন। অন্তত সাহেব-সুবো-উকীল-ব্যারিস্টার, বন্ধু-ইয়ার এদের সম্পর্কে পারতেন। পারতেন না চাকর-বাকর, প্রজা-খাতক, কর্মচারী-মোসাহেব এদের সম্পর্কে। বোস-সাহেবের কথা শুনে বলেছিলেন—এই দ্যাখেন রেগে গেলেন ত? তা মিছা বলেন নাই—আপনি বোরেগী। বেরসিক লোক। জানেন—বোরেগীরা তরকারি কাটাকে বলে—তরকারি বিনোনো। কাটা বললে সি তরকারি আঁষ হয়ে যায়। আপনার তাই—মদের গেলাস মাথায় করে নাঁচলে মদের ছোঁয়াচ লাগবে। তা লে কাঞ্চন—শুধুই নাচ।

খুব প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন কুমারসাহেব।—লে থিয়েটারের পালার একটা গান গা। সেই—ছি ছি এত্তা জঞ্জাল। এত্তা বড়া বাড়ি ইসমে এত্তা জঞ্জাল।

তখন কাঞ্চন তার মনের কথা-গাঁথা গান খুঁজে পেয়েছে। তার মনে পড়ে গেছে সাজাহান নাটকের সখীদের গান—

আজি এসেছি আজি এসেছি বঁধু হে
লয়ে এই হাসি রূপ গান

* * *

তোমার চরণতলে শরণ লভিব বলে
আসিয়াছি তোমারই নিদান
এমন চাঁদের আলো ম'রি যদি সেও ভাল
সে মরণ স্বরগ সমান!

চাঁদের আলো ছিল না—দিনের বেলা—তা হোক, তবুও ওই গানের কথায় আর তার মনের কথায় কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। সত্যই সেদিন সে মরলে মনে হত তার স্বর্গ। যদি তিনি তাকে তার আগে বলতেন—কাঞ্চন তোমাকে আমি ভালবাসি।

প্রাণ ঢেলে সে গেয়েছিল এবং নেচেছিল। তিনি বুঝেছিলেন কিনা তিনিই জানেন। তবে প্রশংসা করেছিলেন। কুমারসাহেব খুব খুশি হয়েছিলেন। আবার অখুশিও হয়েছিলেন। বোসসাহেব চলে গিয়েছিলেন সেইদিনই বিকেলবেলা। সন্ধ্যেবেলা কুমারসাহেব এসে ধপ্ করে বসে সটান শুয়ে পড়ে বলেছিলেন—মদ আন তো কাঞ্চন।

মদের গেলাস সামনে ধরতেই কুমার বলেছিলেন—উ বেলা গান নাচ আচ্ছা হয়েছিল মাইরি। বোসবাবু খুব তারিফ করেছে।

—সত্যিই উনি খুশি হয়েছেন?

—তা হয়েছে। কিন্তুক—

স্থিরদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কুমার।

মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল কাঞ্চনের। সে বুঝতে পেরেছিল চাউনি দেখে।

ভুরু নাচিয়ে কৌতুক করে কুমার বলেছিলেন—কি বেপার বল দেখি? মজেছিস? লয়?

কাঞ্চনের মনে হয়েছিল সে যেন ভয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে। তবুও সে ছলাকলা-পটিয়সী দেহব্যবসায়িনীর মেয়ে—নিজে অভিনয় করেছে। সে বলেছিল, আপনি ক্ষ্যাপা কুমারসাহেব। মরণ আমার! মজতে যাব কেন?

কুমার খপ্ করে তার হাতখানা টেনে নিয়ে নিষ্ঠুর একটা চিমটি কেটে ধরে স্ক্রুর প্যাঁচ কষার মতো চিমটিতে-ধরা মাংসটুকু ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিলেন—মজবি ক্যানে? ওই শালার রূপে! শালার গুণে! বল্—বল্!

চিৎকার করে কাঁদতে ওখানে মানা। রাজাদের বাগান শুধু প্রমোদভবনই নয়—একাধারে প্রমোদভবন কারাগার দুই-ই। ত্রিসীমানায় লোক হাঁটে না। চিৎকার করে কাঁদলেও কেউ শুনতে পায় না, ফল হয় বেয়াদপির অপরাধ, যোগ হয় মূল অপরাধের সঙ্গে। শাস্তি বাড়ে। রুদ্ধকণ্ঠ, মর্মবিদ্ধ মানুষের মতো অথবা পাখির মতো তার দেহখানা এঁকে বেঁকে গিয়েছিল—ফুঁপিয়ে লুটিয়ে পড়েও সে বলেছিল—না—না—না।

—তবে উয়ার ছামুতে তোর গান নাচ এত ভাল হলো ক্যান রে? অঁ? উঃ—একেবারে রসে ঢলঢল। বান ডেকে গেল! বল্।

কাঞ্চন তবু বলেছিল সেই আর্তকণ্ঠে—না—না—না।

এবার কুমার ছেড়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু প্রশ্ন করেছিলেন—সত্যি করে বল্। নইলে সেই চাবুকটো বার করবো।

কাঞ্চন সুযোগ পেয়ে শুধুই কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—উত্তর দেয়নি।

কুমার বলেছিলেন—কাঞ্চন! বল্—বলছি।

—কি বলব?

—বেপারটো কি তুর? না মজলি তো গান এমন খুলল কি করে বল? অঁ?

কাঞ্চন বলেছিল—গানের আড়াআড়িতে। উনি এমন ভাল গাইলেন—আমি ভাল না গাইলে আমার ইজ্জত থাকবে কোথা? আপনি আমাকে রেখেছেন—আপনার ইজ্জত থাকবে কোথা?

—হুঁ! ই কথা টো তো ভাবি নাই। হুঁ! তা হলে তো অন্যায় হলো। লে—এক ঢোক মদ খা! লে লে কাঁদিস না মাইরী। লে এই আঙুটি টো লে। কেমন চুনি পাথরটো দেখ! লে। কাঁদিস না!

কিন্তু এ কথা লুকানো থাকে ক' দিন! একদিন না একদিন প্রকাশ হয়েই থাকে এবং তাই হলো। পিঠে তার শঙ্কর মাছের চাবুক পড়েছিল সেদিন। প্রথম ঘা খেয়েই

সে সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াল এবং স্বীকার করলে। কিন্তু সেদিন তারই ছিল জিত-পাল্লা।

কুমার তখন নতুন একটি মেয়েকে আবিষ্কার করেছেন। সে মেয়ে বাঙালী নয়। হিন্দুস্থানী মেয়ে—হামিদন বাঈ। মাত্র আঠারো-উনিশ বছর বয়স। বাড়ি তার কানপুর—এখানে এসে বাসা নিয়েছিল—বউবাজার স্ট্রীটে ; কুমারসাহেব তার নেশায় পড়ে গেছেন। প্রথম ঘন ঘন কলকাতায় যেতে লাগলেন। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কলকাতা থেকে তার মা তাকে খবর দিলে। রাজাসাহেবের কাছে খবর পেয়ে চাঁপা খবর দিলে। মা, চাঁপা দু'জনেই শঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু কাঞ্চন শঙ্কিত হলো না। খুশি হলো।

কুমারসাহেবকে রহস্য করে সবিনয়ে জানালে যে সে জেনেছে কথাটা কিন্তু ওই পর্যন্তই—মান-অভিমান কিছু করবার চেষ্টা করলে না। কুমার একটা গয়না এনেছিলেন তার জন্য—সেটা তাঁরই কাছে থেকে গেল।

রাসযাত্রার সময় লালপাহাড়ীতে আর এক ধুমধাম, সেই ধুমধামে হামিদন এল। মেয়েটা গাইতে ভাল পারে না—নাচতে পারে—আর আছে রূপ। অপরূপ রূপ।

কুমারসাহেব তাকে পাকাভাবেই এনে তুলেছিলেন বোধ হয়, কারণ বাঈজীদের, ওস্তাদদের বা যাত্রাওয়ালা থিয়েটারওয়ালা যারা এই সব উৎসবে লালপাহাড়ী আসে তাদের বাসা দেবার জন্য ব্যবস্থা করা আছে। বাড়িঘরের অভাব লালপাহাড়ীর রাজ এস্টেটে নেই। রাজাসাহেব এবং কুমারসাহেব খাস বাগানবাড়ির ইজ্জত তাঁদের অন্দরেই। ওখানে সাধারণ বাঈজী খেমটাওয়ালীদের থাকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু হামিদনকে বায়না করে আনা হয়েছে বলে প্রচার করেও তোলা হলো কাঞ্চনের বাড়িতে। একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন কুমারসাহেব। বললেন—শুনছ হে কাঞ্চন, এ বাঈজী বড় ভারী বাঈজী—বহুত আচ্ছা নাচ- -তেমনি খান্দানী আদমী। তা ইনাকে এই বাড়িতে রাখতে হবেক। ওই উধারকার ঘরটোতে হামিদন বিবি থাকবেক, লোকজন সব নিচে থাকবেক। বুঝেছ ?

ফিক্ করে হেসে সে বলেছিল—খুব বুঝেছি!

চটে গিয়েছিলেন কুমারসাহেব। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মানে ?

—উনি এইখানে থাকবেন।

—হুঁ।

—আগে বললে যে আমার ঘরটাই খালি করে রাখতাম।

চমকে ওঠেননি কুমার—সে লোক তিনি নন, তবে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—না—না। ওই উপাশের ঘর হলেই হবে।

কাঞ্চন হেসে বলেছিল—যেতে তো হবেই আমাকে, তা দু'দিন আগে ঘরখানা ছেড়ে ওঁকে দিলে কি ক্ষতি হত ?

—যেতে হবে মানে ? তু চলে যাবার মতলব ফেঁদেছিস ?

—তা চিরকাল কি একজনাতে মন ওঠে, আপনিই বলুন না? আপনি হামিদনকে দেখে মজেছেন—আমিও তো কাউকে দেখে মজতে পারি! পারি না?

—তু কাকে দেখে মজলি? বোসবাবু?

—তা মজলে কি নিন্দের হবে? বলুন আপনি।

কুমারসাহেব লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তারপর হন্‌হন্‌ করে কোণের দিকে গিয়ে লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে আলমারির পিছন থেকে চাবুকটা বের করে এনে পিঠে বসিয়ে দিয়েছিলেন। অতর্কিতে নয়—তাই নিষ্ঠুর আঘাত হলেও দাঁতে দাঁত টিপে সে সহ্য করেছিল। এবং মাথা উঁচু করেই বলেছিল—চাবুক রাখুন। আমাকে যা ঘা মারবেন শয়ে শয়ে তার খেসারত লাগবে। মরে গেলে লাশ সামলাতে পারবেন কিন্তু পুলিশে অনেক টাকা খাবে। তার উপর নমুনা দেখে হামিদন বিবি ভড়কে যাবে। তাছাড়া এতদিন আপনার কাছে থাকলাম—আপনি পুষলেন—ছাড়াছাড়ির সময় কেন মিছে ঝগড়া করছেন বলুন! ভালয় ভালয় চলে যাব, এরপর দেখা হলে হাসিমুখে কথা বলব; তাই ভাল নয়? এখন রাসের সময় নানান ঠাঁই থেকে লোক এসেছে—চাবুক রাখুন। যদি ছুটে পথে বের হই তো কি হবে ভাবুন তো!

কুমারসাহেব সত্যিই চাবুক রেখেছিলেন।

এরপরে কিন্তু কুমার তাকে বলেছিলেন—না, হামিদনকে আমি রাখবার জন্যে আনি নাই কাঞ্চন। তু যাস নাই। উটা তুকে আমি পরখ করছিলাম। এবং হে হে করে হেসেছিলেন।

এর অবশ্য কারণ ছিল। রাজাসাহেব বলেছিলেন—ইটা খুড়া তুমি ভাল কর নাই। কলকাতা দিল্লী লক্ষ্ণৌ যাই—জাত ধরম বাছি না—গান শুনতে যাই, রাত কাটাই, সি এক কথা, আর ই তুমি ঘরে এনে পিতিষ্ঠা করছ,—ই কেমন কথা হে! বাড়িতে ঠাকুর রইছে। জাত জ্ঞাত রইছে! না, না, ই ঠিক কর নাই।

থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল কুমারকে। কারণ এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সম্পত্তির অধিকার পর্যন্ত। সুতরাং কুমার থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবং কাঞ্চনকে ওই কথা বলেছিলেন। কিন্তু কাঞ্চন বলেছিল—আর হয় না কুমারসাহেব—আমার মন উঠেছে। আপনার টাকা আছে—অনেক মেয়ে আসবে—আমি আর থাকব না।

টাকা বাড়াতে চেয়েছিলেন কুমার—তবু থাকেনি কাঞ্চন। ওই চাবুকের ঘা খেয়ে তার ভয় কেটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যাকে সে ভালবেসেছে তার জন্যে পাগল হয়েছে। সে যাবেই। তাকে তার পেতেই হবে। না পেলে এ জীবনে কি ফল? কি হবে বেঁচে? কি হবে টাকায়? কিন্তু সেই কি সহজ? পথে দাঁড়িয়েছিল তার মা। ঘটনাটা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা থেকে খবর পেয়ে মা ছুটে এসেছিল।

আশ্চর্য!

এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কাঞ্চন তার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আশ্চর্য রে মুক্তো; তাই আমি আজও ভাবি। মা আমার ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে—বিয়ের এক বছর যেতে-না-যেতে বিধবা হয়েছিল। তারপর ললাটের লেখন আর পাড়াগাঁয়ের

সমাজ—তার সঙ্গে গরীবের ঘর—কপালে কলঙ্কের দাগ পড়ল—বাধ্য হয়ে এল কলকাতায়—হলো কসবী খানকী। কিন্তু কসবী খানকীর অভ্যাসটা এমন পেয়ে বসল যে আমার কসবী মায়ের মেয়ে কসবী হয়েও ওই অভ্যেসটায় এত পোক্ত হতে পারিনি। ওঃ! বলে সে শিউরে উঠল।

মা এল—ছুটে এল—শর্তমত ছাড়াবার সময় যে টাকা দেবার কথা তাই আদায় করতে। চাবুক যখন মেরেছে তখন তার দাম পেতে হবে তাই আদায় করতে। কলকাতায় তার মা তখন দুই মেয়ের টাকায় বাড়ি কিনেছে। বাড়িউলি হয়েছে। টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। এখানে এসে সমস্ত দেখে সে নিলে কুমারসাহেবের পক্ষ। বললে—পাগলামি করিসনে কাঞ্চন। রাজার ছেলে—ওরা নিজের সাতপাকের পরিবারকে ঠেঙায়, পাঁচ-সাতটা বিয়ে করে—তুই তো কসবী—রক্ষিতা। একঘা চাবুক মেরেছে বেশ করেছে। কিছু টাকা নে। থাকতে বলছে—থেকে যা। এ রাজভোগ কোথায় মিলবে লা? আর মাসে মাসে এই টাকা?

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বলেছিল—উঃ হুঁ। আমার মন উঠেছে। এ আমার ভাল লাগছে না। আমি আর থাকব না।

—হারামজাদী রাজকুমারী আমার—মন উঠেছে! মন উঠেছে কি লা? কুমার যদি এখানে মেরে পুঁতে দেয়?

—দেবে। তুমি ক্ষতিপূরণ নিয়ে বাড়ি করবে।

মা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল—শোন্। ভাল ভাল লোক বড় বড় লোকে বলেছে—আমার কথা নয়; আমাদের, যারা এই বৃত্তি করে তাদের ভালবাসা মানা; তাদের প্রেম করতে নেই। করলে সর্বনাশ হয়। শেষ জীবনে ভিক্ষে করতে হয়। মনস্তাপ সার হয়, যার প্রেমে পড়ে সে শেষ পর্যন্ত একদিন ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে দিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ঘরে ফেরে। আমি শুনেছি কাঞ্চন—যার প্রেমে তুই পড়েছিস সে লোকটা উকীল। তুই ভালবাসলে সে তোকে তো ভালবাসতে পারবে না। সে তো দুর্নামের ভাগী হবে না। আমি শুনেছি তার পরিবার নেই, পালিয়েছে। বিয়ে করেনি। না করুক—করতে কতক্ষণ? ও হলো সোনার হরিণ, ও ধরতে যাসনে। ভাল বললাম, মন চায় শোন —না-চায় যা খুশি কর। কিন্তু দুঃখে পড়লে আমার দোরে যেন যাসনে। গেলে ঝাঁটা মেরে বিদায় করব বলে দিলাম।

বলেই মা রাগ করে চাঁপার ওখানে চলে গিয়েছিল। সে যাওয়াটা প্রায় থিয়েটারের বইয়ের চলে যাওয়ার মতো। বলতে বলতে চলে যাওয়া। উইংসের ভিতরের কথা শেষ হওয়ার মতো।

কাঞ্চনের মন তবু মানেনি। সোনার হরিণ সে মায়াই হোক আর ছায়াই হোক—সে যে দেখে, তার যে তার পিছনে না ছুটে পরিত্রাণ নেই। ভগবান ভুলেছেন সোনার হরিণে। স্বয়ং লক্ষ্মী ভুলেছেন সোনার হরিণে। সে তো সামান্য মেয়ে। ও মানা যায় না। কিন্তু ভাগ্যের ফাঁকি তপস্যায় পূর্ণ হয়। সোনার হরিণের তপস্যা যদি প্রাণপাত

করে করে কেউ তবে সোনার হরিণ সে পাবে—তাকে পেতে হবে। সে পেয়েছে। সেই কথাটাই তো মরণকে শিয়রে করে বলতে বসেছে মেয়েকে।

তপস্যায় বসলে তপস্যা পূর্ণ হবার আগে নানান বাধা আসে মুক্তো। লোভ দেখায়। বলে—ধন দেব, রত্ন দেব, রাজ্য দেব, সিংহাসন দেব, সুখ দেব ;—ওঠ, এ-তপস্যা ছাড়।

কুমারসাহেব তাই বললেন—ওসব মতলব ছাড় কাঞ্চন। ওসব ছাড়। দেখ আমরা পুরুষ মানুষ, তায় রাজা-রাজড়ার ছেল্যা। আমাদের স্বভাব উড়নচণ্ডে। তা তোদেরও মনে কি হয় না উসব ? হয়। বল তো মাইরি দিব্যি করে ? হ্যাঁ। উসব জানা আছে।—উ উকীল তুকে কি দেবে রে ? মুরদটা কত ? শালা। এমন দশগুণ্ডা উকীল আমি এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারি। শুন—তুর মাসোহারা পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিব আমি। আর গয়না একটো দিব খেসারত। তুর মা বলছে—কুমারসাহেব, উকে একটো বাড়ি করে দাও। আমি বুলেছি—তাও দিব, কিন্তু কলকাতায় লয়। এইখানে পাকাবাড়ি করে দিব লালপাহাড়ীতে—শুধু বাড়ি লয়—ধানীজমি দিব বিশ বিঘা। আমি মরলে সেই থেকে খাবি তু বুড়া বয়সে। ছেলেপুলে হয় তো ভোগ করবেক ; না হয়—মরে গেলে সে আবার ঘোরত হবে আমার এস্টেটে।

কাঞ্চন বলেছিল—না।

ওই একটি কথা। না। অত্যন্ত শক্ত তার কণ্ঠস্বর। সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

তারপর এসেছিল—ভয় !

কুমারসাহেব তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বললি ?

—না।

—না ?

—হ্যাঁ।

—চোপরাও হারামজাদী কসবী। চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দিব।

শান্ত কণ্ঠে কাঞ্চন বলেছিল—দেন। পিঠ তো পাতাই আছে। এবং একটু হেসেছিল এর উপর। কুমারসাহেব বনদেশের রাজার ছেলে—বুনো বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন।—তবে রে...অশ্লীল গালাগালি দিয়েছিলেন। এবং চাবুকটা পাক দিয়ে টেনে বের করে নিয়েছিলেন। কাঞ্চন আজও বলতে পারে না—এত বড় দুঃসাহসের জেদ সে কোথা থেকে পেয়েছিল সেদিন। বলতে পারবে না কেন ? হায় মানুষের অবিশ্বাসী মন! সোনার হরিণ ছোটে—মানুষ ছোটে পিছনে। সে ছোটে পাহাড়ের মাথায় মাথায়—বনে অরণ্যের মধ্য দিয়ে। মানুষও ছোটে—লাফ দেয়, এ পাথর থেকে ও পাথরে ; পড়লে অতল খাদে প্রাণ যায়। কিন্তু প্রাণ যাবার ভয়ে সে থমকে দাঁড়ায় না, ফেরে না। বনে অরণ্যে কাঁটা ফোটে—বাঘ সাপ ওত্ পেতে থাকে ; সোনার হরিণ—মায়া, সে তারা দেখতে পায় না, তারা দেখে—যে মানুষ পিছনে ছুটছে তাকে। মানুষ তাদেরও ভয় করে না তখন। তাদের মুখের সামনে দিয়েই

ছোটে। সে যে তখন উন্মাদ? না—। তপস্যা। তপস্যাতেই উন্মাদ করে। কাঞ্চনও তখন উন্মাদ। সে চাবুক হাতে কুমারসাহেবের সামনে একটু কাত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—এই নিন। মারুন। মা—।

শেষ 'মারুন' শব্দটার 'মা'-এর পর আর উচ্চারণ করতে হয়নি। কুমার মেরেছিলেন চাবুক। লম্বা সাপের মতো—না—সাপ বরফের মতো ঠাণ্ডা, এ আগুনের জ্বালার মতো জ্বালা ছড়িয়ে পিঠের ব্লাউজ কেটে—হাতের হাতা কেটে—থুতনির গোড়ায় ডগার গিঁটটা জ্বলন্ত পেরেকের মতো বিঁধে গিয়েছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা অবাধ্য অধীর অস্থিরতা বেয়ে গিয়েছিল—চিৎকার একটা গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল। কেঁপেও সে উঠেছিল—কিন্তু আশ্চর্য—একটা উন্মত্ত শক্তিতে সে অবাধ্য অস্থিরতাকে বাধ্য স্থির করতে পেরেছিল, চিৎকারকে সে টুঁটি টিপে ধরেছিল। এবং ঠিক তেমনিভাবেই দাঁডিয়ে থেকেছিল। তখন থুতনি থেকে রক্ত পড়ছে—সে অনুভব করছিল, হাত থেকেও পডছিল। পিঠের কথা বুঝতে পারেনি। কিন্তু পিঠও খানিকটা কেটেছিল। কুমারসাহেব এই সহ্য করা দেখে বোধ হয় থমকে গিয়েছিলেন। কাঞ্চন আরও খানিকটা এগিয়ে এসে বলেছিল—থামলেন কেন? মারুন।

—কাঞ্চন! গর্জে উঠেছিলেন কুমারসাহেব।

—মেরে ফেললেও হ্যাঁ বলব না।

—বলবি।

—না। আমার জবাব ওই না।

—কাঞ্চন!

—না।

আবার চাবুক পড়েছিল।

কাঞ্চন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করেছিল—না।

আবার চাবুক পড়েছিল।

এবার কাঞ্চন দু'বার না বলেছিল—না—না।

আবার চাবুক।

এবার বার বার 'না' বলে চিৎকার করেছিল সে—না—না—না—না—না।

ওদিকে চাবুকও আরও দু'বার পড়েছিল।

সাতখানা চাবুকের দাগ তার পিঠে পায়ে আঁকা আছে। আরও পড়ত। কিন্তু সাতবারের বার খোদ রাজাসাহেব ঘরে এসে কুমারের হাত চেপে ধরে বলেছিল—কাকাসাহেব, ই কি করছ? ছি। ছাড়।

—না—ছাড়। উকে চাব্‌কিয়ে আমি মেরা্যা ফেলব। পুঁতে দিব গাড়া করে! উ বলে কি না—!

—বলুক; তুমি রাজা। উ কসবী খানকী। উয়াকে চাব্‌কিয়ে কি হবেক! উয়ার থেকে একটা কুত্তার দাম বেশি।

—উ বলে—না বলেছি—হাঁ আর বলব নাই। হাঁ উকে বলাব আমি।

—উ ঠিক বলেছে। তার লেগ্যা উকে বকশিস দাও তুমি। মুখের থুতু তুমি ফেলা দিছ মাটিতে। মুখের থুতু তো—থুতুই গো কাকাসাহেব—মুখে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অমৃতি। মাটিতে ফেললে তখুনি থুতু—তখুন কি আর চেটে তোলা যায়? খানকী রেখেছিলে—ছিল। তুমিই হামিদনকে এনে উকে ছাডবে ঠিক করলে—তখুনিই তো উ মাটিতে ফেলা থুতু হয়ে গেল। মদ খেয়ে নেশার বশে মাটির থুতুকে অমৃতি ভেবে তুলতে গিয়েছি—থুতু বলেছে না—না। ঠিক বলেছে উ—উকে বকশিস দাও। এস তুমি। ভাল মেয়্যা এন্যা দিব। না হয় ওই হামিদনকেই রাখ তুমি। লালপাহাড়ীর এলাকার বাইরে ওই—ওই পলাশটুঙির টিবিটোর মাথায় বাড়ি বানায়ে রেখে দাও। ঠিক পাহাড়ের মাথায় বাড়ির মতুন লাগবে। এ তো চার মাইল পথ। চলে যাবেক—গাড়িতে ভোঁ করে পাঁচ মিনিটে। ব্যস। রাখ ই সব রাখ। মশা মারতে কামান দাগা। ছারপোকা মেরে হাত-গন্ধ করা। লাও ছাড়। চল এখুনি যাব কলকাতা—নিয়ে আসব হামিদনকে। ছাড়।

কুমারকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন রাজাসাহেব।

কাঞ্চন এবার ক্ষতবিক্ষত দেহে উপুড় হয়ে পড়েছে ফরাশটার উপর।

কথাটা রাজাসাহেব হয়তো তাঁদের মতে ঠিকই বলেছিলেন। তারা হয়তো থুতুই বটে। কিন্তু ওরা যে থুতু চেটেই আনন্দ পায় তাতে সন্দেহ নেই। সে সত্যটা ওরা বুঝেও বুঝতে চায় না। সংসারে যারা মানুষকে ঘৃণা করে এই কথা বলে, তাদের থেকে হীন মানুষ সৃষ্টিতে নেই। তারাই কলুষিত করেছে ভগবানের পৃথিবীকে গোবিন্দের সংসারকে। কিন্তু আসল কথাটা কি জান কাঞ্চন—আসল কথাটা হলো থানা পুলিস।

কথাটা পরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি—অর্থাৎ বোসসাহেব—তাব গুরু, তার ভালবাসার বিগ্রহ। বলেছিলেন—কুমারসাহেব আগে একটা খুন করেছিলেন প্রথম জীবনে। তখন ষোল-সতের বছর বয়স। এই দেশের একটি বুনোমেয়েকে নিয়ে মত্ত হয়েছিলেন। সে মেয়েটিও তাঁকে ভালবেসেছিল। তাকে রেখেওছিলেন রাজবাড়িতে। তখন বাগানবাডি হয়নি। একদিন মেয়েটির কয়েকজন আত্মীয় এসেছিল মেয়েটির কাছে। তার মধ্যে ছিল একটি আকর্ষণীয়া মেয়ে। কুমার ক্ষেপলেন তাকে দেখে। এবং মেয়েটিকেই বললেন—নিয়ে আয় ডেকে ঘরের মধ্যে। তিনজনে বসে বিলিতি মদ খাব। বুনোমেয়েরা হাড়িয়া খায়, খেতে ভালবাসে। মদে লোভ আছে। তার উপর বিলাতি মদ। এ মেয়েটিও সন্দেহ করেনি—ও মেয়েটিও না। তারপর মদ খানিকটা পেটে পড়তেই কুমারের খোলস খসল। ঘরে খিল দিয়ে—ওই মেয়েটির সামনেই এই নতুন মেয়েটির উপর ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু এ মেয়েও বুনোমেয়ে। কুমার চিতাবাঘ—মেয়েটা বন্যশূকরী। সেও ঝাঁপ দিল কুমারের উপর। তারপর—কিসের মধ্যে কি হলো—মেয়েটা খুন হয়ে গেল। জেলাটা তো জান—নন-রেগুলেটেড এলাকা। ধরলেন ডেপুটি কমিশনার। তিনি অনেক কষ্টে খালাস পেলেন। অনেক টাকা গেল। ওই কুমারেরই রাজা হবার কথা। এতেই স্থির হলো...রাজা এ কখনও

হবে না। আরও কথা হলো...ভবিষ্যতে কুমার যদি এই ধরনের কোন অপরাধ করেন তবে সরকার আর কোন বিবেচনা তো করবেই না বরং নিষ্ঠুর সাজা দেবেন।

রাজাসাহেব কাঞ্চনের মায়ের কাছে খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না কুমারের মেজাজ। কাঞ্চনও জানত না। জানলে এইভাবে জেদ ধরে দাঁড়াতে পারত কিনা এ প্রশ্ন অন্য কেউ করেনি, কাঞ্চন নিজেই করেছিল। করেই আবার হেসেছিল। সোনার হরিণের পিছন ধরে যে ছোটে বা ছুটবার নেশায় যে ঘর থেকে ছুটে বেরুতে যায়...তার সম্মুখে সেই বেরবার মুহূর্তটিতেই যদি রাক্ষস ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দাঁড়ায় তবে সে কি করে? ভয়ে পিছন ফিরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খিল দেয়? না...কি করে?

হায় হায় হায়।

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে গড়িল কে।
পরান ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে তিতায় তিতিল দে।
ওই পিরিতি—ওই প্রেমেই সেই সোনার হরিণের নেশা।

সোনাব হরিণ মানুষ নয়—জন্মজন্মান্তরেব মনের মানুষ। ধ্যানেব ধন। মনেব মানুষ মনেই থাকে—হঠাৎ কোন এক জন্মে বাইরে এসে কোন ভাললাগা মানুষেব সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়, প্রেম অমৃত, প্রেম গঙ্গাসাগবসঙ্গম। ওতে যে ডুবতে পারে তাব মৃত্যু নেই, সে অমর, তাব সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়—অপূর্ণ থাকে না। অশুচিকে শুচি করে মর্ত্যকে স্বর্গ করে, সকল গ্লানি নাশ কবে বে মুক্তো! আমার জীবনে এই ঘটেছে, আমাব মরতে খেদ নেই, নবকের ভয় নেই—স্বর্গে আমি যাবই; কোন বাসনা অপূর্ণ নেই। ভক্তে আমাকে প্রণাম করেছে, পুণ্যাত্মারা আমাকে আশীর্বাদ করেছে—পাপাত্মা দুরাত্মা সংসাবে কেউ জন্মায না, কর্মদোষে পাপসংসর্গ ঘটে—দুষ্ট কাজ করে—তেমন লোক তারাও আমাকে ভালবেসেছে; হিংসে করতে গিয়েও করেনি। সবের মূলধন আমার ওই। মানুষকে ভালবাসলাম, সে মানুষে আর ভগবানে ভেদ রইল না, আমার ভগবানকে ভালবাসা হয়ে গেল। জীবনে যাকে পাইনি মরণে তাকে পাবই।

দেহে রোগ—সম্মুখে মৃত্যু—জীবনের ভাবাবেগ মুক্ত ধারায় বেরিয়ে আসছিল। ডাক্তারেরা বেশি কথা বলতে বারণ করেছিল, সে কথা কাঞ্চনের মেনে চলবার সাধ্য ছিল না। মেয়ে মুক্তো কচি মেয়ে; ও যদি তার মাযেব মতো পরিবেষ্টনীতে ও সংস্কারে মানুষ হত তবে এরই মধ্যে অনেক শিখত, অনেক জানত, অনেক বুঝত। দেহব্যবসায়িনীর ঘরের পরিবেশ ও সংস্কার অত্যন্ত বাস্তব, কঠিনতমভাবে নিষ্ঠুর; রাত্রে তাদের ঘরে যত বাতি জ্বলে, যত রঙের ফুল ফোটে, যত ধনসম্পদ লুটিয়ে যায়—উড়ে যায়—সকালে তার কিছু থাকে না। এতে প্রথম বয়সে ওরা নিশ্চয় দুঃখ পায়—আঘাত লাগে; এ-জীবনে ঢুকবার আগে থেকে এসব শিক্ষা দেখে দেখে, শুনে শুনে পাওয়া সত্ত্বেও দুঃখ লাগে—কিন্তু তাতে তারা ভেঙে

পড়ে না, প্রথম দু' দশ দিন পরেই সয়ে যায়, তখন ওরা এতেও হাসতে শেখে—সে-হাসি যেমন তেমন হাসি নয়, ব্যঙ্গ-কৌতুকের হাসি। কাঞ্চনও সে শিক্ষা পেয়েছিল কিন্তু মুক্তামালা পায়নি। মায়ের কথা শুনতে শুনতে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

বিবর্ণমুখে সে বললে—থাক মা থাক, আর বলো না। আর বলো না।

হাসলে কাঞ্চন। বললে—শোন মা, শুনতে হয়—শুনতে হবে। রাত্রির কথা—দুঃখের কথা—পাপের কথা শেষ হয়ে এসেছে। দিনের কথা এল। আর দুঃখ নেই। এটুকু না শুনলে মনে বল পাবি কোথা থেকে, কেমন করে?

কুমারসাহেব ভয় পেয়েছিলেন ভাইপো রাজাসাহেবের কথায়। আবার যখন হামিদনকে রাখবার কথা বললেন তখন তার সঙ্গে পেলেন উৎসাহ, সান্ত্বনা। আসল জ্বালা তো তাঁর কাঞ্চন থাকছে না বলে নয়, আসল জ্বালা হামিদনকে পাচ্ছিলেন না বলে। সব রাগ তাঁর জল হয়ে গেল, ঠিক হলো—সেই রাত্রেই যাবেন কলকাতা বরাবর মোটরে চেপে।

কাঞ্চন বলল—আমাকে বললে এক হাজার টাকা নগদ পাবি—নিজের গয়নাগাঁটি পাবি, নিয়ে কাল পর্যন্ত থেকে চলে যাবি। বেঁচে গেলি।

রাজাসাহেব বললেন—না। এখন একমাস আটক রইল—বরং আমার বাগানে চাঁপার কাছে থাকবেক। পিঠের দাগগুলা মিলাক আগে। ভূপীন্দর সিংকে বলে দিছি সে তার চাপান-টাপান লাগাযে দাগগুলানের বেবস্থা করুক।

সে কাল ছিল আলাদা মুক্তো। ভূপীন্দর সিং ওই বাড়িতে ছিল ওই একটি কাজের জন্যে। ওর একটি বিদ্যে ছিল—সে বিদ্যেটি হলো নানান পাহাড়ী গাছগাছড়ার ওষুধের বিদ্যে। ওই গাছগাছড়ার বিষবড়ি দিয়ে জানোয়ার মানুষ সব মারতে পারত। সব থেকে বড় কাজ ছিল দুটি—রাজা কুমারের হুকুমে সে নষ্ট করত সেই সব সন্তানদের যাদের এঁরা মাটিতে ধুলো ছুঁতে বা আলো দেখতে দিতে চাইতেন না। আর একটি হলো—মারপিট হয়ে দাগরাজি হলে—কালসিটে পড়লে—প্রলেপ চাপিয়ে দিন দুয়েক রেখে ধুয়ে দিলে বুঝবার জোই থাকত না যে সেখানে কেউ আঙুল দিয়েও টোকা মেরেছে। রাজারা মারপিট করত—ভূপীন্দর প্রলেপ লাগিয়ে দাগ মিলিয়ে দিত। বেমালুম মিলিয়ে দিত। কিন্তু মুক্তো, কেটে গেলে সে দাগ মাংস কেটে বসে; তার দাগ যায় না রে; এই দেখ—এই থুতনিতে। এই দেখ এই উপর হাতে।

হাসল কাঞ্চন।

এক মাস নয়, এক সপ্তাহ আটক ছিলাম।

রাজাসাহেব বলেছিলেন তাই ছিলাম। বলেছিলেন—এতকাল ছিলি কাঞ্চন—এইভাবে যায় না, যাস নে।

আমি বলেছিলাম—রাজাসাহেব, ভগবানের মন্দিরে নিয়ে চলুন, সেখানে মন্দিরে হাত রেখে বলছি—আমি কারুর কাছে কোন নালিশ করব না। নালিশ যে করাবে সে তো এখানে—মা।

—আর একজন যে আছে রে।

—না। বিশ্বাস করুন রাজাসাহেব, তিনি বিন্দুবিসর্গ জানেন না। তিনি ভুলেও আমার দিকে এ মন নিয়ে তাকাননি। তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয়নি, ইশারা না। রাজাসাহেব, আমি তাঁকে পাবার আশাও করি না। তবু—তবু মন মানছে না। আকাশের চাঁদ দেখে অনবুঝ মন যেমন হাত বাড়ায়, এ হাত বাড়ানো আমার তেমনি।

রাজাসাহেব বলেছিলেন—হুঁ—তাইতো বড় তাজ্জব লাগছিল হে। বোস উকীলের নামটি তো অনেকদিন থেকে জানা বটে। উকীল খুব বড় নয়—তবে নিন্দের নয়। কিন্তুক মানুষটি ভাল বলে যে সবাই সুখ্যেত করে হে। তবে—তবে ইটা কি হলো ?—হুঁ। শুনলাম যখন তখন তাই মনে হলো হে কাঞ্চন। ভাবলাম কি জান—হুঁ হুঁ বাবা মাছ সব পাখপাখুরীতেই খায় গ, ধরা শুধু পড়ে মাছরাঙাগুলা! তাই বল! ই তো তু কি বলে বিল্বমঙ্গল হয়ে যাবি গ! এ্যাঁ। তা যা, হাঙ্গামা হুজ্জুত করবি না জানি। চাঁদা রইছে ঐখানে, তুর মায়েরও সাহস হবে নাই! তা যা। এখুন তার সঙ্গে বুঝাপড়া করগা। কাকাও লিখেছে—বিদেয় করতে তুকে। সে হামিদনকে নিয়ে আসবেক।

কুমারসাহেবের চাবুকের জ্বালা আমার সব চেয়ে বড় জ্বালা নয়, তার হাতে খুন হবার ভয়ও বড ভয় নয়, তার চেয়েও বড় জ্বালা এর পরে; আমার মায়ের কথার জ্বালা—বিষ দিয়ে মেরে দেবার ভয়, ওষুধ খাইয়ে গলা নষ্ট করে দেবার ভয়।

এলাম কলকাতা। কলকাতায় আশ্রয় মায়ের আশ্রয়। মা বাড়ি করেছে আমাদের দুই বোনের পাপের টাকায়, কিন্তু সে বাড়ি তো তার।

নিজের মা, গর্ভে ধরেছে, মানুষ করেছে, অবিশ্বাস তো করিনি। মুখে মা বলেছিল—ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব কিন্তু নিজের মা কি তাই পারে—এই ভেবে মনে মনে হেসেই বাড়ি এ৻ েছিলাম। মা সঙ্গেই এসেছিল লালপাহাড়ী থেকে। পথে মুখ ভার করেই এসেছিল। কিন্তু লোকসান ভবিষ্যতের হিসেবে যত হোক—তখন আমার গায়ে গয়না—হাজার তিনেকের, আসবার সময় হাজার টাকা নগদ, পিঠের চামড়ার দাগ—এ তো ছিল। এ নিয়ে তখনকার দিনে কলকাতাতেও দু' তিন বছরের জন্যে ভাবনা হবার কথা নয়। মা বলেছিল—চল আবার থিয়েটারে ঢুকবি।

আমি বলেছিলাম—না। ও আর আমার হবে না।

—হবে। মোটা একটু হয়েছিস—বসে খেয়ে খেয়ে। খাওয়া কম কর আর ফের নাচ অভ্যেস কর। শরীর হাল্কা হয়ে যাবে।

—না!

মা কুচ্ছিৎ কথা বলেছিল—আমার দেহের ব্যাখ্যান করে।

আমি কথা বলিনি!

ক'দিন পর মা ডেকে বলেছিল—আজ দালাল এসেছিল, বলে সব গিয়েছে—কয়লাকুঠির বাবুরা ক'জনা আসবে। তারা লালপাহাড়ীতে কুমারের মাইফেলে তোকে দেখেছে। আমি বলেছি ঘণ্টা ধরে কারবার আমার মেয়ের। প্রথম ঘণ্টা একশো বলব পঁচাত্তর নেব—তারপর তিরিশ টাকা করে ঘণ্টা।

আমি বলেছিলাম—না।

—না। বাঘিনীর মতো গর্জে উঠেছিল মা।

—হ্যাঁ, না। বলেছি তো বারবার। কতবার বলব ?

—তোকে পুষবে কে ? আমি পারব না। বেরিয়ে যা—

—যাব। কালই চলে যাব।

—আজই যা, এক্ষুণি যা। এই মুহূর্তে।

মুক্তো, আমি আর সইতে পারিনি রে। আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমার রোজগারের টাকা সে তো মাকেই দিয়েছি। সেই তো নিয়েছে। কুমারের কাছে ছিলাম, মাসকাবারের টাকা পেতাম—সব পাঠাতাম মাকে। আমি চাঁপা দু'জনেই পাঠিয়েছি। মা বুঝিয়েছিল, টাকা নিজের কাছে রাখিস নে গয়নাও না, নেহাত যা না-হলে নয় তাই রাখবি কাছে—আর কিছু রাখবি নে। খানকী কসবীর জীবন—পদ্মপত্রের জল। এই আছে এই নেই। তাছাড়া কবে কি হয় কে জানে। ধর ঝগড়া হলো ঝাঁটি হলো—বাজারাজড়ার ব্যাপার—গলায় ধরে বের করে দিলে—এক কাপড়ে! কি করবি তখন ? আমার কাছে থাকবে—আমি যার যা আলাদা আলাদা চিহ্নিত করে রাখব। মা নিজের জীবন ভাড়ার বাড়িতে কাটিয়েছে। আমরা দু'জনে বড় হলাম—রোজগার শুরু হলো ; বছর দুয়েকের মধ্যে মা বাড়ি কিনেছিল—ছোট বাড়ি, তারপর ভাগ্য খুলল—রাজা কুমারের নজরে পড়ে। সে পুরনো বাড়ি বেচে নতুন বাড়ি হলো। এ বাড়ি সেই বাড়ি। মা বেরিয়ে যেতে বললে সেই বাড়ি থেকে। আমি ছুটে উপরে গেলাম—আমার টাকা গয়না বের করে নেব আলমারি থেকে—খানকয়েক কাপড় নেব—নিয়ে চলে যাব।

আলমারিতে হাত দিয়েছি—আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবি পরিয়েছি, মা পিছন থেকে এসে খপ্ করে চাবির রিঙ চেপে ধরে খুলে নিয়ে—আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললে—বেরো, বেরো এখুনি, বেরো বাড়ি থেকে। ঘরের দরজায় মায়ের অনুচরটা। সে এক বদমাস গুণ্ডা। ঘর-সংসার ছেড়ে অনেককাল আগে মায়ের ঘরে বাসা গেড়েছিল। এককালে সে পারত সব। এ কালে বয়স হয়ে মায়ের বাড়ির কর্তা হয়ে ভদ্রলোকের মতো কাপড়-জামা পরলেও প্রয়োজনে পুরনো মানুষ বের হয়ে আসত। সে মাকে টেনে বের করে নিয়ে আমাকে ঘরে বন্ধ করে শেকল দিলে। তিন দিন ভরে রেখেছিল। খেতে দেয়নি। আমি হ্যাঁ না বললে খেতে দেবে না।

তিন দিন পর—একদিন—পেলাম সুযোগ।

সেদিন ওরা দু'জনেই খেয়েছিল মদ। এই জীবনে মুক্তো মধ্যে মধ্যে মদ খাওয়ার পাগল পালা আসে। মদ নিত্যই খেত। হঠাৎ একদিন পরিমাণ, সময় সবের ছেদ মুছে দিয়ে বোতলের পর বোতল দিন-রাত্রি খেয়ে চলত। খেতে খেতে মারামারি হত। মারামারি না হলে বেহুঁশ হয়ে পড়ত ; হুঁশ হলেই আবার শুরু হত—দু' দিন তিন দিন ; তারপর ক্ষান্ত হত। এমনি সেদিন সকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধেবেলা হলো দু'জনের ঝগড়া। প্রচণ্ড ঝগড়া। সেই ঝগড়ার মধ্যে মায়ের অনুচরটি দিলে

আমার ঘরের শিকল খুলে। আমি পালালাম। তখন বিকেলবেলা। রাস্তায় বেরিয়ে চলেইছিলাম ; কোথায় যাব ঠিকানা ছিল না। পথে পথে। সম্বলের মধ্যে আট টাকা দশ আনা—একটা কাঁচের বাটিতে আমার ড্রয়ারে ছিল—সেটা মা জানত না—সরাতে পারেনি ; নইলে প্রথম যেদিন আমাকে ঘরে বন্ধ করে সেইদিনই সে আমার গায়ের গয়না হাতের চুড়ি পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল। আঙুলে থেকে গিয়েছিল একটা আংটি। একটা রিক্‌শায় চেপে বললাম—চল! একবার ভাবলাম থিয়েটারে যাই। একবার ভাবলাম থিয়েটারের কোন বন্ধুর কাছে যাই। কিন্তু কি করে পরিত্রাণ পাব মায়ের হাত থেকে কলকাতায় কোথাও গিয়ে। মুখ দিয়ে বের হলো—হাওড়া পুলের পাশে জগন্নাথঘাট। রিকশাওয়ালাকেও বিশ্বাস করতে পারিনি—। জগন্নাথঘাটে নেমে হেঁটে পুল পার হয়ে স্টেশনে এলাম।

স্টেশনে এসে বর্ধমানের টিকিট কাটলাম।

বর্ধমানে এসে কিন্তু তাঁর কাছে যাবার ভরসা হলো না। কি বলে যাব? কি বলব—ভালবেসে এসেছি আমাকে আশ্রয় দাও! কিন্তু সে তো বলবে—সে কি? তুমি ভালবাস কিন্তু আমি তো—।

তিনি যে মানুষ—তিনি তো মুখে বলতে পারবেন না—ভালবাসি না। থেমে যাবেন একটু—বেদনার হাসি হাসবেন। তারপর বলবেন—তুমি সমুদ্রমন্থন করা বিষ—এ গলায় রাখতে পারেন যিনি তিনি আমি নই। সে শক্তি তো আমার নেই। তখন আমি কি বলব? কি করব? পৃথিবীকে দু'ভাগ হতে বললেও পৃথিবী তা হবে না—আমি কোথায় গিয়ে লুকোব?

পড়ে রইলাম বর্ধমানে সারারাত।

আকাশপাতাল ঘুরলাম মনে মনে। কোথায় যাব? মনে মনে গোবিন্দকে ডাকলাম—বললাম—যাকে ভালবাসলাম তাকে তো রূপ দেখে শুধু ভালবাসিনি, ভালবাসার মূল কথা—তাঁর মুখে তোমার নামগান শুনে। তোমাকে ভালবেসে সে কাঁদল—সেই কান্নার ছোঁয়াচ লেগে আমি কাঁদলাম। তুমি বলে দাও কোথা যাই?

মনে মনে কূলকিনারা না-পেয়ে মুসাফেরখানায় অনেক কাঁদলাম। সকালবেলা মনে হলো চাঁপার কাছে যাই, তারপর ভেবে ঠিক করব কোথায় যাব। দশটার সময় চড়লাম লালপাহাড়ীর ট্রেনে।

কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলাম। চারিদিক কূলকিনারাহীন বলেই নয় ; যার জন্যে এত, তার দোর থেকে ফিরে এলাম। ঢুকতে ভরসা হলো না, বল পেলাম না! সে আমাকে ভালবাসুক না-বাসুক—আমি তো তাকে ভালবাসি! গিয়ে সেই কথাটা বলেও আসতে পারলাম না।—ভাবতে ভাবতে নেমে পড়লাম আসানসোল। বেলা তখন দুটো। ফিরে যাব, বর্ধমানে ফিরে যাব। কিন্তু হাতে টাকা কই। আট টাকার পাঁচ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। ভুলের উপর ভুল করলাম—আসানসোলে নেমে লালপাহাড়ী যাবার টিকিটখানা টিকিট কালেক্টরকে দিয়ে বেরিয়ে এলাম মুসাফেরখানায়। বর্ধমানের টিকিট করতে গিয়ে আবার কে যেন হাত চেপে ধরল।

আমি বেশ্যার মেয়ে, আমি পতিত—আমি নরকের কীট—কি করে যাব—কোন্ অধিকারে সেই পুণ্যাত্মার বাড়ি গিয়ে তাঁর পুণ্য অঙ্গে আমার নরকের পাঁকের ছাপ লাগিয়ে দিয়ে আসব? টিকিট করতে গিয়ে করতে পারলাম না, ফিরে এলাম। চুপ করে একপাশে বসে রইলাম। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম—বিপদে পড়েছি। বেলা পড়ে এসেছে, শীতের দিন। সন্ধ্যে হয় হয়। বয়সে তখন যুবতী; তার সঙ্গে রূপ ছিল; সে রূপকে সাজানো মাজাঘষাই তো শুধু জীবনের কাজ; যৌবন রূপ এই তো ছিল জীবনের ব্যবসার মূলধন; মাজাঘষা রূপোর বাসনের ঝকমকানি—ধুলোতে দু' চার দিন পড়ে থাকলে তো যায় না; ক' দিনের অযত্নে তা আমারও যায়নি। চুল বেঁধেছি কত বাহার করে—পাতা কাটার কাল তখন, পাতা কেটে কেটে চুলে একটা ছাঁদ হয়ে গিয়েছিল—তাই বা যাবে কোথায়? ধুলোমাখা চুলের মধ্যে তাও ছিল। দেখলাম—লোকের চোখ পড়েছে আমার উপর, তারা ঘুরছে—ফিরছে। শিস কাটছে। নিজেদের মধ্যে ইশারা করছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। লালপাহাড়ীতে ছিলাম—আসানসোলের কথা শুনেছিলাম।

আসানসোলে পয়সা অনেক—পাপ অনেক—পাপী অনেক। এখানে দেশদেশান্তরের গুণ্ডা ডাকাত গোপন আড্ডা গেড়ে থাকে। ভয় পেয়ে মুসাফেরখানা থেকে স্টেশনে প্লাটফর্মে যাব বলে উঠলাম। হঠাৎ পুলিস এসে পথ আটকাল। খাকী পোশাক পরা ভদ্রলোক—বললে থানায় যেতে হবে তোমাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

বললে—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ। চল থানায় চল। এজাহার দিতে হবে।

আমি বললাম—আমি লালপাহাড়ী রাজবাড়ি যাব। সেখানে আমার বোন আছে। আমি ভুল করে নেমে পড়েছি। পরের ট্রেনে যাব। আমি থানায় যাব কেন?

—যেতে হবে। আমরাই তোমার বোনকে খবর দেব। ওঠ ওঠ। নইলে কনেস্টবল ডাকতে হবে। ওঠ।

কি করব? ভগবানকে ডাকলাম। আবার মনে হলো ভালই হলো—দুষ্টু লোকের হাত থেকে তো বাঁচলাম! রাত্রিটা তো থানায় থাকতে পাব! কিন্তু তখন কি জানি— ?

তখন জানতাম না—মুক্তো—যে ওরা পুলিস নয়। পাষণ্ডেরা পুলিস সেজে এসেছে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—।

একখানা ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে আমাকে—।

ওঃ বনে এত জন্তুজানোয়ার নেই, নরকে এত অন্ধকার নেই মুক্তো, এত প্রহার নেই, এত ভয় নেই! তারা পাঁচজন। কি ভয়ংকর তাদের হাসি—কি জ্বালা দাহ তাদের স্পর্শে। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

পরের দিন পুলিস আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল রাস্তার ধারে। রক্তাক্ত দেহ! দেহটার উপর আর অত্যাচারের শেষ ছিল না।

একটু চুপ করে গেল কাঞ্চন। মুক্তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মা বলে চলেছে এই সব কথা—তাকে—তার পেটের মেয়েকে বলে চলেছে—কিন্তু কোন অনুশোচনা নেই—কোন দুঃখ নেই—কোন ক্ষোভ নেই—খেদ নেই।

কাঞ্চন আবার বললে—ভগবান আমাকে ওই চরম শাস্তি দিলেন। বললেন—যাকে ভালবেসেছিস তার দেহের জন্যে যে লোভ তোর, তার শাস্তি এই নে। তোর দেহের পাপের চরম শাস্তি দিলাম। সেদিন বুঝিনি মুক্তো—পরে বুঝেছি।

তিন

সে মামলা বিখ্যাত মামলা আসানসোলে।

খবরের কাগজে হৈ-চৈ।

কাঞ্চন গোপন করেনি। সব বলেছিল। সব অকপটে বলেছিল। সে বেশ্যার মেয়ে। বেশ্যাবৃত্তিই করে এসেছে। চৌদ্দ বছরে শুরু করেছিল—আজ চব্বিশ বছর। অর্থ ছাড়া কিছু চায়নি। ভোগ ছাড়া বোঝেনি। মদে ছিল প্রবল লোভ। দেহভোগের কামনা—বহু পুরুষের সঙ্গ-লালসা ছিল বিলাস; ওই ছিল সুখ। হঠাৎ কি হলো তার। সমস্ততে তা অরুচি হলো। এ জীবন মনে হলো কণ্টক-শয্যা। মনে হলো—এই বিলাস ভোগে যেন বড অশান্তি, বড় জ্বালা।

সে গোপন করলে না—সে একজনকে ভালবাসলে। ভালবাসলে—তার গান শুনে। কীর্তন গান শুনে। কীর্তন গান শুনে সে কেঁদেছিল—অনেক কেঁদেছিল। তারই সঙ্গে সব যেন গলে ধুয়ে মুছে গেল। সে ঠিক করলে এই পাপ সে আর কববে না। সে মস্ত এক বড় লোকের কাছে ছিল—তার আশ্রয় ছাড়লে; তার মা এর জন্যে তার গয়না-ক'টি কেড়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, সে পথে বের হলো।

যে-জনকে সে ভালবাসে তার কাছে সে যায়নি—তার নাম কলঙ্কিত হবে বলে। কোথায় বেরিয়েছিল তার ঠিক ছিল না। বেরিয়েছিল পরিত্রাণ পেতে তার মার চাপানো এই পাপ ব্যবসা এই ঘৃণিত জীবন থেকে। কিন্তু পৃথিবীতে পাপী ব্যভিচারী সমাজ-বিরোধী কুৎসিত ভয়ংকর মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পঙ্ককুণ্ড করে রেখেছে পৃথিবীকে: তারা পথে এই অসহায়া মেয়েটিকে রক্ষকের ছদ্মবেশে অপহরণ করে পৈশাচিক অত্যাচার করেছে। মেয়েটি হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। পুলিস জোর তদন্ত করছে।

খবরের কাগজে ফলাও করে সংবাদ ছাপা হয়েছিল। তার ছবি সমেত।

সে সব প্রকাশ করেছিল—কিন্তু তাঁর নাম প্রকাশ করেনি; কুমারের নামও সে বলেনি।

কুমার কিন্তু এসেছিলেন।

এসে বসে বলেছিলেন—হঁ। তু একটো দেখালি বটে কাঞ্চন। হঁ। তা—খুব ভাল লাগছেক রে—! হঁ খুব ভাল লাগল আমার। পুলিস বল্‌বেক—

কাঞ্চন বলেছিল—আমি তো আপনার নাম করিনি কুমারসাহেব।

হেসে কুমার বলেছিলেন—তু করিস নাই কিন্তুক পুলিসের কাছে কি ছাপি থাকে গ? উয়ারা একটুকুন গন্ধ পেলে—নাড়িনক্ষত্র সব টেনেটুনে ঠিক বার করবেক। তুর মায়ের নাম তো শুনেছে। ব্যস আর কি চাই? সব জেনেছে, তুর বোসবাবুর নাম সমেত; হঁ তাও জেনেছে উরা।

কাঞ্চন বলেছিল—না—না—কুমারাসাহেব—

—হঁ। সে নাম উঠবে নাই—সি ভয় তু করিস নাই। আমার লাজ-লজ্জা নাই কাঞ্চন। আমি সিধা মানুষ। বেটাছেলে পযসা আছে—কারি—কারি। হঁ—বেআইনী হয় দাও সাজা দাও। মামলা করা। পাপটাপ উসব আমি বুঝাপড়া করব ঠাকুরদেবতার সঙ্গে। কিন্তু রাজাসাহেব বলে—না। মামলাতে নামটাম উঠলে চলবে নাই, উ চাপা দাও। টাকা দিয়া চেপ্যা দাও হে। হুকুম হয়ে গেছে। আমাদের নাম চাপা পড়লে বোস উকীলের নামও চাপা পড়বেক। তবে আমি যাব উয়াব কাছে। বলব—কি হলো দেখ। ইটার লেগে দায় তুমার আছে কি না বল!

কাঞ্চন আকুতিভরে বলে উঠেছিল—না—কুমাবসাহেব না। আপনার পায়ে ধরছি।

অনেকক্ষণ অভিভূতের মতো বসে থেকে কুমার বলেছিলেন—তু আমার কাছে কিছু চেঁয়ে লে কাঞ্চন। আমি তুকে দোব। দিতে আমার খুব সাধ হচ্ছে রে!

একটু হেসে কাঞ্চন বলেছিল—কি নেব? বলুন কি দেবেন? যা দেবেন তাই নেব আমি।

—বেশ। আমার মন হচ্ছে কাঞ্চন তুকে আমি বর্ধমানে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে দি। আর তিরিশ টাকা করে মাসে দিব। তু বর্ধমানে থাক। মাসে একদিন করে তু লালপাহাড়ী আসবি, এই পূন্নিমেতে পূন্নিমেতে—। কীত্তনে তুর মন গলেছে—তু ঠাকুরকে কীত্তন শুনায়ে যাবি।

কেঁদে ফেলেছিল কাঞ্চন।

বলেছিল—আপনি আমার সত্যি রাজা। রাজা নয় বাদশা। নইলে দাসী-বাঁদীকে এত দয়া করে কে? নোব—কুমারসাহেব নোব। আপনি যখন ডাকবেন যাব। তবে—

হাত জোড় করে বলেছিল—মদ খাব না। নাচব না।

—বেশ কথা রইল।

কুমার চলে গিয়েছিলেন।

দিন সাতেক পর, তখন কাঞ্চন সুস্থ হয়েছে অনেকটা। কুমারসাহেব এলেন দলিল নিয়ে। বর্ধমানের বাড়ির দলিল। তিন হাজার টাকায় ছোট একটি বাড়ি—একটি পুকুরের পাড়ে। তিনি একা নন—সঙ্গে কাঞ্চনের প্রিয়তম মানুষটি। বোসবাবুকেও নিয়ে এসেছেন। এ দলিলের কারবার তাঁর হাত দিয়েই হয়েছে। স্থির গম্ভীর মুখে সারাক্ষণ বসে থাকলেন। বুঝতে পারলে না কাঞ্চন—তিনি বিরক্ত কি প্রসন্ন। কথাও বিশেষ বললেন না। ওই দুটো-চারটে।

প্রথম কথা বললেন—এখন ভাল আছ?

উত্তর দিতে গিয়ে কাঞ্চনের চোখে জল গড়িয়ে এল। মুখে কথা বলতে পারলে না—ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

এরপর কুমারসাহেব কলরব শুরু করে দিলেন। বিচিত্র মানুষ, প্রাণের উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ভরা।—এই তুর দলিল। টাকা আমার, ওই বোসসাহেব করে দিলেন। উকে বললাম—আমি মশায় মাথা গুঁজবার জাগা করে দিলাম, ইবার মনের মাথা গুঁজবার বেবস্থা আপনাকে করতে হবেক। নইলে ধম্মে পতিত হতে হবে আপনাকে।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় কথা বললেন তিনি—কাজটা ভাল করনি তুমি। এইভাবে ঘর থেকে পালিয়ে আসা—

সে চুপ করে ছিল।

তারপর তিনি আবার বললেন—বর্ধমানে যদি নামলে তবে আমার ওখানে গেলে না কেন?

তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। বলতে পারেনি—আপনি ফিরিয়ে দিলে কি করতাম? বলতে পারেনি—কি করে বলতাম আপনাকে ভালবেসে আপনার কাছে এসেছি। দেহের ব্যবসা যারা করে তারা ছলনা করে অভিনয় করে বলতে পারে—গলা জড়িযে ধরে বলতে পারে—আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সত্যিই যখন ভালবাসে তারা তখন তা পারে না, মুখ থেকেও কথা বের হয় না।

আবার তিনি বললেন—কি বিপদ ঘটালে বল তো?

আবার কাঁদলে কাঞ্চন।

কুমারসাহেব এবার কলরব করে উঠলেন—সব তো আপনার লেগ্যা মশায়! হঁ—আপুনি আবার বকতে লাগলেন।

হেসে তিনি বললেন—আমার জন্যে হলে সেটা আমার লজ্জা কুমারসাহেব। তবে কীর্তন শুনে কেঁদে যদি মনে হয়ে থাকে এ পাপ করব না—যাকে ভাল লেগেছে তাকেই ভালবাসব—তবে আলাদা কথা। তাতে আমারও কলঙ্ক নেই—ওরও পুণ্য আছে—মুক্তি আছে।

—উসব আপনাদের ভাল ভাল কথা, পঁথির কথা, কেতাবের কথা। মানুষের কথা হয়। বুঝলেন! আপনাকে দেবতা বলে ভজেছে—

—মানুষকে দেবতা বলে ভজা ভুল কুমারসাহেব। দেবতা দেবতা, মানুষ মানুষ। তবে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যেও দেবতা উঁকি মারে মধ্যে মধ্যে। ওর কাছে দেবতা উঁকি মেরেছে আপনার মধ্য দিয়ে। আপনিই ওর সত্যিকারের পথ করে দিলেন। যা ব্যবস্থা করে দিলেন—তাতে যদি ও কীর্তন শিখে শুদ্ধভাবে পেটের ভাতটা জুটিয়ে জীবন কাটাতে পারে তবে ওর মুক্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না।

—এই দ্যাখেন। আমার মতো লোককে দেবতা বানায়ে দিলেন। একটা মাতালকে বেশ্যাখোরকে দেবতা! তা আপনারা সব পারেন মশায়—উকীল লোক—। হা-হা করে খানিকটা হেসে কুমার আবার বললেন—তো কীর্তন উ গাইবেক—তো শিখাবার

ভারটো আপুনি লেন। মজালেন তো আপুনি গো! ওঃ কী গেয়েছিলেশ
—মাইরি—হ্-হ্-হ্!

হেসেছিলেন একটু তিনি। বলেছিলেন—দেবতা নেই কোথায় কুমারসাহেব। সর্বত্র আছে—সবার মধ্যে আছে। নইলে সেই মেয়েটিই বা এই মেয়ে হয় কি করে? সব ছেড়ে পথে বের হয় কি করে? দেখুন ওর মধ্যে থেকে যে দেবতা বের হলো তাকে মারবার জন্যে কিভাবে দল বেঁধে পিশাচরা জুটল—কি অত্যাচারটা করলে। কিন্তু মরল সে? আর আপনি? তোষামোদ তো করি নে, সে জানেন আপনি। অনেক পাপ, অনেক গলদ আপনার আছে—আবার অনেক পুণ্যও আছে। শেষ পর্যন্ত কোন্‌টা টেঁকবে কোন্‌টা টেঁকবে না জানি না—তবে যদি দেবতা পাথর ফাটিয়ে বের হয় তবে সে দেবতা অনেক কিছু করবে দুনিযার জন্যে। আপনাদের রাজাসাহেব পারবেন না, আপনি পারবেন। সংসারে যারা হিসেবী তারা জীবনের ব্যালান্স শীটে হিসেব মিলিয়ে চলে; দেউলে পিশাচও হয না আবার পুণ্যের ক্রেডিটে পাহাড় তুলতেও পারে না।

কথাটা তিনি মিথ্যা বলেননি। রাজাসাহেবই অনেক তদ্বির করে মামলাটাকে ধামাচাপা দিয়েছিলেন। আসামী পুলিস বের করেছিল কিন্তু তদ্বিরের ফলে তারাও খাঁলাস হয়েছিল। তার কারণ ছিল—রাজাসাহেবের হিসেব।

লালপাহাড়ীর রাজবাড়ির অনেক কেলেঙ্কারি বের হবে। কুমারের নাম তো উঠবেই খবরের কাগজে, আদালতেও টানতে পারে। হযতো কাঞ্চনের কাটা থুতনি পিঠের কাটা দাগও বেব হতে পারে। কুমার বলেছিলেন—হোক ক্যানে হে, তাই হোক। তাই আদালতেই বলব। লাজ কিসের ইতে? আঃ! জানাজানি হলো তো আমার বেগুনবাড়ি ভেসে গেল। কিসের কার ধার ধারি গ!

তবুও রাজাসাহেব হতে দেননি।

কাঞ্চনকে হাসপাতাল থেকে কৃশ্চানদের আশ্রমে রাখা হয়েছিল। তার মা এসেছিল নিতে। কাঞ্চন যাযনি। রাজাসাহেব কাঞ্চনকে বলেছিলেন—শুন্ কাঞ্চন, তু লোকগুলানকে দেখে চিনতে পারলেও চিনিস না। বুঝলি! কুমারের কেলেঙ্কারি হবে—চাঁপা আমার কাছে রইছে—আমার হবে, বোসবাবুরও হবে। আর তুকে নিয়ে আদালতে খিস্তি করবেক রে!

সে-খিস্তির নমুনাও তিনি তাকে শুনিয়েছিলেন। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়েছিল। বলেছিলেন—উহারা বলবেক কি জানিস? বলবেক তু নিজে গিয়েছিলি—টাকার লাগে। তু তো খানকীর বেটী খানকী। তুদের তো এই করণ—এই করে তো খাস!

সে বলেছিল—না—না রাজাসাহেব। কাজ নেই। আমি চিনব না। আমি চিনব না।

রাজাসাহেব বলেছিলেন—হুঁ। তবে তুকে আমি কথা দিছি—উ শালার লোচ্চাদিগে

আমি সাজা দিব। হঁ কঠিন সাজা দিব। তুকে ছামুতে রেখে সাজা দিব, তুর পায়ে ধরাব।

—না। তাতেও কাজ নেই রাজাবাহাদুর। সেও চাই না আমি। কাঞ্চন বলেছিল। মনে মনে সে বলেছিল—যে পাপ জীবনে করেছি এতদিন—এ আমার সেই পাপের সাজা! এতেই যেন তার মুক্তি হয়।

তাই হয়েছে মুক্তো। ওই সাজাতেই মুক্তি আমার হয়েছে।

এরপর আমার আরম্ভ হলো নতুন জন্ম রে—নতুন জন্ম। বর্ধমানের বাড়িতে এসে শাক-অন্নে দিন কাটাতে লাগলাম। উনি আমার কীর্তন শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। বর্ধমানের রাজলক্ষ্মী ঢপ গাইত; ভাল গাইত। তার দলে দোহারকি করবাব কাজ করে দিলেন। কিন্তু নিজে চলে গেলেন বর্ধমান থেকে। কথাটা চাপা থাকেনি। সংসারের কিছু মানুষ আছে মুক্তো, যারা দুনিয়াতে মিথ্যে অত্যাচাবের প্রতিবাদ কবে না, সয়েই যায়, বিশেষ করে সঙ্গে যদি কেউ স্নেহাস্পদ জড়ানো থাকে। এই মানুষটি সেই দলের মানুষের একজন, হয়তো বা তাদের মধ্যে সেরা মানুষ। যাবা ভাগ্য মানে তাবা বলে এরা এই ভাগ্য নিযেই এসেছে। আমারও তাই বলতে ইচ্ছে হয—ওঁর ভাগ্যই এই। ওঁব ভাগ্যে যে মেযে ওঁকে প্রাণ দিযে ভালবাসবে সেই তাঁকে আঘাত করবে আব দুর্নামেব ভাগী করবে।

একটু হেসেই কাঞ্চন মেয়েকে বললে—ঠাকুরদেবতাতে তোর বিশ্বাস তো তেমন নেই মুক্তো, আমি তো জানি। কৃশ্চানদেব ইস্কুলে তোর যখন পড়াবাব ব্যবস্থা উনি কবে যান, তখন আমাব মত ছিল না। কিন্তু ওঁব কথায় তো না আমি বলিনি কখনও। উপায়ও ছিল না। এখানকাব ইস্কুলে নেবে না বলেছিল। নিলেও পাঁচজনে দশকথা কইত, সে সহ্য করা তো সহজ হত না।

মুক্তো হেসে বলেছিল —এতে আর ঠাকুবদেবতা বিশ্বাস-অবিশ্বাসেব কথা তুলছ কেন? ভাগ্য মানি আব না মানি যেমন মানুষের কথা বললে—বাবাব কথা—তেমন মানুষ আছে—নিশ্চয আছে। মিথ্যে দুর্নাম অপবাদ সহ্যই কবে যায় চুপচাপ—প্রতিবাদ কবে না; ববং মিষ্টি হাসি হাসে। আছে বই কি। তারা বড়মানুষ।

—না। তারা হলো ভক্তমানুষ, ভগবানেব-কৃপা-হওয়া মানুষ। এইটেই তুই বিশ্বাস করবি কি না করবি তাই বলছিলাম। জানিস মা—কলঙ্ক—মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েই তো ভগবান সংসারেব কাছ থেকে ভক্তকে আলাদা একা করে দিযে নিজেই তার সর্বস্ব হয়ে বসেন। দেখ—ওঁর দেখ। তাই হলো। মানুষটা তো মনে মনে সন্ন্যাসীই ছিল। তবু কাজকর্ম করছিল—সংসারেই ছিল। ভগবান বললেন—দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি। বলে আমাব মতো কলঙ্কিনীকে দিয়ে ভালবাসালেন—সংসাবকে দিয়ে কাদা ছোঁড়ালেন—ঘর ছাড়ালেন।

কাউকে কিছু বলেন না; ওঁর কাছে যে অল্পবয়সী উকীল কাজ করত, কাজ শিখত তাব হাতে কাজের ভার দিয়ে, 'কিছুদিন ঘুরে আসি, শরীর খারাপ' বলে চলে গেলেন; ওই উকীলই আমাকে মাসে কুড়ি টাকা করে দিত।

লালপাহাড়ীতে পূন্নিমেতে কেত্তন গাইতে যেতাম, তিরিশ টাকা হিসেবে পেতাম; উনি দিতেন কুড়ি, মধ্যে মধ্যে রোজগার হতো রাজলক্ষ্মী মায়ের সঙ্গে ঢপ গাইতে গেলে; চলে যেত।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাঞ্চন বলেছিল—যা হলো তার জন্যে দুঃখ ছিল না মুক্তো—খেদ ছিল—খেদ হত আমার জন্যে ঘর ছাড়লেন উনি। আর আমি ওঁর জন্যে ঘর ছেড়েও ওঁকে পেলাম না! ভগবানকে ডাকতাম—নাম-গান করতাম মনে মনে ভগবানকে চাইতাম না, চাইতাম ওঁকে। তা—। তা—। সে চাওয়া আমার মিথ্যে হয়নি—ওঁকে পেলাম। কিন্তু সে কি পাওয়া মুক্তো। তার থেকে—।

চুপ করে গেল কাঞ্চনমালা। এত দীর্ঘ কাহিনী বলতে গিয়েও বারেকের জন্য এমন অভিভূত হয়নি। এমন অনর্গল ধারায় চোখ থেকে তার জল পড়েনি এই দু' দিনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করে সে বললে—তিন বছর পর ঝুলন পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় লালপাহাড়ী গিয়েছি গান গাইতে। লালপাহাড়ীতে আমার থাকবার জায়গা করে দিয়েছিলেন ওঁরা ওই ঠাকুরবাড়িতেই একপাশের একখানা ঘরে। নিরিবিলি ঘর। সন্ধেবেলা ঘরে বসে তিলক আঁকছি—আসরে যাব, হঠাৎ লোক এসে খবর দিলে কুমারসাহেব কলকাতা থেকে একটু আগে এসেছেন—গেস্ট-হাউসে আছেন—খবর পাঠিয়েছেন যেন দেখা করি—আসরে যাবার আগেই।

বুঝলাম বরাত আছে। ফরমাস কিছু হবে। গেস্ট-হাউস থেকে যখন ডাক এসেছে তখন গেস্ট আছে। হয়তো বরাত হবে বৈঠকী শোনাতে হবে। হয়তো বা গজল ঠুংরি—। কে জানে রাজারাজড়ার খেয়াল কখন কি হয়। হামিদনের কাপই আছে কিন্তু গাইতে হুকুম করবেন না তো? ভাবতে ভাবতেই গেলাম। ভরসার মধ্যে এই, তিন বছরের মধ্যে কুমার কথার খেলাপ করেননি।

বারান্দায় কুমার দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—আইচিস? আয়, কাকে এনেছি দেখ—। বোসবাবুকে ধরে নিয়ে আইচি। হঁ, কলকাতাতে দেখা।

বুকখানা ধড়াস করে উঠল, তরপর সে যেন খাঁচায় বন্ধ, দম-বন্ধ হওয়া পাখির মতো খাঁচার গায়ে ঝটপট করে মাথা কুটতে লাগল। হাত ঘেমে উঠল—পা কাঁপতে লাগল।

কুমার বলেই চলেছিলেন—শরীরটা খুব খারাপ করেছে বোসের। সন্ন্যাসী হওয়া কি উয়ার সয়? তার উপরে যত সব আনখাই কথা। কলকাতার ডাক্তারগুলান ভালও বটে আবার মন্দও বটেক। যত সব—

ঘরের ভিতর থেকে সেই মুহূর্তটিতেই ঠিক তিনি এসে দরজায় দাঁড়ালেন—চাপা গলায় ডাকলেন—কাঞ্চন।

আমি পাথর হয়ে গেলাম মুক্তো।

সেই লম্বা মানুষ, রোগা হয়ে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। মুখের সে লাবণ্য নেই—শ্রী নেই, সোনার মতো বর্ণ—সেই বর্ণের উপর যেন কে কালি-মাখা হাত বুলিয়েছে; কালিপড়া চিমনির মধ্যে আলোর রঙ যেমন দেখায়—তাই। পরনে বহির্বাসের মতো

থান কাপড়, গায়ে একটা সাদা পাঞ্জাবি। সে মানুষই যেন নয়। আমার মুখে কথা ফুটল না; তিনিই আবার চাপা গলায় বললেন—ভাল আছ?

তারপর একটু হেসে বললেন—তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। সুন্দর হয়েছ তুমি। ধবধবে সাদা লালপেড়ে গরদ পরেছ—কপালে তিলক—চমৎকার লাগছে।

আমি লজ্জা পেলাম। যত লজ্জা তত আনন্দ।

মনে মনে সারা মন যেন বলে উঠল—সব তো তোমার জন্যে। তোমার ভাল লেগেছে—আমার সব সাজ সার্থক হয়েছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—কিন্তু আপনি? এ কি শরীর হয়েছে? কি হয়েছে আপনার?

চাপা গলাতেই বললেন—গলায় ক্যান্সার হয়েছে। মৃত্যু-ব্যাধি কাঞ্চন।

গলায় ক্যা-ন্সা-র। মৃত্যু-ব্যাধি!

তিনি বলে গেলেন—চাপা গলা শুনছ না? গলার এখন এই অবস্থা। গান গাইতাম বলে বোধ হয় অহংকার ছিল। তাই সে অহংকার তিনি চূর্ণ করে দিলেন। জল খেতেও যন্ত্রণা হয়। কলকাতা এসেছিলাম ডাক্তার দেখাতে। দেখা হলো কুমারসাহেবের সঙ্গে। উনি বড় ভালবাসেন আমাকে। তোমার উপরেও মমতা খুব। জোর করে ধরে নিয়ে এলেন।

বলতে বলতে হাসলেন। হেসে এবার বললেন—ধরে নিয়ে এলেন লালপাহাড়ীর জলহাওয়ায় উনি সব সারিয়ে দেবেন আমার। গাড়িতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসা। আজ পূর্ণিমা—তুমি কীর্তন গাইবে। তুমি নাকি বড় ভাল গাইছ আজকাল। শুধু ভাল গাইছ না। গাইতে গাইতে কাঁদ, সঙ্গে সঙ্গে যারা শোনে তারাও কাঁদে। তাই শুনতে এলাম—কাঁদতে এলাম। গান শুনে কাঁদবার ভাগ্য তো সহজে হয় না; নিজে না কাঁদলে তো পরে কাঁদে না। কিন্তু গাইতে গাইতে কাঁদতে পারে এমন গাইয়ে কোথায়?

মুক্তো, গাইবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়নি—তখনই সেই মুহূর্ত থেকে কাঁদতে শুরু করেছিলাম। এ কি হলো? এ কি দেখলাম? হে গোবিন্দ!

গোবিন্দ নাম করলে তোর মুখ অপ্রসন্ন হয় কেন মুক্তো? নামটা মিষ্টি লাগে না, অসভ্য মনে হয়, নয়? অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী। একটুকরো হাসি—হ্যাঁ একটুকরোই বটে—পড়ন্ত বেলায় অন্ধকারপ্রায় ঘরে পশ্চিম দেওয়ালের কোন একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে একটি রেখার মতো একটু আলো যেমন পড়ে তেমনি সামান্য একটু হাসি তার রোগক্লিষ্ট মুখে ঠোঁটের রেখায় রেখায় ফুটে রইল।

একটু পরে বললে—যাক—তোর যে নাম ভাল লাগে সেই নামেই তাকে ডাকিস্। কিন্তু কাউকে ডাকিস। আজ জীবনে দেখছি তো ওই একটি নামই আছে—আর কিছু নেই—কিছুই নেই। তুইও নেই।

বলে চুপ করলে কাঞ্চন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—সেদিন আমি সত্যিই প্রাণ ঢেলে কীর্তন গেয়েছিলাম। তিনি বসেছিলে সামনে। চোখ বুজে কোলের উপর হাত দুটি রেখে

ধ্যানী যোগীর মতো। বন্ধ চোখ দুটির কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যে মধ্যে আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল—কান্নার জন্যে। উনি একবার বলেছিলেন—গান গাইতে গাইতে কাঁদবে—তাতে গলা বন্ধ হলে তো চলবে না। এ কান্না আনন্দের কান্না।

আমার সঙ্গে ছিল বর্ধমানের আর একটি মেয়ে—রাজলক্ষ্মী মায়েরই দলের মেয়ে। সেই আসর রেখেছিল আমার গলা বন্ধ হলে।

রাত্রে গান শেষ হলো। আমি গোবিন্দকে প্রণাম করে ঘরে গিয়ে বসলাম। তিনি হেসে অনেক প্রশংসা করে চলে গেলেন। আমি থাকতে পারলাম না। আমার সব বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

লালপাহাড়ীর পথঘাট সব আমার চেনা। তিন বছর এখানে কাটিয়েছি, এখানকার দারোয়ান চাপরাশী সকলে আমাকে চেনে। বেরিয়ে এগিয়ে এলাম। গেস্ট-হাউসের ফটকের মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। থমকে যেতে হলো।

বারান্দায় কুমার দাঁড়িয়ে। আরও ক'জন লোক। যেন কি কথাবার্তা হচ্ছে।

দারোয়ান বললে—বাবু—ওই বোসবাবু ফিরে এসে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন।

পড়ে গিয়েছিলেন মাথা ঘুরে ? আর বাধা রইল না। ছুটেই গেলাম। বললাম—কই ? উনি কেমন আছেন ? কুমারসাহেব !

কুমারসাহেব বললেন—এসেছিস ? ভাল হইছে। আমি ভাবছিলাম তোকে ডাকি। আয়।

সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন বিছানার পাশে। বললেন—থাক, সেবা কর। বাইরে লোক থাকল। ডাক্তারবাবু, বুঝিয়ে দাও হে কি কখন করতে হবেক।

উনি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। হয়নি কিছু। মধ্যে মধ্যে মাথা ঘোরে। দেহটা দুর্বল হয়েছে। তোমার থাকবার দরকার হবে না।

কাঞ্চন বলেছিল—না।

কুমারও বলেছিলেন—না মশায়—উ থাকুক না লয়।

বেয়ারাকে বললেন—আলোটা নিবায়ে নীল আলোটো জ্বেলে দে হে!

সকালবেলা দেখলাম—

শেষরাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দেখলাম—ওঁর বুকের পাশে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ওঁর হাত আমার পায়ের উপর। উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন একদৃষ্টে।

লজ্জায় মরে গেলাম।

তুই আমার মেয়ে, তুই বুঝবি না, জানবি না। আমি আমার দেহব্যবসা করা মায়ের মেয়ে; আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখেছি—এতে লজ্জা নেই; মা

বলত—এতেই ভাত এতেই কাপড়। লক্ষ্মী আমাদের এতেই। এতে লজ্জা নেই আমাদের। কিন্তু—

সেদিন কিন্তু সে যে কি লজ্জা হয়েছিল আমার! শুধু লজ্জা নয়, আনন্দ—আনন্দ না হলে তো এ লজ্জা হয় না—আসে না। এ বড় মধুর! বড় মিষ্টি!

ফল ধরলে গাছ নুইয়ে পড়ে।

জীবনের গাছে জীবনফল না জন্মালে তো এমন লজ্জার ভার ঘাড়ে চেপে ঘাড় নুইয়ে দেয় না!

আমার লজ্জা দেখে তিনি আশ্চর্য হেসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—যেয়ো না।

মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘেমে উঠছিলাম, একটু অপেক্ষা করে বললাম—বলুন!

—বলুন নয়, বল—বল।

পারলাম না। বুকের ভিতর কেমন করে উঠল। কান্না যেন উথলে উঠল সমাদরে। কিন্তু কাঁদব কেমন করে তাঁর সামনে।

তিনি বললেন—সারাজীবন তো বিচ্ছেদের আঘাত পেলাম, যাকে ভালবেসেছিলাম তার—। অকৃতজ্ঞতার আঘাত—আর তার কলঙ্কের লজ্জা মাথায় করে ভগবানকে ভালবাসতে গিয়েছিলাম। গান অনেক গেয়েছি—অনেক কেঁদেছি। কিন্তু সে নিজের দুঃখে নিজের লজ্জায়। তুমি আমাকে ভালবাসলে সব ছেড়ে, অনেক দুঃখ পেলে, ঠিক আমারই মতো। কাল সারারাত ঘুমুইনি, চোখ বুজে পড়েই ছিলাম। তুমি একসময় ঘুমিয়ে পড়লে—মাথাটা খাটের বাজুর উপর লুটিয়ে ছিল। বড় মমতা হলো—তোমাকে টেনে বুকের কাছে নিলাম, তুমি একবার চোখ মেললে—বললাম—খাটে উঠে একপাশে শোও। তুমি হয়তো বুঝলেও না কিন্তু তাই শুলে। তোমাকে চেপেও ধরেছিলাম। মানুষের দেহ—কাঞ্চন—এ দেহে কামনাই হলো কালিন্দীর স্রোত—দিন-রাত—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বইছে। এরই তটে ভগবানের বাঁশি বাজে কিনা জানি না—শুনিনি—তবে বাঁশি বাজে, সেই আত্মাপুরুষের বাঁশি বাজে। সে ডাকে। কাকে ডাকে তা জানি নে—তবে এক একজনকে দেখে মনে হয় এরই মধ্যে তার বাস, একে পেলেই তাকে পাব। জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া হয়ে যাবে। কাল তোমাকে মনে হয়েছে তাই। জীবনে বাকি বেশি দিন নেই, যে ক'টা দিন আছে সে ক'টা দিন নিজেকে আমাকে দাও।

আর সহ্য করতে পারিনি। হা-হা করে কেঁদে ভেঙে পড়েছিলাম।

তুই আমার জীবনের সেই অমৃতফল মুক্তো।

তিনিই আদর করে নাম রেখেছিলেন—কাঞ্চনমালার জীবনের ফল মুক্তামালা।

তোর ভাগ্য তুই তাঁকে পেয়েও পাসনি। আট মাস বয়স হতে-না-হতে তিনি চলে গেলেন।

মুক্তো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মুখ তার যেন মাটির মূর্তির মতো অথবা পাথরে গড়া। এই কয়েকদিন ধরে এ কাজ ও কাজ মায়ের সেবার মধ্যে এই কাহিনী সে শুনে এসেছে। প্রথম দিকটায় সে আঘাত পেয়েছে। যখন সে শুনেছে তার মায়ের প্রথম দিকের কথা তখনকার আঘাত তাকে প্রায় বিহ্বল করে দিয়েছিল। যখন সে প্রথম তার বাবার আসরে এসে গান গাওয়ার কথা শুনেছে—তাঁর জীবনের লাঞ্ছিত প্রেমের কথা শুনেছে, তাঁর অসাধারণ ধৈর্যের কথা শুনেছে তখন শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তার মন ভরে উঠেছে। তার মায়ের শেষজীবনের কথাতেও তার মায়ের উপর শ্রদ্ধা হয়েছিল। কিন্তু তারপর?

মা কাঞ্চন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো। তার অন্তর যেন কঠিন কিছুর স্পর্শে শিউরে উঠল। সে ডাকলে—মুক্তো।

মুক্তো মুখ ফেরালে তার দিকে।

মা বললে—বলবার আমার কিছু নেই আর। মরতেও খেদ নেই। এত কথা তোকে বললাম—তিনি তোকে সব কথা বলতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—কাঞ্চন, মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা আমি করে গেলাম; কিন্তু ও বড় হলে ওকে অন্ধকারে রেখো না। ওকে সব কথা বলো। তাই বললাম—আর—

সে চুপ করলে।

মুক্তো তবু কোন কথা বললে না।

কাঞ্চন বললে—তিনি আমার বাপ, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করলেন না কেন বলতে পার?

কাঞ্চনকে কে যেন চাবুক মারলে। সে আর্তস্বরে বলে উঠল—মুক্তো!

মুক্তো বললে—তিনি যদি তোমাকে বিয়ে করতেন—

—বিয়ে তিনি করতে চেয়েছিলেন—বৈষ্ণব হয়ে মালাচন্দন—

—মালাচন্দন? ব্যঙ্গভরে কথাটা বলে উঠল মুক্তো।

—আর কি মতে হতে পারত বল? তিনি কায়স্থ—

—কেন রেজেস্ট্রী করে—

—হত না। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছেড়ে চলে গেলেও তিনি তাকে ছাড়েননি—।

—তা হলে—

—কি বল?

—কিছু না মা; চুপ করে একটু ঘুমোও। আজ ক'দিন ধরে তো বকেই যাচ্ছ। বারণ করলেও শোননি। এবার তো কথা শেষ হয়েছে। এবার একটু বিশ্রাম কর।

—বিশ্রাম করব রে। একেবারে বিশ্রাম।

একটু চুপ করে থেকে কাঞ্চন বললে—আজ তো বেস্পতিবার, চাঁপাকে লিখলাম—সে এল না।

—না এলে কি করবে বল? কি হবে মিথ্যা ভেবে?

—ভাবনা তোর জন্যে। সেও তো আজ গেরস্ত হয়ে ঘর বেঁধেছে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে—তারাও ইস্কুলে পড়ছে।

একটু হেসে মুক্তো বললে—আমার জন্যে ভেবো না তুমি। আমি মিশনে চলে যাব। খৃশ্চান হয়ে যাব।

—মুক্তো! চিৎকার করে উঠল কাঞ্চন।

মুক্তো বলে উঠল—তোমার ওই ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম করে তোমরা অন্যায় করেছ। আমার পরিচয় কি বলতে পার মা? কাঞ্চন কীর্তনওয়ালীর মেয়ে—এক বোসবাবু উকীলের এক—; বল মা বল, তুমি তার কে—কি?

কাঞ্চন রুদ্ধ রোষে উঠে বসল ধড়মড় করে, মুখ-চোখ তার লাল হয়ে উঠেছে—সে বললে—আমি তাঁর দাসী। দাসী। তিনি প্রভু। আমি ভালবেসে তাঁর চরণে বিকিয়েছিলাম—আমি তাঁর দাসী—

মুক্তো বললে—আমি সে পরিচয় আমার পরিচয় থেকে মুছে দেব। আমি দাসীর মেয়ে নই। নিজে কারুর দাসী হব না। তোমার প্রভুর মেয়ের পরিচয়েও আমার কাজ নেই। আমি মানুষ। আমি মেয়ে। বলেই সে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাঞ্চন একদৃষ্টে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। থাকতে থাকতে বোধ করি আর পারলে না। ঘাড়টি লুটিয়ে দিলে বালিশের উপর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাঞ্চনমালা সেই যে ঘাড় লুটিয়ে পড়ল—সে ঘাড় সে আর তুলতে পারলে না।

দেহ জীর্ণ হয়েছিল, মৃত্যুর পদধ্বনি সে কানে শুনছিল—তাতে হতাশা তার খুব একটা ছিল না। রোগে দীর্ঘদিন ভুগলে মানুষ অনেকটা প্রস্তুত হয়ে যায়; তার উপব এই মানসিক আঘাতটা তার বড় লাগল। জীবনের সব কথা মেয়েকে খুলে বলবার পর এই ধরনের নিষ্ঠুর ঘৃণাত্মক আক্রমণ সে মেয়ের কাছে প্রত্যাশা করেনি। মেয়ে সে কামনা করেনি। কামনা সে তাঁকে করেছিল। তাঁকে পেয়েছিল—তার ফল সে। দেহব্যবসায়িনী কাঞ্চনের কোলে যদি তুই আসাতিস মুক্তো তবে তোকে আজ—। না—সে কথা আর কাঞ্চন মুখে আনবে না। তবে মুক্তো যেন তার মুখে থুতু ছুঁড়ে থুৎকার দিল। আর তার মরা বাপের উদ্দেশ্যে আকাশে ছুঁড়ল—তা এসে তারই মুখে পড়ল। জন্মের দায় যে কত বড় দায় তার কতটুকু তুই বুঝিস?

তোর জন্মকথা তুই জানিস নে, কাঞ্চন জানে।

রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণা লজ্জা ভয় সব কোথায় মিলিয়ে যায়। মাটি আকাশ চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সব মুছে যায়। কেউ থাকে না, কিছু থাকে না—ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্য কিছু থাকে না। সন্তান আসে—আসে তোরই মতো। কিন্তু তারও কোন বাসনা থাকে না। থাকে শুধু দু'জন। দু'জন মিশে একজন হয়ে যায়।

তিনি বলতেন—। থাক তাঁর কথা, তুই তাঁকে ঘেন্না করলি—অপমান করলি, আমাকেও করলি। যাক।

তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো মেয়েকে ডেকে—। না; সে কথা কুৎসিত। বাল্যকালে সে তাদের পাড়ায শুনেছিল—যুবতী মেয়েকে বলেছিল বুড়ী মা!

ওই বুড়ী মা বৈশাখ মাসে কি যেন ব্রত করেছিল। যুবতী মেয়ে প্রমত্ত অবস্থায় মাকে তার যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিযে বলেছিল, সেইগুলো মনে পড়ে না? তোর পড়ছে না—কিন্তু ধর্ম তোর ভোলেনি—সে যে লজ্জায় মরে গেল। ধর্ম? ধর্ম আবার কিসের লা বুড়ী কসবী? মুহূর্তে মায়ের পুরনো দিনের ভাষা বেরিয়ে এল। শেষে বলেছিল—একদিন তোরও এমনি হবে দেখবি। ধর্ম আজ তোব কাছে লজ্জায় মরছে। বয়স যখন পড়বে—তখন দেখবি সে মুখ খুলে এসে বলবে—নে আমার পাযে ধর।

থিয়েটারে চাকরির সময় সে দেখেছে। গল্প শুনেছে। এ পাপ মানুষ জন্মেব দায়েও করে—তাদের সমাজে করে, আবার অন্য সমাজের—যাদের এ জন্মের দায় নেই তারাও কবে—কর্মের দায় তাদের। পাপ থেকে আবার মুক্তির টানও সবারই আছে। তুই যা বললি মুক্তো, বললি, গোবিন্দ তোকে মার্জনা করুন।

বিনোদিনী অ্যাক্ট্রেস—তোরা এখন বলবি অভিনেত্রী—তাব কথা জানিস? এত বড় অ্যাক্ট্রেস হয়ে গিরিশ ঘোষের স্নেহ পেয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষ পরমহংসদেবের কৃপা পেয়েছিলেন। ভেলায় চড়ে মহাসমুদ্র পার। জন্মকর্ম সব জড়িয়ে পাপের সমুদ্র অনায়াসে পার হয়ে গিয়েছিলেন বিনোদিনী।

তারাসুন্দরীকে সে নিজে দেখেছে। তাঁর ছেলেদের দেখেছে। বড ছেলে থিয়েটারে কাজ করত। আজও হয় তো করে কিম্বা অন্য কিছু কবে। ছোট ছেলে খোকাকে দেখেছে। তার সমাদর দেখেছে, ছেলেটির তরিবৎ দেখেছে, তার মর্যাদাবোধ দেখেছে। খোকার মৃত্যুর পর তারাসুন্দরী ভুবনেশ্বরে গিযে বাকি জীবনটা কাটিয়েছেন।

কই তারা কি এমন অপমান করেছে তাদের মাযেদের?

পাছে তার জীবনের পাপ তাকে স্পর্শ করে তাই সে তাকে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তার বাপ—সেই অপরূপ মানুষ—তাকে সে আজ অপমান করলে?

—মিশনারী ইস্কুলে তাকে পড়তে দেওয়া তার ভুল হয়েছিল। ভুল তার নয়—ভুল তাঁর।

সে জানে সংসারে কেউ কারুর ভার নেয় না। সবার ভার যাঁর উপর—ভার তাঁর। কিন্তু তবু—তবু মন মানে না। চাঁপা—তার সহোদরা। শুধু তাই নয়, চাঁপাও আজ দেহব্যবসায়িনী নয়, সে গৃহস্থ, সে সংসারী। তাকে সে আসতে লিখেছে। কিন্তু এই মুক্তো কি সেখানে মানিয়ে চলতে পারবে? পাপে জন্মে নয় কর্মে; পাপ কারুর জীবনে অক্ষয় বট নয়, পাপ জীবনের আগাছা। নিড়েন দিয়ে ফসলের ক্ষেতের মতো পরিষ্কার করলেই পুণ্যের ফসল ফলবে।

চাঁপার জীবনেও তাই ফলেছে। তার আজ স্বামী হয়েছে—ছেলে-মেয়ে হয়েছে, সংসার হয়েছে। সেও ওই ভালবাসার জন্যে হয়েছে।

সুরেনদা চাঁপার স্বামী—থিয়েটারে ড্যান্সিং মাস্টার। সুরো মাস্টার। সুরো মিত্তির নেপা বোসের ছাত্র। সুরো মাস্টার মিত্তির কায়স্থবাড়ির ছেলে। বখা ছেলে। আলিবাবার আবদালার পার্টে নেপা বোসের পরেই ছিল সুরো মাস্টারের নাম। যেদিন কুমারসাহেব তাকে থিয়েটারে মর্জিনার পার্টে দেখে তার উপর ঝুঁকেছিল, সেদিন সুরো মাস্টারই ছিল আবদালা। সেই সুরেন এখন চাঁপার স্বামী। মানুষ পাপী নয় রে মুক্তো; পাপ তবে সয় না। যৌবনের নেশার ঝোঁকে করে—ওসময় জীবন থাকে জোরালো—জীবনের ঘরে যে পরমাত্মাই বল আর আসল মানুষই বল তাকে সে কায়দা করে রাখে রে! তখন ছোটে সে পাগ্‌লা ঘোড়ার মতো। মানুষের মতো মানুষও তাকে বাগ মানাতে পারে না কোন রকমে, ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে বসে থাকে।

ওঃ কি মানুষই ছিল সুরেন মিত্তির। সুরো মাস্টার। কি মানুষ কি হলো! মেয়েরা বলত—ঠগ সুরেন।

ঠকাতো মেয়েদের। না, ঠকাতো না। নাচের দলের মেয়েদের ঘরে পালা করে রাত্রিবাস ছিল তার বাধা নিয়ম। যেদিন যার পালা সেখানে ঠিক গিয়ে উঠত এগারটার পর। ওটা তার ঠকানো ব্যবসা ছিল না—ওটা ছিল তার দক্ষিণে। সে বলত—এই! আজ দক্ষিণে আদায়ে যাব।

তবে সে খাবার কিনে নিয়ে যেত। খাবারের প্রথম দফায় নুন নয় শাক নয়—মদ।

সে সব মনে করতেও তার মন কেমন ছি ছি করে। গোবিন্দ স্মরণ করে সে মনে মনে। হয় তো সুরেনও আজ করে। বলে ওঠে হরি-হরি-হরি। কিম্বা তারা—তারিণী।

কলকাতার কাছেই সুরো মিত্তিরের বাড়ি। চেহারা ভাল ছিল—গানের গলা ছিল—তালে হুঁশ ছিল। ইস্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠেই পেয়েছিল থিয়েটার বাতিকে। ফিমেল পার্টের জন্য মেয়েলি চেহারা, গলা যা দরকার তার ছিল—সুতরাং ইস্কুল থেকে খসে পড়ে অ্যামেচার ক্লাবে ভিড়ে গেল। অ্যামেচার থিয়েটার থেকে যা রোজগারটা হত তাতে তখনকার পাঁচসিকিতে পাঞ্জাবি—ন-সিকে আড়াই টাকায় পেটা ধুতি—তিন-চার টাকায় লপেটা—দু'-আনা বাক্স কাঁইচি সিগারেটের দিনে চলে যেত তার। ভাতটা ঘরে থাকতো বাড়িতে—সুরেন বলতো ফাদারস্ হোটেলে মিলত। বাপ মারা যেতে ভাইরা ঝেড়ে ফেলে দিলে। বিয়েটা বাপ দেয়নি, সেও করেনি, কারণ তখনই সে ভ্রমরা হয়ে উঠেছে। এরপর মথুর শার যাত্রার দলে। প্রথমে হিরোয়িন, তারপর ড্যান্সিং মাস্টার। ওই যাত্রার দলে থাকতেই নেপা বোসের সঙ্গে আলাপ। কলকাতার বড়লোক বাড়িতে যাত্রা হচ্ছিল। সেই আসরে নেপা বোস ওর নাচ দেখে ওকে ডেকে বলেছিলেন—পা তো তোমার মন্দ নয়, চেহারাখানাও আছে—গলাটা

একটু মেয়েলি—সেটা অভ্যাস করে করেছ। তা—কি পাও? থিয়েটারে এস না। পার্টও করতে পার।

সে ঝট করে ঝুঁকে পড়ে পায়ের ধুলো নিয়েছিল।

নেপা বোস পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—মারব থাপ্পড়। বলা নেই কওয়া নেই পায়ে হাত! জাত কি? বামুন নয় তো রে বাবা!

—আজ্ঞে না কায়স্থ।

—বহুত আচ্ছা—নে বাবা এবার দু'বার নে—ঝেড়ে মুছে চেঁচে ছুলে নে! কিন্তু চামড়ার জুতোর ঘামে দুর্গন্ধ বড্ড।

সে হেসেছিল।

তিনি বলেছিলেন—কাল যাস। তারপরই জিজ্ঞেস করেছিলেন।—বিয়ে করেছিস?

—আজ্ঞে না।

—জিতা রহো বেটা, ঠিক লাইনে এসেছিস—। বিয়ে করিস নে।

থিয়েটারে ঢুকে সে সহজেই পথ করে নিয়েছিল। ঝোলে ঝালে অম্বলে সবেই সে কাজে লাগল এবং কাজে লাগবার নেশা ছিল তার। তবলা বাঁয়ার ভাল হাত ছিল, অ্যামেচার যাত্রায় সে মেক-আপম্যানের বিদ্যে শিখেছিল—তাতেও হাত লাগাত! বড়বাবুর হুকুম শুনত, পাশে পাশে ঘুরত, ম্যানেজারকে সব খবরাখবর জোগাত, যিনি সব থেকে বড় অ্যাক্টর—তাঁর পরিচর্যা করত।

আস্তানা একটা ছিল, সেটা কালীঘাটে। হাজরা পার্কের পাশে ছিল মেথরপাড়া—তার গা ঘেঁষে ছিল একটা বেশ্যাপল্লী—তারই কাছাকাছি একটা আড্ডা তার ছিল। সেখান থেকে উঠে এসে আড্ডা নিয়েছিল—গ্রে স্ট্রীটের কাছাকাছি শ্যামবাজারের উপর তলায় দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে। সেও শুধু নামে। সকাল বেলাতেই সে পাশবোতাম পাঞ্জাবি চড়িয়ে এসে বসত থিয়েটারের টিকিট ঘরের পাশে। পাশেই চায়ের দোকান—পান-সিগারেটের দোকান। বেগুনী ফুলুরী তেলেভাজারও একটা ফুটপাথি দোকান ছিল। তেলেভাজার সঙ্গে চা, তারপর কখনও বিড়ি কখনও সিগারেট। কোন কোন দিন মালিক বড়কর্তার কেস থেকে সরানো দামী চুরোট ধরিয়ে বসে থাকত, তারই মতো আর দু'চারজন যারা আসত তাদের সঙ্গে গল্প করত। গল্প অন্য কিছু নয়—অন্য থিয়েটারে চলতি বইগুলির সমালোচনার নামে শ্রাদ্ধ। এরই মধ্যে উপযাচক হয়ে থিয়েটারের ভিতরে যারা স্টেজের কাজ করে তাদের সাহায্য করত। নতুন বইয়ের সময় প্রথম দশ-পনের দিন সকালবেলায় গানের মেয়েরা আসত, রিহারস্যাল দিত; সুরো ড্যান্সি মাস্টার—গানও সে জানত সুতরাং রিহারস্যাল দেওয়াতো সেই।

বেলা এগারোটা-বারোটায় বাসায় ফিরত, স্টোভে রান্না করত; রান্নার মধ্যে ভাতটা ফুটিয়ে নিত, আর একটা ভাজা কি তরকারি; তার সঙ্গে রেস্টুরেন্ট থেকে খানিকটা মাংস আনিয়ে নিত। তারপর নিদ্রা। আবার বিকেলে উঠে থিয়েটার। সেই বেশবাস! তবে, ওবেলাই হোক আর এবেলাই হোক প্রত্যেক বেলাতেই মনে হত পাটভাঙা

জামাকাপড়। তার আর্থিক স্বাচ্ছল্য তার হেতু নয়, ওটি তার নিজের কৃতিত্ব। সে নিজেই কাপড় কুঁচিয়ে নিত—চমৎকার হাত ছিল ওই কোঁচানো বিদ্যাটিতে। ওই কাপড় কোঁচানো বিদ্যের জন্যই সে মালিকের প্রসাদ পেয়েছিল। মালিকের চাকরের কোঁচানো বিদ্যের হাতের চেয়েও তার হাত সরেস ছিল। মাসের প্রথমেই খানকয়েক কাপড় তার কাছে আসত—সে সেগুলি কুঁচিয়ে ব্যাগে পুরে থিয়েটারে কর্তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রণাম করে চলে যেত। এ ছাড়াও তার আর একটা কৌশল ভালভাবে জানা ছিল। সেই বাটি-ইস্ত্রি বিদ্যে। তখন ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ছিল না, লোহার ইস্ত্রি, তারও উনোন-টুনোন নিয়ে অনেক হাঙ্গামা। বাটি-ইস্ত্রি মানে ভারী একটা কাঁসার বাটি গরম করে তাই দিয়ে ইস্ত্রি করে নেওয়া। ব্যাপারটায় সরঞ্জামের হাঙ্গামা কম কিন্তু ইস্ত্রিকারীর কৌশল বেশি। প্রতিবার জামাটি খুলে সঙ্গে সঙ্গে পাট এবং ইস্ত্রি করে রাখত সুবেন। কাপড় ছেড়ে পরত লুঙ্গি অথবা গামছা। এবং ছাড়া কোঁচানো কাপডখানিকে নিয়ে আবার তার কোঁচগুলি সংস্কার করে সদ্য কোঁচানো কাপড়ের মতো গুটিয়ে বেঁধে রাখত।

এই সুরো মিত্তির—বাইরে সুরো মাস্টার—নাচের মেয়েদের মহলে গোপনে সুরো নচ্ছাব—প্রকাশ্যে সুরোদা। এই সুরো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে অবাক করে ভালবেসে বিয়ে করেছে চাঁপাকে।

সুরোর এই বিয়ে নিয়ে থিয়েটার মহলে কম হাসিঠাট্টা হয়নি। কিন্তু সুরো বলত—পরশমণি জান মানিক ? ভালবাসা পরশমণি, ওর ছোঁয়া লাগলে লোহা সোনা হয়।

* * *

অন্যে সেকথা বিশ্বাস করুক না করুক কাঞ্চন বিশ্বাস করে। তাব জীবন সোনা হয়েছে। সে সোনায় সে জীবনকে গড়েছে রাধাশ্যামের মন্দির করে; সুরো মিত্তির আর চাঁপা—তারা মন্দির গড়েনি—এই সোনার মূলধনে গড়েছে ঘরসংসার। তারা এখন গেরস্থের মতো বাস করছে।

কাঞ্চন চলে এল লালপাহাড়ী থেকে; কুমার কাকার বাগানে এল রূপসী হামিদন বেগম। সেখানে নতুনের ছটায় মহফিলের ঝুমুষ ঝলমলিয়ে উঠল। নাচ গান খানা পিনা সে প্রায় বারো মাসে তের পার্বণের ব্যাপার। রাজাসাহেব একটু চঞ্চল হলেন। এ পথের পথিকদের নেশা রূপেরও নয়, দেহেরও নয়, গুণেরও নয়। এ নেশা নিত্যনতুনের নেশা। রাজাসাহেব হিসেবী লোক বলেই তাঁর নতুনের নেশাটা একটু দমে থাকে। সংসারে যে মাতাল দাম হিসেব করে মদ খায়, তার কেনা বোতলটা না শেষ হওয়া পর্যন্ত নতুন কেনে না। হোক না কেন নতুন বোতলের গড়ন সুন্দর এবং মদের রঙ ও গন্ধ নতুন রকম। অনেক ধন এবং অনেক জনের মাথায় যারা দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসে, তাদের মধ্যে এই ধরনের হিসেবী লোক কম। লোকদের

একজন এই রাজাসাহেব। কিন্তু মন তো চঞ্চল হয়। ভিজে ঘাসে আগুনের ফুল্কি এসে পড়ার মতো পড়ে, খানিকটা ঘাস ঝলসে দেয়, তারপর নিভে যায়। কিন্তু বাতাস যদি অনুকূল হয় আর আকাশে যদি প্রখর রৌদ্র থাকে তবে ভিজে ঘাসকেও শুকিয়ে নিয়ে আগুন জ্বলে।

রাজাসাহেবের আশেপাশে পারিষদের দল ছিল সেই অনুকূল বাতাস আর জীবনের আকাশে খট্খটে চড়া রোদের মতো। অনেক টাকার সমাগম হয়েছিল তার জমিদারীর আকাশ থেকেই। বড় সাহেব কোম্পানি কয়লা তুলে আকাশপথে তার খাটিয়ে, তাকে গেঁথে টব নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল। তারা রাজার এলাকায় তার নিয়ে যাবার জন্য সেলামী দিয়েছিল মোটা টাকা।

মো-সাহেবরা রাজাসাহেবকে জপাচ্ছিল—"দেশে আর মান থাকছেক নাই, নানান জনে নানান কথা বলছেক। কুমারসাহেবের পিঁজরাতে এল নতুন পাখি, রাজাসাহেবের পিঁজরা সোনার হলে হবেক কি?—পাখিটা সেই বুড়ীধাড়ী।

রাজাসাহেব বলেছিলেন—বলুক হে, উহারা জানে নাই, পুরানো চাল ভাতে বাড়েক, সহজে হজমি হয়।

পরের দিন সব থেকে পেয়ারের মো-সাহেব—সে এল। তার পরনেব কাপড়খানা জামাটা ময়লা এবং ঘামের বিশ্রী গন্ধে প্রায় অসহ্য। রাজাসাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—এই—শালার-বেটা শালা।

সে বলেছিল—আজ্ঞা রাজাসাহেব!

—ই কি করে এসেছিস তু অঁ? ই কি কাপড়-চোপড়?

—আজ্ঞা হুজুর—ই কাপড়খানা আজ্ঞা খুব দামী, খাস ঢাকাই, আর জামার ছিটটা খাস মুরশিদাবাদি। হুজুর কিনে দিয়েছেন সিবারে, আমার পরে খুশি হয়েছিলেন—সেই থিয়েটারে যিবার কাঞ্চন আর চাঁপাকে পছন্দ করে আনা হলো! সেই আপনি শুধালেন কোন্ মেয়েটা সব থেকে ভাল—তা আমি বললাম ওই ওইটি—চাঁপা বল্যা মেয়েটি। আপনকার মনের সঙ্গে মিলে গেল। পরের দিনে সব গেলাম উদের বাড়ি, আপনি কিনে দিলেন এই জামাকাপড়।

রাজা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—হুঁ হুঁ মনে রইছে হে, বেবাক মনে রইছে। তা সে বহুদিনের কথা। পুরানো হইছে।

সে বলেছিল—আজ্ঞা হুজুর, পুরানোর কদর আপনি কইলেন কাল, পুরানো চাল ভাতে বাড়ে, সহজে হজমি হয়।

রাজাসাহেব বলেছিলেন—হঁরে, শালা এখুনও বলছি। তা কাপড়-জামা কাচাকুচি কর নাই ক্যানে হে? কি বদ গন্ধ উঠছে—শালার নাকের ফুটা দুটো বুজে গেইছে নাকি হে?

—আজ্ঞা না। নাক ঠিক আছে। তা পুরানো জিনিসের গন্ধ হয়। কাচতে গেলে যি ছিঁড়ে যাবেক। পাটে পাটে এলায়ে যাবেক। চাঁপা যি চাঁপা তাকে কাচাকুচা কর্যা দেখেন কি হয়? তার বদবাস আপনিও পান না, আমিও পাই না এই জামাকাপড়ের।

—ওরে শালা! শুয়ারের বাচ্চা! বলে হো—হো করে হেসে উঠেছিলেন। বড়া বুলেছিস রে শালার বেটা, খুব বুলেছিস!

এরপর কাঁচা ঘাস শুকিয়ে এই বাতাসে জ্বলল মনের আগুন। ঠিক কথা। এবং যে কথা সেই কাজ একেবারে সঙ্গে সঙ্গে। আগুন জ্বললে তো আর ঢাকা পড়ে না! চাঁপা বাতিল হলো কিন্তু তার কাজের ধারা আর কুমারসাহেবের কাজের ধারা একরকম নয়। কুমারের মেয়েমানুষ পোষার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে শুধু হৈচৈ দেওয়া-থোওয়ার মধ্যেই শুধু একটা আতিশয্য নেই, তাকে ছাড়বার সময় একটা ঝগড়া করে তাকে চাবুক মেরে একটা কাণ্ড না করে সোজা কথায় তাকে তুই চলে যা, এই নে তোর পাওনা বলে কারবার শেষ করতে পারেন না। কিন্তু রাজাসাহেবের ধারা-ধরন সোজাসুজি। কোন কারণে চটলে বিচিত্র সাজা দেন। চুল কামিয়ে ন্যাড়া করে ভাগিয়ে দেন। টাকাকড়ি দেন না কিন্তু জবরদস্তি টাকাপ্রাপ্তির রসিদ নেন। গভীরতব অপরাধে কঠিনতর শাস্তি হয়—মেয়েটা অক্ষত দেহে যায় অনেক সাক্ষীর সম্মুখে কিন্তু তারপর আর কোথাও গিয়ে পৌঁছয় না। কিন্তু এই এমনই ধারার জবাবের সময় সোজা ডেকে বলেন—ইবার ফারকৎ। এবং তাকে খুশি করে বিদায় করেন।

চাঁপাকে তিনি সোজাসুজি ডেকে বলেছিলেন—চাঁপা! তুর ইবার ছুটি! একটু হেসে বলেছিলেন—ই শালারা আর দেশের শালারা বদনামি করছেক। বলছেক কুমারসাহেবের এমন খুবসুরত নতুন বিবি এল আর রাজাসাহেবের সেই পুরনো বিবি—দশবছুরে বালাপোষের মতুন। তা—! তা তুকে ছুটি দিচ্ছি। এখন বল কি লিবি তু? তু আমাকে খুশি করেছিস। হঁ -তা করেছিস! বল। চাঁপার কাছেও কথাটা চাপা ছিল না—সে শুনতে পাচ্ছিল—সে মনে মনে তৈরি ছিল; এদিকে কাঞ্চনের সঙ্গে মায়ের যা হয়ে গেছে তা থেকে সে সাবধান হয়ে নিজের অর্জন নিজে সঞ্চয় করে শক্ত ভিতের উপরই দাঁড়িয়েছিল এবং হিসেবী ও ছিল। সে আপত্তি না করে রাজাসাহেবের কথায় হাসিমুখেই বলেছিল—বেশ। রাজাসাহেব যা হুকুম করবেন তাই। আমি না বলবার কে? আর সাজবেই বা কেন? তবে কাঞ্চনের মতো একটা মাসোহারা করে দেন। একটা বাড়িটাড়ি করে দেন। নইলে লোকে কি বলবে?

রাজাসাহেব বাড়ি একটা কিনে দিয়েছিলেন; ভবানীপুর কালীঘাটের দক্ষিণে টালিগঞ্জ পর্যন্ত তখন কলকাতার সীমানা এগিয়ে গেছে; বজবজ রেললাইনের দক্ষিণে রসা রোডের দুই পাশে কলোনি হচ্ছে। অনেক ব্যবসাদার সস্তায় জায়গা মালমশলা কিনে বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করছে। চাঁপাকে সেইখানে একখানা বাড়ি তিনি কিনে দিয়েছিলেন। পল্লী ভদ্রলোকের। তবে মাসোহারা সম্পর্কে বলেছিলেন—উটি হবেক নাই। উ কাকাসাহেব করে—উহার সাজে। আমি রাজা, আমার সাজে না। আর উ আমি ভালবাসি না হে। চাঁপা আপত্তি করেনি। বাড়িই যথেষ্ট। বাড়ি ভাড়া দেবে—নিজে নিজের সমাজের অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া করে থাকবে এবং থিয়েটারে কাজকর্ম নেবে। এই ঠিক করেই কলকাতায় এসেছিল। মায়ের কাছে সে যায়নি। তার মায়ের তখন

চরম দুর্দশা। এক অল্পবয়সী হিন্দুস্থানী পানওয়ালা তার কাছ থেকে বাড়িঘর সব দলিল করে লিখিয়ে নিয়েছে—কোকেনে মরফিয়ায় অভ্যস্ত করেছে, নানান রোগে ধরেছে। দিদির অবস্থা মায়ের অবস্থা দেখে সে হিসেব করেই বোধ হয় মধ্যপন্থা নিয়েছিল। দিদি ভালবেসে হলো সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনী না হোক একরকম বৈরাগিনী বষ্টুমী। কেত্তন ছাড়া গান করে না। নিরিমিষ্যি খায়—। বিধবার মতো বেশভূষা। ভাগ্যে মেয়েটা কোলে এসেছিল তাই, না হলে হয়তো বৃন্দাবনে গিয়ে ভিক্ষে মেগে খেত। আর ওদিকে মা হয়েছে—নেশাখোর, কোকেন—কোকেন থেকে এখন মরফিয়া ধরেছে। ওই একটা পাষণ্ডকে ধরেছিল এখন তাকে ছেড়ে, বলতে লজ্জা, ধরেছে হিন্দুস্থানী পানওয়ালা এক গুণ্ডাকে। ওই দুই পথ এড়িয়ে সে পথ বেছে নিয়েছিল। ওই; চাকরি করবে থিয়েটারে, রাজার দেওয়া বাড়িটা খাটবে ভাড়ায়। দেহ নিয়ে ব্যবসায় রুচি খুব ছিল না। রাজার আশ্রয়ে থেকে এইটুকু অন্তত হয়েছে, বহুজনায় একটা অরুচি। রাজার কাছে বাঁদীর মতো থেকেও একজনকে ভজে থাকার একটা স্বাদ পেয়েছে। থিয়েটারে চাকরিও মিলেছিল, তার বয়স তখন যাযনি। চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। তখন থিয়েটারে শিশিরবাবুর যুগ পড়েছে—তবুও মধ্যে মধ্যে পুরনো আমল ফিরে আসে। পুরনো আমলের লোকেরা মিনার্ভা থিযেটারে ভিড় করেছে। আত্মদর্শন নাটক খুব জমেছে। চাঁপা একদিন সন্ধেবেলা একখানা রিক্‌শায করে সেখানে গেল; মালিকের পাযে হাত দিয়ে প্রণাম করে সোজাসুজি বললে—বাবা, ফিরে এসেছি, একটা চাকরি দিয়ে রাখুন। যা দেবেন। সখীর দলে নাচতে বললে তাই নাচব।

মালিক হেসে বললেন—ফিরে এলে!

—হ্যাঁ বাবা!

—আব পাববে? বাজারাজড়ার বাগানে এতদিন রানীগিরি করে—

—রানীগিরি নয বাবা বাঁদীগিরি।

—হ্যাঁ—তা বটে! তা দেহ তোমার মজবুত আছে; সখীব দলে ভালই মানাবে। পা-টাগুলো ঠিক আছে তো? অভ্যেস আছে?

—দেখুন। সে সব ঠিক আছে। এখনও একটানা আধঘণ্টা তো সমানে নাচব।

—আচ্ছা, দেখি! ওরে দেখ তো সুরো কোথায়?

সুরো মাস্টার কাছেই ছিল। সে শুনেছিল কোথা থেকে একটি নতুন মেয়ে এসেছে। শুনে অবধি দেখবার জন্যে সে ছুঁক ছুঁক করেই ফিরছিল। মালিক ডাকবামাত্র—আমাকে ডাকছেন—বলে ঘরে ঢুকে আর স্যারটা বলতে অবকাশই পায়নি।

চাঁপাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—চাঁপা!

হ্যাঁ। চাঁপাই। চাঁপা যখন এখান থেকে লালপাহাড়ী যায় তখন তার আপসোসের সীমা ছিল না। সবে তখন সে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তখনও দেহ তার পরিপুষ্ট লাবণ্যে যৌবনমাধুর্যের পরিপূর্ণতায় ফুটে উঠতে পারেনি। কাঞ্চনের খ্যাতি তখন বেশি, সে সখী দলের এলাকা পার হয়ে অ্যাক্‌ট্রেস হচ্ছে, চাঁপা সখীর দলে নাচত কিন্তু

কি ছিল তার লাস্য, কি উজ্জ্বলতা। কি নাচের পা! চাঁপার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য তার বিশ বছরের কম নয় কিন্তু তখন থেকেই তার রূপে লাস্যে উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই চাঁপা! লালপাহাড়ীর বনদেশে থেকে চাঁপার রঙে কালচে আমেজ ধরেছে কিন্তু দেহ যৌবনে কি ভরাই ভরে উঠেছে সে!

চাঁপাই বলেছিল—চিনতে পারছেন না আমাকে—মাস্টারদা?

—তা পারছি। কিন্তু—কি ব্যাপার? তুমি তো লালপাহাড়ীতে থাক।

—না, আর থাকি না। চলে এসেছি।

—চলে এসেছ?

—হ্যাঁ। এখন চাকরির জন্যে এসেছি—বাবার কাছে। বাবা বলেছেন আপনার হাত।

কর্তা বলেছিলেন—হ্যাঁ। চাকরি চাচ্ছে। পুরনো মেয়ে, এতদিন থাকলে অ্যাকট্রেস হয়ে যেত। তা আর কি করবে? নিয়ে নাও। এখন নাচের দলে কাজ করুক।

সুরো বলেছিল—তা বেশ। আমাদের বাঁয়ের মুখপাতটা একটু নরমও বটে। তা ভালই হবে।

চাকরি হয়ে গিয়েছিল। চাকরি নিয়ে ফেরবার পথে রিক্‌শায় উঠে একটু পথ এসেছে একটা গলির মোড়ে, পিছন থেকে সুরোদা এসে রিক্‌শা থামিয়ে তার পাশে বসে বলেছিল—চল।

চাঁপা প্রথমটা খুশি হয়নি। সে বলেছিল—আপনি কোথায় যাবেন?

—তোমার বাড়ি। আপত্তি আছে?

আপত্তি থাকলেও করা যায় না এ ক্ষেত্রে; বিশেষ করে সে আমলে যেত না। থিয়েটারের ড্যান্সিং ব্যাচে কাজ করে ড্যান্সিং মাস্টারকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব ছিল। চাঁপা চুপ করেই গিয়েছিল অগত্যা। সুরো মাস্টার বলেছিল—গল্প শুনব। একটু মদ খাব। তুমি খাওয়াবে। চাকরি পেলে। কি বল?

—বলব আর কি? চলুন।

—রাগ করছ না তো?

—তা করলেই বা কি হবে? মনের রাগ মনেই রাখতে হবে।

—এই রিক্‌শা রোখ্, রোখ্ রে বাবা। রোখ্!

চমকে গিয়ে রিক্‌শাওয়ালা দাঁড়িয়েছিলেন। লাফ দিয়ে নেমে সুরো মাস্টার বলেছিল—আচ্ছা চললাম। কিছু মনে করো না।

মাস তিনেক পর, নতুন একখানা বই পড়ল রিহারস্যালে। তাতে ছিল সাঁওতালি নাচ। থিয়েটারে সে আমলে এই ধরনের বিকৃত হিন্দী চলত সাঁওতালি কথা হিসাবে, আর নাচও ছিল সেইরকম একটা বিকৃত ব্যাপার। চার বছর লালপাহাড়ীতে থেকে চাঁপা সাঁওতালি কথা নাচ সবটাই ভাল করে শিখেছিল। সে শঙ্কা এবং সংকোচের সঙ্গে সুরো মাস্টারকে বলেছিল—একটা কথা বলব সুরোদা?

—বল।

—রাগ করবেন না তো?

হেসে সুরোদা বলেছিল—করলেই বা কি বল। মনের রাগ মনেই চাপতে হবে।

এবার চাঁপাও না হেসে পারেনি, হেসে বলেছিল—বাবা বাবা!—সুরোদা কথা ভোলে না।

—না ভুলি না। তবে কি জান—তোমার উপর রাগই করতে পারি না।

—কেন?

—সে জানি না। তোমাকে দেখলে আমার মনটাই কেমন হয়ে যায়। রাগ থাকে না। বুঝেছ! কিন্তু কি বলছ?

—বলব। এখানে নয়; আজ রিহারস্যালের পর আমার ওখানে যাবেন। নেমন্তন্ন করছি।

—জয় জয় কালী কলকাত্তাওয়ালী।

ওই প্রথম রাত্রেই তারা বাঁধা পড়ল দু'জনের কাছে। প্রথম চাঁপা তাকে দেখালে আসল সাঁওতালি নাচ; শুধু নাচ নয়—লালপাহাড়ীতে সংগ্রহ করা সাঁওতালি শাড়ি; দেখালে সাঁওতালি চুল বাঁধার ঢঙ। সেখানে শেখা সাঁওতালি গান গেয়ে সুর শোনালে। সুরো চাঁপার রূপে মজেছিল এবার গুণে মজল। তারপর কখন দু'জনে দু'জনের কাছে বললে মনের কথা। আশ্চর্য, দু'জনের মনের কথা এক। একটি ঘর। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে সংসার। শেষ রাত্রে দু'জনেই কাঁদলে। অকারণে। তারপর সকাল বেলা চাঁপা বললে—আবার কবে আসবে?

সুরো বলেছিল—আজ তো নড়ছিনে। এখানেই থাকব। যাচ্ছি, বাজারটা করে আনি।

চাঁপা বলেছিল—মাছ-মাংস এনো না। সুক্তো করব। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাল লাগবে। নিরিমিষ্যি।

সুরো বলেছিল—মদ?

—এনো। তুমি খাবে, আমি না।

—তবে আমিও না।

এসব কথা চাঁপা পুরোই বলেছিল কাঞ্চনকে। কয়েকবারই তারা এর আগে এসেছে। প্রথমে বার দুই ঘন ঘন এসেছিল। এখন সংসারী তারা। ঘোর সংসারী। তার শুরু ওই দিন। অর্থাৎ যেদিন চাঁপা সুরেনকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডাকলে।

তারপর আর সুরেন মাস্টার জীবনে চাঁপার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যায়নি। শুধু তাই নয়, মাস ছয়েক পর সুরেন মাস্টার ধুমধাম করে শাস্ত্রমতে এবং আইনমতে চাঁপাকে বিয়ে করেছিল; থিয়েটারের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল। তারপরও বছরখানেক থিয়েটারে কাজ করেছিল দু'জনে। একসঙ্গে আসত একসঙ্গে যেত—সব থেকে আশ্চর্যের কথা, সুরেন মাস্টার মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর রূপী এল চাঁপার কোলে। এরপরই চাঁপা এবং সুরেন দু'জনেরই কি হলো সে তারাই

জানে—আর জানেন গোবিন্দ—হঠাৎ তারা পিছনের জীবনের সঙ্গে সব সংস্রব কাটিয়ে হয়ে গেল পুরোদস্তুর সংসারী সমাজের মানুষ। চাঁপাকে কাজ ছাড়িয়ে সুরেন মাস্টার উত্তরপাড়ার অভিনেত্রীদের সমাজ ছেড়ে উঠে গেল দক্ষিণে চাঁপার নিজের বাড়িতে। সকলে ভেবেছিল—সন্তান প্রসবের পর আবার চাঁপা স্টেজে আসবে কিন্তু তা চাঁপা আসেনি। শুধু তাই নয়—বছর দু'য়েক পর সুরেন মাস্টারও থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল এবং ব্যবসা শুরু করেছিল! করেছিল কয়লার ডিপো। সেও চাঁপার জোরে। চাঁপা সুরেনকে পাঠিয়েছিল লালপাহাড়ী—রাজাসাহেবের কাছে চিঠি লিখে দিয়েছিল। রাজাসাহেব হুকুম দিয়েছিলেন—সেই হুকুমে রাজার দপ্তর থেকে কয়লাকুঠির মালিকদের কাছে চিঠি গিয়েছিল; তারা যথাসম্ভব কম দরে এবং ধারে কয়লা দিয়েছিল। সুতরাং সুরেন মাস্টারের মতো মানুষও তা থেকে লোকসান খায়নি, লাভ করেছিল। কিছুদিনের মধ্যে ওতেই সে পোক্ত হয়ে ডিপো করেছিল বড় করে এবং মানুষটাও পালটে গিয়েছিল। থিয়েটারে নিত্য রাত্রে মাখত রং—পরত পুরনো রঙচঙে পোশাক—তার একেবারে উল্টো—সকাল থেকে রাত্রি সাতটা পর্যন্ত কয়লার কালো ধুলো মেখে এমনই পালটাল যে মাস্টার খেতাব তার উঠে গিয়ে সেটা হয়ে গেল—কয়লাওলা। বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গা ছিল—সেইখানে ডিপো আরম্ভ করেছিল, ক্রমে কালীঘাট রেলস্টেশনের পাশে রেলের জায়গা বন্দোবস্ত নিয়ে ডিপো করে সাইনবোর্ড টাঙিয়েছিল—এস. মিটার অ্যান্ড সন্স—কোল মারচেন্ট। থিয়েটারের ড্যান্সিং মাস্টার কোল মারচেন্ট হয়েছিল—থিয়েটারের সখীর দলের সখী—এক দেহব্যবসায়িনীর কন্যা—রাজাসাহেবের রক্ষিতা পতিতা চাঁপা—সে হয়েছিল গৃহস্থঘরের গৃহিণী এবং পুত্রকন্যার মা।

ইদানীং তারা কম আসছে; অবসর নেই। ঘরসংসার ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার সুখের সংসার।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল কাঞ্চনমালার বুক থেকে। সেটা পড়ল—তার নিজের কথা ভেবে। চাঁপা এবং সুরেন গৃহস্থ হয়েছে এ কথা সত্য কিন্তু তারা ঘোর বিষয়ী। বছরখানেক আগে যখন কাঞ্চন কলকাতায় গিয়েছিল ডাক্তার দেখাতে তখন ওদের ওখানেই উঠেছিল। মুক্তোকে নিয়ে যায়নি বলে মনে মনে সে গোবিন্দকে প্রণাম জানিয়েছিল। কারণ সেখানে গিয়ে সে যা দেখেছিল তাতে তার তৃপ্তি হয়নি। চাঁপা-সুরেনের গৃহস্থালীতে পুরনো কালের পুরনো জীবনের ছাপ মুছে যায়নি। যেন ইচ্ছে করেই তারা মোছেনি।

দেওয়ালে সেকালের থিয়েটারের সাজে এবং ভঙ্গিতে তোলা চাঁপার এবং সুরেনের ফটো টাঙানো ছিল। চাঁপার ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই ইস্কুলে পড়ে, তারা থিয়েটারের গল্পে মশগুল এবং পঞ্চমুখ। শুরু করে এ কালের ছবির অভিনয় নিয়ে তার সঙ্গে চলে আসে সেকালের গল্প। গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃত বোস, অমৃত মিত্তির, দানীবাবু এমন কি কাশীবাবু, নেপা বোস, অহীন বোস ভাল অভিনেতা না একালের

শিশিরবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্তির, ছবি বিশ্বাস ভাল অভিনেতা এই নিয়ে তর্ক প্রায় দৈনন্দিন। অভিনেত্রীদের নাম মুখস্থ। বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি থেকে একালের কাননবালা, চন্দ্রাবতী, পদ্মাবতী, ছায়া দেবী কার নাম না জানে ওরা! এমন কি হালে এসেছে কে সুনন্দা দেবী তার নকলও করে দীপা। চাঁপার মেয়ে দীপা। তাদের ঝগড়া হলে সুরেন মীমাংসা করে দেয়। চাঁপা মীমাংসা করতে যায় না, সে মুখ বাঁকায়। বলে—হুঁ—ওই সব আবার অ্যাক্টিং! কি যে সব হচ্ছে কালে কালে।

দেখে শুনে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে কাঞ্চন বলেছিল—ঘর পাতিয়ে গেরস্থ হয়েছিস চাঁপা, নিজেরা ওপর পথ ছেড়ে এসেছিস—ছেলে-মেয়েকে ওসব কথা নিয়ে মাততে দিস কেন?

চাঁপা বলেছিল—দিদি, এখন এ কথা ঘরে ঘরে গো। বামুন যারা গুরু পুরুতের কাজ করে তাদের ঘরেও। লক্ষপতিদের বাড়িতেও। আমরা তো আমরা।

কাঞ্চন বলেছিল—ঘরে তোর অ্যাক্টিং-এর ফটো রেখেছিস। ছেলে-মেয়ে জিজ্ঞাসা করে না?

—করে!

—কি বলিস?

—সে সব গল্প ওরা জানে।

—জানে?

—ওরে বাপরে, শুনছ না ওদের থিয়েটার-সিনেমার গাল-গল্প।

—কি করে বলিস? মানে—গেরস্ত সেজে রয়েছিস তো!

একটু থমকে গিয়েছিল চাঁপা, তারপর বলেছিল—ও কি চাপা থাকে দিদি! জানতে পারেই। তবে এত ভাবিনি কখনও। তাছাড়া ওদের বাপকে তো জান, সে তো ঢাকাঢাকির ধার ধারে না। সেই নিজে সব গল্প করে বলে। বলে কি কাজ বাবা ঢেকেঢুকে। এ দিকটা না হয় ঢাকলাম, কিন্তু আমার রক্ত—সে তো ঢাকনি মানবে না।

সুরেনের সঙ্গেও এ নিয়ে কথা হয়েছিল। সে বলেছিল—আমেরও অম্বল হয় আমড়ারও অম্বল হয় কিন্তু তা বলে আম-আমড়া এক নয়। আমি ওদের বলে দিয়েছি, বুঝিয়ে দিয়েছি—এই যে টাকা টাকা স্বাদ তোদের—এ—হলো আমড়ার, আমের নয়। চিনি আম আদা মিশিয়ে আমড়াকে আমের অম্বল করা যায়, তা সুরো মিত্তিরের পোষাবে না। শালা ঝঞ্ঝাট কত? বড় হলে—কা—কা—কা—বলেই যখন চেঁচাবে,—ডাকবে—তখন বাচ্চা বয়সে কুহু—কুহু—কুহু—ডাক শেখানো ভস্মে ঘি ঢালা। মার ঝাড়ু শালা কুহুর মুখে। কা—কা—ই ভাল। বলে একচোট খুব হেসে নিয়েছিল।

সেদিন কাঞ্চন মনে মনে আঘাত পেয়েছিল। মনে হয়েছিল কথাগুলো সুরেন বোধহয় তাকেই বলছে। সে আঘাতের খানিকটা ক্রিয়াও হয়েছিল। রাগ হয়েছিল।

সে তা সম্বরণ করেছিল গোবিন্দ স্মরণ করে। একটু চুপ করে থেকে হেসে বলেছিল—তা কি হয় সুরেনদা? তা হয় না। সৎ কথা ভগবৎ কথা—ও হলো—অমৃত। অমৃত কি নিষ্ফল হয়? উনি বলতেন—কাঞ্চন, সৎকথা হলো— অমৃত আর অসৎ কথা হলো বিষ। বিষ খেলে আসে যম মরণ, অমৃত খেলে আসেন ভগবান। ভগবান দয়া করলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ছেলেবয়সে সৎশিক্ষা তো অনেক আশার কথা গো—ছেলেবয়সে অসৎ শিক্ষা যারা পায় আমাদের মতো—তারাও তো কত জনে গুরুর কৃপায় সৎ শিক্ষা পেয়ে পার হয়ে যায়।

হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল—থিয়েটারে সমস্ত জীবনটাই তো কাটল, তা পরমহংসদেবের কৃপায় শিক্ষায়—

হাঁ হাঁ করে উঠে বাধা দিয়ে উঠেছিল সুরেন—জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ! কার কথা যে বল কাঞ্চন—কিসের কথায় কি! সে কি আর কেউ না বলতে পারে। তা আমি বলিনি। আমি বলছি সাধারণ কথা। এই আমাদের কথা, আমার চাঁপার কথা। তোমার কথাও আমাদের কথা নয়। বোসবাবুকে আমি ভাল করে না-জানি, চাঁপার কাছে তাঁর কথা শুনেছি; তোমার জীবনটা তো নিজের চোখে দেখছি। খাঁটি লোক, পরশপাথরের গুণ ছিল। নইলে এমনটা হয়! তোমার মেয়ে—ওর জাত আলাদা হবে—দেখো তুমি।

চাঁপা বলেছিল—তা বলে কৃশ্চানদের ইস্কুলে দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি দিদি। না-না-না। কি যে ওর বাপ বুঝেছিল আর তুমি যে কি বুঝে সায় দিয়েছিলে! না-না-না।

চুপ করে থেকেছিল কাঞ্চন। এ নিয়ে আর আলোচনা করেনি। নিজের মনেই এ নিয়ে একটি সংশয় তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কাঁটার মতো বলতে গেলে নিরন্তর তাকে বিদ্ধ করত।

আজও রোগশয্যায় শুয়ে সেই কাঁটার খোঁচা সে অনুভব করলে। সেই কাঁটাটা যেন নতুন করে মুখ নিয়ে উঠেছে। সুরেনের কথাই তা হলে ঠিক! মুক্তোকে কৃশ্চান ইস্কুলে দেওয়া ঠিক হয়নি। মুক্তো বললে—তোমার ওই ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম করে তোমরা অন্যায় করেছ।

ওঃ তার শেষ কথাগুলো কি কঠিন কি নিষ্ঠুর, তাতে কি ঘেন্না! ওঃ!

ক' ফোঁটা জল শীর্ণ মুখখানি বেয়ে পড়েছিল। ভাবনা তো তার নিজের জন্য নয়—ওই মেয়ের জন্যে। পাপ-পুণ্যের বিচার করতে গিয়ে যারা বাপ-মাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় তারা দুনিয়ার কাছে আর যা পাবে পাক, ভালবাসা তো পায় না। তাছাড়া সে সেখানে গিয়ে তাঁকে বলবে কি? তিনি তো দাঁড়িয়ে আছেন প্রতীক্ষা করে। নিশ্চয় আছেন। তিনি যখন বলবেন—কাঞ্চন, মুক্তোর নিঃশ্বাসগুলি এত তপ্ত কেন বলতে পার? সেগুলি আমার বুকে এসে লাগে আর ঝলসে দেয়।

কি বলবে সে?

পরের দিন সকালে কাঞ্চন বসেছিল উঠে। নিজেই কোনমতে কষ্ট করে উঠে পিঠের দিকে বলিশগুলি গাদা করে তাতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছিল। সকালে অনেককালের বাউড়ী ঝিটি আসে, তার মমতা আছে সে কাজ ছাড়েনি, সেই সব পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। চাপার কাপড় সেই কাচে। মুক্তোকে করতে হয় না। কাঞ্চনও চায় না, ওই ঝিটিও দেয় না। মুক্তো এসে মুখ ধোয়ার জল, মাজন, জিভছোলা দিয়ে সামনে বসে খল নুড়ি নিয়ে কবিরাজী ওষুধ মাড়তে বসে। ওষুধ খাইয়ে একটু ছানা, কযেক টুকরো কলা কেটে মাকে খাইয়ে তবে যায। নিচে গিয়ে রান্না-বান্না করে। নইলে কে করবে? মুক্তোর রান্না মুক্তোর নিজের জন্যে। সাহায্য ওই ঝিটিই করে। আগে একটি বৈষ্ণবের মেয়ে ছিল তাকে জবাব দিতে হয়েছে কিছুদিন হলো। জবাব মুক্তোই দিযেছে। বলেছে এত জাত কেন? ইস্কুলে জাতবিচার নেই। সেখানে তো জল খাই। বাড়িতে এত ভড়ং কেন?

মেনে নিতে হয়েছে কাঞ্চনকে। বোসবাবু কাঞ্চনের প্রভু, স্বামী, তিনিও জাত মানতেন না। বলতেন, বৈষ্ণবের কাছে জাতিবিচার নেই। শুধু মানুষের দুটি জাত কাঞ্চন। সৎ মানে ভাল মানুষ, অসৎ মানে মন্দ মানুষ। ওই হলো আসল সদ্‌ জাতি আর অসদ্‌ জাতি। তবু কাঞ্চন তার সবটা মানাতে পারেনি। সে হিন্দু অহিন্দু মানত এবং মানে। সে নিরামিষ খায় তার দীক্ষার পর থেকে, মেযে মাছ খায়। যে বৈষ্ণব মেয়েটি রান্না করত, মুক্তো ছুটিতে বাড়ি এলে, সে তার জন্যে আলাদা মাছ রান্না করে দিত। স্নান করে রান্না করত। জাতিবিচার ধর্মের নিয়মে না-মানলেও, সদাচারের কদাচারের জাত মানত। এবং এ মানাটা তার আজকের নয়, অনেক দিনের। কলকাতায় যারা দেহ নিয়ে ব্যবসা করে তারা এটাকে বিচিত্রভাবে মানে। বর্ধমানে তো আজও রয়েছে সে মানা। রাত্রে ব্যবসার জন্য তারা যা করুক, সকালে স্নান সেরে তারা শুদ্ধ হয়ে যেত। তাদেরও ঠাকুরঘর ছিল—আজও আছে—সে ঘরে কখনও কোন অনাচার ঢুকতে পায়নি। মনের মধ্যেও তেমনি একটা ঘর আছে তাদের। হয় বয়সের সঙ্গে নয় অন্য কোনও সুযোগে সে ঘরের ধূপের গন্ধ বেরিয়ে বাইরের অপর সকল ঘরের সকল গন্ধ সেন্ট ল্যাভেন্ডার পাউডার গন্ধতেল হুইস্কি ব্র্যান্ডি ধেনো মদের গন্ধ আচ্ছন্ন করে দেয়।

কাঞ্চনের সারা জগৎটা ধূপের গন্ধে ছেয়ে গেছে। তার কি একার? কত জনের, কত জনের, কে হিসাব রাখে তার? কতজন সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে। এই তো গতবারে চাঁপা সুরেন এসে বলে—দিদি, আশ্চর্য শুনেছ শিশিরকণাদি হরিদ্বারে এক আশ্রমে গিয়েছে; সেখানে এঁটো বাসন মাজার কাজ নিয়েছে!

শিশিরকণা বাংলা থিয়েটারের দমকা হাওয়া। নাচে গানে হাস্যে লাস্যে সে ছিল পাগলাঝোরা। শেষ পর্যন্ত মস্ত অ্যাক্‌ট্রেস হয়েছিল। শুধু তাই নয়—গোটা একটা থিয়েটারের প্রায় মালিক—; মালিকের গৃহিণী। কত ধনী, কত বাবু, কত অ্যাক্টর যে শিশিকণার জন্যে পাগল হয়েছিল তার হিসেব নেই। মদ—মজলিস

—হাসি—রঙ্গ—এই ছিল তার জীবন। সে—; সে বাসন মাজতে গেল হরিদ্বারে এক আশ্রমে। হরি! হরি! হরি!

কথাটা শুনে কাঞ্চন মনে মনে হরিকে ডেকেছিল। আর কাকে ডাকবে! এ আর সে ছাড়া কার খেলা!

মুক্তো এসব মানে না। অবশ্য এসব কথা মুক্তোর কাছে সযত্নে সে ঢেকেই রেখেছিল। জানতে দেয়নি, আজ জানালে। জেনে সে তাকে ঘেন্না করে বেরিয়ে গেল। তাকে ঘেন্না করুক ক্ষতি নেই। সে তো সত্যিই কলঙ্কিনী।

কলঙ্ক তো কোন জনকে ভালবাসার নয়! কলঙ্ক ব্যভিচারে। ব্যভিচাব তার তো একদিনের পেশা ছিল, নেশাও ছিল। ঘেন্না তার প্রাপ্য। কিন্তু মুক্তো তাব বাপকে, তাঁর মতো মানুষকে ঘেন্না কবলে।

চোখ দুটি তার আবার জলে ভরে গেল। চোখ মুছলে। না মুছে উপায় কি! ওঃ, সকাল থেকে এল না মুক্তো! জল মাজন জিভছোলা দিলে না! না দিক, সে দেওয়াল ধরে উঠল। আস্তে আস্তে গিয়ে সেগুলি নামিয়ে জলের ঘটিটা টেনে নিয়ে মুখ ধুতে বসল।

মুখ ধোয়ার শব্দে মুক্তো এসে দাঁড়াল।

—তুমি নিজেই নিয়েছো? আমাকে ডাকতে হত। এমন করে—

—তা হোক। পেরেছি তো!

—পারবে না কেন? কিন্তু আমি রয়েছি।

—কত আর করবি বাছা? তাছাড়া সুখ-দুঃখ তো সবারই আছে। তোর সেই কাল থেকে—। কে এল দেখ তো? সাইকেল রিক্সার ঘণ্টা বাজছে দোরে! হয় তো চাঁপা এল! দেখ।

হ্যাঁ। চাঁপাই বটে। সুরেনেব গলা শোনা যাচ্ছে। রিক্সাওলার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তকরার জুড়েছে।

—তার চেয়ে তুমি বিক্সায় চড় বাওয়া—আমি চালিয়ে তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার কাছে তুমি বারো আনা চাচ্ছ—ছ' আনা দিয়ো। এই পথটুকুর জন্যে বারো আনা! এর চেয়ে যে আলিবাবার চিচিং ফাঁকের গুহার ধন সস্তা মানিক! নাও-নাও। ওই অষ্টগণ্ডাতেই রফা কর।

চাঁপা ঘরে ঢুকে কাঞ্চনের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সেই দিদি—এমন হয়ে গেছে! এ যে যাবার জন্যে সেজেছে বললেই হয়! তার মুখ থেকে শুধু একটি কথা বের হয়েছিল, ভয়ে—বিস্ময়ে—আনন্দে সব কিছুব মধ্যেই কথা হারিয়ে সর্বপ্রথম যে কথাটি ফিরে পায়। ও—মা!

তারপরই সে কেঁদে ফেলেছিল।

কাঞ্চন হেসে বলেছিল—কাঁদছিস? কেঁদে কি করবি? কাঁদিসনে।

তবু চাঁপা কেঁদেছিল।

কাঞ্চন আবার বলেছিল—আমি কাঁদিনি। তুই কাঁদবি কেন? তোরা শুধু আমাকে একজনকে হারাবি। আমি তো তোদের সকলকে হারাব। কাঁদিস নে রে। বড় কষ্ট পাচ্ছি। এ থেকে খালাস পাব এবার।

ঠিক এই সময়টিতেই সুরেন ভাড়ার কোন্দল মিটিয়ে উত্তপ্ত পদক্ষেপের শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে—যে—সে—সেও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কাঞ্চনই বলেছিল—এস বস। তারপর হেসে বলেছিল—ভয় পাচ্ছ দেখে?

সুরেন বিহ্বলতার প্রভাবে মৃদুস্বরে বলেছিল—এমন হয়ে গেছ?

—যাবার একটা সাজ আছে সুরেনদা! মনে কর থিয়েটারে যাবার সাজ! তা যেখানে যাব, সেখানকার সাজ যে এমনি। এস বস।

মুক্তোও এসে দাঁড়িয়েছিল—মেসোর পেছনে। কথা বলেনি। মাসী ও মেসো এসেছে সে তা উঠোনের দিক থেকে দেখেছে। কাল রাত্রে মায়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের পশ্চাদপট যেন একটা আকস্মিক ঝড়ের আঘাতে ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে দিয়ে চলে গেল এবং সে দেখলে তার জীবনের আসল পটভূমি—যে পটভূমিকে সে মিশনারী ইস্কুলে পড়ে ঘৃণা করে এসেছে—যেখানে ছড়ানো আছে মদের বোতল—যেখানে পড়ে আছে পানোন্মত্ত নারীদেহ, অসাড় মাংসপিণ্ডের মতো। যেখানকার শব্দজগতে বেজে বেজে উঠছে স্খলিত চরণের ঘুঙুরের শব্দ, মধ্যে মধ্যে কুৎসিত অশ্লীল কথা, গালিগালাজ, যাতে সুর সঙ্গীত এমন কি তার মায়ের চোখের জল-ফেলে-গাওয়া কীর্তন গান পর্যন্ত কুৎসিত ও কলুষিত মনে হয়। তার কিশোর মনে এ আঘাত নিষ্ঠুর অতি নিষ্ঠুর হয়েছিল; মায়ের উপর রাগ হয়েছিল—নিজের উপর ঘৃণা হয়েছিল—বাইরের সকল কিছুর মধ্যে একটা আতঙ্ক যেন রূঢ় কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে শাসন করেছিল। সকাল থেকে উঠে তাই সে রান্নাশালের দিকে চুপ করে বসেছিল। যে ঝিটা কাজ করতে আসে সে কাজ করে যাচ্ছিল এবং তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করছিল—কি হলো গো মুক্তো মা? এমন করে কেন গা?

উত্তর দেয়নি মুক্তো। সে আবার প্রশ্ন করেছিল—মায়ের জন্য এত ভেব না। ও ডাক্তার-বদ্যিরা যা বলে বলুক। আমি বলি কি জান? মা কালী—ওই যে—সব্বানপুরের মা কালী—ওইখানে চল আমার সঙ্গে। চান করে সোঁ-চুলে সোঁ-কাপড়ে পেন্নাম করে মানত করে চরণামেরতো আর মিত্তিকে নিয়ে এস—মাকে দাও—ভাল হয়ে যাবে! এই দেখ আমার—আমার একবার সুতিকা ব্যামো হয়ে এমনি দশায় মরতে বসেছিনু, তা ওই—মায়ের থানে গিয়ে পড়নু, বননু—মা যা হয় কর। যদি ভাল না কর মা—তোমার মহিমে যাবে। অপযশ হবে। ভাল কর, পাঁঠা বলি দেব পুজো দেব। তা দেখ—বেঁচে গেনু। জলজ্যান্ত কাজ করছি।

ঠিক এই সময়েই মাসীরা এসে পৌঁছল। ঝি বেরিয়ে গিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিলে, এবং এক ফাঁকে এদিকে এসে তাকে সজাগ করে দিলে। তোমার মাসী-মেসো এসেচে মুক্তো। ওঠ—এমন করে বসে থাকে না।

তারপর সে একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিল—এই তোমার সেই চাঁপা মাসী না মুক্তো? আর ওই তো সুরো মাস্টার?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল মুক্তো—হ্যাঁ।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল মুক্তো। উঠতেই হবে। ঘরের দোরে—সুরেন মেসোর পিছনে এসে দাঁড়াতেই চাঁপা মাসী তাকে দেখেছিল। দেখে বলেছিল, আয় মুক্তো আয়। ওগো সর না একটু। মুক্তো তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে। আসতে দাও ওকে।

সুরেন মেসো পিছনে ফিরে মুক্তোকে বলেছিল, এই মুক্তো? মিস্ পার্ল? বাঃ দিব্বি মেয়ে। সঙ্কুচিত এবং বিরক্ত হয়েছিল মুক্তো। কিন্তু পরক্ষণেই সুরেন বলেছিল—এ তো বড ঘরের মেয়ের মতো বেশ সম্ভ্রমের মেয়ে হয়েছে, কাঞ্চন! বা বা বা! গতবার যখন দেখেছিলাম তখন ছোট ছিল। অনেক ছোট। এ তো একটু মাজলে ঘষলে সিনেমায়—

চাঁপা ধমক দিয়ে বলেছিল—কি যা তা বলছ! কোন কাণ্ডজ্ঞান কি কোন কালে হবে না! আয়রে মুক্তো—আয়। মায়ের কাছে বস।

কাঞ্চন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—না। ওর এখন অনেক কাজ। তোদের চা দেবে, সুরেনদাকে কিছু খেতে দিতে হবে। আমি তো জানি ওর ভোর বেলা ক্ষিদে পায়।

সুরেন মেসো হেসে উঠেছিল।—মনে আছে তোমার?

—তা নেই!

—কিন্তু সে অভ্যেস আর নেই। গতবার সবে মন্তর নিয়েছি তো। তা গুরু বলেছিল, অনুমতি রইল তুমি খেয়ো। খেয়েদেয়েই যখন হোক একবার তাঁকে ডেকো। তা বুঝেছ কাঞ্চন—ক্রমে ক্রমে না সাপ যেমন করে ব্যাঙ ধরে একটু একটু করে কায়দা করে না—ঠিক তেমনিভাবেই কায়দা করে ফেলেছে ইষ্টমন্ত্র। তবে চা-টা খাই। দে বাবা মুক্তো চা-টা দে।

চলে আসছিল মুক্তো। সুরেন মেসোর কথা তার ভাল লাগেনি। আগে লাগেনি যখন বছরখানেক আগে এদের দেখেছিল—কিন্তু তখন এদের জীবনের নগ্ন সত্যটা, আসল রূপটা জানতে পারেনি। তখন যে সব কথাবার্তাকে ভাবভঙ্গিকে—অজ্ঞতা বা গ্রাম্যতা বলে ক্ষমা করে গ্রহণ করেছিল, আজ সে সবই তার কাছে অশ্লীল, অশুদ্ধ, অপবিত্র বলে মনে হচ্ছে। চলে আসতে আসতে সে সিঁড়িতে দাঁড়াল। সুরেন মেসো তার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলছে—কেন—কি—বললাম কি? ভাগবত অশুদ্ধ হলো কিসে? যত সব—

চাঁপা মাসী বললে—চেঁচিও না।

—নে বাবাঃ, এও চেঁচানি হলো?

মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—না—না। মানে—ওকে সিনেমা-টিনেমার কথা বলো না, মিশনারী ইস্কুলে পড়ে তো। এ সবকে—বুঝেছ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে কাঞ্চন—কাল আমি ওকে সব বলেছি। আমি কি, ওর বাপ—মানে সব কথা। কোন কথাই লুকুইনি।

—ভাল করেছ। খু—ব ভাল করেছ—

—কিন্তু—

—এতে আবার কিন্তু কি আছে? কাল বদলেছে—তার উপর ভগবান দয়া করেছিলেন তোমাকে—বোসবাবুর মতো ভক্ত লোক ভাল লোকের ভালবাসা পেয়েছিলে—তিনি টাকা দিয়ে গিয়েছেন—তাই আজ মিশনারী ইস্কুলে পড়ছে। নইলে তো এতদিন থিয়েটারের গাড়ি আসত—ছুটতে হত। কোমর বেঁধে এক দুই তিন—এক দুই তিন—গুণে ধিন তাক তাক করতে হত। হয়তো ঠেলে জানালার ধারে খোঁপায় মালা জড়িয়ে দাঁড়াতে হত।

কাঞ্চন বললে—হয় তো হত সুরেনদা। কিন্তু মুক্তো আর তা হবে না। কিন্তু বলে তাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের।

সে বলতে লাগল মুক্তোর কথাগুলি, বললে—বললে কি জান—তোমার ওই ধম্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম করে তোমরা অন্যায় করেছ। ভগবানও তোমাদের ক্ষমা করবেন না। ছি ছি! আমার পরিচয়টা কি বলতে পার মা? তারপর—। কণ্ঠ বোধকরি রুদ্ধ হয়ে গেল কাঞ্চনের।

মুক্তোর মনে পড়ল নিজের বলা কথাগুলি।

—সে পরিচয় আমি আমার পরিচয় থেকে মুছে দেব। আমি দাসীর মেয়ে নই—কোন ভণ্ড প্রভুর মেয়ে নই। আমি কারুর দাসী হব না। আমি মানুষ। আমি মেয়ে। তাই আমার সব।

দুড় দুড করে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল।

ঘরের দরজা খুলে চাঁপা মাসী বেরিয়ে এসে ডাকলে—মুক্তো! মুক্তো!

মুক্তো তখন উনোনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। কেৎলিটা খুঁজছিল—চড়িযে দেবে চায়ের জল। উত্তর দিয়েছিল—জল চড়িয়েছি চায়ের।

কাঞ্চন সেই দিনেই একসময় হঠাৎ ঘাড লুটিয়ে বালিশের উপর কাত হযে পড়ে গিয়ে আর ওঠেনি। মুক্তো তখনও কাছে ছিল না। সে পাশের ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বালিকা বয়স তখন কাটছে, বা কেটেছে, কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের অনেক কিছু শুনে শুধু পাখির মতোই শেখেনি—অনুভবে আন্দাজে মনে মনেও বুঝেছে। বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিযে সে সেদিন আশ্চর্য লজ্জা এবং দীনতা অনুভব করেছিল। তার কান্না পাচ্ছিল।

ঠিক এই সময়েই চাঁপা মাসী আর্তস্বরে ডেকে উঠেছিল—দিদি! দিদি!

সেও চমকে উঠেছিল। এবং শুনতে চেষ্টা করেছিল—মা কি বলছে। মায়ের কোন কথা শুনতে পায়নি। তার বদলে মাসীই আবার চিৎকার করেছিল—ওগো, শুনছ—ওগো! দেখ কি হলো?

মেসো ডেকেছিল—মুক্তো! মুক্তো! মুক্তো কই!

মুক্তোর পা বুক কেঁপে উঠেছিল থর থর করে। সে কোনরকমে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়ের ঘরের দরজায়। মা চেয়ে রয়েছে—কিন্তু কথা বলতে পারছে না। চোখের দৃষ্টি যেন কেমন! তবু তার মধ্যে চেনার চিহ্ন ছিল।

চাঁপা মাসী বলেছিল—আয় আয় পাশে বোস। দে দে—মুখে দুধ গঙ্গাজল দে। দুই কই—গঙ্গাজল কই!

সে পাশে চুপ করে বসেই ছিল। দুধ গঙ্গাজল আনতে আনতে মায়ের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল। সে পাথরের মতো বসেছিল। মা বলে একবারও ডুক্‌রে ডেকে ওঠেনি; ওঠেনি নয়, উঠতে পারেনি চেষ্টা করেও।

দ্বিতীয় পর্ব

(মুক্তমালার কথা)

এক

১৯৫৪ সাল। বারো বৎসর পর। মুক্তামালা এখন ছাব্বিশ বছরের পূর্ণ যুবতী। সে দুঃখে নেই—তার জীবনেব চারিপাশে এরই মধ্যে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্য। মুক্তামালা নৃত্যকলায় খ্যাতি পেয়েছে অনেক—শুধু বাংলাদেশেই নয়—ভারতবর্ষেই নয়—এই বয়সে সে বাইরের দেশ ঘুরে এসেছে। গানেরও তার যথেষ্ট খ্যাতি। তার নাম এখন মুক্তামালা নয়, মুক্তি; এবং বাপের বোস উপাধি সে নেয়নি—মায়ের মাতৃ-উপাধি সে কালের দাসী..ক সে দাস করে নিয়েছে। দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, টানা দুটি চোখ—শ্রীময়ী মেয়ে—নৃত্যকলার উপযুক্ত করেই যেন তার দেহখানিকে কেউ গড়েছিল—কিন্তু সব থেকে আ৷কর্ষণ করে তার দৃষ্টির একটি বিষণ্নতা। অন্যমনস্কতার সঙ্গে একটি উদাসীনতা যেন বর্ষার রাত্রের মধ্য-আকাশের চাঁদের পরিপূর্ণ আলোর উপর দিগন্তের কালোমেঘের মতো একটি ছায়া ফেলেছে। জীবনে সে একাই একরকম। থাকবার মধ্যে চাঁপা মাসীর ছেলে রূপেন, ডাক নাম রূপী—সে থাকে। সেই তার ভরণ-পোষণ করে; রূপেন বয়সে তারই বয়সী প্রায়; লেখাপড়া তেমন শেখেনি; বারদুযেক ম্যাট্রিক ফেল করে বসেই আছে। বাড়িটা ওরই, অর্থাৎ চাঁপা মাসীরই বাড়ি। নিচের তলায় ভাডাটে আছে একঘর, মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পায়। মুক্তার কাছে ভাড়া চায় না—নেয় না, মুক্তার টাকাতেই তার বাকি খরচ চলে যায়। হিসেবে সেটা ভাডার চেয়ে বেশিই পড়ে। রূপী ঠিক হিসেব করে হাত ছেড়ে দেয় তা নয়, অন্তর থেকেই সে নেয় না, নিজের বোনের থেকে বেশি মনে করে মুক্তাকে।

সংসারে রূপেনের কাছেই সে মধুর এবং কোমল—বাকি দুনিয়ার কাছে সে তিক্ত, রূঢ় এবং নিষ্ঠুর। দৃষ্টিতে তার এমন যে একটি বিষণ্নতা, যা দেখে মানুষ আকৃষ্ট

হয়, কাছে এগিয়ে আসে; যখন সে দৃষ্টি তার ঘৃণায় রূঢ়তায় এমন তীব্র হয়ে ওঠে যাতে কাছে আসা মানুষের অন্তরে আগুনের জ্বালার মতো একটা জ্বালা অনুভব করে। তারা বাধ্য হয়ে দূরে সরে যায়। আশ্চর্য! একটা আশ্চর্য—তার জীবনে বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে।

জীবনে সে নাচ-গানকে দূরেই রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হলো না শেষ পর্যন্ত। আশ্চর্যভাবে সে এসে পড়ল এই নাচ-গানের কাছেই। নাচ-গানে খ্যাতি তার হয়েছে কিন্তু মনে মনে নিজের উপরেই সে বিরক্ত। এ যেন তার ভাগ্যের কাছে না হোক জন্মের কাছে হার মানা হয়েছে। মায়ের সকল সম্পর্ক থেকেই দূরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু হলো না।

এতকাল পরে ঘরে বসে বিষণ্ন অবসরে বসে এই আশ্চর্য সংঘটনের কথাই ভাবছিল সে। মনে পড়েছে তার সব।

এর জন্য আজও সে ভাবে, মনে করে—দায়ী তার বাপ, তার মা। শুধু কি তারাই? সংসারে ওই অপরাধে অপরাধী করে মানুষ ঠেলে তাকে এই কাজেই এনে দিলে।

ওঃ, মায়ের মৃত্যুর পরই—সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—শ্মশানে—!

শ্মশানে মৃতের নাম লেখাতে হয়। সেখানে খাতায় লিখবার সময় প্রকাশ হয়ে গেল—কাঞ্চনমালা—ভক্তিমতী কীর্তনগায়িকার পিতৃপরিচয় নেই, সে দেহব্যবসায়িনীর কন্যা—দেহব্যবসায়িনী—উকীল বোসবাবুর রক্ষিতা। এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ হলো মুক্তামালার পরিচয়।

সারাটাক্ষণ মুক্তা মাটির দিকে চেয়ে বসে ছিল। মনে হচ্ছে শ্মশানের লোকগুলি তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে।

তখনও বুঝবার ঠিক সময় হয়নি। তখন বুঝতে পারেনি কিন্তু আজ বোঝে। তার বাপ-মা তার প্রতি স্নেহবশে—? না—শুধু স্নেহবশে কখনও নয়—তাঁদের এই ভালবাসাকে তাঁরা দু'জনেই পুণ্যের মূল্য দিতে পারেননি তাই তার পরিচয়ের সঙ্গে তাঁদের সেই ভালবাসার কথাও গোপন করেছিলেন। অত্যন্ত সযত্নে। উকীলী চাতুর্যের সঙ্গে চারিদিকে এমন করে ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন যে কোন দিক থেকে যেন এক বিন্দু আলো না-পড়ে তার ওপর।

তার মা সেদিন শেষ কথাটা খাঁটি সত্য বলেছিল—আমি তাঁর দাসী। তিনি আমার প্রভু। ভালবেসে তাঁর চরণে বিকিয়েছিলাম।

খাঁটি সত্য। এবং তার বাপ প্রভুদের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী তাকে দাসীর অধিকার ছাড়া আর কিছু দেননি। মধ্যযুগে রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশা, দস্যুসর্দার, গুরু, সমাজপতিরা এই প্রভুনীতি—না, নীতি নয়, প্রভুধর্মকে জীবনধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে আবিষ্কার করেছিল, তাদের চারিপাশে থাকত নারীর দল—দাসী—সবাই ছিল দাসী। যাদের পিছনে বাপের জোর থাকত তারা ছিল পত্নী, বাকিরা ছিল উপপত্নী। কেউ

হাটে কেনা—কেউ ধরে আনা—কেউ বা নিজেই বিকোত। ওই তার মায়ের মতো বিকোত নিজেকে। এদের সন্তান-সন্ততিরা এ দুনিয়ায় জন্ম নিত কুক্কুরীর শাবকের মতো; বড বাড়িটার কোন এক প্রকাণ্ড উনোনের ছাই অথবা খড়কুটোর গাদায় জন্মাত, মায়ের যত্নে, তার দুধে মানুষ হত; শৈশব লাবণ্যের জোরে করুণা পেয়ে উচ্ছিষ্ট পেত। বড় হত। তারপর ঘর হতে বিতাড়িত হত। পথে পথে ঘুরত, না খেয়ে মরত। কেউ মারা পড়ত মাথায় ডাণ্ডা খেয়ে। কেউ মরত জলাতঙ্কে পাগল হয়ে। জন্তুর রাজ্যে যে নিয়ম, মানুষের রাজ্যেও সেই নিয়ম—এক—এক, কোন প্রভেদ নেই। মানুষ বুদ্ধিমান জন্তু, সে কাপড় পরে জামা পরে—অর্থাৎ সে আবরণের কৌশল জানে, তাই নারী-পুরুষের সেই আদিম সম্পর্কের উপর সে একটা আবরণ দিয়েছে। চেলি মালা টোপরের আবরণ।

তার জন্মদাতা—তার মায়ের প্রভু—তাকে তাঁর প্রভুধর্মের ছলনা করে গিয়েছিলেন। দাসী—তার মা—সেই ছলনাকেই ভালবাসা বলে মনে করেছিল! হায় দাসীর দল!

তার জন্মদাতা একখানা দলিল করে তার জন্যে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তারমধ্যে সব লিখে পড়ে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। সে দলিল তার কাছেই আছে। তাতে দাতা তিনি— গৃহীতা মা। "তুমি এবং আমি উভয়ে প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলাম—আমি দুরন্ত ক্যান্সার ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তুমি একান্ত নিষ্ঠার সহিত আমার সেবা পরিচর্যা করিয়াছ; এবং আমাদের উভয়ের সাহচর্যের ফলে আমাদের একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তোমাদের উভয়ের ভরণ-পোষণ আমার দায়িত্ব। আমার যে ব্যাধি হইয়াছে তাহাতে আমার যে কোন দিন মৃত্যু হইতে পারে এই উপলব্ধি করিয়া অতি বিচক্ষণ বিবেচনা ও বিচার করিয়া তোমাদের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিযা যাইতেছি।"

এরপর ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক ধর্মকথা বলে বলেছেন—তোমাদের মা এবং মেয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রইল। এই টাকার অর্ধেক—যা মুক্তামালার জন্য—সেটার প্রথম পাঁচ বছর খরচ হবে না—তারপর অর্থাৎ মুক্তামালার সাত বছর বয়স থেকে তার পডার জন্য খরচ হবে। তাকে কোন মিশনারী ইস্কুলে বোর্ডিংয়ে রাখতে হবে। কারণ এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থায সাধারণ ইস্কুলে মুক্তামালার মতো পরিচয় যাদের তাদের অনেক অসুবিধা। পড়ার খরচ সংকুলান হয়ে যদি কোন টাকা থাকে সেটা মুক্তামালা পাবে।

মুক্তামালা সাত বছর বয়স থেকেই মিশনারী বোর্ডিংয়ে থেকেছে। সাত বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত থেকেছে। তারপর মুক্তামালার মুক্তি, তার সৌভাগ্য ব্যাঙ্কটা ফেল পড়ে টাকাটা গেল। মায়ের তখন অসুখেরও শুরু। ওখানেই ইস্কুলে ভরতি হয়েছিল। সেখান থেকেই সে এর আঁচ পেতে লাগল। তারপর একদিন স্বয়ং তার মা—তার মুখের সামনে পরিচয়ের বারুদের আগুন ধরিয়ে দিনের আলোর মতো আলো জ্বেলে—সামনে ধরলে আয়না। ভাবলে রোশনাইয়ে তার মুখখানা অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আসলে ওই বারুদের আলোতে তার মুখখানা পুড়ে ঝলসে গেল।

যাক, পোড়ামুখের উপর মুখোশ বা রঙ সে লাগাবে না। সে ঢাকবে না। কিছুই ঢাকবে না। তার জন্মদাতা—তার মায়ের থেকে চাঁপা মাসী ভাল। অনেক ভাল—সহজ ওরা! চাঁপা মাসীর হরিভক্তি নেই—কিংবা চাঁপা মাসী যে সুরেন মেসোকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে তারও ওসব হরিভক্তি বা কালীভক্তি বা কোন ধর্ম-বাইই নেই।

* * *

শ্মশান থেকে ফিরতে হয়েছিল প্রায় রাত্রি ন'টা।

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সারারাত্রি। মাসী অনেকক্ষণ জেগেছিল কিন্তু মেসো ঘুমিয়েছিল। সুবেন মেসো আশ্চর্য সহজ মানুষ। মায়ের অসুখের শেষ দিনে এসে পৌঁচেছিল। সারাটা দিন আশ্চর্য সেবা সে করেছিল। মলমূত্র থেকে সব দু'হাতে পরিষ্কার করেছে—কারও মানা শোনেনি। শশ্মানেও সেই সব করেছে। তারপর এসে শুয়েছে এবং অঘোরে ঘুমিয়েছে। মুক্তা জেগেছিল। একা জানালার ধারে বসে তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। ঘুমন্ত শহর—উপরে নক্ষত্র-ভরা আকাশ—তার নীচে অন্ধকার, শহরের এখানে ওখানে আলোর ছটা, নিস্তব্ধ ইটকাঠের স্তূপ। মাথার মধ্যে সব যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ছিল একটা অবসন্নতা। কিন্তু তবু ঘুম আসেনি। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন উঠেছিল—এরপর?

এরপর সে চলে যাবে সেই কৃশ্চান মিশনের ইস্কুলে। সেখানে গিয়ে সব বলবে। তার জীবনের সব কথা। তারপর কৃশ্চান হবে। ওখানেই পড়বে। তারপর নিজের একটা পথ সে করে নেবে। এ পথ নয়; নাচগানের পথ নয়। কিন্তু এতেই তার একটা জন্মগত অধিকার আছে। গান সে শুনবামাত্র শিখতে পারে। তা হোক—এ পথে সে হাঁটবে না। না।

স্থির তাই করেছিল কিন্তু কাজে পরিণত করা তো সহজ নয়। সংসারে আসবাবপত্র, বাড়িটা আর শতখানেক টাকা ছাড়া আর কিছু ছিল না। চৌদ্দ-পনের বছরের কুমারী মেয়ে—সংসারে একা। কৃশ্চান মিশনে যেতে চেয়েও তার যাওয়া হয়নি। চাঁপা মাসী, সুরেন মেসো যেতে দেয়নি। আসবাবপত্র সামান্য, বেচে আশী টাকা পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ির ব্যবস্থা পরে হবে, ভেবেচিন্তে করা ভাল এই স্থির করে চাঁপা মাসী আর সুরেন মেসো তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করলে সে বলেছিল—আমার টাকাটা আমাকে দাও মাসী। আমি আসানসোলে গিয়ে মিশন ইস্কুলে ভরতি হব।

—মিশন ইস্কুলে ভরতি হবি কি? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল চাঁপা মাসী।

—হ্যাঁ। মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছি।

—কই দিদি তো তা বলেনি কিছু।

—না। মা বলেনি। আমি ঠিক করে রেখেছি।

—তুই ঠিক করে রেখেছিস কি? তোর ঠিক করার মানে কি? তোর কি ভালমন্দ বুঝবার বয়স হয়েছে যে তুই কৃশ্চান ইস্কুলে পড়বি! খরচ যোগাবে কে?

—কৃশ্চান হয়ে গেলে—বাপ-মা না থাকলে ওরা খরচ নেয় না।

—পডবার খরচের জন্যে তোকে ভাবতে হবে না! আমার একট ছেলে একটা মেয়ে আছে, তারা পড়ছে তুইও পড়বি। এই বাড়ি বিক্রি হলে কিছু টাকা তোর আসবে। পড়বার জন্যে জাত দিবি কি? এমন কথাও তো কোথাও শুনিনি।

সে চুপ করে গিয়েছিল—তার মাকে মুখের উপর যা বলতে পেরেছিল তা মাসীকে বলতে পারেনি। একবার ভেবেছিল সে পালিয়ে যাবে আসানসোল এবং কৃশ্চান মিশনে গিয়ে উঠবে। কিন্তু তাও সে পারেনি। অসহায় বোধ হয়েছিল নিজেকে।

কলকাতাতেই আসতে হয়েছিল তাকে মাসীর সঙ্গে। এসেছিল অনিচ্ছার সঙ্গে কিন্তু এখানে এসে তার ভাল লেগেছিল রূপীকে। রূপীর বয়স তখন বারো-তেরো। ওর স্বভাবে একটি আশ্চর্য মিষ্টতা আছে যেটি বোধ হয় জন্মগত।

সে প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করেছিল—তুমিই তো দিদি? আমার থেকে বয়সে তো বড় তুমি?

সে জবাব দেয়নি। কি জবাব দেবে? এবং জবাব দেবার মতো মনও ছিল না। উত্তর দিয়েছিল চাঁপা মাসী। কথাটা তার কানে গিয়েছিল—বলেছিল—হ্যাঁ, পেন্নাম কর।

রূপী বলেছিল—এস না তার থেকে হ্যান্ডশেক করি। পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম—এই তো এতটুকু বড় তুমি! বলেই হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিল—গুড মরনিং!

একটু ম্লান হেসেছিল সে।

চাঁপা মাসী ঘুরে এসে ঘরে ঢুকে বলেছিল—ওকে মেলা বকাসনে। ওকে জিরুতে দে। কই দীপা কই? বলেই ডেকেছিল গলা তুলে—দীপা—।

ও ঘর বা কোনখান থেকে দীপা উত্তর দিলে—আমি চুল আঁচড়াচ্ছি।

মা অর্থাৎ চাঁপা মাসী বলেছিল—মরণ হারামজাদীর। জাত-স্বভাব যাবে কোথা? চুল আঁচড়াচ্ছি! দিদি এসেছে—আয়।

—বাঃ। এই ছিরি করে যায় নাকি!

চাঁপা মাসী অবশ্য দাঁড়ায়নি, সে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত—ক'দিন বাড়ি ছিল না, ঘরদোর গুছিয়ে ঘুরছে এ ঘর থেকে ও ঘর। সে দীপার উত্তরের আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

রূপী হেসে বলেছিল—এইবার মা গাল দেবে। খানকীর বেটী কসবী। দীপাটা দিনরাত সাজছে আর নাচছে। এই নাচছে— এই নাচছে। পাড়ায় নটীর পূজা দেখেছে তাই নকল করছে!

দীপা ঘরে ঢুকেছিল সেই মুহূর্তটিতেই। রূপীর কথাগুলি শুনেছিল, বলেছিল,—আর তুই? তুইও তো দিনরাত গান গাইছিস—সূরিয়া অস্ত হো গেয়া—সূরিয়া মস্ত হো গয়া—গগন মস্ত হো গেয়া! আল্লা পানি দে—ম্যাঘ দে আল্লা—। থিয়েটার করছিস! এ্যাঁ—ওরে বাবা! মদ খাব না—সিগারেট খাব না—তাহলে কি খেয়ে বাঁচব নুটুদা! জান—একটা প্লে হচ্ছে—দুই পুরুষ—তাই দেখে এসে দিনরাত সুশোভনের আর গোপী মিত্তিরের পার্ট করছে। চা যেমন ডাল ভাত নয় তেমনি বিবেচনা করুন বিষও

না, আপনি মুনিব, বলছেন খেতে—তা দাও হে এককাপ চা দাও! দিনরাত ফাঁক পেলেই করছে। আবার আমাকে বলছে।

মুক্তো শোকাচ্ছন্নতার থেকেও অসহায় অবস্থার উদ্বেগে বেশি অভিভূত হয়েছিল। দীর্ঘ রোগভোগে মা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছে, তাতে তাকে প্রস্তুতই শুধু করেনি, ক্লান্তও করেছিল—তার উপর এই পরিচয়ের আঘাত! এতেই তাকে অভিভূত করেছিল বেশি। এদের মতো সত্য পরিচয়ের মধ্যে মানুষ হলে এমন হত না! এই সব কথাবার্তা শুনে তার মন চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল—

আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চলে যাব। তাও তো কিন্তু পারে না মানুষ। বিশেষ করে সে তখন চৌদ্দ বছরের কিশোরী। ছেলে হলে সে হয়তো পারত। কিন্তু সে যে মেয়ে। এ দেশের মেয়ে। যেখানে মেয়েদের বিশেষণ অবলা। বলহীনা। যারা বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের দ্বারা রক্ষণীয়া।

দুই

চাঁপা মাসী সুরেন মেসো কিন্তু জীবনের ঘরে কোন জানালাতে ঘষা কাঁচ বা রঙীন কাঁচ লাগায়নি। পরিষ্কার সাদা কাঁচের কারবার। জীবনের বর্তমানেও বাইরের সাদা আলো রঙীন হয়ে পড়েনি—এবং ভিতর থেকে বাইরেটা অর্থাৎ ভবিষ্যৎটাও রঙীন দেখা যেত না। সবটাই খোলাখুলি স্পষ্ট। কয়লার ডিপো থেকে চলত ওদের মন্দ নয়, ভালোই। যুদ্ধের বাজারে তো কয়লা থেকে বেশ কামিয়েছে। ছেলে পড়ে মেয়েও পড়ে। তা বলে ছেলে পড়ে একটা কেষ্টবিষ্টু হবে তা তাদের কল্পনা ছিল না, যা হয় হবে, কয়লার ডিপো তো আছেই, তবে মেয়ের সম্পর্কে উচ্চাশা কালের সঙ্গে ফুলে-ফলে ভরে উঠেছিল।

সিনেমা আর্টিস্ট হবে দীপা।

১৯৪২।৪৩ সাল।

বাংলাদেশে কলকাতার ভাল ভাল ঘরের মেয়েরা ছবিতে নামছে; সিনেমায় নেমে চাঁপা মাসীর জানাশোনা ও চেনা মেয়েরা যখন আর্টিস্ট হয়ে খ্যাতি ও অর্থই শুধু নয় কত সদ্বংশের বউ হয়ে যাচ্ছে তখন এর চেয়ে ভাল ভবিষ্যৎ মেয়ের জন্য আর কি হতে পারে?

সুরেন মেসো খবরের কাগজ নিত, পড়ত তার মধ্যে শুক্রবারের কাগজের দাম বেশি। ওই দিন কাগজে থাকে সিনেমার খবর, থিয়েটারের খবর। চাঁপা মাসী ছেলেকে পাঠায় মাসে মাসে সিনেমার কাগজ কিনবার জন্য। ছেলে-মেয়ে চাঁপা মাসী সুরেন মেসো সেগুলি কণ্ঠস্থ করে নিত। যুদ্ধের কাল, দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল—দেশে অভাব মড়ক—এ সব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না, তবে কথাবার্তা তাদের হতো; কিন্তু জীবনের সব আগ্রহ ছিল সিনেমা নিয়ে। এরই মধ্যে তার জীবন শুরু হলো নূতন করে।

তার জীবনের মূলে রয়েছে একটা গোপন রাখা ছি-ছিক্কার। এটা যদি তার মা

তার কাছে জন্ম অবধি গোপন না করত, একটা ভগবানকে বিশ্বাস-ভক্তির ভানের নামাবলী পরিয়ে হিতোপদেশের নীলবর্ণ শৃগালের শৃগালত্বের উপর একটা অবজ্ঞা ঘৃণা না জন্মিয়ে দিত তা হলে এই ছি-ছিকার বোধ থেকে পীড়া সে অনুভব করত না।

মাসখানেক পর দীপাদের স্কুলেই তাকে ভরতি করে দিয়েছিল সুরেন মেসো। তখনও সে মুক্তামালা বোস। বাবার নাম ভূদেব বোস। কিন্তু দীপা তার মায়ের নাম আর সংগীতখ্যাতির গৌরব প্রকাশ করে দিয়েছিল সগৌরবে। তার মায়ের গানের রেকর্ডের কথাটা অহংকার করেই সে বলে বেড়িযেছিল।

—জান, মুক্তোদির মা, আমাব মাসী খুব ভাল গান গাইত। রেকর্ড আছে। খুব ভাল রেকর্ড। কেত্তনগান। সজনী কি হেরিনু যমুনার কূলে। ব্রজকুলনন্দন, হরিল আমার মন—ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে! আর এক পিঠে আছে গজল- -কুয়েঙ্গে হম হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো!

মুক্তামালার শরীর যেন ঝিমঝিম করে উঠত। তার মনে হত—এখনি, যাদের কাছে গৌরব কবে দীপা এই সংবাদটি দিচ্ছে তাদের মুখে সেই বিচিত্র হাসি ফুটে উঠবে—যা ফুটে উঠেছিল বর্ধমানের শ্মশানে সেখানকার লোকদের মুখে।

তার জন্মের বছরেই—মাস আষ্টেক পব—তার জন্মদাতা কগ্নদেহেই তদ্বির করে গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তাদের ধরে-পেড়ে মায়ের এই গান দু'খানা রেকর্ড করিযেছিলেন। আশা করেছিলেন—যদি গান দু'খানা বাজারে জনপ্রিয় হয় তবে এই দিক থেকে কাঞ্চনমালার জীবনের উপার্জনেব পথ খুলবে। নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সে আশা পূর্ণ হয়নি, শুধু এ রেকর্ডখানায় প্রমাণ থেকে গেছে—কাঞ্চনমালা দাসী ছিল পেশাদার কীর্তনওযলী . ঢপ কীর্তনওয়ালী।

দীপাকে সে বারণ কবত—-ওসব কথা কেন বল দীপা ?

দীপা বলত—কেন, বলব না কেন ? হিংসুটিরা সব শুনুক না। আমার মা থিযেটার করত আমি তো সবাইকে বলি!

চুপ করতে হত তাকে।

যাদের কাছে দীপা এ গল্প কবত তারা অনেকে প্রশ্ন করত—তুমি গান গাইতে পার ?

সে বলত—না।

দীপা বলত—না—না। খুব ভাল পারে। গায় না। আমি শুনেছি—একা যখন থাকে, তখন গুনগুন করে গায়। রেডিওতে গান হয়—যে গান ভাল লাগে সে একা থাকলে নিজে গায়। ববীন্দ্রসংগীতে ভারী ঝোঁক!

সে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত কাঠের পুতুলের মতো চলে যেত সেখান থেকে। কিন্তু চ গিয়ে এমন ক্ষেত্রে রেহাই পাওয়া যায় না। হয় তো সব দেশে সব সমাজে . কিছু কিছু আছে—কিন্তু এ দেশে এ সমাজে এর আর ক্ষমা নেই। এ দেশে মানুষ ছুঁলে মানুষ স্নান করে, নিজের বিছানাও এখানে পবিত্র নয়, অন্ন-জল এ ে

মানুষের স্পর্শে অপবিত্র হয়। সেই দেশে কি কাঠের পুতুল হলেও রেহাই পায় কেউ? সেও পায়নি। একদিন কাঠের পুতুলত্বের ভিতর থেকে তার অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল।

অহল্যা অসতীত্বের অপরাধে পাথর হয়ে গিয়েছিল। সে গল্প সে শুনেছে। পড়েছে। আজ এই চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মন তার নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছে! মানুষের দেহ সত্যিই পাথর হয় না; মন পাথর হয়। সে যেমন ইস্কুলে কাঠের পুতুল হয়েছিল—তেমনি গৌতম ঋষির পরিত্যক্ত স্ত্রী অন্তরে পাথর হয়ে ঘুরে বেড়াত—গ্রাহ্য করেনি মানুষের ব্যঙ্গ, গ্রাহ্য করেনি সমাজের শাস্তি; সে অরণ্যে অরণ্যে বনবাসিনী হয়ে ফিরত, স্তব্ধ বোবা হয়ে থাকত। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। তারপর রাম এসে তাকে যেদিন পদাঘাত করলেন—সেইদিন পাথরের মন ফেটে গেল মর্মান্তিক বেদনায়। ভেঙে পড়ল। কাঁদল রামের পায়ে ধরে। রাজার ছেলে রাম, লোকে তাঁকে বলত ভগবানের অবতার, তাঁর আদেশে দেশের সমাজের একপ্রান্তে সে স্থান পেয়েছিল। সে অহল্যার মতো নয়, তবু তার সঙ্গে নিজের একটা মিল খুঁজে বের করে। অহল্যার দোষ—অহল্যার; সে দোষ কতটুকু তার বিচার থাক, হয় তো ষোল আনা অপরাধের এক আনা। তার ক্ষেত্রে অপরাধ তার নিজের এক পাইও নয়। অপরাধ জন্মদাতার, অপরাধ গর্ভধারিণীর। যার জন্যে সে কাঠের পুতুল হয়েছিল। তারপর একদিন সে কাঠের পুতুল ক্ষোভে অপমানে অন্তরের আগুনে জ্বলে উঠল। তার ভাগ্যে রাজার ছেলে রাম নয়, বর্ধমানেরই এক উকীলের নাতনী তাকে লাথি মারার মতোই আঘাত করলে।

মাস আষ্টেক পর।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস।

সেবার সে ক্লাস প্রমোশন পায়নি, ফেল করেছিল। দীপাও পায়নি। রূপী কেঁদেকেটে উঠেছিল। চাঁপা মাসীর বাড়িতে তা নিয়ে কোন ক্ষোভ হয়নি। চাঁপা মাসী একটু ক্ষুব্ধ যদিবা হয়েছিল কিন্তু সুরেন মেসোর পরিহাসে তা জোরালো ফুৎকারে আগুনের ফিনকির মতো নিভে গিয়েছিল।

চাঁপা মাসী বলেছিল—একটা কেউ বাড়ির প্রমোশন পেলে না গা! (তখনও কাঁদাকাটা করে রূপীর প্রমোশন হয়নি।) তা হলে—অপব্যয়গুলো করে হবে কি?

সুরেন মেসো বলেছিল—যেত্ দাও (যেতে দাও) মহিন্দর—যেত্ দাও। বেশি বকো না! (বোধহয় কোন পুরানো নাটকের কথা)

চাঁপা মাসী বলেছিল—যেত্ দেবো! বকবো না?

সুরেন মেসো গড়গড়ায় কাঠের নল লাগিয়ে তামাক খেতো, আর খেতো এক ডেলা আফিং। চোখ প্রায় বুঁজেই থাকত। সেই অবস্থায় তামাক খেতে খেতেই বলেছিল—হ্যাঁ। যেত্ দেবে। বকবে না।

—কেন?

—আরে! গড়গড়ার নল থেকে এবার মুখ তুলে—চোখের পাতা দুটোকে চেষ্টা

করে চাড় দিয়ে খুলে আরক্ত দৃষ্টিতে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল—আরে আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হয়? ইস্কুলে ফিফ্‌থ ক্লাস থেকে ভেগেছিলাম। এক ক্লাসে তিন বছর ছিলাম। ভেবেছিলাম কেঁদেকেটে প্রমোশন পাব, তা হেডমাস্টার বললেন—তোকে প্রমোশন দিতে হলে গরুকে দিতে হবে। ও কেষ্ট, কেরানীবাবুকে বল তো সুরেনের বাংলা খাতাটা দিতে। খাতা এল—মাস্টার দেখালেন—গরু বানান লিখেছি গ রয়ে উ। তারপর বললেন—তোর পকেট থেকে হেডপণ্ডিত পরীক্ষার হলে সিগারেট বের করেছিলেন, তাতে কি ছিল? সিগারেট? তাঁর মাথা ঘুরছে! ছিল চরস। মিকচার টোবাকোর সঙ্গে চরস মিশিয়ে খেতাম। বুয়েচ! এরপর পড়া ছাড়লাম। তারপর অ্যামেচার থিয়েটার। শেষ পর্যন্ত পাবলিক থিয়েটারে ড্যান্সিং মাস্টার। একবার এস্টারের বড়বাবু নাটক কপি করতে দিয়েছিলেন—এমন কপি হলো যে সে পড়ে কোন্ বেটা। তা আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া কি করে হবে বলো? আক্ষেপ করো না চম্পকরানী, বৃথা এ আক্ষেপ তব, অরণ্যে রোদন।

চাঁপা মাসী বুঝেছিল। কিন্তু পড়া ছাড়ায়নি ছেলেমেয়ের। সিনেমাতে ঢুকতে হলে লেখাপড়া জানা চাই। অন্তত ম্যাট্রিক ফেল এটা বলতে পারা চাই। তার সম্বন্ধে কথা ওঠেনি। মায়ের মৃত্যুর পর মাত্র কয়েক মাস সে ভরতি হয়েছিল। আর টাকা যেটা তার পিছনে খরচ হচ্ছিল সেটা তার বাড়ি বিক্রির টাকা। বিশ বছর আগে আড়াই হাজারে কেনা বাড়ি সাত হাজারে বিক্রি হয়েছে। সে নিজে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দুঃখ পেয়েছিল কিন্তু পরিশ্রম সে কম করেনি, তাই অনুশোচনা বা নিজেকে তিরস্কার করতে পারেনি—শুধু দুঃখ পেয়েছিল, কেঁদেছিল।

ক্লাসে নিচের ক্লাসের মেয়েরা উঠে এল। সঙ্গে এল এই মেয়েটি—নাম গায়ত্রী মুখার্জী! বর্ধমানের কোন্ উকীলের পৌত্রী—বাপ কোন্ তেল কোম্পানিতে কাজ করে, আগে থাকত ভবানীপুরে, এখন নতুন কলোনিতে বাড়ি করে এখানে থাকে। মেয়েটি এ ইস্কুলে এসেছে অল্প কিছুদিন। প্রমোশনের দিন সে তাদের ক্লাসের মেয়েদের নাম ডাকা শেষ হলেই চলে এসেছিল, তার নাম তাদের মধ্যে ছিল না। তারপর দু' তিন দিন কেঁদেছিল। তারপর কয়েকদিন ইস্কুলে আসেনি। তারপর এল ইস্কুলে। যেদিন এল সেইদিনই একটি ঘটনা ঘটল। সে ক্লাসে ঢুকে ভাবছিল কোথায় বসবে। একটা বেঞ্চে আরও দু'জন ফেল করা মেয়ে বসেছিল। তারাই তাকে ডেকেছিল—মুক্তো এখানে আয়। এই বেঞ্চে।

মুক্তো সেই বেঞ্চেই গিযে বসেছিল। গায়ত্রী উঠে গিয়েছিল বেঞ্চখানা থেকে। কারণটা সেদিন বুঝতে পারেনি মুক্তা।

কয়েকদিন পর গায়ত্রী এসে হঠাৎ তাকে বললে—আমাদেরও বাড়ি বর্ধমান।

মুক্তার বুকখানা ধড়াস করে উঠল। সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গায়ত্রী হেসে বললে—আমার মা তোমার মাকে দেখেছে। বলছিল—তোমার মা খুব ভাল গান গাইত।

সে হাসির মধ্যে ইঙ্গিত ছিল। মুক্তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, হাত-পা ঘামতে

শুরু করেছিল। চুপচাপই সে থাকত। অভ্যাসে অভ্যাসে যেন স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। বুকের ভিতর বিদ্রোহ জেগেছিল কিন্তু বলতে কিছু চায়নি—পারেনি। এর উত্তর যে সে আজও খুঁজে পায়নি। এর উত্তরে সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মা উত্তর একটা দিয়েছিল—সে উত্তর উত্তর নয়—সে তার মায়ের কৈফিয়ৎ। যে কৈফিয়তে সে নিজেই সন্তুষ্ট হয়নি—দুনিয়া তাতে খুশি হবে কেন? মায়ের মতো সে যদি বলতে পারত তবে ভাল হত। কিন্তু সে তা আজও পারলে না। সেদিন পারার কথাই ছিল না। সে শুধু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে সেই তাকিয়েই ছিল।

গায়ত্রীর বয়স হয়েছিল। তার থেকে তার বেশি বয়স। তাছাড়া সে সেই ধরনের মেয়ে যারা বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বয়সের মেয়ে হয়ে ওঠে। যাদের বাড়িতে পুরানো আমলেই সেই রেওয়াজ আজও আছে যাতে মেয়েরা যুবতী হতে হতে বুড়ির মতো কথা বলতে পারে। সে মুখ মচকে বলেছিল—তুমি বোবা নাকি?

সে এবার বলেছিল—না। বোবা কেন হব?

—তবে? কথা বল না যে?

—এই তো বলছি।

—কিন্তু সবাই বলে, তুমি কথা বল না।

এ কথারও সে জবাব দেয়নি। আবার সে চুপ করে গিয়েছিল।

—আচ্ছা, চলি।

বলে গায়ত্রী চলে গিয়েছিল। ক্লাসে মাস্টার তখনও আসেনি। শুরু হয়নি ইস্কুল। যাবার সময় গায়ত্রী গান গেয়েছিল গুনগুন করে।

গোকুল নগর মাঝে আরও কত নারী আছে।
তাহে কেন না পড়িল বাধা!—কীর্তন গেয়েছিল কাঞ্চনমালা দাসী।

সারাটা দিন সে কাঠ হয়ে বসেছিল। না কাঠ নয়—ছিল কাঠ, সেদিন সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কাঠ মাটির তলায় চাপা পড়ে পাথর হয়। সেদিন এ কথা সে জানত না—আজ সে লেখাপড়া না শিখেও অর্থাৎ ইস্কুল-কলেজে না পড়েও অনেক জেনেছে, আজ সে জেনেছে শুধু পাথর কেন কয়লাও হয়—আগুন লাগে কয়লায়।

ইস্কুলে যে পড়া তার হয়নি, পড়েও যে সে ভাল করে কিছুই বুঝতে পারত না তার কারণও এই। একটা আশঙ্কায়, নিজের প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় তার মন প্রথমে কাঠ, পরে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

চাপা হাসির একটা তরঙ্গ ক্লাসের অন্য প্রান্তে বয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার কাছে অগোচর থাকেনি। শুধু চাপা হাসিই নয়—মধ্যে মধ্যে সপ্রশ্ন বিস্মিত দৃষ্টি গায়ত্রীর মুখের দিকে প্রথম নিবদ্ধ হয়ে মুহূর্ত পরে তার দিকে ফিরছিল।

টিফিনের সময় স্রোতটা এসে সরাসরি তার উপর আছড়ে পড়েছিল। ওপাশের একটি মেয়ে এসে তাকে প্রশ্ন করেছিল—তোমার মা নাকি ঢপকেত্তনওয়ালী ছিল?

সে কি উত্তর দেবে? বিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে তার দিকে শুধু তাকিয়েই ছিল। গায়ত্রী পিছন থেকে এসে বলেছিল—উত্তর দাও না কেন?

তার কণ্ঠ থেকে এবার স্বর বের হয়েছিল। তাতে অসহনীয় উত্তাপ। সে উদ্ধতভাবে কণ্ঠে উত্তাপ এনে বলেছিল—হ্যাঁ ছিল।

—তোমার মা বেশ্যা ছিল?

এবার বিস্ফোরণ হয়েছিল। তার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। সে বাঘিনীর মতো লাফ দিয়ে পড়েছিল গায়ত্রীর উপর। এবং চিৎকার করে বলেছিল—না—না—না। আপিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন—হেডমিস্ট্রেস!—কি হলো? কি হয়েছে? ছাড! ছাড!

ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা তো এখানেই শেষ হবাব নয়! আপিসরুমে ডাক পড়েছিল। দু'জনেরই ডাক পড়েছিল। হেডমিস্ট্রেস দু'জনকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছিল বল!

ঠিক এই সময়ে অন্য একজন দিদিমণি হেডমিস্ট্রেসের কানে কানে কিছু—কি আর কিছু—এই ঘটনার কথাই সংক্ষেপে তাঁকে বলেছিলেন,—নইলে হেডমিস্ট্রেস বলবেন কেন—তুমি একটু বাইরে যাও—ওই টিচারদের রুমে গিয়ে বস। পরে ডাকব তোমাকে।

টিচারদের ঘরে গিয়ে একপাশে সে চুপ করে বসেছিল। অন্তরে কিন্তু আগুন জ্বলছিল, মনে হচ্ছিল উদ্ধত চিৎকাবে সে বলে—হ্যাঁ—আমার মা—। আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে—এইখানেই তাব মনের কণ্ঠও যেন আপনা-আপনি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল—নিজের ভিতরেই কেউ যেন মনের কণ্ঠকে সজোরে টিপে ধরে বলছিল—না—। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতর থেকে অসহনীয় বেদনার ক্ষোভের সমুদ্র কলকল্লোলে আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল বাইরে এসে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সেই হাতখানাই এবার তাব মনের মুখের উপর চাপা দিয়ে সেই ভিতরের জন বলছিল—ছি! মেঝের দিকে চেয়ে সে বসেছিল কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করছিল—টিচারদের বক্রকটাক্ষ একবার তার দিকে একবার নিজেদেব মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে বিনিময় হচ্ছিল—ইঙ্গিত চলছিল। অনেকজনের ঠোঁট দুটি ওই গায়ত্রীর মতোই উল্টে উল্টে যাচ্ছিল।

অসহনীয় শীতে যেমন কষ্ট হয় ঠিক তাই যেন হচ্ছিল তার। সূচীতীক্ষ্ণ কিছু যেন তাকে বিঁধছিল, দেহ হয়ে আসছিল অসাড।

এ অনুভূতি স্পষ্ট মনে আছে আজও। মনই অসাড় হয়ে আসছিল আসলে। কিছুক্ষণ পর যখন তার ডাক পড়েছিল তখন প্রথমটায় সে ঠিক খেয়াল করতে পারেনি। তাকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে হয়েছিল, চমকে উঠেছিল সে; যে দিদিমণি কাছে বসেছিলেন তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিলেন,—তোমাকে ডাকছেন! শুনতে পাচ্ছ না?

সে আস্তে আস্তে উঠে এসে আপিসঘরে টেবিল ধরে দাঁড়িয়েছিল। হেডমিস্ট্রেস বলেছিলেন—কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমাকে। সত্যি জবাব দেবে! কেমন?

সে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ।

—তোমার—! কথা বলতে তাঁরও বাধছিল। একবার থেমে দ্বিতীয়বারে শেষ করে বলেছিলেন—তোমার মা কীর্তন গাইতেন?

—হ্যাঁ।

—কাঞ্চনমালা—কীর্তনগায়িকা?

—হ্যাঁ।

—বর্ধমানে থাকতেন?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি তো বর্ধমান ইস্কুলের সার্টিফিকেট নিয়ে এসে ভর্তি হয়েছ। মিশনারী ইস্কুল।

এর উত্তর আর সে দেয়নি। গলা তার শুকিয়ে আসছিল।

হেডমিস্ট্রেস কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন। এরপর আর যেন প্রশ্ন পাচ্ছিলেন না তিনি। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—বোধহয় খুঁজে পেলেন—কাঞ্চনমালা দাসী? না?

সে ঘাড় নাড়লে—হ্যাঁ।

—জাতে কি তোমরা?

—বোস্টুম।

—কিন্তু—তোমার নাম রয়েছে মুক্তামালা বোস! বাবার নাম রয়েছে ভূদেব বোস। কেন বল তো? মা দাসী! বাবা বোস!

অকস্মাৎ সব কালো হয়ে গিয়েছিল—অথবা কালো একটা সমুদ্রের মতো কিছু এসে দিনের আলো বাইরের সব—আপিস রুম—সব—সব ঢেকে ফেলেছিল বা ডুবিয়ে দিয়েছিল।

আর তারপর কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ পর সে জানে না, আবার দিনের আলোর মধ্যে ফিরে এসেছিল। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। শুয়েছিল একখানা বেঞ্চের উপর। একজন দিদিমণি মুখে জল দিচ্ছিলেন, ইস্কুলের ঝি মাথায় হাওয়া করছিল।

কথা আর কিছু হয়নি। কিছুক্ষণ পরে একখানা রিক্‌শা ডেকে একজন দিদিমণি তাকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং দিয়ে গিয়েছিলেন ইস্কুলের একখানা পত্র। তার গার্জেন মেসোমশায়কে যেতে লিখেছিলেন হেডমিস্ট্রেস।

অকস্মাৎ চাঁপা মাসীর গৃহস্থঘরের সব আবরণ নিতান্তই একটা খোলসের মতো খসে পড়েছিল। কুৎসিত ভাষায় উলঙ্গ অশ্লীল গালিগালাজ শুরু করেছিল মাসী ওই গায়ত্রীকে এবং ইস্কুলের দিদিমণিদের। সে শুয়েছিল, শুয়ে শুয়ে শুনছিল, তারপর সে এখানেও যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। তার মাও কি এমনই আঘাতে এমনি উলঙ্গ গালিগালাজ করতে পারত? সেও কি পারে? আজ না-পারলেও কাল পারবে?

ব্যাপারটা আরও খানিকটা গড়িয়েছিল। সুরেন মেসোকে ডেকে হেডমিস্ট্রেস বলেছিলেন, ভালকরেই বলেছিলেন—দেখুন এ নিয়ে যখন আন্দোলন হয়েছে তখন তো মুক্তোকে বা দীপাকে আর নিতে পারব না! ইস্কুলের ক্ষতি হবে।

সুরেন মেসো আহত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—ওদের মা-বাপের যাই দোষ থাক ওদের দোষ কি বলুন?

—সে বিচার আমি করব না সুরেনবাবু, আমাকে ইস্কুল রাখতে হবে। ইস্কুলের জন্য ওদের আমি রাখতে পারব না। আপনি অন্য ইস্কুলে দিন না।

—না। সেখানেও যদি এই বলে?

—কি করব? আমি নিরুপায়। আমাকে নোটিশ দিয়ে নাম কেটে দিতে হবে।

সুরেন মেসো একটু অনুনয় করেছিলেন, বলেছিলেন—আপনি জানেন না, মুক্তার মা বলতে গেলে মুক্তার জন্মের আগে থেকে গৃহস্থরের মেয়েদের থেকেও ভাল ছিলেন। একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে না-নিলে—

—উপায় নেই। কি করব আমি। ইস্কুল আমার ভেঙে যাবে।

এবার চটেছিলেন সুরেন মেসো। বলেছিলেন—ভাল, মুক্তোকে বলছেন—সে আসবে না! কিন্তু দীপা আসবে। তাকে আপনি তাড়ান কি করে তা আমি দেখব।

চলে এসেছিলেন সুরেন মেসো। তারপর ইস্কুল থেকে নোটিশ এসেছিল—পরিচয় গোপন করে মুক্তা ও দীপাকে ভরতি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে পড়তে ইস্কুলের মেয়েদের সামাজিক কারণে আপত্তি আছে। সুতরাং তাদের নাম কেটে দেওয়া হলো।

সুরেন মেসো দিয়েছিলেন উকীলের নোটিশ। তার ব্যাপার নিয়ে নয়, দীপার ব্যাপার নিয়ে।

সুরেন মেসো চাঁপা মাসীকে থিয়েটারের লোকদের সাক্ষী রেখে চাঁপা মাসীদের সমাজের পুরোহিত ডেকে অনুষ্ঠান করেই বিয়ে শেষ করেননি; রেজেস্ট্রী করেও বিয়ে করেছিলেন।

ওই সমারোহের কিছুদিন পর। লোকের ব্যঙ্গে ঠাট্টায় ক্রুদ্ধ হয়ে করেছিলেন রেজেস্ট্রী বিয়ে। থিয়েটারের লোকে বলেছিল—মিত্তিরের মরণ, চাঁপারও আদিখ্যেতা। বিয়ে! দূর। দু'দিন পরে মিত্তির ছুটবে চাঁপাকে ছেড়ে পারুলের বাড়ি—চাঁপা ধরবে নতুন কাপ্তেন। সঙ করবি তার এত ঢঙ কেন?

শুধু পুরুষরাই নয়। মেয়েরাও। মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়ে হাসত। একজন সেই বৈশাখে চাঁপাকে ঠাট্টা করে বলেছিল—তোকে ভাই এবার এয়ো করব আমি। চাঁপা মাসী তাকে কি জবাব দিয়েছিল সেটা কাহিনী আর স্মৃতি থেকে মুছে গেছে, সুরেন মেসোরও গেছে, চাঁপা মাসীরও গেছে—তবে তাদের সে মর্মবেদনার কথা মনে আছে; বেদনা তারা দু'জনেই পেয়েছিল, এই ক্ষেত্রটিতে তাদের দু'জনেরই মনের চামড়ার অবস্থা গণ্ডারের চামড়ার মতো পুরুই ছিল কিন্তু তা তখন বিচিত্রভাবে কোমল মানুষের চামড়া হয়ে উঠেছিল—তারা এতে আঘাত পেয়েছিল। এবং দু'জনেই পরামর্শ করে রেজেস্ট্রী করে এসেছিল।

সার্টিফিকেটখানা ছিল। কোনদিন কাজে লাগবে বলে ছিল না, পরম প্রিয় বস্তু বলে ছিল। তারই নকল সমেত দিয়েছিল উকীলের চিঠি এবং মানহানির জন্য নালিশের কথাও তাতে লেখা ছিল। এরপর হেডমিস্ট্রেস ও সেক্রেটারী ছুটে এসেছিলেন চাঁপা মাসীর বাড়ি। ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—যা হয়ে গেছে গেছে, দীপাকে পাঠিয়ে দেবেন। মুক্তোকেও দেবেন। তবে—গোলমাল তো ওকে নিয়েই কিনা। একটু ভেবে দেখুন—ইস্কুলটা হয়তো ভেঙে যাবে।

সুরেন মেসো টেবিলে চাপড় মেরে বলেছিলেন—স্যার, আমি দু'-কান কাটা। এক-কান-কাটারা গাঁয়ের বাইরে বাইরে যায়, দু'-কান-কাটারা শহরের পথের উপর বুক ফুলিয়ে হাঁটে। ওই গায়ত্রী না কি, ওর বাবাটার খোঁজ আমি নিয়েছি স্যার। ওটার আবার নাক-কান দুই কাটা। মুক্তোর মা কাঞ্চন এই পাপ জীবন থেকে পালাতে গিয়ে আসানসোলে কয়েকটা ডাকাত লোচ্চার হাতে পড়েছিল—তারা তার লাঞ্ছনার বাকি রাখেনি। খবরের কাগজে শোরগোল উঠেছিল—লিখেছিল—ভদ্রলোকে পুণ্য করে না পতিতে পুণ্য করে। সব ভদ্দরলোকের ছেলে গুণ্ডা লোচ্চা তারা। মস্ত কেস। সেই কেসে ওই গুণ্ডাদের উকীল ছিল গায়ত্রীর ঠাকুরদা। ওর বাবাও গুণ্ডা! সেটা ছিল গুণ্ডাদের টাউট। মহাজনটুলিতে নামী লোক। তবে উকীলের বেটা চাকরি পেয়ে গেছে। এখন জেন্টেলম্যান। আমি ফাঁস করে দিচ্ছি। যেতে দিন বললে শুনছি না।

তাই বলতে তাঁদের হয়েছিল। কিন্তু সেটা এ পক্ষের জন্যেই তাঁরা বলেছিলেন। অর্থাৎ দীপা এবং মুক্তোর জন্যে।

পরের দিন সুরেন মেসো নিজে পরমোৎসাহে সেজেগুজে ডাক দিয়েছিলেন—দীপা মুক্তো—হলো তোদের, চল আমি নিয়ে যাব তোদের ইস্কুলে।

দীপার হয়েছিল—সে তৈরি হয়ে বলেছিল—যাচ্ছি বাবা। মুক্তোদির হয়নি।

—মুক্তো! ডাক দিয়েছিলেন সুরেন মেসো।

মুক্তো চুপ করে বসেছিল তার বিছানার তক্তাপোশটার একটা কোণে। একটা দুরন্ত ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল; পাশে বইপত্তর পড়ে ছিল কিন্তু কোন মতেই উঠে দাঁড়াতে পারছিল না সে।

তার মনের চোখের সামনে অসংখ্য মেয়ের ব্যঙ্গ-হাস্যে মেলা দাঁতগুলো যেন লম্বা ধারালো ছুরির মতো সারি বেঁধে উঁচিয়ে ছিল—ঝিকঝিক করছিল—তাকে যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

দীপা এসে দাঁড়িয়েছিল—এসো ওঠো। দীপার উৎসাহ সুরেন মেসোর মতো। অথবা তার থেকেও বেশি। কিন্তু মুক্তো পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। দীপা তার বইয়ের ব্যাগটা তুলতেই সে চেপে ধরেছিল।

—না।

—তারপর এসেছিল চাঁপা মাসী—মুক্তো।

সে বলেছিল—না।

চাঁপা মাসী তাব হাত ধবে বলেছিল—না নয়, ওঠ! যেতে হবে তোকে।

সে কেঁদে ফেলেছিল—না—না। অন্য হাতটা দিয়ে বিছানাব চৌকিব বাজুটা চেপে ধবেছিল।

—কেন?

—না—না। আমি যাব না।

—মুক্তো, তোব হলো কি? এবাব এসেছিলেন সুবেন মেসো। সঙ্গে রূপী।

সে এবাব সবেগে ঘাড় নেড়ে নিদারুণ আতঙ্কে কেঁদে উঠে বলেছিল—আমি যাব না। আমি মবে যাব। না—না—না। বাগ কবে চাঁপা মাসী টেনেছিল তাকে সজোবে। সে-টানে তাব হাত ছেড়ে গিযে সে আছড়ে পড়েছিল মেঝেব উপব। পড়বাব সময় চৌকিব কোণে লেগে তাব কপালটা কেটে বক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে কথা সে জানতে পাবেনি, সে অধিকতব আতঙ্কে চিৎকাব কবে কেঁদে উঠেছিল—তোমাদেব পায়ে পড়ি, তোমাদেব পাযে পড়ি। আমি যাব না। আমি পড়ব না। চাঁপা মাসী ছেড়ে দিয়েছিল তাকে।

সুবেন মেসো বলেছিল—থাক তবে, আজ থাক ও। চল দীপা, তুই চল।

তিন

এবপব আব সে ইস্কুলে যায়নি। চেষ্টা সুবেন মেসো কর্বেছিল—প্রায এক মাস ধবে চেষ্টা কবেছিল— প্রতিদিন সে এসে ডাকত—চল, কোন ভয নেই চল।

সে খাটেব বাজু ধবে দাঁড়িয়ে থাকত। চুপ কবে। সেই কাঠেব বা পাথবেব মূর্তিব মতো।

শেষ পর্যন্ত চাঁপা মাসী একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে তাব চুলেব মুঠো ধবে টেনেছিল।—যেতেই হবে তোকে।

সে চিৎকাব কবে কেঁদেছিলো—না —না।

বাঁচিয়েছিল সুবেন মেসো এসে।— ছেড়ে দাও। কবছ কি?

চাঁপা মাসী বলেছিল—না। আজ ওবই একদিন কি আমাবই একদিন!

—না—না। যেতে দাও।

—যেতে দেবো!

—হ্যাঁ। যেতে দাও। না যায় যাবে না।

—যাবে না তো কববে কি? আমবা গেবস্ত এখন। সোনাগাছিব ব্যবসা তো নয়!

—কি বিপদ! চেঁচিও না।

—চ্যাঁচাব না! আব তো সব ঢাকা আছে তাই চ্যাঁচাব না ওই ওব জন্যে।

সুবেন মেসো বলেছিল—রূপীব সঙ্গে ওব বিয়ে দিয়ে দেব। রূপীব তো বিয়ে দিতে হবে।

—রূপীব সঙ্গে বিযে? মাসতুত ভাই-বোন। ও বয়সে এক বছবেব বড।

—হলেই বা! আমাদের শাস্তরে তো পিণ্ডিদোষ নেই। আর এক বছরের ছোটতে যাবে আসবে না কিছু। বেটাছেলে—হু হু করে বেড়ে যাবে।

হঠাৎ রূপী ঘরে ঢুকে বলেছিল—এক থাবড়া মারব তোমার মুখে। খবরদার তুমি ও কথা বলবে না আর। ও কথা শুনলেও পাপ হয়।

সে শুধু কাঠের মূর্তির মতো এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এবার তার চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করেছিল। গায়ত্রীর কথায় তার বুকে আগুন জ্বলেছিল, রূপীর কথায় এসেছিল চোখে জল।

সুরেন মেসো বলেছিল—ওরে আমার মুনিঋষির ব্যাটা! মুখে আমার থাবড়া মারবি! ও কথা শুনলে পাপ হয়! যে কাল পড়েছে তাতে বামন বদ্যি ভদ্দরলোকের ঘরে রেজেস্ট্রী করে এই বিয়ে কত হচ্ছে—আর তুই বেটা আমার গঙ্গাজলখেগো কুলীনের পুত্তুর মহা-কুলীন! বলে কিনা পাপ হয়! তোর মাকে বিয়ে করে আমার পাপ হয়েছে? পাপ?

চাঁপা মাসী ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল—তুমি হলে পরমহংস মহাপুরুষ। তোমার আবার পাপ হয়?

রূপী বলেছিল—পাপ হয়ে থাকে তোমার হয়েছে। সে তুমি জান! তার প্রায়শ্চিত্ত তুমি করবে। তা বলে আমরা কেন পাপ করব? না। এসব কথা বলবে না তুমি।

দীপা মুখে কাপড় দিয়ে হেসেছিল তার মায়ের মতোই।

বিচিত্র মানুষ সুরেন মেসো। ও-কথা আর কোন দিন বলেনি। এবং এ নিয়ে কোন ক্ষোভই তার ছিল না।

কয়েক দিন পর রূপীকে বলেছিল—ওরে বেটা আমার কথাটাই তুই বুঝলি নে। তোর মাকে বিয়ে করে আমার পাপ তো হয়ইনি, পুণ্যি হয়েছে। বুঝলি! পাপ করেছিলাম আগে—সেটা খণ্ডেছে।

রূপী কথা বলেনি। বলেছিল—চাঁপা মাসী। বলেছিল—কিন্তু তুমি কি করে বললে মুক্তোর সঙ্গে রূপীর বিয়ের কথা?

—কি করে বললাম?

—হ্যাঁ? কি করে? কোন্ শাস্তরে লেখে!

—কোন্ শাস্তরে লেখে না?

—যে শাস্তরে লেখে সে শাস্তর আমরা ছেড়েছি—গেরস্ত হয়েছি।

—মুসলমান কৃশ্চানরা গেরস্ত নয়?

—মরণ মরণ! মুখে আগুন! আমরা তাই?

—বেশ, হয়ে যেত ওরা। আমাদের ঘাটও নেই, ঘরও নেই। একটা গাছতলা হলেই হলো।

—তুমি আর ও সব কথা বলবে না।

—বেশ বলব না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই সুরেন মেসো বলেছিল—দেখ—একটা কথা বলছিলাম। মুক্তোর জন্যে একটা ভাল পথ পেয়েছি।

—থাক, মুক্তোর জন্যে ভেবো না তুমি।

—আরে শোনই না ছাই। এটা ভাল কথা।

—তোমার ভাল কথারও মুখে ছাই।

—আরে বাপু দয়া করে শোন। হাত জোড় করছি। মাইরি বলছি—ভাল আইডিয়া।

—বল।

সুরেন মেসো তার আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে তামাক টানতে টানতেই কথা বলছিল।—এই কাল হঠাৎ মনে হয়ে গেল। দেখা হয়ে গেল সুবাসিনী—মানে মুন্ সুবাসিনীর প্রভাত চাটুজ্যের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম খবর। ভালই। ছেলেমেয়ের কথা শুনলাম। ছেলেটি খাসা বুয়েচ, বি. এস-সি পর্যন্ত পড়েছে, ফেল করে জামসেদপুরের ওখানে একটা চাকরি পেযেছে, সেখানেই থাকে। দিব্যি বিয়েও করেছে। অবিশ্যি এখানে আসে না। মেয়ে দুটি তো ছোট—বুঝছ একজন আঠারো, একজন ষোল—তা দু'জনকেই নার্সিং শেখাচ্ছে বললে—তো, বিপদ তো ওদের নিয়েই। বিয়েতে টাকা ঢালতে পারলে ভাবনা ছিল না। গরীব ঘরের ভাল ছেলে পাওয়া যেত। তা যখন নেই তখন অনেক ভেবেচিন্তে এই লাইনেই দিলাম। লাইনটা ভাল। ভাল কাজ সৎ কাজ। তা আমারও মনে হলো তাই তো, এ লাইনে তো অনেক মেয়ে যায়। ওখানে তো কুলুজী বিচার নেই। কি বল? ওর মায়ের যে ধারা ইচ্ছে ছিল তাতে ওটা আমার ভাল মনে হচ্ছে। সিনেমা লাইনে ও পারবে না। মানে, দেখছি তো—ভারী আড়ষ্ট—চব্বিশ ঘণ্টাই ভাবছে—মুখে হাসি নেই—গলা ভাল—শুনবামাত্র গান শিখে নেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু নেশা নেই। ও ওর হবে না। তা—নার্সিং শিখে নার্স হোক না। কি বল?

চাঁপা মাসী বলেছিল—এ তো খুব ভাল। খুব ভাল বলেছ তো!

পুলকের আতিশয্যে চোখদুটো চাড দিয়ে খুলে সুরেন মেসো বলেছিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখ তাহলে আমার মাথা আছে কিনা। তাহলে প্রভাত চাটুজ্যের কাছে গিয়ে হদিসগুলো নিয়ে আসব, কি বল?

মাসী বলেছিল—দাঁড়াও, সেই মনসাঠাকরুণকে একবার জিজ্ঞাসা করি। মায়ের আমার ধূপের ধুনোয় চোখ দিয়ে জল যে ঝরছেই—ঝরছেই!

পাশের ঘর থেকেই সব শুনেছিল মুক্তো। কান্নার বদলে তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।

চাঁপা মাসী চোখ থেকে জল ঝরার কথাটা অতিরঞ্জন করেনি। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সে তার মা-বাপের উপর ক্ষোভে ও অশুচি-বোধে বেদনায় কাঠ হয়ে গিয়েছিল কাঠের পুতুলের মতো। তার ওপর মানুষের ঘৃণায সে কাঠ থেকে হলো পাথর। তারপর পাথর ফেটে কোথা থেকে এল জলের ধারা। চোখের জলের উৎস যেন বাকি জীবনটার জন্যই সে সময় বিমুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

দোষ কার? আজও সে ভাবে। দোষ কার? তার? অর্থাৎ তার জন্মের? না—সে তা মানতে পারে না।

পূর্বজন্ম? মিথ্যা। জন্মজন্মান্তর—পূর্বজন্ম—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। অলীক কল্পনা।

কোন্ দূর সুদূর অতীতকালে মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে সদ্য জ্ঞানবুদ্ধির একটি আলো—হয়তো তার উপমা প্রদীপের মতো—জ্বেলে পিছনের দিকে অন্ধকারের মধ্যে যখন ভ্রূণের আকারেও মানুষ থাকে তখন, তারও পিছনে আছে হয়তো আর একটি জন্মান্তর, এবং এ জন্মে— বর্তমানের মধ্যে পথ চলেছে যখন ভবিষ্যতে অন্ধকারের মধ্যে, তখন আরও একটি জন্মান্তর প্রতীক্ষা করছে তার জন্য। হয়তো অনুমানের পিছনে শুধু জ্ঞানের আলোকেব স্বল্পতাটুকুই সব নয—তার সঙ্গে মিশে আছে জন্ম ও মৃত্যুর দুই প্রান্তে নাস্তির শূন্যলোকের ভযাবহতা। সেই ভয়ে এই কল্পনার চেয়ে বড় সান্ত্বনা কি হতে পারে? জন্মের জন্য কোন দোষ কোন অপরাধ তার নেই! নেই! নেই!

তবে কার? মার-বাবার?

তাই বা কি কবে বলবে? না, বলতে পারবে না। তার মা-বাবার ভালবাসাকে সে অস্বীকার করতে পারবে না! মায়ের ভালবাসাকে তো নয়ই। বাবার—? একটু থমকে দাঁডাতে হয় এখানে। কে—? রোগশয্যায় মৃত্যুকে সম্মুখে রেখেও দেহের আবেদন মঞ্জুর করলে কেন? উত্তর তারও আছে। যে দেহের আবেদন মৃত্যু-ভয় রোগযন্ত্রণাকেও বিস্মৃত করিয়ে দিতে পারে তার আবেদন কি অমঞ্জুর করবার হাত কারুর আছে? মঞ্জুরী-অমঞ্জুরীর ঊর্ধ্বে সে! যখন আসে তখন দিনকে আচ্ছন্ন নিষ্প্রভ করে অন্ধকারের আসার মতো অনিবার্য শক্তিতে সে আসে বা জাগে।

শুধু একটি প্রশ্ন। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমবা তপস্যা করেছ—তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রেখেছিলে কেন? তার পরিচয় তারই কাছে বা কেন ঢেকে রেখেছিলে? মানুষ তার এই জন্মপরিচয়কে অশুচি ভাবে—সেটা সমাজের সংস্কার; তোমরা সত্য পরিচয় গোপন করে তার মধ্যেও সেই সংস্কার জন্মাতে দিলে কেন?

মা হযতো এ পরিচয গোপন করত না। প্রথম বাল্যেই সে নিশ্চয জানতে পারত, এবং সেই সত্যকে স্বীকার করলে সে তো নিজেকে নিজে ঘৃণা করত না।

চাঁপা মাসীর ছেলে-মেয়ে তারা তো নিজেদের নিজেরা ঘৃণা করে না!

গোপন করে গেছেন তার জন্মদাতা। দায়ী তিনি!

থাক। ও কথা থাক!

চাঁপা মাসীকে এসে কথাগুলি সব বলতেও হয়নি। সে কাঁদেনি। পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে উজ্জ্বল হাসি হেসে বলেছিল—তই বল মাসী মেসোমশাইকে—নার্সিং শিখতে ভরতি করে দিন আমাকে। আমি শিখব।

চার

দু' বছর জুনিযর নার্স কোর্স ট্রেনিং। তারপর দু' বছর সিনিয়র কোর্স। চার বছর।

অনেক আগ্রহ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সে এখানে এসেছিল। আশঙ্কাও ছিল, না ছিল তা নয়। কেউই কি কোন প্রশ্ন করবে না এখানে? নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল—মুন সুবাসিনীর দুই মেয়েও তো পড়ে সেখানে। প্রশ্ন তো ওঠেনি। আরও জেনেছিল—সুবাসিনী এবং প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বাস করে তার মা-বাপের মতোই। চাঁপা মাসী সুরেন মেসোর মতো বিয়ের রেজেস্ট্রি করার সার্টিফিকেট তারা নেয়নি। তাদের মেয়েরা যখন পড়ছে সেখানে তখন তার সম্পর্কেই বা কথা উঠবে কেন? সুরেন মেসো বলেছিল—শুধু সুবাসিনীর মেয়ে দুটি নয়—সুবাসিনী, চাঁপা মাসী ও তার মায়ের মতো আরও অনেকের মেয়েই ওখানে পড়ে পাস করে গেছে এবং আরও আট-দশজন পড়ে। একবার মনে হয়েছিল—তারা যদি দীপার মতো হয়; যাদের জন্ম-সত্য জানার জন্য এরকম কোন সংকোচ নেই। নিজের প্রতি নিজের ঘৃণাই যে সে সংকোচের মূল! তবুও ভরসা করে সে গিয়েছিল। ভরতিও হয়েছিল। ১৯৩৪ সাল। যুদ্ধের জন্য নার্সের অনেক চাহিদা।

সে এক নতুন জগৎ—বিচিত্র পরিবেশ।

বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে হাসপাতাল—নানান বিভাগ; জেনারেল ওয়ার্ড, এমার্জেন্সী ওয়ার্ড, সার্জিকেল ওয়ার্ড, কলেরা বসন্তের ওয়ার্ড। ইয়ার-নোজ-থ্রোট। মেটারনিটি।

এতদিন সে হাসপাতাল দেখেছে বাইরে থেকে। ভিতরে এসে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। আবার অজ্ঞাত অকল্পিত এক আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েও চমকে উঠেছিল প্রথমটা। এ যে সবই পুরুষ—। ডাক্তার ছাত্র লোকজন সব—সবই যে পুরুষের মেলা।

হাসপাতালের বাইরে নিজেদের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে উল্লাস—উচ্চহাসি, ইঙ্গিত, রসিকতা,—তরুণ ডাক্তারদেরও তাই। তবে অপেক্ষাকৃত সংযত তারা। মেয়েদের অর্থাৎ নার্সরাও ঠিক তাই নিজেদের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য—হাসপাতালের ভিতর ঢুকলে সব পালটে যায়। রোগ মৃত্যু—ওষুধের গন্ধ—অ্যাপ্রনের খসখসানি—নিস্তব্ধতার মধ্যে দু' চারজন রোগীর কাতরানি, অন্যদের বিষণ্ন শঙ্কাতুর দৃষ্টি—এই সবের এক প্রবল প্রভাব পড়ে সকলের উপর। সব চঞ্চলতা সব উল্লাস—সব যেন স্তম্ভিত হয়। মনে হয় অদৃশ্য তর্জনী রেখে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে—চুপ কর।

আবার বেরিয়ে এসে খোলা হাতায় লাল সুরকির পথ বেয়ে চলবার সময় সব যেন পালটায়, মানুষ সহজ হয়ে আসে। প্রথম দিকে হোস্টেলের অভিজ্ঞতা মনে পড়ছে।

সুষমা বলেছিল—কি অসভ্য ভাই ওই বোস ডাক্তারটা আর সিক্সথ ইয়ারের সেনটা। কোন জিনিস দিতে-নিতে গেলেই হাত বা আঙুল টিপে দেবে নয় চিমটি কাটবে।

রেবা তার মাথায় রুমালখানা বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিয়েছিল—তুমি ওদের বঁড়শীগাঁথা মাছের মতো খেলাচ্ছ ভাই, আর ওরা সুযোগ পেলে টান দেবে না এ কি কথা? আঙুল টিপে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে ভাগ্যি তোমার। তোমায় কামড়ে দিতেও তো পারত! মাছ না হয়ে যদি কুমীর হত!

সুষমা মফস্বলের মেয়ে—কলকাতার কাছাকাছি আধাশহর ডায়মন্ডহারবারে বাপের বাড়ি। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিল। সেখানে এমন কি ঘটেছিল যাতে সুষমাকে এ দেশের সাধারণ বিধবা মেয়েদের মতো রাখার কল্পনা তার বাপ করতে পারেননি। অনেক ভেবেচিন্তে নার্সিং কোর্সে ভরতি করে দিয়েছিলেন। সাহায্য করেছিলেন ওখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। একটা সরকারী বৃত্তিও পাইয়ে দিয়েছিলেন! এখানকার নার্সরা বলে—সুষমা সেখানেও বঁড়শী দিয়ে গেঁথেছিল—ওই অফিসারের সদ্যযুবক পুত্রটিকে। নার্সিং শেখার সুযোগ এবং বৃত্তি তারই মূল্য। চঞ্চলা সুষমা সেবাব্রত নিয়েও বদলায়নি।

সেদিন সুষমা সঙ্গে সঙ্গে রেবাকে উত্তর দিয়েছিল—মণি, আমি গাঙের ধারের মেয়ে, আমরা কি শুধু মাছ নিয়েই খেলি—কুমীর নিয়েও খেলতে পারি। গায়ে আমরা হলুদ মেখে তবে জলে নামি। ওটা কুমীরের ক্লোরোফর্ম। কুমীর কাত হয়ে যায়। আর সত্যি বলতে কি এরাও রুই মাছ নয়, কুমীর—তবে মেছো কুমীর—ওদের জন্যে হলুদ লাগে না—কাতুকুতু দিয়েই সারি। কুমীরের কাতুকুতু বড্ড বেশি জান তো। কথাটা শেষ করে সে হেসে প্রায় ভেঙে পড়েছিল।

রেবা শহরের মেয়ে এবং কুমারী। রঙ কালো। বাপ গরীব। বিয়ের ব্যর্থ চেষ্টা না করে তার বাপ তাকে পড়াতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তিনবারেও ম্যাট্রিক পাস করতে পারলে না যখন তখন তার বাপ এখানে ভরতি করে দিয়েছেন। রেবা প্রথম প্রথম বড় গম্ভীর আর আড়ষ্ট ছিল—কিন্তু বিচিত্র চরিত্র—সাজতে ভালবাসত। আজও বাসে এবং সাজতেও সে জানত। এখন তো তার চর্চায় প্রায় সে সিদ্ধিলাভ করেছে! এই কালো মেয়ে যার বিয়ে হয়নি কালো বলে, তার দিকে চোখ পড়লে চোখ জুড়িয়ে যায়। নাকি—সকলে না-হলেও একদল রসিক ওর নাম দিয়েছে কালো রাধিকা। রেবা তা জানে, যখন সে ওয়ার্ড থেকে ফেরে বা ওয়ার্ডে যায়—কিংবা ডিউটির সময়েই—একটু দূর বা কোন একটি আড়াল থেকে শুনতে পায় ওই শব্দটি। প্রথম প্রথম ওর অন্তর একটু ছলকে উঠত—হুঁচোট-খাওয়া পথিকের হাতের জলভরা ঘটের ভিতরের জলের মতো। কিন্তু এখন আর ওঠে না। কারণ হুঁচোটই খায় না ও কথা শুনে। তারের উপর জলভরা ঘট মাথায় নিয়ে চলার অভ্যাস তার হয়ে গেছে। শুধু একটু মুচকে হাসে। বান্ধবীরা পরিহাস করে বলে—তুই ভাই নিষ্ঠুর। এমন মিষ্টি নাম—কালো রাধিকা বলে ডাকে—তবু সাড়া দিস নে!

রেবা বলে—জানিস নে বুঝি, গৌরী রাধা সাগরে কামনা করে স্নান করেছিল যার জন্যে বাঙলাদেশে কালো হয়ে জন্মেছে—শুধু কালো নয়, কালাও বটে। কামনা ছিল কালোকানাই ফরসা রঙ নিয়ে জন্মে বাঁশি বাজালেও যেন তা কানে না যায়। পাগল হব না আর বাঁশির সুরে! বুঝেছ!

এমন আরও অনেক মেয়ে। রেবা সুষমা তখন সিনিয়র ট্রেনিং শেষ করেছে, পাস করেছে, হাসপাতালেই কাজ করছে। ওরা তখন সব বড়র দল। সে দলের সকলেই একটা ছাঁচ পেয়েছে—শুধু ব্যক্তিগত চরিত্রের পার্থক্য অনুযায়ী পরস্পর

থেকে কিছু কিছু পৃথক। সকলেরই জীবনে যেন দুটো কুঠরী হয়ে যায়, এক কুঠরী কর্মের কর্তব্যের অন্য কুঠরীটা জীবনের। এক কুঠরীতে তারা সেবিকা—মায়ের মতো বোনের মতো মেয়ের মতো ; অন্যটায় ঢুকলেই চেহারা পালটায়—তখন তারা জীবনের গৃহসুখ বঞ্চিতা—স্নেহ সম্পর্কে বঞ্চিতা—একান্তভাবে একাকিনী—জীবনের গৃহসমারোহের আনন্দক্ষেত্র থেকে নির্বাসিতার মতো। তাই এই জীবনে একাকিনীরা এই নির্বাসন দ্বীপে দলবদ্ধ হলেই খানিকটা হেসে নেয়—বাঁকাপথে জীবন-বাসনার খানিকটা প্রকাশে হাল্কা হয়। দু' একজন কাঁদেও।

বাসনাদি একটু বয়স্কা—পঁচিশের উপর বয়স—সে ধনুষ্টঙ্কারে বালকের মৃত্যু হলেই কাঁদত। এ কেস প্রায় আসত হাসপাতালে—এবং এলেই সে সেখানে ছুটে যেত দেখতে। বারবার খবর নিত। মৃত্যু হলে হোস্টেলে এসে শুয়ে শুয়ে কাঁদত! বাসনাদি বিধবা হয়েছিল একটি ছেলে নিয়ে—সে ছেলে ধনুষ্টঙ্কারে মারা গেছে। বাসনাদি বড় ভাল মেয়ে।

মুন সুবাসিনীর মেয়েরা জুনিয়র কোর্স শেষ করেছে তখন। নীলিমা আর অনিমা। তারা খানিকটা দীপার মতো। দীপার মতো এতটা নয়, তবু আদল যেন আসে। গান তাদের মুখে লেগেই থাকত। চাপল্য লাস্য—তাও বেরিয়ে পড়ত বেলোয়ারী কাঁচের ছটার মতো। বেলোয়ারী কাঁচের ছটা তো অহরহই ছিটকে দেয় না—ছিটকে দেয় তখনই যখন তাতে রোদের ঝলক এসে পড়ে।

কৃশ্চান মেয়ে ছিল সংখ্যায় বেশি। তাদের ছন্দ স্বতন্ত্র। কর্মের সময় সংযম তাদের বড় সহজ ; হিন্দু মেয়েদের মতো টানটা কড়া নয়। আবার কর্মের বাইরে উল্লাস—তাদের জীবনের ঝলকও একটু বেশি চড়া।

এরই মধ্যে আশ্বাস সত্ত্বেও সে আড়ষ্টভাবেই ঢুকেছিল এবং জীবনের এই বৈচিত্র্যে ওই আশ্বাসের মধ্যেও একটুখানি ভয় পেয়েছিল।

আশ্বাসের পরিমাণই বেশি। কারণ এখানে জীবনের কলঙ্ক নিয়ে জটলা নেই এমন নয় তবে তা নিয়ে জট কেউ পাকায় না। এবং সে জট ধরে টানা-টানিরও প্রবৃত্তি নেই কারও। ওগুলি যেন দেহরূপের অন্তরালবর্তী রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার অস্তিত্বের মতো শুধু যুক্তিতেই স্বীকৃত নয়—বোধে স্বীকৃত। এগুলির স্পর্শে ছোঁয়াচপড়া নেই। হাতই ধুতে হয়—গঙ্গাস্নান করতে হয় না।

তবু ভয় হয়েছিল।

ভয় হয়েছিল বঞ্চিত জীবনের নির্জনে কল্পনার উল্লাস দেখে! আরও ভয় হত বাইরে বেরিয়ে! অনুভব করত কত তীক্ষ্ণ বাঁকা চোখের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তরুণ ছাত্রদের হাসি শুনে সে চমকে উঠত। তাকে দেখে হাসছে!

তাদের নিম্নস্বরে কথা বলতে দেখলে মনে হত—তার সম্পর্কে কথা বলছে!

সে পথ চলত মাটির দিকে মাথাটি ঈষৎ নত করে, চোখ মাটির উপরেই থাকত কিন্তু চকিতে সে দৃষ্টি তির্যক হয়ে দুই পাশে ছুটে যেত। কখনও কখনও অকস্মাৎ মনে হত পাশে কেউ দাঁড়িয়ে। চকিত তির্যক দৃষ্টিতে দেখত—হ্যাঁ ভুল দেখেনি সে।

আবার কখনও দেখত—ভুলই তার সেটা। যেটার ছায়া তার উপর পড়েছে অথবা তার অস্তিত্ব সে অনুভব করেছে সেটা মানুষ নয়—গাছ খুঁটি অথবা এমনি একটা কিছু।

ডাক্তার, মেডিকেল স্টুডেন্টদের সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলা তার সারা পাঠ্যজীবনে সম্ভবপর হয়নি। চিকিৎসার জিনিস যোগাতে গিয়ে হাত কাঁপা তার বন্ধ হয়নি। মনে পড়ে—প্রথম যেদিন ডাক্তারকে সাহায্য করবার জন্য তার ডাক পড়েছিল সেদিন তার এই্ কম্পনের আর সীমা ছিল না—তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলে কাজ করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। শেষকালে একটা কাঁচের গ্লাস দিতে গিয়ে ডাক্তার ধরবার আগেই সে সেটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল—হাতে হাত ঠেকল বুঝি। গ্লাসটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। গ্লাসে শুধু জল ছিল তাই রক্ষা। তবু ডাক্তার বলেছিল—বলেছিল নয়, বিরক্তিতে বলে ফেলেছিল—ননসেন্স। ডাক্তারটি এখানকারই্ ছাত্র ছিল।—পাস করে হাউস ফিজিসিয়ান হয়েছিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী। বয়সে নবীনই্ শুধু নয়, কলেজে তার খাতির আছে!

লজ্জায় সে প্রায় মরে গিয়েছিল।

শুধু নিজের অক্ষমতা বা দুর্বলতার জন্য নয়। সে জানে—নিশ্চিতরূপে জানে—ডাক্তারের সঙ্গে তার হাত ঠেকতই এবং ডাক্তার লোহার টুকরোর মতো তার হাতের চুম্বকে আকৃষ্ট এবং নিষিদ্ধ হয়ে যেত। যেতই।

সে দেখেছে—চুম্বকের মতো এই আকর্ষণী মুন সুবাসিনীর মেয়ে নীলিমা অনিমার আছে। তার আছে। কিন্তু সুষমা, যাকে দেখে এবং যার কথা শুনে সে প্রথম দিনই্ চমকে গিয়েছিল—তার ছিল না। তার বাক্যের তার ভঙ্গিমার লাস্য সত্ত্বেও না। রেবা, যাকে বলত কালো রাধিকা—তারও না।

সুষমা এখানে এখনও আছে। সে এখন এখানে চাকরি করছে। সেই্ হাসি—সেই কথা—সেই সব—বরং সে সব দিনে দিনে বাড়ছে—প্রখরতায় সূক্ষ্মতার এবং শক্তিতেও। জীবনে এখন সে এখানে জলের মধ্যে মাছের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। রেবা সেই কালো রাধিকা এখন আর এখানে নেই—আশ্চর্য কথা—সে পাস করেই যুদ্ধের চার্করি নিয়ে চলে গেছে। সুষমাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি দিত। শেষ চিঠি পেয়েছিল রেঙ্গুন থেকে। জাপানীদের পরাজয়েব পর সেটা। একটা কথা মনে আছে—সে লিখেছিল—Life is so easy here dear Susama, ইংরাজীতে চিঠি লিখেছিল। সুষমা বলেছিল—মরণ তোর! কিন্তু ডাক্তার যারা একটু অনুগ্রহ করত তাকে, তাদের দেখিয়ে বলেছিল—দেখুন! ভাবছি আমিও চলে যাব চাকরি নিয়ে। ইজি লাইফটা দেখে আসি, চেখে আসি একটু। টাকাও নিশ্চয় অনেক পাব।

মুখে বললেও কিন্তু তা যায়নি সুষমা। নিজের কথা উল্টে দিযে বলেছিল—দূর এ বেশ আছি। এখানে কেমন মায়া পড়ে গেছে।

এই্ সুষমাই এই গ্লাস ভাঙার ঘটনার পর বিকেলে ডেকে বলেছিল—এই মুক্তি—শোন।

হ্যাঁ—মুক্তা ওই নার্সিং পড়বার সময় মুক্তি হয়েছিল—আর বোসের বদলে হয়েছিল দাস। জাতি লিখেছিল বৈষ্ণব।

বাপের উপাধি নেবার অধিকার তার জন্মদাতা দেননি! অর্থ দিয়েছিলেন—এটা সে স্বীকার করে। কিন্তু কোন অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ কি অর্থে হয়? ওটা নিতান্তই শোকে সান্ত্বনার মতো। সান্ত্বনায় শোকের কারণ যেমন তেমনি থেকে যায়—কোন মতেই তা ফেরে না, এও তাই; যে ঘটনায় অন্যায় হয় সে ঘটনা ঘটে গেলে কি আর ঘটনা ঘটার আগের অবস্থায় ফেরা যায়? আর্থিক ক্ষতিপূরণে যার উপর অন্যায় হয় তার আত্মার অপমান বাড়ে।

অর্থ অবশ্য নিয়েছিল তার মা। ছেলেবেলা তার এসব পরিচয় না জানার সময় সে অর্থে সে খেয়েছে পরেছে কিন্তু জানার পরও তো সে তা ফেলে দিতে পারেনি!

লালপাহাড়ীর কুমারেব দেওয়া বাড়ির দরুন টাকাটা নিয়ে তার কোন অনুশোচনা নেই। সেখানে ছলনা নেই। কিন্তু যে জন্মদাতা তার ধার্মিক ঈশ্বরভক্ত—যিনি তার মাকে বলে গেলেন, টাকা দিয়ে গেলেন তাকে সৎ, সমাজমতো শুদ্ধা করে তৈরি করতে অথচ জন্মের মধ্যে দিয়ে তাকে অশুচি অশুদ্ধাই রেখে গেলেন—স্বীকৃতির সত্য-গঙ্গায় অবগাহনের অধিকার তাকে দিলেন না—তার টাকা তো সে নিয়েছিল! সেও তো ছলনা! আর উপাধি ত্যাগ? সেও তো তাই! মুক্তমালা মুক্তি নাম নিলেই কি আত্মার মুক্তি হয়? বোস দাস হলেই কি হয়? তার মধ্যে মুক্তি কামনাই বা কতটা সত্য ছিল? হিসেব করে দেখলে অতি সামান্য। ওটাও ছিল ছলনা। ওর পিছনে ছিল স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সেই জেরার স্মৃতি।

"তোমার বাবা বোস কিন্তু তোমার মা দাসী কেন?"

তখন সে তার উত্তরই খুঁজে পায়নি। বললেই হত—মায়ের বাপেদের বাড়ি গোঁড়া ছিল—তাঁদের ঘরের মেয়েরা উপাধি ব্যবহার করতেন না। সে আমলে বামুনের মেয়েরা লিখত দেবী—কিন্তু বামুন ছাড়া সব জাতের মেয়েরা লিখত দাসী!

যাক—ও সব কথা ভেবে আজ লাভ নেই।

জীবন ভুলের বোঝা। হয়তো সবটাই ভুল। ভুল নয় মিথ্যা। সব মিথ্যা। যা সত্য ভেবে তাকে মানে মানুষ—তাই তোমাকে পিষে মারে। সেই হয় তখন শাসনকর্তা—তখন সে সত্য যদি মিথ্যাই প্রমাণিত হয় তবুও তখন তাকে অস্বীকারের উপায় নেই। তোমার নিজের মনই তখন বলে—না—না—ওই সত্য। ওকে ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে? বাঁচতে আমি পারি না।

মানুষের একটি জাত—জাতিতে সে মানুষ।

কিন্তু তা আজও সে কোনমতেই মানতে পারছে না। তার কাছে—সত্য—'হিন্দু—মুসলমান—কৃশ্চান—ইংরেজ—ফরাসী—জার্মান—ভারতীয়—সাদা—কালো—হলুদ'—এই মিথ্যাকে সে একদিন মেনেছিল সত্য বলে। আজ তা মিথ্যা হয়ে গেছে—বুদ্ধিতে যুক্তিতে সবেই। কিন্তু তা তো তাকে মানতে পারছে না। সে আজও সত্যের উপরেও সত্য হয়ে আছে।

মিথ্যা জেনেও তো ওই জন্মের কলঙ্ককে আজও অস্বীকার সে করতে পারছে না। প্রতিমুহূর্তে সে অনুভব করছে—তার কলঙ্কের আকর্ষণে মানুষের মনের প্রবৃত্তি চুম্বকের টানে লোহার মতো আকৃষ্ট হচ্ছে, সে অনুভব করছে—সেই অনুভূতির ফলে তার মুখের রক্তাভায় কলঙ্ক ছোপ ফুটে উঠেছে।

সেদিনও তার তাই মনে হয়েছিল। যখন সে তরুণ হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তার গাঙ্গুলীকে জিনিস যুগিয়ে দিচ্ছিল তখন সে মনে মনে অনুভব করছিল যে তার আকর্ষণ চুম্বকের লোহাকে টানার মতো ডাক্তারকে টানছে। কিন্তু যতক্ষণ রোগীটি মাঝখানে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝখানে একটি বাধা ছিল। তারপর ডাক্তার চাইল জল। কাঁচের গ্লাসে জল দিতে গেল সে। ডাক্তার হাত বাড়াল—সে স্পষ্ট বুঝলে এবার ডাক্তারের আঙুল দুটো তার আঙুলেব উপর পড়বে, চেপে ধরবে। সে ছেড়ে দিল গ্লাসটা। মুখখানা তখন তার কলঙ্কের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। এ কলঙ্কই যে তার রক্তে রক্তের কলঙ্ক।

সুষমাদি বিকেলে তাই ডেকে প্রশ্ন করেছিল—এই মুক্তি শোন।

সে প্রথমটা বুঝতে পারেনি। সদ্য সে তখন ওই স্মৃতির অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এর আগে পর্যন্ত শুধুই তার মনটা ছি-ছি করেছিল। তখন সদ্য ভাবছে—হয়েছে হয়েছে—তার জন্য এত লজ্জা কিসের? ডাক্তার তাকে নির্বোধ বোকা ভেবেছে—এ সব তো সে বুঝতে পারেনি। আর বুঝে থাকলেই বা কি? সেও তাহলে ঠিক আঙুল বাড়িয়েছিল তার আঙুলের উদ্দেশ্যে! তাহলে সে সরিয়ে নিয়েছে ঠিকই করেছে। গ্লাসটা ভেঙেছে বেশ হয়েছে। গ্লাসের চেয়ে তার পবিত্রতার দাম নিশ্চয় বেশি। সে তাদের হোস্টেলের বারান্দার রেলিঙে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময়টা ফাল্গুনের শেষ; বিকেলে কলকাতার সেই সমুদ্র-হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সামনে বাদাম গাছটায় পাতা ঝরছে। ভারী ভাল লাগছিল। মুহূর্তটা ছিল অস্বস্তির অবসানে স্বস্তির; তার উপর বসন্তদিনের অপরাহ্ণে সমুদ্রের হাওয়ার স্পর্শে শরীরে যেন একটি আনন্দময় আরামের স্বাদ অনুভব করছিল; মধ্যে মধ্যে কোন গাছের মুকুলজাতীয় ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল।

সুষমাদির আহ্বানে সে মুখ একটু ফিরিয়ে প্রসন্ন হেসে বলেছিল—কি?

—শোন! নিচে আয়, আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারছি না।

—যা মোটাচ্ছ দিন দিন! বলে হাসতে হাসতে নেমে গিয়েছিল সে।

—কি?

—কি? ভঙ্গি করে মিষ্টিভাবেই ভেঙিয়েছিল সুষমাদি।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ কি? যেন কিসের একটা সন্দেহ জেগেছিল মুহূর্তে এবং ভুরুদুটি ঈষৎ কুঁচকে উঠেছিল।

—নন্‌সেন্স! বলে হেসে ফেলেছিল সুষমাদি।

বলা এতেই সব হয়ে গিয়েছিল—মুখ তার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় শুকিয়ে গিয়েছিল।

আয়না ছিল না, বলতে পারবে না সে। কিন্তু বুকের ভিতরটায় যেন কাঁসরে কে জোরে একটা ঘা মেরেছিল—ঘং। তারপর অতি দ্রুত ঘন—ঘন্—ঘন্—ঘন্ বেজেই চলেছিল। তবু সে বলেছিল—তার মানে?

—মানে। ডোন্ট মাইন্ড ইউ প্লিজ! অন্যায় হয়ে গেছে। ডাক্তার গাঙ্গুলী বলেছে রে, আমি না। মাঃ—সে কি আকুতি! যাক এতকাল পরে যেন তুই খোলস ছাড়লি! ওঃ কি জড়ভরতই না ছিলি! বলেই সে হেসে ভেঙে পড়েছিল।

সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—না—তুমি এমন করে হেসো না। না। তার হাসি বেড়ে গিয়েছিল—সে বলেছিল—ও মা! ঘাযেল—দু' পক্ষই! তুই মরেছিস!

—সুষমাদি!

আরও হেসে সুষমা বলেছিল—ভারী অসহ্য লাগছে, না?

সে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিল—হ্যাঁ লাগছে। কারণ এ মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা। আর আমার তোমার মতো গণ্ডারের চামড়া নয়।

* * *

বীজের মধ্যে থাকে অঙ্কুব। সে অঙ্কুর যখন উদ্গত হয় প্রথম, তখন তাকে প্রথম ক্ষণটিতে অন্তত চোখেও দেখা যায় না; শুধু বীজের দল দুটির মধ্যে দেখা যায় সুতোর মতো একটি রেখা।

সেদিন সুষমার কথায় সে সজোরে প্রতিবাদ করেছিল—কিন্তু সুষমা জীবনের অভিজ্ঞতার ওই সুতোর দাগের মতো রেখার লক্ষণটি দেখে ঠিক ধরেছিল। অঙ্কুর উদ্গত হয়েছে তখন। ডাক্তার গাঙ্গুলীর সঙ্গে এর আগে থেকেই আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলছিল তার অজ্ঞাতসারে। তরুণ ডাক্তার অরুণেন্দ্র গাঙ্গুলী—এখানে সিনিয়র; ছাত্রত্ব থেকেই গম্ভীর লোক। চলায়-ফেরায তখন থেকেই সে নিজের একটা মর্যাদা গড়ে এসেছে। যার ফলে সকলে তাকে সম্ভ্রম করত। তার উপর সে সুপুরুষ। ছাত্রদের মধ্যে একটি সহজ প্রাধান্য তার ছিল, কিন্তু সে তাদের নেতৃত্ব নিয়ে নেতা সাজেনি।

সংঘর্ষের কাল! পথে-ঘাটে ইনকিলাব অহরহ দীর্ঘজীবনের শুভ-কামনা লাভ করছে; এমন অবস্থাতেও ক্ষমতা থাকলেও ওই ধ্বজা সে ধরতে যায়নি। এতেই ওর মর্যাদা ছিল বেশি। কলেজের অধ্যাপকরাও তাকে যে স্নেহ করতেন তা নিছক স্নেহ ছিল না—তার সঙ্গে সম্ভ্রমের সংমিশ্রণ ছিল। নেতৃত্ব সে করত কেবল এক জায়গায়; কলেজের ছাত্রদের অভিনয়ে। সেও সেক্রেটারী হিসেবে বা অন্য কোন পদাধিকারী হিসেবে নয়—স্টেজের উপর অভিনয়ের সময়ে ওকেই দেখা যেত নায়ক হিসেবে। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিন বছরের ছ'খানা নাটকের পাঁচখানাতেই মুক্তা তাকে নায়ক হিসাবে দেখেছে। 'শেষরক্ষায়' গদাই-এর ভূমিকায়—সেই বুড়ী ঝিয়ের কাছে মোজা নিযে বুকে চেপে ধরে—ওরে মোজা বলে জানালার পানে চেয়ে কবিতা আবৃত্তি দেখে লোকে হেসে গড়াগড়ি গিয়েছিল—কিন্তু তার মুখ চোখ কান গরম হয়ে উঠেছিল লজ্জায়, কৌতুকে সেও হেসেছিল কিন্তু তার থেকেও একটা

অস্বস্তিকর লজ্জাই যেন বেশি হয়েছিল তার। কর্ণার্জুনের কর্ণের ভূমিকায় তার সে অভিনয় দেখে কেঁদেছে। দুই পুরুষে 'নটু', মাইকেলে 'মাইকেল মধুসূদন' সবই সেই করত। শুধু কলেজেই নয়, মধ্যে মধ্যে বাইরেও অভিনয় করত সে। শনি-রবিবার সপ্তাহে ফাঁক পেলেই থিয়েটারে সে যেতই। প্রথম ছাত্রজীবনের ছাত্র হিসেবেও তার সুনাম ছিল। কিন্তু শেষের দিকে এই বাতিকের জন্যই তার সে সুনাম গিয়েছিল। অধ্যাপকরা অনুযোগ করতেন কিন্তু ফল হয়নি। শেষ পরীক্ষায় পাস একবারেই করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে কৃতিত্বের দীপ্তি ছিল না। তবুও তার ব্যক্তিত্বের জন্যই হোক আর অধ্যাপকদের স্নেহের জন্যই হোক—কলেজে জুনিয়র হাউস ফিজিসিয়ান হয়ে ঢুকে অনায়াসেই সিনিয়র হয়েছিল। সেটা সদ্য সদ্য। এই ঘটনার মাত্র দিন চারেক আগে।

রূপে এবং গুণে, বিশেষ করে সাধারণ সময়ে তার গাম্ভীর্য এবং এই অভিনয়ের মধ্যে তার সর্বমুখী নায়কোচিত যোগ্যতায় সে কুমারী হৃদয়ের স্বপ্ন দেখার মানুষ ছিল এতে ভুল নেই। নইলে হয়তো সেদিন গ্লাসটা এমনি করে ভাঙত না। কল্পনার এতখানি আতিশয্য তার ঘটত না।

তরুণী নার্সদের সবাই স্বপ্নে তাকে দেখেছে। অন্তত যাদের স্বপ্নদেখার মানুষ জীবনে দেখা দেয়নি তারা দেখেছে। সেও দেখেছে—এর আগে। হ্যাঁ—কতবার দেখেছে। অন্তত কলেজে অভিনয়ের পর কয়েকদিন করে দেখেছে।

পরের দিন সন্ধেবেলা সে হাসপাতালে বেরিয়ে ওয়ার্ডের দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল। ডিউটিতে যাচ্ছিল সে। ওপাশ থেকে ডাক্তার গাঙ্গুলী আসছিল খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে—সেও ওয়ার্ডে যাচ্ছে। সঙ্গে দারোয়ান। ডাক্তার গাঙ্গুলীও থমকে দাঁড়াল—বললে, তোমার ডিউটি এখন?

সে বলেছিল—হ্যাঁ।

—কোথায়—কত নম্বরে?

—দোতলায় চার নম্বরে।

—তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি বদল করে দিলাম ডিউটি। বলে দিচ্ছি গিয়ে। তারা চলেছিল তেতলায়। প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই ডাক্তার বলেছিল—আগে আগেই যাচ্ছিল ডাক্তার, বারেকের জন্য মুখ ফিরিয়ে বলেছিল—কালকে কথাটা আমার অভ্যাসবশে মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। I did not mean to offend you, তুমি offended হয়েছ, না?

সে উত্তর খুঁজছিল কিন্তু সে সময় তাকে ডাক্তার দেয়নি—বোধ হয় উত্তর চায়ওনি, বলেছিল—কুইক। কেবিনে একটা ম্যানেনজাইটিস কেস—সিরিয়াস টার্ন নিয়েছে।

আবার কয়েকটা সিঁড়ি উঠে বলেছিল—নিভার পেশেন্স কম। টেম্পারটা কুইক। তোমার নেচার সফট্। আর কাজ তোমার পরিষ্কার।

বলতে বলতে তারা কেবিনের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে জুনিয়র হাউস সার্জেন, স্টাফ নার্স, কেবিনের মাইনে করা নার্স—এরা রোগীর দুই পাশে দাঁড়িয়ে

ছিল—তাদের স্তব্ধতার মধ্যেই উৎকণ্ঠা যেন বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। রোগী গোঙাচ্ছিল। ঘাড়টা বেঁকে গেছে।

ঘরে ঢুকেই বাস্তব জগৎ থেকে একমুহূর্তে অন্য জগতে এসে গিয়েছিল তারা।

রোগীকে মাঝখানে রেখে একপাশে তারা, অন্যপাশে মৃত্যু। ঘরের বাতাসে রোগের গন্ধ ওষুধের গন্ধ। রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডাক্তার। জুনিয়র ডাক্তার বলে যাচ্ছিল—অবস্থা।

ডাক্তার বলেছিল—এক মিনিট। তারপর স্টাফ নার্সের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—পেনিসিলিন দেব—মুক্তিকে এখানে দরকার হবে। বলে দিন আপনি। দোতলায় চার নম্বরে ডিউটি ছিল ওর। হ্যাঁ—তারপর বলো।

জুনিয়র ফিজিসিয়ান—তিনমাস আগে পাশ করেছে। সে আবার শুরু করেছিল—পাল্‌স্—।

ডাক্তার গাঙ্গুলী চার্টটা হাতে নিযে পড়ে নিতে লাগল।

তারপর বলল—পেনিসিলিন দেব। নিয়ে এসো, যাও। আমি রইলাম। আমিই দেব ইনজেকশন। তার আগে লাম্বার পাংচার করব।

১৯৪৫ সাল।

পেনিসিলিন তখন রেফবিজারেটার ছাড়া থাকে না। দু' ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দু' ঘণ্টা।

মুক্তিকে হুকুম করলে—লাম্বার পাংচারের সব ঠিক করো। দেখো কেবিনের আলমারিতে আছে বোধ হয়।

মুক্তি সাজাতে লাগল—লাম্বার পাংচার নিড্‌ল্, গ্লাভস, টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেনজিন। ট্রেতে সাজিয়ে এনে রাখল টেবিলের উপর।

হাত ধুয়ে গ্লাভস তুলে নিয়ে হাতে পরতে পরতে ডাক্তার বললে—এবার ওকে বেঁকিয়ে ধর। স্টেডি! গুড।

নিপুণ হাতে সূচটা ঢুকিয়ে দিলে ডাক্তার স্পাইনাল কলামেব ভিতর—জল বেরিয়ে এল—টেস্ট টিউবে জলটা ধরে সেটা দিলে কেবিনের মাইনে করা নার্সের হাতে। তার নাম নিভা।

প্রথম ইনজেকশন দিয়ে গাঙ্গুলী বললে—ঠিক সময়ে আমি আসব। সাড়ে দশটায়। তুমি এখানে স্পেশাল ডিউটিতে থাকলে। একা এর কাজ নয়।

দু' ঘণ্টা অন্তর গাঙ্গুলী এসেছিল ঘডির কাঁটার মতো।

শেষ রাত্রে সাড়ে চারটেতে ইনজেকশন দিয়ে এসেছিল ডাক্তার। রোগী তখন শান্ত। মুক্তা নিভা দু'জনেই চেয়ারে বসে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়েছে। মুক্তার কপালে একটি হাত রেখেছিল ডাক্তার। চমকে জেগে উঠেছিল সে।

স্মিত হেসে ডাক্তার বলেছিল—ইনজেকশনের সময় হয়েছে।

লজ্জিত হয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ডাক্তার বললে—ব্যস্ত হয়ো না। খুব ভাল ডিউটি করেছ, রোগী শান্ত হয়েছে—রোগ কমেছে; ঘুম একটু

আসবেই। চোখের দোরে দাঁড়িয়ে থাকে—উৎকণ্ঠা কমলেই সেও এসে চোখের পাতায় আসন পাতে! নাও—আন সব।

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার চলে যেতে যেতে বলেছিল—তুমি একটু ঘুমতে পার এবার।

তারপর আঙুল বাড়িয়ে নিভাকে দেখিয়ে বলেছিল—এ তো সেই আড়াইটে থেকেই দেখছি ঘুমুচ্ছে। রাবিশ। তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ। ঘুমুচ্ছিলে—এত মায়া হচ্ছিল ডাকতে।

একটু হেসে বলেছিল—You have got a very soft face and so sad!

কিছু বলতে পারেনি সে।

সে নার্স—ডাক্তার সিনিয়র হাউস ফিজিসিয়ান। ভয় অবশ্যই ছিল। তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল। হ্যাঁ ছিল, ভাললাগাও ছিল। ভাল লেগেছিল তার।

অশ্বত্থামা পিটুলিগোলা জল খেয়ে দুধ খেয়েছে বলে নেচেছিল।

জীবনে তার প্রথম পুরুষের সমাদরের স্বাদ। ভাল লেগেছিল।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের চাকর এসেছিল ফ্লাস্ক নিয়ে। চা পাঠিয়েছিল ডাক্তার। একটা স্লিপ পাঠিয়েছিল—চা খেয়ো। আমি খেলাম—তোমার ক্লান্ত মুখ মনে পড়ল। ভাল লাগবে। ও. কে.।

খুব ভাল লেগেছিল। খুব। খুব।

একরাত্রে বীজের চারিপাশের সুতোর মতো দাগটি ফেটে অঙ্কুর বেরিয়েছিল। বীজের দল দুটি তখনও পাণ্ডুর!

* * *

তা রঙ সবুজ হতে বেশি দিন লাগেনি। অল্প কয়েকদিন—বোধহয় সাত-আট দিনের মধ্যেই সবুজ হয়ে সে দুটিকে ছাড়িয়ে সবুজ দুটি পাতা দেখা দিয়েছিল। জীবনের সকল শিক্ষা সকল সংকল্প সব যেন কোন অভিনব উল্লাসের আবেগে নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়েছিল—নাইট ডিউটিতে যেমন কর্তব্যবোধ সংকল্প সকলকে নিস্তেজ করে দিয়ে ঘুম আসে তেমনিভাবে। রোগী কাতরায়—কর্তব্য ডাক দেয় তবু ঘুম ভাঙলেও ছাড়ে না, তেমনি। ঠিক তেমনি।

মনে হয়—এমন কিছু নয়। আবার এখুনি ঘুমিয়ে যাবে রোগী। তেমনিভাবেই মনে হত—মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি! হোক না পুরুষ! শুধু প্রীতি বই তো নয়। যে প্রীতি এমন মধুর, এত মধুর। যার স্পর্শে মনে আনন্দের স্রোত উৎসারিত হয়েছে—জীবনের শুকনো বালি ঢেকে স্রোত বইছে।

সাত দিন পর রূপী এসেছিল। দীপা থিয়েটারের টিকিট পাঠিয়েছে। দীপা থিয়েটারে নামছে। অ্যামেচার অবশ্য। কলকাতায় তখন অ্যামেচার থিয়েটারে মেয়েদের নিয়ে অভিনয়ের রেওয়াজটা প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। দীপার মতো অনেক মেয়ে এতে নামছে। সুরেন মেসো দীপাকে তৈরি করে দেয়। কলকাতায় নাম-করা অ্যামেচার পার্টি।

রূপী বলেছিল—নিশ্চয় যেন যাবি দিদি। দীপা ভাল পার্ট করবে! সত্যিই ভাল। বাবা নাচটা খুব ভাল দিয়েছে। ঠিক শিশিরবাবুর থিয়েটারের মতো।

জনা নাটক। এতে দীপা করবে মোহিনীর অভিনয়। গঙ্গার বরে অজেয় প্রবীর শুদ্ধাচারে ব্রহ্মচর্য পালন করে যুদ্ধ করেছে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে। অর্জুন প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এরপর দেবলোক থেকে এল এক মোহিনী। বিজয়ী প্রবীর মাতৃদর্শনে চলেছিল—পথ থেকে এই মোহিনী তাকে নৃত্যগীতে হাস্যেলাস্যে মোহিত করে নিয়ে গেল এক মায়াকাননে। সেখানে তাকে আসবপানে প্রমত্ত করে তার সকল শক্তি হরণ করে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। পরদিন প্রভাতে যখন প্রবীরের নিদ্রাভঙ্গ হলো তখন সে সবিস্ময়ে দেখলে—কোথায় নন্দন কানন? সে শুয়ে আছে এক শ্মশানে। কই সে মোহিনী? তার পাশে রয়েছে একটি নরকঙ্কাল। হয়তো নারীকঙ্কাল।

এই মোহিনীর ভূমিকায় অভিনয় করবে দীপা। দীপা এখন ষোড়শী। মুক্তা অনেকদিন যায়নি অবশ্য। সম্পর্কটা সে ছিঁড়তেই চেয়েছিল। কিন্তু রূপী মধ্যে মধ্যে এসেছে—দেখা করেছে—সেই বলত দীপার কথা।

সে জিজ্ঞাসা করত—মাসী কেমন আছে?

—মা ভালই। তবে বাত হচ্ছে।

—মেসো?

—বাবার নেশা চেপেছে দীপাকে নিয়ে। তাকে খুব নাচ শেখাচ্ছে। ফিল্মস্টার তাকে করবেই। তা হবে, বুঝেছ না? দীপা দেখতে বড় ভাল হয়েছে। ওঃ যদি ফিগারটা তোমার মতো হত! আর মুখের নরম ভাবটা পেত! মুখটা একটু কাঠ, বড্ড স্নো-টোনো-গুলো মাখে যে! মাঝখানে নটীর পূজায় নটীর পার্ট করলে। নাচ ভাল হয়েছিল—গান ভাল না।

—আর তুই?

—আমি? আমি কয়লা ভাঙছি। ডিপো তো আমিই চালাচ্ছি।

—তুই থিয়েটার করছিস না?

—নাঃ। তবে সেতার শিখছি।

—সেতার!

—হ্যাঁ। নাড়া বেঁধেছি। কালীঘাটের শিবেন মাস্টারের কাছে যাই। আর একটা বিদ্যে শিখছি। একদিন তোকে আশ্চর্য করে দেবো।

—কি বল তো!

—অ্যাস্ট্রোলজি, পামিস্ট্রি! জ্যোতিষ-বিদ্যা!

—এসব আবার মাথায় ঢোকালে কে?

—যে ঢোকাবার সেই। গ্রহ! তোর যেমন গ্রহ—তুই এসেছিস নার্সিং শিখতে। রোগীর সেবা। পুঁজ রক্ত মলমূত্র ঘেঁটে কি মাইনে? না দুটি অঙ্ক পঞ্চাশ ষাট সোত্তর

পঁচাত্তর—ম্যাক্সিমাম আশী! এমন গলা! তার গলা কেটে কি হলো? না তোর প্রায়শ্চিত্তির! তুই তো প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট হতে পারতিস।

—না।

—বেশ। না তো না। যা খুশি কর। আমি অবিশ্যি খুব অ্যাডমায়ার করি। এ তোর তপস্যা।

সেদিন টিকিট দিতে এসেও এ কথাগুলি বলেছিল রূপী। শেষকালে শুধু বলেছিল নিশ্চয় যেন যাবি। বুঝলি? আমাকে বললে—খুব তাক লেগে যাবে তোর একটা কি দেখে। অবাক হয়ে যাবি তুই! তবে বলেনি আমাকে কি ব্যাপার! তুই চলে যাস—কেমন? এই তো—রঙমহল! আমি বরং ফেরার সময় তোকে পৌঁছে দেব। দীপা বারবার করে বলেছে। বাবা বলেছে—এই নাচেই দীপা ফেমাস্ হয়ে যাবে।

—যাব। হেসে বলেছিল মুক্তো।

গিয়ে সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। দীপাকে দেখে নয়! প্রবীরকে দেখে। প্রবীরের ভূমিকায়—ও কে? এ যে ডাক্তার গাঙ্গুলী!

চমৎকার লাগছিল ডাক্তার গাঙ্গুলীকে। এবার এই সাতদিনের পরিচয়ে তাকে রাজকুমারের ভূমিকায় যে ভালটা লেগেছিল সে ভাল লাগা এর আগে তার লাগেনি। অপরূপ মনে হয়েছিল।

দীপা তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ভিতরে। রূপী ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

দীপা তখন সেজেছে। রঙে-চঙে সাজ-পোশাকে মানিয়েছিল ভালই। হ্যাঁ ভালই। তবে প্রবীরকে ভোলাবার মতো নয়!

আজ এতকাল পর—যখন তার গাঙ্গুলীর উপর কোন মোহ নেই, নিজে সে এতবড় নৃত্যশিল্পী—নিজের রূপে সে নিজেই মুগ্ধ এবং বহুজন মুগ্ধ; তখনও সে ঈর্ষা মোহ সব মুক্ত হয়েই বলছে—না—না সেই প্রবীরকে ভোলাবার মতো রূপ দীপার মধ্যে এত যত্নেও ফোটেনি। কাগজের মতো চড়া রং আর কোমলতার অভাব তাকে ম্লান করেছিল।

তবে সেদিন তার ঈর্ষা হয়েছিল। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিজের উপর নিজে বিরক্ত হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল সেও যদি আজ দীপার সঙ্গে নামত। তার ইচ্ছে হয়েছিল—প্রবীরের প্রেয়সী মদনমঞ্জরীর ভূমিকায় নিজেকে দেখতে।

রূপীই তাকে নিয়ে ভিতরে গিয়েছিল। তখন প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়েছে। দীপা তখনও স্টেজে বের হয়নি। তার পার্ট আরও পরে। প্রবীরকে দেখেছে এবং বিস্ময়বোধও করেছে। খানিকটা দুঃখও অনুভব করেছে। হ্যাঁ দুঃখই। অভিমান নয়, কারণ দুঃখ অভিমান হয়ে ওঠার মতো অবস্থা হয়নি তখনও। সেই রাত্রি থেকে এই অভিনয়ের দিন পর্যন্ত রোজই তার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হয়েছে। রোজ। ডাক্তার যেন দাঁড়িয়ে থেকেছে তার জন্যে—হাসপাতালে ঢুকবার মুখে। একটু প্রসন্ন হাসি—দু' চারটে কুশল প্রশ্ন ছাড়া কথা বলেনি। তারই মধ্যেই যেন মৃদু বর্ষণের জল-সিঞ্চনে মন

অভিষিক্ত হয়েছে—যার ফলে হৃদয়ের গোপন বীজটি ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়েছে অঙ্কুর বিকাশের জন্য।

ভিতরে দীপা সেজে তাদের অর্থাৎ মেয়েদের সাজঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতীক্ষা করে। তাকে দেখে অনেকখানি হেসে বলেছিল—চিনতে পারছ মুক্তাদি?

চমৎকার লাগছিল দীপাকে।

মুখের রং, চোখে কাজল আঁকা ভুরু, মাথায় ফুলের মুকুট, নীচে হাতে, উপর হাতে ফুলের মালা বাজুবন্ধ—গলায় মালা পরে দীপা রূপসী হয়েছে। তার উপর সজ্জাকৌশলে তাকে তার স্বভাবের চেয়ে অনেক বেশি লাস্যময়ী মনে হচ্ছিল। দীপার কথার জবাবে সে বলেছিল—ভাল লাগছে রে!

—খুব ভাল?

জবাবে একটু অতিরঞ্জনই করেছিল—খু-ব ভাল।

কানের কাছে মুখ এনে দীপা প্রশ্ন করেছিল—বেটা-ছেলে হলে তোর মাথা ঘুরে যেত?

সে ভুরু কুঁচকে বলেছিল—ছি!

দীপা বলেছিল—তুই ভারী বেরসিক!

ঠিক সেই সময়েই ভিতরে ওদিক থেকে এদিকে এসেছিল প্রবীরবেশী ডাক্তার। তাকে দেখেই বলেছিল—এই যে, এসেছ। যেন প্রত্যাশা করাই ছিল।

দীপা বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল—আমার মেক্-আপ কেমন হয়েছে?

—ভাল! তবে একটু বেশি হয়েছে। জান, বঙকে রঙ বলে ধরা গেলেই—মানে ওটা ধরা পড়লেই তো মোহ ছুটে যায়। বলেই হেসে বললে—আমার আবার ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে। দিদিকে চা-টা খাওয়াও।

চমকে উঠেছিল মুক্তা। দিদি? ডাক্তার চলে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুই ওঁকে বলেছিস নাকি আমি তোর দিদি?

দীপা অসংকোচে বললে—হ্যাঁ। উনিই তো এ ক্লাবের হিরো। ওঁর খুব নাম অ্যামেচারে। শুনলাম তোদের হাসপাতালের ডাক্তার। তাই বললাম—আমার এক দিদি থাকে আপনাদের হাসপাতালে—নার্স সেখানে। জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম বল তো? বললাম তো, বললেন—খু" চিনি। বড ভাল মেযে তোমার দিদি। কি রকম দিদি? বললাম—মাসতুত দিদি। সে প্রথম দিন।

তার শরীরটা যেন ঝিমঝিম করে উঠেছিল। অকারণে। কারণ জীবনের পরিচয় তো সে গোপন ঠিক করেনি বা করতে চায়নি। নার্সেস কোয়ার্টারে তার পরিচয় ঠিক গোপনও তো ছিল না। কতদিন সে তাদের বান্ধবীদের মধ্যে এ আলোচনা কানাকানি হতে শুনেছে। মুন সুবাসিনীর মেয়ে দুটি তো সেকথা প্রচার করে দিয়েছিল সে ওখানে ভরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তবুও শরীর ঝিমঝিম কবে উঠেছিল। সে দীপাকে বলেছিল—কি দরকার ছিল বলবার?

দীপা বিস্মিত হয়ে বলেছিল—বাঃ—তাতে দোষটা কি হলো?

—আমার পরিচয়ে তো তোর আলাপের সুবিধে হবে না!

—মানে?

—নার্সের বোন, তার আর দাম কি? তার থেকে—তুই আর্টিস্ট—তার খাতির তো বেশি। তার উপর উনি নিজে আর্টিস্ট!

—না—না। খুব প্রশংসা করেছিলেন তোর। বলেছিলেন—কাজ করে অন্তর দিয়ে আর স্বভাবটি ভারী মিষ্টি। a sweet girl—

তার দেহে ঝিমঝিমিনির বিপরীত চঞ্চল প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল।

দীপা বলেই চলেছিল—উনিই তো বললেন—তুমি পার্ট করবে তো দিদিকে নেমন্তন্ন করবে না দেখতে? আমি বললাম—আপনিই তো এখানকার একজন কর্তা—তা কার্ড করে দিন। উনিই কার্ডের ব্যবস্থা করে দিলেন। নইলে আমরা টাকা নেব—তার উপর কার্ড দেবে কেন? তবে বললেন—আমি নামছি তা জানিয়ো না ওকে, তাহলে হয়তো আসবে না। মানে উপরওয়ালা তো আমরা। তা না হলে তো উনিই তোকে নিয়ে আসতেন।

ঠিক এই সময়েই ফিরেছিল ডাক্তার গাঙ্গুলী। পোশাক বদলে রণবেশে সেজে বেরুবে এবার। বুকে হাতে পায়ে বর্ম—পিঠে ঢাল—তূণীর—কাঁধে ধনুক—এ যেন আরও ভাল লাগছে। কর্ণার্জুনের কর্ণের সাজেও এমন মানায়নি। বললে—ওঃ বোনের সঙ্গে বোনের আলাপন—আনন্দমগন! খুব জমে গেছ যে তোমরা।

তারপরই বলেছিল—যাও যাও—গিয়ে সিটে বস গে। খুব জমবে এবার বই। বলেই এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিল—মুক্তা, তোমার আপত্তি না থাকলে ফেরবার সময় আমি গাড়িতে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। দীপা ওকে চা-টা খাইয়ো।

ফেরার পথে ওর গাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে তার ছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল। খানিকটা দীপা তার পরিচয় দিয়েছে তার জন্য—খানিকটা তার পাশে বসে যেতে হবে তার জন্য। সেই অস্থিরতা। যার জন্য সে গ্লাসটা ছেড়ে দিয়েছিল ডাক্তার ধরবার আগেই। তার দুর্বলতা—সে তার রক্তে আছে। বোধহয় মায়ের রক্তের উত্তরাধিকার। সে মনে করে—তার সান্নিধ্য—পাশের মানুষটি যদি পুরুষ হয় তবে তাকে অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট করে। চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণের মতো। কিন্তু উপায় ছিল না। শেষের দিকে সুরেন মেসোর শরীরটা অসুস্থ হয়েছিল। সুরেন মেসো দীপার সঙ্গে সর্বত্রই যেতেন—টাকাটা বুঝে নিতেন। তিনি বাইরে বসতেন না। ভিতরে স্টেজের লোকেদের সঙ্গে জমিয়ে বসে গল্প করতেন সে-কালের থিয়েটারের। মধ্যে মধ্যে চা—একটু আফিং আর সিগারেট। এখানেও গল্প চোখ বুজে। বাইরে বসতেন না ওই কারণেই—দেখতে হলে চোখ খুলতে হয় যে। আর দেখবেনই বা কি এ কালের অ্যাকটিং। সেদিন তাঁর শরীর খারাপ হওয়াতেই রূপীকে তাদের সঙ্গে ফিরতে হয়েছিল। রূপী বলেছিল—তুই তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যাবি। আমি চলে যাই ওদের সঙ্গে।

সে 'না' বলতে উত্তর খুঁজে পায়নি।

রূপী থাকলেই বা কি হত? কি করে বলত—আমি রূপীর সঙ্গে যাব। অথবা রূপী সঙ্গে যাবে। না—তা বলতে পারত না। দুটোর একটাও না।

তার অস্বস্তি থাকলে তার সে অস্বস্তির অন্তস্থলে তার সঙ্গে যাবারও গোপন কামনা উন্মুখ হয়েছিল। সে কামনা সেদিন প্রবীর রাজকুমারের মৃত্যুতে শোকে বেদনায় অনুরঞ্জিত হয়ে তাকে প্রায় বিহ্বল করে তুলেছিল। নাটক শেষ হবার আগেই তাকে একজন এসে ডেকে ভিতরে নিযে গিয়েছিল। বলেছিল—ডাক্তারবাবু ভিতরে ডাকছেন।

প্রবীরের শোকে কাঁদতে কাঁদতে সে গিয়েছিল। শেষের উজ্জ্বল দৃশ্য তার দেখা হয়নি। চুপচাপ সে বসেই ছিল। অভিনয় শেষে ডাক্তাব এসে বলেছিল—পাঁচ মিনিট। রঙটা তুলেনি। কেমন—

গাড়িতে উঠে তাকে পাশেই বসিয়েছিল ডাক্তার। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বলেছিল—কেমন লাগল? ডাক্তারের মুখ থেকে বিলাতী মদের গন্ধ বের হচ্ছিল।

সে বলেছিল—খুব ভাল। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—এ সব পার্ট কেন কবেন?

—কেন?

—মরলে ভারী খারাপ লাগে।

—হাসপাতালে এত মৃত্যু দেখেও?

—হ্যাঁ।

—সে আমি দেখেছি। তোমার মুখই সফট্ নয়—ভিতরেব ভিতরটাও। আমি জানতাম। এবং সেইজন্যেই দীপাকে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে বলেছিলাম। নেমন্তন্নটা প্রকৃতপক্ষে আমার।

চুপ করে গিয়েছিল সে।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করেছিল—তুমি জানতে না—না?

মৃদুস্বরে সে বলেছিল—দীপা বলেছে।

দীপার পার্ট ভাল হয়নি। ভালগার হয়ে গেছে খানিকটা।

সে বলেছিল এবার—দীপার সঙ্গে থিয়েটার করবেন না। ও ভাল মেয়ে নয়। নিজেই ভালগার।

হেসে ডাক্তার বলেছিল—অভিনয়ে ও বাছলে চলে না।

সে হঠাৎ বলে ফেলেছিল—থিয়েটার আপনি না করলেই পারেন। কেন করেন?

এবার ডাক্তার হেসে উঠেছিল। কিন্তু তাবপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল—থিয়েটার না-করে আমি পারি না। তা পারলে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম। অনেক কিছু। অন্তত ডাক্তারিতে ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে পারতাম। কিন্তু।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—অথচ ইচ্ছে হয় ছেড়ে দিয়ে বিলেত গিয়ে

পড়ে আসি—রিসার্চ করি। কিছু আবিষ্কার করি। কিন্তু এর থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারি নে। কিছুতেই না।

কি উত্তর দেবে সে।

গাড়িটা হাসপাতালের রাস্তায় না-এসে সোজা বি. টি. রোড ধরেছিল। সেটা বুঝেও যেন ধরতে পারেনি। ভারী ভাল লাগছিল। ডাক্তারের কথায় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল।

হঠাৎ ডাক্তার বলেছিল—কিন্তু তুমি নার্স হতে এলে কেন? কি হবে তোমার এতে? এ তো দুঃখের জীবন। এদের তো কেউ সম্মান করে না। তুমি অভিনয় করলে যে দীপার থেকে অনেক ভাল করতে।

অস্ফুট স্বরে আতঙ্কিতভাবে সে বলেছিল—না। কিন্তু সে ডাক্তারের কানে যায়নি। সে বলেই চলেছিল—শুনেছি তোমার গান গাইবার গলা খুব মিষ্টি। আর শুনেই শিখতে পার। আমি জানি, শুনেছি সব সুরেন মিত্তিরের কাছে—তুমি—

সে এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

ডাক্তার ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বলেছিল—তুমি কাঁদছ কেন?

সে বলতে চেষ্টা করেছিল—আমি জন্মের জন্য ঘৃণিত কিন্তু আমি পবিত্র হতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বলতে পারেনি—শুধু বারকয়েক বলেছিল—আমি—আমি—আমি।

—তুমি পবিত্র তুমি শুদ্ধ। কেন নিজেকে ছোট ভাব?

সে বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ডাক্তার বলেছিল—তুমি কারুর চেয়ে ছোট নও।

সে এবার প্রশ্ন করেছিল—আপনি আমাকে ঘৃণা না করে পারেন?

হেসে ডাক্তার বলেছিল,—ভালবাসি, তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

সেদিন তারা গঙ্গার ধার পর্যন্ত গিয়েছিল। ববানগরের নতুন ব্রিজ পর্যন্ত।

তাকে সেদিন গান গাইতে হয়েছিল ডাক্তারের অনুরোধে। ডাক্তার বলেছিল—ছি—ছি—ছি। এমন গলা, তুমি গান গেয়েও তো পবিত্র জীবন যাপন করতে পারতে। প্রতিষ্ঠা পেতে, অর্থ পেতে—সুখে থাকতে। নার্সিং শিখে তুমি কি করবে? তুমি যা চাও মুক্তা তা নার্স হয়ে পাবে না—পাবে শিল্পী হয়ে। ওই তোমার মূলধন।

সে চুপ করেই বসেছিল।

অনেকক্ষণ পর ডাক্তার বলেছিল—ওঠো। বারোটা বাজে।

সে উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার—।

'না—' বলে চিৎকার করে উঠল বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মুক্তামালা। সে স্মৃতিটুকু থাক, বিস্মৃতির তলে থাক, অকথিত থাক।

পাঁচ

আপনার ঘরে বসে একখানা চিঠি পডতে পড়তে মুক্তামালা স্মরণ করছিল তার অতীত জীবন। তাকে চিঠি লিখেছেন তার সর্বাপেক্ষা হিতার্থী—তার বন্ধু তার কর্ম ও শিল্প-জীবনের সঙ্গী শ্রীনারায়ণ। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ—বিখ্যাত যন্ত্রী। সন্ন্যাসীর মতো মানুষ। বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন।

না, তাঁর নিজের সঙ্গে নয়। তিনি ব্রহ্মচারী। তিনি প্রৌঢ়। কলকাতায় এক খ্যাতিমান ঘরের ছেলে—নিজে খ্যাতিমান যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ, মুক্তামালার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় সে তাকে বিবাহ করতে প্রার্থনা জানিয়েছে। সেও ব্রহ্মচারী নারায়ণের শিষ্য। দীপেন রায়; বিখ্যাত সেতারী সেও। সে জানে মুক্তমালা তাঁর কথা ঠেলতে পারবে না। সে সব জানে—মুক্তামালার জন্মকথা। সব জেনেই সে মুক্তামালাকে গ্রহণ করতে চায়। সে মুক্তামালার নাচের সঙ্গে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেছে।

শ্রীনারায়ণ শিষ্যটিকে বড় ভালবাসতেন। তিনি অনুরোধ করেছেন— তোমার দুস্তর তপস্যার শেষ হোক মা। আমার ইচ্ছা তুমি গৃহকে বরণ করে গৃহিণী হও।

না, না, তা হয় না। আপনি গুরু, আপনাকে আজ সব কথা জানাব। সে কথা সংসারে মাত্র কয়েকজন জানে, যা স্মরণ করতে গিয়েও আমার মুখ থেকে আমার অজ্ঞাতসারে না—না বলে একটা চিৎকার বেরিযে আসে, সেকথা আজ বলব আপনাকে। তারপর আপনি বলবেন, আপনি গুরু, আপনি বিচার করে বলবেন—আমার কি কর্তব্য ?

ওই চিঠি পাওয়ার একদিন পর।

সারাটা দিন-রাত্রি চিন্তা ক.্র রূপীকে পাঠিয়েছিল শ্রীনারায়ণের কাছে। তাঁকে তার ঘরে আসতে বলেছিল।

প্রৌঢ় নারায়ণ ব্রহ্মচারী মানুষ; সংগীত তাঁর জীবন-সাধনা। শিষ্য তাঁর স্বল্প কযেকজন। প্রথম জীবনে নৃত্য-কলাও চর্চা করেছেন। কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আজন্ম-বৈরাগী মন বাঁধা পড়েনি তাতে। সন্ন্যাসী হয়ে যান। পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ ঘুরেছেন। তাতেও ঠিক তৃপ্তি পাননি। ফিবে এসে লোকসমাজের একান্তে একটি নির্জন স্থান খুঁজে সেখানে এই সংগীতচর্চা নিয়েই ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুরধ্বনি অমৃতস্পর্শ বায়ুতে বহন করে লোকসমাজে নিয়ে গেছে। লোকসমাজ তাঁর কাছে ছুটে এসেছে। তাঁর নিজের শুধু একটি খেয়াল ছিল—সেটি হলো এই যে, বৎসরে একবার তিনি ভারত পরিক্রমা করে অমরনাথ থেকে কন্যাকুমারী—দ্বারাবতী থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত তীর্থগুলিতে একবার তীর্থেশ্বরদের অঙ্গনে বসে গান শুনিয়ে আসতেন। শুধু দেবতা নয়, ভারতবর্ষের পুণ্যতোয়া নদ-নদীকেও গান শোনাতেন। সে অভ্যাস আজও রেখেছেন। দ্বারকায় ভগবানের মন্দিরে গান শুনিয়ে সমুদ্রতটে যান—যন্ত্রসংগীত শোনান—পুরীতেও তাই—জগন্নাথদেবের অঙ্গনে গান সেরে সমুদ্রকে গান শোনান। বারাণসীতে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাকে সংগীত বন্দনা করে দশাশ্বমেধঘাটে যান—গঙ্গাকে

গান শোনান। কামাখ্যায় নীলপর্বতে কামাখ্যাদেবীকে গান শুনিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তটভূমিতে বসেন—সেতার নিয়ে ঝংকার তোলেন। এখানেও শেষ নয়; এই বিচিত্র মানুষটি যত মহৎ মানুষ আছেন—ছিলেন—তাঁদেরও গান শোনাতে যান—এবং যেতেন শান্তিনিকেতন—গেছেন কবিগুরুকে গান শোনাতে—ওয়ার্ধা গেছেন—সবরমতী গেছেন—মহাত্মাজী যখন মহাপ্রয়াণের পূর্বে দিল্লীতে ছিলেন সেখানেও গেছেন। তাঁকে ভজন শুনিয়ে এসেছেন। আক্ষেপ করেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে শোনাতে পারেননি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলালের কাছে আজও যাননি—বলেন—তাঁর সময় কোথায়। সময় হোক, তখন যদি বেঁচে থাকি যাব!

বিচিত্রভাবে মুক্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

এখানে নয়, বিদেশে। চীনে।

মুক্তামালাও তখন থেকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে এই গুরুর শিষ্যা হয়ে পরস্পরের কাছে বাঁধা পড়েছে।

মুক্তামালার ঘরে আসনের উপর বসেছেন। পরনে সাদা থান—গায়ে আংরাখা, তার উপর উত্তরীয়—গলায় সোনার তারে গাঁথা রুদ্রাক্ষ; মাথার চুল ধবধবে সাদা; দাড়ি-গোঁফ রাখেন না—পরিচ্ছন্নভাবে কামানো; সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিচ্ছন্নতা তার শুভ্রতার মধ্য দিয়ে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুখের হাসিটি মিষ্টি—কপালে একটি হোমতিলক।

মুক্তা বললে—আমি অপরাধী। আমার জীবন সব আপনার কাছে আজও খুলে বলতে পারিনি। আজ বলব। আপনি জানেন আমার জন্ম পরিচয়। আমি গোপন করিনি।

নারায়ণ বললেন—মা, তুমি পবিত্র। জন্মের কোন কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করেনি। জন্মের কলঙ্ক কোথায় স্পর্শ করে জান মা—করে যেখানে জন্মের জন্যই কর্মও মানুষের কলঙ্কিত হয় সেইখানে। তুমি তো মা তপস্বিনীর মতো শুদ্ধ। এ কি মা কাঁদছ কেন?

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল তার। একটু চুপ করে বোধ করি আত্মসম্বরণ করে সে বললে—বলেছি তো আপনার কাছে তা আমি গোপন করেছি। পারিনি বলতে। আমার জন্যে নয়—। আবার তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

আবার আত্মসম্বরণ করে বললে—।

আপনি জানেন—আমি জীবনে একা। না। আমি একা নই। আমি মা। আমার সন্তান আছে।

চকিত হয়ে একবার তাকালেন শ্রীনারায়ণ। বললেন—বল মা বল!

মুক্তামালা বললে—সেদিন ডাক্তারের কাছ থেকে নিজেকে সজোরে মুক্ত করে নিয়েছিলাম। শুধু বলেছিলাম—না—না—।

তার কারণ এই নয় যে বিবাহ না-করা পর্যন্ত তাকে আমায় স্পর্শ করতে দেব না। বিবাহের দাবি কামনাই আমার ছিল না। বিবাহেই ছিল আমার ভয়। আমার জন্মকলঙ্ক বিবাহ সত্ত্বেও আমার সন্তানকে স্পর্শ করবে। আমার নিজের সম্পর্কে

ভয় ছিল—আমার রক্তে আছে দেহবিলাসবাসনা। যা জাগলে আমার সর্বদেহে মহিষের দেহজ্বালা—পাঁকে আকণ্ঠ ডুবেও যেমন মহিষের মেটে না—তেমনি একটি জ্বালা, আমাকে এমনি পাঁকে ডুবতে বাধ্য করবে।

ডাক্তার হেসে ছেড়েই দিয়েছিল আমাকে সেদিন। বলেছিল—excuse me—ভুল হয়ে গেল। চল ফিরে যাই। বিশ্বাস কর আমাকে।

আবার সে চুপ করে গেল।

নারায়ণ বললে—থাক মা—

বাধা দিয়ে মুক্তা বললে—না থাকবে না। বলব, বলতেই হবে আমাকে। অপরাধ শুধু তার তো নয়—আমারও। এই ভয়, এই প্রতিবাদ আমার সত্য কিন্তু তাকে কামনাও তো আমার ছিল। আমার তপস্যা—হ্যাঁ নার্স হতে গিয়েছিলাম—এই তপস্যার জন্যে এ যুগে অন্যের কাছে তপস্যা কথাটা হাস্যকর মনে হবে—আপনার হবে না।

—সে তো আমি চিঠিতে লিখেছি—কতবার বলি—এ তোমার তপস্যা।

হাসলে মুক্তা।

বললে—জানেন, আমি নিজেই একদিন নিজেকে বিশ্লেষণ করে এ ব্যাখ্যা করেছি—এ আমার কমপ্লেক্স। মনের বিকৃতির জটিলতা। বাল্যে আমার মাকে দেখেছি ভগবানকে ডাকতে, তাঁর নিজের যে অতীত জীবন তার রূপ ছিল মহাজনটুলিতে—তাকে তিনি পাপ বলতেন। আমার জন্মের সত্যকে সযত্নে গোপন রেখেছিলেন, আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন—এ পাপ। নিজে জানতাম না নিজের পরিচয় মিথ্যায় ছিল ঢাকা—সেই মিথ্যার উপর ব˙তি বেঁধে আমার সত্য পরিচয়কে করেছিলাম ঘৃণা। তাই যেদিন সত্য প্রকাশিত হলো—মা বললেন নিজের মুখে—সেদিন নিজেকে নিজেই দিলাম দণ্ড; পাতিত্য নিজেই চাপিয়ে নিলাম নিজের মাথায়। শ্মশানঘাটে আমার পরিচয়ে সেখানকার লোকের বাঁকা হাসি একটা বাঁকা ছোরার মতো আমার মনের মুখে ঠিক কপালে দাগ টেনে দিয়েছিল। তারপর থেকে অন্য যে কেউ আমার দিকে তাকিয়েছে, তার চোখের আয়নায় আমি যেন আমার মনের মুখের কপালের এই দাগ দেখেছি। ইস্কুলে গায়ত্রী আর হেডমিস্ট্রেস আমার সেই দেখাকে সত্য করে তুলেছিল। তারা উঁচু গলায় প্রকাশ করে বলেছিল—তোমার কপালে দাগ—কপালে দাগ। ভয়ে ঢুকলাম। মনে হলো আমি পাপী—আমার মধ্যে পাপের বাসা। মায়ের শিক্ষা—ইস্কুলের শিক্ষা আমাকে বললে—পবিত্রতার তপস্যা কর, জীবনটাকে শুদ্ধ কর, বঞ্চনা কর নিজেকে। গানে ছিল সহজ অধিকার, জন্মগত অধিকার, নাচেও ছিল—প্রথমটা অবশ্য জানতাম না। জন্ম থেকে পাওয়া বলে গান অনিবার্য আকর্ষণে টেনেছে—তবু গান গাইনি, গাইতে চাইনি, শিখতে চাইনি। ভয় হত—গান যা জন্মগুণে পেয়েছি সে নিশ্চয় আমাকে নিয়ে যাবে ওই পঙ্কতৃষ্ণায়।

একটু থামলে মুক্তা। তার কণ্ঠস্বর ক্রমশ জড়তামুক্ত হয়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছে

এখন। সে মুখ তুলেছে। কথা বলছে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে অসংকোচে। থেমেছে সে একটু বিশ্রামের জন্য।

গুরু তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হেসে বললেন—বিশ্লেষণ তো তোমার মিথ্যা নয় মা। সংসারে পাপ কখন সত্য ভেবে দেখ। পাপকে পাঁকের সঙ্গে তুলনা করলে, পাঁকের একটা পীড়া আছে, কিন্তু পাঁক থেকে উঠে স্নান যখনই কর, তখনই তো মানুষ তা থেকে মুক্ত। সে পীডা তো থাকে না—থাকবার কথা নয়! স্নান করার পরেও যদি সে পীড়া কেউ মনে অনুভব করে তবে সেটা তো মানসিক বিকৃতিই বটে।

একটু থেমে আবার বললেন—আরও একটা অবস্থায় পাপের পীডা থাকে না, যখন পাঁকের মধ্যে থেকে থেকে ওই পীডাটা সইবার ক্ষমতা জন্মে যায়, তখন আর মানুষ মানুষ থাকে না—তখন ওই মহিষই হয়ে যায়।

মুক্তা বললে—এমন সহজভাবে সোজা সামনে তাকিয়ে এই কথাগুলো তখন মনে আসেনি। মনে এসেছিল বাঁকাভাবে। পাপ-পুণ্য অস্বীকার করে, সংসার-সমাজ সব কিছুর উপর মর্মান্তিক আক্রোশে—ঘৃণায়।

ঘৃণা আক্রোশ এনে দিল জীবনে—ওই ডাক্তার।

* * *

সেদিন প্রতিবাদ করতেই সে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল, মাফ্ চেয়েছিল। হাসপাতালে ফিরে এসে নামিয়ে আবার বলেছিল—Please forget and forgive me.

এত রাত্রেও সুষমা জেগেছিল—সুষমাদি একা নয়—আরও পাঁচ-সাত জন। ওরা নিত্যই এমনি জেগে আড্ডা দিত—জীবনের এই রসপানের নেশায় মাতলামি করত যতক্ষণ না দেহ ভেঙে পড়ত ঘুমে ততক্ষণ।

আমাকে দেখেই তারা খুব হুল্লোড় করেছিল—বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু আমি রূঢ়স্বরে বলেছিলাম—সুষমাদি! কারণ আমি পবিত্র দেহ নিয়েই ফিরে এসেছিলাম।

তাতে সুষমাদিও থমকে গিয়েছিল। কিন্তু একমুহূর্ত পরেই সে সমান রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করেছিল—রাত্রি সাড়ে বারোটায় ডাক্তারের গাড়িতে তার পাশে বসে ফিরে এলি কোত্থেকে শুনি? সতী শিরোমণি আমার!

একমুহূর্তে মিথ্যে কৈফিয়ৎ এসে গেল। বললাম—থিয়েটারে সুরেন মেসো এসেছিল দীপাকে নিয়ে—সেখানে মেসোর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ডাক্তারবাবুদের থিয়েটার—ডাক্তারবাবু পার্ট করছিলেন—তিনি তাঁকে দেখে ইনজেকশন দিয়ে নিজের গাড়িতে তাদের বাড়িতে দিয়ে এলেন। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম, সঙ্গে এসেছি।

থমকে গেল ওরা। আমি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। শুয়ে শুয়ে কাঁদলাম।

প্রতারণা সেদিন তাদের করতে গিয়ে করলাম নিজেকে। সত্য কথাটা বলতে

পারলাম না! দেহে তাকে পেতে—তাকে কেন কাউকে পেতেই আমার ভয় ছিল—কিন্তু মন আমার—আমার সেই যৌবনদিনে একজনকে চেয়েছিল বই কি। এ চাওয়া এ চাহিদা যে প্রকৃতির চাওয়া। আমার মন তাকেই চেয়েছিল। তারই জন্যে সেদিন শুয়ে আমি কেঁদেছিলাম। আজ বুঝতে পারছি—আপনার কাছে বলছি—সে আমাকে চেয়েছিল সেদিন—আমি তাকে নিজেকে দিতে পারিনি—সেই বেদনায় আমি কেঁদেছিলাম। পরের দিনও কেঁদেছিলাম। কয়েকদিন দূরে দূরে সরেও থাকলাম। কিন্তু কয়েকদিনের পর আর পারলাম না।

একদিন হাসপাতালে ডাক্তার এল রাউন্ডে। আমি ছিলাম—আমার কর্তব্য সব দেখানো—দেখাচ্ছিলাম। কিন্তু বুকের ভিতরটার দুরন্ত আবেগ বর্ষার মেঘের মতো অকস্মাৎ ছুটে এসে সব ছেয়ে ফেলে গুরু গুরু করে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার হাত-পা কাঁপছে।

যখন সে বেরিয়ে গেল তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললাম—আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। খুব করুণ কণ্ঠে বলেছিলাম। কানে আজও আমার সেদিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। তিনি মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে চলে গেলেন।

ক্ষমা সে হাসির মধ্যেই ছিল।

বুকের মধ্যে আমার তাকে পাবার কামনা তখন জেগেছে শেষরাত্রির ঘুমের মতো। কর্তব্যবোধ মমতাবোধ সবকিছুর আকুতি প্রেরণাকে ছাপিয়ে ছেলের শিয়রে জেগে থাকা মাও যেমন ঘুমে কাতর হয়—ঢুলে ঢুলে শেষে ঘুমিয়ে পড়ে—তেমনি করে জাগছিল আমার এই কামনা। এর সঙ্গে তার সমাদর মৃদু বাতাসের স্পর্শের মতো আমার সে ঘুমকে গাঢ়তর করছিল। আমার তপস্যা শিথিল হলো। ঘুমিয়ে পড়লাম।

গুরু বললেন—থাক মা—

—না। শুনুন। দোষ সে লোকটির নিঃসন্দেহে—সে অপরাধী। তবু সে বিচিত্র মানুষ। এবং আমার মন—এও হয়তো বিচিত্র। না শুনলে বুঝবেন না। সে লোকটি আমার এ ঘুমের সুযোগ ঠিক নেয়নি। সে আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে যাচ্ছিল। আর বাড়ছিল তার থিয়েটারের নেশা। থিয়েটারের নেশাতেই চাকরি ছেড়ে প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে চেম্বার খুলে বসল। আমি চেম্বারে যেতাম। চেম্বারে দীপা আসত। দীপা দিনে দিনে খ্যাতি অর্জন করে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। সিনেমাতে ছোটখাটো পার্ট পেয়েছে। অ্যামেচারে নায়িকা হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে আসত। বসে থাকত। হাসত। গাঙ্গুলী ওদের বিনা পয়সায় দেখত।

বাজারে গুজব রটল—ডাক্তার প্র্যাকটিস ছেড়ে সিনেমা করবে। থিয়েটারেও নামবে। শুনলাম হাসপাতালে। সেদিন চেম্বারে গিয়ে আমি বললাম—না। এ করবেন না। আমি দেব না এ করতে।

তখনও আমি তাকে আপনি বলি।

সে বললে—না এ মিথ্যে কথা। থিয়েটারের নেশার চেয়ে ডাক্তারিতে অনুরাগ আমার কম নয়। ওসব বাজে কথায় বিশ্বাস করো না। কিন্তু ও হাসপাতালে ভাল লাগছিল না। তার অনেক কারণ। ওখানে আমার জীবনের সুযোগ নেই। সুযোগ যেদিন আসবে সেদিন থিয়েটারও ছেড়ে দেব। তুমি কি আজও আমাকে চিনলে না!

চুপ করে রইলাম। অস্বীকারের উপায় তো ছিল না।

সে বললে—কি তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি গালব ?

মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিতে বললে—গাললাম—। ডাক্তারি ছেড়ে সিনেমা করব না। হলো তো ?

মাথাটা না-সরিয়েই বললাম—না। আরও একটা—

—সেটা কি ?

—দীপার সঙ্গে থিয়েটার করবেন না!

—দীপার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ।

—বেশ। তুমি তা হলে নাম অভিনয়ে। আমি নায়ক তুমি নায়িকা। বল! সেই মুহূর্তে সব ভেসে গিয়েছিল আমার। বলেছিলাম—হ্যাঁ।

সেইদিন অঘটন ঘটল। আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখল। আমি আপত্তি তো করলামই না, চাইলাম এইভাবেই থাকি কিছুক্ষণ। ডাক্তার আমাকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হেসে বললে—Oh sorry—I forget myself—take it easy.

অভিনয়ে নামলাম। এ পারঙ্গমতা আমার জীবনে ছিল। দেহ বোধ হয় আমার নাচের ছন্দেই গড়া—কণ্ঠে স্বর আমার সুরে বাঁধা—নাম করতে দেরি হলো না। দু' তিন বারেই নাম হলো। চাকরি সেই ছাড়ালে। বললে—ও তোমার জন্যে নয়।

মাস তিনেকের মধ্যে ঘটে গেল।

আরও ঘটল। দীপা বাড়ি থেকে পালাল। চাঁপা মাসীর স্ট্রোক হয়ে প্যারালিসিস হলো। সুরেন মেসো, রূপী দীপাকে ফেরাতে গেল—সে ফিরল না। যার সঙ্গে সে পালিয়েছিল সে সিনেমায় একটা কিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে আসতে দেয়নি। দীপাও চায়নি। তার ধারণা হওয়ার কারণ ছিল যে তার বাপ তার মা উপার্জন কেড়ে নিচ্ছে। তা নিত তারা। থিয়েটারের সিনেমার টাকা তারাই নিত হাত পেতে। এবং দিত না তাকে। চাঁপা মাসী গৃহস্থ হয়েও ও স্বভাবটুকু ছাড়তে পারেনি। ডাক্তারই চাঁপা মাসীকে দেখত—সেই দীপার সঙ্গে অভিনয়ের সূত্র থেকে। সে বলেছিল—মুক্তাকে বাড়ি আনুন সুরেনবাবু। ওকে ছুটি নেওয়াচ্ছি। এই বইটায় যদি ভাল পার্ট করে তবে চাকরি ছাড়িয়ে দেব। ও বাড়ি থাকলে দেখাশোনার সুবিধা হবে।

ছুটি নিয়ে সে বাড়ি এল। হাতে পার্ট। বড় পার্ট।

ডাক্তার নতুন থিয়েটার গ্রুপ করেছে। ছোট বই। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। নাটক আর নৃত্যনাট্য মিশিয়ে করবার ঝোঁক হয়েছে ডাক্তারের। সুরেন মেসোকে বলেছিল—ওর নাচটা আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে। আমরা আমাদের গ্রুপ থেকে ফি দেব আপনাকে।

চাঁপা মাসী সুস্থ থাকলে হয়তো চিৎকার করত। চিৎকার করত দীপার জন্য। কিন্তু তার কথা জড়িয়ে গিয়েছিল—বোধশক্তিও বেশ ভাল ছিল না।

ডাক্তারই তাকে বলেছিল—আমার মুখ রাখতে হবে।

ডাক্তারই একটা গ্রামোফন এবং চিত্রাঙ্গদার গানের সব রেকর্ড কিনে দিয়েছিল।

—আমারও তখন নেশা লেগেছে। রক্তে যেন জোয়ার ধরেছে। পৃথিবী ভুলেছি—দিন ভুলেছি—রাত ভুলেছি। গান গুঞ্জন করছি—

রোদন ভরা এ বসন্ত
কখনও আসেনি বুঝি আগে।
কখনও গাই—তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি—
তুমি এসো—বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন!
বক্তৃতা করি—পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি—নহি—
অবহেলা করি রাখিবে পিছে
সে নহি—নহি।

স্বপ্নও দেখতাম অভিনয়ের।

তারপর হলো অভিনয়। সেও স্বপ্নের মতো। আত্মহারা হয়ে অভিনয় করেছিলাম। অভিনযে নৃত্যে গানে আশ্চর্য শক্তি দেখিয়েছিলাম আমি। কিন্তু আমার মনে নেই।

মনে আছে—অভিনযের শেষে কখন সে আমাকে তার ফ্ল্যাটে নিযে গেছে। আমি বিহ্বল হয়ে তার দিকে তাকিযে আছি। বুকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা—আকুল আগ্রহে সর্ব দেহ শিরস্নায়ু থরথর করে কাঁপছে। তবে মুখে বলছি—না, না—না। তুমি তো তেমন নও। তুমি বৈজ্ঞানিক। তুমি যুক্তিবাদী তুমিও—

সে বলেছিল—আমিও আজ আপনাতে হারিয়েছি মুক্তা। তুমি হারিয়েছ। আমি দেখতে পাচ্ছি।

বলেছিলাম—কি হবে ভাবো তো? না—না।

সে বলেছিল—জীবন অঙ্ক নয় মুক্তা। জান এক আর একে যোগ করলে দুই হয়। কিন্তু জীবনে একটি পুরুষ একটি নারীর যোগফল সাধারণত এক। নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রে এক। কখনও কখনও দুই হয় সে তিনও হয় চারও হয়। জীবন অঙ্কে চলে না। বিদ্যায় চলে না বুদ্ধিতে চলে না—জীবন চলে আপন ছন্দে। বলে সে আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিল।

আমি হারালাম, ডুবে গেলাম।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। স্থির নির্বাক। দু' চোখের কোণে দুটি ফোঁটা জল ছোট দুটি মুক্তার দানার মতো টলমল করছিল।

প্রতিমার মতো মনে হচ্ছিল তাকে। মুখের ভাবে কি ছিল নির্ণয় করা কঠিন। বেদনা? না, ক্ষোভ? না—হয়তো অপরিসীম ঔদাসীন্য।

নারায়ণ ডাকলে—মা।

প্রতিমার মুখে কথা ফুটল। সে বলতে লাগল—আমি মা হলাম। মাস তিনেক যেতে যেতেই অনুভব করতে পারলাম। ছুটে গেলাম তার কাছে। কি হবে? সে একটু চুপ করে থেকে বললে—অত্যন্ত সহজভাবে নিতে পাব না?

চমকে উঠলাম।

সে বললে—তোমাকে কোন হোমে রেখে দেব। সন্তান হলে তাকে অনাথ আশ্রমে দেব—

আবার চমকে উঠলাম—কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি। ভাল আশ্রমে রাখব। টাকা পয়সা দেব—

—না। চিৎকাব করে উঠলাম—

—কিন্তু—অন্য পথে বিপদ আছে —

হে ভগবান! বলে এবার চিৎকাব কবে উঠেছিলাম। তাবপব বলেছিলাম- -না—না। তা দেব না। সে হতে দেব না আমি।

—তবে?

উত্তব দিতে পারিনি আমি।

সেই বলেছিল—তা হলে বিযেব কথা বলছ? কিন্তু তা তো হয না। বিবাহ তো আমি কবব না। আমি বিবাহেব উপযুক্ত নই। না—নই। আমি আমাকে জানি। তাছাড়া তোমাকে বলিনি—আমি ইউবোপ চলে যাচ্ছি। আমেবিকান বন্ধু আছে আমার—তাবা সাহায্য কবছে। সে তো হয না!

প্রচণ্ড ঝগড়া হযে গিযেছিল। আমি তাকে অপমান করেছিলাম. সে কথা বলেনি। শুধু বলেছিল—এ যুগে এত অবুঝ হচ্ছ কেন তুমি?

নিরুপায় হযে কাঁদতে কাঁদতে বাডি এসেছিলাম। বাড়িতে তখন লোক বসে আছে—আমায পার্ট দিতে এসেছে। অনেক টাকা দেবে। আমাব খ্যাতি রটে গেছে, আমি বিখ্যাত হযে গেছি।

* * *

সেই তাব সঙ্গে শেষ দেখা।

চলে যাবার সময় কিন্তু সে একটি মাতৃসদনে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। সেখানেই হয়েছিল আমার সন্তান। পুত্র। তার জন্যও সে টাকা দিযে গিযেছিল একটি সম্ভ্রান্ত আশ্রমে।

আমি প্রথম সন্তানকে ছাডতে রাজী হইনি। কিন্তু শেষে ছেড়েছিলাম—নিজের প্রতি ঘৃণায় লজ্জায়। কি বলব আমি তাকে যখন সে বড় হবে?

তারপর জীবনে এল সাফল্য। একের পর এক।

আমি একা, আমি নিঃস্ব, আমি রিক্ত। চাঁপা মাসী মারা গেছে, সুরেন মেসো মারা গেছে, দীপার অনেক দুঃখ-দুর্দশা। তিনবার বিয়ে করেছে।

আমি নানান দলে নাচলাম। আমাকে বিদেশে নিয়ে গেল। চীনে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। আমি অবাক হলাম। মনটা জুড়োল। আপনাকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু এই সত্যটি বলতে পারিনি আপনাকে। ছেলের জন্যই আমি মরতে পারিনি। আমার জীবনশুদ্ধি হলো না। হেরে গেছি আমি। প্রতিষ্ঠা নিয়ে আছি—সম্পদ নিয়ে আছি। আর আছি ছেলের জন্য। তার টাকা সেই অনাথ আশ্রমেই পড়ে আছে। আমার টাকাতেই সে এখন পড়ছে। রূপী যায়--তাকে দেখে আসে। সে তাকে চেনে—সে তার মামা। আমিও যাই—দেখে আসি। দূর সম্পর্কের মাসী বলেই আমাকে জানে। সিনেমাতে নামিনি ছেলের জন্যে। সে দেখবে আমার নগ্নরূপ।

শ্রীনারায়ণের চোখ থেকে এবার জলের ধারা নেমে এসেছিল।

সেই দেখে চুপ করলে মুক্তামালা।

একটু পর বললে-- আর একটু আছে। কিছুদিন আগে সে একখানা পত্র লিখেছিল কালিফোর্নিয়া থেকে—সেখানে এখন সে বড় ডাক্তার হয়েছে।

লিখেছিল--জীবনে আবার তার মোড় ফিরছে। সে ওখানকার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বড় একটা কিছু করবার প্রত্যাশা রাখে। লিখেছে— আশা করি এতদিনে তুমি এটা সহজভাবে নিতে পেরেছ। Take it easy. — মহাভারত পড়েছ? ব্যাসের জন্মকথা। ব্যাস নিজে বলেছেন--পড়ে দেখো। কোথাও সংকোচ নেই--সত্যকে সহজভাবে বলেছেন। ঋষি পরাশর—ঋষি, তবুও মানুষ। তিনি জীবনের আগ্রহে মিলিত হয়েছিলেন মৎস্যগন্ধার সঙ্গে। বিবাহ না—মন্ত্র না—সাক্ষী না। তাতেই উৎপন্ন হলেন ব্যাস। ব্যাস নিন্দিত নন-- পুরুষশ্রেষ্ঠ। তোমাকে শিল্পীখ্যাতি আমি দিয়ে এসেছি। যোজনগন্ধার সঙ্গে যদি তার তুলনা করি তবে আমাকে উদ্ধত ভেবো না। তুমি ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ছেলে বা মেয়ে আমি জানি না। যাই হোক সে তাকে পাঠিয়ে দাও। তাকে মানুষ করব আমি--যোগ্য করেই করব। এ মডার্ন ম্যান বা উযোম্যান। তোমার যোজনগন্ধার মতো খ্যাতিতে অবশ্যই আসবে শান্তনু। তুমি সম্রাজ্ঞীর সৌভাগ্য লাভ কর।

হাসলে সে। তারপর বারবার ঘাড় নেড়ে বললে—না। সে অসাধারণ! কিন্তু এখানে তার ভুল হয়েছে।

মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন শ্রীনারায়ণ।

মুক্তা বললে— মহাভারতের যুগ পার হয়ে গেছে বাবা। অনেকটা চলে এসেছি আমরা। একালে সত্যবতী পরাশরের মতো ঋষির প্রিয়া হবার সৌভাগ্য—তা সে সৌভাগ্য হোক না কেন একদিনের—লাভ করার পরও কি তাঁকে বিস্মিত হয়ে সিংহাসনের লোভে রাজ-রাজেশ্বরকে বরণ করতে পারে?

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শিষ্যার মুখের দিকে গুরু।

কিছুক্ষণ পর বললেন—!

—বলুন। এর পরও কি আপনি বলবেন—

জিভ কেটে বললেন—না মা, না! আমি বলছি।

নীরবে অপেক্ষা করে রইল মুক্তামালা।

গুরু বললেন—সন্তানকে নিজের কাছে আন মা—তোমার ব্রত পূর্ণ কর। সত্যকে বুকে টেনে নাও। এই বলছি। বাকি তো ওইটুকুই।

সে বললে—না, তাকে তার জন্মদাতার কাছে পাঠিয়ে দেব। ব্যাস তো তাঁর মায়ের কাছে ধীবরকন্যার কাছে থাকেননি! একটু হাসলে সে।

একটু পরে গুরু বললেন—তাঁর ঠিকানাটা আমাকে দেবে?

—নেই। চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। বলে গুরুর পদধূলি নিয়ে উঠে চলে গেল। যাবার সময় বললে—আপনি গুরু। মীরা গানে ভজনা করে জীবন পূর্ণ করেছিল। সে হয় তো সেকাল। একালেও আমি আনন্দের মধ্যে পবিত্র পুণ্যের মধ্যে এই সাধনাতেই জীবন পূর্ণ করব। আর আমার অভিযোগ নেই।

ব্যর্থ
নায়িকা

□●□

১৯৪৬ সাল আর ১৯৬০ সাল—গুণতিতে কুড়ি না হলেও—মোটামুটি কুড়ি বছরই বলা চলে। কুড়ি বছরের একটি নাটক। গোপার জীবন-নাটক। শুরু হয়েছিল গোপার চৌদ্দ বছর বয়সে, আজ গোপার বয়স চৌত্রিশ। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অকল্পিত অচেনা প্রান্তরে এসে সে যেন একটা দিকদিগন্তহীন প্রান্তরের মধ্যে হারিয়ে গেল। অবশিষ্ট বাকি জীবন বুকে হেঁটে এই প্রান্তর ভেঙে চলা ছাড়া আর কিছু রইল না। এবং তার মধ্যে নতুন কিছু ঘটবারও আর প্রত্যাশা রইল না। এইটেই যেন শেষ ঘটনা। বিন্দুমাত্র ঘটা না করেই ঘটে গেল।

এরপর আর নাটক চলে না। একঘেয়ে একটি স্রোতের টানে ভেসে চলার মধ্যে যে গতি—তার সঙ্গে ছেদ পড়ার কোন তফাৎ নেই। ঘরের তক্তাপোশখানার উপর গোপা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

জীবন যে এমনভাবে অবশ্যম্ভাবিতায় বিয়োগান্ত তা গোপা জানত না। মন বলছে—হয়তো নাটক এর জন্যে দায়ী নয়। দায়ী সে। সে এই নাটকের নায়িকা, সে-ই নাটককে সার্থক করে তুলতে পারলে না। হ্যাঁ। পারলে না। একালের মেয়ে, লেখাপড়াও কিছু করেছে, ঠিক যারা পাঁচপাঁচি—অতিসাধারণ বা ব্রাত্য—কাল বা যুগের ধ্যানধারণা থেকে পিছিয়ে পড়া মেয়ে তা ঠিক নয়। তবে অবশ্য যারা অনন্যা অসাধারণ তাদেরও একজন নয় সে। এবং মাঝারি মেয়েদের মতোই জীবনের দাবিকে জোর করে তুলে জীবনকে বিয়োগান্তক বলে মানতে সে প্রস্তুত ছিল না।

মানুষের মরাটা বিয়োগান্ত নয়। মানুষ মরবার জন্যেই জন্মায়—সব মানুষই মরে। কিন্তু সে হলো সমাপ্তি। মৃত্যুর মধ্যে যে বিয়োগ—সে বিয়োগ সমাপ্তি। সে বিয়োগ বিয়োগান্ত নয়। কিন্তু জীবনের মাঝখানে এইভাবে সকল কল্পনায়, সকল ফুল ফোটানোর প্রত্যাশায়—জীবনের বিস্তারে ছেদ টেনে দিয়ে এইভাবে ব্যর্থতার মধ্যে ভেঙে পড়ার বা মধ্যপথে পথের পাশে সাঁটপাট হয়ে শুয়ে পড়ার মধ্যে যে ব্যর্থতার লজ্জায় ও বেদনায় ম্রিয়মাণ ও সকরুণ বিয়োগান্ত পরিণতিটি আপনা থেকে ফুটে ওঠে—তাকে কি করে অস্বীকার করবে? কি করে বলবে—আমার এই ভাল, এই ভাল। কি করে মুখ তুলে চাইবে? কি করে অস্বীকার করবে? স্বীকার অস্বীকারের কোন অপেক্ষা না রেখেই রাত্রি যেমন করে দিন শেষ করে দেয় অন্ধকারের মধ্যে—ঠিক তেমনিভাবেই তার জীবন-নাটক শেষ হয়ে গেল। জ্যোতি তার সকল কামনার কাম্য—নারী-জীবনের আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ—পৌরুষে প্রেমে স্নেহে সহযোগিতায় তাকে সে জয় করেছিল—সেও তাকে বরণ করেছিল—সারা অন্তর দিয়ে। আজ বিশ বৎসর কামনা করে এসেছে—প্রতিটি দিন পরস্পরকে কামনা করে এসেছে—একটি মিলন দিনও

তারা স্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল। ব্যর্থ নায়িকা সে—সে পিছিয়ে এসে ভেঙে পড়ল। এগিয়ে যেতে পারল না।

*　　　*　　　*

নিতান্ত বিশেষত্বহীন অতি সাধারণ দু' কুঠুরীর একখানা পুরনো বাড়ি।

নতুন কালে হিসেব করে তৈরি করা প্ল্যানসম্মত বাড়ির স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ, যাকে ফ্ল্যাট বলা হয়—তা নয়। এ হলো সেই পুরনো কালের চকমিলান বাড়ি; চৌকো বারান্দার কোলে কোলে ঘর; বারান্দাটাকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে কেটে কেটে আলাদা করা হয়েছে এবং এদিকে-ওদিকে খানিকটা জোড়াতালি দিয়ে বাথরুম-রান্নার জায়গার সংকুলান হয়েছে কোনরকমে। তবে গোপাদের অংশটা নিচের তলায়—সামনের দিকটা, এই কারণে অন্য অংশগুলো থেকে অসুবিধে কম।

দু'খানা ঘরের যেখানাকে সামনের ঘব বলা চলে—এবং এককালে যে ঘরখানা সত্যি সত্যিই সামনের ঘর ছিল—সেইখানাই দু'খানা ঘরের মধ্যে সম্ভ্রান্ত এবং বাইরের পোশাকী সজ্জায় সজ্জিত।

এইখানাই গোপার জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্যের পৃষ্ঠপট বা ব্যাকগ্রাউন্ড। ঘবখানা লম্বায় চওড়ায় অর্থাৎ আয়তনে ছোট নয়—ষোল ফিট বাই বারো ফিট হবে; কোন্ কালে ডিসটেম্পার কবা হয়েছিল—পাতলা কালির আস্তরণের মধ্যে এখনও তার চিহ্ন ঘষা মোছা হয়েও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঘরের ভিতর আসবাবের মধ্যে একদিকে একখানা তক্তাপোশ আর একদিকে একখানা ছোট টেবিল এবং খানতিনেক চেয়ার, একটা ভাঙা নড়বড়ে বুকসেল্‌ফ। একটা কাঁচভাঙা কাঁচের আলমারি। তার মধ্যে একটা থাকে খানকতক বই পরিপাটি কবে সাজানো। খানচাবেক রবীন্দ্র রচনাবলী, দু'খানা শরৎচন্দ্রের রচনাসম্ভার, একখানা বসুমতীর ছাপা ছেঁড়া বঙ্কিম গ্রন্থাবলী; এছাড়া বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী, মানিক বাঁড়ুজ্জের বউ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি খানচারেক বই বেশ ঝরঝরে করেই সাজানো রয়েছে। একটা থাকে ছেঁড়া বইয়ের পাতা গাদা করা রয়েছে; তার সঙ্গে খানকয়েক ছেঁড়া মলাটও রয়েছে। যা হয়তো এখনও দপ্তরীর হাতে পড়লে বাঁধানো হয়ে নবকলেবর পেতে পাবে। তার মধ্যে রামায়ণ আছে মহাভারত আছে, আবার সেকালের রাজলক্ষ্মী, দামোদর গ্রন্থাবলীও আছে।

দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে মাত্র চারখানা ছবি—আর খানবারো ছবি টাঙাবার হুক—পেরেক সর্বাঙ্গে ঝুল জড়িয়ে বেরিয়ে রয়েছে—দৃষ্টিকে যেন খোঁচা মারছে।

চারখানা ছবির মধ্যে দু'খানা হলো ইতিহাসের ছবি—আর দু'খানাকে ভূগোলের বলা যায়; অর্থাৎ নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি, একখানা কাঞ্চনজংঘার, অপরখানা সমুদ্রের। ইতিহাসের ছবি বলতে দুটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির ছবি—একখানি রবীন্দ্রনাথের, অপরখানি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের।

বাকি খালি জায়গাগুলোয় অর্থাৎ পেরেকগুলোর নিচে এককালে ঊনবিংশ শতাব্দীর বড়মানুষদের ছবি ছিল; রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, মাইকেল, দেশবন্ধু প্রভৃতির

ছবি ছিল ; সেগুলোর দড়ি জীর্ণ হয়ে হয়ে একে একে কেটে ছিঁড়ে আছড়ে পড়েছে মাটিতে এবং ভেঙে ভেঙে বাতিল হয়ে গেছে।

দেওয়ালে অনেককালের মালিন্য পলেস্তারার উপর জমে রয়েছে। ঝাড়াঝুড়ি হয় কিন্তু তাতে ওই মালিন্য মোছে না। সদ্য যে কলির আস্তরণ পড়েছে সে আস্তরণের মধ্যে যেন কেমন একটা ভিজে ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে দাগের আভাস ফুটে রয়েছে। সে থাক। পুরনো হলে এই দশাতেই আসতে হয়। জোয়ার-ভাঁটা খেলা গঙ্গার ধারে কলকাতার মাটির উপর ইঁট চুন সুরকীতে গড়া বাড়ি আর এর চেয়ে শুকনো এবং ঝরঝরে তাজা থাকে না।

গোপার পা যেন টলছিল। দেহের শক্তি যেন শেষ হয়ে গেছে কি যাচ্ছে।

জ্যোতিপ্রসাদকে বিদায় দিতে সে ঘরের দরজাটা খুলে দিল। বাইরে বের হবার দরজা। জ্যোতিপ্রসাদ দরজার মুখে একবার থমকে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এই তাহলে শেষ কথা ?

ম্লান হেসে গোপাও মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে—আমি তোমাকে সব লিখেই জানিয়েছি। তাছাড়া—আর কি কথা থাকতে পারে বলো ?

জ্যোতিপ্রসাদ বললে—আর একবার ভেবে দেখ।

বিষণ্ণ হেসে গোপা বললে—কি ভেবে দেখব ?

অনেকক্ষণ, তা প্রায় আধ মিনিটকাল নিস্তব্ধ হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল জ্যোতিপ্রসাদ, তারপর বললে—তাহলে যাই।

—হ্যাঁ। যাও।

জ্যোতিপ্রসাদ চলে গেল। গোপা দরজা বন্ধ করে এসে—সেই তক্তাপোশটার উপর বিস্তৃত অনন্তশয্যার মতো সেই ছেঁড়া সতরঞ্চি এবং ময়লা চাদরখানার উপর নিজেকে এলিয়ে দিল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ভেঙে পড়ে যেন লুটিয়ে পডল—অদৃশ্য কালস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিল।

দুই

১৯৪৬ সালে নাটকের শুরু।

১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে হয়ে গেল ; রাত্রে কলকাতার কতকগুলো অঞ্চলে আগুন লাগল ; রক্তপাত হলো ; মেয়েদের আর্তনাদ উঠল ; তা ছাপিয়েও সারারাত দুটি বিরোধী সম্প্রদায় চিৎকার করে ধ্বনি তুললে। একদল হাঁকলে বন্দেমাতরম—জয় হিন্দ্। অন্যদল হাঁক তুললে—আল্লাহো আকবর, নারায়ে তকদীর !

কলকাতার নতুন সুগঠিত চাকচিক্যময় অঞ্চল —পার্ক সার্কাস। পার্ক সার্কাসেই বাসা ছিল গোপার বাবার।

না। পার্ক সার্কাসে বাসা ছিল বলে গোপার বাবা নরেশ গুপ্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। বড় চাকরেও না। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। সেকালে আড়াইশো টাকা মাইনে পেতেন, দুই মেয়ে এক ছেলে এবং স্ত্রী নিয়ে পাঁচ জনের সংসার ছিল।

তবে ধনী বা অবস্থাপন্ন মানুষ না-হলেও মনে-মনে মানুষটি ছিলেন জাত-অভিজাত, রীতিমতো সংস্কৃতিবান মানুষ ; জাত জানতেন না, ধর্ম সংস্কার এ সবের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না ; পাজামা পরতেন, অনেক সময় খালি পায়ে থাকতেন এবং ঘুরতেন কিন্তু খালি গায়ে কখনও থাকতেন না ; রবিবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেতেন ; মেয়েরা গান গাইতে পারত, তারা উদ্বোধনী বা সমাপ্তি সঙ্গীত গাইত। এসব মহলে তাঁর খাতির ছিল।

নিত্য দাড়ি-গোঁফ কামানো ধবধবে পাঞ্জাবি-পাজামা পরা ঝরঝরে সংস্কৃতিবান মানুষ ; পার্ক সার্কাসে প্রতিবেশী মুসলমানদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। পার্ক সার্কাসে তিনি বাসাটা নিয়েছিলেনই তাঁর বন্ধু মহম্মদ কাদের সাহেবের আকর্ষণে। কাদের সাহেব তাঁর কলেজের সহপাঠী ছিলেন এবং কর্মজীবনে বিচিত্রভাবে একই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়েছিলেন। কাদের সাহেবের ছিল বাইবে ঘোরাঘুরির কাজ, গুপ্তবাবুর ছিল আপিসের কাজ, কলকাতার আপিসে তিনি ছিলেন অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে প্রথমতম কেরানী। যুদ্ধের কলকাতা তখন—যুদ্ধপূর্বে নরেশ গুপ্তের মাইনে ছিল একশো পঁচিশ, যুদ্ধেব বাজারে সেটা আড়াইশোতে উঠেছে; এবং নতুন কালের যে হাওয়া উঠেছে—সেই হাওয়াতে নিঃশ্বাস নিয়ে এবং আড়াইশো টাকার কল্যাণে বাড়িতে বড খাঁচায় কয়েকটা লেগহর্ন মুরগী পুষে বাসা নিয়েছেন পার্ক সার্কাসে। কাদের সাহেবই এই সুন্দব বাসাটি তাঁকে দেখে দিয়েছিলেন।

কাদেব সাহেবের ভায়রাব বাড়ি। পার্ক সার্কাস ইমপ্রুভমেন্ট স্কীমে কাঠা দশেক জমি কিনে যুদ্ধেব বাজারে পাশাপাশি দু'খানা দোতলা বাড়ি কবেছিলেন ভদ্রলোক। নিজে একখানাতে থাকবেন—অন্যখানা ভাড়া দেবেন। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের স্কীমের একেবারে সীমান্ত; অর্থাৎ শেষপ্রান্ত পূর্বদিকে তারপবই যে বস্তী এলাকা বা পুরনো কালের জের আজও দেখতে পাওয়া যায় তাই তখন বেশ জমকালো হয়ে বর্তমান ছিল। এবং পার্ক সার্কাসের আগের কালের বাসিন্দারা তখনকার রাজনৈতিক জোরে জোরালো হয়ে বেশ সগর্বেই নিজেদের জিন্দাবাদ ঘোষণা করত। তাদেব এই এলাকার গা ঘেঁষে এই সভ্য বসতির একখানা বাড়িতে সকল ধর্মেব গোঁড়ামিকে অতিক্রম করে বাস কবতেন নবেশবাবু। নিচের তলায় থাকতেন তিনি এবং একটি বাঙালী খৃশ্চান পরিবার, উপর তলায় থাকতো একজন অ্যাংলো সাহেব এবং অন্যটায় থাকত এই কাদের সাহেব। পার্ক সার্কাসে তখন মুসলমান বিদগ্ধজনদের প্রাধান্য থাকলেও হিন্দু কম ছিল না—খৃশ্চানও ছিল। এছাড়া মাদ্রাজী-পাঞ্জাবী এবং খাস ইংরেজদেরও বসতি ছিল।

উত্তর কলকাতা দক্ষিণ কলকাতার মতো একজাতের পাড়া নয়। পার্ক সার্কাস তখন এখনকার চেয়ে অনেক গুণে বেশি কসমোপলিটন অঞ্চল ছিল। সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা এবং গোঁড়ামি আন্তর্জাতিকতার খোলা অঞ্চলে এসে লজ্জায় মাথা হেঁট কবে থমকে গিয়েছে; অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে এলাকাটায় সীমানার দাগের বাইরে-বাইরে।

কাদের সাহেব বাইরে যেতেন—ওঁদের সুখসুবিধের ভালমন্দের দেখাশুনো করতেন নরেশবাবু।

গোপা তখন বারো-তেরো বছরের। গোপার দিদি—নীপার বয়স তখন ষোল—বড় দাদার বয়স আঠারো, সে স্কুল পার হয়ে কলেজে পড়ত।

জীবনের দিনগুলি যুদ্ধের দুঃসহ বাজারদরের পীড়ন—সাইরেন এবং বোমার দুঃসহ আতঙ্ক এসবগুলি পার করেছিল বলতে হবে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে। রেঙ্গুনে বোমা পড়তে কলকাতা থেকে মানুষেরা যখন পালাল তখনও ভাবেননি বাসা ছেড়ে পালাবার কথা। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে যখন সত্যিই হাতিবাগানে বোমা পড়ল তখনও ছাড়েননি, ছাড়া দূরের কথা, এ বাসা ছেড়ে বা কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না তখন।

বিশেষ করে উত্তর কলকাতা বা কালীঘাট অঞ্চল, যেখানে ওই সব পুরনোকালের বাসিন্দারা আজও তাদের ধর্মের আচার-আচরণ এবং বনেদীয়ানার চালচলন নিয়ে আটঘাট বেঁধে বসে আছে।

* * *

নরেশবাবু উত্তর কলকাতা এবং কালীঘাট কালচার সম্বন্ধে একটু গল্প বলতেন। গোপার সে গল্প আজও মনে আছে। বলতেন—একবার এক রবিবার দিন সন্ধ্যের সময় হঠাৎ একটা বিপদে পড়ে গেলেন! হেসে বলতেন—প্রথম যৌবন, খবর এসেছে স্ত্রী পীড়িত, মন কি আর মানে। বিকেলে টেলিগ্রাম এল—সত্যবতী ইল। তখন ওর বাবা পাটনায় থাকতেন। রাত্রি ন'টায় পাঞ্জাব মেল। হাতে টাকা নেই। ছুটে গেলাম নর্থ ক্যালকাটার এক ধনী বন্ধুর কাছে। টাকা ধার চাই। অন্তত দুশো টাকা। কারণ সত্যবতীর চিকিৎসার জন্যে শ্বশুরমশায় টাকা খরচ করেন এটা আমি চাইনে। তাছাড়া তাঁর অবস্থা বেশ ভাল নয়। ছা-পোষা মানুষ। বড় ডাক্তার দেখাতে পারবেনই বা কোথা থেকে। তখন ফি অবশ্য ষোল টাকা কিন্তু সে ষোল টাকার দাম তখন অনেক। যাকগে। এখন নর্থ ক্যালকাটার ক্যারেকটার আর ট্রাডিশনের কথা বলি। বন্ধু ধনী হলেও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুই-তুকারির বন্ধু। কলেজে আলাপ। কিন্তু যেতেই বললে—তাই তো রে নরেশ, মুস্কিলে ফেললি! দুশো টাকা?

বললাম—তোরা লক্ষপতি—দুশো টাকাতে তোদের মুস্কিল?

সে বললে—জানিস নে রে। বলতে ঠিক পারি নে। রবিবার তো। ক্যাশ-ট্যাশ সব বন্ধ। তবে—।

—কি তবে?

তবে বাড়িতে লোহার সিন্দুকের তহবিল একটা আছে। যেটাতে বংশের কোম্পানির কাগজ আছে। মজুত মোহর আছে, বন্ধক নেওয়া গয়নাগাঁটি আছে অর্থাৎ বংশের যাকে মূলধন বলে তাই আছে তাতে। কিন্তু তার চাবি থাকে মায়ের কাছে। তিনি মালিক।

বললাম—দেখ ভাই, মাকে বলেই দেখ।

বলা হলো। মা বললেন—বাপরে—আজ তো সংক্রান্তি। আর এই ভরসন্ধ্যে—কি করে টাকা দেব! সব্বনাশ।—মা লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় হবেন। আমাকে বললেন নিতান্ত অসহায়ের মতো—কিছু মনে করিসনে বাবা, তুই আমার ছেলের মতো। কিন্তু সিন্দুকের চাবি দেবার সময় শাওড়ী আমাকে এই প্রতিজ্ঞে করিয়েছেন। প্রতিজ্ঞে কি করে ভাঙি, বল, তুই বল?

শেষে সুদ, চড়া সুদেব কথা বললে বন্ধু। আমাকে সে চুপি চুপি বলেই দিলে—দেখ—তুই বল—চড়া সুদ দেব আমি। আর বন্ধক কিছু রাখ। সোনার চেন ঘড়ি আর বোতাম খুলে দে সামনে। তাহলে দেবে। না হলে ভাই, আমার মরা বাবা এলেও ন্যা—হ্যাঁ হবে না।

কি করব? তাই দিলাম এবং তাই বললাম। বললাম—মা—এক কাজ করতে তো পারেন—কিছু বন্ধক রেখে সুদের শর্ত রেখে দিন—। তা হলে তো লক্ষ্মী বিদায় করা হবে না। যেমন বের করবেন তেমনি তো বন্ধকী জিনিস সিন্দুকে ঢুকবে।

তখন বললেন—হ্যাঁ তা হতে পারে। হ্যাঁ, সে নিয়ম আছে, তা আছে। তবে মাসে সুদ শতকরা দেড টাকা আর জিনিস যা রাখবে তার ছাড়াবার মেয়াদ ছ' মাসের।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিলাম বোতাম আর চেন ঘড়ি। বন্ধুর মা বললেন—তা হলে বস। আমি আসছি।

বসে রইলাম। এরপর সে একটা যজ্ঞ বা স্বস্ত্যয়ন কিম্বা পূজা-অর্চনার ব্যাপার। চোখে আমি অবশ্য দেখিনি—তবে কানে শুনেছি।

বন্ধুর মা হাত-পা ধুলেন—কাপড ছেড়ে একখানা দুর্গন্ধযুক্ত খাটো রেশমেব কাপড় পরলেন,—ধূপ ধুনো প্রদীপ জ্বেলে লক্ষ্মীর ঘরে গিয়ে বারকয়েক প্রণাম-ট্রণাম করে—সিন্দুক খুলে—হাত জোড় করে বললেন—মা, শতকরা দেড টাকা সুদে এই সোনার সামগ্রী বন্ধক রেখে তোমা‌র কাছ থেকে ধার নিচ্ছি মা। ছ' মাসের মধ্যে সুদে আসলে তোমায় শোধ করব।

বন্ধুর মায়ের সে গন্ধওয়ালা খাটো পাটের কাপড পরা মূর্তিটি আমার মনে আছে। আমার সোনার দ্রব্যগুলি আর ছাডাতে পারিনি। দুঃখ তাতে নেই। সোনার চেন আর বোতামের জন্যে আক্ষেপ হয় না। আক্ষেপ হয় সেই ঘড়িটার জন্যে। কলেজে ঢুকে প্রাইভেট টিউশনির টাকা থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। অক্ষয় অমর ঘড়ি। জলে ডুবিয়ে রাখলেও থামত না, দরকার হলে ঢেলার মতো ছুঁড়ে আম পাড়াও চলত। সেই ঘড়িটার জন্যে আজ দুঃখ হয়।

কালীঘাট আরও সাংঘাতিক। এখনও পুরনো বাসিন্দেরা কোমরে কাপড় জড়িয়ে—হ্যাঁ-লা, ও-লা বলে ঝগডা করে; 'গাঁয়ে আর মানুষ নেই' বলে আক্ষেপ করে, পুলিশ দারোগার নাক কেটে নিতে চায় বঁটি দিয়ে।

বাপ!

এই পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এসে মনের মতো করে সংসার পেতে নিয়ে—ডিনার

টেবিলে বসে নরেশবাবু এই গল্প করেছিলেন। সেকথা গোপার মনে আছে। সেই তার গল্পটা প্রথম শোনা। এরপর আরও অনেকবারই বলেছেন যখনই কোন কারণে পার্ক সার্কাস থেকে অন্য কোথাও যাবার কথা উঠত তখনই বলতেন। অথবা উত্তর কলকাতা ও কালীঘাট সম্পর্কে কথা উঠত—তখনই বলতেন। ওই গল্প ছাড়া আরও বলতেন—বাপ, উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর জিভ লকলক করছে—দক্ষিণে কালীঘাটে মা কালী খাঁড়া নিয়ে সদাজাগ্রতা—মধ্য কলকাতা আগলে আছেন মা ফিরিঙ্গীকালী। বহু কষ্টে পার্ক সার্কাসে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছি। এখান থেকে যাওয়ার কথা ওঠে না।

আশ্চর্য! আশ্চর্য কি—তা বলতে পারবে না গোপা, হয়তো মানুষের ভাগ্য বলে যে একটি অদৃশ্য শক্তিকে মানুষ হাজার বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও এক একটা সময় স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই ভাগ্যই ওদের আশ্চর্য।

হঠাৎ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট রাত্রিকালে আরম্ভ হলো ডাইরেক্ট অ্যাকশন। রাত্রিটা কাটল কোনরকমে, ১৭ই আগস্ট সকালবেলা থেকে ঘরের দরজা বন্ধ কবে নিদারুণ উৎকণ্ঠার বোঝা মাথায় করে বসে রইল গোটা পরিবারটি। ১৬ই রাত্রে কাদের সাহেব এবং তার ছেলে এসে তাঁদের সাহস দিয়েছিল এবং নিজেরা সত্যসত্যই আন্তরিক চেষ্টাও করেছিল তাঁদের রক্ষা করতে; ১৭ই দিনের বেলাযও চেষ্টা করেছিল তারা, কিন্তু ১৭ই সন্ধ্যার পর তারা এসে বললে—যেকোন রকমে পারেন চলে যান এখান থেকে। আর পারব না ওই গুণ্ডাদের ঠেকাতে। ওরা গুণ্ডা।

বাস, পার্ক সার্কাস ছেড়ে চলে আসতে হলো; সেইদিনই হলো। ইংরেজী মতে ১৮ই—বাংলা মতে ১৭ই শেষ রাত্রে সাড়ে তিনটের সময় জিনিসপত্র সব ফেলে রেখে কোনরকমে এসে উঠেছিল গলিটার পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে খান দশ-বারো বাড়ির পরের একটা বড় বাড়িতে; সে বাড়িতে তখন তাদের মতো পালিয়ে আসা কতকগুলি পরিবারই এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু শুধু বস্তুব মাশুল দিয়েই মাশুল দেওয়ার শেষ হয়নি। জীবনের মাশুলও দিতে হয়েছিল।

বাবা নরেশবাবু গুণ্ডাদের ছোরায় খুন হযেছিল। গোপার দাদা ছোরা খেযেও বেঁচে গিয়েছিল কোনরকমে। তাছাড়া—। আর মাশুল দিতে হযেছিল দিদিকে।

নরেশবাবু আগলে নিয়ে আসছিলেন বড মেযে নীপাকে। বডদা সৌরীন আগলে নিয়ে আসছিল গোপাকে।

ভোর রাত্রি সাডে তিনটে বাজে তখন। রাত্রির বীভৎস উল্লাস তখন ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ হলো ঘুমিয়েছে মনে করেছিল তারা। কিন্তু না; ঘুমোয়নি, লোভে হিংসায গুণ্ডাদের চোখে ঘুম আসেনি; তারা শুধু ঢুলছিল। এরই মধ্যে গোপাদের সন্তর্পিত পদক্ষেপ পথে বেজে উঠতেই তারা জেগে উঠে চোখ চেয়ে দেখেছিল; দেখেছিল—এরা পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কলরব তুলে কুটিল কুৎসিত উল্লাসে তারা ছুটে এসে তাদের আক্রমণ করেছিল।

প্রথমেই ছিল মেয়েরা। নীপা ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল একটা

পাশের গলিতে। তার পিছনে তাকে রক্ষা করতে ছুটেছিলেন নরেশবাবু। এরা ছুটেছিল সোজা সামনে। এরা মানে মা গোপা আর সৌরীন। গুণ্ডারাও দু'ভাগ হয়ে দু'দলের পিছনে ছুটেছিল। শুধু শেষ রাত্রে উঠেছিল কয়েকটা চিৎকার, তার একটা নীপার, একটা নরেশবাবুর! বাকি কদর্য বীভৎস হাসি।

যাক।

নরেশবাবুর মৃতদেহের সৎকার করা সম্ভবপর হয়নি। দিদি নীপাকেও উদ্ধার করা যায়নি। তবে দাদা হাতের বাহুতে একটা ক্ষত নিয়ে এসে হিন্দুদের সেই বড় বাড়িটা পর্যন্ত পৌঁচেছিল এবং সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা পেয়ে বেঁচেছিল। এর বেশি আর কিছু করা যেত কি যেত না সে নিয়ে কোনকালে প্রশ্ন কেউ তুলতে সাহস করেনি।

যেত না।

কারণ পরের দিন সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই গলিটায় হিন্দু নাম যাদের তাদেব আশ্রয়স্থল সেই বড বাড়িটা থেকেও মেয়েছেলে ও আহত অক্ষমদের সরিয়ে দেওযা হয়েছিল। এবং এই সরিযে দেবাব জন্যেও কম কষ্ট করতে হচ্ছিল না। বালিগঞ্জ বা কালীঘাট নয়, উত্তর কলকাতার বাগবাজার-শ্যামবাজার অঞ্চলে।

বাগবাজাব এলাকায় কাঁটাপুকুরে নরেশবাবুর এক খুড়তুতো ভাই থাকতেন। রক্তের সম্পর্ক সত্য হলেও আসল সম্পর্কটা নামেই ছিল। কারণ মানুষ হিসেবে প্রৌঢ় কবিরাজটি ছিল বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তবু তারই নাম-ঠিকানা সেদিন মনে পড়েছিল এবং কোনরকমে এই ঠিকানাতেই এসে উঠেছিল তাবা তিনজন।

গোপা, গোপার দাদা সৌরীন এবং মা। আশ্রয় পেয়েছিল। সন্ধ্যের মুখে গিয়ে কোনরকমে পৌঁচেছিল তারা। বাগবাজার সুরক্ষিত হিন্দু অঞ্চল হলেও সন্ধ্যে হতে হতে আতঙ্ক এবং আশঙ্কা যেন মাটি ভেদ করে শীতকালের বাষ্পপুঞ্জের মতো উঠে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পবিব্যাপ্ত এক-টা কুয়াশার মতো বিস্তৃত হতে চাচ্ছিল। তাঁরমধ্যে তারা নেমে দাঁডাতেই কযেকজনেই হাঁ হাঁ করে উঠে জানতে চেযেছিলেন—কে? কে? কোত্থেকে আসছেন? কি? কি নাম? নরেশ গুপ্ত? পার্ক সার্কাস? কিন্তু দেশ কোথায়? সেনহাটি খুলনে? কি নবেশ মারা গেছে? খুন? ছোরা? কই বউমা? কই?

এরপর খানিকটা কান্না। কিন্তু বাড়ির দরজা খুলে গিয়েছিল সাদর অভ্যর্থনার আহ্বানের সঙ্গে।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা কলকাতায় কারফু জারি হলো।

* * *

কাঁটাপুকুর থেকে এই পুরনো বড় বাড়িটার নিচের তলার সিকিখানা ভাড়া নিয়ে তার মা সংসার পেতেছিল ছ' মাস পর। ১৯৪৭ সালে। কাঁটাপুকুর থেকে বেশি দূর নয়, কাছাকাছি; এবং নিরাপদ বলেই মনে হয়েছিল।

সেদিন হিন্দুদের মধ্যে খারাপ লোক আছে একথা স্বীকার করেও পার্ক সার্কাস এলাকার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ বলে মনে করেছিল।

পার্ক সার্কাসে তাদের গিয়েছিল প্রায় সর্বস্ব। জিনিসপত্র আসবাব ইত্যাদির কিছুই পায়নি একরকম। সে নিয়ে তারা গণ্ডগোল করতেও যায়নি। পাবার মধ্যে পেয়েছিল নরেশবাবুর পরিত্যক্ত কিছু অর্থ। ব্যাঙ্কে মজুদ ছিল হাজার দেড়েক, ইনসিওরেন্সে পাওয়া গিয়েছিল আড়াই হাজার আর আপিসের প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে পেয়েছিল পাঁচ-হাজার সাতশো কত টাকা কত আনা যেন।

এইখানেই গোপার জীবনে অকস্মাৎ এল নাটকীয়তা।

তিন

১৯৪৭ সাল—জুন মাস।

কলকাতার হাওয়া তখন দিক বদল করেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে, স্বাধীন হবার পূর্বে ভাগ হচ্ছে দেশ। বাংলাদেশ কেটে দু'ভাগ হচ্ছে। পূর্ব বাংলা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম বাংলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।

কলকাতা পড়েছে ভারতবর্ষে। হাওয়া ফিরে গেছে খবরটার সঙ্গে সঙ্গে। পার্ক সার্কাসের অনেক মুসলমান ঢাকা বা পূর্ব পাকিস্তানের কোন শহরে চলে যাচ্ছে, বাড়ি ওখানে খালি হচ্ছে। কাদের সাহেব ভাবছেন চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন কি না। তাঁর ভায়রাভাই; বাড়ির মালিক যিনি তিনি চলে যাচ্ছেন ঢাকায়। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন কে তাঁর পার্ক সার্কাসের এই বাড়ির সঙ্গে ঢাকার বাড়ি এবং সম্পত্তির বদল করতে পারে। এরই মধ্যে এই বাড়িখানায় এসে উঠেছিল গোপারা। গোপার জ্যাঠা, কাঁটাপুকুরের কোবরেজ মশাই-ই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, যা ঘটবার ঘটে গেছে। ভাগ্যের একটা ফল আছে। তবে কর্মটা করে যেতে হয় ধর্মের পথে। তাতে হয় এই যাই ঘটুক আপসোস হয় না। নরেশের—। থাক নরেশের কথা। যা হবার হয়ে গেছে। ভুলে যাও সেসব। এখন নতুন করে আরম্ভ কর। কাছেই রইলাম আমি। হ্যাঁ, যা যখন দরকার হবে বলবে।

অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে যা বলা উচিত, যা সকলেই বলে থাকে, সব দেশে বলে থাকে তাই।

১৯৪৭ সালের মাঘ মাসে, ইংরেজী ফেব্রুয়ারিতে বাসা পাতা হয়েছিল; একটা বাংলা 'দ'য়ের আকারের ছোট গলি অর্থাৎ একখানা গাড়ি যায় এমন গলি; তারই প্রায় ভিতরের দিকে বাড়িটা। দাদা সৌরীনের কলেজ ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স; গোপা ওইদিকের একটা স্কুলে পড়ত; এখন ভর্তি হলো উত্তর কলকাতার একটা স্কুলে।

মানুষজনের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা হয়নি, তবে লোক আঙুল দিয়ে দেখাতো তাদের, আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত—ওদের একটা যুবতী মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে। বাপটার পেটটা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ফাঁসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। হঠাৎ তবে তার মধ্যে নাটকীয়তা নেই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট

দেশ স্বাধীন হবে। সেই উপলক্ষে গলিটিতে একটি ভলান্টিয়ার দল তৈরি হবে। এই ভলান্টিয়ার দলের অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়াল তার দাদা সৌরীন। সে কুচকাওয়াজের সঙ্গে পরিচিত; শুধু তাই নয়, পার্ক সার্কাসে সে একটা ব্যান্ড পার্টি তৈরি করেছিল। এখানেও সে সেই ভূমিকা নিযে মাত্র তিন-চারদিনের মধ্যে গোটা পাডাটার মধ্যে একজন মাতব্বর তরুণ হযে গেল।

সৌরীনের পিছনে পিছনে এল গোপা।

সৌরীনের সাদা খদ্দরের ফুল প্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথায় ১৯৪৭-এর আইন মতো গান্ধী টুপি, বুকে পৈতের ঢঙে টকটকে লাল খদ্দবের একটা চওডা ফেটি। গোপার পরনে খদ্দরের লাল পাড শাডি, লাল হাতা খদ্দবের ব্লাউজ আর ঐ পৈতেব ঢঙের ফেটি, রুখু এলানো চুলে একটা লাল রিবন। মেয়েদের দলে সে আগে থাকতো। সেইসময় এলো জ্যোতিপ্রসাদ। জ্যোতিপ্রসাদ থাকত ছেলেদের দলের আগে। সৌরীন জাযগা নিয়েছিল দুই দ,লেব সর্বাগ্রে, সে ছিল ভলান্টিযার দলেব সর্বাধিনাযক।

পাশাপাশি ছেলের আব মেযের সারি।

পাশাপাশি জ্যোতিপ্রসাদ আব গোপা দু'জনে বইছে দুটো তেবঙ্গা ঝাণ্ডা। আরও একটা ঝাণ্ডা ছিল তাদেব ক্লাবেব ঝাণ্ডা। সেটা থাকত ব্যান্ড পার্টিব সামনে।

সামনে দৃষ্টি রেখে মাথা উঁচু কবে মার্চ কবে চলত—লেফট্ বাইট, লেফট্ বাইট, লেফট্ বাইট, লেফট্ বাইট। চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণী তল—অরুণ প্রাতের তরুণ দল—চলরে চল্ চলরে চল্ চল্ চল্ চল্।

আমবা গডিব নূতন কবিয়া ধূলার তাজমহল।

চলরে চল্, চলরে চল্ চল্ চল্ চল্।

কারুর অবসব ছিল না ক ়ার দিকে তাকাবাব। বুকের ভিতব ছিল আশ্চর্য একটা উদ্দীপনা উৎসাহ—সে দিনগুলি ছিল আশ্চর্য দিন।

জুলাই মাসের ১৫ই, ১৬ই থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত একটা মাস সকাল থেকে সেই বাত্রি পর্যন্ত বিবাম ছিল না, বিশ্রাম ছিল না; শুধু মার্চ, লেফট্ বাইট, লেফট্ রাইট।

—রাইট টার্ন—।

—হল্ট।

লেফট্ রাইট, লেফট্ বাইট, লেফ্ট রাইট।

ঊষাব দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব নব প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধাব বিন্ধ্যাচল!
চলরে চল্, চলরে চল্ চল্ চল্ চল্।

কেউ কারুর দিকে তাকায়নি। না। ঠিক হলো না। কতবার তাকিয়েছে কিন্তু সে তাকানো তাকানো নয়! না নয়।

কথাটার মতো সত্য কথা আর হয় না। তাকিয়ে ছিল অনেকবার। হয়তো বা বারবার, এক মিনিট দু' মিনিট অন্তর, কখনো পায়ের দিকে, কখনও হাতের দিকে, কখনও মুখের দিকে, এমন কি চোখে চোখ মিলিয়ে নীরবে কথাও হয়েছে।

এই ঠিকানাতেই এসে উঠেছিল তারা তিনজন।

সৌরীন হুকুম হেঁকেছে মা-র্চ—

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের চোখ দু'জনের দিকে ফিরেছে, মিলেছে, ইশারায় বলেছে চল। পায়ে পা মিলিয়ে চল। কিন্তু তবু একথা সত্য যে কেউ কারুর দিকে তাকায়নি। হয়তো ঠিক হলো না। চোখের দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যে মন অন্যের চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার মনকে খোঁজে সে মনে মনে দেখা তাদের হয়নি। অবসর ছিল না। এতটুকু সচেতনতা ছিল না যে, সে একটি মেয়ে এবং জ্যোতিপ্রসাদ একটি ছেলে। তখনকার দিনে আজকের থেকে অনেক অল্প বযসে বাল্য-কৈশোব কেটে যেতো। ষোল-সতের বছরে বিয়ের বয়সও হয়ে যেতো অনেকের ভাগ্যে। চৌদ্দ বছরের পর আর তখন ফ্রক পরলে বিশ্রী দেখাতো। লোকে ছি ছি করত। নিজেরও মনে হত। আজকাল কুড়ি-বাইশ বছরের মেযের মন সেকালে ষোল-সতেবোতেই পেতো।

ছেলেদের কথা বলতে পারে না—; পাবে নাই বা কেন। নিশ্চয পাবে। ছেলেবা তাই পেত। সেকালেব ষোল বছবের জ্যোতিপ্রসাদ অনাযাসে এ কালেব বাইশ বছরেব পুরুষের দেহমনের পরিপক্কতা দাবি করতে পারত।

তখন তার বযস চৌদ্দ, জ্যোতিব বযস সতেরো। ষোলেব উপব। কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে কোন কথা হযনি, হতে পাযনি।

কালটা যেন সকল কাল থেকে পৃথক, সৃষ্টিছাড়া একটা বিচিত্র কাল ছিল। "পরাধীনতার অবসান হচ্ছে—স্বাধীনতা আসছে।"

১৯৬০ সালের এই বসন্ত রজনীর দ্বিতীয় পাদে তক্তপোশের উপর ভেঙেপড়া গোপা অকস্মাৎ কেমন বিভ্রান্তভাবে বিচিত্র দৃষ্টিতে সামনেব স্যাঁৎসেঁতে ছোপধরা দেওয়ালটার দিকে অর্থহীনভাবে একদৃষ্টে তাকিযে থাকতে থাকতে হাতে ভব দিয়ে উঠে বসেছিল।

—আশ্চর্য। আশ্চর্য একটা কাল। সেই অন্তত কয়েকটা মাস। আশ্চর্য কাল। সকল কালেই কালের প্রভাব আছে। নানাভাবে নানান ভঙ্গিতে আছে। গ্রীষ্মের উত্তাপে বর্ষার বর্ষণে বন্যা-প্লাবনে, শীতের অসাড় পঙ্গু করে দেওয়া শীতে, বসন্ত কালের জীবনোল্লাসে আছে—মানুষের দেহে তার প্রভাব বিস্তার করে। আবার যুগের ভাবে ভাবনায তার প্রভাব আছে। বিয়াল্লিশ সালের পর থেকে ছেচল্লিশ—তাই বা কেন, সাতচল্লিশ পর্যন্ত একটা বিচিত্র কাল গেছে। রাত্রির পর রাত্রি ময়দানে, ম্যাসাজ ক্লিনিকে, এম্পটি হাউসে, পাঞ্জাবীদের ট্যাকসিতে সে একটা নেশার রাজত্ব চলেছে। আরম্ভ হয়েছিল পেটের দায়ে, শেষ হলো সেটা নেশার টানে।

বইয়ে কাগজে পড়েছ সে যে অভাব এর হেতু। অবিশ্বাসের কিছু নেই। মূল

হেতুটা তাই। কিন্তু পরে তাতে যে ফুল ফুটেছে ফল ধরেছে তার মহুয়া ফুল ও ফলের মতো—তা থেকে চোলাই করে মদ হচ্ছে।

হরিহরছত্রের মেলার কথা তার মনে পড়ছে। রাস পূর্ণিমায়, হরিহরনাথের মাথায় গঙ্গাজল ঢালবার জন্য মানুষেরা ছুটে যেত। মানুষ যেত বলে দোকান যেত। মানুষ আর দোকান মিলে মেলা হলো। মেলা যখন হলো তখন হরিহরনাথের মাথায় জল ঢালার লক্ষ্য চাপা পড়ে গেল—হাতি-ঘোড়া, উট-গরু বিক্রির কারবারের আড়ালে। রাত্রিকালেও হরিহরনাথের রাজত্ব বজায় রইল না। সেখানে স্বাভাবিকভাবে এসে বসল বাঈজীদের তাঁবু; ইলেকট্রিক আলোর সমারোহের মধ্যে ম্যাজিক, সার্কাস, নাগোরদোলা, মদের দোকান, রেস্তোরাঁ, খাবার দোকান, বিশ্রামকুঞ্জ।

যুদ্ধের বাজারে ময়দানের মেলার বিকিকিনির মতো হাওয়া যখন বিয়াল্লিশের সাইক্লোনের—মাঠের ফসল গাছের ফল বসতি ঘরবাড়ি বিপর্যস্ত করে দেওয়ার মতো সমস্ত কিছুকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। যখন কোন কিছুরই মূল্য আর ছিল না—তখনই আরম্ভ হয়েছিল ছেচল্লিশের দাঙ্গা।

বাবা খুন হয়েছিল। দিদিকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল।

না। আজ আর সত্য কথাকে গোপন করবে না গোপা। কি লাভ? স্বীকারই করবে। তার দিদি 'নীপা'কে কেড়ে নিয়ে যাওযাটা আধা সত্য। সে ইচ্ছে করেই গেছে। নীপাই এ ইশারা দিয়েছিল—কাদের সাহেবের ভায়রাভাই বাড়িওলা কাসেম আলির ছেলে ওসমানকে।

ওসমানের সঙ্গে নীপার পরিচয় গাঢ় থেকে গাঢতর হয়ে উঠেছিল নানান বিচিত্র পথে। দুটো নদী পাশাপাশি বইবার সুযোগ পেলে মাঝখানে কোন উঁচু বাঁধ কি পাড়ের বাঁধ না থাকলে—কিছু দূর এগিয়ে মিলবেই। আবার নিচু জমির দেশ পেলে একটা নদী পাঁচটা-দশটা ফ্যাকরা মেলে আরও নিচুর দিকে ছুটবেই।

তাদের বাড়ির ধারা-ধরন ছিল প্রশস্ত সমতলের মতো। কোন বাধা বা বাঁধ ছিল না জীবনের স্রোতকে বেঁধে চালাবার জন্য। আবহাওযা ছিল আকাশলোকের আবহাওয়া। মর্ত্যলোকের ধূলি সেখান পর্যন্ত পৌঁছুতো না। জাত-বিচারের বা ধর্মগত আচার-আচরণের ক্ষুদ্রতা ও তীব্রতা তাকে সংকীর্ণ বা ঝাঁঝালো করে তুলতে পারেনি। তার উপর এক কম্পাউন্ডের মধ্যে দু'খানা বাড়ি। এ-বাড়ির কুকুর মুরগী ও বাড়ির কুকুর মুরগীর সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল প্রথম। তারপর মানুষেরা। বাবার সঙ্গে কাদের সাহেবের ভাযরাভাই কাসেম আলি। ওদের মেয়ে জুলি (জুলেখা) ছিল—নীপা এবং গোপার মাঝের বয়সী, সুতরাং দু'জনের বন্ধু। খৃশ্চান নিখিল বিশ্বাসদের বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও তাদের বন্ধু ছিল। মণিকা পড়ত তার সঙ্গে। কালটা ছিল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল। সম্পন্ন ঘবের রূপবান ছেলে ছিল ওসমান আলি। ব্যবসা করত; তখনকার দিনের একটা রাজনৈতিক দলের পাণ্ডাও ছিল কাসেম আলি, এবং ছেলে ওসমান কতকটা সেই উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ে উঠেছিল ছোটখাটো একটি যুবক দলের নেতা; ওসমান আলির ভলান্টিয়ার কোর ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল বস্তীর বাসিন্দা।

ভলান্টিয়ার ছাড়া সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল ওসমানের। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হত সেখানে। ওসমান আলির আরও অনেক কিছু ছিল—সারা যুদ্ধের কালটা জুড়ে ছিল এ. আর. পি-র একজন হোমরা-চোমরা ওয়ার্ডেন; সাইডকারওলা একটা মোটর সাইকেল ছিল—তার উপর চড়ে ঘুরে বেড়াতো। সে সাইডকারে জুলি চড়ত, তার সঙ্গে ওসমানের মেসো কাদের সাহেবের ছেলে-মেয়েরা—ছেলে রহমান, মেয়ে জুবিদা, রাবেয়া এরাও চড়ত। তাদের সঙ্গে সময়ে সময়ে নীপা-গোপাও চড়েছে। এছাড়া আরও একটা উপলক্ষে নীপা-গোপা চডত সাইডকারে।

ওদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নীপা গান গেয়ে এবং গোপা আবৃত্তি করে প্রাইজ পেয়েছিল। তারপর থেকে ফাংশন হলেই ওপ্‌নিং সং গাইবার জন্য ওসমান এই সাইড্‌কারে বসিয়ে নীপাকে নিয়ে যেত, সঙ্গে যেত গোপা। সুতরাং এমন একটি সম্পন্ন অবস্থার রূপবান তরুণের সঙ্গে একটি সতের বছরের মেয়ের বাধা কোথায়? অস্বাভাবিকই বা কিসে?

মনের দাবি থেকেও কালের দাবিই ছিল বড। একালের দাবিটাই ছিল—মিলনের দাবি যদি মন থেকে ওঠে তা হলে সমাজের দাবি জাতের দাবি ধনসম্পদের দাবি কোন দাবিই চলবে না। কিন্তু তবু দাবিটা শ্লোগান হয়েই থেকে গিযেছিল—সমাজ জীবনে জাতীয জীবনে আইন হয়ে পাশ হযনি। সেই কারণেই এই অনুরাগের কথাটা গোপন থেকে গিযেছিল; ওসমান বা নীপা কেউই প্রকাশ করতে পারেনি। তবে ওসমান দু'-চারবার নীপাকে বলেছিল—একদিন চল না দু'জনে চলে যাই কলকাতা থেকে। সেখানে গিয়ে বিয়ে করে ফিরে এলে বাস্ সব ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু নীপা তা সাহস করেনি। হ্যাঁ বলেনি। না-ও ঠিক বলেনি, নিরুত্তর থেকেছে। হঠাৎ বাধল দাঙ্গা। এবং ১৭ই তাবিখে সন্ধ্যার সময় সব ফেলে পালানো ছাড়া যখন উপায় রইল না, তখন কাদের সাহেব নিজে এসে নবেশবাবুকে বললেন—দাদা—আর এ বাড়িতে থাকবেন না। আপনি ছেলেমেযে নিযে চলে যান। ওই বড় রাস্তার উপর চ্যাটার্জীদের বড বাড়িখানায় হিন্দুরা একটা ঘাঁটি করে রয়েছে; এখান-ওখান থেকে পালিয়ে আসছে ওখানে; ওখানেই যান আপনি। নইলে বিপদ হবে। এ বাড়ির পর আর হিন্দু বাড়ি নেই—তাছাডা বস্তীর গুণ্ডাদের নিয়ে ওসমানের ভাবগতিক ভাল লাগছে না। আপনি চলে যান।

সেদিন জীবনের সবটুকু সাহস ছিল কাদের সাহেবের প্রীতি এবং মনুষ্যত্বকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে। কাদের সাহেব অপ্রীতিকে প্রশ্রয় দেননি, মনুষ্যত্বকেও হারাননি; হারিয়েছিলেন নিজের সাহস। সঙ্গে তাঁদের গোটা বাড়িটার সকলের সাহস ভেঙে পড়ল।

কাদের সাহেব নিজে দাঁডিযে থেকে তাঁদের বাড়ি থেকে বের করে পথে এগিযে দিচ্ছিলেন।—চলে যান। আমরা রয়েছি পিছন আগলে। যান।

গোপার মনে পড়ছে। গোপা তখন সব ভুলে গিয়ে আতঙ্কবিহ্বল এক বিচিত্র দেহমন নিয়ে সামনের দিকে টলতে টলতে এগিযে চলছিল। হাত পঞ্চাশেক জনশূন্য একটা

পথের অংশ। পঞ্চাশ হাত দূরে হিন্দুদের সেই বাড়িটার ফটক—সেখানে কতকগুলি ছেলে দাঁড়িয়েছিল। ওরা চলছিল যথাসাধ্য দ্রুতপদে। কিন্তু পা ঠিক দ্রুত চলছিল না। কারণ সর্বাঙ্গে একটা কম্পন অনুভব করছিল।

বাবা চলছিলেন নীপার সঙ্গে। নীপার প্রতি একটা অদৃশ্য দৃষ্টি যে নিবদ্ধ হয়েছে সেকথা তারা অনুভব করছিল, সেটা আর গোপন ছিল না।

হাত বিশেক এগিয়েছিল তারা। পিছনে কাদের সাহেব এবং তাদের বাড়ির অন্যেরা অর্থাৎ খৃশ্চান পরিবারের ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে ছিলেন। পিছন থেকে কেউ ছুটে এলে বাধা দেবেন এ সংকল্পও তাঁদের ছিল। সেদিক থেকে কোন গুণ্ডাও আসেনি। এল, ওই হাত বিশেক পর ডান-হাতি যে একটা গলি বেরিয়ে গেছে উত্তর মুখে, সেই গলি থেকে। গলি থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল চারপাঁচ জনের একটি দল। সকলের সামনে ওসমান।

ওসমানকে দেখে নীপা থমকে দাঁড়াল।

ওসমান ডাকলে—নীপা!

মুহূর্তে কি হয়ে গেল নীপার। সে ডান দিকের গলির দিকে মোড় ফিবে ছুটল। বাবা ছিল খুব কাছে—বাবা খপ্ করে হাত চেপে ধরলে—চিৎকার করে বললে—নীপা।

নীপা নিজে হাতখানা সজোবে টেনে ছাড়িয়ে নিতে চাইলে এবং বাবার থেকেও জোরে চিৎকার করে উঠল—না।

বাবা আর একবার চিৎকার করেছিল—নীপা—

সঙ্গে সঙ্গে কে যে ছুটে এসে তাঁর পেটে ছোরা মেবে গোটা পেটটাকে ছিঁড়ে দিলে তা দেখেনি গোপা। কিন্তু বাবা পড়ে গিয়েছিল। দাদা ছুটেছিল সাহায্য করতে। ওদিকে ঐ সামনের বাড়িটা থেকে জনয়েক অসম সাহসী ছেলে ছুটে এসেছিল। তারপর একটা গোলমাল। সব যেন একটা দুর্বোধ্যতার মধ্যে হিজিবিজি হয়ে একাকার হয়ে গেছে তবে সে এইটুকু বলতে পারে যে, ওসমান তাকে কেড়ে নিয়ে যায়নি। নীপা নিজে ছুটে চলে গিয়েছিল। ওসমান যে তাদের বাবাকে ছুরি মেরেছে,—অন্তত, তারই হুকুমে এটা হয়েছে তাতে কোন ভুল নেই কিন্তু নীপাকে কেউ জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়নি। নীপা নিজে ছুটে গিয়েছিল।

নীপা তার কামনার আকর্ষণে ছুটে চলে গিয়েছিল। নীপা আজও বেঁচে আছে।

গোপা নীপার কাছে, জুলির কাছে, রাবেয়ার কাছে জীবনের অনেক কথা শিখেছিল তখন। তবে নিজের সর্বাঙ্গ জুড়ে বর্ষার জলে ভরে ওঠা নদীর মতো যে দেহ ভরে ওঠার একটা পালা শুরু হয়েছিল—তব বিস্ময়, আর আবেগও তার কাছে অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত ছিল না। ববং পার্ক সার্কাসে থাকতে এসব বিষয়ে যেন সচেতনতা একটু তীব্রই ছিল। কিন্তু সব যেন কেমন অদল-বদল হয়ে গেল। উল্টেপাল্টে গেল।

তারপরই এল ১৯৪৭ সালের সেই বিচিত্র কাল। অশ্বমেধের একটি জয়পতাকা আঁকা একটি কাল।

সেই কালে সে জ্যোতির সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনে পতাকাবাহী হয়ে মার্চ

করেছে; সেই মার্চের প্রয়োজনে বারবার পরস্পরের দিকে তাকিয়েছে; চোখে চোখে কথা বলেছে।

—কি? পা বাড়াব এবার?

—বাড়াবে কি? বাড়াও! আমি এই বাড়াচ্ছি—লেফট্।

—চল। রাইট।

তাহলে জ্যোতির সঙ্গে সত্যিকারের দেখা কবে হয়েছিল? অনেক পরে।

১৯৪৭ থেকে ৪৮।৪৯।৫০।৫১ সাল চার বছর পর। চৌদ্দ আর চার আঠারো হয়েছে তখন তার বয়স। কৈশোর তখন শেষ হয়ে গেছে, হ্যাঁ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে—পাশ করেছে। যৌবন তার জীবনে তখন কচি সতেজ চারা গাছের মতো সোজা হয়ে মাথা তুলে উঠেছে, কিন্তু ফুল ফোটার সময় তখনও আসেনি।

গোপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু হাসলেও; একটুকরো বিষণ্ন ম্লান হাসি; বর্ষার সময় অমাবস্যার পর দ্বিতীয়া কি তৃতীযার বাঁকা চন্দ্রলেখার মতো।

পৃথিবীতে কিশোরী বয়স থেকেই মেয়েদের দেহে শিহরন জাগবার আগে থেকেই মনে শিহরন জাগে; জাগে নয় জাগায়। জন্তুদের এ অকাল জাগরণ হয় কি-না সে তা ঠিক বলতে পারবে না তবে সে মানুষের মেয়েমানুষী সে বলতে পারে মানুষীদের মনের মধ্যে এই অকাল শিহরন মানুষেরা ব্যবস্থা করে জাগিয়ে দেয়। ছবিতে গল্পে গানে—অল্প বয়সী বেশি বয়সী পুরুষদের ইশারায়, ছুঁড়ে মারা কথায়, হাসিতে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেয়।

কলকাতা শহর। ১৯৪৮।৪৯ সাল। দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মধ্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ করলে যেসব তরুণ বীর, তাদের একটা দল বীরত্বের দাবিতে সংকটত্রাতা হিসেবে, কৈশোরের সদ্য উপনীতা থেকে যুবতী পর্যন্ত মেয়েদের কাছে বরমাল্য দাবি করছে তখন। বরণ না করলে হরণ করতেও তারা পিছু হটতে চায় না।

মেয়েরা পথে বের হলে শিস্ চিরকাল পড়ে—-আগেরকালে পড়ত একালেও পড়ে; ১৯৪৭-৪৮ সালে সিটি পড়ত। একটা সিটি এখানে পড়লে মোড় পর্যন্ত চার-পাঁচটা সিটি বেজে উঠত। মধ্যে মধ্যে পানের দোকান, গলির মোড় থেকে কথা ভেসে আসত। পাশ দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে আগন্তুক সুন্দরেরা বিদ্যাদের সঙ্গ-সুখ কামনা জানিয়ে কটাক্ষ হেনে চলে যেত।

শুধু এখানেই শেষ নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যেই তারা গা টিপে হেসে-হেসে কতজনের কত অনুরাগ তার পায়ের তলায় ঢেলে দিয়েছে সেকথা বর্ণনা করেছে। নারীদেহের এবং নারীজীবনের যে রহস্যগুলি সমাজ ও সভ্যতার গোপনতার গভীর কূপের মধ্যে সোনার কৌটায় ভোমরার মতো লুকিয়ে রাখা আছে সেসবও তার তখন জানা হয়েছে, সেসব প্রত্যক্ষভাবে না দেখলেও শুনেছে।

শুধু তাই বা কেন?

পনের-ষোল বছরে সে যখন ক্লাস টেনে উঠেছে, যখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে এবং নিজের দেহের পরিবর্তনে অপরূপত্বে এবং কোমল মাধুর্যে নিজেই নিজের প্রেমে পড়েছে, তখন পথেঘাটে কত অপরিচিত তরুণকে তার ভাল লেগেছে, অপাঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে—সে কথা তো সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভাসা জলের মতো সে এসেছে চলে গেছে এইমাত্র—জীবনের মোড়কে সে ফেরাতে পারেনি। সিনেমাতে নায়কদের এবং তারা ছাডা নায়িকাদের প্রেমই যেন তখন গাঢ়তর ছিল। স্কুলে ইতিহাস-দিদিমণির মুখের দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। বান্ধবীদের বাডি গিয়ে তাদের দাদাদের দেখে লজ্জিত হত—আবার সুযোগমতো তাকিয়ে দেখত।

এ-সবই সত্যি। এতটুকু সে অস্বীকার করছে না। তবু সে বলবে না যে—এতদিন পর্যন্ত তার জীবনে কৈশোরেব ফসল উঠে যৌবনের বীজ উপ্ত হয়নি। ভূমি প্রস্তুতই ছিল, হয়তো বা বীজও ছডানো হয়েই ছিল, তবুও বলবে যে বীজ তখনও উপ্ত হয়নি।

৪৮।৪৯।৫০ তিনটে বছর চলে গেল। সে দেহে বাডল—দেহ ভেঙেচুরে নতুন করে গডে উঠল, চুলগুলি অকস্মাৎ যেন রাশি রাশি হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, সে অনেক বই পডলে,—লুকিযে লুকিয়ে সিনেমায ছবি দেখলে—তারপর পরীক্ষা দিলে—ম্যাট্রিক পাশ করলে। রেজাল্ট বের হলো। সে সেদিন ছুটতে গিয়ে সংকুচিত হলো। স্বচ্ছন্দে লজ্জাব ধার না-ধেরে সে ছুটতে যেন পারলে না, মুখখানা হেঁট হয়ে পডল আপনা থেকে। তবুও সে ছুটল, ছুটে সারা দেহকে আন্দোলিত করে আনন্দকে প্রকাশ না করে সে পারছে না। অল্প অল্প দৌডেব ভঙ্গিতে—ছুটে ছুটে সে প্রণাম করে করে ফিরলে। তারপর কলেজে ভর্তি হলো।

এবার ট্রামে-বাসে যাওয়া-আসা। মেয়ে-পুরুষের ভিডেব মধ্যে ঠেলাঠেলি করে স্থান কবে নেওয়া। এরমধ্যে বর্বরতা আছে, কুৎসিতপনা আছে, আবার সে সব কিছুকে হার মানিয়ে নিজের ঠাঁই করে নেওয়াও আছে।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর কলেজ।

বৃহত্তর জীবন জগৎ। সেখানে জোর করে জায়গা করে নিতে হয়। মেয়ে বলে কেউ সহজে সেখানে স্থান দেয় না। বুকের ভিতর যেন যৌবনের বীজ ফাটছে। অন্যদিকে মনের উপর একটা ভার বোঝা চাপছে।

ভবিষ্যতের কল্পনার ভার বোঝা। তার মধ্যে আদর্শ আছে আবার সাধ আছে আহ্লাদ আছে। আরও অনেক কিছু আছে।

কলেজের সিঁডির পাশে দেওয়ালের অসংখ্য পোস্টার। ইউনিয়নের ইলেকশনের যুদ্ধে মতবাদের অজস্রতা। আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে অশ্লীল কথা। মেয়েরাই লিখত। ওই কথাগুলোকে খুঁজে খুঁজে ফিরত তার দু' চোখের দৃষ্টি। শুধু তার কেন? সব মেয়ের। নতুন মেয়েদের চোখ যেন বেশি বেশি খুঁজত।

হঠাৎ একদিন যৌবন যেন জাগল। এবং বিচিত্রভাবে ওই জ্যোতিপ্রসাদের সঙ্গেই সেই 'লগ্নের' মতো আশ্চর্য ক্ষণটিতে দেখা হয়ে গেল।

* * *

সেদিন রাত্রে দাদা সৌরীন বাড়ি ফিরল না। একসময় রাত্রি তখন অনেক; মা তাকে ডাকলে—গোপা! গোপা!—গোপা সেসময় স্বপ্ন দেখছিল। আজও তার স্পষ্ট মনে আছে সে স্বপ্ন দেখছিল। কি স্বপ্ন দেখছিল তাও মনে আছে। তাদের মামার বাড়ির সম্পর্কের বিমল সেন বিলেত গেছে ইঞ্জিনীয়ারিং পডতে; তার মা তাদের বাড়ি গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে গোপার বিয়ের কথা বলে এসেছিলেন সাহস করে। সে স্বপ্ন দেখছিল—সেই বিয়েব কথা হচ্ছে। সে পাশের-ঘরে দোরের পাশে আড়াল দিয়ে কথাগুলি শুনছে। বুকখানা স্বপ্নের মধ্যে ঢিব ঢিব করছিল তার।

এরই মধ্যে মনে হলো—ও ঘর থেকে—কথা বলতে বলতেই মা তাকে ডাকছে—গোপা! গোপা!

স্বপ্নের মধ্যে এই শিল্প কুশলতাটুকু বিচিত্রভাবে আছে। বাস্তবকেও সে স্বপ্নের মধ্যে খাপিয়ে নেয়। ডাকটা যখন ঘুমের স্তরকে ভেদ করে চেতনাকে নাড়া দিল তখনও স্বপ্ন রচনা করছে যে-মন সে-মন এটাকে, ওই ঘবে বসে মা ডাকছে,—এইভাবে ছাপিয়ে নিয়েছিল।

তারপর একসময পূর্ণ চেতনায় জেগে উঠে সাড়া দিলে—মা!

মা বললে—একবার ওঠ তো।

উঠে বসে সে।—কি মা?

—সৌবীন তো এখনও ফিরল না রে। একটা বাজে যে।

—দাদা আসেনি?

—না।

—তাহলে ফিববে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। একে তো সকালে ফেরা তার অভ্যাস নেই। তার উপর আজ আবার তার কোথায যেন নেমন্তন্ন আছে। বেশ সেজেগুজে বেরিয়ে গেছে। সে একেবারে স্নো সেন্ট মেখে।

—কই আমাকে তো কিছু বলেনি।

—দেখা হযনি তাই বলেনি।

মা চুপ করে রইল।

গোপা বলেছিল—শোও। আসবে'খন। তোমার ছেলে সৌরীন ছেলেটি সোজা ছেলে নয়; সেই অনেকের জন্যে ভাবে; তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

বলে সে আবার শুয়ে পড়েছিল এবং সেই অসমাপ্ত স্বপ্নটিকে কল্পনায় জাগ্রত স্বপ্নে রূপ দেবার জন্য একাগ্র হয়ে চোখ বন্ধ করেছিল।

মা ডাকছিল—গোপা! গোপা!

সে জিভ কেটে পা টিপে টিপে পিছিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে উত্তর দিয়েছিল—যাই মা।

তারপর আঁচলে মুখখানা মুছে নিয়ে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—ডাকছ?

—এই এই গোপা। আজ ঠিক চিনতে পারবেন না। বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রণাম কর—

এরই মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—কিন্তু স্বপ্নটা আর দেখেনি।

আবার মা ডাকলে—গোপা! গোপা!

বিরক্তিভরেই গোপা উঠে বসে বলেছিল—কি হলো আবার?

—সৌবীন তো এল না এখনও। তিনটে বাজল যে?

—তাহলে?

—সেই তো ভাবছি।

একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে বললে—এত ভাবছ কেন? হয়তো নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে আটকে গেছে। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে, বেশ খানিকটা দূর পথ—আটকে গেছে। হয়তো তাদের বাড়িতেই আছে কিংবা কোন বন্ধুটন্ধুর বাড়িতে রাত্রিটা থাকবে—আসবে কাল সকালে।

—কি জানি! আমাব যেন কেমন—

—কি? কেমন আবার কি?

—ভাল লাগছে না।

তারপর আপন মনেই বকতে শুরু করেছিল—আমার যেমন কপাল!

একটু চুপ করে থেকে আবার একটা টুকরো কথা সেই স্তব্ধ রাত্রে মায়ের বুক থেকে বেরিয়ে এসেছিল—নীপার ওই হলো। উনি—।

থেমে গেল মা। শুধু একটা গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল অন্ধকারের মধ্যে। আগে হলে হয়তো মা কাঁদত। এখন আর কাঁদে না। পুরনো ক্ষতের উপর শক্ত হয়ে মাংস জমার মতো যেন কড়া পড়েছে। কান্না এখন আর আসে না।

আবার একটু পর, তন্দ্রা তখন খানিকটা যেন গরম দুধের উপর পাতলা সরের মতো জমে এসেছে, ছোট্ট একটি ঢেলার মতো চাল থেকে কি ছাদ থেকে খসে পড়া কিছুর মতো টুপ করে পড়ল তার সেই তন্দ্রার উপর এবং তন্দ্রার আস্তরণটিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলে।

যা হয়েছিল—তা হয়েছিল—সয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে নতুন করে ঘর পাতলাম। সৌরীন পড়বে—পড়াশুনা করে মানুষের মতো মানুষ হবে—কত আশা যে করেছিলাম—গোপার বিয়ে দেব, সৌরীনের বিয়ে দেব—

আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মা।

এবার কান্না পেয়েছিল গোপার।

চার

মা এরকম করে বিলাপ করে কাঁদত মধ্যে-মাঝে। প্রথমটা ঘন ঘন, তারপর নেহাত কম হলেও সপ্তাহে একদিন দু'দিন, ক্রমে সেও কমে এসে মাসে দু'দিন তিন দিনে দাঁড়িয়েছিল।

নিদারুণ আঘাত এবং প্রতিকারহীন দুঃখের মধ্যে এসে সংসার পেতেছিল নতুন করে। নরেশ গুপ্তের অতি যত্নে গড়ে তোলা সংসারের রীতি-নীতি চাল-চলন ধারা-ধরন সব কিছুর বিপরীত বলতে পারা যায়—সে সমস্তকে আগাগোড়া ভুল স্বীকার করে নিয়ে সংসার পেতেছিল।

দু'খানা ঘরের সংসার। পুরনো আমলের বাড়ি। আসবাবপত্র নেই, খাট না—চেয়ার-টেবিল না—টিপয় না, সাদামাটা সস্তা জারুল কাঠের তক্তাপোশ দিয়ে সংসার পাতা হয়েছিল প্রথম।

নরেশবাবুর পরিত্যক্ত কয়েক হাজার টাকা মাত্র সম্বল। তাতে সৌরীন তখন সবে আই-এ পড়ছে, গোপা পড়ছে স্কুলে। ওদের পড়াতে হবে—তারপর গোপার বিয়ে আছে।

১৯৪৭।৪৮ সাল—তখনও মেয়েদের জীবনে বিয়ে ছাড়া আব কিছু ভাবা যায় না। ভাবতে গেলে তখনও দৈববাণীর মতো কোন বাণী মানসলোকে ধ্বনিত—চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হোক বা না হোক—মেয়ের নারীত্বের লাঞ্ছনার আর শেষ থাকবে না।

গোপা তখন চৌদ্দ বছরের—তখন থেকে গোপা বিযেব কথা ভাবত। কল্পনা করত। এ কল্পনা সে পার্ক সার্কাসে থাকতে করত না। মধ্যে মধ্যে পাড়ায় কোন বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হলে নেমন্তন্নের জন্যে মন লালায়িত হত।

সেটা অবশ্যই পোলাও লুচি চপ কাটলেটের জন্য ঠিক নয়। একটা কারণ ছিল, খুব ভালভাবে সাজবাব সুযোগ পাবে। আর একটা কারণ ওই বরটিকে দেখবে। দেখে কি হত বা হতে পারতো এ ঠিক গোপা বুঝত না—আজও বোঝে না—তবে এটা ঠিক যে ওই বরটি যদি তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতো তবে তার খুব ভাল লাগত।

থাক।

মা এইভাবে থাক বলেই এসব কল্পনায ছেদ টেনে দিত। মনে পড়িয়ে দিত—তার বিয়ে হওয়া এত সহজ নয়। তার বাবা খুন হয়েছে। তাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই। তার দিদি—। সত্য কথাটা বলা দূরের কথা ভাবতেও পারত না। ভাবত—ওসমানই তাকে ধরে নিযে গেছে। আজ তারা নিতান্ত গরীব। কোনরকমে সংসার চালিয়ে চলেছেন তার মা।

সে মানত। কিন্তু তার দাদা মানত না। জীবনের এই পরিবর্তনটাকে সহজে স্বীকার করতে সৌরীন পাবেনি। দুই বোনের মধ্যে একমাত্র ছেলে বলে তার আদর ছিল বেশি এবং তার দিক থেকে আবদারও ছিল তার থেকেও বেশি। নরেশ গুপ্ত তাঁর

জীবনের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলতে, সমাজ ও মানুষের কাছে তুলে ধরতে সচেতনভাবে সচেষ্ট ছিলেন বলে ছেলে-মেয়ের পোশাক-পরিচ্ছদে, খেলায়-ধূলায়, পড়ায়-শোনায় খরচ কিছু বেশিই করতেন। এই নিদারুণ পরিবর্তনের পর গোপা হয়তো মেয়ে বলেই কোনরকমে এটাকে সংযত করতে পেরেছিল, কিন্তু সৌরীন পারেনি।

সে আবৃত্তি করত ভাল, খেলাধূলায় ছিল ভাল এবং স্থানীয় যে কোন আন্দোলন বা কাজকর্মে একটি অনায়াস সহজ ছন্দে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটি অংশ গ্রহণ করত। এই নতুন পাডায এসে সে সেই পারঙ্গমতার জোরেই স্থানীয় ক্লাবটির ব্যান্ড ও ভলেন্টিয়ার পার্টির ও-সি বা অফিসার কমান্ডিং হতে পেরেছিল। এবং তারপর অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে সেদিন—১৯৫১ সালের ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত এ পাডায তরুণ দলের অগ্রণীই হযে ওঠেনি, মোটামুটি উত্তর কলকাতার একজন নামকরা ইয়ংম্যান হয়ে দাঁড়িযেছিল। জীবনে পলিটিকস্‌টাকে বেশ ধাতস্থ কবে নিতে পারেনি—পারলে একজন লীডার হয়ে যেত। তবে পলিটিকস্‌ বাদ দিয়ে খেলায-ধূলায় অভিনয়ে আবৃত্তিতে সাহিত্যের সমাবোহে উত্তর কলকাতায় সে নিজেকেই নিজে রইস আদমী বলে অভিহিত কবত। ব্যাডমিন্টনে ওস্তাদ খেলোয়াড ছিল, ফুটবল মন্দ খেলত না—এ ডিভিশন লীগেও বছব দুই খেলেছিল, উত্তব কলকাতা রবীন্দ্র জয়ন্তীর ও নজরুল জয়ন্তীব সে ছিল প্রধান উদ্যোক্তা। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় জিতে আনা কাপের সারি সাজানো রয়েছে ভাঙা কাঁচের আলমারিটায। লেখাপডাতেই গণ্ডগোল। তাও অবশ্য খুব বেশি নয। গত বছর বি-এ পাশ করেছে পাশ কোর্সে; এখন ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে, নামটা আছে, অন্যদিকে চাকরির চেষ্টা করছে, আর একদিকে তার প্রতিষ্ঠার জগৎ—তাই নিয়ে সে মত্ত হয়ে বয়েছে।

মাযেব দুঃখ সে ঠিক বোঝে না—মাযের এই দুঃখ। মায়ের দুঃখ তাঁর অভিযোগ—নবেশ গুপ্তের ছেলে নরেশ গুপ্তের মতো হলো না।

না—তাঁব সেই সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ সুন্দব মন ও চরিত্র,—না তাঁব মতো সেই সম্মানজনক একটি চাকরি, না—তাঁর মতো মান-সম্মান কিছুই হলো না।

গোপা মধ্যে মধ্যে বলত—মা, দাদার সেই বযস হোক—এখন থেকে এমন কথা বলছ কেন ?

মা বলত—গাছ কেমন হবে সে চারার বাডের রকম দেখলেই বোঝা যায, নদী যখন বের হয তখন সেটা নদী থাকে না—তখন সেটা একটা নালা। তবে সেই নালায় জলের তোড দেখে আব যে অঞ্চলে মাটিব ঢাল—সেই অঞ্চল দেখে দিব্যি বোঝা যায নদীটা কত বড হবে। গাঙে পডবে না বিলে খালে গিয়ে মরবে।

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কপালে হাত দিয়ে বলতো—আমার কপাল।

সৌরীন এসব শুনেও কানে তুলত না। আপনার কাজকর্ম—অর্থাৎ যা-নিয়ে সে দিন কাটায তাই নিয়ে এমনি মত্ত থাকত যে তাকে প্রকৃষ্টরূপে মত্ত অর্থাৎ প্রমত্ত ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এবং যে মানুষ প্রমত্ত হয়ে নাচে তার নাচের তাল

যেমন ভূমিকম্পেও কাটে না বা বন্ধ হয় না তেমনিভাবে মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস, সংসারের অবস্থার বিশীর্ণতা কোনটাই সৌরীনের গতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারত না।

সম্প্রতি কিছুদিন, এই মাস দুইয়েক থেকে সৌরীন যেন বড় বেশি ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে: ঘরদোর মা বোন সবকিছুকে চোখের সামনে রেখেও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতে বসেছে। দু'-তিনদিন ধরে একটু ঝগড়াও চলছিল বাড়িতে।

অর্থাৎ মা এবং সৌরীনের মধ্যে।

গোপা তার মধ্যে পড়ে দু'দিক থেকে মার খাচ্ছে এবং মার খাচ্ছে সে মুখ বুজে। মুখ খুলবার তার উপায় নেই। কারণ পৈত্রিক টাকা।

নরেশবাবু যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন—তার পরিমাণ বেশি ছিল না; হাজার দশেক। তার সঙ্গে নিজেদের গহনা যে-ক'খানা গোপার এবং তার মায়ের গায়ে ছিল—সেইসব বিক্রিটিক্রি করে মোট দাঁড় করানো হয়েছিল বার হাজারে। টাকাটার মধ্যে ছ' হাজার অর্থাৎ অর্ধেক ফিকসড্ ডিপোজিটে আবদ্ধ রেখে—বাকিটা পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে রেখে নতুন সংসারের পত্তন হয়েছিল। এর ওপর দুটি বাড়িতে দু'বেলা দুটি করে চারটি ছেলে পড়িয়ে মা পেত তিরিশ টাকা আর সৌরীন নানান রকমের কর্ম—সে রবীন্দ্র জয়ন্তী থেকে সার্বজনীন পূজার্চনা পর্যন্ত অনুষ্ঠানে পাণ্ডাগিরি করে মাসে আরও তিরিশটে টাকার সংস্থান করে দিত। এছাড়া তার নিজের সিগারেট ট্রাম-বাস জামা-কাপড় এসবগুলোও চালিয়ে নিত। এ উপার্জনটা ক্রমশ ক্রমশ বেড়েছে, কমেনি। ম্যাট্রিক পাশ করে গোপাও দুটো ছোট ছেলে পড়ায়। কিন্তু উপার্জন বাড়া সত্ত্বেও অকস্মাৎ দেখা গেছে পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকাটা কিছুদিনের মধ্যে দ্রুত ফুরিয়ে এসেছে।

টাকা বের করত—সৌরীন।

মাস কয়েকের মধ্যে টাকা বেশি বেশি বের করেছে সে। এটা ধরা পড়েছে তিন-চারদিন আগে।

মা আগুন হয়ে উঠেছিল—কি করলি টাকা?

সৌরীন তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—কোন উত্তর দেয়নি।

মা উত্তপ্ততর হয়ে বলেছিল—সৌ-রী-ন!

সৌরীন আবার একবার তাকিয়েছিল মায়ের মুখের দিকে। এবং আবারও মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু গোপা দেখেছিল গতবার সৌরীনের যে মুখখানা সাদা দেখিয়েছিল এবার সে মুখখানা তার টক্‌টকে রাঙা হয়ে উঠেছে। যে-রক্ত সরে গিয়েছিল সে-রক্ত ফিরে এসেছে।

বুঝতে পেরেছিল—সৌরীনের মনে কি হচ্ছে।

তার মনেও তো এমনি যুদ্ধ চলত। কিছুদিন আগে কলেজের ফাংশানে বেশি একটু মেতে ওঠার জন্যে তাকে মা এমনি—কি এর থেকে চড়া বকুনি দিয়েছিল। নিষ্ঠুর অপবাদ দিয়ে বকুনি দিয়েছিল মা।

মা ট্রামে আসবার পথে তাকে দেখেছিল একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে। সেই কারণে একটা অপবাদ দিয়ে তিরস্কার করেছিল।

মা বলেছিল—বল—ও—কে?

সে সত্য বলেছিল—সে চেনে না। বলেছিল—চিনিনে আমি।

সত্যই সে তাকে চিনত না। ছেলেটা তাকে দেখে তার পিছু নিয়েছিল। কলেজের সামনে রাস্তায় কোথাও দাঁড়িয়ে থাকত। সে বের হলেই বেরিয়ে পড়ত এবং পিছন-পিছন আসত। ট্রামে উঠলে ট্রামে উঠত, বাসে উঠলে বাসেই উঠত সে। এবং পাড়ার মোড় পর্যন্ত এসে চলে যেত। ছেলেটা লাজুক—ছেলেটা ক্যাংলা—ছেলেটা একটি ভীতু ছেলে—কোল-কুঁজো একটা ছেলে। প্রথম কিছুদিন ছেলেটাকে একটু নাচিয়েছিল। বেশ লেগেছিল। একটা বাঁদরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নাচানোর মধ্যে একটা খেলা আছে। দু'-চারদিন বেশ লাগে। তাই দু'-চারদিন মন্দ লাগেনি। তারপর উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। সেদিন যেতে যেতে পথে দাঁড়িযে মৃদুস্বরে কয়েকটা কথা তাকে বলেছিল--কি চাই আপনার? আমার পেছন নেন কেন?

কণ্ঠস্ববে ছেলেটা কেমন হয়ে গিয়েছিল—বলেছিল—এ্যা?

সে বলেছিল—তুমি একটা শূকরের বাচ্চা।

ছেলেটার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। তবু বলতে চেষ্টা করেছিল—"আমাকে"—হয়তো বলতে চেযেছিল—আমাকে কেন গাল দিচ্ছেন? আপনি ডাকলেন যে চোখ মেরে?

কিন্তু তার আগেই গোপা বলেছিল—তোমাকে কানে ধরে আমার পায়ের চটি খুলে পটাপট করে মারব?

এবার ছেলেটা বোবার মতো দাঁড়িয়েছিল।

গোপা বলেছিল—তোমার বোন নেই বাড়িতে? মা নেই? মাসী নেই? উল্লুক শুয়ার কুকুর— ?

এমন সব খটখটে কথা খুব মৃদুস্বরে বলেছিল কিন্তু! কাবণ এ নিয়ে গোলমাল বাধাতে সে চায়নি।

তার মা এই মৃদুস্বরে কঠোর এবং কঠিনতম কথা বলার সত্যটি বুঝতে পারেনি—বা চায়নি। সে তিরস্কার করেছিল।

মা বলেছিল—ও—কে? বল!

সে বলেছিল—জানি নে। চিনি নে।

—মিথ্যে বলছিস।

—না।

সে-সবই মনে পড়েছিল সেদিন তার সেই মুহূর্তে।

মনে পড়েছিল মায়ের প্রথম প্রশ্নেই তার মুখের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল এবং মা তারপর যত বেশি চিৎকার করেছিল তত বেশি রক্ত এসে তার মুখে জমা হয়েছিল।

কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল—সঙ্গে সঙ্গে বাজতে শুরু করেছিল বিচিত্র রকমের শব্দ—অনেকটা নিস্তব্ধ রাত্রির ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো।

সৌরীনের সাদা মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল সৌরীনের মনে ঝড়ের ইশারা। ঝড় উঠেছে।

পাঁচ

কিন্তু সে ঝড় তার জীবনেও ওঠে। মেয়েছেলে, এ যুগের মেয়েরা অনেক স্বাধীন একথা ঠিক, তবুও মেয়েরা মেয়ে। কোথায় বুকের মধ্যে আছে একটা ভয়, কোথায় আছে একটা কান্না-পাওয়া নরম-নরম মনের খানিকটা অংশ, যেটা একটুতেই চোরাবালির মতো সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে—শিক্ষা-দীক্ষা সাহস-সংকল্প সব কিছুকে নিজে নিজেই গিলে বসে থাকে। সৌরীন পুরুষ। তার উপর সে দুর্দান্ত। গোপা সৌরীনের মুখ দেখে ভয় পেয়েছিল।

সৌরীনেব মুখ দেখে শঙ্কিত হয়ে সে মাকে বারণ করতে চেয়েছিল—থাক এসব কথা থাক। এমন করে বলো না মা। কিন্তু মুখে বলতে পারেনি; মুখে শুধু শঙ্কিত স্বরে বলেছিল—মা।

মা গ্রাহ্য করেনি—সে সৌরীনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—কথার জবাব দে সৌরীন। না হলে আমি পুলিশে খবর দেব।

এবার সৌরীন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আব মুখ নামায়নি। বলেছিল—আমি আর মাইনর নই। আমি এখন সাবালক হয়েছি। ও টাকা আমার বাবার টাকা! আমি মাইনর ছিলাম বলে টাকার দেখাশুনা তুমি করেছ। এখন ও টাকা আমার। দিতে পার তুমি পুলিশে খবব। আমি তোমার সই কবা উয়থড্রয়াল ফর্মেই টাকা বেব কবেছি। জাল কবিনি।

বলেই সে আব দাঁড়ায়নি—হন্ হন্ কবে বেরিযে চলে গিযেছিল। মা স্তম্ভিত হয়ে গিযেছিল।

কাণ্ডটা ওখানেই থেমে ছিল না। ছেদও পড়েনি, কোন আপোসও হযনি। কাঁটাপুকুরের কবিরাজ জেঠামশাই আজও বেঁচে আছেন, তাঁর কাছে পর্যন্ত গিযেও মা কিছু বলতে পারেনি।

কবিরাজ গুপ্তমশাই বেশ প্রতিপত্তিশালী মানুষ, এখানে কিন্তু সে প্রতিপত্তি সৌরীনেব মতো ছেলেকে কাবু করতে পারে না।

মা অনেকটা যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। গোপার লজ্জার শেষ ছিল না। কারণ তার মা তাঁর সকল ক্ষোভের কেন্দ্রে কারণ হিসেবে তাকেই দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। বারবার বলেছেন এবং ওই এক কথা ধরে রেখেছেন—নরেশ গুপ্তের তুই একটি ছেলে নস। তার ওই মেয়েও আছে। গোপা। কুমারী মেয়ে। তোর সঙ্গে তার সমান অংশ। আমার অংশের কথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমি খেটে খাচ্ছি—যখন না পারব তখন ভিক্ষে করে খাব। আমি সমানে

খেটে আসছি আজ চার বছর; তোদের কিছু খাইনি। ভবিষ্যতেও খাব না। কিন্তু নরেশ গুপ্তের মেয়ে? তার কি হবে? তার বিয়ে দিতে হবে না? তার বিয়ে আগে না তোর ভাগ পাওয়া আগে?

সৌরীন শেষে বলেছিল—বেশ, ফিকস্‌ড ডিপোজিটের ছ' হাজার টাকা মেচিওর হয়ে ব্যাঙ্কে রয়েছে। সে তোমার নামেই আছে। নাওগে তোমার সেই টাকা। আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমি চলে যাব। কারণ ঠিক পোষাবে না আমার তোমাদের সঙ্গে। একটা চাকরি—যে-কোন চাকরি পেলেই চলে যাব আমি। দোহাই তোমার মা। দোহাই তোমাকে। এর থেকে বেশি কিছু আমি করতে পারি নে। কয়েকটা দিন সবুর কর তুমি। কয়েকটা দিন।

মায়ের জেদ ভীষণ। মা ছেলের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন। ওই যে দাদা বলেছিল আমি চলে যাব। তোমাদের সঙ্গে আমার পোষাবে না; এই কথা কয়টার জন্যে।

দাদা সৌরীনও কম না। কয়েকবার কথা বলে উত্তর না পেয়ে সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ও, কথা বলবে না বুঝি আমার সঙ্গে?

মা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

সৌরীন বলেছিল, ভাল। এই একটি ছোট্ট কথা বলেই সেও কথা শেষ করেছিল।

কথা বলেছিল কাল। তার আগের দিন একটা মারচেন্ট আপিসে চাকরির জন্য বিকেলে ফুটবল খেলে এল। মারচেন্ট আপিসের ফুটবল টীম আছে—খেলোয়াড় চাকরে নেবে। সৌরীন গত বছরে 'এ' ডিভিশনে খেলেছিল—নাম আছে, তাকে ডেকেছিল কর্তৃপক্ষ। ভালই খেলে এসেছে, ফরওয়ার্ডে খেলে দুটো গোল দিয়েছে। চাকরি তার হবে। সেই চাকরি নিয়ে কাল কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল দাদা।

সকালে এসে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মা সবে টিউশানি সেরে বাড়ি এসে ঢুকেছে। বাজারের থলিটা নামিয়ে কাপড় ছাড়তে যাবে এই সময় এসে দাঁড়িয়েছিল দাদা।

একটু অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল।

মা ভোরে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ছেলে পড়াতে যায়; গোপা চা করে দেয়। মা চলে যায়, গোপা পড়তে বসে, ওদিকে ঠিকে ঝি কাজকর্ম করে। বাসন মাজা, রান্না-ঘর পরিষ্কার, ঘরদোর পরিষ্কার করে উনোনে আঁচ দিয়ে বাটনায় বসে। গোপা এর মধ্যে ঘণ্টাখানেক পড়ে নিয়ে উঠে পড়ে। রান্না চড়াতে আসে। ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে আবার গিয়ে পড়ে। ওদিকে দাদা উঠলে কেরোসিন স্টোভে চা করে নিজেও একটু খায়। দাদাকে বোঝায়।—কেন রে দাদা, কেন এমন করে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস বল তো? কেন?

সৌরীন আগে এইসব নিয়ে আলোচনা করত, কথা বলত; কিন্তু আজকাল এই কয়েক মাস ওই টাকার ব্যাপারটার পর থেকে যেন কেমন হয়ে গেছে। ভাল করে কথাবার্তা বলে না। বলতে চায় না।

কয়েকবার সে বলেছে—দাদা—।

দাদা উত্তর দেয়নি। কেমন যেন হয়ে গেছে। অহরহই অন্যমনস্ক।

সে আবার ডেকেছে—এই দাদা। শুনছিস ?

—কি ?

—কি ভাবিস বল তো ? কথা কানে যায় না ?

উত্তর দেয়নি দাদা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থেকেছে। সে আবার বলেছে—এই দাদা !

—আমি বড় অশান্তিতে রয়েছি রে!

—কিসের অশান্তি তোর ? ব্যাপারটা কি ?

—ব্যাপার আবার কি? দেখছিস তো—মায়ের—। থাক গোপা, এ নিয়ে আলোচনা ঠিক আমি করতে চাইনে।

থাক—এসব পুরনো দৈনন্দিনের কথা। এ কলহ তুচ্ছ খুঁটিনাটির সামিল না হলেও, এ অশান্তির মধ্যেই সংসার চলছিল তাদের। হঠাৎ পরশু ধোঁয়ানো জীবন দপ্ করে জ্বলে উঠল। সেদিন মা এসে বাজারের থলিটা সবে নামিয়েছে, টিউশন সেরে ফিরবার পথে মা বাজারে ঢুকে বাজার করে আনে। কিছু আলু কিছু অন্য সব্জী, তার সঙ্গে ছেলে-মেয়ের জন্য মাছ।

তখনকার দিনে—।

১৯৫১ সালের দিন; তখন আজকের মতো বাজারের অবস্থা হয়নি। থাক বাজার—বাজারদরের কথা।

বাজারদরের পীড়নে জীবনের সমস্ত রস নিংড়ে টেনে চুষে নিয়েছে—জীবনের পল্লব-পুষ্প শুকিয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে, তবুও জীবন ফুল ফোটাতে চায়, তাতে কুঁড়ি ধরে আজও। সে থাক। সে থাক।

১৯৫১ সালে সেদিন মা এসে সবে বাজারের থলিটা নামিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই দাদা এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। বলেছিল—তুমি কথা বন্ধ করেছ বলেই আমি কথা বন্ধ করেছি। কিন্তু আজ আমার জরুরি প্রয়োজন। একটা কথা না বললেই নয়। বলতেই হবে আমাকে। কারণ আমার প্রায় জীবন-মরণ সমস্যা।

মা কথা বলেনি—শুধু মুখের দিকে তাকিয়েছিল ছেলের।

সৌবীন বলেছিল—আমার পাঁচশো টাকার দরকার। চাকরিটা আমাকে পেতে হবে। ঘুষ দিতে হবে।

এবার মা বলেছিল—ও টাকা গোপার বিয়ের জন্যে রেখেছি।

—পাঁচশো টাকা কম হলে গোপার বিয়ে আটকে যাবে না। আর তখন আমি টাকাটা যেখান থেকে পাবি পূরণ করে দেব।

মা মাথা নেড়ে বলেছিল—না; সে আমি দেব না।

—দেবে না ?

—না।

—দিতে তোমাকে হবে মা। এই তোমাকে শেষবার চাচ্ছি।

—না।

—না?

—না।

—আচ্ছা। বলে উঠে চলে গিয়েছিল সৌরীন। সারা দিনটা আর ফেরেনি। ফিরেছিল রাত্রে। রাত্রি তখন অনেকটা। আবার আজ ভোরে উঠে বেরিয়ে ফিরেছিল দুটোর সময়। তারপর কামিয়ে স্নান কবে বেশ সেজেগুজেই বেরিয়ে গেল—বলে গেল—রাত্রে আমার নিমন্ত্রণ আছে।

আর কোন কথা না।

এখন এই রাত্রি একটার সময় মা তাকে ডাকছে।—গোপা। সৌরীন তো এখনও এল না রে!

গোপা বললে—সে আসবে। কেন ভাবছ?

বলতে বলতেই গোপা ঘুমিয়ে পড়ল।

এরই মধ্যে স্বপ্ন দেখলে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

আবার ডাকলে মা। সে বিবক্ত হলো। মা বললে—তিনটে বাজছে।

তা বাজুক না। সৌরীন গুপ্ত নিশ্চয়ই আসবে। কোথাও আটকে গিয়ে থাকবে।

ঘুম তার আর এরপর আসেনি। সে চোখ বুজে শুয়ে তাব সেই স্বপ্নটি যেটি তার বিয়ের স্বপ্ন এবং যেটি মাঝখানে ভেঙে গেছে—সেইটিকেই আধ ঘুমের মধ্যে কল্পনা করে সম্পূর্ণ করতে লাগল।

মা তারমধ্যেই আক্ষেপ করছিল— নীপার ওই হলো। উনি—।

অর্থাৎ নরেশবাবু।

আবার মা বলল—সৌরীন গোপার বিয়ে দেব- -।

মায়ের সে কণ্ঠস্বর এবং বুক-ভাঙা বিলাপের কথাগুলি শুনে তার কান্না পেয়েছিল।

আর ভাঙা স্বপ্নকে জেগে শুয়ে জোড়া দিতে মন চায়নি—সে উঠে বসেছিল।

চুপচাপ এসে বসেছিল মায়ের পাশে।

মা বলেছিল- —উঠলি কেন? শুয়ে থাক না। কি করব— -কেন জানিনে আমাব ঘুম ঠিক আসছে না। কিছুতেই এল না। আমি হয়ত বেশি জেদ করেছিলাম না?

সে চুপ করে থেকেছিল।

পাশের বড বাড়িটা থেকে ক্লক ঘড়ির আওয়াজ ভেসে এসেছিল ঢং ঢং ঢং ঢং।

চারটে বাজছে। ভোর-ভোর ঘোর লেগেছে রাত্রির আকাশে।

রাত্রির আকাশের ঘষা কাঁচের মতো চেহারা হয়েছে। কলকাতা শহরও এত স্তব্ধ এখন যে, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

ওরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

পাঁচটা বাজল। বেশ সকাল হয়েছে। মা উঠল। উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকল। সে স্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে।

বাইরের দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। ঠিকে-ঝি যমুনার মা দাঁড়িয়ে, তার পিছনে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বাড়ির দিকেই তাকিয়ে।

যমুনার মা বললে—তোমাকে ডাকছে।

—আমাকে?

সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোতিপ্রসাদ।

জ্যোতিপ্রসাদের সর্বাঙ্গে যৌবনের প্রকাশ—আজ যেন বড় স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ল তার। এই ভোরবেলা তাকে ডাকছে!

যমুনার মা বললে—ওদের বাড়িতে আগে কাজ করতাম তো। তা বললে, যমুনার মা, একটু চুপি চুপি ডেকে দেবা তোমাদের গোপাকে। কেমন? কি কথা আছে।

রাঙা হয়ে উঠল গোপা। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে বারকয়েক লাফ দিয়ে উঠল। জ্যোতিপ্রসাদও যেন রাঙা হয়ে উঠেছে।

এই নির্জন ভোরবেলাটাই যেন তাদের দু'জনকে এমন করে রাঙিয়ে তুলেছে।

—গোপা!

গোপা উত্তর দিতে পারেনি। গলা তার শুকিয়ে গিয়েছিল।

—একটা কথা বলতে এসেছিলাম। কাল রাত্রে দু'বার এসেছিলাম। কিন্তু ডাকতে সাহস পাইনি।

গোপার মনে পড়ছে—সেই মার্চেব সময়েব কথা। কত ছোট ছোট্ট চোখাচোখির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে একটাব পর একটা—তাবপর আর একটা। এবং সে সবগুলোব কত বিচিত্র মানে যে আজ মনে হচ্ছে তা ঠিক ধরবাব মতো মনের শক্তি নেই গোপার।

জ্যোতি বললে—সৌরীনদা কাল রেজেস্ট্রী কবে বিয়ে করলে। কনেকে তোমরা জান। পার্ক সার্কাসের মণিকা বিশ্বাস। আমাকে সাক্ষী হতে বলেছিলেন সৌরীনদা। আমি সাক্ষী হয়েছি। বিয়ে করে কাল রাত্রে ওরা পার্ক সার্কাসে আছে, আজ সকালের ট্রেনেই চলে যাচ্ছে কোম্পানির ফ্যাক্টবি—আসানসোল। মার্টিনে চাকরি পেয়েছে তো; আজই জয়েনিং ডেট। তোমার মাকে বলো।

গোপা সব শুনেও কেমন অভিভূতের মতো জ্যোতিপ্রসাদেব মুখেব দিকে আবক্তিম হয়ে তাকিয়েছিল।

ছয়

সেইদিন সেই ভোরবেলা ওই খববটার সূত্রের একটি প্রান্ত জ্যোতি এসে তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

সূত্রের অন্তরালে ভাগ্যবিধাতার মতো কোন সূত্রধারকে একালে ঠিক মেনে নেওয়া যায় না, না-হলে গোপা ভাবত বা মনে মনে আজ বলত—যে সূত্রধার সেদিন সূত্রটির এক প্রান্ত জ্যোতিব হাত এবং অন্য প্রান্তটি জ্যোতিপ্রসাদের হাত দিযেই গোপাকে ধরিয়ে দিযে—সেই একান্ন সালের অক্টোবর হতে এই সাতষট্টি সালের

১১ই মে—২৭শে বৈশাখ পর্যন্ত একটি গ্রন্থি রচনা করার খেলায় তাদের মত্ত করে রেখেছিলেন, তিনিই আজ সেই সূত্রটির মাঝখানে ছুরি চালিয়ে দু' টুকরো করে দিলেন। আর ছিন্ন সূত্রটির একপ্রান্ত ধরে জ্যোতি চলে গেল এক পথে এবং সে অর্থাৎ গোপা অপর প্রান্তটি ধরে মুহ্যমান হয়ে ভেঙে পড়েছে এই কতকালের পুরনো ঘরখানির মধ্যে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে চাইছে কিন্তু পারছে না। ১৯৫১ সালে যা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬৭ সালে তা শেষ হলো।

ছেঁড়া সুতোর টুকরোটিকে সে ফেলে দিতেও পারছে না। এই সুতোটি নিয়ে তারা দু'জনে কতভাবেই না একটি অক্ষয়গ্রন্থি রচনা করতে চেষ্টা কবেছে। ছোট্ট একটুখানি হাতের স্পর্শের টুকরো, অপাঙ্গে চাওয়া, এতটুকু ক্ষীণ হাসি, একটি ভ্রূভঙ্গি, ছোটখাটো কথা, টুকরো চিঠি, কত অপরাহ্ণ যাপন। সব মনে পড়ছে।

সেইদিন শুরু হয়েছিল—১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে ভোরবেলা। জ্যোতি খবর দিতে এসেছিল—সৌরীনদা বিয়ে করেছে কাল। রেজেস্ট্রী করে বিয়ে। পার্ক সার্কাসের মণিকা বিশ্বাস। খৃশ্চান মেয়ে। তাকে তো তোমরা চেন।

বিস্ময়ে আঘাতে হতবাক হয়ে গিয়েছিল গোপা।

দাদা এমনভাবে লুকিয়ে বিয়ে করেছে? তাকেও বলেনি? পার্ক সার্কাসের মণিকা তাদের সঙ্গে একবাড়িতে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকত। হ্যাঁ। তাকে চেনে গোপা। জানে। তার সঙ্গেই মণিকা পড়ত। কিন্তু তাদের জানালে না? ও! এই জন্যেই তার টাকার দরকার হয়েছিল।

বুকখানা হঠাৎ যেন ধ্বক করে লাফিযে উঠেছিল।

দাদা—তাহলে—আলাদা হয়ে গেল? তাদেব ছেড়ে চলে গেল?

মনে পড়ল দিদি নীপা এর থেকেও নিষ্ঠুব এবং রূঢভাবে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বাবা তাকে আটকাতে গিযেছিল—বাবাকে তার জন্যে জীবন মাশুল দিতে হয়েছে। বাবাকে খুন হতে দেখেও দিদি ফেরেনি।

সেদিন সেই মুহূর্তে সে আশ্চর্য হয়েছিল—ছি-ছি করেছিল। যত ছি-ছি করেছিল দিদিকে তত ছি ছি কবেছিল দাদাকে। না, সেদিন সেই ভোবে দাদাকেই ছি-ছি করেছিল বেশি। দিদি হয়তো—। হয়তো তার আগেই ওসমানকে আত্মদান করে বসেছিল। মেয়েদের দেহটাই মেয়েদের জীবনে সব থেকে বেশি আনুগত্য দাবী করে পুরুষের। কোন পুরুষকে একবার দেহ দিলে আর তা ফিরে নেওয়া, সংসারে সমাজে থেকে অন্তত যায় না। কিন্তু দাদা? দাদা একবার তাদের কথাও ভাবলে না? এই চার-পাঁচ বছর মা প্রাণপণ পরিশ্রম করে তাদের এমন করে বড় করে তুললে—।

বুকের ভিতরটায় একটা তুফানের মতো ক্রুদ্ধ, বেদনার্ত ক্ষোভ যেন ফেটে পড়েছিল। মেঘের বুকে চমকানো যে বিদ্যুৎ বজ্র হয়ে মাটির দিকে নেমে আসে, যাতে প্রচণ্ড অসহনীয় দীপ্তিকে সব ঝলসে দেয় এবং প্রচণ্ড গর্জনে সব কাঁপিয়ে দেয়—ঠিক সেইভাবে সে ক্ষোভ পড়তে চেয়েছিল তার দাদার উপর।

এতবড় অকৃতজ্ঞ এতবড় স্বার্থপর—এতবড নারীদেহ-লোলুপ কামার্ত। তার চোখে

বোধহয় সেই দীপ্তির চকিত আভাস দেখতে পেয়েছিল জ্যোতি। সে ভয় পেয়েছিল। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলেছিল—মাকে বলো। আমি তাহলে যাই।

—না। বলে খপ্ করে জ্যোতির হাত চেপে ধরেছিল গোপা।

—না। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমি পারব না। বিশ্বাস কর তুমি—আমরা, অন্তত আমি এর কিছুই জানতাম না। উনি আমাকে ভালবাসতেন, ক্লাবের ক্যাপ্টেন ছিলেন—একসঙ্গে খেলেছি; আমাকে ব্যাডমিন্টন উনি হাতে ধরে শিখিয়েছেন। নিজের জুটি করে নিয়েছিলেন। আমি জানতাম—মণিকা বিশ্বাসের সঙ্গে ওঁর ভাব আছে। কিন্তু—!

—আপনার কৈফিয়তে আমার দরকার নেই জ্যোতিবাবু—আমাকে আপনি হাওড়া স্টেশনে নিয়ে চলুন। আমার সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে। কোন্ ট্রেনে ওরা যাচ্ছে—আমাকে দেখিয়ে দেবেন। একবাব আমি জিজ্ঞেস করব।

—আপনি যাবেন? কিন্তু কেন যাবেন? কি হবে?

—কিছু না। একবার জিজ্ঞেস করব।

—কি হবে?

—জিজ্ঞাসা কবাই হবে। জিজ্ঞাসা কবব—মা-বাপ, ভাই-বোন, ঘব-সংসাব, সমাজ-ধর্ম এসব থেকেও কি পুরুষেব কাছে একটি মেয়ের দামই বেশি? এ পৃথিবীতে পুরুষের জীবনে এর থেকে বেশি দাম কিসের?

চুপ কবে দাঁড়িযেছিল জ্যোতি, কোন উত্তব দেয়নি।

গোপা ঘরের দোব থেকে নেমে এসে পথে দাঁড়িযে বলেছিল—চলুন। আমাকে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে। আপনি কিছু জানেন না তাব প্রমাণটা দিতে হবে। দাঁড়ান—।

বলে সে ঘবেব দরজায় দাঁড়িযে যমুনার মাকে হেঁকে বলেছিল—আমাব চটি জোড়াটা দিযে যাও যমুনার মা, আর দেখ আমার বিছানায় বালিশের তলায ব্যাগটা আছে। পার্সটা। আব মাকে বলো আমি একটু বেরুচ্ছি। দাদা কাল বিযে কবেছে। বলো—মণিকাকে বিযে কবেছে। আমি যাচ্ছি তাকে ধবতে।

নিজে সে ভিতবে যায়নি; মনে হয়েছিল জ্যোতি হযতো চলে যাবে এই সুযোগে।

চটি জোড়াটা পাযে পরে নিয়ে সে বেবিযে পড়েছিল। কিছুদূর গেছে এমন সময যমুনাব মা বাড়ির দরজা থেকে তাকে চিৎকার করে ডেকেছিল—দিদিমণি। গোপা-দি; মা ডাকছে, গোপা দিদিমণি।

গোপা ফেরেনি। ফিরে তাকাযনি; জ্যোতিকে পিছনে ফেলে তার আগে আগে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলতে শুরু করেছিল। জ্যোতি তাকে বাধ্য হয়ে অনুসরণ করে চলেছিল। ভোবেব কলকাতার পথ। সূর্য তখনও ওঠেনি—মানুষজনের ভিড় নেই; রাস্তা ভিজে সপসপ করছে তখনও; কাক নেমেছে, নর্দমার ধারে বসে খুঁটে খাচ্ছে আবর্জনা, কুকুব ঘুরছে; ঝিয়েবা ডাস্টবিনে এনে ফেলছে গৃহস্থবাড়ির রাত্রেব উচ্ছিষ্ট। গাড়ি রিক্সা এসব তখনও ভিড় করে বের হয়নি। বড় রাস্তায় মোড় ফিরে

ভিড় বেড়েছিল, দূরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ট্রামের শব্দ উঠছে, বাস চলছে। বাগবাজার স্ট্রীটের দু'পাশের দোকানগুলো সবে খুলেছে, এখনও মাটির ধুনুচির মধ্যে জ্বলন্ত টিকের উপর দেওয়া ধূপের ধোঁয়া উঠছিল। শুধু রেস্টুরেন্টগুলোতেই ব্যবসা তখন মোটামুটি চলতে শুরু করেছে; টেবিলের সামনে প্রায় চেয়ারেই লোক বসে আছে চায়ের অপেক্ষায়। বড় ড্রামের জলে বা বেসিনে ছোকরাগুলো কাপ-ডিস ধুচ্ছে। দু'-একটা দোকানের বেয়ারা ছোকরা একটা-দুটো বিশ্রী হাঁক মেরে উঠছে—গ্রম চা।

জ্যোতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গোপার মনে হয়েছিল—জ্যোতি চা খেয়েছে তো? পরক্ষণেই মনে হলো, তারই খাওয়া হয়নি, স্টোভের উপর জলটা চাপিয়েই সে চলে এসেছে। তার অবশ্য আর চায়ের তৃষ্ণা নেই কিন্তু জ্যোতির তো আছে। জিজ্ঞাসা করেছিল—

—চা খাওয়া হয়নি তো আপনার?

জ্যোতি বলেছিল—তা হোক।

—না—তা হলে খেয়ে নিন।

—না। চলুন। আপনিও তো খাননি।

—না। আপনি খান।

মৃদুস্বরে জ্যোতি বলেছিল—চলুন, হাওড়ায় খাব—। এখানে চা খেতে সব সকালে—বিকেলে শুনতে পাবেন— -।

হ্যাঁ। কথাটা মনে হয়নি গোপার। ঠিক কথা। খুব সত্যি কথা বলেছে জ্যোতি। মানুষের মধ্যে পঞ্চভূত মাছির প্রবৃত্তি একটা মৌলিক প্রবৃত্তি।

সামনের রেস্টুরেন্টের বারান্দায় বসে একটা দাড়িচুলওলা পাগল তার ভাঁড় নিয়ে বসে আছে চা খাবে। দোকানে বেশ সুস্থভাবেই বসে আছে। এ অঞ্চলে খুব জানা পাগল। রাস্তায় নামলেই অশ্লীল গালিগালাজ দিয়ে চলতে শুরু করবে। লোকটা এখানকারই লোক—একটা মেয়েকে ভালবেসে পাগল হয়ে গেছে। বখা উড়িয়া ছোকরা কেষ্টা এখানকার বয। এখানে বসা কোনমতেই ঠিক হবে না।

চলতে লাগল তারা। জ্যোতি বললে— দেখুন—আসানসোল যাবার ট্রেন অনেক। সকাল থেকেই ট্রেন আছে। আমার বিশ্বাস তারা যত শীগ্‌গির পারে চলে যাবে। কারণ সৌরীনদার ভয় আছে আপনার' গিয়ে কোন হাঙ্গামা কববেন।

ব্যঙ্গভরে গোপা বলেছিল—ভয়?

—হ্যাঁ। ভয় না হোক একটা অশান্তি তো করতে পারেন। মানে—আমি বলছি ধরতে হলে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হয়।—একখানা ট্যাক্সি—

—হ্যাঁ সেই ভাল।

দু'জনে হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করেছিল। এবং ট্যাক্সি পেয়ে ছুটে গিয়ে জ্যোতি ট্যাক্সিটার হাতল ধরে তাকে ডেকেছিল—আসুন—আসুন।

ছুটেই গিয়ে গোপা গাড়িতে উঠে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে—বাবাঃ!

—খুব হাঁপিয়ে পড়েছেন?

—হ্যাঁ তা পড়েছি।

—একটা সিগারেট খাব?

—খান না।

—আপনার অসুবিধে—

—না—না—না। আপনি আমার জন্যে যা করলেন!

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জ্যোতি বলেছিল—আচ্ছা, হঠাৎ আমরা আপনি-আপনি হয়ে গেলাম কেমন করে বলুন তো? স্বাধীনতার সময় আমরা পাশাপাশি সেই ফ্ল্যাগ বয়ে মার্চ করেছি—মনে নিশ্চয় পড়ে।

—নিশ্চয় পড়ে। তার মুখের দিকে তাকাল গোপা। তার ক্ষুব্ধ অপ্রসন্ন মুখের উপর একটি প্রসন্নতার দীপ্তি উঁকি মারতে শুরু করেছে। সুখের স্মৃতি স্মরণে যে মিষ্টি হাসি আপনি ঠোঁটে ফোটে—তাও ফুটেছে তখন।

—তবে? জ্যোতি প্রশ্ন করলে।

—তবের উত্তর তো একা আমি দেব না, আপনাকেও দিতে হবে। আপনিও তো, আপনি আপনি বলছেন।

—না—আমি তুমি বলেই শুরু করেছিলাম। আপনি উত্তরে আপনি শুরু করলেন।

—হবে। এ খবরে আমার কিছুই ঠিক ছিল না। কিন্তু এখনও তুমি আপনি চালাচ্ছ।

—ক্ষমা চাচ্ছি।

—তা করলাম। বলতে বলতেই সে বললে—বেশ মিষ্টি গন্ধ তো সিগারেটের।

—কাল সৌরীনদার বিয়ের পর হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম—সেখানকার সিগারেট দামী সিগারেট—ফাইভ ফিফটি ফাইভ।

বলতে বলতে কখন যে হাওড়া ব্রিজের মুখে এসে পৌঁচেছিল তা বুঝতে পারেনি। ব্রিজে উঠে কথাবার্তার মোড় ফিরল।

হঠাৎ গোপাই বললে—ওই তো ওই ট্যাক্সিটায় দাদা না?

—হ্যাঁ—ওই তো মণিকা। ওই তো।

ট্যাক্সিটা তাদের ট্যাক্সিকে পাশে রেখে এগিযে বেরিযে গেল—ডবলু বি টি ০ ০ ০ ০ ওই তো। ওই তো।

সাত

—হ্যাঁ গোপা। হ্যাঁ। একটি পুরুষ যখন সত্যিকারের পুরুষ হয়ে ওঠে তখন তার কাছে একটি নারীব মূল্যই সব থেকে বেশি। সংসার-সমাজ, মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-বত্ন এমন কি জীবন থেকেও তার দাম বেশি। ধর্ম ভগবান—সমস্ত থেকে বেশি।

গোপার আজও কথাগুলো অক্ষরে-অক্ষরে মনে আছে।

সে বলেছিল—কিন্তু তোমার মা তো—! সে যদি তোমাকে মেরে ফেলত আঁতুড়ে?

—তাহলে তাকে পুলিশে ধরত। ফাঁসি হত। অন্তত ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ।

—সেই তার ভাল ছিল। জীবনে এত দুঃখ সইতে হত না।

সৌরীন বলেছিল—প্লিজ, প্লিজ গোপা; প্লিজ স্টপ। আমাকে ক্ষমা কর। বিয়ে করে জীবনে সংসার পাততে চলেছি—অনাবশ্যক মন তিক্ত করে তুলিস নে। শাপ-শাপান্ততে কিচ্ছু হয় না কিন্তু স্বাদটা বড় খারাপ।

মণিকা তার এককালের সহপাঠিনী—সে মুখভার করে দাঁড়িয়েছিল—সে হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠেছিল—কেন, আমরা তোমাদের কাছে কি অপরাধটা করেছি বল তো? এমন করে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত তাড়া করে মন্দ কথা বলতে এসেছ!

—আমি যতটুকু পারি পাঠাব। যা পারি।

মণিকা বলে উঠেছিল—মাইনে তো দু'শো পঁচিশ টাকা, তার আর কি নিজে খাবে, আমাকে খাওয়াবে—আর ওদের পাঠাবে বল তো।

উত্তেজনাবশে কানে আঙুল দিয়েছিল গোপা। এবং বলেছিল—টাকার জন্যে ছুটে এসেছি, না? তাই ভেবেছ? ছি-ছি-ছি!

* * *

এ জীবনের নাটকে সৌরীনের চরিত্রের সমাপ্তি এখানেই। আর নেই। অন্তত সশরীরে জীবন রঙ্গমঞ্চে আর আবির্ভূত হয়নি।

নিদারুণ তিক্ততা ও ক্ষোভের মধ্যেই গোপা তাকে বিদায় দিয়েছিল। ট্রেনখানা চলে গিয়েছিল। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল গোপা। চোখ দুটো তার জ্বালা করছিল।

মিলিয়ে গেল ট্রেনখানা; প্লাটফর্ম পার হয়ে খানিকটা ডানহাতি বেঁকে হাওড়ার রাস্তার তলা দিয়ে ক্রমশ পশ্চিমমুখে চলে গেল। শুধু ধোঁয়ার একটু পুঞ্জ ভেসে রইল শূন্যলোকে। সেখানে আরও অনেক গাড়ির ওগরানো ধোঁয়া ভাসছে, তারই সঙ্গে মিশেও গেল এবং ক্রমশ ফিকে হয়ে মিলিয়েও গেল।

গোপার মনের মধ্যে ক্ষোভের পুঞ্জটাও ঠিক ওইভাবেই ফিকে হয়ে এসে এসে মিলিয়ে ঠিক যায়নি—পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছিল অভিমানে। চোখ ফেটে জল এসেছিল।

প্রথম ফোঁটা দু'য়েক জল টপ টপ করে ঝরে পড়েছিল প্লাটফর্মের উপর। তারপর একটা দুরন্ত আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বুকেব মধ্যে তোলপাড করে উঠেছিল; আর সে সামলাতে পারেনি, নিজের আঁচলটা চোখে-মুখে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

—গোপা! গোপা! সেই মুহূর্তে জ্যোতি তার কাঁধের উপর হাত দিয়ে ঈষৎ চাপ দিয়ে ঈষৎ ব্যস্তভাবেই বলে উঠেছিল—গোপা—গোপা! কেঁদো না। গোপা!

সে স্পর্শের মধ্যে একটা স্বাদ ছিল।

সহানুভূতির সঙ্গে স্নেহ থাকে চিরকাল; এ তো বোধহয় তা ছাড়াও আরও কিছু ছিল। শরীরের লোমকূপে-কূপে সে স্পর্শে—ওই বাস্তব হাতের স্পর্শের উত্তাপে

একটা রোমাঞ্চ বয়ে গিয়েছিল। বেশ মনে পড়ছে গিয়েছিল। একটু যেন চমকে গিয়েছে সারা অঙ্গ।

—গোপা!

গোপার মনে আরও সমাদরের একটি তৃষ্ণা জেগেছিল। কাপড়ে মুখ ঢেকেই সে বার বার ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না-না-না।

তার অর্থ নিশ্চয় এই ছিল যে থামতে বলো না, বলো না, আমি কাঁদি।

জ্যোতি এবার বলেছিল—গোপা, এবার বিপদ ঘটবে। কেঁদো না। পুলিশে ধরে তো কেলেঙ্কারি করে ছাড়বে।

এবার ভয় পেয়েছিল গোপা। বিস্ময়েরও শেষ ছিল না। কিন্তু কান্না তার একমুহূর্তেই থেমেছিল এতে। সে চোখ মুছে মুখ তুলে বলেছিল—পুলিশে ধরবে কেন?

—কেন? ভাববে তোমাকে আমি ভুলিযে নিযে এসেছি, পালিয়ে যাচ্ছি, হাওড়া স্টেশনে এসে তোমার মন কেমন করতে শুরু করেছে—তুমি কাঁদছ।

—মিথ্যে মিথ্যে ধরলেই হলো! ধরুক না।

—হ্যাঁ, তারপর হাজত। তারপর পাড়ায় এনকোয়ারি—।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল গোপা!—এতো বড জুলুম।

—নিশ্চয়। কিন্তু কি করবে? এই ছেলেমেয়ের পালানোর তো আর আদি-অন্ত নেই। প্রতি ট্রেনেই হযতো একজোড়া আধজোড়া পালায়। আধজোড়া মানে—মেযে একলা পালায। আর কলকাতা শহরে এবং সারা দুনিযা জুডে যে কত পালায় তার আর হিসেব নেই। এখন চল। বাড়ি ফিরে চল।

ট্যাক্সি করেই তারা বাড়ি ফিরে এসেছিল।

নাটকের সূত্রধার বিধাতা পুরুষ একগাছি রাঙা সুতোর এ প্রান্তটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন জ্যোতির হাতে, অন্য প্রান্তটি ধরিয়ে দিযেছিলেন গোপার হাতে। বলেছিলেন—গ্রন্থি দিয়ে পরস্পরকে বেঁধে নাও। ইঙ্গিতেই বলেছিলেন। স্পষ্টভাবে নয।

সেদিন ফেরবার পথে ওদিক দিয়ে মন হাঁটেইনি। নাগিনী কন্যার কাহিনী বলে একখানা বইয়ে সে মনসা পুজোর কথা পড়েছে তাতে এক মানুষের মেযে নাগলোকে গিযে পডেছিল; তাকে মা মনসা বলেছিলেন—সবদিক পানে তাকিযো মা—শুধু দক্ষিণ দিক পানে তাকিযো না।

সেদিন যেন তেমনি একটি মানার নিষেধ মনের উপর কেউ জারি করে দিয়েছিল। যাবার সমযেও পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল। আসবার সময কিন্তু তাকাযনি। আসবার পথে গোপার মনে চিন্তার আর শেষ ছিল না।

দুনিয়ার ছকে সে আর মা কেবল রইল। আর কেউ না। বাবা গেছে, দিদি গেছে, দাদা গেল—রইল সে আর মা।

ভাবতে ভাবতেই বাডি ফিরেছিল।

সামনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসেছিল। ওই একটি কথা ছাড়া আর কিছু ভেবেছিল কি না—তা তার মনে পড়ছে না। না; এতকাল পরেও

ওই ক'টি কথাই মনে আছে—"সে আর মা—দু'জন ছাড়া আর সব চলে গেল।" বাবা মরে গেছে, দিদি গেছে; দাদা গেল। রইল সে আর মা। এছাড়া আর কিছু বলেছিল বা ভেবেছিল বলে মনে নেই। এত বছর—১৯৫১ ও ১৯৫৪ সাল—চৌদ্দ বছর পরেও ওই কথা ক'টা মনে আছে, আর কিছু মনে নেই।

আজ এই ১৯৬০ সালের এই মে মাসের রাত্রে দুঃখের বেদনার মন্থনে অন্তরটা আলোড়িত হয়ে তলায় থিতিয়ে পড়া কথা-স্মৃতি আশ্চর্যভাবে উপরতলায় ঘুলিয়ে তুলে দিয়েছে। ভাল করে ছেঁকে ছেঁকে বেছে বেছে দেখে নিয়েও তো আর কোন কথা বলেছিল বা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে না।

না। ফেরবার সময় সে একবারও জ্যোতির দিকে ফিরে তাকায়নি। না। ওই প্লাটফর্মে তার সঙ্গে যে কথাগুলো হয়েছিল—সেই বিচিত্র, পুলিশের কথা জড়ানো কথাগুলি। হোক বিচিত্র কিন্তু অবাস্তব বা আজগুবি নয়; মেয়ে আর ছেলে পালানো এবং ধরা পড়া—এ খবর প্রতিদিনের খবরের কাগজেই আছে।

বিস্ময়ের কিছু নেই।

হ্যাঁ—১৯৫১ সালে মনে মনে সে তাই স্বীকার করেছিল। কারণ তার বয়স তখন ১৮, কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, নানান ধরনের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। জীবনের অনেক কিছু বুঝেছে। পুরুষ আর নারীর জীবনে দেহে এবং মনে যৌবন এলে তার যে উত্তাপ—সে উত্তাপে নির্মল জলে ঝাঁপ দেবার সুযোগ না হলে—পঙ্ক-পল্লল পেলে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবে।

সে অবশ্য তা পড়েনি। তবে বদ্ধ ঘরে ঠাণ্ডা মেঝেতে খালি গায়ে গড়াগড়ি খেয়েছে। কতদিন কত কল্পনা করেছে। কিন্তু সেদিন হাওড়া থেকে ট্যাক্সিতে ফেরার পথে—জ্যোতিপ্রসাদের পাশে বসে এসব ভাবনা ভাবেনি। অথচ প্লাটফর্মে জ্যোতি তার পিঠে হাত রাখলে সে একবার চমকে উঠেছিল। বিচিত্র মানুষ—বিচিত্রতর তার মন। আলো-ছায়ার খেলার মতো একটা যায় একটা আসে। যখন যেটা যায় তখন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব মুছে যায়।

গাড়ি থেকে নেমেছিল—তাদের গলির মোড়ে। তখন আর তার নারীপুরুষের রূঢ়তম এবং তীব্রতম সত্য সম্বন্ধ সম্পর্কে কোন সচেতনতা ছিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাড়ি থেকে নেমে বলেছিল—তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম। দিলাম অকারণে।

—না না। সে কি? এমন করে বলছ কেন?

—বলছি, সত্যিই বলছি।

—না—তা সত্য নয়। অন্তত আমার দিক থেকে।

—অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। বলেই সে গলির দিকে মোড় ফিরেছিল।—আচ্ছা চলি।

বাড়িতে এসে দেখেছিল আর এক বিপদ—মা পড়ে গিয়ে প্রায় পাখানা ভেঙে ফেলেছেন। যমুনার মা তাকে আগলে বসে আছে।

মা বলেছিল—কেন গিয়েছিলি? কি হলো? এল?

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

মা কণ্ঠস্বরে আগুনের হল্কা মিশিয়ে আবার বলেছিল—ক'সের চোখের জল ঢাললি? ক'টা লাথি খেলি তার?

কি উত্তর দেবে?

মা বলেছিল—তুই-তুই-তুই ফিরলি যে বড়!

এতেও তার জ্যোতিপ্রসাদের কথা মনে হয়নি। কারণ মনে রয়েছে সে এর জবাবে বলেছিল—তুমি যে মরনি এখনও। তুমি মর, চিতায় পোড়—তারপর তা থেকে আমার চুলো আমি জ্বেলে নেব।

মা-ও বলতে পারেনি কিছু জ্যোতিপ্রসাদকে নিয়ে। সে তো জানত যে গোপা জ্যোতির সঙ্গেই গেছে হাওড়া। নিশ্চয় শুনেছিল যমুনার মার কাছে। তবু বলেনি। কথাটা তারও মনে হয়নি।

অথচ নাটকের শুরু তখন হয়ে গেছে। জীবন রঙ্গমঞ্চের একটি রঙীন সুতোর একপ্রান্ত ধরে জ্যোতি চলে গেছে দুটো গলির পর তাদের গলিটায়—আর সে ফিরে এসেছে তাদের বাড়িতে সেই সুতোরই আর এক প্রান্ত হাতে করে।

আট

সেদিন সারা দিনটা সে ক্ষোভে বনের একটা আগুন ধরা মরাগাছের কাণ্ডের মতো গুমড়ে গুমড়ে জ্বলেছিল। কখনও শিখা জালিয়ে কখনও ধোঁয়ায় চারিপাশটা আচ্ছন্ন করে সে জ্বলেছিল—নিজে পুড়েছিল এবং আশপাশ আকাশ-বাতাসকে উত্তাপে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল।

জীবনে যত জ্বালা আছে সংসারের কারণে, যত জ্বালা আছে যৌবন কামনায় যৌবন জ্বালায়, দারুণ ক্ষোভে সে সেদিন এইসব জ্বালাগুলোকেই পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল। ঠিক করেছিল এ সবের কোনটাকে সে প্রশ্রয় দেবে না। জীবনে অকারণে মদন ভস্ম করতে চেয়েছিল।

ছি-ছি-ছি।

মানুষ এমন কামার্ত? এমনভাবে পশুর থেকেও স্বার্থপর হতে পারে? অনায়াসে সৌরীন মণিকাকে নিয়ে একটা জন্তু মেয়ের সঙ্গে কামার্ত একটা জন্তু পুরুষের মতো চলে গেল।

সারাটা দিন সে এই ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল প্রাণপণ একটা জেদের বশে, জোর করে।

মায়ের কাছেও বসেনি ভাল করে। মা যে গালাগাল এবং শাপশাপান্তগুলো করছিল সেও তার খুব ভাল লাগছিল না! তার কারণ ওদের গাল দিতে দিতে মা বার বার ঘুরেফিরে তারই কথাতে আসছিলেন—এ কালটাই এমনি। এবার ঐটার পালা। সাপ—সাপ সব, দুধ-কলা দিয়ে বড় কর—তারপর একদিন বুকে ছোবল মেরে দিয়ে চলে যাবে। এটাও যাবে। আজ নয় কাল, নয় পরশু।

তার মনে হচ্ছিল তীব্র চিৎকারে প্রতিবাদ করে উঠে বলে—তার থেকে তুমি মরে যাও না। মরে গিয়ে তুমি স্বর্গে যাও বৈকুণ্ঠে যাও,—তা অবশ্য তুমি যাবে না—কারণ নরেশ গুপ্তের প্রগ্রেসিভ আইডিয়ার সোর্স ছিলে তুমি, ফোর্স ছিলে তুমি। পার্ক সার্কাসে ওই বাড়িতে যাব বলে তুমিই জেদ ধরেছিলে। আমি তখন আট-ন' বছরের। মুর্গী তুমি পুষিয়েছিলে। আজ খুব বিধবা সেজেছ। অভিসম্পাত দিচ্ছ।

কিন্তু কিছু না বলে মুখ বন্ধ করে কাজই করেছিল। রান্না করে খাবার এনে সামনে ধরে দিয়েছিল। জলের গ্লাস নামিয়ে দিয়েছিল। পান সেজে জরদা পর্যন্ত এনে সামনে নামিয়ে দিয়েছিল।

বিকেলবেলা মা ডেকে কথা বলেছিল। সে সৌরীনের ঘরটায় কাগজপত্র ঘাঁটছিল। আবিষ্কারের কোন প্রয়োজনই ছিল না—তবু মণিকার সঙ্গে সৌরীনের সম্পর্কটা গড়ে শক্ত হয়ে এমন হয়ে ওঠার কথা কাহিনী খুঁজছিল। সৌরীনের লেখা কাগজপত্র থেকে তার মনের কথা—এবং মণিকার চিঠি থেকে গোপন কাহিনী। খানছয়েক চিঠি সে পেয়েছিল—তার থেকেই তার এই খোঁজার নেশা বা ঝোঁক জেগে উঠেছিল।

নিজের স্যুটকেস জামাকাপড় সব যে কখন সৌরীন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা গোপা বা গোপার মা জানতে পারেনি। বড় একটি ট্রাঙ্ক পড়ে ছিল—সেটা প্রায় খালি, কয়েকটা পুরনো জামা—ফুটবল খেলার ইউনিফর্ম গেঞ্জি ছাড়া আর ট্রাঙ্কটা খালি। সেই ট্রাঙ্কের তলায় একখানা খাম পেয়েছিল। নাম লেখা ছিল সৌরীনের, লেখাটা দেখে মনে হয়েছিল—মণিকার হতে পারে। নামের পাশে লেখা ছিল—"সিক্রেট অ্যান্ড আরজেন্ট।"

চিঠিখানা মণিকার চিঠিই বটে। লিখেছে, হোটেলে যারা তোমাকে বলেছে যে আগেও তারা আমাকে দেখেছে ওখানে তারা হাফট্রুথ বলেছে। যেকোন শপথ আমাকে করতে বলবে—আমি করতে পারি। তুমি জান সেক্স সংক্রান্ত যে কাগজখানায় আমার ছবি দেখে আমার প্রতি নতুন করে অ্যাট্রাকটেড হয়েছ—তার আপিস ওই হোটেলটার নিচের তলায়। আমি ফটোর জন্যে পোজ দিয়ে টাকা আনতে গিয়েছি ওখানে। হোটেলের যে-সব ব্রোকার আছে তারা আমাকে অনেকবার লোভ দেখিয়েছে। আমি ঈশ্বরের নামে, মেরীর নামে শপথ করে বলতে পারি এই হোটেলে তোমার সঙ্গেই আমি প্রথম পদার্পণ করেছি এবং তোমাকে তুমি বলে চিনেই তবে মনের কৌতুকবশে তোমাকে পাকড়াও করব বলেই এসেছিলাম। তুমি মণিকাকে ভুলে গিয়েছিলে—মণিকা তোমাকে ভোলেনি। এসপ্লানেডে সন্ধ্যেবেলা তুমি যখন অন্যমনস্কভাবে শুধু কেবল মেয়েদের দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিলে তখনই আমি তোমাকে চিনেছিলাম—মতলব বুঝেছিলাম এবং ইচ্ছে করেই এই হোটেলটায়—যে হোটেলটা ওই কাগজের উপরতলায় বলে খানিকটা চেনা—সেখানেই তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলাম।

অত্যন্ত কৌতূহল জেগেছিল তার। সে খুঁজতে আরম্ভ করেছিল ট্রাঙ্কটা। আর বিশেষ কিছু পায়নি। পেয়েছিল সেকস্ সম্পর্কিত খান-দুই সাময়িক পত্রিকা। তাতে ছবি ছাপা হয়েছে, কিছু কিছু বিচিত্রভাবে ছাপা, বিজ্ঞানকে বড় করা হয়েছে এমনি

একটা ভানই হোক অথবা কৌশলই হোক একটা কিছু আছে। একটি নারীদেহ—অনাবৃত কিন্তু তার মুখ নেই। গলা থেকে পা পর্যন্ত ছবি ছাপা হয়েছে। অনেক রকমের ছবি। শুধু সামনের মলাটে মণিকার বাস্ট ফটো ছাপা হয়েছে।

বইখানা ওল্টাতে ওল্টাতে মানুষের মানুষীর জীবনের বিচিত্র গল্প, বিস্ময়কর গোপন সত্য কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করেছে—জীবনে খাদ্যে বঞ্চিত হয়ে অনাহারে দু'-দিন তিনদিন মুখ বুজে থাকে মানুষ। তারপর কুড়িয়ে খায়—চুরি করে, কঙ্কালসার দেহে মানুষের দোরে গিয়ে হাত পাতে। জীবনের আরও ক্ষুধা তো আছে, দেহের ক্ষুধা—

গোপা এবার সভয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল বইখানা, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এবং পালিয়ে এসেছিল ঘর থেকে বেরিয়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ ও থাকতে পারেনি—ও ঘর থেকে দূরে। আবার গিয়েছিল ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে চোরের মতো। আবার পালিয়ে এসেছিল। আবার গিয়েছিল।

মাঝখান থেকে বাঁচিয়েছিল মা।

মা এতক্ষণে তাকে ডেকেছিল--গোপা!

গোপার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠে যেন থেমে যাবে বলে মনে হয়েছিল—। আবার ডেকেছিল—শুনছিস? গোপা! শোন! মায়ের উপর রাগ করে না। শোন।

ওই কথা কয়টার সাড়ায় এবং মায়ের কণ্ঠের সুরে তার মনের ওই প্রলুব্ধ ক্ষুধা, যে ক্ষুধা প্রলুব্ধ হয়েও সারা দেহের সর্বাঙ্গেও অনুভব করছিল,—তা যেন একমুহূর্তে আলোর ছটায় অন্ধকারের মতো মরে গিয়েছিল।

মা তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল—আমার পায়ের যন্ত্রণাটা ক্রমশ বাড়ছে রে। ও বেলা তুই হেঁকে বলে চলে গেলি—আমি রাগে যেন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। কোনমতে সামলে বললাম- যমুনার মা—বারণ কর। শুনলি নে চলে গেলি। আমি এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম—এমন দিশেহারা হলাম যে, জ্ঞান ঠিক ছিল না আমার। সেই অবস্থায় সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে একটার বদলে দুটো ডিঙিয়ে পা ফেলেছি। ফেলেই কোমরে ধাক্কা লাগল, হাঁটুতে ধাক্কা লাগল—পড়ে গেলাম আছাড় খেয়ে। তারপর উঠতে পারিনি। কাঁটাপুকুর থেকে বটঠাকুরকে খবর পাঠালাম। উনি দেখে বললেন—হাড় ভেঙে থাকলে মুস্কিল। তবে বড় কিছু হয়নি বলেই মনে হয়। ডাক্তারেরা বলে বরফ দিতে। আমরা বলি সেঁক দাও। লবণের পোঁটলা করে গরম গরম সেঁক দাও। দেখ কেমন থাক। বাড়লে পর বুঝতে হবে কঠিন কিছু। এক্স্-রে করতে হবে। ষড়পক্ষ থাকলে বেটে প্রলেপ দিলে হত।

চুপ করে বসে শুনে গেল গোপা। মনে অনুতাপ না-হোক, মায়ের জন্য দুঃখ হয়েছিল তার। সত্যিকারের করুণতম দুঃখ অনুভব করেছিল বিচিত্র ভাগ্যের খেলার পুতুল এই তাদের মা মেয়েটির জন্যে—যিনি একদা ছিলেন প্রগতিশীল নরেশ গুপ্তের প্রগতিশীল স্ত্রী এবং যিনি পরবর্তীকালে সৌরীনের ও গোপার মা—যে মা সকালে

উঠে বের হত প্রাইভেট টিউশনি করতে; সেখান থেকে ফেরার পথে বাজার করে ি য়ে এসে রান্না সম্পূর্ণ করত; তারপর সৌরীনের এবং গোপার সঙ্গে তার নিজের কাপড় ব্ল উজ সায়া কামিজ প্যান্ট পর্যন্ত সার্ফে কেচে শুকুতে দিয়ে স্নান করত, খেতো, বিশ্রাম করত, আবার চারটের সময় উঠে—সেই শুকনো জামাকাপড় প্যান্ট স্টার্চ দিয়ে ইস্ত্রী করে পাট করে রেখে তাদের জন্যে জলখাবার করতে বসত; খুট করে শব্দ হলেই জিজ্ঞাসা করত—কে গোপা? যমুনার মা—গোপা এল? এল না? তবে শব্দটা কিসের?

কাল ও তাব আগের দিন সৌরীনের ম্যাচ ছিল। কিন্তু পায়ে ছিল বেদনা। এই জখম পা নিয়ে মা বারণ করেছিল খেলতে কিন্তু সৌবীন শোনেনি। খেলতেই হবে। ি ডিভিশনের টিম থেকে তাকে আসছে বার এ ডিভিশনে যেতেই হবে। ঠেলে গিয়ে ঢুকতে সে বদ্ধপরিকর। এ ম্যাচটায় খেলবেই সে এবং স্কোর তাকে করতেই হবে।

মা সারাদিন বকেছিল আপন মনে। খেলোয়াড়দের জীবনকে মা পছন্দ করে না বলে সৌবীনকে তিরস্কার কর্বেছিল, নিজের ভাগ্যকে বাক্যে যতটা লাঞ্ছিত কবা চলে তাও কবোছল। কখনও কখনও নিজের কপালে দুটো-চারটে চড়ও মেরেছিল—আর বলেছিল এততেও ভাঙে না ফাটে না? পাষাণে গড়া! ছি!

বলতে বলতেই বলেছিল—নাও বস- -পাখানা মেলে দাও—। ভাল করে মেলো। একটু সবে বস। উনুনের আঁচটা যোল আনা মুখে লাগছে। মুখ তো ভেতরে ভেতরে পুড়ছে—তার উপব আর বাইরে পোড়ানো কেন।

বলে নুনের পোঁটলার সেঁক দিতে বসেছিল। আগের দিন গোটা সন্ধ্যা সেঁক দিয়েছিল; পবের দিন ঘণ্টা দুই-আড়াই দুপু: পর্যন্ত। তার সঙ্গে মালিশও কবে দিযেছিল। ছেলে প্রণাম কবতে গেলে বলেছিল—থাক—। ঢের হয়েছে। ইউনিফর্ম পরে বেরিয়ে যাবাব সমযও বলেছিল—দেখিস মারামারি কবে যেন বিশ্রী কিছু করে আসিসনি বাপু!

*   *   *

এই তাদের মা। এমন মা সুলভ নয়। কিন্তু সুলভ মা যারা, তাদের উপরেই কি এই অবস্থায় রাগ করা চলে!

গোপা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—যন্ত্রণা কি খুব বেশি হচ্ছে?

—হচ্ছে—। তবে খুব বেশি বলতে কি বলছিস?

সারা মুখে তার যন্ত্রণার চিহ্ন রেখায় বেখায ফুটে উঠতে চাচ্ছে। তারই মধ্যে হেসে বলেছে—অজ্ঞান তো হইনি। তবে কন্ কন্ করছে। বেশ কন্ কন্ করছে।

—তা হলে, যাব—ডাক্তার ডেকে আনব?

—ডাক্তার কি করবে? বলবে এক্স্-রে করতে। তার থেকে দুটো সারিডন কি কোডোপাইরিন কিনে আন। যমুনার মাকে বল।

—আমিই যাই। বরং জিজ্ঞাসা করে আসব ডাক্তার দাসকে। ওঁর ডাক্তারখানাতেই যাব।

—না। যমুনার মা যাক। তোকে যার জন্যে ডেকেছি বলি। কাল সকালে তো টিউশনিতে যেতে পারব না আমি। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা?

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গোপা। সত্যিই ওই ছোট তিনটি বাক্য—'বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা?' তার মনশ্চক্ষুর সামনে একটা নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের সম্মুখ থেকে একটি আড়ালকে সরিয়ে নিল।

মা বললে—তুই কাল সকালে উঠে আমার বদলে যাবি। আমি চিঠি লিখে রাখছি—দুই বাড়িতেই, লোক ওরা ভালই। আ—আমার বদলে তোকে এখন নিশ্চয় নেবে। তবে বেশিদিন হলেই মুস্কিল! এই মায়ের উপর রাগ করেছিল বলে মনে মনে অনুতাপ করেছিল সে।

মা সাবারাত কাতরেছিল। যন্ত্রণা বাড়ছিল। সে মায়ের পাশে শুয়েছিল। ঘুম তার ভাল হয়নি। জেগেছিল প্রায় দেড়টা পর্যন্ত। তারপর আধ-ঘুমের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চিন্তার শেষ ছিল না।

দাদা-মণিকা—আসানসোলে ফুলশয্যা পেতেছে আজ। দুটো মানুষ নয। মানুষেব দেহের মধ্যে দুটো বন্য বর্বর পুরুষ প্রকৃতি আর নারী প্রকৃতি।

সেই মাসিক পত্রিকাখানায় প্রকাশিত কতকগুলো বিবরণ মনে পড়েছিল। ছি-ছি-ছি!

একজন স্বামী লিখেছে—তার নববিবাহিত বধূ সম্পর্কে—। দেহ নিয়ে তার উল্লাস সাইক্লোনের রাত্রির মতো—

শিউরে উঠেছিল সে! হয় তো মণিকা—

থাক। থাক। ছি! ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল সে। দাদা-মণিকা দূরান্তরে কোন অবণ্যের অরণ্যচারী হযে হাবিয়ে যাক। মনকে সে জোব করে ফিরিযেছিল। কাল সকালেই মায়েব ব্যবস্থা করতে হবে। কাল সে যাবে মায়ের চিঠি নিয়ে—এবং কযেকদিনের ছুটি নিযে আসবে। বলে আসবে—এক্‌স্‌-রেটা কবিয়েনি। মায়ের একটা ব্যবস্থা করে আমি আসব।

এক্‌স্‌-রের জন্য ডাক্তারের চিঠি চাই।—কম ফিযে হলে ভাল হয। একলা তাকে সব করতে হবে। হায দাদা—।

থাক, দাদার কথা থাক।

কাল জেঠামশায়ের কাছে যাব। জেঠামশায়ের কাছে যেতে তার খুব ভাল লাগে না। একটা প্রচ্ছন্ন—

না হয জ্যোতিকে বলবে। জ্যোতিপ্রসাদের কথা মনে হলো। আজ সে অনেক করেছে তার জন্যে। কাল গিয়ে ডাকবে জ্যোতিকে। আর একবার সাহায্য করতে হবে যে!

এবই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কত জেগে থাকবে। ছিলকের মতো ঘুম;

পাতলা চাদরে যেমন কিছুটা শীত আটকায়; তেমনিভাবে পাতলা ঘুমে—জেগে থাকার রূঢ়তাকে কিছুটা কমিয়ে এনেছিল।

এরই মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছিল জ্যোতিকে। জ্যোতি এসে তার কাঁধে ঠিক হাওড়া প্লাটফর্মের উপর যেমনভাবে হাত রেখেছিল—তেমনিভাবে,—তার থেকে আরও নিবিড়ভাবে হাত রেখেছিল।

সে শিউরে উঠে বলেছিল—ছাড়! ছাড়! না। কে যেন কাতরাচ্ছে—ছাড়। স্বপ্নের জ্যোতির কাছ থেকে সরে এসে স্বপ্ন ভেঙে সে জেগে উঠেছিল—মায়ের কাতরানি শুনে জিজ্ঞাসা করেছিল—মা—বেদনা বেড়েছে?

—হ্যাঁ রে। বড্ড বেড়েছে, বড্ড।

নয়

মানুষের লেখা নাটকের একটা ছাঁচ আছে; একটি ঘটনা ঘটে—তা থেকে আর একটি ঘটনা এসে উপস্থিত হয়; তার থেকে আর এক পরিণতি। নায়কের সঙ্গে নায়িকার দেখা হয়—প্রেমে পড়ে তারপর তৃতীয়জন আসে—সে এসে কলহ বাধায়, বিচ্ছেদ হয়—তারপর বিচিত্রভাবে আবার অঘটন আজও ঘটের মতো বিচ্ছেদকে ব্যর্থ করে মিলন হয়।

বিধাতার নাটকেও তা হয়। তবে এই মোটা নিয়মের ঘটনা ছাড়াও আরও অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। তবে এই ছোট নাটকটির ধারা যেন আলাদা। গোপার জীবন ছোট, তার ঘটনাগুলিও চোখে পড়বার মতো নয়।

পরদিন সকালে জ্যোতিকে সে চেয়েছিল—কিন্তু জ্যোতিকে সে পায়নি। জ্যোতির আসা উচিত ছিল কিন্তু জ্যোতি আসেনি।

ভেবেছিল সকালবেলা জ্যোতি নিজেই খোঁজ নিতে আসবে। কিন্তু তা আসেনি। সে একটু রাগ করেছিল। জ্যোতির উপর রাগ করার অধিকার আছে কি না এ বিচার না করেই রাগ করেছিল। সকালে তখন মায়ের যেন খানিকটা গা গরম মনে হয়েছিল। রাত্রে তো স্পষ্ট জ্বর ছিল। সকালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে জেঠামশায়ের বাড়ি গিয়েছিল। লোকের সাহায্য চাই। এক্স্-রে করাবে।

জেঠামশায়ের বাড়িতে তাঁর নিজেরই ঝঞ্ঝাট সামলাবার লোক নেই। বাড়িতে পুরুষ বলতে তিনি নিজে; বড় ছেলে দু'বার করোনারী ধাক্কা খেয়ে তৃতীয়বারের প্রতীক্ষায় আছে। ছোট দূর দেশে চাকরি করে। এছাড়া তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ বছরের এবং বত্রিশ বছরের দুই কুমারী মেয়ে; দুই বউ আর একপাল ছেলে। বাড়ির কাজ সে বাজার-হাট থেকে সবই করে মেয়েরা, রান্না করে বউয়েরা, ছেলেগুলো খায় আর হল্লা করে—তার সঙ্গে পড়ে। অত্যন্ত রক্ষণশীল বাড়ি। তার মা এককালে পার্ক সার্কাসে ওই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, দেশী কৃশ্চান এবং মুসলমানদের সঙ্গে একবাড়িতে ছিল বলে এখনও তাকে ব্যঙ্গ করে। জেঠতুতো বোনেরা বাড়ির কাজ করেও কিছু কাজ করে। লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। দু'জনেই ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙোয়নি; তবে, কথাবার্তা বলে ভাল;

সেজেগুজে দিব্যি মডার্ন চালে চলে। ওরা কতকগুলি জিনিস ক্যানভাস করে বিক্রি করে। তার মধ্যে জেঠামশাযের আয়ুর্বেদীয় ফ্যাক্টরি অর্থাৎ তাঁর বাড়ির তৈরি দাঁতের মাজন, ভাস্কর লবণ, ধূপকাঠি, মেচেতার জন্য লাবণ্যপ্রভা ক্রীম, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য সুখবিবেচক আর ক্ষুধা বর্ধনের জন্য ক্ষুধাবর্ধিনী মোদক। মোদকটায় শুধু ক্ষুধাই বাড়ে না—শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের মধ্যে, তার সঙ্গে হয় গাঢ় ঘুম। বউরা কলে ছেলেদের জন্যে ফ্রক পেনী শার্ট জাঙ্গিয়া—মেয়েদের নানা মাপের ব্লাউজ এবং নানা মাপের বালিশের ওয়াড তৈরি করে ফেরিওয়ালাদের দেয। দিদি দু'জনের কাজ শুরু হয় ভোরে, ফেরে তারা সন্ধ্যায। বাড়িতে ক্লান্নার পালা আছে। দিনে বউদের রাত্রে মেয়েদের। আজ রাত্রে বড়দি তো কাল রাত্রে ছোড়দি। করিৎকর্মা মেয়েরা। এতসব করেও রাত্রের শো-যে দুই বোনে সিনেমা দেখে আসে।

বড়দির নাম রমা, ছোড়দি ক্ষমা। এরাই কিন্তু শেষে সাহায্য করলে।

বড়দি রমাই তাকে সঙ্গে করে সব জাযগায নিয়ে গেল।

বিচিত্র মানুষ বড়দি রমা। রমাদিকে সে কখনও ভুলবে না। তার সান্ত্বনা রমাদির শেষ শয্যায় সে থাকতে পেরেছিল।

রমাদি—।

•

বৈশাখের উত্তপ্ত রাত্রে রমাদিকে মনে পড়ে অস্থির হয়ে উঠল গোপা। এতক্ষণ পর্যন্ত কোন অস্থিরতা তার ছিল না। নীরবে স্থিরভাব মধ্যে আশ্চর্য রকম শান্তভাবে সে পিছনটা স্মরণ করছিল—আর মধ্যে মধ্যে চোখ মুছছিল। মাঝে মাঝে জল আসছিল চোখে।

রমাদিকে মনে করে অকস্মাৎ বেদনাটা যেন অশান্ত হয়ে উঠল। চোখ থেকে হু-হু করে জল পড়তে লাগল।

আরও দু' বছর পর ১৯৫৩ সালে চল্লিশ বছর বয়সে রমাদি নিজের রক্তস্রোতের মধ্যে ছটফট করতে করতে—। যাক সে আবও পরের কথা। সে পরেই হবে।

রমাদিকে সেদিন আশ্চর্য লেগেছিল। সব করলেন একা। সঙ্গে সে নিজে ছিল, কিন্তু সে শুধু সঙ্গে থাকাই, তাকে কিছু করতে হয়নি। ডাক্তার, সার্জেন, এক্স্-রের সব ব্যবস্থা করে দিলেন রমাদি। বারেকের জন্য আরও কেউ থাকলে ভাল হত এমন কথা মনেই হলো না। জ্যোতিপ্রসাদকে মনেও পড়ল না।

মায়ের কোমরের নিচে ডানদিকের হিপ বোনে আঘাত লেগেছে; আঘাতটা বেকাযদায় পড়ে বেশ কঠিন হয়েছে। হাড় ভাঙেনি কিন্তু হাড়টায় চিড় খেয়েছে, বেশ একটা লম্বা ফাট ধরার মতো দাগ উঠেছে প্লেটে। প্লাস্টার করে অন্তত মাস দুই শুয়ে থাকতে হবে। প্রথম পনের দিন হাসপাতালে থাকতে হলো তারপর বাড়ি। এ পনের দিন রমাদি এ বাড়িতে এসে থাকতেন।

আশ্চর্য ঝকমকে মেয়ে রমাদি। ফরসা রঙ, লম্বা চেহারা, দোষের মধ্যে মনে হত ভারিক্কী মেয়ে। অর্থাৎ বয়স্থা। বেণী ঝুলালে মানাতো না। এলো-খোঁপায় চমৎকার

মানাতো। ফেরতা দিযে কাপড পড়লে যেন কাঠ-কাঠ শক্ত দেখাতো। বেশ ঝলমলে করে দেশী ঢঙে কাপড পরলে বেশ দিদিঠাকরুণ দিদিঠাকরুণ মনে হত।

জ্যোতিকে আশ্চর্যভাবে ঢেকে দিয়েছিলেন রমাদি। ভুলে গিয়েছিল প্রায়। মনে পড়বার অবকাশই হলো না। দেখা হলো তবু যেন কোন আকর্ষণ অনুভব করলে না। মনে হলো যে সুতোটার দুই প্রান্ত বিধাতা দু'জনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন—তা দু'জনের হাতে ধরাই রইল, কোন বুনন তাতে হলো না, কোন গ্রন্থি তাতে পড়ল না।

রমাদি তার জীবনকে পুরো একটা মাস জুড়ে রইলেন।

মা হাসপাতালে, রমাদি তাকে আগলে ছিল। আগলে ছিল মানে, রাত্রে এসে আগলে শুত। সকালে উঠে চা খেয়ে চলে যেত। আবার রাত্রে আসত। যেদিন সিনেমা যেত সেদিন তাকে নিয়ে যেত।

রাত্রে তার জীবনের গল্প বলত রমাদি।

প্রথম গোপাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল গোপার জীবনের গল্প। তারপর বলেছিল নিজের জীবনের কথা।

তারমধ্যে পুরুষকে ভালবাসার কথাই পনের আনা। এই বয়সে ভালবেসেছিস কি না? ক'জনকে বেসেছিস?

সে রাঙা হযে উঠত। অস্বস্তি অনুভব করত। সে যতবার বলেছে না, ততবার হেসে রমাদি বলেছে দূর - ! কেন মিছে কথা বলছিস? মাইরী বলছি কাউকে বলব না আমি।

সে প্রায় হাঁপিয়ে উঠে বলেছিল—ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি—না। না-না-না। মনে পডছে—না না বললেও জ্যোতিপ্রসাদকে মনে পডেছিল। সেই বোকা হাবা ছেলেটা, যে তার স্কুলের সামনে থেকে পিছন নিত, তাকে মনে পড়েছিল। আরও দু'-চারজনকে মনে পডেছিল। সে মাত্র ম.ন পডাই। তার সঙ্গে প্রেমের কোন সম্পর্ক ছিল না।

রমাদি জিজ্ঞাসা করেছিল—

— বেশ, প্রেমে না পড়িস, তোর পেছনে লাগেনি? পুরুষ জাতটাই তো নির্লজ্জ—। ওরা তো সারাদিন-রাত ওই ভাবছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে কোথায মেয়েরা যাচ্ছে। যেই দেখলে—আর পিছন নিলে। কলকাতায তো রোয়াকে আড্ডা। স্কুলে যাস—নেয না পেছন? মিথ্যে বলিসনে।

এবার সে বলেছিল, সেই একজন বোকা ছেলেকে বলেছিল গালে ঘুষি মারব সেই কথাটা। ছেলেটা কেমন কাঁদো কাঁদো হযে গিয়েছিল—সে কথা বলে খানিকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল। এবং হেসেছিল।

ওই একটু হাসিই ক্রমে ক্রমে গভীর রাত্রি পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হাসিতে পরিণত হয়েছিল। উচ্ছ্বসিত হাসি থেকে সব শেষ পরিণতি হয়েছিল রমাদির একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে, তারপর হঠাৎ কান্নায়।

রমাদি নিজের জীবনে এই রকম কত পুরুষের সঙ্গে কত কৌতুক করেছে, কত তাদের নিয়ে খেলা করেছে, ঠকিয়েছে, লাঞ্ছনা করেছে তার কথা বলতে বলতে শেষ বলেছিল—কিন্তু বড় খারাপ রে বড় খারাপ। মেয়ের বিয়ে না হওয়া, স্বামী না-থাকা, এ বড় খারাপ। মেয়ে জাত লতার মতো, একটা ডালপালাওলা শক্ত গাছের মতো পুরুষ তার চাই, তাকে জড়িয়ে উঠবে, ফুল ফোটাবে। যাকে জড়িয়ে উঠলে ছাগলে ভেড়ায় গরুতে ছিঁড়ে খাবে না, মাড়িয়ে যাবে না! জানিস—আজও বাবা আছে, নিজের বয়স আছে, খেটে খাচ্ছি—বাবার ঘরে আছি—এরপর নিরাশ্রয় হব। দেখবার কেউ থাকবে না।

কেঁদে ফেলেছিল রমাদি।

সেই বরং বলেছিল—এ তুমি আগে কালের কথা বলছ রমাদি। আজকাল নতুন যুগ, লেখাপড়া শিখলে বেটাছেলেও যা পারে মেয়েতেও তাই পারবে। চাকরি-বাকরি সব।

—হুঁ। রমাদি একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল। তারপর বলেছিল—ম্যাট্রিক একবার ফেল করলাম, বাবা আর পড়ালেন না। বড়দা চারবার ফেল করেছে সবসুদ্ধ। ম্যাট্রিকে একবার আই-এতে একবার বি-এতে দু'বার। ছোটভাই দু'বার ফেল করে নিজে ছেড়ে দিলে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তুই যেন পড়া ছাড়িস নে গোপা, পড়াটা যেন চালিয়ে যাস। না-হলে মেয়েদের নিয়ে যে কি ছিনিমিনি খেলে রে—তুই জানিস নে। পরে জানবি। খুব সাবধান গোপা, খুব সাবধান, লেখাপড়া শেখ—চাকরি কর। আর একটা কথা—বেটাছেলের সঙ্গে মিশবি, কখনও গা ছুঁতে দিবি নে। কখনও না। ওরা শয়তান। তার উপর মেয়েদের যৌবনকালে বুকে একটা লুকানো দাহ থাকে। সেই দাহের মধ্যে পুরুষের ছোঁওয়া—একেবারে ঘি ঢেলে দেয় রে। একেবারে হু-হু করে জ্বলে ওঠে। খুব সাবধান! ওদের গা ছুঁতে দিবি বিয়ের পর। তার আগে নয়। খুব সাবধান।

এত সমাদর রমাদি তাকে করেছিলেন

*   *   *

শুধু ওই রাত্রিটাই নয়। এরপর পর পর পনের রাত্রি। পনের রাত্রি রমাদি তার কাছে এসে শুতেন। দীর্ঘাঙ্গী কাঠ কাঠ শক্ত চেহারার রমাদিকে এ পাড়ায় লোকেরা বলত—রমা সার্জেন্ট।

সার্জেন্ট অর্থাৎ পুলিশ সার্জেন্ট।

এ-নামে এর পূর্বে গোপাও মনে মনে কৌতুক অনুভব করত। তার মাকে সে দু'-চারবার রমাদি সম্পর্কে সকৌতুকে হেসে বলেছিল, রমাদিকে লোকে বলে পুলিশ সার্জেন্ট। তা রমাদির যা কাঠখোট্টা চেহারা না...তাতে ঠিকই বলে। বাবাঃ—

মা বলেছিল—কাঠখোট্টা না-হলে চলে না। তবে একটু বেশি তা ঠিক। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন? কারুর সঙ্গে বুঝি কিছু হয়েছে রমার?

হয়েছিল। কিন্তু সে থাক। কথাটা কি হয়েছিল তা নিয়ে নয়। কথা কাঠখোট্টা পুলিশ সার্জেন্ট নাম দেওয়া রমাদির অন্তরের এই গোপন পরিচয়টুকু নিয়ে। রমাদির ভেতরে যে আর এক রমাদি আছে তাকে নিয়ে। এ-রমাদি আশ্চর্য এবং বিচিত্র। সে এক কাঙাল মেয়ে। ক'দিনের মধ্যে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠে। কত কথাই যে বলেছিল, কত শিক্ষাই যে দিয়েছিল, কত বুঝানোই যে বুঝিয়েছিল—তার আর এপার-ওপার নেই।

কলকাতার যে ময়দানের কথা গত মহাযুদ্ধ থেকে বিখ্যাত হযে আছে—যেখানে অন্ধকার গাছতলায় মেয়েদের দেহ বেচার হাট বসেছে, হোটেল, মাসাজ বাথ ক্লিনিক, এম্পটি হাউস—বার-রেস্টুরেন্টের কথা বলতে বাকি রাখেনি। সিনেমাব মাযাপুরী, রঙ্গমঞ্চের তাসের ঘরেব কথাও রমাদি খুব ভাল করে জানত। তাও বলেছিল। এমন কি গৃহস্থবাড়িতে প্রচ্ছন্নভাবে মেযেব ঘরে পুরুষ-বন্ধু আপ্যাযনের ব্যবস্থাব বিচিত্র সংবাদ সব রমাদি জানত—সে সব জানা সে তাকে জানিযেছিল।

পুরুষেরা কেমন করে ভোলায, কেমন কবে উপভোগ কবে চলে যায, পালিযে যায, মেযেরা কেমনভাবে সেই ভোগের ফলকে জীবনে ধাবণ কবতে বাধ্য হয সে-সব বলেছিল। এই পনেব দিনের মধ্যে চার-পাঁচ দিন জ্যোতির সঙ্গে দেখা হযেছে। কিন্তু তাকে দেখে মন এতটুকু তার দিকে ঢলেনি। তাকে ডেকে সে কথা বলেনি, বলতেও যাযনি। কেন ? কিসেব জন্যে। জ্যোতি বোকার মতো ফিরে গেছে। সে মুখ মুচকে হেসেছে। রমাদির শিক্ষায-দীক্ষায সে যেন আর এক মেযে হযে উঠেছে।

এই পনেব দিনে—। না—পনের দিন কেন—প্রায একটা বছব রমাদি তাকে জীবনের শিক্ষা দিযেছিল। এর মধ্যে পনের দিন নিরঙ্কুশ ছিল তাদেব পবিচয। পনের দিন পরই মা ফিরল হাসপাতাল থেকে।

মা ফিরল। তখন উঠে দাঁড়াতে পারছে—তা হলেও ব্যথা আছে। ডাক্তারেরা বলেছে বিশ্রামের মধ্যেই সেরে যাবে। তবে রেস্ট। রেস্ট চাই।

তার অভাব হযনি। রমাদিই প্ল্যান ছকে দিয়েছিল। বাড়িতে মাকে এনে বিছানায শুইয়ে দিয়ে বলেছিল, খুড়ীমা—নডাচডা করলে যদি মরণ হত তা হলে নডতে-চডতে বারণ করতাম না। নডলে-চডলে কষ্ট বাডবে আপনার আর কষ্ট দেবেন এই মেযেটাকে। এছাড়া আর কিছু হবে না। হাসপাতালে থেকে খরচ বাডবে—বাড়িতে শুযে থাকুন। যমুনার মাকে বলেছি একটা চব্বিশ ঘণ্টার লোক দেবে ও। আপনার কাছে থাকবে। গোপা যেমন সকালে টিউশনি করবার করবে, যমুনার মা এদিকের কাজকর্ম করবে। মেযেটা বাকি কাজ করবে। গোপা কলেজ করবে। মানে যেমন চলছিল তেমনি চলবে এখন। তারপর আপনি ভাল হযে উঠুন—তখন আবার ভেবেচিন্তে করবেন যা হয়। আমিও আসব যাব দেখব।

মা বলেছিলেন—হুঁ। তাই হোক এখন। তবে বটঠাকুরকে একবার ডেকে আনিস সন্ধ্যাবেলা।

—কেন ? বাবাকে কেন ? বাবা তো খটরোগা লোক—

—আমি একবার দেখাব নিজেকে।

—বাবা আবার কি দেখবেন!

—তিনি বৈদ্য, আমি বৈদ্যের মেয়ে, বৈদ্যের বাড়ির বউ। অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে আমাদের একটা জ্ঞান আছে। আমার মনে হচ্ছে, পায়ের আমার কিছু সারেনি। পা আমার সারবে না। আমি চিরজীবনের জন্যে অক্ষম হয়ে গেলাম।

তাই হয়েছিল। মায়ের ভুল হয়নি। তিনি নিজেই হেসে বলেছিলেন—আমি জানতাম রে। হাজার হলেও বৈদ্যের বাড়ির মেয়ে। ছেলে বয়সে মনে আছে এমনি করে বর্ষার সময় পিছল বাঁধাঘাটে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন আমাদের গ্রামের বাবু-গিন্নী। তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বছর। আমার ঠাকুরদা ছিলেন ভাল কবিরাজ। বড় বাপের ছেলে। কচি তালগাছ হলেও লাল কাঁকরের পুকুরপাড়ের তালগাছ। মানকড় তো যাসনি কখনও। গেলে বুঝতিস। সে কথা থাক। বাবা দেখেশুনে বলেছিলেন—বাবুগিন্নীর বড়ছেলেকে, বড়বাবু—মা বোধহয় আর উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। এ আঘাত বড় খারাপ। এ থেকে শেষ পর্যন্ত ওই পা-খানা শুকিয়ে যেতে আরম্ভ হবে। আপনি ভাল করে দেখান। আপনাদের পয়সা আছে। পরে আপসোস হবে। তার থেকে সময়ে দেখানো ভাল।

হেসে বলেছিলেন, মানকড থেকে বর্ধমান—বর্ধমান থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে শেষ পর্যন্ত কাশী। একখানা পা শুকিয়ে বাঁশের মতো হয়ে গিয়েছিল—গোরা রঙ ছিল বাবুগিন্নীর—সোনার মতো- —শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কালো ফুলের মতো।

তবুও চেষ্টার ক্রুটি হয়নি। আবার হাসপাতালে দিয়েছিল মাকে। রমাদি আবার এসে দু'বেলা দেখাশুনা করতেন।

মা হাসপাতালে যেতে চায়নি। সে চেয়েছিল গোপার বিয়ে দিতে। ফিকসড্ ডিপোজিটে ছ'হাজার টাকা বেড়ে সাত হাজারে পৌঁচেছে। একটি পয়সা ভাঙেনি। মা রমাদিকেই বলেছিল—রমা, এ টাকা আমার জন্যে খরচ করতে আমি পারব না। ও টাকায় গোপার একটা বিয়ে দিয়ে দে।

—বিয়ে? ছ'হাজার টাকায় কি বিয়ে হবে খুড়ীমা? ও হয় না।

—হয়। হতেই হবে।

—না হবে না। ওই টাকায় একটা থার্ডক্লাস ফোর্থক্লাস ছেলে দেখে তার হাতে দেবেন; সারা জীবন শুধু ছেলের পর ছেলে হবে, একপাল ছেলে। তারপর না খেয়ে টিবি হয়ে মরবে। আর যদি ছেলেটা মরে তো বিধবা হয়ে ভাত রান্নার কাজ খুঁজবে। না হয়—। থাক্ সে না হয় নাই শুনলেন। ছেলে নিয়ে বিধবা হলে তো সোনায় সোহাগা—। আর আপনি বেঁচে থাকলে শুকনো পা নিয়ে বসে বসে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলবেন আর একটা এনামেলের বাটিসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে বলবেন—দয়া করে কিছু দিন মা—বাপরা। আমি ভাল ঘরের মেয়ে—ভাল ঘরের বউ—!

মা চিৎকার করে উঠেছিল—রমা—? সঙ্গে সঙ্গে সেও হাঁপিয়ে উঠেছিল। মনে পড়েছিল জ্যোতিকে।

হেসে রমাদি বলেছিল—ভয় পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভয় পাবার কথাই বটে।

—তোরাও তো করে খাচ্ছিস!

—খাচ্ছি হাত-পা খালসা-ঝাড়া মোছা বলেই করে খাচ্ছি। বিয়ে হলে তো এর থেকে অনেক খারাপ থাকতাম খুড়ীমা। আমাদের বাড়ির বউগুলোর মতো, ছোট বউটা কাজের চেষ্টা করছে। শুনেছি সরকারী কাফেটেরিয়া না কি হচ্ছে—-সেখানে চাকরি। মানে বাড়িতে রাঁধুনী চাকরানী নয়, সরকারী খাবার দোকানে।

চুপ করে গিয়েছিল মা। চুপচাপ বসে সারাদিন কেঁদেছিল।

রমাদি সেদিন মাকে সান্ত্বনা দিয়ে যা বলেছিল তা আজও মনে অক্ষয় হয়ে আছে গোপার। আগুনের অক্ষরে লেখা একখানি কালের পুঁথির পাতা। বলেছিল—এ কালকে বুঝতে পারছেন না খুড়ীমা? কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে এলেন—এই সেদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন—বিছানা নিয়েছেন তো ক' মাস। এমন কাল কখনও দেখেছেন? চালের দাম ডালের দাম নুনের দাম তেলের দাম এত কখনও দেখেছেন? আপনাদের বাড়ির পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়ে ক্যানভাসারি করে—এ ভাবতে পারেন? বাপ মেয়েকে সঙ্গে করে হোটেলে নিয়ে যায়, দাদা নিয়ে যায়---। বিধবা যারা তারা থাক। আমার বয়স হয়েছে খুড়ীমা—পঁয়ত্রিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে—আমাব লজ্জার বয়স ফুরিয়েছে। খুড়ীমা—যৌবনজ্বালা মেয়েদের আছে। বড় জ্বালা। কিন্তু একগণ্ডা কি আধগণ্ডা ছেলে নিয়ে বিধবা হওয়ার জ্বালা তার থেকে অনেক বেশি—তার উপর তার সঙ্গে যদি অক্ষম বেকার স্বামীদেবতাসুদ্ধ শালগ্রাম শিলার মতো কুলুঙ্গীতে বসে থাকেন তা হলে আর জ্বালার এপার-ওপার নেই, তল নেই। গোপাকে পড়তে দিন--গোপা পাশটা করুক। তারপর ওব ভার ওর নিজের; দেখেশুনে আপনার জনকে চিনে নেবে।

মা ফোঁস করে উঠেও চেপে গিয়েছিল। চোখ দুটোর ধ্বকধ্বকানি আজও মনে পড়ছে গোপার। সম্ভবত দিদি নীপার কথা বলতে চেয়েছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন—নীপা যেমন ওসমানকে টেনে নিয়ে ছুটে পালিয়েছে বাপেব রক্তে পা চুবিয়ে চরণচিহ্ন এঁকে রেখে---অথবা সৌরীনের কথা বলতে চেয়েছিল।

সে আর বলতে দেয়নি রমাদি। বলেছিল—নিজে সেরে উঠুন আগে। তারপর ওসব কথা হবে। ভাববেন, করবেন। হাসপাতাল থেকে আর একবার ঘুবে আসুন।

মাকে বাধ্য হয়ে চুপ করতে হয়েছিল।

বিচিত্র জীবন—বিচিত্র সংসার—বিচিত্র এই সংসার রঙ্গমঞ্চের নাটক। আশ্চর্য তার গতি।

মাকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিল। বিকেলবেলা। মা শুয়েছিল রমাদির কোলে মাথা দিয়ে পিছনের সিটে। আবার একটু জ্বর দেখা দিয়েছে। যন্ত্রণাটা বেড়েছে। মা প্রায় দাঁতে দাঁত টিপে সহ্য করে শুয়ে আছে। মায়ের পায়ের দিকে বসে আছে গোপা। বসে ঠিক নেই। অন্তত সিটে নেই, মায়ের পা আছে সিটের উপর, সে কোনরকমে বসে আছে কিনারায়। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে রমাদিব

ভাইপো রণজিৎ---বড় ভাইয়ের মেজ ছেলে। ট্যাক্সিখানা কাঁটাপুকুর হয়ে এসে সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুতে পড়ে মেডিকেল কলেজ যাবে। সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু থেকে মির্জাপুরে বেঁকে গিয়ে মেডিকেল কলেজের কলেজ স্ট্রীট ফটকে ঢুকবে।

হঠাৎ রণজিৎ কাউকে লক্ষ্য করে বলে উঠেছিল—খে-ল-তে যা-চ্ছে-ন ? কার সঙ্গে খেলা ?

জবাবে আওয়াজ ভেসে এল, কারুর কথাগুলো স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি।

রমা গোপা দু'জনেই ফিরে তাকিয়েছিল। তাকিয়েছিল ফুটপাথের দিকে। কিন্তু না। যার সঙ্গে রণজিৎ কথা বলছিল—সে ফুটপাথে ছিল না, ছিল তাদের ট্যাক্সির পাশে আর একখানা ট্যাক্সিতে। রণজিৎই দেখিয়ে দিল —বললে, জ্যোতিদা। ট্যাক্সিতে যাচ্ছে—আমাদের পাশেই।

পাশেই ট্যাক্সিতে ইউনিফর্মপরা জ্যোতি বসে ছিল, সঙ্গে আরও দুটি পাড়ার ছেলে—জ্যোতির চ্যালা বা শিষ্য। তার দিকে তাকিয়ে গোপা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। রমা কিন্তু বলেছিল—ছেলেটা বেশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছে রে! ইউনিফর্মে বেশ দেখাচ্ছে তো!

গাড়িখানা চলছিল। জ্যোতির গাড়িখানা পিছিয়ে পড়েছে। রাজবল্লভপাড়ার ওখানে সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুর বাঁকে ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়িখানা দাড়াতে দাঁড়াতে জ্যোতির ট্যাক্সিটা আবার এসে পাশে দাঁড়াল।

জ্যোতি হাসলে--হাসলে সকলের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে রণজিৎকে— কোথায় যাচ্ছ ?

—মেডিকেল কলেজ।

—কেন ?

ঠাকুমার পা---বলতে বলতে ট্যাক্সিটা এগিয়ে গেল। রণজিৎ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে কথা ছুঁড়ে বললে—আবার বেড়েছে—।

আবার গ্রে স্ট্রীটের জংশনে গাড়ি থামল--সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পাশে এসে দাঁড়াল জ্যোতির ট্যাক্সি।

—আবার বেড়েছে? মানে--? অপারেশন--? কথাটা বলতে পারছে না জ্যোতি। তাকাচ্ছিল তারই দিকে।

রমাদি বিরক্ত হয়ে বললে—ইডিয়টিক ব্যাপার। দেখ না, রাস্তায় যেতে যেতে—। হুঁ। ট্যাক্সি আবার এগিয়ে চলল। এবার জ্যোতির ট্যাক্সি এগিয়ে গেছে। এ ট্যাক্সিওলা কথার সূত্রটা মনে রেখেই বোধ হয় ভেবেছিল কথাটা হওয়া দরকার। সে গাড়িতে স্পীড দিয়ে জ্যোতির ট্যাক্সিকে ধরতে চলল।

এসে দাঁড়াল পাশে। জ্যোতি বলল – অপারেশন হবে নাকি ?

—তা জানি না। রণজিৎ বললে।

কথা এবার সে না বলে থাকতে পারলে না। বললে—না, নতুন করে প্লাস্টার করে পা বেঁধে রাখতে হবে নইলে ছোট হয়ে যাবে।

না বলে তার উপায় ছিল না। মা অপারেশন শুনে চকিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। চোখ খুলেছিলেন, কপালে সারি সারি রেখা জেগে উঠেছিল।

রমাদি আবার বলেছিল—ইডিয়েট। বেশি খেলাধূলা নিয়ে যারা থাকে তারা অমনি হাঁদলাই হয়। খোঁজ নিচ্ছে—তাও চলন্ত ট্যাক্সি থেকে।

এরই মধ্যে জ্যোতির গাড়ি এগিযে চলেছিল। এ গাড়িটার ড্রাইভার অ্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে গাড়িটার স্পীড বাড়াল। এসে সঙ্গ নিল জ্যোতির গাড়ির।

রণজিৎ হেসে উঠেছিল সশব্দে।

জ্যোতিও হাসছিল—মুচকে মুচকে। কেমন করে যেন একটা রেস বেস খেলা জমে উঠেছে দু'খানা গাড়ির মধ্যে। দুই ড্রাইভারই মেতেছে। এ খানিকটা এগিযে যায়—পিছন থেকে অন্যটা স্পীড বাড়িযে এর সঙ্গ নেয—ড্রাইভার ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হাসে। জ্যোতি হাসে প্রথম রণজিতের দিকে তাকিযে। তারপর সেই হাসিমুখে তাকায সকলেব অর্থাং গোপাদের দিকে। গোপার মুখেও হাসি ফোটে।

এবার তাদের গাড়ি এগিযেছিল এবং রণজিৎ এবার সশব্দে হেসে উঠেছিল। বমাদি পর্যন্ত হেসেছিলেন। হেসেই বলেছিলেন—কি হচ্ছে?

বলতে বলতে জ্যোতির ট্যাক্সি এসে তাদের ট্যাক্সিকে ধবে তাকে পাশ কাটিযে বেবিযে গিযেছিল। হাসিমুখে জ্যোতি সকৌতুকে যেন 'হেবে গেল' বলে খেলাঘবের বাচ্চা ছেলের মতো হেসে চলে গেল।

এ ট্যাক্সিও স্পীড বাড়ালে। সামনেই বিবেকানন্দ বোড ক্রসিং। এ ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লাল সিগন্যাল ঘুচে গিযে হলদে হযে গেল। ট্যাক্সিটা সুযোগ পেযে তিনটে লাইনেব ডান পাশ দিযে এসে একেবারে সিগন্যাল পোস্ট পাব হযে ছুটল। জ্যোতিব ট্যাক্সি অনেক পিছ..।

রমাদিই এবার বললে—ওই পিছনে পড়ে গেল। ওই।

মা এবার জিজ্ঞাসা কবলে—কে?

—আমাদেব পাড়াব জ্যোতি বলে একটা ছেলে।

—আমি তো চিনি জ্যোতিকে।

—হ্যাঁ। জ্যোতি খেলতে যাচ্ছে—ট্যাক্সি কবে যাচ্ছে। রণজিৎ আর ট্যাক্সি-ড্রাইভাবরা রেস লাগিযে দিযেছে।

মাও হেসে বলেছিলেন—রেস?—হ্যা। তা লাগে। কিন্তু দেখো বাবা যেন ধাক্কা লাগিয়ো না।

ড্রাইভার এমন প্রমত্ত যে সে ছুটিযেছে প্রাণপণ বেগে।

এই—এই!—এই!

সে সাবধানবাণী ঢাকা পড়ে গিযেছিল—জ্যোতিব কণ্ঠস্বরে, তাদের চলন্ত ট্যাক্সি পাশে—আরও অধিকতর জোরে চলন্ত আব একখানা ট্যাক্সি থেকে সকৌতুক আহ্বান ভেসে এল—র-ণ-জি-ৎ।

রণ শব্দটা জোরে জিৎ শব্দটা খাদে।

বলতে বলতে মহাজাতি সদনেব সামনে দু'খানা ট্যাক্সিই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। বণজিৎ হেসে উঠল সশব্দে।

তাবাও হাসছিল। সে, বমাদি এমন কি যন্ত্রণাকাতব মা পর্যন্ত।

বিচিত্র নাটক।

সেদিন হাওডা স্টেশনে একটা সুতোব দুটো প্রান্ত দু'জনে যে হাতে ধবে বাড়ি ফিবেছিল—তাতে এতদিন প্রায় তিন মাস পর্যন্ত কোন একটি গ্রন্থি পডেনি—কোন একটি বুনন চলেনি। মনে হযেছিল জ্যোতিব ভূমিকা বোধ কবি শেষ হযেই গেল তাব জীবন নাটকে। কিন্তু তিন মাস পবে আজ এই পনেব বিশ মিনিটেব মধ্যে এমনভাবে বুনন চলল —সেই সুতোয যে কাটাপুকুবেব মোড থেকে মির্জাপুব সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু জংশন পর্যন্ত বেশ কযেক আঙুল চওডা একটি কাপডেব পত্তন হযে গিযেছিল। সেবাব সুতো যে ফিবেছিল—সে-কথা সে আজ এতকাল পবেও হিসেব কবে মোটামুটি বলতে পাবে।

বাজবল্লভপাডাব বাঁকেব মুখে প্রথম তাবপব গ্রে স্ট্রীট—তাবপব বিডন স্ট্রীট—তাবপব বিবেকানন্দ বোড— তাবপব মহাজাত সদন তাবপব হ্যাবিসন বোড এবং এব মধ্যে—বাস্তায চলন্ত অবস্থায ওভাবটেকিংযেব খেলা বাব পাঁচ কি সাত হবে।

বিধাতা বা অদৃষ্ট যখন সক্রিয হযে ওঠে তখন এমনিভাবেই ওঠে।

আশ্চর্য! ওই পনেব বা কুডি মিনিটেব ওহ সমযটুকু যদি কোনবক[illegible] পবমাযু থেকে বা জীবন থেকে বাদ দিতেন বিধাতা! তাহলে অন্তত এ[illegible] না। ওই জ্যোতিব সঙ্গে জীবনটা এমনভাবে জডাতো না।

দশ

তা পাবতো না কিন্তু তাব বদলে অন্য কাকব সঙ্গে জডাতে পাবতো তো!

একটি মেযেব জীবন শৈশব থেকে বাল্য, কৈশোব পাব হযে যৌবনে প্রবেশ কবেও একান্তভাবে একক ধুলোয লুটিযে বেডে এল এবং অনাসক্ত হযে পডে বইল—এমনটা হয না এই সৃষ্টিতে। হয না। পুকষেব জীবনেও তাই।

যদি বহুজনকে নিযে কাববাব শুরু কবে—সে নাবীই হোক আব পুরুষই হোক— তা হলেও বহুব মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিযে একটা গোপন কিছু বচনা কবতে চায সে। হ্যাঁ তা চায। এবং গোপা মনে মনে নিশ্চয কবে জানে যে, যদি সেদিন ওই কুডি মিনিটেব একটি বিশেষ কালব্যাপী একটি জীবন সুতোয বুননেব অধ্যায নাই আসত তাহলেও অন্য কাকব সঙ্গে একটা বুননেব পালা অবশ্যম্ভাবীরূপে চলত। যে-কোন মেয়ে যাদেব জীবনে বাল্য পাব হযে কৈশোব, কৈশোব পাব হযে যৌবন এসে অন্তত কিছুটা কাল কেটেছে— তাদেব জীবনেব গড়ন লক্ষ্য কবে দেখো, দেখবে কোন একটা চাবা গাছেব কাণ্ড বা ডালে জড়িয়ে উপব পাকেব চিহ্ন তাব গডনেব

মধ্যে রয়েছে। লোহার স্প্রিংয়ের পাকের মতো পাকে পাকে জড়ানো স্মৃতি বহন করছে।

জ্যোতি না এলে অন্য কাউকে জড়িয়ে ধরত তার মন তার জীবন। তবে তা ভেবে কি লাভ? জ্যোতি এসেছিল, তাকে সে জড়িয়ে ধরেছিল, তারই হাজার কথা আজ মনের মধ্যে ভিড় করে এসে ঠেলাঠেলি করছে,—বলছে ভেবে দেখ বিচার করে দেখ—যা তুমি বললে জ্যোতিকে তা তোমার বলা ঠিক হলো কি না?

জ্যোতি আজ ষোল বছব তোমাকে জডিয়ে ধরতে দিযেছে নিজেকে। দেহ না হোক মন বটে। দেহই বা নয় কেন? যাক্ কতটা দিলে সত্য করে দেহ দেওয়া হয় সে হিসাব জটিল।

যাক্ সে হিসেব সে বিচার। কি হবে?

যা দিয়েছে তাই দিযেছে। তাতে আপসোস তাব নেই। আজ দেওযা-নেওয়ার পালা গুটিযে নেবার মুহূর্তে বেদনা এবং দুঃখেই সে ভেঙে পডেছে। এ দুঃখ এ বেদনা এ মুহূর্ত যেন তুফানের মতো। এ বিক্ষোভ এ চাঞ্চল্য যখন থাকবে না তখন তুফান না থাক বেদনা দুঃখ থাকবে পারাপারহীন মোহনাব নদীর মতো। পারও থাকবে না, তলও পাওযা সোজা হবে না। শুধু তো জ্যোতিকে হারানো নয়—নিজেকে বঞ্চনা।

এইটেই বুঝি সেই ভাগ্যনিযন্তাব তার জীবন-নাটকের নির্দিষ্ট পরিণাম। তা না হলে—। তা না হলে-- জ্যোতির সঙ্গে জীবনটা এমনভাবে জড়ালো কেন। সে তো বমাদির মতোই হতে পাবত। যত শোচনীয় পরিণামই হোক বমাদির এমন করে অনন্ত দুঃখের পাবাপারহীন নদীতে ভাসার থেকে অনেক ভাল।

বিচিত্র বচনা। রমাদিই ডেকে এনেছিলেন জ্যোতিকে।

যে রমাদি প্রথম একদিন রাস্তায় জ্যোতিকে তার দিকে তাকাতে দেখে বলেছিলেন—খুব সাবধান গোপা! খুব সাবধান! ওদের থেকে খুব সাবধান। সেই রমাদিই ওই ট্যাক্সি বেসের দিন তিনেক পরে জ্যোতিকে সঙ্গে কবে এনে বাড়ি ঢুকলেন।

—গোপা, কাকে এনেছি দেখ!

ঘরেব ভিতর থেকে গোপা উত্তর দিয়েছিল—কে রমাদি?

—ট্যাক্সি রেসের জকিকে।

—ট্যাক্সি রেসের জকিকে? মানে? বলে কৌতূহলের সঙ্গে রান্নাঘরের ভিতর থেকে উঁকি মেরে জ্যোতিকে দেখেই বিচিত্রভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল অথচ যুক্তি-তর্কের মতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার কাবণ অন্তত কার্যে যা ঘটেছে তার মধ্যে ছিল না। উচ্ছ্বাসের কারণটা ঠিক বাস্তবতা বিচার করে মেলে না। এ কারণ বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু। অথবা অতি সূক্ষ্ম বাস্তবতা, যাকে বাস্তবতা বলে ধরা যায না। তুলনা অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যের মতো। যার মূল্য বাঁদিকে কিছু না কিন্তু ডান দিক হলে হয় দশগুণ।

জ্যোতিকে দেখে সে উচ্ছ্বসিত কৌতুকে বলে উঠেছিল—ওঃ মা! রেস উইনার, জে-পি—কি ভাগ্যি?

রমা বলেছিল—বোকার মতো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমি রাস্তায় ঢুকেই লম্বা ঢেঙা ছোকরাকে দেখেই চিনেছি। এ সেই জকি দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোতি একেবারে লাজুক মেয়ের মতো মাথা নিচু করে মৃদু মৃদু হাসছিল।

রমাদি বলেছিল—কিন্তু তুই উইনার বলছিস কেন? ও হারু। হেরেছে।

—তা বলছ কেন? জ্যোতিবাবুর গাড়িই কিন্তু আগে ক্রস করে বেরিয়ে গেল। আমরা পরে বাঁদিকে বেঁকলাম।

—বাজে বকিসনি। দেখ না আমরা দিব্যি পৌঁছেটৌছে ঘরকন্না গুছিয়ে বসেছি, ও এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে খোঁজ করতে এসেছে—আমরা নিরাপদে পৌঁছেছি কিনা আমাদের কষ্টতষ্ট হয়েছিল কিনা। জিজ্ঞাসা করলাম—আগে তোমার খেলার খবর বল? জিতেছ না হেরেছ? বললে—হেরেছি। জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম হার?

বললে, দুই—এক। বললাম—তোমাদের সে একটা কার ক্রেডিটে। বললে—আমার পাস, সেন্টারম্যানের স্কোর। এরপর ওকে উইনার কে বলবে!

নিজের থলিটা গোপার হাতে দিয়ে বলেছিল রমাদি—দেখ ওর মধ্যে লেবু আছে আর চারটে ডিম আছে।

—ডিম?

—হ্যাঁ। ফুটপাথে বিক্রি হচ্ছিল, কিনে আনলাম।

সেদিন অনেকক্ষণ বসে ওমলেটের সঙ্গে চা খেয়ে জ্যোতি বাড়ি গিয়েছিল। তার মনের মধ্যে জ্যোতিপ্রসাদ সম্পর্কে একটি প্রীতিরস যেন মনের প্রতিটি কোষ থেকে ক্ষরিত হয়েছিল, যখন সে চলে গেল তখন তার মনের ঘাসের উপব একটি নিটোল শিশিরবিন্দুর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো কাব্য একটু বেশি হলো। কিন্তু সেদিন, গোপা হলফ করে বলতে পারে যে, জীবনেব ছোঁওয়া-ছুঁইয়ি, নাড়াচাড়া, দেওয়া-নেওযার কারবার থেকে ওই শিশিরবিন্দুর মতো অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী অলীক বা কল্পনার ব্যাপারটাই বড় ছিল।

— তাই থাকে। ওখান থেকেই শুরু।

নতুন করে শুরু করলে রমাদি। যে রমাদি পাড়ার পুলিশ সারজেন্ট বলে খ্যাত।

এর তিনদিন পর সেদিন রিমিঝিমি বৃষ্টির দিন সন্ধ্যের পর রমাদি ইউনিফর্মপরা জ্যোতির সঙ্গে বাঁ হাতে একটা টাটকা ইলিশ ঝুলিয়ে নিযে বাড়ি ঢুকল। এবং কোলাহল করে বললে, ওরে জ্যোতি আজ একলা দুটো গোল দিয়েছে রে। ইলিশ মাছ কিনে আনলাম বাগবাজার ঘাট থেকে— ওকে ইলিশ মাছ ভাজা খাইয়ে দে। কি সুন্দর খেলেরে জ্যোতি, তোকে কি বলব গোপা!

—তুমি খেলাও দেখলে না কি?

থমকে গেল রমাদি। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আজ বিকেলে সে হাসপাতালে

খুড়ীমাকে অর্থাৎ গোপার মাকে দেখতে যায়নি গোপার সঙ্গে। বিকেল সাড়ে তিনটার সময় একসঙ্গে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার একটা জরুরী কাজ ছিল ধর্মতলায় বলে গোপা মেডিকেল কলেজে নেমে গেল, সে নামেনি, চলে গিয়েছিল ভবানীপুর। ওখানকার দু'তিনটে দোকানে তাকে সাপ্লাই দিতে হয় কয়েকটা জিনিস। বিশেষ করে ধূপকাঠি। তার সঙ্গে আরও কয়েকটা ওষুধ। এগুলো তার বাবার তৈরি ওষুধ।

এর মধ্যে জ্যোতির খেলা কখন দেখলে রমাদি? প্রশ্নটা খপ্ করে করে ফেলেছিল গোপা। রমাদি থমকে গিয়ে সেকেন্ড দুই কেমন হয়ে গেল তারপর বললে—ভাল। গোপা, বেশ জেরা করতে শিখেছিস তো! খেলাও দেখলে নাকি? হ্যাঁ দেখলাম। ট্রামে যাচ্ছিলাম, ট্রাম লাইনের পাশে মিউজিয়ামের সামনের গ্রাউন্ডে খেলা হচ্ছিল। দেখলাম একজন একটা শট করলে খুব জোরে। একেবারে গোলে ঢুকে গেল। পার্ক সার্কাস ক্রসিং-এর মাথায় ট্রামটা দাঁড়িয়ে। বেশ দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম যে শট করলে সে আমাদের জ্যোতি জকি। খুব উৎসাহ লাগল। মনে মনে বললাম—মরুক গে ব্যবসা। খেলা দেখি আমাদের জকির। তারপর আরও একটা গোল দিল জকি। খেলার শেষে ওকে নিয়ে চিৎপুরের ট্রামে উঠে বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ কিনে আনলাম। বাদলার দিনে ওকে ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি খাওয়াব।

এক নিঃশ্বাসে দম দেওয়া পুতুলের মতো বলে গেল রমাদি। কখনও তাড়াতাড়ি, কখনও একটু থেমে, কখনও একটু ভেবে নিয়ে, কখনও বেশ খানিকটা হাসির সঙ্গে। এমনভাবে রমাদি কথা বলে না।

গোপা বুঝতে পেরেছিল যে রমাদি মিথ্যে কথা বলছে—গড়ে গড়ে বলছে রমাদি। মধ্যে মধ্যে সকরুণ হেসে অপ্রতিভভাবে ঢাকতে চাচ্ছে।

* * *

রমাদি কথাটা স্বীকার করেছিল তার কাছে। নিদারুণ কষ্টের মধ্যে রমাদি তাকে কথাগুলো বলেছিল।

প্রায় আরও আট-ন' মাসের পর।

এই আট মাসে বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল।

না। কিসের বিস্ময়কর? কোথায় বিস্ময়কর? এই পৃথিবীতে যে সৃষ্টির নিয়মটি—প্রকৃতিই হোক আর ঈশ্বরই হোক—নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করতে গেলে এমনি কাণ্ডই তো ঘটবার কথা!

এগার

হঠাৎ রমাদি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। যেন হারিয়ে গেলেন।

গোপার মনে পড়ছে। রাত্রি তখন নটা-দশটা—হঠাৎ ক্ষমাদি এসেছিলেন ওদের বাড়ি।

—গোপা! দিদি আসেনি?

—রমাদি ?

ক্ষমাদি যেন মুখ ঝামটে উঠেছিল।—নইলে আর কে ? দিদি আর আমার ক'টা আছে ?

সবিস্ময়ে গোপা বলেছিল—কিন্তু রমাদি তো সেই রাগ করে চলে গেছে আর তো আসে না। তুমি তো জান।

—কি বিপদ দেখ দেখি!

—কেন ? কি হয়েছে বড়দির ?

—জানি না। আজ ভোরে উঠে—। মানে সকাল থেকে বেরিয়ে গেছে—এখনও ফেরেনি। ভাবলাম তোর এখানে যদি এসে থাকে।

ঘটনার আদি এবং অন্ত, অর্থ এবং সত্য ঠিক ধরতে পারেনি গোপা। যেন খানিকটা হেঁয়ালি হেঁয়ালি। রহস্য রহস্য মনে হয়েছিল। সকালে গিয়ে রমাদির ফিরতে তো রাত্রি হামেশাই হয়। রাত্রির শোতে সিনেমা দেখে রমাদি একলা বাড়ি ফেরে বারোটার পর। একালের বারোটার পর রাত্রির কলকাতাকে ভুতুড়ে কলকাতা মনে হয়। দোকানপাট ঘরদোর সব বন্ধ। রাস্তাঘাট থমথম করে। মানুষজন থাকে না, কেমন গা ছমছম করে। তারই মধ্যে রমাদি ফেরে হন্‌হন্‌ করে। সেই রমাদির জন্যে রাত্রি দশটার মধ্যে ক্ষমাদির এই উৎকণ্ঠা, ভাবনার কারণটা যেন সে বুঝতে পারছে না। অথচ ক্ষমাদির কণ্ঠস্বরের উৎকণ্ঠার অন্তরালে একটা চাপা কিছু যেন পুঞ্জীভূত হয়ে জমে আছে।

ক্ষমাদি বলেনি একটা কথা। রমাদি ভোরবেলা বা সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়নি। রমাদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে কাল দুপুরে। সকলে যখন ঘুমিয়েছিল বা আধ ঘুমন্ত হয়েছিল তখন সে বেরিয়ে গেছে। কেউ লক্ষ্য করেনি। করার কথাও তো নয়! দোকানে দোকানে অনেকের বাড়িতে সে টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত জিনিস বেচে আসে যে মেয়ে, সে কখন বের হচ্ছে তারই বা কে খোঁজ রাখে। কি কি নিয়ে বের হলো তারই বা কে খোঁজ রাখে। গতকাল দুপুর, মানে বেলা দুটো থেকে আজ বেলা দুটো—চব্বিশ ঘণ্টা এবং তারপর রাত্রি দশটা পর্যন্ত আট ঘণ্টা—সবসুদ্ধ বত্রিশ ঘণ্টা রমাদি বাড়ি নেই—বা বাড়ি ফেরেনি। ক্রমশ ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছিল যে রমার একটা স্যুটকেস নেই, তার সঙ্গে তার ভাল শাড়ি ব্লাউজ সায়া যে ক'টা সেগুলো নেই, তার সঙ্গে আরও পরে দেখা গেল ক্ষমার কিছু সোনার গহনা ছিল, একটা হাতঘড়ি ছিল—তাও নেই।

ব্যাপারটা ঘটেছিল বিচিত্র পথে। নাটকীয় ভঙ্গিতে। কিন্তু গোপার মনে পড়ছে সোজাসুজিভাবে। রমাদি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ছত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার—সাঁইত্রিশ বছরে পা দিয়ে রমাদির জীবনে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সাঁইত্রিশ বছর যৌবনের অশান্ত কান্না কেঁদে কেঁদে হঠাৎ সেই অশান্তিতে গৃহত্যাগিনী হলো।

রমাদির মুখের খুব আগল বাঁধ ছিল না। তার মা অর্থাৎ খুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলত—মেয়েরা মেয়ে হলেও মানুষ খুড়ীমা। রক্তমাংসে গড়া শরীর। পাথরও

নয়, মাটিও নয়। আব যৌবনকাল যখন আসে তখন সে একটা জ্বালাও নিয়ে আসে। যৌবনজ্বালা দেহে জ্বলে, মনে জ্বলে। জলে নেভে না, ধুলোবালি চাপালে নেভে না, শ্মশানেব যত ভস্ম সব মেখে শিব যে শিব তাঁবও এ জ্বালা চাপা পড়েনি। আবাব নূতন কবে বব সাজতে হয়েছিল। ব্রহ্মা ছুটেছিলেন কন্যা সন্ধ্যাকে বুকে ধবতে। দেবীদেব কথা চাপা দেওয়া হয়েছে তবু অর্জুনকে দেখে বুড়ো বয়সে উর্বশীব কাণ্ড দেখে মর্ত্যবাসিনীদেব পূজা কবতে ইচ্ছে হয়।

কথাগুলো বমাদি গোপাব মাকে বলত তখন সৌবীন এবং নীপাব প্রসঙ্গেব সূত্র ধবে। ওদেব কথা উঠলেই মা ক্ষেপে যেতেন প্রায়। বলতেন -জন্তু! জন্তু! জন্তু ও দুটো। একটা পুরুষ জন্তু আব একটা মেয়ে জন্তু।

বমাদি শুরু কবত মৃদুভাবে প্রতিবাদ কবে। বলত, না—না—খুড়ীমা আপনি বড্ড বেশি রূঢ় কথা বলছেন। মানুষ মানুষ, বক্তমাংসেব দেহ তাব। দেবতা তো নয়।

ক্রমে চড়ত বমাদি। শেষে গিয়ে যখন চবমে পৌঁছুতো তখন ফণা তোলা সাপেব মতো মাথা খাড়া কবে, দৃঢ়ভাবে নেড়ে নেড়ে বলত, না — না —না। এ আমি মানব না। না —না না। এবং নিঃশ্বাস ফেলত সাপেব মতো। তাব নাকটা লম্বা ছিল। সে লম্বা টিকলো নাকটিব পেটী দুটো ফুলে ফুলে উঠতো। একটা উত্তাপ যেন বেবিয়ে আসত।

মা তাব বলতেন কেন? কেন একথা বলছিস? তুই কেন একথা বলবি? তুই তো নীপাব চেয়ে বড়, সৌবীন থেকে বড়। তোব এত বয়স হলো। বাপ বিয়ে দিতে পাবেনি। তুই নিজেব বাপকে সাহায্য কবাব জন্য এই সাবা শহবে ওষুধপাতি বিক্রি কবে এনে বাপকে সাহায্য কবছিস, কই তোব তো এমন মতি হয়নি। তুই তো পাবিসনি—কাকুব হাত ধবে চলে যেতে? পাবিস তুই বল?

একেবাবে স্তব্ধ হয়ে যেত বমাদি। একেব বে।

মা বেশি চাপাচাপি কবলে- খুব ধীবে ধীবে ঘাড় নাড়ত - না— না —না। অর্থাৎ -তা পাবে না, সে তা পাবে না।

সেই বমাদি— এই সাইত্রিশ বছব বয়সে গৃহত্যাগিনী হলো।

তাব আগে যে কি কবে কি ঘটেছিল, তা গোপা জানে না। শেষ মাস চাবেক বমাদি তাদেব সংস্রব ছেড়েছিল। ঝগড়া কবে ছেড়েছিল। তাব আগেব কথাগুলি মনে পড়ছে গোপাব।

* * *

সেই ইলিশ মাছ ভাজা আব খিচুড়িব নিমন্ত্রণেব পব, বোধ হয় মাসখানেক পব ডাক্তাববা বললেন—এ পা আব ঠিক সাববে না। হাড়েব উপব যে সরু চিড়টা খেয়েছিল সেটা কমেনি সেটা বেড়েছে, সেটাকে পুবো সাবানো সে অনেক ঝঞ্ঝাট। কেউ বলে অপাবেশন কবে দেখতে হবে। তাতে সাবতেও পাবে, না সাবতেও পাবে।

কেউ বলে অপারেশন করে হাড়ের ফুলো অংশটা স্ক্রেপ করে দিতে হবে। কেউ বলে—কিছু, কেউ বলে কিছু। মা বলেছিল—থাক্ আমি বাড়ি যাব।

মা জেদী মেয়ে। মাস দেড়েক পর হঠাৎ বাড়ি ফিরে এল। সম্পূর্ণ হঠাৎ। সে থাক। তার আগে এই দেড় মাসের কথা মনে পড়ছে। এই দেড় মাসের মধ্যে জ্যোতি খুব কাছে এসে গেল। সে নিয়ে এল রমাদি। ওই খিচুড়ি ইলিশের ভোজের পর থেকে তিনিই তাকে নিয়ে আসতেন। জ্যোতি এসে অবশ্য মুখচোরার মতো বসে থাকত। কথাবার্তা কম বলত। কথা বেশি বলত রমাদি, বেশি কেন—সব কথাই সে বলত। গোপাও অবশ্য বলত কিছু কিছু; কিন্তু জ্যোতি একেবারেই কথা বলত না। সে শুনত এবং মৃদু মৃদু হাসত। এবং সুযোগ পেলেই প্রসন্ন হৃদ্য দৃষ্টিতে গোপার দিকে তাকিয়ে নিত। গোপা অনেকটা সহজভাবে তাকাতে পারত, লজ্জার হেতু হয়তো ছিল, কিন্তু সেটাকে সে জয় করতেই চাইত। আমল সে দিত না তার কুমারী হৃদয়ের লজ্জাকে। যে লজ্জা স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর লতার মতো সবুজ হয়ে আপনি আপনি জন্মেছে—যে কোন দোলায় সে হাতের স্পর্শের হোক, বাতাসের হোক—লাগলেই সে লজ্জানত হয়ে নুয়ে পড়ে। কিন্তু ষোল আনা লজ্জাকে জয় করতে পারেনি। তবে কিছুটা পেরেছিল। সেটা খানিকটা রমাদির দৃষ্টান্ত তাতে সন্দেহ নেই। আর খানিকটা মায়ের অনুশাসন। যে মা তার—নীপাকে পার্ক সার্কাসে ওসমানের সঙ্গে এবং অ্যাংলোদের হ্যারিস জনের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশতে দিয়ে গৌরব অনুভব কবত—সে মা এ নয়। এ আর একজন। সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তার নিজের কোন সংস্কারের বাধা নেই। স্বাধীনতার পরের কাল থেকে সারা ভারতবর্ষে যে ঢেউ এসেছে—যাতে পুরনো সংস্কার নিযম রীতি নীতি ভেসে যাচ্ছে, তাতেই তার সব পুরনো সংস্কার ভেসে গেছে। সে নতুনকালের মেয়ে। কিন্তু তারই মধ্যে সে চিরকালের মেয়ে। পুরুষের কাছে সে আগে ধরা দেবে কেন? কেন সে তার চাউনিতে গলে পড়বে? কেন সে তার স্পর্শমাত্রে লজ্জাবতী লতার মতো বেঁকে নুয়ে যাবে?

নারী হৃদয়ে একটা আকুল আকুতি আছে একটি পুরুষ হৃদযের জন্য—নারী দেহের রোম কূপে কূপে ব্যাকুল আগ্রহ আছে সেই পুরুষটির সবল বাহুবেষ্টনীর মধ্যে এলিয়ে পড়বার জন্য। কিন্তু তার চেয়েও একটি প্রবলতর শক্তি তাকে দূরে স্থির হয়ে দাঁড করিয়ে রেখেছে। সে এক বিচিত্র নারী প্রকৃতিধর্ম, না সে এগিয়ে যাবে না। না।

তা সে যায়নি এবং জ্যোতিও নিজের লজ্জাকে এবং রমাদির অহরহ উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসতে পারেনি। তবু তাদের দু'জনের হাতে ধরা সুতোয় দুই প্রান্ত বার বার অদলবদল করে করে বুননের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।

এরই মধ্যে মা চলে এলেন—হাসপাতাল থেকে। নিজেই চলে এলেন। হাসপাতালে এমন করে শুয়ে তিনি থাকবেন না। থাকতে পারবেন না। এবং অপারেশনও করাবেন না। যা জীবনে আছে হবে।

মা চলে এসেছিলেন সকালে। সে এবং রমাদি দু'জনেই বিস্মিত হয়েছিল। কই? কাল বিকেলেও তো কিছু বলনি?

মা বলেছিলেন—বলব কি? রাত্রে ভেবে দেখলাম। সারা রাত ঘুম হলো না। সকালে উঠে চলে এলাম। ওদের বলে আসিনি।

—বলে আসনি?

—না।

মায়ের মুখখানা থমথম করছিল। গোপা বুঝতে পারেনি কি ঘটেছে। প্রগলভা রমাদি তাকে শাসন কবে বলে উঠেছিলেন—আপনি চলে এলেন। নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলে এলেন। বলছেন—পা যদি খোঁড়া হয় তো হবে। কিন্তু সারা জীবন আপনার সেবা কে করবে? বলুন?

মা ফেটে পড়েছিলেন—সে ভাবতে তোমাদের হবে না। নীপা গেছে, সৌরীন গেছে, গোপাও যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে—

—মা! চিৎকার করে উঠেছিল গোপা!—কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি। ওই বাড়িব জ্যোতিকে নিযে কি চলছে বাড়িতে? ইলিশ খিচুড়ি হচ্ছে, ডিম ভাজা চা হচ্ছে, মশলা মুড়ি সল্টেড বাদাম কেক দিযে বাড়িতে পার্টি চলছে। কেন? কাল সন্ধ্যেতে কোন লোক আমাকে গিয়ে বলে এসেছে। তাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারিনে।

মুহূর্তে বোবা হযে গিযেছিল দু'জনে। দু'জনে মানে—সে এবং রমা দু'জনেই। উত্তব খুঁজে পাযনি। কিন্তু কেন পাযনি সেকথা ভেবে আজ এতকাল পরে গোপা আশ্চর্য হচ্ছে। তাদের মেলামেশার মধ্যে তো কোন গোপন অভিপ্রায ছিল না।

মা আবার বলেছিল—রমা, তোমাকে কে বলেছে গোপার সঙ্গে জ্যোতির প্রেম কবিযে দিতে? বল? আমাব অনুমতি না নিযে—এসব তুমি কেন কবতে গেলে?

—চুপ কব খুড়ীমা। আমি চলে যাচ্ছি। আমি ভাল বুঝেছিলাম তাই করেছিলাম। আমাব মনে হযেছিল—

গোপার সেদিন বিস্ময লেগেছিল— প্রচণ্ড বিস্ময়! রমাদি বিবর্ণ মুখে অপবাধীর মতো ভাব চেযেও বেশি—চোবেব মতো যেন পালিযে গিযেছিল। এবং সেদিন আসেনি।

তার পরদিন আসেনি। জ্যাঠামশাযদের বাড়িতে গিযেও রমাদিকে ধরতে পাবেনি। রমাদি বাড়িতে এসেও বাড়িতে ঠিক থাকে না। যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেড়ায। কারুকে কিছু বলে না।

ক্ষমাদি বলেছিল—জানিনে বাবা। বাপ ওকে যা করেছে একেবারে খাণ্ডারণী! বলতে পারব না।

দু'-দিন পর বমাদিব সঙ্গে দেখা হযেছিল। রমাদি বলেছিল—আমাব কাছে তুই আসিসনে গোপা। আমিও আর যাব না তোদের বাড়ি।

একটু চুপ কবে থেকে বলেছিল—দেখ আমার ইচ্ছে ছিল তোদের দু'জনের ভাব কবিয়ে দি। কিন্তু—

অকস্মাৎ যেন জ্বলে উঠেছিল বমাদি। বলেছিল—এরা মেয়েদের পৃথিবীতে আনে—এনে জন্তু করে রাখে। নিজেরা অক্ষম, বিয়ে দিতে পারে না। দেবার ক্ষমতাও

নেই। বাড়িব ঝি-বাঁদী হয়ে থাকতে হয়। নিজেবা মেয়েবা যদি নিজেব পথ নিজেব ঘব গড়ে না নেয় তবে তাবা যাবে কোথা? দাঁড়াবে কোথা? আব নেবে নাই বা কেন? সে একটা প্রচণ্ড বক্তৃতা অথবা মনেব ক্ষোভ মনেব আগ্নেয়গিবিব মুখ খুলে গিয়েছিল। বলেছিল—আমবা ছাগল না ভেড়া না গরু? যাব খুশি হাতে ওবা তুলে দেবে? তাও ক্ষমতা নেই। আমবা নিজেবা খুজে নেব আমাদেব জন। কেন শুনব ওদেব কথা? কেঁদে ফেলেছিল বমাদি।

জ্যোতিও আব আসেনি।

গোপাব জীবন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। একি হলো? বমাদি চলে গেল। জ্যোতি আব আসে না। বোগা মা যেন ক্ষ্যাপা আহত জন্তুব মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে—অহবহ তাকে আক্রমণ কবছে কথা দিয়ে, কাদছে। এই অসহনীয় অবস্থাব মধ্যে সে কি কববে? এবই মধ্যে পেয়েছিল সে প্রথম প্রেম-পত্র জ্যোতিব পত্র।

ছোট্ট চিঠি।

গোপা—আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রাণেব চেয়েও বেশি ভালবাসি। কতদিন বলতে চেয়েছি—কিন্তু পাবিনি। আজ লিখে জানালাম। না জানিয়ে পাবলাম না। ভালবাসি। আমি তোমাকে ভালবাসি। পৃথিবীতে বোধহয় এত ভালবাসা কেউ কাউকে বাসেনি।

চিঠিখানা একখানা বইয়েব ভিতব বেখে তাবই সঙ্গে দিয়েছিল, পথেব উপব।

গোপা কলেজ যাচ্ছিল। জ্যোতিও চলছিল। সে এ ফুটপাথে, জ্যোতি ও ফুটপাথে। বড় বাস্তায় পড়ে ট্রাম বাস্তাব দিকে মোড় নেবাব দু' তিন মিনিটেব মধ্যে পিছন থেকে দীর্ঘ পদক্ষেপে লম্বা জোয়ানও এসে তাব সঙ্গ নিয়েছিল। সে এ ফুটপাথে, জ্যোতি ও ফুটপাথে। হঠাৎ তাকে দেখে বলে উঠেছিল এই বইখানা।

—মানে বমাদিব কাছ থেকে নিয়েছিলাম। আপনাদেব বই।

বইখানা নতুন একখানা গীতবিতান।

হাতে প্রায় গুজে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

পবদিন ঠিক সেই জায়গায় আবাব দেখা হয়েছিল। ঠিক সেই পিছন দিক থেকে এসে তাকে অতিক্রম কবে চলে গিয়ে গতি মন্থব কবেছিল। সে এ ফুটপাথে— জ্যোতি ও ফুটপাথে।

কোন কথা হয়নি। পবস্পবেব দিকে বাববাব তাকাতে তাকাতে চলছিল তাবা। অতি মৃদু বেখায় আঁকা একটি হাসিব বেখা দু'জনেব মুখেই ফুটে উঠেছিল।

পবেব দিন আবাব দেখা হয়েছিল। ঠিক সেইভাবে। আজ আবাব চিঠি দিয়েছিল। তাব পাশ দিয়ে যাবাব সময় চিঠিখানা তাব দিকে বাড়িয়ে ধবেছিল—সে চিঠিখানা অনায়াসে নিয়ে নিয়েছিল।

"চিঠিব উত্তব দিলে না? তোমাব সঙ্গে আমাব অত্যন্ত জরুবি কথা আছে। উত্তব দিয়ো।"

চিঠির উত্তর তবু সে দেয়নি। তবে তার দিকে তাকিয়ে একটি প্রসন্ন হাসি দিয়ে যতখানি নিজেকে জানানো যায় তা জানিয়েছিল। সেই দিনই; হ্যাঁ সেই দিন রাত্রেই ক্ষমা এসেছিল তাদের বাড়ি।

—গোপা। দিদি আসেনি?

দিদি অর্থাৎ রমা কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি।

প্রথম বলেছিল ভোরবেলা বেরিয়ে এখনও ফেরেনি। তাই ক্ষমা বলেছিল—বাবা উতলা হয়ে পড়েছে। বড্ড উতলা হয়েছে।

তার মা ক্ষমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল—কথা বলেনি, কথা শুনেই যাচ্ছিল। হঠাৎ বলেছিল—সত্যি কথা বল ক্ষমা, লুকোস নে। রমা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে না?

এবার ক্ষমাদি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল—কাল দুপুরবেলা থেকে কোন খোঁজ নেই। বিকেলবেলা আমি খোঁজ করতে বেরিয়েছিলাম, কোন খোজ পাইনি। বাবা বলেছে গঙ্গায় ঝাঁপটাপ খেয়েছে নয় তো ট্রেনের তলায়টলায়—

বার

সেই বিষণ্ন মলিন জীর্ণ ঘরখানায় ভাঙা তক্তাপোশের উপর আবার একবার উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছিল, যেন ভেঙে পড়েছিল আছাড় খেয়ে। কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে কেঁদে তবে শান্ত হতে পেরেছিল।

রমাদি গৃহত্যাগই করেছিল। খবর পাওয়া গিয়েছিল আরও মাসতিনেক পর।

খবরটা এনেছিল জ্যোতিপ্রসাদ। জ্যোতিকেই খবর দিয়েছিল রমাদি। চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল "আমাকে উদ্ধার করতে পার? মনের ভুলে ঝোঁকের বশে তোমাদের উপর রাগ করে নিজের ভাগ্যের উপর শোধ নিতে, জীবনের জ্বালায় এইভাবে ঝাপ খেয়েছিলাম। তিলে তিলে মরছি। মর ত দুঃখ নেই। কিন্তু তার আগে তুমি একবার এস।"

রমাদি বিচিত্র রমাদি। অথবা বিচিত্র নারীজীবন নারীমন। তার কামনার কথা বলতে পারেনি। তাই বা কেন ঠিক হয়তো বিচার করে বুঝতেও পারেনি তাই রমাদি নিজের মুখেই তাকে বলেছিল।

রমাদি নিখোঁজ হওয়ার পর জ্যোতির জীবনের সঙ্গে তার জীবনের যে বুনন চলছিল তাতে ক'দিন ছেদ পড়েছিল।

মা চিৎকার করত। যেন অনুমান করতে পারত যে, জ্যোতির সঙ্গে তার দেখা হয় রাস্তায়। সে নিজে ভয় পেত। যদি জ্যোতির সঙ্গে এখন জড়িয়ে যায় সে, তার টানে আর বাড়ি ফেরার পথ না থাকে? মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ করত মন। বলত—না থাকে না থাকবে। কিন্তু সে শুধু বলাই, কথার কথা; সে সাহস তার হয়নি। জ্যোতিও যেন আপনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। সেও যেন ভয় পেয়েছিল। তিন মাস ধরে

তারা সরে সরে ছিল; দেখাও খুব কম হয়েছে। দেখা হলেও কেউ কারুর দিকে তাকায়নি।

জ্যোতি সেদিন গোপার মায়ের ভয়কে তুচ্ছ করেও এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের দোরে। মৃদু মৃদু কড়া নেড়েছিল আর ডেকেছিল কে আছেন বাড়িতে? গোপা দেবী আছেন? গোপা দেবী?

মা ঘুমিয়েছিল, গোপা জেগে ছিল। সে বেরিয়ে এসে জ্যোতিকে দেখে চমকে উঠেছিল, মুখখানা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল, চাপা গলায় বলেছিল—কি? মা ভারী চটে যাবে।

জ্যোতি বলেছিল, চিঠিটা দেখ।

সে যখন চিঠিটা দেখছিল, জ্যোতি তখন বলে গিয়েছিল মৃদুস্বরে—তোমাকে আমি বলিনি, বলতে লজ্জা হয়েছিল, সুযোগও পাইনি। রমাদি সব সময় থাকতেন হাজির। রমাদি। রমাদি আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। আমি তার থেকে কত ছোট তিনি আমাকে—। একটু থেমে বোধ করি সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বলেছিল—তিনি আমাকে ভালবেসেছিলেন। সেসব চিঠি আমাব কাছে আছে। তোমার মা সেদিন বকাবকি করাতে আমাকে পথে পাকডাও করে বলেছিলেন আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল জ্যোতি। আমি ছুটে পালিয়েছিলাম। সেইদিন উনিও পালিয়েছিলেন। আমি তোমাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—জরুরি কথা কিন্তু তুমি তার উত্তর দাওনি। না হলে বলতাম এসব কথা।

গোপা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—আমি কি বলব?

—আমি কি করব বল? আমি যাব?

—জানিনে! বলে ঘরের দোর বন্ধ করে দিয়েছিল সে। কিন্তু পবের দিন সে এসে আবার কড়া নেড়েছিল। এবার আস্তে নয়। জোরে জোরে। বেরিয়ে এসে দেখেছিল জ্যোতি। এবং তার সঙ্গে পুলিশ।

রমাদি পালিয়েছিল একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে। হিন্দুস্থানীটা তাকে ছোরা মেরেছে। রমাদি হাসপাতালে মরছে।

রমাদি কাতরাতে কাতরাতে বলেছিল—জ্যোতি, তুমি গোপাকে যেন ভালবেসো না। বিয়ে করো না। জ্যোতি। জ্যোতি। না। না। রমাদি প্রলাপ বকেছিল।

* * *

বিচিত্র, অতি বিচিত্র মানুষ এবং মানুষের মন। সেইদিনই ফেরবার পথে দু'জনেই মনে মনে সংকল্প করেছিল তারা দু'জনে বিয়ে করবেই! বিয়ে করতে তারা বাধ্য। বিধাতার এই নির্দেশ। কারণ ভাল তাবা পরস্পবকে বেসেছে। সম্পূর্ণভাবে বেসেছে ভাল। যেটুকু বাকি ছিল আজই তা এই রমাদির মৃত্যুশয্যায় তার নিষেধকে অমান্য করে পূর্ণ হয়ে গেল। কেউ বা কোন অদৃশ্য নির্দেশ যেন পূর্ণ করে দিল। কিন্তু কেউ কাউকে বলেনি। মাথা হেঁট করে চলেই এসেছিল নীরবে।

১৯৫২ সাল। রমাদি মরেছে জানুয়ারির পনের তারিখে।

আজ ১৯৫৭ সাল। মে মাস। ষোল বছর চার মাস কয়েক দিন। সেই বিবাহের দিনটির জন্য তারা প্রতীক্ষা করেছিল। দু'জনেই। গভীরতম আগ্রহে একটি দিন ও লগ্নের অপেক্ষা করেছে। সেসময় তার বয়স ছিল আঠারো। আজ তার বয়স চৌত্রিশ, চৌত্রিশ কেন পঁয়ত্রিশ। জ্যোতি বোধহয় আটত্রিশ পার হলো! আজ সেই প্রতীক্ষার শেষ হলো —সেই শপথ মিথ্যে হয়ে গেল, একটি স্বপ্ন ভেঙে শূন্যে মিলিয়ে গেল, একটি ভালবাসার সমাধি হলো।

হে ভগবান।

* * *

১৯৫২ সালের বোধ হয় সে এক বসন্ত দিন। তারিখ মনে নেই—কিন্তু সে ছিল এক বসন্ত দিন।

রমাদি মারা গিয়েছিল জানুয়ারিতে। বসন্ত দিন—সে মার্চ মাস– ফাল্গুন। এই দু'মাস কয়েক দিন—তার সঙ্গে জ্যোতির দেখা হয়নি। মনে মনে ওরা সংকল্প করে এসেছিল—রমাদির শিয়রে দাঁড়িয়ে যে তারা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসবে। কিন্তু বলেনি কেউ কাউকে। বাড়ি ফিরে ভয় হয়েছিল। কি ভয় সে আজ মনে পড়ছে না। কেন ভয় তাও বলতে পারবে না। তবে ভয় হয়েছিল এবং পরস্পর থেকে যেন দূরে দূরেই থাকতে চেয়েছিল—না। কাজ নেই। কাজ নেই।

বাড়িতে মা গাল দিতে শুরু করেছিল তাকে। দিনরাত্রি গালাগাল। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই। জ্যাঠামশায় থেকে ও বাড়ির সকলে বলেছিল—এটা ঘটল গোপার জন্যে।

পাড়ার লোকে বলেছিল—জ্যোতির মতো লম্পট কেউ নেই। গোপার মতো বিশ্রী মেয়েও পাড়ায় আর নেই।

জ্যোতিও বাড়ি থেকে নির্বাসিত হয়েছিল একরকম। বাউণ্ডুলেব মতো ঘুবত—ঘুরে বেড়াত। দু'মাস পব তাদের দু'জনের দেখা হযেছিল বাজারে। সরস্বতী পুজোর আগের দিন। বসন্ত চতুর্থী ছিল সেদিন। বাজার করতে গিয়েছিল গোপা, একই আলুর দোকানে তার পিছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল জ্যোতি। হঠাৎ কার মৃদুস্বর কানে এসে ঢুকেছিল—গোপা!

গোপা চকিত হয়ে উঠেছিল—মাথা তুলে ফিরে তাকিয়ে জ্যোতিকে দেখে আত্মসম্বরণ করতে পারেনি, একমুহূর্তে প্রসন্ন হাসিতে তার মুখখানা ভরে উঠেছিল—বলেছিল—তুমি?

—হ্যাঁ।

স্থান-কাল ভুলে যেতে বসেছিল সে—সে বলেছিল, ওঃ আচ্ছা মানুষ তুমি—।

তার কাঁধে নিজের হাতখানি রেখে জ্যোতি বলেছিল—আলু কেনা শেষ করো আগে।

—যা ভিড়।

—সর, আমি ভিড় ঠেলে কিনি আর কিনে দি! কত?

—কত? আধ সের।

বাজার শেষ করে ফেরার পথে বাজারেই এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল দু'জনে।

সে অনেক কথা।

জ্যোতিদের বাড়ি অনেকজনের সংসার। এজমালী বাড়ি। ওরা পুরনো বাসিন্দে, বাগবাজারে বাস করে, ভটচাজ পুরোহিতের বংশজ। কাকারা কাজ করে কেউ করপোরেশনে, কেউ মার্চেন্ট আপিসে, কেউ ফিল্ম লাইনে অ্যাসিস্টান্টের কাজ করে। জ্যোতির মা আছে, দুটো বড় বড় বোন আছে। গোপারা বৈদ্য। রমা এবং গোপার সঙ্গে জড়িয়ে যে রটনা রটল—তাতে ওদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছিল। বাপ মা কাকারা সকলেই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। সে এখান-ওখান করে ফিরছিল। দিন দশেক আগে বাপ বিছানা নিয়েছে। করোনারি অ্যাটাক হয়েছিল! তাই ফিরেছে। তাদের সংসার এখন তার ঘাড়ে। কি করে চালাবে জানে না। সে যজমান রাখতে পারবে না! মন্ত্র জানে না—সংস্কৃত জানে না—শাস্ত্র বোঝে না, বিশ্বাস করে না। ভাবছে কি করবে? প্রথমটা চুপ করে থেকেছিল গোপা, কি উত্তর দেবে?

হঠাৎ জ্যোতি বলেছিল—তবে বিশ্বাস করো—রমাদি সম্পর্কে আমার কোন দোষ নেই।

সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—জানি।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর জ্যোতি বলেছিল, আর একটা কথা বলব?

—বল।

—তোমাকে চিঠিতে লিখেছিলাম।

প্রতীক্ষা করে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল গোপা। কথাটা সে জানে। তবু উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। একটু থেমে অকারণে একবার মৃদু গলা ঝেড়ে নিয়ে জ্যোতি বলেছিল—আমি তোমাকে ভালবাসি।

কি উত্তর দেবে গোপা?

—গোপা!

—বল।

—উত্তর দাও।

—কি উত্তর দেব?

—তুমি?

অতি মৃদুস্বরে গোপা বলেছিল—বাসি।

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাজারের মেঝেতে দাগ টানতে টানতে জ্যোতি বলেছিল—আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে?

গোপা চুপ করে থেকেছিল।

—আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব। একটা চাকরি খুঁজেনি। না হলে—। বিষণ্ণ হেসে বলেছিল—দেখ আমি লেখাপড়া ভাল শিখিনি—দু'বার বি-এ ফেল করেছি। অবস্থায় বরাবর গরীব। তবে অমানুষ নই। হলে—রমাদি—

—থাক। সে বড় দুঃখী। তার নাম করো না।

—আমাকে মাপ করো তুমি। ভুল হয়েছিল আমার।

—তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও। চাকরি খোঁজ। আমাকেও পড়া ছাড়তে হবে। আমার পঙ্গু মা ঘরে। সামান্য ক'হাজার টাকা আছে। —এই বাজারে—। আমিও চাকরি খুঁজব। দু'জনে চাকরি পেলে তখন—।

এতক্ষণে গোপা মুখ তুলে জ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এবং সে মুখ—প্রত্যাশায় প্রসন্ন—এবং সহাস্য। জ্যোতির মুখের উপর সেই প্রসন্ন হাসিমুখের ছটা পড়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল তাকে—জ্যোতিও হেসেছিল।

কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে—চোখ নামিয়ে নিয়ে তারা বাজার থেকে বেরিয়েছিল। গোপা এইখানে বলেছিল—কিন্তু একটা কথা।

—কি ?

—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব, তুমি আমাব জন্য অপেক্ষা করবে কিন্তু যেখানে সেখানে পথে ঘাটে নির্লজ্জের মতো হাসবে না। মিথ্যে মিথ্যে চিঠি লিখবে না। কেমন ?

— বেশ।

তেরো

একটি ছেলে একটি মেয়ে। বেলা ঠিক সাড়ে ন'টায় বাগবাজাব স্ট্রীটের মোড়ে—দু'জনে দু'জনেব দিকে তাকিয়ে একটু হাসত। হয়তো বা একবারেব বদলে দু'বাব। কোনদিন এ আসত এক মিনিট আগে, কোনদিন ও আসত দেড় মিনিট আগে। তাবপর গতি মন্থর করত; আস্তে আস্তে হাঁটত। একটু দাঁড়াত। এরই মধ্যে অন্যজন এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখত। হঠাৎ চোখে চোখ মিলত। সঙ্গে সঙ্গে চোখে জ্বলত আলো, ঠোঁটে ফুটত হাসি। গোপা একটু ঝোঁক দিয়ে মাথা হেঁট করে হাসিটুকু গোপন করে হন্ হন্ করে হাঁটত।

– দেরি হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে। উঃ। কোনরকমে জ্যোতির সঙ্গ নিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে আউড়ে যেত। অর্থাৎ জ্যোতিকেই বলত।

একটি শব্দ ভেসে আসত—কেন ? কি হয়েছিল ?

—আবার কি ? মায়ের বকুনি ! রোগা মানুষ তো !

একসঙ্গে দু'জনের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ত।

মনে পড়ছে মা একদিন মাথা কুটছিল। সেই পলিটিকাল হাঙ্গামার সময়। বেঙ্গল-বিহার মার্জার নিয়ে হাঙ্গামা। রাত্রি ন'টার সময় জ্যোতির রক্ত মুছিয়ে কাপড় রাঙ্গা কবে বাড়ি ঢুকেছিল। সেইদিন সে মাকে স্পষ্ট করে বলেছিল—হ্যাঁ জ্যোতিকে আমি

ভালবাসি—ভালবাসি। এবং ভালবাসব। যতদিন বাঁচবো—ততদিন বাসব ভাল। তুমি তো তুমি—ভগবান বারণ করলেও মানব না। ওকে আমি ভালবাসব। কথাটা মনে করে মুখে মৃদু বিষন্ন হাসি ফুটে উঠল গোপার। কোন্ সাল সেটা? মনে পড়ছে না। তখন চাকরি তার তিন চার বছর হয়ে গেছে।

জ্যোতিরও চাকরি হযেছে তখন। তার চাকরি হয়েছিল আগে।

আই-এ পাশ করতে সে পারেনি। লোকে বলেছিল—দোষ নেই। এই বাচ্চা মেয়ে—বাড়িতে রোগা মা—সারা সংসার, পড়বে কখন? ওদিকে মজুত টাকা ক্রমশ ফুরিযে আসছিল। ছ' হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট থেকে সেভিংস অ্যাকাউন্টে এসেছিল। এবং কমে আসছিল। সম্বল ছিল মাযের দুটো এবং তার একটা প্রাইভেট টিউশনি। তিনটিতে পঁযতাল্লিশ টাকা। একটা মানুষের সংসারও পঁয়তাল্লিশে চলে না। তা দু'জনের সংসার তার উপর একজন রোগী।

এর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে দাদা সৌরীনের মধুবর্ষী পত্র আসত। তাব মাইনে দেড়শো টাকায় তার চলছে না—তার উপর তার ছেলে হযেছে, বাপের পরিত্যক্ত টাকা ছেলেতেই পায়। সে অনুগ্রহ করে টাকাটা তোমরাই নিযো বলেছিল বলে তাদের এমন করে ষোল আনা আত্মসাৎ করা উচিত নয। এখানে সে উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। তারা বলেছে—প্রভিডেন্ড ফান্ডেব যে টাকা তাব মা•অভিভাবিকা হিসেবে ড্র কবেছিল তার পাই পয়সা হিসেব দিতে হবে তাকে।

মা অবশ্য এতে ভয পায়নি। টাকাও দেয়নি। তবে হঠাৎ চিঠি এল সৌবীনের ছেলের অসুখ। টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না। মা এবার টাকা পাঠিযেছিল কিছু।

থাক সেসব কথা। টাকা নইলে জীবন চলে না কিন্তু টাকা জীবনেব কথা নয়। টাকার কথা জীবন কেনাবেচার কথা। টাকা নইলে পেট ভরে না, তাই তাকে তখন পড়াশুনা ছেড়ে চাকরির জন্য ছুটতে হয়েছিল।

চাকরি একটা পেযেওছিল।

বাবার আপিসে চাকরি! বাবা চাকরি করত বিলিতী মার্চেন্ট আপিসে, আপিসে বাবার সুনাম ছিল। বিশেষ করে তার উদার মতের জন্যে সাহেবরা ভালবাসতো। সেইখানে একখানা দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে তখনও একজন পুরনো সাহেব ছিল—তার হাতে দরখাস্তখানা পৌঁছতেই কাজ হয়েছিল, সমস্ত শুনে চাকরি তাকে একটা দিয়েছিল। চাকরি সামান্য। ডেসপ্যাচে খাম বন্ধ করা—চিঠির হিসেব রাখা ছিল তার ডিউটি। মাইনে আশি টাকা, ডি এ নিয়ে একশো টাকা। সাহেব বলেছিল—তুমি আই-এ পাশ কর, মাইনে বাড়বে।

জ্যোতি খবরটা শুনে বলেছিল—এবার আমি একটা চাকরি পেলেই ব্যস। বুঝেছ!

গোপা তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল—মন তার বলেছিল—হ্যাঁ। দু'জনের উপার্জনে তারা ঘর বাঁধবে।

তারপর আরও মাস কতক পরে চাকরি হয়েছিল জ্যোতির। চাকরি আপিসে বসে

কাজ করার চাকরি নয়। ডক ইয়ার্ডে মাল ডেলিভারি দেবার জন্যে ডকের উপর গুদোমের মুখে বসে থাকত যারা তাদের মধ্যে একজন ছিল সে।

সেখানেও গেছে গোপা। দেখে এসেছে। ক্রেন,—নানান ধরনের মাল—লোহা-লক্কড়, প্যাকিং বাক্স, চটে মোড়া বড় বড় পেটী, মোটরকার, বিচিত্র জ্যোতির কর্মস্থল—ঝন ঝন ঠং ঠং থেকে বিপুল গর্জন—তার মধ্যে চীনে ক্যাপের মতো ক্যাপ পরে ময়লা প্যান্ট ময়লা হাফশার্ট পরে জ্যোতি বলত—নামুক। নামুক। নামুক।

অথবা উঠাও-উঠাও। আরও। আরও।

তারই মধ্যে হঠাৎ লোহার গাদার উপর আছড়ে পড়ত আরও লোহার মাল।

জ্যোতির আগে ছুটি হলে সে এসে দাঁড়িয়ে থাকত—তার আপিসের সামনে, না হলে পায়ে হেঁটে সে যেত স্ট্র্যান্ড রোডের ওপাশে—ডক গোডাউনের এলাকায় জ্যোতির খোঁজে। সেখান থেকে হেঁটে আসত এসপ্ল্যানেড। সেখান থেকে বাড়ি। ছাড়াছাড়ি হত বাগবাজারের মোড় থেকে। সে চলত এ ফুটপাথ ধরে, জ্যোতি চলত ও ফুটপাথ ধরে। গোপার উত্তর দিক—জ্যোতির দক্ষিণ ফুটপাথ ছিল নির্দিষ্ট।

কাঁটাপুকুরের মোড়ে দক্ষিণ দিকের ফুটপাথের মোড় থেকে নেমে দাঁড়ায় জ্যোতি। সিগারেট ধরায় কোণের দোকানের দড়ির আগুনে। উত্তর দিক থেকে রাস্তা পার হয়ে এসে তার গা ঘেঁষে পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে যেত গুড নাইট। কোনদিন বলত— আসি। কোনদিন বলত—কথাটা যেন মনে থাকে। কোনদিন মনের রং গাঢ় থাকলে একটা খোঁচা দিয়ে চলে যেত। কিছুদূর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসির সম্ভাষণ জানাতো।

জ্যোতি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কোন কোন সময়ে সেও বলত কথা—হঠাৎ দূরের কাউকে যেন সম্ভাষণ করে হাত তুলে বলত—বাই-বাই। আবার কাল। গুড নাইট। অথবা কাল একটু সকালে বেরুব। মনে থাকে যেন। বেটাছেলে তো—দূরের কোন কল্পিত মানুষকে উপলক্ষ করে তার দিকে লক্ষ্য করে কথাগুলো ছুঁড়ে মারত।

মধ্যে মধ্যে এর জন্যে অনুযোগ করত গোপা।—কোনদিন কে বুঝে ফেলবে—সেদিন হবে।

—কেউ ধরতে পারবে না।

—না, পারবে না। তুমি চেঁচাও—সে উত্তর দেয় না—লোকের সন্দেহ হবে না? চালাকি!

—পারলে তো পারলে! আমি গ্রাহ্য করি নে। তুমি ভয় পাও কেন বলতো?

—কেন? মায়ের জন্যে! জান তো!

চুপ করে যেত জ্যোতি।

—তা ছাড়া। গোপা বলত—তোমারও এমন বেপরোয়া হওয়া উচিত নয়। দুই বোনের বিয়ে দিতে হবে। আমি বদ্যি ঘরের মেয়ে—আমার দিদি আমার দাদা যা করেছে সে তো হিন্দু সমাজ সহ্য করবে না—এত বেপরোয়া হয়ো না।

এসব কথা হত ওই ছুটিব পর—গঙ্গাব ধাবে বসে। বসে বসে দু'জনে চিনেবাদাম অথবা চানাচুব অথবা ফুচকা খেত আব কল্পনা কবত।

ভবিষ্যতেব কল্পনা। দু'জনেব মাইনে—দু'শো পঞ্চাশ টাকা। গোপা ঘাড নেড়ে বলত—এতে তিনটে এস্টাবলিশমেন্ট চলবে না। চলতে পাবে না। বিয়ে হলে আমাব মায়েব একটা, তোমাব মা-বোনদেব একটা, আমাদেব একটা বাসা—ওতে চলবে না।

কোনক্রমেই হিসেব মেলেনি। মেলাতে পাবেনি!

জ্যোতি বলেছিল—কাব কি হবে দেখে দবকাব নেই গোপা! আমবা এস আলাদা সংসাব পাতি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হতাশায ক্লান্ত স্ববে গোপা বলেছিল— তাই কি হয? মাকে—আমাব মাযেব কথা বলছি—একেবাবে খোঁডা হযে গেছেন— পাখানা শুকিযে আসছে, বল কি কবে ফেলে দেব? তাই পাবি?

অনেকক্ষণ পব জ্যোতি বলেছিল —পাবা উচিত।

—পাবা উচিত?

—নয? ওঁবা পাববেন না আমাদেব মিলিত সংসাবে থাকতে, আমবা কেন পাবব ওঁদেব জন্যে কষ্ট কবতে? কেন যাব ত্যাগ স্বীকাব কবতে?

ঠিক এই সমযে এসপ্ল্যানেডে যেন একটা কুটিল ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ ফেটে পডেছিল। চমকে উঠেছিল দু'জনে।—কি? কি আব? মানুষেব চিৎকাব। মানুষ গর্জাচ্ছে প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষোভে! ঝডেব মতো সমুদ্রেব মতো। বাংলাদেশকে বিহাবেব সঙ্গে এক কবে মিশিযে দেবাব প্রস্তাব কবেছেন ড'ঃ বিধানচন্দ্র বায। তাবই প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হযে উঠেছে বাঙালী। আজ বিকেলে প্রতিবাদ সভা হবাব কথা— মিছিল বেব হবাব কথা। দু'জনে দু'জনেব মুখেব দিকে তাকিযে উত্তব খুঁজছিল। উত্তব এল গুলিব শব্দে। এবং তাব সঙ্গে কোলাহল ভেসে এল।

তাবা তাডাতাডি উঠে পডেছিল। চল—বাডি চল।

ততক্ষণে বাস ট্রাম সব বন্ধ। এবং আন্দোলন যেন শুকনো ঘাসেব আগুনেব মতো চাবিদিকে ছডিযে পডেছে। দোকানপাট বন্ধ হযে গেছে। পথেব আলো থাকতে থাকতে নিভে যাচ্ছে। ঘন অন্ধকাবে ভবে উঠছে –ইঁট কাঠ-পাথবেব বাডি দিযে গডা মহানগবীব পথঘাট। অবাজকতা বিশৃঙ্খলা সাবা শহবেব বুকেব উপব গাঢ অন্ধকাবেব মধ্যে অবণ্যেব বাত্রিকে যেন মূর্তিমন্ত কবে তুলেছিল। সে অন্ধকাব যেন বাত্রিব অন্ধকাব থেকে গাঢ এবং ভযাল। বড বড বাডিগুলো স্থাবব অন্ধকাবেব মতো চাবিপাশে খাডা হয়ে দাডিযেছিল। যেন কোন টানেলেব মধ্যে বা খনিব মধ্যে অন্ধকাব। দূবে ফাযাবিংযেব শব্দ উঠছিল—কোলাহল উঠছিল—দলবদ্ধ মানুষেব ক্রুদ্ধ গর্জন। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বেগে ভাবী লবী সম্ভবত পুলিশ ট্রাক বা ভ্যান চলে যাচ্ছিল দুবন্ত বেগে। এবই মধ্যে দু'জনে হাটছিল। ঘুবে ঘুবে চলছিল। বড বাস্তা এডিযে চলছিল। চলতে চলতে হঠাৎ এসে পড়ে গিযেছিল সংঘর্ষেব মধ্যে। তাবা পডেনি, সংঘর্ষটাই ধাবমান হয়ে

এসে তাদের নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। একদল মানুষ পুলিশের তাড়ায় ছুটে এসেছিল তাদের দিকে এবং আরও পিছিয়ে গিয়ে তাদের ফেলেছিল ঠিক মাঝখানে। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল তারা। ভেবে পায়নি কি করবে। কোন্ দিক দিয়ে এগুবে। একদিকে পুলিশ আর অন্যদিকে ক্ষুব্ধ মানুষ। এরা ছুঁড়ছে টিয়ার-গ্যাস, ওরা ছুঁড়ছে ঢেলা। পালাব কোন্ পথে, কোথায় পথ? মনে আছে জ্যোতি তার হাত ধরে বলেছিল—ভয় করো না গোপা। চলে এস। পাশে যে গলি পাব ঢুকে পড়ব।

—চল। কিন্তু গলিতে মোড় নিতে নিতে একটা ঢেলা এসে পড়েছিল জ্যোতির মাথায়। একটা আর্তনাদ করে উঠেছিল সে।

সেও আর্তভাবে বলেছিল—জ্যোতি!

—কিছু না, চলে এস। এই গলিতেই ঢুকে পড়।

তাই ঢুকেছিল। রাত্রিতে যখন বাড়ি এসে পৌঁচেছিল তখন রাত্রি সাড়ে আটটা, মা আগ্নেয়গিরির মতো এসেছিল। সে বাড়ি ঢুকল। মা তার দিকে তাকিয়ে দেখে চিৎকার করে উঠেছিল। কাপড়খানার সামনের দিকটা রক্তাক্ত। বাকিটা ধুলোয় কাদায় নোংরা। পথে একটা খোলা হাইড্রেন্টের জলের মধ্যে পা পিছলে পড়েছিল গোপা। মা বলেছিল—গোপা! খুন হয়েছিস?

গোপা শান্ত শুষ্ককণ্ঠে বলেছিল—না।

—তবে? রক্ত লাগল কিসের? এত রক্ত? গোপা?

গোপা সেদিন নাম গোপন করেনি। বলেছিল—জ্যোতির। আসবার সময় দাঙ্গার মধ্যে পড়েছিলাম। একটা ঢেলা লেগে জ্যোতির মাথাটা ফেটে গেছে। সেই রক্ত।

মা চিৎকার করে প্রশ্ন করেছিল—জ্যোতি? জ্যোতি কোত্থেকে এল? তার রক্ত তুই মুছিয়ে দিতে গেলি কেন? গোপা!

—মা।

—বল।

—চিৎকার করো না মা। একটু থামতে দাও।

মা শোনেনি।

সে তখন বলেছিল, শোন মা, সে আমাকে ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসি।

—গোপা?

—চেঁচিয়ো না মা। জ্যোতিকে আমি ভালবাসি—আমি তাকে ভালবাসব। তুমি তো তুমি মা, ভগবান বারণ করলেও আমি শুনব না। না।

—গোপা। মা প্রথম হিংস্রভাবে চিৎকার করে উঠেছিল, এবার মায়ের থেকেও জোর চিৎকার করে উঠেছিল গোপা—সে—না-না-না।

পরদিন সে মায়ের সামনে দিয়েই জ্যোতির খোঁজ নিতে গিয়েছিল। কোন সঙ্কোচ ছিল না তার। জ্যোতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল পথে। জ্যোতিও আসছিল তার খোঁজ নিতে।

তারও বাড়িতে হাঙ্গামা কম হয়নি। প্রচণ্ড ঝগড়া। রাত্রে ঝগড়ার জন্য হাঁড়ি চড়েনি।

জ্যোতির বাড়িতে কথাটা ঠিক গোপন ছিল না। বোনেরা জেনে ফেলেছিল। তারা সেদিন তুফান তুলেছিল। জ্যোতি তাতে টলেনি। বলেছিল—বেশ কালই আমি চলে যাব।

জ্যোতি গোপাকে বলেছিল—চল আজই যাব ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ওখানে।

সে বলেছিল—দাঁড়াও আর একটু ভাবি। সে একটু ভাবা ভাবতে গিয়ে তার শেষ হয়নি।

চৌদ্দ

সে ভাবনাব আব শেষ হলো না।

পা বাড়াতে গেলেই গোপার চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে উঠত মায়ের মুখ। শুকিয়ে গেছে মানুষটা, আছে কঙ্কালটা আর তার উপর চামড়াখানা। আর আছে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ।

জ্যোতিকে মা দেখতে পারে না ববাবর। তার কাবণ জ্যোতিদের বাড়িটা নিতান্ত গোঁড়া হিন্দু ভটচাজ বামুনেব বাড়ি। পুরুত ভটচাজেব ছেলে জ্যোতিপ্রসাদ। জ্যোতি শুধু ফুটবল খেলতে জানে। তার মধ্যে জীবনের উচ্চমার্গীয় আর কিছু নেই। তাব সেই প্রগতিশীল মা দাঙ্গাব ধাক্কায় খানিকটা ধর্মমুখিনী হযেও ওই মোহ ছাড়তে পারেনি। তাছাড়া এ সংসারে সে যাই হোক গোপাকে যে কেড়ে নেবে বা নিচ্ছে তাকে ক্ষমা করতে পারে না এই মা-টি। না। সে পারবে না। তাতে যে যা বলবে বলুক। আঘাত অভাবে পৃথিবীর প্রতি আক্রোশে তাব মাথাবও গোলমাল হযে গেছে। দিনে তিনবার অন্তত সেই পাখানাকে টানতে টানতে বাড়ির দবজাব দিকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলে; বেবিযে যাবে বাড়ি থেকে, ভিক্ষে করে খাবে।

গোপা ধবে আনে।

মা তাকে শপথ করাতে চায—বল—তুই জ্যোতিকে বিযে কর্বাব নে?

গোপা বলে—না, তা কিছুতেই বলব না। বলতে পাবব না। তাহলে তুমি যা খুশি কর।

মা চুপ কবে দবজাব চৌকাঠ ধরে বসে থেকে বলে—তাহলে বল আমি বেঁচে থাকতে বিযে করবি নে!

গোপা তা বলেছে।—বেশ তাই বলছি।—তুমি মর—তারপর।

মধ্যে মধ্যে মা সে চিৎকাবও করে, তুই আমাকে মেবে ফেলতে চাস!

গোপা সচরাচর উত্তর দেয না। এক-একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে—বলে, চাই। কিন্তু তা তো পাবি নে। ভাবিও যে, তুমি মববে—কিন্তু তুমি অমর, তুমি মর না। হয় তো আমি মরবো তখনও তুমি বেঁচে থাকবে। আমার মৃত্যুব পর যা করতে চাও তাই করবে। ওই ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলে ভিক্ষে করে বেড়াবে। মা কেঁদে ওঠে ডুকরে, আমাব মবণ তাকাচ্ছিস। সে বলে—তাকাচ্ছি—তাকাচ্ছি। না তাকিয়ে কি করব? তুমি যে নিজের ছাড়া আমার দিকে তাকাবে না কোনদিন?

উদয়াস্ত কান্নার মধ্যে জীবন চলে। তবু এই কুম্ভীপাক থেকে বের হতে পারেনি সে।

জ্যোতির এ দুর্বলতা কম। তারও বাড়িতে এমনি কলহ কোলাহলের মধ্যে জীবন চলে। সে বার বার বলেছে; ১৯৫২ সাল থেকে পনের বছর ধরে এই '৬৭ সাল পর্যন্ত অন্তত পনের শো বার বলেছে—আমাদের জীবন কি এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে গোপা? ওই বুড়ো হাবড়া পূর্বপুরুষদের মৃত্যু হয় না বলে ওদের মৃত্যু কি আমরা মাথায় করব?

—তোমার দুই বোন?

—যাক। তারা আপনাদের পথ দেখুক। তোমার দাদা তোমার কথা ভেবেছিল? ওর তো সংসারে কারুর সঙ্গ—

—থাক। আর বলো না জ্যোতি। আমার কষ্ট হচ্ছে।

—হয়তো আমার উপর ঘেন্না হচ্ছে তোমার। তা হোক, কি করব? চারিদিকে তাকিয়ে দেখ। মেয়েরা ছেলেরা স্বাধীনভাবে যাচ্ছে ম্যারেজ রেজেস্ট্রি আপিসে, বিয়ে করে চলে আসছে। কার দিকে তাকাচ্ছে তারা? তারা সকলে অন্যায় করছে? না করছে না।

গোপা বলেছে—হয় তো করছে না। অন্যায় আমিই করছি। মানছি! কিন্তু—

—কি কিন্তু—

—ভাত খেতে বসলে একজন কেউ না খেয়ে সেদিকে চেয়ে থাকলে আমি খেতে পারি নে জ্যোতি। আমি দুর্বল। কি করব? তা ছাড়া—

—কি তা ছাড়া?

—এই তো পনের বছরের মধ্যে, তোমার চাকরি যাই যাই হলো তিনবার। টেম্পোরারী থেকে পারমানেন্ট হলো না। আমার চাকরিতে কোনরকমে মা-মেয়ের খাওয়া-পরা চলে। এতে আমরা ঘর বেঁধে কি করব বল? ছেলে হবে—মেয়ে হবে—তাদের মুখে কি দেব? চালের কেজি তিন টাকা, নুনের কেজি পনের পয়সা; বল আমাদের কি করে চলবে? আমি এর থেকে বেশি দুঃখ সইতে পারব না জ্যোতি। ছেঁড়া কাপড় পরে উনোনশালে বসে উনোনে জল ফুটবে—ছেলেটা দুধের জন্যে আমাকে ছিঁড়বে—আমি তোমায় গাল দেব—তা আমি পারব না জ্যোতি—

—তা হলে?

—তা হলে অপেক্ষা কর জ্যোতি। আমরা পথ চেয়ে থাকি। সুদিনের—

—সুদিনের? তেতো হাসি হাসে জ্যোতি এ কথা শুনে।

গোপা বলে—কেন? সুদিন নিশ্চয় আসতে পারে।

—আকাশ থেকে ঝরে পড়বে?

—দিন আকাশে সূর্য উঠেই শুরু হয় জ্যোতি।

—সুদিন কিভাবে আসবে, সে সূর্যোদয় কিভাবে হবে বল শুনি।

—জানি নে। তবে আসবে না ঐ কথা মানি নে। ধর আমি লটারির টিকিট

কিনেছি চাবখানা। তা থেকে পেতে পাবি। আমাব নামে কিনেছি ননডিপ্লুম দিয়েছি 'জ্যোতি।' পঞ্চাশ হাজাবও যদি পাই তাহলে সুদিন নিশ্চয হবে আমাদেব। ধর চাকরি ছেড়ে একটা ব্যবসা কববে তুমি—পাড়াগাঁয়ে কিছু জমি-জেবাত কিনে ঘব কবে নেব। সেখানে চাষবাস নিযে আমি থাকব। আমাব মা তোমাব মা-বোনদেব মাসে একটা কবে টাকা দেব—

জ্যোতি বসে থাকত চুপ কবে। হঠাৎ নীববতা ভঙ্গ কবে বলে উঠত, পাড়াগাঁয়ে জমি-জেবাত এ প্ল্যান ঠিক হবে না। বুঝেছ? তাব থেকে বাড়িতে ছোটখাটো কল— গেঞ্জি মোজা—এসব বসালে তুমি কযেকটা মেযে নিযে তৈবি কবলে আমি বিক্রি কবব দোকান কবে।

গোপা কতবাব বলেছে—আমাব ধাবণা এবাব আমি পাবই একটা প্রাইজ। আমাব কি বকম ধাবণা হযে গেছে।

৫৫ সাল থেকে ৬৭ সাল বাবো বছব। বাবো বছবে চাব বাবো আটচল্লিশখানা লটাবিব টিকিট তাব বাক্সে মজুত কবা আছে।

প্রতি বৎসবই টিকিট কেনা থেকে খবব বেব হবাব সময পর্যন্ত তাদেব জীবনে একটি প্রত্যাশাব সময এসেছে। মাস দুই বা তিন কাল তাবা দু'জনে ঠিক ওই কাঁটাপুকুবেব মোড়ে পবস্পবেব জন্য প্রতীক্ষা কবেছে, ঘড়িব কাটাব মতো দু'জনেব পা একসঙ্গে চলতে শুরু কবেছে, পূর্ব মুখে পবস্পবেব দিকে তাকিযে হেসেছে, মুখ দীপ্ত হযেছে, চোখেব চাউনিতে আলো ঝলসেছে। ছুটিব পব নিত্য প্ল্যান। নতুন প্ল্যান হযেছে। জ্যোতি মোটব ড্রাইভাবি শিখেছে। ড্রাইভাবি চাকবিব জন্য নয, এমনি শিখেছে কাজে লাগবে বলে। মনে গোপন ইচ্ছে ছিল একটা ট্যাক্সি নেয। কিন্তু গোপা তা চায না। মোটব ড্রাইভাবি তাব কোনমতেই পছন্দ নয। গোপা খববেব কাগজ থেকে জাযগা জমি বিক্রিব বিজ্ঞাপন থেকে কাটিং কবে তাব ভ্যানিটি ব্যাগেব ভিতব বেখেছে একটা খাতাব পাতায পেস্ট কবে।

'কুড়ি বিঘা ধানী জমি সমেত একখানি ইটেব গাঁথনি টালিব ছাউনি বাড়ি, একটি ছোট পুকুব—কলিকাতা হইতে বিশ মাইলেব মধ্যে সস্তায বিক্রয হইবে। মূল্য চল্লিশ হাজাবেব মধ্যে। সত্বব অনুসন্ধান করুন।'

—খবব নিও তো টিকিট বিক্রি যাবা কবে তাদেব কাছে কবে খবব বেব হবে। কেমন? কাল মা যা কবেছে না? যা হোক একটা কবতেই হবে এবাব। বুঝেছ।

—কি হযেছে?

—কাল দাদাব একখানা চিঠি এসেছে।

—সৌবীনদাব?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছেন?

—শবীব খাবাপ হযেছে খুব, কলকাতায ডাক্তাব দেখাতে আসছেন। সেই নিযে সে যাচ্ছেতাই কবেছে মা।

—কি ? দাদাকে আসতে দেবেন না ?

—না। আমিই না বলেছি। তাইতেই যাচ্ছেতাই।

—তুমি বলেছ ?

—হ্যাঁ বলেছি। আর সহ্য করতে আমি পারছি নে জ্যোতি।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল জ্যোতি।—আমি তো তোমাকে কতদিন থেকে সাধ্যসাধনা করছি। বাপ! রোজ আয়না দেখি আর হতাশ হই মাথার দিকে তাকিয়ে। মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে।

—বাজে কেন বক।

কথাটা বলেছিল গোপা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ঝরে পড়েছিল। বয়স তারও পঁয়ত্রিশ পার হতে চলেছে। তালুর উপরে সিঁথির পাশে তারও দু'গাছা চুল পেকেছে। নিত্যই সে সযত্নে ওইখানটা আয়নার সামনে ধরে খুঁজে দেখে। এবং তোলা চুল এতটুকু মুখ বাড়ালেই তুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজে দুইয়ের জায়গায় তিন গাছা হয়েছে কিনা। তিন গাছা হতে দেরি নেই। হয়তো বা কালই হবে। অথবা হয়েই আছে—খুঁজে পায়নি।

সুতরাং আর দেরি করা চলবে না।

সে বলেছিল—হ্যাঁ। জ্যোতি আমি আর পারছি নে। দাদা হোক মা হোক—যে হোক আর আমি পারছি নে জ্যোতি—এমন করে নিজেকে নিঃশেষ করতে আমি পারছি নে, পারব না। তুমি আমাকে নাও। জ্যোতি তুমি আমাকে নাও।

জ্যোতি তাকে দুই হাতে টেনে বুকে নিতে চেয়েছিল—সেই গঙ্গার ধারেই—সেই আধো অন্ধকারের মধ্যে। ওপারে পশ্চিম আকাশে হাওড়ার কলকারখানার চিমনিগুলো কালো তর্জনী তুলে যেন শাসিয়েছিল। আশ্চর্যভাবে তাই তার মনে হয়েছিল কে যেন শাসাচ্ছে। সে ভয় পায়নি—লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল—না —না। সবুরই তো করলে আজ বিশ বছর। আর ক'টা দিন সবুরই কর না। ক'টা দিন তো!

পরের দিন দুপুরবেলা এসেছিল সৌরীন।

গোপা সন্ধ্যের সময় এসে চমকে উঠল। বাড়ির বারান্দায় ক'টি ছেলেমেয়ে। দুটি কিশোরী মেয়ে, দুটি ছেলে, বাচ্চা, ছোটটার বয়স বছর পাঁচেক। অবাক হয়ে তারাও ওকে দেখেছিল, সেও তাদের অবাক হয়ে দেখেছিল।

—কে ? এরা ?

অনুমান করতে পারছে কিন্তু মন বললে—না—বিশ্বাস করো না। হে ভগবান, তা যেন না হয়। না হয়! কিন্তু ঠিক তাই। বড় মেয়েটি এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আপনি পিসীমা ? গলা জিভ সব শুকিয়ে গেয়েছিল —নীরস কণ্ঠে জিহ্বায় সে বলেছিল—তোমরা কে ?

—আমি মলি। মলিনা সেন। সৌরীন সেন আমার বাবা।

—আমি ডলি। ডাবলু বাবলু এস, পিসীমাকে প্রণাম কর।

—বাবা কোথা তোমাদের ?

—ওঘরে ঠাকুরমার কাছে।

অবাক হয়েছিল—এরই মধ্যে পরিচয় তারা জমিয়ে ফেলেছে, তাদের অধিকারের জবব দখল শেষ করে ফেলেছে। তিক্ত হয়ে উঠেছিল সমস্ত জীবন।

ঘবের ভিতবে গিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেয়েছিল।

কঙ্কালসার দাদা বিছানায় শুয়ে আছে। মা বসে আছে শিয়রে। চোখের জল ফেলছে।

দাদাব পেটে কি হযেছে। ডাক্তাববা বলেছে ক্যানসার। এখানে এসেছে দেখাবাব জন্যে।

ছেলেগুলোকে নিয়ে এসেছে। বাধ্য হযেছে নিয়ে আসতে। কাবণ মেয়ে দুটো বড হযেছে, বড়টাব বযস চৌদ্দ, ছোটটাব বযস বারো, ওদেব মা নেই। মা মরেনি। ডাইভোর্স হয়ে গেছে। সে চলে গেছে আসানসোল থেকে মোকামা। সে এখন এক ইঞ্জিনীয়াবেব স্ত্রী। কথাটা চাপা ছিল, লেখেনি, জানায়নি সৌবীন।

মায়েব স্নেহ পারাবার উথলে উঠেছে।

শিযবে বসে কাঁদতে শুরু করেছে।

সৌবীন বলেছিল—বস গোপা। তাবপব হেসে বলেছিল একটা গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—বলেছিল—তোকেই কষ্ট দিতে এলাম বে—

কোন উত্তর দেয়নি গোপা।

—আব যে কাউকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পেলাম না বে?

এবাব কেঁদে ফেলেছিল গোপা।

পনের

আজ সব মীমাংসা হযে গেল।

১৯৫৭ সালেব মে মাসেব রাত্রি। বাইবের স্যাঁতসেঁতে পলেস্তাবা ঘবেব তক্তাপোশের উপর একেবাবে ভেঙে যেন শুয়ে পড়েছে গোপা।

সব শেষ হযে গেল। জ্যোতিকে সে ফিবিয়ে দিল।

—না, আব তা হয় না জ্যোতি। আর তা হয না! না-না-না! আমি—আব তা পারব না। আমাব দ্বাবা তা হবে না।

অর্থাৎ তাদের বিয়ে।

জ্যোতি রাগ করে চলে গেল। গোপা বললে, আমাকে মাফ কর তুমি। আমার আব উপায় নেই।

আমি জানি এটা আমাব দুর্বলতা। কেন—কেন—সৌরীন কি গোপাব দিকে তাকিয়েছিল? না তাকায়নি। ওই ছেলেমেয়েগুলোকে তার মা স্বচ্ছন্দে ফেলে দিয়ে তাব নতুন জীবনে নতুন ঘরে দিব্যি হাসছে, নিশ্চিত নিদ্রায় তার নতুন স্বামীর বাহু-বন্ধনের মধ্যে নিপীড়িত হয়ে জীবনরস আনন্দরস উপভোগ করছে—আর তুমি,

তুমি কেন তাদের ভার ঘাড়ে তুলে নিয়ে এমন করে নিজেকে নিজে দণ্ড দিচ্ছ—জীবনকে দুর্বহ করে তুলছ? কেন—কেন—কেন?

গোপার সে কথা মানে জ্যোতি। সে মানে। এর মধ্যে কোন পুণ্য নেই, কোন মহত্ত্বও হয়তো নেই, এ ত্যাগ অর্থহীন। এবং গোপা তাদের ভার না নিলে তারা মরে যাবে, মানুষ হবে না এরও নিশ্চয়তা নেই। গোপার মধ্যে স্নেহের উৎসও ঠিক উথলে ওঠেনি। না ওঠেনি, তবুও ওদের সে ফেলে দিতে পারবে না। না, লোকলজ্জাও নয় চক্ষুলজ্জাও নয়, বাধ্যবাধকতাও নয়। তা নয়! মনের মধ্যে স্নেহসমুদ্র না উথলাক স্নেহের একটি মজাদীঘি অন্তত আছে। রাঢ় দেশে ছোট ছোট ঝর্ণা আছে, যা দেখলে মনে হয় রেল লাইনের ধারের কাটিং, ছোট্ট; অত্যন্ত অগভীর কিন্তু অহরহ কানায় কানায় ভরা। নালা দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা জল বেয়ে চলে যাচ্ছে। এমনি একটি কি যেন আছে। হয়তো কুণ্ড বলা যায়। ওইটিই জীবনরসের কুণ্ড। ওই রসের স্রোতের জন্যেই গোপা ওদের বিদায় করতে পারলে না।

পারা উচিত, তুমি বললে পারা উচিত।

নিশ্চয় উচিত। যে পারে—তার নিশ্চয় পারা উচিত।

গোপা হেরে গেল। পারলে না।

হাজারে হাজারে মেয়ে-ছেলে মিলে রেজেস্ট্রি আপিসে যাচ্ছে, বিয়ে করছে—স্বতন্ত্রভাবে ঘর বাঁধছে। বাঁধছে। হ্যাঁ বাঁধছে।

গোপারা তার থেকে নিচের।

ব্যঙ্গ করে তুমি বললে উপরের।

না। উপরের নিচের বিচার ছাড। গোপা গোপাই। হয়তো সে একলাই। সে পারলে না। পারলে না। হেরে গেলে।

সৌরীন মারা গেছে দিন পনের।

ছেলেমেয়ে ক'টি এখানেই আছে। কোথায় যাবে? গোপা বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ভাবতে পারছে না, এদের ছেড়ে সে চলে যাবে।

জ্যোতি বলেছিল—বেশ তো। ওরা থাক। আমরা ওদের নিয়েই ঘর বাঁধব।

গোপা ঘাড় নেড়েছিল—না।

—কেন?

—আমাদেরও তো ছেলে-মেয়ে হবে। তখন?

জ্যোতি আরও আধুনিক কথা বলেছিল। গোপা তাতেও সম্মতি দিতে পারেনি। সে বিবাহের মানে কি?

—না হয় আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর। যদি লটারিতে টাকা পাই!

জ্যোতি রাগ করে চলে গেল।

গোপা ভেঙে যেন পড়ে গেল। উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে তক্তাপোশের উপর।

এতকালের একটি অতি সাধারণ নিতান্ত কম মূল্যের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। একটি অকিঞ্চিৎকর প্রত্যাশার মৃত্যু হলো। হায় পৃথিবী!

* * *

মৃত্যু হলো যেন মনের। মাটির পৃথিবীতে শবদেহের মতো গোপার মধ্যে ওর মৃত আত্মার শবদেহটা পড়ে রইল অন্ত্যেষ্টির অপেক্ষায়, পথের ধারে পড়ে থাকা শবের মতো।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ভোরবেলা হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল গোপা।—বাজারে যেতে হবে। টিউশন আছে একটা। আপিস আছে। উঃ বাপরে! এর আর শেষ নেই।

তবে নাটক শেষ। যবনিকা ফেলে দাও।

না দাঁড়াও, অপেক্ষা কর। জ্যোতি ডাকলে।—গোপা!

—কেন? আবার কেন এলে তুমি! তুমি যাও।

—নাঃ। অন্য কথা বলতে এসেছি।

—বল।

—আজ আমাব বিয়ে। রমাদির বোন ক্ষমার সঙ্গে। তোমাকে সাক্ষী হতে হবে।

জ্যোতি হাসছে। গোপা হাসলে—বেশ। তাই হবে।

বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। এরপব আর ঘটবার কি রইল? যবনিকা ফেলে দাও। নাটক ব্যর্থ নয়—সে ব্যর্থ, সে পারলে না সার্থক হতে। সে-ই ব্যর্থ। স্বীকার করছে তা।
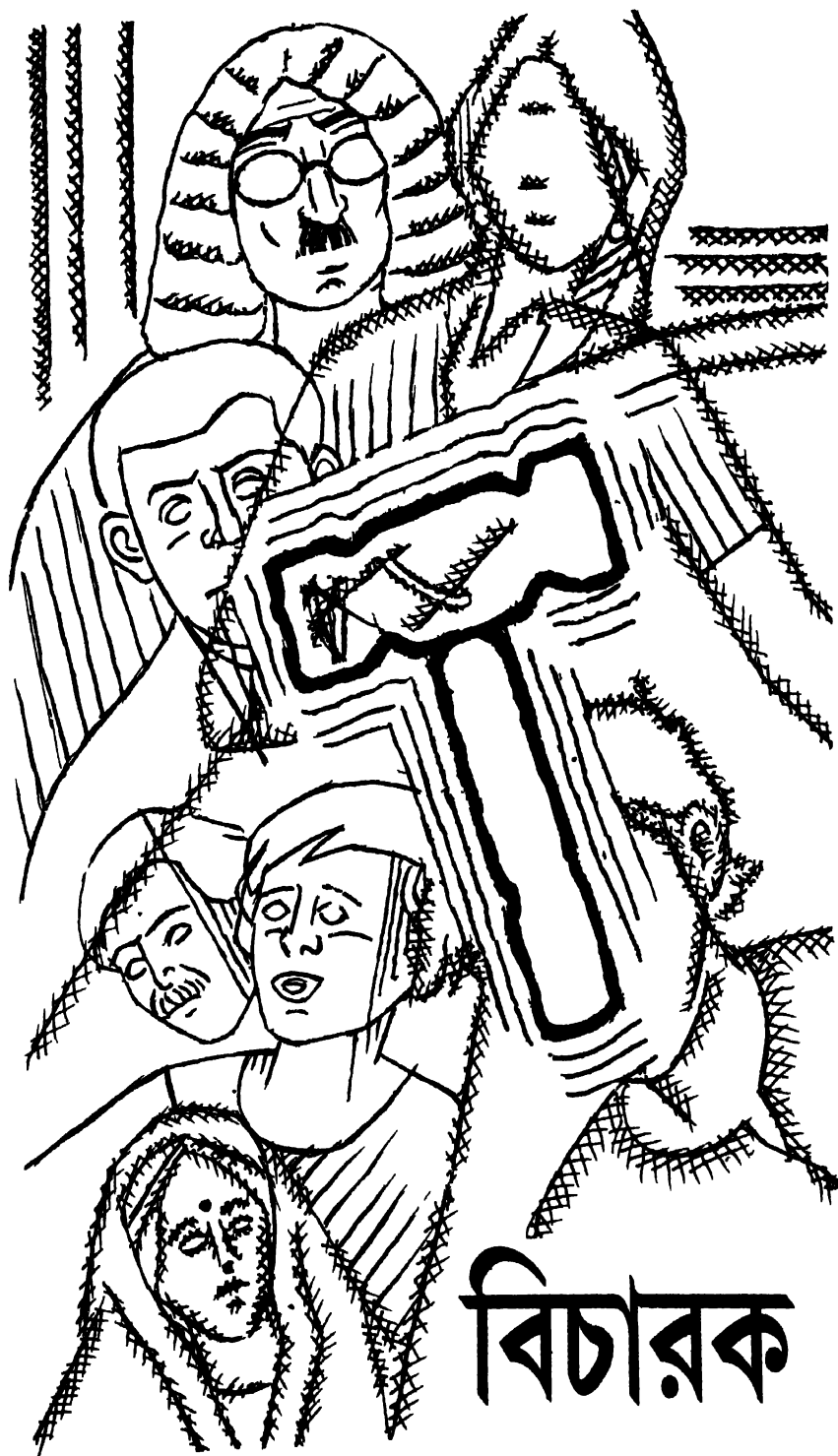
বিচারক

□●□

এক

(ক)

আদালতে দায়রা মামলা চলছিল। মামলার সবে প্রারম্ভ। মফস্বলের দায়রা আদালত। পশ্চিম বাংলার পশ্চিমদিকের ছোট একটি জেলা। জেলাটি সাধারণত শান্ত। খুনখারাবি দাঙ্গাহাঙ্গামা সচরাচর বড় একটা হয় না। মধ্যে মধ্যে যে দু'-চারটে দাঙ্গা বা মাথা-ফাটাফাটি হয সে এই কৃষিপ্রধান অঞ্চলটিতে চাষবাস নিয়ে গণ্ডগোল থেকে পাকিয়ে ওঠে। কখনও কখনও দু'-একটি দাঙ্গা বা মারামারি নারীঘটিত আইনের ব্যাপার নিয়েও ঘটে থাকে। অধিকাংশই নিম্ন আদালতের এলাকাতেই শেষ হয়ে যায়, ক্বচিৎ দুটি-চারটি আইনের জটিলতার টানে নিম্ন আদালতেব বেড়া ডিঙিয়ে দায়রা আদালতের এলাকায এসে পড়ে। যেমন সাধারণ চুরি কিন্তু চোর পাঁচজন—সুতরাং ডাকাতির পর্যায়ে পড়ে জজ-আদালতেব পরিবেশটিকে ঘোরালো করে তোলে। চাষের ব্যাপারে সেঁচের জল নিযে মারামারি, আঘাত বড জোর মাথা ফাটাফাটি, কিন্তু দু'পক্ষের লোকের সংখ্যাধিক্যের জন্য রায়টিং-এর চার্জে দায়বা আদালতে এসে পৌঁছয়। এই কারণে জেলাটি সবকাবী দপ্তরে বিশ্রামের জেলা বলে গণ্য করা হয় এবং কর্মভার-পীড়িত কর্মচারীদের অনেক সময় বিশ্রামের সুযোগ দেবার জন্য এই জেলাতে পাঠানো হয়। কিন্তু বর্তমান মামলাটি একটি জটিল দায়রা মামলা।

খুনের মকর্দমা। আদালতে লোকেব ভিড জমেছে। মামলাটি শুধু খুনের নয়, বিচিত্র খুনের মামলা।

অশোক-স্তম্ভখচিত প্রতীকের নীচেই বিচারকের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। অচঞ্চল, স্থির নিরাসক্ত মুখ, অপলক চোখের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত কিন্তু কোনও কিছুর উপর নিবদ্ধ নয়। সামনেই কোর্টরুমের ডানদিকের প্রশস্ত দরজাটির ওপাশে বারান্দায় মানুষের আনাগোনা। বারান্দার নীচে কোর্টকম্পাউন্ডের মধ্যে শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রিমিঝিমি বর্ষণ বা দেবদারু গাছটির পত্রপল্লবে বর্ষণসিক্ত বাতাসের আলোড়ন, সব কিছু ঘষা কাঁচের ওপারের ছবির মতো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একটা আকার আছে, জীবনস্পন্দনের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তার আবেদন নেই; বন্ধ জানালার ঘষা কাঁচের ঠেকায় ওপারেই হারিয়ে গেছে। সরকারী উকিল প্রারম্ভিক বক্তৃতায় ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে মামলাটির আনুপূর্বিক বিবরণ বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি মনের পটভূমিতে সেই ঘটনাগুলিকে পরের পর

তুলি দিয়ে এঁকে এঁকে চলেছিল। ক্বচিৎ কখনও সামনের টেবিলের উপর প্রসারিত তাঁর ডান-হাতখানিতে ধরা পেন্সিলটি ঘুরে-ঘুরে উঠছিল অথবা অত্যন্ত মৃদু আঘাতে আঘাত করছিল। তাও খুব জোর মিনিট-খানেকের জন্য।

প্রবীণ গম্ভীর মানুষ। বয়স ষাটের নীচেই। গৌরবর্ণ সুপুরুষ, সবল কর্মঠ দেহ, কিন্তু মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে। পরিচ্ছন্নভাবে কামানো গৌরবর্ণ মুখে নাকের দু'-পাশে দুটি এবং চওড়া কপালে সারি সারি কয়েকটি রেখা সারা অবয়বে যেন একটি ক্লান্ত বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে। লোক, বিশেষ উকিলেরা—যাঁরা তাঁর চাকরিজীবনের ইতিহাসের কথা জানেন—বলেন, অতিমাত্রায় চিন্তার ফল এ-দুটি। মুনসেফ থেকে জ্ঞানেন্দ্রবাবু আজ জজ হয়েছেন, সে অনেকেই হয়, কিন্তু তাঁর জীবনে লেখা যত রায আপিলের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এত আব কারুর হয়েছে বলে তাঁরা জানেন না। রায় লিখতে এত চিন্তা করার কথা তাঁরা একালে বিশেষ শোনেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর চিন্তাশক্তির গভীরতা নাকি বিস্ময়কর। প্রমাণপ্রয়োগ সাক্ষ্যসাবুদেব গভীরে ডুব দিয়ে তার এমন তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন যে, সমস্ত কিছুর সাধারণ অর্থ ও তথ্যের সত্য আমূল পরিবর্তিত হযে গিয়ে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়—অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারে তিনি ক্ষমাহীন। একটি নিজস্ব তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে তিনি ক্ষুরের ধারের উপর পদক্ষেপ করে শেষ প্রান্তে এসে তুলাদণ্ডের আধারে যে আধেয়টি জমে ওঠে তাই অকম্পিত হাতে তুলে দেন, সে বিষই হোক আর অমৃতই হোক।

(খ)

কর্মক্লান্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্রাম নেবার জন্যই ছোট এবং শান্ত জেলাটিতে মাস-কয়েক আগে এসেছেন। ইতিমধ্যেই উকিল এবং আমলা মহলে নানা গুজবের রটনা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথের আর্দালীটি হাল-আমলের বাঙালীর ছেলে। এদিকে ম্যাট্রিক ফেল। কৌতূহলী এবং উকিল আমলারা তাকে নানান প্রশ্ন করে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাধারণত আদালত এবং নিজের কুঠির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। ক্লাবের সভ্য পর্যন্ত হননি। এ নিয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীমহলেও গবেষণার অন্ত নেই।

এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নাকি বলেন যে, তাঁর স্ত্রী আর বই এই দুটিই হলো তাঁর সর্বোত্তম বন্ধু। আর বন্ধু তিনি কামনা করেন না।

প্রবাদ অনেক রকম তাঁর সম্বন্ধে। কেউ বলে তিনি শুচিবাইগ্রস্ত ব্রাহ্ম। কেউ বলে তিনি পুরো নাস্তিক। কেউ বলে লোকটি জীবনে বোঝে শুধু চাকরি। কেউ বলে চাকরি ঠিক নয়, বোঝে শুধু আইন। পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ, ধর্ম-অধর্ম, এ-সব তাঁর কাছে কিছু নেই, আছে শুধু আইনানুমোদিত আর বেআইনী। ইংরাজীতে যাকে বলে—লিগাল আর ইল্‌লিগাল।

তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবীও জজের মেয়ে। জাস্টিস চ্যাটার্জী নামকরা বিচারক। এখনও লোকে তাঁর নাম করে। ব্যারিস্টার থেকে জজ হয়েছিলেন। সুরমা দেবী শিক্ষিতা

মহিলা। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন সুরমা দেবী একসময়। আজও সে সৌন্দর্য ম্লান হয়নি। নিঃসন্তান সুরমা দেবীকে এখনও পরিণত বয়সের যুবতী বলে ভ্রম হয়। এই সুরমা দেবীও যেন তাঁর নাগাল পান না।

জজসাহেবের আর্দালীটি সাহেবের গল্পে পঞ্চমুখ। সে-সব গল্পের অধিকাংশই তার শুনে সংগ্রহ করা। কিছু কিছু নিজের দেখা। সে বলে—মেমসাহেবও হাঁপিয়ে ওঠেন এক-এক সময়।

ঘাড় নেড়ে সে হেসে বলে—রাত্রি বারোটা তো সাহেবের রাত ন'টা। বারোটা পর্যন্ত রোজ কাজ করেন। ন'টায় আর্দালীর ছুটি হয়। মেমসাহেব টেবিলের সামনে বসে থাকেন; সাহেব নথি ওলটান, ভাবেন, আর লেখেন। আশ্চর্য মানুষ, সিগারেট না, মদ না, কফি না, চা দু'-কাপ দু'-বেলা বড় জোর আর এক-আধ বার। চুপচাপ লিখে যান। মধ্যে মধ্যে কাগজ ওলটানোর খসখস শব্দ ওঠে। কখনও হঠাৎ কথা—একটা কি দুটো কথা, বইখানা দাও তো! বলেন মেমসাহেবকে। আউট হাউস থেকে আর্দালী বযেরা—দেখতে পায় শুনতে পায়।

এখানকার দু'-চারজন উকিল, উকিলবাবুদের মুহুরী এবং জজ-আদালতের আমলারা এসব গল্প সংগ্রহ করে আর্দালীটির কাছে।

আর্দালী বলে—তবে মাসে পাঁচ-সাত দিন আবার রাত দুটো পর্যন্ত। ঘরে ঘুমিয়ে পড়ি। দেড়টা-দুটোর সময় আমার রোজই একবার ঘুম ভাঙে। তেষ্টা পায় আমার। ছেলেবেলা থেকে ওটা আমার অভ্যেস। উঠে দেখতে পাই সাহেব তখনও জেগে। ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথম প্রথম আশ্চর্য হতাম, এখন আর হই না। প্রথম প্রথম সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াতাম, সাহেব না ডাকলে যাই কি করে? দু'-একদিন চুপিচুপি ঘরের পিছনে জানালার পাশে দাঁড়াতাম। দেখতাম টেবিলের উপর ঝুঁকে সাহেব তখনও লিখছেন। এক-একদিন শুনতাম শুধু চটির সাড়া উঠছে। বুঝতে পারতাম সাহেব ঘরময় পায়চারি করছেন। এখনও শুনতে পাই। কোনও কোনও দিন বাথরুমের ভেতর আলো জ্বলে, জল পড়ার শব্দ ওঠে, বুঝতে পারি মাথা ধুচ্ছেন সাহেব। ওদিকে সোফার ওপর মেমসাহেব ঘুমিয়ে থাকেন। খুটখাট শব্দ উঠলেই জেগে ওঠেন।

বলেন—হলো? এক-একদিন মেমসাহেব ঝগড়া করেন। এই তো আমার চাকরির প্রথম বছরেই; বুঝেছেন, আমি ওই উঠে সবে বাইরে এসেছি; দেখি মেমসাহেব দরজা খুলে বাইরে এলেন। খানসামাকে ডাকলেন—শিউনন্দন?—ওরে!

ভিতর থেকে সাহেব বললেন—না না। ও কি করছ? ডাকছ কেন ওদের?

মেমসাহেব বললেন—ইজিচেয়ারখানা বের করে দিক।

—আমি নিজেই নিচ্ছি—ওরা সারাদিন খেটেখুটে ঘুমোচ্ছে। ডেকো না। সারাদিন খেটে রাত্রে না ঘুমোলে ওরা পারবে কেন! মানুষ তো!

আর্দালী বিস্ময় প্রকাশের অভিনয় করে বলে—দেখি সাহেব নিজেই ইজিচেয়ারখানা টেনে বাইরে নিয়ে আসছেন। আমি যাচ্ছিলাম ছুটে। কিন্তু মেমসাহেব ঝগড়া শুরু

করে দিলেন। আর কি করে যাই? চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু শুনলাম। মেমসাহেব নাকি বলেন—আর্দালী এবার বলে যায় তার শোনা গল্প। পুরনো আর্দালীর কাছে শুনেছে সে। সুরমা নাকি আগে প্রায়ই ক্ষুব্ধভাবে বলতেন—দুনিয়ার সবাই মানুষ। রাত্রে ঘুম না-হলে কারুরই চলে না। চলে শুনেছি এক ভগবানের। তা জানতাম না যে, জজিয়তি ভগবানগিরিতে তফাত নেই। তারপর বলেন, তাই বা কেন? আমার বাবাও জজ ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাসতেন। হেসে আর-একখানা চেয়ার এনে পেতে দিয়ে বলতেন—বোসো।

রায় লেখা তখন শেষ হয়ে যেত। সুবমাও বুঝতে পাবতেন। স্বামীর মুখ দেখলেই তিনি তা বুঝতে পারেন। রায় লেখা শেষ না-হলে সুরমা কোন কথা বলেন না। ওই দুটো-চারটে কথা—কফি খাবে? টেবিল-ফ্যানটা আনতে বলব? এই। বেশি কথা বলবার তখন উপায় থাকে না। বললে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেন, প্লীজ, এখন না, পরে বোলো যা বলবে।

রায় লেখা হযে গেলে তখন তিনি কিন্তু আর এক মানুষ। সুরমা বলতেন—মুনসেফ থেকে তো জজ হযেছ। ছেলে নেই, পুলে নেই। আর কেন? আর কী হবে? হাইকোর্টের জজ, না সুপ্রীমকোর্টের জজ? ওঃ! এখনও আকাঙ্ক্ষা গেল না।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটি অভ্যেস-করা হাসি আছে। সেই হাসি হেসে বলতেন বা বলেন—নাঃ। আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। ঠিক সময়ে রিটায়ার করব এবং তারপর সেই ফার্স্ট বুকেব নির্দেশ মেনে চলব। গেট আপ অ্যাট ফাইভ, গো টু বেড অ্যাট নাইন। তা-ই বা কেন, এইট। সকালে উঠে মর্নিং ওয়াক করব; তারপর থলে নিয়ে বাজারে যাব। বিকেলে মার্কেটে গিয়ে তোমার বরাতমতো উলসুতো কিনে আনব। এবং বাড়িতে তুমি ক্রমাগত বকবে, আমি শুনব। কিন্তু যতদিন চাকরিতে আছি, ততদিন এ থেকে পরিত্রাণ আমাব নেই।

আর-একদিন, বুঝেছেন;—আর্দালী বলে আর-একদিনের গল্প।

সুরমা বলেছিলেন—আচ্ছা বলতে পার, সংসারে এমন মানুষ কেউ আছে যার ভুল হয় না?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—না নেই।

সুরমা বলেছিলেন—তবে?

—কি তবে?

—এই যে তুমি ভাব তোমার রায় এমন হবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ পালটাতে পারবে না। হাইকোর্ট না, সুপ্রীমকোর্ট না, এত দম্ভ তোমার কেন?

—দম্ভ? জ্ঞানেন্দ্রনাথ হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন। আর্দালী বলে—সে কী হাসি! বুঝেছেন না। যেন মেমসাহেব নেহাত ছেলেমানুষের মতো কথা বলছেন। মেমসাহেব রেগে গেলেন, বললেন—হাসছ কেন? এত হাসির কি আছে?

সাহেব বললেন—তুমি দম্ভ, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, কথাগুলো বললে না, তাই।

মেমসাহেব বললেন—ভুল হয়েছে। ভগবানও পালটাতে পারবেন না বলা উচিত ছিল আমার।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—উঁহু, ওসব কিছুর জন্যেই নয় সুরমা। হাসলাম মেয়েরা চিরকালই মেয়ে থেকে যায় এই ভেবে।

—তার মানে?

—মানে? তুমি তো সে ভাল করে জান সুরমা। এবং সে-কথাটা তো আমার নয়, আমার গুরুর, তোমার বাবার। দম্ভ নয়, হাইকোর্টে রায় টিকবে কি না-টিকবে সেও নয়, সে কখনও ভাবি নে। ভাবি আজ নিজে যে রায় দিলাম, সে রায় দু'-মাস কি ছ-মাস কি ছ-বছর পরে ভুল হয়েছে বলে নিজেই নিজের উপর যেন না স্ট্রিকচার দিই। শেষটায় খুব রাগ করে তুমি ভগবানের কথা তুললে—। মধ্যে মধ্যে জজগিরি আর ভগবানগিরির সঙ্গে তুলনাও কর—

সুরমা সেদিন স্বামীর কথার উপরেই কথা কয়ে উঠেছিলেন, বেশ খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন—না, তা বলি না কখনও। বলি, আমার বাবাও জজ ছিলেন; তাঁর তো এমন দেখিনি। আরও অনেক জজ আছেন, তাঁদেরও তো এমন শুনি নে। বলি, তোমার জজিযতি আর ভগবানগিরিতে তফাৎ নেই। হ্যাঁ, তা বলিই তো। তোমাকে দেখে অন্তত আমার তাই মনে হয়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চোখ দুটি বন্ধ করে প্রশান্তভাবে মিষ্টি হেসে বলেছিলেন—তাই। আমার জজিয়তি আর ভগবানগিরির কথাই হলো। আমি অবিশ্যি ভগবানে বিশ্বাস ঠিক করি নে, সে তুমি জান, তবু তুলনা যখন করলে ভগবানগিরির, যে-সব বর্ণনা তোমরা কর—ভাল ভাল কেতাবে আছে—সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে বলি, আমার জজিয়তি ভগবানগিরির চেয়েও কঠিন। কারণ ভগবান সর্বশক্তিমান, তাঁর উপরে মালিক কেউ নেই, সূক্ষ্ম বিচারক নিশ্চয়ই, কিন্তু তবুও অটোক্র্যাট। অন্তত করুণা করতে তাঁর বাধা নেই। ইচ্ছে করলেই আসামীকে দোষী জেনেও বেকসুরও মাফ করে খালাস দিতে পারেন। পাপপুণ্যের ব্যালান্স-শীট তৈরি করে পুণ্য বেশি হলে পাপগুলোর চার্জশীট ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করতে পারেন। মানুষ জজ তা পারে না। আমি তো পারিই না।

বার লাইব্রেরি থেকে আদালতের সামনের বটতলা পর্যন্ত এমনি ধরনের আলাপ-আলোচনার মধ্যে এই মানুষটির সমালোচনা দিনে এক-আধ বার না-হয়ে যায় না। এ-সব কথা অবশ্য পুরানো কথা। জেলা থেকে জেলায় তাঁর বদলীর সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলিও প্রচারিত হয়েছে। এখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ আরও স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র। অহরহ চিন্তাশীল—প্রায় এক মৌনী মানুষ। মেমসাহেবও তাই। দু'জনেই যেন পরস্পরের কাছে ক্রমে মৌন মূক হয়ে যাচ্ছেন। এক দুকূল পাথার নদীর বুকে দু'খানি নৌকা দু'দিকে ভেসে চলেছে।

(গ)

সরকারী উকিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মামলার ঘটনাগুলির বর্ণনা করে চলেছিলেন।

অবিনাশবাবু প্রবীণ এবং বিচক্ষণ উকিল। বক্তা হিসেবে সুনিপুণ এবং আইনজ্ঞ হিসাবে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী। এই বিচারকটিকে তিনি খুব ভাল করে চেনেন। আর্দালীর কথা থেকে নয়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। এবং এই জেলায় আসার পর থেকে নয়, তার অনেক দিন আগে থেকে। এ জেলায় তখন সরকারী উকিল হননি তিনি; তাঁর পশারের তখন প্রথম আমল। আশেপাশের জেলা থেকে তাঁর তখন ডাক পড়তে শুরু হয়েছে। জীবনে প্রতিষ্ঠা যখন প্রথম আসে তখন সে একা আসে না, জলস্রোতের বেগের সঙ্গে কল্লোলধ্বনির মতো অহংকারও নিয়ে আসে। তখন সে-অহঙ্কারও তাঁর ছিল। একটি দায়রা মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে গিয়েছিলেন। সে মামলায় তিনি তাঁকে যে তিরস্কার করেছিলেন তা তিনি আজও ভুলতে পারেননি। আজও মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

সেও বিচিত্র ঘটনা। বাপকে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল ছেলে। ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধ বাপ, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলে, সেও দুই ছেলের বাপ। মামলার প্রধান সাক্ষী ছিল মা। ছেলেটি কৃতকর্মা পুরুষ। যৌবন বলশালী দেহ, তেমনি অদম্য সাহস, তেমনি নিপুণ বিষয়বুদ্ধি। প্রথম যৌবন থেকেই বাপের সঙ্গে পৃথক।

বাপ ছিল বৈষ্ণব, ধর্মভীরু মানুষ। বিঘা সাতেক জমি, ছোট একটি আখড়া ছিল সম্পত্তি। তার সঙ্গে ছিল গ্রামের কয়েকটি বৃত্তি। কার্তিক মাসে টহল, বারোমাসে পার্বণে—ঝুলন, রাস, দোল, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসবে নাম-কীর্তন এবং শবযাত্রার সংকীর্তন গাইত, তার জন্য গ্রাম্য বৃত্তি ছিল। এতেই তার চলে যেত। ছেলে অন্য প্রকৃতির, গোড়া থেকেই সে এ-পথ ছেড়ে বিষয়ের পথ ধরেছিল। চাষের মজুর খাটা থেকে শুরু, ক্রমে কৃষাণী, তারপর জমি কিনে চাষী গৃহস্থ হয়েছিল। তাতে বাপ আপত্তি করেনি; প্রশংসাই করত। কিন্তু তারপর ছেলের বুদ্ধি যেন অসাধারণ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। নিজের জমির পাশের জমির সীমানা কেটে নিতে শুরু করল এবং এমন চাতুর্যের সঙ্গে কেটে নিতে লাগল যে অঙ্গচ্ছেদের বেদনা যখন অনুভূত হলো তখন দেখা গেল যে, কখন কতদিন আগে যে অঙ্গটি ছিন্ন হয়ে গেছে তা যার জমির অঙ্গ ছিন্ন হয়েছে সেও বলতে পারে না। হঠাৎ প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ চাষের সময় দেখা যেত বলাই দাসের ছোট জমি বেড়ে গেছে এবং অন্যের বড় জমি ছোট হয়ে গেছে। এবং তখন ছিন্নাঙ্গ জমির মালিক সীমানা মাপতে এলে বলাই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত, জোর করলে লাঠি ধরত; সালিশী মান্য করলে আদালতের খোলা দরজার দিকে পথ-নির্দেশ করে সালিশী অমান্য করে আসত। বাপ অনেক হিতোপদেশ দিলে, কিন্তু ছেলে শুনলে না; ধর্মের ভয় দেখালে, ছেলে নির্ভয়ে উচ্চ হেসে উঠে চলে গেল। ওদিকে বাড়ির ভিতরেও তখন শাশুড়ী-পুত্রবধূতে বিরোধ বেধেছে। বৈষ্ণবের সংসারে বধূটি পেঁয়াজ ঢুকিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মাছ ঢুকিয়েছে এবং ছেলে তাকে সমর্থন করেছে। একদিন মা এবং বউয়ের ঝগড়ার মধ্যে বলাই দাস মাকে গালাগাল দিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, এক অন্নে

এক ঘরে সে আর থাকবে না; পোষাবে না। বাড়ির পাশেই সে তখন নতুন ঘর তৈরি করেছে। বাপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—জয় মহাপ্রভু, তুমি আমাকে বাঁচালে।

আর বলাই দাসের অবাধ কর্মোদ্যম। তাতে বাপ মাথা হেঁট করে নিজের মৃত্যু কামনা করেছিল। হঠাৎ পুত্রবধূ দুটি ছেলে রেখে মারা গেল। বলাই দাস স্ত্রীর শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন অন্তে বন্ধুবান্ধব ভোজন করালে মদ্য-মাংস-সহযোগে এবং গোপন করার চেষ্টা করলে না, নিজেই মত্ত অবস্থায় পথে পথে স্ত্রীর জন্য কেঁদে বলে বেড়ালে—তার জীবনেব কাজ নেই, কোনও কিছুতে সুখ নেই, সংসার ত্যাগ করে সে চলে যাবে। সন্ন্যাসী হবে।

বাপ মহাপ্রভুব দরজায় মাথা কুটলে। এবং ছেলেব বাড়িতে গিয়ে তাকে কঠিন তিরস্কর কবে এল। বলাই দাস কোনও উত্তব-প্রত্যুত্তর করলে না, কিন্তু গ্রাহ্য করলে বলেও মনে হলো না, উঠে চলে গেল।

দিন-তিনেক পর ভোরবেলা উঠে বাপ পথে বেরিযেই দেখলে বলাই দাসের বাড়িব দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে আতর বলে একটি স্বৈরিণী, গ্রামেবই অবনত সম্প্রদায়ের মেযে। বাড়ি থেকে বেরিযে সে চলেই গিযেছে; ঝুমুব দলে নেচে গেযে এবং তার সঙ্গে দেহ ব্যবসায করে বেড়ায়; মধ্যে মাঝে দু’-দশ দিনেব জন্য গ্রামে আসে। আতর কয়েকদিন তখন গ্রামেই ছিল।

বাপ ছেলেকে ডেকে তুলে তার পায়ে মাথা কুটেছিল। এ অধর্ম কবিস নে। সইবে না। ব্যভিচার সবচেয়ে বড পাপ!

হাত ধরে বলেছিল—তুই আবার বিয়ে কর।

বলাই দাস তখন অন্ধ। হয়তো-বা উন্মত্ত। শুধু আতরই নয়, গ্রামের আরও যে-কটি স্বৈরিণী ছিল তাদের সকলকে নিয়ে সে জীবনে সমারোহ জুড়ে দিলে। অনুরোধ ব্যর্থ হলো, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে হলো বিরোধ। বিরোধ শেষে চিরদিনের মতো বিচ্ছেদের পরিণতির মুখে এসে দাঁড়াল।

বাপ সংকল্প কবলে ছেলেকে সে ত্যাজ্যপুত্র করবে। নিজের সামান্য সাত বিঘা জমি দেবতার নামে অর্পণ করে ভবিষ্যৎ সেবাইত মহান্ত নিযুক্ত করলে নাতিদের। শর্ত করল যে, মতিভ্রষ্ট ব্যভিচারী বলাই দাস তাদের অভিভাবক হতে পাবে না। তার অন্তে সেবাইত এবং নাতিদের অভিভাবক হবে তার স্ত্রী। তার স্ত্রীর মৃত্যুকালে যদি নাতিবা নাবালক থাকে তো, কোনও বৈষ্ণবকে অভিভাবক নিযুক্ত করে দেবেন গ্রামেব পঞ্চজন। ছেলে খবর শুনে এসে দাঁড়াল। বাপ পিছন ফিরে বসে বললে—এ বাড়ি থেকে তুই বেবিয়ে যা! বেরিয়ে যা! বেরিযে যা! এ বাড়ি আমার, কখনও যেন ঢুকিসনি, আমাব ধর্ম চঞ্চল হবে। মৃত্যুর সময়েও আমার মুখে জল তুই দিসনে, মুখাগ্নিও করতে পাবিনে, শ্রাদ্ধও না। ভগবান যদি আজ আমার চোখ দুটি নেন, তবে আমি বাঁচি। তোর মুখ যেন আমাকে আর দেখতে হয় না।

পরের দিন রাত্রে বাপ খুন হলো। গরমের সময়, দাওয়ার উপর একদিকে শুয়ে

ছিল বৃদ্ধ, অন্য দিকে নাতি দুটিকে নিয়ে শুয়ে ছিল বৃদ্ধা। গভীর রাত্রে কুড়ুল দিয়ে কেউ বৃদ্ধের মাথাটা দু' ফাঁক করে দিয়ে গেল। একটা চিৎকার শুনে ধড়মড় করে বৃদ্ধা উঠে বসে হত্যাকারীকে ছুটে উঠোন পার হয়ে যেতে দেখে চিনেছিল যে সে তার ছেলে। মাথার কোপ একটা নয় দুটো। একটা কোপ বোধ করি প্রথমটা, পড়েছিল এক পাশে, দ্বিতীয়টা ঠিক মাঝখানে। মা সাক্ষী দিলে, আবছা অন্ধকার তখন, চাঁদ সদ্য ডুবছে, তার মধ্যে পালিয়ে গেল লোকটি, তাকে সে স্পষ্ট দেখেছে। সে তার ছেলে বলাই। বলাই দাস অবিনাশবাবুকে উকিল দিয়েছিল। কতকটা জমি হাজার টাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করে, ফৌজদারী মামলায় তাঁর নামডাক শুনে, লোক পাঠিয়ে তাঁকে নিযুক্ত করেছিল। অবিনাশবাবু জেরা করতে বাকি রাখেননি। মায়ের শুধু এক কথা।—'বাবা—'

সুযোগ পেয়ে অবিনাশবাবু ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—না। বাবা নয়। বাবা-টাবা নয়। বলো, হুজুর।

মা বলেছিল—হুজুর, মাযের কি ছেলে চিনতে ভুল হয়? আমি যে চল্লিশ বছর ওব মা। দুপুর বেলা মাঠ থেকে ফিরে এলে ওর পিঠে আমি রোজ তেল মাখিযে দিয়েছি।

অবিনাশবাবু বলেছিলেন—ছেলের সঙ্গে তোমাব অনেক দিনের ঝগড়া। আজ বিশ বছর ঝগডা। ছেলের বিয়ে হওযা থেকেই ছেলের সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য। তোমাদের ঝগডা হত। বল সত্যি কি না?

মা বলেছিল—তা খানিক সত্যি বটে। কিন্তু সে মনোমালিন্য নয় হুজুর। বড পরিবার-পবিবার বাই ছিল. পরিবাবের জন্যেই ও পেঁয়াজ-মাছ খেতে ধরেছিল, তার জন্যেই পেথকান্ন হয়েছিল, তাই নিয়ে বকাবকি হত। সে বকাবকিই, আব কিছু নয়।

অবিনাশবাবু বলেছিলেন—না। আমি বলছি সেই আক্রোশে তুমি বলছ তুমি চিনতে পেরেছ। নইলে আসলে তুমি চিনতে পারনি।

মা বলেছিল—চিনতে আমি পেরেছি হুজুর। আক্রোশও আমার নেই। ও আমার নিজের ছেলে। ধর্মের মুখ তাকিয়ে—মা থেমেছিল। এইখানে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার। অবিনাশবাবু তাকে কাঁদতে সুযোগ দেননি, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন—ধর্মের মুখ তাকিয়ে? আবোল-তাবোল বোকো না। জোর করে কাঁদতে চেষ্টা করো না। বলো কি বলছ?

মা-মেয়েটি কঠিন মেয়ে, সে আত্মসংবরণ করে নিয়ে বলেছিল—নাঃ, কাঁদব হুজুর। ধর্মের মুখ তাকিয়ে সত্যি কথাই আমাকে বলতে হবে হুজুর। আমি মিছে কথা বললে ও হযতো এখানে খালাস পাবে। কিন্তু পরকালে কী হবে ওর? মরতে একদিন হবেই। আমিই বা কী বলব ওর বাপের কাছে? আমি সত্যিই বলছি। হুজুর বিচার করে খালাস দিলে ভগবান ওকে খালাস দেবেন, সাজা দিলে সেই সাজাতেই ওর পাপের দণ্ড হয়ে যাবে; নরকে ওকে যেতে হবে না।

অবিনাশবাবু এইবার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, জেরা করেছিলেন—পাপপুণ্য তুমি মান?

মা বলেছিল—মানি বইকি হুজুর। কে না মানে বলুন? নইলে দিনরাত হয় কি করে?

ধমক দিয়েছিলেন অবিনাশবাবু—থামো, বাজে বোকো না। সাঁইত্রিশ বছর আগে, বর্ধমান জেলায়, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তুমি একবার এজাহার করেছিলে?

বৃদ্ধা ঈষৎ চকিত হয়ে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

কঠোর স্বরে অবিনাশবাবু বলেছিলেন—বল উত্তর দাও।

বৃদ্ধা বলেছিল—দিয়েছিলাম।

—কিসের মামলা সেটা?

—আমি বাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমার এই স্বামীর সঙ্গে। আমার বাবা তাই মামলা করেছিল আমার স্বামীর নামে। সেই মামলায় আমি সাক্ষী দিয়েছিলাম।

—তোমার বাবার নাম ছিল রাখহরি ভটচাজ? তুমি বামুনের মেয়ে ছিলে?

—হ্যাঁ।

—যার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলে সে কোন্ জাত ছিল?

—সদ্‌গোপ। আমাদের বাড়ির পাশেই ওদের বাড়ি ছিল। ছেলেবেলা থেকে ওর বোনের সঙ্গে খেলা করতাম, ওদের বাড়ি যেতাম। তারপর ভালবাসা হয়। আমি যখন বুঝলাম, ওকে নইলে আমি বাঁচব না, তখন আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসি। দু'জনে বোষ্টুম হয়ে বিয়ে করি। মামলা তখনই হয়েছিল।

—কি বলেছিলে তখন এজাহারে?

—বলেছিলাম—আমি বাপ চাই না, মা চাই না, ধম্ম চাই না, আমি ওকে নইলে বাঁচব না, ওই আমার সব—পাপপুণ্য সব। ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্য যদি আমাকে নরকে যেতে হয় তো যাব।

মামলার সওয়াল জবাবের সময় অবিনাশবাবু মায়ের চরিত্রের এই দিকটিব উপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন, নারীচরিত্রের বিচিত্র এক বৈশিষ্ট্যের কথা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন—এ মেয়েটির অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এ সেই বিচিত্র নারী-প্রকৃতি, যে নারী জীবনের সনাতন পুরুষের জন্য বাপ, মা, জাতি, কুল, ধর্ম, অধর্ম সব কিছুকে অনায়াসে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করতে পারে। এরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বোধ করি এই লজ্জাকর মোহে মগ্ন এবং অন্ধ হয়ে থাকে। এরা অনায়াসে সন্তান ত্যাগ করেও চলে যায় অবৈধ প্রণয়ের প্রচণ্ড আকর্ষণে, দেহবাসের রাক্ষুসী ক্ষুধার তাড়নায়। এই মেয়েটি যখন আজ ধম্মের কথা বলে তখন বিশ্বসংসার হাসে কিন্তু সে তা বুঝতে পারে না। প্রতিহিংসার তাডনায় যে ধর্মকে সে মানে না আজ সে ধর্মের দোহাই দিচ্ছে।—আসলে সে হত্যাকারী কে তা চিনতে পারেনি। সেই অতি অল্পক্ষণ সময়, যে সময়ে সে স্বামীর চিৎকারে ঘুম ভেঙে উঠে মশারি ঠেলে বাইরে এসেছিল, যখন হত্যাকারী ঘরের দরজা পার হয়ে পালাচ্ছিল, তারমধ্যে রাত্রির অন্ধকারে

কারুর চিনতে পারা অসম্ভব। চিনতে সে পারেনি। হয়তো-বা কাউকে দেখেইনি, সে জেগে উঠতে উঠতে হত্যাকারী পালিয়ে গিয়েছিল। সেই উত্তেজিত অবস্থায় সে যা দেখেছিল তা তার চিত্তের কল্পনার অলীক প্রতিফলন। ছেলেকে সে গোড়া থেকেই দেখতে পারত না। তার উপর ছেলের সঙ্গে স্বামীর বিরোধ হয়েছিল, সুতরাং তার মনে হয়েছিল পুত্রই হত্যাকারী এবং তাকেই সে কল্পনা-নেত্রে দেখেছিল। এ নারী মা নয়, মাতৃত্বহীনা বিচিত্র পাপিষ্ঠা। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, মা হয়ে পুত্রকে হত্যাকারী বলে ঘোষণা কববার সময় একটি ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত তার চোখ থেকে নির্গত হয়নি।

জোরালো বক্তৃতা অবিনাশবাবু চিরকালই করেন। ওই কেসে এই তথ্যটির উপর ভিত্তি করে প্রাণ ঢেলে বক্তৃতা করেছিলেন। এ ছাড়া আর অন্য কোন পথই ছিল না। এবং জুরিদের অভিভূত করতে সমর্থও হয়েছিলেন। তাঁরা ওই কথাই বিশ্বাস করেছিলেন—স্বামীর প্রতি অত্যধিক আসক্তির বশে এবং পুত্রের বিবাহের পর থেকে পুত্রবধূর প্রতি পুত্রের আকর্ষণের জন্য পুত্রের সঙ্গে তার সনাতন বিদ্বেষের প্রেরণাতেই আপন অজ্ঞাতসারে সে পুত্রকেই হত্যাকারী কল্পনা করেছে; এমন ক্ষেত্রে সদ্য ঘুমভাঙার মুহূর্তে অজ্ঞাত হত্যাকারীকে পুত্র বলে ধারণা করাই সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক। সুতরাং তারা সন্দেহেব সুযোগে অর্থাৎ বেনিফিট অফ ডাউটের অধিকারে আসামীকে নির্দোষ বলেছিলেন। কিন্তু এই কঠিন ব্যক্তিটি জুরিদের সঙ্গে ভিন্নমত হযে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। এবং তাঁর রায়ে অবিনাশবাবুর মন্তব্যগুলির তীব্র সমালোচনা করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

বায়ে তিনি লিখেছিলেন—এই মাযের সাক্ষ্য আমি অকৃত্রিম সত্য বলে বিশ্বাস করি। আসামীপক্ষেব লার্নেড অ্যাডভোকেট তার চরিত্র যেভাবে মসীময় করে তুলে ধরতে চেষ্টা কবেছেন তা শুধু বিচার-ভ্রান্তিই নয়, অভিপ্রাযমূলক বলে আমার মনে হয়েছে। সাক্ষী এই মা-টি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক চরিত্রের নারী। প্রবল দৈহিক আসক্তি, যা ব্যাধিব সামিল, তার কোন অভিব্যক্তিই নেই তার জীবনে। বরং একটি সূক্ষ্ম সুস্থ বিচারবোধ তার জীবনে আমি লক্ষ্য করেছি। সে প্রথম যৌবনে কুমারী জীবনে একজন অসবর্ণের যুবককে ভালবেসেছিল। সে-ভালবাসার ভিত্তিতে দেহলালসাকে কোনওদিনই প্রধান বলে স্বীকার করেনি। প্রতিবেশীব পুত্র, বাল্যসখীর ভাই, সুদীর্ঘ পবিচয় এ ভালবাসাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল; মনের সঙ্গে মনের অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল। আকস্মিকভাবে কোন সুস্থ সবল ও রূপবান যুবককে দেখে যুবতী-মনে যে বিকার জন্মায়, তাকে উন্মত্ত করে তোলে—তা এ নয়। এ উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে মনের উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিবশে যে হৃদযাবেগের নির্দেশে সে গৃহ, কুল, জাতি ত্যাগ করেছিল তা সমাজবোধের বিচারে পাপ হতে পারে কিন্তু মানবিক বিচারে অন্যায় নয়, অধর্ম নয়, অস্বাস্থ্যকর নয়। সামাজিক ও মানবিক বিচারে সর্বত্র একমত হতে পারে না বলেই আইন মানবিক বিচারের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে একালে। যা সমাজের বিচারে পাপ সেই সূত্র অনুযায়ীই তা সর্বক্ষেত্রে আইনের বিচারে দণ্ডনীয়

অপরাধ বলে স্বীকৃত নয়। যাকে তিনি বলেছেন দেহলালসা—প্যাশন অব লাইফ; তার জন্য মর্মান্তিক মূল্য দিয়েও সে অনুতপ্ত নয়, লজ্জিত নয়। এবং পরবর্তী জীবনের আচরণে সে একটি বিবাহিতা সাধ্বী স্ত্রীর সকল কর্তব্য অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে করে এসেছে। এই মা যে বেদনার সঙ্গে ধর্মের মুখ তাকিয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে তাকে আমি বলি ডিভাইন; স্বর্গীয় রূপে পবিত্র। আশ্চর্যের কথা, সুবিজ্ঞ অ্যাডভোকেট মহাশয় এই হতভাগিনী মায়ের সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ের বেদনার্ততা ও ধর্মজ্ঞানের বা সনাতন নীতিজ্ঞানের মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব যেন ইচ্ছাপূর্বকই লক্ষ্য করেননি! বলেছেন—সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পুত্রের ফাঁসি হতে পারে জেনেও তাঁর চোখে জল পড়ল না। হাইকোর্ট জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিচারকেই মেনে নিয়েছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আসামী অর্থাৎ ওই ছেলেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এই দণ্ডাদেশ ঘোষণার ইতিহাসও ঠিক সাধারণ পর্যায়ে পড়ে না। অসাধারণই বলতে হবে। অবিনাশবাবু আর একটা কেসে ওখানে গিয়ে সে ইতিহাস শুনেছিলেন। তিন দিন নাকি সে তাঁর অদ্ভুত স্তব্ধ অবস্থা; তিনটি রাত্রি তিনি ঘুমোননি, সবটাই প্রায় লিখে ফেলে ওই দণ্ডাদেশের কয়েক লাইন অসমাপ্ত রেখে অবিশ্রান্ত পদচারণা করেছিলেন। এদিকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মহলে একটা উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। জ্ঞানবাবুর এই বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কথা তাঁদের কানে পৌঁছুতে বাকি থাকেনি। সিভিল সার্জেন এসেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন এস-পি! এস-ডি ও যিনি, তিনিও এসেছিলেন। নতুন জজসাহেব শেষে কি ফাঁসির হুকুম দেবেন? এঁদের যে উপস্থিত থেকে দণ্ডাদেশকে কাজে পরিণত করতে হবে!

ভোরবেলা, আবছা অন্ধকারের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চটাকে দেখে অদ্ভুত মনে হবে। মৃত্যুপুরীর হঠাৎ-খুলে-যাওয়া দরজার মতো মনে হবে। মনের দরজাটার চারপাশের কাঠগুলো থেকে কপাট-জোড়াটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, খোলা দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে মৃত্যুর গ্রাসের মতো। তারপর ঝুলিয়ে তুলে নিয়ে আসবে একটা হাড় আর মাংসের বিহ্বল বোঝাকে। ওঃ! তার দণ্ডাদেশ পড়তে হবে। দণ্ডিত হতভাগ্যের মাথায় কালো টুপি পরিয়ে দেবে। ওঃ!

সিভিল সার্জেন বলেছিলেন—এ জেলে আজ তিরিশ বছর ফাঁসি হয়নি। গ্যালোজ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু আছে একটা ঢিবি। সব নতুন করে তৈরি করতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বিচলিত হয়েছিলেন।

পরামর্শ করে ওঁরা এসেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবুর কুঠিতে। ইঙ্গিতে অনুরোধও জানিয়েছিলেন।

জ্ঞানবাবু বলেছিলেন—তিন দিন আমি ঘুমুইনি। শুধু ভেবেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন—আমি শুনেছি। মানুষকে ডেথ সেন্টেন্স দেওয়ার চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য কিছু হয় না।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—আমার স্ত্রীও খুব বিচলিত হয়েছেন। তিনি যেন আমার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না! কিন্তু কী করব আমি!

সত্যই সুরমা দেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, সভয়ে বলেছিলেন—তুমি কি ফাঁসির হুকুম দেবে?

প্রথমটা উত্তর দিতে পারেননি জ্ঞানেন্দ্রবাবু। অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন—ওর মা তার সাক্ষ্যে যে কথা বলে গেছে তারপর ওই দণ্ড দেওয়া ছাড়া আমি কি করতে পারি বল?

সুরমা দেবী এরপর আর কোন্ কথা বলবেন? তবু বলেছিলেন—ওই মায়ের কথা ভেবে দেখ। সে হতভাগিনীর আর কি থাকবে বল?

—ধর্ম? জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম কি কৃশ্চান ধর্ম নয় সুরমা—সত্যধর্ম।

কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে এক বিচিত্র হাসি হেসে বলেছিলেন—ওই মেয়েটি আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেল। ইতিহাসের বড় মানুষ মহৎ ব্যক্তি এই সত্যকে পালন করে আসেন পড়েছি; একালে মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু ভেবেছি—ও পারেন শুধু মহৎ যাঁরা এবং যাঁরা বৃহৎ তাঁরাই। কিন্তু ওই মেয়েটি বুঝিয়ে দিলে—না, পারে, তার মতো মানুষেও পারে। মস্তবড় আশ্বাস পেলাম আজ।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে বসে গিয়েছিলেন লিখতে। এক নিঃশ্বাসেই প্রায় লাইন ক'টি লিখে শেষ করে দিয়েছিলেন। বিচার নিষ্ঠুর নয়, সে সাংসারিক সুখ-দুঃখের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে। জাস্টিস ইজ ডিভাইন।

সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট, এস-পি, সিভিল সার্জেন এঁদেরও সেই কথাই তিনি বলেছিলেন। আব কোন দণ্ড এক্ষেত্রে নেই। আমি পারি না। আই কান্ট।

(ঘ)

অবিনাশবাবু মামলাটি সযত্নে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। সাজাবার অবশ্য কিছু ছিল না, তবু একটি স্থান ছিল যেটির জন্য গোটা মামলাটি সম্পর্কে প্রথমেই বিরূপ ধারণা হয়ে যেতে পারে। তার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন। তিনি স্থির জানেন যে, বিচারকের আসনে উপবিষ্ট ওই যে লোকটির স্থির দৃষ্টি সামনের খোলা দরজার পাশে বাইরের উন্মুক্ত প্রসারিত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে লক্ষ্যহীনের মতো, যা দেখে মনে হচ্ছে এই আদালত-কক্ষের কোনও কিছুর সঙ্গেই তাঁর ক্ষীণতম যোগসূত্রও নেই, দৃষ্টির সঙ্গে কোন্ দূরে চলে গিয়েছে তাঁর মন উদাসী বৈরাগীর মতো, ঘটনার বর্ণনায় কোনও অসঙ্গতি ঘটলে অথবা ঘটনার ঠিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিতে মানুষটি সজাগ হয়ে উঠে বলবেন—ইয়েস। অযথা চকিত হয়ে ঘুরে তাকাবেন, ভুরুদুটি প্রশ্নের ব্যঞ্জনায় কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, এবং জিজ্ঞাসা করবেন—হোয়াট? কি বললেন মিস্টার মিট্রা? ডিড ইউ সে—?

অবিনাশবাবুর অনুমান মিথ্যা হলো না; আজও জজসাহেব চকিতভাবে ঘুরে অবিনাশবাবুর দিকে প্রশ্ন করলেন, হোয়াট? কি বলছেন মিঃ মিট্রা? আপনি বলছেন

ছোট ভাই খগেন্দ্র ঘোষ, যে খুন হয়েছে, সেই আসামী বড় ভাই নগেনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? নগেন, এই আসামী, ডেকে নিয়ে যায়নি?

অবিনাশবাবু খুশি হলেন মনে-মনে—এই প্রশ্নই তিনি চেয়েছিলেন; তিনি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন—ইয়েস, ইয়োর অনার। তাই প্রকৃত ঘটনা। তাই বলেছি আমি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—দ্যাটস্ অলরাইট। গো-অন প্লীজ।

অবিনাশবাবু বলে গেলেন—ইয়েস, ইয়োর অনার, ঘটনার যা পরিণতি তাতে সাধারণ নিয়মে আসামী নগেন এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এই ঘটনাটি সোজা হত। পূর্বের কথা অনুযায়ী নগেনেরই ডাকতে আসবার কথাও ছিল। কিন্তু সে আসেনি।

অবিনাশবাবু ধীর কণ্ঠে একটি একটি করে তাঁর বক্তব্যগুলি বলতে শুরু করলেন। কোনও আবেগ নেই, কোন উত্তাপ নেই, শুধু যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ।—নগেন আসেনি। তারই ডাকবার কথা ছিল, কিন্তু সে এল না, ডাকলে না। ইয়োর অনার, এইটিই হলো আসামীর সুচিন্তিত পরিকল্পনার অতি সূক্ষ্ম চাতুর্যময় অংশ! অন্যদিকে এই অতিচতুরতাই তাব উদ্দেশ্যকে ধরিয়ে দিচ্ছে, অত্যন্ত সহজে ধরিয়ে দিচ্ছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা অত্যন্ত সহজেই এ-তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। অবশ্য আর একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে, কিন্তু তাতেও ওই একই সত্যে উপনীত হব আমরা। ইয়োর অনার, সমস্ত বিষয়টি যথার্থ পটভূমির উপর উপস্থাপিত করে চিন্তা করে দেখতে হবে।

পটভূমিকা কী? পটভূমি হলো—বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামের একটি স্বল্পবিত্ত চাষীর সংসাব। সুবল ঘোষ একজন চাষী। আমাদের দেশের পঞ্চাশ বছর আগের চাষীর একজন চাষী। তখনকাব দিনের ধর্মবিশ্বাসে সামাজিক বিশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাসী। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বাল্যকাল থেকেই বিচিত্র প্রকৃতির। সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, প্রথমটায় এই বালক অত্যন্ত দুর্দান্ত। বাপ একমাত্র ছেলেকে অনেক আশা পোষণ করে ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিল। সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ, ভদ্র শিক্ষিত মানুষ তৈরি করবার সাধকে সে খর্ব করেনি। কযেক মাইল দূরে বর্ধিষ্ণু গ্রামের ইস্কুলে ভর্তি কবে দিয়ে বোর্ডিংয়ে রেখেছিল। ইস্কুলের রেকর্ডে আমরা পাই, ছেলেটি আরও কতকগুলি দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে মিশে ইস্কুলে প্রায় নিত্যশাসনের পাত্র হয়ে ওঠে এবং দু'-বছর পরেই ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হয়। তার কারণ কী জানেন? তার কারণ চৌর্যাপরাধ এবং হত্যা; মানুষ নয়—জন্তু। বোর্ডিংয়ের কাছেই ছিল একজন ছাগল-ভেড়া ব্যবসায়ীর খামার এবং গোয়াল। এই গোয়াল থেকে নিযমিতভাবে—দু'-চার দিন পরপর—ছাগল-ভেড়া অদৃশ্য হত। কোনও চিহ্ন পাওয়া যেত না, রক্তের দাগ না, কোনও রকমের চিৎকার শোনা যেত না, কোনও হিংস্র জানোয়ারেরও কোনও প্রমাণ পাওয়া যেত না। শেষ পর্যন্ত অনেক সতর্ক চেষ্টার পর ধরা পড়ল এই দলের একটি ছোট ছেলে। সে স্বীকার করলে,

একাজ তাদের। তারা এই ছাগল-ভেড়া চুরি করে গভীর রাত্রে রান্না করে ফিস্ট করত। বিচিত্রভাবে অপহরণ করতে পটু এবং সক্ষম ছিল একটি বালক! এই আসামী নগেন ঘোষ। কয়েকটি গোপন প্রবেশ পথ তারা করে রেখেছিল। একটি জানালাকে এমনভাবে খুলে রেখেছিল যে, কেউ দেখে ধরতে পারত না যে, জানালাটি টানলেই খুলে আসে। সেই পথে রাত্রে প্রবেশ করত এই নগেন এবং ঘরের মধ্যে ঢুকেই যেটিকে সে সামনে পেত, সেইটিকে মুহূর্তেই গলা টিপে ধরত এবং সঙ্গে সঙ্গে মুচড়ে ঘুরিয়ে দিত। এতে সে প্রায় সিদ্ধহস্ত হয়েছিল। এমনটি আর অন্য কেউই পারত না। এই কারণেব জন্যই হেডমাস্টার তাকে ইস্কুল থেকে বিতাড়িত করেন। বাপ এর জন্য অত্যন্ত মর্মাহত। এবং ছেলেকে কঠিন তিরস্কার করে। তারা বৈষ্ণব, এই অপরাধ তাদের পক্ষে মহাপাপ; এই অপরাধ বাপকে এমনই পীড়া দিয়েছিল যে সে এই পাপের জন্য ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়ে পারেনি; মাথা কামিয়ে শাস্ত্র বিধিমত প্রাযশ্চিত্ত! ছেলে সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ কবে। এবং বারো বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর ফিরে আসে। তখন তার বয়স প্রায় আটাশ-ঊনত্রিশ। ইয়োর অনার, সন্ন্যাসীব বেশে ফিরে আসে। তখন এই যে ক্ষুদ্র শান্ত চাষীর সংসারটি, সে-সংসারে পরিবর্তনশীল কালেব স্রোতে অনেক ভাঙন ভেঙেছে এবং অনেক নূতন গঠনও গডে উঠেছে। নগেনের মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তার ভগ্নী বিধবা হয়েছে, বাপ সুবল ঘোষ বংশলোপের ভয়ে আবার বিবাহ করেছে, এবং একটি শিশুপুত্র রেখে সে-পত্নীটিও পরলোকগমন করেছে। সুবল ঘোষ তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। শিশুপুত্রটিকে মানুষ কবেছে সুবলেব বিধবা কন্যা, আসামী নগেনের সহোদবা।

সুবল হারানো ছেলেকে পেয়ে আনন্দে অধীর হলো এবং তাব অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ দেখে কেঁদে আকুল হয়ে উঠল। বললে—তুই এ-বেশ ছাড়।

নগেন বললে—না।

বাপ বললে—ওরে তুই হবি সন্ন্যাসী হযতো নিজে পাবি পরমার্থ, মোক্ষ। কিন্তু এই আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটে, এই ঘোষ বংশ? ভেসে যাবে?

নগেন বললে—ওই তো খগেন রয়েছে।

সুবল বললে—ছ' বছরের ছেলে, ও বড হবে মানুষ হবে, ততদিন মানুষ-অভাবে ঘর পডবে, দোর ছাড়বে, জমিজেবাত ক্ষুদকুঁড়ো দশজনে আত্মসাৎ করে পথের ভিখারী করে দেবে। ওই বিধবা যুবতী ঘোষ বংশের মেয়ে, তোর মায়ের পেটের বোন, ওর অবস্থা কি হবে ভাব? মন্দটাই ভাব!

নগেন বললে—বেশ, খগেনকে বড কবে ওর বিয়ে দিযে ঘরসংসার পাতিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমি রইলাম। কিন্তু আর কিছু আমাকে বোলো না।

পাবলিক প্রসিকিউটার অবিনাশবাবু তাঁর হাতের কাগজগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোর্টের দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন। পাঁচটার দিকে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। টেবিলের উপর কাগজ-ঢাকা কাঁচের গ্লাসটি তুলে খানিকটা জল খেয়ে আবার আরম্ভ করলেন, ইয়োর অনার, মানুষের মধ্যেই জীবনীশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। জড়ের মধ্যে

যে-শক্তি অন্ধ দুর্বার, জন্তুর মধ্যে যে-শক্তি প্রবৃত্তির আবেগেই পরিচালিত, মানুষের মধ্যে সেই শক্তি মন বুদ্ধি ও হৃদয়ের অধিকারী হয়েছে। জন্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না, সার্কাসের জানোয়ারকে অনেক শাসন করে অনেক মাদক খাইয়েও তার সামনে চাবুক উদ্যত রাখতে হয়। একমাত্র মানুষেরই পরিবর্তন আছে, তার প্রকৃতি পাল্টায়। ঘাত-প্রতিঘাতে, শিক্ষা-দীক্ষায় নানা কার্যকারণে তার প্রকৃতির শুধু পরিবর্তনই হয় না, সেই পরিবর্তনের মধ্যে যে মহত্তর প্রকাশে প্রকাশিত করতে চায় নিজেকে, এইটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রের নিয়ম। অবশ্য বিপরীত দিকের গতিও দেখা যায়, কিন্তু সে দেখা যায় স্বল্পক্ষেত্রে।

জ্ঞানবাবুর গম্ভীর মুখে একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল। অবিনাশবাবু চতুর ব্যক্তি। অসাধারণ কৌশলী। এইমাত্র যে-কথাগুলি তিনি বললেন, সেগুলি তাঁর অর্থাৎ জ্ঞানবাবুর কথা। কিছুদিন আগে এখানকার লাইব্রেরিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

অবিনাশবাবু বললেন—তৎকালীন আচার-আচরণ কাজকর্ম সম্পর্কে যে প্রমাণ আমরা পাই, তাতে আমি স্বীকার করি যে, আসামী নগেনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সে পরিবর্তন সৎ ও শুদ্ধ পরিবর্তন। তার বারো বৎসরকাল অজ্ঞাতবাসের ইতিবৃত্ত আমরা জানি না কিন্তু পরবর্তীকালের নগেনকে দেখে বলতে হবে, এই অজ্ঞাতকালের সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এবং তীর্থ ইত্যাদি ভ্রমণের ফল নিঃসন্দেহে একটি পবিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উপর। না হলে, অর্থাৎ সেই বর্বর পাষণ্ডতা তার মধ্যে সক্রিয় থাকলে সে অনায়াসেই তার বাপের মৃত্যুর পর ছ-বছরের বালক খগেনকে সরিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতে পারত। তার পরিবর্তে সে এই সৎভাইকে ভালবেসে বুকে তুলে নিলে। শুধু তাই নয়, বাপের মৃত্যুর কিছুদিন পর বিধবা বোন মারা যায়। তারপর এই নগেনই একাধারে মা এবং বাপ দুইয়ের স্নেহ দিয়ে তাকে মানুষ করে। ছেলেটি দেখতে ছিল অত্যন্ত সুন্দর। নগেন খগেনকে খগেন বলে ডাকত না, ডাকত গোপাল বলে। টোপরের মতো কোঁকড়ানো একমাথা চুল, কাঁচা রঙ, বড় বড় চোখ। ছেলেটি সত্যিই দেখতে গোপালের মতো ছিল।

একটু থেমে হেসে অবিনাশবাবু বললেন—এক্সকিউজ মি ইয়োর অনার, আমি এ-ক্ষেত্রে একটু কাব্য করে ফেলেছি। বাট আই অ্যাম নট আউট অব মাই মাইন্ডস্, ইয়োর অনার। কারণ—

জ্ঞানবাবু বললেন—একটু সংক্ষেপ করুন।

অবিনাশবাবু বললেন—এই মামলাটি অতি বিচিত্র ধরনের, ইয়োর অনার। আমার মনে হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং তার বিশ্লেষণ ভিন্ন আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হতে পারব না। আসামী নিজে স্বীকার করেছে যে, নৌকো উল্টে নদীর মধ্যে দু'জনে ডুবে গিয়েছিল। ছোট ভাই সাঁতার ভাল জানত না, সে বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে, বড় ভাই আসামী নগেন সেই অবস্থায় নিজেকে তার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আত্মরক্ষার জান্তব প্রকৃতির তাড়নায় তার গলার নলি টিপে ধরে। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছোট ভাইয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে

ভেসে উঠে কোনো রকমে এসে নদীর বাঁকের মুখে চড়ায় ওঠে। পরদিন সকালে ছোট ভাইয়ের দেহ পাওয়া যায় ওই চড়ার আরও খানিকটা নীচে। মৃত খগেনের শবব্যবচ্ছেদের যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি, তাতেও দেখেছি খগেনের গলায় কণ্ঠনালীর দু'পাশে কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন ছিল। ডাক্তার বলেন, নখের দ্বারাই এ ক্ষতচিহ্ন হয়েছে। এবং শবের পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেছে অতি অল্প, জলে ডুবে মৃত্যু হলে আরও অনেক বেশি পরিমাণে জল পাওয়া যেত। ডাক্তার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরোধের ফলে এবং কণ্ঠনালী প্রচণ্ড শক্তিতে টিপে ধরার জন্যে মৃতের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল। এখন এক্ষেত্রে আমাদেব বিচার্য, আসামী নগেন মানসিক কোন অবস্থায় খগেনের গলা টিপে ধরেছিল ? সেই মানসিক অবস্থার অভ্রান্ত স্বরূপ নির্ণয়ের উপরই অভ্রান্ত বিচার নির্ভর করছে। সামান্যমাত্র ভ্রান্তিতে বিচারের পবিত্রতা, মহিমা কলঙ্কিত হতে পারে, নষ্ট হতে পারে। আমরা নির্দোষ একটি অতি সাধারণ মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হয়ে মানবিক জ্ঞান হারিযে আত্মরক্ষার জান্তব প্রবৃত্তির অধীন হওয়ার জন্য তাকে ভুল করে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করার ভ্রম করতে পারি। আবার বিপরীত ভুলের বসে অতি-সুচতুব অতি-কুটিল ষড়যন্ত্র ভেদ করতে না-পেরে নিষ্ঠুরতম পাপের পাপীকে মুক্তি দিযে মানব-সমাজের চরমতম অকল্যাণ করতে পারি। ইয়োর অনার, সিংহচর্মাবৃত গর্দভ সংসারে অনেক আছে, কিন্তু মনুষ্যচর্মাবৃত নরঘাতী পশু বা বিষধরের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। সিংহচর্মাবৃত গর্দভের সিংহচর্মের আবরণ টেনে খুলে দিলেই সমাজ নিরাপদ হয়, সমাজে কৌতুকের সৃষ্টি হয় ; মনুষ্যচর্মাবৃত পশু সরীসৃপের মনুষ্যচর্মের আবরণ মুক্ত করলে মানুষের সমাজ আতঙ্কিত হয় ; তখন সমাজকে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে সমাজেরই উপরে। এই কারণেই আমাকে অতীতকাল থেকে এ-পর্যন্ত এই আসামীর জীবন ও কৃতকর্মগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে। ধর্মাধিকরণে বিচারক মানুষ হয়েও মানুষের উর্ধ্বে অবস্থান করেন, স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করে তেমনি বিচার করতে হবে, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস।

কোর্টের বাইরে কম্পাউন্ডের ওদিক থেকে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে লাগল ঢং ঢং। কোর্টরুমের ঘড়িতে তখনও পাঁচটা বাজতে দু'-মিনিট বাকি।

নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জ্ঞানবাবু বললেন- -কাল পর্যন্ত মামলা মুলতুবী রইল।

একবার তাকিয়ে দেখলেন আসামীর দিকে। সবল সুস্থদেহ নগেন ঘোষ, স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। আশ্চর্য স্থির দৃষ্টি, লোকটির মুখ যেন পাথরে গড়া। কোনো অভিব্যক্তি নেই।

লোকটি থানা থেকে এস-ডি-ও কোর্ট এবং এখানে পর্যন্ত স্বীকার করে একই কথা বলে আসছে। নৌকোতে নদী পার হবার সময় বাতাস একটু জোর ছিল ; মাঝ নদী পার হযেই বাতাস আরও জোর হয়ে উঠেছিল, খগেন সাঁতার প্রায় জানত না, সে ভয় পেযে চিৎকার করে ওঠে, নগেন হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে তাকে বলে, ভয় কী ? খগেন মুহূর্তে নৌকোর ওপাশ থেকে এপাশে এসে তাকে জড়িয়ে

ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট নৌকোখানা যায় উল্টে। জলের মধ্যে নগেন তাকে সজোরে আঁকড়ে ধরে। দু'জনে ডুবতে থাকে। প্রথমটা সে তার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যত চেষ্টা করেছে ততই সে নগেনকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে। তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, জল খাচ্ছিল সে, হঠাৎ খগেনের গলায় তার হাত পড়ে। সে তার গলাটা টিপে ধরে। খগেন তাকে ছেড়ে দেয়। সে জানে না, খগেন তাতেই মরেছে কিনা। কিনারায় এসে উঠে কিছুক্ষণ সে শুয়ে ছিল সেখানে। তারপর কোনরকমে উঠে বাড়ি আসে। মাঝ রাত্রে তার শরীর সুস্থ হলে মনে হয়, খগেন হয়তো মারা গিয়েছে। হয়তো গলা টিপে ধরাতেই সে মরে গিয়েছে। সকালে উঠে সে থানায় যায়। এজাহার করে। এর সাজা কি সে তা জানে না। ভগবান জানেন। যা সাজা হয় জজসাহেব দিন, সে তাই নেবে।

ভগবান জানেন। হায় হতভাগা! নিজে কী করেছে তা নিজে জানে না। ভগবানকে সাক্ষী মানে। কিন্তু ভগবান তো সাক্ষী দেন না। অথচ ডিভাইন জাস্টিস করতে হবে বিচারককে।

দুই

(ক)

ডিভাইন জাস্টিস!

অবিনাশবাবু কথাটা যেন অভিপ্রায়মূলকভাবেই ব্যবহার করেছেন।

কথাটা তিনি নিজেই বোধ করি অন্যের অপেক্ষা বেশি ব্যবহার করেন স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগ যেখানে একমাত্র অবলম্বন, মানুষ যতক্ষণ স্বার্থান্ধতায় মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না, ততক্ষণ ডিভাইন জাস্টিস বোধ হয় অসম্ভব। সরল সহজ সভ্যতাবঞ্চিত মানুষ মিথ্যা বললে সে মিথ্যাকে চেনা যায়, কিন্তু সভ্য-শিক্ষিত মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন সে মিথ্যা সত্যের চেয়ে প্রখর হয়ে ওঠে। পারার প্রলেপ লাগানো কাঁচ যখন দর্পণ হয়ে ওঠে তখন তাতে প্রতিবিম্বিত সূর্যচ্ছটা চোখের দৃষ্টিকে সূর্যের মতোই বর্ণান্ধ করে দেয়। জজ, জুরি, সকলকেই প্রতারিত হতে হয়। অসহায়ের মতো।

জাস্টিস চ্যাটার্জি বলতেন—He is God, God alone. He can do it. আমরা পারি না। অমোঘ ন্যায়-বিধানের কর্তব্যবোধ এবং ন্যায়ের মহিমাকে স্মরণে রেখে প্রমাণ-প্রয়োগগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে, বিন্দুমাত্র ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে, আমরা শুধু বিধান অনুযায়ী বিচার করতে পারি।

একটি নারী অপরাধিনীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার সময় বলেছিলেন তিনি। সুরমা তারই মেয়ে; সুরমা কেঁদে ফেলেছিল—একটা মেয়েকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে বাবা?

চ্যাটার্জি সাহেব বলেছিলেন—অপরাধের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের কৃতকর্মের গুরুত্ব একতিল কমবেশি হয় না মা। দণ্ডের ক্ষেত্রেও নারী বা পুরুষ বলে কোনো ভেদ নেই। ঈশ্বরকে স্মরণ করে এক্ষেত্রে আমার এই দণ্ড না দিয়ে উপায় নেই।

তাঁরই কাছে জ্ঞানেন্দ্রনাথ শিখেছিলেন বিচারের ধারাপদ্ধতি। তিনিই তাঁর গুরু। জ্ঞানেন্দ্রবাবু ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বরকে স্মরণ তিনি করেন না। ঈশ্বর, ভগবান নামটি বড় ভাল। তিনি শুধুই নাম। তিনি সাক্ষীও দেন না, বিচারও করেন না, কিন্তু ওই নামের মধ্যে একটা আশ্চর্য পবিত্রতা আছে, বিচারের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ আছে; সেটিকেই তিনি স্মরণ করেন। তাই ডিভাইন জাস্টিস। ফিরবার পথে গাড়ির মধ্যে বসে বার বার তিনি আপনার মনে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে বলে চলেছিলেন—ডিভাইন জাস্টিস! ডিভাইন জাস্টিস!

স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করে তেমনি বিচার করতে হবে যা অভ্রান্ত, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস!

অবিনাশবাবুর কথাগুলি কানের পাশে বাজছে।

ডিভাইন জাস্টিস! ডিভাইন জাস্টিস!

স্ত্রী সুরমা দেবী কুঠির হাতার বাগানের মধ্যে বেতের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসে বই পড়ছিলেন। সারাদিনের বাদলার পর ঘণ্টাখানেক আগে মেঘ কেটে আকাশ নির্মল হয়েছে, রোদ উঠেছে। সে-রৌদ্রের শোভার তুলনা নেই। ঝলমল করছে সুস্নাত সুশ্যামল পৃথিবী। সম্মুখে পশ্চিম দিগন্ত অবারিত। কুঠিটা শহরের পশ্চিম প্রান্তে একটা টিলার উপর। এর ওপাশে পশ্চিমদিকে বসতি নেই, মাইল দুইয়েক পর্যন্ত অন্য কোনো গ্রাম বা জঙ্গল কিছু নেই, লাল কাঁকুরে প্রান্তরের মধ্যে তিন চারটে অশ্বত্থগাছ আর একটা তালগাছ বিক্ষিপ্তভাবে এখানে-ওখানে দাঁড়িযে আছে আর প্রান্তরটার মাঝখান চিরে চলে গেছে একটা পাহাড়ীয়া নদী। ভরা বর্ষায় নদীটা এখন কানায় কানায় ভরে উঠে বয়ে যাচ্ছে। তারই ওপাশ অবধি প্রান্তরের দিগন্তের মাথায সিঁদুরেব মতো টকটকে রাঙা অস্তগামী সূর্য। রৌদ্রের লালচে আভা ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢতব হয়ে উঠেছে। গাড়িটা এসে দাঁড়াল। আর্দালী নেমে দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এরই মধ্যে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন গাড়ির মধ্যে। আর্দালী মৃদুস্বরে ডাকলে—হুজুর!

চমক ভাঙল জ্ঞানেন্দ্রবাবুর। ও! বলে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। সুরমা দেবী স্বামীকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। বইখানা চায়ের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে এগিয়ে এলেন। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় কণ্ঠেই বললেন—কতদিন চলবে সেসন্‌স্‌?

একটু হেসে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—বেশিদিন না। কেসটা জটিল কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা কম। দিনে বেশি দিন সময় লাগবে না।

বাগানের মধ্যে চায়ের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বললেন—বাগানে চায়ের টেবিল পেতেছ?

সুরমা বললেন—বৃষ্টি আসবে না। দেখছ কেমন রক্তসন্ধ্যা করেছে!

—হ্যাঁ। অপরূপ শোভা হয়েছে। আকাশের দিকে এতক্ষণে তিনি চেয়ে দেখলেন,—সুরমা কথাটা বলে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিতে তবে ফিরল সে-দিকে। রক্তসন্ধ্যা!

রক্তসন্ধ্যার মধ্যে জীবনের একটি স্মৃতি জড়ানো আছে। সুরমার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন রক্তসন্ধ্যা হয়েছিল আকাশে।

সুরমা বললেন—তাড়াতাড়ি এস একটু।

—Yes, time and tide wait for none;—হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।

—শুধু তার জন্যেই নয়। কবিতা শোনাব।

—এক্ষুণি আসছি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু হাসলেন। গম্ভীর ক্লান্ত মুখখানি ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি খুশি হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘদিন পর সুরমা কবিতা লিখে তাঁকে শোনাতে চেয়েছে। সুরমা কবিতা লেখে, তার ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লেখে। তখন লিখত হাসির কবিতা। সে-কালে নাম করেছিল। সুরমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর তিনিও কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। কবিতায় সুরমার কবিতার উত্তর দিতেন তিনি। এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনিও কবিতা লিখতে পারেন। অন্তত পারতেন। জজিয়তির দপ্তরে তাঁর সে-কবিত্ব পাথর-চাপা ঘাসের মতোই মরে গেছে। কিন্তু সুরমার জীবনে বারো মাসে ফুল-ফোটানো গাছের মতো কাব্যরুচি এবং কবিকর্ম নিরন্তর ফুটেই চলেছে ফুটেই চলেছে।

হয়তো অজস্র ফুল ফোটায় সুরমা, কিন্তু সে ফোটে তাঁর দৃষ্টির অন্তবালে তাঁর নিঃশ্বাসের গণ্ডির বাইরে। কবে থেকে যে এমনটা ঘটেছে তার হিসেব তাঁর মনে নেই, কিন্তু ঘটে গেছে! হঠাৎ একটা আবিষ্কার করেছিলেন যে সুরমা তাঁকে আর কবিতা শোনায় না। কিন্তু সে লেখে। প্রশ্ন করেছিলেন সুরমাকে: সুরমা উত্তর দিয়েছিলেন—হাসির কবিতা লিখতাম, হাসি-ঠাট্টা করেই শোনাতাম। ওসব আর লিখি না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—যা লেখ তাই শোনাও।

সুরমা বলেছিলেন—শোনাবার মতো যেদিন হবে সেদিন শোনাব। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটু জোর করেছিলেন, কিন্তু সুরমা বলেছিলেন—ও নিয়ে জোর কোরো না। প্লিজ!

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ পরই ভুলে গিয়েছিলেন কথাটা। বারো মাসে ফুল-ফোটানো সেই গাছের মতোই সুরমার জীবন যাতে শুধু ফুলই ফোটে, ফল ধরে না। সুরমা নিঃসন্তান।

আজ সুরমা কবিতা শোনাতে চেয়েছে। চিন্তা-ভারাক্রান্ত মন খানিকটা হালকা হয়ে উঠল। গুরুভারবাহীর ঘর্মাক্ত শ্রান্ত দেহে ঠাণ্ডা হাওয়ার খানিকটা স্পর্শ লাগল যেন।

একবার ভাল করে সুরমার দিকে তাকালেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। পরিণতযৌবনা এ সুরমার মধ্যে সেই প্রথম দিনের তরুণী সুরমাকে দেখতে পাচ্ছেন যেন। ঘোষাল সাহেব বাঙলোর মধ্যে চলে গেলেন,—একটু ত্বরিত পদেই। সুরমা দেবী দাঁড়িয়েই রইলেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে।

সুরমার মনেও সেই স্মৃতি গুঞ্জন করে উঠেছে আজ। অনেকক্ষণ থেকে। সাড়ে চারটের সময় বাইরে বারান্দায় এসে দূরের ওই ভরা নদীটার দিকে চেয়ে বসে ছিলেন

তিনি। ধীবে ধীবে নিঃশব্দ আযোজনেব মধ্যে আকাশে রক্তসন্ধ্যা জেগে উঠেছিল। তাঁর দৃষ্টি সেদিকে তখন আকৃষ্ট হযনি। হঠাৎ রেডিওতে একটি গান বেজে উঠল। সেই গানেব প্রথম কলি কানে যেতেই আকাশের বক্তসন্ধ্যা যেন মনেব দোরে ডাক দিয়ে সামনে এসে দাঁডাল।

'তুমি সন্ধ্যাব মেঘ শান্ত সুদূব আমাব সাধের সাধনা।'

শুধু বক্তসন্ধ্যাব বর্ণচ্ছটাই নয, তাব সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথেব সঙ্গে প্রথম দেখা হওযাব স্মৃতিটুকু বর্ণাঢ্য হযে দেখা দিল।

সে কতকালেব কথা! বর্ধমানে জজসাহেব কুঠিতে ছিল তখন তাবা। তাব বাবা তখন বর্ধমানে সেসন্‌স্‌ জজ। উনিশ শো একত্রিশ সাল। আগস্ট মাস। এমনি বর্ষা ছিল সাবাদিন। সন্ধ্যাব মুখে ক্ষান্তবর্ষণ মেঘে এমনি বক্তসন্ধ্যা জেগে উঠেছিল। বাবা-মা বাডিতে ছিলেন না, তাঁবা গিযেছিলেন ইংবেজ পুলিশ সাহেবেব কুঠিতে চাযেব নিমন্ত্রণে। নিজে সে তখন কলকাতায থেকে পডত। সেইদিনই সে বাবা মাযেব কাছে এসেছিল। সেই কাবণেই তাব নিমন্ত্রণ ছিল না, পুলিশ সাহেব জানতেন না যে সে আসবে। একা বাঙলোব মধ্যে বসে ছিল, হঠাৎ পশ্চিমেব জানালাব পথে বক্তসন্ধ্যাব বর্ণচ্ছটাব একটা ঝলক ঘবেব মধ্যে এসে পডেছিল একখানা বঙীন উত্তবীযেব মতো। এবং গোটা ঘবখানাকেই যেন বঙীন কবে দিয়েছিল। একলা বাঙলোব মধ্যে তাব যেন একটা নেশা ধবেছিল মনে প্রাণে। সে মুক্তকণ্ঠে ওই গানখানি গেযে উঠেছিল—

'তুমি সন্ধ্যাব মেঘ শান্ত সুদূব আমাব সাধেব সাধনা।

* * *

মম হৃদয বক্ত-বঞ্জনে তব চবণ দিযেছি বাঙিযা
অযি সন্ধ্যাস্বপনবিহাবী'

মনেব উল্লাসে গাইতে গাইতে সে জানালাব ধাবে এসে দাডিযেই অপ্রতিভ হয়ে পডেছিল। সামনেই বাঙলোব হাতাব মধ্যে সিঁডিব নীচে বাইসিক্ল ধবে দাঁডিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সুন্দব, সুপুরুষ, দীর্ঘ-দেহ, গৌববর্ণ, স্বাস্থ্যবান জ্ঞানেন্দ্রনাথও তখন পূর্ণ যুবক। বেশভূষায যাকে স্মার্ট বলে তাব চেযেও কিছু বেশি। গলাব টাইটি ছিল গাঢ লাল বঙেব, মনে আছে সুবমাব। অপ্রতিভ হযে গান থামিযে সবে গিয়েছিল সে জানালাব ধাব থেকে। এবং আর্দালীকে ডেকে প্রশ্ন কবেছিল—কে ও? কি চায?

আর্দালী বলেছিল—এখানকাব থার্ড মন্সব সাহেব। নতুন এসেছে। সাবকে সেলাম দেনে লিয়ে আযে থে।

—কতক্ষণ এসেছে? সাহেব নেই বলনি কেন?

— দো মিনিট সে জেযাদা নেহি। বোলা সাহেব নেহি, চলা যাতে থে, লেকিন বাইসিকল পাংচাব হো গয়া। ওহি লিযে দেবি হুয়া।

বাইসিক্ল পাংচাব হযেছে? হাসি পেয়েছিল সুবমাব। বেচাবী মন্সব সাব, এমন

সুন্দর স্যুটটি পরে এখন বাইসিক্ল ঠেলতে ঠেলতে চলবেন। বর্ধমানের রাস্তার লাল ধুলো জলে জলে গলে কাদায় পরিণত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে খানাখন্দের ভিতর লাল মিকশ্চার ? সুরকি মিকশ্চার ? একান্ত কৌতুকভরে সে আবার একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল।

আজ রেডিওতে ওই গানখানা শুনে রক্তসন্ধ্যার রূপ অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে সুরমা দেবীর মনে।

(খ)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাঙলোয় ঢুকেই সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। ওখানে টাঙানো রয়েছে তরুণী সুরমার ব্রোমাইড এনলার্জ-করা ছবি।

লাবণ্য-ঢলঢল মুখ, মদিরদৃষ্টি দুটি আয়ত চোখ, গলায় মুক্তোর কলারটি সুরমাকে অপরূপ করে তুলেছে। সে আমলে এত বহুবিচিত্র রঙীন শাড়ির রেওয়াজ ছিল না, পাওয়াও যেত না, সুরমার পরনে সাদা জমিতে অল্প-কাজ করা একখানি ঢাকাই শাড়ি। আর অন্য কোনো রকম শাড়িতে সুরমাকে বোধ করি বেশি সুন্দর দেখাত না। সেদিন জজসাহেবের কুঠিতে দেখেছিলেন শুধু সুরমার মুখ। সিঁড়ির নীচে থেকে তার বেশি দেখতে পাননি। দেখতে চানওনি! রক্তসন্ধ্যার রঙে ঝলমল-করা সে মুখখানার থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরেনি। দেখবার অবকাশও ছিল না। সুরমা জজসাহেবের মেয়ে; কলেজে পড়েন; প্রগতিশীল সমাজের লোক। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন মাত্র থার্ড মুন্সেফ। গ্রাম্য হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মাত্র। তার সমাজের লোকে মুন্সেফি পাওয়ার জন্য 'রত্ন' বলে, ভাগ্যবান বলে। কিন্তু সুরমাদের সমাজের কাছে নিতান্তই ঝুটো পাথর এবং মুন্সেফিকেও নিতান্তই সৌভাগ্যের সান্ত্বনা বলে মনে করেন তাঁরা। সুরমাকে ঠিক এই বেশে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁর নিজের বাসায়, কিছুদিন পরে। বোধহয় মাস দেড়েক কি দু'-মাস পর। তাঁর বাসা ছিল শহরেব উকিল-মোক্তার পল্লীর প্রান্তে। বেশ একটি পরিচ্ছন্ন খড়ো বাঙলো দেখে বাসাটি নিয়েছিলেন। তখনও ইলেকট্রিক লাইট হয়নি। বাসের জন্য গরমের দেশে খড়ো বাঙলোর চেয়ে আরামপ্রদ আর কোনো ঘর হয় না। সামনে একটুকরো বাগানও ছিল। সেদিন কোর্ট শেষ করে বাইসিক্লে চেপে বাড়ির একটু আগে একটা মোড় ফিরে, বাইসিক্লে-চাপা অবস্থাতেই তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর বাসার দরজায় মোটর দাঁড়িয়ে। কার মোটর ? পরমুহূর্তে মোটরখানা চিনে তাঁর বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এ যে সেসন্‌স্ জজের 'কার' ! ওই তো পাশে দাঁড়িয়ে জজসাহেবের আর্দালী ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। বাইসিক্ল থেকে বিস্মিত এবং ব্যস্ত হয়ে নেমে আর্দালীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে এসেছেন ?

আর্দালী মুন্সেফ সাহেবকে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বলেছিল—মিস্ সাহেব আয়ি হ্যায় হুজুর।

মিস্ সাহেব? জজসাহেবের সেই কন্যাটি? সেদিন বাঙলোয় তার গানই শুধু শোনেননি জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আহ্বানও শুনেছিলেন—আর্দালী!

শুধু তাই নয। এই কলেজে-পড়া, অতি-আধুনিকা, বাপের আদরিণী কন্যাটি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আরও অনেক কথা তিনি শুনেছেন। ব্যঙ্গ-কবিতা লেখেন। বাক্যবাণে পারদর্শিনী। এখানকার নিলাম-ইস্তাহার-সর্বস্ব সাপ্তাহিকে জজসাহেবের মেয়ের ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশিতও হয়েছে। তাও পড়েছেন। আরও একদিন এই মেয়েটিকে দেখেছেন ইতিমধ্যে। সেদিন বাঙলোয় শুধু মুখ দেখেছিলেন; মধ্যে একদিন জজসাহেবের বাড়িতে তাঁর ছোট ছেলের বিয়ে উপলক্ষে প্রীতি-সম্মেলনে মেয়েটিকে জজসাহেবের পাশে বসে থাকতেও দেখেছেন। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল, তেমনি সম্ভ্রমও জেগেছিল তাঁর সংযত গাম্ভীর্য দেখে। সেই মেয়ে এসেছেন তার বাড়িতে? কেন? হয়তো প্রগতিশীলা রাজকন্যা কোনো সমিতি-টমিতির চাঁদার জন্য বা সুমতিকে তার সভ্য করবার জন্য এসে থাকবেন। সুমতি কি— ?

আজ সুমতির নাম স্মৃতিপথে উদয় হতেই প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমার ছবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাঁ দিকের দেওযালের দিকে তাকালেন। দেওয়ালটার মাঝখানে কাপড়ের পরদাঢাকা একখানা ছবি ঝুলছে।

সুমতির ছবি। সুমতি তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। হতভাগিনী সুমতি। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর মুখ দিযে দুটি আক্ষেপভরা সকাতর ওঃ-ওঃ শব্দ যেন আপনি বেরিয়ে এল। তিনি দ্রুতপদে এ-ঘর অতিক্রম করে পোশাকের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সুমতির স্মৃতি মর্মান্তিক।

আঃ বলে একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। মর্মান্তিক মৃত্যু সুমতির। শার্টটা খুলছিলেন তিনি, আঙুলের ডগা নিজেব পিঠের উপর পড়ল। গেঞ্জিটাও খুলে ফেললেন। পিঠেব উপরটার চামড় অসমতল, বন্ধুব। ঘাড় হেঁট করে বুকের দিকে তাকালেন! বুকের উপরও একটা ক্ষতচিহ্ন। হাত বুলিয়ে দেখলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ক্ষতচিহ্নটার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। বাঁ হাত দিয়ে পিঠের ক্ষতটা অনুভব করছিলেন। গোটা পিঠটা জুড়ে রযেছে। ওঃ! এখনও স্পর্শকাতর হয়ে রয়েছে। বিশ বৎসর হয়ে গেল তবু সারল না। কোট শার্ট গেঞ্জির নীচে ঢাকা থাকে, অতর্কিতে কোনো রকমে চাপা পডলেই তিনি চমকে ওঠেন। কন-কন করে ওঠে। সুমতিকে শেষটায় চিনবার উপায় ছিল না। তিনি শুনেছেন, তবে কল্পনা করতে পারেন। তিনি তখন অজ্ঞান; বোধকরি একবার যেন দেখেছিলেন। বারেকের জন্য জ্ঞান হয়েছিল তাঁর।

পোশাকের ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। চৌকির উপর বসে হাতে মুখে জল দিলেন। সাবানদানি থেকে সাবানটা তুলে নিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সারা বাথরুমটা একটা লালচে আলোর আভায় লাল হয়ে

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছে কোথাও প্রদীপ্ত আগুনের ছটা! চমকে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু, হাত থেকে সাবানখানা পড়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে ফিরে তাকালেন পাশের জানালাটার দিকে। ছটাটা ওই দিক থেকেই এসেছে। জানালাটার ঘষা কাঁচগুলি আগুনের রক্তচ্ছটায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। একটা নিদারুণ আতঙ্কে তাঁর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল, চিৎকার করে উঠলেন তিনি। একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। ভাষা নেই ; শুধু রব।

* * *

দপ্ করে জ্বলে উঠেছে বটে কিন্তু অগ্নিকাণ্ড যাকে বলে তা নয়।

জানালাটার ঠিক ওধারেই খানিকটা, বোধকরি আট-দশ ফুট খোলা জায়গার পরই কুঠির বাবুর্চিখানায় বাবুর্চি ওমলেট ভাজছিল। ওমলেট ভাজবার পাত্রটা সম্ভবত মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়েছিল। তার উপর ঘি ঢালতেই সেটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে, এবং বিভ্রান্ত পাচকের হাত থেকে ঘিয়ের পাত্রটা পড়ে গেছে। আগুন একটু বেশিই হয়েছিল। তারই ছটা গিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ঘষা কাঁচের জানালায়।

তাই দেখেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন।

ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে খালি গায়ে, খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সে কী চিৎকার! শুধু ভয়ার্ত একটা ও-ও-ও শব্দ শুধু। সুরমা দেবী ছুটে এসে তাঁকে ধরে উৎকণ্ঠিত চিৎকারে প্রশ্ন করলেন—কী হলো? কী হলো! ওগো! ওগো!

থরথর করে কাঁপছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কিন্তু ধীমান পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি, দুরন্ত ভয়ের মধ্যেও তাঁর ধীমত্তা প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্গে বনস্পতি-শীর্ষের মতো লড়াই করে অবনমিত অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল। পিছন ফিরে বাঙলোর দিকে তাকালেন তিনি। চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টির চেহারা বদলাল, প্রশ্নাতুর হয়ে উঠল। বললেন —আগুন। কিন্তু—

অর্থাৎ তিনি খুঁজছিলেন, যে আগুনকে দাউ দাউ শিখায় জ্বলে উঠতে দেখলেন তিনি এক মিনিট আগে সে আগুন কই? কী হলো!

সুরমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আগুন? কোথায়?

আত্মগতভাবেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন—কী হলো? অগ্নির সে লেলিহান ছটা যে তিনি দেখেছেন, চোখ যে তাঁর ধেঁধে গিয়েছে। পরক্ষণেই ডাকলেন—বয়!

বয় এসে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে বললে—একটুক্ষণ জ্বলেছিল, তারপরই নিভে গিয়েছে।

জ্ঞানবাবু বললেন—এমন অসাবধান কেন? ঘরে আগুন লাগতে পারত!

বয় সবিনয়ে বললে—টিনের চাল—!

—লোকটার নিজের কাপড়ে-চোপড়ে লাগতে পারত। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—ওকে জবাব দিয়ে দাও! বলেই হন্ হন্ করে বাঙলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। সুরমা দেবী কোনো উত্তর দিলেন না। স্বামীর পিঠজোড়া ক্ষতচিহ্নের দিকে

চেয়ে রইলেন। দীর্ঘদিন পূর্বের কথা তাঁর মনে পড়ল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং সুমতি ঘরে আগুন লেগে জ্বলন্ত চাল চাপা পড়েছিলেন। খবর পেয়ে জজসাহেব এবং সুরমা ছুটে গিয়েছিলেন। ঘরে আগুন লেগেছিল রাত্রে। মফস্বল শহরেব খড়ো বাঙলোবাড়ি, শীতকাল, দরজা-জানালা শক্ত কবে বন্ধ ছিল। খড়ের চালের আগুন প্রথমে খানিকটা বোধহয় বেশ উত্তাপের আরাম দিয়েছিল। যখন ঘুম ভেঙেছিল সুমতি ও জ্ঞানেন্দ্রবাবুর, তখন চারিদিকে ধবে উঠেছে। দরজা খুলে বের হতে হতে সামনের চালটা খসে নীচে পড়ে যায়। সুমতি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু জ্বলন্ত চাপা পড়েন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাব হাত ধরে বের করে আনছিলেন; মাঝখানে সুমতি কাঁচে পা কেটে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিটকে সামনে পড়েও বুকে পিঠে জ্বলন্ত খড চাপা পড়েন। সুমতির সর্বাঙ্গ পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল। ওঃ সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য! জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন হাসপাতালের ভিতরে বেডের উপর অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে। সুমতির দেহটা কাপড দিয়ে ঢাকা ছিল। তুলে দেখিয়েছিল ডাক্তার।

ওঃ! ওঃ! সুরমা দেবীও চোখ বুজে শিউরে উঠলেন।

(গ)

কী মিষ্টি চেহাবা কী বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। উঃ! সুমতিকে মনে পড়ছে। শ্যাম বর্ণ, একপিঠ কালো চুল, বড বড দুটি চোখ, একটু মোটাসোটা নরম-নবম গড়ন; মুক্তোর পাতির মতো সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে সুমতির গালে টোল পড়ত। এবং দু'জনের মধ্যে অনির্বচনীয় ভালবাসা ছিল। অফিসার মহলে এ নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। হওয়ারই কথা। ব্রাহ্ম বিলেত ফেরত ব্যাবিস্টাব জজসাহেবেব কলেজে-পড়া মেয়ের সঙ্গে সামান্য মুনসেফের স্ত্রী গ্রাম্য জমিদার-কন্যা অর্ধশিক্ষিতা সুমতির এত নিবিড় অন্তরঙ্গতা কিসের? কেউ বলেছিল---কোথায় কোন্ জেলা ইস্কুলে সুরমা ও সুমতি একসঙ্গে পড়ত। কেউ বলেছিল সুরমা ও সুমতিব পিতৃপক্ষ কোনকালে দার্জিলিং গিয়ে পাশাপাশি ছিলেন, তখন থেকে সখী দু'জনে। হঠাৎ এখানে সাবজজের বাড়িতে দু'জনে দু'জনকে চিনে ফেলে, পুরানো সখীত্ব নতুন করে গড়ে তুলছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই একটা-না-একটা অসঙ্গতি বেরিয়েছেই বেবিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সত্য কথাটা প্রকাশ হলো।

সুমতি ছিল তার নিজেব পিসতুতো বোন; জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি সুমতির মামা। সুমতির মায়ের সহোদব ভাই। কলেজে পডবার সময ব্রাহ্ম হয়ে সুরমার মাকে বিবাহ করেছিলেন। বাপ ত্যাজ্যপুত্র করেন। ছেলের নাম মুখে আনতে বাড়িতে বারণ ছিল। কোনো সম্পর্কও ছিল না দুই পক্ষেব মধ্যে। অরবিন্দবাবু বিলেত গেলেন, ব্যারিস্টার হয়ে এসে বিচাব বিভাগে চাকরি নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন! তাঁর পক্ষে খবর না রাখাই স্বাভাবিক। পিতৃপক্ষও বাখতেন না। রাখেননি। ববং এই ছেলেটির নাম তাঁরা সযত্নে মুছে দিয়েছিলেন সে-কালের সামাজিক কলঙ্ক ও লজ্জার বিচিত্র কারণে। এ-পরিচয প্রকাশ হলে সেকালে সামাজিক আদান-প্রদান

কঠিন হয়ে পড়ত। সুমতি তার মায়ের কাছে মামার নাম শুনেছিল। শুনেছিল, তিনি ব্রাহ্ম হয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছেন, এই পর্যন্ত। তার মা বিয়ের সময় বার বার করে বলে দিয়েছিলেন, মামার কথা যেন গল্প করিস নে। কী জানি কে কী ভাবে নেবে! সুরমা অবশ্য গল্প শুনেছিল। তার বাবার কাছে। ইদানীং জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে রাত্রিকালে ব্র্যান্ডি পান করে মায়ের জন্য কাঁদতেন! বলতেন, মাই মাদার ওয়াজ এ গডেস! আর কী সুন্দর তিনি ছিলেন! সাক্ষাৎ মাতৃদেবতা! যেন সাক্ষাৎ আমার বাঙলাদেশ! শ্যামবর্ণ, একপিঠ ঘন কালো চুল, বড় বড় চোখ, মুখে মিষ্টি হাসি, নরম-নরম গড়ন—আহা—হা!

সুমতির চেহারা ছিল ঠিক তাঁর মতো, নিজের মায়ের মতো। সেই দেখেই প্রকাশ পেলে সেই পবিচয়। চিনলেন চ্যাটার্জি সাহেব নিজেই। বর্ধমানে সুমতিরা মাস দুয়েক এসেছে তখন। সাবজজের বাড়িতে ছোট ছেলের বিবাহে সামাজিক অনুষ্ঠান—বউভাতের প্রীতিভোজন। সুরমা, সুবমার মা এবং বাবা বাইরের আসরে বসে ছিলেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সাহেব, ডাক্তার সাহেবরাও সস্ত্রীক বসে ছিলেন, পাশে একটু তফাত রেখে বসেছিলেন ডেপুটি, সাবডেপুটি, মুনসেফের দল। তাঁদের গৃহিণীদের আসর হয়েছিল ভিতরে; এই আসরের মাঝখানের পথ দিয়েই তাঁরা ভিতরে যাচ্ছিলেন। সুমতিও চলে গিয়েছিল। সুরমার বাবা কথা বলছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। তিনি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরিসীম বিস্ময়। পরক্ষণেই অবশ্য তিনি আত্মসম্বরণ করে আবার কথা বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষণিকের বিস্ময়-বিমূঢ়তা লক্ষ্য করেছিলেন অনেকেই। সুরমার মারও চোখ এড়ায়নি। কিছুক্ষণ পর যে কথা তিনি বলছিলেন সেই কথাটা শেষ হতেই আবার যেন গভীর অন্যমনস্কতায় ডুবে গেলেন। সুরমার মা আর আত্মসম্বরণ করতে পারেননি, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন—কী ব্যাপার বলো তো?

—অঁ—? চমকে উঠেছিলেন সুরমার বাবা।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হঠাৎ কি হলো তোমার? তখন এমনভাবে চমকে উঠলে? আবারও যেন কেমন তন্ময় হয়ে ভাবছ!

—কতকাল পর হঠাৎ যেন মাকে দেখলাম। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চ্যাটার্জি সাহেব কথাটা বলেছিলেন।—অবিকল আমার মা। অবিকল! তফাত, এ মেয়েটি একটু মডার্ন।

—কে? কী বলছ তুমি?

—লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে একটি মেয়ে তখন বাড়ির ভিতরে গেল, দেখেছ? শ্যামবর্ণ, বড়-বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা একটু বড়, গোঁড়া হিন্দুর ঘরে যেমন পরে। অবিকল আমার মা! ছেলেবেলায় যেমন দেখতাম।

এর উত্তরে সুরমার মা কী বলবেন, চুপ করেই ছিলেন। চ্যাটার্জি সাহেব কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ একটু সামনে ঝুঁকে মৃদুস্বরে বলেছিলেন—একটু খোঁজ নিতে পার? কে, কে এ মেয়েটি? সহজেই বের কবতে

পারবে, লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে এসেছে, ভারী নরম চেহারা, কচি পাতার মতো শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা বড়। সহজেই চেনা যাবে। দেখ না? দেখবে?

অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি সুরমার মা। এবং সহজেই সুমতিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন—এখানে নতুন মুনসেফ এসেছেন, মিস্টার ঘোষাল, তাঁর স্ত্রী।

থার্ড মুনসেফের স্ত্রী?—একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, অবিকল আমার মা। মেয়েটির সিঁথির ঠিক মুখে, এই আমার এই কপালে যেমন একটা চুলের ঘূর্ণি আছে। আমার মায়েরও ছিল।

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে চ্যাটার্জি সাহেব মদ্য পান করে মায়ের জন্য হাউ-হাউ করে কেঁদেছিলেন। নিশ্চয় আমার মা! এ জন্মে—

সুরমার মা বলেছিলেন—পুনর্জন্ম? বোলো না, লোকে শুনলে হাসবে।

হঠাৎ চ্যাটার্জি সাহেব বলেছিলেন—তা না হলে এমন মিল কী করে হলো? ইয়েস। হতে পারে। সুরো, মামি, তুমি একবার কাল যাবে এই মেয়ের কাছে। তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার। জেনে এসো, ওর বাপের নাম কি, ঠাকুরদাদার নাম কী, কোথায় বাড়ি?

সুরমার মার খুব মত ছিল না, কিন্তু প্রৌঢ় বাপের এই ছেলেমানুষের মতো মা-মা করতে দেখে সুরমা বেদনা অনুভব করেছিল, না-গিয়ে পারেনি।

সুমতি অবাক এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল প্রথমটা খোদ জজসাহেবের মেয়ে এসেছেন, কলেজে-পড়া আধুনিকা মেয়ে! যে-মেয়ে সমাজে সভায় তাদের থেকে অনেক তফাতে এবং উঁচুতে বসে, সে নিজে এসেছে তাদেব বাড়ি!

সুরমা গোপন করেনি। সে হেসে বলেছিল—আপনি নাকি অবিকল আমার ঠাকুরমার মতো দেখতে। এমনকি আপনার সিঁথির সামনের চুলের এই ঘূর্ণিটা পর্যন্ত। আমার বাবার মধ্যে আবার একটি ইটারন্যাল চাইল্ড, মানে চিরন্তন খোকা আছে। মায়ের নাম করে প্রায় কাঁদেন। কাল সে কী হাউ-হাউ করে কান্না! তাই এসেছি, আপনার সঙ্গে ঠাকুরমা পাতাতে।

সুমতি স্থির দৃষ্টিতে সুরমার দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ।

সুরমা হেসে বলেছিল—অবাক হচ্ছেন ` অবাক হবার কথাই বটে। কিন্তু আপনার বাপের বাড়ি কোথায়, বলুন তো? আপনি কি অবিকল আপনার ঠাকুরমার মতো দেখতে?

সুমতি বলেছিল—না। তবে আমার দিদিমার সঙ্গে আমার চেহারার খুব মিল। মা বলেন—অবিকল।

এর উত্তরে আসল সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে বিলম্ব হয়নি। সুমতি ছিল অবিকল তার দিদিমার মতো দেখতে। দিদিমা তার জন্মের পরও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন, নইলে এই ঘটনার পর অন্তত লোকে বলত, তিনিই ফিরে এসে সুমতি হয়ে জন্মেছেন,

এবং ধর্মান্তর-গ্রহণ-করা অরবিন্দ চ্যাটার্জি জজসাহেবের সঙ্গে এই দেখা হওয়াটি একটি বিচিত্র ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হত; লোকে বলত জজসাহেব-ছেলের সমাদর পাবার জন্যই ফিরে এসেছেন তিনি। এ-সব কথা সুমতি বলেনি, বলেছিল সুরমা। সুমতি খুব হেসেছিল, খুব হাসতে পারত সে। ঠিক এই সময়েই বাসার বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। দরজায় জজসাহেবের আর্দালী এবং গাড়ি দেখে কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো। সারাটা দিন মুনসেফী কোর্টে বেল্ট সুট আর মনি সুটের জট ছাড়িয়ে, কলম পিষে, শ্রান্ত দেহে ও ক্লান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে মাইল তিনেক বাইসিক্ল ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছিলেন গৃহদ্বার একরকম রুদ্ধ, খোলা থাকলেও প্রবেশাধিকার নেই। বাইরের ঘরে সুমতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুরমাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা দেখতে পেয়েছিল এবং প্রচুর কৌতুকে বয়স ও স্বভাব-ধর্মে কৌতুকময় হয়ে উঠেছিল।

(ঘ)

রয়!

সুরমা চমকে উঠলেন। স্বামী বাঙলোর মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই সুরমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন। স্বামীর ভয়ার্ত অবস্থা এবং পিঠের ও বুকের ক্ষতচিহ্ন দেখে অতীত কথাগুলি মনে পড়ে গিয়েছিল। সুমতির ওই মর্মান্তিক মৃত্যুস্মৃতির বেদনার মধ্যে তাঁর নিজের তরুণ জীবনের পূর্বরাগের রাঙন দিনগুলির প্রতিচ্ছবি ফুটে রয়েছে। একরাশ কালো কয়লার উপর কয়েকটি মরা প্রজাপতির মতো।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন তিনি। পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে ররাবের স্লিপার পায়ে কখন যে তিনি এসেছেন তা জানতে পারেননি। বাঙলোর দিকে পিছন ফিরে রক্তসন্ধ্যার দিকেই তিনি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চেয়ার টেনে বসে পড়েন, তার চোখ-মুখ এখনও যেন কেমন থমথম করছে। তাঁকে দেখে সুরমা শঙ্কিত হলেন, মনে হলো বড় ক্লান্ত তিনি। সুরমা এগিয়ে এসে মিঃ ঘোষালের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর নিজের হাত দু'খানি গাঢ় স্নেহের সঙ্গে রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—ডাক্তারকে একবার খবর দেব?

—ডাক্তার? একটু চকিত হয়ে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ—কেন?

—তুমি অত্যন্ত আপসেট হয়ে গেছ। নিজে বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছ না। এখনও পর্যন্ত—

পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাত ধরে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—নাঃ। ঠিক আছি আমি।

—না। তুমি তোমার আজকের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছ না। আগুন নিয়ে তোমার ভয় আছে। একটুতেই চমকে ওঠ, কিন্তু এমন তো হয় না। তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আর এ-ভাবে পরিশ্রম—

বাধা দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেসে বললেন—নাঃ, আমি ঠিক আছি। আজকের ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক!

—আগুনটা কি খুব বেশি জ্বলে উঠেছিল?

—উঃ, সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। বাথরুমের জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে রিফ্লেকশনে ঘরটা একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছিল! অবশ্য আমিও একটু-একটু, কী বলব, Dreamy, স্বপ্নাতুর ছিলাম। ঠিক শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়েছিলাম না। চমকে একটু বেশি উঠেছি।

—মানে?

—বলছি। সামনে এসো, পিছনে থাকলে কি কথা বলা হয়?

সুরমা সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। ওঁদের দু'জনের পিছনে বাবুর্চি চায়ের ট্রে এবং খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সাহেব এবং মেমসাহেবের এই হাত-ধরাধরি অবস্থার মধ্যে সামনে আসতে পারছিল না, সে একবার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জামগুলি নামিযে দিল।

সুরমা বললেন—যাও তুমি, আমি ঠিক করে নিচ্ছি সব।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—ইয়ে দফে তুমহারা কসুর মাফ কিয়া গয়া, লেকিন দুসরা দফে নেহি হোগা। হুঁসিয়ার হোনা চাহিয়ে। তুমহারা লুগামে আগ লাগা যাতা তো কেয়া হোতা? আঃ?

সেলাম করে বাবুর্চি চলে গেল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—আজকের ঘটনাগুলো আগাগোড়াই আমাকে একটু—কী—বলব—একটু—ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল। এখানে এসেই তোমাকে দেখলাম, রক্তসন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে রযেছ। সেই পুরনো কবি-কবি ভাব! দীর্ঘদিন পর বললে কবিতা শোনাব। পুরনো শুকনো মাটিতে নতুন বর্ষার জল পড়লে সেও খানিকটা সরস হয়ে ওঠে। আমার মনটাও ঠিক তা-ই হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে গেল একসঙ্গে অনেক কথা। রক্তসন্ধ্যার দিন বর্ধমান জজকুঠিতে তোমাকে দেখার কথা। ঘরে ঢুকেই ওদিকের দরজার মাথায় তোমার সেই ছবিটা—দ্যাট রিমাইন্ডেড মি—সেই প্রথম দিনের পরিচয় হওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিলে। স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ল সুমতিকে। সেই হতভাগিনীর কথা ভাবতে ভাবতেই বাথরুমে ঢুকেছিলাম। গেঞ্জি খুলতে গিয়ে পিঠের পোড়া চামডায হাত পড়ে। আজও পড়েছিল। কিন্তু আজ মনে পড়েছিল সেই আগুনের কথা। ঠিক মনের এই ভাববিহ্বল অবস্থার মধ্যে হঠাৎ বাইরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমার মনে হলো আমাকে ঘিরে আগুনটা জ্বলে উঠল।

চায়ের কাপ এবং খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন সুরমা। মৃদুস্বরে বললেন—তবু বলব আজ ব্যাপারটা যেন কেমন। আগুনকে ভয় তোমার স্বাভাবিক। কিন্তু—।

আগুনকে ভয় তাঁর স্বাভাবিক, অতর্কিত আগুন দেখলে চকিত হয়ে ওঠেন, খড়ের ঘরে শুতে পারেন না, রাত্রে বালিশের তলায় দেশলাই পর্যন্ত রাখেন না। সিগারেট

পর্যন্ত খান না তিনি। বাড়ির মধ্যে পেট্রোল-কেরোসিনের টিন রাখেন না। কখনও খোলা জায়গায় ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে যান না। কিন্তু আজ যেন ভয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে হেসে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বোধ করি সমস্ত ঘটনাটাকে হালকা করে দেবার অভিপ্রায়েই হেসে সুরমার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন—ওসব কিছু না। তুমি! সমস্তটার জন্য রেসপন্‌সিবল্‌ তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি। কবি হলে বলতাম, 'এলোচুলে বহে এনেছ কি মোহে সেদিনের পরিমল।' বললাম তো—আজকের তোমাকে দেখে প্রথম দিনের দেখা তোমাকে মনে পড়ে গেল। এবং সব গোলমাল করে দিলে! জজসাহেবের কলেজে-পড়া তরুণী মেয়েটি সেদিন যেমন মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, আজও মাথাটা সেইরকম ঘুরে গেল!

হেসে ফেললেন সুরমা দেবী।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—ওঃ সেদিন যা সম্বোধনটা করেছিলে! ভ্যাবাকান্ত!

এবার সশব্দে হেসে উঠলেন সুবমা। বললেন—বলবে না? নিজেব বাড়ির দোরে এসে বাড়িতে জজসাহেবেব কলেজে-পড়া মেয়ে এসেছে শুনে একজন মডার্ণ তরুণ যুবক পেট-জ্বালা-করা ক্ষিদে নিয়ে মুখ চুণ করে ফিরে যাচ্ছেন।*কী বলতে হয় এতে তুমি বল না? গাঁইয়া কোথাকার!

সেদিন বাড়ির দোর থেকে মুখ চুণ করে সত্যিই ফিরে যাচ্ছিলেন থার্ড মুনসেফ জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কী করবেন? জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে, কোথায় কী খুঁত ধরে মেজাজ খারাপ করবে, কে জানে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। ঠিক এই সময়েই সামনের ঘরের পর্দা সরিয়ে সুরমাই আবির্ভূত হয়েছিল; জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিব্রত অবস্থা দেখে অন্তরে অন্তরে কৌতুক তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেদিন তখন সে জজসাহেবের মেয়ে এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুনসেফ নয়; আত্মীয়তার মাধুর্য, পদমর্যাদার পার্থক্যের রূঢ়তা ভুলিয়ে দিয়েছে, বরং খানিকটা মোহের সৃষ্টি করেছিল এমন বিচিত্র ক্ষেত্রে। তাই সুমতির আগে সে-ই পর্দা সরিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল—আসুন মিস্টার ঘোষাল; বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। আলাপ করতে এসেছি।

সুমতি সুরমার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলেছিল—এসো। সুরমা আমার মামাতো বোন। ওর বাবা আমার সেই মামা, যিনি বাড়ি থেকে চলে গিয়ে—!

বাকিটা উহ্যই রেখেছিল সুমতি।

—কী আশ্চর্য!

একমাত্র ওই কথাটিই সেদিন খুঁজে পেয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

সুরমা বলেছিল—ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিন্তু তখনও বসেননি। বসতে সাহসই বোধকরি হয়নি অথবা অবস্থাটা

ঠিক স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। সুরমাই বলেছিল—কিন্তু আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আমি তো আপনাদের আত্মীয়া। আপনজন।

বেশ ভঙ্গি করে একটু ঘাড় দুলিয়ে চোখ দুটি বড় করে বক্র হেসে সুমতি বলেছিল—অতিমিষ্টি আপনজন, শালী।

সুরমাতে গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছিল মুহূর্তে। সভ্যতাকে বজায় রেখে জ্ঞানেন্দ্রনাথের মতো সুপুরুষ অপ্রতিভ বিব্রত তরুণটিকে বিদ্রূপ না করে তৃপ্তি হচ্ছিল না। এই গ্রাম্য ছোঁয়াচের সুযোগ নিয়ে উচ্ছল হয়ে সে বলে উঠেছিল—হলে কী হবে, ভগ্নীপতিটি আমার একেবারে ভ্যাবাকান্ত।

সুমতি হেসে উঠেছিল।

পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করবার অভিপ্রায়েই সুবমা বলেছিল—মাফ করবেন। রাগ করবেন না যেন।

সুমতি আবাবও তেমনি ধারায় ঘাড় দুলিয়ে বলেছিল—শালীতে ওর চেযেও খারাপ ঠাট্টা করে। এ আবার লেখাপড়া-জানা আধুনিকা শালী; এ ঠাট্টা ভোঁতা নয়, চোখা।

এতক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটা ভাল কথা খুঁজে পেয়েছিলেন, বলেছিলেন—শ্যালিকার ঠাট্টা খারাপ হলেও খারাপ লাগে না, চোখা হলেও গায়ে বেঁধে না। মহাভারতে অর্জুনের প্রণাম-বাণ চুম্বন-বাণের কথা পড়েছ তো? বাণ—একেবারে শানানো ঝকঝকে লোহার ফলা-বসানো তীর—সে তীর এসে পায়ে লুটিয়ে পডত, একেবারে কপালে এসে মিষ্টি ছোঁয়া দিয়ে পড়ে যেত। শ্যালিকার ঠাট্টা তাই। ওদের কথাগুলো অন্যের কাছে শানানো বিষানো মনে হলেও ভগ্নীপতিদের কানের কাছে পুষ্পবাণ হয়ে ওঠে। তার উপর ওঁর মতো শ্যালিকা।

সুমতি চা করতে করতে মুহূর্তে মাথা তুলে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। কুঞ্চিত দুটি ভ্রূর নীচে সে-দৃষ্টি ছিল তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। বলেছিল—কী কথার শ্রী তোমার! ও তোমাকে পুষ্পবাণ মারতে যাবে কেন? পুষ্পবাণ কাকে বলে? কী মনে করবে সুরমা?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঘরের পরিমণ্ডল অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল!

(৬)

কথাটা দু'জনেরই মনে পড়ে গেল। অতীত কথার সরস স্মৃতি স্মরণ করে যে আনন্দমুখরতা সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটার মতো ফুটে উঠেছিল, তার উপর একখানা মেঘ নেমে এল। দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে চুপ করে গেলেন। একটু পরে সুরমা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—আব একটু চা নেবে না?

—না।

স্থিরদৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। না বলেই তিনি উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। পিছনের দিকে

হাত দুটি মুড়ে পায়চারি করতে লাগলেন। হাতার ওপাশে একটা রাখাল একটা গোরুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওঃ! সুমতি তাঁকে ওর চেয়েও নিষ্ঠুর তাড়নায় তাড়িত করেছে। ওঃ! গোরু-মহিষের দালালরা ডগায় ছুঁচ বা আলপিন-গোঁজা লাঠির খোঁচায় যেমন করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় তেমনিভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সে কী নিষ্ঠুর যন্ত্রণা! যে যন্ত্রণায় জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন—ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্মে বিশ্বাস, সব বিশ্বাস। ঈশ্বরের নামে শপথ করেছেন তিনি সুমতির কাছে, ধর্মের নামে শপথ করেছেন। সুমতি মানেনি। দিনের মাথায় দু'তিন বার বলত—বলো, ভগবানের দিব্যি করে বলো! বলো, ধর্মের মুখ চেয়ে বলো!

তিনি বলেছেন। তার শপথ নিয়ে বললে বলেছে—আমি মরলে তোমার কী আসে যায়? সে তো ভালই হবে।

ওই প্রথম দিন থেকেই সন্দেহ করছিল সুমতি। সে বার বার বলেছে—ওই—ওই এক কথাতেই আমি বুঝেছিলাম। সে-ই প্রথম দিন। তার চোখ দুটো জ্বলন্ত। প্রথম দিন রহস্যের আবরণ দিয়ে যে কথাগুলি বলেছিল তার প্রতিটির মধ্যে এ সন্দেহের আভাস ছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমা দু'জনে একজনও সেটা ধরতে পারেননি সেদিন।

অরবিন্দ চ্যাটার্জির মতো উদার লোককেও সে কটু কথা বলত। নিজের মায়ের সঙ্গে নিবিড় সাদৃশ্যের জন্য চ্যাটার্জি সাহেবের স্নেহের আর পরিসীমা ছিল না। সুমতিকে দিয়ে-থুয়ে তাঁর আর আশা মিটত না। সুমতির স্বামী বলে জ্ঞানেন্দ্রনাথের উপরেও ছিল তাঁর গভীর স্নেহ। সে-স্নেহ তাঁর গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তরের স্পর্শে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের উদার মন এবং প্রসন্ন মুখশ্রীর আকর্ষণে। তিনি তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সুমতি তাঁর কাছে ঘেঁষতে চাইত না; অরবিন্দবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কাছে টেনে তাঁরই হাত দিয়ে সুমতিকে স্নেহের অজস্র সম্ভার পাঠাতে চাইতেন। তাঁর জীবনের উন্নতির পথ তিনিই করে দিয়েছিলেন। রায় লেখার পদ্ধতি, বিচারের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কৌশল তিনিই তাঁকে শিখিয়েছিলেন। এসব কিছুই কিন্তু সহ্য হত না সুমতির। তাঁর পাঠানো কোনও জিনিস জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিয়ে এলে তা ফেরত অবশ্য পাঠাত না সুমতি, কিন্তু তা নিজে হাতে গ্রহণ করত না। বলত—ওইখানে রেখে দাও। কী বলব দেওয়াকে আর কী বলব দিদিমার চেহারার সঙ্গে আমার আদলকে। কী বলব জজসাহেবের বুড়ো বয়সে উথলে-ওঠা ভক্তিকে। গোরু মেরে জুতো দান! সেই দান আমায় নিতে হচ্ছে!

রায় লেখা বা বিচার-পদ্ধতি শেখানো নিয়ে বলত—মুখে ছাই বিচার-শেখানোর মুখে। যে একটা মেয়ের জন্যে ধর্ম ছাড়তে পারে, সে তো অধার্মিক! যে অধার্মিক, সে বিচার করবে কী? ধর্ম নইলে বিচার হয়? আর সেই লোকের কাছে বিচার শেখা!

থাক। সুমতির কথা থাক। সুমতির ছবি দেওয়ালে টাঙানো থেকেও পর্দা ঢাকা থাকে। সুমতির কথা থাক। অরবিন্দবাবু বলতেন, সুমতির কথা নিয়ে বলতেন—কী করবে? সহ্য করো। ভালবাসো ওকে। Love is God and God is Love.

চ্যাটার্জি সাহেব বলতেন—ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। ব্রহ্ম-ট্রহ্ম ও-সবও না। আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম, সে ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, সেইজন্যই আমি ব্রাহ্ম হয়েছি। তবে ঈশ্বরত্বের কল্পনাতে আমি বিশ্বাস করি, সেখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্র, সব মানুষ করে, সব মানুষ। ওই ঈশ্বরত্ব। একটি পবিত্র একটি মহিমময় মানুষের মানসিক সত্তায় তার প্রকাশ।

সুমতির ক্ষুদ্রতা, তাঁর ভালবাসার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে মানুষটি কখন চলে আসতেন সার্বজনীন জীবনদর্শনের মহিমময় প্রাঙ্গণে, মুখের সকল বিষণ্নতা মুছে যেত, এই রক্তসন্ধ্যার আভার মতো একটি প্রদীপ্ত প্রসন্ন প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত মুখখানি। দূর-দিগন্তে দৃষ্টি রেখে মানসলোক থেকে তিনি কথা বলতেন—এখন আমার উপলব্ধি হচ্ছে ঈশ্বরত্বই নিজেকে প্রকাশ করেছে মানব-চৈতন্যের মধ্য দিয়ে। God নন, Godliness, yes, Godliness yes;—বলতে বলতে মুখখানি স্মিত হাস্যরেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

তখন ভারতবর্ষে গান্ধীযুগ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৩০ সনের অব্যবহিত পূর্বে। বলেছিলেন গান্ধীর মধ্যে তার আভাস পাচ্ছি। বুদ্ধের মধ্যে তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে তার ছটা আছে। ওখানে বুদ্ধি দিয়ে পৌঁছুতে পারি, প্রাণ দিয়ে, নিজের শ্রদ্ধা দিয়ে পারি নে। পারি নে। মদ না খেয়ে যে আমি থাকতে পারি নে। আরও অনেক কিছু দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় আমি করি নে। করব না। ওইটেই প্রথম শিক্ষা। বিচার-বিভাগে আমি ওটা প্র্যাকটিসের সৌভাগ্য পেয়েছি। বাঙলায় ওটাকে কী বলব? অনুশীলন? হ্যাঁ তাই। রায় লিখবার সময় আমি সেইরকম রায় লিখতে চেষ্টা করি, লিখি, যাকে বলা যায় ধর্মের বিচার। ডিভাইন জাস্টিস।

ডিভাইন জাস্টিস কথাটা তাঁরই কথা।

—হুজুর!

চকিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে তাকালেন। বেয়ারা ডাকছে।

—এ-দিকে কাল রাত্রে একটা সাপ বেরিয়েছে হুজুর। একটু থেমে আবার বললে, তাঁকে বোধকরি মনে করিয়ে দিলে—অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

মুখ তুলে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, আজ আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। দূরে দিগ্বলয়ে গ্রামের বনরেখার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে অন্ধকারে, প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ক্রমশ গাঢ় হয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। বাঙলোর দিকে চাইলেন, আলো জ্বলে উঠেছে সেখানে। সুরমাও বাগানে নেই, সে কখন উঠে বাঙলোর ভিতরে চলে গিয়েছে। নিঃশব্দেই চলে গিয়েছে।

তিন

(ক)

সুরমা ঘরের জানালার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে

ভাবছিলেন অতীত-কথা। সুমতির কথা। আশ্চর্য সুমতি। যত মধু তত কটু। যত কোমল তত উগ্র তীব্র। যত অমৃত তত বিষ। অমৃত তার ভাগ্যে জোটেনি, সে পেয়েছিল বিষ। সে বিষ আগুন হয়ে জ্বলেছিল। সুমতির পুড়ে মরার কথা মনে পড়লেই সুরমার মনে হয়, হতভাগিনীর নিজের হাতে জ্বালানো সন্দেহের আগুনে সে নিজেই পুড়ে মরেছে। ওটা যেন তার জীবনের বিচিত্র অমোঘ-পরিণাম। প্রথম দিন থেকেই সুমতি তাকে সন্দেহ করেছিল। কৌতুক অনুভব করেছিল সুরমা। ভেবেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সে ভালবেসেছে বা ভালবাসবেই। ভালবাসা হয়তো অন্ধ। ভালবাসায়, কাকে ভালবাসছি, কেন ভালবাসছি, এ প্রশ্নই জাগে না। তবু ইয়োরোপে-শিক্ষিত জজসাহেব বাপের মেয়ে সে; আবাল্য সেই শিক্ষায শিক্ষিত, বি-এ পডছে তখন, তার এটুকু বোধ ছিল যে, বিবাহিত, গোঁডা হিন্দুঘরেব ছেলে, পদবীতে মুনসেফের প্রেমে পডার চেযে হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা অন্তত তাব পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। মনে মনে আজও রাগ হয়, সুমতির মতো হিন্দুঘরের অর্ধশিক্ষিতা মেয়েরা ভাবে যে, তাদের অর্থাৎ বিলেত-ফেরত সমাজের মেযেদের সতীত্বেব বালাই নেই, তারা স্বাধীনভাবে প্রেমেব খেলা খেলে বেড়ায় প্রজাপতির মতো। জ্ঞানেন্দ্রবাবু শুধু সুমতির বর বলেই সে তার সঙ্গে হাস্যকৌতুকের সঙ্গে কথা বলেছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুপুরুষ, বিদ্বান, কিন্তু তাঁর দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাতের কথা তাঁর মনের মধ্যে স্বপ্নেও জাগেনি। সুমতির বর, লোকটি ভাল, বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সুমতি হতভাগিনীই অপবাদ দিয়ে তার জেদ জাগিয়ে দিলে; সেই জেদের বশে সপ্রেম দৃষ্টির অভিনয করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ল সে। সুমতি সুরমাকে যেন ঠেলে নিয়ে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথের গায়ের উপর ফেলে দিলে।

সুমতির সন্দেহ এবং ঈর্ষা দেখে সে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নিয়ে খেলা খেলতে গিয়েছিল; সুমতিকে দেখিয়ে সে জ্ঞানবাবুব সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার অভিনয় করতে গিয়েছিল। সুমতি আরও জ্বলেছিল। বেচারা থার্ড মুনসেফ একদিকে হয়েছিল বিহ্বল অন্যদিকে হয়েছিল নিদারুণভাবে বিব্রত। সুরমার কৌতুকোচ্ছলতার আর অবধি ছিল না; তারুণ্যের উল্লাস প্রশ্রয় পেয়ে বন্য হয়ে উঠেছিল। প্রশ্রয়টা এই আত্মীয়তার। ছুটির পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে সে কবিতায় চিঠি লিখেছিল জ্ঞানবাবুকে। ইচ্ছে করেই লিখেছিল। সুমতিকে জ্বালাবার জন্য। তার বাবাই শুধু সুমতিকে ভালবাসতেন না, সেও তাকে ভালবেসেছিল। অনুগ্রহের সঙ্গে স্নেহ মিশিযে যে বস্তু, সে-বস্তুর দাতা হওয়ার মতো তৃপ্তি আর কিছুতে নেই। পরম স্নেহের ছোট শিশুকে রাগিয়ে যেমন ভাল লাগত, তেমনি ভাল লাগত সুমতিকে জ্বালাতন করতে। বছর দেড়েকের বড়ই ছিল সুমতি, কিন্তু মনের গঠনে বুদ্ধিতে আচরণে সুরমাই ছিল বড। তার সঙ্গে এই ভ্যাবাকান্ত হিন্দু জামাইবাবুটিকে বিদ্রূপ করে সে এক অনাস্বাদিত কৌতুকের আনন্দ উপভোগ করত। প্রথম কবিতা তার আজও মনে আছে। সুমতির পত্রেই লিখেছিল—'জামাইবাবুকে বলিস—

'সুমতি তোমার পত্নী, দুর্মতি শালিকা
টোবাকো পাইপ আমি, সুমতি কলিকা
পবিত্র হুঁকোর, তাহে নাই নিকোটিন।
সুমতি গরদ ধুতি, আমি টাই-পিন।
পিনের স্বধর্ম খোঁচা, নিকোটিনে কাশি;
ধন্যবাদ, সহিয়াছ মুখে মেখে হাসি!'

উত্তরে সুমতির পত্রের নীচেই দু' ছত্র কবিতাই এসেছিল।

'ধন্যবাদে কাজ নাই অন্যবাদে সাধ
অর্থাৎ মার্জনা দেবী হলে অপরাধ।'

সুরমা কবিতা দু'-লাইন পড়ে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিল, ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল তার। মনে মনে বলেছিল—হুঁ! গবুচন্দ্রটি তো বেশ! ধার আছে! মিছরির তাল নয়, মিছরির ছুরি!

এরপরই হঠাৎ অঘটন ঘটেছিল। পর পর দুটি। একখানা বিখ্যাত ইংরেজী কাগজে একটা প্রবন্ধ বের হয়েছিল "একটি অহিংস সিংহ ও তার শাবকগণ"। গান্ধীজীকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ। লেখক বলেছিলেন, একটি সিংহ হয়তো অভ্যাসে ও সাধনায় অহিংস হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি ধরে নেওয়া যায় যে, তার শাবকেরাও তাদের স্বভাবধর্ম হিংসা না নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে, বা রক্তের প্রতি তাদের অরুচি জন্মাবে। প্রবন্ধের ভাষা যেমন জোরালো, যুক্তি তেমনি ক্ষুরধার। বুদ্ধের কাল থেকে এ-পর্যন্ত ইতিহাসের নজির তুলে এই কথাই বলেছেন লেখক, অহিংসার সাধনা অন্যান্য ধর্মের সাধনার মতো ব্যক্তিগত জীবনেই সফল হতে পারে। রাষ্ট্রে এই বাদকে প্রয়োগ করার মতো অযৌক্তিক আর কিছু হয় না। এমন কি, সম্প্রদায়গতভাবেও এ-বাদ সফল হয়নি, হতে পারে না। প্রবন্ধটি কয়েকদিনের জন্য চারিদিকে, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে, বেশ একটা সোরগোল তুলেছিল। সুরমাও পড়েছিল সে প্রবন্ধ। লেখকের বক্তব্য তার খারাপ লাগেনি। সে-কালে সরকারী চাকুরে বিশেষ করে বড় চাকুরে যাঁরা এবং অচাকুরে অতিমাত্রায় ইউরোপীয় সভ্যতা-ঘেঁষা সমাজের একদল লোক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে গান্ধীজীর এই অহিংসা নিতান্তই অবাস্তব এবং সেই হেতু ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, অত্যাধুনিক ইউরোপীয় মতবাদ ও সভ্যতা-বিরোধী এই গান্ধীবাদী আন্দোলনকে অনেকখানি তাঁদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বলে মনে করতেন। সমাজে আসরে মজলিশে এ-সম্পর্কে অনেক আলোচনা হত। তাঁদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, অহিংসার এই মতবাদ এটা নিতান্তই বাইরের খোলসমাত্র। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ নয়, গর্দভচর্মাবৃত সিংহ। সুরমার বাবা অরবিন্দবাবু ভিন্ন মতের মানুষ ছিলেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তবুও জজসাহেব হিসেবে তিনি এবং তাঁর সঙ্গে স্ত্রীকন্যা বাধ্য হয়েই বিরোধী শিবিরের মানুষ বলে লোকের দ্বারাও গণ্য হতেন এবং নিজেরাও নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বোধ করি তাই বলে গণ্য করতেন। সেই কারণেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ভাল লেগেছিল।

লেখার ঢঙটিও অতি ধারালো, বাঁকানো। দিনকয়েক পরে তার বাবা তাকে লিখলেন—এ প্রবন্ধ জ্ঞানেন্দ্র লিখেছে। আমাকে অবশ্য দেখিয়েছিল। ভাল লিখেছে, পড়ে দেখিস।

সুরমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এ লেখা সুমতির মুখচোরা কার্তিকের কলম থেকে বেরিয়েছে! ঠিক যেন ভাল লাগেনি! মনে হয়েছিল সে যেন ঠকে গেছে, জ্ঞানেন্দ্রনাথই তাকে ভালমানুষ সেজে ঠকিয়েছে।

এর কিছুদিন পরেই আর এক বিস্ময়। হঠাৎ সেদিন কলেজ-হস্টেলে নতুন একখানা টেনিস র‍্যাকেট হাতে দেখা করতে এলেন সুমতির পতি! টেনিস র‍্যাকেট! হাসি পেয়েছিল সুরমার। উচ্চপদের দণ্ড। পাড়াগাঁয়েব ছেলে, অনেক বিনিদ্র রাত্রি অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় ভাল ফল কবে একটি বড চাকরি পেয়েছে, তারই দায়ে অফিসিযালদের ক্লাবে চাঁদা তো গুণতেই হচ্ছে, এর ওপর এতগুলি টাকা খরচ করে টেনিস র‍্যাকেট কিনে বেচারাকে একদা হয়তো পা পিছলে পড়ে ঠ্যাঙখানি ভাঙতে হবে! হেসে সে বলেছিল—খেলতে জানেন, না হাতেখড়ি নেবেন?

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—শেখাবেন?

—শেখালেই কি সব জিনিস মানুষের হয? নিজের ভরসা আছে?

—তা আছে। ছেলেবেলায় ভাল গুলি-ডাণ্ডা খেলতাম।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সুরমা। তারপব বলেছিল—পারি নে তা নয়। কিন্তু গুরুদক্ষিণা কী দেবেন?

—বলুন কি দিতে হবে? বুঝে দেখি।

—আপনার ঐ কার্তিকী ঢঙের গোঁফজোডাটি কামিয়ে ফেলতে হবে।

হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—বিপদে ফেললেন। কারণ এই গোঁফজোডাটি সুমতির বড প্রিয। ওর একটা পোষা বেডাল ছিল, সেটা মরে গিযেছে। তার দুঃখ সুমতি এই গোঁফজোড়াটি দেখেই ভুলেছে।

সুবমা বক্র হেসে বলেছিল—তা হলে ও দুটি কামাতেই হবে। আমি বরং সুমতিকে একটা ভাল কাবলী বেডাল উপহার দেব।

এবপরই হঠাৎ কথাব মোডটা ঘুরে গিযেছিল। পাশেই টেবিলের উপব পুরনো খবরেব কাগজের মধ্যে লাল-নীল পেনসিলে দাগমারা সেই কাগজখানা ছিল, সেটাই নজরে পডেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথেব। তিনি সকৌতুকে কাগজখানা টেনে নিযেছিলেন এবং পাশে লেখা নানান ধরনের মন্তব্যের উপর চোখ বুলিয়ে হেসে বলেছিলেন—ওরে বাপরে! লোকটা নিশ্চয় বাসায মরেছে! উঃ কি সব কঠিন মন্তব্য!

সুবমা মুহূর্তে আক্রমণ করেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথকে। কেন, তা বলতে পারে না। কাবণ মন্তব্যগুলি একটিও তার লেখা ছিল না, এবং জজসাহেবের মেয়ে এই মতবাদেব ঠিক বিরুদ্ধ মতবাদও পোষণ করত না। তাই আজও সে ভেবে পায না কেন সে সেদিন এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল তাঁকে। বলেছিল—বাসায় তিনি মরেননি, আমার সামনে তিনি বসে আছেন সে আমি জানি। ছদ্মনামের আড়ালে বসে আছেন। এই বলেই শুরু করেছিল আক্রমণ। তারপর সে অবিশ্রান্ত শরবর্ষণ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ

শুধুই মুচকে হেসেছিলেন। শরগুলি যেন কোনও অদৃশ্য বর্মে আহত হয়ে ধার হারিয়ে নিরীহ শরের কাঠির মতোই ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। সুরমা ক্লান্ত হলে বলেছিলেন—মিষ্টিমুখের গাল খেয়ে ভারি ভাল লাগল।

সুরমা দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, বলেছিল—ডাকব অন্য মিষ্টিমুখীদের? বলব ডেকে যে, এই দেখ সেই কুখ্যাত প্রবন্ধের লেখক কে? দেখবেন?

জ্ঞানেন্দ্রনাথের চোখ দুটোও দপ্ করে একবার জ্বলে উঠেছিল। সুরমার চোখ এড়ায়নি। সে বিস্মিত হয়েছিল। গোবরগণেশ হলেও তার হাতে কলম দেখলে বিস্ময় জাগে না, শখের বাবু কার্তিকের হাতে খেলার তীর-ধনুকও বেখাপ্পা লাগে না, কিন্তু ললাটবহ্নি চোখের কোণে আগুন হয়ে জ্বলল কী করে? কিন্তু পরমুহূর্তেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেই নিরীহ গোপাল জ্ঞানেন্দ্রনাথ হয়ে গেয়েছিলেন।

পরমুহূর্তেই হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—দেখতে রাজি আছি। কিন্তু আজ নয়, কাল। সুমতিকে তা হলে টেলিগ্রাম করে আনাই। আমার পক্ষে উকিল হয়ে সেই লড়বে। কারণ মেয়েদের গালিগালাজের জবাব এবং অযৌক্তিক যুক্তির উত্তরে ওই ধরনের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে তো সম্ভবপর নয়।

কতকগুলি মেয়ে এসে পড়ায় আলোচনাটা বন্ধ হয়েছিল।

তারপরই দ্বিতীয় ঘটনা। টেনিস র‍্যাকেট নিয়েই ঘটল ঘটনাটা।

(খ)

পুজো ছিল সেবার কার্তিক মাসে। পুজোর ছুটিতে বাবা সেবার দিন পনেরো দার্জিলিংয়ে কাটিয়েই কর্মস্থলে ফিরে এলেন। সাঁওতাল পরগনার কাছাকাছি কর্মস্থলের সেই শহরটি শরৎকাল থেকে ছ'মাস মনোরম হয়ে ওঠে। ফিরেই সুরমা শুনেছিল, সুমতিরা পুজোর ছুটিতে সেবার দেশে যায়নি, এখানেই আছে, সুমতিরই অসুখ করেছিল। সুমতি তখন পথ্য পেয়েছে, কিন্তু দুর্বল। চ্যাটার্জি সাহেব পুজোর তত্ত্ব, কাপড়-চোপড়, মিষ্টি নিয়ে নিজে গিয়েছিলেন ওদের বাড়ি, সঙ্গে সুরমাও গিয়েছিল। আসবার সময় সুরমা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বলে এসেছিল,—বিকেলে যাবেন। আজ টেনিসে হাতেখড়ি দিয়ে দেব।

চ্যাটার্জি সাহেব নিজে ভাল খেলতেন। এককালে স্ত্রীকেও শিখিয়েছিলেন। সুরমা ছেলেবেলা থেকে খেলে খেলায় নাম করেছিল। সেদিন চ্যাটার্জি সাহেব খেলতে আসেননি। সুরমা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নিয়ে একা একা খেলতে নেমে নিজে প্রথম সার্ভ করে বলটার ফেরত-মার দেখে চমকে উঠেছিল। সে বল সে আর ফিরিয়ে মারতে পারেনি। জ্ঞানেন্দ্রের মার যে পাকা খেলোয়াড়ের মার। সুরমা হেরে গিয়েছিল।

খেলার শেষে সে বলেছিল—আপনি অত্যন্ত শ্রুড লোক। তার চেয়ে বেশি কপট লোক আপনি। ডেঞ্জারাস ম্যান!

—কেন? কী করলাম?

—থাকেন যেন কত নিরীহ লোক, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, অথচ—।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন—তাহলে গোঁফজোড়াটা থাকল আমার?

ওই খেলার ফাঁকেই কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হলো সে। সুমতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তার উপর। গ্রাহ্য করেনি সুরমা বরং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার উপর। চরম হয়ে গেল ওখানকার টেনিস কম্পিটিশনের সময়। বড়দিনের সময় সুরমা গিয়ে কম্পিটিশনে যোগ দিলে, পার্টনার নিলে জ্ঞানেন্দ্রকে। ফাইন্যালের খেলা জিতে দু'জনে ফটো তুলতে গিয়েছিল। ফটো তুলবার আগে জ্ঞানেন্দ্র বলেছিল,—তোমার সঙ্গে ফটো তুলব, গোঁফটা কামাব না!

ওই খেলার অবসরেই 'আপনি' ঘুচে পরস্পরের কাছে তারা তখন 'তুমি' হয়ে গেছে।

সুরমা হেসে উঠেছিল। এবং সেদিন জ্ঞানেন্দ্র যখন তাদের কুঠি থেকে বিদায় নেন তখন নিজের একগোছা চুল কেটে একটি খামে পুরে তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিল—আমি দিলাম, আমার দক্ষিণা! কিন্তু আর না। আর আমিও তোমার সঙ্গে দেখা করব না, তুমিও কোরো না। সুমতি সহ্য করতে পারছে না। আজ আমাকে সে স্পষ্ট বলেছে, তুই আমার সর্বনাশ করলি!

অনেককাল পরে আজ সুরমা উঠে এসে দাঁড়ালেন সেই টেনিস ফাইন্যালের পর তোলানো সেই ফটোখানার সামনে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ফোকাসের সময় তারা ক্যামেরার দিকেই তাকিয়ে ছিল, কিন্তু ঠিক ছবি নেবার সময়টিতেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের কপিখানা নেই, সেখানা সুমতি—। এই ঘটনার স্মৃতি মাথার মধ্যে আগুন জ্বেলে দেয়।

ঈর্ষাতুরা সুমতি! আশ্চর্য কঠিন ক্রুর ঈর্ষা। পরলোক, প্রেতবাদ, এসবে সুরমা বিশ্বাস করে না, কিন্তু এ-বিশ্বাস তার হযেছে, মানুষের প্রকৃতির বিষই হোক আর অমৃতই হোক, যেটাই তার স্বভাব-ধর্ম সেটা তার দেহের মৃত্যুতেও মরে না, যায় না, সেটা থাকে, ক্রিয়া করে যায়। সুমতির ঈর্ষা আজও ক্রিয়া করে চলেছে; জীবনের আনন্দের মুহূর্তে অকস্মাৎ ব্যাধির আক্রমণের মতো আক্রমণ করে, মধ্যে মধ্যে সেই আক্রমণের থেকে নিষ্কৃতি বোধ করি এ-জন্মে আর হলো না। কিন্তু আজ যেন এ আক্রমণ অতি তীব্র, হঠাৎ ওই আগুনটা জ্বলে ওঠার মতোই জ্বলে উঠেছে। খড়ের আগুনটা নিভেছে, এটা নিভল না।

(গ)

তাঁর কাঁধের উপর একখানা ভারী হাত এসে স্থাপিত হলো। গাঢ় স্নেহের আভাস তার মধ্যে, কিন্তু হাতখানা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। স্বামী রবারের চটি পরে সতরঞ্চির উপর দিয়ে এসেছেন; চিন্তামগ্নতার মধ্যে মৃদু শব্দ যেটুকু উঠেছে তা সুরমার কানে যায়নি।

—অকারণ নিজেকে পীড়িত কোরো না। ধীর মৃদু স্বরে বললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ—পরের দুঃখের জন্যে যে কাঁদতে পারে, সে মহৎ; কিন্তু অকারণ

অপরাধের দায়ে নিজেকে দায়ী করে পীড়ন করার নাম দুর্বলতা। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। এসো।

ঘুরে তাকালেন সুরমা, স্বামীর মুখের দিকে তাকাবামাত্র চোখ দুটো ফেটে মুহূর্তে জলে ভরে টলমল করে উঠল।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁকে মৃদু আকর্ষণে কাছে টেনে এনে কাঁধের উপর হাতখানি রেখে অনুচ্চ গাঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন—আমি বলছি, তোমার কোনও অপরাধ নেই, আমারও নেই। না। অপরাধ সমস্ত তার! হ্যাঁ তার! উই ডিড নাথিং ইমমরাল, নাথিং ইললিগ্যাল। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অধিকার আমার ছিল। সেই অধিকারের সীমানা কোনওদিন অন্যায়ভাবে অতিক্রম আমরা করিনি। বিবাহের দায়ে অপর কোনও নারীর সঙ্গে পুরুষের বা কোনও পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা নারীর বন্ধুত্বের বা প্রীতিভাজনতার অধিকার খর্ব হয় না।—আমারও হয়নি তোমারও হয়নি।

সুরমার চোখ থেকে জলের ফোঁটা ক'টি ঝরে পড়ল; পড়ল জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাঁ হাতের উপর। বাঁ হাত দিয়ে তিনি সুরমার একখানি হাত ধরে ছিলেন সেই মুহূর্তটিতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—তুমি কাঁদছ? না, কেঁদো না। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো। আমি অনেক ভেবেছি। সমস্ত ন্যায় এবং নীতিশাস্ত্রকে আমি চিরে চিরে দেখে বিচার করেছি। আমি বলেছি অন্যায় নয়। অন্যায় হয়নি। শুধু বন্ধুত্ব কেন সুরমা, প্রেম, সেও বিবাহের কাটা খালের মধ্যে বয় না। বিবাহ হলেই প্রেম হয় না সুরমা। বিবাহের দায়িত্ব শুধু কর্তব্যের, শপথ পালনের। সুমতিকে বিবাহ করেও তোমাকে আমি যে-নিয়মে ভালবেসেছিলাম সে নিয়ম অমোঘ, সে-নিয়ম প্রকৃতির অতি বিচিত্র নিয়ম, তার উপর কোনও ন্যায় বা নীতিশাস্ত্রের অধিকার নেই। যে-অধিকার আছে সে-অধিকার আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এসেছিল ভালবাসা, তাকে আমি সংযমের বাঁধে বেঁধেছিলাম, প্রকাশ করিনি। তোমার কাছে না, সুমতির কাছে না, কারও কাছে না। আর তোমার কথা? তোমার বিচার আরও অনেক সোজা। তুমি ছিলে কুমারী। অন্যের কাছে তোমার দেহমনের বিন্দুমাত্র বাঁধা ছিল না। শুধু সুমতির স্বামী বলে আমাকে তোমার ছিনিয়ে নেবারই অধিকার ছিল না, কিন্তু ভালবাসার অবাধ অধিকার লক্ষ বার ছিল তোমার। সুরমা, আজও স্থির বিশ্বাসে ভগবান মানি নে, নইলে বলতাম ভগবানেরও ছিল না। কোনো অপরাধ নেই আমাদের। বিচারালয়েই বল বা যে-কোনও দেশের মানুষের বিচারালয়েই বল, সেখানে সিদ্ধান্ত—নির্দোষ। জড়িমাশূন্য পরিষ্কার। কণ্ঠের দৃঢ় উচ্চারণে উচ্চারিত সিদ্ধান্ত! দুর্বলতাই একমাত্র অপরাধ যার জন্য প্রাণ অভিশাপ দেয় আত্মাকে।

স্থির দৃষ্টিতে অভিভূতের মতো সুরমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি শুনছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্থির। তিনি তাকিয়ে ছিলেন একটু মুখ তুলে ঘরখানার কোণের ছাদের অংশের দিকে, ওইখানে ওই আবছায়ার মধ্যে দেওয়ালের গায়ে কোনও মহাশাস্ত্রের একটি পাতা ফুটে উঠেছে, এবং তিনি তাই পড়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে দৃঢ়কণ্ঠে।

—চলো, বাইরে চলো, বেড়াতে যাব।

সুরমা এটা জানতেন। এইবার তিনি বাইরে যেতে বলবেন। যাবেন। অনেকটা দূরে ঘুরে আসবেন। আগে সারারাত ঘুরেছেন, ক্লাবে গিয়েছেন, মদ্যপান করেছেন। রাত্রে আলো জ্বেলে টেনিস খেলেছেন দু'জনে। এখন এমনভাবে সুমতিকে মনে পড়ে কম। এবার বোধ হয় দু'বছর পরে এমনভাবে মনে পড়ল। সোজা পথে তো সুমতিকে তাঁরা আসতে দেন না। কথার পথ ধরে সুমতি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেই কথার পথের মোড় ঘুরিয়ে দেন তাঁরা। অন্য কথায় গিয়ে পড়েন। আজ সুমতি দীর্ঘদিন পরে ঘুরপথ ধরে সামনে এসেছে। বাথরুমের জানালা দিয়ে ওই আগুনের ছটার সঙ্গে মিশে অশরীরিণী সে ঈর্ষাতুরা এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে।

(ঘ)

গাড়ি চলল। শ্রাবণ-রাত্রিতে আবার মেঘ ঘন হয়ে উঠেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নতুন অ্যাসফল্টের সমতল সরল পথ। শহর পার হয়ে নদীটার উপর নতুন ব্যারেজের সঙ্গে তৈরি ব্রিজ পার হয়ে শাল-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে নতুন-তৈরি পথ। দু'পাশে শালবনে বর্ষার বাতাসে মাতামাতি চলেছে। নতুন পাতায় পাতায় বৃষ্টিধারার আঘাতে ঝরঝর একটানা শব্দ চলেছে। মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় পথের পাশে পাশে কেয়ার ঝাড়। সেখানে কেয়া ফুল ফুটেছে, গন্ধ আসছে। ভিজে অ্যাসফল্টের রাস্তার বুকে হেডলাইটের তীব্র আলোর প্রতিচ্ছটা পড়েছে; পথের বাঁকে হেডলাইটের আলো জঙ্গলের শালগাছের গায়ে গিয়ে পড়েছে। অদ্ভুত লাগছে।

গাড়ি চলেছে। একসময় যেন প্রকৃতির রূপ বদলাল। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হয়ে উঠল। চারপাশে আকাশ থেকে ঘন কালো মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে মাটিতে নেমেছে মনে হচ্ছে। মেঘ নয়, ওগুলি পাহাড়, অরণ্যভূমি এবং পার্বত্যভূমি এক হয়ে গেল এখান থেকে। অ্যাসফল্টের রাস্তা এইবার সর্পিল গতি নিচ্ছে, সত্যিই সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে। দূরে কোথাও প্রবল একটা ঝরঝর শব্দ উঠেছে, একটানা শব্দ; দিঙমণ্ডল-ব্যাপ্ত-করা প্রচণ্ড উল্লাসের একটা বাজনা যেন কোথাও বেজে চলেছে; বাজনা নয়,—পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরছে। গাড়ির মধ্যে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, ঘোষালসাহেব তাঁর হাতের মধ্যে সুরমার একখানি হাত নিয়ে বসে আছেন। মধ্যে মধ্যে দু'-চারটি কথা। কাটা-কাটা, পারম্পর্যহীন।

—এটা সেই বনটা নয়? যেখানে গলগলে ফুলের গাছ দেখেছিলাম?

—এই তো বাঁ পাশে; পেরিয়ে এলাম।

তারপর আবার দু'জনে স্তব্ধ। গলগলে ফুলের সোনার মতো রঙ। ফুল তুলে সুরমাকে দিয়েছিলেন; সুরমা একটি ফুল খোঁপায় পরেছিল। ঘোষালসাহেবের হাতের মুঠো ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠেছিল; অন্তরে আবেগ গাঢ় হয়ে উঠেছে। সুরমা একটি অস্ফুট কাতর শব্দ করে উঠলেন! উঃ!

—কী হলো? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন স্বামী।

মৃদুস্বরে সুরমা শুধু বললেন—আংটি।

—লেগেছে? বলেই হেসে ঘোষালসাহেব হাত ছেড়ে দিলেন, আঙুলের আংটির জন্যে হাতের চাপ বড্ড লাগে।

—না। অন্ধকারের মধ্যে অল্প একটু মুখ ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে স্বামীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। না, ছেড়ে দিতে তিনি চান না।

আবার স্তব্ধ হলেন দু'জনে। মনের যে গুমোট অন্ধকার কেটে যাচ্ছে তাই যেন বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে; তাঁরা প্রশান্ত ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হযে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছেন। অকস্মাৎ দূরের একটানা বাজনার মতো ঝরনার সেই ঝরঝর শব্দটা প্রবল উল্লাসে বেজে উঠল। যেন একটা পাঁচিল সরে গেল, একটা বদ্ধ সিংহদ্বার খুলে গেল। একটা চড়াই অতিক্রম করে ঢালের মুখে বাঁক ফিরতেই শব্দটা শতধাবায বেজে উঠেছে। চমকে উঠলেন সুরমা।

—কিসের শব্দ?

ঝরনার। বর্ষার জলের ঢল নেমেছে! নির্ঝবেব স্বপ্নভঙ্গ। স্বপ্নাতুর হাসি ফুটে উঠল ঘোষালসাহেবের মুখে। সুবমা উৎসুক হয়ে জানালার কাঁচে মুখ রাখলেন, যদি দেখা যায়!

ঘোষালসাহেব চোখ বুজে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করলেন,

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খলখল গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি।"

কযেক সেকেন্ড স্তব্ধ থেকে আবার বললেন—"এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোব।" তারপর বললেন—প্রাণ গান গাইছে। লাইফ ফোর্স। যেখানে জীবন যত দুর্বার, সেখানে তাব গান ত উচ্চ। কিন্তু সব প্রাণেরই কামনা বিশ্বগ্রাসী, তাই তাব দাবি—"নাল্পে সুখমস্তি—ভূমৈব সুখম্।" বিপুল বিশাল প্রাণেরও যত দাবি এক কণা প্রাণেরও তাই দাবি। বড অনবুঝ। বড অনবুঝ।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—কিন্তু যার যতখানি শক্তি তার একটি কণা বেশি পাবার অধিকার তাব নেই। নেচারস্ জাজমেন্ট! কোথাও নদী পাহাড কেটে ভেঙে চুরমার করে দিযে আপন পথ করে নিযে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথাও স্তব্ধ হয়ে খানিকটা জলার সৃষ্টি করে পাহাড়ের পাযের তলায় পড়ে আছে, শুকিযে যাচ্ছে। বড় জোর মানস সরোবর। কিন্তু মাথা কোটার বিরাম নেই।

অকস্মাৎ সুরমা দেবী সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন—ক'টা বাজল?

শঙ্কিত হযে উঠেছেন তিনি। দর্শনতত্ত্বের মধ্যে ঘোষালসাহেব ঢুকলে আর ওঁর নাগাল পাবেন না তিনি। মনে হবে, এই ঝরনাটার ঠিক উলটো গতিতে তিনি পাহাড়ের উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে উঠে চলেছেন, আর তিনি সমতলে অসহায়ের মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্রমশ যেন চেনা মানুষটা অচেনা হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ

হাঁপিয়ে ওঠে। একথা বললে আগে বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলতেন—তাহলে ইন্সিওরেন্স পলিসি, গভর্নমেন্ট পেপার আর শেয়ার স্ক্রিপ্টগুলো নিয়ে এসো। তাই নিয়ে কথা বলি। অথবা আলমারি খুলে হুইস্কির বোতল বের করে দাও। গিভ মি ড্রিঙ্ক। হেঁটে নামতে দেরি লাগবে অনেক। তার চেয়ে স্খলিত চরণে গড-গড করে এগিয়ে এসে পড়ব তোমার কাছে। তোমার অঙ্গে ঠেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকব। বলে হা-হা করে হাসতেন। যে হাসি সুরমা সহ্য করতে পারতেন না।

আগে ঘোষালসাহেব সত্য সত্যই এ-কথার পর মদ খেতেন, পরিমাণ পরিমাপ কিছু মানতেন না। এখন মদ আর খান না। সুদীর্ঘকালের অভ্যাস একদিনে মহাত্মার মৃত্যুদিনেব সন্ধ্যায় ছেড়ে দিযেছেন। মদ ধরেছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমার সংস্পর্শে এসে। শুরু তার টেনিস খেলাব পর ক্লাবে। সেটা বেড়েছিল সুমতির সঙ্গে অশান্তির মধ্যে। সুমতির মৃত্যুর পব সুরমাকে বিযে করেও মধ্যে মধ্যে এমনই কোনও অস্বস্তিকব অবস্থা ঘনিয়ে উঠলেই সেদিন মদ বেশি খেতেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর গোটা রাত্রি দিনটা তিনি স্তব্ধ হযে বসেছিলেন একখানা ঘরের মধ্যে। উপবাস করে ছিলেন। জীবনে গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি যতকিছু মন্তব্য করেছিলেন, ডাযবি উলটে উলটে সমস্ত দেখে তার পাশে লাল কালির দাগ দিয়ে লিখেছিলেন---ভুল ভুঁল। সুরমা তাঁর সামনে কতবার গিয়েও কথা বলতে না পেরে ফিরে এসেছিলেন। তারপর, তখন বোধ হয় বাত্রি ন'টা, ঘর থেকে বেরিযে এসে বেযারাকে ডেকে বলেছিলেন—সেলারে যতগুলি বোতল আছে নিয়ে এসো।

বোতলগুলি খুলে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন মাটিতে। তারপর বলেছিলেন—আমার খাবারের মধ্যে মাছ-মাংস আজ থেকে যেন না থাকে সুরমা।

সুরমা বিস্মিত হননি। এই বিচিত্র মানুষটির কোনও ব্যবহারে বিস্ময় তাঁর আর তখন হত না!

সেই অবধি মানুষটাই যেন পালটে গেলেন। এ আর-এক মানুষ। মানুষ অবশ্যই পালটায়, প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণে পালটায়, প্রকৃতির নিয়ম, পরিবর্তন অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু এ-পরিবর্তন যেন দিক পরিবর্তন। একবার নয়, দু'বার। প্রথম পরিবর্তন সুমতির মৃত্যুর পর। শান্ত মৃদু মিষ্টভাষী কৌতুকপরায়ণ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুমতির মৃত্যুর পর হয়ে উঠেছিলেন অগ্নিশিখার মতো দীপ্ত এবং প্রখর, কথা-বার্তায় শাণিত এবং বক্র; দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে হা-হা করে হেসে উড়িয়ে দিতেন।

একবার, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বর্ধমানে ডিস্ট্রিক্ট জজ, তাঁদের বাড়িতে সমবেত হয়েছিলেন রাজকর্মচারীদের নবগ্রহমণ্ডলী; তার চেয়েও বেশি কারণ এঁরা ছিলেন সপরিবারে উপস্থিত। তর্ক জমে উঠেছিল ঈশ্বর নিয়ে। তর্কের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কথা বলেননি বেশি কিন্তু যে কম কথা ক'টি বলেছিলেন তা যত মারাত্মক এবং তত ধারালো ও ব্যঙ্গাত্মক। লঙ্কা ফোড়নের মতো ঝাঁঝালো এবং সশব্দ। হঠাৎ এরই মধ্যে

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বারো বছরের ছেলেটি বলে উঠেছিল—গড ইজ নাথিং বাট বদারেশন।

কথাটা ছেলেমানুষী। শুনে সবাই হেসেছিল ; কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথেব সে কী অট্টহাসি। তিন দিন ধরে হেসেছিলেন।

ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাসির উচ্ছলতা তাঁর কমে এসেছিল, কিন্তু প্রকৃতিতে তিনি পালটাননি। প্রথম যেন স্তব্ধ হযে গেলেন যুদ্ধের সময়। তারপর গান্ধীজীর মৃত্যুর দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্য মানুষ হযে গেলেন। এখন দর্শনতত্ত্বের গহনে প্রবেশপথে তাঁকে পিছন ডাকলে তিনি আগের মতো অট্টহাস্য করেন না, মদ খান না, চোখ বন্ধ কবে চুপ কবে বসে থাকেন এবং তারই মধ্যে একসময ঘুমিয়ে পড়েন। এমন ক্ষেত্রে তাঁকে সহজ জীবনেব সমতলে নামাতে একটি কৌশল আবিষ্কাব করেছেন সুবমা। তাঁকে কোনও গুরুদায়িত্ব বা কর্তব্যের কথা স্মবণ করিয়ে দেন। তাতেই কাজ হয়।

(৬)

আজ ওই নদীর জলে বেগ এবং ওই পাহাড়েব বাঁধের দৃঢ়তার কথা ধবে জীবনতত্ত্বের জটিল গহনে তিনি ক্রমে ক্রমে সুরমাব নাগালেব বাইরে চলে যাবার উপক্রম করতেই শঙ্কিত হযে সুবমা নিজেব হাত-ঘডিটার দিকে তাকালেন। বোধ করি বিদ্যুতের চমক দেখে আপনা-আপনি চোখ বুজে ফেলার মতো সে তাকানো, বললেন—ক'টা বাজছে ? আমার ঘড়িটায কিছু ঠাওব করতে পারছি না। চোখের পাওয়ার খুব বেড়ে গেছে। দেখো তো ?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ কবে গাড়িব ঠেসান দেওয়ার গদীতে মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে মৃদু স্বরে বললেন—গাড়িব ড্যাসবোর্ডের ঘড়িটা দেখো।

ড্যাসবোর্ডের ঘড়িটা বেশ বড একটা টাইম-পিস। তার উপরে বেডিয়াম দেওয়া আছে। জ্বলজ্বল করছে। সুরমা চমকে উঠে বললেন—ও মা! এ যে বাবোটা।

—বারোটা ? ক্লান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কিন্তু তার বেশি চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। চোখ বুজে ভাবছিলেন, চোখ খুললেন না।

—গাড়ি ঘোবাও। বললেন সুরমা।

—ঘোরাবে ?

—ঘোরাবে না ? ফিরে তো আবার সেই নথি নিয়ে বসবে। ওদিকে সেসন্‌স্ চলছে, সেই দশটার সময়—

তবুও তেমনিভাবে বসে বইলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

গোটা কেসটা মাথাব মধ্যে উদ্ঘাটিত-যবনিকা রঙ্গমঞ্চেব দৃশ্যপটের মতো উঠল।

জটিল বিচার্য ঘটনা। নৌকো উলটে গিয়েছিল। নৌকো ডুবেছিল ছোট ভাইয়ের দোষে। তারা জলমগ্ন হয়েছিল! ছোট ভাই আঁকড়ে ধরেছিল বড় ভাইকে। বড় ভাই

ছাড়াতে চেষ্টা করেও পারেনি। শেষে ছোট ভাইয়ের গলায় তার হাত পড়েছিল। এবং—! সে স্বীকার সে করেছে। কিন্তু—।

আসামীকে মনে পড়ল তাঁর।

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

সুরমাও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়েই আছেন, কিন্তু তখন ডুবে গেছেন মামলার ভাবনার মধ্যে। সে সুরমা বুঝতে পারছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। এ তবু সহ্য হয়। সহ্য না করে উপায় নেই। এ কর্তব্য। কিন্তু এ কী হলো তাঁর জীবনে? তিনি পেলেন না। তাঁর সঙ্গে চলতে পারলেন না? না—! হারিয়ে গেলেন? টপটপ করে চোখ থেকে তাঁর জল পড়তে লাগল। কিন্তু সে-কথা জ্ঞানেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন না; অন্ধকার গাড়ির মধ্যে তিনি চোখ বন্ধ করেই বসে আছেন। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে আদালত, জুরি, পাবলিক প্রসিকিউটার, আসামী।

চার

(ক)

পরের দিন। ডকের মধ্যে আসামী দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই এক•ভঙ্গিতে। বয়স অনুমান করা যায় না, তবে পরিণত যৌবনের সবল স্বাস্থ্যের চিহ্ন তার সর্বদেহে। শুধু আহারের পুষ্টিতে নধর কোমল দেহ নয়, উপযুক্ত আহার এবং পরিশ্রমে প্রতিটি সুদৃঢ় ছন্দে ছন্দে গড়ে উঠেছে দেহখানি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়, জন্মকাল থেকেই দেহের উপাদানের স্বচ্ছলতা এবং দৃঢ়সংকল্পে পরিশ্রমের অভ্যাস নিয়ে জন্মেছে। মাথায় একটু খাটো। তাম্রাভ রঙ। মুখখানা দেখে মুখের ঠিক আসল গড়ন বোঝা যায় না, দীর্ঘদিন বিচারাধীন থাকার জন্য মাথার চুল বড় হয়েছে, মুখে দাড়ি-গোঁফ জন্মেছে। অবশ্য আগের কালের মতো রুক্ষতা নেই চুলে, আজকাল তেল পায় জেলখানার অধিবাসীরা। তবুও দাড়ি-গোঁফ-চুল বিশৃঙ্খল; হতভাগ্যের বিভ্রান্ত মনের আভাস যেন ফুটে রয়েছে ওর মধ্যে; অঙ্গারগর্ভ মাটির উপরের রুক্ষতার মতো। নাক স্থূল; চোখ দুটি বড়, দৃষ্টি যেন উগ্র। উদ্ধত কি নিষ্ঠুর ঠিক বুঝতে পারছেন না জ্ঞানেন্দ্রনাথ। পরনে সাদা মোটা কাপড়ের বহির্বাস, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক।

(খ)

—ইয়োর অনার, এই আসামী নগেনের বাল্যজীবনের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির কথা আমি বর্ণনা করেছি। উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা সত্যের উপর তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর এই নগেন গৃহত্যাগ করে চলে যায়। অনুতাপ-বশেই হোক আর ক্ষোভে অভিমানেই হোক নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়। এবং দীর্ঘকাল পর সন্ন্যাসী বৈরাগী বেশে ফিরে আসে।

পাবলিক প্রসিকিউটার অবিনাশবাবু তাঁর গতকালকার বক্তব্যের মূল সূত্রটি ধরে অগ্রসর হলেন। হাতের চশমাটি চোখে লাগিয়ে কাগজপত্র দেখে একখানি কাগজ বেছে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—

—ইয়োর অনার, আমার বক্তব্যে অগ্রসর হবার পূর্বে আপনাকে আর একবার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব।

অবিনাশবাবু জুরিদের দিকে তাকিয়ে বললেন—রিপোর্টে আছে জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু হলে মানুষের পাকস্থলীতে যে-পরিমাণ জল পাওয়া যায়, এই মৃতের পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেলেও তার পরিমাণ তার চেয়ে আশ্চর্য রকমের কম। অর্থাৎ জলমগ্ন হওয়ার কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু এ-ক্ষেত্রে হয়নি। অথচ মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। এবং শবদেহেও সেই লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। তা হলে হতভাগ্য মরল কী করে? তার প্রমাণ রয়েছে মৃতের কণ্ঠনালীতে সুস্পষ্ট পাঁচটি নখক্ষতের চিহ্নের মধ্যে লুকানো। বাঁদিকে একটি, ডানদিকে চারটি। মানুষের হাতের লক্ষণ। আসামী নগেন থানায় এবং নিম্ন আদালতে স্বীকার করেছে, খগেন জলমগ্ন অবস্থায় তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধবেছিল যে সেও ডুবে যাচ্ছিল, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। সে তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। সেই অবস্থায় কোনওক্রমে তার ডান হাতটা সে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং সেই হাত পড়ে খগেনের কণ্ঠনালীতে। সে কণ্ঠনালী টিপে ধরে। খগেন ছেড়ে দেয় বা সর্বদেহের সঙ্গে তার হাত শিথিল হয়ে এলিয়ে যায়। তখন সে ভেসে ওঠে। সে এ-কথা অস্বীকার করে না। এখন দুটি সিদ্ধান্ত হতে পারে। এক, কণ্ঠনালী টিপে ধরার ফলে খগেনের মৃত্যু হওয়ায় সে ছেড়ে দেয় বা এলিয়ে পড়ে, বা মৃত্যুর কিছু পূর্বে মৃতকল্প অবস্থায় সে এলিয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত যাই হোক না কে ন, মৃত্যু এই কারণে আসামীর দ্বারাই ঘটেছে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েও দুটি বিষযেব বিচার আছে। জটিল, অত্যন্ত জটিল। দুটি বিষয়ের একটি হলো, আসামী আত্মরক্ষ র জন্য অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে মানবিক সকল চৈতন্য এবং চেতনা হারিয়ে এমন ক্ষেত্রে অবশিষ্ট জান্তব চেতনার পক্ষে অতি স্বাভাবিক প্রেরণায় মৃত খগেনের গলা টিপে ধরেছিল, অথবা তার পূর্বেই তার মানসিক কূটবুদ্ধি, লোভ-হিংসাসঞ্জাত ক্রূরতা ও জীবনের অভ্যস্ত পাপপরায়ণতা এই সুযোগে চকিতে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। যেমন জাগ্রত হয়ে ওঠে নির্জনে অসহায় অবস্থায় নারী দেখলে ব্যভিচারীর পাশব প্রবৃত্তি, অ থবা জাগ্রত হয় লুঠেরাব লুণ্ঠন প্রবৃত্তি, তেমনিভাবে কাল ও পাত্রের সমাবেশে সৃষ্ট সুবর্ণ-সুযোগের মতো পরিবেশের সুযোগ দেখে জেগে উঠেছিল। ইয়োর অনার, সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্বের মধ্যে এই সংসারে কতক্ষেত্রে যে বিশ্বাসপরায়ণ অসহায় বন্ধুকে হত্যা করে তার সংখ্যা অনেক! গোপন প্রবৃত্তি, সুযোগ দেখে অকস্মাৎ জেগে ওঠে দানবের মতো। চিরন্তন পশু জাগে; অসহায় মানুষ দেখে বাঘ যেমন গোপন স্থান থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গোপন মনের পাশব প্রবৃত্তির অস্তিত্বই মানুষের সভ্যতার শৃঙ্খলার ভয়ঙ্করতম শত্রু।

নানা ছদ্মবেশ পরে নানা ছলনায় মানুষের সর্বনাশ করে সে। আমি সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করেছি বলেই বিশ্বাস করি যে, সেই প্রবৃত্তিই সজাগ ছিল আসামীর মনের মধ্যে। এখন বিচার্য বিষয় সেইটুকু; এই জলমগ্ন অবস্থায় আসামীর মনের স্বরূপ নির্ণয়! এ নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন; অতি জটিল; এর কোনও সাক্ষী নেই। আসামী বলে, সে জানে না। এবং এও বলে যে, সে যদি হত্যা করে থাকে তবে সে মৃত্যু শাস্তিই চায়। আসামী বৈষ্ণব, এই বিচারাধীন অবস্থাতেও সে তিলক-ফোঁটা কাটে দেখতে পাচ্ছি। সে এক সময় গৃহত্যাগ করেছিল বৈরাগ্যবশে, জীবহত্যা করে কুলধর্ম লঙ্ঘনের জন্য অনুতাপবশে। বারো বৎসর পর ফিরে এসে সৎভাইকে বুকে তুলে নিয়েছিল সুগভীর স্নেহের বশে। সেই ভাইকে সে-ই কুড়ি বৎসরের যুবাতে পবিণত করে তুলেছিল। এই দিক দিয়ে দেখলে অবশ্যই মনে হবে এবং এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হব যে, আসামী যখন ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছিল, তখন তাব মধ্যে মৌলিক জীবনেব আত্মরক্ষার জান্তব চেতনা ছাড়া মানবিক জ্ঞান বা চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে যে অপরাধ সে কবেছে, সে-অপরাধ অনেক লঘু, এমনকি তাকে নিরপরাধও বলা যায়।

বিচারক জ্ঞানেন্দ্রনাথ আবার তাকালেন আসামীর দিকে। মাটির পুতুলের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তাঁর নিজের মতোই ভাবলেশহীন মুখ। তিনি জানেন, এ সময় তাঁর মুখের একটি রেখারও পরিবর্তন হয় না; নিরাসক্তের মতো শুনে যান। একটু তফাত রয়েছে। আসামীর দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস রয়েছে। বিশ্লেষণের ধারা তাকে বিস্মিত করে তুলেছে।' বিহ্বলতার মধ্যেই ওই বিস্ময় তাকে সচেতন করে রেখেছে।

অবিনাশবাবু বলছিলেন—কিন্তু যদি এই ব্যক্তি আকস্মিক সুযোগ, লোভ এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে নিজের-হাতে মানুষ-কবা ভাইকে হত্যা করে থাকে তবে সে নৃশংসতম ব্যক্তি এবং চতুরতম নৃশংস ব্যক্তি। এবং সে তাই বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপাতদৃষ্টিতে একথা অসম্ভব বলে মনে হবে। মনে হবে, এবং হওয়াই উচিত, যে লোক ছাগল মারার অনুতাপে লজ্জায় সন্ন্যাসী হয়েছিল, যে ভাইকে বুকে করে মানুষ করেছে, যার কপালে তিলক-ফোঁটা, গলায় কণ্ঠি, যে ব্যক্তি ও অঞ্চলে খ্যাতনামা বৈষ্ণব, সে কি এ কাজ করতে পারে? কিন্তু পাবে। আমি বলি পারে। এক্ষেত্রে আমার দুটি কথা। প্রথম কথা, মানুষের শৈশব-বাল্যের অভ্যাস, তার জন্মগত প্রকৃতি অবচেতনের মধ্যে স্থায়ী অধিকারে অবস্থান করে। সে মরে না, চাপা থাকে। এবং মানব-জীবন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অহরহ পরিবর্তনশীল। নিত্য অহরহ পরিবর্তনের মধ্যেই তার জীবনের প্রকাশ এবং সেই প্রকাশের মধ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন অনেকবার হতে পারে। যে-পথে সে চলে হঠাৎ তার বিপরীত পথ ধরে চলতে শুরু করে। ইয়োর অনার, গৃহধর্ম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। হঠাৎ দেখা যায় মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে গেল, আবার দেখা যায় সেই সন্ন্যাসীই গৈরিক ছেড়ে গৃহধর্ম করছে, মামলা মোকদ্দমা বিষয় নিয়ে বিবাদ সাধারণ সন্ন্যাসীর চেয়ে শতগুণ আসক্তি এবং কুটিলতার সঙ্গে

করছে। যে মানুষ পত্নীবিয়োগ বিরহের মহাকাব্য লেখে, সেই মানুষ কয়েক বৎসর পর বিবাহ করে নূতন প্রেমের কবিতা লেখে।

(গ)

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—সংক্ষেপ করুন অবিনাশবাবু। বি ব্রীফ প্লীজ!

—ইয়েস ইয়োর অনার, আমার আর সামান্যই বক্তব্য আছে। সেটুকু হলো এই। এই আসামী নগেনের আবার একটি পরিবর্তন হয়েছিল। আমরা তার পরিচয় বা প্রমাণ পাই। সে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হবার ব্যবস্থা করছিল এই ঘটনার সময়। কিন্তু এটা বাহ্য। অভ্যন্তরে ছিল দি ইটারন্যাল ট্রায়ঙ্গল্—

—হোয়াট? ভ্রূ কুঞ্চিত করে সজাগ হয়ে ফিরে তাকালেন বিচারক।

—সেই সনাতন ত্রয়ীর বিরোধ, ইয়োর অনার—

—দুটি নারী একটি পুরুষ—?

—এক্ষেত্রে দুটি পুরুষ একটি নারী, ইয়োর অনার।

—ইয়েস।

অবিনাশবাবু বললেন—নারীটি একটি লীলাময়ী।

—লীলাময়ী? উই মিন এ মডার্ন গার্ল?

—না, ইয়োর অনার, মেয়েটি লাস্যময়ী। তার চেয়েও বেশি স্বৈরিণী। এ হার্লট। ওই গ্রামেরই একটি দরিদ্র শ্রমজীবীর কন্যা। নগেন এবং খগেনের বাপের আমল থেকে ঐ মেয়েটিব বাপমায়ের নানা কর্মসূত্রে হৃদ্যতা ছিল। চাষের সময় মেয়েটির মা-বাপ ওদের চাষে খাটত। শেষের দিকে কয়েক বৎসর যখন নগেন-খগেনের বাপ শেষ শয্যায় দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তখন স্থায়ীভাবে কৃষাণের কাজও করেছিল। ওদের বাড়িতে মেয়েটির মায়ের নিত্য যাওয়া-আসা ছিল; বাড়ি ঝাঁট দেওয়ার কাজ করত, ওদের বাড়ির ধান সেদ্ধ ও ধান ভানার কাজ করত নিয়মিতভাবে, মাইনে করা ঝিয়ের কাজ করত। তখন থেকেই ওই মেয়েটিও, চাঁপা মায়ের সঙ্গে দু'বেলাই এদের বাড়ি আসত। এবং বয়সে সে ছিল খগেনেরই সমবয়সী, দু' এক বছরের বড়; খগেনের সঙ্গে সে খেলা করত, পরে চাঁপার বিবাহ হয়, সে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। তখন সে বালিকা। আমাদের দেশেব নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাত-আট বছর বয়সে বিবাহের কথা সর্বজনবিদিত। তারপর এই ঘটনার দু' বছর আগে বিধবা হয়ে সে যখন ফিরে আসে তখন সে যুবতী এবং স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় স্বৈরিণী। সে তার স্বামীর বাড়িতেই এই স্বৈরিণী-স্বভাব অর্জন করেছিল, এবং যতদূর মনে হয়, জন্মগতভাবেই সে ওই প্রকৃতির ছিল। কারণ ওই শ্বশুরবাড়িতে থাকতেই স্বভাবহেতু বহু অপবাদ তার হয়েছিল। দুটি-একটি ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই চাঁপা ফিরে এসে স্বাভাবিকভাবেই এবং অতি সহজেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী এই প্রিয়দর্শন তরুণ খগেন ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছিল। তারপর আকৃষ্ট হলো বড় ভাই। এই চাঁপা মেয়েটিই মামলার প্রধান সাক্ষী। আসামী নগেন প্রথমটা এই তরুণ-তরুণীর মধ্যে

সংস্কারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। ভাইকে সে চাঁপার মোহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যই চেষ্টা করেছিল। মেয়েটিকেও অনুরোধ করেছিল প্রতিনিবৃত্ত হতে।

হেসে অবিনাশবাবু বললেন—সাধুজনোচিত অনেক অনেক ধর্মোপদেশ সে দিত তখন। তারপর—।

আবার হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন—সাধুর খোলস তার জীবন থেকে খসে পড়ে গেল। সে তার দিকে আকৃষ্ট হলো এবং উন্মত্ত হয়ে উঠল। চাঁপার কাছে সে বিবাহ-প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। সাময়িকভাবে চাঁপাও তার দিকে আকৃষ্ট হয়। ছোট ভাই মৃত খগেন তখন বড় ভাইকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। সন্ন্যাসী হয়ে বড় ভাই যখন গৃহত্যাগ করেছিল, এবং বাপের মৃত্যুশয্যায় স্বমুখে বলেছিল যে, গৃহধর্ম সে করবে না, ছোট ভাইকে মানুষ করে দিয়েই সে আবার চলে যাবে, তখন পৈতৃক বিষয়-আশয়ের উপর তার কোনও অধিকার নেই। সমস্তর মালিক সে একা। কিন্তু আসামী নগেন তখন সে-কথা অস্বীকার করলে। বললে, সে মুখের কথার মূল্য কী? প্রকাশ্যেই সে বলেছিল তার সে মন আর নেই। বলেছিল, তোর জন্যেই আমাকে থাকতে হয়েছে সংসারে; সেই সংসার আজ আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। তোর জন্যেই আমাকে চাঁপার সংস্রবে আসতে হয়েছে। তুইই আমাকে চাঁপার মোহে ঠেলে ফেলে দিয়েছিস। আজ আমি চাঁপাকে বষ্টোমি করে নিয়ে মালাচন্দন করে আখড়া করব। সম্পত্তির ভাগ আজ আমাকে পেতে হবে, আমি নেব।

বিরোধের একটি জটের সঙ্গে আর একটি জট যুক্ত হয়ে রূঢ়তর এবং কঠিনতর হয়ে উঠল। তার পরিণতিতে এই ঘটনা। বিষয় নিয়ে বিরোধের শেষ পর্যন্ত গ্রামের পঞ্চজনের মীমাংসায় স্থির হয় যে, নগেন বাপের কাছে যা-ই মুখে বলে থাক, তার যখন কোনও লিখিত-পড়িত কিছু নেই এবং বাপ যখন নিজে একথা বলেনি বা উইল করে যায়নি যে, তার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র খগেন হবে, তখন নগেন অবশ্যই সম্পত্তির অংশ পাবে। প্রায় সকল জমিই ভাগ হয়ে বাকি ছিল শুধু একখানি জমি। পঞ্চজনে বলেছিল দু'জনে মাপ করে জমিটার মাঝখানে আল দিয়ে নিতে। সেই জমিখানি মাপ করে ভাগ করবার জন্যই দুই ভাই ঘটনার দিন নদীর অপর পারে গিয়েছিল। এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। একটি বন্ধুর সঙ্গে মিলে ভাগে খগেনের একটি পান-বিড়ির দোকান ছিল। সে সেই দোকানেই থাকত। সেদিন কথা ছিল নগেন এসে খগেনকে ডাকবে এবং দুই ভাই ওপারে যাবে। কিন্তু নগেন আসে না, দেরি হয়। তখন খগেনই এসে নগেনকে ডাকে। নগেনের মনের মধ্যে তখন এই প্রবৃত্তি উঁকি মেরেছে বলেই আমার বিশ্বাস। একটা দ্বন্দ্ব তখন শুরু হয়েছে।—এই সুযোগে যদি কাঁটা সরাতে পারি তবে মন্দ কী? আবার ভয়-মায়া-মমতা, তারাও স্বাভাবিকভাবে বাধা দিয়ে চলেছিল প্রাণপণ শক্তিতে। স্নেহ, দয়া প্রভৃতি মানবিক প্রবৃত্তিগুলি তখন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ওই নদীতে ভাইকে একলা পাওয়ার সুযোগ এলেই অন্তরের গুহায় প্রতীক্ষমাণ হিংসা যে হুঙ্কার দিয়ে লাফ দিয়ে পড়বে সে তা বুঝতে পারছিল। সেই কারণেই নগেন বাড়ি থেকে বের

হয়নি। তারই ডাকবার কথা ছিল খগেনকে। এর প্রমাণ পাই আমরা খগেনের দোকানের অংশীদার বন্ধুর কাছ থেকে। খগেনের দোকানের অংশীদার বন্ধু বলে, চাঁপা এবং নগেনের ব্যবহারে খগেন তখন ক্ষোভে অভিমানে প্রায় পাগল। অভিমানে রাগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এ-গ্রামেই সে আর থাকবে না। বিষয় ভাগ করে নিয়ে, সব বেচে দিয়ে, সে যত শিগগির হয় চলে যাবে অন্যত্র। দোকানের অংশ খগেন সেই সকালে বন্ধুকে বিক্রি করেছিল এবং বলেছিল নদীর ওপারের এই জমিটা হলেই সে এ-গ্রাম ছেড়ে প্রথম যাবে নদীর ওপারের গ্রামে। সেখান থেকে জমিজমা নগেনের কোনও শত্রুকে বিক্রি করে চলে যাবে দেশ ছেড়ে। সেই কারণেই সে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল নগেনের। কিন্তু নগেন এল না দেখে বিরক্ত হয়ে বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে নগেনকে ডেকে আনে। নদীর ঘাটের পথেই এই দোকানখানি। খগেনের এই বন্ধু বলে—ওপারে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে দোকান পর্যন্ত এসেও নগেন বলেছিল, খগেন, আজ থাক। আমার শরীরটা আজ ভাল নেই। এবং এও বলেছিল, বিকেলটা আজ ভাল নয়, বৃহস্পতির বারবেলা ; তার উপর কেমন গুমোট রয়েছে। চৈত্রের শেষ। বাতাস-টাতাস উঠলে তোকে নিয়ে মুশকিল হবে।

খগেন ভাল সাঁতার জানত না। জলকে সে ভয় করত। কিন্তু সে-দিন সে বলেছিল, না। আর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আমি রাখব না। ওই জমিটায় আল দিতে পারলেই সাতখানা দড়ির শেষখানা কেটে যাবে। আজ শেষ করতেই হবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নগেন বলেছিল, তবে চল।

এর মধ্যে ইঙ্গিতটি যেন স্পষ্ট। তার বর্বর প্রকৃতির কাছে যে তখন অসহায়! দীর্ঘনিঃশ্বাসটি তারই চিহ্ন! এবং পরবর্তী ঘটনা, যা এর পূর্বে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, তাই ঘটেছে। জলমগ্ন অবস্থার সুযোগে বর্বর-প্রবৃত্তির তাড়নায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাধা করেছে সে।

ওদিকে বাইরের পেটা ঘড়িতে একটা বাজল। কোর্টের ঘড়িটা ও থেকে দু' মিনিট স্লো।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু উঠে পড়লেন।

পাঁচ

(ক)

খাস কামরায় এসে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।

শরীর আজ অত্যন্ত অবসন্ন। কালকের রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ফলে সারা দেহখানা ভারী হয়ে রয়েছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। নিজের কপালে হাত বুলিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন তিনি।

আর্দালী টেবিল পেতে দিয়ে গেল। মৃদু শব্দে চোখ বুজেই অনুমান করলেন তিনি। চোখ বুজেই বললেন—শুধু বুজেই বললেন—শুধু টোস্ট আর কফি। আর কিছু না!

সকাল বেলা উঠে থেকেই এটা অনুভব করেছেন। সুরমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; তিনিও লক্ষ্য করেছেন। বলেছিলেন, শরীরটা যে তোমার খারাপ হলো।

তিনি স্বীকার করেননি। বলেছিলেন—নাঃ। শরীর ঠিক আছে। তবে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি কোথায় যাবে? তার একটা ছাপ তো পড়বেই। সে তো তোমার মুখের উপরেও পড়েছে। হেসেছিলেন তিনি।

—তাছাড়া কালকের বিকেলের ওই আগুনটা—!

—ওঃ! এ স্নান করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই তিনি ফাইল টেনে নিয়েছিলেন। এবং যা প্রত্যাশা করেছিলেন তাই ঘটেছিল; সুরমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিলেন। ফাইল খুলে বসার অর্থ-ই হলো তাই।

—প্লিজ সুরমা, এখন আমাকে কাজ করতে দাও।

সুমতি যেত না। কিন্তু সুরমা যান। এ-কর্তব্যের গুরুত্ব সুরমার চেয়ে কে বেশি বুঝবে? সুরমা বিচারকের কন্যা; বিচারকের স্ত্রী। এবং নিজেও শিক্ষিতা মেয়ে। সুমতিকে শেষ পর্যন্ত বলতে হত—আমাকে কাজ করতে দাও! শেষ পর্যন্ত আমার চাকরি যাবে এমন করলে। সুমতি রাগ করে চলে যেত।

সুমতির প্রকৃতির কথা ভাববার জন্যে তিনি ফাইল টেনে নিয়েছিলেন। নইলে ফাইল দেখবার জরুরী তাগিদ কিছু ছিল না। আসলে গতরাত্রির সেই চিন্তার স্রোত তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে অবরুদ্ধ জলস্রোতের মতো আবর্তিত হচ্ছিল। সত্যেব পর সত্যের নব নব প্রকাশ নতুন জলস্রোতের মতো এসে গতিবেগ সঞ্চারিত করছিল; কিন্তু সময়ের অভাবে সম্মুখপথে অগ্রসর হতে পাবেনি। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। ঘুমও হয়নি। স্বপ্ন-বিহ্বল একটা তন্দ্রার মধ্যে শুধু শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, স্বপ্নের মধ্যে সুমতি একবার এসে সামনে দাঁড়ায়নি। সকাল বেলায় কিন্তু ঘুম ভাঙতেই সর্বাগ্রে মনে ভেসে উঠেছে সুমতির মুখ। আশ্চর্য! অবচেতন নয়, সচেতন মনের দুয়ার খুলে চৈতন্যের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে সে। সুমতিকে অবলম্বন করেই গতকালের অসমাপ্ত চিন্তাটা মনে জাগল। মনে পড়ে গিয়েছিল, লাইফ ফোর্সের প্রাণশক্তির জীবন-সংগীত শুনেছিলেন কাল ওই ঝরনার কলরোলের মধ্যে। সে ঝরঝর শব্দ এখনও তাঁর কানে বাজছে। সে এক বিন্দুই হোক আর বিপুল বিশালই হোক, আকাঙ্ক্ষা তার বিশ্বগ্রাসী। কিন্তু শক্তির পরিমাণ যেখানে যতটুকু, পাওনার পরিমাণ তার ততটুকুতেই নির্দিষ্ট, তার একটি কণা বেশি নয়। ব্রহ্মা-কমণ্ডলুর স্বল্প পরিমাণ, হয়তো একসের বা পাঁচপো জল, গোমুখী থেকে সমগ্র আর্যাবর্ত ভাসিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে তার বিষ্ণুচরণ থেকে উদ্ভব-মহিমার গুণেতে ও ভাগ্যে, সুমতির মুখে এই কথা শুনে তিনি হাসতেন। বলতেন, তা হয় না সুমতি, এক কমণ্ডলু জল ঢেলে দেখ না কতটা গড়ায়। সুমতি রাগ করত, তাঁকে বলত অধার্মিক, অবিশ্বাসী।

কথাটা প্রথম হয়েছিল দার্জিলিং-এ বাসে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুমতিকে হিমালয়ের মাথার তুষার-প্রাচীর দেখিয়েও কথাটা বোঝাতে পারেননি। অবুঝ শক্তির দাবি ঠিক সুমতির মতোই বিশ্বগ্রাসী। সে-দাবি পূর্ণ হয় না। বেদনার মধ্যেই তার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশ জল আগুন বাতাস—এরা লড়াই করে নিজেকে শেষ করে স্থির হয়;—কিন্তু জীবন চিৎকার করে কেঁদে মরে, জানোয়ার চিৎকার করে জানিয়ে যায়; মানুষ ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে, অভিশাপ দেয়। অবশ্য প্রকৃতির মৌলিক ধর্মকে পিছনে ফেলে মানুষ একটা নিজের ধর্ম আবিষ্কার করেছে। বিচিত্র তার ধর্ম—বিস্ময়কর। মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও তৃষ্ণার্ত মানুষ নিজের মুখের সামনে তুলে-ধরা জলের পাত্র অন্য তৃষ্ণার্তের মুখে তুলে দিয়ে বলে, দাই নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন। লক্ষ লক্ষ এমনি ঘটনা ঘটেছে। নিত্য ঘটছে, অহরহ ঘটছে। এ-মহাসত্যকে কে অস্বীকার করবে যে, যে মরণোন্মুখ তৃষ্ণার্ত নিজের মুখের জল অন্যকে দিয়েছিল, তার তৃষ্ণার যন্ত্রণার আর অবধি ছিল না। এখানে প্রকৃতির ধর্ম অমোঘ। লঙ্ঘন করা যায় না। মানুষের জীবনেও ওই তো দ্বন্দ্ব ওই তো সংগ্রাম; ওইখানেই তো তার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। প্রকৃতিধর্মের দেওয়া শাস্তি! হঠাৎ জ্ঞানেন্দ্রবাবু চোখ খুলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাইলেন। তাকিয়েই রইলেন।

না। শুধু তো এইটুকুই নয়। আরও তো আছে। ওই তৃষ্ণার্ত মৃত্যুযন্ত্রণার সঙ্গে আরও তো কিছু আছে। যে মরণোন্মুখ তৃষ্ণার্ত তার মুখের জল অন্যকে দিয়ে মরে, তার মুখের ক্ষীণ একটি প্রসন্ন হাস্যরেখা তিনি যেন ওই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন।

গতরাত্রে সদ্য-দেখা নদীর ব্যারাজটার কথা মনে পড়ে গেল। ব্যারাজটার ও-পাশে বিরাট রিজারভয়েরে জল জমে থৈ থৈ করছে। দেখে মনে হয় স্থির। কিন্তু কী প্রচণ্ড নিম্নাভিমুখী গতির বেগেই না সে ওই গাঁথুনিটাকে ঠেলছে। ব্যারাজটার জমাট অণু-অণুতে তার চাপ গিয়ে পৌঁচেছে। সর্বাঙ্গে চাড় ধরেছে।

জীবন বাঙ্ময়। তবু জীবনকে এ-চাড এ-চাপ নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়, চৌচির হয়ে ফাটতে চায়। তবু সে সহ্য করে।

(খ)

আর্দালী ট্রে এনে নামিয়ে দিলে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—কফি বানাও। ছুরি-কাঁটা সরিয়ে রেখে হাত দিয়েই টোস্ট তুলে নিলেন। আজ সকাল থেকেই প্রায় অনাহারে আছেন। ক্ষিদে ছিল না। রাত্রে এসে খেতে সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল। তারপরও ঘণ্টাখানেক জেগে বসেই ছিলেন। এই চিন্তার মধ্যেই মগ্ন ছিলেন। চিন্তা একবার জাগলে তার থেকে মুক্তি নেই। এ দেশের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, চিন্তা অনির্বাণ চিতার মতো। সে দহন করে। উপমাটি চমৎকার। তবু তাঁর খুব ভাল লাগে না। চিতা তিনি বলেন না। প্রাণই বহ্নি, বস্তুজগতের ঘটনাগুলি তার সমিধ, চিন্তা তার শিখা। চিন্তাই তো চৈতন্যকে প্রকাশ করে, চৈতন্য ওই শিখার দীপ্তজ্যোতি। আপনাকে স্বপ্রকাশ করে, আপন

প্রভায় বিশ্বরহস্যকে প্রকাশিত করে। যাঁরা গুহায় বসে তপস্যা করেন, তাঁদের আহার সম্পর্কে উদাসীনতার মর্মটা উপলব্ধি করেন তিনি। রাত্রি জাগরণের ফলে শরীর কি খুব অসুস্থ হয়েছিল তাঁর? না, তা হয়নি। অবশ্য খানিকটা অনুভব করেছিলেন, সমস্ত রাত্রি পাতলা ঘুমের মধ্যেও এই চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঘুরছে বিচিত্র দুর্বোধ্য স্বপ্নের আকারে। সকাল বেলাতেই সে-চিন্তা ধূমায়িত অবস্থা থেকে আবার জ্বলে উঠেছে। তারই মধ্যে এত মগ্ন ছিলেন যে, খেতে ইচ্ছে হয়নি। টোস্ট খেতে ভাল লাগছে। টোস্ট তাঁর প্রিয় খাদ্য। আজ বলে নয়, সেই কলেজজীবন থেকে। প্রথম মুনসেফী জীবনে সকাল-বিকেল বাড়িতে টোস্টের ব্যবস্থা অনেক কষ্ট করেও করতে পারেননি তিনি। সুমতি কিছুতেই পছন্দ করতে পারত না। সে চাইত লুচি-তরকারি; তরকারির মধ্যে আলুর দম। তা-ই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুরমা সুমতির এই রুচিবাতিকের নাম দিয়েছিল টোস্টোফোবিয়া। এই উপলক্ষ করেও সে সুমতিকে অনেক ক্ষেপিযেছে। তাঁদের দু'জনকে চায়ের নেমন্তন্ন করে তাঁকে দিত টোস্ট, ডিম, কেক, চা; সুমতিকে দিত নিমকি, কচুরি, মিষ্টি। সুমতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হত কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারত না। অনেক সংস্কার ছিল সুমতির। জাতিধর্মে তার ছিল প্রচণ্ড বিশ্বাস। এবং সেই সূত্রেই তার ধাবণা ছিল যে, খাদ্যে যার বিধর্মীয় রুচি, মনেপ্রাণেও সে বিধর্মের অনুরাগী। কতদিন সে বলেছে, খেযেই মানুষ বাঁচে, জন্মেই সবচেযে আগে খেতে চায। সেই খাদ্য যদি এ-দেশের পছন্দ না হয়ে অন্য দেশের পছন্দ হয় তবে সে এ-দেশ ছেড়ে সে-দেশে যাবেই যাবে। এ ধর্মের খাদ্য পছন্দ না হযে অন্য ধর্মের খাদ্য যার পছন্দ সে ধর্ম ছাড়বেই। আমি জানি নিজেদের কিছু তোমার পছন্দ নয়। ধর্ম না, খাদ্য না, আমি না। তাই আমি তোমার চোখে বিষ।

সুরমা এতটা অনুমান কবতে পারেনি। তিনিও তাকে বলেননি। সুমতিকে নিযে এই জ্বালাতনের খেলা খেলবার জন্য মাঝে মাঝে স্যান্ডউইচ, কাটলেট, কেক, পুডিং তৈরি করে আর্দালীকে দিয়ে পাঠিযে দিত। লিখত, নিজে হাতে করেছি, জামাইবাবু ভালোবাসেন তাই পাঠালাম। স্যান্ডউইচে চিকেন আছে, কাটলেটের সরু হাড়ের টুকবো ভুল হবে না, কেক-পুডিংয়ে মুরগির ডিম আছে। তোর আবার ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক আছে, ঘরে এক গোযালা ঠাকুরের ছবি আছে, তাই জানালাম।

আর্দালী চলে গেলে সুমতির ক্রোধ ফেটে পড়ত।

ফেলে দিত। শুচিতার দোহাই দিযে স্নান করত।

সুরমা সব খবর সংগ্রহ করত। এবং দেখা হলেই খিলখিল করে হাসত, বলত, কেমন?

তিনি বাধ্য হযে হাসতেন। হাসতে হত। নইলে জীবন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

(গ)

বেচারী সুরমা। এইসব নিয়ে তাঁর মনে একটা গোপন গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে অশরীরিণী সুমতি যখন তাঁদের দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়ায় তখন তাঁর

বিবর্ণ মুখ দেখে তিনি তা বুঝতে পারেন। সুমতির মৃত্যুর জন্য দায়ী কেউ নয়, সুরমার সঙ্গে স্পষ্ট কথা তাঁর হয় না, কিন্তু ইঙ্গিতে হয় ; বরাবর তিনি বলেছেন—কালও বলেছেন—নিজেকে মিথ্যে পীডন কোরো না। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দেখেছি। তবু তার মনের গ্লানি মুছে যায় না, জ্ঞানেন্দ্রনাথ জানেন অন্তরে অন্তরে সুরমা নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন সে এগুলি করেছিল ? কেন তাকে কষ্ট দিয়ে খেলতে গিয়েছিল ? হয়তো সুমতি এবং তাঁর মধ্যে সে এসে এ-কৌতুক খেলা যা খেলতে গেলে সুমতির এই শোচনীয় পরিণাম হত না। আংশিকভাবে কথা সত্য। না। দায়িত্ব প্রথম সুমতির নিজের। সে নিজেই আগুন জ্বালিয়েছিল, সুরমা তাতে ফুঁ দিয়েছিল, ইন্ধন যুগিয়েছিল। ঈর্ষার আগুন। সেই আগুনই বাইরে জ্বলে উঠল। সত্যই, তার মনের আগুন ওই টেনিস ফাইন্যালের দিন তোলা ফটোগ্রাফখানায় ধরে বাইরে বাস্তবে জ্বলে উঠেছিল। টেনিস ফাইন্যাল জেতার পর তোলানো দু'জনের ছবিখানা। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞাতে হেসে ফেলেছিলেন। সুরমার কপিখানা সুরমার ঘরে টাঙানো আছে। ওই টেনিস ফাইন্যালের ক'দিন পর। দোকানী ফটোগ্রাফখানা যথারীতি মাউন্ট করে প্যাকেট বেঁধে তিনখানা তাঁর বাড়িতে আর তিনখানা জজসাহেবের কুঠিতে সুরমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনি নিজে তখন কোর্টে। তিনি এবং সুরমা দু'জনের কেউই জানতেন না যে, ছবিতে তাঁরা পরস্পরের দিকে হাসিমুখে চেয়ে ফেলেছেন। চোখের দৃষ্টিতে গাঢ় অনুরাগের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। জানলে নিশ্চয় সাবধান হতেন। ফটোগ্রাফারকে বাড়িতে ফটো পাঠাতে বারণ করতেন ; হয়তো ও ছবি বাড়িতে ঢোকাতেন না কোনও দিন। জীবনের ভালোবাসার দুর্দম বেগকে তিনি ওই নদীটার ব্যারেজের মতো শক্ত বাঁধে বেঁধেছিলেন। যেদিকে তাঁর প্রকৃতির নির্দেশে গতিপথ, সুরমার দুই-বাহুর দুই তটের মধ্যবর্তিনী পথ, প্রশস্ত এবং নিম্ন সমতল ভূমির প্রসন্নতায় যে-পথ প্রসন্ন সে পথে ছুটতে তাকে দেননি। জীবনের সর্বাঙ্গে চাড ধরেছিল, চৌচির হয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তবু সে-বন্ধনকে এতটুকু শিথিল তিনি করেননি। নাথিং ইম্‌মরাল নাথিং ইল্‌লিগাল ! নীতির বিচারে, দেশাচার আইন সব কিছুর বিচারে তিনি নিরপরাধ, নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু সেকথা সুমতি বিশ্বাস করেনি। করতে সে চায়নি। তিনি বাড়ি ফিরতেই সুমতি ছবি ক'খানা তার প্রায় মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে অগ্ন্যুদ্গারের পূর্বমুহূর্তের আগ্নেয়গিরির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ছবি-ক'খানা সামনে ছড়িয়ে পড়েছিল। একখানা টেবিলের উপর, একখানা মেঝের উপর তার পায়ের কাছে, আর একখানাও মেঝের উপরই পড়েছিল—তবে যেন মুখ থুবড়ে, উলটে।

ছবি ক'খানা দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন।

সুমতি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে উঠেছিল, লজ্জা লাগছে তোমার ? লজ্জা তোমার আছে ? নির্লজ্জ, চরিত্রহীন—

মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করে তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, সুমতি! তার মধ্যে তাকে সাবধান করে দেওয়ার ব্যঞ্জনা ছিল।

সুমতি তা গ্রাহ্য করেনি। সে সমান চিৎকারে বলে উঠেছিল, ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখো, দেখো কোন্ পরিচয় তার মধ্যে লেখা আছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বন্ধুত্বের। আর ম্যাচ জেতার আনন্দের।

—কিসের ?

—বন্ধুত্বের।

—বন্ধুত্বের ? মেয়ের-ছেলের বন্ধুত্ব ? তার কী নাম ?

—বন্ধুত্ব।

—না। ভালোবাসা।

—বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা। সে বুঝবার সামর্থ্য তোমার নেই। তুমি সন্দেহে অন্ধ হয়ে গেছ। ইতরতার শেষ ধাপে তুমি নেমে গেছ।

—তুমি শেষ ধাপের পর যে পাপের পাঁক, সে পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে গেছ। তুমি চরিত্রহীন, তুমি ইতরের চেয়েও ইতর, অনন্ত নরকেও তোমার স্থান হবে না।

বলেই সে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল। কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত তখন তিনি; কিন্তু বিশ্রাম আহার মুহূর্তে বিষ হয়ে উঠেছিল—তিনিও বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। ভয়ও পেয়েছিলেন; সুমতিকে নয়, নিজের ক্রোধকে। উদ্যত ক্রোধ এবং ক্ষোভকে সম্বরণ করবার সুযোগ পেয়ে তিনি যেন বেঁচে গিয়েছিলেন। উন্মত্তের মতো মৃত্যু-কামনা করেছিলেন নিজের। বৈধব্য শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন সুমতিকে। বাইসিক্লে চেপে তিনি শহরের এক দূর-প্রান্তে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে পাথর-হয়ে-যাওয়া মানুষের মতো বসে ছিলেন। প্রথম সে শুধু উন্মত্ত চিন্তা; না, চিন্তা নয় কামনা, মৃত্যুকামনা, সংসার ত্যাগের কামনা, সুমতির হাত থেকে অব্যাহতির কামনা। তারপর ধীরে ধীরে সে চিন্তা স্থির হয়ে এসেছিল—দাউদাউ-করে-জ্বলা গ্রহের জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠার মতো। সেই জ্যোতিতে আলোকিত করে অন্তর তন্ন তন্ন করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজে দেখেছিলেন। বিশ্লেষণ করেছিলেন, বিচার করে দেখেছিলেন। পাননি কিছু। নাথিং ইম্‌মরাল, নাথিং ইল্‌লিগাল। কোনও দুর্নীতি না, কোনও পাপ না। বন্ধুত্ব। গাঢ়তম বন্ধুত্ব। সুরমা তাঁর অন্তরঙ্গতম বন্ধু, সে কথা তিনি স্বীকার করেন। আরও ভালো করে দেখেছিলেন। না, তার থেকেও কিছু বেশি। সুরমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও আছে! আছে! পরমুহূর্তে আরও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন। না! পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নয়। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই,—না পাওয়ার জন্য অন্তরে ফল্গুর মতো বেদনার একটি ধারা বয়ে যাচ্ছে শুধু। এবং সে ধারা বন্যার প্রবাহে দুই কূল ভেঙেচুরে দেবার জন্য উদ্যত নয়; নিঃশব্দে জীবনের গভীরে অশ্রুর উৎস হয়ে শুধু আবর্তিতই হচ্ছে। আজীবন হবে।

চিন্তার দীপ্তিকে প্রসারিত করেছিলেন ন্যায় এবং নীতির বিধান-লেখা অক্ষয় শিলালিপির উপর। অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রায় ধ্যানযোগের মধ্যে সে-লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। কোনও সমাজ, কোনও রাষ্ট্র, কোনও ধর্মের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি; কোনও ব্যাকরণের কোনও বিশেষ পদার্থ গ্রহণ

করেননি; এবং পাঠ শেষ করে নিঃসংশয় হয়ে তবে তিনি সেদিন সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। দেশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। এতটা রাত্রি! জানুয়ারির প্রথম সময়টা, রাত্রি পৌনে দশটা! আপিস থেকে বেরিয়েছিলেন পাঁচটায়। বাড়ি থেকে বোধহয় ছ'টায় বেরিয়ে এসেছেন। পৌনে দশটা। প্রায় চার ঘণ্টা শুধু ভেবেছেন। সিগারেট পর্যন্ত খাননি। তখন তিনি প্রচুর সিগারেট খেতেন। সুমতির তাতেও আপত্তি ছিল।

(ঘ)

শান্ত চিত্তে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন; ক্রোধ অসহিষ্ণুতা সমস্ত কিছুকে কঠিন সংযমে সংযত করেছিলেন। সুমতি উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়েছিল। বাইসিক্ল তুলে রাখবার জন্য আর্দালীকে ডেকে পাননি। চাকরটাও ছিল না। ঠাকুর! ঠাকুরের সাড়া পাননি। ভেবেছিলেন, সকলেই বোধ হয় তাঁর সন্ধানে বেরিয়েছে! মনটা ছি ছি করে উঠেছিল। কাল লোকে বলবে কী! সন্ধান যেখানে করতে যাবে সেখানে সকলেই চকিত হয়ে উঠবে। তবুও কোনও কথা বলেননি। নিঃশব্দে পোশাক ছেড়ে, মুখহাত ধুয়ে, ফিরে এসে শোবার ঘরে একখানা চেয়ারে বসেছিলেন। প্রয়োজন হলে ওই চেয়ারেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে দেবেন। সুমতি ঠিক একভাবেই শুয়েছিল, অনড় হয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন, আমাকে খুঁজতে তো এদের সকলকে পাঠাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

এবার সুমতি উত্তর দিয়েছিলেন, খুঁজতে কেউ যায়নি। কারণ তুমি কোথায় গেছ, সে-কথা অনুমান করতে কারুর তো কষ্ট হয় না। ওদের আজ আমি ছুটি দিয়েছি! বাজারে যাত্রা হচ্ছে, ওরা যাত্রা শুনতে গেছে। তারপরই সে উঠে বসেছিল। বলেছিল—আমি—ইচ্ছে করেই ছুটি দিয়েছি, তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

চোখ দুটো সুমতির লাল হয়ে উঠেছে! দীর্ঘক্ষণ অবিশ্রান্ত কেঁদেছিল। মমতায় তাঁর অন্তরটা টনটন করে উঠেছিল। তিনি অকৃত্রিম গাঢ় স্নেহের আবেগেই বলেছিলেন, তুমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ সুমতি। একটা কথা তুমি কেন বুঝছ না—

—আমি সব বুঝি। তোমার মতো পণ্ডিত আমি নই। সেই অধার্মিক বাপমায়ের আদুরে মেয়ের মতো লেখাপড়ার ঢঙও আমি জানি না, কিন্তু সব আমি বুঝি।

ধীর কণ্ঠেই জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলছিলেন, না। বোঝ না।

—বুঝি না? তুমি সুরমাকে ভালোবাস না?

—বাসি। বন্ধু বন্ধুকে যেমন ভালোবাসে তেমনি ভালোবাসি।

—বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু! মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে! বলো, ঈশ্বরের শপথ করে বলো, ওর সঙ্গ তোমার যত ভালো লাগে, আমার সঙ্গ তোমার তেমনি ভালো লাগে?

—এর উত্তরে একটা কথাই বলি, একটু ধীরভাবে বুঝে দেখ—তোমার আমার সঙ্গ জীবনে জীবনে, অঙ্গে অঙ্গে, শত বন্ধনে জড়িয়ে আছে! তোমার বা আমার

একজনের মৃত্যুতেও সে-বন্ধনের গ্রন্থি খুলবে না। আমি কাছে থাকি দূরে থাকি একান্তভাবে তোমার—

সুমতি চিৎকার করে উঠেছিল—না, মিথ্যে কথা।

—না মিথ্যে নয়। মনকে প্রসন্ন করো সুমতি, ওই প্রসন্নতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ মিত্রতা। ওর অভাবে অন্ন যে অন্ন তাও তিক্ত হয়ে যায়। তুমি যদি সত্যই আমাকে ভালোবাস, তবে কেন তোমার এমন হবে? তোমার সঙ্গেই তো আমার এক ঘরে বাস, এক আশা, এক সঞ্চয়। সুরমা তো অতিথি। সে আসে, দু' দণ্ড থাকে, চলে যায়। তার সঙ্গে মেলামেশা তো অবসরসাপেক্ষ! খেলার মাঠে, আলোচনার আসরে তার সঙ্গে আমার সঙ্গ।

মিনতি করে বলেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, কিন্তু সুমতি তীব্র কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ তাই তো বলছি। আমার সঙ্গে আমার বন্ধনে তুমি কাঁটার শয্যায় শুয়ে থাক, সাপের পাকে জড়িয়ে থাক অহরহ! অল্পক্ষণের জন্যে ওর সঙ্গেই তোমার যত আনন্দ, যত অমৃত-স্পর্শ।

একটি ক্ষীণ করুণ হাস্যরেখা প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রনাথের মুখে ফুটে উঠল। আনন্দ এবং অমৃত-স্পর্শ শব্দ দুটি তাঁর নিজের, সুমতি দুটি গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিল। তিনি তখন ক্ষুধার্ত, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের ক্রিয়া তাঁর চৈতন্যকে জেলখানার বেত্রদণ্ড পাওয়ার আসামীর মতো নিষ্করুণ আঘাত হেনে চলেছে। বেত্রাঘাত-জর্জর কয়েদীরা কয়েক ঘা বেত খাওয়ার পরই ভেঙে পড়ে। তাঁর চৈতন্যও তাই পর্ডেছিল; প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেও তিনি পারেননি। অথবা কাঁচের ফানুস ফাটিয়ে দপ্-করে-জ্বলে-ওঠা লণ্ঠনের শিখার মতো অগ্নিকাণ্ডে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। আর সংযমের কাঁচের আবরণে অন্তরকে ঢেকে নিজেকে আরও স্নিগ্ধ এবং নিরাপদ করে প্রকাশ করতে পারেননি। ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ অন্তর আগুনের লকলকে বিশ্বগ্রাসী শিখার মতো আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি বলেছিলেন,—তুমি যে কথা দুটো বললে, ও উচ্চারণ করতে আমার জিভে বাঁধে। ওর বদলে আমি বলছি—আনন্দ আর অমৃতস্পর্শ। হ্যাঁ, সুরমার সংস্পর্শে তা আমি পাই। সত্যকে অস্বীকার আমি করব না। কিন্তু কেন পাই, তুমি বলতে পার? আর তুমি কেন তা দিতে পার না?

—তুমি ভ্রষ্টচরিত্র বলে পারি না। আর ভ্রষ্টচরিত্র বলেই তুমি ওর কাছে আনন্দ পাও! মাতালরা যেমন মদকে সুধা বলে।

—আমি যদি মাতালই হই সুমতি, মদকেই যদি আমার সুধা বলে মনে হয়, তবে আমাকে ঘৃণা করো, আমাকে মুক্তি দাও।

নিষ্ঠুর শ্লেষের সঙ্গে সুমতি মুহূর্তে জবাব দিয়েছিল সাপের ছোবলের মতো—ভারি মজা হয় তা হলে না?

বিচলিত হয়েছিলেন তিনি সে-দংশনের জ্বালায়, কিন্তু বিষে তিনি ঢলে পড়েননি। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার তিনি ধীর-কণ্ঠে বলেছিলেন—শোনো সুমতি। আমার ধৈর্যের বাঁধ তুমি ভেঙে দিচ্ছ। তার উপর আমি ক্ষুধার্ত ক্লান্ত। তোমাকে আমার

শেষ কথা বলে দি। তোমার সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে সামাজিক বিধানে। সে-বিধান অনুসারে তুমি আমি এ বন্ধন ছিন্ন করতে পারি না। তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—তোমার ভরণপোষণ করব, তোমাকে রক্ষা করব, আমার উপার্জন আমার সম্পদ তোমাকে দোব। আমার গৃহে তুমি হবে গৃহিণী। আমার দেহ তোমার। সংসারে যা বস্তু, যা বাস্তব, যা হাতে তুলে দেওয়া যায়, তা আমি তোমাকেই দিতে প্রতিশ্রুত, আমি তোমাকে তা দিয়েছি, তা আমি চিরকালই দোব। একবিন্দু প্রতারণা করিনি। কোন অনাচার করিনি।

—করনি ?

—না।

—ভালোবাস না তুমি সুরমাকে ? এতবড় মিথ্যা তুমি শপথ করে বলতে পার ?

—তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে কাউকে ভালোবাসা অনাচার নয়।

—নয় ?

—না-না-না। তার আগে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি বলতে পার, ভালোবাসার আকার কেমন! তাকে হাতে ছোঁয়া যায় ? তাকে কি হাতে তুলে দেওয়া যায় ? দিতে পারে ? তোমার অকপট ভালোবাসা আমার হাতে তুলে দিতে পার ?

এবার বিস্মিত হয়েছিল সুমতি। একমুহূর্ত উত্তর দিতে পারেনি। মুহূর্তকয়েক স্তব্ধ থেকে বলেছিল—হেঁয়ালি করে আসল কথাটাকে চাপা দিতে চাও। কিন্তু তা দিতে দেব না।

—হেঁয়ালি নয়। হেঁয়ালি আমি করছি না। সুমতি, ভালোবাসা দেওয়ার নয়, নেওয়ার বস্তু। কেউ কাউকে ভালোবেসে পাগল হওয়ার কথা শোনা যায়, দেখা যায়, সেখানে আসল মহিমা যে ভালোবাসে তার নয়; যাকে ভালোবাসে মহিমা তার। মানুষ আগে ভালোবাসে মহিমাকে, তারপর সেই মানুষকে। কোথাও মহিমা রূপের, কোথাও কোনও গুণের। সুরমার মহিমা আছে, সে হয়তো তুমি দেখতে পাও না, আমি পাই, তাই আমি তাকে প্রকৃতির নিয়মে ভালোবেসেছি।

—লজ্জা করছে না তোমার ? মুখে বাধছে না ? চিৎকার করে উঠেছিল সুমতি।

—না। সবল দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি, কাঁপেনি সে কণ্ঠস্বর। চোখ তার সুমতির চোখ থেকে একেবারে সরে যায়নি। মাটির দিকে নিবদ্ধ হয়নি। সুমতিই যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে বিভ্রান্তি কাটাতে পেরেছিল। বিভ্রান্তি কাটিয়ে হঠাৎ সে চিৎকার করে বলে উঠেছিল—মুখ তোমার খসে যাবে। ও-কথা বোলো না।

—লক্ষবার বলব সুমতি। চিৎকার করে সর্বসমক্ষে বলব ! মুখ আমার খসে যাবে না ! আমি নির্দোষ, আমি নিষ্পাপ।

—নিষ্পাপ ? নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠেছিল সুমতি। তারপর বলেছিল—ধর্ম দেবে তার সাক্ষী।

—ধর্ম ? হেসে উঠেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ—ধর্মকে তুমি জান না, ধর্মের দোহাই

তুমি দিয়ো না। তোমার অবিশ্বাসের ধর্ম শুধু তোমার। আমার ধর্ম মানুষের ধর্ম, জীবনের ধর্ম। সে তুমি বুঝবে না। না বোঝ। শুধু এইটুকু জেনে রাখো—তোমাকে বিবাহের সময় যে যে শপথ আমি গ্রহণ করেছি তার সবগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে আমি পালন করেছি। করছি! যতদিন বাঁচব করবই।

—কর্তব্য। কিন্তু মন?

—সে তো বলেছি, সে কাউকে দিলাম বলে নিজে দেওয়া যায় না। যার নেবার শক্তি আছে, সে নেয়। ওখানে মানুষের বিধান খাটে না। ও প্রকৃতির বিধান। যতটুকু তোমার ও-বস্তু নেবার শক্তি, তার এককণা বেশি পাবে না। তবে হ্যাঁ এইটুকু মানুষ পারে, মনের ঘরের হাহাকারকে লোহার দরজা এঁটে বন্ধ করে রাখতে পারে। তা রেখেও সে হাসতে পারে, কর্তব্য করতে পারে, বাঁচতে পারে। তাই করব আমি। আমাকে তুমি খোঁচা মেরে মেরে ক্ষতবিক্ষত কোরো না।

সুমতি একথার আর উত্তর খুঁজে পায়নি। অকস্মাৎ পাগলের মতো উঠে টেবিলের উপর রাখা ফাইলগুলি ঠেলে সরিযে, কতক নীচে ফেলে তছনছ করে দিযেছিল। তিনি তার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন—কী হচ্ছে?

—কোথায ফটো?

—ফটো কী হবে?

—পোডাব আমি।

—না।

—না নয়। নিশ্চয় পোডাব আমি।

—না।

—দেবে না?

—না। ফটো আমি ঘরে রাখব না, কিন্তু পোডাতে আমি দেব না।

সুমতি মাথা কুটতে শুরু করেছিল—দেবে না? দেবে না?

জ্ঞানেন্দ্রবাবু ড্রয়ার থেকে ফটো ক'খানা বের কবে ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু ফটো ক'খানাই নয়, চুলের-গুচ্ছ-পোরা খামটাও। রাগে আত্মহারা সুমতি সেটা খুলে দেখেনি। গোছা সমেত নিয়ে গিয়ে উনোনে পুরে দিয়েছিল।

তাঁরও আর সহ্যের শক্তি ছিল না। আহারে প্রবৃত্তি ছিল না। শুধু চেয়েছিলেন সবকিছু ভুলে যেতে। তিনি আলমারি খুলে বেব কবেছিলেন ব্র্যান্ডির বোতল। তখন তিনি খেতে ধবেছেন। নিয়মিত, খানিকটা পরিশ্রম লাঘবের জন্য। সে-দিন অনিয়মিত পান করে বিছানায় গড়িয়ে পডেছিলেন।

সুমতির অন্তরের আগুন তখনই বাইরে জ্বলেছে। সে তখন উন্মত্ত। শুধু ওই ক'খানা ফটো উনোনে গুঁজেই সে ক্ষান্ত হয়নি, আরও কয়েকখানা বাঁধানো ছবি ছিল সুরমার, তার একখানা সুরমার কাছে সুমতি নিজেই চেয়ে নিয়েছিল, আর ক'খানা সুরমা আত্মীয়তা করে দিয়েছিল, সে-ক'খানাকেও পেড়ে আছড়ে কাচ ভেঙে ছবিগুলোকে আগুনে গুঁজে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে গুঁজে দিয়েছিল সুরমার

চিঠিগুলো। ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বেলে তবে এসে সে শুয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক পর ওই আগুনই লেগেছিল চালে। সুমতির অন্তরের আগুন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। বনস্পতির শাখায় শাখায় পত্রে পল্লবে ফুলে ফলে যে তেজশক্তি করে সৃষ্টিসমারোহ, সেই তেজই পরস্পরের সংঘর্ষের পথ দিয়ে আগুন হয়ে বের হয়ে প্রথম লাগে শুকনো পাতায়, তারপর জ্বালায় বনস্পতিকে; তার সঙ্গে সারা বনকে ধ্বংস করে। অঙ্গার আর ভস্মে হয় তার শেষ পরিণতি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। পুড়ে ছাই হয়েও সুমতি নিষ্কৃতি দেয়নি।

বাইরে ঢং ঢং শব্দে দুটোর ঘণ্টা বাজল। কফির কাপটা তাঁর হাতেই ছিল। নামিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। নামিয়ে রাখলেন এতক্ষণে।

আর্দালী এসে এজলাসে যাবার দরজার পরদা তুলে ধরে দাঁড়াল। জুরি উকিল আগেই এসে বসেছেন আপন আপন আসনে। আদালতের বাইরে তখন সাক্ষীর ডাক শুরু হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ এসে নিজের আসন গ্রহণ করলেন। হাতে পেনসিলটি তুলে নিলেন। দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন খোলা দরজা দিয়ে সামনের কম্পাউন্ডের মধ্যে। মন ডুবে গেল গভীর থেকে গভীরে। সেখানে সুমতি নেই, সুরমা নেই, বিশ্বসংসারই বোধ করি নেই—আছে শুধু একটা প্রশ্ন, ওই আসামী যে প্রশ্ন করেছে। সাধারণ দায়রা বিচারে এ-প্রশ্ন এমনভাবে এসে দাঁড়ায় না। সেখানে প্রশ্ন থাকে আসামী সম্পর্কে। আসামীর দিকে তাকালেন তিনি। চমকে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। আসামীর পিছনে কী ওটা ? কে ?—না। কেউ নয়, ওটা ছায়া, স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে ঈষৎ তির্যকভাবে আকাশের আলো এসে পড়েছে আসামীর উপর। একটা ছায়া পড়েছে ওর পিছনের দিকে। ঠিক যেন কে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম সাক্ষী এসে দাঁড়াল কাঠগড়ার মধ্যে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী। হলফ নিয়ে সে বলে গেল—খগেনের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম পাওয়ার কথা, থানার পাতায় লিপিবদ্ধ করার কথা। আসামী নগেনই সংবাদ এনেছিল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু আবার তাকালেন আসামীর দিকে। আসামীর পিছনের ছায়াটা দীর্ঘতর হয়ে পূর্বদিকের দেওয়ালের গায়ে গিয়ে পড়েছে। বর্ষাদিনের অপরাহ্ণের আলো এবার পশ্চিম দিকের জানালাটা দিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। দারোগার সাক্ষী শেষ হলো।

ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে চারটে বাজল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—কাল জেরা হবে। উঠলেন তিনি। আঃ! তবু যেন আচ্ছন্নতা কাটছে না!

ছয়

(ক)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্নের মতো অবস্থায়। দু'দিন পর মামলার শেষ দিন। সব শেষ করে বাড়ি ফিরলেন। পৃথিবীর সবকিছু তাঁর দৃষ্টি-মন চৈতন্যের

গোচর থেকে সরে গেছে। কোনও কিছু নেই। চোখের সম্মুখে ভাসছে আসামীর মূর্তি। কানের মধ্যে বাজছে দুই পক্ষের উকিলের যুক্তি। মনের মধ্যে রয়েছে সমস্ত ঘটনাগুলির বিবরণ থেকে রচনা করা পট। আর চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে আসামীর কথাগুলি।

থানা থেকে শুরু করে দায়রা আদালতে এই বিচার পর্যন্ত সর্বত্র সে একই কথা বলে আসছে। "হুজুর, আমি জানি না আমি দোষী কি নির্দোষ। ভগবান জানেন, আর হুজুর বিচার করে বলবেন।" এবং এই কথাগুলি যেন শুধু কথা নয়। তারও যেন বেশি কিছু। জবাবের মধ্যে অতি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত করেছে সে। কণ্ঠস্বরের সকরুণ অসহায় অভিব্যক্তি, চোখের দৃষ্টির সেই অসহায় বিহ্বলতা, তার হাত জোড় করে নিবেদনের সেই অকপট ভঙ্গি, সব মিলিয়ে সে একটা আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁর চৈতন্যের উপর। 'অপরাধ করিনি' জবাব দিয়েই শেষ করেনি, প্রশ্ন করেছে—বিচারক তুমি বলো সেকথা! ঈশ্বরকে যেমনভাবে যুগে যুগে মানুষ প্রশ্ন করেছে ঠিক তেমনিভাবে।

এ-প্রশ্ন তাঁর সমস্ত চৈতন্যকে যেন সচকিত করে দিচ্ছে; ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের উপর তীব্র আলোর ছটা উত্তাপের এবং স্পর্শে জেগে উঠে মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। ওই লোকটির সেই চরম সঙ্কট মুহূর্তের অবস্থার কথা কল্পনা করতে হবে। স্থলচারী মুক্তবায়ুস্তরবাসী জীব নিশ্ছিদ্র শ্বাসরোধী জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে কোন্ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, অনুমান করতে হবে। মৃত্যুর সম্মুখে সীমাহীন ঘন কালো একটা আবেষ্টনী মুহূর্তে মুহূর্তে তাকে ঘিরে ধরছিল। নিদারুণ ভয়, নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণার মধ্যে আজকের মানুষকে, হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের সভ্য মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যযুগের আদিমতম মানুষের জান্তব চেতনার যুগে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, স্নেহ নেই, মমতা নেই, কর্তব্য নেই, আছে শুধু আদিমতম প্রেরণা নিয়ে প্রাণ, জীবন।

কল্পনা করতে তিনি পেরেছিলেন, কল্পনা নয় ঠিক এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন।

(খ)

অকস্মাৎ মর্মান্তিক শ্বাসরোধী সে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। কে যেন হৃৎপিণ্ডটা কঠিন কঠোর হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিল। তার সঙ্গে মস্তিষ্কে একটা জ্বালা। কাশতে কাশতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। যন্ত্রণার আতঙ্ক বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলেও কিছু বুঝতে পারেননি। এক ঘন সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ কিছুতে তাঁকে যেন ছেয়ে ফেলেছে। আর একটা গন্ধ! আর চোখে পড়েছিল এই পুঞ্জ পুঞ্জ আবরণকে প্রদীপ্ত-করা একটা ছটা।

ধোঁয়া। মুহূর্তে উপলব্ধি হয়েছিল আগুন। ঘরে আগুন লেগেছে।

মাথার উপর গোটা ঘরের চালটা আগুন ধরে জ্বলছে। জানুয়ারিশেষে শীতে ঘরের

দরজা-জানালা সব বন্ধ। ধোঁয়ায় ঘরখানা বিষবাষ্পাচ্ছন্ন আদিম পৃথিবীর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঘরের আলো নিভে গেছে। আগুনের ছটায় রাঙা ধোঁয়া শুধু। তার সঙ্গে সে কী উত্তাপ! তাঁর নিজের মাথার মধ্যে তখন মদের নেশার ঘোর এক যন্ত্রণা। মৃত্যু যেন অগ্নিমুখী হয়ে গিলতে আসছে তাকে এবং সুমতিকে। সুমতি শুয়েছিল মেঝের উপর। সে তখন জেগেছে, কিন্তু ভয়ার্তবিহ্বল চোখের কোটর থেকে চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। বিহ্বলের মতো শুধু একটা চিৎকার।

তিনি তার মধ্যেও নিজেকে সংযত করে সাহস এনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে সব ঢেকে আসছিল, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তারই মধ্যে তিনি গিয়ে সুমতির হাত ধরে বলেছিলেন,—এসো, শীগগির এসো।

সুমতি আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর হাত।

কোথায় দরজা? কোন্ দিকে?

সুমতি সেদিন দরজায় খিল, উপরে নীচে দুটো ছিটকিনি লাগিয়ে তবে শুয়েছিল। এতগুলি খুলতে খুলতে তার শব্দে নিশ্চয় তার ঘুম ভাঙবে। তিনি জানেন, তার ভয় ছিল, যদি রাত্রে সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে যান।

তবুও ধৈর্য হারাননি। প্রাণপণে নিজের শিক্ষা ও সংযমে স্থির রেখেছিলেন নিজেকে। একে একে ছিটকিনি খিল খুলে বেরিয়েছিলেন বারান্দায়। সেখানে নিঃশ্বাস সহজ হয়েছিল, কিন্তু গোটা বারান্দার চালটা তখন পুড়ে খসে পড়ছে। একটা দিক পড়েছে, মাঝখানটা পড়েছে। মাথার উপরে নেমে আসছে জ্বলন্ত আগুনের একটা স্তর। ঠিক এই মুহূর্তেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, এবং ভারী একটা বোঝার মতো মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তার আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়লেন। তাদের উপরে খসে পড়ল চালকাঠামোর সঙ্গে বাঁধা একটি স্তরবন্দী রাশি রাশি জ্বলন্ত খড়। সে কী যন্ত্রণা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে গেল এক মহা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে! তবু তিনি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাধা পড়ল! হাতটা কোথায় আটকেছে! ওঃ, সুমতি ধরে আছে। মুহূর্তে তিনি হাত ছাড়িয়ে উঠে কোনরকমে দাওয়ার উপর থেকে নীচে লাফিয়ে নেমে এসে খোলা উঠানে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এ-অবস্থা কল্পনা ঠিক করা যায় না। তিনি পেরেছেন, ভুক্তভোগী বলেই তিনি বুঝতে পেরেছেন।

"ঈশ্বর জানেন। আর হুজুর বিচার করে বলবেন।" আসামীর কথা ক'টি তাঁর চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে এখনও ধ্বনিত হচ্ছে।

ডিফেন্সের উকিলও আত্মরক্ষার অধিকারের মৌলিক প্রশ্নটিকেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। জীবনের জন্মগত প্রথম অধিকার, নিজের বাঁচবার অধিকার তার সর্বাগ্রে! এই স্বত্বের অধিকারী হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। দণ্ডবিধির সেকশন এইট্টিওয়ানের নজির তুলেছেন। একটি ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি। হতভাগ্য আসামী। সেকশন এইট্টিওয়ান ওকে জলমগ্ন অবস্থাতেও গলা টিপে ধরবার

অধিকার দেয়নি। আসামীর উকিল অবশ্য সুকৌশলে এ প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরেছেন জুরীদের সামনে।

"A and B, swimming in the sea after a ship wreck, get hold of a plank not large enough to support both; A pushes B, who is drowned. This is the opinion of Sir James Stephen, is not a crime..."

কিন্তু এরপরও একটু যে আছে। স্যার জেমস স্টীফেন আরও বলেছেন,...."as thereby A does B on direct bodily harm but leaves him to his chance of another plank."

এ-সেকশন যে তাঁর মনের মধ্যে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদাই করা আছে।

এই বিধানটি নিয়ে যে তিনি বার বার যাচাই করে নিয়ে নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন।

সুমতির হাতখানাই শুধু তিনি ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন, কোনও আঘাত তিনি করেননি। আঘাত করে তার হাত ছাড়ালে অপরাধ হত তাঁর, অবশ্য সুমতির দেহে একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল; সেটা কারুর দেওয়া নয়, সেটা সুমতিকে তার নিয়তির পরিহাস, সেটা তার স্বকর্মের ফল, সুমতির পায়ের তলায় একটা দীর্ঘ কাঁচের ফলা আমূল ঢুকে বিঁধে ছিল। বাঁধানো যে ফটো ক'খানা আছড়ে সে নিজেই ভেঙেছিল সেই ফটোভাঙা কাঁচের একটা লম্বা সরু টুকরো। সেইটে বিঁধে যাওয়াতেই অমনভাবে সে হঠাৎ সেই চরম সংকটের মুহূর্তটিতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।

বিধিলিপি! বিধিলিপির মতোই বিচিত্ররূপ এক অনিবার্য পরিণাম সুমতি নিজের হাতে তৈরি করেছিল। নিষ্কৃতির একটি পথও খোলা রাখেনি। নিজের হাতে নিরন্ধ্র করে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। জীবনপ্রকৃতি আর জড়প্রকৃতি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্ষুব্ধ হলে আর রক্ষা থাকে না। সেদিন তাঁদের জীবনে এমনি একটা পরিণাম অনিবার্যই ছিল। সুমতির হাতের জ্বালানো আগুন ওইভাবে ঘরে না লাগলে অন্যভাবে এমনি পরিণাম আসত। তিনি নিজে আত্মহত্যা করতেন। সুমতির ঘুম গাঢ় হলেই তিনি আত্মঘাতী হবেন স্থির করেই শুয়েছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মদের ঘোরে তাঁর চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্কল্পও অসাড় হয়ে পড়েছিল। তিনি আত্মহত্যা করলে সুমতিও আত্মঘাতিনী হত তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো সে তাঁব জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিল।

(গ)

কুঠির কম্পাউন্ডে গাড়ি থামতেই তাঁর মন বাস্তবে ফিরে এল। জজসাহেবের কুঠি। বর্ষার ম্লান অপরাহ্ণ। আকাশে মেঘের আস্তরণ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়িটা নিস্তব্ধ। কই সুরমা কই? বাইরে কোথাও নেই সে!

নেই ভালোই হয়েছে।

কিন্তু বাইরের এই প্রকৃতির রূপ তার উপর যেন একটা ছায়া ফেলেছে। ম্লান বিষণ্ণ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সুরমা সেই বাবুর্চিখানায় আগুন-লাগার দিন থেকে।

গাড়ি থেকে নেমে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন।

একটা ছায়া। তাঁর নিজেরই ছায়া। পাশের সবুজ লনের উপর নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। আসামী নগেনের চেয়ে অনেক দীর্ঘ তাঁর ছায়া। নগেনের চেয়ে অনেকটা লম্বা তিনি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন বাংলোর দিকে। সরাসরি আপিস-ঘরের দিকে।

বেয়ারা এসে দাঁড়াল—জুতো খুলবে—

—না। হাত ইশারা করে বললেন—যাও। যাও।

ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি। আপিস-ঘর পার হয়ে এসে ঢুকলেন মাঝখানকার বড় ঘরখানায়। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। ঘরখানা প্রায় প্রদোষান্ধকারের মতো ছায়াচ্ছন্ন; তাঁর ছায়াটা পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে সামনের দেওয়ালে টাঙানো পরদাঢাকা ছবিটার উপর থেকে পরদাটা টেনে খুলে দিলেন।

সুমতির অয়েলপেন্টিং আবছায়ার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু সাদা বড় চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে।

ছবিখানার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

সে কি অভিযোগ করছে?

তিনি কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন?

—তুমি এ ঘরে? বাইরে থেকে বলতে বলতেই ঘরে ঢুকে সুরমা স্বামীকে সুমতির ছবির দিকে চেয়ে থাকতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

—ওদিকের জানালাটা খুলে দাও তো!

—খুলে দেব?

—হ্যাঁ।

সে কথা লঙ্ঘন করতে পারলেন না সুরমা। জানালাটা খুলে দিতেই আলোর ঝলক গিয়ে পড়ল ছবিখানার উপর।

সুরমা শিউরে উঠলেন। পরমুহূর্তেই অগ্রসর হলেন—ছবির উপর পরদাখানা টেনে দেবেন তিনি।

—না, ঢেকো না।

—কেন? হঠাৎ তোমার হলো কী?

সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—সেইদিন থেকে ওকে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে এসে যেন সামনে দাঁড়াচ্ছে। আজ বহুবার দাঁড়িয়েছে। তাই ওর সামনে এসে আমিই দাঁড়িয়েছি। থাক—ওটা খোলা থাক।

—বেশ থাক। কিন্তু পোশাক ছাড়বে চলো। চা খাবে।

—চা এখানে পাঠিয়ে দাও। পোশাক এখন ছাড়ব না।

এ-কণ্ঠস্বর অলঙ্ঘনীয়। নিজের ঘুমকে মনে মনে অভিসম্পাত দিলেন সুরমা।

তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নইলে হয়তো গাড়ির মুখ থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ফেরাতে পারতেন। এ ঘরে ঢুকতে দিতেন না।

কয়েকদিন থেকেই স্বামীর জন্য তাঁর আর দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

দিন দিন তিনি যেন দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছেন;—এক নির্জন গহনের মৌন একাকিত্বে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন। বর্ষার এই দিগন্তজোড়া বর্ষণোন্মুখ মেঘমণ্ডলের মতোই গম্ভীর ম্লান এবং ভারী হয়ে উঠলেন। জীবনের জ্যোতি যেন কোনও বিরাট গম্ভীর প্রশ্নের অনিবার্য আবির্ভাবে ঢাকা পড়ে গেছে। অবশ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনে এ নূতন নয়। ঋতুপর্যায়ের মতো এ তাঁর জীবনে এসেছে বার বার, বার বার কত পরিবর্তন হলো মানুষটির জীবনে। উঃ!

কিন্তু এমন আচ্ছন্নতা, এমন মৌন মগ্নতা কখনও দেখেননি! সবচেযে তাঁর ভয় হচ্ছে সুমতির ছবিকে। সে কোন্ প্রশ্ন নিয়ে এল? কী প্রশ্ন? সে প্রশ্ন যাই হোক তার সঙ্গে তিনি যে জড়িয়ে আছেন তাতে তো সন্দেহ নেই। তাঁর অন্তর যে তার আভাস পাচ্ছে। আকুল হয়ে উঠেছে। তাঁর মা তাঁকে বারণ করেছিলেন। কানে বাজছে। মনে পডেছে। নিজেও তিনি দূরে চলে যেতে চেয়েছিলেন। টেনিস-ফাইন্যালে জেতার পর তোলানো ফটোগ্রাফ ক'খানা পেয়েই সংকল্প করেছিলেন সুরমা—জ্ঞানেন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে যাবেন। অনেক দূরে। পরদিন সকালেই কলকাতা চলে যাবেন, সেখান থেকে বাবাকে লিখবেন অন্যত্র ট্রানস্‌ফারের জন্য; অথবা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ট্রানস্‌ফার করাতে। বাবাকে জানাতে তাঁর সংকোচ ছিল না। কিন্তু বিচিত্র ঘটনাচক্র।

পরদিন ভোর বেলাতেই শুনেছিলেন মুন্সেফবাবুব বাসা পুডে ছারখার হয়ে গেছে। মুন্সেফবাবুর স্ত্রী পুডে মারা গেছেন, মুন্সেফবাবু হাতপাতালে, অজ্ঞান, বুকটা পিঠটা অনেকটা পুড়ে গেছে, বাঁচবেন কিনা সন্দেহ!

সব বাঁধ তাঁর ভেঙে গিয়েছিল।

যে-প্রেমকে কখনও জীবনে প্রকাশ করবেন না সংকল্প করেছিলেন সে-প্রেম সেই সংকটময় মুহূর্তে তারস্বরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথের শিয়রে গিয়ে বসেছিলেন। উঠবেন না, তিনি উঠবেন না। মাকে বলেছিলেন—আমাকে উঠতে বোলো না, আমি যাব না, যেতে পারব না।

কাতর দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন বাবার দিকে।

বাবা বলেছিলেন—বেশ, থাকো তুমি!

মা বলেছিলেন—এ তুই কী করছিস ভেবে দেখ। যে-লোক স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে এমনভাবে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তার মনে অন্যের ঠাঁই কোথায়?

লোকে যে দেখেছিল, চকিতের মতো দেখেছিল সুমতির হাত ধরে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বেরিয়ে আসতে। চাল চাপা পড়ার মুহূর্তে সুমতির নাম ধরে তাঁর আর্ত চীৎকার শুনেছিল—সুমতি! বলে, সে নাকি এক প্রাণফাটানো আর্তনাদ!

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাল হয়ে উঠবার পর একদা এক নিভৃত অবসরে সুরমা বলেছিলেন—তোমার জীবন আমি সর্বস্বান্ত করে দিয়েছি। আমার জন্যই তোমার এ সর্বনাশ হয়ে গেল। আমাকে তুমি নাও! সুমতির অভাব—

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আশ্চর্য। সুরমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলেন—অভাববোধের সব জায়গাটাই যে অগ্নিজিহ্বা লেহন করে তার রূপ রস স্বাদ গন্ধ সব নিঃশেষে নিয়ে গেছে সুমতি।

আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন নিজের পুড়ে যাওয়া বুক এবং পিঠটাকে।

—আমার চা-টা—শুধু চা এখানে পাঠিয়ে দাও! প্লীজ—

জ্ঞানেন্দ্রনাথের মৃদু গম্ভীর কণ্ঠস্বর; চমকে উঠলেন সুরমা। ফিরে এলেন নিষ্ঠুরতম বাস্তব অবস্থায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন সুমতির অয়েলপেন্টিংয়ের সামনে।

—না। আর্ত মিনতিতে সুরমা তাঁর হাত ধরতে গেলেন।

—প্লীজ!

সুরমার উদ্যত হাতখানি আপনি দুর্বল হয়ে নেমে এল। আদেশ নয়, আকুতিভরা কণ্ঠস্বর। বিদ্রোহ করার পথ নেই। লঙ্ঘন করাও যায় না।

নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেলেন সুরমা।

সাত

(ক)

স্থির দৃষ্টিতে ছবিখানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ক্ষীণতম ভাষার স্পন্দন তাতে থাকলে তাকে শুনবার চেষ্টা করছিলেন, ইঙ্গিত থাকলে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। সুমতির মিষ্ট কোমল প্রতিমূর্তির মধ্যে কোথায় ফুটে রয়েছে অসন্তোষ অভিযোগের ছায়া?

—তুমি আজ কোর্টের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে তাকালেন।

চা নিয়ে সুরমা এসে দাঁড়িয়েছেন। নিজেই নিয়ে এসেছেন—বেয়ারাকে আনেননি সঙ্গে।

—অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে? মাথা ঘুরে গিয়েছিল?

—কে বললে?

—আর্দালী বললে। পাবলিক প্রসিকিউটারের সওয়ালের সময় তোমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল; তুমি উঠে খাস কামরায় গিয়ে মাথা ধুয়েছ—?

—হ্যাঁ। একটু হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। বিচিত্র সে হাসি। বিষণ্ণতার মধ্যে যে এমন প্রসন্নতা থাকতে পারে, এ সুরমা কখনও দেখেননি।

অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পাবলিক প্রসিকিউটার আসামীর উকিলের সওয়ালের পর তার জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি গভীর আত্মমগ্নতার মধ্যে ডুবে ছিলেন। নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মতো বসে ছিলেন তিনি, চোখের তারা দুটি পর্যন্ত স্থির; কাঁচের চোখের মতো মনে হচ্ছিল। ইলেকট্রিক ফ্যানের বাতাসে শুধু তাঁর গাউনের প্রান্তগুলি কাঁপছিল, দুলছিল। তিনি মনে মনে অনুভব করছিলেন ওই শ্বাসরোধী অবস্থার স্বরূপ। আঙ্কিক নিয়মে অন্ধ

বস্তুশক্তির নিপীড়ন। অঙ্কের নিয়মে একদিকে তার শক্তি ঘনীভূত হয়, অন্যদিকে জীবনের সংগ্রামশক্তি সহ্যশক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। তার শেষ মুহূর্তের অব্যবহিত পূর্বে—সে চরম মুহূর্ত—শেষ চেষ্টা তখন তার, পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া আর ধোঁয়া, নির্মল প্রাণদায়িনী বায়ুর অভাবে হৃৎপিণ্ড ফেটে যায়। সকল স্মৃতি, ধারণা, বিচারবুদ্ধি অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে আসে। অকস্মাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে যেমন আলোর শিখা বেড়ে উঠে লণ্ঠনের ফানুসে কালির প্রলেপ লেপে দেয়, তার জ্যোতির চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে নিজেও নিভে যায়—ঠিক তেমনি। ঠিক সেই মুহূর্তে জ্বলন্ত খড়ের রাশি, একসঙ্গে শত বন্ধনে বাঁধা একটা নিরেট অগ্নিপ্রাচীরের মতো। আসামী ঠিক বলেছে, সে-সময়ে মনের কথা স্মরণ করা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম। হতভাগ্য আসামী জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল, নিষ্ঠুর বন্ধনে বেঁধেছিল তাব ভাই। ঘন জলের মধ্যে গভীরে নেমে যাচ্ছিল, শ্বাসবায়ু রুদ্ধ হযে ফেটে যাচ্ছিল বুক, সে সেই যন্ত্রণার মধ্যে চলছিল। পিছনের দিকে—আদিমতম জীবনচেতনার দিকে—। অকস্মাৎ তাঁর কানে এল অবিনাশবাবুর কথা।

(খ)

পাবলিক প্রসিকিউটার বলছিলেন সেকশন এইট্টিওয়ানের অনুল্লিখিত অংশটিব কথা। আসামী খগেনের গলা টিপে ধরে তাকে আঘাত কবেছে, শ্বাস রোধ করে মৃত্যুর কারণ ঘটিযেছে, খগেনকে মেরে নিজেই বেঁচেছে, খগেনকে বাঁচবার অবকাশ দেয়নি।

"ইযোর অনার, তাছাড়া আর একটি কথা আছে। আমার পণ্ডিত বন্ধু সেকশন এইট্টিওয়ানের একটি নাজিরের অর্ধাংশের উল্লেখ কবেছেন মাত্র। সে-অর্ধাংশের কথা আমি বলেছি। এই সেকশন এইট্টিওয়ানেই আর-একটি নজিবেব উল্লেখ আমি কবব। ভগ্নপোত তিনজন নাবিক, অকূল সমুদ্রে ভেলায ভাসছিল। দু'জন প্রৌঢ়, একজন কিশোর। অকূল দিগন্তহীন সমুদ্র, তার উপর ক্ষুধা। ক্ষুধা সেই নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুরতম রূপ নিয়ে দেখা দিল, যে রূপকে আমরা সেই আদিম উন্মাদিনী শক্তি মনে করি। 'যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।' যার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবন মাথা নত করে। সেই অবস্থায় তারা লটারি করে এই কিশোরটি হত্যা করে তার মাংস খেযে বাচে। তারা উদ্ধার পায়। পরে বিচার হয়।

সে-বিচারে আসামীদের উকিল জীবনের এই আদিম কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, বিচারককে মনে রাখতে হবে, তারা তখন মানুষের সভ্যতার আইনের চেয়েও প্রবলতর আইনের দ্বারা পরিচালিত!"

"কিন্তু সেখানে বিচারক বলছেন, আত্মরক্ষা যেমন সহজ প্রবৃত্তি, সাধারণ ধর্ম—তেমনি আত্মত্যাগে, পরার্থে আত্মবিসর্জনও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মহত্তর ধর্ম। ইয়োর অনার, যে-প্রকৃতির বস্তু-জগতে অন্ধ নিয়মে পরিচালিত, জন্তু-জীবনে বর্বর, হিংস্র, কুটিল, আত্মপরতন্ত্রতায় যার প্রকাশ, মানুষের জীবনে তারই প্রকাশ দয়াধর্মে, প্রেমধর্মে, আত্মবলিদানের মহৎ এবং বিচিত্র প্রেরণায়। জন্তুর মা সন্তানকে

ভক্ষণ করে। মানুষের মা আক্রমণোদ্যত সাপের মুখ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে সে-দংশন নিজে বুক পেতে নেয়। কোথায় থাকে তার আত্মরক্ষার ওই জান্তব দীনতা হীনতা? মা যদি সন্তানকে হত্যা করে নিজের প্রাণের জন্য, পিতা যদি পুত্র হত্যা করে নিজের প্রাণের জন্য, বড় ভাই যদি অসহায় দুর্বল ছোট ভাইকে হত্যা করে নিজের প্রাণরক্ষা করে মহত্তর মানবধর্ম বিসর্জন দেয়, সবল যদি দুর্বলকে রক্ষা না করে, তবে এই মানুষের সমাজে আর পশুর সমাজে প্রভেদ কোথায়? মানুষের সমাজ আদি যুগ থেকে এই ঘটনার দিন পর্যন্ত অনেক অনেক কাল ধরে অনেক অনেক দীর্ঘ পথ চলে এসেছে অন্ধতমসাচ্ছন্নতা থেকে আলোকিত জীবনের পথে; এই ধর্ম এই প্রবৃত্তি আজ আর সাধনাসাপেক্ষ নয়, এই ধর্ম এই প্রবৃত্তি আজ রক্তের ধারার সঙ্গে মিশে রয়েছে; তার প্রকৃতির স্বভাবধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আমাদের পুরাণে আছে, মহর্ষি মাণ্ডব্য বাল্যকালে একটি ফড়িংকে কাঁটা ফুটিয়ে খেলা করেছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁকে বিনা অপরাধে রাজকর্মচারীদের ভ্রমে শূলবিদ্ধ হতে হয়েছিল। তিনি ধর্মকে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্ অপরাধে এই দণ্ড তাঁকে নিতে হলো? তখন ধর্ম এই বাল্যবয়সের ঘটনার কথাটি উল্লেখ করে বলেছিলেন আঘাতের প্রতিঘাতের ধারাতেই চলে ধর্মের বিচার, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মতো অমোঘ অনিবার্য। এ থেকে কারও পরিত্রাণ নেই। ইয়োর অনার, এই মানুষের ধর্ম সম্পর্কে কল্পনা এদেশে—"

ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সমস্ত কোর্টরুমটা যেন পাক খেতে শুরু করেছিল। তার মধ্যে মনে পড়েছিল—দীর্ঘদিন আগেকার কথা। তিনি হাসপাতালে পড়ে আছেন বুকে পিঠে ব্যান্ডেজ বাঁধা; নিদারুণ যন্ত্রণা দেহে মনে। সুরমার বাবা তাঁকে বলেছিলেন—কী করবে তুমি? কী কবতে পারতে? হয়তো সুমতির সঙ্গে একসঙ্গে পুড়ে মরতে পারতে? কী হত তাতে?

আজ আসামীকে লক্ষ্য করে অবিনাশবাবু যখন এই কথাগুলি বলে গেলেন, তখন তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে তীক্ষ্ণ সূচীমুখ হিমানী-স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় যেন একটা অদ্ভুত কম্পন বয়ে গেল সর্বাঙ্গে। আজ আকাশে মেঘ নেই; রোদ উঠেছে। স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে সেই আলোর প্রতিফলনে আসামীর পায়ের কাছে একটা ঘন কালো ছায়া পুঞ্জীভূত হয়ে যেন বসে রয়েছে। তিনি টেবিলের উপর মাথা রেখে যেন নুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে এক মিনিটের জন্য, বোধ করি তারও চেয়ে কম সময়ের জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাথা তুলে বলেছিলেন—মিঃ মিত্রা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। ফাইভ মিনিট্স্ প্লীজ।

তিনি খাস কামরায় চলে গিয়ে বাথরুমের কলের নীচে মাথা পেতে দিয়ে কল খুলে দিয়েছিলেন। চার মিনিট পরেই আবার এসে আসন গ্রহণ করে বলেছিলেন,—ইয়েস, গো অন প্লীজ!

"ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের কল্পনার কাহিনীগুলি যতই অবাস্তব হোক তার অন্তর্নিহিত উপলব্ধি, তার ভিত্তিগত সত্য অভ্রান্ত, অমোঘ। রাষ্ট্র সমাজ সেই নিয়ম ও নীতিকেই জয়যুক্ত করে। বর্তমান ক্ষেত্রে—।"

অবিনাশবাবু আশ্চর্য ধীমত্তার সঙ্গে তাঁর সওয়াল করেছেন। সমস্ত আদালত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সওয়াল শেষের পরও মিনিটখানেক কোর্টরুমে সূচীপতনশব্দ যাবার মতো স্তব্ধতা থমথম করছিল।

আসামী চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সেই স্তব্ধতার মধ্যেও সকলের মনে ধ্বনিত হচ্ছিল,—বর্তমান ক্ষেত্রে আসামী যদি একটি নারীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে স্নেহ-মমতা, তার সুদীর্ঘ দিনের সন্ন্যাসধর্ম বিসর্জন দিতে উদ্যত না হত, তবে আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, আত্মরক্ষার আকুলতায় ওই ছোট ভাইয়ের গলা টিপে ধরেও সে ছেড়ে দিত, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করত। সেক্ষেত্রে যদি এমন কাণ্ডও ঘটত তবে আমি বলতাম যে—জলের মধ্যে সে যখন ছোট ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছিল, তখন শুধু মাত্র জান্তব আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই সে এ-কাজ করেছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসামী এবং হত ব্যক্তি ভাই হয়েও প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, যে দ্বন্দ্বের তীব্রতায় বিষয়ভাগে উদ্যত হয়েছিল। এ-ক্ষেত্রে আক্রোশ অহরহই বর্তমান ছিল তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর এবং যথাসময়ে সুযোগের মধ্যে সে-আক্রোশ যথারীতি কাজ করে গেছে। বাল্যজীবনে চতুষ্পদ হত্যা করার চাতুর্য তার সবলতর কয়েক মুহূর্তে কার্য সমাধা করেছে—ইয়োর অনার—

অবিনাশবাবুর কথাগুলি এখনও ধ্বনিত হচ্ছে—আইনই শেষ কথা নয়। পৃথিবীতে প্রকৃতির নিয়ম যেমন অমোঘ, মানুষের চৈতন্যের মহৎ প্রেরণাও তেমনই অমোঘ। তার চেয়েও সে বলবতী, তেজশক্তিতে প্রদীপ্ত, জান্তব প্রকৃতির তমসাকে নাশ করতেই তার সৃষ্টি! ভাই ভাইকে, বড় ভাই ছোট ভাইকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করেনি, নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তাকে হত্যা করেছে। এ-হত্যা কলঙ্কজনকে ; নিষ্ঠুরতম পাপ মানুষের সমাজে।

(গ)

জুরিরা একবাক্যে আসামীকে দোষী ঘোষণা করেছে।

আসামীও বোধ হয় অবিনাশবাবুর বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, নতুবা বিচিত্র তার মন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কাঠগড়ায় রেলিংয়ের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।

তার দিকে তাকাবার তখন তাঁর অবকাশ ছিল না। তিনি তখন সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে রায় ঘোষণা করেছিলেন—জুরিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আসামীর অপরাধ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে—

আবার তিনি মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়েছিলেন। হঠাৎ চোখ পড়েছিল সামনের দেওয়ালে—আসামীর সেই ছায়াটা আধখানা মেঝে আধখানা দেওয়ালে এঁকেবেঁকে মসীময় একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মুহূর্তেই আত্মসংবরণ করেছেন তিনি।

রায় দিয়েছেন, যাবজ্জীবন নির্বাসন। ট্রান্‌স্‌পোর্টেশন ফর লাইফ। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ

ধারা অনুযায়ী এই অস্বাভাবিক আসামীর প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে ঘটনা সংঘটনের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির করুণা পাবার বিবেচনার জন্য সুপারিশ করেছেন।

কোর্ট থেকে এসে সরাসরি ঘরে ঢুকে আপিসে বসেছিলেন। দেওয়ালে-পড়া সেই প্রশ্নচিহ্নটা কাল ছিল আবছা আবছা, আজ স্পষ্ট ঘন কালো কালিতে লেখা প্রশ্নের মতো দাঁড়িয়েছে।

সুমতির কাছে তাঁর অপরাধ আছে? আছে? আছে? না থাকলে ছবিখানা ঢাকা থাকে কেন? কেন? কেন?

আজ দীর্ঘকাল পর অকস্মাৎ তিনি পলাতক আত্মগোপনকারী দুর্বিসহ অবস্থা অনুভব করেছেন।

তাই বাড়ি ফিরে সরাসরি এসে সুমতির ছবির কাছে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। বলো তোমার অভিযোগ! কোথায় আমার ভয়? বলো! বলো! বলো!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তারই মধ্যে মিলিয়ে গেল তাঁর মুখের সেই বিচিত্র, একাধারে বিষণ্ণ এবং প্রসন্ন হাসিটুকু। সুরমা তাঁর বুকের উপর হাতখানি রেখে গাঢ় স্বরে বললেন—ডাক্তারকে ডাকি?

—না।

—মাথা ঘুরে গিয়েছিল স্বীকার করছ, তবু ডাক্তার ডাকবার কথায় না বলছ?

—বলছি। শরীর আমার খারাপ হয়নি। তুমি জান, আমি মিথ্যা কথা বলি না। ওই সুমতি; সুমতি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার। মাথাটা ঘুরে গেল।

চায়ের কাপটি টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে মাথাটি হেঁট করে ঘুরতে লাগলেন। সুরমা মাটির পুতুলের মতোই টেবিলের কোণটির উপর হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ একসময় জ্ঞানেন্দ্রনাথের বোধকরি খেয়াল হলো—ঘরে সুরমা এখনও রয়েছে। বললেন—এখনও দাঁড়িয়ে আছ? না! থেকো না দাঁড়িয়ে। যাও; বাইরে যাও; খোলা হাওয়ায়; আমাকে আজকের মতো ছুটি দাও। আজকের মতো।

সুরমা সাধারণ মেয়ে হলে কান্না চাপতে চাপতে ছুটে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু সুরমা অরবিন্দ চ্যাটার্জির মেয়ে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের স্ত্রী। নীরবে ধীর পদক্ষেপেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। লনে এসে কম্পাউন্ডের ছোট পাঁচিলের উপর ভর দিয়ে পশ্চিম দিকে অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; দুটি নিঃশব্দ অশ্রুধারা গড়িয়ে যেতে শুরু হলো সূর্যকে সাক্ষী রেখে। তাঁরও জীবনের আলো কি ওই সূর্যাস্তের সঙ্গেই অস্ত যাবে? চিরদিনের মতো অস্ত যাবে?

—বয়! জ্ঞানেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

(ঘ)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘুরছিলেন অবিশ্রান্তভাবে। মনের মধ্যে বিচিত্রভাবে কয়েকটা কথা ঘুরছে।

মাণ্ডব্য ধর্মের বিধানের পরিবর্তন করে এসেছিলেন।

পশু পশুকে হত্যা করে খায়। শুধু হিংসার জন্যও অকারণে হত্যা করে। সে তার স্ব-ধর্ম। তামসী তার ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মানুষ যে ধর্মকে আবিষ্কার করেছে—সে সেখানে ভবিষ্যতের গর্ভে—সেখানে সে জন্মায়নি, সেখানে কোনও দেবতার শাস্তিবিধানের অধিকার নেই। এমন কি, অনুতাপের সূচীমুখেও এতটুকু অনুশোচনা জাগবার অবকাশ নেই সেখানে। মানুষের জীবনেই এই তমসার মধ্যে প্রথম চৈতন্যের আলো জ্বলেছে। শৈশব বাল্য অতিক্রম করে সেই চৈতন্যে উপনীত হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে সকল নিয়মের অতীত। মাণ্ডব্য বলেছিলেন—যম, সেই অমোঘ সত্য অনুযায়ী আমি তোমার বিধান সংশোধন করছি! পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মানুষ অপরাধ ও শাস্তির অতীত।

সে-বিধান ধর্ম নাকি মেনে নিয়েছিলেন।

আধুনিক যুগে সে আবার সংশোধন করেছে মানুষ।

রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধিব নির্দেশ, সাত বৎসর পর্যন্ত মানুষের অপরাধবোধ জাগ্রত হয় না; সুতরাং ততদিন সে দণ্ডবিধির বাইরে। রাষ্ট্রবিধাতাদেব বিবেচনায় পাঁচ বৎসর বেড়ে সাত বৎসর হয়েছে। মানুষ মহাতমসার শক্তির প্রচণ্ডতা নির্ণয করে শিউবে উঠে তাকে সসম্ভ্রমে স্বীকার করেছে। তাতে ভুল করেনি মানুষ! কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো তার অস্তিত্ব। তাকে কি লঙ্ঘন করা যায় ? কিন্তু এখনও কি— ?

এখনও মানুষেব চৈতন্য কি সাত বছর বয়সের গণ্ডি অতিক্রম করেনি ?

এখনও কি আদিম প্রকৃতিব অন্ধ নিযমের প্রভাবের কাছে অসহাযভাবে আত্মসমর্পণেব দুর্বলতা কাটাবার মতো বল সঞ্চয় করেনি ? প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের সঙ্গে আজকের মানুষের কত প্রভেদ!

গুলিবিদ্ধ হযে মরণোন্মুখ মানুষের আজ অক্রোধেব মধ্যে রাম নাম উচ্চারণ করতে পেরেছে। যুদ্ধে আহত মরণোন্মুখ মানুষ নিজেব মখের জল অপরের মুখে তুলে দিয়েছে—'তোমার প্রয়োজন বেশি।' They need is greater than mine.

নিষ্ঠুরতম অত্যাচারেও মানুষ অন্যায়েব কাছে নত হয়নি ; ন্যাযের জন্য হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেছে। দুর্বল বিপন্নকে রক্ষা করতে সবল ঝাঁপ দিযেছে বিপদের মুখে, নিজে মৃত্যু বরণ করে দুর্বলকে রক্ষা কবেছে। বিবেচনা করতে সময়ের প্রয়োজন হয়নি। চৈতন্যের নির্দেশ প্রস্তুত ছিল। চৈতন্য জীব প্রকৃতির অন্ধ নিযমকে অবশ্যই অতিক্রম করেছে।

তিনি নিজেও তো করেছেন—। ক্ষেত্রটা একটু স্বতন্ত্র।

তিনি সুরমাকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সুমতির প্রতি কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। সুমতি বেঁচে থাকতে বারেকের জন্য সুরমাকে মুখে বলেননি, তোমাকে আমি ভালবাসি। মনে না-পাওয়ার বেদনা ছিল, সে বেদনাও তিনি বুকের মধ্যে নিরুদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু পাওযাব আকাঙ্ক্ষাকে গোপনতম অন্তরেও আত্মপ্রকাশ করতে দেননি। তিনি অতিক্রম করেছেন বই কি! তারপরও তিনি পথ চলেছেন। কোনওদিন বারেকের জন্য থামেননি। জীবনে তমসাব সীমারেখা অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন।

চোখ দুটির দৃষ্টি তাঁর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

আবার এসে দাঁড়ালেন সুমতির ছবির সামনে। ভাল আলো এসে পড়ছে না, দেখা যাচ্ছে না ভাল, তিনি ডাকলেন—বয়।

—নামা ছবিখানাকে। রাখ ওই চেয়ারের উপর।

সুমতির ছবির চোখেও যেন অভিযোগ ফুটে রয়েছে, যার জন্য ছবিখানাকে ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। আজ ছবিখানাকে অত্যন্ত কাছে এনে, সত্যিকারের সুমতির মতো সামনে এনে তার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করবেন।

পরিপূর্ণ আলোর সামনে রেখে ছবির চোখে চোখ রেখেই স্থিরভাবে দাঁড়ালেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

ক্লান্ত চিন্তাপ্রখর মস্তিষ্কের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন। অন্যদিকে হৃদয়ের মধ্যে একটা কম্পন অনুভব করছেন। প্রাণপণে নিজেকে সংযত স্থির করে রাখতে চাইলেন তিনি। ঝড়ে সমুদ্রে বিপন্ন জাহাজের হালের নাবিকের মতো। সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আছেন শুধু তিনি আর সুমতির ছবি। ছবি নয়—ওই ছবিখানা আজ আর ছবি নয় তাঁর কাছে, সে যেন জীবনময়ী হয়ে উঠেছে। স্থির নীল আকাশ অকস্মাৎ যেমন মেঘপুঞ্জের আবর্তনে, বায়ুবেগে প্রশান্ত বিদ্যুতে, গর্জনে বাঙ্ময় মুখর হয়ে ওঠে তেমনিভাবে মুখর হয়ে উঠেছে। এ-সবই তাঁর চিত্তলোকের প্রতিফলন তিনি জানেন। আকাশ মেঘ নয়, আকাশে মেঘ এসে জমে, তেমনিভাবে ছবিখানার নিষ্ঠুর অভিযোগের প্রখর মুখরতা এসে জমা হয়েছে।

বার বার ছবিখানার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আবার ঘরখানার মধ্যে ঘুরলেন। দেওয়ালের ক্লকটায় পেন্ডুলামের অবিরাম টক্-টক্ টক্-টক্ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই। সময় চলেছে—রাত্রি অগ্রসর হয়ে চলেছে তারই মধ্যে।

উত্তর তাঁকে দিতে হবে এই অভিযোগের। এই নিষ্ঠুর অভিযোগমুখরতাকে স্তব্ধ করতে হবে তার উত্তরে। তাঁর নিজেরই অন্তরলোকে যেন লক্ষ লক্ষ লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে তাঁর উত্তর শুনবার জন্য। তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি নিজে।

—বলো, বলো সুমতি, বলো তোমার অভিযোগ!

ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন।—বলো!

ওঃ কী গভীর বেদনা সুমতির মুখে-চোখে!—এত দুঃখ পেয়েছ? কিন্তু কী করব? দুঃখ তো আমি দিইনি সুমতি; নিজের দুঃখকে তুমি নিজে তৈরি করেছ। গুটিপোকার মতো নিজে দুঃখের জাল বুনে নিজেকে তারই মধ্যে আবদ্ধ করলে!

—কী বলছ? আমি তোমায় ভালবাসলে তোমার অমন হত না? আমার মন, আমার হৃদয়, আমার ভালবাসা পেলে তুমি প্রজাপতির মতো অপরূপা হয়ে সর্ব বন্ধন কেটে বের হতে? মন হৃদয় ভালবাসা না দেওয়ার অপরাধে আমি অপরাধী?

—না। স্বীকার করি না! মন হৃদয় ভালবাসা দিতে আমি চেয়েছিলাম—তুমি নিতে পারনি, তোমার হাতে ধরেনি। এ সংসারে যার যতটুকু শক্তি তার এক তিল বেশি কেউ পায় না।

সে তার প্রাপ্য নয়। ঈশ্বরের দোহাই দিলেও হয় না। ধর্ম মন্ত্র শপথ কোনও

কিছুর বলেই তা হয় না। হাতে তুলে দিলে হাত দিয়ে গলে পড়ে যায়, আঁচলে বেঁধে দিলে নিজেই সে আঁচলের গিঁট খুলে হারায়, আঁচল ছিঁড়ে ফেলে। হ্যাঁ, পারে, একটা জিনিস প্রাপ্য না হলেও মানুষকে দিতে পারে, দান—দয়া। তাও দিয়েছিলাম। তাও তুমি নাওনি!

ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সত্যই কথা বলেছিলেন। চোখের দৃষ্টি তাঁর স্বাভাবিক উজ্জ্বল। ছবি যেন তাঁর সামনে কথা বলছে। অশরীরী আবির্ভাব তিনি যেন প্রত্যক্ষ করছেন। শব্দহীন কথা যেন শুনতে পাচ্ছেন। তিনি যেন বিশ্বজগতের সকল মানুষের জনতার মধ্যে সুমতির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন।

—কি বললে? সুরমাকে তো ভালবাসতে পেরেছিলাম?

—না পেরে তো আমার উপায় ছিল না সুমতি। তার নেবার শক্তি ছিল, সে নিতে পেরেছিল, নিয়েছিল। তাই বা কেন? তুমি নিজে না-নিয়ে ছুঁড়ে তার হাতে ফেলে দিয়েছিলে, তুলে দিয়েছিলে! তুমিই অকারণ সন্দেহে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিকে অভিশাপ দিতে গিয়ে বিচিত্র নিয়মে আশীর্বাদে সার্থক প্রেমে পরিণত করেছিলে। প্রীতিকে তুমি বিষ দিয়ে মারতে গেলে, প্রীতি সে বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠের মতো অমর প্রেম হয়ে উঠল।

—কী বলছ? বিবাহের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি—?

—দিয়েছিলাম। সে-প্রতিশ্রুতি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি! সুরমাকে ভালবেসেও তুমি জীবিত থাকতে কোনওদিন বাক্যে প্রকাশ করিনি, অন্তরে প্রশ্রয় দিইনি, কল্পনা করিনি। তুমি আমার ধৈর্যকে আঘাত করে ভাঙতে চেয়েছ। আমি বুক দিয়ে সয়েছি, ভাঙতে দিইনি। শেষে তুমি আগুন ধরিয়ে দিলে। সে আগুন ঘরে লাগল। সেই আগুনে তুমি নিজে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে। আমি পুড়লাম। কোনওরকমে বেঁচেছি, কিন্তু আমি নির্দোষ।

—কী?

অকস্মাৎ চোখ দুটি তাঁর বিস্ফারিত হয়ে উঠল। একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বিস্ফারিত চোখের নিস্পলক দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন—

—কী?

—কী বলছ?

—সেই চরম মুহূর্তটিতে আমি তোমার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম? আমি যে তোমাকে বিপদে-আপদে আঘাতে-অকল্যাণে রক্ষা করতে ঈশ্বর সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? সে প্রতিজ্ঞা—

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। করেছিলাম। সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারিনি। স্বীকার করছি। স্বীকার করছি! কিন্তু কী করব? নিজের জীবন তো আমি বিপন্ন করেছিলাম, তবু পারিনি। কী করব? তোমার নিজেব হাতে ভাঙা কাঁচের টুকরো—।

—কী? কী? সেটা বের করে কি তোমাকে বুকে তুলে নিয়ে বের হবার শেষ চেষ্টা করিনি? না। না, করিনি। তোমার নিজের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বিসর্জন

দিতে পারতাম,—দেওয়া উচিত ছিল, তা আমি পারিনি। আমি দিইনি! আমি স্বীকার করছি!

—কী? পৃথিবীতে মানুষের চৈতন্য অনেকদিন সাত বছর পার হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে। হয়েছে! নিশ্চয় হয়েছে! অপরাধ আমি স্বীকার করছি।

অবসন্নভাবে তিনি যেন ভেঙে পড়লেন, দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি আর ছিল না। একখানা চেয়ারে বসে মাথাটি নুইয়ে টেবিলের উপর রাখলেন। অদৃশ্য পৃথিবীর জনতার সামনে তিনি যেন নতজানু হয়ে বসতে চাইলেন। আবার মাথা তুললেন; সুমতি যেন এখনও কী বলছে।

—কী? কী বলছ?

—আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে বলছ?

—বলছ, নিয়তি আগুনের বেড়াকে ছিদ্রহীন করে তোমাকে ঘিরে ধরেছিল, শুধু একটি ছিদ্রপথ ছিল আমার হাতখানির আশ্রয়? আকুল আগ্রহে, পরম বিশ্বাসে সেই পথে হাত বাড়িয়ে ধরেছিল, আমি হাত ছাড়িয়ে সেই পথটুকুও বন্ধ করে দিয়েছি?

—দিয়েছি! দিয়েছি! দিয়েছি! আমি অপরাধী। হ্যাঁ, আমি অপরাধী।

চেতনা যেন তাঁর বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে নিজেকে সচেতন রাখতে চেষ্টা করলেন। নিজের চৈতন্যকে তিনি অভিভূত হতে দেবেন না। সকল আবেগ সকল গ্লানির পীড়াকে সহ্য করে তিনি স্থির থাকবেন।

কতক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে। তার হিসাব তাঁর ছিল না। ঘড়িটা টক-টক শব্দে চলেছেই—চলেছেই; সেদিকে তিনি তাকালেন না। শুধু এইটুকু মনে আছে—সুরমা এসে ফিরে গেছে; বয় কয়েকবার দরজার ওপাশ থেকেও বোধ করি শব্দ করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি মাথা তোলেননি। শুধু নিজেকে স্থির চৈতন্যে অধিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। তপস্যা করেছেন।

মাথা তুললেন তিনি। মুখ-চোখে প্রশান্ত স্থিরতা, বিচারবুদ্ধি অবিচলিত, মস্তিষ্ক স্থির, চৈতন্য তাঁর অবিচল স্থৈর্যে অকম্পিত শিখার মতো দীর্ঘ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে জ্বলছে। আদি-অন্তহীন মনের আকাশ শরতের পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তির মতো দীপ্তিতে প্রসন্ন উজ্জ্বল। চারিপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আলোকবিন্দুর মতো যেন কাদের মুখ ভেসে উঠেছে। কাদের?

যাদের বিচার করেছেন—তারা?

বিচার দেখতে এসেছে তারা! ডিভাইন জাস্টিস! ডিভাইন জাজমেন্ট!

কোনও সমাজের কোনও রাষ্ট্রের দণ্ডবিধি অনুসারে নয়, এ-দণ্ডবিধি সকল দেশের সকল সমাজের অতীত দণ্ডবিধি। সূক্ষ্মতম, পবিত্রতম, ডিভাইন!

আত্মসমর্পণ করবেন তিনি। কাল তিনি সব প্রকাশ করে আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। অবশ্য তার কোনও মূল্যই নেই; কারণ তিনি জানেন—কোনও দেশের প্রচলিত দণ্ডবিধিতেই এ-অপরাধ অপরাধ বলে গণ্য নয়, কোনও মানুষ—বিচারক এর বিচারও জানে না। তিনি নিজেও বিচারক, তিনি জানেন না—কী এর বিচার-বিধি, কী এর শাস্তি!

বিচার করতে পারেন ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া এর বিচারক নেই। ঈশ্বরকে আজ স্বীকার করেছেন তিনি। তবুও প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করবেন। তার আগে—সুরমা।

কই সুরমা? হয়তো পাথর হয়ে গেছে সুরমা। দীর্ঘনিঃশ্বাস একটি আপনি বেরিয়ে এল বুক চিরে। ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন তিনি। সুরমার সন্ধানেই চলেছিলেন। কিন্তু বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। মনে হলো বিচারসভা যেন বসে গেছে।

মধ্যরাত্রির পৃথিবী ধ্যানমগ্নার মতো স্তব্ধ। আকাশে চাঁদ মধ্যগগনে মহাবিরাটের ললাট-জ্যোতির মতো দীপ্যমান। কাটা কাটা মেঘের মধ্যে বর্ষণধৌত গাঢ়নীল আকাশখণ্ড নিরপেক্ষ মহাবিচারকের ললাটের মতো প্রসন্ন। বিচারক যেন আসন গ্রহণ করে অপেক্ষা করছেন।

ধীরে ধীরে অভিভূতের মতো নেমে প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ালেন তিনি। সূক্ষ্মতম বিচারে নিজের অপরাধ স্বীকৃতির মধ্য থেকে এক বৈরাগ্যময় আত্মসমর্পণের প্রসন্নতা তাঁর অন্তরের মধ্যে মেঘমুক্ত আকাশের মতো প্রকাশিত হচ্ছে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত অমলিন জ্যোৎস্নার জ্যোতিষ্মানতা ও মহামৌনতার মধ্যে তিনি যেন এক চিত্ত-অভিভূত-করা মহাসত্তাকে অনুভব করলেন। অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। অথচ কয়েকটা দিন বর্ষণে বাতাসে কী দুর্যোগই না চলেছে!

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে চলেছে এই তপস্যা। মহাউত্তাপে ফুটন্ত, দাবদাহে দগ্ধ, প্রলয়-ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত, মহাবর্ষণে প্লাবিত বিধ্বস্ত পৃথিবীর এই তপস্যার আশীর্বাদে আজ শস্য-শ্যামলতায় প্রসন্না, প্রাণস্পন্দিতা, চৈতন্যময়ী। সেই তপস্যারত মহাসত্তা এই মুহূর্তে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথের অভিভূত সত্তার সম্মুখে। ধ্যাননিমীলিত নেত্র উন্মীলিত করে যেন তাঁর বক্তব্যের প্রতীক্ষা করছেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

—বিচার করো আমার, শাস্তি দাও। তমসার সকল গ্লানির ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ করো আমাকে। মুক্তি দাও আমাকে! পিছনে ভিজে ঘাসের উপর পায়ের শব্দ উঠছে। ক্লান্তিতে মন্থর। অন্তরের বেদনার বিষণ্ণতায় মৃদু। সুরমা আসছে। অশ্রুমুখী সুরমা।

তবুও তিনি মুখ ফেরালেন না।

আদি-অন্তহীন ব্যাপ্তির মধ্যে তপস্যারত জ্যোতিষ্মান এই বিরাট সত্তার পাদমূলে প্রণতি রেখে তাঁর অন্তরাত্মা তখন স্থির শান্ত স্তব্ধ হয়ে আসছে। সুমতির ভ্রূকুটি বিগলিত হয়ে মিশে যাচ্ছে প্রসন্ন মহাসত্তার মধ্যে।

আজ যদি কোনওক্রমে সুরমা মরণ-আক্রমণে আক্রান্ত হয়—সুরমা কেন—যে-কেউ হয়, তবে নিজের জীবন দিয়ে তিনি তাকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত অসীম শূন্য আকাশের পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রত্যক্ষ। তাঁর অন্তরলোকে চৈতন্য শতদলের মতো পাপড়িগুলি মেলছে।

সুরমা এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে; শান্ত ক্লান্ত মুখখানির চারিপাশে চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, দু'চোখের কোণ থেকে নেমে এসেছে দুটি বিশীর্ণ জলধারা, নিরাভরণা বেদনার্তা—পরনে একখানি সাদা শাড়ি; তপস্বিনীর মতো।

ফরিয়াদ

□●□

হঠাৎ যেন বর্ষারাত্রির রিমিঝিমি বর্ষণসিক্ত অন্ধকারকে পটভূমিতে রেখে প্রেতিনী এসে সামনে দাঁড়াল। একেবারে সামনাসামনি। দরজার ওপাশে বারান্দার উপর সে আর এপাশে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে সুধাংশুবাবু।

১৯৬০ সাল, জুলাই মাস—আমাদের শ্রাবণ। আজ দু'দিন থেকে ঘন-ঘোর বর্ষা নেমেছে। আজ বিকেলবেলা থেকে বর্ষণ ধরেছে কিন্তু রিমিঝিমি বর্ষণের বিরাম নেই। শহরের পথঘাট জনহীন বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। হাওড়া শহরের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বড় রাস্তা। এ রাস্তার উপর আগের কালে দোকানপাট এতটা ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে যেকালে কলকাতা বাড়ছে স্ফীতকায় দৈত্যের মতো সেকালে তার ছোঁয়াচে হাওডাও প্রায় তার সঙ্গে তাল রেখেই বাড়ছে। সেকালে হাওডার এসব রাস্তার উপরের লোকেরা কথায় কথায় বলত—কলকাতার চাল এখানে মেরো না। এ হলো হাওডা। এখানে যা ইচ্ছে তাই চলে না। সমাজ আছে। এখনও শোনা যায় দু'চারজন প্রবীণ বা প্রবীণা বলেন—পাড়ায় কি আর সমাজ আছে না মানুষ আছে! বলব কাকে? এখন এই বাস্তাটার উপরেব বাডিগুলোর নিচের তলার ঘরগুলো ক্রমে ক্রমে দোকানে পরিণত হচ্ছে। সাইন-বোর্ড পড়েছে—তার মাথায আলো জ্বলছে। আজ দোকানগুলো এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আলো নিভেছে। রাস্তার আলোর কতকগুলো জ্বলছে কতকগুলো জ্বলছে না। ফলে রাস্তাটা আবছা আলো-আঁধারিতে থমথম করছে। সেই আবছা আলো-আঁধারিকে পিঠের দিকে রেখে দাঁডিয়ে একটি মেয়ে। দরজা খুলতেই ঘরের আলো গিয়ে পডল ওপাশেব বারান্দায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখে বিরক্তি এবং অস্বস্তির সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর! মেয়েটির চেহারার মধ্যেই ছাপ ছিল। মুখে চোখে ঠোঁটে বেশে ভূষায় একটা পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সে পবিচয় ওই প্রেতিনীর পরিচয়। বেশ পরিপাটি করে পরা পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড় কাপড়ে, চিকনের কাজকরা সাদা টাইট হাতা ব্লাউজে, ব্লাউজের নীচে ব্রেসিয়ারের আভাসে, মুখের চারপাশে খোলা চুলের রাশি অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকলেও সমস্ত কিছুর মধ্যে এমন একটা ছন্দবিন্যাস পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে যা বলে দেয় এ মেয়ে সধবা হোক বিধবা হোক এ মেয়ে স্বভাবে প্রেতিনী। আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টিতে এবং চোখের কোল ঘিরে কালো একটি ছায়াবেষ্টনী দেখলেই বোঝা যায় যে, এ কালো ছায়াবেষ্টনী বহু রজনীর অন্ধকারের কাজললতা থেকে আহরণ করা ছোপ। ঠোঁট দুটির উপরেও পড়েছে

শ্যাওলার মতো একটা কালো ছোপ। এ ছাড়াও মেয়েটিকে সুধাংশুবাবু চেনেন। সত্যিই তার যে পরিচয় তা প্রেতিনীর পরিচয় ছাড়া কিছু নয়।

সুধাংশুবাবু ওকে চিনেছেন।

দু'পা পিছিয়ে সরে এলেন তিনি।

মেয়েটি কিন্তু নড়ল না। মুখখানা তার আশ্চর্যভাবে সকরুণ হয়ে উঠেছে। সুধাংশুবাবু বুঝতে পারছেন না কি বলবেন! বলবেন—কে তুমি? কেন তুমি এসেছ? কিন্তু তা বলতে পারছেন না। মনে পড়ছে আর এক রাত্রির কথা।

মেয়েটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই ছিল; বোধ করি সুধাংশুবাবুর এতটুকু সস্নেহ অনুগ্রহসূচক কোন একটা কথার প্রতীক্ষা করছিল। তা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই কথা বললে। বাঁহাত দিয়ে মাথার ঘোমটাটা একটু সামনে টেনে দিয়ে বললে—আমি—।

বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। থেমে গেল, কথা আটকে গেল।

সুধাংশুবাবু অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে বললেন—বল। আমি—। ধরিয়ে দিলেন কথাটা।

মেয়েটি বললে—আমার নাম—।

সুধাংশুবাবু আরও তিক্তকণ্ঠে বললেন—তুমি চাঁপা। ভাল নাম বোধ হয় রত্নমালা। তাঁর কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা জেগে উঠেছে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ।

সুধাংশুবাবু বললেন—এই রাত্রে কি দরকার তোমার? আজ যাও। কাল সকালে এসো।

মেয়েটি ডানহাতে কাপড়েব আঁচল খানিকটা মুঠো করে ধরে মুখের উপর চেপে ধরলে। তাতে কান্নার শব্দ চাপা দেওয়া গেল কিন্তু চোখের জলের অস্তিত্ব গোপন করা গেল না। দু'চোখের কোল থেকে বাঁধভাঙা জল নেমে আসছে।

সুধাংশুবাবু বললেন—একি? তুমি কাঁদছ কেন?

এবার চাঁপা বললে—আমার বড় বিপদ বাবু! বড় বিপদ। এরপরই আকুল আর্তিতে হাত দুটি জোড় করে অতি কাতর করুণ কণ্ঠে সে বললে—আমাকে আপনি বাঁচান।

আবার বিরক্ত ও তিক্ত হয়ে উঠলেন সুধাংশুবাবু। বললেন—কি বিপদ! সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তখন অনেক বিচার তাঁর হয়ে গেছে। এই মেয়েটির কোন্ বিপদ হতে পারে? এবং কোন্ বিপদ থেকে তিনি তাকে বাঁচাতে পারেন? এর উত্তর স্বতঃসিদ্ধ। কোন কেসে পড়ে থাকবে। ফৌজদারী কেস। যে জীবন সে যাপন করে তাতে কেসে পড়াই স্বাভাবিক। এবং তিনি অ্যাডভোকেট। হাওড়া কোর্টে ক্রিমিন্যাল সাইডে প্র্যাক্‌টিস তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত। সেসনস্ কোর্টে বড় বড় কেস—মার্ডার কেস, ডাকাতি, দাঙ্গার কেসে তিনি আসামী পক্ষে থাকেন। এবং শতকরা ষাটটা কেসে জেতেন। সুতরাং যে-বিপদে তিনি বাঁচাতে পারেন সে বিপদ ওই ধরনের কোন কিছু ছাড়া আর কি হতে পারে! তিনি বললেন—কোন কেসে পড়েছ বুঝি?

মেয়েটি আবার কেঁদে উঠল।

সুধাংশুবাবু আবার বললেন, এবার কণ্ঠস্বর রূঢ়তর হয়ে উঠল, বললেন—এতদিন কিছু হয়নি এই আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে জিভ দিয়ে করুণাব্যঞ্জক একটি শব্দ করে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। সেটা আক্ষেপও বটে আবার তিরস্কারও হতে পারে।

চাঁপা মাটির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। শুধু এই তিরস্কারের ফলে তার চোখের জল শুকিয়ে গেল; সে শুকনো চোখে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুধাংশুবাবু আবার তিরস্কার করলেন— জীবনটাকে নিয়ে কি করলে বল তো? এবার তাঁর কণ্ঠস্বর যেন অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু তৃপ্তি পেলেন তিনি। আজ বারো বছর এই তিরস্কার এই মেয়েটিকে করবার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন।

সুধাংশুবাবু বলে গেলেন—কি কেস জানি নে। তবে তোমাদের কেস—। থেমে গেলেন তিনি। প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—তুমি কাল সকালে এসো। আজ শনিবার। আজ সন্ধ্যেবেলা কোন কাজ আমি করি নে। তোমার অন্তত জানা উচিত। এ পাড়ার তো সকলেই জানে এ কথা! অন্তত বারো বছর তোমাকে আমি দেখছি। তুমি নিশ্চয় জান যে আমি শনিবারে কোন কাজ করি নে।

সুধাংশুবাবু—সুধাংশুমোহন চক্রবর্তী নামজাদা অ্যাডভোকেট। হাওড়া জজ কোর্টে সেসনস্ কোর্টে যাঁরা আইনজ্ঞ তিনি তাঁদেরই একজন। হাওড়া জেলারই লোক, হাওড়া জেলা স্কুলেরই ছাত্র, বাপ ছিলেন নরসিং কলেজের অধ্যাপক—তিনি হয়েছেন উকীল। এককালে দেশের মুক্তি আন্দোলনেও যুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু সে কথা থাক। সে সব পুরনো কথা।

শনিবার সন্ধ্যা এবং রবিবার সকালে তাঁর ছুটি। পেশাগত কাজ থেকে ছুটি—মক্কেলের কাগজপত্র ছোঁয়া দূরের কথা তাদের সঙ্গে দেখাও করেন না। এই দুটি বেলা তিনি মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেন। তাঁর ক্লার্করা আসে কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা তিনি করেন না। শনিবার সন্ধ্যেবেলাটা একা থাকেন। ভাবেন, লেখেন। লেখার অভ্যাস আছে—প্রবন্ধ লেখেন। স্টেটস্‌ম্যান অমৃতবাজার পত্রিকায় রাজনৈতিক দার্শনিক বিষয়ে লিখে থাকেন ছদ্মনামে। কখনও কখনও বড় বড় বই নিয়ে একমনে পড়ে যান। তারপর তার উপর নিবন্ধ লিখে থাকেন। সন্ধ্যেবেলা বসেন—ওঠেন সেই রাত্রি বারোটায়। কাপ ছয়েক চা খেয়ে থাকেন আর সিগারেট পোড়ান চার ঘণ্টায় ষোলটা থেকে কুড়িটা। সাড়ে এগারটা থেকে স্ত্রী এসে তাগিদ দিতে থাকেন—ওঠো ওঠো।

উঠি উঠি করেও আধঘণ্টা কাটিয়ে ক্লক ঘড়ির বারোটার ঢং ঢং ঘণ্টার তাগিদে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ছাড়েন।

আগের কালে অর্থাৎ প্রথম জীবনে—প্র্যাকটিসের যখন প্রথম এবং তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে যখন নবীন-নবীনা তখন স্ত্রী বলতেন—আর কত বসে থাকব আমি? এখন বলেন—কাল কি তোমার কোর্ট নেই বলে অন্য কাজকর্মও নেই? বাগানে যেতে হবে না? বা গ্রামে যাবে না?

রবিবার সকালে তিনি গ্রামের বাড়িতে যান কোনদিন, কোন রবিবার যান তাঁর বাগানে। মাইল বিশেক দূরে বাগান বা চাষবাড়ি করেছেন সুধাংশুবাবু।

শনিবার সন্ধ্যায় সুধাংশুবাবু প্রফেশনাল কাজ করেন না এটা হাওড়ার লোকে জানে। তাঁর বাড়ির বাইরে ফটকের গায়ে বারান্দায় এসব বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। আজ নেমপ্লেটের পাশে লেখা আছে—বাড়ি নেই। বারান্দার গায়ে একটা বোর্ডে লেখা আছে—শনিবার সন্ধ্যায় কোন কাজ হয় না।

চাঁপা বারো বছরেরও বেশি কাল এই পথ ধরে যাতায়াত করছে। চাঁপার মা সামনে ওই বাড়িতে, অধুনা মৃত নিত্যবাবুর বাড়িতে কাজ করত। এই রাস্তার উপর সুধাংশুবাবুর পৈত্রিক বাড়ি তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হয়েছে। দোতলা থেকে তেতলা হয়েছে। গ্যারেজ হয়েছে। গাড়ি হয়েছে। চাঁপা বললে—শনিবার জেনেই আমি এসেছি।

বিস্ময়ের আর সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর। বললেন—শনিবার জেনেই এসেছ? কেন?

চাঁপাও বললে—জেনেই নয়, জেনে এসেছি। আমার যে উপায় নেই। কি করব?

ক্রুদ্ধ হয়ে সুধাংশুবাবু কিছু বলতে গেলেন কিন্তু মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে—কিছু মনে করবেন না। একটি মেয়ের বাড়ি। হয়তো সে খারাপ মেয়েই। বাইরে দাঙ্গাহাঙ্গামা। সেইসময় রাত্রিকালে কোন বিপন্ন পুরুষ যদি সেই মেয়ের বাড়ি আশ্রয় চায় তবে বুঝতে হবে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আশ্রয় চাচ্ছে। আশ্রয় দিলে মানুষটা বাঁচে। আর ক্ষতিও তাতে কিছু হয় না। সুধাংশুবাবুর অন্তরাত্মা রাগে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ফেটে পড়তে চাইলে; সর্বাঙ্গ যেন জ্বালা ধরে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংবরণ করলেন তিনি। বললেন—মনে করিয়ে দিতে হবে না। সেকথা আমার মনে আছে। আমি ভুলিনি।

এবার এই কথায় সে-এক আশ্চর্য বিষণ্ন হাসি মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল। মাত্র দুটি ঠোঁটের তটপ্রান্ত-রেখাতেই তা আবদ্ধ। তার সঙ্গে তার দুই চোখে জল গ্রীষ্মের সমুদ্রে ভাটির শেষতম মুহূর্তটিতে ক্লান্ততম ঢেউটি এসে লুটিয়ে গড়িয়ে পড়ার মতোই এ হাসির চেহারা। অনুদ্ধত তো বটেই তার সঙ্গে লজ্জাও অনেক। লজ্জিতভাবেই সে বললে—না, সে কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাইনি। সে আপনি ভাববেন না। আমার সে স্পর্ধা নেই। বারো বছর ধরেই তো আপনার সামনে দিয়ে গিয়েছি ওই ওঁদের বাড়ি—কোনদিন আপনার সঙ্গে কথা বলতে তো চাইনি। আমি যা তা তো আমি জানি। সেদিন সেই বারো বছর আগে সেই রাত্রে সেই ক'ঘণ্টার জন্যে শুধু ঘরের মধ্যে বসতে দিয়েছিলাম—আমার সারাজীবনে সেইটুকুই একমাত্র পুণ্য। সে আমার থাক। আমি এমনি এসেছি—কত লোককে তো বাঁচান—।

সুধাংশুবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

বারো বছর আগের কথা। ১৯৪৬ সাল তখন। সারা দেশটা তখন জ্বলছে। ইংরেজ

চলে যাচ্ছে। দেশ ভাগ হযে স্বাধীন হচ্ছে। বাংলাদেশ কেটে দু'ভাগ হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ব-পাকিস্তান; পূর্ববঙ্গে হিন্দুর বাড়ি জ্বলছে, লুট হচ্ছে, পুরুষেরা খুন হচ্ছে, মেয়েরা হারাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গেও তাই। তবে মুসলমানের মেযে এখানে হারায়নি এটা বলতেই হবে।

কলকাতা হাওডায় সে আগুন পরিণত হযেছিল রাবণের চিতায়। রাবণের চিতার আগুন অনির্বাণ। ও নেভে না। এই তো পঞ্চাশ বছর আগেও লোকে বিশ্বাস করত সে আগুন আজও জ্বলছে। সুধাংশুবাবুর বযস তখন চৌত্রিশ। ১৯৬০ সালে অর্থাৎ আজ তাঁব পঞ্চাশ বছর চলছে। ষোল বছব আগে চৌত্রিশ ছিল। কথা চৌত্রিশ বত্রিশ ছত্রিশ নয, কথা সে সময়ের সুধাংশুবাবুর কথা। বয়স যতই হোক তখন তিনি নবীন এবং দীপ্ত। তখন প্র্যাকটিসে বসেছেন কিন্তু প্র্যাকটিস তখনও তাঁকে বাঁধতে পারেনি। তখনও তাঁব গা থেকে পলিটিক্যাল পার্টির ছাপ ওঠেনি, আটক-আইনে বন্ধ থাকলে চেহারায় একটা যে ছাপ পডে সেটাও তখন সম্পূর্ণ মোছেনি। দেশ ভাগ হবার মাস ছয়েক আগে ছাড়া পেয়েছেন। এবং একটা অনিবার্য অভ্যুত্থান বা সশস্ত্র বিপ্লবের সংগ্রাম আসন্ন ধবে নিযে মনে মনে তাতেই মেতে ছিলেন। হাওডার বার লাইব্রেরি বাংলাদেশ হাইকোর্টেব বারেব পবই গুরুত্বপূর্ণ বার। এখানে অনেক আইনজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব করে গেছেন। হাওডা শহরও বাংলাব রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের জটিল এক কেন্দ্র। এক সেকালের ফরাসীদেব এলাকা চন্দননগর ছাডা হাওডার মতো শক্ত ঘাঁটি এবং আশ্রয বিপ্লববাদীদের আর ছিল না। আবাব অন্যদিক থেকে ই. আই. আর.—এখন ই. আর., বি. এন. আর.—এখন এস. ই. আর-এর টারমিনাস স্টেশন ও প্রধান স্টেশনের ইয়ার্ড হিসেবে ও তার সঙ্গে গঙ্গাব ধাবেব জুট মিলগুলোর অস্তিত্বের জন্য হাওডার সাধারণ জীবন যেমন উত্তপ্ত তেমনি নিষ্ঠুর ও রূঢ। আগুন এখানে সহজেই জ্বলে ওঠে। ব্লাস্ট ফার্নেসেব উপরে দেওযা জ্বলন্ত লোহার মযলা, কিংবা বয়লাবেব ধোঁযানো ছাই-ফেলা জায়গার মতো অবস্থা।

দেশভাগের আগুন তখন জ্বলছে। সে প্রায দাউদাউ করে জ্বলা। রাজনৈতিক মতবাদে বামপন্থী সুধাংশুবাবুর দল সে-আগুন নেভাবাব প্রাণপণ চেষ্টা করছেন; কিন্তু বাতাসে যে-আগুনকে শুকনো চাল-বস্তির উপর দিয়ে বইয়ে নিয়ে চলে মানুষ সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের মতো যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে লডাই দিয়েও তাকে রুখতে পারে না; তাব উপর খডের চালের ঘরগুলো যদি গরীবের সংগ্রহ করা খড়কুটো ডাল-পাতার জ্বালানীতে অথবা পাটে খডে বোঝাই থাকে তাহলে সে আগুনের সামনে মানুষকে ক্রমাগত পিছু হটতে হয়। হাওডার বস্তিব কতক কতক জায়গার উপমা ঠিক ওই খডকুটো ডাল-পাতার জ্বালানী বোঝাই খডের চাল-বস্তির মতো। অপরাধ-প্রবণ একদল মানুষ, পুলিসের কালো খাতায নাম লেখানো আসামী যারা, তারা এই সুযোগে সমাজের পরিত্রাণকর্তা সেজে বসে আপন আপন অঞ্চলে অবাধ কর্তৃত্ব চালিয়ে চলেছে তখন। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন অনেক পবিত্রতার অভ্যুদয় হয়েছে তখন।

এমন দিনে সেদিন; যে দিনটির কথা বললে চাঁপা; যে দিনের পর আর সে তার সামনে আসেনি। সেইদিন বিকেলবেলা নবীন সুধাংশুবাবুর কানে এল একটা নিষ্ঠুর খবর। হাওড়ার উত্তর অঞ্চলের আজ একটা সুরক্ষিত মুসলমান পল্লী আক্রান্ত হবে। পল্লীটি কয়েকবার আক্রান্ত হয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এবার আক্রমণকারীরা শপথ নিয়েছে আগামীকাল সকালে এই পল্লীটি কোনমতেই মাথায় চাল নিয়ে এবং বস্তির মধ্যে জীবনের স্পন্দন নিয়ে আর খাড়া থাকবে না। যা থাকবে তা খাপরা এবং খড়ের চালের ভস্মাবশেষ—ছাই আর কালো রঙধারা ভাঙা ঘরের দেওয়াল। মানুষগুলো মরবে—তাদের লাশ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে; যারা পালাবে তারা পালাক।

পল্লীটির কেন্দ্রে আছেন একজন পশ্চিমদেশীয় অবস্থাপন্ন মুসলমান ব্যবসায়ী। এখানে তাঁর কয়েকটা প্রায়-একচেটিয়া ব্যবসা আছে। দোতলা পাকা বাড়ি আছে এবং বাড়ির মধ্যে একটা বড় আয়রন-চেস্ট আছে যেটাকে তিনি টাকায় নোটে বোঝাই করে রেখেছেন। মুসলিম লীগ আমলে লীগের কর্তাদের সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল অনেক—এখন পুলিশের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রেখেছেন। এ ছাড়া অনেকে বলে ওই একচেটিয়া ব্যবসার খাতিরে অকস্মাৎ ধর্মমতের ঊর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও মেলামেশা করছেন। বোমা মজুত করে রেখেছেন। লোকজনও রেখেছেন।

এ সবকেই আজ উচ্ছেদ করতে হিন্দুদের একটা অংশ বদ্ধপরিকর। এ নাকি আজকের দিনে লজ্জার কথা। হার মানার লজ্জায় হাওড়ার মুখ কালো হয়ে গেছে। সেই লজ্জা মুছবাব জন্যে সেবছরের সেদিনের আয়োজন কুরুক্ষেত্রে সপ্তরথী সমাবেশে চক্রব্যূহ রচনার মতো একটা আয়োজন। টাকাকড়ি লোকজন পৃষ্ঠপোষক নেতা কিছুরই অভাব ছিল না।

খবরটা যেন কোর্ট এলাকা থেকে ফিসফিস করে এ কোণে ও কানাচে উচ্চাবিত হচ্ছিল। সময়টা গুজবের সময়ও বটে। সুতরাং সঠিক কোন সংবাদ পেতে দেবি হয়ে গিয়েছিল। কোর্ট ফেরত সুধাংশুবাবু .কার্টের পোশাক খুলেই বোিবয়ে গিযেছিলেন তাঁদের আড্ডার দিকে।

আড্ডায় কর্মীরা গুম হয়ে বসে ছিল। করার যেন কিছুই নেই। কতকগুলো ব্যবসাদার সমস্ত উদ্যোগের পিছনে দাঁড়িয়েছে; তাদের লক্ষ্য ওই মুসলমান ভদ্রলোকটির ওই একচেটিয়া ব্যবসা। তার সঙ্গে যারা নেতা হিসেবে দাঁড়িযেছে তাদের লক্ষ্য ওই আযরন-চেস্ট এবং আরও একদল আছে যারা চোখ রেখেছে আগামীকাল যে বস্তিটা পোড়াবস্তি হবে সেইটের উপর। এদের সবার পিছনে আছেন বস্তির মালিক যিনি তিনি। গোটা পাড়াটা খেপেছে। বাইরে থেকেও লোক আসছে।

আজও মনে আছে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল সুধাংশুবাবুব। শেষ পর্যন্ত এই পবিণতি হবে ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের! মনে পড়ছে রবি বলে একটি অল্পবয়সী ছেলে বলেছিল—দেশটা কি ফ্যাসিস্ট হয়ে গেল সুধাংশুদা?

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মেয়েটি বললে—আপনার কাছে সেদিন রাত্রে আমার কুৎসিত

চেহাবা আমি লুকোইনি। লুকুতে আমি পাবতাম। কিন্তু আপনাব জন্যেই আমি লুকুইনি। আপনাব ক্ষতি হত, অনিষ্ট হত।

হ্যাঁ—তা হত।

ছুবি কিংবা বোমা কিংবা লাঠি ডাণ্ডাব ঘাযে জখম হতে হত। প্রাণান্ত হলেও হতে পাবত। সেদিন বাত্রে তাঁদেব দলেব আড্ডায় বিপ্লবেব ব্যাকবণ নিয়ে এবং ভাবতবর্ষেব এত পুণ্যেব স্বাধীনতাব তপস্যা নিযে আলোচনাব মাঝখানেই বোমা ফাটতে শুরু কবেছিল। ক্ষুদিবামেব ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীব আত্মহত্যা, বিনয-বাদল-দীনেশ, চট্টগ্রামেব মাস্টাবদা সূর্য সেনেব দৃষ্টান্ত কোন্ ভুলে এমনভাবে দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাবাজদের বিক্রম ও প্রতাপেব কাছে ম্লান হযে গেল সেই কথা হতেই দমাদম বোমাব আওযাজ শুরু হযে গেল। বুঝতে বাকি থাকেনি বস্তিওযালা ব্যবসাদাব এবং ধর্মান্ধ মানুষদেব জোটেব জেহাদ আবম্ভ হযে গেল। প্রথম শব্দেই চমকে উঠেছিল সকলে।

—আবম্ভ হযে গেল?

একজন ঘডি দেখে বলেছিল—এই তো সবে সাডে আটটা—এত সকালে—

—তাব মানে পুলিস একেবাবে নিশ্চিন্ত কবে দিযেছে।

ওদিকে কোলাহল উঠেছিল। তাব অর্ধেকটা পৈশাচিক হিংসাব উল্লাসেব কোলাহল আব অর্ধেকটা আর্ত সকরুণ।

সকলেই প্রায একসঙ্গে এক সংকল্পে উঠে দাঁডিযেছিলেন।

সংকল্প—এই বর্বব হৃদযহীন পৈশাচিক আক্রমণকে বাধা দিতেই হবে। বাজনৈতিক চেতনায সচেতন মন—দুর্ধর্ষ সাহস—নূতন যৌবন, তাঁবা বেবিযে পডেছিলেন ঘব থেকে।

তখন আগুন জ্বলেছে এবং মানুষেব সে বীভৎস উন্মত্ততা, হিংসাব সে প্রচণ্ড ভযাল রূপ বস্তিব চালেব দাউদাউ আগুনেব মতো ভযংকব থেকে ভযংকবতব হযে উঠেছে। যে আগুন আলোব মুখে শিখা হযে জ্বলে, অন্ধকাবে পথ দেখায, সেই আগুন ঘবেব চালে লাগলে মানুষেব ভয হয। সেই আগুন যখন এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয তখন দূব থেকেই তাব আচে মানুষেব দেহ ঝলসায - আত্মা সংবিৎ হাবায। তাদেবও সংবিৎ হাবিযেছিল সেদিন। ওদিকে তখন পাকাবাডি থেকে বর্ধিষ্ণু মুসলমানটি গুলি চালাচ্ছেন।

একজন শান্তিকামী বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই গুলিতে আহত হযেছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওযা হযেছে। এমনই অবস্থায জন সাতেক —।

হ্যাঁ তাঁবা সাতজনই ছিলেন। সাতজনেই গিযে দাঁডিযেছিলেন পাডাটাব সামনে। মনে পডছে চীৎকাব উঠেছিল পাডাব ভিতব থেকে—"নাবায়ে তকদীব! আল্লা হো আকবব!" তাব সঙ্গে ছেলেমেযেদেব ভযার্ত কান্নাব শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এদিকে বাইবেব আক্রমণকাবীব দল চেঁচাচ্ছিল। অর্থহীনভাবে কয়েকটি অতি পবিত্র ধ্বনি উচ্চাবণ কবে তাব সঙ্গে বুকেব কথা প্রকাশ কবছিল, অকুতোভযে কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে চীৎকাব কবে বলছিল—মাব মাব মাব। লাগাও আগুন। জ্বালাও।

এঁরা সাতজনেই চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন—না না- । শোন—শোন ভাই সব—

মুহূর্তে একটা বোমা এসে আছড়ে পড়েছিল সামনে। বোমা নয়, ক্র্যাকার। প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে ঠাঁইটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। গুণ্ডার দল কুৎসিত ভাষায় তাঁদের গালাগালি দিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল—নিকাল শালারা এখান থেকে নিকাল!

আর একজন বলে উঠেছিল—দে, শালাদের ধরে হাত-পা বেঁধে ওই আগুনে ফেলে দে।

তাঁদের দলের সব থেকে ছোট ছেলেটি এই মুহূর্তটিতেই সব থেকে মারাত্মক ভুল করে বসেছিল। তার জামার তলায় লুকানো ছিল একটা—ক্র্যাকার নয় বোমা; সেই বোমাটা সে ছুঁড়েছিল ওই বক্তার দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু হলো বিপরীত। বোমাটা এমনভাবে ফাটল যে তার স্প্লিন্টারগুলো এসে লাগল তাকেই এবং দুটো-একটা লোহার টুকরো ওঁদের দলের দু'একজনকে আহত করে দিলে। ছেলেটা নিজেই রক্তাক্ত হয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে গেল। এরপর সে এক প্রেততাণ্ডব। গুণ্ডার দল ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের দলকে আক্রমণ করলে। সে আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে মরার মতো সাহস ছিল কি ছিল না সে কথা সেদিন ভাবিনি, আজ অকস্মাৎ যেন ভেবে দেখতে হচ্ছিল একবার।

মন বলছে—হ্যাঁ সাহস ছিল। কিন্তু অন্য সকলে সম্ভব-অসম্ভব হিসেব করে বলেছিল—"লড়াই করা অসম্ভব। এবং গুণ্ডার হাতে মরে কোন লাভ হবে না, আমরা মলে ওদের মনে এতটুকু দাগ কাটবে না।" সেই কারণেই সেদিন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যা হতে পারত তার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াতেন।

সেদিন তা দাঁড়ালে এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হত না। দেখা হত কিন্তু তাকে ঠিক এইভাবে চিনতেন না। এ চেনা যে কত বড়—; কি বলবেন—? লজ্জার? দুঃখের?

যাক। ছুটে পালিয়েছিলেন সকলে। জখম হওয়া ছেলেটাকে নিয়ে পালানো খুব সহজ কথা ছিল না। কিছুটা দূরে এসেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিলেন সকলে। গোটা পাড়াটার রাস্তায় আলো তখন সব নিভে গেছে। নিভিয়ে দিয়েছে ওরা। বাড়িগুলির দরজা-জানালা সব বন্ধ। ভিতরেও আলোর আভাস ছিল না। রাস্তা জনহীন। পিছনে ছুটন্ত হিংস্র গুণ্ডার দল। গুণ্ডারা চোরাগোপ্তা গুণ্ডামি করে—সে সহ্য হয়ে গেছে মানুষের, সেখানে গুণ্ডাদের ধরা পড়ার ভয় আছে। আর এ হলো গুণ্ডার অবাধ অধিকার। গুণ্ডামি হলো এখানে বিশেষ অধিকার।

সুধাংশুবাবু ছুটছিলেন অন্ধকারের মধ্যে। বড় রাস্তা ছেড়ে সংকীর্ণ পথ ধরে এলাকাটা পার হয়ে আসতে চেষ্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন—গলিটার ওমাথায় উঠেছিল কোলাহল —সেই আস্ফালন—

মার শালাদের-—দে জ্বালিয়ে।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কি করবেন? আবার পিছনে ফিরবেন? কিন্তু যাবেন

কোথায়? অতি সংকীর্ণ কোন গলিপথ—যে পথে মেথররা হাঁটে—এমন কোন পথও কি নেই?

নিঃসীম অন্ধকার আর ওই দাঙ্গার ছোট পাড়াটা তখন অন্ধকারের মধ্যে যেন দিক-দিগন্তহীন হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে তিনি অতল জলে তলিয়ে হারিয়ে যাবার মতোই ওই অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একপাশের একটা বাড়ির নোনাধরা ইটের দেওয়ালের গায়ের সাবেকী আমলের ছোট একটা জানালা খুলে গিয়েছিল। সুধাংশুবাবু অনুভব করেছিলেন জানালার ওপাশে কেউ আছে। আর শুনতে পেয়েছিলেন একটি বাচ্চার কান্না। বুঝতে দেরি হয়নি যে ওপাশে রয়েছে সে কোন মেয়েছেলে। তবুও সুধাংশুবাবু বলেছিলেন বা বলে ফেলেছিলেন—আমাকে একটু আশ্রয় দিতে পারেন? গোলমাল একটু থামলেই চলে যাব!

ফিসফিস করে মেয়েটি বলেছিল—তুমি কে?

—নাম বললে কি কবে চিনবেন? তবে আমি হিন্দু কিন্তু গুণ্ডার দলের হিন্দু নই। গুণ্ডারা আমাকে তাড়া করেছে। গলির দু'মুখে ঢুকে খুঁজছে।

শেষকালটায় হঠাৎ নামটা বলে ফেলেছিলেন—আমার নাম সুধাংশু—আমি হিন্দু।

— সুধাংশু! সেদিন মনে হয়নি কিন্তু পরে মনে হয়েছিল শব্দটি উচ্চারণের মধ্যে বিস্ময় ছিল। সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—হ্যাঁ। মিথ্যে বলিনি আমি। কিন্তু দরজা যদি খুলে দেন তো দিন নইলে পাশ দিয়ে কোন রাস্তা বলে দিন। ওরা গলিটার দু'মুখ আগলেছে।

খুব দ্রুত উচ্চারণে চাপা গলায় গৃহমধ্যবর্তিনী বলেছিল—দরজার সামনে আসুন। এই ডাইনে দরজা।

ঘরের মধ্যে এ পর্যন্ত সেই কাঁদুনে ছেলেটা এক-ধরনের ঘেনঘেনে কান্না কেঁদেই চলেছিল—হঠাৎ সে এবার কঁকিয়ে উঠল। কে যেন বললে, সেও মহিলা, একটু ভারী গলায় বললে—ছেলেটাকে মেরে ফেল তুই, ছেলেটাকে গলা টিপে শেষ করে দে। এ তরফ থেকে বলেছিল—তুমি থাম তো! চেঁচিয়ো না বেশি।

—ওকি—দরজা খুলছিস কেন? আজকের দিনেও কি তোর—এবার মেয়েটি চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—থাম বলছি মা, তুমি থাম! দরজা খুলে না দিলে মানুষটাকে ওরা মেরে ফেলবে!

—ও মা—! তাই বলে তুই—! ও চাঁপা—চাঁপা—

এদিকে দরজাটা খুলে গিয়েছিল। অন্ধকার দরজার মুখটায় শ্বেতবস্ত্রাবৃতা মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। মেয়েটি বলেছিল—ঢুকে পড়ুন, দেরি করবেন না।

বাড়ির মধ্যে এসেও তিনি মেয়েটিকে চিনতে পারেননি।

কেরোসিনের ডিবে আর একটা কালিপড়া হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল মেয়েটির প্রসাধন এবং সজ্জাবিলাস বেশ একটু অসংগত। এই বাড়িতে এই পরিবেশে যারা বাস করে তাদের পক্ষেও এ বিলাস এ সজ্জা শুধু

বেমানানই নয়—মানে খুঁজতে গেলে একটা খারাপ অর্থই বার বার মনের মধ্যে গর্ত থেকে সাপের মতো মুখ বাড়ায়।

তখন ওর বয়স ছিল বোধ করি বছর কুড়ি কি বাইশ, তার বেশি নয়।

মেয়েটি যে ঘরের জানালা থেকে কথা বলেছিল সেই ঘরেই সে তাঁকে এনে বসতে দিয়েছিল, বলেছিল—বসুন এইখানে।

হঠাৎ এতক্ষণে সুধাংশুবাবুর মনে হয়েছিল মেয়েটিকে যেন তিনি চেনেন—অন্তত দেখেছেন। ভ্রূ কুঞ্চন করে মনে করতে চেয়েছিলেন কোথায় দেখেছেন।

ঘরখানার মধ্যে দু'খানা তক্তাপোশ জোড়া দিয়ে তার উপর দু'জনের বিছানা পাতা। দু'জনের না, আড়াইজনের বিছানা—অর্থাৎ একজনের বিছানার পাশে একটি ছোট ছেলের বিছানা। বিছানায় শুয়ে একটা রুগ্ন ছেলে কেঁদেই চলেছে। বিরাম নেই—তার অসন্তোষের শেষ নেই, সে অসন্তোষ সে প্রকাশ করে চলেছে ওই কান্নার মধ্যে দিয়ে। ক্লান্ত তিক্ত—-। হয়তো তার সঙ্গে ক্ষোভও ছিল কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে যা ছিল তা দুঃখ এবং করুণা ভিক্ষা। ছেলেটার বয়স হয়েছে—বছর চারেক হবে। কিন্তু এত দুর্বল যে উঠতে পারছে না।

মেয়েটি কিন্তু তাকাচ্ছেও না তার দিকে। সে বাইরে চলে গিয়ে ঘরের কোণের রানীগঞ্জ টাইলের বারান্দাটার উপর ঘরের দিকে একেবারে পিছন ফিরে বসে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সুধাংশুবাবু ভাবছিলেন—মেয়েটি কে? দেখা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ দেখেছেন তিনি। কোথায় দেখেছেন? কোথায়? ক্রমশ মনে হচ্ছিল যেন বেশ চেনা। কিন্তু কে? হঠাৎ ছেলেটা যাকে বলে একেবারে কঁকিয়ে ওঠা সেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছিল। সুধাংশুবাবু ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিছু হলো নাকি ছেলেটার? এবং প্রত্যাশা করছিলেন মেয়েটি এবার এসে ছেলোটকে তুলে নেবে। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটি চঞ্চল হয়নি। বাইরে সেই বয়স্কা মেয়েটি বলে উঠেছিল—দেখ কি হলো ছেলেটার? চাঁপা!

মেয়েটি তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাভরা কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল—মরুক—মরুক—আপদটা মরুক। আমি পারব না—তুই দেখ। ওটাকে ছুঁতে ঘেন্না লাগে আমার! সত্যিই সে নড়েনি, যেমন বসেছিল তেমনি বসেই থেকেছিল। এসেছিল সেই বয়স্কা মেয়েটি, মাথায় ঘোমটা টেনে কালিতে কালো লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে ছেলেটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—ও মাঃ—মরে যাই মরে যাই—ওরে ডেয়ো পিঁপড়েতে কামড়ে ধরেছে রে! চাঁপা আয় আয়—ছাড়িয়ে দে ছাড়িয়ে দে!

আশ্চর্য মা!

সেই গাল সেই একমাত্র গাল বর্ষণ কবতে করতে এবার এসে ঘরে ঢুকেছিল—মরুক। মরুক। মরুক। মরে যা তুই! মরে যা।

অবাক হয়ে সুধাংশুবাবু এই মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

মা বলেছিল—ওর অপরাধ কি বল!

অপরাধ যে কি তা বলেনি সেই বিষাক্তজিহ্বা মা।

জিভে তার আশ্চর্য বিষ। কামড়াতে হয় না—জিভ থেকে যেন বিষাক্ত লালা ঝরে পড়ে, হয়তো ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তিক্তমান এবং বিষাক্তজিহ্বা মা ছেলেটার কাছে এসে বলেছিল—কি হয়েছে? ছেলেটা হাত তুলে দেখিয়েছিল। সে স্বল্প আলোতেও সুধাংশুবাবু দেখেছিলেন হাতের আঙুলে একটা ডেয়ো পিঁপড়ে কামড়ে ধরে ঝুলছে।

লণ্ঠনটা কাছে এনে মা নিষ্ঠুর টানে সেটাকে তুলে এবং আলোতে দেখে শুনে আরও একটা পিঁপড়েকে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে নিজের পা দিয়ে পিষে মেরেছিল নিষ্ঠুর আক্রোশে।

লণ্ঠনটা তুলে ধরে মুখ নামিয়ে যখন মেয়েটি ছেলেটির কোথায় পিঁপড়ে ধরেছে দেখছিল সেই সময় আলোর আভা বেশ উজ্জ্বল হয়ে তার মুখের উপর পড়েছিল। তার যে একটি অশোভন প্রসাধনবিলাসিতার ও বিলাসসজ্জার আভাস তাঁর এবাড়ি ঢুকবার মুখেই পড়েছিল এবার সেটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেটা আর সেটুকু বলে এতটুকু কিছু নয়, সেটুকু যেন অনেকটুকু।

মেয়েটিকে ভাল দেখতে পাননি তিনি। এবার দেখলেন মেয়েটি পূর্ণযুবতী এবং আশ্চর্য একটি আকর্ষণ আছে তার, তাব উপর তার কেশপ্রসাধনে এবং বিলাসসজ্জায় একটি ঘোষণা আছে।

তবুও ঘরখানির মধ্যে বিপণী সাজাবার মতো কোন আয়োজন নেই। একটা দৈন্য ফুটে রয়েছে চারিদিকে। গৃহস্থঘরের পরিবেশ চারিপাশে অত্যন্ত স্পষ্ট। এর মধ্যে বেমানান একমাত্র সেই মেয়েটি নিজে। হঠাৎ চোখ পড়ল তার।

মেয়েটির বেশভূষায় প্রসাধনে বিলাসের ও লালসার যে ঘোষণাই থাক, মেয়েটির পরনের বেশভূষায় রঙের ঔজ্জ্বল্য নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কপালে টিপ নেই। সাদা সিঁথি ঘিরে একরাশি চুল নিয়ে যে পরিপাটি কেশ-প্রসাধন সে করেছে তার কাছে সিঁথির কুমকুম লিপস্টিক বিচিত্রিত অনেক মুখ লজ্জা পাবে। পরনে সাদা ব্লাউজ—সাদা জমি ফিতেপাড় শাড়ি।

ছেলেবেলা মনে পড়ল—মিনার্ভায় শাস্তি কি শান্তি নাটক অভিনয় দেখেছিলেন। তাতে বিধবা মেয়ে 'ভুবন' ভ্রষ্টা হয়ে সাদা থান আর সাদা সায়া ব্লাউজে যে অপূর্ব মোহিনী রূপ ফুটিয়ে তুলেছিল তাকে দেখে নায়ক মেয়ের বাপ চমকে উঠেছিলেন এবং বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে অর্থাৎ মেয়ের মাকে বলেছিলেন—"ভুবনের বিবি-রূপ দেখে এলাম। মেয়ের অলংকার খুলতে সিঁথির সিঁদুর মুছতে কেঁদেছিলে তুমি। ভুবনকে এবার একবার দেখে এসে চক্ষু সার্থক কর।"

সেই রূপের আভাস এখনও সর্বাঙ্গে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে তাড়িয়ে দি। কিন্তু না, তা তিনি পারেন না। হ্যাঁ। তা তিনি পারেন না।

সেদিনও বাত্রে এ মেয়েটিব উপর দারুণ ঘৃণায় তিনি চলে আসতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ছে—ঠিক সেই মুহূর্তেই—কেউ একজন সেই জানালা যে জানালাটা খুলে

মেয়েটি তাঁকে দেখেছিল এবং তিনিও তাকে দেখে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেই জানালায় টোকা দিয়েছিল কেউ। চমকে উঠে শঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি।

তাঁব চোখেব সামনে একটু দূবে মা এবং মেয়ে পবস্পবেব দিকে নিষ্পলক নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিল কযেক মুহূর্ত। চাবটি চোখেব দৃষ্টি থেকেই যেন আতঙ্ক উঁকি মাবছিল।

টোকা বা শব্দ আবও জোবে পড়েছিল। মেযে এবাব আর্ত-কান্নাকাঁদা ছেলেটাকে মাযেব কোলে দিযে বলেছিল—আবও জোবে কাঁদা এটাকে।

কাঁদাতে হযনি—ছেলেটা আপনিই কেঁদেছিল। ছেলেটাকে ভাল কবে দেখেছিলেন এবাব ; বোগা অযত্নশীর্ণ দেহ। দিদিমাব কোল থেকে ভেঙে পড়ে ঝুঁকে মায়েব দিকে হাত বাড়িযেছিল। কান্নাব চীৎকাব ক্রুদ্ধ এবং উচ্চ হযে উঠেছিল।

মেযেটি জানালাব দিকে এগিযে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলেছিল—আপনি একটু নেমে বসুন—এই তক্তাপোশেব নিচটায়। একটু আড়াল দিযে বসবেন। আমি জানালা খুলব—ওবা দেখতে পেলে বিপদ হবে।

সুধাংশুবাবু তাই বসেছিলেন।

মেযেটি জানালা খুলে বলেছিল— কি? কি বলছ কি? এই দাঙ্গাব মধ্যে আমি বাড়ি থেকে পা বেব কবব না।

—নেহি নেহি। মালিক সাব বলিযে দিযেছেন কুছু ডব না কববেন। কুছু ডব নেহি। কোই হামলা হোগা তো হমি লোক দেখে গা।

—আচ্ছা।

— আউব সাহাব তিন চাব বোজ আসবেন না।

—আচ্ছা। বলে দবজা বন্ধ কবে দিযেছিল মেয়েটি।

বাইবেব লোক দুটিব আবও কিছু কথা এবই মধ্যে ছিটকে এসে পড়েছিল ঘবেব মধ্যে। যাব অর্থ—মালিক সাহাব শালোযাব উপব শয়তান খুশি হ্যায। দেখ্না ক্যাযসা এক ঔবৎ কব্জা কবিযেছে।

শেষ কথা শুনেছিলেন—হ্যাঁ তবু বলতে হবে লোকটা জাঁদবেল বটে আব দিলওযাব আদমী।

কথাগুলো আশ্চর্যভাবে অর্থসমন্বিত হযে উঠেছিল তখন সেই মুহূর্তে তাঁব কাছে। তিনি তক্তাপোশ ধাবে গুঁড়ি মেবে মাথা নামিযে বসেছিলেন। প্রথমেই নাকে ভক কবে একটা গন্ধ এসে পৌঁচেছিল। তাবপবেই চোখে পড়েছিল একটি বোতল।

গন্ধ মদেব এবং বোতলও মদেব। কিন্তু মূল্যবান বিলাতী মদেব। ওদিকে কানে আসছিল ওই সব কথাগুলি। মেযেটি বিচিত্র-রূপিণী হয়ে উঠছিল তাঁব কাছে। জানালা বন্ধ কবেই মেযেটি বলেছিল—এবাব উঠুন। বসুন ভাল কবে। আব কেউ আসবে না।

সুধাংশুবাবু উঠে দাড়িয়ে বসেননি, দবজাব দিকে পা বাড়িযে বলেছিলেন—না আমি এবার যাব।

—যাবেন ? চমকে উঠেছিল মেয়েটি। তারপরই তার কপাল কুঁচকে উঠেছিল এবং বলেছিল—যাবেনটা কোথায় ?

—বাড়ি—আমার বাড়ি এখান থেকে খুব দূর নয়।

—সে জানি। কিন্তু তা হলেও এখন যাওয়া যায় না। যাদের ভয়ে এখানে ঢুকেছেন তারা গলিতে রয়েছে।

—তা থাক। সে ব্যবস্থা আমি করব। তার জন্যে ভেবো না তোমরা।

মেয়েটির চোখের পাতা দুটো চকিতে বিস্ফারিত হয়ে যেন ঝলসে উঠেছিল, বলেছিল—অ। তার জন্যে ভাবতে হবে না মানে আপনার জন্যে। তা না হয় ভাবলাম না কিন্তু আমাদের জন্যে আমরা ভাবব তো! না—তাও পাব না!

—মানে ?

—ওরা যখন দেখবে কি জানতে পারবে আপনাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম তখন আমাদের অবস্থাটা কি হবে সেটা ভাবতে পারেন, না পারেন না!

সুধাংশুবাবু সেই মন্ত্রপড়া সাপের মতো মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। রাত্রি দুটো পর্যন্ত বসে থাকতে হয়েছিল। তারা নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল। তিনি মাথা নিচু করে বসেছিলেন। শুধু ওই ছেলেটা ক্রমান্বয়ে কেঁদে গিয়েছিল অশ্রান্ত কান্না।

আর এই বিষাক্তজিহ্বা নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর ক্রোধে বার বার বলেছিল—মর মর, তুই মরে যা।

সুধাংশুবাবু ক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়েই অসহায়ভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

বাইরের গলিপথটাই একরকম দাঙ্গার কেন্দ্র বস্তিটার দক্ষিণ সীমানার শেষ প্রান্ত। গলিটার ও মাথায় এ মাথায় হাঁকাহাঁকি চলছে। কখনও ছুটন্ত মানুষের পায়ের শব্দে ফিসফাস কথায় হাসিতে মধ্যরাত্রি চমকে চমকে উঠছে। কখনও তীক্ষ্ণ শব্দে সিটি বেজে উঠছে।

আর একটু ওপাশ থেকে ভয়ার্ত মানুষের সাড়া উঠছে।

সুধাংশুবাবু ভাবছিলেন—মেয়েটি ঠিকই বলেছিল। বের হয়ে পড়লেই বিপদ ঘটতে পারত।

রাত্রি তখন দুটো বাজতে পনের মিনিট—তখন গলিপথটা নীরব নিস্তব্ধ হয়ে এসেছিল, স্পষ্ট মনে হয়েছিল এবার আক্রমণকারী আক্রান্ত হিংসা ক্রোধ ভয় আতঙ্ক সব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

তাঁর নিজের ডায়রিতে স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় ঘটনা লিখে রাখেন। তিনি ঠিক এই কথাগুলিই লিখে রেখেছেন—আক্রমণকারী আক্রান্ত দু'দলই ক্লান্ত হয়েছে—হিংসা ক্রোধ তার সঙ্গে ভয় আতঙ্ক সব যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন এক আশ্চর্য ঘুম আসে। সে ঘুমের তুলনা ঈশ্বরের করুণার সঙ্গে।

এইবার তিনি উঠবেন ঠিক করেছিলেন।

তাকিয়েছিলেন ওদের দিকে। মেয়েটির মা ঘুমুচ্ছে মেঝের উপর শুয়ে। বিছানাটা খালি পড়ে আছে। মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। লণ্ঠনের আলো

পড়েছিল তার মুখের উপর। মাথাটা ঈষৎ হেলে পড়েছিল পিছনদিকে। মেয়েটির সত্যই একটা মোহ আছে।

কপালের দু'পাশে ঢলকো করে নামিয়ে পিছনে একটি এলো খোঁপা। পরনে ফিতে-পাড় শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউজ। বোজা চোখে কাজলের রেখার আভাস। গলায় বিছেহার, কানে টপ, হাতে চারগাছা করে চুড়ি। শুধু জেগে ছিল সেই ছেলেটা। কাঁদুনে ছেলেটা আর কাঁদছিল না। তার ঘুমন্ত মায়ের কোলে বসে আপনমনে লণ্ঠনের আলোতে খেলা করছিল।

সেই মেয়েই আজ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

১৯৪৮ সাল—আর ১৯৬০ সাল।

আজও দেখলেন সেই আভরণগুলি। কিন্তু বেশভূষার মধ্যে আজ আর প্রসাধন নেই পারিপাট্যও নেই তবে অভ্যস্ত ছাঁদ ছাড়েনি তার বেশভূষা। চোখের পাতায় আজ আর কাজল নেই কিন্তু কোলে কোলে মর্মান্তিক শোকের অসহনীয় দাহ বা হাহাকারের একটা কালো আভাস জেগে উঠেছে।

সুধাংশুবাবু তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিন্তু তাঁর মন চলে গিয়েছিল সেই অতীত কালে—এখন থেকে চৌদ্দ বছর আগে। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মনের মধ্যে স্মৃতিস্মরণে সমস্ত ছবিগুলো পরের পর ভেসে গেল।

মেয়েটির সে রাত্রের ছবি আজও জ্বলজ্বল করছে।

বিধবা মেয়ের ওই প্রসাধন ওই পোশাক, ঘরের তক্তাপোশের তলায় মদের বোতল, সেই অন্ধকার এবং গোলমালের রাত্রেও জানালায় টোকা, তারপর সেই সব কথাবার্তা তার পরিচয়ের কোন একটু স্থানও গোপন রাখেনি। মেয়েটা পরিচয় দিতেও এতটুকু সংকোচ করেনি। পরবর্তীকালে সুধাংশুবাবু চাঁপাকে ভাল করে না হোক—তাই বা কেন মোটামুটি বেশ চেনাই চিনেছেন। হিসেব করে দেখলে বলতেই হবে যে, ওই যে প্রথম রাত্রির সেই চেনা বা দেখা তাই পরবর্তী কালে বেশি করে সত্য এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

না, পরের দিনই ওর আর একটা পরিচয় পেয়েছিলেন। এবং তাতেই সম্পূর্ণ হয়েছিল মেয়েটির পরিচয়।

পরের দিন সকালবেলা তিনি খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন—দেখছিলেন কাল রাত্রের হাওড়ার বস্তির ঘটনা সম্পর্কে কি রিপোর্ট বেরিয়েছে। শাক দিয়ে মাছ যেমন ঢাকা যায় না—মাছের চেহারা দেখা না গেলেও যেমন গন্ধে ধরা পড়ে তেমনিভাবেই একথা আজ প্রমাণিত যে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদের যে ফোড়ন দিয়ে সংবাদব্যঞ্জন পরিবেশন করেন তা থেকে হিন্দুত্বের তেলকাঁটার গন্ধ ওঠে। একটু চেষ্টা করলেই কাঁটা বেরিয়ে পড়ে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'র পুজোকে নামে সার্বজনীন করে তুললেও মিথ্যা এবং

সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি এ জাত পায়নি। ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম বলে ভজন গাইলেও অন্তিম সময়ে গান্ধীজী হায় রাম বলেই বিলাপ করেছিলেন।

সন্দেহটা তাঁর অমূলকও ছিল না। কাগজে সম্পন্ন মুসলমান ভদ্রলোকটির উপরেই প্রথম দোষ চাপানো হয়েছে। তিনি গুলি চালিয়েছিলেন এই খবরটাকেই বড় করে ধরে সুকৌশলে এই ধারণাই সৃষ্টি করা হয়েছে যে গুলি চালানোই হলো গতকালের বস্তি আক্রমণের প্রথম হেতু। এবং একমাত্র হেতু।

বিশেষ কিছু করতে হয়নি ; শুধু মোটা হেডলাইনে ঘোষণা করেছেন—'সাম্প্রদায়িক কলহে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার।' 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনৈক ধনী কর্তৃক চৌদ্দ রাউন্ড গুলি ব্যবহার।' তারপর দেওয়া হয়েছে—'দলবদ্ধভাবে উত্তেজিত অপরপক্ষ কর্তৃক বস্তির উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ। গৃহে অগ্নিসংযোগ। সমস্ত বস্তিটি ভস্মীভূত।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে কাগজখানার ওই ছাপা লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং গত রাত্রের সেই ভয়াবহতা স্মরণ করেছিলেন। হঠাৎ নজরে পড়েছিল বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরে একটি মেয়ে চলে গেল। একটি গলিপথ ধরে মেয়েটি রাস্তার উপর পড়ল এবং হাত তিরিশেক সোজা হেঁটে গিয়ে ওপারের একটা গলিপথে ঢুকে গেল।

পরনে ফিতেপাড় শাড়ি---সায়া-ব্লাউজও আছে কিন্তু তা সাধারণ—তাঁতে কোন ফ্যাশন নেই; পিঠের উপরে পড়ে আছে ভিজে একপিঠ চুল; তাতে চিরুনি দেওয়া হয়নি, চুলগুলি এখনও ভিজে; মেয়েটি সদ্য স্নান করেছে। পাশ থেকে মনে হলো চিরুনি দেওয়া না হলেও কেশবিন্যাসের একটি ছাঁদ অনেক দিনের পাট ও ইস্ত্রি করা জামার হাতা বা পেন্টালুনের পায়ার দাগের বা ভাঁজের মতো কায়েমি হয়ে গেছে। বুকখানা ধ্বক করে উঠেছিল তাঁর।

এই তো সেই মেয়ে। সেই কালকের রাত্রের মেয়ে।

চঞ্চল হয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কাগজখানা ফেলে দিতে দিতেই কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

এ কি করছেন তিনি! মেয়েটি ততক্ষণে উত্তরমুখে ওপারে গিয়ে পশ্চিমদিকের একটা ছোট রাস্তার মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ, বোধ করি মিনিট তিনেক পর তিনি নিজেকে আর সংবরণ করতে পারেননি—দ্রুতপায়ে পথের উপর নেমে এসে, এগিয়ে গিয়ে, যে-রাস্তায় মেয়েটি মোড় ফিরেছে সেই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আর দেখতে পাননি। পশ্চিমমুখো রাস্তাটা প্রায় গজ পঞ্চাশেক গিয়ে একটা বাঁক বেঁকেছে—ততদূর পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তার আর কোন সন্ধান মেলেনি। রাস্তায় তখনও খুব লোকজনের সময় নয় এবং ওদিকটা একটু নির্জনও বটে। দুই রাস্তার মোড়ের উপর যে-বাড়িটা সেটা বর্ধিষ্ণু ধনীজনের বাড়ি, বাড়ির গেটে পাহারা আছে—গুর্খা দারোয়ান আছে—পালা করে পাহারা দেয়। সেই ফটকটার সামনে কলরব করছিল দাঙ্গায় বস্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া একদল মানুষ। অবশ্যই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক। এই ভোরবেলা থেকে

হতভাগ্যেরা ক্ষুধা অনুভব করছে। ছেলেগুলো কাঁদছে চেঁচাচ্ছে—বয়স্কেরা কাতরভাবে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে—মধ্যে মধ্যে হাঁকছে—বাবু! বাবু! বাবুমশা—য়!

আজও মনে পড়ছে দুটো কুকুর কয়েকটা কাক দুটো গরু এবং ময়লা টব মাথায় করে একজন জমাদারনী চলে যাচ্ছিল; এ ছাড়া আর লোক ছিল না রাস্তাটায়। রাস্তাটা ছোট রাস্তাই বটে। আগে এ রাস্তায় সবটাই বস্তি ছিল—এখন এই মোড়ের দিকটা ভেঙে খান দুই-তিন বড় বাড়ি তৈরি হয়েছিল কিছুদিন আগে। পর পর দু'খানা বাড়ির মালিকেরা যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে ওঠা বড়লোক।

এরই মধ্যে কোথায় যে গেল মেয়েটি, ভেবে পেলেন না তিনি। রাস্তার মোড় থেকে পর পর তিনখানা বড় বড় বাড়ি। তারপর রাস্তাটা আর রাস্তা নেই, একটা নোংরা গলিপথে পরিণত হয়েছে। তার দু'দিকেই বস্তি। এ সেই পুরনো কালের বোধ করি মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে প্রতিষ্ঠা করা বস্তি। বস্তির ভিতরের রাস্তাটা বারো মাস কাদা হয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দুর্গমতম জায়গায় ইঁট পাতা। মাথার উপর সূর্য এলে তবে কিছুক্ষণের জন্যে রোদ্দুর নামে। এখানকার বাড়িগুলো বা ঘরগুলো বাড়িও নয় ঘরও নয়—ঝুপড়ির মতো একটা অন্ধকূপ। মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে মেয়েরা, পুরুষদের মাথা নুইয়ে থাকতে হয়। এবং এই বস্তিতে যারা থাকে তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। তাদের সঙ্গে তো এই মেয়ের কোন মিল নেই। এ বস্তিতে থাকে এদেশী ঘরামীর দল, কিছু রাত্রে তার-কাটা ডাকাবুকো ছেলে, কিছু হিন্দুস্থানী মজুর আছে তারা মাটি কাটে, কিছু ওড়িয়া মজুর থাকে। একদিকের অংশটায় কিছু রাজমিস্ত্রী এবং মজুর মজুরিণী থাকত, তাদের এলাকার শেষে বিচিত্র সেই ইরানী বেদেরা এসে তাঁবু গেড়ে মধ্যে মধ্যে আড্ডা গাড়ত। এদের মধ্যে আরও আছে—খুনে গাটকাটা চোর, বে-আইনী গাজা আফি মের কারবারী। এরা এখানকার পাক্কা বাসিন্দে নয় তবে একটা করে লুকোবার আড্ডা পেতে রেখেছে।

এই মেয়ের কাল রাত্রে যে-চেহারাই দেখে থাকুন সে-চেহারার সঙ্গে বস্তির বাসিন্দেদের কোন মিল নেই। ওই বস্তিতে সে গেল কোথায়? বিশেষ করে আশ্চর্য লাগল এই যে, মেয়েটি স্নান করেছে এই সকালে এবং পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড় ধুতি পরে বেরিয়েছে। যার মধ্যে শুচিশুদ্ধতার একটি আভাস আছে। ওই বস্তিতে যারা থাকে তারা থাকে—তাদের কথা আলাদা কিন্তু যারা থাকে না তারা ওই বস্তিতে ঢুকলে বেরিয়ে এসে স্নান না করে মনে মনে অশুচির অশান্তি অনুভব করবে। স্নান করে ওই বস্তির মধ্যে ঢোকা অসম্ভব তাতে তার সন্দেহ নেই।

এ মেয়ে কালকের সেই মেয়ে কিনা তাই নিয়ে কৌতূহলের তাঁর অন্ত ছিল না। কেন যে সে কৌতূহল জেগেছিল সে প্রশ্ন সেদিন করেননি—আজ কিন্তু না করে পারলেন না।

না। তা নয়। কোন আকর্ষণ ছিল না।

শুধু কৌতূহল। চকিতের মতো মেয়েটির মুখের একপাশ দেখে তিনি চমকে উঠে

বারান্দা থেকে নিচে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ততক্ষণে মেয়েটি তাঁকে পিছনে ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে গিয়ে চাটুজ্জেদের বাড়ি যে রাস্তায় সেই রাস্তায় মোড় নিয়েছে। তার পিছনটা দেখে মনে হয়েছিল, এ মেয়ে সেই মেয়ে। কাল রাত্রে সেই আধো অন্ধকার ঘরখানা ও বারান্দার মধ্যে তাকে চলতে ফিরতে যতটুকু দেখেছেন তার সঙ্গে এ মেয়ের চলনের, পিছনদিকের আশ্চর্য মিল। তাই তাঁকে কৌতূহলী করেছিল সেদিন। রাস্তার উপর নামিয়ে এনেছিল। রোমান্স কিছু ছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে গতরাত্রে যে-পরিচযটি তার পেয়েছিলেন সে-পরিচয়টা না পেলেই ভাল হত। এবং কৌতূহলটা অহেতুকভাবে মাত্রা ছাড়িয়েছিল। আজও মনে রয়েছে তিনি ফিরে আসেননি, এগিয়েই গিয়েছিলেন। দু'পাশে তিনখানা বড বাডি। সব থেকে বড় বাড়িটা পুরনো অনেকদিনের, তাদেরই বাডির সামনে খানিকটা জায়গা আছে, ফটকে দারোযান আছে। বাডির সামনে ভিখিরীর দল দাঁড়িযে আছে। বিপরীত দিকে পাকা বাডি দু'খানা এবং অপেক্ষাকৃত নতুন। ওই বস্তি ভেঙেই এ দু'খানা তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। এরা একই বংশের তিন শরিক। লোহালক্কড়ের ব্যবসা আছে, কারখানা আছে। বস্তি আছে। নতুন বাড়ির মালিক যারা তারা অল্প অংশের শরিক কিন্তু তারা মডার্ন—যুদ্ধের সময় কন্ট্রাক্টারী করে নতুন ভাগ্য তৈরি করেছে।

বেশি দূরে না, অল্প খানিকটা যেতেই হঠাৎ তাঁর ঠিক সামনেই ওই দু'খানা বাডির দ্বিতীয় বাড়িটার দরজা খুলে মেযেটি বেরিযে এসে থমকে দাঁডিয়েছিল দাওয়া বারান্দার উপর। মেযেটি বোধ হয প্রত্যাশা করেনি যে, তিনি এতদূর এগিযে তাকে দেখতে আসবেন। সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রীমতী মেয়ে। তখন বয়স বোধ হয় বাইশ-তেইশের বেশি ছিল না। পূর্ণ যৌবন তখন। কিন্তু সর্বাঙ্গে অপুষ্টির শীর্ণতা ছিল। কিন্তু মুখে একটি সকরুণ কিছুর আবেদন ছিল। নারী পুরুষকে যে লাবণ্য দিয়ে আকর্ষণ করে সে লাবণ্যকে আরও যেন বেশি মিষ্ট করে তুলেছিল।

মনে পড়ছে আগের দিন রাত্রেব তার যে কেশবিন্যাস, তার যে ছন্দ সে তাব স্নান করা এলো চুলের মধ্যেও জডিযে এবং ছড়িয়ে ছিল। শুধু চুলে কেন তার স্নান করা তেলচকচকে কপালে, তার চোখের কোলেও কি কিছু ছিল না যাকে গত রাত্রের পরিচয়ের আভাস বলা চলে ? ছিল, কিন্তু তাকে আজকের মতো প্রেতিনীর পরিচয় বলে ধবে নেওয়া যেত না। মেয়েটির মুখ সেদিন মুহূর্তে বিবর্ণ হযে গিয়েছিল। যাকে বলে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' তেমনিভাবে দাঁডিয়ে ছিল তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে। তার ভাঁজকরা বাঁহাতের চেটোর উপর একটা পিতলের থালায় কিছু ছিল। আধ মিনিটখানেক লেগেছিল তার আত্মসংবরণ করতে। তারপরেই তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। শ্যামবর্ণ মেয়ে—মাধবীর টকটকে কচি পাতার মতো হয়ে উঠেছিল মুখখানার রঙ। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে ডানহাত দিয়ে বাঁ হাতের থালাখানাকে নামিয়ে কতকগুলো বাসী ফুল আর বেলপাতা একখানা শালপাতায মুড়ে বাড়িখানার দক্ষিণে বস্তির পাশ দিয়ে গরু দুটোর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন

ফিরে গিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। একসঙ্গে ছুটে এসেছিল গরু দুটো—ওদিক থেকে কুকুরটা এবং পথের কাক কয়েকটাও লাফ মেরে মেরে এগিয়ে এসেছিল।

এরপর ব্যাপারটা এবং মেয়েটির পরিচয় আর খুব অস্পষ্ট মনে হয়নি। মেয়েটি এ বাড়ির নয়—এ বাড়ির মেয়ে ওই ভাঙা একতলা বাড়িতে নিশ্চয় যাবে না, যাবার কথা নয়। ওইটেই হয়তো ওর বাড়ি, এ বাড়িতে সকালে এসেছে কাজ করতে। এ বাড়ির পুজোর বাসী ফুল ফেলা বোধ করি ওর প্রথম কাজ। পুজোর বাসী ফুল তাতে ভুল নেই নইলে ফুলের মধ্যে জবা থাকত না এবং তার সঙ্গে বেলপাতা থাকত না।

হায় দেবতা তোমার ভাগ্য! এবং তোমার শুচিতার কপাল!

ফিরে এসেছিলেন তিনি সেদিন। প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েই ফিরে এসেছিলেন। তবুও সুনিশ্চিত হতে লেগেছিল আরও কিছুদিন। কারণ সেদিন রাত্রে তার সেই আচরণ—যে-আচরণ অন্তত সে তাঁর সঙ্গে করেছিল তার মধ্যে তো কোন গ্লানি ছিল না। তিনি তাকে বিপন্ন হয়ে আশ্রয় চেয়েছিলেন—সেও তাঁকে সেই আশ্রয়ই দিয়েছিল। কোন সংকীর্ণতা তার মধ্যে ছিল না। এবং সারাটাক্ষণ—সে তো কম সময় নয়—রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে প্রায় দুটো পর্যন্ত সাড়ে তিন ঘণ্টা। এর মধ্যে সে তাঁর দিকে কি একবারও অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল?—না। এবং পরের দিন সকালে ওই দাওয়ায় দাঁড়িয়ে তার ওই যে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ার সবিনয় অপরাধ স্বীকৃতিকে তিনি তো অপবিত্র অশুচি বলে মানতে পারেননি। তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে আর মেয়েটিকে দেখতে পাননি। তিনি সকালে উঠে খবরের কাগজ হাতে তাঁদের বাড়ির বারান্দায় এসে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন—কিন্তু সে আসেনি। দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন বুঝতে পেরেছিলেন সে যায় না—তার বদলে যায় একটি আধবয়সী বিধবা মেয়ে। একটু লম্বাটে মাথায়, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে ব্লাউজ সায়া নয় শুধু শেমিজ; শেমিজের উপর আধময়লা থান কাপড পরে মেয়েটি ঠিক ওই সময়েই তাঁর সামনে দিয়ে গিয়ে ওই রাস্তায় ঢোকে। চতুর্থ দিন সুধাংশুবাবু তাকে অনুসরণ করেছিলেন। এবং দেখেছিলেন এ মেয়েটিও ঠিক সেই বাড়িতে ঢুকে সর্বপ্রথম পুজোর থালা হাতে বাসী ফুল বেলপাতা ওই সেই গরু দুটোর মুখে দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ঢুকেছিল গিয়ে। চিনতে বাকি থাকেনি এ বিধবা তারই মা। তার সঙ্গে আরও একটা ছোট সত্য তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল যে, ওই গরু দুটো ওই ভোরে এসে ওই ফুল বেলপাতাগুলোর লোভেই এই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

দিন পনের পরে আবার একদিন সকালে দেখেছিলেন মেয়েটিকে। সেদিন আর তিনি উৎসুক হননি। একবার মুখ তুলে দেখে আবার মুখ নামাতে চেষ্টা করেছিলেন খবরের কাগজের উপর। কিন্তু তাও পারেননি। বসে থেকেই আবার চোখ তুলে দেখতে চেয়েছিলেন সেই মেয়ে কিনা এবং সে গলির ভিতর মোড ফিরল কিনা।

বিস্মিত হয়েছিলেন। মেয়েটি মোড়ে মোড় ফিরতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল তার তাঁরই উপর।

তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

এরপর পরপর দিন তিন-চার এসেছিল মেয়েটি। রবিবার পড়েছিল একদিন—অর্থাৎ কোর্ট ছিল না। সেদিন প্রায় বেলা বারোটার সময় মেয়েটিকে ফিরে যেতেও দেখেছিলেন। যাবার সময় মেয়েটির দৃষ্টিতে সতর্কতার প্রচ্ছন্ন আড়ালে যৌবনের আহ্বান উঠেছিল যেন। বাঁকা চাউনির মধ্যে যেমন সে দেখছিল কে তাকে অনুসরণ করছে—কে তার গা ঘেঁষে চলতে চেষ্টা করছে তেমনি ছিল ঠোঁটের কোণে ক্ষুরের ধারের মতো হাসি। সেই রবিবার দিন বেলা চারটার সময় আবার এসেছিল ও একবার। এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গিয়েছিল।

আরও কিছুদিন পর পূর্ণ পরিচয় মিলেছিল।

বোধ হয় আর মাস ছয়েক পর। একদিন ওই লম্বামাথায় বিধবাটি, সেদিন রবিবার, সেই সকালেই এসে তাঁর বারান্দার উপর উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—বাবু!

একান্ত অপরিচিতের মতো তিনি বলেছিলেন—কি চাই?

হাত জোড় করে মেয়েটি বলেছিল—আমরা বড গরীব বাবা। আমার এই কাগজটি যদি দয়া করে দেখে দেন। আপনি উকীল।

বিধবার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাংশুবাবুর মায়া হয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুপকারের একটি সুযোগ পেয়েও তিনি খুশি হয়েছিলেন। হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে দেখেছিলেন। হাওড়া মুনসেফী আদালতের একখানা সমন। তার সঙ্গে খান পাঁচ-ছয় কাগজ জুড়ে একটা নালিশের আর্জির নকল।

কোন এক মৃত প্রণবকুমার চক্রবর্তীর ওয়ারিশন নাবালক পুত্র স্বপনকুমার ও তস্য অভিভাবিকা মাতা মৃত প্রণবকুমারের বিধবা পত্নী রত্নমালা দেবীর উপর পাঁচশো কয়েক টাকা কয়েক আনা হ্যান্ডনোট দরুন পাওনা বাবদ নালিশ করেছেন কোন এক বি. এন. মালিক—ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি. এন. মালিক অ্যান্ড কোং।

—কে? এই রত্নমালা কার নাম?

—আমার সেই হতভাগী মেয়ের নাম বাবু।

—কার?

—চাঁপার। তাকে দেখেছেন আপনি। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললে কথা ক'টি।—স্বপন ওর সেই ছেলেটা। ডাকনাম নীলু।

মনে পড়েছিল ডেঁয়ো পিঁপড়ের কামড়ে বিক্ষত সেই কান্নায় পৃথিবী মাথায় করা হাড়জিরজিরে ছেলেটার কথা।

হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন—তোমাদের নেবে কি? বাড়িটা কি তোমাদের? মানে প্রণবকুমারের?

—বাড়িটা আমার স্বামীর ছিল বাবা—তা সেও তো বাঁধা দেওয়া আছে। প্রণবকুমারের নয়। প্রণবের কিছু ছিল না বাবা, কিছু রেখে যায়নি।

ইতিমধ্যে মক্কেল এসে পড়েছিল। সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—দেখ এখন তো আমার সময় হবে না। আর মামলার দিনও এখন দূরে। অন্য একসময় আসতে হবে। বুঝেছ—

বিধবা বলেছিল—আমরা বড় গরীব বড় অসহায় বাবা—দয়া করে যদি কমসম নিয়ে—

সুধাংশুবাবু কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলেন—দেখ, সেদিন তোমরা আমার উপকার করেছ। সত্যিই উপকার করেছ—

—না না বাবা—

—থাম। যা বলছি, শোন। আমি নিজে তো দেওয়ানী মামলা করি নে। আমি সব শুনব—শুনে যদি সামান্য ব্যাপার হয় তবে আমিই করে দেব। নেব না আমি কিছু। বুঝেছ। তবে জট-পাকানো কেস হলে যাতে অল্প খরচে হয় সেইভাবে ব্যবস্থা করে দেব। তুমি সন্ধ্যেবেলা এস। ঠিক সন্ধ্যের মুখে মুখে।

উপকারের কিছু প্রত্যুপকার করতে চেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু। সেদিনের রাত্রের সে উপকার তো অস্বীকার করা যায় না। সেদিন রাত্রে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে তিনজন মাথায় লাঠির আঘাত পেয়েছিল। একজন ছুরি খেয়েছিল হাতে। তাঁদের দলের সেই ছোট ছেলেটি যে প্রথম বোমা ছুঁড়েছিল সে নিজের বোমার লোহার টুকরোয় আহত হয়েছিল—তার উপর কেউ তার হাতখানা দুমড়ে ভেঙে দিয়েছিল—তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল। তিনি এবং আর দু'জন ফিরেছিলেন আহত না হয়ে, কোন আঘাত না খেয়ে।

এ ছাড়াও পরের দিন থেকে বিপক্ষপক্ষ যাদের মধ্যে ধর্মান্ধ কুশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর বাড়ির সামনে অনেক বোমা বা পটকা ফেটেছে; দেওয়ালে অনেক কুশ্রী বিশ্রী স্লোগান লেখা হয়েছে; ভয়ও অনেক দেখানো হয়েছে। রাস্তার লোকেরা মধ্যে মধ্যে টিটকারিও কেটেছে। তার জের আজ এই আট-ন' মাসেও শেষ হয়নি। হয়তো বা আবার কোনদিন রাজনৈতিক কৌশলে বা প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতার আগুন আবার জ্বলবে—এবং সেদিন আবার তাঁর বাড়ির সামনে তাণ্ডবের পুনরাবৃত্তি হবে। এবং এখনও এদেশে অনেক মুসলমান আছে—এমন কি ওই বস্তিটার খানিকটা অংশে এখনও আছে, সেখানেই আবার আক্রমণ শুরু হবে। এর মধ্যেও তিনি ওই মেয়ে দুটির উপকারকে এতটুকু খর্ব করে দেখতে পারেননি। এদের সম্পূর্ণ ভিতরটা সেদিন তিনি দেখে এসেছেন এবং বাইরেও এরা মলিন এবং ভীরু। এদেরকে নীতিগতভাবে স্নেহ কোন মতে হয়তো করা যায় না—কিন্তু এরা বড় দরিদ্র। শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্যই নয়, কোথায় যেন একটা মনুষ্যত্বের দারিদ্র্যেও এরা বড় দরিদ্র।

সেই কারণেই মমতা হয়েছিল এবং প্রত্যুপকারও করতে চেয়েছিলেন সুধাংশুবাবু।

সে সময় সে চলে গিয়েছিল এবং কথামতো সন্ধ্যেবেলা আবার এসেছিল। এবার একলা আসেনি। সঙ্গে এসেছিল ওই মেয়ে। এবং সেদিনের সেই কাঁদুনে ঘ্যানঘেনে ছেলেটি। মা ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল। কোলে থেকেও সে কাঁদছিল। সেই খুনখুনে কান্না। এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ। এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ!—এ্যাঁ—!

নিরন্তর একটা অভিযোগ যেন শূন্যমণ্ডলে বাতাসের প্রবাহের মতো বয়ে চলেছে ওর জীবনে। আপিসঘরের একদিকে তখনও পর্যন্ত একখানা পুরনো কালের তক্তাপোশ পাতা ছিল, আর টেবিলের সামনে ছিল খানকয়েক চেয়ার। সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—বস।

তারা ইতস্তত করে ভাবছিল কোথায় বসবে।

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—চেয়ারে বস।

—না, আমরা এই মেঝের উপর বসি। বলেছিল মা।

—না না। ওই তক্তাপোশে বস তাহলে। হ্যাঁ বস।

মেয়েটি বসেছিল। মা বসেনি। সে মেয়ের সেই রুগ্‌ণ ছেলেটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল। মেয়ে মাকে বলেছিল—বস্। উনি বলছেন তো বসতে। আমবা তো ছোটলোক নই।

মা এবার মেয়েকে সামনে করে তার পিছনে বসেছিল। আপিসঘরে একশো ওয়াটের বাল্‌ব্ জ্বলছিল। তার আলো পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল মেয়েটির উপর।

আজও সেই মেযে এসে দাঁড়িযেছে তাঁর সামনে। পিছনে তার বর্ষাকালের কৃষ্ণপক্ষেব অন্ধকার; সামনের রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো আজ জ্বলছে না। জ্বলে না আজকাল—হয় বাল্‌ব্ যায় নয় তার যায়, নয় আলোর সুইচ অন করার দায়িত্ব যাদের তারা জ্বালে না।

চাঁপা ওরফে রত্নমালা। বারো বছর পর তাঁর সামনে তাঁরই বসবার ঘরের আলোর সামনে দাঁড়িযে আছে। ঘবে আজ নিওন জ্বলছে। নিওনের স্বপ্নালু আলোর ছটায় ওই অন্ধকার পটভূমির সামনে ওকে আজ প্রেতিনী মনে হচ্ছে। বারো বছর পর আজ ওর বয়স চৌত্রিশ বা পয়ত্রিশ। পূর্ণ যৌবন ওব সারা অঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়িযে আছে। পদ্মফুলের মতো দেখতে ও নয়—সে রূপ ওর নেই—তবে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে পদ্ম যেমন প্রস্ফুটিত অবস্থায বেশ কিছুদিন থাকে, ওর লাবণ্য-যৌবনও তাই—যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু সারা অঙ্গে সেই যৌবনরূপের ছন্দের মধ্যে এমন বিন্যাস আছে যা পুরুষচিত্তকে প্রলুব্ধ করে; কিন্তু লোভকে যে সংযত করতে পারে তার কাছে মনে হয় অশ্লীল। নারী যখন সারা অঙ্গে নিমন্ত্রণের সজ্জা চাপায় তখন তাকে নির্লজ্জা হতে হয়। এ মেয়ে অন্তত আজ আঠারো বৎসর বিধবার আবরণের উপর দেহব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন বহন করে চলেছে। সেই বিজ্ঞাপন বহন-করা যৌবনবতী চাঁপাকে প্রেতিনী ছাড়া কি মনে হবে তাঁর!

ওঃ!

সেদিনের সেই ক'টা কথা যেন স্তব্ধ পৃথিবীর কোন এক নিশীথরাত্রে এক কালো ইস্পাতে তৈরি নারীমূর্তির কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়নি। সে কথা ক'টা সুধাংশুবাবু আজও ভুলতে পারেননি।—"বসুন, জাত যাবে না।"

বারো বছর আগে সেই সেদিন রাত্রে।

মনে পড়ছে মেয়েটিই এগিয়ে এসে তাঁর টেবিলের উপর আদালতের সমন আর্জির নকল এবং তার সঙ্গে দশটাকার একখানি নোট নামিয়ে দিয়েছিল।

দশটাকার নোটখানা আঙুল দিয়ে ঠেলে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—ওটা রাখো।

মেয়েটি নম্রভাবে বলেছিল, আবারও দেব—

মাঝখানে বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—না।

মেয়েটি বিপন্নের মতোই নোটখানা হাতে করে নিয়ে টেবিল ধরে দাঁড়িয়েছিল।

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—তক্তাপোশে গিয়ে বস। হ্যাঁ। তারপর বল তো বিবরণ। তোমার স্বামীর নাম প্রণবকুমার চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ।

—তিনি টাকা ধার করেছিলেন—

হঠাৎ মেয়েটা লেজে পা-দেওয়া সাপের মতো ঝাপটা মেরে পিছন ফিরে ছোবল দেবার ভঙ্গিতেই ওর বাচ্চা ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠ্যালা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল। এক মুহূর্তে কোথায় চলে গিয়েছিল তার বিনম্র মিষ্ট কণ্ঠস্বর, বিনীত কথার ভঙ্গি, রুক্ষতর আক্রোশভরা কণ্ঠস্বরে বলে উঠেছিল—দূর হ আপদ কোথাকার! সে কথাগুলো সত্যিই অবিস্মরণীয়-রূপে নির্মম এবং নিষ্ঠুর। ছেলেটার অপরাধ—সে পিছনে দিদিমার কোল থেকে খুনখুন করতে করতে এগিয়ে এসে মায়ের পিঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো বা কাঁধের উপর ফেলা আঁচল ধরে আকর্ষণও করে থেকেছিল। মা সেটুকুও সহ্য করেনি...তাকে 'দূর হ আপদ' বলে সাপের ছোবলের মতো ছোবল দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। ব্যাপারটার ওজন ঠিক কতখানি তা বলা সহজ নয়। যা ঘটেছিল তা না ঘটলে ঠিক এমনভাবে মনে দাগ কাটত না। বছর চারেক বয়সের রুগ্ন দুর্বল শিশু; মায়ের হাতের ঝাপটায় টলে পড়ে গেল এবং পড়ে গেল তক্তাপোশের উপর থেকে মেঝেতে। সঙ্গে সেই সেই-রকমের মতো কঠিনতম প্রতিবাদ এবং তার সঙ্গে সম্ভবত করুণতম অভিযোগ জানিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল সে।

দিদিমা প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে ছেলেটাকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নিয়েছিল। সুধাংশুবাবু প্রায় আপনা-আপনি বলে উঠেছিলেন—আহা-হা! কিন্তু এই আশ্চর্য মা বলে উঠেছিল—মর মর মর। মরে যা তুই মরে যা!

মুহূর্তে বোমার মতো ফেটে পড়েছিলেন সুধাংশুবাবু। এই নির্লজ্জা মেয়েটার এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা তাঁর কাছে শুধু অসহ্যই মনে হয়নি—তাঁর সমস্ত ক্রোধকে আকস্মিকভাবে একমুহূর্তে পুঞ্জীভূত করে একটা সংঘাতের উত্তাপে ফাটিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলে উঠেছিলেন—এ—ই নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার!

দিদিমা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে চাপড়ে আদর করে থামাতে চাচ্ছিল। ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। এই চীৎকার-করা তিরস্কারে মেয়েটি চমকে উঠে বিবর্ণ পাংশুমুখে তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

কিছুটা নিজেকে সংযত করে তিনি বলেছিলেন—এমনি করে তুমি ছেলেটাকে ফেলে দিলে?

ছেলেটা তখনও কাঁদছে তারস্বরে।

তিনি তাকে দোষ দেননি। তার জীবনে বঞ্চনার আর শেষ নেই। এই মা বোধহয় তাকে স্তন্যেও বঞ্চিত করে রেখেছে।

মেয়েটা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে তা স্বীকারও করলে।

সুধাংশুবাবুব কথা শুনে মেয়েটা এবার স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। তার স্থিরদৃষ্টির সম্মুখে সুধাংশুবাবুর একবিন্দু অস্বস্তি অনুভব করার কথা নয় এবং তার পক্ষেও এই অভিযোগের সম্মুখে এমনভাবে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাও সম্ভবপর স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মেয়েটা বোধ করি অস্বাভাবিক। সে তাকিয়েছিল। যার জন্য সুধাংশুবাবু তাঁর অভিযোগকে আরও জোরালো করে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে বলেছিলেন—সেদিন রাত্রেও আমি দেখেছি তুমি ওই শিশুটার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কর—মর্মান্তিকভাবে অভিসম্পাত কর।

মেয়েটা তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কঠিন অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—ও আমার পথের কাঁটা।

একটু থেমে বোধ করি ভেবে নিয়েই বললে—ও আপনি বুঝবেন না—ওই আমার বন্ধন। ও ছিঁড়লেই আমার মুক্তি। ওকে উপড়ে ফেলতে পারলেই আমার পথ পরিষ্কার।

এর আর উত্তর খুঁজে পাননি সুধাংশুবাবু। নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়িয়ে মাকে বলেছিল—নে উঠে আয়।

মা সকাতরে বেশ ভয়ের সঙ্গেই অনুরোধ করেছিল মেয়েকে—চাঁপা!

—না। উঠে আয়।

মা উত্তর দিতে পারেনি। মেয়ে বলেছিল—তবে তুই থাক আমি চললাম। বলে মায়ের বুক থেকে কান্নায় ভেঙেপড়া ছেলেটাকে কাঁধের উপর ফেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর দাঁড়ায়নি বা কোন একটা কথাও বলেনি।

মেয়েটির মা হাত জোড় করে বলেছিল— কিছু মনে করবেন না বাবা। আমার মেয়ে সম্পর্কে আমার বলবার মুখও নেই কথাও নেই। দিনরাত জ্বলছে বাবা, আগুনের মতো জ্বলছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আক্রোশ। সব থেকে বেশি ওই ছেলেটার উপর। হতভাগার অদৃষ্ট—একবছর বয়সে বাপ খেয়েছে। অবহেলার শেষ নেই। তবু—।

বাইরে থেকে ডাক এসেছিল—মা! দাঁড়িয়ে থাকব কত?

সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—আচ্ছা তুমি যাও। কোন দেওয়ানী উকীলের কাছে যেয়ো। সামান্য কেস বলেই মনে হচ্ছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

সকাতর দৃষ্টিতে মার্জনা ভিক্ষা করে নিয়ে মা চলে গিয়েছিল।

পরের দিন সকালবেলা আবার বিধবাটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে চলেছিল ওই চাটুজ্জেদের বাড়িতে। থমকে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেও একটুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তারপর চলে গিয়েছিল চাটুজ্জেদের বাড়ি। কথাবার্তা বলতে বোধ হয় ভরসা করেনি। সুধাংশুবাবুর ইচ্ছে হয়নি।

২

এতবড় ঘটনাটা না ঘটলে মেয়েটিকে তাঁর মনে থাকত না। একটা আবরণ পরে ওকে আড়ালে ফেলে দিত। নিত্য যে সব লোক তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে—অথচ তিনি তাদের চিনেও চেনেন না—তাদের ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যেত। কিন্তু ওর ওই দু'দিনের আচরণের মধ্যে এমন একটি ক্ষুব্ধ মনের উত্তাপ ছিল যার ছেঁকো লাগার স্মৃতিটুকু তিনি ভুলতে পারেননি। তার উপর এই মা অথবা ওই মেয়ে দু'জনের কেউ-না-কেউ নিত্য ভোরবেলা তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে স্নান সেরে শুচিশুদ্ধ হয়ে চাটুজ্জেদের বাড়ি কাজ করতে গিয়েছে। আজ আর মা নেই কিন্তু মেয়ে আজও যায়। পরনে শৌখিন সায়া-ব্লাউজ, পরিচ্ছন্ন ফিতেপাড় শাড়ি, ভিজে এলো চুলে বিগত রাত্রির একটি বিলাসছন্দের চিহ্ন তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে যায় বা মনে রাখিয়ে দেয়—ভুলতে দেয় না। আজ বারো বছর যাচ্ছে। ভোরবেলা যায়, ফেরে যখন, তখন তিনি কোর্টে চলে যান, ছুটির দিন দেখেন এগারটায় ফেরে। এই বারো বছরে—হ্যাঁ বারো বছরই হলো; দাঙ্গার ঘটনাটা ১৯৪৮ সালে আর আজ হলো ১৯৬০ সাল। এই বারো বছরে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। এবং ক্রমে ক্রমে মেয়েটার যেসব পরিচয় পেয়েছেন তাতে ওর এই প্রেতিনীত্ব সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হয়েই একটি কঠিন বিরূপতা পোষণ করে আসছেন। ওর সেদিন রাত্রে করা উপকারটুকু তাঁর গলায় কাঁটার মতো বিঁধে আছে। এবং এরপর যেসব আচরণ দেখেছেন তাতে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধই হয়েছেন তিনি। সেই ক্ষোভ এবং বিস্ময় বশতই ওকে জানতে চেয়েছিলেন। বিচিত্রভাবে জেনেছিলেন।

এক শিবেন ভট্টাচার্যের মেয়ে। শিবেন ভট্টাচার্যকে লোকে ভুলে গেছে। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা-করা দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্ রয়েছে; শুধু রয়েছেই নয় বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে।

অল্পবয়সে অনেক টাকা হাতে পেয়েছিল শিবেন। পেয়ে একেবারেই মডার্ন হয়ে উঠল। বাপ ছিলেন মোক্তার। কৃতী মোক্তার। তাঁর বাবা ছিলেন খাঁটি ভট্টাচার্য। গ্রাম থেকে হাওড়া শহরে এসেই ওই পৌরোহিত্য করেই ভটচাজবাড়ির ভিত গেড়েছিলেন। দেশে জমিজেরাতও কিনেছিলেন।

শিবেন ভটচাজের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের কাছেই জেনেছিলেন। নিত্যবাবু। ওই প্রথম ঘটনার বছর দেড় কি এক বছর আট-ন' মাস পর নিত্যবাবু এসে তাঁর প্রতিবেশী হয়েছিলেন। এবং সুধাংশুবাবু কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করলেও নিত্যবাবুই নিজে

থেকে 'হায় হায়' করে মেয়েটি সম্পর্কে কোনদিন আক্ষেপ, কোনদিন বা কটুভাষায় বিক্ষোভ প্রকাশ করে, মেয়েটির বাপ ওই শিবেন ভট্টাচার্যের কথা বলে যেতেন। বলতেন—সইল না। বুয়েচেন না? সইল না। ভট্টাচার্য বামুনের বংশ। একেবারে সেই ইতুসংক্রান্তির বামুনের ঘরের মতো। বুয়েচেন না? নিত্যবাবুর মুদ্রাদোষ ছিল ওই বুয়েচেন না? বুলিটি।

ইতুসংক্রান্তির ব্রতকথার দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পই বোধ হয় পুরনো বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বুইজন ব্রাহ্মণের গল্প। এক ছিল ব্রাহ্মণ আর তার ব্রাহ্মণী—আর দুটি ছেলে কি গণ্ডা দুয়েক ছেলে-মেয়ে।

এক ছিল রাজা আর তার সুয়ো-দুয়ো দুই রানী—এ গল্প বোধ হয় এদেশের বামুনদের নয়! দু'দশ ঘর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল তারা জমিদার-টমিদার ছিল। বামুনের কপাল খুলল ইংরেজ আমলে।

নিত্যবাবুর ব্যাখ্যা বড় ভাল ছিল।

বলতেন—লক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে—এক ছিল পরমধার্মিক ব্রাহ্মণ, মহা-তেজস্বী, এও বাংলাদেশের সচরাচর ব্রাহ্মণদের গল্প নয়। বুনো রামনাথ অবিশ্যি একটা-আধটাই হয়। বিদ্যেসাগর মশায়ের ঠাকুরদাদার মতো গায়ের জোরওয়ালা রাগী মানুষও বেশি না। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণেরা সেকালে ছিল নিরীহ দরিদ্র। যজমান চরিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করত কোনরকমে। বৈশাখ মাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত মেয়েদের বারো মাসে তেরো ষষ্ঠি—সকল জনের জন্য স্নানযাত্রা রথযাত্রা থেকে দোলযাত্রা মেড়া-পোড়া ইতুপুজো মনসাপুজো দুর্গাপুজো কালীপুজো—জগদ্ধাত্রী থেকে নবান্নে অন্নপূর্ণা, চৈত্রে বাসন্তীপুজো—তার সঙ্গে ঘরে ঘরে জন্ম-মৃত্যু নিয়ে দশকর্মের কাণ্ডকারখানা নিয়ে মোটমাট ভাটচাজ পণ্ডিতদের যে আড়া এই চাষের দেশে পাতা ছিল তাতে রোজকারের মাছ যা ধরা পড়ত তা কম নয়।

নিত্যবাবুর কথা মনে পড়ছে—বলেছিলেন—আড়া বোঝেন তো? আড়া হলো বাঁশের শলার ঘেরা মাঠের জলনিকাশী নালা জুড়ে পেতে মাছ ধরবার একরকম ব্যবস্থা।

নিত্যবাবু ব্যবসায়ে ছিলেন পাটের দালাল। শখে ছিলেন থিয়েটার এবং গান পাগল। তার সঙ্গে একটা নেশা জন্মেছিল—নাটক লেখার। নাটক লিখেও নাটক যখন অভিনীত হলো না তখন তিনি প্রবন্ধ লিখতে ধরেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম কালে এদেশে যতগুলো বিদ্রোহ হয়েছিল তাই নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। ওই নাটকের সূত্র ধরেই নিত্যবাবুর সঙ্গে শিবেন ভটচাজের আলাপ হয়েছিল।

—বলি কি বলুন? বুয়েচেন না? কপাল ছাড়া কি বলব? শিবেনের মেয়ে! অ্যাঁ! শিবেন বাপের টাকা পেয়ে 'দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্' খুললে। দধীচি নাম শুনে বুঝতে পারছেন যে তার সঙ্গে বজ্রের সম্বন্ধ আছে। মানে বজ্র তৈরি হবে। মানে অস্ত্র। ১৯২৪-২৫ সাল। তখন স্বদেশীর উত্তাপে সারা দেশ তেতে উঠেছে। বোমার খোল তৈরি হবে। ছোরা তৈরি হবে। ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হবে। আর একটা টাটা

তৈরি হবে। আর কল্পনা একটা থিয়েটার মানে স্টেজ প্রতিষ্ঠা করবে। তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ী থিয়েটারে নেমেছেন। এমন একটা থিয়েটার গড়বে যেখানে শুধুই যাকে বলে আগুনের মতো নাটক প্লে হবে। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ সেই জন্যেই। আমি মশাই বারণ করেছি কিন্তু শোনেনি। বলেছি—উন্মাদের মতো খরচ করো না। সে বলত—নেভার মাইন্ড। আমার ঠাকুরদা ছিল পুজুরী বামুন। বাবা হয়েছিলেন মোক্তার।

মেয়েটি সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে।

চোখের দুই কোণে দু'ফোঁটা জল নিটোল হয়ে জমে উঠেছে এই মুহূর্তে।

হাত দু'খানি জোড় করেছে।

নিত্যবাবুর কথা কানে বাজছে।—ভটচাজ বামুনের বংশ। সইল না।

তিনি নিত্যবাবু নন—ও কথাটা মানেন না। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস বটে। তাকে অস্বীকারের পথ নেই।

প্রপিতামহ (মেয়েটি) পেশায় ছিলেন যজমানসেবী ব্রাহ্মণ। হাওড়া আমতা লাইনে গ্রামাঞ্চলে বাড়ি ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে হাওড়ায় এসেছিলেন বংশের শালগ্রাম শিলাটিকে নিয়ে। তাঁর দৌলতে সত্যনারায়ণ থেকে দশকর্ম পর্যন্ত যে ডেকেছে তার বাড়ি গিয়ে ক্রিয়াকর্ম করে হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন। একতলা পাকা দালান একখানি—খাপরার চালের রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর তার সঙ্গে একখানা গোয়াল ঘর পর্যন্ত করেছিলেন তিনি। তার সঙ্গে দেশেও ঘর করেছিলেন—জমি কিনেছিলেন। ছেলেকে এন্ট্রান্স পাশ করিয়েছিলেন। মধুসূদন ভট্টাচার্যের ছেলে হরিহর ভট্টাচার্য এন্ট্রান্স পাশ করে হয়েছিলেন মোক্তার।

কৃতী মোক্তার হয়েছিলেন। ভাল ইংরিজী লিখতেন, প্রয়োজন হলে ইংরিজী সওয়াল জবাব করতে পারতেন। ফৌজদারী আইন খুব ভাল বুঝতেন। তার সঙ্গে ছিলেন হিসেবী লোক। এক টাকা উপার্জন করে আগে আট আনা একটা চাবিহারানো কাঠের বাক্সের ডালার ফুটো দিয়ে ফেলে জমিয়ে রাখতেন। হিসেব করে তিন ছেলের জন্যে তিনখানা বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন হাওড়া শহরে। তাও এক জায়গায় নয়, একখানা শালকেতে, একখানা হাওড়ায় এবং তৃতীয়খানা শিবপুরে।

জায়গা জমি বাড়ি সব ঠিক ঠিক হিসেব মিলিয়ে করেছিলেন হরি মোক্তার। বোধ করি কল্পনাও করেছিলেন ছেলেরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মোক্তারী বা ওকালতী অর্থাৎ আইন ব্যবসায় করবে। যার জন্যে প্রতিটি বাড়িকে দু'ভাগে ভাগ করে তৈরি করিয়েছিলেন যার সামনের ভাগটা খানিকটা বাগান নিয়ে বৈঠকখানা বা আপিসবাড়ি হতে পারত অনায়াসে এবং তার পিছনের অংশটায় ছিল বসতবাড়ি। একতলা করে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন—বলতেন—ছেলেরা দোতলা তুলবে। এসবের জন্য হরিহর ভটচাজ হরিত্ব এবং ভটচাজত্ব থেকে প্রমোশন পেয়ে হয়েছিল শুধু হরি মোক্তার। লোকে হরিহর ভটচাজ আর বলত না, বলত হরি মোক্তার। বড়ছেলেকে ল. পরীক্ষার

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করিয়েও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর আর আয়ু ছিল না। সামান্য তুচ্ছ হেতু, জুতোর কাঁটা উঠে পায়ে ফুটে ছোট ক্ষতের সৃষ্টি করে দিন তিন-চারের মধ্যে ধনুষ্টঙ্কারে মারা গিয়েছিলেন। অন্য দুটি ছেলের একটি তখন বার দুই বি-এ ফেল করেছে। ছোটটি আই-এ পড়ছে।

এই ছোটছেলের নাম শিবেন।

এবং ছোটছেলেরই মেয়ে রত্নমালা—ডাকনাম চাঁপা।

১৯২৪-২৫ সালে শিবেন পড়ত কলকাতার সিটি কলেজে। বাপ মারা যেতেই পড়া ছেড়ে বিষয় সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিয়ে নিজের উন্নতি এবং দেশের উন্নতির জন্য ছোট একটা লোহার কারখানা খুলেছিল। দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্‌। বজ্রের খোল তৈরি হবে!

কল্পনা ছিল, একদা সে টাটানগরের মতো এক শিবনগরের পত্তন করবে। ১৯২৪-২৫ সাল। গান্ধীজী এসেছেন—চিত্তরঞ্জন প্র্যাকটিস ছেড়ে সর্বত্যাগী দেশবন্ধু হয়েছেন। আজকের নেতাজী—সেদিনের বাংলাদেশের তরুণ নায়ক সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস চাকরি পেয়েও সে-চাকরি প্রত্যাখ্যান করে দেশবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছেন। কলেজের ছেলেরা তখন একদফা কলেজ বয়কটের পালা শেষ করে আবার নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে গিয়ে ঢুকেছে। এই সময়ে পিতৃহীন শিবেন ভটচাজ বাপের শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন করে কলেজ ছেড়ে দিল এবং পত্তন করলে এক লোহার কারখানার। নামটা হয়েছিল জবর। দধীচি আযরন ওযার্কস্‌। কল্পনা ছিল বজ্র তৈরি করবে। কোথা দিয়ে কোন্‌ যোগাযোগে কাব সঙ্গে শিবেনের নাকি বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তাদের জন্যে বোমার খোল তৈরি করবার গোপন অভিপ্রায় থেকেই এই নামটা মাথায় এসেছিল। কিন্তু সে থাক, সে কোনদিন হয়নি।

যে-চরিত্র ও যে-জীবন থেকে এমন কল্পনার উদ্ভব হয, যে-ভাবনা যে-সংকল্প থাকলে মানুষ এমন স্বপ্ন দেখে এবং একে সম্ভবপর করে তোলে তা শিবেনের ছিল না।

শিবেন ছিল অতি সাধারণ আবেগসর্বস্ব সেকালের বাঙালীর ছেলে। দেশোদ্ধারের পাঠ বা ভাবনা সেকালের শিক্ষিতদের মধ্যে সকল জনই কিছু না কিছু গ্রহণ করত। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ বন্দে মাতরম্‌ থেকে তখন শরৎচন্দ্রের আমল পর্যন্ত সাহিত্যে, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদবাবুর নাটকে, দৈনিক সংবাদপত্রে সর্বত্রই ছিল এর ছোঁয়াচ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্রোত ছিল মূল উৎস সে বোধহয় না বললেও চলে, কিন্তু শিবেনের স্বদেশ ও স্বাধীনতাপ্রীতির মূল উৎস ছিল সেকালের থিয়েটার। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এমন কোন নাটক সেকালে অভিনীত হয়নি যা শিবেন দেখেনি। এবং সে দেখা একবার হয়েই ক্ষান্ত হত না। দু'বার-তিনবার, ক্ষেত্রবিশেষে এক একখানা নাটকের অভিনয সে আট-দশবারও দেখেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দু'খানা নাটক কলকাতায় খুব চলেছিল। একখানা 'মোগল পাঠান' একখানা 'দেবলা দেবী'। ওই বই দু'খানা দশবার করে দেখেছিল। তখন বাপের আমল—পড়ত ইস্কুলে ; কোনরকমে

বারো আনা হাতে এলেই চলে যেত থিয়েটারে। বসত আট আনার সীটে, খেতো আনা দুই-তিনের, আর গঙ্গা পারাপারের দুটো পয়সা, ব্যাস। যাতায়াতের জন্য সে ট্রামে চড়ত না; বিডন স্ট্রীট থেকে গঙ্গার কোন ঘাটে এসে খেয়া নৌকায় এক পয়সা দিয়ে চলে যেত ওপারে।

শিশির ভাদুড়ী আসতেই মঞ্চে হলো নবজীবন সঞ্চার। ওদিকে পিতৃবিয়োগ ঘটে শিবেন হলো কাঁচা পয়সার মালিক। আই-এ পড়ে, বয়স আঠারো পার হয়েছে সুতরাং নাবালক বলে কোন বাধা-নিষেধ আরোপ কেউ করেনি, করতে পারেনি। এবং তিন ভাই মিলেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নীতিটি সসম্ভ্রমে মেনেও নিয়েছিল তাবা। বাপও ব্যবস্থাদি নানারকম করে গিয়েছিলেন—বাড়ি, নগদ টাকা উইলে লিখিতভাবে বণ্টন করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

বাপের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি চুকে যাওয়ার পাঁচ-ছ' দিন পর পড়েছিল প্রথম শনিবার, সেদিন সে জনতিনেক বন্ধু নিয়ে দু'টাকার সীটের টিকিট কেটে শিশিববাবুব আলমগীর নাটক দেখে এসেছিল।

আলমগীর নাটকখানি বোধ হয় দশবারেরও বেশি বার দেখা। আলমগীরবেশী শিশিরকুমারের প্রথম প্রবেশ, সেই ঈষৎ কুঁজো হয়ে বাঁহাতখানা পিঠের উপর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে "মন্দ কি! দাম্ভিকা কাশ্মীরী বাঈয়ের দম্ভটা চূর্ণ করে দেওযা যাক না" থেকে শেষ বক্তৃতা—"হে কবি, বছর যাক যুগ যাক, বহু শতাব্দী চলে যাক,—শতাব্দীর পারে একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীবের এই মিলন-অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হোক। এস ভাই জগতের অলক্ষ্যে এই সত্যাশ্রয়ীর চিরজাগ্রত (ভীমসিংহের) সম্মুখে এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।" পর্যন্ত বহু স্থান সে সুব স্বর নকল করে মুখস্থ বলে যেতো। সীতা নাটক তার আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ছিল। যখন তখন সে বলে উঠত—কার কার কার করে কণ্ঠস্বর!

ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্তের—কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকস!—এই প্রথম দৃশ্যটা গোটাই সে একাই বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন স্বরে অভিনয় করতে পারত।

কণ্ঠস্বর কর্কশই ছিল তবু স্বদেশী গান সে খুব ফিলীংস দিযে গাইত। কণ্ঠস্বর কর্কশ হলেও সুরে তার দখল ছিল। সুর ঠিক রেখেই গাইত। তার দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্-এর উদ্বোধনের দিনে সে একটা অনুষ্ঠান করেছিল—হাওড়া শহরের বিশিষ্ট নাগরিক, বড একটি কারখানার মালিক এবং আরও কয়েকটি ব্যবসার অংশীদার রায়বাহাদুরকে এনে অনুষ্ঠানটির পৌরোহিত্য করিয়েছিল—সে অনুষ্ঠানে সে ক'টি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিজে উদ্বোধন সংগীত গেয়েছিল।

বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ—

* * *

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য

মানুষ আমরা নহি তো মেষ!

সেদিন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়েছিল রীতিমত হোমযজ্ঞ যথাবিধি শেষ করে তবে। সে হোমযজ্ঞ করেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত পরমনিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শেখর স্মৃতিরত্ন মশায়। রায়বাহাদুর মস্ত একটি বক্তৃতা লিখে এনেছিলেন। তাতে তিনি কলকারখানার কি আশ্চর্য অভ্যুদয় ইউরোপ আমেরিকায় এবং তার তুলনায় কি দৈন্য আমাদের তার বিবরণ ছিল।

নিত্যবাবু বলেছিলেন রায়বাহাদুর তাঁর ভাষণে নাকি প্রত্যাশা করেছিলেন যে হাওড়ার এই তরুণ যুবকটি এককালে এই দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্ থেকে বজ্রের মতো মজবুত এবং শক্তিশালী যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করবে—সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ বৃদ্ধি করে সমৃদ্ধশালী করে তুলবে। সবশেষে বলেছিলেন—"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।"

রায়বাহাদুর ছিলেন ওই চাটুজ্জে বাড়িরই বড়কর্তা।

সন্ধ্যায় ছিল খাওয়াদাওয়া। বন্ধুদের খাইয়েছিল—তার সঙ্গে আত্মীয়স্বজনেরাও ছিল। রাত্রি একটু গাঢ় মানে ন'টা নাগাদ একটু গানবাজনার আসর বসিয়েছিল শিবেন। গান সেকালের মডার্ন গান। তার মধ্যে স্বদেশী সংগীত ছিল না। রবীন্দ্রসংগীতও তখন সাধারণ জীবনে আসন পাতেনি। আজকালকার মতো সাধারণ ঘরের মেয়েরা তখন গান শেখেনি; শিখলেও আসরে গাইবার কথা কল্পনা করতে পারত না।

এসব বিবরণ তাঁকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ির সামনেব প্রতিবেশী বর্তমানে মৃত নিত্যরঞ্জনবাবু। প্রতিবেশী তিনি ছিলেন না—নতুন করে হয়েছিলেন দশ বছর আগে। নিত্যরঞ্জনবাবু সেদিন দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্ ওপনিং আসরে উপস্থিত জনেদের মধ্যে একজন। এসব কথাগুলি সেই নিত্যবাবুই বলেছিলেন সুধাংশুবাবুকে। বলেছিলেন—আজ থেকে অর্থাৎ ১৯৬০ সাল থেকে বারো বছর আগে ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে। মনে পড়তে বলেছিলেন—আরে তখন আপনার এই একাল তো বাদ। তখন এখানকার এই সুনীতি মিত্তির সুচরিতা সরকার-টরকার কোথায় মশায়? তখন আপনার ইন্দুবালা আঙুরবালা দাসীদের আমল। কাজী সাহেব তখন খুব পপুলার। এক্কেবারে মাতিয়ে ভাসিয়ে দেয়। "কে বিদেশী মন উদাসী" গানখানা কি গাওয়াই না গেয়েছিল মশাই সেদিন। বুয়েচেন না। কি বলব আপনাকে—মানে হাতের তালি আর ঘাড় নাড়ায় যাকে বলে মাতন তাই লেগে গেসল। অবশ্য 'রঙ' ছিল মানে কিছু ড্রিংকের ব্যবস্থা ছিল। ভাল ড্রিংক। ছোট ঘরের বস্তু না। অভিজাত দ্রব্য। আর যে মেয়েটা সেদিন গাইতে এসেছিল তার গলাও ছিল আর দেখতে শুনতেও মেয়েটি ভাল ছিল।

একটু থেমে একটু হেসে নিয়ে বলেছিলেন—শিবেনের চোখ ছিল। কানও ছিল। নিজে বাজাতে পারত ভাল। সেদিন আসর পাতলা হয়ে এলে বাঁয়া তবলা নিজেই টেনে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করেছিল। তখন লীলা, মানে সেই মেয়েটি আর কি, সে গান ধরেছিল বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বোঝেন তো? বাজনদারের সঙ্গে তার তালের

পাল্লায় আড়ি দিয়ে। অর্থাৎ ঠকাবার মতলব আর কি। রসের পাল্লা। মেয়েটার সঙ্গে শিবেনের তখন পরিচয়াদি হয়েছে। দু'চার রাত্রি ওর বাড়িও গিয়েছে এসেছে। পরিচয় ছিল। আসরে এসে শিবেনের কারখানার পত্তনটত্তন দেখে ওর প্রতি তার বেশ শ্রদ্ধাও হয়েছে। সুতরাং ভোজবাজির খেলায়, যাকে বলে সেই একদিনেই বীজ ফেটে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর থেকে ডালপালামেলা গাছ গজানোর মতো অনুরাগের ম্যাজিক বৃক্ষ তা বেশ ছত্রছায়া মেলে বড় হয়ে উঠেছিল। কল্পনা করেছিলেন শিবেনের কল্পনার থিয়েটারের বীজটিও একদা ঠিক এইভাবেই রাতারাতি রূপ নিয়ে একেবারে ফুলফোটা গাছ হয়ে গজিয়ে থাকবে। সকালে উঠে দরজা খুলেই দেখবেন বাড়ির সামনের দেওয়ালে তার নাটকের পোস্টার পড়েছে।

থিয়েটারটার নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

বসে বসে বিড়ি টানতে টানতে নিত্যবাবু বলেছিলেন—শিবেনের এই মেয়ে হলো। এর নাম হলো রত্নমালা ; থিয়েটারের নামও রাখা হবে ঠিক হলো রত্নমালা নাট্যালয়। নিত্যবাবু বলেছিলেন—ওর আদর কত ছিল! বিয়েতে টাকা খরচ করেছিল কত! দেখে দেখে পিতৃমাতৃহীন বুদ্ধিমান ব্রাইট ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিল। প্রণব চক্রবর্তী নাম ছিল তার। আমি সন্ধান দিয়েছিলাম। বিয়েতে আমি খেটেছি, পেটের উপর লুচির ধামা নিয়ে পরিবেশন করেছি। কোন আবদারের কথা বাবাকে বলতে না পারলে আমাকে ধরত। আজ সেই মেয়ে—। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন নিত্যবাবু। একটু চুপ কবে থেকে খানিকটা উদাস হয়ে উঠে বলেছিলেন—মশায আমাকে চিনতে পারলে না। ইচ্ছা করে। বুয়েচেন না। ইচ্ছা করে।

সুধাংশুবাবু অবিশ্বাস করেননি নিত্যবাবুর কথা।

এ মেয়ে তা পাবে।

তাঁকেও চিনতে পাবত না ; প্রাযই তো যেত এই পথে : চাটুজ্জেবাড়ির কাজে ওর মা না গেলে ও যেত। ইদানীং অর্থাৎ সে সময়ে সেই ১৯৫০-৫১ সালে তার সেই রুগ্ন খ্যানখেনে ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে অথবা হাত-পা ছুঁড়ে মাকে গালিগালাজ দিতে দিতে পিছনে পিছনে যেত। তিনি তাকিযে দেখতেন কিন্তু মেয়েটি কোনদিন তাকাতো না। কত দিন বর্ষার সময় সকালবেলা অকস্মাৎ বৃষ্টি নেমেছে, এ পথটার উপর এক তাঁর বাড়িতে গাড়িবারান্দা আছে. সেখানে অনেক লোক আশ্রয় নিতো কিন্তু ও কোনদিন আশ্রয় নেয়নি।

বিচিত্রচরিত্র মানুষ নিত্যরঞ্জনবাবু। পাটের দালালি করতেন। একটু প্রগলভ্ মানুষ ছিলেন। কিন্তু খারাপ মানুষ ছিলেন না। তার উপর খানিকটা সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত লোক ছিলেন। হৃদয়ের গড়নটাও ছিল কোন গভীর উপসাগরের মতো। ভারী দুঃখের সঙ্গেই সেদিন বলেছিলেন—শিবেন ভটচাজের মহাসমাদরের মেয়ে তুই—তুই আজ

চাটুজ্জেবাড়ি খেটে খাস, এতে কি কেউ খুশি হতে পারে? না এর জন্যে আমরা কেউ দায়ী? তোকে দেখে আমি ছুটে গেলাম। তার উপর তোর ছেলে—। আমাকে বললে কি জানেন? বললে—আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। মাফ্ করবেন আমাকে। আমার ছেলেটার অপরাধ ক্ষমা করবেন। ও মরেও না—আমিও খালাস পাই নে। আমি মশায় হতবাক হয়ে গেলাম।

সেদিন নিত্যরঞ্জনবাবু দীর্ঘকাল পর বন্ধুকন্যাকে দেখে আরে আরে বলে নিজে থেকে ছুটে গিয়েছিলেন ওর সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর অর্থাৎ সুধাংশুবাবুর সঙ্গে তাঁর মাত্র দশ-পনের দিনের পরিচয়, তাতেও তাঁর সামনে এমন একটি দুর্নামযুক্ত মেয়েকে চেনেন একথা প্রকাশ করতে তাঁর সংকোচ হয়নি।

রাস্তার ওপারে তাঁর বাড়ির সামনে ওই যে ওই বাড়িখানা বিক্রি হয়েছিল এবং নিত্যবাবু সেখানা কিনেছিলেন। কেনার সময় দিন দুই আলাপ করে গিয়েছিলেন। তারপর বাড়িটা সংস্কার করাতে শুরু করে নিত্য সকালে আটটা-ন'টার সময় এসে হাজির হতেন। রাজ মজুর লাগত তাদের তদারক করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে, তাঁকে 'নেবার মশায' বলে নমস্কার করে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। রৌদ্রের উত্তাপ বর্ষার স্বল্পতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতেন। সুধাংশুবাবুর বেশ লাগত, উপভোগ করতেন তিনি। সেদিন এসেছিলেন বেশ ভোরবেলা। পাঁচটা বেজেছে। রাস্তায় লোকজন কম। খবরের কাগজওয়ালাদের সাইকেলের ঘণ্টা বাজছে, ছুটছে। ঝিয়েরা বাড়ি বাড়ি কাজ করতে যাচ্ছে। জমাদারদের নর্দমা ঠেলা হয়ে গেছে। নিত্যবাবু এসে এমনি সময় সেদিন হাজির হয়েছিলেন।

সুধাংশুবাবুই সেদিন নিত্যবাবুকে এত সকালে দেখে বলেছিলেন—আজ এত সকালে নেবার মশায়?

—ইয়েস স্যার, এত সকালেই বটে বুয়েচেন না। কাল রাত্তিবে একজনের বস্তা চারেক সিমেন্ট দিয়ে যাবার কথা ছিল। বিশ্বাসী আদমী বুয়েচেন না। বলেছিল—ভাববেন না—মাল ঠিক পৌঁছে যাবে। বালির গাদার মধ্যে পাবেন। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।

একমুখ হেসে ফেলেছিলেন সুধাংশুবাবু।

মনে পড়েছিল খ্যাঁকশিয়ালীর ইংরিজী হলো ফক্স। এবং বিশেষণ হলো স্লাই। মানে চতুর। "A sly fox met a hen." হেসে মুখে বলেছিলেন—তা মিলল?

নিত্যবাবু বলেই চলছিলেন—Yes yes yes, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে কথা রেখেছে। জানেন এ লোকগুলোকে যে যা বলবে বলুক—চোর ডাকাত গুণ্ডা অ্যান্টিসোসাল কথা উঠেছে আজকাল—তা যাই বলুক এরা যা কথা দেয় তার খেলাপ করে না। নে—ভা-র। ভদ্রলোক—দে—র চেয়ে অ—নে—ক—। হঠাৎ থেমে গেলেন নিত্যবাবু। বলে উঠলেন—আ-রে! বলে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। চলে গেলেন রাস্তা পার হয়ে ওপারে। সুধাংশুবাবু দেখলেন সেই মেয়ে সেই চাঁপা যাচ্ছে। সেই সদ্য স্নান করে ভিজে চুল পিঠে ফেলে—সুপরিচ্ছন্ন না হোক মোটামুটি

পরিচ্ছন্ন একখানি কাপড় পরে মুখ নিচু করে তির্যক দৃষ্টিতে আশেপাশে দৃষ্টি রেখে সে চলেছে ধীর পদক্ষেপে।

নিত্যবাবু এই মেয়েটিকে দেখেই সবিস্ময়ে আরে শব্দটি উচ্চারণ করে বেরিয়ে গেলেন এবং হনহন করে গিয়ে ওই মেয়েটির কাছে দাঁড়ালেন। কয়েকটা কথা বললেন। চাটুজ্জেবাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে কি দেখালেন। তারপর একবার কপালে হাত দিলেন। মেয়েটি একটু পিছিয়ে গিয়ে যেন নিতান্ত অপরিচিতের মতো ভ্রূকুঞ্চনের মধ্যে যে প্রশ্ন তুললে তার অর্থ হলো—আপনি কে?

হঠাৎ এই মুহূর্তটিতেই ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। একটা ইঁটের টুকরো এবং কিছু বালি কেউ ছুঁড়লে এবং সেটা এসে খপ্ করে নিত্যবাবুর পিঠে পড়ল, পড়ল কিছুটা আশেপাশে। অতর্কিত এই আঘাতে—যদিও আঘাত তাতে কিছু ছিল না তবুও নিত্যবাবু "আরে বাপরে" বলে চিৎকার করে উঠলেন এবং পরমুহূর্তটিতেই নিত্যবাবু আঃ উঃ ভুলে গিয়ে বালি-কাদার দাগ লাগা জামার পিছনদিকটা সামনে টেনে এনে চোখের সামনে ধরে হতভম্বের মতো দেখতে লাগলেন। মেয়েটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। নিত্যবাবু তখন পিছনের দিকে তাকিয়ে সন্ধান করছিলেন এই কর্মের দুষ্কৃতিকারীটি কে? তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবাবুও তাকালেন সেদিকে। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা। শহর হলেও ঠাঁইটা বাজার নয় হাট নয়; এখানে একটা অতিক্ষীণ সমাজশৃঙ্খলা আছে। এবং সে শৃঙ্খলা এই স্থানীয় বাসিন্দাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। যুগটা বিচিত্র যুগ শুরু হয়েছে। সুধাংশুবাবু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নতুন যুগের মানুষ। নতুনের এই অসহনীয় অশোভন অভ্যুদয়ের অবশ্যম্ভাবিত্বের কথা জানেন। এই নতুন জীবনস্রোতকে ভগীরথের মতো শাঁখ বাজিয়ে সমুদ্রসঙ্গমে আনতে পাবলে সৃষ্টি হবে মুক্তিতীর্থেব—আর সে স্রোত বিপথগামিনী হলে হবে কীর্তিনাশা—একথা তিনি জানেন। তবুও মস্তানীর জন্য পীড়া অনুভব না করে পারেন না।

দুষ্কৃতিকারীটিকে আবিষ্কার করতে দেরি হলো না বা কষ্ট করতে হলো না। যে এই দুষ্কৃতি করেছে সে পালিয়ে গেল না অথবা নিত্যবাবুর পিঠে কাদা-বালিব মুঠো লেগেছে বলে কোন সংকোচও অনুভব করলে না। সে যেন আরও কোন প্রবলতর আবেগে ভাল-মন্দ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞানশূন্যের মতো ওই ফুটপাথ ধরে এগিয়ে আসছিল।

একটা ছেলে। চিনতে দেরি হয়নি; এ সেই ছেলেটা। ওই মেয়েটার সেই ছেলেটা। সেই অহরহ খুনখুনে কান্না-কাঁদা ক্যাকলাসের মতো রোগা সিঁটকে পাকানো চেহারার কটা চুল কটা চোখ ঘষা উজ্জ্বল তামার পয়সার মতো গায়েব রঙ সেই ছেলেটা। ছেলেটা আগের থেকে একটু বড হয়েছে—একটু শক্ত-সমর্থও হয়েছে। তার সেই চোখে হাত দিয়ে অসহায় অ্যাঁ অ্যাঁ কান্নার চেহারা পালটেছে। কান্নার সুরটা আর অসহায় নয়—তার সঙ্গে ক্ষোভের ঝাল মিশেছে।

ছেলেটা দ্বিতীয়বার আক্রমণের উদ্যোগ করছিল। নিত্যবাবুকে নয়—নিত্যবাবুর সামনে তার মা তখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে তিক্ততার শেষ নেই, জ্বালায় সে চোখ নিষ্পলক হয়ে উঠেছে—যেন ছেলেটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইছে। ছেলেটা তখন দ্বিতীয়বারের জন্য কুড়িয়ে নিয়েছে একটা ইঁটের টুকরো। নিজের ঠোঁটের উপর দাঁতের খামচা কেটে মায়ের দিকে তাকালে।

সুধাংশুবাবু এবং নিত্যবাবু একসঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিলেন—ফ্যাল্ ফ্যাল্—এই ছেলে ফ্যাল্—

সেই মুহূর্তেই তার মা তার সকল লজ্জা-সংকোচকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে বলে উঠেছিল—মর মর—তুই মরে যা। তুই মরে যা। তুই মরে যা।

এবার ছেলেটা পালিয়েছিল। মায়ের ভয়ে নয়। সম্ভবত সুধাংশুবাবুব ভয়ে। সুধাংশুবাবুর একটা পরিচয় ছিল ও অঞ্চলে।

সেদিন তাঁর কোর্ট ছিল না। হয়তো রবিবার ছিল। বা কোন ছুটি ছিল।

নিত্যবাবু তাঁরই বাড়িতে ভিতরে গিয়ে জামাটা খুলে কলে কাদাটুকু ধুযে শুকুতে দিয়ে তাঁর বসবার ঘরে এসে ঢুকেছিলেন, বাইবে থেকে কথা বলতে বলতেই আসছিলেন—যেন না বলে আর থাকতে পাবছিলেন না। নিত্যবাবুর কথাব প্রতি সেন্‌টেন্‌সেই কযেকটা কবে 'বুযেচেন না' শব্দ থাকত—সেই বলেই ঢুকেছিলেন—বুযেচেন না সুধাংশুবাবু, অদৃষ্টের চেযে বলবান কিছু নেই মশায। বুযেচেন না এই যে চামডাঢাকা কপালখানা এইটেই হলো সব। একেবারে মোক্ষম কথা—বুযেচেন না। ওই যে মেয়েটা আর ওই যে ছেলেটা—বুযেচেন না—তাব একেবাবে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুধাংশুবাবু একটু আগ্রহান্বিত বিস্মय অনুভব করেছিলেন। নিত্যবাবু ওদেব জানেন অথচ ওদের পরিচয তাঁর জানা হযনি! ওব সে পরিচয় যত অপবিচ্ছন্ন এবং অপবিত্র হোক ওদের বিশেষ করে ওই মেযেটির কাছে তিনি উপকৃত। অযাচিতভাবে সে উপকার করেছে তিনি নিযেছেন। সেটা যেন একটা কাঁটাব মতোই বিঁধে রযেছে তাঁর মনে। এবং বলেছিলেন—কে বলুন তো মেযেটি? চেনেন? চাটুজ্জেদেব বাড়ি কাজ করে, না?

নিত্যবাবু বলেছিলেন—বুযেচেন না হতভাগা মেযে। আমার চেনা মানে আমার বন্ধুর মেয়ে। আমার বন্ধু শিবেন ভটচাজ বুয়েচেন না—এককালে হাওডার নামকবা ছোকরা। আমার বন্ধু। বলতে গেলে একগেলাসেব ইয়াব। আমবা সেকালে বুযেচেন না একটা দল ছিলুম। শিবেন আমি এবং আরও পাঁচ-সাতজন। আমাদেব লক্ষ্য ছিল বেঙ্গলকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রভিন্স কবে তুলব। ফ্যাক্টরি বানাব। তখন আপনার প্রথম মহাযুদ্ধের পর। বিপ্লবীদেব কথা শুনে ব্লাড বযেল হযে ওঠে। তাদের মতো তো প্রাণট্রাণ দিতে পারি না, তবে সাহায্য করতে পারি। আর তখন চাটুজ্জেরা কারখানা গডে তুলেছে. ১৯১০।১২ সালে ছোট একটা কারখানা ছিল—একটা পুরনো বয়লার একটা ইঞ্জিন দু'খানা লেদ; তার থেকে যুদ্ধের ক'বছরে যাকে বলে মিলিয়নেয়ার।

আরও সব বেশ কয়েকজন আরম্ভ করে ভালই করছে। মধ্যে মধ্যে স্যার পি-সির কাছে যেতুম। তিনি উৎসাহ দিতেন। ঘুষি মেরে খোঁচা মেরে যেন মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন—কলকারখানা গড়ে তোল। হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। শিবেনের বাবা মারা গেল। হাতে অনেক টাকা এসে গেল। তাই দিয়ে পত্তন হলো দধীচি আয়রন ওয়ার্কসের। শিবেনের বাবা ছিলেন খুব পসারওয়ালা মোক্তার। তিন ছেলে।—বেশ গুছিয়ে কথা বলতেন নিত্যবাবু। শিবেনের জীবনের কথাগুলি—ওই কারখানা পত্তনের কথা শিবেনের দরাজ হাতের কথা—এই মেয়ের সমাদরের কথা বলে গেলেন। তারপর চুপ করলেন নিত্যবাবু। যেন হঠাৎ চুপ করে ভাবতে লাগলেন। বোধ করি ভাবতে লেগেছিলেন- তারপর কি ?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুধাংশুবাবু বলেছিলেন—তারপর ?

—তারপর ?

—হ্যাঁ।

—তারপর বুয়েচেন না, ওই কপাল। ফেল পড়ল দধীচি আয়রন ওয়ার্কস্। কিনলে ওই চাটুজ্জেরাই। ওই রায়বাহাদুর। বুয়েচেন না! এখন ওদের বাড়িতেই চাকরি করছে শিবেনের বউ। মধ্যে মধ্যে মেয়েটা এক্‌টিনি করে। শিবেনের দধীচি আয়রন ওয়ার্কসে একটাও বজ্র তৈরি হয়নি। খানকতক ছোরা তৈরি হয়েছিল। চা বাগানের প্রুনিং নাইফের অর্ডার নিয়ে তার সঙ্গেই তৈরি করেছিল। কাদের যেন দিয়েছিল। তারপর—।

আবার চুপ করে গিয়েছিলেন নিত্যবাবু।

সুধাংশুবাবু আবার বলেছিলেন অর্থাৎ কথা বলার ছলেই প্রশ্ন করেছিলেন—এত বড় ব্যাপারটা ফেল পড়ে গেল। পর্বত মূষিক প্রসব করেই দেউলে হয়ে গেল!

—তাই হলো। পর্বতের মূষিক প্রসবই বটে। কি যে হয়েছিল তা বলতে পারব না তবে সাংঘাতিক কিছু। জালজালিয়াতি কিছু করেছিল শিবেন। প্রথমটা কারখানা করে ২৫।২৬ সাল থেকে কারখানা ভাল চালাতে পারেনি, অর্ডার ছিল চা বাগানের অর্ডার। ওই চাটুজ্জে রায়বাহাদুরই ওঁর ছোট অর্ডারগুলো দিয়ে ওকে সাহায্য করতেন। ৩৪।৩৫ সালে হঠাৎ বাড়ি কারখানা চাটুজ্জেদের কাছে মর্টগেজ দিলে। মোটা টাকা নিয়ে এক সিনহার সঙ্গে জুটে একটা ব্যাঙ্ক করলে। ওদের সবার পিছনে ছিল এক মালিক। বুয়েচেন না! সে অগাধ জলের মাছ। লোকটা দালাল। জাপানী ফার্মগুলো তখন বেশ মজবুত করে ভিত গাড়ছে। তারা লোহা মানে পিগ্ আয়রন কিনবে—তার অর্ডার পাইয়ে দেবে বলেছে। ব্যাঙ্কেও টাকা রাখবে বলেছে। শিবেনের কারখানা ফাঁপতে লাগল। আমি নাটক লিখলাম। নতুন রত্নমালা স্টেজের প্ল্যান হয়ে গেল। হঠাৎ ব্যাঙ্কটা ফেল পড়লো, বেধে গেল জাপানী যুদ্ধ। জাপানীরা বললে 'দিস টাইম উই গো বাট নেক্‌স্‌ট্ টাইম নট গো!' ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার দিব্যি জেলে চলে গেল। তার গেল না কিছুই। আর শিবেনের সব গেল। বাড়িঘর কারখানা মর্টগেজ ছিল—লিখে নিলে ওই চাটুজ্জেরা। কিছু টাকা দিয়েছিল চাটুজ্জেরা—সেও বহু অপমানের টাকা।

মাথা নিচু করে সত্য সত্যই লজ্জিত বেদনার সঙ্গে নিত্যবাবু বলেছিলেন—শিবেন কাপুরুষের মধ্যে বোধ হয় ওয়ার্স্ট কাপুরুষ। শিবেনের বউ ছিল সুন্দরী—১৯৪০।৪১ সালেও সে যুবতী ছিল। চাটুজ্জেদের বাড়ির বড় ছেলে—সে মারা গেছে—তার কাছে নাকি বিক্রি করেছিল শিবেন। চাটুজ্জে গিন্নী কথাটা জানতে পারে। সেই ভদ্রমহিলাই এর জন্য শিবেনদের বসতবাড়ি পিছনদিকের খানিকটা ছেড়ে দিয়েছেন। এ চাকরিও সেই তাঁর চাকরি। শুনেছিলাম যতকাল শিবেনের বউ বাঁচবে ওদের বাড়ির ঠাকুরঘরের কাজ করে খেতে পাবে।

—কিন্তু এই মেয়েটি ?

—সেই মায়ের কাছেই গেল বোধ হয়। আর আমাকে বলে গেল আপনাকে তো চিনি নে!

—না, তা নয়! জিজ্ঞাসা করছি—

—আমি সঠিক জানি নে সুধাংশুবাবু। বুয়েচেন না। তবে একাল তো সর্বনাশের কাল, আত্মঘাতের কাল—।

চুপ করে গিয়েছিলেন নিত্যবাবু।

সুধাংশুবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, মুখে আর কিছু বলেননি। তাকিয়ে ছিলেন সামনের দিকে। মনে পড়েছিল সেই রাত্রির কথা। এবং ওর এই শুচিস্নাত রূপের মধ্যে রাত্রে ও যে রূপে ও ছন্দে রূপসী ও ছন্দময়ী হয়ে দাঁড়ায় তার আভাস সকালবেলায় জ্বলা আলোর মতো জেগে থাকার কথা মনে পড়েছিল।

নিত্যবাবু হঠাৎ বলেছিলেন—শুনেছি She is the cause of her husband's death; she sold herself,—আরও অনেক কথা শুনি। এর আগে আমি সেসব বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ দেখলাম She is a dangerous woman. ওইটে ওর ছেলে মশায়।

এর পরও আছে। এই মেয়েটির আরও অনেক পরিচয় নৈমিত্তিক খুঁটিনাটির মধ্যে তাঁর কাছে এসে জমা হয়েছে। নদী যেমন বয়ে যাবার সময় বাঁকের মুখে খড়কুটো পলিমাটি রেখে যায়, তেমনিভাবেই ও সেসব পরিচয় রেখে গেছে।

নিত্যবাবু এরপর বাড়ি সম্পূর্ণ করে গৃহপ্রবেশ করলেন। স্থায়ী প্রতিবেশী হলেন। চার-পাঁচ দিন পরই একদিন এসে বললেন—জানলেন স্যার, শিবেনের স্ত্রীকে আমার বাড়ি রান্নার কাজের জন্য রাখলাম। বুয়েচেন না? মাটা মেয়েটার মতো না! হ্যাঁ। নাক-চোখ ঘুরোয় না। বেশ বিনয়টিনয় আছে। আমি মশাই দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়, শিবেনের স্ত্রী দাঁড়াল। চাটুজ্জেবাড়ি থেকে ফিরছিল। আমাকে বললে—চিনতে পারছেন? বললাম—তা পারব না কেন। তবে ভয় হয় বাপু। সেদিন তোমার মেয়ে যে অপ্রস্তুতটা না আমাকে করলে! ও বললে আপনাকে তো আমি চিনি না!

বললে—ও এমনি বটে। তবে কি বলব বলুন—সবই তো জানেন। বিস্তর দুঃখে পাথর হওয়ার মতো এমনি হয়ে গেছে।—আপনাকে ওরা খুব চেনে। খুব সম্মান

করে।—রান্নার লোক চাই তা বললাম—মেয়ে কি করে? চাটুজ্জেবাড়ির কাজ তুমি কর। ও সেই কাজেই মধ্যে মধ্যে যায়। তা ওকে দাও না আমার বাড়ির রান্নার কাজে। বললে—ওকে শুধিয়ে বলব। তা কাল সন্ধ্যেবেলা বলে গেল আমার বাড়ির কাজ ও নিজে করবে। মেয়ে করবে চাটুজ্জেদের কাজ। বললাম—সেই ভাল তাই কর।

এরপর থেকে ভোরবেলা মা এবং মেয়ে দু'জনেই আসত একসঙ্গে—ওপাশের ওই নিত্যবাবুর ফুটপাথ ধরে হাঁটতো তারা আর পিছনে খানিকটা দূরে আসতো সেই ছেলেটা। সেই পা ঠুকে ঠুকে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে একটা দুর্বোধ্য গর্জন মেশানো কান্নার মতো শব্দ করতে করতে আসতো সে।

মেয়েটির মা ঢুকত নিত্যবাবুর বাড়িতে। মেয়ে চলে যেত চাটুজ্জেবাড়ি। মেয়েটির মা দিদিমা নিত্যবাবুর বাড়ি ঢুকবার সময় বলত—নীলু আয়—আমার সঙ্গে আয়। নীলু!

নীলু দৃকপাত করত না। সে সেই একভঙ্গিতে চলত মায়ের পিছনে পিছনে। মা সাধারণত পিছন ফিরে তাকাতোই না। চলে যেত সামনে। বড় রাস্তার মোড় থেকে গলিপথে ঢুকে যেত। তারপর আর দেখতে পেতেন না সুধাংশুবাবু। তবে কোন কোন দিন কোর্টে বের হবার সময় দেখতে পেতেন ছেলেটা নিত্যবাবুর বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। কোনদিন বা নিত্যবাবুর বাড়ির সংগৃহীত কোন একটা ছেঁড়া বই খুলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোন কোন দিন দেওয়ালে মাথা ঠুকত। আর একটা খেলা করত সে। এখানকার কুকুরদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে খেলা করত। দু'তিনটে দেশী কুকুর তার সামনে উপুড় হয়ে বসে থাকত—ছেলেটা তাদের সঙ্গে কথা বলত।

কোন কোন দিন মা-দিদিমার দিকে বালি ঢেলা ছুঁড়ত।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতেন সুধাংশুবাবু। শুধু অবাক নয় মনে মনে একটা অপরিমেয় ঘৃণা তার সঙ্গে আরও কিছু, হয়ত মার্জনাহীন ক্রোধ, মেঘের মধ্যে লুকনো বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো আবর্তিত হত। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেতেন একটা উগ্র পাপের মূর্তি যেন তিল তিল করে প্রতিদিনে গড়ে উঠছে।

এক একদিন এই মা—;

এ কি মা? রাক্ষসী হয়তো। অথবা প্রেতিনী!

মনে একটা ছবি ভেসে উঠল। খোঁচাখাওয়া অথবা ঢিলখাওয়া সাপিনীর ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফণা তুলে উঠে দাঁড়ানোর মতো ওই ছেলেটার দিকে ঘুরে দাঁড়াত।

বাল্যকালে এই হাওড়াতেও সাপ দেখেছেন সুধাংশুবাবু। মানুষকে দূরে রেখেই সাপ চলে যেতো মাথা নিচু করে। পিছনে পায়ের সাড়া উঠলে গতি দ্রুততর করত। কিন্তু কোন কোন দিন ফোঁস করে ফণা তুলে ঘুরে দাঁড়াতো। নিষ্পলক সাপিনীর দৃষ্টি। চেরা জিভ লকলক করত।

ঠিক তেমনিভাবেই এই প্রেতিনী অথবা সাপিনী মা এক একদিন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতো এবং তিক্ত কটু কণ্ঠে সোচ্চারেই বলে উঠত—মর মর তুই মর—তুই মরে যা! আমি খালাস পাই।

ছেলেটাও থমকে দাঁড়াতো। সেও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত মায়ের দিকে। ঠোঁট দুটো নড়ত অথবা কাঁপত। দিদিমা এসে হাত ধরত; না—ধরতে চেষ্টা করত। ছেলেটা ধরা দিত না। ছুটে পালিয়ে যেতো। তারপর এ মেয়ে চলে যেতো চাটুজ্জেবাড়ি—এর মা ঢুকত নিত্যবাবুর বাড়ি।

এরপর ছেলেটার মুখ ফুটল। সেও বলতে শুরু করলে—তুই মর তুই মর—তুই মরে যা। তারপর তার সঙ্গে যুক্ত হলো—হারামজাদী শুয়োরের বাচ্চা—। তারপর কোথা থেকে শিখলে—কুত্তি, কুত্তার বাচ্চি কুত্তি!

না। এ গালটা সুধাংশুবাবু ছেলেটার মুখে শোনেননি। নিত্যবাবুকে বলেছিল মেয়েটির মা ছেলেটার দিদিমা। সেদিন সকালে ছেলেটা দিদিমার সঙ্গে এসেছিল কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে। ব্যান্ডেজ তখনও কাঁচা রক্তে ভিজে ভিজে ছিল। ছেলেটার পদক্ষেপ ঠিক ছিল না, টলছিল। মা চলে গেল চাটুজ্জেবাড়ি—দিদিমা ছেলেটাকে নিত্যবাবুর বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে কাজে লেগেছিল, সেদিনটাও ছিল কোন ছুটির দিন। বাড়িতে বসে সুধাংশুবাবু তাঁর রাজনৈতিক কর্মী বন্ধুদের সাথে কথা বলছিলেন, হঠাৎ একটা গোলমাল উঠেছিল নিত্যবাবুর বাড়িতে।

সুধাংশুবাবু বারান্দায় বেরিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন ছেলেটার উপর ঝুঁকে পড়ে দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে ডাকছে—ওরে নীলু রে—ওরে! ওরে ভাই রে সোনা রে!

নিত্যবাবু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কপালের ব্যান্ডেজটা তখন কেমন করে খসে বা খুলে পড়েছে এবং খানিকটা জায়গায় খানিকটা রক্ত পড়ে জমে রয়েছে। সুধাংশুবাবুই ডাক্তার ডেকেছিলেন। মোড়ের মাথাতেই ডাক্তার আছে। ডাক্তার এসে দেখে শিউরে উঠে বলেছিল—এ যে অনেকখানি কেটেছে। যেন কেউ কিছুতে করে কুপিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে।

কুপিয়ে দিয়েছিল এই রাক্ষসী অথবা প্রেতিনী মা।

কথাটা প্রকাশ করে দিয়েছিল দিদিমা। দিদিমা বলেছিল—কি করব বলুন। তখন অনেকটা রাত্রি। চাঁপা গিয়েছিল সিনেমা দেখতে। ফিরে এল। এসে, নিজের খাবারটা গরম করে নিচ্ছিল। শীতের দিন তো। উনোনে ঘুঁটে দিয়ে চাটু চড়িয়েছে, ছেলে এসে বসল ঝগড়া করতে। এ বলে তুই মর—ও বলে তুই মর। এরই মধ্যে ছেলেটা মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে বললে—কুত্তি কাঁহাকা, কুত্তার বাচ্চি কুত্তি! এই হাতে ছিল খুন্তি, সেই খুন্তি বসিয়ে দিলে মাথায়, লাগল কপালে, এতখানি কেটে গেল। ভকভক করে রক্ত পড়েছিল। তখন আবার ন্যাকড়া পুড়িয়ে করালী করে লাগানো হলো, তারপর উঠোনে গাঁদা গাছ হয়েছে তা থেকে পাতা বেঁটেও ভাল করে বেঁধে

দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ কিরকম আবার রক্ত পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—দুর্বল হয়েছে তো!

সুধাংশুবাবুকে কথাগুলো বলেছিলেন নিত্যবাবু।

ছেলেটা ভুগেছিল কিছুদিন। মরত, মরাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল কিন্তু গরীব এবং দুর্ভাগা যারা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক রেহাইটা মেলে না। সেখানে উল্টোটা হয়।

এরপর ছেলেটাকে দেখা যেতো না।

নিত্যবাবুই বলেছিলেন ছেলেটা স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

দেখা যেতো মধ্যে মধ্যে। শনিবার দিন ন'টা বাজলেই ছেলেটা এসে দাঁড়াতো নিত্যবাবুর বাড়ির দরজায়—বাড়ির চাবি নেবে।

রবিবার কোন কোন দিন আগের থেকে প্রচণ্ডতর আক্ষেপ বা বিক্ষোভের সঙ্গে পা ঠুকে হাত ছুঁড়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে আসত।

একদিন মাকে মারলে ঢেলা ছুঁড়ে। তাঁর সামনে। ওই রাস্তার উপর। সেদিন ওদের এই পথে যাওয়া-আসার ছকে খানিকটা ওলোটপালোট হয়েছিল। ছেলেটা সেদিন রাগ করে হন্‌হন্‌ করে চলে যাচ্ছিল, তার পিছনে ছিল দিদিমা; সে তাকে ডাকছিল—নীলু ফের, ফিরে আয়। নীলু!

নীলু পিছন ফিরেই বলছিল—না না।

—নীলু!

—না!

এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—নীলু—!

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা, সাপের মতো না, বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁতে খামচ কেটে একমুহূর্তের মধ্যে কুড়িয়ে তুলে নিয়েছিল একটা ইটের টুকরো। এবং সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল সেই ঢেলাটা। সে তাঁর চোখের সম্মুখে ঘটেছিল। ছেলেটার সে ঢেলা ছোঁড়ার ছবিটা চোখের উপর ভাসছে এই মুহূর্তে। ঢেলাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সজোরে এসে লেগেছিল নীলুর মায়ের হাঁটুতে। সে জোর আঘাতের একটা শব্দ উঠেছিল। সেটাও আজ মনে পড়ছে। মেয়েটি দুই হাতে হাঁটু ধরে বসে পড়েছিল। নীলুর মায়ের মা ছুটে গিয়েছিল মেয়ের কাছে।

যত সে "চাঁপা" "চাঁপা" বলে ডেকেছিল ততই মেয়েটি ঘাড় বেঁকিয়ে মুখখানা যথাসাধ্য বুকের মধ্যে গুঁজে লুকিয়ে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল— না না না। ডাকিস নে ডাকিস নে ডাকিস নে। তার অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে তা কোনদিন সুধাংশুবাবু ভেবে দেখতে চাননি।

ঘটনাটা তো খুব কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এরকমটা ওই ধরনের জীবন যাদের তাদের পক্ষে অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক। খালি পায়ে যারা চলে তারা প্রমত্ত হলে হুঁচোটের আঘাতটা তাদের প্রাপ্য।

ওদিকে তখন চাঁপার চারিদিকে ভিড় জমে গিয়েছিল। তাঁর মনে আবার প্রশ্ন জেগেছিল—আঘাত গুরুতর হয়নি তো?

ইতিমধ্যে প্রতিবেশী নিত্যবাবু বেরিয়ে এসেছিলেন। এবং কি হলো কি হলো বলে ছুটে গিয়েছিলেন ওই ভিড়ের মধ্যে। এবং নিত্যবাবু তার হাত ধরে তাকে ভিড় থেকে বের করে এগিয়ে নিয়ে চাটুজ্জেদের পথটায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

সুধাংশুবাবু তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ওই ছেলেটিকে দেখেছিলেন। পিঙ্গল চোখ পিঙ্গল চুল শক্ত শীর্ণ দেহ। তারপর কখন যে নিত্যবাবু আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন তা খেয়াল ছিল না কিন্তু এরই মধ্যে ছেলেটা কোথায় চলে গিয়েছিল। সবশেষে সেদিন একটা আক্ষেপ হয়েছিল তাঁর—মনে পড়ছে মনে হয়েছিল যেন কোন অদৃশ্য বিচারকের আদালতের পিওন এসে তাঁকে বলে যাচ্ছে—এর কাছে তোমার দেনা আছে, শোধ করছ না কেন?

রবিবার হলেও কয়েকজন মক্কেল এসে গিয়েছিল। তারাও ক'জন দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর কাছেই। ক'জন আপিসঘরে গিয়ে বসেছিল। তিনি তখনও ভাবছিলেন।

কি জানি কেমন করে এই ছেলে এবং এই মা মেয়েটিকে নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা তাঁর সারা অন্তরময় ছড়িয়ে পড়ছিল। শুধু অন্তরময় কেন সারা দেশময়। একটা সহানুভূতি সেদিন অনুভব করেছিলেন এই হতভাগিনীর জন্যে।

কি হয়ে গেল সব?

ওই মেয়ে—ওই তো যেন চারিদিকে! গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে। ওঃ! ইংরেজ অ্যামেরিকা লাখে লাখে তাদের সৈন্যবাহিনী নামিয়ে দিলে। দেশের খাদ্যভাণ্ডার লুঠ করে দুষ্প্রাপ্য করে দিলে, হাওয়ায় নোট উড়িয়ে দিলে। ময়দানে বসে গেল দেহ বিক্রির হাট।

যারা বাজারে এসে পা দিল তারা আর ফিরে গেল না। দেশ স্বাধীন হলো কি না কে জানে—হিন্দু ধরলে ছুরি মুসলমান ধরলে ছুরি— মারলে পরস্পরের বুকে—রক্ত ঝরল—সে রক্ত আজও ঝরছেই-ঝরছেই। দেশ ভাগ হয়ে গেছে তবু ঝরছে। এখন আর হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রয়োজন নেই—তোমার সঙ্গে আমার—তোমার সঙ্গে তার কিংবা তার সঙ্গে তার বিরোধ হলে সে বিরোধের মীমাংসা পৃথিবীর আদিম মীমাংসার পথে। খানিকটা রক্তপাত। পথে যেখানে দু'জনে চলা যাবে না তখন একজনকে যেতে হবে।

ঠিক এই সময়েই চাঁপাকে চাটুজ্জেদের গলিতে অথবা দোরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছিলেন নিত্যবাবু। তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের বাড়ি না ঢুকে নিত্যবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—দেখলেন কাণ্ডটা!

তিনি বলেছিলেন—আমি সবটাই দেখেছি। আর শুধু আজকের ঘটনা নয় রোজই দেখি। হঠাৎ আজ—

—পাখা গজায়নি এতদিন। আজ গজালে। একেবারে মস্তান হয়ে গেল।

একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—দিদিমাই ওর মাথা চিবিয়ে খেয়ে দিলে।

তিনি কোন উত্তর দেননি।

এই হতভাগিনী মা-টির উপর করুণা করতে চেয়েও কোনমতেই এতটুকু করুণা তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়নি। করুণা তো কেউ কাউকে করে না—করুণা আপনা থেকে সঞ্চারিত হয়। শুষ্ক হৃদয় আপনা-আপনি সজল হয়ে ওঠে। তার কারণ থাকে। এ মেয়েটির পক্ষে সে কারণ নেই। এর জন্য তা হয়নি।

৩

তারপর অনেক দিন চলে গেছে।

নিত্যবাবু নেই। তিনি গত হয়েছেন। এ মেয়েটির মা সেও নেই, মারা গেছে। মেয়েটি আছে। তার কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি।

এই অনেক দিনে বয়স তার বেড়েছে—চেহারায় কিছুটা যেন ভারী দেখায় কিন্তু তাতে তার ওই যে প্রেতিনী রূপ তার এতটুকু ইতরবিশেষ হয়নি। বরং প্রেতিনীত্বের মধ্যে যে একটি মোহ বা মোহিনীত্ব থাকে তা যেন বেড়েছে।

আজও চাটুজ্জেদের বাড়ির কাজটা সে রেখেছে। সে কাজ সে করে। ভোরবেলা সে যায়। সেই স্নান করে শুচিস্নাত হয়ে শৌখিন সায়া-ব্লাউজের উপর ফিতেপাড় শাড়ি পরে যায় এবং আসে।

সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না। সুধাংশুবাবুও আর ভোরবেলা রাস্তায় এসে দাঁড়ান না। তবে যেদিন দাঁড়ান সেদিন ঠিক দেখতে পান সেই মেয়ে চলেছে সেই মনোহারী কেশবিন্যাসছন্দটি বজায় রেখে—সেই চুলের রাশির উপর আধঘোমটা টেনে মাথাটি একটু হেঁট করে চলেছে। আজকাল আব ছেলেটাকে দেখেন না। সে আর তার পিছনে পিছনে হাঁটে না। তবে তার কথা অনেক শোনেন।

পড়া ছেড়েছে। নেশা করে। আবও অনেক কিছু করে।

বোমা ফাটার শব্দ হলে ছেলেটার কথা ওঠে।

দু'দলে মারামারি হলে একদলে-না-একদলে ও থাকেই। মধ্যে মধ্যে পুলিসে ধরে নিয়ে যায় আবার ছেড়ে দেয়। মোট কথা সে তার জীবনক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। মায়ের পিছনে সে আর হাঁটে না। বছব তিনেক থেকে হাঁটে না। মা এখন একলাই হাঁটে।

লোকে বলে—। লোকে অনেক কথা বলে।

যা বলে তার প্রতিটি অক্ষর সত্য না হলেও যা বলে তার অর্ধ সত্য—সে সুধাংশুবাবু জানেন। তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠছে খাটের তলায় খালি মদের বোতল গড়িয়ে পড়েছিল। ভর্তি বোতলও ছিল।

সেই মেয়ে চোখে জল নিয়ে এই সন্ধ্যায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুধাংশুবাবু এখন অনেক বড় হয়েছেন। পুরনো বাড়ি সংস্কার করে নতুন হয়েছে। আর একটা তলা উঠেছে। পাশের দিকে বেড়েছে। গাড়ি হয়েছে। এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁর জীবনের গতিবিধি স্বভাব অভ্যাস সবকিছুর খবর রাখে। সপ্তাহের এই শনিবারের সন্ধ্যাটি তাঁর একান্তভাবে নিজস্ব। মিটিং-টিটিং হলে যান, রাজনীতির সঙ্গে যোগ

তাঁর আছে। সেখানে কোন স্বার্থ তাঁর নেই কিন্তু একটা আদর্শ তাঁর আছে। এ ছাড়াও নানান প্রতিষ্ঠানও তাঁকে ডাকে। কখনও কখনও সিনেমা-থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণও আসে। এ সন্ধ্যায় কারুর সঙ্গে তিনি দেখা করেন না—এ কথাটা বাইরে বোর্ডেও লেখা আছে।

চাঁপার—

হ্যাঁ চাঁপাই ওর ডাকনাম—ভাল নাম রত্নমালা।

চাঁপার চোখের কোলে কোলে জলের ধারাং দাগ দুটি চিকচিক করে উঠ া এই মুহূর্তটিতে। মধ্যে মধ্যে নতুন জলের ফোঁটা গড়িয়ে এলেই ঘরের আলোর ছটা প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। মিনিট কয়েকই দাঁড়িয়ে আছে। এমনি ভাবে হাত জোড় করে মাটির পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলতেও সাহস করেনি। তিনিও কথা বলেননি। বিস্ময়ের আর তাঁর অবধি ছিল না।

প্রথমেই মনে হয়েছে এই প্রেতিনী তাঁর দোরে এসে দাঁড়াল কেন?

প্রথমেই একবার মনে হয়েছিল দরজাব পাল্লা দু'খানা জোরে ঠেলে দিয়ে ওর মুখের উপরই বন্ধ করে দি। কিন্তু পারেননি। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছিল বারো বছর আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সেই বীভৎস এবং ভয়ানক রাত্রে অন্ধকার গলিপথেব উপর দরজা খুলে দিয়ে তাঁকে একটি মেয়ে, সে-মেয়ে এই-মেয়ে বলেছিল—তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে আসুন। তাড়াতাড়ি।

তাবপর গভীর রাত্রি পর্যন্ত যতক্ষণ না দাঙ্গার আস্ফালন এবং বীভৎসতা স্তব্ধ হয়েছিল ততক্ষণ তাঁকে ঘরের মধ্যে লুকিযে রেখে বাইরে বসে থেকেছিল।

আজও পর্যন্ত তার বিনিময়ে কোন দাবি সে করেনি। পরিচয়ের দাবিও না। একবার একটা মামলার কাগজ নিযে এসেছিল।—টাকাপয়সা দেনা-পাওনার পেটি কেস—কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিশ্রী কাণ্ড ঘটেছিল। উপকারের প্রত্যুপকার তা সে যতটুকুই হোক তার সুযোগ দিতে এসেও এই উদ্ধত দর্পিতা মেয়েটি দেয়নি। হাত পেতেও হাত গুটিয়ে যেন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আজ সে হাত জোড করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে জল টলমল করছে। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না কি করবেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হয়তো তিন মিনিট—হয়তো তার থেকে বেশি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে ভাবছেন। মনে পড়ছে পিছনের কথা।

এ স্তব্ধতা ভঙ্গ সেই করলে প্রথম—ভীত ও মৃদু কণ্ঠে সে তাঁকে ডাকলে—একান্ত দীনজনের মতোই ডাকলে—বাবু!

সে কি তবে ভিক্ষাপ্রার্থিনী? অর্থ? অর্থ চাই?

তিন বা চার পা। গলায় সোনার বিছেহার চিকচিক করছে। কানে টপ রয়েছে। হাতে তিন বা চারগাছি করে বরফি চুড়ি রয়েছে।

তিনি অত্যন্ত নীরস কণ্ঠেই বললেন—এত রাত্রে কি প্রয়োজন তোমার? বল!

মেয়েটির চোখের কোল জলের উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। কিছু বলতে গিয়ে প্রথমটা পারলে না। তারপর বললে—আমাকে বাঁচান, বাবু—আমার—আমার।

কণ্ঠস্বর তার দ্বিতীয়বার রুদ্ধ হয়ে গেল। মুখের উপর কাপড় চাপা দিয়ে সে হুহু করে কেঁদে উঠল।

সুধাংশুবাবুকে স্পর্শ করল সে বেদনার ছোঁয়াচ। একটু সহৃদয় হয়েই তিনি বললেন—কেঁদো না, বল কি বলছ?

একটু অপেক্ষা করে বললেন—কি হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চরিত্র এবং তাঁর ফৌজদারী আদালতে খ্যাতির সঙ্গে যোগাযোগ করে একটু বক্রহাসি না হেসে পারলেন না। বললেন—কি কেসে পড়েছ? ঘরে মদ বেরিয়েছে? না—। কি? কি হয়েছে বল!

এবার কোনমতে আত্মসংবরণ করে চাঁপা বললে—আমার নীলু—আমার নীলুকে আপনি বাঁচান বাবু। লোকে বলছে আমিও জানি আপনি পারেন।

—নীলু? মানে? মনে পড়ল না প্রথমটা।

—আমার ছেলে। আমার নীলু!

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ—।

মস্তান—।

আশ্চর্য! আরবী ভাষা পারসী ভাষা তুর্কী ভাষা যারা এনেছিল এদেশে, এদেশের ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে উর্দু ভাষা যারা তৈরি করেছিল তারা বাংলাদেশে বক্তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ অধিকার থেকে পলাশী যুদ্ধ উধুয়ানালা বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত কমদিন রাজত্ব করেনি—তারা এই পাঁচ-ছ'শো বছরে দিয়েছে অনেক কিন্তু এই মস্তান শব্দটি এবং মস্তানী রূপটি তাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশে চালু হয়নি—হঠাৎ এতকাল পরে শব্দটি এবং শব্দের বাস্তব রূপটি আরব্য উপন্যাসের কোন বোতলের ছিপি কাটিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬০ সাল এখন—এখন বারো-তের থেকে চব্বিশ-পাঁচশ বছব পর্যন্ত সব মানুষই যেন মস্তান হয়ে গেছে।

একজন পনের-ষোল বছরের ছেলে যখন কোন বাড়ির মধ্যে ঢুকে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বলে—মাসীমা সতু কোথায়? একবার ডেকে দেবেন!

তখন মাসীমা বিবর্ণ হয়ে যান, নির্বাক হয়ে যান। মাসীমা সতুর মা। তিনি জানেন রামুর হাতে ছুরি আছে। এবং সে-ছুরি সতুর বুকে বা পেটে বসিয়ে যখন দেবে তখন একবারও হাত কাঁপবে না।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত মহা-আবির্ভাবের সব পুণ্য ফুৎকারে উড়ে গেছে। কোন্ মহাশূন্যে ধুলো হয়ে উড়ে হারিয়ে গেছে; তার উপর—

মনে পড়ল নীলুর এবং নীলুর মায়ের এবং নীলুর মাতামহের ইতিহাস। জন্মগত পাপ ছেলেটার রক্তের মধ্যে কীর্তিনাশার কুটিল ধ্বংসের প্রবৃত্তিতে আবর্তিত হচ্ছে।

আশ্চর্য কি?

একটু বিষণ্ন হাসির রেখা ঠোঁটের কোন এক কোণে ফুটে উঠল আপনা-আপনি। জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু মারলে কেন? কারণটা কি? টাকাকড়ি ছেনতাই? না জুয়োটুয়ো— ?

—না না। বাবু কারণ আমি—।

নিজে কপালে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে মেয়েটি বললে—আমি তার কারণ। আমার জন্যে—

—তোমার জন্যে? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না সুধাংশুবাবুর।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ আমার জন্যে। ওই বরেন মল্লিক ছিল—

থেমে গেল মধ্যপথে। আকস্মিকভাবে।

রূঢ়স্বরে সুধাংশুবাবু বললেন—হ্যাঁ—। ওই বরেন মল্লিক ছিল—। কি ছিল? বল।

—ছিল—

কঠিন স্বরে সুধাংশুবাবু বললেন—হ্যাঁ—। কি ছিল তাই বল। মনে মনে বললেন—বুঝেছি। তুমি প্রেতনী সে প্রেত। তা স্বীকার করতে এখনও তোমার লজ্জা!

মনে মনে অকারণে নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিলেন তিনি।

তবু সেই একটি রাতের কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। আবার তিনি কিছুটা কোমল হবার চেষ্টা করে বললেন—বল। আদালতের ব্যাপার—এখানে না বললে তো চলবে না!

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে—কি বলব তাই ভাবছি! কি ছিল? এক বিচিত্র জাতের হাসি হেসে বললে—সে-কালে শুনেছি কেনা দাস-দাসী ছিল। বরেন মল্লিকের কাছে আমি ছিলাম তাই। আমাকে সে কিনেছিল। নগদ টাকা গুণে দিয়েছে। দলিলে সই করিয়ে নিয়েছে।

—দলিলে সই করিয়ে নিয়ে সে কিনেছিল তোমাকে? চমকে উঠলেন সুধাংশুবাবু। চাঁপার কথার মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা ছিল না—এবং সুধাংশুবাবু একজন বড় অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞ—তিনি বহু বিচিত্র প্রথা ও ঘটনার কথা জানেন তবু তাঁব প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় প্রকাশ না পেয়ে পারলে না! এবং সে বিস্ময অনেক বিস্ময়। এমন কোন কথা তো তাঁর প্রতিবেশী নিত্যবাবুর কাছে তিনি শোনেননি। না। কোন আভাসই সে তো দেয়নি।

চাঁপা স্পষ্ট ধীর কণ্ঠস্বরে উত্তর দিলে—একবার নয় দু'বার। প্রথমবার বাবার সামনে দু'হাজার টাকার নোটের গোছা আমারই হাতে তুলে দিয়েছিল। বাবা বলেছিল—নে মা নে, আমাকে বাঁচা। নইলে আমাকে জেলে যেতে হবে। পুতুলের মতোই আমি নিয়েছিলাম। মল্লিক বলেছিল—বাবাকে দাও, ও গুণে নিক আর শোন—এ ছাড়াও তোমাকে গহনা দেব—পোশাকআশাক কাপড়চোপড় দেব। তবে কোনদিন আমার স্ত্রীর দাবি করতে পাবে না। গহনাও সে আমাকে দিয়েছিল। সেও বাবা বেচেছে মা বেচেছে সে বেচেছে। আমি? আমিও বেচেছি। একটুক্ষণের জন্য চুপ করলে

চাঁপা তারপর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে গেল—কোন কথা আজ আপনার কাছে গোপন করব না। সেদিন যেদিন দু'হাজার টাকায় প্রথমে বিক্রি হলাম, সেদিন ওই লোকটার কথা শুনে আমার শরীর যেন কাঠ হয়ে গিয়েছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল—আমার গলাও যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনের মধ্যে কোন বলবার কথা খুঁজে পাইনি—হারিয়ে গিয়েছিল। আমি কোন কথা বলিনি, বলতে পারিনি। শুধু বসেই ছিলাম। বাবা আমার হাত থেকে নোটের গোছাটা টেনে নিয়ে কখন একসময় নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল। তারপর—

দু'হাতে মুখ ঢাকলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবুও নির্বাক হয়ে গেলেন। শুধু নির্বাক নয় যেন নড়াচড়ার শক্তিও তাঁর ছিল না।

এতবড় অপরাধ আইনের উকীল, তিনি জানেন ভূমি আর নারী এই নিয়েই যত অনর্থ ঘটে পৃথিবীতে। ভূমির চেয়েও বোধ হয় নারীর হাট বেশি বিস্তৃত। বাপ বিক্রি করে কন্যাকে, মা বিক্রি করে কন্যাকে, স্বামী বিক্রি করে স্ত্রীকে, ভাই বিক্রি করে বোনকে; নারী নিজে বিক্রি করে নিজেকে।

পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ মহাভারতের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক এবং মহৎ জন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশায় জুয়াখেলায় পণ রেখে হেরেছিলেন।

অনেকক্ষণ পর সুধাংশুবাবু বললেন—এস ভিতরে এস। বস ওই চেয়ারে। বল তোমার ছেলের কেসের কথা!

—আমার নীলু—।

দু'চোখ থেকে দুটি জলের ধারা আবার গড়িয়ে এল। চেয়ারের উপর বসে হাত দু'খানি কোলের উপর রেখে বলতে আরম্ভ করেছিল।—আমার নীলু—বলেই কিন্তু থেমে গেল। থেমে গেল বলা ঠিক হলো না; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা দুটি আপনি বন্ধ হলো এবং জলধারা গড়িয়ে পড়ল দুটি চোখ থেকে।

—নিজেকে একটু শক্ত কর। ভেঙে পড়লে চলবে না। শান্ত হয়ে আস্তে আস্তে বল। গুছিয়ে পরিষ্কার করে বল।

—আমার নীলু আমার গরুড়।

—গরুড়? কি বলছ?

—পুরাণের গরুড়ের কথা বলছি। তার মা বিনতার দাসীত্ব মোচন করেছিল অমৃত এনে। মল্লিকের বুকে-পেটে ছুরি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে নীলু পালিয়ে যাবার সময় আমাকে বলেছিল—যা এবার তুই খালাস। ইচ্ছে করে তোকেও শেষ করে দি। তা থাক। তুই মা। এরপর কিন্তু তুই যদি এ পাপ করিস তাহলে আমি বেঁচে থাকলে তোর রক্তে আমি চান করব।

আমি পাথর হয়ে গেলাম। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলাম ফুটপাথের উপর। নীলু ছুরি উঁচিয়ে ছুটে ঢুকে গেল গলির মধ্যে। মল্লিকের রক্তে আমার কাপড়চোপড় লাল

হয়ে গেল। লোকজন জমে গেল; পুলিস এল, গলিটার ওদিক থেকে কতকগুলো লোক নীলুকে ধরে নিয়ে এল—তারা ধরেছে নীলুকে।

আপনি দেখেছেন সে গলি।

আমার কাছে এসে আমাকে ফুটপাথের ওপর রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নীলু বললে—যা, তুই এবার নিষ্কণ্টক। আমার ফাঁসি হবে। আর কেউ তোর পথ রুখে দাঁড়াবে না।

তারপর বললে—এরপরও যদি তুই এ-পাপ করিস তবে তোর যেন কুষ্ঠ হয়। যদি না হয় তবে ফাঁসি গিয়ে প্রেত তো আমি হবই। সেই প্রেত হয়ে ভগবানের বুকে গিয়ে ছুরি বসাব আমি। তারপর মরা ভগবানটাকে টেনে নিয়ে কবর দিয়ে দেব নরকের পাঁকের মধ্যে।

শিউরে উঠলেন সুধাংশুবাবু।

চাঁপা বললে—পাপ কার তা আমি জানি না। তবে পাপের পাঁক আমি সর্বাঙ্গে মেখেছি। আপনি একদিন স্বচক্ষে দেখে এসেছেন আমার সে পাঁকমাখা চেহারা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এমনি সেজে আমাকে বসে থাকতে হত। আর যে লোকটা সেদিন জানালায় টোকা মেরে কথা বলেছিল—যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেই লোকটাই মল্লিক। সেদিন সেই দাঙ্গার অবস্থা বলেই সে ফিরে গিয়েছিল। নাহলে সে ফেরবার মানুষ ছিল না। সে একটা জন্তু। নিষ্ঠুর জন্তু। সাপের মতো। কুমীরের মতো। আমার বাবা টাকার জন্যে বিক্রি করেছিল আমাকে; সে আজকের কথা নয়। কুড়ি বছর আগে। তখন আমার বয়স ষোল। আজ পনের বছর ধরে ওই অজগরটা ওই কুমীরটা আমাকে তিল-তিল করে গিলেছে। কঠিন জীবন আমার, আমি মরিনি।—সে কেঁদে ফেললে এতক্ষণে। সুধাংশুবাবু একটু নড়েচড়ে বসলেন।

বহুদর্শী মানুষ তিনি। অনেক অপরাধী ঘেঁটেছেন—অনেক অপরাধ দেখেছেন; তিনি জানেন সত্য এবং ভাবাবেগ সূর্যের আলো এবং রঙিন চশমার মতো অথবা আলো এবং রঙিন ফানুসের মতো। রঙিন বাল্‌বের বিচিত্র খেলায় রঙ্গমঞ্চে পর্দার উপর ঘনঘোর মেঘপুঞ্জ ভেসে যায়; দূরে পাহাড়ের মাথা থেকে মিথ্যা নদীর জলপ্রপাত ঝরে পড়ে; মিথ্যা সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দিন রাত্রির মায়ার সৃষ্টি করা যায়। সে হয়তো রঙ্গমঞ্চের সত্য, নাটকের সত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ঘটনাবর্ত। তার পটভূমি আছে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আছে, অকৃত্রিম দিন-রাত্রিতে একটা কাল আছে; অনেক হাসি-কান্নার আবেগও আছে। কিন্তু সে আবেগ চাঁপার আজকের আবেগ নয়। চাঁপার আবেগ আজ রঙ্গমঞ্চের রঙিন আলোর মায়াবিভ্রম হয়ে উঠে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাছাড়া নারী যখন দেহকে আঁকড়ে ধরে তখন সে ছলনাময়ী। মিথ্যাবাদিনী।

সুধাংশুবাবু বাধা দিয়ে বললেন—দাঁড়াও। একটা প্রশ্ন করব।

চাঁপা চুপ করলে এবং সুধাংশুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুধাংশুবাবু বললেন—পনের বছর আগে তোমার বাবা মল্লিকের কাছে দু'হাজার টাকা নিয়েছিল—পনের বছর তুমি এই মল্লিকের রক্ষিতা হয়ে আছ—

দুই হাতে মুখ ঢাকলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবুর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। তিনি বললেন—তুমি বলছ এতদিন তার কাছে থেকেও তুমি তার প্রতি অনুরাগিণী ছিলে না? তোমাব আসক্তি ছিল না? মুখ ঢাকা হাত দু'খানা সরিয়ে নিয়ে ভুরু কপাল কুঁচকে বোধ করি ভেবে নিলে চাঁপা।

সুধাংশুবাবু বললেন—সব তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে এই কথা বিশ্বাস করতে বল?

চাঁপা মুখ নত করলে এবার তারপর বললে—না তা বলব না। সংসারে দেহের একটা কামনা আছে—পেটের ক্ষিদের মতো একটা ক্ষিদেও আছে। অভ্যাসেরও একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এই তো সব নয়। দেহের পবে মন আছে। দেহের ক্ষিদে মিটে গেলে মন কেঁদেছে দেহকে তিরস্কার কবেছে। প্রতিজ্ঞা করতে বলেছে—কতবার প্রতিজ্ঞা করেছে—আর যাব না আর যাব না আর যাব না। সে চেষ্টাও করেছি। যাইনি। বাড়ি থেকে বের হইনি। বাড়ির দরজা বন্ধ করে থেকেছি। তাবপর শুরু হয়েছে অদৃশ্য অজগরের পাকের চাপ।

আপনার মনে আছে? একবার মা আর আমি দেনার জন্যে নালিশের সমন নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। ওই মল্লিকই নালিশ করেছিল। এ টাকা নিয়েছিল আমার স্বামী।

সুধাংশুবাবুর মনে পড়ে গেল আর একটি সন্ধ্যার কথা। তাঁর আপিসঘরে চৌকির উপব সামনেই বসেছিল এই চাঁপা। সেও প্রায় বারো বছর আগে। তখনকার চাঁপা ছিল তরুণী। মনে পড়ছে তার পিঠ ধরে তাকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিল সেই রুগ্ন ছেলেটা। মাথার চুলগুলি পিঙ্গল কোঁকড়ানো, চোখের তারাও পিঙ্গল, গায়ের রঙ তেমনি পিঙ্গলাভ গৌর; দুই হাত দিয়ে মায়ের মাথার কাপড় ধরে টেনেছিল; সঙ্গে সঙ্গে এই মা ফণাতোলা সাপের ছোবল মারার মতো তার ডান হাতের ঝটকা দিয়ে ছেলেটাকে যেন ছোবলই মেরেছিল। ছেলেটা টাল সামলাতে পারেনি—তক্তাপোশের উপর থেকে মুখ ঠুকে পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর। আর্তনাদ করে কেঁদে উঠেছিল ছেলেটা। সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবাবু ফেটে পডেছিলেন নিষ্ঠুর ক্রোধে, বলেছিলেন—এই নির্লজ্জ নষ্ট মেয়ে কোথাকার!

মেয়েটা চকিতের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠে তাঁর দিকে তাকিয়েই যেন নিভিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। এবং পবক্ষণেই বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে মাকে বলেছিল—বেরিয়ে আয় এখান থেকে। মা!

সেদিনও সুধাংশুবাবু তাকে বিচার করবার সময় সুবিচার করেননি। মেয়েটির ওই আচরণের জন্য তাকে নষ্ট বলার হেতু ছিল না। সে কথাটা যেন আপনা থেকে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। হয়তো ওই বেদনা দুঃখে আহত মেয়েটির আজকের মাতৃরূপটিই আজকে তা মনে করিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, সুধাংশুবাবু আজ যেন সত্যই বাস্তবের চেয়ে কিছু বেশি অনুভব করছেন এই মুহূর্তে।

মনে পড়ল চাঁপার নাম রত্নমালা।

ওর স্বামী ছিল—তার নাম ছিল প্রণবকুমার চক্রবর্তী। সে তখন বিধবা কিন্তু সারা অবয়বে ছিল স্বৈরিণীর পরিচয়।

সেদিন চাঁপার জীবনের পাপের ছাপ গোপন ছিল না। তবে তার সঙ্গে একটা দর্পিত ঔদ্ধত্য ছিল। আজও সে পাপের ছাপ মোছেনি। অনেক চোখের জলে সে নিজেকে ধুয়েছে; তবু মোছেনি। কিন্তু সে ক্ষোভ তার নেই। ক্ষোভ তার মুছে গেছে।

চাঁপা বললে—রূপ আমার ছিল, তখন আমার অল্প বয়স—বয়স কত হবে? ষোল বছর। সদ্য বিয়ে হয়েছে। বছর ঘোরেনি। মা-বাপের একমাত্র মেয়ে। বাপ তখনও একটা ফ্যাক্টরির মালিক। জীবনে অনেক সাধ স্বপ্ন। যুদ্ধের ঝড়ে সে-সব উড়ে গেল। আমি উড়ে গেলাম না—ভেসে গেলাম না—না খেয়ে মরলাম না—বিক্রি হয়ে গেলাম। দেহ বিক্রি করে দিলে বাপ—দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করতে পারলাম না তাই আত্মাও বিক্রি হলো আমার।

৪

বাবা ছিল বিচিত্র মানুষ। ফাঁকা শূন্য মাটির কলসীর মতো মানুষ। বিয়াল্লিশ সালে যুদ্ধের বাজারে যখন সকলে লাভ করলে তখন বাবার হলো দেনা। তার একটা কারণ হলো সেসময় যে স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের জন্য মিলিটারী কনট্রাক্ট নেয়নি। তার উপর চ্যাটুজ্জেবাবুদের কাছে কোন একটা কনট্রাক্টের মাল দেয়নি বলে খেসারতের দায়ী হয়েছিল।

বাবার কথা হয়তো জানেন। বাবা সেকালের লোক। মদ খেতো, থিয়েটারপাগল ছিল, চরিত্রদোষও ছিল কিন্তু তার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে স্বদেশী-পাগলও ছিল। বিয়াল্লিশ সালে সাইক্লোন হয়ে বাংলাদেশ ভাসিয়ে দিয়েছিল উড়িয়ে দিয়েছিল—সারা কলকাতা শহরে মেদিনীপুরের আর চব্বিশ পরগনার মানুষেরা এসে ফ্যান আর এঁটোকাঁটা ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল—পথের ধারে পড়ে মরছিল যখন, তখন বাবা আমার মাস কয়েক—তা মাস ছয়-সাত একটা লঙ্গরখানা চালিয়েছিল।

থাক।

এসব বলে আজ কি লাভ?

কোন লাভ নেই। থেমে গেল চাঁপা।

সুধাংশুবাবু বললেন—বল। আমি শুনছি।

চাঁপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—নিজে আমি নিজেকে বিক্রি করিনি আপনি এইটুকু বিশ্বাস করুন। এ দেশের সেকালকে আপনি জানেন না—সেকালে আমার মতো অনেক মেয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিক্রি হয়ে গেছে। হয়তো সকল কালেই হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের কালের মতো এমন করে মা-বাপের সংসারের পেটের দায়ে হাট বসিয়ে মেয়ে কখনও বিক্রি হয়নি। তাদের কার কি হয়েছে তা আমি জানি না। আমি আমার কথা বলছি। তাদের হয়তো অধিকাংশই মরে খালাস পেয়েছে। কত

জনে এটাকেই জীবনে সইয়ে নিয়েছে। দিব্যি ঘর বাহির বজায় রেখেছে। কোন জ্বালা নেই কোন সংশয় নেই। শুধু আমিই মরতে পারিনি, মরিনি; বেঁচে থেকেও সইয়ে নিতে তো পারিনি। আজও পাপের পঙ্কে ডুবে আছি। সেই পাঁকের রসই আমি নিত্য পান করি। আমার সারা দেহ-মন জ্বলে যায়। একটু থেমে তারপর বললে—যেদিন বাবা আমাকে বেচলে, দু'হাজার টাকাব নোট মল্লিক আমার হাতে দিলে, বাবা আমার হাত থেকে নিয়ে বেরিয়ে এল। আমি পঙ্গু হয়ে বসে রইলাম ঘরেব মধ্যে, ঘরের আলোটা নিভে গেল। এরপর আমাকে বিশ্বাস করুন আমার দেহে মনে সত্যিই আগুন জ্বলল; আমি বাবাকে বললাম—বাবা, আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচতে দাও। বাবা বেতমারা কুকুরের মতো ছুটে পালাল। একদিন নয় দশদিন বলেছি—শেষে একদিন পাথর ছুঁড়ে মেরেছি বাবাকে। কপালটা ফেটে গিয়েছিল তার। সে বক্ত আমাকেই আবাব ধুযে মুছাতে হয়েছিল। বাবা আমার অভাবে লোভে দুঃখে জানোয়ারের অধম হযে পড়েছিল। মা ছিল অদ্ভুত মানুষ। সব অদৃষ্ট বলে মেনে নিত। বোকা বোকা অদৃষ্টেব খেলাব পুতুল।

বিয়ে হযেছিল। স্বামী ছিল। তাকে প্রথমটা বলতে পারিনি। শেষ তাকে ধরলাম। স্বামীকে বললাম—তুমি বাঁচাও। বাবা আমাকে বেচেছে—তুমি আমাকে ওব থেকে খালাস কবো।

চাঁপা একটা গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীরবে 'না' বলার ভঙ্গিতে ঘাড নাডলে। জানালে, 'পাবলে না' বা 'করলে না খালাস', অথবা 'হলো না।'

বললে—এরা না সেই স্বামী না সেই পুরুষ। কীচকের হাত থেকে দ্রৌপদীকে ভীম বক্ষা করেছিলেন কীচককে মেরে। আমি আমার স্বামীর পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম, বলেছিলাম—তুমি বাঁচাও। কিন্তু আমার—; কি বলব?

প্রশ্ন কবে মেয়েটি কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিযে রইল। তাবপর বললে—বাবা আমাকে ছুঁড়ে নরককুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল—আমার স্বামীর দিকে আমি হাত বাড়িয়ে ডাকলাম, বললাম—আমাকে বাঁচাও; সে আমাকে বাঁচাতে এসে বুকে একখানা পাথব চাপিয়ে একেবারে এই দুঃসহ পঙ্ককুণ্ডটার পাঁকগোলা জলের তলায় পাঁকের উপর শুইয়ে দিয়ে গেল। আজও সেই সেইখানেই শুয়ে আছি আজ ষোল বছরের উপর। আশ্চর্য, মরিনি। মরণ তো এমনি এতে হয় না, মরতে হয়—কিন্তু সে মবতে আমি পারিনি। এর জন্যে এত ঘেন্না করি যে কি বলব আপনাকে। একটু চুপ করে থেকে সে বললে—আমার বাবাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। আপনাকে কত বলব কলঙ্কের কথা লজ্জার কথা ঘেন্নার কথা; বাবার কলঙ্ককথা বলে শেষ হয় না—বাবা মদ খেতো চরিত্রহীন ছিল—তার সঙ্গে দেশ দেশ করত—গরীবকে দেওয়ার নামে উড়িয়ে বড়লোকগিরি করত এই তো সব নয়; আমাকে বেচার আগেই বাবা আমার মাকে পাঠিয়েছিল চাটুজ্জেবাড়ি; সেখানে চাটুজ্জেগিন্নী জানতে পারে ঘটনাটা। তার থেকেই চাকরি দিয়েছিল মাকে। তার পুজোর ঘর ঠাকুরের আসন পরিষ্কার করাতো। শুধু

পেটের ভাতটা তাতে হতো। তার বেশি কিছু না। সংসারের অন্নের জন্যে মানুষ কি যে না পারে, না করে তা জানি না আমি। নিজেকে বেচেছি আবার মায়ের ওই চাকরিটা তাও নিয়েছি। মায়ের পর আমি নিয়েছিলাম সে কাজ। নিত্য যেতাম সকালে আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে সে আপনি দেখেছেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু।

মনে হলো কথাটা ইঙ্গিতে নিত্যবাবু যেন বলেছিলেন।

চাঁপা বললে—কিন্তু বাবার থেকেও বেশি ঘৃণা করেছিলাম আমার স্বামীকে। সে আমার স্বামী। আপনি বিশ্বাস করুন ব্যভিচারে অামার প্রবৃত্তি ছিল না, অলংকার আভরণ সাজসজ্জা এতেও আমার লোভ ছিল না, আমার রূপ ছিল, তখন আমার সদ্য-যৌবন, সেও তখন নবযৌবনে নতুন জোওয়ান—নারীর উপর তার লোভ ছিল—কিন্তু সে ওই রাক্ষসটার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারেনি। দু'জনে আমরা পরামর্শ করেছিলাম—তাকে আমি তাতিয়েছিলাম, বলেছিলাম—তুমি ওকে খুন কর। ছোরা কিনবার টাকা তাকে আমি দিয়েছিলাম। ছোরা কিনেও সে এনেছিল, গিয়েও সে ছিল। কিন্তু খুন করে প্রাণ নেওয়ার বদলে সে টাকা নিযে ফিরে এসেছিল চোরের মতো। কম টাকা নয়—তাকেও দু'হাজার টাকা দিযে বলেছিল—ব্যবসা কর। আরও সাহায্য করব আমি। কি হয়েছিল শুনুন।

আমার স্বামীর নাম প্রণব চক্রবর্তী। অবিকল নীলু।

একটু হেসে চাঁপা বললে—ভুল বলছি—নীলু অবিকল তাব মতো। ওই গায়ের রঙ, ওই কটা গৌরবর্ণ কটাসে চুল, ওই খয়রা কটা চোখের তারা, ওই মুখ ওই সব।

থেমে গেল চাঁপা। হঠাৎ যেন তার ভেতর থেকে কেউ বা কিছু তাকে থামিয়ে দিলে। থমথম করে উঠল তার মুখ।

চাঁপা বলেছিল তার রূপ ছিল।

মিথ্যে বলেনি। তা ছিল। কিন্তু সে রূপের উপর বিচিত্রভাবে কিছুর যেন ছায়া পড়েছে। একটা গ্লানির আস্তরণ পড়েছে। সেই আস্তরণ ভেদ করে বিদ্যুচ্চমকের মতো কিছু খেলে গেল। সেটা হয় ক্ষোভ নয় ক্রোধ অথবা একটা নিদারুণ কোন আক্ষেপ!

তারপর বললে—তার সঙ্গে নীলুর চেহারার এত মিল বলেই নীলুকে আমি তার জন্মকাল থেকে চোখে পাড়িনি। তাকে ঘেন্না করে এসেছি—তার মৃত্যু কামনা করেছি। মায়ের কাছে ছেলের যা পাওনা তার, বলতে গেলে, কিছুই দিইনি। অহরহ কেমনভাবে মর মর বলে তাকে অভিসম্পাত দিয়েছি সে আপনি নিজে জানেন। কাছে আসতে চাইলে কিভাবে তাকে কুকুর-বেড়ালের মতো আঘাত করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি তাও আপনি দেখেছেন।

নীলুর কপালে নাকে মাথায় পাঁচ-ছ'টা কাটার দাগ আছে। তার মধ্যে আমার নিজের হাতের আঘাত আছে তিন-চারটে। বাকি দু'তিনটে সেও আমারই অবহেলায়

অথবা ঠেলায় কি হাতের ঝটকায় পড়ে গিয়ে কেটে গিয়ে দাগ রেখে গেছে। কত আঘাতের কত চিহ্ন যে নীলু আপন সহ্যগুণে নিজেই মুছে ফেলেছে তার আর হিসেব নেই।

সুধাংশুবাবু বললেন—তুমি যা বলছিলে তাই বল। তোমার স্বামীকে তুমি সমস্ত বলেছিলে এবং দু'জনে ঠিক করেছিলে যে, ওই মল্লিককে সে মানে প্রণব খুন করবে, কিন্তু সে তাকে খুন করতে গিয়ে আরও দু'হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এসেছিল। বল কি হয়েছিল। তার আগে দাঁড়াও, কতদিন আগের ঘটনা? যেদিন তোমার বাবা তোমাকে বেচে দু'হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল তার কতদিন পর ? হ্যাঁ। বিয়ের কতদিন পর এ ঘটনা ঘটেছিল ? মানে তোমার বাবা তোমাকে এমনভাবে বেচেছিল ? যখন বিক্রি করে তখনই বা সে কোথায় ছিল ? মানে তোমার স্বামী ? দেশ কোথায় ছিল তার ? তাদের অবস্থাই বা কেমন ছিল ? সংসারে স্ত্রী কন্যা ভগ্নী বিক্রির হাজার লক্ষ কোটি নজির আছে কিন্তু তার পিছনে থাকে নানান কারণ। মদ মানুষ খায়, নেশার লোভেও খায়, নিদারুণ শোকেও খায়, আবার ডাকাতি খুন করবার আগেও খায়।

মা-বাপ নেই, কলেজে পড়ে এমনি দেখেই বাবা আমার স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিল। সে নাকি লেখাপড়ায় ভাল ছিল। ইচ্ছে ছিল, আমি তার এক মেয়ে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরে রাখবে; জামাই ছেলের মতোই তাব সব দেখবে—ঘরসংসার কারখানা চালাবে।

কারখানা তখনও চলছিল। তখনও বাবা বুঝতে পারেনি যে ভিতরে-ভিতরে সর্বনাশ তার হয়ে গেছে।

চৌদ্দ বছরে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমার স্বামী তখন আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের তিন মাস পরে রেজাল্ট বের হলো। খুব ভাল করে পাস করেছিল জামাই। বাবা তাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল। থাকত হোস্টেলে। রবিবারে, ছুটিতে আসত, থাকত, চলে যেত। এক বছরের মধ্যে সব উলটে গেল পালটে গেল; ওই বিয়াল্লিশের ঝড়ে যেমন সারা দেশটা ভেসে গিয়েছিল উড়ে গিয়েছিল তছনছ হয়ে গিয়েছিল তেমনিভাবে আমাদের সংসার অবস্থা সব ভিতধ্বসা বাড়ির মতো ভেঙে পড়েছিল—মাথার উপরের চাল উড়ে যাওয়ার মতো উড়ে গিয়েছিল।

তবে বিয়াল্লিশ সালে নয়, দু'বছর পরে বাবার উপর ঝড়টা এল—১৯৪৪ সালে হঠাৎ একদিন বডি ওয়ারেন্ট এসে হাজির হলো। আদালতের লোক পুলিস বাবার নামে বডি ওয়ারেন্ট দেখিয়ে বাড়ি ঘিরে ফেললে। ওদিকে কারখানাতেও তালা চাবি দিয়ে সীল করে পাহারাওলা বসিয়ে দিয়েছে। বাবা কোনরকমে একশো টাকা ঘুষ দিয়ে পালাল।

সে অনেক কথা।

গহনাগাঁটি বিক্রি করে টাকা দেওয়া হলো। বাড়ি বন্ধক পড়ল চাটুজ্জেদের কাছে।

মা অনেক সেবা করে এল চাটুজ্জেদের ঠাকুরের, চাটুজ্জেদের বুড়ো কর্তার; কিন্তু দায় তাতেও মিটল না। অবশেষে বাবা একদিন আমাকে বেচলে। ১৯৪৪ সালে।

আমি সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। তিন দিন খাইনি! উপোস করে পড়েছিলাম। মা পুতুলের মতো মাথার কাছে বসেছিল। বাবা থিয়েটারে অ্যাকটিং করে যারা শোক করে, তাদের মতো বুক চাপড়ে হায় হায় করলে। তিন দিন পর মল্লিকই এল, এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

সেদিন সে রাজ্যের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। গহনা শাড়ি ব্লাউজ খাবার-দাবার—সে যেন একটা নতুন বিয়েব পরের তত্ত্বতল্লাশী ভারভারোটা। সেন্ট পাউডার স্নো সাবান—সে থরে থরে সাজানো জিনিস।

ইচ্ছে হয়েছিল পায়ের লাথি মেরে সব ছুঁড়ে ফেলে দি—ভেঙে চুরমার হয়ে যাক। কিন্তু পারিনি। কেন শুনুন!

লোকটা আমার সামনে দাঁড়াবামাত্র আমার ভয়ের আর শেষ ছিল না। বুকের ভিতরটা যেন কাঁপছিল। মনে পড়ে গেল দু'হাজার টাকা সে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। বাবা টাকাটা আমার হাত থেকে নিয়ে আমাকে তার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল বেরিয়ে। লোকটা আমাকে ভোগ করেছিল বুভুক্ষুর মতো। রাক্ষসের মতো। আমার চেতনা ছিল না— আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সে আমাকে গাড়ি করে এনে ওই আমাদের গলির মোড়ে, যে মোড় দিয়ে আপনি সেদিন ঢুকে পড়েছিলেন, যে মোড়ের মাথায় মল্লিক খুন হয়েছে সেই মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। মোড়ে বাবা দাঁড়িয়েছিল, আমার হাত ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ছে লোকটা আমাকে বলেছিল—তোমার বাবা তোমাকে বেচেছেন আমাকে। তুমি এখন আমার।

তখন আমার বয়স ষোলতে পৌঁছয়নি। আমি বোবার মতো শুধু শুনেইছিলাম। এ কাল হলে হয়তো বলতে পারতাম, বলতাম মানুষ টাকায় বিক্রি হয় না। মানুষ কেনা-বেচার কাল চলে গেছে। কিন্তু সেকালে সে বোধও জন্মায়নি, সাহস তো হয়ইনি।

তাই তিন দিন উপোস করে আছি যখন তখন সেই লোক, যে লোক সেদিন দু'হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে আমার অবশ বিবশ অসাড় দেহখানাকে ছিনিমিনি খেলার নজির মনে পড়িয়ে দিয়ে আমাকে কিনেছে বলে মুখের কথার দলিল আমার সামনে ধরলে, আমার মনে হলো: আমার বুঝি উপোস করে কি বিষ খেয়ে মরারও অধিকার নেই। লোকটা বোবা আমাকে দিয়ে যে মৌন সম্মতির সই বা টিপছাপ দিয়ে নিয়েছে তা আমার অস্বীকার করবার সব জোর একমুহূর্তে হারিয়ে গেল।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কেঁপে উঠলাম।

'—একটু জল দেবেন, আমি একটু জল খাব।'

চাঁপা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কথা ক'টি বললে।

সুধাংশুবাবু একেবারে যেন আচ্ছন্নের মতো বসে শুনছিলেন। চাঁপা চুপ করতেই

এবং কথা কয়টার অর্থ তাঁকে বাস্তবে এই ১৯৬০ সালের জুলাই অর্থাৎ শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণে ভিজে ভিজে এই রাত্রির অস্তিত্বে সচেতন করে তুললে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেওয়ালের ক্লক ঘড়িটার পেন্ডুলামের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চাঁপার মুখখানার উপর তাঁর দৃষ্টিও এতক্ষণে সচেতন হলো। সত্যই চাঁপার একদা রূপ ছিল। আজও আছে—নেই তা নয়। তবে আজকের রূপ বাসী ফুলের মতো। গন্ধেও তার সেই এক পরিচয়। বিকৃত এবং বাসী। চাপার মুখের উপর চোখের কোল থেকে চিবুক পর্যন্ত দুটো দাগ আলোর ছটায় চকচক করছে। যতক্ষণ এই কথা সে বলছে ততক্ষণ সে নিরন্তর আত্মসংবরণের চেষ্টা করে ধীরে ধীরে কথা বলেছে এবং এরই মাঝে মাঝে কেঁদেও চলেছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছে, গড়িয়ে ঝরে পড়েছে, চাঁপা তা মুছতে চেষ্টা করেনি, হয়তো তার মতোই তারও এ সম্পর্কে কোন সচেতনতা ছিল না।

তিনি একদিকে শুনছিলেন অন্যদিকে বিচার করছিলেন মেয়েটির কথার সত্যাসত্য।

মেয়েটি ?

মেয়েটি অকপট সত্য বলে যাচ্ছিল তার সাক্ষী ওই দুটি জলধারার চিহ্ন। সেও নিজেকে বিচার করে কথা বলছিল।

সুধাংশুবাবুর টেবিলের উপর পুরির ঝালর দেওয়া নেটের ঢাকনি ঢাকা কাচের গ্লাসে জল ছিল, গ্লাসটি তিনি নিজের হাতে তুলে বাড়িয়ে ধরলেন।

খাও।

মেয়েটি বললে — এই গ্লাসে খাব ?

—খাবে।

কিন্তু মেয়েটি তা খেলে না, গ্লাসটি হাতে নিয়ে বাইরে গিয়ে গ্লাসটা উঁচু করে ধরে মুখ তুলে অনেকখানি জলে মুখ ধুয়ে নিলে, তারপর খসেপড়া ঘোমটাটি আবার মাথায় টেনে শান্ত হয়ে ফিরে এসে সামনে বসল। জলের গ্লাসটি টেবিলের তলায় রেখে দিল।

বাইরের দিকে তাকিয়ে সুধাংশুবাবু চুপ করে বসে ছিলেন। তার কাছে এই মুহূর্তে সব হারিয়ে গেছে। চোখে কিছু দেখছেন না, মনে কিছু ভাবছেন না। কানের কাছে শুধু শেষ কথা কয়টা ধ্বনিত হচ্ছে এবং এই হতভাগিনী মেয়েটার বলা কাহিনী, যে পর্যন্ত সে বলেছে, তারই প্রভাব তার চেতনা ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সামনে বারান্দার বাইরে পথের উপর বর্ষার রাত্রি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধ্যরাত্রির দিকে এগিয়ে চলেছে, রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর পোস্টে বাল্‌ব্ নেই, কেউ চুরি করেছে অথবা মিউনিসিপ্যালিটির যারা আলো দেয় তারাই ওটা দেয়নি। পরের পোস্টটার আলো থেকে একটু আলোর আভাস অন্ধকার শূন্যমণ্ডলে জেগে রয়েছে। তাঁর ঘরের ভিতরের কিছুটা আলো বারান্দা পার হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মিশেছে, সেই সংযোগস্থলের আভাসিত শূন্যমণ্ডলে দেখা যাচ্ছে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা নির্জন হয়ে গেছে। তিনি প্রতীক্ষা করে রয়েছেন চাপা মেয়েটির কথা শুনবার জন্য।

১৯৪২।৪৩।৪৪ সালের কথা মনে পড়ছে।

১৯৪২ সালে তিনি নতুন উকীল। মনে পড়ছে সেসময়কার কথা। ১৯৪৩ সালের পূজা সাহিত্যে লেখাগুলো আজও বেঁচে আছে। মন্বন্তর উপন্যাসের গীতা বলে মেয়েটির ঠিক এই কথা। প্রবোধ সান্যালের অঙ্গার গল্পের সেই ক'টি মেয়ের বিলাপের মতো সকরুণ আক্ষেপের সঙ্গে চাঁপার এই কথাগুলির এতটুকু গরমিল নেই। সেই সময়ের বাংলাদেশের এই সব হতভাগিনীদের মর্মান্তিক বিলাপ এবং সহস্রমুণ্ড রাবণের মতো কালোবাজারী অর্থশক্তিতে বলীয়ান মানুষের সে অত্যাচার নিষ্ঠুরতম সত্য বলেই, এই মুহূর্তে সুধাংশুবাবুর মনে পড়ছে। চিত্রায় জয়নাল আবেদিন সাহেবের কালো কালিতে আঁকা ছবিগুলো মনে পড়ছে। শুধু সাহিত্য শিল্প কেন তাঁর নিজের ওকালতির ইতিহাসে তাঁর সেরেস্তার খাতার পাতায় এমনি ছোট-বড় কেসের কথা আছে।

চাঁপা মিথ্যা বলেনি! তার কাহিনীর সত্য ইতিহাসের পাতা খুলে দিয়েছে।

মনে পড়ল গ্রামাঞ্চল থেকে যারা বেরিয়েছিল পেটের জ্বালায় তাদের যারা মরেছে তারা বেঁচেছে—যারা আছে যাদের যৌবন ছিল রূপ ছিল তারা আর ফেরেনি। এবং সেই যে সেদিন যুদ্ধের দ্যূতসভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করেছিল তার পালা আজও শেষ হয়নি।

চাঁপা এবার কথা বললে—এবার শুরু করলে সে।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু। তাঁর চিন্তার প্রবহমানতা খণ্ডিত হলো। ছেদ পড়ল।

চাঁপা বললে---যতবার চেষ্টা করেছি সাহস আনতে চেয়েছি বুকের মধ্যে ততবার যেমনি ওই লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অমনি ভেঙে বসে পড়েছি। মনের সাহস চলে গেছে, দেহের শক্তি চলে গেছে—আমি যেন হয়ে পড়েছি সাপের মুখে ধরা পড়া ব্যাঙের মতো। আমাদের গলিটার নর্দমায় একটা খুব মোটা জলঢোঁড়া সাপ আছে—সেটা রোজই প্রায় একটা ব্যাঙকে কামড়ে ধরে মাথা উঁচু করে চলে যায় আমাদেরই উঠোনের মাঝখান দিয়ে। উঠোনের কোণে জঙ্গলের মধ্যে তার একটা গর্ত আছে। সেখানে গিয়ে সেটাকে নির্বিবাদে গেলে। আমি দেখেছি তার গেলা। ব্যাঙটা যদি ব কাতরায় কিন্তু হাত-পা ছোঁড়ার বাধা দেবার শক্তি তার থাকে না। মধ্যে মধ্যে কোন একটা পা হয়তো থরথর করে কাঁপে।

হেসে চাঁপা বলে—জানেন লোকে বলে, মায়ের কাছে শুনেছি,—মা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বলে সাপে যখন ব্যাঙ ধরে তখন ব্যাঙটা যে ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দে কাতরায় তাতে বলে—কড়ি নে। কড়ি নে। তার মানে হলো সাপটা হলো গত জন্মের পাওনাদার আর ব্যাঙটা হলো ওই গত জন্মেরই দেনাদার; পাওনাদারের দেনা দেয়নি। তাই এ জন্মে পাওনাদার হয়েছে সাপ, ও হয়েছে ব্যাঙ! থাক। এখন যা ঘটেছিল বলি শুনুন। আমার স্বামীর কথা। মাস চারেক পর একদিন ওই লোকটাই শ্রীরঙ্গম থিয়েটারের টিকিট কিনে আনলে। আমার স্বামী তখনও কিছু জানে না। সে তখনও হোস্টেলে

থাকে। খরচ এই মল্লিকই দিত। শ্রীরঙ্গমে সেদিন হচ্ছিল 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। শিশিরকুমার ভাদুড়ী করবেন 'ভীম'।

—কোথা থেকে যে কি হয়! কি থেকে যে মানুষ কি পায়! সে এক আশ্চর্য হাসি হাসলে চাঁপা। হেসে বললে—দ্রৌপদী ভীমকে কীচকের কথা বললে ভীম তাকে আশ্বাস দিলে—তারপর কীচককে সে বধ করলে। আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠল। মনে হলো এই তো আমি উপায় পেয়েছি। যুধিষ্ঠিরেব উপর ঘেন্না হলো—অর্জুনকে বলতে ইচ্ছে হলো তুমি ওই বৃহন্নলা হয়েই থাক আজীবন।

একটু থেমে সে বললে—আজও আমি ভীমের ভক্ত। মহাভাবতে আমার কাছে ভীমের চেয়ে বড বীর নেই—বড মানুষ নেই।

—মনে আছে সপ্তাহের মাঝখানে বৃহস্পতিবারে পাণ্ডবগৌরব দেখতে গিয়েছিলাম। শুক্রবার তাকে চিঠি লিখলাম—নিশ্চয় আসবে কাল। না এলে আমাকে আর বেঁচে থাকতে দেখতে পাবে না। কিন্তু শনিবার সে এল না, এল পরের দিন রবিবার। শনিবার কোথায় গিয়েছিল। চিঠি পৌঁচেছিল সন্ধ্যের ডাকে। তখন আর হোস্টেল থেকে আসবার উপায় ছিল না। শনিবার-রবিবার লোকটার ডাক আসত না। ও দু'দিন তার অন্য আড্ডা ছিল। সে সব নাকি নাচগানের আসর।

সারাদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে চিঠি লিখে তার হাতে দিয়ে বললাম—পড়ে দেখ।

চিঠিতে লিখেছিলাম—যদি আমাকে মরতে বল তবে তুমিই আমাকে মাব, খুন কর। নয়তো বিষ এনে দাও—তুমি গুলে তুলে দাও আমি খাই—নযতো মহাভারতের ভীমের মতো তুমি ওকে খুন করে আমাকে বাঁচাও।

সারারাত সেও বোবা হয়ে বসে রইল, আমিও বোবা হয়ে বসে রইলাম। যখন রাত্রি শেষ হয়ে এল—ক্লক ঘডিতে ঢং ঢং শব্দে চারটে বাজল তখন আর আমি থাকতে পারলাম না, লজ্জার সব বাধাবন্ধন টেনে ছিঁডে ছিঁড়ে ফেলে দিযে তার দুটো পা জডিয়ে ধরে বললাম—বল আমি কি করব। কে আমাকে বাঁচাবে? আমি কি এমনি করেই মরব জ্বলব আজীবন?

সে আমাকে—।

একটু থেমে আবার বললে—দু'হাতে সমাদর করে বুকে তুলে নিয়েছিল। ভরসা দিয়ে বলেছিল—কোন ভয় নেই। এ বাঁচানোর দায় আমার। আমিই বাঁচাব তোমাকে।

আমি বলেছিলাম—আমাকে ঘেন্না করছ না তুমি?

—না। তারপর খুব জোর করে বলেছিল—আমি একালের মানুষ রত্না। একটু থেমে মেয়েটি বললে—জীবনে কতকগুলো কথা মনে থেকে যায় কাটা দাগের মতো। সে রাত্রের কথা আমার তেমনি যেন কাটা দাগ হয়ে বসে আছে। অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। সারারাত্রি দু'জনে বোবার মতো পড়ে থাকার পর ভোরবেলা এসব কথা হয়েছিল। ভোরবেলাতে সে হঠাৎ আমাকে সমাদর করে বুকে জড়িযে ধরেছিল।

সোমবার সকালে উঠেও সে যায়নি। সারাদিন শুধু এই নিয়েই কথা বলেছিল। অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল তার। সত্যকাম জাবাল আর তার মা জাবালাকে নিয়ে কবিতা শুনিয়েছিল আমাকে। মহাভারতের অহল্যার গল্প বলেছিল। আর গল্প বলেছিল কলেজে পড়া নেপালী ছেলে খড়্গবাহাদুরের কথা। খড়্গবাহাদুর নেপালী মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করবার জন্য—তাদের যুবতী মেয়ে কেনার গোপন ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য একজন ধনী ব্যবসাদারকে খুন করে গিয়ে থানায় ধরা দিয়ে বলেছিল—আমাকে ফাঁসি দাও। আমার স্বামী বলেছিল—তুমি আমার স্ত্রী—তোমাকে কিনে তোমাকে যে শয়তান ভোগ করেছে তাকে খুন করে আমি গিয়ে বলব- -দাও আমাকে ফাঁসি দাও!

সারাটা দিন নানান জল্পনা করেছিলাম।

সোমবার রাত্রিতেও সে আমাদের বাড়িতে ছিল। বিকেলে আমার কাছে টাকা নিয়ে কলকাতায় গিয়ে ছোরা কিনে নিয়ে ফিরে এসেছিল। সেটা স্প্রিংদেওয়া ছোরা। অনেকখানি লম্বা। ডগাটা ছুঁচালো আর ডগার দিকটা দু'দিকেই ধারালো। পরামর্শ করে ঠিক হয়েছিল পরের বৃহস্পতিবার আবার থিয়েটার দেখতে যাব। বাবাকে বলব—বাবা তাকে বলবে। এদিন তার সঙ্গে একলা যাব। সে তাতে খুশিই হবে। থিয়েটার শেষে সে আমাকে নামিয়ে দিতে আসবে এখানে। ওই গলির মোড়ে দিলে আমি বলব তাকে একটু দাঁড়িয়ে যাও। বাবা যদি থাকে দাঁড়িয়ে তাহলেও তাকে ডাকব। সে ছোরা নিয়ে গলিতে অপেক্ষা করে থাকবে। গলিতে ঢুকবামাত্র সে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দেবে।

তারপর কি হবে তা ভাবিনি। কি হবে এ চিন্তা আসেনি। শুধু এই মহাপাপ এই নরকের জ্বালা এই নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাব এইটেই মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল। দেশে তখন আকাশের বাতাসের মধ্যে দিয়ে তুফান বয়ে গেছে, দুর্ভিক্ষের জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে, যারা অভাবী, যারা মরছে, যারা ডুবছে, যাদের বাড়িঘর মানসম্ভ্রম সর্বস্ব হারাচ্ছে তারা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চাচ্ছে- -তাতে যা হয় হোক। আমরা দু'জনে সদ্য বিয়ে হওয়া ছেলে এবং মেয়ে—তার বয়স সবে উনিশ, আমার বয়স ষোলতে আমি পা দিয়েছি—আমাদের দু'জনেরই বুকে জ্বলছে আগুন। কি হবে তা ভাবিনি, ভাবতে চাইনি, সে ভাবনা মনে আসেনি। তবু মোটামুটি ঠিক হয়েছিল খুন করে সে পালাবে। প্রথম আমি বলব একটা গুণ্ডা লোক তাকে খুন করে পালিয়েছে—আমার গলার হার ছিঁড়ে ফেলে দেব গলির উপর। বলব—আমার হার ছিঁড়ে নিচ্ছিল দেখে সে তাকে বাধা দিয়েছিল, গুণ্ডাটা তাকে ছুরি মেরে পালিয়েছে।

আর ধরাই যদি পড়ে তাহলে আমি বলব সত্য কথা।

সেও বলবে—আমার স্ত্রীর সতীত্ব যে নষ্ট করেছে—যে শয়তান আমার স্ত্রীকে টাকার জোরে হরণ করেছে তাকে আমি খুন করেছি। রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল—রাম তাকে বধ করেছিলেন। আমিও আমার স্ত্রীর সতীত্ব হরণকারীকে বধ করেছি।

সে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল।

আমিও পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস দেখে এসেছিলাম—ঠিক যেন দ্রৌপদীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। সারা রাত্রি সারা দিন ঘুম হয়নি। কিন্তু—

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে চাঁপা। এবং চুপ করে গেল কিছুক্ষণের জন্য। মুখের উপর চোখের জলের দাগ দুটো আবার চিকচিক করে উঠল। এরই মধ্যে একটু আশ্চর্য হাসি হেসে চাঁপা বার দুয়েক 'না'-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললে—হয় আমার কপাল, নয়তো নিতান্তই কাঁচা কাজ হয়েছিল। খুন করা যে কতটা কঠিন তা বুঝিনি। কিংবা—।

চুপ করে গেল চাঁপা।

একটু চুপ করে থেকে বললে—হয়তো সেই ছিল নিজে অত্যন্ত ভীরু! অত্যন্ত ভীরু! আমার চোখের সামনে নীলু তো তাকে মারলে। ঠিক যেমন করে মারবার কল্পনা করেছিলাম —যেখানটায় মারবাব কথা হয়েছিল ঠিক সেইখানটায় নীলু তার পেটে-বুকে ছুরি মারলে—পড়ে গেলে মুখে লাথি মাবলে।

আবাব চুপ করে গেল।

সুধাংশুবাবু বললেন —তুমি সেইদিনেব কথা বল। থিয়েটার থেকে ফেবাব পথে তোমাব স্বামী কি করলে? ভয়ে পালিয়ে গেল?

—না। ছুরি তুললে। কিন্তু মল্লিক খপ্ করে তার হাত ধরে ফেললে। হাতখানা তার আগে থেকেই কাঁপছিল—এবার ধবার সঙ্গে সঙ্গে ছুরিখানা খসে মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক গলির মোড়ে গ্যাস পোস্টটার নিচে। আমি দেখলাম মুখখানা সাদা হয়ে গেছে তাব। বাবা চাপা গলায় চিৎকাব করে উঠল—প্রণব! প্রণব হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল।—ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি চলে যাব। আর কখনও আসব না।—ও—ও—আমাকে—। আর আমি শুনিনি। ভয় বোধ হয় আমিও পেয়েছিলাম। আমিও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

সেইদিন রাত্রে আমি আবার বিক্রি হলাম।

এব আগে বিক্রি করেছিল বাবা। এবার প্রাণের দায়ে বিক্রি করলে স্বামী। তার সঙ্গে আমি নিজে বিক্রি করলাম নিজেকে।

আমাদেব বাড়িতে আমারই শোবাব ঘরে বসে নিজের হাতে আমার স্বামী লিখলে—সে এবং আমি ষড়যন্ত্র করে আমার রূপযৌবনের লোভ দেখিয়ে এ বাড়িতে এনে তাকে খুন কবার প্ল্যান করেছিলাম। তাতে সই করিয়ে নিলে আমার স্বামী আর আমার; সাক্ষী রইল আমার বাবা আব তার ড্রাইভাব।

আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিয়ে গেল নগদ দু'হাজার টাকা। বললে—এসব করো না। লাভ হবে না। টাকা নিয়ে ব্যবসা করো। আমার অধীনে সাবকন্ট্রাক্ট তোমাকে দেব আমি। এভাবে বদ মতলব কবো না। আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে গরীব লোকেরা ছোট জাতের বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের নখে বেখে ডানহাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে টিপে উকুন মারে। তেমনিভাবে নখের চাপে মরে যাবে।

হেসে বললে—তোমার বউ তোমারই থাকবে। থাকল ; আমরা একটুআধটু আনন্দ করব। চলে যাব। এর জন্যে এত ফোঁসফোঁসানি কেন হে ?

সে রাত্রে সারারাত সে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। মড়ার মতো। নড়লে না কথা বললে না। আমিও উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। আমি কাঁদলাম সারারাত। সে খাটের উপর আমি মেঝের উপর মুখ গুঁজে।

সকালবেলা সে উঠে কোন কথা না বলে চলে গেল। আমি দেখেও দেখলাম না। বাবাও বোবা হয়ে যাওয়া দেখলে। মা কাঁদলে আর দেখলে। বলতে কিচ্ছু পারলে না।

সেও বেরিয়ে গেল ঘাড় হেঁট করে। এ কথাও বলতে পারলে না যে তোমাদের মেয়ে রইল আর আমি আসব না।

এক মাস আর এল না। বাবা যেতেও পারলে না তার হোস্টেলে। বাবা পারলে না লজ্জায়। আমাকে মা বললে—চিঠি লেখ। কিন্তু আমি লিখলাম না। আমার লজ্জা হলো না। ঘেন্না হলো।

ঘেন্না তখন জন্মেছে। একতলা থেকে দোতলার মতো ভারী ইমারত হয়ে গড়ে উঠেছে। ঘেন্নার একতলাটা ওর ভীরুতার জন্য। ওর সেই হাউ হাউ কান্নার জন্য। ও যে বলেছিল, আমাকে ছেড়ে দিন—আমি চলে যাব—কখনও আসব না।—তার জন্য। তার ওপর দোতলা ইমারত গড়ে উঠল তার পরের দিন, ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। দু'হাজার টাকা যেটা মল্লিক ওকে দিয়েছিল গতরাত্রে সেটা ও নিয়ে গেল সঙ্গে করে—এই খবরটা ফাঁস হবামাত্র একতলা ঘেন্নার ইমারত দোতলা হয়ে উঠল। সেটা তিনতলা হয়ে উঠল আরও এক মাস পর। আমাদের বাড়িতে নির্লজ্জ লোকটা পাকাপাকি বাস করতে এল। মল্লিকই ব্যবস্থা করে দিলে। বললে, পড়ে কি হবে। আমার আন্ডারে সাবকন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করুক।

আমার মধ্যে তখন নীলু এসেছে। বুঝতে শুরু করেছি তার সাড়া। সারা শরীর মন ঘেন্নায় ঘিনঘিন করে উঠেছিল—রাগে মন হয়ে উঠেছিল তপ্ত কড়াইয়ের মতো ; কেউ কিছু বললে তাকে উত্তাপে ঝলসে দিতাম—নিজে জ্বলতাম—দেহে যেন মনে হত কেউ লঙ্কা বেঁটে মাখিয়ে দিয়েছে।

বার বার প্রতিদিন মনে মনে বলেছি ছেলেটা যেন গর্ভেই মরে যায়—ওকে পেটে নিয়েই আমি মরি। কিংবা ভূমিষ্ঠ হতে হতে মরে যায়। কার ছেলের মা হব আমি ? ওই রাক্ষস মল্লিকের ? না এই অক্ষম অপদার্থ আমার ওই স্বামী ওই গোলামটার ? হায় হায়, ছ'মাস পর নীলু জন্মালো—তখন ওর বাবা মরেছে, আমার বাবা মরেছে। ছেলেটা জন্মের মুহূর্ত থেকে অবিকল বাপের মতো দেখতে। কটা চুল, কটাসে রঙ, চোখ দুটো তখন খয়রা রঙের ছিল না, নীল রঙের ছিল।

মুখের দিকে তাকিয়ে আমার আর ঘেন্নার আক্রোশের অন্ত রইল না।

বাপ আর স্বামী মরবার পর মল্লিক আমাকে বলেছিল—আমি বাড়ি ভাড়া করি, তুমি সেখানে গিয়ে থাকবে চল। কেন এখানে কষ্ট করবে!

আমি তা যাইনি।

আমাকে সে সুখ-সম্পদ দিতে চেয়েছে—আমার তা পছন্দ হয়নি। তার ওপর আমার সে ঘেন্না কোন দিন যায়নি। তাকে আমি ভয় করতাম। সে আমাকে কিনেছিল। আমার আর আমার স্বামীর সই করা একখানা কাগজ তার কাছে ছিল। স্বামীর সই করা টাকা ধারের দলিল সে বছর বছর আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে।

আমি এতটুকু মিথ্যে বলিনি, বাড়িয়ে বলিনি। বিশ্বাস করতে হয় করবেন নইলে করবেন না। আমি পাপিনী এ কথা কেউ না-জানা নয়। পাপের কোন সাফাই নেই, সে সাফাই আমি গাইছি না। শুধু এইটুকু বিশ্বাস করুন যে, সারা সংসারের উপর আমার ঘেন্না। ঈশ্বরের উপর ঘেন্না—মানুষেব উপব ঘেন্না—নিজের উপর ঘেন্না—মা-বাপের উপর ঘেন্না—মল্লিক আমার শত্রু কিন্তু সব থেকে বেশি ঘেন্না আমার ওই অক্ষম ভীরু কাপুরুষ স্বামীর উপব। তার ছেলে বলে নীলুকে আমি জন্মদিন থেকে ঘেন্না করে এসেছি। একটা কথা বলি—জন্মের পর কতদিন কতবার যে মনে মনে চেয়েছি—মরে যাক, ওটা মরে যাক, আমার আপদ যাক। কতদিন ভেবেছি ছেলেটার মুখের উপর একটা বালিশ চাপিয়ে কিছু ভার চাপিয়ে দি। কিন্তু পারিনি আমার মায়ের জন্যে—আর পারিনি ওই মল্লিক লোকটার জন্যে। কেন জানি না সে এর বিরোধী ছিল। বলত—মহাপাপ। আমার সর্বনাশ করে তার পাপ হয়নি কিন্তু ছেলেটাকে মেরে ফেললে মহাপাপ হবে একথা যে কতদিন বলেছে তার ঠিক নেই। বলত—খবরদার! খবরদার! মহাপাপ হবে। এ যেন কখনও করো না।

চুপ করে গেল চাঁপা।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বেশ কিছুক্ষণ। বাড়ির ভিতর থেকে তাগিদ এল। সুধাংশুবাবু বললেন—মক্কেলের কথা শুনছি। দেরি হবে।

বাইরে বৃষ্টিটা চেপে এল কিছুক্ষণের জন্য। সুধাংশুবাবু রত্নমালাকে ভাল করে দেখলেন। তার অবয়বের ভাঁজে ভাঁজে বিশেষ করে এলানো চুল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে থাকার মধ্যেও যে একটি ছাঁদ রয়েছে এবং চোখে ও মুখে যে একটা কিছু রয়েছে তাতে সে প্রেতিনী। তিনি বারো বছর আগে তাকে দেখেছেন,—তারপর তার ইতিহাস শুনেছেন। তার ছেলে নীলু তাকে তিন-চার বছরের শিশুকালে অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে ডেয়ো পিঁপড়ের কামড়ের যন্ত্রণায় কাঁদতে দেখেছেন। এই মায়ের সেদিনের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে বাজছে। "মর মর। মরে যা আপদ মরে যা!" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সকাল-বেলা চার-পাঁচ বছরের ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে চলেছে পিছনে পিছনে। মনে পড়ল সাত-আট বছরের ছেলেটা পা ঠুকতে ঠুকতে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলেছে। তার সঙ্গে বিচিত্র এক কান্না—আঁ! আঁ! তার পরেই মনে পড়ল নিষ্ঠুর আক্রোশে ঢেলা ছুঁড়লে ঢেলাটা লাগল মায়ের হাঁটুতে, মা পা ধরে বসে পড়ল। এসবের অর্থ যেন বদলে যাচ্ছে আজ! চাঁপা যেন তার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়া, হাহাকারভরা জীবনের আবরণ উন্মোচন করছে।

মন তাঁর এখনো প্রশ্ন করছে—এ সত্য? যা বললে তা সত্য?

তাঁর পেশা ওকালতী। ওকালতীর দেওয়ানী মামলা তিনি করেন না। ক্রিমিন্যাল কেস নিয়েই তাঁর ওকালতী। একসময় রাজনৈতিক-দলের বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনে অভিযুক্ত কর্মীদের স্বপেক্ষ দাঁড়াতে গিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ডাকাতি মামলায় অভিযুক্তদের খুনের মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করেছেন তিনি। এও খুনের মামলা। এর আসামী নীলু, সাধারণের মধ্যে তার যে পরিচয় তাতে সে এখানকার একজন বিখ্যাত মস্তান। তার এই মা—তার ইতিহাস সে স্বৈরিণী। সে নিষ্ঠুরা। তার সাক্ষী তিনি নিজে।

এ মামলা তিনি অর্থের জন্য নেবেন না।

একদিন একটি ক্ষুদ্র উপকার মেয়েটি করেছিল। হযতো ক্ষুদ্র নয়—বৃহৎ। তাঁর প্রাণটা যেতে পারত সেদিন।

আর ওই মেয়েটি এতক্ষণ ধবে যা বললে—।

পুরাণের চরিত্রের মতো পুণ্য চবিত্রবল ওর নেই। ও পতিতা। কিন্তু অপহৃতা নিগৃহীতা বন্দিনীদেব মতোই একটি ককণ সত্য আছে যা সমাজ শোনেনি, শুনতে চায় না।

তার একটা আবেদন তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ চাঁপা দেখলে সুধাংশুবাবু তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সে এ দৃষ্টির সম্মুখে এতটুকু সংকোচ অনুভব কবলে না। বললে—বলতে গিযে ঠোঁট দুটি তার কেঁপে উঠল,—আমাব নীলুকে আপনি বাঁচান। লোকে বলছে আপনি পারেন।

—তার আগে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।

—বলুন।

—আদালতে তোমাকে পুলিস সাক্ষী মানবেই। মানতেই হবে। তুমি আমার কাছে যা বললে যেমন অকপটে বললে তেমনিভাবে বলতে পারবে ? স্বীকার করতে পাববে ? হয়তো বিশ্রী প্রশ্নও করতে পারে। সরকারপক্ষ পারে আমিও পারি। সত্য উত্তর দিতে পারবে ?

মেয়েটি আস্তে আস্তে বললে— পারব।

সুধাংশুবাবু বললেন—তাহলে তোমার ছেলের কেস আমি নিলাম। তাকে বাঁচাতে চেষ্টা আমি কবব। কি হবে তা জানি না। আজ আমি উঠব। বাকিটা পবে শুনব। পুলিস মামলা দাযের করলে চার্জশীট দেখে সব জেনে নেব তখন।

—তাহলে আজ আমি যাই!

—এই রাত্রে—

—আমি পারব। পাড়ার ঘুঁটেওয়ালী বুড়ী আমার সঙ্গে এসেছে। একটু দূরে ওই পান-বিড়ির দোকানে বসে আছে।

ড্রইংরুমের খোলা দবজা পার হয়ে সেই বর্ষারাত্রের স্বল্পালোকিত আবছায়ার মধ্য

দিয়ে সে একলাই চলে গেল। পান-বিড়ির দোকানটা একটু আগে। একটা বাঁকের মাথায়।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সুধাংশুবাবু।

৫

মহামান্য বিচাবপতি এবং জুরি মহোদযগণ ! এই এক নৃশংস এবং কুৎসিত হত্যাকাণ্ডের বিবরণ আপনাদের সমক্ষে বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য সহযোগে উপস্থাপিত কবা হয়েছে। আনুপূর্বিক সংঘটনেব মধ্যে এতটুকু কোথাও ছিদ্র নেই।

ডকে দাঁডিয়ে ওই যে তরুণ আসামী—বযসে তরুণ আকারে অবয়বে যেকোন ভদ্রসন্তানের মতো কিন্তু প্রকৃতিতে সে নিষ্ঠুব ক্রুর উদ্ধত ভয়হীন ; যে অঞ্চলে সে বাস করে সে অঞ্চলে তাব ডাকনাম 'টাইগার'। এব ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। যে নামকরণ করেছিল সে ভুল করেনি।

বাঘেব মতোই সে হিংস্র এবং নিষ্ঠুর। পুলিসের খাতায তার বিববণ আজ তিন বছর ধবে লেখা হচ্ছে। প্রথম বৎসর মাসে একবাব—দ্বিতীয় বৎসরে মাসে দুই বা তিনবার এবং এই তৃতীয় বৎসরে সাত মাসে আরও বেশিবার রেকর্ড করা হয়েছে। পাড়ায় পাডায ঝগডা, দলে দলে ঝগড়া, দলবদ্ধ হযে পাডাতে আগন্তুকদের সামান্য অজুহাতে আক্রমণ কবা, রাত্রিব অন্ধকাবে ছেনতাই, এমন কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও ইদানীং এ পাড়াব যাবা সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করে ; মহামান্য বিচারপতি, এই কালে 'মস্তান' বলে উর্দু শব্দটি বাংলা শব্দভাণ্ডাবেব অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, সমাজ এমন কি বাষ্ট্রের অবস্থাকে যারা সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে সেই এক কুখ্যাত মস্তানদের সে প্রধান। সার্বজনীন পূজার চাঁদা আদায়ে জবরদস্তিতে, বিসর্জনেব সময় অন্য পাড়ার পূজার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সামান্য অজুহাতে ঝগডা বাধিয়ে সে এই অঞ্চলের পক্ষে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। হাতবোম' তৈরি কবার দক্ষতায়, বোমা ছোঁডায তার কথা লোকে সভয়ে উচ্চারণ করে। বোমা তৈরি করতে গিয়ে একবাব বারুদ জ্বলে গিয়ে গোটা ডানহাতখানা জখম হয়েছিল। হাসপাতালে ছিল এক মাস। বোমা ছোঁড়ার অপরাধে পুলিস তাকে বারোবার অ্যারেস্ট করেছে কিন্তু সাক্ষী কেউ দিতে চায়নি বলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ছুরি মারার জন্য পুলিস ওকে সন্দেহ করেছে কয়েকবারই। কিন্তু সেখানেও প্রমাণ অভাবে গায়ে হাত দিতে পারেনি। ধবে নিযে গেছে—তাকে পুলিসী জিজ্ঞাসার সামনে এনেছে। কিন্তু তার ধাতু বিচিত্র ধাতু। যে উত্তাপে ইস্পাত গলে সে-উত্তাপের মধ্যেও অনমনীয় থেকেছে। এবং সে স্বীকারও কবেছে যে এই খুন সে করেছে। এক্ষেত্রে বার বার আসামীর তরুণ বয়সের দিকে বিচাবক ও জুরি মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব ওর মার দিকে। সে এই মামলার প্রধান সাক্ষী। আপনারা দেখেছেন আসামীর মাকে।

তার কপালে একটা কাটা দাগ আছে বিচারক সেটা দেখবেন।

সেটা ওর মায়ের কপালে এই ছেলে তার নিজের হাতে আঘাত করে চিরদিনের মতো একটা শিলালিপি এঁকে দিয়েছে। একখানা ভাঙা থালার কানা দিয়ে মেরেছিল কপালে। তাকেও হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল কয়েক দিন। ঘটনাটা ঘটেছিল ওদের বাড়ির ভিতর—মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞান অবস্থাতেই তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়েছিলেন কারণ পেশেন্টের অবস্থা ভাল ছিল না। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। এবং তাঁরাই খবর পাঠিয়েছিলেন পুলিসে। পুলিস এখানেও সন্দেহ করেছিল এই তার টাইগার নামধারী মানুষের অবয়বে জন্তুর মতো সন্তানটিকে। মা তখন একথা স্বীকার করেনি কিন্তু এখানে অর্থাৎ এই মামলায় স্বীকার করেছে যে ও আঘাত ওর ওই ভয়ঙ্কব হিংস্র প্রকৃতির জন্তুর মতো পুত্রটির। ওই সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর ওই পিঙ্গলবর্ণাভ দৃষ্টি, ওর এই তরুণ বয়সেও এই তরুণ মুখের রেখায় রেখায় নির্মম, কাঠিন্য ভ্রূর ভ্রূকুটিভঙ্গিতে, ওর দেহের কঠিন নিষ্ঠুর গড়নের মধ্যে এমন একটা কিছু রয়েছে যা—

এবার সুধাংশুবাবু উঠে দাঁড়ালেন—আপত্তি করবেন তিনি। কিন্তু তার আগেই জজসাহেব বললেন—আপনি, আমার বোধানুযায়ী সীমানার বাইরে যাচ্ছেন; ওর এই অল্পবয়সের যে-সব ঘটনার ইতিহাস দিলেন তার উল্লেখ করলেন তাঁর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওর চেহারা নিয়ে এর সঙ্গে জড়াচ্ছেন—এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, he is a born criminal, crime is in his blood. কিন্তু আমার মতে জোর করে এটা আরোপ করা হচ্ছে।

সরকারপক্ষের অ্যাডভোকেট তাঁর বক্তব্য নিবেদন করছিলেন।

কোর্টে ভিড়ের আর শেষ ছিল না। ভিতর থেকে বাইরের বারান্দা পর্যন্ত লোকেরা দাঁড়িয়ে। রূদ্ধশ্বাসে শুনছে।

হাওড়ার টাইগারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে মামলা হচ্ছে। ভ্রষ্টা মায়ের সন্তান। মায়ের উপপতিকে খুন করেছে। বরেন মালিক অর্থাৎ মল্লিক আজ ষোল-সতের বৎসরের উপর—নিখুঁতভাবে গণনা করলে আজ সতের বছর কয়েক মাস এই মেয়েটিকে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে রেখেছিলেন। লোকে বলে সংসারটাই সে পোষণ করত একরকম। কেউ কেউ বলে টাইগারের উদ্ভবও ওই বরেন মল্লিক থেকে। সুতরাং এর মধ্যে কোথাও যেন আছে প্রকৃতির সেই বিচিত্র খেলা বা লীলা, যার অমোঘ ঘাত-প্রতিঘাতে পিতা পুত্রহত্যা করে, পুত্র পিতৃহত্যা করে প্রকৃতিরও অন্তরালবর্তিনী এক রহস্যময়ীর অভিপ্রায় পূর্ণ করে; অথবা সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে আছে এক আশ্চর্য নাটক যা অতিপুরাতন হয়েও আজও পুরানো হয়নি বা হবে না।

ডকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হাওড়া শহরের টাইগার। আসামী নীলু।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে সেসনস্ সোপরদ্দ হয়ে দায়রা আদালতে বিচার বসতে প্রায় পাঁচ মাস সময় গেছে। এই পাঁচ মাসে নীলুর চেহারা যেন আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। সরকারপক্ষের উকীল যা বললেন তার সঙ্গে এতটুকু মেলে না। নীলু এই

বিচার মাথায় করেও জেলখানার মধ্যে নিয়মিত শান্ত জীবন যাপনের সুযোগ পেয়ে যেন আর এক নীলু হয়ে উঠেছে।

পিঙ্গল বর্ণ আর নেই, তার মধ্য থেকে ফুটে উঠেছে একটি স্বর্ণাভ দীপ্তি। শরীর তার সবল এবং কঠিন—তাকে ঢেকে একটি প্রসন্ন পুষ্টির প্রলেপ পড়েছে। চোখের কোলে চারিপাশে ছিল একটি কালো মেঘ—সে মেঘটি আর নেই। সযত্ন মার্জনায় কেউ যেন আঁচল দিয়ে সে দাগ মুছে দিয়েছে। মুখে তার অল্প অল্প দাড়ি-গোঁফ বেরিয়েছে। চুল তার কটাসে অর্থাৎ পিঙ্গল। দাড়ি-গোঁফগুলি পিঙ্গল নয় স্বর্ণাভ। চোখ দুটি তার বড জন্ম থেকেই। তার দৃষ্টি বয়সের সঙ্গে হয়ে উঠেছিল উগ্র রূঢ় এবং হিংস্র; সে দৃষ্টি এই ক'মাসে আশ্চর্য এক ঔদাসীন্যে উদাসীন হয়ে উঠেছে। কোন উদ্বেগ নেই কোন চঞ্চলতা নেই। ডকের মধ্যে যেন শূন্যদৃষ্টিতে অথবা গভীর এক আত্মমগ্নতায় মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়তো সওয়ালের সব কথা তার কানে পৌঁছুলেও সচেতন মনে পৌঁচচ্ছে না। মাথার চুলগুলি দীর্ঘ এবং বিশৃঙ্খল; তৈলহীন রুক্ষ; গায়ে একটা রঙচঙে হাওয়াই শার্ট, পরনে একটা চোঙা প্যান্ট। পরিষ্কার নয়; জামাটা ক'জাযগায় ছিঁড়েও গেছে। ভ্রূক্ষেপহীন ভঙ্গিটার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন গভর্নমেন্ট প্লীডার।

সরকারী উকীল তৎক্ষণাৎ বললেন—আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করছি ইওর অনার। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই আসামী হাওড়া শহরে টাইগার নাম অর্জন করেছে তার এই ষোল বৎসবের জীবনের যে গৌরবে সে গৌরব সে তার মস্তানীর গৌরব।

মহামান্য বিচারক, মানুষ জন্তর বা জীব ও প্রাণীর মতোই দেহধারী জীব। কিন্তু জীবজীবনের জৈব ধর্মের নির্দেশ তার জীবনসত্য নয়। কাম ক্রোধ লোভ তৃষ্ণাকে সে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারে না এ কথা বৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্য কিন্তু মানবধর্মে তা থেকেও অধিকতর সত্য যে এই জৈব বিধানগুলিকে সে আপন আয়ত্তাধীনে এনে মনুষ্যত্বে উপনীত হযেছে। মানুষ এইখানেই জন্তু থেকে পৃথক।

বর্তমান মামলায যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আপনার এবং জুরি মহোদয়গণের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে তাতে দেখতে পাবেন যে, ঘৃণিত প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মনুষ্যধর্মের প্রথমতম বা প্রাথমিক সত্য বা বিধানকে কুৎসিতভাবে দুই পায়ে ছেঁটে-মেরে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যিনি হত হযেছেন, যাঁকে হত্যা করা হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম ছিল বরেন মল্লিক; ১৯৬০ সাল থেকে সতের বছর আগে একটি যুবতী এসে আত্মবিক্রয় করেছিল এবং সেই ক্রযবিক্রয়ের ঘটনায় সাক্ষী ছিল তার বাপ এবং তার স্বামী।

ঘটনাটি অসামাজিক। মনুষ্যত্বসম্মত নয়। কিন্তু জৈব প্রবৃত্তিব গতি এবং মানুষের মনের নির্দেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বসংকুল মনুষ্যত্বের বা মুনষ্যধর্মের যে-পথ সে-পথে এই ধরনের পতন ও স্খলনগুলি নিঃসন্দেহে বিয়োগান্ত কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। এমন ঘটে থাকে। অতীতকালে ঘটেছে, বর্তমানেও ঘটছে। ভবিষ্যতেও ঘটবে। তাছাড়াও

এক্ষেত্রে আরও একটি কথা আছে। স্বামী ও পিতার সাক্ষাতে যেখানে একটি যুবতী নিজেকে বিক্রি করে সেখানে এমন কোন কারণ আছে যা নিষ্ঠুরতম বাস্তব সত্য। যা অলঙ্ঘনীয়, যা অপরিবর্তনীয়, মাননীয় বিচারক মহোদয়, তার থেকেও বেশি কিছু। প্রকৃতির নির্দেশ। আজ সতের বৎসর ধরে এই মল্লিক এই যুবতীর সঙ্গে নরনারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপন করে এই দুঃস্থ সংসারটিকে প্রতিপালন করে আসছিল। সর্বোপরি এই যুবতী মেয়েটি তার সঙ্গে অর্থাৎ মল্লিকের সংসর্গে আসবার এক বছর পর এই বালকের জন্ম। সুতরাং বলি এই মল্লিকই এই হত্যাকারী বালকের—

—না—না—না—না।

পর পর চারটে 'না' শব্দের প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর ধ্বনিতে দায়রা আদালতের প্রকাণ্ড ঘরখানা চমকে উঠল।

চিৎকার করে উঠল আসামীটি। সমস্ত জনতা নিবিষ্ট মনে গভর্নমেন্ট প্লীডারের এই বৃক্তুতা শুনছিল। তারা কৌতূহলে আকৃষ্ট ছিল, বক্তব্যের জটিল অর্থ অনুধাবনের জন্য নিবিষ্টচিত্ত হয়েছিল। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এই ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড এবং দৃপ্ত চিৎকারে চমকে উঠল তারা। তরুণ কৈশোরের ভাঙাচোরা কণ্ঠস্বরে সবল বুকের চিৎকার।

বিচারকও চকিত হয়ে আসামীর দিকে তাকালেন। সে দুই হাতে মুঠো করে চেপে ধরেছে ডকের বেষ্টনীব কাঠখানা। চোখ দুটো তার জ্বলছে। মনে হচ্ছে সে যেন হাঁপাচ্ছে।

জজসাহেব তাব দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন। তাঁর ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি? কি না? বল, তুমি কি বলছ?

একজন কনস্টেবল এবং একজন কোর্ট সাবইন্সপেক্টর ছুটে এসে কাঠগড়ার সামনে দাঁড়াল। রূঢ়স্বরে ধমক দিয়ে বললে—চুপ! চুপ!

মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বড বড় পিঙ্গলাভ রুক্ষ চুলের রাশিতে নাড়া জাগিয়ে সে বললে—না না। আমি চুপ করব না।

কোর্ট চঞ্চল হয়ে উঠল। উকীল মোক্তার কর্মচারী জনতা সমস্ত লোকের মধ্যে একটা গুঞ্জন জাগল—একটা নড়াচড়ার ঢেউ জাগল। শুধু জজসাহেব একটি স্থৈর্যপূর্ণ ধীরতাব সঙ্গে বসে রইলেন। তাকালেন তরুণ আসামীটির দিকে। টেবিলের উপরে রাখা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে শব্দ করে তাঁর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে জনতাকে স্তব্ধ হতে বললেন। অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—চুপ! চুপ! তারপর আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বল তুমি কি বলছ? কি না? বল?

উত্তেজিত কণ্ঠে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল—হুজুর জজসাহেব—যে মল্লিক খুন হয়েছে—হুজুর—

বুকে দু'বার ডানহাতের চাপড় দিয়ে যেন আস্ফালন করেই বললে—আমি তাকে খুন করেছি হুজুর—আমি। আমি তাকে খুন করেছি হুজুর। তিনবার ছোরা মেরেছিলাম তাকে। পেটে, বুকে—তারপর পড়ে গেল—তখন পিঠে।

থেমে গেল আসামী। যেন কি বলবে সে খুঁজে পাচ্ছে না। চোখ দুটো শুধু দপ্ দপ্ করছে জ্বলন্ত আঙরার মতো।

পাবলিক প্রসিকিউটর তার এই কথা-হারানো বিভ্রান্তিকর অবস্থার সুযোগে বললেন—রক্তের সম্পর্ক ছিল না কিন্তু সম্পর্ক ছিল—বিধবা রত্নমালা নিহত মল্লিকের রক্ষিতা ছিল—

—না! আবার চিৎকার করে উঠল আসামী।—না না।

—মল্লিকের লোক এসে রত্নমালাকে নিয়ে যেতো না? মল্লিকের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত না সদর রাস্তায়? রত্নমালা সেজেগুজে বেরিয়ে যেতো না?

—না, রক্ষিতা সে ছিল না। সে তার কেনা বাঁদী ছিল। হুজুর জজসাহেব এই কালেও মানুষ বিক্রি হয়। বাপ মেয়ে বিক্রি করে হুজুর—স্বামী স্ত্রী বিক্রি করে হুজুর—আর হতভাগিনী ওই বিক্রি হওয়া মেয়েটা কেনা বাঁদীর মতো, চিরকাল জন্তু-জানোয়ারের মতোই খেটে মরে যায় তবু তার গলার বাঁধন খোলে না। দড়ি দিয়ে সে বাঁধা থাকে মরণকাল পর্যন্ত। মরে গেলে দড়িগাছাটা খুলে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেয়। তেমনি করেই আমার ওই মা—।

এইখানে এসে হা-হা করে কেঁদে ফেললে দুর্দান্ত ছেলেটা।

—কে বললে এসব কথা তোমাকে? তুমি কেমন করে জানলে?

—শুনেছি আমার ওই হতভাগিনী মায়ের কাছে।

—মা তোমাকে বলেছে এই সব কথা?

—হ্যাঁ হুজুর—মায়ের কপালে একদিন একখানা কানাভাঙা থালা দিয়ে মেরেছিলাম। কেটে বসে গিয়ে অনেক রক্ত পড়েছিল। সেইদিন বলেছিল—তবে শোন তোকে আজ সব বলে যাই। আমার নিজের ইচ্ছেতে আমি ওই পাপ করি নে। আমার বাপ আমাকে বিক্রি করেছিল। দু'হাজার টাকা সে নিয়েছিল। এই লোকটাই আমার হাতে দিয়েছিল টাকা। আমি মাটির পুতুলের মতো বসে ছিলাম- আমার হাতে লোকটা ধরিয়ে দিয়েছিল দু'হাজার টাকার নোটের গোছা। আমি মাটির পুতুলের মতোই বসেছিলাম। একসময় বাবা সেগুলো টেনে নিয়ে পকেটে ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। ওই ঘরখানার মধ্যে ওই লোকটার কাছে আমাকে ফেলে দিয়ে।

হুজুর, আমার বাবা প্রণব চক্রবর্তী—সে ঠিক আমার মতোই দেখতে, সেও— সেও; স্তব্ধ হয়ে গেল এই প্রচণ্ড ছেলেটি। দুই হাতে তার চুলের মুঠো ধরে কাঠগড়ার রেলিঙের উপর কনুই রেখে মাথা হেঁট করলে।

কিছুক্ষণ পর বললে—বাবার কাছে মা নাকি বলেছিল—তুমি আমাকে বিষ এনে দাও। আমি মরি। বাবা বলেছিল—না, লোকটাকে আমি খুন করব। কিন্তু ছুরি তুলেও ছুরি মারতে পারেনি—হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। লোকটা বাবাকে ধরে ফেলে তার কাছ থেকেও বিক্রির একটা দলিল লিখিয়ে নিয়েছিল। মাকেও তাতেই সই করিয়েছিল। সে কাগজখানা তার কাছে ছিল। বাবাকে এরপর আরও দু'হাজার টাকা দিয়ে একটা ধারের দলিল লিখিয়ে নিয়েছিল।

হুজুর—জজসাহেব—বাঁচতে আমি চাই নে। মরতে আমার ভয় নেই। আমাকে ফাঁসি আপনারা দিন। আমি খুন ওই লোকটাকে করেছি। খুন করেই আমি পালিয়েছিলাম, ওইটে আমার দোষ হয়েছে। তবে ভোর বেলাতেই এসে আমি ধরা দিয়েছি থানায়। ফাঁসি যাবার জন্যেই ধরা দিয়েছি। উকীলবাবু বলছিলেন আমি মস্তান। হ্যাঁ হুজুর আমি মস্তান। ওই—ওই আমার মায়ের জন্যে! হুজুর—হুজুর, সারা জীবনে আমার বয়স ষোল বছর হলো—ষোল বছরে কোন দিন কখনও আমাকে আমার ওই মা,—

হুজুর ওকে আমি রাক্ষুসী বলে ডাকতাম ছেলেবেলায়। এই দেখুন আমার কপালে একটা মস্ত কাটা দাগ। ওই মা আমাকে খুন্তি দিয়ে মেরেছিল। আমার মনে আছে হুজুর—রক্ত পড়েছিল অনেক—আমার দিদিমা ভয় পেয়ে কেঁদেছিল, আমিও ভয় পেয়েছিলাম কেঁদেছিলাম। মা বলেছিল—মর মর তুই মরে যা। ছেলেবেলা আমার পাঁচড়া হয়েছিল—আমার কষ্টের শেষ ছিল না। সর্বাঙ্গে তার দাগ। কখনও মা আমায় মলম লাগিয়ে দেযনি ভাল কথা বলেনি। সকালবেলা কাজে যেত—আমি কাঁদতে কাঁদতে পিছনে পিছনে যেতাম—পথে হুঁচোট খেয়েছি, পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটেছে হাঁটু ছড়েছে—কখনও হাতে ধরে তোলেনি, কখনও আহা বলেনি।

ওই একটা কথা—মর মর মর—তুই মরে যা।

হুজুর, পাঠশালায় গেলাম—ছেলেরা ক্ষেপাতে আরম্ভ করলে। বলত—বাবার নাম কি রে? বুঝতে পারতাম না প্রথম প্রথম। তারপর বুঝলাম। আবার বলত—তুই চক্রবর্তী কি করে হলি রে? তুই তো মল্লিক নাকি?

দিদিমা যতদিন ছিল ততদিন কিছু আদর-যত্ন পেয়েছি হুজুর—তারপব সে মরার পর দুনিয়া আমার তেতো ছিল—এবার বিষ মিশল বিষাক্ত হলো। ইস্কুল ছাড়লাম—মস্তান হলাম।

উকীলবাবু বললেন মস্তান। হ্যাঁ হুজুর মস্তানের সর্দার হলাম আমি। সিগারেট বিড়ি আরও নেশা শিখলাম। মানুষ মারতে শিখলাম। মন খুব খুশি হলো। মাকেও মারতে ধরলাম। প্রথম চড়চাপড। চড় খেয়েও মা গাল দিত—তুই মর তুই মর।

সঙ্গে সঙ্গে আবার চড় মেরেছি আমি।

আবার বলেছে—মর মর।

আবার মেরেছি।

আবার বলেছে—মরে যা তুই মরে যা।

—ফের বলছিস? বলে আবার চড মেরেছি।

ফের বলেছে—হ্যাঁ আবারও বলছি তুই মরে যা। চণ্ডালের সন্তান চণ্ডাল তুই। তুই মরে যা আমি খালাস পাই।

আমি এবার ভয় পেয়ে হার মেনে চলে গিয়েছি ঘর থেকে। পথে গিয়ে কোন ফিরিওলাকে কি অন্য কোন মস্তানের সঙ্গে ঝগডা করে মাথা ফাটাফাটি করে হাওড়া স্টেশনের ফুটপাথে কি গঙ্গার কোন ঘাটে বসে থেকেছি—সারা দিনরাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। ঘরে মা গাল দিয়েছে—মায়ের বেদনা বুঝিনি, বুঝতে চেষ্টা করিনি—বাইরে

গাল খেয়েছি তাই নিজে গাল দিয়ে মস্তানী করে ফিরেছি। মনে ছিল লজ্জা—হুজুর এমন লজ্জা আর হয় না। এর চেয়ে মরণ ভাল—এর চেয়ে নরক ভাল—এর চেয়ে খুন হওয়া ভাল খুন করা ভাল। নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম—আমি চক্রবর্তী না মল্লিক? আমি কি?

বলতে বলতে থেমে গেল দুর্দান্ত ছেলেটি।

সমস্ত কোর্ট রুমটা থমথম করছিল। মানুষেরা রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনছে। একটা সূঁচ পড়লেও শোনা যায়। মাথার উপরে কয়েকটা চড়ুইপাখি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা মিনিট স্তব্ধতা যেন অনেক কয়েক মিনিট দীর্ঘ মনে হলো। তবুও তাকে প্রশ্ন কেউ করলেন না—তারপর?

জজসাহেবও স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তাঁর হাতে পেনসিল ছিল একটা, অকস্মাৎ সেটা হাত থেকে খসে টেবিলের উপর এবং টেবিল থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সেই শব্দে সজাগ হয়ে উঠল ছেলেটি। বললে—হুজুর, একদিন মায়ের বাক্স খুললাম। মায়ের জিনিসপত্র ছিল না কিন্তু ট্রাঙ্ক ছিল তিনটে। যত বাজে ভাঙা ফুটো জিনিস ভর্তি থাকত। একটা বাক্সের দরকার ছিল। বোমা তৈরি করেছিলাম—সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে বড় বাক্সেরই দরকার ছিল। খড় ন্যাকড়া নিচে দিয়ে আরও খড় ন্যাকড়া দিয়ে প্যাক করে তার ওপর খানকতক কাপড় বই দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাব। বড় একটা হাঙ্গামা আছে। দলে দলে হাঙ্গামা হুজুর। বাজারে বাক্স কেনার হাঙ্গামা ছিল। তাই বাড়ির বাক্স একটা খালি করে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম। আমার মা সে-দিন—।

—সন্ধ্যের পর। মা বাড়ি ছিল না। একটা বাক্স খালি করে ফেললাম। হুজুর, তার মধ্যে পুরনো ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল। কতকগুলো কাগজ ছিল। একটা সিগারেটের কেস ছিল। পুরনো রুমাল ছিল। হুজুর, সব শেষে ছিল—একখানা ফটো। অনেকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

হুজুর, আলোতে ছবিখানা দেখলাম; দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ কে? এ কে? চেয়ারে বসে? আর পাশে দাঁড়িয়ে?

চিনতে পারলাম হুজুর।

মাকে চিনলাম আগে। বিয়ের কনে আমার মা। মাথায় মুকুট গায়ে গয়না পরনে দামী শাড়ি। তারপর চিনতে বাকি রইল না চেয়ারে যে বসে তাকে। সে আমার বাবা প্রণবকুমার চক্রবর্তী। দেখলাম হুজুর—অবিকল আমি।

আমার সব ভুল হয়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম আমাকে ট্রাঙ্ক নিয়ে যেতে হবে। আমি ভুলে গেলাম। ছবিটা নিয়েই বসে রইলাম আলোর সামনে। কালিপড়া একটা লণ্ঠন। তারই আলোতে অবাক হয়ে দেখলাম। আমি শুনেছিলাম—দিদিমা মাঝে মাঝে বলত—আমি বাবার মতো দেখতে। মা আমাকে দেখে হয় মুখ ফিরিয়ে নিত নয় বিরক্ত হত—তার চিহ্ন ফুটত তার মুখে। আমি এ ছবি কখনও দেখিনি। বাবা

যখন মারা যায় তখন আমি এক বছরেরও নই। সেদিন এই ছবি দেখে আমার যে কি হলো তা বলতে পারব না। মনে হলো আমি যেন রাজা হয়ে গিয়েছি। মনে হলো ছবিখানা নিয়ে সারা হাওড়ার পথে পথে দেখিয়ে আসি—চিৎকার করে বলে আসি—দেখ আমার বাবার ছবি দেখ।

দলের লোক ডাকতে এল—তাকে ট্রাঙ্কটা দিয়ে দিলাম—আমি গেলাম না। বললাম—যাব না আজ। আমাকে ডাকিস নে। খুনোখুনি হয়ে যাবে। পালা। সে চলে গেল। আমি ক্ষ্যাপার মতো ঘবে ঘুরতে লাগলাম। ঠিক এই সময়ে এল আমাব মা।

মাকে আমি রাক্ষুসী বলতাম। বলতাম তার উপর রাগের জন্যে—যেভাবে সে মারত তার জন্যে। পবে আব একটা চেহাবার জন্যেও বলতাম। সে যে সাজ করে ওই একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যেত সপ্তাহে একদিন করে বাত্রে তার জন্যে। সে ঘবে তালা দিয়ে বাইরে যেত। আমার তো ঠিক ছিল না কিছু। আমি ঢুকতাম পাঁচিল টপকে। তারপর ঘরের চাবি খুলে নিতাম—সে চাবি আমার কাছে থাকত। ঘরের তালা খুলে মা ওই সাজে ঢুকতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। আমি গিযে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম—কোথায় গিয়েছিলি?

মা চমকে উঠে আমার মুখেব দিকে তাকিয়েছিল।

আমার রাগ চড়ে উঠেছিল—বললাম—বল, আজ তোকে বলতে হবে। কেন তুই যাবি এমনভাবে? তোর লজ্জা নেই, তোর হায়া নেই?

মা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—সরে যা—সরে যা নীলু—আমার মাথায় খুন চড়িয়ে দিসনি।

আমি সরিনি। পথ দিইনি ঘরে ঢুকতে।

মা বলেছিল—নীলু! সর আমি চান করব।

—হুজুব, বাইরে থেকে এসে মা চান করত। সে সেই বোধ হয গোড়া থেকেই। আমি আজন্ম দেখে আসছি।

আমি বললাম—না। আগে তোকে বলতে হবে কেন তুই আমার বাবার মুখে এমন করে কালি মাখিয়ে দিবি? আমার বাবা মরে গিয়েছে সে কি তার—

মা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিল—তোর বাবাকে আমি ঘেন্না করি, তোদের বংশকে আমি ঘেন্না করি। আর তুই? তোকে পেটে ধরে আমার লজ্জার শেষ নেই। অখণ্ড তোর পরমায়ু—তুই হয়ে হয়েই মরিসনি।

আমি ঠাস করে এবার মায়ের মুখের উপর চড় কষিয়ে দিয়েছিলাম; শুধু চড় মারাই নয় হুজুর; ছেলেবেলা থেকে মায়ের উপর অহরহ রাগ করে থেকে থেকে মেজাজ আমার রাবণের চিতার মতো জ্বলে—আমার বাবাকে আমার বংশকে গাল দেওয়া আমার সহ্য হয়নি। শুধু চড়ই মারিনি, খারাপ কথা বলে গালও দিয়েছিলাম।

মা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। হুজুর, মায়ের সঙ্গে সমানে মারপিট করেছি—মা

মারলে আমিও মেরেছি—হাতে কামড়ে দিয়েছি, ঢেলা ছুঁড়েও মেরেছি—কিন্তু এমনভাবে কখনও গালে চড় মারিনি।

কিছুক্ষণ গালে হাত দিযে আমার মুখের দিকে সাপের মতো তাকিয়ে ছিল মা। আমি মনে করেছিলাম মা ভয় পেযেছে—মা এবার বললে—আর করব না। আমি ভাবছিলাম ওকে গলা টিপে মেরে ফেললে কি হয়!

অনায়াসে তখন আমি খুন করতে পারতাম। আমি মায়ের হাত ধরে তাকে ঘরে টেনে এনে বাইবের দরজা বন্ধ কবে দিয়েছিলাম—তারপর বলেছিলাম বল কেন তোব পাপে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে? বল?

মা বলেছিল—আমি যেদিন মরব সেদিন তোকে ডেকে সব বলে যাব। আর তুই যদি মরিস তবে—

আমি তখন মরিয়া। আমার হাতের কাছেই পড়েছিল একখানা কানাভাঙা বেকাবি, সেইখানা তুলে নিয়ে মাযের কপালে মারলাম—ভাবলাম না কি হবে! বেকাবির ধারটা কপালে খপ্ করে বসে গেল। বললাম—সীতা সাবিত্রী আমার—হারামজাদী—কুত্তার বেটি কুত্তি—

কথা আমার শেষ হলো না—শেষ করতে পারলাম না আমি—মায়ের কপাল থেকে গলগল করে রক্ত বের হয়ে মুখখানাকে ভয়ংকর করে তুললে। আমি বোবা হয়ে গেলাম। চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

মা বাঁহাত দিযে সেই বক্ত নেড়ে আঙুলে মেখে চোখের সামনে ধবে দেখে আস্তে আস্তে বললে—রামের মতো স্বামী পেলে আমিও সীতা হতে পারতাম নীলু। তোর বাপ রাম ছিল না রে! রাবণ সীতাকে হবণ করে নিয়ে গিযেছিল—রাম সমুদ্র বন্ধন করে রাবণকে বধ করে তারপর সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিল; তোর বাবা রাম ছিল না—আমাকে কুত্তার বেটি বললি—আমার বাবা কুত্তার চেয়েও অধম জীব ছিল। অর্থের জন্যে বড়লোক লম্পটের পা চেটেছে—তাদের কাছে স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করেছে। আমাকে যখন বিক্রি করলে, আমার হাতে নগদ দু'হাজার টাকার নোটের গোছা ধরিয়ে দিযে বাবা নির্লজ্জের মতো পাষণ্ডের সেই টাকা আমার হাত থেকে টেনে নিযে পকেটে পুবে বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজাটা মল্লিক বন্ধ করে দিয়ে—।

হুজুর, মা আমার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল এবার। বললে—ওরে নীলু, আমাকে সেকালে দাসী-বাঁদী যেমন বিক্রি হত তেমনি করে বিক্রি করলে প্রথমে বাপ। আমি তখন ষোল বছরের মেয়ে—আমি কি করব? অসহায় অবলার মতো পড়ে রইলাম—লোকটা আমাকে রাক্ষসের মতো গোগ্রাসে গিললে—। তোর বাবাকে তখন আমি দু'হাত বাড়িয়ে ডেকেছিলাম—তুমি স্বামী—তুমি আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। বলেছিলাম—ভীম যেমন দ্রৌপদীকে কীচকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল তেমনি করে বাঁচাও। শুধু বাঁচানো নয় তুমি শোধ নাও। তুমি ওকে খুন কর। করে যদি ফাঁসি যেতে হয় যাবে—তুমি ভেবো না—আমি বিষ খেয়ে মরব। কিন্তু তোর বাবা কাপুরুষের

অধম কাপুরুষ—আমাকে উদ্ধার করতে এসে ছুরি তুলে কাঁপতে লাগল থরথর করে, ওই রাবণ তার হাত ধরলে, ছুরিটা পড়ে গেল। তোর বাপ তার পায়ে গড়িয়ে পড়ে বললে—আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ছেড়ে দিন। ওই আমাকে বলেছিল—। তোর বাপ আমার দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

আমি মাটির পুতুলের মতো অবশ হয়ে গিয়েছিলাম—চোখেও বোধ হয় পাতা পড়েনি—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু শুনেই গির্যেছিলাম—মাযের কাছে লিখিযে নিয়েছিল—আমাকে আপনি কিনিলেন—তার দাম দিলেন আমার বাবাকে আমার স্বামীকে। আমি চিরদিন কেনা হইয়া রহিলাম। বাবা লিখে দিয়েছিল—আমাব স্ত্রী রত্নমালাকে স্বেচ্ছায় আপনাকে বিক্রয় করিলাম এবং দুই হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম। তারপর বাবা নিজে নাকি নিযে যেত মাকে সঙ্গে করে।

কপাল থেকে রক্ত ঝবে ঝরে মুখ ভিজিযে বুক ভিজিযে দিযেছিল—মধ্যে মধ্যে থানা থানা হয়ে জমেও উঠেছিল—সেদিকে তারও খেযাল ছিল না, আমারও ছিল না। সব বলা শেষ করে মা বলেছিল—ওবে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না সেই বাপের মেযে বলে। সেই স্বামীব স্ত্রী বলে। তোকে ক্ষমা করতে পাবিনি ওই কাপুরুষ বাপের ছেলে বলে। তুই পেটে না এলে আমি হযতো মরতাম—মরতে পারতাম। তোকে কোর্নদিন স্নেহ কবিনি কিন্তু তোর জন্যেই মরতে পারিনি। •

বলতে বলতে মা ঢলে পড়ে গিয়েছিল। বক্তক্ষযে দুর্বল হচ্ছিল সে খেযাল ছিল না। তারও ছিল না। আমারও ছিল না। যখন পড়ে গেল তখন মা বললে—নীলু, তুই লোকজন ডাক রে—তাদেব সামনে বলব আমি নিজে রাগ করে কানাভাঙা রেকাবিখানা নিজের মাথায বসিয়ে দিয়েছি।

হুজুর, আমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর শোধ আমি নেব। আমাব মা। হুজুর, লোকে আমাকে মস্তান বলে—যাব মাযেব উপব এমন অত্যাচাব হয—যাব চারিদিকে কোন আনন্দ নেই আশা নেই সে মস্তান না হযে কি কববে? উপায় কি তার? মাযের কাছে সব কথা শুনে অবধি আমি ঘুরেছি—পাগলের মতো ঘুবেছি। তারপর ছোরা নিযে তৈরি হযে সেদিন দাঁড়ালাম ওই গলির মোড়ে।

বলতে ভুলেছি হুজুর, মাকে হাসপাতালে দিতে হযেছিল। মা লোকেদের কাছে বলেছিল নিজের কপালে সে নিজেই ভাঙা বেকাবি বসিযেছে—হাসপাতালে বলেছিল এমন কাটা নিজের হাতে হয় না। লোকজনে বলেছিল—তার ছেলেই মেরেছে। তাও লেখা আছে পুলিসের খাতায়। তারপর মা বাঁচল—হাসপাতালে সাতদিন থেকে ফিরে এল। এসে বললে—নীলু তুই চলে যা। আমি তোকে টাকা দিচ্ছি, এই ঘড়ি বিক্রি করে টাকা দিচ্ছি, তুই চলে যা কোথাও।

আমি মাকে কিছু না বলে চলেই গেলাম। চলে গেলাম না, লুকোলাম কাছে পিঠেই। বুকে আগুন জ্বলত অহরহ। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হলো। তাদের আমি ছাড়লাম, তারা আমাকে ছাড়লে। ছোরাখানা নিয়ে তক্কে তক্কে থাকতাম। জানতাম মা সপ্তাহে একদিন যায়। ঠিক করেছিলাম প্রথম দিনেই রাক্ষসকে আমি বধ করব।

আর একদিন একবারও যে আমার মার গায়ে হাত দেবে তার থেকে আমার মৃত্যু ভাল। কিন্তু তা পারিনি হুজুর। সে আমার আপসোস। এত আপসোস আমার বাবা দাদামশায়ের কাজের জন্যেও হয়নি। প্রথম দিন গাড়ি এল কিন্তু সে এল না।

দ্বিতীয় দিন গলির মুখে অন্ধকারে দাঁড়ালাম।

একটা লোক নেমে ভিতরে গিয়ে মাকে ডেকে আনলে।

রাক্ষসটা নামলে। এগিয়ে এসে বললে—এস।

আমি লাফিয়ে পড়লাম। পেটে ছুরি চালালাম। তারপর বুকের বাঁদিকে-ডানদিকে। লোকটা পড়ে গেল। যে লোকটা মাকে ডাকতে গিয়েছিল সে ভয়ে ছুটে পালাল। গাড়ির ভিতর থেকে ড্রাইভারটা চিৎকার করে উঠল। মা বলে উঠল—নীলু!

বললাম—হ্যাঁ। এই তোকে খালাস করে দিলাম। এরপরও যদি এই পাপ তুই করিস তবে তুই যা বলেছিস সব মিথ্যে আর তার জন্যে তোর কুষ্ঠ হবে জেনে রাখিস। যদি না হয় তবে ফাঁসি যাব আমি—আমি মরা ঈশ্বরকে নরককুণ্ডের পাঁকে পুঁতে দেব চিরদিনের মতো।

আমাকে ফাঁসির হুকুম দিন। আমি খুন করেছি। আমার মাকে যে টাকার জোরে জন্তু-জানোয়ারের মতো কিনেছিলে তাকে খুন করে আমার মাকে আমি খালাস করেছি।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা গুরুভার কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে সারা আদালত ঘরটা চকিত হয়ে উঠল। কি পড়ল ? আসামীও চুপ করলে এবং সেদিকে তাকালে যেদিক থেকে শব্দটা উঠেছিল। উঠেছিল সামনের দিক থেকেই।

একটি অতি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

মা।

তার মা চেয়াবে বসেছিল—-সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। কোর্ট অ্যাডজোর্নড হলো সেদিনের মতো।

"মানুষের প্রতি কি মানুষেব অন্যায় করবার অধিকার আছে ? প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। এ অধিকার নেই। তবু অন্যায় ঘটে। মানুষ মানুষের উপব সজ্ঞানেই অন্যায় করে। তাহার প্রতিবিধানের জন্য দেশে আইন আছে কানুন আছে শাসন আছে শৃঙ্খলা আছে তবু অন্যায হয। এবং বহু ক্ষেত্রে সে অন্যাযের প্রতিকার হয় না। আইন অসহায়ভাবে দুর্বল হয়ে মাথা নত করে। মানুষেব ন্যায়বোধ সমস্ত কিছুকেই মানুষেরই প্রবৃত্তি সরীসৃপের মতো বিষাক্ত দংশনে বিনষ্ট করে। আইন-শৃঙ্খলার লোহার বাসরঘর নির্মাণ কবে মানুষ ন্যাযনীতিব লখীন্দরকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূচীপ্রমাণ ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করে লখীন্দরেব প্রাণ হরণ করছে যুগ যুগ ধরে। মানুষ অসহাযভাবে মেনে নেয় এবং এই সরীসৃপ প্রবৃত্তিকে মাথা নত করে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয। মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে। বর্তমান ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আসামী নীলু চক্রবর্তীব জীবন নিষ্ঠুর অভিশাপে অভিশপ্ত জীবনের একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জন্মের বোধ করি প্রথম মুহূর্ত থেকে সে তার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, সম্ভবত

ঠিক বলা হলো না—মাতৃরোষের দ্বারা তিলে তিলে সে দগ্ধ। সমাজে সে চরমতম অপমানিত, লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত। এক কামার্ত নরপিশাচের কুটিলতম অত্যাচারে অত্যাচারিত।

পাবলিক প্রসিকিউটর বলেছেন সাক্ষীদের দ্বারা তিনি প্রমাণিত করেছেন যে আসামী কুখ্যাত একজন মস্তান। স্থানীয় লোকেরা তার নামকরণ করেছে টাইগার। অর্থাৎ হিংস্র শ্বাপদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং হিংস্র শ্বাপদ।

হয়তো তাই।

এ সম্পর্কে আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—হয়তো তাই। যার মায়ের অপমান হয় ধনী ব্যভিচারীর কলুষিত থাবার নীচে, যে বালকের জীবনে কোন সম্মান নেই সমাদর নেই সে যদি সত্যই প্রাণবন্ত হয় তবে বাঘের মতো হিংস্র হয়ে নিষ্ঠুরভাবে বর্তমানের সব কিছুকে ভেঙেচুরে চূর্ণ করে না দিয়ে তার পথ কোথায়? যাকে কেউ স্বীকার করে না তাকে আপন শক্তিতে স্বীকার করাতে হয়, সকল অত্যাচারকে রোধ করতে হয়।

মানুষের কাছে সকল অত্যাচারের চরম অত্যাচার—মায়ের অপমান।

আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—সারা দেশের অবস্থা এবং দেশের তরুণদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলতে ইচ্ছে করে যে এই বালক এবং তার মা তার প্রতীক।

এ কথা স্বীকার করতে আমারও ইচ্ছে হয়। এবং বলতে আমি বাধ্য যে এই বালকের মায়ের উপব যে কুটিল এবং কল্পনাতীত-রূপে কুৎসিত অত্যাচার হয়েছে, আইনসংগতভাবে তার প্রতিকার হয়তো পেতে পাবত কিন্তু এর শোধ নেবার অধিকার তার ছিল না। এ কথাও সত্য যে, বিচিত্র মানুষেব সমাজের অতীত-কালের প্রভাবে ওই মিথ্যা দলিলে সই করিয়ে নিয়ে এই নারীর উপব যে অত্যাচার হয়েছে এবং যে অত্যাচাবের মুখে অসহায়ভাবে তার পিতা ও তার স্বামী তাকে সমর্পণ করেছে তাতে তার এই পুত্রটি এইভাবে নিজের জীবন পণে ফাঁসিকেই স্থির পরিণাম জেনে অত্যাচারীকে হত্যা করেছে; সে দুর্দান্ত, প্রাণবন্ত—তাব পক্ষে বোধহয় এই ছিল স্বাভাবিক। দেশের আইন এতে সম্মতি না দিলেও এই প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে উদ্যত হত্যাকারী পুত্রটিকে মানুষ শ্রদ্ধা ও প্রশংসাব দৃষ্টি দিযেই মনোলোকে অভিষিক্ত করবে।

আমি মহামান্য হাইকোর্টের কাছে এই বালকের সকল অপরাধের মার্জনার জন্য সুপারিশ করছি।"

দায়রা বিচারের রায়খানা পড়ছিলেন সুধাংশুবাবু। সুধাংশুবাবুর সেই বসবার ঘরে। সেই রাত্রিবেলা। সামনে দাঁড়িয়েছিল সেই চাঁপা সেই রত্নমালা!

প্রেতিনী নয়, মমতায় বেদনায় জল-টলমল দুই চোখ নিয়ে সুধাংশুবাবুর সামনে দাঁড়িয়েছিল—মা। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়েছিল।

সকল গ্লানি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত মা।

সুধাংশুবাবু প্রসন্ন এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকালেন।

চৈতালী ঘূর্ণি

□●□

অনাবৃষ্টির বর্ষার খররৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে; সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব; মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাতাস, হু হু করিয়া একটা দাহ বহিয়া যায়।

গোষ্ঠ মাঠের কাজ সারিযা ঘরের দাওয়ায় কোদালখানি রাখিয়া কলিকায় তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল; টানিয়াই যায়, আর কি যেন ভাবে।

পত্নী দামিনী হাতাখানা পুড়াইয়া ডালের মধ্যে সশব্দে ডুবাইতে ডুবাইতে কহিল, কি ভাবছ বল তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোষ্ঠ কহে, হু, ভাবছি—ভাবছি কি জান, তুমিও তো অনেক দিন এসেছ, বল দেখি, গাঁ-খানা কি ছিল আর কি হলো?

দামিনী কহে, তা সত্যি বাপু, সেই গাঁ—সবাবই ঘবে গোলাভবা ধান, যাত্রা, মচ্ছব কত; বছর বছব নটবরের যাত্রা হযেছে; আর এখন আজ খেতে কারু চাল নাই।

গোষ্ঠ বলে, জান আজ মাঠ থেকে ফিরতে নদীর ধাবে দাঁড়িযে গা শিউবে উঠল। সমস্ত গাঁটা যেন আবছা ধোঁযাতে ছেযে গিয়েছে, নদীব বুকে বাতাসে তপ্ত বালি হু হু কবছে, নদীব ওপবেই শ্মশানের ছাই উডছে, শেযাল কুকুর শকুন চেঁচাচ্ছে; গাঁয়েব মাঝ থেকে একটা সাড়া নেই কারু, যেন সব মরে গিয়েছে; আমাব বুকখানা কেমন করে উঠল বাপু।

দামিনী ভযে শিহবিয়া উঠে; তরুণীটির সদাহাস্যময়ী মুখখানি মলিন হইয়া উঠে, উহাবও তবল মনেব বুকে ভাবনাব বোঝা চাপিযা বসে।

সত্যই বিভীষিকা জাগে।

গ্রামে ঢুকিতে প্রথমেই একটা নদী।

নদী ঠিক নয়, একটা মরুভূমি, লম্বা একটানা একটা বালুকার প্রবাহ, জল নেই; অন্তত বৎসরের মধ্যে আটটি মাস জলধাবা বয না, বয একটা অদৃশ্য অগ্নিলীলা, খররৌদ্রে হু হু করে মরীচিকার ধাবা।

আর ওই মরীচিকা, ওই নৃত্যশীল অদৃশ্য অগ্নিধাবা, ও তো মিথ্যা বা মাযা নয, ও শুষ্কবক্ষ মাটির তৃষ্ণা; নিদারুণ রুক্ষতায় হাহা করে।

নদীর পরই চবের উপর শ্মশান।

এখানে অগ্নিলীলা অদৃশ্য নয়, রাশি বাশি অঙ্গারে, চিতাব লকলকে বক্তরাঙা বহ্নিশিখার বাস্তবে মূর্ত।

জীবজন্তুব সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, আছে শুধু উত্তাপ, অগ্নি, অঙ্গাব, কঙ্কাল, শব।

জীবন্তের মধ্যে, আকাশের বুক হইতে তীক্ষ্ণ চিৎকারে শকুনির পাল শবগুলার বুকে গলিত দেহের লোভে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বীভৎস দুর্গন্ধময় বিশাল ডানা দুইখানার ঝাপটে এ উহাকে তাড়ায় ও উহাকে তাড়ায়।

আর আসে শৃগালের দল, শবগুলার বুকে পা রাখিয়া রক্তহীন মাংসের পিণ্ডে দাঁত বসাইয়া কুকুরগুলা গোঙায়—গোঁ-গোঁ।

শৃগালের দল দূরে আর একটা শবের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তীক্ষ্ণ রোমাঞ্চকর কোলাহলে চরখানা মুখর হইয়া উঠে। গাছের ছায়ায় পূর্ণ-উদর তন্দ্রাচ্ছন্ন কয়টা কুকুর শবগুলার পানে চাহিয়া থাকে। পূর্ণ উদর, লোভের অন্ত নেই, লোলুপ লোভে মুখগুলা হাঁ করিয়া থাকে, লম্বা করকরে জিভগুলা ঝুলিয়া পড়ে, আর তাহাতে অনর্গল গড়ায় লালসার লালা।

বায়ু, যে বায়ু মানুষের জীবন, সেও এখানে ভয়াল, সেও পাগলের মতো অবিরাম আপন অঙ্গে মাখে চিতার ছাই, গলিত শবের দগ্ধ দেহের বিকট বীভৎস দুর্গন্ধ।

শ্মশানের পরই খান তিরিশেক মাঠ, তাহার পর গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটা, যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান; পল্লীটার দ্বারপ্রান্ত অবরোধ করিয়া যেন মরণের কটকখানা বসাইয়াছে।

মাঠের ফসল শ্মশানের প্রান্ত পর্যন্ত জাগিয়া উঠে, কিন্তু নীচে শুষ্ক নদীর টানে মাঠের রসটুকু চোঁয়াইয়া ওই রাক্ষসী বালুকা-প্রবাহের বুকে মিশিয়া যায়।

কঠিন রসলেশহীন মাটির বুকে শীর্ণ পাংশুটে গাছগুলি তবু অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, যেন শুষ্কবক্ষ কঙ্কালাবশেষা নারীর সন্তান সব; মরণের শোষণে রসময়ী ধরণী মা, সেও বুঝি বন্ধ্যার মতো শুষ্কবক্ষা হইয়া উঠিল। বাতাস বয়, সঙ্গে সঙ্গে চিতার ছাই উড়ে; এদিকে গাছগুলা দোলে, উহাদের পাতায় ছাইগুলা জড়াইয়া যায়; যেন মুমূর্ষু জীবন-মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শ্মশানটাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়।

অন্ধকারের মাঝে প্রেত নাচে; তাই অন্ধকারের মাঝে জীবন্ত মানুষকেও প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়, আর প্রেতত্ব পায়ও মানুষ, তাই অন্ধকারের মাঝেই মানুষ চোর, মানুষ ঘাতক। বাহিরের ওই মরণের রাজ্যের ছায়ায় গ্রামখানাও ঠিক যেন মৃতের রাজ্য। মানুষ তো নয় সব, হাড় চামড়া ঝরঝর করে কঙ্কালসার মানুষ অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; বাড়িঘরের অবস্থাও তাই, দেওয়ালগুলার লেপন খসিয়া গিয়াছে, যেন পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চালও তাই, খড় বিপর্যস্ত, কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে পড়ে। অবরুদ্ধ জীবন্তের রাজ্যের টুকরাখানা বুঝি থাকে না।

কে রক্ষক?

রক্ষক ভগবান কত দূরে, কে জানে!

লোকে ভগবানকে ডাকেও।

কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌঁছায় না।

কিংবা সে বুঝি অতি নিষ্ঠুব।

তবু উচ্চকণ্ঠে ওবা প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ডাকে—

"ওবা তাব নামেব গুণে গহন বনে, মৃত তরু মুঞ্জবে,
নামেব তবী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পাব কবে।"

ওই বিশ্বাসটুকুর আশ্বাসেই উহাবা বাঁচিযা আছে, ওইটুকুই জীর্ণ স্বর্ণসূত্রেব মতো এই জীবনেব মালাখানি আজও গাঁথিযা বাখিযাছে। কিন্তু ও আশ্বাসও অতি ক্ষীণ, অতি দুর্বল; তাই উহাবা মুখে বলে, হবি হে, যা কব। কিন্তু মন ঠিক ওই কথাটা মানিযা লইতে চায না, সে কবিবাজেব 'ডাক্তাবখানা' পর্যন্ত ছুটায, বটিকা পাঁচন মুখ খিঁচাইয়া গিলায়।

বাঁচিলে দেবতাব পূজা দেয, না বাচিলে বলে, পাথব, পাথব দেবতা-ফেবতা মিছে কথা।

মোট কথা, ভগবানকে উহাবা মানে, কি মানে না, সেটা আজ একটা অমীমাংসিত সমস্যা।

ডাকিতেও মন চায না, না ডাকিলেও মন খুঁতখুঁত কবে।

উপলব্ধ সত্য আব যুগযুগান্তেব সংস্কাবে এখানে দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতায বুকেব ভিতব ক্ষোভ জাগিযা উঠে—সংস্কাবেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ঝড়ো হাওযাব মত্তো।

কি সে চৈত্র প্রান্তবেব ঘূর্ণিব মতোই ক্ষীণ আব ক্ষণস্থায়ী, উঠিযাই মিলাইযা যায।

শশ্মানখানা যেন দিন দিন আগাইযা আসিতেছে। সুদূব আফগানিস্থানেব কাবুলীব দল শকুনীব মতো তীক্ষ্ণ চিৎকাবে খাটো খাটো ভাঙা বাংলায হাঁকে, এ গুষ্ঠা মুডাব, আবে এ—

দামিনীব তখন ওই বিভীষিকাময়ী ভাবনায দম যেন বন্ধ হইযা আসিতেছিল, সে কহিতেছিল, আপনি শুতে ঠাই পায না, শঙ্কবাকে ডাক, তোমাব হলো তাই। গাঁযেব ভাবনা ভাবতে লাগলে—

সহসা বাহিব হইতে ওই কাবুলীওযালাব ডাক।

দামিনী কহে, ওই নাও, যা বলছিলাম তাই, এখন কি কববে কব।

বাহিব হইতে হাঁক আসে, এ গুষ্ঠা, আবে এ —' সঙ্গে সঙ্গে দবজায লাঠিগাছটা ঠোকে, ঠকঠক।

গোষ্ঠেব দেশেব ভাবনা কোথায় উবিয়া যায, হুকা টানিতে টানিতে সে আঁতকাইয়া উঠে।

আবাব লাঠি ঠোকাব শব্দ হয।

গোষ্ঠ অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিযা ঘবেব মধ্যে গিয়া কোণে লুকাইযা সে হুঁকা পর্যন্ত টানে না।

দামিনীও সঙ্গে সঙ্গে যায়, দামিনীব বুকখানা গুবগুব কবিযা উঠে, বলে, কি হবে গো?

গোষ্ঠ ফিসফিস করিয়া বলে, বল, ঘরে নেই।

দামিনী চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, না না, আমি পারব না।

গোষ্ঠ হাতজোড় করিয়া মিনতি করে, হেই গো, তোমার পায়ে পড়ি।

দামিনী স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তিরস্কার করে, ছি, কি বল তার ঠিক নেই; আক্কেলের মাথা খেয়েছ একেবারে?

ওদিক হইতে আবার হাঁক আসে, আরে এ গুষ্ঠা, হারামজাদা, বদমাশ, বাহার আসো।

গোষ্ঠ আবার কাকুতি করিয়া বলে, লক্ষ্মীটি, বল বল, নইলে বেটা আবার ঘরে ঢুকবে।

দামিনীর বুক গুরগুর করে, সে চাপা গলায় ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তখন যে কাপড় কিনতে মানা করেছিলাম। ধারে পেলেই কি হাতি কিনতে হয়?

গোষ্ঠ বলে, সে তো তোমার জন্যই—

দামিনী জ্বলিয়া যায়, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই দরজার মুখে নাল-মারা নাগরা আওয়াজ দিয়া উঠে।

দামিনী তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় শিকল দিয়া বাহিরে আসিয়া ঘোমটা টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলে, ঘরে নাই গো।

ভাঙা বাংলায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাবুলী কয়, তুমি কৌন্ আসো, তুম্হি—

দামিনী ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না, তাড়াতাড়ি শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে চায়, দেখে ভিতর হইতে খিল আঁটা।

ওদিকে নাগরার আওয়াজ উঠানের বুক অবধি আগাইয়া আসে।

দামিনী ভয়ে এক পাশে সরিয়া দাঁড়ায়।

কাবুলী কয়, তুমি কৌন্ আসো? উস্কো কৌন্? জরু? বহু আসো?

দামিনী ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ।

কাবুলী কয়, তব তো তুম্হি টাকা দিবিস; পন্‌রা টকা, পন্‌রা টকা, দশ আওর পাঁচ লিয়ে আস।

দামিনীর গলা শুকাইয়া যায়, তবু আর্তস্বরে কহে, ঘরে নাই, আসুক।

কাবুলী দাঁত বাহির করিয়া বলে, তব তুম্ আসো, তুম্‌কো লিয়ে যাবে।

দামিনী ভয়ে চেঁচাইয়া উঠে।

কাবুলী হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়, আপন ভাষায় গোটা জাতটাকে গালি দেয়।

দামিনী কাঠ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে, তবু সে চোখ আগুনের মতো জ্বলে।

কতক্ষণ পর দরজা খুলিয়া গোষ্ঠ বাহিরে উঁকি মারিয়া বলে, গিয়েছে বেটা শকুনি?

দামিনী কথা কয় না, চোখের জলের প্রবাহ দ্বিগুণ হইয়া বয়, মুখখানা কঠিন হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ আড-চোখে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া কয, একদিন এমন ঠেঙান ঠেঙাব!

এই নির্লজ্জ আস্ফালন কানে আগুনের হলকার মতোই ঠেকে, সে মাটির উপরেই সজোরে ফুৎকার নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

ঘরের ভিতর পাঁচ বছরের ছেলেটা জ্বরে ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে চেঁচায, ক্ষিঁধে লেঁগেচে—এঁ—এঁ—এঁ—।

দামিনী তীব্রকণ্ঠে বলে, মব, মর, আমার হাড জুডোক।—বলিযা একথালা মুডি সশব্দে ছেলেটাব মুখেব কাছে নামাইযা দিয়া আবার বলে, নাও, গেলো, গিলে যমের বাডি যাও।—বলিযা মুখ ফিবাইযা চোখ মোছে, কিন্তু সে জল মুছিয়া শেষ করিতে পাবে না।

গোষ্ঠ সভযে কহে, মুডি কেন? সাবু সাবু—

দামিনী কথা কাডিযা বলে, সাবু আমি রোজগার করে আনব, নয?

গোষ্ঠ চুপ কবিযা যায, ক্ষণেক পর আপন মনেই কয, তা পুরনো জ্বর বটে, তা খা, দুটো মুডি খা। কত আর সাবু খাবি?

ছেলেটা কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট হয না, মুডি ছডাইয়া ফেলিযা চেঁচায, ভাঁ--আ ত খাঁ—আ—বো—ও—ও—

চিৎকারে বিরক্ত হইয়া গোষ্ঠ উঠিয়া যায়।

কোথায় যাইবে? নিবানন্দ এ পুবীতে কোথায আনন্দ? গোষ্ঠ মাঠেব পথ ধবে, ওই হোথায গিয়া আশাব আলো নজরে ঠেকে, শেষ আষাঢেব সবুজ মাঠ, কচি কচি লকলকে ঘন সবুজ ফসলের ডগাগুলি হেলে দোলে আর যেন কত কথা বলে, ধানের ডগাগুলি যেন বলে—

"ধান, ধান, ধান—ধানে বাখবে জান,
ঋণ শোধিব খাজনা দিব
ধানে বাখবে আমাব মান।
নতুন বস্ত্র পুবনো অন্ন
এই যেন খেতে পাই জন্ম জন্ম।"

গোষ্ঠ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঘন সবুজ ধানেব পানে তাকাইয়া থাকে। ইচ্ছা কবে এইখানেই দিবাবাত্রি কাটাইযা দেয।

ওদিক হইতে আখেব পাতাগুলি ইশাবা কবিযা দুলিযা দুলিযা যেন ডাকে, গোষ্ঠ আগাইযা চলে, আব আপন মনেই গুনগুন করিযা বলে—

"কাজুলি রে কাজুলি,
তোব পাযে এবার আমাব
বউ পরাবে মাদুলি।"

তকতকে নিডানো ক্ষেতে বসিযা গোষ্ঠ বিনা কাজে হাতে কবিযা ডুরার মতো গুঁডা মাটি পেষে, সাবা অঙ্গে মাখিতে ইচ্ছা করে।

মাঠের আলপথে ভিন্ গাঁ হইতে দোকান সারিয়ে ফিরিতেছিল ভোলা মযরা। সে

কহিল, কি গোষ্ঠ, রোদে বসে কি হচ্ছে? সত্য কথা বলিতে কেমন লজ্জা করে, আমতা আমতা করিয়া বলে, এই খুড়ো, বসে আছি।

ভোলা খুড়া কহে, সে আমলের ক্ষেপা মোড়লের মতো ধান বাড়াচ্ছিস নাকি? ক্ষেপা মোড়ল কি করত জানিস? দিনে, দুপুরে, সন্ধ্যেয় বাড়ির কাজে খোলসা পেলেই মাঠে এসে নিজের ধানের ডগায় হাত দিয়ে বলত, কন্—কন্—কন্—,—ওঠ—ওঠ—,কন্—কন্ করে বেড়ে ওঠ। আর পরের ধানেব মাথায় হাত দিয়ে নীচে দিয়ে নামিয়ে বলত, কন্—কন্—কন্, বসে যা, নেমে যা।

গোষ্ঠ গল্প শুনিতে শুনিতে ভোলা খুড়ার সঙ্গ ধরিয়াছিল। গোষ্ঠ কহিল, খুড়ো, ক্ষেপা মোড়লের অবস্থা বুঝি ভাল ছিল না?

খুড়া চ্যাঙারিসুদ্ধ মাথা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর পানে তাকায়; তারপর বলে, হ্যাঁ, অবস্থা তার ভাল ছিল না, তবে আজকালকার সবার চেয়ে ভাল ছিল।

গোষ্ঠ কহে, আচ্ছা, খুড়ো, সে সব ধান ধন গেল কোথায় বল দেখি? ঠিক পাশের আখের ক্ষেতটার ভিতরে শব্দ উঠে মডমড খসখস; গোষ্ঠ কহে, কে, আখ ভাঙছে কে রে, কে? কচি আখ ভাঙে কে?

ভিতর হইতে সে লোকটা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠে, তোর বাপ রে হারামজাদা।

গোষ্ঠ কিল খাইয়া কিল চুরি করে, গালিটা নির্বিবাদে হজম করিয়া চলে, গতিটা একটু বাড়াইয়া দেয়, আপন মনেই বলে, বাঘে ধান খায়, তো তাড়ায় কে? ভাঙ বাবা জমিসুদ্ধু তুলে নিয়ে যা।

যে লোকটা আখ ভাঙিতেছিল, সে জমিদারের চাপরাসী। খুড়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া কহে, দেখলি গোষ্ঠ, ধন ধান গেল কোথা? ওই দশজনে লুটেই খেলে।

গোষ্ঠ ও কথাটার উ—া দেয় না, আপন মনেই বলে, দেবতা-ফেবতা মিছে কথা—মিছে কথা খুডো, ওসব আঁকা চোখে ফাঁকা চাউনি, দেখতে কেউ পায় না।

মোড ফিরিবার মুখে খুড়া কহে, চ্যাঙারিটা একবার নামিয়ে ধর তো গোষ্ঠ।

গোষ্ঠ চ্যাঙারিটা নামাইয়া ধরিলে একমুঠা বাতাসা লইয়া খুডা গোষ্ঠর আঁচলে দিয়া বলে, ছেলেটাকে দিস। ক্ষণিকের এই ক্ষীণ সহানুভূতিতে গোষ্ঠের প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

ওদিকে ছেলেটা ভাত খাইবার বাসনায় কাঁদিতে কাঁদিতে নেতাইয়া পডে। দামিনী দাওয়ার উপর কাঠের মতো বসিয়া ছিল, সহসা সে ছেলেকে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিযা ধরে।

চোখের প্রবাহ প্রবল হয়; মনে মনে শতবার ষষ্ঠীকে স্মরণ করিয়া ছেলের মাথায় সে হাত বুলায়।

ছেলেটা তবু কাঁদে,—ভাঁ—আঁ—ত খাঁ—বো—ও।

স্নেহসর্বস্বা অশিক্ষিতা নারীর মন বলে, আহা, দুটি খাক। পুরনো জ্বরে তো লোকে খায়। ভাত খাইয়া ছেলেটার ক্ষুধার কান্না থামে, কিন্তু যাতনার কান্না বাড়ে, বমি হয় জ্বর বাড়ে।

মায়ের মন সেই গাল দেওয়ার কথাটাই স্মরণ করে, ভাতের কথাও মনে হয়, কিন্তু সে যে এত কয়টি, মাত্র দুইটি গ্রাস।

গালটাই মনে প্রবল হইয়া জাগে, দেবতার উদ্দেশ্যে মাথা ঠুকিয়া কপালটা ফুলিয়া উঠে।

সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজকেও স্মরণ করা হয়।

কবিরাজ ডাকিবার জন্য দামিনী ক্রমে ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কিন্তু সে যে নারী! ডাকিবে যে, সে কোথায় কোন্ আড্ডায় একটু তামাকের আশায় স্ত্রী-পুত্র সব ভুলিয়া বসিয়া আছে।

ব্যাকুল মন সঙ্গে সঙ্গে বিষাইয়া উঠে, সে বিষের ঘোরে ভাল-মন্দ জ্ঞান যেন সব লোপ পায়।

তাই যাহাকে সে দূরে রাখিতে চায়, যাহার পরম দাস্যভাব সে ঘৃণা করে, সেই সুবল দাসের কাছে ছুটিয়া গিয়া হাতের পৈঁছা জোড়াটি খুলিয়া দিযা কাকুতি করিয়া কহিল, আমাকে দুটি টাকা দাও, আর কবরেজকে একবার ডেকে দাও।

তরুণ সুবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া আবার সলাজে মুখ নামাইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, পৈঁছা তুমি রাখ, টাকা আমি দিচ্ছি।

বিষের ঘোরের মাঝেও যাতনার দাহে চেতনা ফিরিযা আসে, সুবলের সহানুভূতি দামিনীর বুকে সেই দাহের কাজ করিল, দামিনী ঝাঁঝাইয়া উঠিল, শুধু হাতে তোমার টাকা নোব কেন আমি?

সুবল বিবর্ণ হইয়া অনুনয় কবিযা কহিল, সধবা মানুষ তুমি, খালি হাতে—। সুবলের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল।

জীর্ণ কাপড়ের পাড়খানি ঝাঁঝের মুখে এক হাত ছিঁড়িতে, তিন হাত ছিঁড়িযা হাতে জড়াইয়া কহিল, এই আমার সোনার কাঁকন, তোমার পায়ে পড়ি মহান্ত; এ দুটো নিয়ে আমাকে টাকা দাও, ছেলেটা বুঝি আর বাঁচে না। দীপ্ত কণ্ঠস্বর স্নেহের দুর্বলতায় ভাঙিয়া পড়িল, চোখের কোলে কোলে জল টলমল করিয়া উঠিল।

সুবল ব্যস্ত হইয়া পৈঁছা জোড়াটি ঘরে তুলিয়া টাকা আনিযা দামিনীর হাতে আলগোছে দিতে গেল, কিন্তু কেমন হাত কাঁপিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট টাকা দুইটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সুবল লজ্জায় একরূপ ছুটিযাই পলাইল, কহিল, কবরেজকে ডেকে আনি আমি।

ঘর-দ্বার সব খোলা পড়িয়া রহিল!

দামিনী শেষে দরজায় শিকলটা তুলিয়া দিয়া বাড়ি ফিরিল।

মনটা কিন্তু কেমন ছি-ছি করিতেছিল।

একের লজ্জা অপরকেও লজ্জিত করে যে সংক্রামক ব্যাধিব মতো; যাহাকে দেখে তাহার লজ্জায় যে দেখে সেও লজ্জা পায়, হউক না কেন দ্রষ্টার মন ফুলেব মতো পবিত্র।

দামিনী ওই কথাই ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছিল। বাড়ির দুয়ারে তাহার চমক ভাঙিল একটা কাঁসার মতো তীক্ষ্ণ উচ্চ কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া।

লোকটা উচ্চকণ্ঠে কহিতেছিল, ও চালাকি চলবে না হে বাপু, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেওয়ার কথা, দাও, দিতে হবে।

লোকটা মহাজন।

দামিনীর সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দামিনী ভাল ঘরের মেয়ে, পড়িয়াছিলও ভাল ঘরে।

গোষ্ঠর অবস্থা চিরদিনই এমন ছিল না, তাহার বাপের আমল পর্যন্তও গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গাই, পুকুর-ভরা মাছ—পল্লীর ঐশ্বর্য যা কিছু সবই ছিল।

কিন্তু সে শ্রী আর নেই, সব গিয়াছে।

থাকে কি করিয়া ? মূল মরিলে কি ফুল বাঁচে !

পল্লীর শ্রীই যে গিয়াছে।

এখন অভাবের মাঝে শুধু অতীতের প্রাচুর্যের স্মৃতিই সম্বল, ছেলেকে পর্যন্ত ওই স্মৃতিকথার মালায় সান্ত্বনা দেয়—

"আয় চাঁদ আয় আয়, গাই বিয়োলে দুধ দোব,
ভাত খেতে থালা দোব, রুইমাছের মুড়া দোব,
আম-কাঁঠালের বাগান দোব, চাঁদের কপালে
একটি টিপ দিয়ে যা।"

দামিনী এ বাড়িতে আসিয়াছিল আট বছরেরটি ; আজ বয়স তাহার বাইশ। ইহারই মধ্যে এই সংসার কতরূপেই না তাহার চোখের উপর ফুটিল। প্রথম প্রথম এ গৃহ কারা মনে হইয়াছে, মায়ের জন্য কাঁদিয়া দিন গিয়াছে ; তারপর এ সংসার কৈশোরের প্রারম্ভে যেন পুষ্পিত উদ্যান। স্বামী কত ভালবাসিয়াছে, কত গোপন উপহার, মনসার মেলায় গভীর রাত্রে ঘুমন্ত দামিনীর মুখে গরম বেগুনি গুঁজিয়া দেওয়া।

দামিনী জাগিয়া উঠিয়া কহিত, দূর।

গোষ্ঠ কহিত, আমি তো দূর, ওদিকে তো বেশ মুড়মুড় শব্দ উঠছে।—বলিয়া ঠোঙাসুদ্ধ সম্মুখে ধরিত।

দামিনী হাসিয়া ফেলিত।

গোষ্ঠ সম্মুখে মেলিয়া ধরিত কত উপহার—ফিতে, চিরুনি, তেল, আয়না, সাবান।

দামিনী আয়নাখানা তুলিয়া মুখের সামনে ধরিত।

গোষ্ঠ হাসিয়া কহিত, নিজের রূপ কি নিজে দেখে, পরকে দেখাতে হয়।

দামিনীর মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিত, কানের পাশ পর্যন্ত গরম। সে আয়নায় মুখখানা ভাল করিয়া ঢাকিত।

গোষ্ঠ কহিত, রাত্রে আয়না দেখলে কি হয় জান তো ?

কি ?

কলঙ্ক !

দামিনী চট করিয়া আয়নাখানা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর মুখের সামনে ধরিত।

গোষ্ঠ কহিত, আমি চোখ বন্ধ করেছি।

দামিনী গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখ খুলিবার জন্য চেষ্টা করিত। শেষে মিনতি করিয়া কহিত, লক্ষ্মীটি চোখ খোল।

গোষ্ঠ চোখ খুলিলে দামিনী কহিত, এইবার ?

কি ?

তোমারও কলঙ্ক হবে।

আমরা পুরুষ, সোনার গহনা, কলঙ্ক আমাদের হয় না, বিপদ তোমাদের।

দামিনী হাসি" ঠোঁট উল্টাইয়া কহিত, ভারি বুদ্ধি ! ওই জন্যে বুঝি আয়না দেখালাম ?

তবে কি ?

কলঙ্ক হয় তো তোমার সঙ্গেই হবে, তোমাকে সাক্ষী করে রাখলাম।

দূর, আমি তোমার আয়ান ঘোষ। গোষ্ঠ ইঙ্গিত করিয়া হাসিত।

দামিনী আবার রাঙা হইয়া কহিত, চোরের মন পুঁইমাচাতে, কলঙ্ক বুঝি আর কিছু হয় না ?

কি শুনি ?

এই লোকে বলবে, অমুক কি মেগো, আর মাগীও কিছু জানে বাপু, অত বড় জোয়ানটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে গো !

তা করনি নাকি ?—বলিয়া গোষ্ঠ পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইত।

সে এক দিন গিয়াছে। এখনও সেদিন মনে পড়িলে দামিনীর চোখ ছলছল করে।

তারপর এই ভরা যৌবনেই অভাবের দাহে সুখের ঘর পুড়িয়া গেল। উত্তাপে বুঝি প্রেমের স্রোতও শুকাইয়া গেল।

গোষ্ঠও মনের মতো কিছু দিতে পারে না বলিয়া মরমে মরিয়া থাকে, অমনোমতো কিছু দিতেও মন উঠে না। দামিনীও তাহা বুঝে, তাই সেও কিছু চায় না।

কিন্তু তাহাও গোষ্ঠর প্রাণে বাজে, সে ক্ষুন্নস্বরে কয়, কখনও দেখলাম না যে কিছু চাইলে তুমি।

একমুখ হাসি ভরিয়া দামিনী কয়, যা বেশ লোক তো তুমি, না দরকার হলেও চাইতে হবে ? কি নেই আমার, সবই তো রয়েছে।

হাসিটি ছলনার সত্য, কিন্তু বড় সুন্দর, গোষ্ঠ অতৃপ্ত নয়নে মুখপানে চাহিয়া থাকে।

তারপর আপন মনেই নিজের সামর্থ্যের সঙ্গে দামিনীর অভাবের সূচী মিলাইয়া যায়, শেষে বাহির করে, একখানা গায়ের কাপড় ; কাবুলীর কাছে ধারে পাওয়া যাইতে পারে, তাই সে বলে, কই, গায়ের র‍্যাপার তো নাই তোমার ?

দামিনী তাড়াতাড়ি কয়, না না, ও আমি গায়ে দিতে নারি ; মাগো, যে সুঁড়সুড়ি ! ও কিনো না তুমি।

গোষ্ঠ মানে না, কিনিয়া আনে।

দামিনী ঝগড়া করে, বললাম, এনো না।

গোষ্ঠ অপ্রস্তুতের মতো কয়, রাগ কেন, আনলাম। আবার কখনও বা দুইটা আম দুইটা কাঁঠাল কিনিয়া আনে, কিন্তু তাহা খায় না, স্বামী পুত্রকে বাঁটিয়া দেয়।

গোষ্ঠ অনুযোগ করিয়া কয়, আমাকে কেন, তোমার তরে আনলাম।

এই স্নেহে দামিনীর চোখে জল আসে তবু সে হাসিয়া কয়, তুমি খাও, আমার আছে।

গোষ্ঠ প্রতিবাদ করে, এ তো আমাকেই সব দিয়েছ, তুমি—

তাড়াতাড়ি কথাটা শেষ করিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে দামিনী বলিয়া উঠে, ও আমি খেতে পারি না।

সঙ্কোচে মন শুধু সঙ্কুচিতই হয় না, শঙ্কিতও হয়। গোষ্ঠও নিজের অমনোমতো উপহারের জন্য শুধু সঙ্কুচিতই হয়, প্রত্যাখ্যানের শঙ্কায় শঙ্কিতও হইয়া থাকে। তাই সে ভাবে, এ অরুচি দামিনীর রসনায় নয়, তুচ্ছ বলিয়া তাচ্ছিল্যের অরুচি এ!

এ তাচ্ছিল্য মনে বড় লাগে, ক্ষোভে দুঃখে অন্তর মথিয়া বিষ ফেনাইয়া উঠে, গোষ্ঠ মুখের আহার সার ডোবায় ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া যায়। দামিনীর মনে হয়, আম ফেলিয়া দিল না, আমাকেই ফেলিয়া দিল। চোখে জল আসে, অন্তর জ্বলিয়া যায়।

এমনই নিরন্তর দাহে উত্তপ্ত অঙ্গার বুকের মাঝে স্তূপ বাঁধিয়া উঠে, শ্মশানের অঙ্গার স্তূপের চেয়ে সে কম নয়।

এই অশান্তির মাঝে আর এক দারুণ অশান্তি জুটিয়াছিল, প্রতিবেশী সুবল দাস। আট বছরের বউ দামিনী যখন আসে, তখন তাহারও ঠিক অমনই বয়স।

আট বছরের বউ ঘোমটা টানিয়া বসিয়া আছে, ফুটফুটে ছেলেটি আসিয়া মুখের ঘোমটা খুলিয়া ডাকিল, বউ!

দু'জনেই ফিক্ করিয়া হাসিল।

তারপর। ছেলেতে-মেয়েতে মিতালি হইতে কতক্ষণ!

ঠিক মিতা নয়, বউটির দাস হইল সে; ফুল তুলিয়া, ফল পাড়িয়া বউটির মন যোগানোই ছিল তাহার কাজ।

সুবল দামিনীকে প্রথম দিনই ডাকিয়াছিল, বউ! এখনও তাই বলে।

দামিনী বলিত, সুবলো। এখন বলে, মহান্ত।

বাউলের ছেলে সুবল দাস, মহান্ত স্বভাব তাহাদের।

কৈশোরের প্রারম্ভে দামিনীর দেহে যৌবনের মুকুল দেখা দিলে গোষ্ঠ আসিয়া তাহার হাত ধরিল, দামিনীরও তাহা লাগিল ভাল; সে গোষ্ঠর পানে মুখ ফিরাইল।

তখন এই লাজুক কিশোরটি দামিনীর পানে, বিদায়-নেওয়া প্রিয়জনের পানে মানুষ যে দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে তেমনই সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সে দৃষ্টি দেখিয়া দামিনীর করুণা হইত।

ফাঁক পাইলেই সুবল আসিয়া কহিত, বউ, কুল পাড়তে যাবে ভাই?

এদিক-ওদিক চাহিয়া দামিনী কহিত, না ভাই, বকবে।

সুবল নতদৃষ্টিতে চলিয়া যাইত, দামিনীর তাহাও প্রাণে বাজিত, সে ডাকিয়া কহিত, আমাকে দুটো দিয়ে যাস ভাই, আমি খাব।

সুবল কৃতার্থ হইত।

আঁচল ভরিয়া পাকা জাম, কাঁচা আম, টোকো কুল সুবল গোপনে আনিয়া দিত; দামিনী হাসি মুখে গ্রহণ করিয়া কাঁচা আমে কামড় মারিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিত, মাগো, কি টক। টাকরায় সে টোকার মারিত। সুবল তাড়াতাড়ি দামিনীর আঁচল টানিয়া বাছিয়া একটা আম লইয়া কহিত, এইটে খাও, কাঁচামিঠে আম, কাঁকুড়ের মতো।

কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে সম্মোহনের আবেশময় রাজ্যে উভয়ে প্রবেশ করিতেই দুইজনের এই প্রীতি কেমন টুটিয়া গেল।

দামিনীর মনে হইল, ওই শান্ত লোকটির একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টির দীপ্তি যেন বড় প্রখর, দীপ্তিতে যেন একটা দাহ। সে দাহ দামিনী তাহার সর্বদেহে অনুভব করিল।

সুবলের পরম দাস্যতা ভরা ব্যবহারের মাঝে একটা সবল শক্তি যেন দামিনীকে আকর্ষণ করিল; তাহার ওই সলাজ নীরবতার মাঝে যেন দূরত্বের সৃষ্টি করিল।

সুবল দেখিল, দামিনী পর হইয়া গেল।

শাস্ত্রে বলে, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, কিন্তু সুবল দেখিল, ভিক্ষায়াং বসতে লক্ষ্মী।

বাউলের ছেলে সুবল গান গাহিয়া ভিক্ষা করে, গায়ে আলখাল্লা, পায়ে নূপুর, হাতে তাহার একতারা।

ভিক্ষার চাউলে তার পাঁচ-সেরি ঝোলাটা ভরিয়া উঠে; একটা পেটে লাগে আর কত—বড জোর এক সের, বাঁচে চার সের।

ওই চার সের জমিয়া জমিয়া ভিক্ষুককে মহাজন পর্যায়ে দাঁড় করাইয়া দিল।

লোকে বলে, মহান্ত, আর কেন?

মহান্ত হাসিয়া বলে, বাপ রে, পিতিপুরুষের বেবসা, কুলকর্ম, ও কি ছাড়তে আছে?

দামিনীর দুঃখের দিনে কিন্তু সুবল সত্য সত্যই মহাজন হইতে ভিক্ষুক পর্যায়ে নামিতে চাহিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলা যে যায় না! আর বুক বাঁধিয়া তাহার সঞ্চয় সম্বল দামিনীর পায়ে ঢালিয়া দিতেও সাহস হয় না। হয়তো দামিনী লাথি মারিয়া ফিরাইয়া দিবে।

প্রথম প্রথম সে লুকাইয়া কুলুঙ্গির উপরে, কোন দিন বা চৌকাঠের ফাঁকে, দুয়ারের প্রবেশমুখেই টাকাটা সিকিটা রাখিয়া আসিত। দামিনীর নজরে ঠেকিলে সে আঁচলে বাঁধিত, আর আপন মনেই বকিত এই আলবোড্ডেমিতেই তো গেল সব; কাজ দেখ দেখি, কুলুঙ্গির উপরে টাকা, যদি কেউ দেখতে পেত।

ওটুকুও কিন্তু সুবলের সহ্য হইত না, আর সহ্য হইত না যখন গোষ্ঠ আসিত।

দামিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বামীকে কহিত, কারও কিছু হারিয়েছে?

গোষ্ঠ চমকিয়া স্মরণ করিতে চাহিত, জিনিসটা কি? শেষে বলিত, হ্যাঁ হারিয়েছে, আমার—

কি?

আমার মন।

দূর। সে তো আমারই, দত্ত জিনিসে স্বত্ত্ব কি? এই দেখ। বলিয়া বাঁধা খুঁট দেখাইত। গোষ্ঠ অবাক হইত; আবার ভাবিত, হবে হয়তো, বনিয়াদী ঘর তো, কোন পিতৃপিতামহের সঞ্চয় ইঁদুরে কোন গর্ত হইতে বাহির করিয়াছে। চোখে জল আসিত।

সুবলের কাছে সমস্ত সংবাদ তিক্ত হইয়া উঠিত।

সর্বস্ব দিয়াও সুবল আপন হওয়ার সুযোগ পাইল না।

কখনও কখনও সাহস করিয়া নতমুখে গিয়া কহিত, বউ!

রুক্ষস্বরে উত্তর আসিত, কি? কি কাজ কি, আগুন নেবে নাকি?

সব সুবলের হারাইয়া যায়, ঝঙ্কারের ঝঞ্ঝায় সব বিপর্যস্ত হইয়া যায়; তবু চুপ করিয়া থাকাও তো যায় না! অতি কষ্টে সে কহে, হ্যাঁ।

দামিনী হাতার টানে আগুন টানিয়া ফেলিয়া দিয়া কহে, নেবে কিসে? কি আবাঙ তুমি, সঙ নাকি? সঙ্গে সঙ্গে হাসেও; সুবলের অবস্থা দেখিয়া না হাসিয়া পারে না।

প্রতিবেশিনী সাতু-ঠাকুরঝি আসিয়া বলে, কে লো?

দামিনী কহে, ওই দেখ না মাইরি আগুন নেবে, তা শুধু হাতে এসেছে; দিই কিসে বল তো?

সাতু বেশ ভাল মানুষের মতোই বলে, ভিক্ষের ঝোলাটা আন গিয়ে মহান্ত, আগুন নিয়ে যাবে।

দুই সখী দুইজনে মুখপানে চায়।

এই অসবরে সুবল রণে ভঙ্গ দেয়, সহসা পিছন ফিরিয়া পালায়।

দুই সখীতে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

সাতু বলে, মরণ! বোবা পুরুষ কি ভাল নাকি, ও বিধেতার অলক্ষুণে ছিষ্টি।

*　　　*　　　*

বাড়ির বাহির হইতেই উচ্চকণ্ঠে শোনা যাইতেছিল, ও চালাকি চলবে না হে বাপু, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেবার কথা; দিতে হবে, দাও।

গোষ্ঠর মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, বর্ষার ক'মাস মাপ করুন দত্ত মশাই, ক'মাস নারব।

দত্ত, রসিক দত্ত গ্রামের মহাজন, লোকে কহে মহাযম। তীক্ষ্নদন্ত শৃগালের মতোই কঙ্কাল-ঢাকা চামড়াটুকু লইয়া টানাটানি করে; দত্ত তীক্ষ্ন চিৎকার করিয়া উঠিল, গা জল হয়ে গেল মাইরি; কাঁদুনি ছাড়, টাকা আন।

দামিনী ধীরে ধীরে আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিল, ভিতরে ছেলেটা জ্বরে

গোঙাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার পা উঠিল না, দুনিয়া ভুলিয়া শঙ্কিত বক্ষে দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়াই রহিল।

গোষ্ঠ কাকুতি করিয়া কহিল, দোহাই দত্ত মশাই, খেতে জুটছে না—

দত্ত ভেঙাইয়া কহিল, খেতে জুটছে না তো আমার কি রে জোচ্চোর? খেতে জুটছে না!

ভঙ্গীতে সে কি বীভৎস, কণ্ঠস্বর সে কি নির্মম!

দত্তর খর জিহ্বা সাপের জিহ্বার মতোই তীক্ষ্ণ, ঘন ঘন লকলক করিয়া নড়ে।

ঘটি-বাটি বাঁধা দাও, না থাকে পরিবারের শাঁখা-খাড়ু বেচ, কোথা পাবে সে আমার দেখবার দরকার নেই, আমার পাওনা আমায় পেতে হবে, দাও।

গোষ্ঠ জোড়হাত করিয়া কাঁদিল।

দত্ত কহিল, বেটারা শুধু কাঁদতেই জানে।

কথাটা ঠিক।

চির নত যে দূর্বাদল সে পদদলনে পত্রপুষ্প হারাইয়া বিদ্রোহ করে, শুষ্ক তৃণাঙ্কুর পায়ে ফোটে।

এরা কিন্তু তাহাও পারে না; হয়তো বুঝি বা বুকের মাঝে রাগও জাগে না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সমাজে রাষ্ট্রে পিষ্ট হইয়া বুঝি পাষাণ হইয়া গিয়াছে। না; পাষাণও রৌদ্রে আগুনে উত্তপ্ত হয়।

ইহারা তবে কি? ইহারা প্রকৃত স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, অস্বাভাবিক ইহারা। মানুষের সৃষ্টি-করা সভ্যতার চাপে ধ্বংস-হওয়া মানুষের তুলনা বিধাতার সৃষ্টির মাঝে নেই।

গোষ্ঠ কাঁদিয়াই কহিল, ওই দেখুন, পয়সা অভাবে ছেলেটা ওষুধ পায় নাই।

পাথর জলে গলে না, দত্ত খিঁচাইয়া উঠিল, তা সে পয়সাও আমাকে লাগাবে নাকি, বলছ কি?

ইহার উত্তর কি? গোষ্ঠর অভিধানে অন্তত তা নেই, চোখ দিয়া শুধু জল পড়িল।

মহাজন বলিয়াই চলিল, থাক, এই মাসেই নালিশ করব আমি; যত বেটা বজ্জাতের পাল্লায় পড়ে মাটি হলাম আমি। ইঃ, এদিকে পরিবারের পরনের কাপড়ের বাহার দেখ না! ঢাকাই, না শান্তিপুরে হে গোষ্ঠ?

পরনের কাপড় জোটে নাই, তাই শ্বশুরের দেওয়া অতি পুরাতন পোশাকী কাপড়খানা দামিনী সেদিন পরিয়াছিল।

দত্তর কথায় ওই ছিন্ন-পাড় জীর্ণ কাপড়খানা অঙ্গে কাঁটার মতোই বিঁধিতে লাগিল; লজ্জায় অপমানে বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল, আঁচলটা মুখে পুরিয়া ত্বরিত পদে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল, অবশ হাত হইতে অতর্কিতে টাকা দুইটা মাটিতে পড়িয়া বাজিয়া উঠিল, ঠনঠন।

শব্দ দত্তকে ফিরাইল, সে কোলাহল করিয়া উঠিল, ওই যে, ওই যে টাকা!

হুঁ হুঁ বাবাঃ, মহাজনের কথা মিথ্যে হবার কি জো আছে রে বাবা? সোজা আঙুলে ঘি উঠবে কেন? আন্ গোষ্ঠ, টাকা আন্।

গোষ্ঠ দামিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

কথা না কহিতেই, দামিনী টাকা দুইটা মুঠার ভিতর সজোরে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া জবাব দিল, না, আমি কবরেজকে দোব।

গোষ্ঠর তখন যেন সব সহিত, মানের দায়ে প্রাণ তুচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল। কণ্ঠে তাহার বাক সরিতেছিল না, সে অতি রুক্ষস্বরে শুধু কহিল, দাও।

কাকুতি করিয়া দামিনী কহিল, না গো না, তোমার পায়ে পড়ি।

গোষ্ঠর সেই এক বুলি, দাও। সেই কণ্ঠ, সেই ভঙ্গি, যেন আরও উগ্র।

দামিনী কাঁদিয়া কহিল, ছেলেটার পানে তাকাও।

দত্ত তাগিদ করিল, গোষ্ঠ, আমাকে অনেক জায়গা ঘুরতে হবে।

গোষ্ঠ পাগলের মতো কহিল, মরুক ছেলে।

দামিনী টাকা দুইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

শুধু টাকা নয়, মনে হইল ঘর-দ্বার এই দরদহীন বিশ্বসংসারটা পর্যন্ত এমনই করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিযা যদি কোথাও স্থান থাকে সেথা সরিয়া দাঁড়ায়। ছেলেটা কাতরাইয়া উঠিল, মা গো!

দামিনী মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া শান্ত উদাস কণ্ঠে কহিল, আর দেরি নাই, সব ভাল হয়ে যাবে ধন, সব ভাল হয়ে যাবে। তুমিও জুড়োবে, আমিও।

আমি জুড়োব—এ কথাটা বুঝি মায়ের মুখে বাহির হয় না, বুকে উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠে, সব ভাসাইয়া দেয়; দামিনী হু হু করিয়া কাঁদে।

গোষ্ঠ টাকা দুইটা দত্তর পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিযা দাওয়ায় উঠিযা কাঠের উপর বসিয়া রহিল।

দামিনীর কান্নায় তাহারও চোখে জল আসিতে চাহিল; চোখের জল ছোঁয়াচে, একের কান্না অপরের সংযমের বাঁধ টলাইয়া দেয়—প্রায় ভাঙিয়াই দেয়।

মুখখানা বিকৃত করিয়া গোষ্ঠ উদ্যত অশ্রু গোপন করিতে চাহিল। দত্ত টাকা দুইটা বাজাইতে বাজাইতে কহিল, কি পাজী রে তোরা মাই'রি, অ্যাঁ! টাকা থাকতে বলিস, নাই, উশুল উঠবে কার বাবা? আমার, ন. ়তার?

* * *

কই মোড়ল, ছেলের অসুখ ক'দিন?

কবিরাজ অশ্বিনী সিং আসিয়া বাড়ি ঢুকিল, পিছনে পিছনে সুবল, অতি সঙ্কোচে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্নীর বাল্য-সাথীর উপর বিরূপ সংসারে হাজারে নশো নিরেনব্বই জন। মনের গতি মানুষের বাঁকা; আর প্রীতি ও পিরিতির মাঝে ভেদ করা বড় কঠিন, বিশেষ পুরুষ ও নারীর মাঝে।

গোষ্ঠও সুবলকে সুচক্ষে দেখিত না, বাড়ি আসিলে যেন বিবক্ত হইত, কাবণে-অকাবণে ঝাঁঝিয়া উঠিত।

সুন্দব তকণ সুবলকে দূবে বাখিয়া নিজেব আড়ালে দামিনীব দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া বাখিতে চাহিত।

সুবলও তাহা বুঝিত, তাই তাব এ সঙ্কোচ।

গোষ্ঠ কহিল, তুমি কেন হে মহান্ত, কি কাজ কি?

কবিবাজ উত্তব দিল, ওই তো আমায় ডেকে নিযে এল।

গোষ্ঠ কহিল, এস কববেজ, এস, ছেলেটাব ক'দিন থেকে 'উন্দো ধূন্দো' জ্বব, চেতনা নেই; দেখ ভাই একবাব।

ভিতব হইতে দামিনী পাগলেব মতো কহিল, না না দেখতে হবে না, টাকা নাই, টাকা নাই আমাব।

গোষ্ঠ মিনতি কবিযা কহিল, দোব দোব, টাকা দোব ভাই কববেজ; দু'দিন আগে আব পিছু, দেখ ভাই, দেখ।

কবিবাজ সুবলেব পানে চাহিল।

বিবর্ণ মুখ সুবল সে দৃষ্টিব অর্থ বুঝিল, কিন্তু মনেব কথা তো বলা যায না। হয়তো দামিনী ছুঁড়িয়া ফেলিযা দিবে, গোষ্ঠ কি কথায কি ধবিয়া বসিবে! সহসা ঘবেব ভিতবে দামিনীব মুখখানা চোখে পড়িল, দামিনীব চোখেব জলে বুক ভাসিযা যাইতেছে।

বেদনায মূকেব মুখও ফুটে, ভাষা না হউক, যাতনায স্বব ধ্বনিযা উঠে।

সুবলেব মুখও ফুটিল, সে মূকেব মতোই জড়িতকণ্ঠে কহিল, টাকা দেবে কববেজ মশায, টাকা দেবে।

কবিবাজ বাজাইযা লইল, না দিলে—না দিলে আমি তোমাব কাছে নোব, তুমি সে দেখে নিও।

সুবল কহিল, তাই দোব, আমিই দোব।

দীনতাব মতো মনুষ্যত্বনাশী এতবড ব্যাধি আব দুনিযায নেই, দীনতাব চাপে হীনতা আসিবেই।

আজ এই দীনতাব চাপে সুবলেব অনুগ্রহ গোষ্ঠকে মাথা পাতিযা লইতে হইল, সে কহিল, তাই দেবে, সুবলই তোমাকে দেবে, আমি সুবলকেই দোব; এই চাব-পাঁচ দিনেই দোব।—বলিযা সে সুবলেব মুখপানে চাহিল।

সুবল সান্ত্বনা দিযা কহিল, না না তাগিদ নেই আমাব, যখন হবে দিও।

কবিবাজ হাসিযা কহিল, আব না হয নাই দিলে, মহান্ত মহাজন ভাল।

সুবল কোঁচড় হইতে টাকা খুলিযা কবিবাজকে দিল, কহিল, আব যা লাগবে দোব।

কবিবাজ টাকা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে কহিল, নগদ বিদেয, তা ভাল। তা মহান্ত, তোমাব তেজাবতি সেবেস্তায উশুলেব ঘব বুঝি শূন্য?

সুবল লজ্জিত ও ম্লান হাসি হাসিল।

কবিরাজ কহিল, এবার তুমি মানুষ কোরোক কর মহান্ত; না দিলে মানুষ ধরে নিয়ে যাবে, ঘরে খেতে পরতে দেবে, তেজারতি তোমার আরও ফলাও হবে।

আপন রসিকতায় কবিরাজ আপনি হা-হা করিয়া হাসে; ওদিকে এই তরল কথাটা গাঢ় কঠিন হইয়া আর একজনের কানে বাজে, ঘরের মাঝে দামিনী হাঁপাইয়া উঠে, তাহার মনে হয়, ওই টাকাটা দেনাও নয়, দামও নয়, ও দাদন—তাহারই উপরে দাদন। কোরোকী পরোয়ানার লেখার রেখা সুবলের বুকের মাঝে আঁকা, যেন সে দেখিতে পায়। সে কণ্ঠস্বর চাপিতে ভুলিয়া গেল। উচ্চ আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না না, না গো, কবরেজ দেখাতে হবে না, ধার করতে হবে না; ছেলে ভাল আছে, ছেলে ভাল আছে আমার।

গোষ্ঠ ধমক দিয়া উঠে, থাম থাম, কত্তাতি ফলাতে হবে না, থাম।

মুখ থামিলে রব থামে, কিন্তু রোদন ত থামে না।

দামিনী নীরব হইল, কিন্তু শ্বাসরুদ্ধের মতোই পাগল হইয়া উঠিল।

মরণ টুঁটি চাপিয়া ধরে, রোগীর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে; সে সমস্ত অঙ্গের শিথিলতম বাঁধনটুকু পর্যন্ত কাটিতে চায়, যেন ওইটুকু টুটিলেই সে আরামের শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। তেমনি অস্থিরতায় দামিনী আপনার সারা অঙ্গের মাঝে যদি কোথাও কোন সোনা-রূপার বাঁধন থাকে, তাহার খোঁজ করিয়া যায়।

নাই, মেলে না; চোখে পড়ে রোগা ছেলেটার সরু লিকলিকে হাতে শতচ্ছিদ্র জীর্ণ রূপার বালা দুইগাছা।

দামিনী তাই খুলিয়া ল", ছুঁড়িযা সুবলের দিকে ফেলিয়া দেয। ছেলেটা শ্রান্ত সরু গলায় কাঁদিয়া উঠে, আমার গন্না—-আঁ—আঁ।

গোষ্ঠও একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, তাই রাখ ভাই, তাই রাখ; শুধু হাতে কারবার ভাল নয়, কিছু থাকা ভাল।

ছেলেটার কান্না কিন্তু থামে না, সে কাঁদিয়াই চলে, আমার গন্না—-আঁ—আঁ।

দামিনী পাষাণের মতো বসিয়া রহিল, ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা পর্যন্ত করিল না। করিল না নয়, বোধ হয় পারিল না।

গোষ্ঠ কহে, দুর, শুধুই আঁ—আঁ। সে উঠিয়া চলিয়া যায় মাঠের পানে। দাওয়া হইতে নামিয়াই নতদৃষ্টিতে পড়ে ছেলেটার জীর্ণ বালা দুইগাছা, সুবল ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে।

দয়া! সর্বাঙ্গ তাহার রি রি করিয়া উঠে; বালা দুইগাছা হাতে তুলিয়া সে সঙ্কল্প করে, সুবলের মুখে ছুঁড়িযা মারিয়া আসে। আবার মনে হয়, কত দাম ইহার, বড় জোর বারো গণ্ডা পয়সা; সঙ্গে সঙ্গে আপনিই সে হাসে, বড় দুঃখের হাসি। চারিটা টাকা দিয়া বারো আনার দ্রব্য বিনিময়, যদি নাই লয় সে। বালা দুইগাছা সে ছেলেটার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া মাঠের পথ ধরে। ছেলেটা বালা দুইগাছা বুকে চাপিয়া ধরে, মানিকের মতো নাড়ে-চাড়ে। ওইটুকু যে এ বিশ্বে উহার আভরণের গৌরব।

সবুজ মাঠে গোষ্ঠের বুকখানা জুড়াইয়া যায়; সে ভাবে, আশা বোধ হয় সবুজবরণী।

হালে পোঁতা তরকারি বীজের চারার কাছে বসিয়া আঙুলের ডগা দিয়া সন্তর্পণে মাটি সরায়, একটি প্যাঙাশে নরম অঙ্কুরের প্রত্যাশায়।

তরুণী নারী যেমন ভাবী সন্তানের স্বপ্ন দেখে।

অঙ্কুর উঠে নাই, মরা মন লইয়া বেচারী উঠিয়া দাঁড়ায়, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ে; আপন মনেই বলে, মোটে তো আজ তিন দিন, আর দু'-তিন দিনে বেরুতেই হবে। আর ও কটা যদি নাই হয়, তাই বা কি, ধানেই এবার ছয়লাপ।

আল-পথের উপরে দাঁড়াইয়া ধানী জমির পানে তাকায়, চোখ যেন জুড়াইয়া যায়, সে বলে, বলিহারি, বলিহারি, কি রং মাইরি, কালো, আঁধার, যেন আষিঢে মেঘ নেমেছে জমিতে।

সে মনের আনন্দে গান ধরে, "ও কালো কালিন্দী-কূলে দেখ সখি কালো মেঘ নেমেছে।"

ওদিকের রাস্তা হইতে কে হাঁকে, গোষ্ঠ! গোষ্ঠ!

ও গাঁয়ের সতীশ সরকার, জেলার সদরে থাকে, পাঁচজনের মামলার তদ্বির করে, বেঁটেখাটো চেহারা, পেটটা মোটা, কবিরাজ বলে—পাঁচসেরী পিলে ওটা। সতীশ তবু ওষুধ খায় না। বলে, কচু জান তুমি, ও আমার বুদ্ধির গেঁড়ো, ওরই জোরে করে খাই বাবা।

লোকে বলে, ও একরকম ভুঁড়ি, বদহজমের ভুঁড়ি, বেটার টাকা হজম হয় না, তাই ভুঁড়িটা অমনই।

গোষ্ঠ অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া কহে, সরকার মশায়, তা সব কুশল তো? সবকার কুশলের ধার দিয়া যায় না, সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ে, মামলাকে এত ভয় করলে চলবে কেন গোষ্ঠ?

গোঁফ তাহার ঘন ঘন এপাশে-ওপাশে নাচে; ওইটা তাহার মুদ্রাদোষ। গোষ্ঠ কথাটার মাঝে গুরুত্ব খুঁজিয়া পায় না, সে হাসিয়া কহে, মামলাকে কি আর ডরাই সরকার মশায়, ডরাই যত আমলাকে, খাঁই আর মেটে না।

কথাটা সরকারের গায়ে বাজে, সেও ওই শ্রেণীভুক্ত যে; সে তীব্রকণ্ঠে কহে, শুধু পয়সা কেউ চায় না রে, শুধু পয়সা কেউ চায় না, তারা তো ভিখিরী নয়। এই তো বাবা, নিলে বেটা দত্ত নিলেম করে তোর জোতকে জোত। সে মামলা করলে, ডিক্রী করলে, নিলেম করলে, জানতে পারলি? আমলারা পয়সা খেয়ে নেমখারামি করে না, যার পয়সা খায় তার কাজ বজায়, বুঝলি?

গোষ্ঠর মাথায় যেন কে মুগুরের ঘা মারে, সব যেন গোলমাল হইয়া যায়। তাহার জমি, তাহার অন্নদাত্রী মা ভূমিলক্ষ্মী। তবু সে স্বস্তির আশায় কথাটা অবিশ্বাস করিতে চায়, কহে, আজ্ঞে না, তাই কি হয়, আজই যে দু'টাকা সুদ নিয়ে গেল।

সরকার হাসিয়া ওই সরল বিশ্বাসের জন্য গোষ্ঠকে গালি দেয়, চাষা কি সাধে বলে রে, বুদ্ধিগুণেই চাষা বলে; হুঁ, তোমার দোষ কি, বল? ন চাষা সজ্জনায়তে—এ

যে শাস্ত্রবাণী। বলি নাই আমি একবার, ওরে গোষ্ঠ, দত্ত নালিশ করেছে, একটা জবাব দে। তুই বললি, টাকা নিয়ে আর জবাব কি দোব সরকার মশায়? তবে ধরে পড়ে দেখি, দত্তকে এখন থামাই; তুই ধরলি পাড়লি, দত্তকে, মুখে রাজীও করালি, কিন্তু আদালত তো ছাঁটলি না, মামলাটা তুলে নিলে, কি না নিলে, তা দেখলি না। ভয় হলো আমলার হাঁ দেখে। নে, এখন তার ফল দেখ্।

গোষ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোখে তাহার দৃষ্টি জাগ্রত ছিল, কিন্তু দৃশ্য সমস্ত যেন অর্থশূন্য বোধ হয়।

সরকার কহে, তুই নিলেম রদের মামলা কর। দেখ, বেটা চামাবকে কেমন ফাঁসাই, তদ্বিরের ভার আমার, সে তোকে ভাবতে হবে না। ও বেটা বেণে, আমিও কায়েত।

কথা গোষ্ঠর কানে যায় না, তাহার বুকের মাঝে ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে একটা ঘূর্ণি জাগিয়া উঠে।

একটি বিধিবদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচারে নিঃশেষিতপ্রায় মানবাত্মাব যেটুকু অবশেষ ওই নিরীহের বুকে ছিল, সে বুঝি বিদ্রোহ করিযা উঠে; বাহিরের দেহেও তাহার বিকাশ হয়; দীর্ঘ মোটা মোটা হাড় বাহির করা দেহখানার শিথিল পেশীগুলার মাঝে একটা চাঞ্চল্য বহিযা যায়, কাঠিন্য ফুটিয়া উঠে, শিরাগুলা মোটা হয, বোঝা যায়, রক্তের স্রোতে জোর ধরিযাছে।

মানুষকে সে আর বিশ্বাস করিতে চায় না, তাহার ঘৃণা-ভরা সন্দিগ্ধ চোখে সরকারের মতলব আজ ধরা পড়ে, সে হাসিয়া কয, মামলার খরচ কে দেবে সরকার, বুদ্ধি তো তোমার কায়েতের বটে, কিন্তু যাতে রস, ওই জমি আমার লক্ষ্মী মা, ও গেলে খরচ যোগাবে কে? তুমি দে'ব?

সরকার কহে, ওরে, কায়েতের বুদ্ধিতে সব আছে, জমিতে তুই দখল দিবি না, জমি তো তোর দখলে, বাঁশগাড়ি করতে যায়, তুলে ফেলে দিবি।

কথাটা ক্রোধতপ্ত কানে লাগে ভাল, গোষ্ঠ কহে, দখল আমি ছাড়ব না সরকার। যা হয় হবে, আমার জমি গেলে ওকে আমি গোটা রাখব না। মামলা-ফামলা যা করতে হয ও করুক।

সরকাব শিহরিয়া কয়, সর্বনাশ সর্বনাশ, জেল হয়ে যাবে; মামলার বল না নিয়ে কি ফৌজদারী করা হয়; অখ না হলে শুধু সামথ্যে কি হয?

গোষ্ঠ কহে, তা অথ নেই যখন, তখন সামথ্য ছাড়া উপায় কি?

সরকাব চোখ দুইটি বড কবিযা কহে, বেটা ডাকাত রে! বলে কি? খবরদার, মরবি, মরবি। ওরও লাঠি আছে, ও শালা কি কম ধূত্ত, শালা ধূত্ত শেয়াল, টাকায় জমিদারকে বশ করেছে; দেখেছিস তো জমিদারের চাপরাসীর পেতলে বাঁধা লাঠি?

যুগ-যুগান্তের, পিতৃ-পিতামহের পুষিয়া রাখা জমিদার-ভীতির সংস্কার বুকের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। বুকের ঘূর্ণিটার বল, বেগ ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

এই সেদিনই সে যে কথাটা বলিয়াছিল, সেই কথাটা তাহার মনে পড়ে, বাঘে ধান খায় তো তাড়ায় কে?

সরকার বলিযাই যায, তার চেয়ে শোন্; খরচ বেশি হবে না, পাঁপরের মকদ্দমা করে দোব, হাকিমকে এক দরখাস্ত দোব, হুজুরের অধীন গরিব, মামলা-খরচের সামথ্য নাই—

গোষ্ঠ যেন কূল পায, সে ব্যগ্র হইযা বলিযা উঠে, তা হয় সরকার মশায়, হয অ্যাঁ?

সরকাবের গোঁফ-নাচানো মুদ্রাদোষটা প্রবল হইযা উঠে, সে হাসিযা কহে, হয, না হয় সে আমার ভার, তার ভাবনা তোর না? আসছে সোমবার করে তুই গোটা দশেক টাকা নিযে সদরে যাস। আমার বাসা জানিস তো— বাসা? আচ্ছা, না জানিস, নাই, ওই হোটেলে নেমে তুই আগে খেযে নিবি তাবপবই ওইখানেই থাকবি, আমি খুঁজে নোব বুঝলি?

গোষ্ঠ হতাশ হইযা পড়ে, দশ টাকা যে তাহার পক্ষে দুই শো, দুই হাজাব বলিতেও ক্ষতি নেই; সে ম্লানকণ্ঠে কহে, দশ টাকা যে আমাকে কাটলে বেরুবে না সরকার মশায়, ধারও মিলবে না।

সরকাব এবার খিঁচাইযা উঠে, তবে কি মামলা তোমার অমনই হবে, তোমার চাঁদবদন দেখে নাকি?

ওই যে বললেন, পাঁপবে দরখাস্ত দিলেই হবে?

খরচ হবে না বলে কি একেবারে তিন শূন্যতে চলে বাবা? দরখাস্ত দিতে খরচ নেই? এই ধর্ না, হিসেব তোর মুখে মুখেই হবে—উকিল পাঁচ টাকা, মুহুবী সেও পাঁচ সিকের কম ছাড়বে না, কোর্ট-ফী এক টাকা, ডেমি দু' পযসা; ম্যাদ আট আনা, বিত্তি চার আনা, আর এদিক ওদিক বাজে খরচ সেও তোর দু'টাকার কমে তো হয না, এই তো তোর দশ টাকা দু'পযসা, তা ডেমির দু' পযসা তোকে লাগবে না, ডেমি আমি দোব।

গোষ্ঠর চোখ দিযা জল পড়ে, সে ঘাড় ফিরাইযা জমিগুলার পানে চায, দূর হইতে ঘন সবুজ ধানগুলি সত্য সত্যই কালো মেঘের মতো দেখায।

সরকার কহে, আচ্ছা, এক কাজ কর, তোর ওই নাখারাজ গড়েটা—ওইটা বাঁধা দে, টাকার বন্দোবস্ত আমি করে দোব। যাস সোমবারে, বুঝলি? সবই হবে সেই দিন, বন্ধকী দলিলও হবে, দরখাস্তও দেওযা হবে, কি বল্?

তখনও গোষ্ঠর চোখ ফেরে নাই, মমতায় সারা বুক টনটন করিয়া উঠে। সে কহে, তাই যাব সবকার মশায, কিন্তু দেখবেন যেন ফিরতে না হয়; এ বিপদে আপনাকে রাখতেই হবে।

সরকারের পা দুইটা সে চাপিয়া ধরে।

মন বিশ্বাস করিতে চায় না, ভরসা হয় না।

কিন্তু মাটির পরে চাষীর মমতার মোহ, কহে, তবু যদি।

সরকার ভরসা দিয়া আপন পথ ধরে, গোষ্ঠ ফিরিয়া আপন জমির আঙুলের উপর

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ধানের পাতা নাড়ে-চাড়ে, কচি কচি সতেজ ধানগুলি হাওয়ায় লুটোপুটি খেলে, গোষ্ঠর গায়ে পড়ে, পায়ে পড়ে। যেন দুরন্ত চঞ্চল শিশুর দল।

সহসা গোষ্ঠ নারীর মতো ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

পথে যোগী মোড়লের বৈঠক; সেথায় গোষ্ঠ আসিয়া বসে।

মাইনার-পাস ছোকরা রমাপতি মাস্টার সেখানে পাঠশালা করে। মোড়লকর্তার সাপ্তাহিক খবরের কাগজ পড়ে, আগে নারী-হরণের কলম—দিবা দ্বিপ্রহরে নারীহরণ, পাশবিক অত্যাচার, বাড়িতে পুরুষ কেহ ছিল না, চারিজন বদমাইস ঘরে প্রবেশ করিয়া—

মোড়ল-কর্তা চেঁচাইয়া উঠে, ওরে মদনা, মদনা, ওরে শালা ডোম!

মদনা বাড়ির রাখাল, সে উত্তর দেয়, কিন্তু মোড়ল-কর্তার কানে যায় না।

মদনা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়।

মোড়ল-কর্তা খিঁচাইয়া উঠে, বলি, লবাব, ছিলেন কোথা, রা দাও না যে?

মদনা বলে, বলি, রা মানুষকে কবার কাড়ে, রা তো দিলাম।

আবার মুখের উপর মুখ! কর্তা ঠেঙাগাছটা হাতড়ায়, হাতে ঠেকিতেই সে গাছটা ফাবড়াইয়া দেয়। মদনার লাগে না, তবু সে বলে, মেলে তুমি আমাকে?

কর্তা কহে, বেশ করেছি। বলিয়া হুঁকা টানে, ক্ষণেক পরে আবার কহে, বুড়ো মানুষের রাগ তো জানিস; তুই সরে গেলি না কেন? তা বিকেলে এক সের চাল নিস্, মদ খেলেই গায়েব বেথা সেরে যাবে। যা দেখি, রতে ছুতোরকে ডেকে আন, বল্, খিল আঁটতে হবে দুয়ারের। আর হরিশ, বলে দাও চব্বিশ ঘণ্টা দুয়ারে খিল। শালারা, দিবা দ্বিপ্রহরে, আয় শালারা—

আবার লড়াইয়ের সময় মাস্টার লড়াইয়ের খবর পড়ে, ম্যাপ আঁকিয়া লাইন বুঝায়, বলে, এই দেখ কর্তা, এই হলো ফ্রান্স, এই তোমার জারমানি, আর এই রুশ।

বুড়ো বলে, এ তো শুধু দাগ হে মাস্টার, নক্সা এঁকে লড়াই বোঝা যায়? এখন কে হারল তাই বল, এ সায়েবরা, না উ সায়েবরা?

মাস্টারের বয়সী বাগাল রায় বলে, বুঝতে কেনে নারবে খুঁড়ো, এই দেখ, এই হলো ফেরান্স।

বুড়া বিরক্ত হইয়া কহে, রাখ্ বাপু তোর ফেরাঙ-টেরাঙ, ওসব তোরা বোঝ গিয়ে। এখন কাপড় সস্তা কখন হবে তাই বল হে মাস্টার?

মাস্টার বলে, তবে ডুবো-জাহাজের ঠেলা কর্তা, মাল নিয়ে ভাসা-জাহাজের কি পার আছে? মাল নিয়ে জলে ভেসেছেন কি দুই-তিন কোশ দূর থেকে তাল মেরে, চোল—চোল—মার টুঁ, আর এক টুঁতেই বাস্ চিচিং ফাঁক, জলের তলায় ভরভর—ফস্।

বাগাল বলে, তবে ডুবো-জাহাজের টিরিক-ফিরিক মল এইবার, আকাশে ফরফর উড়বে আর কলকাতায় এসে নামবে তোমার; কাটুক শালা ডুবো-জাহাজ জলের তলে বুটবুটি।

বিস্ময়ে বুড়ার চোখ দুইটা ভাঁটার মতো পাকাইয়া উঠে, সে কহে, উড়বে কি করে বাপু; গরুড়পাখির বাচ্চা ধরেছে নাকি অ্যাঁ?

মাস্টার হাসিযা বলে, না কর্তা, কল, কলে উড়বে—অ্যারোপ্ল্যান।

কাগজে অ্যাবোপ্ল্যানের ছবি আঁকে, ছবিটা দাগে দাগে হয় একটা বৃত্ত।

বুড়া বলে, দূর, এ কি হলো, রসগোল্লা আবার ওড়ে?

মাস্টার বললে, কেন কর্তা, রাহুর ছবি, চাঁদেব চেহারা দেখনি? ওই সব থেকেই ওরা এই সব করলে; সব আমাদের নিযে, আমাদেব পুষ্পক রথ—

বুড়া চটিযা কহে, সবই তো শুনি তোদের, ও ছিল-ফিল বুঝি না, করতে পারিস তো বুঝি, পারিস বানাতে ওই কি বলছিল এলাং-পেলাং নাকি?

বর্তমানের নগ্ন রিক্ততায়, দারিদ্র্যে, মবণ-দ্বারেব বৃদ্ধেব পর্যন্ত অতীতের পানে চাহিবার অবকাশ নেই।

তরুণ চাহে ভবিষ্যতের পানে, সে স্বপ্ন হয়তো।

বাগাল কহে, হবে বইকি খুড়ো, আমাদেবও হবে।

সে সব পুবানো কথা।

আজ মাস্টার পড়িতেছিল, অসহযোগ আন্দোলন, বক্তৃতার সুরে সে পডিতেছিল, মহাত্মার বাণী, স্বরাজ আসিবে, স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার, শুধু বাণী পালন কর। বুঝবে কর্তা, স্বরাজ হলেই আর চাই কি!

স্বরাজ মানেটা আমায় বুঝিযে দিতে পাব, তবে তো বুঝি ব্যাপাবটা কি?

মানে বুঝলে না কর্তা? আমরাই আমাদেব মালিক—রাজা, ওই ওন্তেই আমাদেব দুঃখ ঘুচবে কর্তা।

তাই কি হয় মাস্টার? রাজা থাকবে না—

বহুযুগ নিরক্ষরের কানে কথা বিস্ময়েব মতো ঠেকে।

তরুণ রক্ত, যুগের হাওযায উষ্ণ চঞ্চল; বাগাল কহে, কেন হবে না খুড়ো, এই তো ফেরাঙ্গ, অ্যামেরিকা—

কর্তা চটিযা যায, তুই থাম্ বাপু, তুই আর পাকামি করিস না, মাস্টার বলছে তাই বলুক, না খালি ফেরান্ ফেরান্! হলি কি বে বাপু, বাপ-খুড়োর খাতিরও করবি না?

ও পাড়ার গণেশ দেবাংশী কহে, যা বলেছ ভাই, আমাদের আমল পালটিয়ে গেল; সে সব আর কিছু রইল না।

মাস্টার বলে, তফাত তো হবেই কর্তা, তোমরা হলে পুরনো, আমরা নতুন।

গোষ্ঠর দুঃখার্ত মন দুঃখদূরের কথাটা ভোলে না, সে কহে, জমিদার-মহাজন কবে উঠবে বলতে পার?

অন্তর-ফাটা বাণী, আন্তরিকতার গাম্ভীর্যে এত গম্ভীব যে মজলিসের চটুল ভাবটুকু উবিয়া গেল। মরুর বুক-চেরা ঝঞ্ঝা বায়ুস্তরের রস পর্যন্ত যেমন শুষিয়া লয়।

সবার বুক চিরিয়াই দীর্ঘশ্বাস বহে।

যোগী বলে, ওই যা বলেছ গোষ্ঠ, স্বরাজ-ফরাজ বুঝি না আমরা, যমের হাত হতে বাঁচি কিসে তাই মহাত্মা বলুক। হ্যাঁ, চাচা আপন জান বাঁচা।

অন্তকালের অত্যাচারে, অনাহারে অতীতের সব—দেশ, ধর্ম, সমাজ, সমস্ত ইহাদের কাছে বুঝি তুচ্ছ হইয়া উঠিতেছে। শুধু জীব-জগতের একমাত্র জন্মগত প্রেরণা, বাঁচিবার চেষ্টায় কঙ্কালগুলা পাগল।

কিন্তু ক্লান্ত মস্তিষ্কে উপায় আসে না; শ্রান্ত দেহ এলাইয়া পড়ে।

কে যে ইহাদের জীবন অদৃশ্যভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া শোষণ করিয়া লইতেছে, তাহাও ইহারা জানে না; বিধাতা, না মানুষ?

আর সে জীবন ফিরিয়া চাহিতে চিৎকার করিতেও বুঝি ক্লান্তি আসে। তবে তাহা চায় তাহারা; মাটির তলের অঙ্কুর যে সুরে যে ভাষায় আলো, বাতাস চায়, সেই সুরে সেই ভাষায় ইহাদের সে চাওয়ার বাণী বুকের মাঝে অহরহ বাজে।

কয়দিন পর।

গোষ্ঠ মাঠ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভেজানো দুয়ারটা খুলিতেই মনে হইল ওদিকের দুয়ার দিয়া কে বাহির হইয়া গেল, আবছা দেখা, ঠিক চেনা গেল না, কিন্তু মনে হইল, সুবল।

গোষ্ঠ ত্বরিত পদে অনুসরণ করিয়া খিড়কির দুয়ারে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না; ঠিক পাশেই সুবলের দুয়ার বন্ধ, শিকলটি পর্যন্ত নড়ে না। গোষ্ঠ বাড়ি ফিরিয়া হাঁকিল, ওগো!

কেহ সাড়া দিল না।

ভিতব-ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিল, রুগ্ন ছেলেটা অকাতরে ঘুমাইতেছে, দামিনী নেই। দাওয়ার উপব কোদালিটা রাখিয়া হুঁকা হাতে চলিল মোড়ল-কর্তার দলিজার পানে; কিন্তু মনের কোণে একটা অস্বস্তি জাগিয়া রহিল, কে গেল?

দামিনী জল আনিতে গিযাছিল।

ঘড়া কাঁখে বাড়ি ফিরিযা দুয়ারের পাশে কোদালি দেখিয়া বুঝিল, গোষ্ঠ মাঠ হইতে ফিরিয়াছে। কিন্তু গেল কোথায়? হয়তো নেশার আড্ডায় গিযাছে।

মনটা কেমন হইয়া উঠিল।

এমন করিয়াই কি মানুষ নেশায় মজে? ঘরে রোগা ছেলে, তার খোঁজ লওয়া নাই, মুখে কিছু দেওয়া নাই, এ ক'দিন আবার সবই বেশি বেশি! আর মাঠেই বা এত কাজ কি? নিড়েন তো হইয়া গেল।

বিরক্তিভরে দামিনী ঘড়াটা রাখিয়া আপন মনেই বকিতে বকিতে কোদালিখানা ঘরে ঢুকাইতে সেখানা তুলিয়া সোজা হইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের কুলুঙ্গির উপরে।

রঙিন কাগজে মোড়া কি ওইটা?

দামিনী কোদালি ছাড়িয়া মোড়ক খুলিয়া দেখে—একজোড়া শাঁখা।

লাল রঙের উপর সূক্ষ্ম তুলির রেখার হলুদ রঙের নক্সা, দামিনীর চোখ ফিরিল না। রূপার পৈঁছার চেয়ে শাঁখার রূপখানি যেন শতগুণে অপরূপ। এ তো শাঁখের শাঁখা নয়, এ তাহার সোনার কাঁকন।

শাঁখা জোড়াটির রক্ত-রাগটুকু মুহূর্তে অনুবাগ হইয়া সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আশ্চর্য মানুষেব মন, আবাব দুই ফোঁটা জলও চোখ হইতে ঝরিয়া পডিল; অধবে অতি মৃদু ম্লান হাসি।

ওই নিরুপায় মানুষটির অক্ষমতার বেদনা শতগুণ হইয়া মনে বাজিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি সাতু ঠাকুরঝির বাড়ি শাঁখা পরিতে ছুটিল।

ঠাকুরঝি, শাঁখা জোড়াটি পরিয়ে দাও ভাই।—বলিয়া কাপড়ের পাড-জডানো হাত দুইখানি নিঃসঙ্কোচে বাহির করিয়া দিল।

সাতু কহিল, পৈঁছা কি হলো লো, হাতে পাড জডানো?

দীর্ঘ অনশনের পব অর্ধাশনের তৃপ্তিতেই মানুষ ক্ষুধার দুঃখ ভোলে; শাঁখা দিয়াছে—এই সুখে, পৈঁছা গিয়াছে—এ দুঃখ দামিনীব মনে ঠাঁই পাইল না; সে অম্লান বদনে মিথ্যা বলিয়া গেল, খিল ছেড়েছে, তাই খুলেছি।

সাতু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, যাই বলিস ভাই বউ, গোষ্ঠদাদা বড় মেগো।

কেন লা?

এই দেখ্ না, পৈঁছা খুলতে না খুলতে বাঙা শাঁখা, বোন হলে পাঁচ দিন লাগত। এই বলিযা সাতু ছড়া কাটিযা উঠিল—

"রাঙা হাতে রাঙা শাঁখা দেখতে ভালবাসি হে।"

দামিনী আনন্দ-কৌতুক কোপ করিয়া উঠিল, মর্, মব্ ভাই-সগী।

সাতু আবার ছড়া কাটিয়া লইল—

"ভাইযের সোহাগ বউ নিয়েছে, বোন হয়েছে সুখেব কাঁটা।
বউয়ের বেলা শাঁখা শাড়ি, বোনেব পিঠে ঝাঁটা।"

মর্, এতও জানিস।

না জানলে বউ জব্দ হয় কি করে? কই, হাতটা দে দেখি, বেলা থাকতে পরিয়ে দেই; ল্যাম্পের আলোতে রাঙা হাতেব শোভা দেখে দাদার আশ মিটবে কেন?

দামিনী হাত বাড়াইযা দিযা কহিল, ভারী দুষ্টু হযেছিস, দাঁড়া, এবার নন্দাই আসুক, বলে দোব।

সাতু শাঁখা পবাইতে পরাইতে কহিল, কি বলবি?

বলব,- -উঃ, আস্তে আস্তে লো—বলে দোব, সাবধান হযো ভাই, তোমার গিন্নীর ভাবী নজব ভাইয়েব ওপর। দেখবি, আর পাঠাবে না। উঃ উঃ, না না, আর বলব না, উঃ।

কথাব মাঝেই সাতু বলিতেছিল, বলবি, বলবি আব, বল, নইলে আবও জোরে—এ—এই হযেছে, চোখ মোছ।

শাঁখার চাপে দামিনীর চোখে জল আসিয়াছিল।

সাতু কহিল, মাইরি বউ, তোকে যা লাগছে ভাই, কি বলব! মুখখানা সিঁদুরমাখা, চোখের পাতা ভারী! যা যা, ছুটে যা, এই রূপ নিয়ে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়া; আর শাঁখা-পরা রাঙা হাত ছুতোনাতা করে মুখের উপর নেড়ে দিগে। উঃ।

দামিনীর সাতুর পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

সাতু কহিল, বটে, এই বুঝি শাঁখা পরানোর বানি?

গোষ্ঠ দাওয়ায় বসিয়া ধার-করা তামাকটুকু টানিতেছিল আর ভাবিতেছিল, লোকটা কে? সুবল? কিন্তু সুবলের দুয়ার তো বন্ধ, শিকল পর্যন্ত নড়ে না। সে হইলে দুয়ার বন্ধ করার শব্দ তো হইত, অন্তত শিকলটাও নড়িত। তবে কে?

দামিনী সাতুর বাড়ি হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়াই গোষ্ঠকে দেখিয়া সানন্দ কৌতুকে থমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল, ধ্যুৎ, সাড়া দেয় না, এমন লোক!

গোষ্ঠ উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখে, দামিনীর পিছনে কে।

দামিনী কিন্তু ওদিকে খেয়াল করে না। মনে তাহার তখন রসের মাতামাতি।

রূপের উপচারে দেবতাকে অঞ্জলি দিতে সাধ হয়, শাঁখা-পরা হাত দুইখানি মেলিয়া দিয়া কহিল, দেখ দেখি, কেমন হয়েছে!

বীণার আ-বাঁধা তার ঘা খাইলে বেসুর' ঝঙ্কারই তুলিয়া থাকে, গোষ্ঠর সন্ধান-ব্যগ্র সন্দিগ্ধ মন শাঁখা দেখিয়া শোভায় মুগ্ধ হইল না, বাঁকা চোখে তীব্র দৃষ্টিতেই চাহিল। পাইল কোথা? সম্বল তো সবই জানা। চট করিয়া মনে পডিল, আবছা-দেখা লোকটাকে সুবল বলিয়াই মনে হইয়াছিল; তবে শাঁখার গাযে এখনও অস্পষ্ট হাতের ছাপ—ও সুবলের ছাপ বলিয়াই গোষ্ঠব প্রত্যয় জন্মিয়া গেল।

সে দামিনীর হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

দামিনীর লাজ-রক্তিম আনন্দোজ্জ্বল মখখানি মুহূর্তে শবের মতো বিবর্ণ হইযা গেল।

ভিতরে রুগ্ন ছেলেটা একটা গভীব যন্ত্রণাকাতর শব্দ করিয়া উঠিল, উঃ, মা গো!

দামিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দিকে চলিল।

উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে চলিতে গিযা দুয়ারের চৌকাঠে হুঁচোট খাইল, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিবাব তাহার অবসর ছিল না; সে আর্ত কণ্ঠে কহিল, কি হলো ধন, আজ যে ভাল ছিলে বাবা।

ছেলেটা ওই যে 'মা গো' বলিযা ডাকিল, ওই শেষ ডাক, তারপর আর ডাকিল না।

এমন একটা প্রবল জ্বর আসিল যে, কঙ্কালসার দেহখানা থরথব করিয়া কাঁপিতে লাগিল, নাভি হইতে বুক পর্যন্ত দুঁপিয়া দুঁপিযা উঠে; শীর্ণ হাতখানায় বুঝি অবশিষ্ট সব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেহেব সকল আবরণ ঘুচাইতে চাহিল; যেন ওই তুলার আবরণ পাষাণেব ভারে বুকে চাপিয়া বসিযাছে।

বসিয়াছিল সে মরণ।

তিলে তিলে বিন্দুর পর বিন্দু ভার বাড়াইয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় দেহখানার সকল স্পন্দন নীরব করিয়া দিল।

দামিনী বুক চাপড়াইয়া মেঝের পরে আছাড় খাইয়া পড়িল, আর্ত মাতৃকণ্ঠে মরণের বিজয়বার্তা ঘোষিত হইয়া গেল; নিশীথে নিস্তব্ধ পল্লীটার আকাশ-বাতাস শিহরিয়া উঠিল।

গোষ্ঠ উন্মাদের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল, রাক্ষুসী, সর্বনাশী, তুই আমার ছেলে খেলি; তোর পাপেই আমার ছেলে গেল। সর্বনাশী, ছেলের চেয়ে তোর সুবল বড় হলো, একজোড়া শাঁখা বেশি হলো।

ওই একটা কথায় নারীর সন্তানের শোক পর্যন্ত মূক হইয়া গেল, কে যেন বুকের উপরে পাহাড় চাপাইয়া দিল।

অসাড় নিস্পন্দ পাষাণপিষ্টের মতো যেখানে পড়িয়া ছিল, সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল, মৃত সন্তানটাকে বুকে টানিয়া লইতে পর্যন্ত পারিল না।

রাঙা শাঁখা জোড়াটা অন্ধকারের মাঝেও আগুনের মতো জ্বলিতেছিল, না, দামিনীর মনের মাঝে জ্বলিতেছিল, কে জানে! সহসা শাঁখা জোড়াটা আপন কপালে সজোরে ঠুকিয়া সে ভাঙিয়া দিল।

তারপর আবার অসাড় নিস্পন্দ।

শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস-মাখানো একটি মৃদু কথা বুঝি জোর করিয়াই বাহিরে আসিতেছিল, মা, উঃ মা!

বাহিরে ঝরিতেছিল জল। বর্ষণমুখর শ্রাবণ রজনীর ওই মৃদু কণ্ঠ ঘরের দাওয়ায় গোষ্ঠর কান পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল না, তা পাড়া-প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ হয় কি করিয়া!

আসিল শুধু সাতু। দামিনীর প্রথম বুকভাঙা আর্তস্বর তাহার কানে গিয়াছিল, সে যখন আসিল তখন দামিনীর কান্না থামিয়া গিয়াছে, সে পাথরের মতো পড়িয়া আছে।

আরও একজন আসিল, সে সুবল।

সে সাতুরও আগে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রবেশমুখেই উন্মত্ত গোষ্ঠর কথা কয়টা শুনিয়া আর ঘরে ঢুকিতে সাহস করে নাই, ঘরের পিছনে ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়াছিল।

সাতু কহিল, বউ, একটু কাঁদ্ কেন ভাই।

দামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না ঠাকুরঝি, আমিই খোকাকে মেরে ফেলেছি।—বলিয়াই হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, নীরব রোদন, অশ্রুরই ধারা শুধু।

সাতু সান্ত্বনা দিল না, দিবার প্রয়াসও করিল না।

কতক্ষণ পরে আবার দামিনী কহিল, ঠাকুরঝি, জল হচ্ছে বুঝি?

সাতু কহিল, আড়া-বিষ্টি জল, মাঠ-ঘাট ভেসে গেল। পুকুর গড়ে সব ভরে উঠেছে।

দামিনী ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, আমাদের গড়েও তবে ভরেছে?

শঙ্কিত কণ্ঠে সাতু তিরস্কার করিল, পোড়ারমুখী, দাদার হাতে শেষে কি দড়ি পরাবি নাকি? ছি!

তারপর সব চুপ, কথা যেন সব হারাইয়া গেল।

শুধু কয়টি প্রাণীর দুঃখদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস, সে যেন শ্মশানের বুকে কঙ্কালের মালার মাঝ দিয়া বায়ুপ্রবাহ।

জীর্ণ কাঁথার উপর ছেলেটার শব।

শ্মশানখানা যেন ঘরের বুকেই প্রকট হইয়া উঠিল।

জীবন তাহা সহিতে পারে না, দূরে সরাইয়া দিতেই হইবে।

আগে কহিল সাতু, দাদা, ছেলেটার তো একটা গতি করতে হবে।

গোষ্ঠ কহে, হ্যাঁ, কিন্তু যে জল—

দামিনী কথা কহে না, মা—হয়তো সন্তানের শব সবার শেষ পর্যন্ত বুকে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, কিন্তু অবশেষে তাহাকেও তাহা ত্যাগ করিতে হইবেই।

জীবন মরণের ভয়েই অস্থির, তাহার সান্নিধ্য সহিবে কেমন করিয়া?

সাতু কহে, পাড়ায় ডাক।

বর্ষণের পানে আঙুল দেখাইয়া গোষ্ঠ বলে, বাইরেও কি হচ্ছে দেখছিস?

তা বলে তো বাসী করে ফেলে রাখে না। দাঁড়াও, আমি ডাকি।

সাতু উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল, মহান্ত!

দামিনী দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, না।

গোষ্ঠ কহিল, দাঁড়াও, আমি পাড়ায় ডাকি।

সাতু কহিল, ডাকলেই আসবে?

দামিনী কহিল, আর কেউ আসবে না।

সাতু কহিল, এলে ওই আসবে; এ জলে আর কেউ আসবে না।

ততক্ষণে লোকটি আসিয়া পড়িয়াছে, ভিজিতে ভিজিতে সুবল আসিয়া কহিল, আমাকে ডাকছিলে?

ছেলেটা নষ্ট হয়েছে, তার গতিটা করে দাও ভাই।

আর কে যাবে?

দাদাই যাবে, আর কে যাবে বল? [illegible], নাও, তুলে নাও, আর দেরি করো না।

সুবল বিব্রত হইয়া কহিল, তুমি এনে দাও মায়ের কোল থেকে।

সাতু কহিল, এস তুমি। বউ মরার মতো পড়ে আছে এক পাশে।

সুবল ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সত্য সত্যই দামিনী মড়ার মতো পড়িয়া।

তাহার চোখে জল আসিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বিছানাসুদ্ধ ছেলেটিকে তুলিতেই চোখে পড়িল কয়টা শাঁখাভাঙা টুকরা, রাঙা টকটকে, আগুনের মতো ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে যেন।

ধকধকে টুকবা কয়টা অঙ্গাবেব মতো দাহে বিছানা ভেদ করিয়া তাহাব অঙ্গ যেন পোড়াইয়া দিল।

ইচ্ছা কবিল, ওই মবা ছেলেটাকে দামিনীব বুকে আছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, বলে, উপেক্ষাব বিনিময়ে কি উপকার পাওয়া যায়?

সাতু পিছন হইতে বলে, নিযে যাও মহান্ত, নিয়ে যাও, মা কি ওই দেখতে পাবে! বউ কেমন কবছে।

সুবলেব আব চিন্তাব অবসব থাকে না, অন্ধকাব বর্ষণমুখর শাওন-রাতিব সেই তাণ্ডবেব মাঝে শব বুকে সে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সাতু কহিল, দাদা।

গোষ্ঠ সুবলেব পিছন ধবিয়া কহিল, চল মহান্ত।

সাতু দামিনীকে ঠেলা দিয়া কহিল, বউ, বউ, বউ!

উত্তব নেই।

মুখে-চোখে জলেব ছাঁট দিতে দিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সাতু কহিল, জাগিস নে হতভাগী, আব জাগিস নে।

ভাগ্য নিষ্ঠুব, দামিনীব জুড়ানো হয না; সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জাগে।

গোষ্ঠ ও সুবল বাস্তাব জল ভাঙিযা অতি কষ্টে শ্মশানেব দিকে চলিয়াছিল।

মাথাব উপব অবিবাম বর্ষণ আব দুবন্ত বাতাস; হাডেব ভিতব অবধি কনকন কবিতেছিল।

খান বিশেক মাঠ পাব হইয়াই আব পথ নেই, মাঠ নেই, জল—শুধু জল, আব জলপ্রবাহেব একটা কল কল্লোল।

সুবল কহিল, বান।

পায়ে কাঠকুটার মতো কি সব ঠেকিতেছিল, বিদ্যুৎচমকে সেগুলা চেনা যায়—পোডা কাঠ, অঙ্গার বাশি, ওই যে একটা কঙ্কালও।

গোষ্ঠ কহিল, শ্মশানে এসেছি না কি মহান্ত?

না, বানেব ঠেলে শ্মশানটা এগিযে এসেছে। কথাটা শেষ হয় না, ওইটুকু বলিযা বক্তাও শিহবে, শ্রোতাও শিহবে।

সুবল আবার বলে, তা—হলে—

স্বব বুঝিয়া গোষ্ঠ উত্তব দিল, হ্যাঁ, দাও তা হলে এইখানেই—

সুবল নামিযা গিযা বন্যাব প্রবাহের মুখে শবটা ছাড়িয়া দেয়।

গোষ্ঠ গম্ভীব কণ্ঠে কহে, যা, চলে যা, তুই তো জুড়লি। আমার বুকে জ্বলে চিতে জ্বলুক।

ভাবুক বাউল উদাস সুবে গান ধবিল, "শ্মশান ভালবাসি বলে শ্মশান কবেছি হৃদি।"

গোষ্ঠ ধীবে প্রশান্ত কণ্ঠে কহে, শ্মশান তো বুকে বুকে, ঘরে ঘরে, কিন্তু মা

আসে কই, নাচে কই মহান্ত? ফাঁকি, ও সব ফাঁকি, ও সব মানুষের মন-গড়া কথা।

দুঃখের দিনে চরম নগ্ন বাস্তবতার মাঝে, মানুষের আশা-প্রত্যাশা-আকাঙ্ক্ষা, সর্বরিক্ত মন, পরম প্রত্যক্ষ সত্যের সন্ধান চায়।

যুগে যুগে পিষ্ট দারিদ্র্য দেবতার সন্ধান পায় না, সে কয়, সব ফাঁকি, মানুষের রচা কথা ওসব।

গোষ্ঠ আবার বলে, এ এইবার সবাই বুঝেছে, সবাই বলবে, দেখো।

ওই উপলব্ধি হয়তো সত্য; ওই বাণী বলিবার জন্যই যেন বিশ্বমানবের অন্তর প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে।

মানুষ জন্মায় ক্ষুধা লইয়া, সে ক্ষুধা তাহার মরণ অবধি মেটে না; মরণেও তাহার লয় নাই; মানুষ মরে, অতৃপ্ত ক্ষুধা তাহার ধরণীর বুকে হা-হা করিয়া বেড়ায়, তাহার পর পুরুষের বুকে আশ্রয় লয়। এমনই করিয়া মানুষের ক্ষুধার আজ অন্ত নেই। দিনে দিনে সে অসহ লোলুপ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।

আদি যুগে উদরের ক্ষুধায় মানুষে মানুষের মাংস খাইয়াছে, আজ ভোগের অতৃপ্ত ক্ষুধায় একটি জাতি অপর জাতির বুকে রক্ত অদৃশ্য শোষণে হরণ করে আজ একটা মানুষের ক্ষুধা বোধ করি সমগ্র দুনিয়া গ্রাস করিয়াও মেটে না। ক্ষুধার তাড়নায় একের অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ নেই; মানুষের ক্ষুধার তাড়ায় যীশুর সাধনা আজ ধর্মযাজকের কোমরে বাঁধা লোহার ক্রুসে নিস্পন্দ, ব্যর্থ; বুদ্ধের বাণী আজ পাষাণের গায়ে আখরের রেখায় মূক।

দিন দুই পর, তখনও গোষ্ঠর চোখের কোল হইতে অশ্রুব রেখা মুছে নাই, তাহার দুয়ারের সম্মুখ দিয়া ঢোল পিটিয়া দত্ত গোষ্ঠর জমি দখল করিতে চলিল।

অপরিসীম শোকের রুক্ষতায় বুকটা হু-হু করিতেছিল।

তাহার উপর বঞ্চনার, প্রতারণার ক্ষোভে সেথা জাগিয়া উঠে বিপুল ক্রোধ, সে যেন একটা ঘূর্ণি।

আগুনের শিখা যেন পাক খাইয়া মাথার দিকে ছুটে, জ্ঞান-বিবেচনার অবসর থাকে না। গা-ঝাড়া দিয়া গোষ্ঠ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে, ত্রস্ত পদক্ষেপে এদিক-ওদিক কি সন্ধান করিয়া ফেরে। চায় সে লাঠি; মেলে না।

সে ছুটিয়া গিয়া উঠে ঠিক পাশের গাঁয়ের ভল্লাপাড়ায় রাম ভল্লার বাড়ি।

রাম লাঠি-খেলায় ওস্তাদ; সে জেল-খাটা দাগী, ভাল লোকে বলে, সে ডাকাত।

রাম বলে, বলুক, ভদ্দরলোককে না মানলেই সে ডাকাত। তা ডাকাত আমি।

ঝড়ের মতো গোষ্ঠ আসিয়া কহে, ওস্তাদ, একগাছা লাঠি—

কথা শেষ করিতে পারে না, বুকের মোটা মোটা পাঁজরগুলা লাফাইতে থাকে।

পাঁচ হাত লম্বা মানুষটি, দেহে ভোগালো মাংস নেই, সব যেন হাড় কিন্তু সেগুলা বাঁশের মতো মোটা, বোধ করি লোহার মতো শক্ত।

রাম বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

সে জিজ্ঞাসাও করে না, কেন, কি বৃত্তান্ত। নির্বিকারভাবে আঙুল দেখাইয়া বলে, ওই মাচায় দেখ।

গোষ্ঠ মাচায় উঠিয়া লাঠি লইতে লইতে কহে, শালা দত্ত ফাঁকি দিয়ে ডিক্রী করে আমার জমি দখল করছে ওস্তাদ।

রাম সেইরূপ নির্বিকারভাবে বলে, দুনিয়াসুদ্ধু এই হাল গোষ্ঠ, সব যে পারে কেড়ে নেয়; সব ওই। একা আর ওর দোষ কি, আর দোষই বা কার; তুই আমি সবাই তো ওই চায, তবে নিই না পয়সা নেই বলে, পারি না বলে।

সত্যই বুঝি ইহার জন্য মানুষকে দাযী করা যায় না।

এ বুভুক্ষা যে তাহার সহজাত, এ ক্ষুধা তাহার জীবনের ধর্ম। তবে দাযী কে?

রাম বলে, আমি দোষ দিই ভগবানের, চন্দ্রসূয্যির মতো বড় বড় চোখ নিয়ে সে দেখছে কি? তার রাজ্যিতে এমন হয কেন?

সত্য কথা, ইহার জন্য দাযী জীব-জগতের জীব-ধর্মের স্রষ্টা যদি কেহ থাকে, সে। শিল্পের খুঁতের জন্য শিল্পী দাযী, শিল্প নয়। সে শুধু অঙ্গহীন।

রামের মেযে হিমি গোষ্ঠর সমবযসী, সে পাশের বাড়ি হইতে আসিযা পিছন হইতে কহে, লাঠি হাতে যে; লাঠি কি করবে মোড়লদা?

তিক্তস্বরে রাম কহে, তোর মাথায মারবে, লাঠি নিযে বেটাছেলে কি করবে!

কৌতুকে খিলখিল শব্দে হাসির কলরোল হিমির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্তেই সে হাসি নীরব হইয়া গেল, যেন ঝরনা ঝরিতে ঝরিতে শুকাইয়া গেল।

গোষ্ঠ হিমির পানে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সে রুক্ষ মুখ, চোখের কোলের ওই কালো রেখা দেখিযা হিমির হাসির ঝরনা শুকাইযা গেল; সে শিহরিযা কহিল, ও কি মোড়ল-ভাই, এ কি চেহারা?

গোষ্ঠ লাঠিগাছটা মাটিতে ঠুকিয়া দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল, ছেলেটা পরশু রেতে গেল।

হিমি আর্ত স্বরে কহিল, অ্যা! খোকা!

রাম ধমক দিযা কহিল, হিমি, প্যানপ্যান এখন নয, পরে করবি; মরদ লাঠি হাতে করলে কাঁদতে নাই। যা গোষ্ঠ, বেরিযে পড, দেখ, সঙ্গে যাব?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোষ্ঠ কহিল, ওস্তাদ, বড ভাল হয়।

আর একগাছা লাঠি টানিয়া লইয়া রাম দাঁড়াইয়া কহিল, চল্।

রসিক দত্ত বাঁশের লগির মাথায লাল পতাকা বাঁধিয়া গোষ্ঠর জমিতে পুঁতিয়া দখল লইতেছিল, বাঁশগাড়ি করিতেছিল। সঙ্গে জমিদারের নগদী, আদালতের পেযাদা, নিজের রাখাল আর ঢুলী।

দত্ত মনে করে, এই বাহিনীই তাহার বিশ্বজয় করিবে; সে বলেও, জোর কি আমার রে, জোর আদালতের।

খাতকে কিছু বলে না, কিন্তু ছেলের দল ছাড়ে না, উত্তর দেয়, আর আদালত টাকার, তবে আর দত্তকে ঠেকায় কে?

শুধু টাকায় হয় না ধন, মামলায় মাথা চাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বকের মতো লম্বা গলার উপরে ছোট্ট টেকো মাথাটি টিকটিকির মতো নড়ে।

তা তোমার খুব আছে, বেড়ালের মতো চোরা বুদ্ধি তোমার খুব; কাঁকুড়চুরি করা করে চাকলার জমিটা নিলে বাবা। মরে যে কি হবে তুমি—

আর একজন বলে, বেণে মরে জোনাক পোকা, করে টিপির টিপ।

কেউ বলে, যখ, যখ হয়ে মাটির তলায় বসে টাকা গুণবে।

কেউ বলে, বাদুড়, বাদুড়, উল্টোমুখ করে গাছে ঝুলবে?

কেউ বলে, সে তো ফিরে জন্মালে? যমপুরীর কথা বল, সেই গবম তেলে, ছ্যাঁক কলকল। তবে তো চামড়া উঠবে।

দত্তের ভয় এইখানে—গরম তেলের নামে লম্বা লিকলিকে শরীরখানা আহত সরীসৃপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে, গায়ে কাঁটা দেয়, সে তাড়াতাড়ি বলে, ও হাসি তাম্‌সা নয়, বাবা হাসি তাম্‌সা নয়, ছাড়ান দাও, ছাড়ান দাও।

কেউ বলে, নয়ই তো, এ তো শাস্ত্রের কথা, খোদ বেদব্যাস।

দত্ত তাড়াতাড়ি পথ ধরিয়া কহে, যাস যাস, তামাক খাওযাব, ভাল তামাক খাওয়াব—কাষ্ঠগড়ার, আট আনা সের।

একটা ছেলে পেছন হইতে এক আঁজলা জল দত্তর গায়ে ছিটাইয়া দিয়া কহে, ছ্যাঁক কলকল।

দত্ত আতঙ্কে লাফাইয়া উঠে, ইরেঃ, বাবাঃ!

দত্তর মন দমে, কিন্তু ক্ষুধা কমে না, সে বাড়িয়াই চলে।

আদালতের পেয়াদা কহে, কই দত্ত, নিশেন দেবে কে?

খোদ জমিদারের নগদী; কই রে, কত দূর আর?

নগদী কহে, হুই—ওঃ, বেঁকী লম্বা ফালিখানার উতোর মাথায, হুই আঠারো কাঠা বাকুড়ি, কসকসে কালো ধান।

ঢুলিটা ঢোল পিটিয়া উঠে, ডুগডুগ।

দত্ত তাড়া দেয়, মল রে বেটা মুচীর ডিম, ঢোল পিটতে লাগলি যে? ঢোল গলায় ঝুলিয়ে এসেছিস ঝুলিয়ে চল্, আসবার সময় গাঁযে একবার পিটেছিস্, যাবার সময একবার দু' ঘা, বাস্; আইন রক্ষে।

গোপনে একটা অজ্ঞাত প্রয়াস কেমন আপনি আসে; মানুষের মতো তো, বুকে একটু অপহরণের লজ্জাও জাগে, তাবই তরে উচ্চধ্বনিতে অধিকার ঘোষণা করিতে বোধ করি কেমন কেমন লাগে।

দত্ত বলে, হ্যাঁরে গোবিন্দে, জোলের সেই চাব বিঘে বাকুড়ি, সেথায় চল্ না আগে।

নগদী বলে, চাব বিঘে বাকুডি তো গোষ্ঠব নয়, ও তো দেবেন্দ পালেব, তাবই ওপবে গোষ্ঠব বাবো কাঠা একখানা।

অ্যাঁ, ওটা গোষ্ঠর নয়? ওই বাকুডিব তবেই তো তোমাব এত আটুবাটু; বলিস কি? না না, তুই জানিস না, ও গোষ্ঠবই বটে।

তবে দাও গা তুমি ওই জমিতেই বাঁশ গেডে, তোমাব তো কাজই ওই।

দত্ত খিঁচাইয়া উঠে, উঃ, বেটা আমাব ধন্মপুত্তুব যুধিষ্ঠিব বে!

সহসা একটা ভীষণ রুদ্র গর্জনে সব কয়টা লোক চমকিয়া উঠে। উঠিবাবই কথা, এমন হাঁক মানুষেব কণ্ঠনালী দিয়া বাহিব হয় না।

সব চাবিদিকে তাকায, দুইটা লোক তীবেব মতো মাঠেব পথে ছুটিয়া আসিতেছে, হাতে লাঠি, আব কণ্ঠে ওই হাঁক। ঢোলটা বগলে চাপিযা মুচীটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে, সঙ্গে সঙ্গে দত্তব বাখালটা, তাহাব পিছনে পিছনে জমিদাবেব নগদী।

সে বলিযা যায, পালাও দত্ত পালাও, গোষ্ঠ আব বাম ভল্লা, দাগী ডাকাত, পালাও।

আব সে কি বলে, শুনিতে পাওযা যায না।

দত্তব সম্মুখেব পথ রুদ্ধ কবিযা দাঁডাইযা ছিল আদালতেব পেযাদা, ঝপ কবিয়া পাশেব জমিতে লাফাইয়া পডিয়া কাদায় কাদায ছুটে। বকেব মতো লম্বা পায়ে ধানেব পাতা জডাইযা জমিব কাদাব জলে দত্ত পডিযা গেল। উঠিবাব অবকাশ হইল না, পাঁকে জলে পাঁকালমাছেব মতোই বেচাবী হাঁপাল মাবিযা চলিতে চায। বহু ব্যগ্রতায় উঠিযা আবাব ছুটে, মুখেব একপাশে কাদা লেপিযা গিযাছে, চোখে কাদা, দেখিতে পায না, মুখে কাদা, থু-থু কবিযা ফেলিতে ফেলিতে ছুটে, দেখব শালাকে, থু, এমন কাণ্ড, থু, আদালতেব হুকুম, অ্যাঃ থু-থু গোবব, না কি আব কিছু, অ্যা হ্যা-হ্যা থু থু। যাঃ শালা, খোট খুলে গেল।

বিপদেব উপব বিপদ। জলে কাদায ভাবী কাপড লিকলিকে কোমবে থাকে না, কাছা খুলিযা যায, বেচাবী দুই হাতে কোমবেব কাপড চাপিযা ধবিযা ছুটে, ওদিকে ভিজা কাপডে পাযে পা জডায, শেষে দত্ত কাপড বগলে পুবিযা ছুটে।

বাম ভল্লা হা হা কবিয়া হাসিযা সাবা, পুত্রশোকেব মাঝেও গোষ্ঠেব হাসি পায।

ওস্তাদ কহিল, তাবপব, এইবাব জমিদাবেব পালা, পাববি সামলাতে? না পাবিস তো সবে যা কোথাও।

গোষ্ঠ কহে, তুমি?

আমাব কথা ছাড্, আমি ভিন গাঁযেব, তাব ওপব লোকে শুধু আমাদিগে ঘেন্নাই কবে না, ভযও কবে। তা হলেও আমিও দু'দিন সবব, হিমিকে নিয়ে জামাইয়েব বাডি যাব।

তাই দেখি। কণ্ঠটা কেমন হতাশায হিম, তাহাব উত্তেজনা শীতল হইয়া আছে! আকাশ পাতাল ভাবে, যাইবে কোথায?

রাম কহে, ভাবছিস কি? না হয় গাঁ থেকে চলে যাবি। বলে না সেই, 'সমুদ্রে পাতিয়া শয্যা শিশিরে হলো ভয়'; তোর হলো সেই বিত্তান্ত।

গোষ্ঠ তবু নীরব, সে ভাবে।

রাম কহে, আর কি নিয়েই বা থাকবি গাঁয়ে, মেমতাই বা কিসের তোর? জমি তো তোর যাবেই, যমে ছুঁলে আঠার ঘা—তা এ তো মহাযম।

তবু ওস্তাদ, গাঁয়ে মায়ে সমান কথা।

তা হলে বাবা, আমার মতো হতে হবে, বুকের পাটা আর লাঠি এই আশ্রয়, এই ছাড়া উপায় নেই।

তাই, তাই হবে ওস্তাদ।

গ্রাম প্রবেশমুখে ও পাড়ার নবীন মোড়ল কহে, গোষ্ঠ পঞ্চাশ টাকা।

কি?

জরিমানা, গোমস্তা করেছে। আবার শেয়াল বেটা জমিদারের বাড়ি ডাকাত যাবে। তা দিলি দিলি, বেটার বগের মতো ঠ্যাং দুটো সেরে দিতে নারলি? উই, উই যে বেটা, আড়ে আড়ে সবছে। ও দত্ত! দত্ত! দত্ত!

তাহার বুকটা কেমন দমিয়া যায়, গোষ্ঠ বাড়ি আসিয়া সদব দরজায় খিল আঁটে।

চৈত্রের ঘূর্ণি ক্ষীণজীবি যে; আকাশ বাতাস ধরণী সব আগুন না হইলে ঝড় পরমায়ু পাইবে কোথা?

শ্রাবণ-গগনে মেঘ যেন পাগল হইয়া উঠিল।

বর্ষণ-মুখর মেঘলা দিনে মন আরও উদাস হইয়া উঠে, শোকাহত দুইটি প্রাণীর দিন নীরবে অতি দীর্ঘ হইয়া কাটে।

দামিনী ঘরের মাঝে, গোষ্ঠ :ওয়ায়; খাওয়ার উদ্যোগ পর্যন্ত নাই, বুভুক্ষ পর্যন্ত যেন মূক হইয়া গিয়াছে।

তারাহীন মেঘাচ্ছন্ন তামসী রাত্রি, দীপহীন গৃহ, সেও অমনই ধারায় কাটে।

তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাঝে মেঘ ডাকে, গোষ্ঠ চমকিয়া উঠে।

দুয়ারে কে ঘা মাবে না? ভ্রম ভাঙিলে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

দুয়ারে ঘা পড়িল; প্রভাত না হইতে জীর্ণ দ্বাব সবল দন্তভরা আঘাতে ঝনঝন করিয়া উঠিল, মোটা গলায় হাঁক আসে, গোট্যা, আবে এ গোট্যা হারামজাদা বদমাস!

প্রভাতের তন্দ্রা, সদ্য-যাওয়া ছেলেটার স্মৃতি, স্বপ্নে-দেখা তাহার কচি মুখ, শোক, শক্তি সব যেন ঝড়ো হাওয়ার ফুল-ঝরার মতো ঝরিয়া পড়িল, গোষ্ঠ বিহ্বলের মতো বলিয়া উঠিল, জমিদারের প্যায়দা, আমাকে ধরতে এসেছে।

দামিনী নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল না, ছেলে যাওয়ার চেয়েও যেন বড় বিপদের আশঙ্কায় বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল।

দুয়ারে আরও জোবে ঘা পড়িল, শুয়ারকি বাচ্চা, খোল্ কেঁয়াড়ি।

গোষ্ঠ অস্থির হইয়া উঠিল, মনে পড়িল, হাতের উপব ইঁট, নালমারা জুতা, বুকে কাঠ, ওঃ, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে যে!

আবাব খাজনা, তাহাও বাকি; মনে পড়ে খাজনা, মামুলি চাঁদা, সেস, সুদ, চেকের দাম, নজবানা, তলবানা, তহুবী, আমলা-খরচ, থিয়েটাববৃত্তি।

বাবেব আব অন্ত নাই, সে বাবেব এক কানাকড়িও মাফ নাই। সব লোলুপ গ্রাসে হাঁ কবিয়া বসিয়া আছে, অনন্ত ক্ষুধায় শ্মশানেব কুকুরগুলাব মতোই জিভগুলা ঝুলিয়া পড়িযাছে, লালসায় উষ্ণ বিষেব মতো লালা গড়াইতেছে।

গোষ্ঠর দেহেব হাড়গুলা অবধি কনকন কবিযা উঠিল, উঃ! এতগুলা তীক্ষ্ণ হিংস্র দন্তপাটিতে এই জীর্ণ হাড় কয়খানা পিষিযা ফেলিবে যে।

সে ত্ববিত পদে খিড়কিব দুযাবপানে ছুটিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, বলো, ঘরে নাই, কোথা জানি না।

মাযেব বুকেও সন্তান যাওযাব বিপুল বেদনা উবিযা গিযা আশঙ্কাব মেঘ গুরুগুরু কবিয়া ডাকিযা উঠিল।

দামিনী ধড়ফড় কবিযা উঠিযা বসিল, ততক্ষণে অতি সন্তর্পণে খিড়কিব দুযাব খোলাব শব্দ উঠিল।

দামিনী চিৎকাব কবিযা ডাকিতে যাইতেছিল, ওগো!

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জীর্ণ দুযাবখানা মড়মড় শব্দে ভাঙিযা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে দবজা মাড়াইযা ঘবে ঢুকিল জমিদাবেব খোট্টা চাপবাসী।

বিভীষণ হিংস্র চেহাবা, মুখখানা হইতে দেহেব কাঠামো পর্যন্ত হিংস্র বুল্‌ডগেব মতো, মুখখানা থ্যাবড়া, দেহখানা বেঁটে বেঁটে, গিঁট গিঁট পা দুই পাশে বাকা-বাঁকা। গলাব আওযাজ পর্যন্ত ওই কুকুবগুলাব মতো মোটা বীভৎস।

সে বলিতেছিল, লুকইযে বইবি, লুকইযে বাঁচবি শালা, হাঁড়ি পাকড়কে লুকইযে বাঁচবি, মতলব তেবি?—বলিতে বলিতে সে সটান ঘবে ঢুকিযা চাবিদিকে দেখে।

কাঁথা বিছানা বালিস উল্টাইযা ভাঙিযা ঘবখানাকে তছনছ কবিযা ফেলে।

আবে, এ শালা তব্ গেইলো কোথা? ভাগলো, না কা?

কণ্ঠে তাহাব যেন লুকোচুরি-খেলাব কৌতুক ঝবিতেছিল।

দামিনী এই অবসরে উঠানে নামিযা কোথায যাইবে ভাবিতেছিল সহসা পিছন হইতে খোট্টাটা অশ্রাব্য ভাষায গালি দিযা উঠিল, তুহভি ভাগবি মতলব, তোক্‌বাকে হামি লিযে যাবে কচহাবি, চল্।

বলিযা হাসিতে হাসিতে জিভ বাহিব কবিযা আগাইযা আসে, শ্মশানেব কুকুবগুলা ঠিক অমনই ভাবেই লোল জিহ্বায কোলাহল কবিতে কবিতে শবগুলাব পানে আগাইযা যায়।

কঙ্কালেব মধ্যে যেটুকু জীবনেব অবশেষ অশেষ কষ্টে বাচিযা থাকে, সেইটুকুই চিৎকাব কবিযা উঠে, যতটুকু শক্তি তাহাব থাকে, নিঃশেষে প্রযোগ কবিযা ছুটে।

কোথায? কোন্ দিকে?

পথহাবা নাবী, গোষ্ঠেব পদবেখা ধবিযা খিড়কির পানেই ছুটিল।

দুর্বলা, আত্মহারা নারী, তাহার গতি কতটুকু, ওই হিংস্র জানোয়ারটার সলক্ষ অনুসরণের কাছে কতক্ষণ ?

খিড়কির ঘাটের কাছেই খোট্টার বীভৎস হাসিটা ঠিক কানের কাছেই বাজিয়া উঠিল ; উপায়হীনা দামিনী সুবলের ঘরেই ঢুকিয়া পড়িল।

প্রাণের দায়ে মানের জ্ঞান হাজার-করা একটা লোকেরও থাকে কি না সন্দেহ।

সকল সংসার ডুবিয়া যায় ; জীব জীবধর্ম লইয়া জাগে সেখানে।

খোট্টার ভয়ে দামিনী মানমর্যাদা সব ভুলিয়া সুবলকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মহান্ত আমাকে বাঁচাও।

সুবল সকল হিয়া উজাড় করিয়া দিল, ভয় কি, ভয় কি ?

ওদিকে খোট্টাটা দাঁড়াইয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছিল আর কহিতেছিল, হামরাকে ধর গো হামরাকে ধর, ঐসিন করকে হামরাকে ছাত্তি পর আ যাও, ডর কুছ রহবে না।

ওই একটা কথায় স্থান-কাল-পাত্র সমস্তটার রূপ পাল্টাইয়া যায় ; শুধু বাহিরের নয়, অন্তরেব মাঝেও আর একটা পর্দা খুলিয়া যায়, হৃদযের সমস্ত কদর্যতা অস্থির হইয়া উঠে।

দামিনী সুবলকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায় ; সুবলের বুকের ভিতরটা একটা উদ্দাম ক্ষুধায় তোলপাড় করিয়া উঠে।

দামিনীর অঙ্গের ওই কোমল স্পর্শ শিরায় শিরায় আগুন ধরাইয়া দেয়, সে খোট্টাকে কহে, মেয়েমানুষকে—

আর মেইয়ামানুষ, ওক্‌রাকে হামি জরুর লিয়ে যাবে, ওক্‌রা ভাতারকে জরমানা কৌন্ দিবে ? উ শালা ভাগি‍‍সে তো ওক্‌রাকে হামি লিযে যাবে।

দামিনী অস্থির হইয়া উঠে।

সুবলও জরিমানার টাকা কয়টা দিবা‍ জন্য অস্থির হইয়া উঠে।

এ যেন দামিনীকে কি‍নিবার একটা সুযোগ।

খোট্টাকে একটা টাকা দিয়া সে কহিল, চলো সিংজী, ওব কাছ থেকে টাকা নিযে আমি দিযে আসছি। কত জবিমানা ?

টাকাটা বাজাইতে বাজাইতে খোট্টা কহে, পচাশ—পচাশ রূপইযা কৌড়ি না কম। আউর খাজনা উ ভি পচিশ-তিশ হোগা।

আর সে তাগিদ করে না, হাসিমুখে চলিয়া যায়। ঠিক যেমন চিৎকার-রত কুকুরকে একটুকরা হাড় ছুঁড়িয়া দিলে সকল রব বন্ধ করিয়া হাডমুখে রাস্তা ছাড়িয়া সে চলিযা যায়, তেমনই ভাবে।

দামিনী কহিল, টাকা তো নাই মহান্ত।

সুবল সলজ্জ অস্থিরভাবে কহিল, তার জন্যে তু—তুমি ভেবো না।

তা—তা সে কথা কি কাউকে বলে ? বলিযা সে লজ্জায় রাঙা হইযা টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

পাপ, সাপের মতোই তাহার প্রকৃতি, গোপনতার মধ্যে তাহার বাস, তাই মানুষ গোপনতার আড়ালে যে ক্রিয়া দেখে, তাহাকেই পাপ বলিয়া সন্দেহ করে।

দামিনীও সুবলের এই টাকা দেওয়ার সত্য গোপনের প্রয়াসে পাপের ছাপ দেখিতে পাইল, দুনিয়ার দয়াধর্ম সব যেন বীভৎস কুৎসিত কালিতে কালো হইয়া গেল।

বুকখানা কেমন অস্থির হইয়া উঠে, বিনিময়ে সে যে দিবার কিছু খুঁজিয়া পায় না।

তবে ?

নিরুপায় মন বলিয়া উঠে, তবে আর কি, এ তো ঋণ লওয়া হইল না, সেদিনের মতো দুইটি টাকার দাদনও এ নয়—এ দাম, দাম, তোমার দাম, বিকাইলে, তুমি বিকাইলে।

দামিনী যেন উন্মাদ হইয়া উঠিল, চিৎকার করিয়া উঠিল, না না না, মহান্ত না।

কিন্তু কোথায় মহান্ত, সে তখন চলিয়া গিয়াছে।

দামিনী ছুটিল, না না, মহান্ত, না। খিড়কির ঘাটে আসিয়াও দেখিল, সুবল নাই; দামিনীর ইচ্ছা হইল, ওই ভরা ডোবাটার বুকে লুকায়।

কিন্তু কে যেন পিছন হইতে টান দিয়া কহিল, বিকাইয়াছ যে!

দামিনী বিহ্বলার মতো ফিরিতেই দেখিল, আঁচল টানিয়া ধরিয়াছে সাতু।

ছিঃ বউ!

দামিনীর বুকখানা গুরগুর করিয়া উঠিল।

সাতু ছিছিকার করে কেন ? তবে কি এই বিকিকিনির কাহিনী—

দামিনীর বাক্য ফুটিল না, সাতুর মুখপানে চাহিয়া রহিল—বিহ্বল দৃষ্টি।

সাতু কহিল, ছি বউ, দাদার কি সর্বনাশই করবি, হাতে দড়িই দিবি ? গাছের সব ফল কটাই কি থাকে ? ভাগ্যে আমি গলা শুনে এসেছিলাম, নইলে কি হত বল্ দেখি ? ভগবান রক্ষে করেন, কাল থেকে আমি ও পাড়ার মাসীর বাড়িতে ছিলাম, এসে কেবল বাড়িতে পা দিয়েছি, আর শুনি 'মা মা' বলে তুই চেঁচাচ্ছিস। সর্বনাশ, সর্বনাশ। আয়, ঘরে আয়, বুক বাঁধ্, সব হবে আবার।

দামিনী সাতুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল, কি হবে ঠাকুরঝি ?

মাথায় হাত বুলাইয়া সাতু কহিল, হবে আবার কি, সব হবে, একবার যখন কোঁক ফেলেছে, তখন আবার হবে, খোকা তোর বেড়াতে গিয়েছে। নে, বুক বাধ, সব হবে। ও মা, চুলে যে জট পড়েছে লো, আয় দেখি, চুল কুঁড়ুলে দি, বস।

চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া ফাস ভাঙিতে ভাঙিতে সাতু গল্প করে, দামিনীর কিন্তু কানে যায় না, সে যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে।

সাতু যাইবার সময় কহে, এই নে, এ দু'গাছা রাখ্, ভাল কাজে দিস, তার ভাল হবে, না হয় মা ষষ্ঠীকে নোটন গড়িয়ে দিস, সেদিন আমি নিয়ে রেখেছিলাম। ছেলেটার সেই জীর্ণ বালা দুইগাছা। সাতু দামিনীর আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া যায়।

এদিকে আকাশে বুঝি ভাঙন ধরে—ঝরঝর অবিরাম ধারা।

দামিনী আশ্বাসে বুক বাঁধিতে চায়, কিন্তু বাঁধা যায় না। উপায়ের বাঁধ পাইলে তো নিরুপায়ের ভাঙন বাঁধা যায়, কিন্তু উপায় যে দামিনী পায় না। মনে হয়, স্বামী শোধ দিবে।

পরক্ষণেই মনে পড়ে, কাবুলীর ভয়ে ঘরে খিল দেওয়া, সন্তানের চিকিৎসার সম্বল মহাজনের হাতে সঁপিয়া দেওয়া—জমিদারের ভয়ে পালানো—হতাশের ভাঙন দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়।

মনে হয়, সুবল আসিয়া হয়তো—। দামিনীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতে চায়, কিন্তু সে শক্তিও যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

খুটখুট।

বুকের স্পন্দন বুঝি নিস্পন্দ হইয়া গেল, বুঝি সে আসিল।

অতিকষ্টে ফিরিয়া দেখে, কাকটা ঘর-নিকানো পেলেটার কানায় বসিয়া সেটা উল্টাইয়া দিল।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বুকখানাকে হাল্কা করিয়া দেয়। আঃ! চিন্তায় চিন্তায় বস্তু হারাইয়া যায়, লক্ষ্যশূন্য একাগ্র দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া থাকে।

আবার শব্দ হয়, দামিনী চমকিয়া যেন জাগিয়া উঠে, এবার রোঁয়া-ওঠা শীর্ণ কুকুরটা ঘরে ঢুকিয়া গিন্নীপনা করিতেছে দেখা যায়। মর্মদাহী চিন্তার গুমোটের মাঝে স্বস্তির বাধা পাইয়া দামিনী যেন বাঁচিয়া যায়, যতক্ষণ পারে অবসরটুকু ধরিয়া রাখিতে চায়।

কুকুরটাকে তাড়ায়, দূর দূর।

পরমুহূর্তেই আবার চিন্তায় ডুবিয়া যায়; কুকুরটা বাহির হইল কি না, সে খেয়াল আর থাকে না।

ওই বাধার ক্ষণটুকু জলমগ্নের প্রাণপণে মাথা তুলিয়া নিঃশ্বাস লওয়ার মতো ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী।

ক্ষণের পাখায় সময় চলে, সে বোধও নারীটির থাকে না।

আবার শব্দ হয়, এবার সত্য সত্যই সুবল আসিয়া দাঁড়ায়; অস্থির ভঙ্গি, দৃষ্টি কেমন।

সমস্ত শরীর দামিনীর কেমন করিয়া উঠে।

সুবল কহিল, দিয়ে এলাম।

উত্তর যোগায় না, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ, একটা কাজ পাইবার জন্য দামিনী ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই রসিদ।—একখানা কাগজ সুবল নামাইয়া দেয়।

দামিনীর হাত যে অবশ, কাগজখানা পড়িয়াই রহিল।

তবুও যে সুবল যায় না।

তবে?

বিনিময় চাহিবে, দাম দিয়াছে, দেহ চাহিবে!

বউ!—সুবলেবও কথা যোগায না, কানেব পাশ দিয়ে আগুন ছুটে, বুকেব ভিতবটা টগবগ কবিয়া ফুটে।

বউ! এবাব সুবল দামিনীব হাতখানা চাপিয়া ধবে, সুবলেব হাতে যেন আগুন ছুটিতেছে, আব এ যেন হিম, অহল্যাব দেহ বুঝি পাষাণ হইতে শুরু কবিয়াছে।

তবু দামিনী অস্থিব চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, তোমাব পাযে পডি, এখন যাও।

সুবল বেত্রাহতেব মতো পলাইযা গেল।

সুবল গেল, কিন্তু সুবলেব অস্তিত্বেব আভাস গেল না; ও-বাডিতে খুট শব্দ হয, অস্থিব পদশব্দে তাব বুকেব কথা দামিনীব কানে বাজে।

সে শব্দ খিডকিব দুযাব পর্যন্ত আগাইয়া আসে, কখনও গোষ্ঠব বাডিব দুযাব পর্যন্ত, আবাব ফিবিযা যায।

এমনই সাবাটা দিন, সন্ধ্যাযও তাহাব বিবাম নাই।

গ্রাম নিশুতি হইযা আসিল, পদশব্দ আবও আগাইযা আসে, বাত্রি অন্ধকাব, দামিনী কাঠেব মতো বসিযা।

নীববে দুইখানা হাত দামিনীব হিমানী-শীতল দেহখানা জডাইযা ধবিল, সর্বশবীবে সে যেন ক্লেদাক্ত সবীসৃপেব স্পর্শ। নাবী দেহখানা আঁকিযা বাঁকিযা উঠিল।

* * *

বাত্রি শেষ হইযা আসে, দামিনী তেমনিই নিস্পন্দ বসিযা।

কিন্তু অন্ধকাব যত তবল হইযা আসে, দামিনী তত অস্থিব হইযা উঠে, মাটিব বুকে লুকাইতে সাপেব গর্তেব মতো একটা গর্ত খোঁজে, স্যাৎসেঁতে, মযলা, ছোট্ট। কিংবা এই বাত্রিটা যদি প্রভাত না হয, এই অন্ধকাব যদি বৎসব, যুগ, না, প্রলযান্তব্যাপী হয!

আঃ, তাহা হইলে বাঁচে সে।

সম্মুখেই সেই কাগজখানা পাডযা, সুবলেব দেওযা সেই বসিদটা, সেটা সে স্পর্শ কবিতে পাবে না। একদৃষ্টে দেখে।

মনে হয, ওই কালো গুটি গুটি দাগেব মধ্যে তাহাব ওই ইতিহাস লেখা আছে।

শবীব মন শিহবিযা উঠে।

আবাব কাহাব টিপিযা টিপিযা পা যেলাব শব্দ হয, দামিনীব বুকে আব উদ্বেগ জাগে না।

বাবা, যে বান! কে?

শ্বেতবস্ত্রাবৃত দামিনীকে দেখিযা গোষ্ঠ চমকিযা উঠে, তাবপব চিনিয়া বলে, ও, তুমি! খোট্রা আব আসে নাই?

দামিনী কথা কয না।

একবাব মনে হয, ওই বসিদখানা আগাইযা দেয, চিৎকাব কবিযা অভয দেয, ভয নাই ভীরু, ভয নাই।

আবার নিজেরই ভয় হয়, অতি যত্নে কাগজখানাও লুকাইয়া ফেলিতে ব্যগ্রতা জাগে। কিন্তু দুটোর একটাও হয় না, কাগজখানা স্পর্শ করিতে পারে না; অন্তরের অহল্যা বুঝি পাষাণই হইয়া গিয়াছে।

গোষ্ঠ বলে, যে বান, গাঁয়ে ঢুকল বলে। ক্ষণপরে আবার কহে, আর গাঁয়ের পিতুল নাই, বানের আগে শ্মশান এসে গাঁয়ে ঢুকছে।

ব্যগ্রভাবে দামিনী প্রশ্ন করে, আর কত দেরি?

প্রশ্নটার তাৎপর্য গোষ্ঠ বুঝিতে পারে না, দামিনীর মুখপানে চাহিয়া থাকে।

আবার বর্ষণ প্রবল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো ক্ষ্যাপা হাওয়া।

পশ্চিমের দিগন্তে বুঝি কোন ঘুমন্ত সুবিশাল অজগর সদ্য জাগিয়া ধরণীগ্রাসে আগাইয়া আসিতেছে।

কালো মেঘের বুক চিরিয়া তাহার রক্তজিহ্বা ঘনঘন লকলক করে; সমস্ত সৃষ্টিটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠে; আকাশস্পর্শী বৃক্ষশীর্ষ, তাহার বিষনিঃশ্বাসে মাথা আছড়াইয়া মরে; উচ্চ গৃহচূড়ের পাশ দিয়া সে নিঃশ্বাস গর্জিয়া যায়—গোঁ গোঁ, পাষাণপুরীর অন্তস্থল পর্যন্ত চাড় খাইয়া চড়চড় করিয়া উঠে। বৃষ্টির ছাঁট—হাওয়ার দাপটে অসহ্য তীক্ষ্ণ, সে যেন বিষেব ছিটা, মৃত্যুর হিমানী মাখা।

দাওযার উপর এমনই একটা দাপটে গোষ্ঠ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলে, ঘরে এস গো, ঘরে এস।

দামিনীর এ প্রলয়তাণ্ডবে কেমন একটা উল্লাস জাগে, সে কথা কহিল না, শুধু সমস্ত অন্তর উন্মুখ করিয়া ওই প্রলয়লীলার উন্মত্ত আলিঙ্গনের মাঝে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিতেছিল।

ঘরখানার চালের পাশ দিয়া আবার একটা প্রবাহ বহিয়া যায়, সে বিষনিঃশ্বাসে ঘরখানার হাড়-পাঁজর মড়মড় করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠে, চাল করিয়া উঠে মচমচ।

গোষ্ঠ শিহরিয়া ত্রস্তভাবে কহে, পিঁড়েখানটা কই গো, পিঁড়েখানটা পবনদেবতাকে বসতে পেতে দি উঠোনে।

পিঁড়িখানা গোষ্ঠ উঠানে পাতিয়া দেয়, বলে, শান্ত হয়ে বস ঠাকুর, শান্ত হয়ে বস।

দেবতা শান্ত হয় না; আবার ঝড় গোঙায়, দামিনীর পাশ হইতে রসিদখানা ঝড়ে উড়িয়া যায়।

দামিনীর বুকখানা কত হাল্কা হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ আর্তকণ্ঠে ডাকে, হে ভগবান্, রক্ষে কর প্রভু, রক্ষে কর। আবার কহে, ডাক গো, ভগবানকে ডাক এ সঙ্কটে।

না।—অতি স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

গোষ্ঠ হতভম্বের মতো দামিনীর পানে তাকায়। দামিনী বলে, ক্যানে? কি হবে ডেকে?

প্রশ্নের উত্তর নাই, নির্বাক বিস্মিত নেত্রে গোষ্ঠ দামিনীর পানে চায়; বৃষ্টির দাপট

স্বামী-স্ত্রীকে ভিজাইয়া, দাওযার দেওয়াল পর্যন্ত ভিজাইয়া দেয়, গোষ্ঠ ত্রস্ত শিশুর মতো ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসে, দামিনীকেও ডাকে, এস, এস, ঘরকে এস গো।

দামিনী কথাও কহিল না, উঠিলও না, বসিয়াই রহিল।

গোষ্ঠ এবার বিরক্ত হইয়া কহিল, তোমার হলো কি বল দেখি? দুঃখ কি আমার হয় নাই, না কি তোমার একারই হয়েছে?

দামিনী উন্মাদের মতো কহে, কত দুঃখ তোমার হয়েছে? মরতে মনে হয তোমার? হয়?

হা-হা করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে তাহার, ওপাশ হইতে একটা বিপুল আর্তনাদ, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার; ওই চিৎকারে তাহার সম্বিৎ আবার ফিরিয়া আসে।

বুকের মানুষটি একেবাবে মরে না।

দেহের কষ্টে, মরণের ভয়ে যে গোষ্ঠ শিশুর মতো চাবিখানা দেওযালের ভিতর মাটি মায়ের কোল খুঁজিতেছিল, সেও ওই বিপুল আর্তনাদে ছুটিযা গিযা বাহির-দুযাবে দাঁড়ায়।

বৃষ্টির আবরণ ভেদিয়া সকল শক্তিপ্রযোগে তীব্র বিস্ফাবিত দৃষ্টি হানে; সুব আবরিত করিয়া বর্ষার শুভ্র ধারা, কিছু দেখা যায না।

আন্দাজ করিয়া বলে, কার ঘর উড়ল, টিনের শব্দ, টিনের ঘর। কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিতে আর সে কাতরতা নাই, পরের অবস্থা দেখিয়া সেও যেন প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

সে নিজেব ঘরের পানে তাকায়, ঘরখানা এক একবাব ঝড়ের বেগে দেওযাল ছাড়িয়া উঠে।

বাহির পথ হইতে হাঁক আসে, এ গুষ্টা, গুষ্টা!

জমিদারের খোট্টা চাপরাসী।

মুহূর্ত পরেই ভাঙা দুয়ার দিযা খোট্টা আসিযা গোষ্ঠের হাত ধবিযা টানে; বলে, আও, কোদালি লেকে আও, কচহাবিমে বান উঠিয়েছে।

জমিদারের ভযের চেযে ভীষণতব ভয় গোষ্ঠর সম্মুখে, সে তাহারই জন্য বুক বাঁধিয়াছিল।

আজ খোট্টার রক্ত-আঁখি তাহার তুচ্ছ ঠেকিল, সে হাত টানিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, আর ঘর উড়ুক, ঘর-সংসার ডুবে মরুক; পারব না যেতে আমি।

গালি দিযা খোট্টা দরিদ্রের ঘাড়ে মারে, চল্ শালা চল্।

রিক্ততা শুধু বঞ্চনাই করে না, সর্বপ্রকার সঙ্কোচ হইতে মুক্তও করে মানুষকে; উলঙ্গ শক্তি লইয়া রিক্ত জন মরিয়া হইয়া জাগে।

বুকের মাঝে আবার ঘূর্ণি জাগে, সমস্ত শরীরের রক্ত ঝাঁঝিয়া উঠে, গোষ্ঠ ঘুরিয়া খোট্টাকে নিঃসঙ্কোচে সজোরে ধাক্কা মারে; পিছল মাটিতে ধাক্কার বেগে সে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে।

বিপুল ক্রোধে খোট্টা উঠিয়া বসিতে না বসিতেই হাতের লাঠি হানিল। বেকায়দায় হানা দুর্বল লাঠি গোষ্ঠ সহজেই ধরিয়া লইল, বিদ্রোহী ঝড়ের ছোঁয়াচে মরিয়া মস্তিষ্কে তাহার যেন খুন চাপিয়া যায়, সজোরে সেই লাঠি খোট্টার মাথায় বসাইয়া দিল।

বৃষ্টির জল লালচে হইয়া গেল, ফিনকি-দেওয়া রক্তের ধারায় মাটির খানিকটা উপরের বৃষ্টির ফোঁটা কয়টা পর্যন্ত।

রক্ত দেখিয়া গোষ্ঠ শিহরে না, স্থির দৃষ্টিতে দেখে। দামিনীরও ভয় হয় না, মনে তৃপ্তি যেন জাগে, লাঞ্ছিতা নারীর বুক দুঃশাসনের রক্তে পাঞ্চালীর উল্লাস জাগিয়া উঠে।

আইনে অত্যাচারীকে হত্যার অধিকার নাই।

গোষ্ঠ বসিয়া ভাবে।

ক্ষণপরে আপন মনেই বলে, সেই ভাল, কিসের তরে থাকব, জমি গেল ; ছেলে গেল ; দুটো পেট যেখানে খাটাব, সেইখানে ভাত। এখানেও খাটা, বাইরেও খাটা। ঘর ? গাছতলা তো আছে।

আবার ঝড় গোঙায়।

উঠানের ওপাশের বড় আমগাছটা শিকড়সুদ্ধ উপড়াইয়া পড়িল। সে কি শব্দ! গাছটার মরণের আর্তনাদ যেন !

তলার আগাছার দল, হাওয়ায়, জলে, মেঘলা দিনের ম্লান আলোকে উন্মত্ত পুলকে লুটাপুটি খাইয়া মরে।

উঠানে জল ঢোকে, গোষ্ঠ কহে, বান।

খোট্টার দেহটা টানিযা ওপাশের সার-ডোবায় ফেলিযা দিযা দামিনীব হাত ধরিয়া বলে, এস।

নিঃসঙ্কোচে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া দামিনী উঠিযা দাঁড়ায়, প্রশ্ন পর্যন্ত করে না, কেন, কোথায ?

পাতানো ঘবসংসারেব পানে ফিরিযা তাকায় না পর্যন্ত ; গোষ্ঠও না।

মুক্তির কামনায় মায়া টুটে।

দামিনী আগে পা বাড়াইয়া বলে, চল।

উন্মত্ত ঝড়বৃষ্টির মাঝে ওই আগাছাগুলার মতো লুটাপুটি খাইতে খাইতে পথে বাহির হয়, নূতন আশ্রয়ের তরে।

কোথায় সে আশ্রয় ? বন-জঙ্গল হয়তো।

চলিতে চলিতে গোষ্ঠ বলে, এস, ওই বটতলাতে দাঁড়াই, এমন করে ঝড়ে জলে মরার চেয়ে চাপা পড়া ভাল।

আবার ক্ষণপরে কহে, ঠিক বলেছ, কি হবে ভগবানকে ডেকে ? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে ?

দামিনী কথা কয় না, দাঁতে দাঁতে তাহার একটা শব্দ হয় ; সে শীতের কম্পন, না আক্রোশের ঘর্ষণ কে জানে !

আধা শহর।

কালো কালো পাথরের কুচি দেওয়া চওড়া রাস্তা। দুই পাশে দোকান—পান-বিড়ি, মিষ্টি, মণিহারী, চকচকে ঠুনকো জিনিসে ভরা, সবারই মাঝে একটা বহিঃসৌন্দর্যের আস্ফালন।

ওপাশে রেলস্টেশনের ধারে স্তূপ বাঁধা কয়লার ডিপো, কালিতে রাস্তাঘাট কালিমাখা, সব যেন রুক্ষ, রৌদ্রে কয়লার স্তূপ ঝাঁঝে ভরা, আশপাশ পর্যন্ত ওই উত্তাপে তপ্ত।

লোহার দোকান, শুধু ঝনঝন শব্দ, মাটির বুক ফালি ফালি করিয়া ফাঁড়িয়া ফেলিবার কত অস্ত্র—টামনা, গাঁইতি, শাবল, সব যেন তীক্ষ্ণ হিংস্র, রৌদ্রের আলোয় চকচক করে।

ধারে ধাবে প্রযোজনের অতিরিক্ত জাযগা ঘিরিযা ধানের কল, বযলার আঁচে গরম জলের ভাপে সব যেন আগুন।

দুইটা বাজারেব মাঝে স্টেশন, মস্ত জংশন।

সারি সাবি কালো কালো সুকঠিন লোহার লাইন, মাটির বুক চিরিয়া পাতা; লোহার বাঁধনে দুনিযাটাকে বাঁধিবাব কি সে উদগ্র চেষ্টা! দূর—সুদূর পর্যন্ত কালো কালো লাইনেব দাগেব বেশ চোখে বাজে, মনের চোখে আরও দূর পর্যন্ত, দুনিয়ার সীমাবেখা পর্যন্ত—ওই রেশ আগাইযা যায।

মাঝে মাঝে সিগ্‌নালের স্তম্ভগুলা যেন লোহার বিশ্বজয়েব বিজয়নিশান।

বাত্রের অন্ধকাবে ওগুলার মাথায আবার রক্ত-বাঙা জ্বলজ্বলে আলোর সাবি ধকধক করে।

ও যেন মানুষের উদগ্র বুভুক্ষার উগ্রতা, রাত্রে ঘুমন্ত বিশ্বেও সে জাগিয়া আছে: আপন উগ্রতার জ্বালায ও আপনি জ্বলে। দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ও আপন তৃপ্তি হেতু আপন গ্রাসেব কাজ চালাইযাছেই; রেল চলে, টেলিগ্রাম চলে, মানুষ কাজ কবে, বিশ্রামের হুকুম দেয না ও। চব্বিশ ঘণ্টাই শহবটা ধ্বনিয়া রেলের বাঁশীর অশ্রান্ত তীক্ষ্ণ চিৎকার, তন্দ্রা টুটিয়া যায়, অন্যমনস্ক চমকিযা উঠে, মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরাগুলা পর্যন্ত ঝনঝন করে; সকল শান্তি তৃপ্তি যেন শিহরিয়া উঠে। গাড়ি কাটে, গাড়ি টানে, শান্টিং হয়, গাড়িতে ধাক্কা মারে ঘড়াং ঘড়াং; আশে-পাশের মাটি কাঁপে, ধরণী-মায়েরও বুঝি ভার লাগে, হাড়পাঁজরা মড়মড় করে যেন।

দারুণ বুভুক্ষায মাতৃস্তন্যে তৃপ্তি হয় না উহাদের, মায়ের বুক চিরিয়া নিঃসঙ্কোচে রক্ত শোষণ করে।

মালের গাড়ি সব বোঝাই হয, ধানে চালে আহারের সামগ্রীতে বোঝাই করে, আহার যাহাদের জোটে না তাহারাই।

মাটিতে মাথা বুঝি ঠেকিযা যায়, কাঁখ বাঁকাইয়া গরুর গাড়ি হইতে দুইমণে বস্তাগুলা গাড়িতে বোঝাই করে অর্ধাহারী মজুরের দল।

পাশে গাড়ির গরুগুলার মুখে ফেনা ভাঙে, শ্রান্তিতে হাঁপায়, গায়ে সোঁটা সোঁটা

চাবুকের দাগ, বিশ-পঁচিশ মণ বোঝাই গাড়িগুলা ওই পাথরের রাস্তার উপর দিয়া জিভ বাহির করিয়া টানিয়া আনিতে কষ্ট হয়, তাই মানুষ এদের চাবকায়। নির্মমভাবে গুঁতা মারে, তাহাতে মাথা নাড়ে পাছে, তাই নাকে দড়ি দিয়া টানে।

মজুরগুলারও গা হইতে টসটস করিয়া ঘাম পড়ে, দাঁড়াইয়া দম লইতে গেলে মাড়োয়ারী মহাজন গালি দিয়া তাড়া দেয়, এ শালালোক বদমাস, চালাও চালাও; দের হোনেসে গাড্ডিমে ড্যামরেজ লাগেগা, চালাও চালাও।

মারিতে তাড়াও করে।

পশুর উপরে মানুষ যে অত্যাচার করে, মানুষের উপরেও তার চেয়ে কম অত্যাচার করে না; আট আনা, দশ আনা মজুরীতে ইহাদের সাত-আট ঘণ্টায় আয়ু বিকায়, এই সাত-আট ঘণ্টার মাঝে এদের বাঁচিবার প্রয়াসে নিঃশ্বাস লইবার অধিকার নাই।

মজুরগুলার বাস ওই উত্তাপ, ওই লৌহ-বন্ধনের মাঝে, লাইনের ধারেই ছোট ছোট পায়রা-খুপীর মতো ঘর—ওই মজুরের বস্তি, সমাজের আঁস্তাকুড়, অর্থশালীর ডাস্টবিন। পূর্ব দিকে কলের সারি, কালো কালো লম্বা লম্বা চিমনি, সারাদিন ধোঁয়া উদগীরণ করে। উত্তরেও তাই। পশ্চিমে রেলের মালগুদাম। মহাজনকে টাকা আনিয়া দেয়, আর ইহাদের আলো-বাতাসের পথ রোধ করে। রেল-ইঞ্জিনও ধোঁয়া ছাড়ে। ওদিকে দক্ষিণে মদের ভাঁটি; হতভাগ্যদের আয়ুবিক্রয়-করা পয়সাগুলা লুঠ করে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ পর্যন্ত কেমন ঘোলাটে, দীপ্ত রৌদ্র পর্যন্ত এখানে ম্লান।

কেমন একটা অভিভূতি আসে, মদের গন্ধে ম্লান আলোয় সব যেন কেমন নেশায় বিকারগ্রস্ত।

তবু এখানকার মানুষগুলি তন্দ্রালু নয়—জীবনের দুরন্তপনার সাড়া পাওয়া যায়, সে দুরন্তপনা বিচিত্র।

এতকালের বিশ্বের সঙ্গে মেলে না। হয়তো বা প্রেত ইহারা, কিন্তু প্রেত জীবনে জীবন্ত।

পড়ন্ত বেলা।

গোষ্ঠ আর দামিনী ওই স্টেশনটির ধারে একটা বটতলায় আশ্রয় লইয়াছিল। গোষ্ঠ পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল, সে যেন নিশ্চিন্ত। আর দামিনী বটগাছের একটা শিকড়ে হেলান দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, অন্তহীন অর্থহীন চিন্তা। কুলী-মজুরের দল ঘরের দিকে ফিরিতেছিল।

কর্মক্লান্তির অবসাদের মাঝে খলখল উচ্ছৃঙ্খল হাসি, ইহাদের বেতালা পায়ের মলের মতোই বাজিতেছিল।

মেয়েরা গান ধরিয়াছিল—

> ধকধকিয়ে আগুন জ্বলে ভকভকিয়ে ধূমা,
> মিস্ত্রী বলে, বয়লার আড়ে দে লো একটা চুমা।

একজন পুরুষ বলিতেছিল, দোব মাইরি এইবার শালার মাথাটা ফেড়ে, এক শাবলের ঘা বাস্, ডিমফাটা হয়ে যাবে; বাবু হলো তো হলো কি!

অপর জন কহে, শালা রোজ আমাদের হাজরি চুরি করে। উঃ, আমরা শালারা খেটে মরব আর হাজরিবাবুর পরিবারের শাঁখের শাঁখা সোনার হবে, ইঃ—রে?

নারীকণ্ঠের সমবেত তীক্ষ্ণ উচ্চসুরে গোষ্ঠ জাগিয়া উঠে, বিস্মিতের মতো ইহাদের পানে চাহিয়া থাকে।

ওই বেতালা চাল কেমন নূতন ঠেকে, মনে খট করিয়া বাজে; আবার ওই বিচিত্র নূতন ধারার কোন সূক্ষ্মতম সুর তাহাকে আকর্ষণও করে।

সহসা পিছনেব পানে একটা কোলাহল উঠে, দুইটি সমান উত্তেজিত কণ্ঠে। মজুরের দল ঘুরিয়া দাঁড়ায়, গোষ্ঠও ফিরিয়া তাকায়।

উত্তরদিকের কলের ফটকে দুইজন লোক,—একজন জামা-কাপড়-জুতায় বাবু, আর একজন মজুর, গায়ে হাতকাটা কামিজ, হাফপ্যান্ট, সারা অঙ্গে তেল-কালি মাখা, হাতে একটা হ্যামার। সে কহিতেছে, আমার খুশি আমি 'ওপরটায়েম' খাটব না।

মজুরের দল কহে. ছোট মিস্ত্রী আর ক্যাশবাবু, শালা ভুড়েও কম নয়, সবেই শালা পাক মারে।

ওখানে ক্যাশবাবুটা বলে, অঙ্গ জল কবে দিলে আর কি আমার; পাম্প না সারলে কল যে কাল বন্ধ থাকবে, তাব কি? সে লোকসান দেবে কে? তুমি সিরাজউদ্দৌলার নাতি লবাব সরফরাজ খাঁ! বলি, মালিকের মাইনে খাও না? কল বন্ধ হবে আর লবাব ঘরে বসে আরাম করবেন!

মাগনা মাইনে দেয, আমায়, নয়? দাতাকর্ণ রে আমার! গতব খাটাই, পয়সা নিই; বাঁধা টাযেমের কাজ না করি, বলতে পার; ওপরটায়েম খাটা আমার গতরে পোষাবে না, আমি খাটব না, সিধা বাত।

সে দুই পা আগায়।

পিছন হইতে ক্যাশবাবু ক্রোধে ভুঁড়ি নাচাইয়া, হিন্দী বাত ছাড়িযা দেয, আলবৎ খাটনে হোগা, তোমার ঘাডকে খাটনে হোগা, উল্লুক গিধ্বড় কাঁহাকা।

হাতের হ্যামার উঁচাইযা ছোট মিস্ত্রী কহিল, খবরদার, মু সামাল করো।

বাবু দশ পা পিছু হটিয়া যায় আর কহে, মারবি নাকি রে বাপু?

ওদিকে পিছনে হাত বাড়াইয়া কলের ফটক খোঁজে।

মজুরদের একজন শূন্যে হাত হানিয়া কহে, লাগাও হ্যাম্মর, ফটাং ভস, আণ্ডা তোড় যায়।

জনকয় হাততালি দিয়া উঠে, যেন এ রুদ্র সঙ্গীতে তাল দিয়া যাইতেছে।

একজন প্রৌঢ়, সেও তেল-কালি-মাখা, সে আসিয়া ছোট মিস্ত্রীর উদ্যত হাতখানা ধরিয়া নামাইয়া লয়, মানাইয়াও লয়।

মজুরের একজন কহে, বড় মিস্ত্রী।

ওদিকে বাবু ফটক বন্ধ করিয়া শাসায়।

কাল যদি হামারা কল্‌মে মাথা গলায়েগা তো জুত্তি লাগায়ে গা, পুলিশমে দেগা। জবাব তোমারা।

বড় মিস্ত্রীর আকর্ষণের মাঝেও ঈষৎ পাশ ফিরিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ছোট মিস্ত্রী কহে, নেহী মাংতা হ্যায় তুমহারা নোকরি, কিস্মৎ থাকে আমার, কাল আবার তোরাই ডাকবি।

আপন বুকে ঘা মারে, দম্ভের ঘা।

গোষ্ঠ দাঁড়াইয়া উঠে, তাহার মনের দ্বিধা টুটিয়া যায়, সকল অন্তর তাহার যেন ওই ভাবধারা বুক পুরিয়া লইতে চায়।

দামিনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠে। জ্বলে, কিন্তু ওই জ্বলনের মাঝেও প্রসন্নতার আভাস পাওয়া যায়।

ঘাড়ে পাষাণ চাপানো নতদৃষ্টি বন্দী যেন ঊর্ধ্বে নীলাকাশের পানে, আলোর পানে চাহিবার উপায় দেখিতে পায়।

গোষ্ঠ কহে, বেশ ঠাঁই, হেথায় থাকা যাক্, কি বল ?

দামিনীর মুখপানে সম্মতির জন্য তাকায়।

দামিনীরও বেশ লাগে, হউক এ জীবন প্রেতের কিন্তু বন্ধহীন, হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিতে পারা যায় ; সেও ঘাড নাড়িযা সম্মতি দেয়, বেশ।

গোষ্ঠ আগাইয়া চলে মিস্ত্রী দুইজনেব দিকে।

ওদিকের ঝগড়া মিটিয়া গেল দেখিয়া মজুরের দল বস্তির পানে পথ ধরে।

দামিনী বসিয়া রহিল, অবসন্ন দেহে—শ্রান্তিতে, ক্ষুধায় ; কাল হইতে একটা দানাও পেটে পড়ে নাই, মানুষের ভযে লোকালয দিয়া পথ দিযা হাঁটে নাই, আসিয়াছে প্রান্তরে রেখাচিহ্নহীন বিপথ ধরিয়া।

হাওয়ায় ঘোমটা খসিয়া পড়ে, সেটা তুলিয়া দিতেও হাত উঠে না ; অবসাদ আসে ; অবসন্ন দৃষ্টিতে সম্মুখের ছবি বেশ ধরা পড়ে না, যেন ক্ষণে ক্ষণে মুছিয়া যায়, আবছায়ার মতো কাঁপে।

সমস্ত অন্তরাত্মা তাহার একটি দানাব জন্য কাঁদে !

তন্দ্রার মতো একটা আচ্ছন্নতা সর্বদেহ ব্যাপিয়া ফেলে, মাথাটা ঝুঁকিয়া পড়ে, ইচ্ছা করে ঘুমায়।

বউ !

দামিনীর ওই তন্দ্রা টুটিয়া যায, পিছন হইতে কে যেন ডাকে, বউ ! ফিরিয়া দেখে সুবল।

তেমনই সলাজ নত দৃষ্টি, কুণ্ঠিত ভঙ্গি।

দামিনীর সর্বদেহে একটা উত্তেজনা বহিয়া যায় ; ঋণমুক্ত খাতক যে উগ্রতায মহাজনের সম্মুখে দাঁড়ায়, সেই উগ্রতায়, সেই ভঙ্গিতে কহে, কি ?

ওই একটি কথায় সুবল কাঁপিয়া উঠে, সে কথা কহিতে পারে না, শুধু হাতটি বাড়াইয়া সম্মুখে ধরে, সে হাতও থরথর করিয়া কাঁপে। হাতে একটি ঠোঙা, তাহার

মধ্যে খাবার, সে কত কি! যত ভাল যত রকম মেলে, তত ভাল, তত রকম উপচারে সাজানো।

দামিনীর কথা ফুটে না।

তাহার সকল ক্ষুধা উন্মুখ হইয়া ওই উপচার ধরিতে চায়, ইচ্ছা করে, একই লোলুপ বিপুল গ্রাসে ওইগুলি গ্রাস করিয়া ফেলে।

তবু যেন কিসে বাধে; সে একাগ্র বিস্মিত দৃষ্টিতে সুবলের পানে চাহিয়া থাকে, ক্ষুধার তাডনায় সে দৃপ্ত মহিমা আর থাকে না!

দামিনীর ওই একাগ্র দৃষ্টি, এই নীরবতার মাঝে কি যেন সাহস পায়, সে কথা কয়। বলে, ছেলেবেলায় কুল খাওয়ার কথা মনে পড়ে না?

দামিনী হাত বাড়াইয়া ঠোঙাটি ধরে, সে যেন বারো বছরের অনভ্যস্তা বধূটির বয়সে ফিরিয়া যায়।

তারপরে সে কি বুভুক্ষার গ্রাস, সে যেন গিলিয়া খাওয়া!

সুবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কহে, বউ, আমিও হেথায় থাকব, আমার আর সেথায় কে আছে; আমি তোমাদের সঙ্গেই এসেছি।

দামিনীর অবসর হয় না, সে খায়।

সুবল সাহস পাইয়া কত বকিয়া যায়।

আমরা তো যেখানে থাকব সেইখানেই ঘর, এইখানেই ভিক্ষে করব।

দামিনী এতক্ষণে কহে, ছিঃ ভিক্ষে!

সুবল কহে, তবে মুড়ি-মুড়কির দোকান করব, অ্যাঁ, কি বল বউ? তুমি মুডি ভেজে দিও।

দামিনী কহে, বানি দিও। হাসিয়া দামিনী মাথায় কাপড টানিতে খুঁট খসিয়া পড়ে, হাতে বাজে সেই সেতুর বাঁধিয়া দেওয়া বালা দুইগাছা।

সুবলের ইচ্ছা করে, মুখে তুবডির মতো কথার ফুলঝুরি ছুটাইয়া দেয়; কিন্তু পারে না; কথা যোগায় না, শুধু অনেক চেষ্টায় বলে, সবই তোমাকে দোব বউ।

ক্ষুধাব নিবৃত্তিতে দামিনীর সহজ বৃত্তি জাগিয়া উঠে, তাহার মনে পড়ে সে দিনের কথা।

সে যেন পাগল হইয়া উঠে, হাত্তের অর্ধভুক্ত ঠোঙাটি মাটিতে আছাড মারিয়া ফেলিযা দিয়া কহে, আবার?

একদিনের ভুল ভুলে যাও ভাই বউ।

সুবলের চোখ ছলছল করিয়া উঠে, দামিনীর পা ধবিতে যায; সর্পস্পৃষ্টার মতো দামিনী পিছাইয়া যায়, বলে, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে।

চোখে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠে।

সুবল নত নেত্রে চলিয়া যায়।

দামিনী হাঁফ ছাডে, মনে বল পায়, অপরাধ যেন তাহার লঘু হইয়া গিয়াছে; কিন্তু উত্তেজনাটা কাটিয়া যাইতেই মন কেমন ম্লান হইয়া পড়ে।

সে বসিয়া ভাবে, ঠিক ভাবা নয়, কথাগুলা মনের মাঝে ঘোরাফেরা করে।

সুবলের যাওয়া-পথের পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকায়, দেখা মেলে না; মনে পড়ে, 'আমার আর সেথায় কে আছে, আমি তোমাদের সঙ্গেই এসেছি।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

অনেকক্ষণ পর গোষ্ঠ ফেরে, চোখ দুইটা লাল, হাত-পা নাড়ে একটু বেশি, কথা কয় বেশি।

দামিনী বুঝিল, নেশা মিলিয়াছে।

গোষ্ঠ সোল্লাসে কয়, উঠাও তল্পি।

দামিনী মুখের পানে চায়। গোষ্ঠ বলে, ঘরদোর কাজকম্ম সব ঠিক। কলে কাজ, ফিটার-মিস্ত্রীর কাছে; ছ'মাস পরে পঞ্চাশ-ষাট দিয়ে পায়ে ধরবে লোকে। তার ওপর মহান্তকে পেলাম, ভালই হলো, গাঁয়ে মায়ে সমান কথা, কি বল? কই, গেল কোথা? ওই যে ফিটার-বুড়োর সঙ্গে কথা কইছে। মহান্ত, ও মহান্ত, এস, এস, এই হেথা বউ রয়েছে।

আজ এই নিরাশ্রয়ের মাঝে আশ্রয়প্রাপ্তিতে মেজাজটা গোষ্ঠর দিলদরিয়া, ঈর্ষা-দ্বেষেব কথা মনে জাগে না; আর বিদেশে এই স্বদেশের অপ্রিয় জনটিও পরম প্রিয় আত্মীয় হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ হাতছানি দিয়া সুবলকে ডাকে; সুবল ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে।

দামিনী ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহার পানে তাকায়, আবার সেই উগ্র দৃষ্টি, সুবলকে দেখিয়া আবার দামিনীর অন্তর বিরূপ হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ আবার বলে, মহান্তও আর গাঁয়ে ফিরবে না গো, হেথা মুডি-মুডকির দোকান করবে, তা বেশ হ'ব, কি বল? তুমি মুড়ি ভেজে দেবে, ব'নি পাবে; দু'জনার রোজগার, আমাদের ভাত ভূতে খাবে এইবার।

দামিনী মুখ ফিরাইয়া লয়।

মহান্ত, বউকে নিয়ে এস ভাই, ঘরটা আমি দেখে নিই, মাসে দু'টাকা ভাড়াই নেবে।—বলিয়া গোষ্ঠ আগাইয়া চলে।

দামিনীও গোষ্ঠর পিছন ধরিয়া চলে, সুবলেব পানে ফিরিয়া চায় না পর্যন্ত; লাজুক লোকটি সঙ্গ ধরিতে সাহস করে না, তেমনই দাঁড়াইয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পর বলে, যা চলে, বয়েই গেল; এবার মলেও চেয়ে দেখব না। আমি মবব না, সব চেয়ে দেখব। কত হবে, এই তো কলির সন্ধ্যেবেলা।

কতক দূর গিয়া গোষ্ঠ পিছনে দামিনীকে দেখিয়া কহে, ওই!

কথার শব্দে ফিটার-বুড়া চোখ ফিরায়, ঘোলাটে চোখেব নিষ্প্রভ দৃষ্টি; ছোট মিস্ত্রীর রক্তবর্ণ চোখের দৃষ্টি ধকধক করে।

দামিনী মুখ ফিবায়।

ফিটার-বুড়া চোখ ফিবাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে; ছোট মিস্ত্রীর চোখ ফেরে না, গোষ্ঠর সম্মুখেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সঙ্কোচও নাই।

গোষ্ঠ কহে, মহান্ত কই?

জানি না। দামিনীর কথার সুরে একটা ঝাঁঝ। উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের একটা পিচ কাটিয়া ছোট মিস্ত্রী সোল্লাসে কহে, ভারী ঝাঁঝালো বউ হে; বাঃ। চলিতে চলিতে মাথা নাড়িয়া যেন উপভোগ করিতে করিতে সে আবার কহে, ঝাঁঝালো মেয়েলোকই ভাল হে; তা না প্যানপ্যান—চোখের কোণে নোনা পানি, দূর! ঝাড়ু মার, দু'চক্ষে দেখতে পারি না আমি।

দামিনীর পানে আবার সেই রক্তবর্ণ লোলুপ দৃষ্টি হানে।

দামিনীর ইচ্ছা করে, চোখ দুইটি টিপিয়া গালিয দেয়।

বড়ো মিস্ত্রী শুধু বলে, আঃ!

ছোট মিস্ত্রী হি-হি করিয়া হাসে, বলে, বাবা, মাছ সব পাখিতেই খায়, মাছরাঙাই ধরা পড়েছে, দোষ আমাদের—ঢাকু ঢাকু করি না, পেটেও যা, মুখেও তাই।

দামিনী থমকিয়া দাঁড়ায়।

গোষ্ঠ বলে, এস।

না, আমি যাব না।

কি? হলো কি?

আর কোথাও চল।

গোষ্ঠ বিষম চটিয়া কহে, ট্যাঁকে আমার ট্যাঁকশাল ঝমঝম করছে, আর কোথাও চল! ব্যাডব্যাড করতে হবে না, এস। ওদের কথা অমনই।

ছোট মিস্ত্রী তবু হাসে।

মজুরের বস্তি, কুলী-হাট সব?

ছিটে-বেড়ায় ঘেরা, উলুখড়ের ছাউনি; ছোট ছোট ঘর, শুইলে এ দেওয়ালে মাথা ঠেকে, ওদিকের দেওয়ালে পা ঠেকে; দাঁড়াইলে চালে ঠেকে মাথা, একেবারে মাপা, যে লোক বেশি লম্বা, সে নাকি অনাসৃষ্টিব সৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া।

এক এক আঙিনা ঘেরিয়া তিন-চারি ঘরেব বাস; এক একজনের দুটি কুঠরি, একটি বারান্দা, তাই ঘিরিয়া রান্না হয়।

উহারই ভাড়া মাসে দু'ট'কা; কলেব মালিক মাস মাস বেতন হইতে কাটিয়া লয়।

এ আঙিনায় থাকে তিনজন; পূর্বদিকে ফিটার-বুড়া, দক্ষিণের ভাগটায় ছোট মিস্ত্রী, পশ্চিমের খালি ভাগটা মিলিল দামিনী আর গোষ্ঠর অদৃষ্টে।

দামিনী কহে, এ যে অন্ধকূপ, আলো নাই, বাতাস নাই, ভিজে জ্যাবজ্যাব করছে।

এরই ভাড়া মাসে দু'টাকা—বত্রিশ আনা—একশো আটাশ পয়সা। যেখানকার যা, শহরের এই বটে।

ঝাঁটা মার শহরের মুখে, এ যে বুকে চেপে ধরেছে!

তাও ভাল, ঘাড় তো ধবছে না কেউ।

ওপাশ হইতে ছোট মিস্ত্রী নেশার ঝোঁকে মাটিতে চাপড় মারিয়া কহে, কভি নেহি, কোইকো এক্তিয়ার নেহি হ্যায়।

গোছগাছ কর তুমি।

দামিনী সংসার পাতিতে বসে।

ঘরের মাঝে সে শুধু বসিয়া ভাবে, অভাব যে ষোল আনার—চাল, ডাল, জল, হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি সব কিছুরই।

শুধু সে খুঁটে বাঁধা সেই বালা দুইগাছা নাড়ে-চাড়ে আর কাঁদে।

ওপাশে গোষ্ঠ ছোট মিস্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া গল্প করে, ওই সেই কথা। ছোট মিস্ত্রী বলে, মালিক কই নেহি।

উত্তেজনায় বাঙালী হিন্দী বাত ঝাড়ে।

গোষ্ঠ বলে, মালিক ভগবান!

নেহি, ভগবান কৌন হ্যায়, ভগবান রহনেসে দুনিয়াকো এইসা হাল হোতা, কেউ দুধ ভাত খেত কেউ এঁটো পাত চাটত?

গোষ্ঠ চুপ করিয়া যায়, মন যেন সায় দেয়, কিন্তু স্বীকার করিতে ভয় হয়, সংস্কার চোখ রাঙায়।

বস্তির প্রতিবেশীর দল আসিয়া জুটে, ফায়ারম্যান, রেলের পয়েন্টস্‌ম্যান, জমাদার, পদস্থ কুলীর দল সব।

ছোট মিস্ত্রী পরিচয় করাইয়া দেয়, এ ফয়রমন, এ পাইন্টমন, ঈ—

পয়েন্টস্‌ম্যান গান ধরিয়া দেয়—

বৃন্দাবনের কিষণলাল মথুরার রাজা,
সেথায় খেতেন লঙ্কা ছাতু হেথায় খান গাঁজা।

ফায়ারম্যান ঢোলকটা পাড়িয়া ধমাধম বেতালা বাজনা জুড়িয়া দেয়।

আর একজন মাথায় হাত দিয়া নাচে

এমনই তাণ্ডবের মাঝে পরিচয় হয়। গোষ্ঠর অন্তর কেমন কাঁপাইয়া উঠে। জমাদার চেঁচায়, এ বইঠ যাও, বইঠ যাও।

শেষে নৃত্যপর ব্যক্তিটির হাত ধরিযা টানিযা বসাইয়া দিয়া কহে, গাঁজা তৈয়ার করো।

পয়েন্টস্‌ম্যান সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করিয়া হাত পাতে, গাঁজা টিপিতে টিপিতে টেপার সঙ্গে জোর দিয়া কহে, সা-ত কা-ট, ন-য় টি-প, ত-বে হ-বে গাঁ-জা ঠিক।

ফায়ারম্যান এতক্ষণে গোষ্ঠর সঙ্গে আলাপ করে, বাড়ি কোথা ভাই?

সে অনেক দূর, খাটতে এসেছি খাটব, থাকব, ব্যস্‌।

তবু কি নাম গাঁয়ের?

সে কথা আর ছেড়ে দাও, সেথার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে এসেছি আমি।

তবু—

এবার চটিয়া গোষ্ঠ কহে, বাড়ি আমার নাই।

ও বাবাঃ, চটছ কেন হে? আঃ আঃ, উ কি করলি, কাট্, গাঁজাটা কাট্, তবে তো ঠিক হবে। তা নামটি কি তোমার?

গোষ্ঠ নামটা গোপন করতে চায়, মনে মনে একটা নাম খোঁজে।

গাঁজার কলিকা চলে।

টানিতে টানিতে গোষ্ঠ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে, কাঙালী, আমার নাম কাঙালী; হাম কাঙালী তো হ্যায়, হামারা নাম কাঙালী ঘোষ। বাড়ি হ্যায় নিশ্চিন্দিপুর—নিশ্চিন্দিপুর। বলিয়া আপন মনেই হা-হা করিয়া হাসে।

ফায়ারম্যান বলে, সচ বাত নেহি হ্যায়; কাঙালীভি ঝুটা, নিশ্চিন্দিপুরভি ঝুটা।

পয়েন্টস্‌ম্যান বলে, ফেরারী নাকি হে?

খবরদার!—গোষ্ঠ মারিতে উঠে।

গাঁজায় দম দিতে দিতে পয়েন্টস্‌ম্যান কহে; ঠারো ঠারো, ইস্টিম হামকো লেনে দাও। আও, আব চলা আও।

ফায়ারম্যান হাততালি দিয়া উঠে, লাগে পালোয়ান লাগে।

মিস্ত্রী হাত ধবিযা গোষ্ঠকে মানাইযা লয, বস বস, ভাই বেবাদাবের সঙ্গে ঝগডা কবে না।

জমাদার বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মান যাও ভাই, মান যাও।

ফায়ারম্যান দাঁত মেলিয়ে হাসে, পয়েন্টস্‌ম্যানও হাসে, যেন কিছুই হয় নাই।

চিৎকার শুনিয়া দামিনী বাহিরে আসিযা দাঁড়ায়।

ফায়ারম্যানের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে, চোখ দুইটা জ্বলজ্বল করিয়া উঠে; সে শুধু আঙুল দেখাইয়া কহে, আরে!

জমাদাব কহে, এ ভেইয়া, ই-কাঁহাকা আমদানি?

একজন গান ধরিয়া দেয়, গোবর-বনে কোন্ কারণে ফুটল কমলফুল!

পয়েন্টস্‌ম্যানটা চিত হইয়া শুইয়া পডিয়া বলে, জান গিযা মেরা, জান গিয়া। কথাগুলা প্রায়ই সব একসঙ্গে উপরে উপরে পড়ে।

গোষ্ঠ আবার লাফাইয়া উঠে, পয়েন্টস্‌ম্যানটাকে বিশেষ করিয়া শাসায়, জিভ ছিঁড়ে নেব।

ওদের ভযও হয় না, লজ্জাও হয় না, হি হি করিয়া হাসে; যুগান্তব্যাপী তমসার মাঝে ওই নির্লজ্জ হাসির কুৎসিত রূপ যে উহাদেব চোখে কখনও পড়ে নাই।

পয়েন্টস্‌ম্যান আবার বলে, এ তুমি খাঁটি কারও কপালে তেঁতুল গুলেছ বাবা।

গোষ্ঠ আর সেখানে দাঁড়ায় না, দামিনীকে টানিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবে। দামিনী নির্বাক।

তখনও ওদের কথা শোনা যাইতেছিল, পঞ্চাশ টাকা বাজি, ফেরারী না হযতো কি বলেছি!

এত কোলাহলেও বাহির হয় না বড় মিস্ত্রী।

লোকটা যেন কেমন, কাজের শেষে ঘরে আসিয়া ঢোকে, আবার বাহির হয় কাজের সময়। বাঁধাধরা কাজ কয়টি ছাড়া আর যেন দুনিয়ায় কিছু নেই, লোহার মতন শরীর, লোহা পেটা কাজ, যেন একটা যন্ত্র, ও যেন বস্তির অতীতের ধারা, বর্তমানকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া ক্ষীণ যোগসূত্রের মতো পড়িয়া আছে।

তবু লোকটার মাঝে কি আছে, ওই নিস্পন্দতার মাঝখানে যেন বিপুল উদ্দাম কিছু আছে। দেখলে ভয় হয়।

সহসা গোষ্ঠ কহে, নাঃ হেথা আর থাকব না।

দামিনী অকূল চিন্তার মাঝ হইতে কহে, কোথায় যাবে? যেন সে কূল পায় না।

গোষ্ঠও হতাশ হইয়া কহে, কোথায় বা যাব? সবারই গতিক যে ওই। রাস্তায়, ঘাটে, সবখানে, দেখলে না ভদ্দরলোকদের চাউনি?

নিরাশ্রয় দুইটি নরনারী ব্যাকুল অন্তরে অন্তর্দৃষ্টি হানিয়া একটা নিরুপদ্রব নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিশ্বসংসার খুঁজিয়া ফেরে।

হঠাৎ গোষ্ঠ আগুন হইয়া কহে, ফের যদি তুই বাইরে বেরুবি তো খুন করে ফেলব বললাম।—বলিয়া সে দুয়ারটায় শিকল দিয়া বাহির হইয়া যায়।

ঈষৎ ম্লান হাসি ক্ষীণ রেখায় দামিনীর অধরপ্রান্তে আসিয়া আবার মিলাইয়া যায়।

নিরুপায় ওই আশ্রয়টুকুই আঁকড়াইয়া ধরে।

আধার ভেদে আধেয়ের রূপ পাল্টাইয়া যায়।

এই দুইটি নরনারীর জীবনধারা যেন কাঁদনভরা করুণ কীর্তনের সুরে চলিতে চলিতে সহসা খেয়ালের সুরে চলিতে শুরু করিল.

অন্ধকার ঘরে দামিনী তাহা অনুভব করিল, কিন্তু গোষ্ঠের কোন ভ্রূক্ষেপ হইল না।

সে কলে খাটে, বয়লারে কয়লা ঠেলে, বাঁকানো হাঁটুর উপরে কনুইয়ের চাপ দিয়া হাতলভরা কয়লা তোলে, আর বয়লারের অগ্নিগহ্বরে ঝপাঝপ মারে, শেষ হইলে ঘডাং করিয়া মুখের ঢাকনিটা বন্ধ করিয়া মাথায় জডানো গামছাটায় কপালের স্বেদ মুছে, পা দুইটি ছড়াইয়া বিড়ি টানে।

জ্বলন্ত আগুনের সঙ্গে লড়াই, ভ্রূক্ষেপও নেই, আক্ষেপও নেই।

গোষ্ঠ বলে, আমার বেশ লাগে।

গাঁজাটা যেদিন বেশি টানে, সেদিন বুকের তাণ্ডব যেন বাড়িয়া উঠে, কহে, বহুৎ আচ্ছা, এই তো আগকে সাথ ফাগ খেলা রে ভাই। আমি দিই কয়লা, ও ছিঁটোয় আঁচ। মার ফাগ, হেঁই রে।

সে কয়লা মারে, হুহু করিয়া আগুনের আঁচ আগাইয়া আসে। গোষ্ঠর কৌতুক লাগে, সে হাসে।

ওই উত্তাপে সব যেন আগুন হইয়া উঠে, বক্ষে রক্ত, চক্ষে ধরা শরাখানার মতোনই তুচ্ছ ঠেকে।

ওদিকে হাউজের ধারে মেয়েরা সব কাজ করে, স্টীম-পাইপের গোল হাতলটা ঘুরাইয়া হাউজের মুখে গরম ভাপ ছাড়িয়া দেয়। মেয়ের দল ছুটিয়া পালায়, উ উ বাবাঃ লো!

গোষ্ঠ হাসে, ছোট মিস্ত্রী হাসে।

মেয়েরা গালি দেয়, মর মুখপোড়া, উ কি আমোদ নাকি?

উহাদের আমোদ বাড়ে।

কাজের শেষে, কয়লায কালো, আগুনে ঝলসানো দেহ, শুষ্ক বক্ষে মরুতৃষ্ণা লইয়া সে যখন মদের দোকানের পানে ছুটে, তখন সে যেন একটা অর্ধদগ্ধ শব, প্রেতত্ব লইয়া চিতা হইতে জাগিযা উঠিয়াছে।

সমগ্র বিশ্বমানব-সভ্যতার ধারা এ মূর্তি দেখিযা বোধ করি শিহরিয়া উঠে। এ যে তাহারই আর একটি অন্য দিকের রূপ।

ওই উন্মত্ত আচরণ বুঝি বিশ্বসভ্যতার কাহিনী কয়।

ওই সুপ্রকট কঙ্কালের মালাব আখরে বুঝি তাহার ব্যর্থতার ইতিহাস লেখা।

সে কপট ঘৃণায মুখ ফিরাইয়া ওই দৃশ্য দেখিতে বাঁচিযা থাকে। কলের ঘরে তখন তহবিল মিল হয, টাকা বাজে ঝমাঝম।

গোষ্ঠর মজুরি মিলে বারো আনা।

অর্ধেক তার নেশায় যায়, বাকি ছয় আনা দামিনীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিযা কহে, ওই নে।

আর 'তুমি তোমাব' নয়, এখন 'তুই তোর'; বুকে মুখে সবেই আগুন ধরিয়াছে, ভাষা পর্যন্ত ওই আগুনের আঁচেই বুঝি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যায় এ রূপ আরও বিকট ভযাল হইযা উঠে; এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষগুলার বুকের নগ্ন পশুত্ব বিপুল তাণ্ডবে জাগিযা উঠে; জাগে তো অবিরাম, কিন্তু অন্ধকারে বুঝি আবরণের সুযোগ পায়; উন্মুক্ত আলোকে লজ্জা হয়। এতটুকু লজ্জার রেশ আজও আছে; ওইটুকুই বুকের মানুষটির অতি ক্ষীণ অবশেষের পরিচয় দেয়, ওই এতটুকুই আজও আছে যে।

ওপাশে বাউরীপাড়ায় সে কি কোলাহল! ঢোল বাজে এক তালে গান হয় অন্য তালে, এক সঙ্গে চার-পাঁচজন গায়। রাখনা গায়, ইস্কাপনের টেক্কা রে প্রাণ রুহিতনের টেক্কা! নিতাই ধরে, বনের ফল খাও রে কানাই, ফল এনেছি চেখে চেখে। শশন ওরফে শশধরের আজ আধবাটি মদ পড়িযা গিয়াছিল, সে সেই তখন হইতেই করুণ সুরে গাহিতেছে, আধ বাটি মদ প—ড়ে গে—ল আধ বাটি প—ড়ে গে—ল হায় গো! ওই তাহার গান, তাহার বিরাম নাই।

মেয়েরা রাস্তার ধারে বসিযা জটলা পাকায়, পরনে এখন চওড়াপাড় মিহি শাড়ি, অল্প চুলে যোগান দিযা খোঁপা বাঁধা, দীপ্তিহীন চক্ষে অন্ধকারের মাঝেও বক্ষের উদগ্র ক্ষুধা জ্বলজ্বল করে। কিন্তু ওই জ্বলজ্বলে চক্ষু শুধু তো মানুষের পথ পানে চায় না,

চায় সে রজতের ঔজ্জ্বল্যের পানে। চক্ষে ওই জ্বলজ্বলে দৃষ্টির মাঝে শুধু বুকের ক্ষুধাই নেই, পেটের জ্বালায় ভোগের লিপ্সাও জ্বলে।

ওরা বলে, কত ভাগ্যে মনুষ্য জন্ম, পেটে খাব না, গায়ে পরব না তো করব কি ?

লক্ষ্য যে ওদের অন্ধকারে ঢাকা। ওদের পাপের ভয় শুধু দেবতার ঘরে উঠিতে, পূজা-করা ফুল পায়ে ঠেকিলে।

আর কোন পাপ ওদের মনে ছাপ মারে না; জীবনের ধারার জন্য দুঃখ নেই, অনুশোচনা নেই, আসলে পাপপুণ্য মানে না।

সাবি কপালে হাত বুলাইয়া বলে, উঃ কপালটা ফুলে উঠেছে ভাই, পাশের বাড়ির মেজো বউ—

মাতুরী চিবাইয়া চিবাইয়া বলে, কার পায়ে মাথা ঠুকে লো ?

সাবি ঠোঁটের ডগায় তাচ্ছিল্যের পিচ কাটে। এত নেকন, বলে যে সেই—পায়ে ধরতে পারলে সখি, ঘুঁটে কুড়োতে পড়ে থাকি !

তবে ?

ওই মুখপোড়া বুড়ো ভালুক খাতাঞ্চী লো। বলিয়া হাসিয়া সারা, কৌতুকে কথা আর শেষ করিতে পারে না, ঠুই করে ঢেলিয়ে দিলে, আর চোখের সে কি ইসেরা, সূর্যিমামা ডুবুডুবু। আবার হি-হি হাসি।

তুই কি বললি ?—কৌতুকব্যগ্র প্রশ্ন হয়।

সন্ধ্যাবেলায় টাকা-ভরা বাক্সটা দেবে ? অমনই মুখখানা চুন, বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

পাড়ার ভিতব পাঁচীব ঘবে কোলাহল উঠে, জমাদার আর ফায়ারম্যানের গলা শোনা যায়।

খবরদার।

খবরদার।

সব ছুটিয়া যায়; তখন যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে, জমাদারের হাতে ঝাঁটা, ফায়ারম্যান একখানা বাঁখারি লইয়া পরস্পরকে মারে।

সকলে হাততালি দেয়, হাসে। পাঁচী গালি দেয়, নেমে যা বলছি আমার ঘর থেকে, বাঁশমুখো কালোমুখো। কি বিপদ মা ঝাঁটাগাছটা সুদ্ধু নিয়েছে, দে তো ভাই পরী, তোর ঝাঁটাগাছটা—

কে শুনিবে ?

পশ্চিম পাড়ায় উচ্চতব শ্রেণীর বাস, সেখানে আড্ডা বসে কোন দিন ছোট মিস্ত্রীর ঘরে, কোন দিন স্টেশনেব ধারের সেই বটতলায়। গল্প করে বুড়া ড্রাইভার; খালি গা, পরনে চৌকণা ঘরকাটা লুঙ্গি, গলায় কালো কারে বাঁধা রূপার তক্তি, বাহুতে একটা; দক্ষিণ মণিবন্ধে শুধু কার চার ফেরা করিয়া বাঁধা। প্রত্যেক পেশীটি সুপ্রকট, বুকখানা বোধ করি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ ইঞ্চি।

দেখো ভাই, হামারা উমর হুয়া বহুত, দেখা হায় বহুত। কেতনা ধরমঘট হুয়া পহেলে, কেতো আদমী ভুঁখাসে মর গিয়া, দানা নেহি মিলা, পানি—শুধু পানি পিয়ে ধরমঘট চালায়া; আখের মে হুয়া কি; কোইকো নোকরি গিয়া, কোইকো জেহেল হুয়া, যিসকো নোকরি নেহি গিয়া উসকা তলব কম হো গিয়া।

ছোট মিস্ত্রী বলে, সে তো বটেই, প্রথম যারা কষ্ট করে গিয়েছে, তাদের দৌলতেই আজ যেটুকু হয়েছে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ফেলে সবাই। সে দীর্ঘশ্বাস বোধ করি অতীতের সহকর্মী নির্যাতীত বন্ধুদের প্রতি উহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফায়ারম্যান বলে, আরে আজকাল তো বহুত সুবিধা, ধরমঘট বললেই হলো।

ছোট মিস্ত্রী বলে, হ্যাঁ, এখন আর—

কথার উপর দিয়া গোষ্ঠ বলে, এখন আর তখন—এ তফাত বড় কিছু হয় নাই। তখন ধমক দিয়ে কাজ সারত, আর এখন ফন্দি করে—

ফন্দি-টন্দিতে বড কিছু হবে না, আর সে গুড়ে বালি—

বালি দিলে ওরা জলে গুলে গুড়ের পানা করে নিতে জানে। আচ্ছা, মুখে তো বল হীরে আর জিরের দামের তফাত মানুষের করা—

আরে সে তো বটেই, জানের দাম তো সবারই সমান। তবে সমান দামে আমরা বিকুতে পারি না, সে দোষ কার বলব?

নসিবের!

কে জানে! ছোট মিস্ত্রী বসিয়া ভাবে, কথাটা তার মনে ধরে না, দুর্বল রিক্ত মস্তিষ্কও ইহার সমাধান করিতে পারে না; তাহার পর সমস্ত সংস্কারের তমসায় আচ্ছন্ন, দৃষ্টি আর যায় না।

গোষ্ঠ বলে, দাদা রে, বুদ্ধি যার বল তার, আর দুনিয়ার মালিক সে চিরদিন।

ড্রাইভার বলে, জরুর, বুদ্ধিকে মারে সব হোতা হ্যায়। একদফে কেয়া হুয়া। শুনো। হুযা কি, এক দরখাস হামলোক দিয়া কি, দেশোয়াল ড্রাইবর, ফযারম্যানকো গ্রেড বাড যায়, ডিপার্টমেন্টকো সব কোইকো সাথ সমান হো যায়; নেহি তো হামলোক কাম ছোড় দেবে।

ধর্মঘট হলো তা হলে?

নেই হলো, দরখাসকো আচ্ছা হুকুম নেই হোনেসে হোবে এই ঠিক হলো। হাঁ উসকে বাদ তিন ডিবিসনকে তিন ডি.টি.এস. বাহাল হলো, দরখাসকে হাল মালুম করনেকে লিয়ে।

হ্যাঁ, হলো তো ঘোড়ার ডিম?

না ভেইয়া, বহুত বাত আছে; হাঁ, হুযা কি, ওহি তিন সাব লোক হুকুম দিয়া কি, সব ডিবিসনসে দেশোয়াল আদমীর তিন তিন সর্দার হাবড়েমে ভেজ দেনা, হুঁয়া সাব লোকका সাথ বাত হোগা। হাঁ, দেশোয়াল লোক তো গেইলো, থাট কিলাসমে; ময়লে ওদের লুগা, বিড পিতা, উ লোক জরুর থাট কিলাসমে যাবে। হাঁ, হাবডেমে

মুলাকাত তো হুয়া। দেশোয়াল লোক বোলা, সাব দেখো, ভুঁখামে ময় লোক মর যাতা, লুগা না মিলতা; মে-লোগনকো তিয়াষকো পানি না মিলি, দেশোয়াল মাটি পাত্থর তোরকে লাইন বানাতা, উসকে শিরমে লোহে গিরতা, কাঠ গিরতা, জান দেতা, আওর—, সাব বোলা, ই তো ঠিক বাত, জরুর তুমহারা তলব বাড় যায়গা।

গোষ্ঠ বলে, বাস্ ওই বলে ভুব্কি দিয়ে চলে গেল।

নেহি উস বখৎ টিফিনকা টায়েম হুয়া রহা সাব বোলা, বহুত আচ্ছা টিফিনকো বাদ ইয়ে বাত হোগা, যাও বাবালোক, তুম লোগভি টিফিন করকে আও। সাব সব কইকো এক এক রূপৈয়া দিহিস। টিফিনকে বাদ সাব পহিলে পুছা কি, তুম কেয়া খায়া, কেতনেকো খায়া, কোই খায়া চার পয়সেকা সত্তু, এক পয়সেকা নিমক, পয়সে ভর মরচাই; কোই খায়া চার পয়সেকা চানা। লেকেন দো আনেকা জাস্তি কোই নেই খায়া, আওর চৌদ্দা আনা কোই জেবমে, কোই লুগামে বাঁধ্লিয়া। সাব বোলা, ময় কেতনোকা খায়া জানতা—চার রূপৈয়া। ওহিমে বস্ সব মাটি হো গিয়া, তলব কুছ যাস্তি মিলা লেকেন সমান না মিলা।

বাঃ রে! আমার মেহন্নত, তার দাম আমি পাব, সে পয়সা খরচ করি না করি আমার খুশি।

বেশি খেতে, ভাল খেতে, কেউ জানে না, ভাল বাড়িতে থাকতে কেউ ভালবাসে না!

ওহি তো ভেইয়া, খায়া নেহি কাহে? রূপৈয়া ভোর খানেসে তো জরুর বহুত জাস্তি তলব মিল যাতা।

নেহি মিলতা, টাকা ভর খেলে কি বলত জান, বলত, যত পাবে ততই খাবে; পয়সা তোমরা রাখতে জান ন, দিয়ে কি হবে?

আরে বাপু, এতদিন না খেয়ে যে পেট মরে আছে, আজ যে খেতে ভয় লাগে, হজম হবে না, মনে যে হয়ই না, এমনই ভাল চিরদিনই খেতে পাব।

ভেইয়া, হুয়া তো লেকিন এহি; আর ইয়ে হাল উলট যাগা কব, কৌন জানতা!

ছোট মিস্ত্রী কহে, আবার তোমরা বল—

বাত চলতা হ্যায়, মালুম হোতা ধরমঘট চলেগা, তামা—ম দেশোয়াল এক সাথমে কাম ছোড় দেগা। চার বাবু আয়াথা উ রোজ, মুশকিলকে বাত ইয়ে হ্যায় কি, গরিব আদমী তামাম, ধরমঘটকে বখত খানে নেহি মিলতা। বাবুলোক কুছ কুছ দেতা হ্যায়, হাম লোককা তরফসে বাতভি করতা হ্যায়; আওর কোই কোই ঘুষভি খা লেতা হ্যায়।

উ লোক জরুর ঘুষ খায়েগা ভাই; বিনা গরজে ওরা এক পা হাঁটে না।

গোষ্ঠর মনে জাগে জমিদারের কথা, মহাজনের কথা সকলেরই মনে জাগে।

দোষ নেই; যুগ-যুগান্তর যাহারা ইহাদের লুটিয়া খাইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস করিবার মতো শক্তি ইহাদের নেই। কথাটা এত খোলাভাবে ইহারা বুঝে না, কিন্তু জন্মগত সংস্কার, অহি-নকুলের জন্মগত বিরোধের মতো।

হঠাৎ ছোট মিস্ত্রী বলে, তোমরাও লাগাও, আমরাও লাগাব, ধর্মঘট কবব, জরুর করব; সাবাদিন খেটে এক টাকা, বার আনা, আট আনা পয়সা, নেহি চলেগা। জরুব ধর্মঘট করব।

গোষ্ঠ কহে, মুশকিল ওই বাউবী বেটাদের নিয়ে; কিছুতেই ঘামবে না, ওরা বলবে, বেশ চলেছে ভাই, কে হাঙ্গামা করে!

না করে তো মজা দেখাব।

রাত্রের কথা রাত্রের অন্ধকাবেই ডুবিয়া থাকে ন' অভাবেব তাডনায় বুকের মাঝে কর্মেব সময়ে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, কে জানে!

প্রভাতে আবাব সব কাজে ছোটে।

সারাটা দিন আবাব গা দিযে ঘাম ঝরে, দুবন্ত রৌদ্রে দেহ তাতিযা উঠে, আগুনের আঁচে ঝলসায, বুকেব রক্ত শুকায়।

কাজেব শেষে, বেলা চারটায় আবাব অবসন্ন দেহে আসিযা অফিস-ঘরে হাত পাতিয়া দাঁডায়।

খাজাঞ্চীব তবু অবকাশ হয না, বলে দাঁড়া বে বাপু, ঘোডায চড়ে এলি যে সব! তিন পয়সা আব দুই পযসা পাঁচ পয়সা—আবে গেল, এই চাপবাসী, এ লোককে ভাগা দেও তো।

অফিস-ঘবেব ঘডিটা অবিরাম চলে টুকটাক টুকটাক; সে হিসাব দেয়, দিনেব এগারো ঘণ্টা, বাবো মিনিট, ছত্রিশ সেকেন্ড গেল—

গোষ্ঠ বলে, চাবটে বেজে বারো মিনিট, গোটা দিনটাই গেল—

ছোট মিস্ত্রী বলে, একটা দিন যায় আর আমাদের পেরমাই যায় ক'দিন, তাব হিসেব ও ঘডিতে মিলবে না।

সত্য কথা, ইহাদেব জীবনেব যে কত ঘণ্টা গেল, তাহার হিসাব ওই ঘডিটা দিতে পাবে না, সে গতিতে ছুটিতেও পারে না।

সেদিন তখন দশটা বাজে।

বয়লারের গর্ভে আগুন জ্বলে, উৎপাদিত বিপুল শক্তি গুমগুম শব্দ করে।

শ্রমিকের দল আপন আপন কাজে লাগিযা যায।

কলের ছোট-বড় চাকাগুলা ঘুরিতে শুরু করে, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত—দ্রুততব।

দাঁতওয়ালা চাকাগুলো দাঁতে দাঁত মিলিয়া অবহেলে ওই বিবাট লোহার রাজ্য চালাইয়া চলিয়াছে, শ্রান্তি নেই, বিবক্তি নেই, অবসাদ নেই।

গোষ্ঠ বযলাবটার পানে তাকাইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে আপন মনেই বলে, ঠিক ওই ভুঁডে মালিকদেব মতো, দুনিয়াটা দাঁতে দাঁতে টেনে গিলেই চলেছে গিলেই চলেছে; অরুচি নেই, বিরাম নেই, অবিরাম।

একটা ছেলে আসিয়া কয়খানা কাগজ দিয়া যায়, গোষ্ঠ কহে, কি রে?

ছেলেটি সরিয়া যাইতে যাইতে কহে, চুপ। ম্যানেজার দেখতে পাবে, পড়ে দেখ না।

গোষ্ঠ কাগজটা পড়ে, শ্রমিক মিলিত হও।

গোষ্ঠ তাচ্ছিল্যভরে কাগজখানা বয়লারের মুখে ফেলিয়া দিল, সেখানা অগ্নিগর্ভ লৌহপুরীটার আঁচেই হইয়া গেল তামাটে, সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়াইয়াও গেল। এমন কাগজ প্রায়ই পাওয়া যায়, ওই বাবুরা দেয়।

অন্য একজন ফায়ারম্যান কিন্তু সেটা মন দিয়া পড়ে।

এমন সময় সেখানে আসিয়া পড়িল মাদ্রাজী ম্যানেজার।

ম্যানেজার আসিয়াই কহে, সব ঠিক হ্যায় টিণ্ডাল ?

হেড ফায়ারম্যান—টিণ্ডাল, সে সেলাম বাজাইয়া কহে, হাঁ হুজুর, সব ঠিক হ্যায়।

স্টীম কেতনা ?—বলিয়া ম্যানেজার নিজেই উপরের মিটারটার পানে চাহিয়া দেখে।

সহসা ম্যানেজারের নজরে পড়ে ওই ফায়ারম্যানের হাতের কাগজখানা, উত্তপ্তকণ্ঠে সে কহে, উ কেয়া হ্যায় ?

ফায়ারম্যানটি কহে, একঠো কাগজ হুজুর।

কেয়া লিখ্‌খা উসমে, মিল তোড় দাও, স্ট্রাইক চালাও।

নেহি হুজুর, এক সাথ মিলানেকো লিয়ে লিখ্‌খা হুয়া হ্যায়।

হাঁ হাঁ, ওহি বাত হ্যায, ইউনিয়ন করনেকা লিযে লিখ্‌খা হ্যায। কোন্ দিয়া হ্যায় ?

রাস্তামে মিল গিয়া হুজুর।

লায়ার, ঝুটা বাত, সচ কহো।

এবার সাহেব মাটিতে পা ঠোকে।

অগ্ন্যুত্তপ্ত শ্রমিক, তাহারও প্রাণে এ আঘাত সয় না, তাহার মনে হয়, ও লাথি মাটির বুকে তো নয উহাদেরই বুকে পড়িল। গোষ্ঠ গম্ভীর কণ্ঠে কহে, গালি মত দেনা হুজুর।

ছোট মুখে বড় কথায় ম্যানেজারেরও মেজাজ গরম হইয়া উঠে, সে হাতের বেতটা সপাং করিয়া গোষ্ঠর পিঠে বসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

যাইতে যাইতে কি ভাবিযা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একটা টাকা গোষ্ঠের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার চলিয়া যায়, যাইবার সময় মোলায়েম সুরে বলিয়া যায়, ওইসিন কাগজ মিলনেসে বয়লারকো অন্দর ফেক দেনা, মগজ বিগড যায়েগা।

বেতের জ্বালায়, অপমানের দাহে গোষ্ঠ গুম হইয়া বসিয়া থাকে। ওই বয়লারটার শব্দ যেন ওর আহত বুকের মাঝে বাজে ; ক্ষণপরে সহসা বয়লারটার ঢাকনিটা খুলিয়া অপমানের দাম ওই তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়িযা দেওয়া টাকাটা বিরাট অগ্নিতাণ্ডবের ভিতরে ফেলিয়া দেয়।

রূপাটা গলিয়া গলিয়া গড়াইয়া জ্বলন্ত কয়লাব চাপের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া যায়, গোষ্ঠ একদৃষ্টে তাই দেখে।

টাকাটার ওই গতিতে তবু তাহার মনে সান্ত্বনা আসে।

মুক্ত দ্বারপথে বয়লারের আগুন যেন বিকট শব্দে বিশ্বগ্রাসে আগাইয়া আসিতে চায়।

রক্তচক্ষে গোষ্ঠ আপন মনেই কহে, পারবি, বাইরে এসে সারা সৃষ্টিটা অমনই করে গলিয়ে ফেলতে পারবি? দূর দূর, লোহার ঢাকনিটাই ফাটাতে পারিস না, তা সৃষ্টি! মানুষের গোলাম তুই; আবার বলে, আগুন দেবতা!

অসম্ভব জোরে সে লোহার দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, বলে, মর, ওরই ভেতর গুম্‌রে গুম্‌রে মর্।

অন্য সঙ্গী কয়টি তাহারই পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে, একটা সহানুভূতির দৃষ্টি সকলেরই চক্ষে, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার ভাষা যেন পায় না, অক্ষমতার দোহাই দিয়া সান্ত্বনা দিতে মন বুঝি উহাদের আর উঠে না, গোষ্ঠ আপন মনেই বুকের উষ্ণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া যায়, ঠিক আমাদেরই মতো, বুকের আগুন বুকের মাঝে অমনই গুমগুম করে, বেরিয়ে আসতে পারে না।

এইবার টিণ্ডাল একটা কথা খুঁজিয়া পায়, কহে, আসবে রে আসবে একদিন; বাবুরা বলে শুনিসনি?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে গোষ্ঠ বলে, হ্যাঁ, বেরুবে যেদিন, সেদিন আর এই হাড়-পাঁজরাগুলো থাকবে না। আমাদের পোড়াতে আর আগুন লাগবে না, আর পোড়াবেই বা কে? টেনে ফেলে দেবে, মাটিতে হাড়গুলো মিশে যাবে, মাংস খাবে শেয়াল-শকুনি।

টিণ্ডাল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে, নাঃ, এর বিধান করতেই হবে।

গোষ্ঠ হাসে অবিশ্বাসের হাসি।

টিণ্ডাল বলে, চল্, আজ বাবুদের কাছে যাব। ওরা বলে, সভা করলেই এর উপায় হবে; সব কেঁচো হয়ে যাবে।

অন্য একজন ফায়ারম্যান বলে, হ্যাঁ, ওদের কাছে যাবি, ওরা তোদের বুকেব ওপর বসে খাবে, আমি দু'-দু'বার দেখেছি, আমাদের দিয়ে ধর্মঘট করালে, আর শেষে ওরাই ঘুষ খেয়ে আমাদের সর্বনাশ কবলে। বাবা, সাপের দুটো মুখ, যেমন মালিক, তেমনই ওই বাবুরা।

টিণ্ডাল ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া কহে, না না না, ওই যে শিবকালী আর সুরেনবাবু, ওই যে রে খদ্দর পরে, আমাদের পাড়ায় যায় মাঝে মাঝে, ওরা তা নয়। পাপী আদমীর চেহারাই আলাদা হয় রে, মহাত্মাজীর শিষ্য ওরা! এই ছোকরা এই!

ও পাশের কর্মরত ছোকরাটা এ পাশ ও পাশ চাহিয়া দেখিয়া ছুটিয়া আসে। হেড ফায়ারম্যান বলে, যা তো, বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী আর রামকিষণ—এদের বলে আয়, যেন টিফিনে সব এইখানে আসে, কাজ আছে, বাড়ি না যায়।

ছোকরাটা বলে, সায়েব যদি দেখে?

টিণ্ডাল কলে দিবার তেলের চুঙ্গিটা ওর হাতে দিয়া কহে, এইটে হাতে করে যা।

ছোঁড়াটা চুঙ্গি হাতে চলিয়া যায়।

বারোটায় ভোঁ বাজে—টিফিনের ছুটির সিটি, সিটিটা আজ হয় অনাবশ্যক দীর্ঘ, আর ঘন ঘন; ফায়ারম্যানগুলির মন যেমন উৎকণ্ঠিতভাবে বলে, সাথীরা আয় আয়। বয়লারের বাঁশীর সুরে তেমনই ভাষা উহারা ফুটাইতে চায়, মনে করে, এই অভিনবত্বের মাঝে আহ্বানের ইঙ্গিতটা সাথীরা বুঝিবে।

বড় মিস্ত্রী আসে, তেমনই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, যন্ত্রচালিতের মতো ভাব। ছোট মিস্ত্রী আসে গান ধরিয়া, আর বাঁশী বাজাও না শ্যাম।

কি, সব খবর কি? কিছু পেয়েছিস নাকি, খাওয়াবি?

গোষ্ট বলে, ভাগ নিবি? এই দেখ।—বলিয়া পিঠটা খুলিয়া দেখায়, রক্তমুখী দড়ির মতো দাগ। কথায়, চোখে তাহার ব্যথার জ্বালা ফুটিয়া বাহির হয়, যেন বয়লারের মুখেই ঢাকনিটা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহার আঁচলটা উহাদেরও উত্তপ্ত করিযা তোলে।

বড় মিস্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে কহে, কে মেলে?

ছোট ম্যানেজার!

চল, বড় সায়েবের কাছে যাব।

টিণ্ডাল বলে, হ্যাঁ, ওদের কাছে গিয়ে তো সব হবে, সব মুখ শোঁখাশুঁখি হয়ে যাবে, ও হবে না।

তবে?

আমি বলছিলাম, চল্, বাবুদের কাছে চল্।

ছোট মিস্ত্রী ঘৃণার ভঙ্গিতে কহে, দূর, ওরা আমাদের চেযেও ভেড়া।

হেড ফায়ারম্যান বলে, তবু ওরা আমাদের দিকে তাকাবে, ওরাও চাকর, আমরাও চাকর, বুঝলি? আর যদি ঠকায়ই ওরা, তা হলে ওদের উপকার তো হবে।

অসহিষ্ণুভাবে ছোট মিস্ত্রী কহে, তা হবে না বাবা, ওসব আমি বুঝি না, যদি ঠকায় আমাদের, তবে জান নেব, স্পষ্ট কথা আমার; রাজি হও তবে আমরা ওদের কাছে যাব।

টিণ্ডাল বলে, না রে, শিবকালীবাবু, সুরেনবাবু ঠকাবার আদমী নয়, ওরা মহাত্মাজীর চেলা।

ছোট মিস্ত্রী বলে, বিশ্বাস আমি কাউকে করি নে, সে চেলাই হোক আর ফেলাই হোক। আমাদের ভাতে মারে, আমরা হাতে মারব—এই বোঝাপড়া হয়, রাজি আছি।

তোর মনের দোষ, বুঝলি।

ঠকে আর ঠেকেই মানুষ শেখে; মুখ দেখে মন বোঝা যায় না, বুঝলি? বিশ্বাসের কাল নেই আর, যাকে বিশ্বাস করবি সেই ঠকাবে; খাঁটি কথা। আর দোষ দিস আমার?

কথাটা সত্যই খাঁটি, দোষ কাহার ?

বঞ্চিতের, না বঞ্চকের ?

যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই ক্ষুধাতুরের দল শুধু যে স্বার্থেই বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে তাহা তো নয় ; যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের একটা পরম আশ্বাস—শান্তি, সেটুকুতেও দুনিয়া ইহাদের নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছে।

তাই এই রত্নভরা সারা বসুন্ধরা উহাদের চোখে আজ শুধু মেকী আর ফাঁকি ছাড়া কিছুই নয়।

যুগ-যুগান্তবের বঞ্চনায় আজ উহারা অন্তরে বাহিবে রিক্ত ; হাহাকার আজ উহাদের বাণী।

বঞ্চনার ভয়ে ওরা ত্রস্ত।

অবিশ্বাস আজ উহাদের সংস্কার।

বড় মিস্ত্রী বলে, ওরে, এতটা অবিশ্বাস ভাল নয়।

উহার সংস্কারগত বিশ্বাস আজও মরে নাই। বড মিস্ত্রী আবার বলে, দুনিয়াতে আর বিশ্বাস রইল না, এরপর বাপও আর ছেলেকে বিশ্বাস করবে না।

ছোট মিস্ত্রী বলে, করবে নাই তো, তোমাদেব সে এক কাল গিয়াছে, লোকে বিশ্বাস করে ঘরের কোণে লুকিয়ে টাকা ধার দিযে এসেছে : পাওনাদারি মরে গিয়েছে, দেনাদার তার ওযারিশকে টাকা দিয়ে এসেছে ; আর আজ, ঘোর দেখি। সারা বাজারটা, একটা লোক সত্যি কথা কয় ? দোকানী দাম বলে চাব ডবল, খদ্দের তাতেই বাজি। মতলব হচ্ছে তার ফাঁকি দেবার, মিথ্যে বই সাবা বাজারটার কিছুই নেই। আর আমরা, আমাদের গলা তো সবাই কাটে, মালিক কাটে, খাজাঞ্চী কাটে, দোকানী কাটে, তুমি আমার কাট, আমি তোমার কাটি। অবিশ্বাসের দোষ আছে ?

বড মিস্ত্রী ভাবে ; সমস্ত শ্রোতার দলও নির্বাক হইয়া ভাবে।

হেড ফায়ারম্যান নীরবতা ভঙ্গ করিযা কহে, তা বেশ তো, আমাদের ওদের সঙ্গে মিলে কাজ কি আছে, ওদের পরামর্শ নিতে তো দোষ নেই, ওদের একটু ঘাঁটিযে নে না।

বড মিস্ত্রী বলে, সেই ভাল, চল, ওদের দু'জনকে সন্ধ্যেতে আমাদের ওখানে যেতে বলে আসি।

দল বাঁধিয়া সব বাবুদের বাসার দিকে যায। শিবকালী কেরানী, আর সুরেন টাইপিস্ট।

পঁচিশ-ছাবিবশ বছর বয়স ; শতকরা আশীজন বাঙালীর ছেলের মতোই দুর্বল দেহ কিন্তু চোখে স্বপ্ন, বুকে আশা। চোখ হইতে মাঝে মাঝে আগুনের ঝলকও বাহির হয ; সহকর্মীরা শিহরিয়া উঠে, কিন্তু আডালে ব্যঙ্গ করিয়া বলে, ভারত উদ্ধারের দল।

সুরেন বলে. আমবাই তার ভিত্তি গেড়ে যাব। সুগভীর বিশ্বাস উহার বাক্যের প্রতি অক্ষরের মধ্যে রনরন করিয়া বাজে, সে ঝঙ্কারে সহকর্মীদের ব্যঙ্গ মূক হইয়া যায়।

শিবকালী বলে, সে শুভ্র প্রভাতের আলোর রেশ আকাশে লেগেছে, আকাশ লালচে হয়ে উঠেছে। এত বড় দুর্দশা, একটা এমনই বড় উন্নতির ইঙ্গিত নিশ্চয় করছে।

ওর কথার বেশ অর্থ হয় না, তবু সহকর্মীদের কেমন ভয় করে, অদূর ভবিষ্যতে একটা জীবন-মরণের যুদ্ধের ছবি জাগিয়া উঠে।

আবার বুকের এক কোণ হইতে লুপ্তপ্রায় একটা উত্তাপও যেন জাগিয়া উঠে, খানিকটা উত্তেজনাও যেন লাগে, তাহারাও ভারত উদ্ধারের কথা কয়।

নাঃ, আর বেশি দেরি নেই।

একজন বৃদ্ধ কহে, তাও আমাদের নাতির আমলের আগে নয়।

দেশবন্ধু থাকলে কিন্তু আরও আগে হত।

মহাত্মাই কি করেন দেখ।

খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক একটি ছোকরা বলে, মহাত্মা কি হে, অর্ধউলঙ্গ রাজদ্রোহী ফকির বল!

থিয়েটারে হিবোয়িনের পার্ট করে রমেশ, সে ভাবাবেগে গান ধরে, আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, আমরা ঘুচাব মা তোর ক্লেশ।

একজন বলে, আন ডুগি তবলা আন, হারমোনিয়ম আন, আসর পাত, তা না, ভারত আর ভাবত। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে কাজ কি বাপু? ভাবত উদ্ধার হলে তোদের কী রাজ্যলাভ হবে শুনি?

খবরের কাগজের পাঠক ছোকরা উষ্ণ হইয়া কহে, কি বললে, কিছু হবে না?

কি হবে শুনি? জিওগ্রাফি‍্‌ত প‍ড়নি ধনমণি যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না; কেমন, না একটি বলের উপর একটি পিপীলিকা ছাড়িয়া দিয়া উহাকে যে ভা বই ঘুরাও না কেন পিপীলিকা তাহার গতি বুঝিতে পারে না। বাবা, আমরা হলাম পিপীলিকা।

স্বাধীনতা অধীনতায় কোন ভেদ নেই দাদা, কোন ভেদ নেই।

কলম পিষিয়া যাই, কলম পিষিয়া খাব।

বাঁশরী বাজাব শুয়ে যেমন বাজাই।

ইহার পর আর মতভেদ থাকে না, ওরা বাঁশীই বাজায়। স্বপ্নপ্রবণ তরুণ দুইটি তখন ঘরের মাঝে বসিয়া শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার কর্মপন্থা ছকে।

শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টাও উহাদের ছিল, গোষ্ঠ এখানে আসিবার পূর্বে উহারা দুইজনে শ্রমিকদের আড্ডায় যাইত, উহাদের মতো হইয়া মিলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু মিলিত না। উহারা যাইতেই গায়কের গান বন্ধ হইয়া যাইত, কিষণলাল ঢোলকটা পাশে সরাইয়া রাখিত।

সুরেন কহিত, রাখলে কেন, লাগাও, আমরা শুনি।

উহাদের বিছানাতেই বসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহাদের তাহাতে বিষম আপত্তি।

বড় মিস্ত্রী একখানা ময়ূর-আঁকা জাপানী মাদুর বিছাইয়া কহিত, ওখানে নয় বাবু, এখানে বসুন, এখানে বসুন।

ব্যবধান একটা থাকিয়াই যায়।

ফিরিবার পথে দুই বন্ধুতে তাই লইয়া আলোচনা হইত।

সুরেন কহিত, এ ব্যবধান আমাদের স্বখাত-সলিল। যাক, এ ব্যবধান পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অসহিষ্ণু হলে চলবে না, দশ দিন, বিশ দিন, দু'মাস ছ'মাস—একদিন ভুল ভাঙতে বাধ্য। হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে, হতাশ হয়ে অসহিষ্ণু হয়ে ফিরিয়ে নিলে চলবে না, একদিন ওরা সে হাত ধরবেই।

শিবকালী কহে, নিশ্চয়, এই যে একটা স্বাতন্ত্র্য, এই সে মিলনের সূচনা ; দুনিয়াতে প্রত্যেক জিনিসেরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে; বৈশাখের শুষ্ক নদী শ্রাবণের বন্যার পূর্বাভাস।

ইহাদের এই আসা-যাওয়াটা কিন্তু শ্রমিকদের বেশি দিন ভাল লাগিল না ; সন্দিগ্ধ চক্ষে, অধঃপতিত মনে নানা কথা জাগিয়া উঠিল ; ফলে এমন কুৎসা তাহারা রটাইল যে, সুরেন-শিবকালীকে যাওয়া-আসা বন্ধ করিতে হইল, কিন্তু রাগ করিল না।

সহকর্মীরা ইঙ্গিত করিল, বাবা, সিংকিং সিংকিং ওয়াটার ড্রিংকিং।

সেটা কিন্তু প্রত্যক্ষে নয়, পরোক্ষে।

সুরেন সে শুনিয়া আগুন হইয়া উঠে; শিবকালী কিন্তু ফুৎকারে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিয়া কয়, ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

সেদিন শিবকালী আর সুরেন টিফিনের ছুটিতে মেসে বসিয়া ওই কথাই কহিতেছিল, ও ঘরে বাবুরা বসিয়া তামাক টানিতেছিল, এমন সময় শ্রমিকের দল আসিয়া সেলাম জানাইল।

শিবকালী আপনার ও সুরেনের বিছানা দুইটি টানিয়া পাতিয়া দিয়া কহে, বস বস মিস্ত্রী, বস সব।

বড় মিস্ত্রী জোড়হাত করিয়া কহে, মাপ করবেন বাবু, তেল কালি কয়লায় গায়ে একটা খোলস পড়ে গিয়েছে, বসলে বিছানাই মাটি হবে, আমরা এসেছি, একবার সন্ধ্যেবেলায় আমাদের ওখানে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

সুরেন কহে, ব্যাপার কি হে মিস্ত্রী ?

আজ্ঞে, সেইখানেই বলব সব, যাবেন তা হলে, যেতে বলতে মুখ তো আমাদের নেই।

শিবকালী হাসিয়া কহে, সেজন্যে লজ্জিত হয়ো না মিস্ত্রী, পাঁচজনের মন তো সমান নয়, তাই পাঁচজনে পাঁচ কথা কয় ; তা যাব আমরা। তবে কি জন্যে যেতে হবে জানা থাকলে সুবিধে হত।

ছোট মিস্ত্রী কহে, আমরা একটা সভা গড়তে চাই, তবে আপনারা শুধু গড়ে দেবেন, আপনাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

শিবকালী ছোট মিস্ত্রীকে আবেগে আলিঙ্গন করে।

বড় মিস্ত্রী কহে, কালি লাগবে বাবু, কালি লাগবে।

শিবকালী কহে, মিস্ত্রী, কালি-লাগা জায়গাটা আমি রেখে দেব। এ কালি আমি মুছব না।

সুরেন কহে, আর আমাদের গায়ের কালি বড় মিস্ত্রী, এ যে চামড়া না তুললে উঠবে না; কালিতে লজ্জাই বা কি, আর ক্ষতিই বা কি?

ছোট মিস্ত্রী বলে, আমরা কিন্তু কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করব। সরল ব্যবহারে ছোট মিস্ত্রীরও উহাদের বেশ ভাল লাগে।

সুরেন বলে, বেশ বেশ, বহুত আচ্ছা, খেতে আমি খুব ভালবাসি।

শিবকালী কহে, আর আমি বুঝি বাসি না, আমি বুঝি মার খেতে, গাল খেতে ভালবাসি?

সকলে হাসিয়া উঠে, লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া সকলে কেমন একটা সরল আত্মীয়তার সরল সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়; ওই লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়াই বুঝি প্রথম আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়, ক্রমে সে গভীরতার মধ্য দিয়া সুদৃঢ় বিরাট হয়।

বীজ উপ্ত স্বল্প মাটির নীচে, গাছ বড় হয়, তখন মূল চলিয়া যায় মাটির গভীরতা ভেদ করিয়া সুদূর অন্তরে—অন্তরতম প্রদেশে।

ওদিকে সিটি বাজে—কাজ, কাজ, কাজ।

শ্রমিকের দল চলিয়া যায়।

হেড ফায়ারম্যান বলে, দেখলি কেমন লোক।

বুড়া মিস্ত্রী বলে, ওরা বুকে করে নিতে চায়, আমাদেরই বিশ্বাস হয় না, আর আমাদের বুকে কাঁটা আছে, সহ্যও হয় না।

ছোট মিস্ত্রী বলে, পাড়াগাঁয়ের বাবু বোধ হয়; তাই এমন ধারা। পাড়াগাঁয়ের মুচীও গ্রামসুবাদে মামা হয়।

গোষ্ঠ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আজ তাহার গ্রামকে মনে পড়ে, রমাপতি মাস্টার, মুদী খুড়ো, যোগী কর্তা, সত্য, সেখানে অভাব থাক, নিদারুণ হতাশা থাক, তবু মমতা ছিল।

আবার আপন কাজে লাগিয়া যায়।

ওই আগুনের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে মন আবার হালকা হইয়া উঠে। গোষ্ঠর মুখেও গান আসে, হাসি ফোটে।

এতক্ষণে সে হেড ফায়ারম্যানকে বলে, যাই বল বাপু, এও বেশ, খাই দাই কাম বাজাই, ধার কারুর ধারি না। আব এ কাম কি, একটা দৈত্যের সঙ্গে লড়াই।

কর্মের মাঝে একটা আনন্দ আছে, আত্মপ্রসাদ আছে যে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় শ্রমিকসঙ্ঘ গঠিত হইয়া যায়; বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী, টিণ্ডাল, কিষণলাল, গোষ্ঠকে লইয়া এক পঞ্চায়েত গঠিত হয় উহাদের।

কত নূতন নিয়মকানুন হয়।

বেশ একটা আনন্দও পায়। কি যেন গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করে।

বাবুরা বলে, মাটির বুক চিরে ফসল ফলায় কারা?

তোমরা।

আগুনের সঙ্গে লড়াই করে কল চালায় কারা?

তোমরা।

মাটির ভেতর খনির অন্ধকূপে, সোনা রূপো হীরে জহরৎ খুঁড়ে বের করে কারা?

তোমরা।

তোমরা হচ্ছ দুনিয়ার হাত, তোমরা দুনিয়ার মুখে আহার তুলে দাও, তবে দুনিয়া খায়।

কথাটায় মনের ভিতর উহাদের অহঙ্কার জাগে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের এত বড, এত শক্তিমান ভাবিতে বুক কাঁপিয়া উঠে, নিজেকে যেন নিজেরই ভয় হয়।

বুড়ী সাবি বাউরিনী বলে, না বাপু, ও আবার কি কথা, আমরা গরিব মানুষ, গরিবের মতো থাকব—না বাপু, ভয় লাগছে আমার।

সভার কাজ সারিয়া তরুণ দুইটিও ফেরে নীবব নিস্তব্ধ। তাহারাও ভাবে।

সহসা সুরেন কহে, ওদের এখনই চাই সেলফ-কন্‌শাস্‌নেস্‌; আত্মবিস্মৃতি না টুটলে জাগরণ আসবে না; শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে তা হবে না, নাইট স্কুল স্টার্ট করে ফেলা যাক।

শিবকালী বলে, এদের জন্যে তার প্রযোজন নেই, সে ব্যর্থ হযে যাবে। লঘু মেঘ, সে হলো বাষ্প, তার মধ্যে শত সাধনাতেও বজ্রের সন্ধান পাবে না, কিন্তু ঝড এসে তাদের মিলিত করে দেয, বর্ষণে বজ্রে ধরণী সন্ত্রস্ত হযে উঠে।

যুগ-যুগান্তরের উচ্ছৃঙ্খল শক্তি কিন্তু একদিনে সংযত হয না, দূব-দূরান্তরের প্রবাহমানা নদীর ঘূর্ণিভবা বন্যা সহসা বাঁধনে বাঁধা যায না।

উহাদের আজন্মেব উদ্দাম প্রকৃতি নিযমের বাঁধন মানিতে চায না। দল আবার ভাঙিতে শুরু কবে, একদিনের কথার ঘাযে জাগানো অনুভূতি ধীরে ধীরে সুপ্ত হইযা পড়ে।

বাউরীর দল আগে ভাঙিল।

একদিন উহাবা আসিযা কহিল, তোমাদেব সঙ্গে আমরা আর নাই বাপু।

বড মিস্ত্রী বলে, কি হলো কি, কেন, থাকবি না কেন শুনি?

মানতে হয আমবা মালিককে মানব, তোমাদের কেন মানব? খেতে পরতে দাও তোমরা?

আরে, শোন্‌ শোন্‌, তোরাই সব পঞ্চাযেত হবি, আয় না, আমরা ছেড়ে দিচ্ছি।

কে সে কথা শুনে, উহাবা কিছুতেই মানে না, জবাব দিযা চলিয়া যায, তখন পাড়ায় উহাদের মহোৎসব চলিতেছে, মালিক পক্ষ আজ মদের জন্য করকরে দশ টাকা বকশিশ করিয়াছে।

সুরেন আবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু হয় না; ভাঙা দল আর জোড়া লাগে না।

শিবকালী কহিল, কেন মিছে চেষ্টা করছ সুরেন, চাপ না পড়লে ওরা এক হবে না; দেখেছ; আকাশে মেঘ আসে, চলে যায়, কিন্তু যেদিন বায়ুপ্রবাহ চাপ দেয় সেদিন বিচ্ছিন্ন মেঘমালা জমাট বেঁধে এগিয়ে আসে।

সুরেনও যাওয়া-আসা ছাড়িল।

আবার যা ছিল তাই; সেই নেশা, নাচ, গান, তাণ্ডব, কোনরূপে জীবনটাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া, জীবনের দিন কয়টাকে ক্ষয় করা।

হঠাৎ কাজের চাপ পড়ায় কোম্পানি শ্রমিকদের কাজের সময় সামগ্রিকভাবে একঘণ্টা বাড়াইয়া দিল, মজুরিও বাড়িল, কিন্তু সে বাড়া অতি সামান্য, বিশেষ সারাটা দিন পরিশ্রমের প্রচণ্ড ক্লান্তি, অবসাদের মধ্যে আরও একঘণ্টা পরিশ্রমের বিরক্তি—ক্লান্তির তুলনায় তাহার মূল্য নগণ্য, মজুরদের তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

একটা অসন্তোষ, মনের মধ্যে সহিয়া যাওয়া পুঞ্জীভূত অসন্তোষের উপরে আসিয়া সে অসন্তোষকে নাড়া দিয়া যেন সজীব করিয়া তুলিল।

মদের দোকানে ভিড় বেশি জমিতে শুরু হইল; এই অবসাদ এই ক্লান্তি দূর করিতে, সারাদিনের আয়ুর দামে আয়ুক্ষয়-করা বিষ উহারা আকণ্ঠ গিলিতে শুরু করিল।

গোষ্ঠ যেন মদে পাগল হইয়া উঠিল; কোনদিন মজুরির অর্ধেক যায়, কোনদিন বা বারো আনাই নেশায় চলিয়া যায়।

সেদিন গোষ্ঠ শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়া ভাম হইয়া দাওয়ার উপর এলাইয়া পড়িল।

দামিনীর তখনও রান্না চাপে নাই, গোষ্ঠই রোজ ফিরিবার পথে বাজার করিয়া আনে, আজ তাহার শূন্য হাত আর নেশার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কা হইল।

চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল, আজ মনে হয়, শত দীনতা, শত নির্যাতনের মধ্যেও সেই ছোট গ্রামখানি, সে ছিল ভাল।

মনে পড়ে সাতু ঠাকুরঝিকে, এমন দিনে দুই মুঠা চালের অভাব সেখানে কোনদিন হইত না। এখানে লোকের নিজেরই কুলায় না, অপরকে দিবে কোথা হইতে?

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, খরচ—?

গোষ্ঠ মুখ বাঁকিয়া কহে, কেয়া খরচ, কিসকে খরচ, খরচ হামরা নেহি হ্যায়, জমা কর্ লেও, সব জমা হোগা; সেরেফ হামকো খরচ লিখ্ দেও।

চোখ মুছিতে মুছিতে দামিনী গোষ্ঠর মুখে-চোখে জল দিয়া বাতাস করিযা বলে, ওগো, রান্না হবে কিসে, খরচ কই, খরচ?

দুই হাতেরই বুড়ো আঙুল দুইটা প্রবলভাবে নাড়িয়া গোষ্ঠ কহে, ফক্কা, ফক্কা।

দামিনীর সারা অঙ্গ যেন হিম হইয়া যায়, উদরের মাঝে ক্ষুধার অগ্নিদাহ দাউ-দাউ কবিয়া জ্বলে, সে তো উপেক্ষার নয়, ক্ষুধার তাড়নায় জননী সন্তানের মাংসও খাইয়াছে; সে উষ্মাভরে কহে, তারপর পেট—পেট চলবে কিসে?

গোষ্ঠ হাত-পা ছুঁড়িয়া খুব উৎসাহের সহিত চেঁচায়, আগুন জ্বালাও, পেটমে আগুন জ্বালাও।

দামিনী আর কথা কয় না; ঘরের মেঝের উপর কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়ে, পেটে তো নয় তাহার ইচ্ছা করে সংসারজীবনে আগুন দিতে। ইচ্ছা করে, যাই মহান্তর কাছে। শুধু একটি মিষ্ট কথার অপেক্ষা; ওই কথাটির দামে সে যাহা দিবে সে অনেক, এই স্বামীর ঘরে তাহা কল্পনার বস্তু।

দামিনী যায়ও ঘরের দুয়ার পর্যন্ত; কিন্তু কেমন যেন আর পা উঠে না; মনে পড়ে তার দৃষ্টির লোলুপতা!

সারা অঙ্গ তাহার ঘিন ঘিন করিয়া উঠে।

সে আবার ফিরিয়া আসিয়া শোয়।

উপবাসের অবসাদে দামিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সারাটা দিন সে শুধু জলের উপর আছে, ওবেলা ঘরে যাহা ছিল, তাহাতে গোষ্ঠর জলখাবাবও পুরা হয় নাই।

তন্দ্রার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে, মহান্ত তাহাকে ডাকে, সম্মুখে তাহার—থালার উপর নানা উপচারে সাজানো নৈবেদ্য, পাশেই একখানি সুন্দর আসন পাতা, যেন সে বলে, এস দেবীর মতোই তোমায় পূজা করিব। সহসা একটা প্রবল আকর্ষণে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়।

মাতাল গোষ্ঠ তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিয়া কহে, এই, ভাত দে—ভাত।

আগুনের দাহে নেশার বিষে এতক্ষণে তাহার উদরে বিশ্বগ্রাসী আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

দামিনী রুক্ষ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চায়, স্বপ্নেও সুখ এ তাহাকে দিবে না?

বুভুক্ষু মদ্যপের কাছে এ নীরবতা অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, গোষ্ঠ একটা চড কষাইয়া কহে, লবাবের বেটি, হারামজাদী—-

শরমস্তব্ধ নারীকণ্ঠ একবার অতর্কিতে ফুটিয়া আবার নীরব হইয়া যায; শুধু চোখের জল বাঁধ মানে না।

সম্মুখেই ও ঘরে বসিযা ছোট মিস্ত্রী ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গোষ্ঠকে তিরস্কার করে, এই উল্লু, এই গোষ্ঠ, কি হচ্ছে কি? মেয়েলোকের গায়ে হাত? খবরদার—

গোষ্ঠ ঘরের ভিতর হইতেই পড়িয়া পড়িয়া আস্ফালন করে, উঠিতে পারে না।

নারীকণ্ঠের চাপা-ক্রন্দনের আভাস তখনও পাওয়া যায়।

ছোট মিস্ত্রী আসিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারে; চোখে পড়ে দামিনী।

দামিনী বড় বাহির হইত না, ইহাদের এই লোলুপ দৃষ্টি যেন তাহাকে বিঁধিত। সামনের বারান্দায় গোষ্ঠ আবার একটা অবরোধ তুলিয়াছিল। দামিনীকে দেখিয়া ছোট মিস্ত্রীর দৃষ্টি আর ফিরিল না, লোলুপ উদগ্র ক্ষুধা তাহার মত্ত চোখে জ্বলজ্বল করে। অবরোধের মাঝে থাকিয়া দামিনীর রং আরও খুলিয়াছে, অশান্তি-অভাবের পীডনে সে শীর্ণ হওয়ায় তাহাকে যেন লম্বা দেখায়, কিন্তু মানায যেন বেশি, বেশ ছিপছিপে দীর্ঘ দেহ।

দামিনী মিস্ত্রীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে গেল, কিন্তু শতছিন্ন কাপড়খানার এক পাশ টানিতে আর একপাশ নগ্ন হইয়া পড়ে; সেদিকে দামিনীর ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে মুখখানা ঢাকিল, কিন্তু অঙ্গের ওই একটা দিকের নগ্ন-সৌন্দর্যেই মাতাল ছোট মিস্ত্রী উন্মত্ত হইয়া উঠে; সে হাত বাড়াইয়া দামিনীকে ডাকে, একটা পা ঘরের মধ্যেও আগাইয়া দেয়।

ভয়ে দামিনীর বুক কাঁপিয়া উঠে, সে ছুটিয়া গিয়া ওই জ্ঞানশূন্য স্বামীকে জড়াইয়া ডাকে, ওগো, ওগো, ওঠ গো, ওঠ।

ছোট মিস্ত্রী এবার পালায়, বলিতে বলিতে যায়, শালার ফাঁসি দিতে হয়, এমন পরিবারের গায়ে কাপড় না দিয়ে শালা মদ খায়।

দামিনী এবার উঠিয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়। ওই মুহূর্তটুকুতে সে দেখে, আরও একজনের দৃষ্টি তাহারই উপর আবদ্ধ, সেই ঘোলাটে চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি।

দামিনীর আপন দেহের পরে ধিক্কার জন্মিয়া যায়।

সে ফিরিয়া গিয়া আবার শোয়।

আরও একজোড়া দৃষ্টি তখন দামিনীর পরে আবদ্ধ ছিল। পিছনের ছোট ঘুলঘুলির মধ্য দিয়া পিপাসিত চক্ষু জাগিয়াছিল সুবলের।

পান-বিড়ি মুড়ি-মুড়কির দোকান ফেলিয়া সে দিনে দশবার সেথায় আসিয়া চোখ পাতিয়া থাকিত, বউকে একটি পলক দেখার জন্য।

স্টেশনের জমাদারকে কহিত, দেখো তো দাদা দোকানটা, আমি এলাম বলে, বিড়ি খাও ততক্ষণ।

ঘুলঘুলি তো নয়, যেন তমসাব দ্বারপথ, অন্ধকার—সব অন্ধকার; দৃষ্টি শিহরিয়া উঠে, চোখের তারা শঙ্কা পায়, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুবল ফিরিয়া আসিত। আবার হয়তো ঘণ্টাখানেক পরে, বালতির জলটা ফেলিয়া দিয়া আপন মনেই কহে, এঃ ময়লা কত! জল পালটে আনি, দোকানটা দেখো তো ভাই পানিপাঁড়ে।

পানিপাঁড়ে হাসিযা কহে, এ যে জল ফেলে জল আনতে যাওয়া হে, বলি, কোন্ ঘাটে হে, এ পাড়া না নাম-পাড়া? বাউরিপাড়ার পানে আঙুল দেখায়।

সুবলও আর সে সুবল নেই, এই মধুর আবহাওযায় সে বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, মুখ ফুটিয়াছে, ছলনায় আর বাধে না; সে কহে, ঘাটে নয় হে, কলের মুখে।

পিরীত করবি, গোপনে করবি, তবে তো থাকবি সুখে, বেশ বেশ বেঁচে থাক কালাচাঁদ।

দেখ, এই দেখ, জলে পোকা দেখ।

জল-ফেলা জায়গায় কয়টা পিঁপড়ে নড়ে, সুবল তাহাই দেখায়। তারপর ত্বরিতপদে সে চলিয়া যায়।

আজিও এমনই একটি গোপন চোখ-পাতার অবসরে এই ঘটনাটি তাহার চোখে পড়িল; অন্ধকারের মাঝে দামিনীকে উজ্জ্বলভাবে দেখা না গেলেও দামিনীর আর্ত কণ্ঠ, গোষ্ঠর গালিগালাজ, ছোট মিস্ত্রীর ওই কাপড়ের কথা সুবলের কানে গেল;

তাহার অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল অনাহারক্লিষ্টা, শীর্ণা, অবসন্না, অশ্রুমুখী দামিনী, পরনে জীর্ণ বাস ; লাজত্রস্তা নারীর এ পাশ আবরণ করিতে ও পাশ নগ্ন হইয়া যায়। সে বুঝি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ধরিত্রী জননীর কোলে আশ্রয় চায়।

সুবলের আর জল লওয়া হইল না, সে ফিরিল।

কিছুক্ষণ পরেই সে একটা চাঙারি মাথায় করিয়া গোষ্ঠদের বাড়ি ঢুকিয়া হাঁকিল, কই হে, মোড়ল কই ?

ছোট মিস্ত্রী দাওয়ায় বসিয়া কহে, কি হে দোকানী ?

এই ভাই একটা সিধে আছে, মোড়লের বাড়ি দিতে হবে ; অনেক দিন থেকেই মনে করছি, দোকান করলাম, মোড়ল গাঁয়ের লোক, একদিন খাওয়াব ; তা ভাই আমার কে রাঁধে-বাড়ে, তাই সিধে দিয়েই সারি। কই, মোড়ল কই ?

বলিয়া সুবল গোষ্ঠর বারান্দায় উঠিয়া রুদ্ধদ্বারে আঘাত করে।

ধীরে ধীরে দুয়ারটা খুলিয়া দিয়া দামিনী সরিয়া দাঁড়ায়, সুবল সম্ভারপাত্রটি মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহে, এমন দিনে আমাকে একটা খবর দিলেও তো পার।

দামিনী উত্তর দিতে পারে না, কাঁদিযা ফেলে।

দামিনীর চোখে জল দেখিয়া সুবলও কাঁদিয়া ফেলিযা কহে, বউ!—বলিযা সে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে দামিনীর হাত দুইটি ধরিতে যায়, মুহূর্তে দামিনী হাত দুই পিছাইয়া গিয়া তাহার পানে তাকায, সজল চোখেও দামিনী ঝলকিয়া যায়।

সুবল পালায়। গোষ্ঠর তখন নাক ডাকে, যেন মরণ-ঘুম।

দামিনী ঘরে খিল দিয়া ওই আহার্যসম্ভারের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

ভোরে উঠিয়া গোষ্ঠ ক্ষুধার যাতনায় চারিদিকে চায, দামিনী তখন ওপাশে ভোবের দিকে ঘুমাইয়া পডিয়াছে।

চোখে পডে সেই খাবারের চ্যাঙারিটা।

গোষ্ঠ সেটা কাছে টানিয়া জলখাবারের আযোজনটুকু গোগ্রাসে গিলিতে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে পিছন ফিরিযা সে দেখে, দামিনী তাহারই পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

গোষ্ঠ ধীরে ধীরে তাহার পানে ফিরিযা বসিয়া লজ্জিতভাবে কহে, কাল কি তোমাকে মেরেছিলাম ?

দামিনী কথা কয না।

গোষ্ঠ কহে, আমাকে মাপ কর, করবে না ?

দামিনী আবেগরুদ্ধ আব্দার-ভরা সুরে কহে, ওগুলো আব খেও না।

ওইগুলা গোগ্রাসে গিলিয়া গোষ্ঠ কলের পানে ছুটে ; ভোরবেলা হইতেই ফায়ারম্যানের বযলারে আগুন দিতে হয, হাতলের পর হাতল ভরা কযলা অগ্নিগহ্বরে নিক্ষেপ করে, দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলে, চিমনি দিয়া রাশি রাশি কালো ধোঁযা প্রভাতের স্বর্ণ-আলোর পথ বোধ করিয়া সমস্ত স্থানটা ম্লান ছায়াচ্ছন্ন করিয়া তোলে।

বয়লারটা আপনার তেজে আপনি কাঁপে, গোঙায়—গুমগুম, গুমগুম।

সাতটায় সিটি পড়ে, ভোঁ—ভোঁ।

গোষ্ঠ হাসে আর বয়লারটাকে তারিফ করিয়া বলে, বাঃ বেটা, বাঃ বেশ বলছিস, ভোঁ—ভোঁ, দে সব ভোঁ-দৌড়।

কুলী-মজুরদের দল সিটির শব্দে কলের পানে ছুটে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া; মুখের রবে কথাটা রটে না বটে, কিন্তু তাহাদের ওই ত্রস্ত ভঙ্গিমার গতিতে তাহা ফুটিয়া উঠে।

কল চলে। বয়লার গোঙায়, ইঞ্জিনের সঘন সুউচ্চ নির্মম শব্দ স্টীমের ফোঁসানি, বেল্‌টিঙের টানে বড় বড় চাকাগুলা অবিরাম ঘুরপাক খায়; শব্দ হয় একটা আনুনাসিক ঘন্—ঘন্ ঘং, ঘন্—ঘন্ ঘং; বিপুল বিচিত্র বিকট শব্দ।

মজুরেরা কাজে মাতে; ওই শব্দরাজ্যে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে কিনা বোঝা যায় না; মন্ত্রের মতো কাজ করিয়া চলে; ওই নির্মম বিরাট শব্দে একটা অনুরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

ওই আবহাওয়ায় মানুষের বুকে হৃৎপিণ্ডের কোমল নৃত্য ক্রমশ কঠোর প্রবল হইয়া উঠে, ওই ইঞ্জিনটার সঙ্গে তাণ্ডবের তাল রাখিয়া ধকধক করিয়া চলিতে শুরু করে।

শ্বাস-প্রশ্বাস মুখ দিয়া হা-হা করিয়া পড়ে, যেন ঐ স্টীমের ফোঁসানির সঙ্গে সমতা রাখিতেই হইবে।

পেশীগুলা ওই যন্ত্রের মতোই কঠিন হইয়া উঠে।

মানুষের অন্তর, ওই দাঁতওয়ালা চাকাগুলার মতোই নির্মম, কঠোর হইয়া উঠে।

একটা ছোঁড়া আসিয়া হেড-ফায়ারম্যান টিণ্ডালকে কি ফিসফিস করিয়া বলিয়া যায়।

গোষ্ঠও ভুরু তুলিয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে, কি?

টিণ্ডাল বলে, শিবকালীবাবু এসেছিল বড় মিস্ত্রীর কাছে, বলেছে যে আজ থেকে আর ওভারটাইম খাটব না।

গোষ্ঠ কহে, তারপর?

না শোনে, ধর্মঘট হবে, বাউরী শাল্যাবাও রাজি হযেছে, বলে গেল।

আবার ছোঁড়াটা আসে, বলে, সব ঠিক, সবাই রাজি হয়েছে। আর আজ রাত্তিরে বটগাছতলায় সভা হবে, বলে দিলে। সব বলে এলাম।

সবারই বুকে যেন একটা আনন্দ জাগিয়া উঠে।

দুনিয়াতে বড় কাজের একটা আনন্দ আছে; শক্তিরও একটা আনন্দ আছে।

আজ পরস্পরের পানে তাকাইয়া উহারা মিষ্ট হাসি হাসে।

অতীতের ছোটখাটো মনোমালিন্যের কথা মনে পড়ে না।

বেলা বারোটায় আবার সিটি বাজে; টিফিনের ছুটি। সব দলে দলে বাড়ির পানে চলে, মৃদু গুঞ্জনে সবাই আজ ওই কথাই বলে।

গোষ্ঠ চলে সবার শেষে; ফায়ারম্যানদের তাই নিয়ম। ওদিকে অগ্নিগর্ভ বয়লারটা শুধু ফোঁসায়।

দামিনী সেদিন শুইয়াই ছিল। আগের দিন উপবাসে গিয়াছে, এঁটো-কাঁটা নেই,

বাসন মাজা নেই; আর ঘরেও আপনার বলিতে কিছু নেই, যাহা দিয়া নূতন করিয়া উনান জ্বলে। যাহা আছে, তাহা সুবলের দেওয়া, কিন্তু সে স্পর্শ করিতে মন চাহিতেছিল না; বিশেষ করিয়া গোষ্ঠর সেই নির্লজ্জ খাওয়াটায় পেটের জ্বালার উপর তাহার ঘৃণার অন্ত ছিল না।

এক-একবার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল আত্মহত্যার প্রয়াস; আবার মনে হইতেছিল, ওই উপচারে পরিপাটি করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া খায়, সুবলকে ডাকিয়া পাঠায়, তাহার মুগ্ধ নয়নের আরতিতে সে নব-বধূর মতো হইয়া উঠে।

পরক্ষণেই মনে জাগে দারুণ ঘৃণা নিজের দেহের উপর, অক্ষম নির্লজ্জ স্বামীর উপর, দুনিয়ার ক্ষুধার উপর, সমস্তগুলার বীভৎসতা তাহাকে অতি কঠোরভাবে পীড়া দেয়। দীর্ঘদিনের উপবাসে ক্ষুধা তাহার ছিল না, কাজেই ওই আহার্যগুলার প্রতি কোন আকর্ষণও তাহার কাছে ছিল না; ছিল শুধু দুর্বল চিত্তে অর্থশূন্য চিন্তা।

সহসা পিছনের সেই ছোট জানালাটায় একটা শব্দ হয়, খস—স খস—স।

দামিনী চমকিয়া সেদিকে চায়; দেখে, শিকের ফাঁক দিয়া একখানা কাপড আগাইয়া আসে; চওড়া খয়ের-পাড় শাড়ি একখানা।

দামিনী খয়ের-পাড় শাড়ি পরিতে ভালবাসিত।

দামিনীর বুকে একটা লঘু চকিত ভাব জাগিয়া উঠে; বক্ষস্পন্দন অকারণে দ্রুত হইয়া উঠে, সে এ-পাশ ও-পাশ তাকায়, মনে হয়, ওই অন্ধকার কোণে দাঁড়াইযা কে বুঝি দেখিতেছে।

সে বুঝিতে পারে কাপড়খানার ওপারে কে, তাহার মনের রুচিটি এমন নিখুঁতভাবে জানে কে। তাহার মনে পড়ে কোন্ গাছটির আম সে বেশি ভালবাসিত, কোন্ কূলে তাহার রুচি বেশি, সে জানে কে। দামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, শব্দ করিতে শঙ্কা হয়, কে হয়তো আড়ি পাতিয়া আছে।

একবার সে কোমল মনোহর বসনখানার পানে তাকায়, আর একবার আপন অঙ্গের ওই শীর্ণ ছিন্ন মলিন বসনখানার পানে।

সহসা আপন মনেই দুইটা আঙুল দিয়া নিজের পরনের কাপডখানা ঘষে; জীর্ণ, অতি কর্কশ কাপড়খানা; আঙুল দুইটার ডগা জ্বলিয়া উঠে, কাপড়খানা ছিঁড়িযা যায়।

তাহার চক্ষে একটা বিচিত্র জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে, সারা অঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠে।

একটা লঘু কোমল শব্দ হয়, কাপড়খানা ঘরের মেঝের উপর আসিয়া পড়িল। ওই লঘু শব্দেই দামিনী চমকিয়া উঠিল।

কাপড়খানার অন্তরাল হইতেই জানালাটার ওপাশে একখানা মুখ চকিতে দেখা যায়; পরমুহূর্তেই সে সরিয়া গিয়াছে।

দামিনীর অনুমান মিথ্যা নয়, সে সুবলই।

দামিনী বসিয়া বসিয়া ভাবে আর আঙুল দিয়া কাপড়খানা ঘষে।

কোমল, মসৃণ। ধীরে ধীরে সে কাপড়খানা আপন হাতের বাইরের উপর ঘষে,

কাপড়খানার কোমলতায় একটা মধুর অনুভূতি আসে; আর ওই দামিনীর শখের পাড়খানি, সুন্দর, চোখ জুড়াইয়া যায়।

দোষ কি?

কতজনের কথা মনে পড়ে; শত শত দৃষ্টান্ত তাহার মনে আসিয়া জাগে।

ওই ছোটলোকপাড়ার উহারা।

উহাদের নয় এই স্বভাব; কিন্তু এই সৎ-জাতি, উহাদের মাঝেও তো অভাব নেই। ওই খেঁদীর অঙ্গে পয়েন্টস্‌ম্যানের দেওয়া উপহারের অন্ত নেই; সে কথা জানেও তো সকলে, খেঁদীও তা গোপন করে না, তাহার তো ইহাতে লজ্জা নেই, সে তো প্রকাশ্যেই বলে, সগ্‌গে আমার কাজ নেই ভাই, সেথায় না হয় তোরাই যাবি; হেথায় তো খেয়ে পরে বাঁচি।

খেঁদীর নয় রক্ষক নেই, কিন্তু ওই দাসী? তাহার তো স্বামী আছে—ওই হাঁপানিরুগী বাবুলাল; তবুও তো হাজারিবাবুর পয়সা নেয় সে। সে বলে, সতীগিরি ফলাতে গেলে তো স্বামীকে শুকিয়ে মরতে হবে; তা এতে যদি ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি, সেই আমার ভাল।

চিন্তায় চিন্তায় মন আজ মুখর হইয়া উঠে, সে বলে, আর ওই যে মানুষটি, যে আমার জন্য সব ত্যাগ করিয়া হেথায় পড়িয়া আছে, না বলিতে, না জানাইতে অপরাধীর মতো গোপনে সব জানিয়া, গোপনে গোপনে যত পূজা যোগাইয়া যায়, তাহার পানে চাহিবার কি কোন অধিকার নেই?

দামিনী কাপড়খানা তুলিয়া লয়।

কিন্তু কেমন একটা অস্থিরতা-বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে, হৃৎপিণ্ডটা বুকের মাঝে ধকধক করে, বাহির হইতেও সে শব্দ শোনা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা মুখও তাহার বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে। দুঃখী স্বামীর ম্লান মুখখানি, তাহারই দিকে অতি নির্ভরশীল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে তাহাকে সামগ্রীসম্ভারের উপহারের সুখ দিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার বুকের একবিন্দুও তো দিতে বাকি রাখে নাই।

বাহিরে দরজা খোলার শব্দ হয়; দামিনী চমকিয়া কাপড়খানা তাড়াতাড়ি একটা শূন্য হাঁড়ির গর্ভে লুকায়।

ও বউ, কাপড় এনেছি, কাপড়।

দামিনী চমকিয়া দরজায় খিল বন্ধ করিতে যায়, কিন্তু তাহার পূর্বেই ভেজানো দুয়ার খুলিয়া, ছোট মিস্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসে, হাতে তাহার একজোড়া শাড়ি। দামিনী পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়ায়, যেন ওই দেওয়ালের মাঝে গিয়া লুকাইতে চায়, সর্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপে।

কাপড়খানা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছোট মিস্ত্রী বেশ নরমভাবেই কহে, দেখ, পাড়ের কি বাহার! জানিতে পারিবে করিলে ব্যবহার।—বলিয়া সে ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসে।

কুৎসিত বীভৎস হাসি, কুৎসিত ইঙ্গিত করে, ইঙ্গিতে যেন দেনা-পাওনার পূর্ণ স্বরূপ প্রকট হইয়া উঠে, সে অতি বীভৎস, অতি ভীষণ।

মানসনেত্রে সুবলের সলাজ মুখখানাও অমনই বীভৎস ভীষণ হইয়া উঠে।

সারা অঙ্গ তাহার যেন মোচড় দিয়া উঠে, কণ্ঠে তাহার স্বর ফুটে না, কিন্তু আর সে সহিতেও পারে না; সে সর্বশক্তি একত্রিত করিয়া দুয়ারটা দড়াম করিয়া মিস্ত্রীর মুখের উপরই বন্ধ করিয়া দিয়া হাঁপায়। ওপাশে মিস্ত্রীর গলা শোনা যায়।

ভয় কি মাইরি, তুমি হুকুম কর, সোনায় অঙ্গ মুড়ে দোব, আর ও শালাকে বল তো আজই ওকে তাড়াই।

উত্তর কেহ দেয় না, ছোট মিস্ত্রী আপন মনে গান করিতে করিতে আপন ঘরে চলিয়া যায়, দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যায়।

দামিনীর আর লজ্জার আত্মগ্লানির পরিসীমা থাকে না, অশিক্ষিতা সে, সুস্পষ্ট কথার যুক্তি তাহার মনে জাগে না, কিন্তু নারী, নারীত্বের অপমানবোধ তাহার জন্মগত সংস্কার, সে বোধ তাহার আছে; প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া সুবলের কাপডখানা বুকে করিয়া আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর যেন পুড়িয়া যায়, আর ওই পশুটা তাহাকে যে নগ্ন বীভৎস অপমান করিয়া গেল, তাহার জন্য ক্ষোভ আর লজ্জার তাহার অন্ত ছিল না। দামিনী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে।

বাক্যহারা মন তাহার তখন বলিতেছিল, মা ধরণী, দ্বিধা হও মা। মাটির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি বুঝি দ্বিধাবিভক্ত মৃত্তিকার অন্তরালে ধরণীমায়ের বিস্তৃত কোলের প্রতীক্ষায় ছিল; কিন্তু নিশ্চলা অকরুণ ধরণী দ্বিধা হয় না; বোধ করি শক্তিমত্ত সন্তানগুলার দম্ভের পদাঘাতে সে আজ বেদনায় মূর্ছিতা চৈতন্যহীনা।

মৃদু বায়ুপ্রবাহে সহসা তাহার নাকে আসে ওই নতুন কাপড়ের গন্ধটা, সে মুখ তুলিয়া তাকায়।

অশ্রুরুদ্ধ ঝাপসা দৃষ্টির সম্মুখে ওই রক্ত-রাঙা পাডখানা মনে হয় যেন নাগপাশ, যেন অন্তহীন বেষ্টনে দামিনীকে বাঁধিতে আসে; আর হাঁড়িটার ভিতরে খয়ের রঙের কাপড়খানা যেন বিবরের নাগের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিযা ঘুরিয়া ফেরে।

দামিনীর দম বন্ধ হইয়া আসে যেন, সত্যই সে আপন দেহের সর্বাঙ্গে একটা কঠিন বন্ধনবেষ্টনী অনুভব করে; তাহার চোখ দুইটা কেমন বড় হইয়া উঠে।

সে উন্মাদের মতো এ বন্ধন-মুক্তির উপায় খোঁজে, চোখে পড়ে তাহার কুলুঙ্গির পরে দেশলাইটা।

দামিনী ব্যাগ্র বাহুপ্রসারণে দেশলাইটা চাপিয়া ধরে; যেন উল্কামুখ গরুড় সে।

ও-পাশ হইতে কেরোসিনের ডিবাটা টানিয়া আনে।

একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ!

সে গন্ধে ছোট মিস্ত্রী বাহিরে ছুটিয়া আসে; চোখে পড়ে দামিনীর রুদ্ধ দ্বারের সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়া অনর্গল ধূমশিখা বাহির হইতেছে।

সে নিশ্চলভাবে আপন বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখে, চোখ দুইটা বিস্ফারিত, চিৎকার করিতে কণ্ঠ ফুটে না।

মনে হয়, ওই রাঙা-পাড় কাপড়খানা সূতায় বোনা ছিল না, আগুনের শিখায় বোনা ছিল; সেই আগুন ওই ঘরের মাঝে সমস্ত গ্রাস করিয়া লেলিহান শিখায় জ্বলিতেছে।

সে আগুন যেন সমস্ত গ্রাস করিবে, তাহার উত্তাপও যেন সে অনুভব করে, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠে; ভয়ার্ত হইয়া মিস্ত্রী পলাইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরেই গোষ্ঠ আসে টিফিনের ছুটিতে জল খাইতে, হাতে একটা খাবারের ঠোঙা; গত রাত্রের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিয়া দামিনীর জন্যই খাবারটা আনিতেছিল, ভোরবেলা সেই খাবারগুলা খাইয়া তাহার নিজের বেশ ক্ষুধা ছিল না। কি বলিয়া দামিনীর কাছে মাফ চাহিবে তাহার কত কথাও মনে জাগিতেছিল।

বাড়িতে ঢুকিয়াই ওই বিশ্রী গন্ধে সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিপাশে চায়, দেখে তাহারই রুদ্ধ দুয়ারের ফাঁক দিয়া অনর্গল কালো ধোঁয়ার রাশি।

খাবাবের ঠোঙা ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া আর্তকণ্ঠে ডাকে, ওগো! ওগো!

কেহ সাড়া দেয় না, গোষ্ঠ উন্মত্তের মতো দুয়ারে ধাক্কা মারে, উন্মত্ত ধাক্কায় দরজাখানা ভাঙিয়া পড়ে।

ধূমকুণ্ডলীর মাঝে দামিনী নিশ্চল দাঁড়াইয়া, দৃষ্টি তাহার স্থিরভাবে নিবদ্ধ, সম্মুখে চরণপ্রান্তে ধূমোদ্গারী এক অগ্নিস্তূপের উপর ছোট ছোট শিখাগুলি যেন তাহার আরতি করিতেছে, অগ্নিশিখার আভায় দীপ্ত মূর্তিখানি যেন ওই অগ্নিশিখায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে।

গোষ্ঠ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে একটা কাপড়ের স্তূপ জ্বলিতেছে, আরও জ্বলিতেছে আহার্য-সামগ্রী।

গোষ্ঠ ব্যস্ত হইয়া কহে, এ কি, কাপড় পুড়ছে যে!

সে একটা পাত্র লইয়া জল আনিতে ছুটে, কিন্তু দামিনী তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলে, না।

গোষ্ঠ বলে, সে কি?

হ্যাঁ, তুমি তো দাও নাই।

গোষ্ঠ দামিনীর পানে চায়, কথাগুলার সূত্র যেন সে পাইয়াছে অনুভব করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না।

দামিনী সহসা গোষ্ঠের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদে।

গোষ্ঠ তাহার হাত ধরিয়া তোলে, অশ্রুমুখী নারী তাহার দুইটি হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহে, ওগো, পরতে কাপড় আর খেতে ভাত তুমি আমায় দিও গো।

গোষ্ঠ দামিনীর অঙ্গপানে চায়।

ছিন্নবসা নারীর লজ্জা আজ অতি করুণভাবে সুপ্রকট হইয়া চোখের উপর ফুটিয়া উঠে।

দগ্ধ কাপড়ের গাদার পানে আঙুল দেখাইয়া গোষ্ঠ পুরুষ কণ্ঠে কহে, কে, দিলে কে?

ওই অজ্ঞাত হস্তের বস্ত্রদানের অন্তরালে সে বস্ত্র-হরণের প্রয়াস দেখিতে পায়।

তা আমি জানি না গো, ওই জানালা দিয়ে—। গোষ্ঠর মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল ; অজ্ঞাতে একটা গোপনতার প্রয়াস তাহার ভীত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তাই পুড়িয়ে দিলে ?

হ্যাঁ।

গোষ্ঠ যেন নিশ্চল পাষাণ হইয়া গেল, তাহার অন্তর-পুরুষ তাহাকে নিদারুণ ধিক্কারে মূক করিয়া দিল।

লজ্জার গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না, তাহার সে লজ্জা, সে ধিক্কার দ্যূতসভায় যাজ্ঞসেনীর বসনাকর্ষণে নিশ্চল অক্ষম পাণ্ডবদের চেয়ে বোধ করি কম নয়।

সে বসিয়া ভাবে কত কি।

কে সে দুঃশাসন ?

আক্রোশ গিয়া পড়ে সুবলের উপর, তাহার মন বলে, এ সেই। গোষ্ঠ ঝাড়া দিয়া উঠে, তাহার সে ভঙ্গিমার মাঝে প্রতিহিংসার ভয়াল রূপ সুপ্রকট হইয়া উঠে।

দামিনী তাহার হাত ধরিয়া কহে, কোথা যাচ্ছ ?

খুন করব শালা মহান্তকে।

দামিনী শিহরিয়া কহে, সে নয়, না না তুমি যেও না।—বলিয়া সে স্বামীকে দুই হাতে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিল।

গোষ্ঠ তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহে, কে তবে ?

দামিনী কাতর কণ্ঠে কহে, ওগো আগে নিজের দোষ ভাব, তুমি আমায় দিলে, ভালবাসলে কার সাধ্যি যে—

ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রুর বন্যা বহিয়া যায়।

গোষ্ঠও আর ঠিক থাকিতে পারে না, নিদারুণ দুঃখে, লজ্জায় দামিনীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদে।

স্বামীর অশ্রুতে দামিনীর নারীহৃদয় গলিয়া যায়, সে বেশ আবদারভরা সহজ কণ্ঠে কহে, তুমি থাকতে আমার দুঃখ কি, আমার অভাব কিসের ? নাও, ছাড়, জল খেতে দি।

গোষ্ঠ স্ত্রীকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু সে এমন সহজ হইতে পারে না ; অক্ষমতার আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর-পুরুষ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। দাওয়ায় আসিয়া বসিয়া ভাবে, কে সে দুঃশাসন ?

দামিনী ঠিক বলিয়াছে, তাহার অক্ষমতা, ওই অভাব, ওই নির্মম কদর্য অভাবই সেই দুঃশাসন।

অভাবের উপায় খুঁজে সে।

উপায় মিলে না, নিরুপায় ক্ষোভে সে বলিয়া উঠে, এর চেয়ে মরণ ভাল আমার।

বড় মিস্ত্রী আসিয়া বাড়ি ঢুকিল, গন্ধটার রেশ তখনও যায় নাই, বুড়া নাক সিঁটকাইয়া বলিয়া উঠে, উঃ, কি পুড়ছে ?

কেহ কথার উত্তর দিল না, বুড়া ধীরে ধীরে আসিয়া গোষ্ঠের কাছে দাঁড়াইল, এক জোড়া শাড়ি গোষ্ঠর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিল, বউকে দিস।

সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠর সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়ে ওই বুড়ার উপর, বাঘের মতো লাফ দিয়া ফিটারের উপর পড়িয়া হাতের নখ দিয়া যেন তাহার গলার নলীটা ছিঁড়িয়া দিতে চাহিল।

আজন্ম লোহা আর আগুনের সঙ্গে লড়াই-করা সবল দেহ, কঠিন হাত দুইখানা লোহার মতো কঠিন, ভাইস-যন্ত্রটার মতো ওই হাতের কঠিন নিষ্করুণ পেষণে গোষ্ঠর হাত দুইখানা যেন মড়মড় করিয়া উঠিল, আপনা হইতেই গোষ্ঠীর হাত দুইখানা শিথিল হইয়া পড়িল।

বুড়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপন ঘরের বারান্দায় গিয়া উঠে, ভাবলেশহীন সেই নিষ্প্রভ কঠিন মুখ, একটি রেখারও ব্যতিক্রম নেই।

দুর্বল গোষ্ঠ এ-পাশে নিরুপায়ে গালি পাড়ে, লজ্জা করে না, বুড়ো ভেড়া, পরের পরিবারকে কাপড় দিতে, এই দেখ্, তোর কাপড়ের কি দশা হয়, পুড়ুক আগুনে।

কাপড়খানা আগুনে দিবার জন্য সে হাতে করিয়া তুলে। ফিটারবুড়া এতক্ষণে ঘুরিয়া আসিয়া বাধা দিয়া কহে, আরে বেটা, বাপ বেটিকে কাপড় দেয় না, তত্ত্বতল্লাস করে না?

হাতের কাপড় গোষ্ঠর হাতেই থাকিয়া যায়, সে হাঁ করিয়া ফিটার-বুড়ার মুখের পানে চাহিয়া থাকে, যেন কথাটা বুঝিতে পারে না। দামিনী নিঃসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসে, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন, মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল, সে গোষ্ঠর হাত হইতে কাপড়খানা তুলিয়া লইয়া যায়, যাইবার সময় বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিয়া যায়, বাবা, এইখানে আজ খাবে তুমি।

গোষ্ঠ কাঁদে, আর থাকিতে পারে না।

ফিটারের ভাবলেশহীন মুখখানারও কেমন পরিবর্তন হইয়া যায়, উদাস দৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া থাকে, মনশ্চক্ষে কি যেন সে দেখে। তারপর ধীরে ধীরে আপন মনেই বলে, আমারও একটি মেয়ে ছিল রে গোষ্ঠ, মা-মরা মেয়ে; এত রোজগার তখন আমার ছিল না, অভাবে খেতে না পেয়ে অন্ধকূপের মাঝে থেকে সেও এমনই রোগা, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, তারও এমনই ছেঁড়া কাপড় পরে দিন গিয়েছে, শেষে সে—

কথাটা আর সে শেষ করিতে পারে না, স্বর কেমন ভারী হইয়া উঠে, ঠোঁট দুইটা কাঁপে, বুড়া আর কথা কয় না, ঠোঁট দুইটা টানিয়া কম্পন সে রোধ করিতে চায়, কিন্তু চোখের জল বাধা মানে না।

ছোট মিস্ত্রী আসিয়া সরাসরি আপন ঘরে প্রবেশ করে; ঘটনাটা সে বুঝিতে চায়। ক্ষণপরে দিব্য হাসিমুখে আসিয়া গোষ্ঠকে কহে, এস টাইম হয়ে গেল যে।

গোষ্ঠ কহে, না।

সে কি হে, না কেন? আজ বিকেলে আবার—

না ভাই, ওতে হবেও না কিছু, আমি কাজই আর করব না। যে কাজ করে

রক্ত জল করে খেটে দুটো মানুষের পেটের ভাত জোটে না, পরনের কাপড় জোটে না, সে কাজের মুখে ঝাঁটা ; যাব না আমি।

ওর কণ্ঠস্বরে আক্ষেপের এমন করুণ প্রার্থনা ছিল যে, ছোট মিস্ত্রী পর্যন্ত বিচলিত না হইয়া পারিল না।

সবাই নির্বাক হইয়া বসিয়া ভাবে। ক্ষণপরে বড় মিস্ত্রী কহে, আচ্ছা মিস্ত্রী, আজ থেকে তো আর আমরা ওভারটাইম খাটব না, এ নিয়ে ধর একটা ছোটখাটো ঝগড়া হবেই, এই সঙ্গে যদি মাইনে বাড়ানোর আরজিটা রাখা যায়—

ছোট মিস্ত্রী সোৎসাহে লাফ দিয়া উঠিয়া কহে, বহুত আচ্ছা, চল সব, বলা যাক, মাইনে বাড়াতে হবে।

গোষ্ঠ কহে, হ্যাঁ, মাইনে বাড়াবে ; বলে কমাতে পেলে বাঁচে।

মনের আগুন উহাদের কথায় লাগে, কণ্ঠ উত্তেজিত হইয়া উঠে, কোন অজানা অহেতুকী আক্রোশ বুকের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

ছোট মিস্ত্রী ওই কণ্ঠে বলে, আলবৎ বাড়াতে হবে, না বাড়ায় রইল কাজ! বাড়াবে না চালাকি নাকি? এস তুমি। বিকেলে কি কাজ, এখুনি আমাদের সভা হোক ; ওই বটতলায় এখুনি জমাটবস্তি করব, সব দিব্যি করিয়ে নোব, কি বল?

শেষ কথাটা বুড়া মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহার মুখপানে তাকায়।

বুড়া সেই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, সেই হিম মৃদু কণ্ঠে কহে, ডাক সকলকে, বাউরীদের সুদ্ধু।

গোষ্ঠ, ছোট মিস্ত্রী বিপুল উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়ায়।

বটতলায় দাঁড়ায় বড় মিস্ত্রী ; একে একে শ্রমিকের দল আসিয়া জমিযা যায়, মেয়ের দল, গাড়ি-বোঝাই-করা মুটের দল, গাড়োয়ানের দল ; স্টেশনের জমাদার, বুড়া ড্রাইভার, পয়েন্টস্‌ম্যান—তাহারাও আসে। মেয়েরা প্রশ্ন করে, কি, হবে কি?

বস বস, জমাটবস্তি হবে।

মেয়েরা বলে, ঢং নাকি, দুপুর রোদে জমাটবস্তি! চল চল, কত কাজ পড়ে আছে, শেষে হাজরি পাব না।

গোষ্ঠ হাঁকে, যে যাবে সে বুঝে যাক, আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, রোগ হলে দেখব না, মলে ফেলব না।

মর্, তুই মর্, কেন রে মুখপোড়া, রোগ হলে দেখব না, দেখে তো সব উল্টে দিলে।

শোন সব।

বড় মিস্ত্রীর মোটা গলার আওয়াজ গমগম করে, কাহারও আর পা উঠে না, সব ফিরিয়া দাঁড়ায়।

বড় মিস্ত্রী বলে, যে সব আক্রা-বাজার চলছে, তাতে আমাদের আর কুলাচ্ছে না।

চারিদিকে আলোচনা শুরু হইয়া যায়।

গাড়োয়ান-সর্দার বলে, যা বলেছ মিস্ত্রী, ঝিঙের দর দু'পয়সা ছিল, দু'আনা হলো।

আর একজন বলে, ন' আনার কাপড়খানা ন' সিকে।

মেয়েরা বলে, পোড়ারমুখোরা বলে আবার, যুদ্দু লেগেছে গো, যুদ্দু লেগেছে।

বুড়ি সাবী বলে, আমরাই দেখলাম মা, পয়সায় দু' সের ঝিঙে, আট আনা দশ আনা চন্দ্রকোনা কাপড়। দু'পয়সা সের চাল, বাবা বলত—

ছোট মিস্ত্রী হাঁকে, চুপ চুপ।

তারপর উত্তেজিত আলোচনা।

কথা কিন্তু এক—বেশি মাইনে চাই আমাদের, বেশি মাইনে চাই। খেতে পাই না, পরতে পাই না।

আবার ঘুরিয়া আসে, বেশি মাইনে চাই।

একজন বলে, সে যদি ওরা না দেয় ?

না দেয় ধর্মঘট হবে।

তা হলে ধর্মঘট ?

মাইনে না বাড়ালে জরুর ধর্মঘট।

যে না করবে সে একঘরে।

ছোট মিস্ত্রী, গোষ্ঠ, সকলের চোখ দিয়া আগুন ছুটিয়া যায়, একটা উত্তেজনার প্রবাহ বুকে বুকে বহিয়া যায়।

অন্তরতম প্রদেশের অতৃপ্ত মানবাত্মা, এমন ভাবেই বিরূপাক্ষের মতো জটাজুট লইয়া জাগে চিরদিন।

কলের বয়লারের সিটিটা উচ্চ চিৎকার করিয়া উঠে, ভোঁ—ভোঁ।

গোষ্ঠ বলে, কে সিটি মারে রে ?

একজন বলে, বোধ হয় বাবুরা কেউ।

গোষ্ঠ বলে, হাঁক হাঁক, হুকুম আজ শুনছি না।

বুড়া ফিটার, ছোট মিস্ত্রী, গোষ্ঠ এমনই কয়জন মাতব্বর শ্রমিক গিয়া অফিসের দুয়ারে দাঁড়ায়।

পিছনে কলের দুয়ারে বুভুক্ষু মজুরের দল।

বুড়া খাজাঞ্চী বলে, কোন্ নবাবের বেটার বিয়ে ? কাজ কামাই করে বটতলায় হচ্ছিল কি ?

কে একজন বলে, তোর বাবার বিয়ে, তুই নিতবর যাবি ?

বুড়া ফিটার বলে, মালিকবাবুর সঙ্গে দেখা করব একবার।

যাও যাও, কাজে যাও, এরপর দেখা করো মালিকের সঙ্গে ; অনেক কাজ কামাই হয়ে গেছে আজ। সব মাইনে কাটব জেনে রেখো।

একজন বলে, মাইনে কাটলে আজ তোমার—

সমবেত জনতা চেঁচাইয়া উঠে, ধর্ ধর্, বুড়ো ভালুককে ধর্।

খাজাঞ্চী ঘরে গিয়া দরজায় খিল আঁটে, খোলা জানালা দিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাঁকে, পল্টু সিং! পল্টু সিং!

ম্যানেজার উপরের বারান্দায় আসিয়া হাঁকে, কেয়া হ্যায় ?

সমবেত জনতা চিৎকার করে, বেশি মাইনে চাই আমরা, খেতে পাই না, পরতে পাই না, আমরা বেশি মাইনে—

ম্যানেজার বড় মিস্ত্রী আর ছোট মিস্ত্রীকে ডাকিয়া লয়, তোম দুনো হিঁয়া আও।

সমবেত জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকে।

পল্টু সিং আসিয়া ক্যাশঘরের দরজায় বসিয়া বন্দুকটা খুলিয়া পরীক্ষা করে, শেষে সেটা বাগাইয়া ধরিয়া চাপিয়া বসে।

বহুক্ষণ পর বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী ফিরিয়া আসে।

বহু কণ্ঠ একসঙ্গে প্রশ্ন করে, কি হলো ?

বড় মিস্ত্রী কিছু বলিবার আগেই ছোট মিস্ত্রী চেঁচায়, ধরমঘট, ধরমঘট।

জনতাও চিৎকার করে, ধরমঘট, ধরমঘট।

পল্টু সিং বন্দুক ধরিয়া কহে, চলা যাও, কলসে নিকাল যাও।

কেউ তাকে দাঁত খিঁচায়, কেউ গালি পাড়ে।

বড় মিস্ত্রী বলে, সুরেনবাবু আর শিবকালীবাবুর'ও জবাব হয়ে গেল।

উত্তেজনার প্রবাহে অসন্তোষের বহ্নিদাহ কলের পর কলে ছড়াইয়া পড়ে; সব বুকের মাঝে যেন বিস্ফোরক পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, আজ অগ্নিসংযোগে ফাটিয়া পড়িল ; দলে দলে মজুর সব ধর্মঘট করিয়া বসিল।

কলগুলার চিমনিতে চিমনিতে আর ধোঁয়া উঠে না, দুরন্ত যন্ত্রগুলা অসাড় নিস্পন্দ ; দুয়ারে দুয়ারে গুর্খা পাহারা, নিষ্ঠুরতা মুখে মাখা, সমস্ত দেহখানা কর্কশ, কঠোর, কোমরে বাঁকা কুকরি, দিনের আলোয় শাণিত অস্ত্রটা চকচক করে, সারা অঙ্গ ব্যাপিয়া হিংস্র তীক্ষ্ণতা শোণিততৃষ্ণায় লকলক করে।

মজুরের দল প্রথম উত্তেজনায় নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে, জয়ের জন্য জীবন পর্যন্ত পণ করে।

কিন্তু অন্ন, অন্ন!

অনাহার যে দুর্বল করিয়া দেয় ; দীনের সম্বল—নাই, নাই আর নাই। দোকানে ধার দেয় না ; বলে, জলে যা পড়েছে তা পড়েছে, আর না বাবা, ফেল কড়ি মাখ তেল, আমি কি তোমার পর।

শিক-দেওয়া ঘেরা দোকানের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে কথা কয়। জ্ঞান যতক্ষণ থাকে মানের দায়ে পেটের দাহ সয়।

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মতো উদরের সমস্ত অন্ত্রপাতি লাভা-স্রোতের মতো টগবগ করিয়া ফুটে যেন।

কিন্তু অজ্ঞান শিশুর দল ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করে, মায়ের বুকের দুধ রসহীন গাঢ় জমাট হইয়া উঠে, উহা বুঝি ক্ষীর নয়, মায়ের বুকের লহু, শিশুর মুখে বিস্বাদ ঠেকে, কচি গলায় পার হয় না।

শিবকালী সুরেন নানা স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আনে।

আপন সঞ্চয়ের ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় বড় মিস্ত্রী, সুবল দেয় আপন দোকান, ছোট মিস্ত্রী আপনার সেই সাধের ঘড়িটা দেয়।

বুড়া ড্রাইভার চাঁদা দেয়, জমাদার দেয়, সবাই কিছু কিছু দেয়; দিতে পারে না গোষ্ঠ, একটু তাহার বুকে বাজে, দামিনী কোন গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করে সেই জীর্ণ বালা দুইগাছা, বলে, দিয়ে এস।

গোষ্ঠ মুখের পানে চায়।

দামিনী কহে, ওই ছেলেদের শুকনো গলায় আট আনার দুধ তো পড়বে; তাই আমার সে পাবে।

জ্বলন্ত শুষ্ক বুকের মাঝেও আজ যেন সেই সচ্ছল দিনের তরুণ গোষ্ঠটি ফিরিয়া আসে, অতি আদরে আজ দামিনীকে বুকে লয়; শুষ্ক পাংশু অধরে একটি চুম্বন আঁকিয়া দেয়, রুক্ষ চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে।

দামিনী একটু মিষ্টি হাসে।

এক সপ্তাহ। দুই সপ্তাহ। আরও পাঁচ দিন।

দুর্ভিক্ষ করাল গ্রাসে হা' হা করিয়া জাগে; হা-হা, অন্ন অন্ন, একমুঠা অন্ন; এত ক'টি ক্ষুদ, হা-হা।

মুখের লালা আঠা বাঁধিয়া যায়, জিভ চটচট করে, আর রব বাহিব হয না, মা চেঁচায়, বাপ চেঁচায়, ছেলেগুলা চেঁচায় না, অতি কষ্টে ধুকধুক করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ধরণীর মমতায জীবন কঙ্কালের আশ্রয়টুকু ছাড়িতে পারে না।

প্রাণের চেযে মান বড, এ দর্শনবাদ মানুষের আবিষ্কৃত, এ তাহার স্রষ্টার উপরে সৃষ্ট, মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো—দুনিয়ার সব ধর্ম সব দ্রব্যের বিনিময়েও আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায়, সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাকে মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে।

মানুষের আবিষ্কৃত এই দর্শনবাদ; এই সংস্কারের আধার মানব-সভ্যতা।

সভ্যতায় বঞ্চিত শ্রমিকদের উদরের জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠে।

দরিদ্র-দলের জন কয় উদবের জ্বালায় আবার গিয়া ধনীর দুয়ারে লুটাইয়া পড়ে, কাজ দাও, কাজ দাও, খেতে দাও, একমুঠো চাল, একমুঠো ক্ষুদ।

উপর হইতে ম্যানেজার হাঁকে, ভাগো, ভাগো, নেহি মাংতা হ্যায, চাই না, চাই না তোদের।

এরা তবুও চেঁচায়, কাজ দাও, দয়া কর, মালিক খেতে দাও।

গুর্খার দল কুকরি উঠাইয়া তাড়া দেয়।

গোষ্ঠ, ছোট মিস্ত্রী, কলের মিস্ত্রী, ফায়ারম্যান—এমনই জনকতক বিবরে রুদ্ধ সাপের মতো গর্জায়, পেটের আগুনের শিখা অনশন-রুক্ষ চোখের শিখায় নাচে।

উন্মাদের মতো বেইমানদের শাস্তি দিতে তাহারা বাহির হয়, হাতে কাহারও হ্যামার, কাহারও হাতে লোহার ডাণ্ডা, যেন শূলহস্তে রুদ্রের অনুচরের দল।

ধনীর প্রসাদভিক্ষু মজুর-দলের পথ আগলাইয়া ছোট মিস্ত্রী হাতুড়ি উঁচাইয়া কয়, কেন গিয়েছিলি তোরা ধরমঘট করে?

হাঁপানি-রুগী বাবুলাল টানিয়া টানিয়া কহে, কেন গিয়েছিলি, কে—ন

গিয়েছি—লি! খেতে দিবি, দিবি? তোরাই তো এই করলি, দে, খেতে দে, দে দে।

উদরের জ্বালায় হিংস্র পশুর মতো সে ছোট মিস্ত্রীর দিকে ছুটিযা আসে। ছোট মিস্ত্রীরও সকল সঞ্চিত ব্যর্থ ক্রোধ গিয়া পড়ে ওই নিরীহের উপর, হাতেব হ্যামারটা উন্মত্তের মতো হানিযা ছোট মিস্ত্রী হাঁকে, খবরদার!

বাস, ওই এক ঘাযেই শেষ, মাথার খুলিটা ডিমের খোলার মতো ফাটিযা রক্তের মজ্জায় সে এক বীভৎস দৃশ্য।

তবুও উহার ওই জীর্ণ পাঁজরা কযখানা দোঁপে, জীবনটা যেন ওই কয়খানা পঞ্জরের মমতা ছাড়িতে চায না।

দুর্বলের দল চিৎকার করিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে দুই দলেই লোক জুটিয়া যায়, তারপর একটা বিভীষণ, ঘৃণিত অধ্যায।

পশুর মতো এ উহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরে, ও ইহার মাথা ফাটাইয়া দেয়; ইঁট, পাটকেল, লাঠি। প্রেতের মতো তাণ্ডব নাচে সব। আর্তেব চিৎকাব, প্রেতের মতো উল্লাস।

দেখিতে দেখিতে পুলিশ আসিয়া পড়ে, তখন সব পালায; ছোট মিস্ত্রী পর্যন্ত।

স্থানটা খালি হইতে দেখা যায়, রক্ত, মাংস, মজ্জায় স্থানটা বীভৎস হইয়া উঠিযাছে, আর কয়টা দেহ, ভয়ার্ত শরণার্থীর দলের কযটা—বাবুলাল আব দুইজন, উন্মাদের দলের দুইটা—গোষ্ঠ আর একজন।

হাসপাতালে গোষ্ঠ মরিতে যায়, পাশে শিবকালী দাঁড়াইয়া। গোষ্ঠ অতি যাতনায় গোঙায়, তবু মাঝে মাঝে পেটের জ্বালায আক্রোশে চিৎকাব কবে, জান দেগা, লেকেন নেহি যায়গা।—বলিয়া প্রলাপের ঘোরে উঠিতে সহসা বিছানায় লুটাইয়া পড়ে।

ডাক্তার ও-ঘরে চলিযা যায়।

কম্পাউন্ডার হাতে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, করুণায় একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে, কহে, কি যে ফল হলো, মরতে গরিবই মল।

অদূরে তখন রেল লাইনের ধারে কয়টা কুলীর ছেলে ধর্মঘটের খেলা খেলিতেছিল, মাটির কলের উপর লাঠি চালাইয়া একদল কহিতেছিল তোড দিয়া, তোড় দিয়া।

সেইদিক পানে চাহিয়া শিবকালী আপন মনেই বলে, চৈতালী ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।

যতিভঙ্গ

□●□

কতদিন ঠিক মনে নেই, তবে বছর দু'তিনের বেশি নয়, একজন সাংবাদিক একটি ফিচার লিখেছিলেন—দিল্লী সম্পর্কে ফিচার—তাতে লিখেছিলেন একটি বিচিত্র-চরিত্র মোহিনী নারী সম্পর্কে।

দিল্লী আজকাল আর অনেক দূর নয়, সাংবাদিকদের কাছে তো নয়ই; তাঁদের কাছে আজ মস্কো, পিকিং, লন্ডন, নিউইয়র্ক সপ্তাহে সপ্তাহে যাওয়া চলে, দিল্লী আজ এবেলা গিয়ে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যেতে খানিকটা কনট প্লেসে ঘুরে ওবেলা ওই সব রহস্যময়ীদের দেখে কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ ফিরে আসা সম্ভবপর। এবং দিল্লীর কাছে—কলকাতার কথা থাক—বোম্বাই শহর রোমাঞ্চকর সংবাদ এবং রোমাঞ্চ সংবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে এই বিচিত্র-চরিত্র নারীর অস্তিত্ব গৌরবে হার মেনে যায় এ স্বীকার করতে হয়।

রূপে এবং সজ্জায় হয়তো বোম্বাই শহরের মনোহারিণীরা দিল্লীর কাছে হার মানবেন না কিন্তু চরিত্রবৈচিত্র্যে হার মানতেই হবে বোম্বাইকে। কারণ রাজধানী দিল্লীর পার্লামেন্ট হাউস থেকে চাণক্যপুরী পর্যন্ত যে প্রসারিত ক্ষেত্র—সে ক্ষেত্রে যে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য, তা শুধু আর্থিক সমৃদ্ধিতে উর্বর বোম্বাই-ক্ষেত্রে কখনও ফোটে না। ওর জন্যে প্রয়োজন হয় রাজনীতির রাসায়নিক সার প্রয়োগের।

যাক গল্পটা মনে করিয়ে দি। এই সাংবাদিক কুতুবের ওখানে এক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীকে দেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও অঞ্চলের রুজ লিপস্টিক মাখা মুখ, আঁকা ভুরু, চোখে কাজল, কেটে ফেলে ছোট করা খুকীবয়েসী কেশসজ্জা, পেটকাটা ব্লাউজ, ভারতীয় মনোহারিণী শাড়ি বাংলার ঢঙে পরা একটি মেয়ে; মুখে সিগারেট নিয়ে চপ্পল পায়ে গায়ে গায়ে যেন সেঁটে ছিলেন। বয়স তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ। একেবারে আবদেরে খুকীর মতো সাহেবের কাঁধে ঝুলেই ঘুরছিলেন একরকম।

ওখানকার রমণীরা স্বাস্থ্যবতী, শক্তিমতী, সাহসিনী—এই বেশভূষা তাঁদের অর্থাৎ নাগরিকাদের আটপৌরে। বাজারে দোকানে তাঁরাই বাজার করেন, দর করেন, বাড়িতে বাড়িতে এই বেশ-বাসকেই শক্ত করে ঘুরিয়ে কোমর বেঁধে গৃহকর্ম করেন, আপিস যাঁদের আছে তাঁরা এইভাবেই সেজেগুজে আপিস করেন। অফিসারের পদ থেকে কেরানীর পদ পর্যন্ত, টেলিফোন অপারেটারের কাজ থেকে রেলওয়ে বুকিং ক্লার্ক তক্। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে কোন্ দপ্তর নয়! মেয়েরা আজ জীবনের কর্মক্ষেত্রে সমান অংশীদার হতে চলেছেন। সেখানে পুরুষদের কোট প্যান্ট টাই-পরা সাহেবীআনা বা অফিসারিআনার সঙ্গেই বা বেশভূষাতেও তাল না রাখলে চলবে কেন?

তবে বাংলাদেশে আমাদের মেয়েরা বেশভূষায় চলনে বলনে এখনও বাঙালী ঘরের

বিনম্র মাধুর্য যেটা বজায় রেখেছে তা ওরা ফেলে দিয়েছে। তার সঙ্গে দিল্লী বোম্বাইয়ের তফাত অনেক—ওখানে রঙ চড়া এবং জীবনের ঢঙ কড়া। দিল্লী বোম্বাই-এর মধ্যে ফারাক—বোম্বাই রঙে চড়া, দিল্লী ঢঙে কড়া। বোম্বাইয়ে মেয়েরা ব্যস্ত এবং উল্লাসময়ী, দিল্লীতে মেয়েরা ব্যস্ততার মধ্যে শক্ত এবং উল্লাস প্রটোকলের ইস্তিরিতে পরিপাটি।

বোম্বাই-এর জীবনে টাকার দেমাক বেশি, দিল্লীর জীবনে টাকার চেয়ে মেজাজের দেমাক বেশি। দিল্লীর এই রঙ ও ঢঙের মধ্যে এই মেয়েটি আবার সেই মেয়ে যাকে দেখবামাত্র মনে হয় এ মেয়ে বিশেষ নাগরিকা—যে নাকি দিল্লীর এই রঙ-ঢঙকে দুনিয়ার যে কোন দেশের রঙ ও ঢঙের মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যার আঁচলে এই শ্বেতাঙ্গনন্দনটি অনায়াসে বাঁধা পড়েছেন, উনি কে, এই শ্বেতাঙ্গটিই বা কে সাংবাদিকের জানা ছিল না। তবে উনি কোন বিদেশের ধুরন্ধর গোপন তথ্যসন্ধানী এবং ইনি এদেশের গোপন পরিচয় সন্ধানকারিণী বা সংবাদ সরবরাহকারিণী হলে বিস্ময়ের কিছু নেই এটুকু তাঁর জানা ছিল। সুতরাং ক'দিন ঘুরে ঘুরে সংবাদ নিয়ে জানলেন, মেয়েটি নিছক বিলাসিনী। ওই শ্বেতাঙ্গনন্দনকে পাকড়াও করে জীবনে ধন্য হয়েছেন।

তিনি নিজেই বলেছিলেন, মদের গ্লাস হাতে বলেছিলেন, ওর সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। মিছে আমার পিছনে ঘুরো না; চলে যাচ্ছি আমি এ দেশ থেকে। এখন আমি আলেয়া, অনর্থক ঘুরে হয়রান হবে। বলে তিনি খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন ব্যঙ্গভরে।

সুতরাং তোঘলকাবাদে পুরনো কেল্লার যে অংশটায় বাজারের ধ্বংসাবশেষ, যেখানে রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট খুপরি দোকানঘরগুলির চিহ্ন আছে সেখানে এমনই এক বিচিত্র কন্যাকে দেখে বিস্ময়ের কিছু আমি দেখতে পাইনি। একলা একটি তরুণী বড় কুলুঙ্গির মতো একটা দোকানঘবেব মধ্যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দোকানের সেই ভাঙা ছাদের দিকে তাকিয়ে বসে অ'ছে; দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—পাঞ্জাবের রঙ টকটকে রক্তাভ গৌরী। মেয়েটি সুন্দরীও বটে। এবং লাস্যময়ী যা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। পরনের কাপড়ের জামার রঙ ফিকে নীল বা সবুজ দুটোর একটা, পাদুখানিকে খানিকটা ভেঁজে দুই হাতে মুঠো বেঁধে ধরে রেখেছে; লম্বা আঙুলগুলির নখের উপর টকটকে নেলপালিশ। হ্যাঁ, সেই মুঠোর মধ্যে একটা গগল্‌স ধরা ছিল। ওটা তো এযুগে আধুনিকতার বোধ করি একনম্বর সিগন্যাল। মুখে রঙ না থাকতে পারে, চুলও খাটো করে না কাটতে পারে কিন্তু গগল্‌স থাকবেই। চোখ তুলে অসংকোচে যার মুখের দিকে খুশি তাকাতে সংকোচের বালাই ঘুচে যায়, চোখে চোখে মেলে না; এবং যার চোখে গগল্‌স থাকে তার পরিচয়টাও একটু ঢাকা থাকে। পাশে পড়ে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ আর একটা ঝোলা। কিন্তু এ তো বড় বিচিত্র ভঙ্গি।

এমন করে সাতশো বছরের পুরনো ভাঙা কেল্লার দোকানের কুলুঙ্গিতে সাজানো পুতুল হয়ে বসতে ইচ্ছে হলো কেন ওর?

বিরহিণী?

অথবা অভিমানিনী কলহান্তরিতা?

কেল্লা দেখতে এসে প্রিয়জনের সঙ্গে কলহ করে এই ধ্বংসস্তূপের অলিগলির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে এমন করে বসে আছে। ধ্বংসস্তূপ বলে খেয়ালই নেই, এখানে সাপ কম বটে কিন্তু বিচ্ছু কম নয়; কীটপতঙ্গ তো আছেই। এবং ধ্বংসস্তূপের ফাটল, গর্ত তাদের অত্যন্ত প্রিয় স্থান। হাজার হলেও বাদশাহী ধ্বংসস্তূপ—সমতলের বা অনাবৃত মাটির গর্তের থেকে অনেক আরাম পায়। কীটপতঙ্গের কামড় বা দংশন মারাত্মক হয়তো নয় কিন্তু মর্মান্তিক; একটা লাল পিঁপড়ে কামড়ালেই সারা শরীরটা চমকে ওঠে, অর্ধেক দিন জ্বালা করে।

মনে মনে একটি সরস কৌতুক এবং কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়েছিল। এবং ক্যামেরা নেই বলে আপসোস হয়েছিল। একখানা ছবির মতো ছবি হত!

ওই দিকে তাকিয়েই এগিয়ে চলছিলাম। তার চোখের গগলস্ খোলা। অনাবৃত মুখখানাই দেখতে পাচ্ছিলাম। সে যেমন ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনিই রইল, আমাকে আমলেই আনলে না।

অল্প বয়স হলে এক্ষেত্রে প্রেমে পড়বারই কথা কিন্তু ষাট বছর বয়সের পর যখন 'বিদায় দে মা ফিরে আসি' গান মনে গুঞ্জন তোলে তখন দুনিয়ারই চেহারা পাল্‌টে যায়, ও-ভাবনা উঁকি মারলেও মানুষ তাকে ঘাড়ধাক্কা দেয়। অন্তত সজ্জনে দেয় এবং অসজ্জন আমি নই। যেতে যেতে থমকে না-দাঁড়িয়ে পারলাম না; কারণ মনে হলো—যা মনে হলো সে কথাটা সে আমার দিকে তাকাতেই বলে ফেললাম, একস্‌কিউজ মি মাদার, ডু ইউ ফীল আনওয়েল?

কারণ একটি বেদনার ছায়া যেন মেয়েটির রঙকরা মুখের রঙ ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল বলে মনে হয়েছিল আমার।

তার ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হলো, অন্যথায় একটু চাঞ্চল্যও সারা শরীরে দেখা গেল না। সে বললে, হোয়াট? হোয়াট ডু ইউ মীন?

আমি বললাম, আমার মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ অথবা ক্লান্ত বোধ করছ। সেই জন্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করছি।

—ধন্যবাদ তোমাকে। না, দুটোর কোনটাই নয়। কিন্তু তুমি আমাকে মা বললে কেন? সঙ্গে সঙ্গে বক্র হেসে বললে, আমি তোমার মা? তা হলে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ তোমারই তো মরবার বয়স হয়েছে।

তারপর আরও একটু হেসে বোধ করি তার শক্ত কথাগুলিতে একটু রসিকতার সিঞ্চন দিয়ে মোলায়েম করবার জন্যে বললে, তুমি খুব রসিক লোক। আমি কি খুব বুড়ো?

আমিও হেসে বললাম, তোমার এ কম্‌প্লিমেন্টের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি দুঃখিত, আমাকে মার্জনা করো, তোমাকে আমার ছোট্ট মা—লিট্‌ল্ মাদার বা ইয়ং মাদার বলা উচিত ছিল।

সেইভাবে আধ শুয়েই সে কথা বলছিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়েনি। যেন লীলাচ্ছলে

কথাগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল। সে হেসেই বললে, কিন্তু তাই বা বলবার দরকার কি ছিল?

বুঝলাম, এ মেয়ে চিরযৌবনের স্বপ্নে বিভোর, আধুনিকতার কড়া নেশায় আচ্ছন্ন; একটু রাগও হলো, সংবরণ করেই বললাম, দেখ, আমাদের ভারতবর্ষে সাধারণ মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক দুটি—

বাধা দিয়ে সে বললে, থাক, আমাকে বিশ্রাম করতে দাও। অনুগ্রহ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ যাও।

আমি কথা না বাড়িয়ে পা বাড়ালাম। মনের মধ্যে মেয়েটির কথাগুলো কাঁটার মতো খচখচ করছিল, জবাব না দিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না, তবুও এগিয়ে চললাম। মনে মনে বার বার বাংলাদেশের মেয়েদের কথা স্মরণ হলো। তারা এমন কথা কখনও বলত না। সেখানে মহেন্দ্রাণীর মতো রূপসী আছে। তারুণ্য এবং রূপ সম্পর্কে প্রতি পদক্ষেপে সচেতন মেয়েকেও মা বলে সম্বোধন করলে তারা শ্রদ্ধায় বিনম্র হয়। এরা বিশেষ করে ইউরোপের শিক্ষায় মোহমুগ্ধা দিল্লীর মেয়ে যারা, তারা জাত হারিয়েছে।

হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনলাম, হ্যালো! হ্যালো ওল্ড জেন্টেলম্যান!

ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে কুলুঙ্গি থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ফিরতেই সে ডাকলে, মেহেরবানী করে একবার শুনবে?

ফিরে এলাম। হয়তো সে অনুতপ্ত হয়ে থাকবে। নিজের পাওনাটুকু পাবার প্রত্যাশাতেই বোধ হয় ফিরে এলাম, বললাম, বল।

সে-ধার দিয়েও সে গেল না; ওর জাতই আলাদা। বললে, তোমার কাছে ফ্লাস্ক রয়েছে, কি আছে ওতে? জল না চা-কফি না—। থেমে গেল কিন্তু এরপর বলাই বোধহয় নিষ্প্রয়োজন ছিল।

আমি বললাম, না, সে পানীয় আমি রাখি নে। ওতে বিশুদ্ধ জলই আছে।

—আমায় একটু জল দেবে? তিয়াস পেয়েছে অনেকক্ষণ থেকে।

ফ্লাস্ক খুলে ঢাকনি-গ্লাসটা জলে ভরতি করে দিয়ে বললাম, নাও।

সেটা নিঃশেষ করে বললে, যদি পার আরও একটু দাও।

তাও দিলাম। এরপর সে বললে, ধন্যবাদ। কিছু মনে করো না, তোমাকে কড়া কথা বলেছি হয়তো।

বললাম, না, না। কি মনে করব? মরবার বয়স তো হয়েছে আমার। এবং সে সম্বন্ধে আমি একটু বেশি সচেতন। আমার বন্ধুরাও বলেন, এত বেশি ভাব কেন মৃত্যু-মৃত্যু করে?

—তুমি দার্শনিক?

এক কথায় ছেদ টেনে দিতে চাইলাম। এবং যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু সে বললে, অনুগ্রহ করে আর একটু দাঁড়াও।

দাঁড়ালাম।

—তোমার সব দেখা শেষ হয়েছে?

—আমি আগেও এখানে এসেছি। আজও এসেছি অনেকক্ষণ। এবার ফিরব। কিন্তু কেন বল তো?

—আমাকে নীচে রাস্তা পর্যন্ত নেমে যেতে একটু সাহায্য করবে? এরপর একটু ইতস্তত করে বললে, দেখিয়ে ময় নে আপকো ঠিক বাত নেহি বোলি থি।

এবার ইংরিজী ছেড়ে দিল্লীর উর্দুঘেঁষা হিন্দী ধরলে সে। বললে, পা-টা আমার জখম হয়েছে। একটা ঠোক্কর খেয়েছি। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটার নখটা ছড়ে গেছে। কাউকে না ধরে নামতে পারব না মনে হচ্ছে। বাসেও চড়িয়ে দিতে হবে।

কথা কেড়ে নিয়েই বললাম, নিশ্চয়। আমার সঙ্গে ট্যাক্সি আছে, সঙ্গেও কেউ নেই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আনন্দের সঙ্গে নিয়েও যাব। কিন্তু তুমি কি একা? সঙ্গে কেউ নেই?

সঙ্গের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে ধারণাটা তখনও মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

সে বললে, না। আমি একাই।

আমি সুযোগ পেলাম, ছাড়লাম না। বললাম, তাতে কোন সংকোচ করবার নেই। আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমাকে বৃদ্ধ ছেলে ভেবে অসংকোচে তুমি চল।

সে হেসে ফেললে এবার। বললে, এবার আমি আর প্রতিবাদ করব না। তবে দোস্তিতে দোষ কি? দোস্তি আমি বেশি ভালবাসি।

সে পা বাড়াল কিন্তু বাড়িয়েই যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল। এবং ঝুঁকে জখম আঙুলটার উপর হাত বুলিয়ে বললে, যা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশি জখম হয়েছে দেখছি।

আমিও দেখলাম, নখটা ফেটে প্রায় উঠে গেছে, শুধু একদিকটায় খানিকটা লেগে আছে। পা ফেলতে গেলেই উঠেপড়া দিকের প্রান্তভাগ চেপে বসে যাচ্ছে নরম ক্ষতটার উপর। ওর শাড়ির প্রান্তভাগ টেনে এতক্ষণ আহত আঙুলটা ঢাকা ছিল; হয় মাছির জন্য অথবা কেউ যাতে না-দেখতে পায় তার জন্য। অথবা দুইয়ের জন্যই।

আমি বললাম, আমার কাঁধে না হয় ভর দাও। আবার বলছি, ভেবে নাও আমি তোমার ছেলে।

সে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললে, উঁহু, যা সত্যি তাই ভেবে নিচ্ছি। দোস্তি হয়ে গেছে, দোস্তের কাঁধের উপর ভর দিয়ে চলছি।

আমিও নাছোড়বান্দা। বোধ হয় খুন চাপার মতো জেদ চেপেছিল, বললাম, কেন। এমন পবিত্র সম্পর্কে তোমার আপত্তি কি?

—ওটা মন-গড়া। সত্যি নয়। সেই জন্যে।

—আমি মরে যদি তোমার কোলে ফিরে আসি?

ঘাড় নেড়ে সে বললে, পূর্বজন্ম আমি মানি না এবং বিয়ে আমি করব না। সুতরাং—। সে হেসে ফেললে, বললে, কিন্তু আশ্চর্য লোক তো তুমি।

ওখান থেকে বেরিয়ে নীচে নামবার মুখে সে হঠাৎ দাঁড়াল। বললে, দাঁড়াও।

আঙুলটায় বেশ লেগেছে, ভুগতে হবে হয়তো। বলে সে সমস্ত ধ্বংসস্তূপটার সর্বত্র যেন দেখে নিলে। কারণটা ঠিক বুঝলাম না।

তারপর বললে, চল।

বললাম, তুমি ডাক্তারের কাছে বরং অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকশন নিয়ে নিয়ো।

—নেব। অন্যমনস্কভাবেই বললে। মনটা যেন তার দৃষ্টির সঙ্গে ওই তোঘলকাবাদের ধ্বংসস্তূপের বিশাল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'চল' বলেও সে দাঁড়িয়ে রইল, বললে, পা জখম হলো, ওখানটায় বসলাম। যন্ত্রণার মধ্যে ভাবছিলাম কি জান? ভাবছিলাম, সে আমলে হয়তো ওই দোকানটার কোন দোকানদারনী ছিলাম।

—তবে যে তুমি বললে তুমি পুনর্জন্ম মান না?

হেসে উঠল সে। বললে, তুমি উকীল?

—না।

—খুব ধরেছ তো! পুনর্জন্ম আমি সত্যি মানি না। তবে ভাবতে ভাল লাগে।

নীচে নেমে রাস্তার মুখটায় এসে বলল, কতকগুলো জোয়ান এসেছিল, এমন হৈচৈ করছিল। যাক, তারা চলে গেছে। যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে মেয়েটি।

প্রশ্ন করলাম, জোয়ান—। সাম্ ইয়ং স্টুডেন্টস্ অর ইয়ং মেন ইউ মীন?

—নো—নো—নো। আমাদের আর্মি মেন, আমরা জোয়ান বলি।

—কিন্তু তারা তো খুব ভদ্র। বদনাম তো শোনা যায় না।

—আমার কিন্তু—মানে আমি নার্ভাস হয়ে যাই। বিলকুল ভাল লাগে না ওদের।

ট্যাক্সির দরজাটা খুলে দিলাম। সে উঠে বসে কোণে ঠেস দিয়ে যেন নিজেকে এলিয়ে দিলে। আমি পাশে বসতেই বললে, আমাকে বিনয়নগরের পথে নামিয়ে দিয়ো। ওখানে একটা ফট্‌ফটিয়া নিয়ে নেব।

—কেন, বল না কোথায় নামবে তুমি—

—না—না—না। সে আমাকে কয়েক জায়গায় ঘুরতে হবে।

তাই গেল সে। সফদরজঙ এরোড্রোমের কাছে রেলওয়ে ক্রসিংটার কাছে এসে একটা ফট্‌ফটিয়া ডেকে বিনা বাক্যব্যয়ে সে নেমে চলে গেল। ফট্‌ফটিয়ায় উঠে বিলিতী বা অত্যাধুনিক ঢঙে হাত নেড়ে কি বললে, বাই বাই না গুড-বাই—ফট্‌ফটিয়ার বিশ্রী আওয়াজের মধ্যে ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে দুটোর একটা বটে।

গাড়ির ভিতরটায় এবং আমার নিঃশ্বাসে তখনও একটি মিষ্টি গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটি কথাও ঘুরছিল—বিচিত্র মেয়ে।

দুই

দিন দশেক পর। সাপ্রু হাউসে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। দাদাসাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের নাট্যকার দাদা মঞ্জরেকর ভারতবিখ্যাত; এমন ভাল মানুষ আর এমন নাটক-পাগল মানুষ বিরল। ওঁকে আমিও বলি দাদাসাহেব। দাদাসাহেব হাসেন আর বলেন, আরে ভাই তুমি তো বড় ভাল খেতাব দিলে এবং তুমিও খেতাব

নিলে। আমাদের দেশে আমার ভাইদের বলে দেব, তোমাকে বলবে—ছোটেদাদা শঙ্করজী।

সুরসিক মানুষ এবং সেই হেতু সুমধুর। এখন ডেরা দিল্লীতেই; নাতনী পরিবৃত হয়ে বাস করেন। সংসারে সম্বল কন্যা এবং কন্যার কন্যারা। সন্ধ্যাতে নাটকের, সংগীতের কোন-না-কোন আসরে থাকবেনই। আমাকে অনেকদিন থেকে ধরেছিলেন, তুমি কিছু নাটক দেখ; বিভিন্ন প্রদেশের নাটক। সন্ধ্যেবেলা কর কি এখানে?

—করি না কিছুই। ঘুরে বেড়াই।

কনট সার্কাসে গিয়ে ঘুরি, দিল্লীর জীবনযাত্রা দেখি। নিঃসন্দেহে একটা বলশালী জীবনযাত্রা। বলের সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রকাশভঙ্গির একটা সম্পর্ক আছে। কেউ উদ্দাম বললে বলব না—না, তা নয়। কেউ দৃপ্ত বললে তাতেও প্রতিবাদ করব না। অত্যাধুনিকতার ফেনার সঙ্গে আবর্জনা আবিলতার অনুযোগ করলে বলব, তা তো গোডাতেই বলেছি। পয়সার প্রাচুর্য কত তা অর্থনীতিবিদেরা বলতে পারবেন, তবে পযসা খরচ ওরা বেশি করে তাতে সন্দেহ নেই। যত স্যুট যত টাই, বার উঠে যাক, মদের দোকানে বিক্রি তত বেশি; আর মেয়েদের পোশাক এবং প্রসাধনদ্রব্যের প্রাচুর্যও দোকানে তত বেশি। এবং প্রতি পাঁচটি মেয়ের চারটির ঠোঁটে লিপস্টিক।

আরও বৈচিত্র্য আছে; ফুটপাথে পকৌড়ি ভাজছিলেন একজন প্রৌঢ় শিখ। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন পূর্বে, এখন বেকার দশায় জীবিকার জন্যে পকৌড়ি ভেজে বিক্রি করছেন। জন দুই-তিন গ্রাজুয়েট ড্রাইভারের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। একজন ফট্‌ফটিযা চালায়।

শুধু পাঞ্জাবী শিখেরাই নয় বাঙালীর ছেলেকেও দেখেছি। বি-এ পাস করে ডি-এ সুদ্ধ একশো চল্লিশ টাকা মাইনেতে লরী অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ঢুকেছে, তারই মধ্যে সন্ধ্যেতে ক্লাস করে এম-এ পাস করেছে। নতুন চাকরি খুঁজছে। আর্দালীর কাজ করে পড়ে আই-এ পাস করেছে। সে হয়তো আরও অনেক শহরেই করে কিন্তু এখানে বলিষ্ঠতা আছে তার জন্যই মুখখানা হাসি-হাসি।

মেয়েরাও এমনই। দোকানে বাজারে ক্রেতা হিসেবে তারাই প্রধান। দশটা থেকে অসংখ্য বাইসিকল্ চলে। কাজে আসে মানুষ, তাদের মধ্যে মেয়েরা সংখ্যায় কম নয়, বেশি। আর মেয়েদের অধিকাংশকে দেখেই ভ্রম হয়, ওই সব বিলাসিনী মেয়েদের আর একজন বলে। তবে তা হয় তো সত্য নয়।

এ ক'দিনে বেশ কয়েকজনকে আমার সেই মেয়েটি বলে ভুল হয়েছে; দু'চারজনের পায়ের দিকে তাকাতে হয়েছে বুড়ো আঙুলটায় ব্যান্ডেজ আছে কিনা দেখবার জন্যে। সেই দেখে তবে নিশ্চিত হয়েছি যে—না, এ সে নয়।

তবে এই ঘোরার মধ্যে আমার একটা অন্য নেশা আছে। সেটা হলো, ফুটপাথে তিব্বতীদের পুরনো মূর্তির দোকান। ইতিমধ্যেই অনেকগুলো মূর্তি কিনেছি আমি। আর দেখি কাঠের এবং ধাতুর উপর রিলিফে ফোটানো ছবি। কাশ্মীরী কাঠের কাজ, লতাপাতা, হরেকরকম নকশা-আঁকা কাঠের বাক্স, কলমদান, বইরাখা ছোট

ত্রিপদী—তারপর বাঁশের, বেতের, ঘাসের তৈরি হরেকরকম শিল্পদ্রব্য। আশ্চর্য মনোহারি এগুলি। জনকতক নেপালী নিয়ে আসে মালা, কাঠের উপর গালা দিয়ে পিতল বসানো গোল ঢালের মতো জিনিস, অ্যাশট্রে—এগুলি ওরা তৈরি করে এখানেই, কিন্তু চালায় খাঁটি তিব্বতী মাল বলে। প্লাস্টার অব প্যারিস এবং কাগজের মণ্ডে সিমেন্ট মিশিয়ে ছাঁচ থেকে ছবি তুলে চমৎকার ঘর সাজাবার শিল্পবস্তু তৈরি করেছে। কোনটায় রামসীতা, কোনটায় আদিবাসী দম্পতি, ভারতবর্ষ থেকে পারস্যের ওমর খৈয়ামের সাকী ও ওমর পর্যন্ত কত বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি। ঘোড়া, হাতি, হরিণ, পাখি, নানান ধরনের সুন্দর পুতুলও বিক্রি করে। কাগজের ফুল নিয়ে ঘোরে ফিরিওলা।

আমি এগুলি দেখে বেড়াই, কিনিও কিছু কিছু। এতেই সাড়ে আটটা বাজে; বাড়ি ফিরি। নটা বাজতে বাজতে গোটা নয়াদিল্লী জনশূন্য হয়ে যায়। নিওনের বিজ্ঞাপনগুলো সারারাত্রি জ্বলে কিনা বলতে পারি না। রিসেপশন, চা-পার্টি, সভা-সমিতিরও অন্ত নেই; তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলে নাট্য আন্দোলন। হিন্দু গুজরাটী মারাঠী—তামিল মালয়ালম—বাংলা ওড়িয়া অসমীয়া সকল ভাষার নাটক অভিনয় হয়। এর সঙ্গে লোকনৃত্য লোকসংগীতও আছে। কিন্তু সর্বত্রই মেয়েরা যায় মুখে রং মেখে, পুরুষকে যেতে হয় মুখোশ পরে খোলস পরে—মুখোশটা রাজধানীর ভদ্রতার কানুনের—প্রটোকল বা যা খুশি বলুন—আর খোলস হচ্ছে পোশাকের।

এখানে মেয়েদের আর দোষ দেওয়া যায় না। তারা শাড়ি স্যান্ডেল বজায় রেখেছে। পুরুষদের সবই কোট, প্যান্ট, অবশ্য গলাবন্ধ কোট। আর শেরওয়ানী চুস্ত পায়জামা। দুটোতেই আমার নিজের চোখে নিজেকে খুব বেমানান লাগে, কাজেই ওই সব পরবার ভয়ে ওদিকে হাঁটি নে। এমন কি বাংলা নাটকেও না।

এবার কিন্তু দাদাসাহেবের হাত এড়াতে পারলাম না। তিনি নাটক নিজে সংশোধন করেছেন, এবং অভিনয়ের ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁর উপদেশ নির্দেশ এ নাটকের এক বিশেষ অঙ্গ এবং তা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। দাদাসাহেব নিজে যাবার সময় আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ ধরে নিয়ে গেলেন। আসন পেলাম প্রথম সারিতেই। নাট্যানুরাগী না হয়েও কর্তব্যের দায়ে নাট্যান্দোলনে উৎসাহদাতা হিসেবে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসে আছেন। দাদাসাহেব প্রসন্ন উদার মানুষ, সকলকে সহাস্য অভিনন্দন জানিয়ে বসলেন।

আলো এবং সাজসজ্জার চমৎকারিত্বের প্রশংসা না করে পারলাম না।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নয়া জমানার জীবন নাটক "এক-হিসাব।"

দাদাসাহেব বললেন, আমরা এ লিখতে পারি নে শঙ্করজী। বলতে বলতেই লাউডস্পীকারে ঘোষণা হলো—"১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল"।

ভিতর থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল শঙ্খধ্বনি, তার সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টা। তার ধ্বনি মৃদু হলো—থামল না, তারই মধ্যে 'আওয়াজ' উঠল—'স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ' 'আজাদ হিন্দোস্তান'—'জনতাকে রাজ!' 'জিন্দাবাদ'! তারপর একে

একে—'জয়—জয়—জয়' 'স্বাধীন ভারত কি'—'মহাত্মা গান্ধী কি'—'পণ্ডিত নেহেরু কি!' 'জয়—জয়—জয়!'

যবনিকা উঠল। গভীর অরণ্য, গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারই মধ্যে কয়েকটি গাছের আভাস। অরণ্যভূমির ভিতর দিয়ে সড়ক চলে গেছে। একটি কাঠের ফলক পোঁতা রয়েছে পথের ধারে, তাতে আরবী দেবনাগরী এবং ইংরেজি হরফে লেখা রয়েছে কিছু; ফোকাসের আলো পড়ল; ইংরিজীতে পড়লাম 'দিল্লী টু দেবগিরি।"

পিছনে সানাই-এর সঙ্গে রোশনচৌকি বাজতে লাগল। তার সঙ্গে গান আরম্ভ হয়। এক বিখ্যাত হিন্দী কবির স্বদেশী সংগীত।

এরই মধ্যে ওই একটা গাছের পিছন থেকে একটি মূর্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল, লোকটার একটা পা নেই। একটা খাঁজওয়ালা গাছের ডালকে ক্রাচের মতো ব্যবহার করে তার উপর ভর দিয়ে চলছে। দাঁড়াল স্থির হয়ে, শুনতে লাগল গান। গান থামলে আবার ধ্বনি উঠল—'আজাদ হিন্দোস্তান'—

—জিন্দাবাদ!

—স্বাধীন ভারত—

—জিন্দাবাদ।

—জনতাকে রাজ—

—জিন্দাবাদ!

লোকটির মুখের উপর আলো পডল। শিউরে উঠলাম।

লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা কঙ্কাল-আঁকা পোশাক, কবর থেকে উঠে এল যেন। জিন্দাবাদ শেষ হতেই সে প্রশ্ন করলে, জনতাকে রাজ হয়ে গেছে? হো—ভেইয়ো!

—হাঁ—হয়ে গেল। আজই। শুনছ না, আওয়াজ উঠছে—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে!

কঙ্কালের পোশাকটা এবার খুলে পড়ে গেল। বের হলো মানুষ। একজন অন্ধ। প্রাচীন ইসলামী আমলের পোশাক। অন্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডাল-ক্রাচের উপর ভর দিয়ে সে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বললে, আমার পা—! তা হলে আমার পা ফিরিয়ে দাও!—আমার পা!

—কি হলো তোমার পা?

—ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

—কে?

—কে আবার? রাজা। সোলতান।

—কোন্ রাজা? কোন্ সোলতান? কবে?

—তা হলে শোন আমার ফরিয়াদ।

পর্দা নেমে এল।

আবার নেপথ্য অভিনয়। ঘোষণা হলো, করিব্ সাত শও বরিষ। দেহলিতে তখন তুঘলকাবাদে সোনালী মিনা করা ইঁটে গড়া সোলতানি মহল, সকালবেলা সূরযদেবের

আলোর ছটায ঝকমক করে ওঠে। মানুষের চোখে সে ছটা লেগে দৃষ্টি অন্ধা করে দিত। হাঁ—সেই 'তুঘলকাবাদ'!

কণ্ঠস্বর এই লোকটির।

বলতে বলতেই পর্দা উঠল।

এবার একেবারে পশ্চাৎপটে সোনালী রঙে আঁকা সোলতান মহলের মাথাটা জেগে রয়েছে। আর সম্মুখে তুঘলকাবাদের সেই বাজাব। সেই আট-দশ ফুট চওডা রাস্তার দু'পাশে কুলুঙ্গির মতো দোকান।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেই বিচিত্র মেয়েটিকে। মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল, "সে আমলে হয়তো এই দোকানে দোকানদারনী ছিলাম।" তা থাক বা না থাক, জন্মজন্মান্তরের অনেক নদী নালা সমুদ্র বা খাঁড়ি পার হয়ে সে আবিষ্কার করা অসম্ভব কিন্তু তার সঙ্গে এই নাটকটার মনে হলো যেন সম্বন্ধ আছে, অন্তত শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সম্ভব। কারণ সে যে মেয়ে তাতে এখনই যদি দেখতে পাই পায়ে ঘুঙুর বেঁধে সে আমলের নাচুনীর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে নাচতে নাচতে বেবিয়ে সে আসছে তবে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। সম্ভাবনাটা দূরে ফোটা ফুলের গন্ধের মতো মনের মধ্যে একটি বিচিত্র ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু না, দোকানেব দোকানদার-দোকানদারনী যারা তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম না তাকে। দোকানদারনী একজনই ছিল, দোকানদাবনীও তাকে বলা চলে না, ফিরিওয়ালী—পথের ধারে—একেবারে সম্মুখেই সবজীর পসরা নিয়ে বসে ছিল। নেপথ্য থেকে দিল্লী অঞ্চলের ছোট ঢেঁডা বেজে উঠল, তাব সঙ্গে দেশী শিঙা। ঘোষণা শুরু হলো, "লা ইলাহি ইলাল্লা। প্রিয় নবী পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদের রসুলাল্লার অনুগামী, হিন্দোস্তানের সোলতান—হাতিমেব চেয়ে বড দানী—অদ্বিতীয় জ্ঞানী—রুস্তমের থেকেও বীর, মালিক সলতান মহম্মদ তুঘলকের এই হুকুমৎ আজ থেকে জারি হলো হিন্দোস্তানে।"

হুকুমৎ—আজ থেকে হিন্দোস্তানে "চাঁদি আওর সোনেকা সিক্কা রূপেয়া আর চলবে না। নতুন সিক্কা রূপেয়া চল হলো—সে সিক্কা তৈবি হবে পিতল আর তামার। আরও চল হলো চামডার নতুন মোহরের। যারা কারবার করবে 'পুরানি' সিক্কা মোহরে তাদের উপরেই সোলতানের এই হুকুমতকি জোরসে সাজাই হো যায়েগা।"

আবার নাকারা শিঙা বাজল, বাজাতে বাজাতে তারা চলে গেল। এতক্ষণ দোকান থেকে দোকানীরা মুখ বাড়িয়ে শুনছিল, মেয়েটি দাঁড়িপাল্লা ধরে ওজন করছিল—সেই পাল্লার দড়ি ধরেই শুনছিল—অবশ্য চতুবতার সঙ্গে গডিয়ে ফেলে দিয়েছিল কিছু সবজি; এবার তারা একসঙ্গে হায় হায় কবে উঠল। হায়—হায়—হায়! মেয়েটা কপালে চাপড মেরে বললে, হা রে নসীব—হা!

দোকানীরা রাস্তায় নামল।

—পিতলেব সিক্কা? হা রে হা!

—চামড়ার মোহর! হে ভগোবান!

—হায় পরমাত্মা!

—হে আল্লা! হায় রসুলাল্লা! তোমরা ছাড়া কে এই সোলতানকে সমঝে দেবে?

—কিন্তু এত বড জ্ঞানী লোক! এত ভারী পণ্ডিত দুনিয়াতে নেই। অ্যাঁ!

—আরে যদি মদ খেতো তো বুঝতাম মাতালের খেয়াল!

—চু—চু-চু! কি আপসোস! যে লোক মদ খায় না—কসবী তো কসবী কোন ঔরৎ—যতই কেন তার সুরত্ থাকুক তার দিকে তাকায় না; তার এ কি উদ্ভট খেয়াল! তামা পিতল—চাঁদি সোনার ফারাক বুঝতে পারে না।

—বাপকে মারে দরবারের মেরাপ চাপা দিয়ে—

—আরে—চুপ্—চুপ্!

—চুপ করব কি করে? আমার ঘরের চাঁদি সোনার সিক্কা মোহর নিয়ে আমি করব কি?

একজন বললে, মিট্টির তলায় গেড়ে রাখ শেঠজী। নেহি তো—

কথা কেড়ে নিয়ে এবার মেয়েটি বলে উঠল, নেহি! শেঠ মেহেরবান কদরবান আমাকে দিয়ে দাও, আমাকে গয়না গড়িয়ে দাও! আমার পিতলের কাঁকনি খাড়ু সব—সব তোমাকে দিয়ে দেব। চাও তো আমার জোয়ানি ভি দিয়ে দেব তোমাকে! আঃ হা—কি খুবসুরত্ তুমি শেঠ! কি খুবসুরত্!

এই সময় শোনা গেল গান—।

গানটা ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে হিন্দী উর্দু গানের মধ্যে যে ভারতীয় সংগীতের আমেজ আছে, বোম্বাই ছবির অত্যুগ্র ইউরোপীআনা অনুকরণের মধ্যেও যে আমেজটি মরেনি, নাটকের গানখানিব মধ্যে সেই আমেজ আরও স্পষ্ট এবং গাঢ়।

দাদাসাহেব বাঃ বাঃ বলে উঠলেন এমন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে যেন মনে হলো তাঁর রসোপলব্ধির উল্লাস বা আনন্দ অজ্ঞাতসারে, অন্ধকার রাত্রি নামার মুহূর্তে প্রতীক্ষার জন্য সুইচ অন করে আলো জ্বেলে সামনে দাঁড়ানোর আনন্দের মতো অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

সুর আমারও ভাল লেগেছিল কিন্তু কথা বুঝিনি, তাই আলো জ্বালায় যে আনন্দ সে আনন্দের বেশি আমার কিছু হয়নি। যে আলো জ্বেলেছে তাকে চিনতে পারিনি। দাদা বললেন, চমৎকার গানটি। সুন্দর।

—আমাকে বুঝিয়ে দেবে? উর্দু ঠিক বুঝি না।

হেসে দাদা বললেন, অনুবাদে তো রস নেহি মিলেগা ভাই। দেখ, আমের তার কি আমসিতে কি আমসত্ত্বতে মেলে?

হেসে আমিও জবাব দিলাম, যে আম খায়নি তার পক্ষে আমসত্ত্ব ছাড়া আমেব স্বাদ বুঝবার উপায় কি বল? না-হলে সাগর ডিঙিয়ে লঙ্কা যেতে হয়।

—চুপ কর। ওরা ঢুকছে।

—কারা?

—হিরো-হিরোইন।

আবার চকিতের জন্য মনে হলো, সে ঢুকছে। মনে হলো নয়, একেবারে প্রায় নব্বুই নয়া পয়সা বিশ্বাস হয়ে গেল।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক আর তার হাত ধরে ভিক্ষুণী। দু'জনের হাতে দুটি বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষে করছে গান গেয়ে। আলোর ফোকাস পড়ল তাদের মুখে—আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, এ তো সেই। সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, সেই—। না, মুখের ঢঙটা তো ঠিক। এমন রঙ তার মুখে সেদিনও ছিল কিন্তু আজকের রঙ অনেক চড়া। তাছাড়া দু' পাশে লম্বা বেণী, কেশ প্রসাধনে সে আমলের ছাঁদ, পরনে ঘাগরা কাঁচুলি ওড়না, হাতে মোটা রূপদস্তার বালা কাঁকন। নাকে নাকছবি। পালটে যাবারই কথা, কিন্তু এতখানি পাল্টাবে?

দাদাসাহেব ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, গানের অর্থ হলো—"ইমাম সাহেব তোমার বসবার জন্যে মসজিদ তৈরি করেছে—হীরা মতি দিয়ে কতই না নকশা কেটেছে আসনে। শাহানশাহ্ বিশাল কেল্লা বানিয়ে তার উপর গম্বুজ তুলে, সেই উচ্চলোকে বসবার জন্যে তোমাকে ডেকেছে। ইমাম কত বয়েৎ তৈরি করে তোমার স্তব করেছে; শাহানশাহ ঘোষণা করে বলেছে সে তোমারই প্রতিনিধি। কিন্তু কি বিচিত্র তুমি! আমি অন্ধ, সামান্য আমার কুটীরে এসে দাঁড়ালে তুমি। আমি বললাম, কোথায় বসাব তোমাকে রাজ-রাজেশ্বর! তুমি বললে, তোমার এবং তোমার প্রিয়ার যে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত বিনম্র কোমল হৃদয় সেখানেই বসব আমি। বললাম, কি বলে স্তব করব তোমার? তুমি বললে প্রেমের গুণগান কর, তাতেই আমার স্তব হবে। জ্ঞানের আসনে আমি উত্তাপ অনুভব করি, সম্পদের আসনে সোনার তৈরি কণ্টক আছে—আমাকে বিদ্ধ করে। প্রেমের আসন দূর্বাঘাসের আস্তরণের কোমল মখমল। ওই ঘাসের ফুলের মালা গেঁথে আমাকে বন্দনা কর। ওই ঘাসের বীজ থেকে অন্ন তৈরি করে আমার ভোগ দাও।"

মিথ্যা বলব না, মনে হলো এ যদি আধুনিক রচনা হয় তবে তো—। একটু কাঁটা ফোটার মতো খচ্ করে কিছু বিঁধল। প্রশ্নই করলাম, এ কোন আধুনিক কবির রচনা?

—হ্যাঁ। অবশ্যি মির্জা গালিবের কাছে ধার করেছে। তবে হিন্দু কবি তো—ফুলের মালা, ভোগ এগুলি ভুলতে পারেনি।

একটু চুপ করে থেকে দাদাসাহেব বললেন, তোমাদের রবিবাবু আর উর্দুওয়ালাদের গালিব মস্ত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

কথা শেষ হতে হতেই নেপথ্যে কলরব উঠল, সোলতান—সোলতান! শাহানশা আসছেন! শাহানশা!

একজন সিপাই এল: হঠ যাও—হঠ যাও! হঠ যাও! সরে যাও সব—সরে যাও।

একজন নকীব সুলতানের নাম ঘোষণা করলে।

লোকজন সব মাথা ঈষৎ নত করে দাঁড়াল।

তারই মধ্যে একজন আতঙ্কিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলে উঠল, এয় আল্লা! আরে ব্বাপ্!—কার শির গেল?

সকলে আড়চোখে তাকালে। একজন জল্লাদ ঢুকল। তার কোমরে কুঠার, হাতে একটা বর্শা, তার মাথায় একটা মুণ্ডু।

তার পিছনেই ঢুকল সুলতানের তাঞ্জাম।

জল্লাদ বললে, দেখ, এই আদমীর মাথা গেল। এই আদমী কে জান? এ হলো সুলতানের মীরবক্সী, আমীর উল উমরা ফিরোজজং সিপাহ্ সরদার জাফর খাঁ। আমীরের দেমাক ছিল কি, সে বহুৎ পণ্ডিত লোক। পাদশাহী-মমালক্ সোলতানকে সে বেওকুফ মনে করেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল, সোলতান যে হুকুম জারি করছেন; তামা পিতলের সিক্কা চাঁদি সোনার সিক্কার বদলে চলবে—তা ভুল। তামা পিতল আর চাঁদি সোনা এক নয়। চাঁদি সোনার কদর বেশি। তকরার করেছিল। বলেছিল, পাদশাহ্ বিচার করুন—আমীর ওমরাহ্ রইস-আদমী, আর গরীব যারা ছোট কাম করে, ভিখারী যারা ভিক্ষা করে খায় তারা যেমন এক নয—তেমনি তামা পিতল আব সোনা চাঁদিও এক নয়। সুলতান বলেছিল, বল, কি কারণে নয? এরাও মানুষ, ওরাও মানুষ। ওমরাহ বলেছিলেন, পাদশাহ্ মালিক, কিন্তু বুঝে দেখুন, যিনি দিনদুনিয়ার মালিক তিনি পাদশাহকে তাঁর হাত প্রসারিত করে রক্ষা করেন। তাঁর চেঁযে কম হলেও আমীর ওমরাহদের রক্ষা করেন, কিন্তু এই গরিবান, এদের উপর কি সেই হাত তেমনি করে রক্ষা করে? করলে এরা হামেশা হামেশা এমন করে দলে দলে মরে কেন? রোগে অনাহারে হরদম মরে। তেমনি সেই নিয়মে পিতল কাঁসাও মরে—তুরন্ত জলদি ক্ষয়ে নষ্ট হয়। পাদশাহ বলেছিলেন, তবে আল্লাহ্তায়লার মর্জিতে পাদশাহ খুন হয়, হেরে যায়, পালিয়ে ভিখারী হয়। ভিখারী পাদশা হয় কেন? তুমি জান, পাদশা কুতুবুদ্দিন ছিল মহম্মদ ঘোরীর খরিদ-করা বান্দা। এই তুঘলক পূর্বপুরুষ—আমার পিতামহ্ একজন করৌনা তুর্ক—সেও ছিল বলবনলোকের খরিদ করা বান্দা! আজ কি করে আমি সোলতান? ওমরাহ্ বলেছিল, খোদার মর্জি। পাদশা বলেন, হাঁ ঠিক। বেশক্। কিন্তু খোদার মর্জিতে যেমন বান্দা হয় পাদশা তেমনি পাদশার মর্জিতে তার শিলমোহরের ছাপে সিক্কা মোহর পায় মোহরের ইজ্জত আর কিম্মৎ। সে সোনা হোক আর চাঁদি হোক। কি দাম সোনার চাঁদির যতক্ষণ তাতে পাদশাহী ছাপ না পড়ে? খোদাতায়লার মর্জিকে মানুষ বলে, খেলা! তাঁর মর্জি হলে পাদশা আমীর বসে থাকতে থাকতে মরে। হয়তো তিনি বসান সেখানে কোন গরীবকে। ঠিক কি না? মীরবক্সীকে মানতে হয়, হাঁ হুজুর। এ ঠিক বাত। পাদশা তখন হুকুম দেন: পিতল তামা পাবে এতদিনের সোনা চাঁদির সিক্কার ওমরাহী পাদশাহী মর্জিতে, তার শিলমোহরের ছাপে। আর সেই সঙ্গে খোদার মর্জিতে মীরবক্সী হবে দেওয়ানখানাব কোন গোলাম। সোনা চাঁদির আমলের মীববক্সী জাফর খাঁয়ের শির যাবে জল্লাদের কুড়ালির ঘায়ে। তা না-হলে তো কায়েম হবে না পিতল-তামার সিক্কার ওমরাহী। এই সেই বেওকুফ্ মীরবক্সীর মুণ্ডু। তোমরা হুঁশিয়ার হবে এই বেওকুফি থেকে।

দীর্ঘ বক্তৃতাদি সে করছিল উইংসের মুখে দাঁড়িয়ে। পিছনে ভিতরে তাঞ্জামের মুখটা দেখা যাচ্ছিল। বাজারের লোকেরা স্থির। আমি দেখছিলাম, অন্ধ ভিক্ষুক, তার চেয়ে বেশি করে তার সঙ্গীকে। মনের মধ্যে সেই প্রশ্ন—এ কি সেই? কিছুতেই যেন জ্যামিতির দুটি কোণ সমান ও দুটি ত্রিভুজের মতো এক হয়ে মিলে যাচ্ছিল না। মেয়েটি এবং অন্ধ লোকের ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করছিল। সে চেষ্টা যেন বিশেষ চেষ্টা।

ঘোষণার পর মুণ্ডশীর্ষ বর্শাধারী জল্লাদ এগিয়ে গেল, পিছনের তাঞ্জাম এসে ঢুকল রঙ্গমঞ্চে; কুর্নিশ পড়তে লাগল অজস্র এবং বারবার।

সুলতান স্মিতহাস্যে ঘাড় নাড়লেন; তারপর বললেন, কে আছে এখানে গরীব? সামনে আ-যাও!

এল সেই সবজিওয়ালা, দুনিয়ার মালিক, মেহেরবান শাহানশা, আমি বড় গরীব।

—আচ্ছা। লে, ইয়ে লে।

মুঠো ভরে মুদ্রা বাড়ালেন পাদশা, সে আঁচল পাতলে। পড়ল ঝরে পাদশাহের মুঠো থেকে।

—আর কে আছে?

ব্যস্ত হয়ে একজন দোকানী অন্ধকে বললে, জলদি যাও! জলদি করো!

সঙ্গিনী অন্ধের হাত ধরে নিয়ে এল সামনে। দাঁড়াল। পাদশাহের হাত উঠল মুদ্রামুষ্টি নিয়ে। উঠে অকস্মাৎ থেমে গেল। একটু ঝুঁকলেন, বললেন, আরে, এ কে? তুমি তো—কবি—সৈফুদ্দিন—! সায়রে শের!—অ্যাঁ?

কুর্নিশ করে অন্ধ বললে, হাঁ শাহানশা, আমি সেই সৈফুদ্দিনই বটে!

—আচ্ছা তুমি দিল্লীতে আছ এবং বেঁচে আছ?

ফের কুর্নিশ করে অন্ধ বললে, হাঁ দুনিয়ার মালিক মেহেরবান সোলতান!

—হাঁ—হাঁ। জরুর আমি মেহেরবান। জরুর। হাজারোবার।

—হাঁ—পাদশাহ। সে কথা কেউ না বললেও লাখোবার সত্য। সূর্যের উত্তাপ প্রখর, তার মেহেরবানীই ওই উত্তাপের মধ্যে, সে কথা না বললেও সত্য।

—এই তো, এই জন্যেই তোমাকে বলতাম, সায়রের মধ্যে তুমি শের। কবির মধ্যে সিংহ। ওঃ, কতকাল তোমার এমন মূল্যবান কথা শুনিনি। তাই মধ্যে মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। তবে তুমি বড় দুর্বলচিত্ত। কবি, কাদায় নরম মাটিতে ফসল হয় মানি, কিন্তু হীরে দুনিয়ার সব থেকে কঠিন—শক্ত। মাটিতে গাছে ফুল হয় মানি, কিন্তু আজ ফুটে কাল ঝরে যায়। কিন্তু হীরে? সে আকাশের এক সূর্যকে পলে পলে খাঁজে খাঁজে ধরে হাজারো করে তোলে আর রোশনির ফুলঝুরি ফুটিয়ে দেয়। আর ফোটায় হাজারো কেন লাখো বরষ ধরে। তাই বা কেন, দুনিয়ার জিন্দিগী যতদিন ততদিন। কি, আমি ঠিক বলিনি?

—এর চেয়ে আর সত্য হয় না সুলতান; আপনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আমি দুর্বল, সত্যই দুর্বল।

—হাঁ। তুমি ঔরৎ লেড়কার চেয়েও দুর্বল। দোয়াবে বিদ্রোহীদের দমন করে তাদের ঘেরাও করে জানোয়ার শিকারের মতো শিকার করেছিলাম। তুমি বুঝতেই পারলে না আমি কেন করেছিলাম। কেন জান? মানুষ বড় না জানোয়ার বড় তাই দেখতে চেয়েছিলাম। শিকার দেখেছ? বাঘ পালায় ভাল্লুক পালায়। গোড়াতে পালায়, কিন্তু শেষে যখন মুখোমুখী হয় সে তখন লড়াই দেয়। জবর লড়াই। মানুষ শুধু কাঁদে। কাঁদে আর মরে। জানোয়ারের চেয়ে অনেক ছোট। তুমি তাদের কাঁদতে কাঁদতে মরা দেখে কাদলে, তাই মেহেরবানী করে চোখ দুটো অন্ধ করে দিয়েছিলাম। ভালই করেছিলাম, না হলে তুমি অনেকবার কাঁদতে আর আমাকে বিবক্ত করতে। আজও এই মুণ্ডুটা দেখে কাঁদতে। কাঁদতে না?

—হাঁ মেহেরবান সুলতান। মনে মনে আপনাকে হাজার সেলাম জানিয়েছি।

হা হা করে হেসে উঠলেন সুলতান। বললেন, সত্যি বলছ সৈফুদ্দিন? সচ্ বাত? খোদা কসম?

—খোদা কসম, সচ্ বাত শাহানশা!

—ঝুটা নেহি?

—কভি না, শাহানশা। ঝুটা নেহি!

—আচ্ছা! কিন্তু—

স্থিরদৃষ্টিতে এতক্ষণে তাকালেন পাদশা তাব সঙ্গিনীব দিকে। সে মুখ নত কবে অন্ধের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। বললেন, এ কে সৈফুদ্দিন?

—ও এক ভিক্ষুকের মেয়ে, নিজেও ভিক্ষে করত। আমি অন্ধ হয়ে শহবের বাইবে গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম—তখন যন্ত্রণায় অজ্ঞান—সেই সময় আমার শিয়রে এসে বসেছিল। আজও আমাকে ছাড়েনি।

—সচ্ বাত?

—খোদা কসম সুলতান।

—কিন্তু তোমাদের সম্পর্ক কি?

—ওকে আমি সাদী করেছি হজবৎ।

—সচ্ বাত?

—খোদা কসম!

—আচ্ছা! কিন্তু তুমি—

মেয়েটি কাঁপছে।

—তোল্—মুখ তোল্। দেখি তোকে! তুই কবিসিংহের প্রিয়তমা সাকী।— আরে, দুনিয়ার মানুষ জানে মহম্মদ তোঘলকেব কখনও ঔরতের ভুখা নেই! কখনও পরের মেয়ে ছোঁয় না। মুখ তোল্।

সে তুললো মুখ। পাকা অভিনেত্রী। আতঙ্কে যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সুলতান আর একবার অট্টহাস্য করে উঠলেন। সব স্তব্ধ। হাসি থামিয়ে সুলতান

বললেন, সৈফুদ্দিন, বল তো, কানা করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি তোমাকে কালাও করে দিয়েছিলাম?

—না শাহানশা!

—হাঁ। কিন্তু করে দেওয়াই আমার উচিত ছিল। ইচ্ছে হচ্ছে আজ সেটা করে দি।

—মেহেরবান সুলতান—

—আরে, তুমি সৈফুদ্দিন, সত্যি কথা বলছ! তুমি শিরিনকে গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পারনি? গান শুনেও চেননি?

চমকে উঠল অন্ধ। বলে উঠল, শিরিন!

—আরে, যাকে তয়ফাওয়ালী কসবী বলে তুমি ঘেন্না করতে। কথাও বলতে চাইতে না। যার জন্যে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম! তা—ওই তো শিরিন!

—দুনিয়ার মালিক শাহানশা, আমি ভিক্ষুক অন্ধ। আমি আপনার রহস্যের অযোগ্য। ও তো বোবা!

—বোবা?

—হাঁ শাহানশা। ঠিক বোবা নয়; ওর গলার নালী সর্দিতে বন্ধ হয়ে গেছে। আওয়াজ বের হয় না। ফিসফিস করে কথা বলে। গান গাইবে কি!

—তা হলে শোন!—এই—এই ঔরৎ!

মেয়েটি মাঝখানে মাথা হেঁট করেছিল, আবার সে তুললে মুখ।

—তুই বোবা? বল্, নইলে সাঁড়াশি দিয়ে চামড়া টেনে দেখব তোর গলার আওয়াজ বের হয় কিনা। বল্—। উত্তর দে। তুই বোবা?

—না, শাহানশা দুনিয়ার মালিক।

—গান গাইতে পারিস?

—পারি।

—সেই গানটা শোনা আমাকে—সেই—"হায় সাধু তুমি তাকে পাবার জন্যে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অন্ধা হলে—কিন্তু চাঁদেব দিকে তাকালে না কোনদিন। আজ অমাবস্যা, চাঁদ নেই, তা হোক—আমার চাঁদের মতো মুখের দিকে তাকাও, তাকে দেখতে না পাও, আমার চোখে তোমার ছবি দেখতে পাবে।" গা—।

গান ধরলে মেয়েটি কম্পিতগলায়।

সুলতান হুকুম দিলেন, চলো। সুলতানের তাঞ্জাম চলে গেল।

যে মুহূর্তে তাঞ্জাম চলে গেল সেই মুহূর্তে মেয়েটি থেমে গিয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকলে। আর সৈফুদ্দিন চিৎকার করে উঠল, তমিনা!

সে মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, না না—আমি শিরিন। আমি শিরিন!

বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

—শিরিন।

—আমার কসুর মাফ করো। আমি শিরিন। মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর দূরে। অন্ধ চিৎকার করে এগুতে লাগল, শিরিন! শিরিন! শিরিন! শি—রি—ন!

নামল পর্দা।

দাদাসাহেব বললেন, বহুৎ আচ্ছা! বাতাইয়ে, আপ ক্যা কহেতে হ্যায়! আপনার মতো বলুন।

বললাম, ভাল!

—শুধু ভাল ? সিরিফ ভালা, ওর থেকে বেশি নয় ?

—অভিনয়, প্রডাকশন খুব ভাল।

—আই অ্যাম গ্ল্যাড!

বাধা পড়ল। প্রথম সারির বিশিষ্ট জনেরা এসে দাদাসাহেবকে টেনে নিয়ে গেলেন। আমার মনে আমি তখনও মিলিয়ে দেখছিলাম, এই মেয়ে আর সেই মেয়ে এক কি না ? তোঘলকাবাদের এই পটভূমি, আর তোঘলকাবাদের সেই বিচিত্র মেয়েটির সেই কথা। ভাবছিলাম, "সেকালে হয়তো আমি এইখানে এই দোকানে দোকানদারনী ছিলাম।" এই দুটো মিলিয়ে এমনই হয়েছে যে হাজার গরমিল হলেও মনে হচ্ছে এরা দু'জনে এক। দুটো সমান ত্রিভুজের একটাব দুটো কোণ ধরে টেনে ইতরবিশেষ করে দিলে একটার সঙ্গে অন্যটাকে, মেলালে আর মিলবে না। অঙ্গে মিলবে কিন্তু চেহারায় মিলবে না। বেশ মনে হচ্ছে, ছুটে বেবিয়ে যাবার সময় যেন মেযেটি খুঁড়িয়েছিল।

দাদা ফিরে এলেন ; আবার পর্দা উঠবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, হিরোইনটি কে ? ভাল অভিনয করছে।

—ও, সী ইজ ওয়াণ্ডাবফুল। পাক্কা অ্যাকট্রেস। পাঞ্জাবী গার্ল। ভেরী মডার্ন। আওযাব অ্যাকাডেমি প্রডাক্ট। ইউনিভারসিটিকে গ্রাজুয়েট ভি হ্যায।

—ও একটু খুঁড়িয়ে চলছে না ?

—চলছে নাকি ? হবে, পা জখম হয়ে থাকবে।

—আমি ওকে দেখেছি।

—দেখবে বই কি। আমার কাছে তো প্রায়ই আসে। সাউথ অ্যাভেন্যুতে দেখে থাকবে। যে কোন জায়গায় দেখে থাকতে পার। সারা দেহ্‌লী চষে বেড়ায়।

পর্দা উঠল।

অন্ধ খুঁজছে শিরিনকে।—শিরিন!

আমার কিন্তু সন্দেহ রইল না যে এই শিরিনই সেই মেয়ে!

শিরিন কিন্তু আর বের হলো না। ওইখানেই শিরিনের ভূমিকা শেষ। শিরিন হারিয়ে গেল। সে আর ফিরল না সৈফুদ্দিনেব কাছে। লজ্জায় সংকোচে বা যে কোন কারণে হোক ফিরল না। সৈফুদ্দিনই বললে, সে তখন কবরের পাশে বসে আছে। তার কুটীরের সামনে একটি কবর—ওই শিরিনের কবর। কবরের পাশে বসে গান গাইছে—"খোদা তোমাকে চেয়েছিলাম, দাও আমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মধু। তোমার

সাড়া পাইনি! পদ্মফুল আমাকে ডেকেছিল, এস তুমি। আমার মধ্যে খোদা তোমাকে পাঠিয়েছেন তোমার প্রার্থিত বস্তু। আমি মুখ ফিরিয়েছিলাম। বলেছিলাম, পাঁকে তুমি ফুটেছ, তোমার মধুতে পঙ্কের অশুচি। চাই নে। আমি অন্ধ হলাম। পদ্ম নিজে এল, আমার চোখে ঢেলে দিলে তার মধু। অন্ধত্ব সারল, চোখ মেলে পদ্মকে বুকে ধরতে গেলাম; পদ্মটির পাপড়ি ঝর ঝর করে পড়ে গেল।"

নাটকে কথার মধ্যে বুঝলাম, শিরিনকে আর সৈফুদ্দিন পায়নি, সে আত্মহত্যা করেছিল, পেয়েছিল তার মৃতদেহ। সেই দেহ নিয়ে কবর দিয়ে সেইখানে বসে সে গান গায় ভিক্ষে করে।

এরই মধ্যে ঘোষণা হলো, রাজধানী যাবে দেবগিরি।

হুকুমৎ জারি হলো—"হুকুম শাহানশা, তামাম হিন্দোস্তানের পাদশাহ্ সোলতান মহম্মদ তুঘলকের; দিল্লী তুঘলকাবাদের সুলতানশাহী যাবে দেবগিরি। এক মাট্টি আর পাথর এ ছাড়া যা কিছু সবকে যেতে হবে। সব আদমী যাবে, গৃহস্থী যাবে, আমীর ওমরাহ্ এমন কি গরু ভেড়া ছাগল কুত্তা সমেত।"

কান্না উঠল, হায় হায় উঠল। এয় আল্লা, হে ভগবান, সুলতানের মতি ফেরাও। সুবুদ্ধি দাও! হে ভগবান! ইয়া আল্লা মেহেরবান! নয় তো দয়া করো—এই উম্মা—

যে বলছিল তার মুখ চেপে ধরলে একজন, চুপ! চুপ! চুপ!

এরপর নাটকে এসেছে অনেক কিছু! জনতা এসেছে, বিদ্রোহের ধোঁয়াও উঠেছে, সে ধোঁয়ার উপর জল ঢালা হয়েছে। এতটুকু প্রতীক করে ভাল দেখিয়েছি। একদল লোক জমায়েত হয়ে পরামর্শ করেছে, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে পালিয়ে যাবে। তারা কাঠ এনে বোঝাই করছে। পাকা ঘর। পাথরের দেওয়াল। আগুন দিলে। ধোঁয়া উঠল। জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের হতে লাগল। লোকজনের সঙ্গে এল পাদশাহী সিপাহী। তারা কুয়ো থেকে জল তুলে ঢেলে দিলে। নিবে গেল। একজন সিপাহী টেনে একখানা কাঠ বের করে বললে, ভিজে, একদম ভিজে। কাঁচা কাঠ। এই জ্বলে! চল! ক'বালতি জলেই নিবে গেল।

অন্যজন বললে, শুকনো হলে কি হত বল তো!

সে বললে, শুকুক, শুকুবে একদিন। সেদিন দেখা যাবে কি হয়!

জল্লাদ এল, একটা শিকে বেঁধানো রয়েছে অনেকগুলো জিভ। ক'জন সিপাহীর হাতের দড়িতে বাঁধা একদল লোক। বধ্যভূমে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গোলমাল এসেছে বেশি। নাটকটা জোর হারিয়ে ফেলেছে। শেষ—অন্ধ সৈফুদ্দিন কবর আঁকড়ে পড়ে বলছে, আমি যাব না। আমি যাব না।

সিপাহীদের একজন বললে, হুকুম শাহানশাহ্ সুলতানের—ইঁট কাঠ পাথর বাদ দিয়ে জীবন্ত যে কেউ, জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত সব যাবে দেবগিরি।

—আমি ভিক্ষুক।

—খানাপিনা সব মিলবে। বিলকুল ভার শাহানশাহের।

—আমি অন্ধ—

—বয়েল গাড়িতে উঠিয়ে দেব। ওঠো।

—না না—আমি যাব না।

—তাহলে হুকুম, দড়ি দিয়ে বেঁধে জানোয়ারের মতো টেনে নিয়ে যেতে। বাঁধ।

—না—না—না।

কিন্তু কে শোনে? শাহানশাহের হুকুম! হাতে দড়ি বেঁধে তাকে টানলে। সে শুয়ে পড়ল। চিৎকার করলে, শিরিন! শিরিন!

একজন বললে, এইসা নেহি। হাতে নয়, এমনি করে বাঁধো পায়ে।

বাঁধতে লাগল পায়ে।

পর্দা পড়ল। ডাক শোনা গেল অন্তরাল থেকে, শিরিন!

আবার পর্দা উঠল। দেবগিরিতে মহম্মদ তোঘলকের দরবার। বাইরে মসজিদ থেকে সুলতানের নামে খুদবা পড়া হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে।

বন্দনা-গান হলো।

সুলতান হুকুম দিলেন, ফকীর ভিক্ষুকদের দান কর। এক এক আঁজলায় যত নতুন সিক্কা ওঠে—দাও। এক সপ্তাহ ধরে সারা শহরে রোশনাই হবে। দিল্লী থেকে যারা এসেছে সব লোকের এক সপ্তাহের খাদ্য যাবে পাদশাহী খাজাঞ্চীখানা আর গোলা থেকে।

তারপর প্রশ্ন করলেন, দিল্লীর সব লোক এসেছে?

—হাঁ সুলতান।

—অন্ধ সৈফুদ্দিন? কসবীর কবর থেকে যে নড়ে না, সে?—সিপাহী।

সিপাহী এসে ঢুকল, তার হাতে দডি। সে দড়ির প্রান্তে বাঁধা শুধু একটা পা।

—আর কই?

—তাকে হেঁচড়ে আনতে হয়েছিল সোলতান। পথে জঙ্গলের মধ্যে সেই হেঁচড়ানিতে কমবক্ত মরে গেল। তারপব ধডের সব অঙ্গ একে একে খসে পড়ে গেল। পাখানা বাঁধা ছিল দডিতে, সেইটে এসেছে।

সভাসদেরা নাকে কাপড় দিয়েছে। অর্থাৎ পচে গন্ধ উঠছে। সুলতান কিন্তু দিলেন না। প্রশ্ন করলেন, কি বলছিল কমবক্ত মরবার সময়? শিরিন বলে চেঁচাচ্ছিল?

—না, শাহানশা।

—তবে?

—বলতে ভয় হচ্ছে মেহেরবান।

—কোন ডর নেই। বল্...

—কমবক্ত চিল্লাচ্ছিল, খোদা—এয় খোদা, কবে, কবে দুনিয়া থেকে পাপ শাহানশাহী বরবাদ হবে? কবে? কবে? নয়া জমানা কবে আসবে? জনতাকে রাজ? আদমী আজাদী?

অট্টহাস্য করলেন পাদশাহ!

পর্দা নামল।

আবার উঠল। এবার তোঘলকাবাদের ধ্বংসস্তূপ। সেই বাজারের মুখ; পরিত্যক্ত কুলুঙ্গির মতো দোকানগুলি পড়ে আছে। কেউ নেই। পিছনে দূরে লালকেল্লার মাথায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। আলোর রোশনাইতে ঝলমল করছে। ঢুকল সেই মানুষ।

—কই, আমার পা? আমার পা?

—কবি?

—কে? কে? কে?

—আমি শিরিন!

—শিরিন!

—হ্যাঁ, আমি কবর থেকে উঠেছি। তোমার জন্যে বসে আছি। চল আমরা যাই।

—কোথায়?

ওই কেল্লার নয়া দরবারে। চল, তুমি চাইবে পা, আমি চাইব জাত, যা না থাকার লজ্জায় আমি দুনিয়ায় অচ্ছুৎ। চল।

পর্দা নেমে এল। শেষ হলো নাটক। করতালিতে ভেঙে পড়ছে আচ্ছাদন। চারিদিকে সাধুবাদ! অজস্র সাধুবাদ!

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা আবার উঠল।

নাটকের পাত্রপাত্রী সম্মুখে দাঁড়ালেন। দাদাসাহেব কখন উঠে গিয়েছিলেন লক্ষ্য করিনি। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, দু' এক বাত। তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি নায়ক সৈফুদ্দিন সেজেছিলেন—

আমি সোজা হয়ে বসলাম। এবার নায়িকা আসবে। নায়িকা এল। তার সজ্জা এখন সহজ সজ্জা। অনেক্ষণ ভূমিকা শেষ হয়েছে। অতি আধুনিক একটি তরুণী।

কিন্তু সে নয। না, সে নয়। তার থেকে এ মেয়েটি সৌন্দর্যে ম্লান। এবং যতই আধুনিকা হোক আধুনিকতার সে উগ্রতা এর নেই। এখন চোখে পড়ল, আকারে অবয়বে মুখ-চোখের গড়নেও অনেক তফাৎ তার সঙ্গে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পরিচয় শেষ হলো; নাট্যকার, প্রডিউসার, ডিরেকটার এলেন। শেষ হলো; সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। গাড়ি পাব না। দিল্লীতে ওই এক সমস্যা।

পথে মেজাজ যেন ভাল ছিল না। নাটকে খুব খুশি হতে পারিনি। শেষ দিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। একদম ঝুলে পড়েছে। হয়তো নায়িকাকে বাঁচিয়ে রাখলে ভাল হত। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই মেয়েকে। তোঘলকাবাদের পটভূমি আর আমার তোঘলকাবাদের সেদিনকার স্মৃতি দুইয়ে এমন জট পাকিয়েছে এবং তার মধ্যে সেই মেয়েটি এমন সামনে রয়েছে যে তাকে বাদ দিয়ে নাটকটা দেখে আমার মন ভরেনি। হয়তো বা সে থাকলে ভালই লাগত। তাতে হয়তো নাটকের এই ভুতুড়ে কল্পনার সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতার সম্পর্কে উচ্ছ্বাস—সাম্রাজ্যবাদ বরবাদ—ডাউন উইথ ইম্পিরিয়ালিজম স্লোগানের উৎকটত্ব ঢাকা পড়ত না—তবে বোধ হয় আমার মনে ভাল লাগত।

তিন

পরের দিন সকালেই দাদাসাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম। বাসায় ফেরার পর মনে একটু সংকোচ অনুভব করেছিলাম, দাদাসাহেবকে ফেলে চলে আসা আমার উচিত হয়নি। দাদাসাহেব নিশ্চয় আমাকে খুঁজে থাকবেন, তিনি যে লোক, নিশ্চয় খুঁজবেন।

সকালবেলা আটটার মধ্যেই গেলাম। রবিবার, ছুটির দিন ; তার উপর কাল থিয়েটার গেছে, আজ অনেক জন আসবে। থিয়েটারেরই লোক। দাদার মতামত শুনতে আসবে। দাদাসাহেবের এ গুণের কথা বলেছি—হয়তো পুনরুক্তি হচ্ছে—দিল্লীর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত—মন্ত্রী থেকে সাধাবণ মানুষকে সমান সমাদরে গ্রহণ করেন, এবং তাদের কাছে তিনি সমান প্রিয। তাছাড়া দাদাসাহেবের কাছে নিন্দে শুনেও সুখ না থাক, দুঃখ নেই। ওঁর নিন্দের মধ্যে বিষ থাকে না।

এরা সকলেই আসবে আটটার পর। ছুটি বলে তো বটেই তা ছাডা প্রাতঃভোজনের পবে আসাই বিধি। অন্তত শোভন। সকালবেলা দাদাসাহেব জমিয়ে চা খান, প্রাতরাশ করেন। চানাচুর পকৌড়ি থেকে ডিম মাখন রুটি জ্যাম জেলি অনেক রকম নিয়ে বসেন, পাশে বসে তরুণীর দল। তাঁর দৌহিত্রীবা এবং তাদের সঙ্গে একজন দু'জন তাদের বান্ধবী তরুণী, তাদেব আকর্ষণ কিন্তু দাদাসাহেব। আমি সকালবেলা খাই নে এসব, দাদাসাহেবেব ঘবে এ-কথা জানা কথা হয়ে গেছে; সুতরাং আমার খাবার টেবিলেব সঙ্কোচ ছিল না।

দাদাব বাসায বারান্দায উঠলাম আর ঠিক মনে হলো এই মাত্র দরজাটা বন্ধ হলো। রাস্তার মোডে একখানা ফটফটিযাও আমাকে পাশ কাটিযে চলে গেছে। তা হলে কেউ এর মধ্যেই এসে গেছে। তার আর উপায কি! বোতামটা টিপলাম! ভিতবে বাজার বেজে উঠল।

নাবীকণ্ঠে উচ্চারিত হলো, আ—!

দরজা সঙ্গে সঙ্গেই খুলল, দাদাসাহেবের সেক্রেটাবি, তাঁব দৌহিত্রীর বান্ধবী শীলা এক তরুণী দরজা খুলে আমাকে দেখে বললে, আপ্! আইযে, নমস্তে।

ভিতবে ঠিক দবজা থেকে কেউ নারীকণ্ঠে বললে, ওঁকে বসতে বল, যিনিই হোন! দেখতে পেলাম, একখানা রঙীন শাডির অঞ্চলপ্রান্ত ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে অদৃশ্য হলো দবজার ওদিকে। সঙ্গে সঙ্গে দাদাসাহেবেব প্রসন্ন কণ্ঠ শুনলাম, আ! অ্যাট লাস্ট মাই রৌশন আগেয়ী—

শুষ্ককণ্ঠে উত্তব হলো, হ্যাঁ এলাম। অন্যের কাছে যাইনি, যাবও না। তোমার কাছেই এসেছি।

—আমি জানি। তা তুমি রাগ করে পালিয়ে এলে কেন? পহলে বস—বস।

—না, বসব না।

—আবে ভাই এতনা গোস্যা বুঢ্‌ঢেকে পর হায় পরমাত্মা? এ কি সাজে! বস, বস! মেজাজ ঠাণ্ডা কর। চা খাও, কিছু খাও, তারপর হবে। কাল রাত্রে যা মেজাজ দেখেছি তাতে জরুর তুমি কিছু খাওনি!

—এত বেওকুফ্ আমি নই।

—বহুৎ আচ্ছা ভাই, তা হলে এখন এই সকালেই বেওকুফি তুমি জরুর করবে না। বস।

চেয়ার টানার শব্দ হলো।

আমি বসবার ঘরে বসেছিলাম। সেক্রেটারিটি দাঁড়িয়ে ভাবছিল কি করবে. মেয়েটি তাকে বারণ করে গেছে। আমি বললাম, দেখ, আমি বরং পরে আসব, কি বল?

—এক মিনিট। আমি আসছি।

সে চলে গেল। পরমুহূর্তেই দাদাসাহেব ডাকলেন, আরে ভাই শঙ্করজী, আ যাও, ভিতর আ যাও।

—না। আমার কথা—

—হবে, পরে হবে, তুমি বস। বাংলাদেশের লেখক, বড় লেখক—তার উপর আর্টে ঝোঁক—আলাপ করিয়ে দিই। তুমি তো 'আরতি' নিয়ে গিয়েছিলে আমার কাছ থেকে। পড়েছ, হারিয়ে ফেলেছ পথে—

সেই মুহূর্তেই আমি গিয়ে ঢুকলাম, নমস্তে।

—নমস্তে ভাই, নমস্তে!

মেয়েটিও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আমি বিস্মিত হলাম, খুশিও হলাম। এ সেই মেয়ে। সেও হেসে সবিস্ময়ে বললে, হোয়াট এ সারপ্রাইজ—! ইট ইজ ইউ, মাই ওল্ড ফ্রেন্ড!—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, হোয়াই নট ওল্ড চাইল্ড, মাই ইয়ং মাদার? ইজ ইট নট সুইটার?

—নো—নেভার। তারপর হেসে বললে, তুমি তো আচ্ছা অবস্টিনেট লোক!

দাদাসাহেব হেসে উঠলেন, মাই গুডনেস! তোমরা জান দু'জনে দু'জনকে?

আমি আবার দুষ্টুমি করেই বললাম, ইয়েস ইয়েস দাদাজী, শী ইজ মাই—

—নো—নো—নো। বেতরিবৎ লোক কোথাকার!

দাদা বললেন, কি ব্যাপার? হোয়াট'স দি ফান্?

—দেখ না, সেই প্রথম দিন থেকে ধরেছে—আমি ওর মা!

কপালে হাত দিয়ে দাদাসাহেব বললেন, মাই গড! রৌশন মা! হায় পরমাত্মা।

—তাই বল তো ওকে!

—নো—নো—নো। বি ফ্রেন্ড, শঙ্করজী!

—দ্যাটস রাইট! ও মাই গ্রান্ড ওল্ড দাদাসাহেব, আই লাভ ইউ। এত পেয়ার করি এই জন্যে। ইউ ডোন্ট নো, হাউ মাচ আই লাভ ইউ।

—হাউ মাচ? এতনা? দাদাসাহেব দু' হাত দিয়ে একটা পরিমাণ দেখালেন।

—উঁহু। এ—ত—না। বলে সে দু'খানা হাতকে যতদূর পারা যায় প্রসারিত করে জানালে, যে তার থেকে বেশি আর হতে পারে না।

—একদম ঝুটা বাত।

—কেন?

—এই সেদিন কলকাতা থেকে ফিরে আমাকে বললে সেখানকার জুতে যে শিম্পাঞ্জীটা আছে তুমি তার প্রেমে পড়েছ আর সেদিনও ঠিক এতখানি প্রেমে পড়েছ বলে হাত দু'খানা এমনি করেই বাড়িয়ে দেখিয়েছ।

মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়ল, ওয়ান্ডারফুল! দাদাসাহেব, তুমি ওয়ান্ডারফুল। ইউ আর এ ডার্লিং!

—তা, শঙ্করজীকেও তো ভালবেসেছ!

—নিশ্চয়।

—প্রথম দিন থেকেই?

—প্রথম দিন থেকে। উনি আমাকে তোঘলকাবাদ রুইন্‌সে জল খাইয়েছেন। পা জখম হয়েছিল, ওঁর কাঁধে ভর দিয়ে সেই উঁচু থেকে নেমেছি। ওঁর ট্যাক্সিতে উনি লিফ্‌ট দিয়েছেন বিনয়নগরের মোড় পর্যন্ত। তখন অবশ্যই জানতাম না যে উনিই শঙ্করজী, 'আরতি' ওঁরই লেখা! ওঃ দাদাসাহেব, কি বলব তোমাকে, ওই আরতির সেকেন্ড হিরোইন আমাকে হন্ট করেছে। ওঃ, কতবার ভাবতে চেয়েছি, ওই আশ্চর্য বউটি যদি আমি হতাম।

দাদা প্রগলভ্ ব্যক্তি। বললেন—এবং লেখককে নায়ক ভাবনি?

—হুঁ। ভেবেছি।

—তা হলে ভাগ্যে শঙ্করজী সে পরিচয় দেয়নি। বচ গিয়া আপ্‌নে, বহুত বচ গিয়া ভাইজী।

—কেন?

—কেন? আর তা হলে, তুমি শ্রীমতী রৌশন, তোমাকে তো আমি জানি, তুমি হয় বেচারাকে চুলের মুঠো ধরে বলতে, চুল পেকেছে কেন তোমার? দাঁত ভেঙেছে কেন? নয়তো একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে বলতে, আই লাভ ইউ, মাই গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান। হু নোজ? জোয়ানি কি মর্জি, ইউ মাইট হ্যাভ বিগান কিসিং হিম। অ্যান্ড শঙ্করজী খুন হয়ে যেত। তুমি জান না, উনি পিউরিট্যান লোক, ধর্মবাতিক।

মেয়েটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ঝরে-পড়া ঝরনার মতো খিলখিল করে হেসেই চলেছে। দাদাসাহেবের কৌতুক রসিকতার লোষ্ট্রনিক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলের মতো তার সে হাসি যেন ছিটকে পড়েছিল। আমি সবিস্ময় কৌতুকে এই পরিহাস-রসিকতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ আবার বাজার্ বেজে উঠল। বাইরে কেউ এসেছে। এক মুহূর্তে রৌশনের হাসি থেমে গেল। বললে, আমার কথাটা আমি শেষ করতে চাই লোক আসবার আগেই।

আমি বললাম, আমি তাহলে উঠি—

হাতখানা চেপে ধরে রৌশন বললে, না বস তুমি। তুমি আমার সাক্ষী। বল তুমি শঙ্করজী, সেদিন তোঘলকাবাদে আমার অবস্থা তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। তোমাকে

আমি বলেছিলাম, ওই কুলুঙ্গি-দোকানে বসে ভাবছিলাম, হয়তো তোঘলকাবাদের আমলে আমি এই দোকানের দোকানদারনী ছিলাম।

আমি বিস্মিত হলাম। বুঝলাম না কথাটার অর্থ।

রৌশন বলেই গেল, উনি আমাকে একদিন দেখেছেন। আমি দিনের পর দিন ওই কবরস্থানে গিয়ে স্কেচের পর স্কেচ করেছি।

—কে তা অস্বীকার করবে, ডিয়ার রৌশন? ই তো সব কোইকো মালুম হ্যায়।

—তবে? কেন, কেন আমার বদলে অন্যের নাম দিলে প্রডিউসার হিসেবে?

—আরে ভাই, তার আমি কি করব বল? সে হলো মাইনেকরা আকাদেমির প্রডিউসার—আর তুমি তো ভাই অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেই রাজী হয়েছিলে।

—কিন্তু আমি কুলি-মজুর নই, শিফ্‌টার নই। আমি স্কেচ করেছি, আমি সেট ডিজাইন করেছি, রঙ-তুলি নিয়েও কাজ করেছি, আর তার জন্যে পাওনা খাতির পাবে অন্য লোকে? এ নাটক ওই ভালা-ভোলি-নাড়ুগোপালের মতো দেখতে ওই শরণ সিংয়ের লেখা ভেবেছ? হ্যাঁ লিখেছিল একটা, কিন্তু সে কংগ্রেস রাজের স্রিফ বেশরমী প্রপাগান্ডা। আমি ওকে বলে বলে কাটিয়ে লিখিয়ে চেহারা দিয়েছিলাম। তাও তুমি তাকে এমন করে কাটলে যে শিরিনকে এক সিন রেখে একদম মুছে দিলে!

দাদা বললেন, সো ইউ রিফিউজড টু অ্যাকসেপ্ট শিরিন'স রোল। হেসেই বললেন, কিন্তু সে হাসি নামেই হাসি, স্বাদে তার ঝাঁজ ছিল।

—হ্যাঁ। তা আমি করেছি।

—কিন্তু করা উচিত ছিল না তোমার।

—ও পার্টে আছে কি তাই করব!

—যা আছে তাই করতে।

—না। তা আমি করি না।

—শুনো ভাই রৌশন। কথাটা শোন। দেখ, তুমি ইউনিটের লোক নও, তবু তোমাকে ভালবাসি। তুমি নাটক নিয়ে এলে, আমি নাটক নিলাম। যা করে এনেছিলে তাতে তোমার মগজ আছে সে বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে আমার ভাল লাগেনি। বলেই নিলাম যে বদল করব।

—আমি তা মেনে নিয়েছি।

—তাও অনেক ঝঞ্ঝাট করেছ। শেষ পর্যন্ত শিরিনকে রাখা উচিত ছিল সে আমি মানি। কিন্তু যে ভাবে তুমি রেখেছিলে তা হয় না। আমি ভাবতেই পারি না। তাই আমি ওই ভাবে কেটে করে দিলাম কি তুমি পার্টটা করবে। পার্টের জন্যেই তোমাকে নেওয়া হয়েছিল। প্রডাকশনের জন্যে নয়। তুমি যেচে ভার নিয়ে স্কেচ করলে, ডিজাইন করলে। তার জন্যে—তুমি। মাফ কর না ভাই। এ নিয়ে অনেক কথা কানে এসেছে। তুমি না কি—।

—হ্যাঁ জানি। যত সব নর্দমার মক্ষির মতো মনের লোক বলেছে, আমি প্রডিউসারকে খুশি করেছি,—কটাক্ষে ঘায়েল করেছি—

—ছাড ছাড, ওসব কথা ছাড। তোমার মুখে আটকায় না কিন্তু আমাদের শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট শিরিনের পার্টের জন্যে। তুমি সাত দিন আগে বললে, আমি করব না। বেশ ভাল। ওরা চটে গেল। যাবারই কথা। সুরঞ্জনা পাক্কা অ্যাকট্রেস, সে চালিয়ে দিলে। তার উপর তুমি হঠাৎ প্রডিউসারকে বললে, ইডিয়ট।

—সে আমাকে কি বলেছে জান? হারলট। লোকেব সামনে। হ্যাঁ। বলেছে আমি মদ খাই! আমি নাকি ফরেনারদের নিয়ে গাইডের কাজ করার নামে ফুর্তি করে বেড়াই। আর্ট ট্রেজার কিনে দেওয়ার ছলে বাজে জিনিস বিক্রি করে ঠকাই। আমি নাকি একটা চিট!

আমি আড়ষ্ট হযে গিযেছিলাম। কিন্তু মেয়েটির কোন সংকোচ ছিল না।

দাদা বাধা দিযে বললেন, দেখ রৌশন, এ নিযে কথা বাড়িয়ে লাভ কি বল? আমি বলব, তুমি প্রডিউসাবকে যখন সাহায্য করেছ, খেটেছ, তখন তোমার রেমুনারেশন পাওয়া উচিত। চেষ্টাও করব যাতে পাও।

—কিন্তু টাকাটাই সব নয়।

হাসলেন দাদা। এ হাসিটাও সহজ নয, তিক্ততা তার মধ্যে স্পষ্ট। বললেন, নিমক মিলা হ্যায়, বাস্; চিনিকে বাত ছোড়ো। ওতেই মেনে যাও। নুন একটু বেশি হওয়া চাই, এই তো!

রৌশন স্থিরদৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে তাকাল। তাতে তিরস্কার ছিল। তারপর বললে, যাক দাদাসাহেব, আর কথা বাড়াব না। কিন্তু—না থাক। শঙ্করজী, তুমি হয়তো খুব শকড্ হলে। মাফ চাইব না। বলব, সহজভাবে নিয়ো। আচ্ছা, নমস্তে।

চলে গেল সে।

বাইরেব দরজা বন্ধ হওযার শব্দ উঠবার পর দাদাসাহেব বেদনার সঙ্গে আক্ষেপমেশানো সুরে বললেন, একদম স্পয়েল্‌ড হো গয়া। অথচ ট্যালেন্ট ছিল লেড়কীর! ছবি আঁকতে পারে, এদেশের ক্রাফটসও জানে, অ্যাক্টিং করতে পারে; ফরোয়ার্ড—কিন্তু—।

ওই অসমাপ্তির মধ্যেই ইঙ্গিতে কথাটা সুস্পষ্ট। বললে এত স্পষ্ট হতে পারত না।

আমি বললাম, কোথাকাব মেয়ে? পাঞ্জাব?

—সে সব কেউ কিছু জানে না। ও বলে হরেক রকম, কাউকে বলে, কোন জায়গীরদারের মেযে। কাউকে বলে, রাজার মেয়ে। কখনও বলে, বাপ ছিল পণ্ডিত লোক। কোন উপাধি ছিল না। শুধু রৌশন। লেখাপড়া ভাল জানে না। তবে ইংরিজি বলে যাবে। ফরেনারদের গাইড হয়, আর্ট ট্রেজার কিনে দেয়, বললে, শুনলে না। লোকে নানারকম বলে। আমি স্নেহ করি। একটা অ্যামেচার ক্লাবে ওর অ্যাক্টিং দেখে

ভাল লেগেছিল। আলাপ করেছিলাম। ঠিক এমনটা বুঝিনি। এই নাটক নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপটা বেশি হয়েছিল। তা—।

হাসলেন দাদাজী।

—তা আমার গোড়াতেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

বাজার্ বেজে উঠল আবার। কেউ এসেছে।

মাঝখানে একবার বাজার্ বেজেছিল। সেবার এসেছিল ডিমওলা। দাদা থামলেন : কোই আ গেয়া হোগা। নাউ লেট আস্ স্টপ। বাট, রৌশন হ্যাজ স্টান্‌ড্ ইউ, ইজ নট ইট্? একদম চমক লাগা দিহিস! অ্যাঁ?

—নট মাচ্।

—নট মাচ্?

—হ্যাঁ। ও সেদিন যখন মা বলতে রাগ করলে তখনই বিস্ময় কেটে গেছে।

হেসে ফেললেন দাদাজী। বললেন, সে দিল্লীর অনেক মেয়েই করবে। কিন্তু রৌশন এজাতের বোধ হয় একটি। অন্তত আমি তো দেখিনি। আরে নাটকে ওর হাত ছিল বলছিল না? ছিল। ফ্যাক্ট। স্বীকার করেছে ড্রামাটিস্ট। ইয়ং ম্যান, রৌশনের পাল্লা। করেছিল কি জান? ওই হিরোই শিরিন ছুটে পালাল। তারপর পাদশার লোক তাকে ধরলে, নিয়ে এল পাদশার কাছে। পাদশা জিজ্ঞাসা করলে, তোর মহব্বতি সত্যি। সে চুপ করে রইল। তারপর বললে, সত্যি কিনা জানি না জাঁহাপনা, তবে—। পাদশা বললে, আচ্ছা তার পরীক্ষা দিতে হবে। তুই ওর কাছে যেতে চাইলে তোর মুখটা ঝলসে পুড়িয়ে দেব। তাতে তোর ক্ষতি হবে না। ও চোখে দেখতে পায় না। আর লোকেও তোর সুরত দেখে তোর পিছু নেবে না। আর যদি না-চাস, তবে তোকে দরবারের নাচনেওয়ালী হয়ে থাকতে হবে। পরদেশ থেকে রাজাদের দূত আসে, আমাব অধীন এ-দেশের রাজারা আসে, তাদের গান শোনাবি, নাচবি, আর তারা চাইলে কসবীগিরিও করবি। খাজাঞ্চীখানা থেকে মাসে একশো মোহর তলব মিলবে। খানাপিনা মিলবে। বাড়ি মিল্‌বে। হীরা-জহরৎ ভি মিল্‌বে। বল্, কি করবি বল্। মেয়েটা কাঁদতে লাগল। পাদশা হুকুম দিলেন, দে তবে ওর মুখখানা ঝলসে দে। দেখিস যেন মরে না-যায। মেয়েটা কেঁদে উঠল, না মালিক, না—না। পাদশা বললেন, কী না? ও বললে, যাব না, আমি অন্ধা সৈফুদ্দিনের কাছে যাব না। পাদশা একরাশ মোহর ঢেলে দিলেন, বললেন, এই নে। যাও, একে আচ্ছা মোকাম দাও। আচ্ছা পোশাক দাও। এরপর মেয়েটার একটা সিন ছিল। বাড়িতে কাঁদছে। তারপর দরবারে মদ খাচ্ছে নাচছে, এক বিদেশী অতিথির কাছে কসবীপনা করছে। তারপর শঙ্করজী, মোস্ট হরিব্‌ল্ থিং—লাস্ট সিনে—দেবগিরির দরবারে যখন পা-খানা নিয়ে সিপাহী ঢুকল, সেই মুহূর্তে ওই মেয়েটা দরবারে ঢুকে কুর্নিশ করে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। তারপর বললে, জাহাঁপনা, মেহেরবানী হয় তো পচা পা-খানা বাইরে ফেলে দিতে হুকুম হোক। আমি গান গাই নাচি আর গুলাব জল ছড়াই। বলে, দিস ইজ রিয়াল। শেষ—

এসে ঢুকলেন যিনি তিনি আমার পরিচিত নন তবে গতকাল রাত্রে তাঁর মুখ চিনেছি। তিনি কালকের নাটকের প্রডিউসার। দাদা হেসে বললেন, আইয়ে। উ আয়ি থি।

—হ্যাঁ দেখলাম, তিনমূর্তির সামনে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

বুঝলাম, এই আলোচনাই চলবে। বলতে কি, খুব ভাল লাগছিল না। গোড়াটা বেশ লেগেছিল, হাসি-ঠাট্টা। মেয়েটির এই নতুনকালের আলট্রামডার্নিজম খারাপ লাগেনি। এ জিনিস আমি বরদাস্ত করতে পারি নে তবু এ সময়টুকুর মধ্যে বেলোয়ারী কাঁচের আলোক প্রতিফলনের ঝকমকানি উপভোগ করছিলাম। এর মধ্যে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলেছিল। ভেবেছিলাম, কিছু লোককে মেয়েটির পিছনে লাগিয়ে দিলে কি হয়! তারা কেবলই বলবে, মাদার! মাঈজী! মা গো! কিন্তু হঠাৎ নাটকের কথা এবং অভিনয়ের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় টাকার প্রসঙ্গ উঠতেই সবটাই কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে। প্রডিউসারটির সম্পর্কেও ধারণাটি যেন প্রসন্ন নয়। দাদা যা বলেছেন তাতে লোকটিও খুব নির্দোষ নন। মেয়েটি যদি তার স্বার্থ-সাধনের জন্য খেলা খেলবার জন্য ফাঁদ পেতে থাকে, তবে উনি তাতে জেনেশুনে পা বাড়িয়েছিলেন।

আমি নমস্কার করে উঠে চলে এলাম। ন'টা বেজে গেছে। বেরিয়ে সাউথ অ্যাভেনুর মোড়ে এসে দেখলাম, সাইকেলের ভিড় চলেছে। দিল্লী শহর, বলতে গেলে সাইকেলের শহর। সাইকেল আর মোটরকার, যাদের ও দুটোর একটাও নেই এবং ট্যাক্সি চড়া যাদের ক্ষমতার বাইরে, এই মাঝখানের লোকের পথকষ্ট ভাগ্যলিপি। বাসের জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কতক্ষণে যে বাসে জায়গা মিলবে সে কথা বোধ করি ত্রিকালজ্ঞও বলতে পারে না। ত্রিমূর্তির চারিদিকের গোলাইটার দিকে তাকালাম। লম্বা কিউ। আপিসের সময়। প্রডিউসার বলেছিলেন, সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম তাকিয়ে, কই সে? ওই না? গগল্‌স্ চোখে? গগল্‌স্ অনেক। আজকাল গগল্‌স্ দিল্লীতে ফ্যাশন। ফ্যাশন প্রয়োজন দুইই বটে। মেয়ে-পুরুষ সবাই পরে। না, গগল্‌স্ ক'জনের চোখে থাকলেও সে নেই। সে রঙের শাড়িই নেই। মেয়েটি আজও সেই হাল্কা নীল বা সবুজ রঙের শাড়ি পরে এসেছিল। ওই রঙটা ওকে মানায় ভাল। এবং মেয়েটি তা জানে।

চার

দিন পঁচিশেক পর। এপ্রিল মাসে শেষের দিকে পৌঁছেছে। শুকনো গরমে শরীর ফাটতে শুরু করেছে। দুপুরে রোদের মধ্যে বের হওয়া দূরের কথা, রোদের দিকে চাওয়া যায় না। সন্ধ্যের পর ভিন্ন বের হওয়া যায় না। সন্ধ্যে হতে সাতটা বেজে যায়। কলকাতা থেকে দিল্লীতে সূর্য ওঠেন দেরিতে, অস্ত যানও দেরিতে। কনট সার্কাসে গিয়ে দু' পাক দিতে-না-দিতে দোকান বন্ধের পালা পড়ে যায়। তাই সেদিন সকাল-সকাল বেরিয়েছিলাম। দিনের আলোরও দরকার ছিল। জনপথের ফুটপাথে চট পেতে যে-সব প্রাচীন তিব্বতী দক্ষিণী পিতলের মূর্তি, টেরাকোটা মূর্তি, কাঠের

মূর্তি বিক্রি হয়, যা আমি নিত্যই দেখি, সেগুলির মধ্যে আগের দিন একটি বিচিত্র মূর্তি দেখেছিলাম। এ মূর্তি আমি আগে আর চোখে দেখিনি। মূর্তিটি শিব ও শিবানীর বিহার অবস্থার মূর্তি। রাত্রে দেখে ঠিক সুষমার পূর্ণ আস্বাদন পাইনি। দাম বেশি বলেছিল বলেই না-দেখে কিনিনি। আমার ট্যাক্সিওয়ালা বন্ধু উধম সিং আমাকে আর একদিন রাত্রে একটি মূল্যবান কথা বলেছিল। উধম সিং ট্যাক্সিওয়ালা বটে কিন্তু ওর সঙ্গে আমার পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রীতি-মমতার স্রোত ফল্গুধারার মতো বিদ্যমান। আগে যখন কনস্টিট্যুশন হাউসে থাকতাম তখন থেকে ওর সঙ্গে পরিচয়। একটু বিচিত্রভাবে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন কারুর ইচ্ছেতে (যে জনকে দেখতে পাইনে) এর সূত্রপাত। অবশ্য সেটা আমারই মনগড়া। সে বিবরণ থাক। উধম সিং এমনি ভাবে একদিন রাত্রে মূর্তি কেনার সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার কাছে সেদিন টাকা বেশি ছিল না, তাই না-কিনে ফিরে তার ট্যাক্সিতে বসতেই বলেছিল, বাবুজী, তুমি না কিনেছ ভালই করেছ।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কেন বল তো?

—বাবুজী দেখিয়ে, আপনি যে এ চিজ কিনছেন, কেন কিনছেন? ও চিজটির সুরতের জন্যে কিনছেন তো? তা রাত্রিকালে বাবুজী বুড্‌টিতে রঙ মেখে এইসা সুরত বানায়—ঝুটা সুরত—যা ধরবার উপায় থাকে না। গাছকে মানুষ মনে হয়, চোর 'ছিপাকে' দাঁড়িয়ে থাকলে আঁখসে মালুম হয় না। সূরযনারায়ণ থাকতে এ ফাঁকি চলে না। কাল দিনে দেখে কিনো। হার জিতের আপসোস থাকবে না।

সে কথাটি ভাল লেগেছিল, কথাটা মেনে চলি। তাই কাল রাত্রে মূর্তিটি দুর্লভ বা অসচরাচর হলেও কিনিনি।

বেলা পাঁচটা। এপ্রিলের বেলা পাঁচটায় দিল্লীতে রোদের উত্তাপ কলকাতার সাড়ে তিনটে-চারটের মতো। ওখানে নেমে মূর্তিটি দেখছি, কিনছি। হঠাৎ পিছনে থেকে মৃদুস্বরে কেউ বললে, হ্যালো ইজ ইট রিয়ালি ইউ ওল্ড ম্যান, মাই ফ্রেন্ড?

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আর কেউ নয়—রৌশন। মনে হলো রৌদ্রে খুব ঘুরেছে। দেখেও খুশি হইনি। সেদিন দাদাসাহেবের ওখানে ওই সব শুনে খুশি হবার কথা নয়। তবুও একটু হেসে বললাম, ইয়েস। কিন্তু তুমি কোত্থেকে?

—আসমানসে নেহি। পথে পয়দলে হাঁটতে হাঁটতে। তোমার মতো ট্যাক্সিতেও নয়।

—ভাল। চলেছ কোথায়? ভাল আছ?

—যাব আর কোথায়? এই কাজ শেষ হলো। এবার একটু ঘুরে আস্তানায় ফিরব।

—কি কাজ করছ এখন? নতুন প্লে?

—না, না, না। ও আমার কাজ ঠিক নয়। ওটাতে একটা চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম। ভাগ্য মন্দ। আর—থাক সে সব। আমি আসলে এই সব নিয়েই কাজ করি। এই সব কিউরিয়ো, আর্ট ট্রেজার। নিজে একটু-আধটু ছবি-টবি আঁকি। আর বিদেশী টুরিস্ট এলে তাদের গাইডের কাজও করি, সঙ্গে সঙ্গে এই সব জিনিসও বিক্রি করি।

একদল ইংরেজ এসেছে, তাদের কুতুব তোঘলকাবাদ ওই দিকটা দেখিয়ে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এই ফিরছি। কিন্তু তুমি এই সব জিনিস কেন বুঝি? হাঁ—হাঁ—হাঁ, দাদাসাহেব সেদিন বলছিলেন বটে। তা কিনছ? এদের সঙ্গে দর করতে পার?

—তা জানি নে। এ সব জিনিসে ঠকা জেতার হিসেব করি নে। করলে কেনাও যায় না। তাছাড়া দিল্লীতে তো জিনিসের দর কুতুবমিনারের মাথায় চড়ে বসে থাকে।

—সিঁড়ি আছে কুতুবমিনারে, টেনে নামিয়ে আনতে হয়। সর, আমি দেখি। ওরা আমাকে খুব চেনে। তোমাকে কত দাম বলেছে? চল্লিশ?

—পঁয়তাল্লিশ।

—হায় পরমাত্মা! তুমি নিশ্চয় এর আগে এদের কাছে বেশি দামে জিনিস কিনেছ, না হয় তো দু'তিন দিন এটার জন্যে এসে দর করে যাচ্ছ?

—সেটা সত্যি। কাল রাত্রে বলেছিল চল্লিশ। আজ বলে পঁয়তাল্লিশ!

—আচ্ছা।

বলে সে মূর্তিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। বললে, নাও, দাম বল।

মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললে, বলেছি তো?

—না, না। উনি আমার দোস্ত। ঠিক দাম বাতাও।

—চালিশ!

রৌশন মুখে কিছু বললে না, শুধু তিনটে আঙুল দেখালে।

—নেহি, নেহি হোগা।

—হোগা। হো গেয়া। এক দো তিন। বাস্ করো।

তিরিশ টাকাতেই কিনে দিলে রৌশন। এবং জিজ্ঞেস করলে, এনিথিং এল্‌স্?

—নো, থ্যাঙ্কস।

—আচ্ছা। তা হলে, চল কফি হাউসে কফি খাইযে দাও।

—তারপর?

—তারপর— ? না বাসায় আর যাব না। সাতটায় ফিরতে হবে হোটেলে। ডিনারের পর ওরা যদি কোথাও যেতে চায় তবে ব্যবস্থা করতে হবে। এইখানেই খানিকক্ষণ ঘুরব। বন্ধু মিলতে পারে। পার্কে বসব। কি ফের কফি হাউসে ঢুকব।

কফি খেতে বসে হঠাৎ সে বললে, তোমায় আমি একটা জিনিস দেখাব। দেখ তো।

তার বড় ধরনের ভ্যানিটি ব্যাগ বা ছোট হাতব্যাগটি খুলে বের করলে ছোট একটুকরো কাঠ এবং একটি পেন্সিল চক।—দেখ তো।

অবাক বা বিস্মিত হয়ে গেলাম বলব না, সাধারণ জিনিস—এ দেখেছি। কিন্তু সাধারণ যা বাজারে মেলে, দেখা যায়, তার থেকে ভাল। কাঠের টুকরোটি পালিশকরা, তার উপরে খুদে লালকেল্লার ছবি আঁকা। খোদাই দাগের উপরে হাতির দাঁতের মতো কোন সাদা জিনিস দিয়েছে যাতে ঠিক হাতির দাঁত বলেই মনে হয়। কোন সস্তা

হাড়ও হতে পারে। আর পেন্সিল চকটি নীল রঙ মানিয়ে তার উপর সুন্দর একটি মেয়ের ছবি। রঙীন।

সে বললে, ইয়ে দিল্লী আর ইয়ে ময় হুঁ। বল, আমার মতো হয়নি?

প্রশ্ন করলাম, তুমি করেছ?

—তোমার ভাল লাগলে, আমি করেছি; না-লাগলে, আমি করিনি। হাসতে লাগল।

—না ভাল লেগেছে। সত্যিই ভাল লেগেছে। রাখ।

—তুমি রাখ। খুশি হয়ে দিচ্ছি। এসব আমি ওই টুরিস্টদের জন্যে করে রাখি। ওদের সকলকে যাবার সময় দিই। বিজ্ঞাপন বলতে পার।

—কিন্তু আমার কাছে তোমার বিজ্ঞাপনের দরকার নেই।

—তা হলেও ধর, এ দুটো দিয়ে মনে মনে বলছি, ফরগেট মি নট।

তার পরমুহূর্তেই বললে, নেইই বা কেন? এতে তোমার মনে হবে আমি রঙীন ফানুস নই। তাছাড়া তুমি ওই সব জিনিস কেনো, মনে কর ক্লায়েন্ট তৈবি করছি।

আজ ভারী ভাল লাগল রৌশনকে। মনে হলো, মানুষ কখনও রঙীন ফানুস হয না। কিছু বস্তু থাকেই। বাসায় ফিরে এলাম। পকেট থেকে ও দুটোকে বের করে দেখলাম পেন্সিল চকটা দু'খানা হযে ভেঙে গেছে। কিন্তু ছবিটা গোটা আছে। চকটা ঠিক মাথার উপর থেকে ভেঙেছে।

চাবদিন পর; মনে হলো ছবিটা দু'খানা হযে ভাঙলেই ভাল হত। সমস্ত মনটা যেন বিষিযে গেল।

সেদিন জনপথের উপর ⁻ড হোটেলগুলোর মধ্যে একটায গিয়েছিলাম বম্বের এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি গত রাত্রে ফোন করেছিলেন। শরীর ভাল নেই, থাকলে তিনিই আসতেন আমার বাসায়। ইস্ট জার্মানী, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেবী, রাশিয়া চষে ফিরেছেন, ধকল অনেক গেছে; শরীর খারাপের দোষ কি?

লিফ্‌টে তিনতলায় উঠে করিডর ধরে চলেছিলাম। বেলা তিনটে হবে, লোকজন নেই। হঠাৎ একটা দরজা খুলে যেন ছিটকে বেরিযে এল একটা মেয়ে। সামনে খানিকটা দূরে, তবু চিনতে পারলাম সে রৌশন। বেরিয়েই সে হন্‌হন্ করে চলে আসছিল। ওদিকে পিছনে দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি সাদা চামডা ছোকরা। সে যেন তাকে ধববার জন্যে অগ্রসর হলো। লম্বা পা ফেলে ডাকলে, ইউ! ইউ! ডু ইউ হিয়ার?—ইউ।

রৌশন দাঁডায়নি। আমাকে সামনে দেখেও না। সে পালাচ্ছিল। বিদেশী ছোকরা লম্বা পা ফেলে এসে তার সামনে দাঁড়িযে রুখে বললে, মাই মানি। রুপেয়া দেও হামারা!

আমি তখন প্রায় কাছে এসে পড়েছি। বেশি হলে হয়তো পনের-বিশ ফুট তফাতে।

রৌশনের মুখ আমার দিকে। চোখ ফিরিয়ে সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা তার মতো প্রগলভার মুখেও জোগাল না। ছোকরাটি তার হাত ধরে বললে, তোমাকে আমি ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাব। সমস্ত কথা বলব। ইউ ড্যাম চীট। লোক ঠকানো তোমার পেশা। তুমি জান, ম্যানেজারকে বললে এ হোটেলে ঢোকা তোমার বন্ধ হয়ে যাবে।

রৌশন যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেছে। এমন সে হতে পারে তা আমি ভাবতে পারিনি। পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিলাম। টাকার কথা এবং যেভাবে সে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে, যেভাবে ওই বিদেশী উদ্ধত যুবক উত্তেজনায় তার পথ অবরোধ করেছে তাতে আভ্যন্তরীণ কুৎসিতপনা নির্লজ্জভাবে দাঁত বের করে হাসছিল। কাছে পৌঁছতেই গন্ধতেও প্রকাশ পেল। মদ্যগন্ধে কযেক ফুটের মধ্যে বাতাস সংক্রামিত হয়ে উঠেছে।

রৌশন মাথা হেঁট করে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

আমি দাঁড়িযে গেলাম। রৌশনকেই ডাকলাম, হ্যালো! রৌশন?

বিদেশী ছোকরা চোখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে বিবক্ত হয়ে উঠল। মুখে-চোখে অসহিষ্ণু ঔদ্ধত্য রেখায় রেখায় ফুটে উঠল। দিল্লীর গরমে চড়া রোদে মদ্যের ক্রিয়াও বোধ করি মাত্রা ছাড়িয়েছিল। সে বললে, ওযেল জেন্টেলম্যান—

আমি প্রস্তুত ছিলাম, প্রত্যাশা করছিলাম কিছুটা। বললাম, ইযেস জেন্টেলম্যান।

—অনুগ্রহ করে যদি তুমি নিজের কাজে যাও তো আমি খুশি হব। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে, কাজ আছে।

চট করে জবাবটা এসে গেল অর্থাৎ ভেবেচিন্তে নয়। ওই জবাবটাই এল তাই বললাম, আমার ওর সঙ্গে তোমার কাজের চেয়েও জরুরি কাজ আছে। আমি ওকে খুঁজতেই এসেছি।

—তোমার কাছে ও টাকা নিয়ে এনগেজমেন্ট রাখেনি—না কি?

আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। একজন পানোন্মত্ত বিদেশী এই দেশের একটি মেয়ের, সে যেই হোক তার পরিচয়, চরিত্র, অপমান করবে, তার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে অপমান করবে সে সহ্য হলো না। বলে উঠলাম, তুমি জান, তুমি কি বলছ?

—নিশ্চয় জানি।

—না। জান না। জান, রৌশন আমার ধর্মকন্যা। সী ইজ মাই অ্যাডপটেড ডটার। আই কল হার মাই লিট্‌ল্ মাদার।

—ওঃ, গৌরবের ধর্মকন্যা তোমার—

—শাট আপ! আই সে! আমি এই হোটেলের সমস্ত ইন্ডিয়ানকে ডাকব এবং বলব, তুমি এমনি জঘন্যভাবে এদেশের মেয়ের অপমান করছ।

এবার ছোকরা চমকাল! এটা সে ভাবেনি। চমকে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, কি করেছে রৌশন যে, তুমি এমন কথা বলছ? আমি শুনেছি, তুমি টাকার কথা বলছিলে। ফিরে চাচ্ছিলে টাকা।

—হ্যাঁ, ও আমার কাছে একশো টাকা নিয়েছে।

রৌশন এবার বললে, কিছু মূর্তি সংগ্রহ করে দেবার জন্য একশো টাকা দিয়েছিল কিন্তু সে মূর্তি এখনও পৌঁছয়নি। ও—।

আমার ব্যাগে টাকা ছিল। আমি বের করে একশো টাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বললাম, যাও চলে যাও। একটা কথা শুধু স্মরণ রেখো, উপকার হবে। ভিন্ন দেশে যখন যাবে তখন সে দেশের মেয়েদের সব থেকে বেশি শ্রদ্ধা সম্মান দিয়ো। যাও।

রৌশনকে বললাম, যাও, বাড়ি যাও। তোমাকে খুঁজে আমি হায়রান। যাও দেরি করো না।

রৌশন নীরবে মাথা হেঁট করে চলে গেল। ওর শরীর থেকেও মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। হতভাগা মেয়ে ভাগ্যের নামে হতভাগ্যের পিছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছে।

যতক্ষণ সে লিফ্‌টে না চড়ল ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

একশো টাকা যাওয়ার জন্য মনে আক্ষেপ ছিল না। সে চলে গেলে আমি ও প্রান্তের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রায় শেষ প্রান্তে বন্ধুর ঘর।

পাঁচ

ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

বাসার দরজায় নেমেছি। রাস্তার ধারে বড় গাছগুলির তলার অন্ধকার থেকে কে উঠে এল। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিল; ট্যাক্সি থেকেই নজরে পড়েছিল কিন্তু সে নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। গবমের দিন—গরমের দিন কেন—শীত বা গ্রীষ্ম যে কালই হোক, সাউথ অ্যাভেনুর দু'পাশের ছোট পথে এবং ঘাসওয়ালা মাঝখানের জায়গায় সভ্য মানব-মানবীরা ঘুরে বেড়ান। এদের ছোট ছেলেদের ব্যাডমিন্টন থেকে ক্রিকেট চলে; মাঝে মাঝে ফুলের বেড: তার চারদিকে পশ্চিম অঞ্চলের তাজা-স্বাস্থ্য টকটকে-রঙ, রঙীন পোশাক পরা বাচ্চারা টলতে টলতে ঘুরে বেড়ায়। দাঈ—মডার্ন কথায় আয়ারা, প্যারাম্বুলেটর ঠেলে। মাঝে মাঝে সাহেবী পোশাক পরা (কোট অবশ্য গলাবন্ধ) বা পাজামা শেরওয়ানী পরা কেউ চামড়ার দড়ি হাতে হন্‌হন্‌ করে হাঁটেন, পিছনে চলে অ্যালসেশিয়ান। মেয়েদের পোশাক আশিভাগ শাড়ি। কিছু সালোয়ার পাঞ্জাবি। মজুর-মজুরনীরা ঘাগরা কাঁচুলি ওড়না পরে কিন্তু তারা সকালে কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। কোন মেয়ে এখানে গাছে ঠেস দিয়ে বসে থাকলে কোন প্রশ্নই জাগে না।

মেয়েটি উঠে এসে দাঁড়াল। সে রৌশন।

চিত্ত কিন্তু আমার প্রসন্ন হলো না। সে বললে, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি।

উত্তর দিলাম না।

সে বললে, হোটেল থেকে বরাবর এখানে এসেছি।

এবার বললাম, ঠিকানা কোথায় পেলে?

—হোটেলের নীচেতলায় এসে ফোন গাইড থেকে দেখে নিয়েছিলাম।

—আর কোন দরকার আছে?

—আছে।

কি বলব? কয়েক পা নীরবে হেঁটে বললাম, এস।

'না' কথাটা বলতে পারলাম না কিন্তু মনে খুব, খুব কেন—আদৌ সায় ছিল না। বাসায় ঢোকা না-পর্যন্ত সেও কোন কথা বলেনি। ঘরে ঢুকে বসবার আসন দেখিয়ে বললাম, বস।

বসে সে বললে, এক গ্লাস জল খাব।

দিল্লীর সংসার আমার চাকর নিয়ে। চাকরকে ডেকে বললাম, জল দে এক গ্লাস।

তার কথা কি জানি। কোনমতে একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। অথবা একশো টাকা দিয়ে তাকে অপমান থেকে বাঁচিয়েছি যখন তখন সে প্রত্যাশা করেছে আর দশ-বিশ টাকা কি আর বের না হবে?

জলের গ্লাসটা একনিঃশ্বাসে শেষ করে সে বললে, আঃ বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

একটু অপেক্ষা করে বললাম, একেবারে সরাসরিই বলে ফেললাম, ধন্যবাদ দিতে এসেছ?

—না।

—তবে?

একটু চুপ করে থেকে বললে, সেই তোঘলকাবাদ থেকে তুমি আমার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতে চেয়েছ। আমি পাতাইনি। আজ--

মুখ তুলে তাকিয়ে সে হাসলে। সংসার বিচিত্র। অথবা মূর্খের মেলা। একটি ভাল কথা বললেই মন্দ মানুষকে ভাল মনে হয়। পিছনের সব মন্দ কথা ঢাকা পড়ে যায়। আশ্চর্য, আমি প্রসন্ন হয়ে উঠেই বললাম, মা হলে আজ থেকে?

—না। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ও নাড়ল।

আমার ভুরু দুটি কুঁচকে আবার কপালের শিরায় টান ধরাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সে ওই কয়েক সেকেন্ড থেমে ঘাড় নাড়া বন্ধ করে বললে, তুমি আজ বলেছ আমি তোমার ধরমবেটী, অ্যাডপটেড ডটার। আজ থেকে তুমি আমার পিতাজী, আমি মেয়ে।

ব্যস। ওইটুকু বলেই সে উঠল যেন তীরের মতো। এবং চট করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি বেরিয়ে এলাম, ডাকলাম, রৌশন! রৌশন!

সে প্রায় ছুটে দুড়দুড় শব্দ করে নেমে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ধরবার সময়ও ছিল না। উচিতও হত না। লোকে মনে করত, অন্তত কিছু মনে করতে পারত। আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ডাকতে গেলাম, কিন্তু তাও পারলাম না। দেখলাম সে হন্‌হন্‌ করে চলছে; চলছে নয় ছুটছে—বাসস্ট্যান্ডের দিকে। অনেকটা দূর পর্যন্ত

তাকে দেখা গেল। দাঁড়িয়েই রইলাম। যাক, এ আবেগ আর কতক্ষণ ? হয়তো যতক্ষণ পানীয়ের প্রভাব আছে ততক্ষণ। সে প্রভাব এখন আছে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। অথবা আজকের রাত্রিটা, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন সব, বিগত দিনের সব মুছে যাবে। আমি জানি এ দিক আর ও মাড়াবে না। আমাকে দেখলে অন্য পথে হাঁটবে।

মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে আমার পারঙ্গমতায় বা সার্থকতায় আমি খুশি হলাম। রৌশনের মতো মেয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। বাংলাদেশে এমন মেয়ে বিরল না হলেও অল্প। তবে দু'জন একজনকে দেখেছি, জানি; এই দিল্লী শহরেও একজনের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। তবে ঘনিষ্ঠতা কম। এমন ক্ষেত্রও তখনও হয়নি। সুতরাং এ অনুমান অভিজ্ঞতা থেকে নয়, এ অনুমানে আমাব বুদ্ধির গৌরব করতে পারি। রৌশন সম্পর্কে আমার অনুমান পনের আনা মিলে গেল।

সাতদিনের মধ্যে রৌশন এল না। সাতদিন পরে একখানা চিঠি এল। এক আনা গরমিল হলো ওই চিঠিখানা। পথে হঠাৎ দেখা হলে সে চলে না গিয়ে কথা বললে বলতাম, এক পয়সা গরমিল। ইংরিজীতে লিখেছে। হাতের লেখাটি ভাল। কিন্তু ভাষাটা গোলমেলে। কথাবার্তা রৌশন ইংরিজীতে চালায়, বেশ চালায়, অনর্গল বলে, থামে না কিন্তু ভুল থাকে অনেক। আমার থেকেও ভুল থাকে। চিঠিখানায় যেন বেশি অসুবিধায় পড়েছে। কথা বলা আর লেখা, সে চিঠি হলেও, এক নয়। লিখেছে—

ডিয়ার ফাদার, (মাই ডিয়ার নয়)

সেদিন তোমাকে ফাদার বলেছি, ওটা মেনে নিয়েছি। পরে অবশ্য মনে কেমন কেমন ঠেকেছে, খুঁতখুঁত করেছে কিন্তু তুমি আমার জন্যে যা করেছ তারপর যদি বলি ওটা ভুল হয়েছে, নিতান্তভাবে সে কালে সেই মাতালের বাদশাকে হাতি বিক্রি করবে কিনা জিজ্ঞাসা করার গল্পের মতো কাণ্ড—তা হলে ঠিক হবে না। সেদিন পানীয়ের প্রভাব আমার উপব ছিল সে তুমি জানতে পেরেছিলে। তা ছিল, কিন্তু আমার সচেতনতাও ছিল, এটা নিশ্চয় ওই হোটেলের বারান্দায় তুমি লক্ষ্য করেছ। তা না-হলে তো এমন দৃশ্য বা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটত না। খুব বেশি কথা বলব না। তবে তুমি সেদিন আমাকে তো জেনে বুঝেই তাকে বলেছিলে—রৌশন আমার ধরমবেটী—আমাকে খারাপ জেনে, মন্দ জেনেই কথাটা অসংকোচে বললে। তারপর তোমাকে ফাদার বলতে সত্যিই ইচ্ছে হয়েছিল, পানীয়ের প্রভাবও তার সঙ্গে মিশেছিল। আবেগটা বেশি হয়েছিল। না-হলে ঘণ্টা তিনেক গাছে ঠেস দিয়ে তোমার বাসার সামনে বসে বসে ঢুলতে পারতাম না। পরে মন খুঁতখুঁত করলেও ওটাকে মেনে নিয়েছি। আমি মন্দ মেয়ে, এ ব্যাড গার্ল জেনেই তুমি কথাটা বলেছ। সুতরাং আমার দিক থেকে কি আপত্তি থাকবে? আমার বাবা তো ছিল। সে থাকলে বরং তার সঙ্গে ঝগড়া হত কিন্তু তোমার সঙ্গে তো ঝগড়া হবে না। তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। বন্ধু হলে যেতাম। ফাদার বলেছি বলেই যাব না। তবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার সত্যিই উপকার করেছ। আমি কৃতজ্ঞ। তার থেকে বেশি—তুমি

আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। তোঘলকাবাদে প্রথম দেখা হওয়ার সময় যে জেদটা ধরেছিলে, যাতে আমি বার বার না বলে ঘাড় নেড়েছি, তা আমাকে স্বীকার করিয়ে ছেড়েছ। কথাটা দাদাজীকে বলো না। বললে যায় আসে না কিছু, তবে বলো না। টাকাটা ফেরত দেবার ইচ্ছে আমার খুব। হাতে নেই। টাকায় কুলোয় না আমার। তবে হলে, দেব। ইতি—

রৌশন

আমি এক চোট হাসলাম। কি করব আর? মনটা খুশি ছিল। অনুমান সত্য হয়েছে বলে।

এরপর কয়েক দিনই ওই তিব্বতী বা নেপালীদের ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকলাম বিকেলে কিন্তু রৌশনের দেখা পেলাম না।

এর কয়েক দিন পর, মে মাসের আট-দশ তারিখ হবে, দাদাসাহেবের সঙ্গে দেখা হলো।

দাদাসাহেব বললেন, রৌশনকে মনে পড়ে তো? দ্যাট স্পয়েল্‌ড গার্ল!

—হ্যাঁ। কি হলো তার?

—তাজ্জব কি বাত, আজ এরোড্রামে গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানে, বললে কাশ্মীর যাচ্ছে। আরে বাপ! মনে হলো আমেরিকান গার্ল! স্ল্যাক, ব্লাউজ পরে, গগল্‌স্ চোখে, বাপ রে! তোমাকে নমস্তে জানিয়েছে।

ক'জনের কাছে টাকা নিয়েছিল রৌশন?

এর ক'দিন পরই চলে এলাম দিল্লী থেকে।

কলকাতায় এসে নিজের কাজে মগ্ন হয়ে ছিলাম। হঠাৎ এর মধ্যে রৌশন এসে দাঁড়াল। রৌশন সশরীরে নয়, ডাক মারফত তার বিচিত্র পরিচয় এল। পিওন হাঁকলে, ইনসিওর! ইনসিওর? দেখলাম, রৌশন ইনসিওব করে একশো টাকা পাঠিয়েছে। ইনসিওরটা দিল্লীর ঠিকানা ঘুরে এখানে এসেছে।

সঙ্গে ছোট্ট চিঠি।

ফাদার, কিছু টাকা পেয়েছি। বিশ্বাস করো, বাই অনেস্ট মীন্‌স্। তোমার টাকাটা ফেরত পাঠালাম। কাশ্মীর এসেছি। তোমার জন্যে কি নিয়ে যাব বল তো?

রৌশন।

সশরীরে রৌশন এল তিন মাস পর। সেপ্টেম্বর। তিন মাস পর দিল্লী গিয়েছিলাম। রৌশনের কথা মনে অবশ্যই হয়েছিল। সে নিজের কন্যা হলে তার ব্যবহারে, তার দুর্নামে যে দুঃখ পাবার কথা তা তো আমার হবার কথা নয়; হয়ওনি। সেই কারণে কনট সার্কাসে যখন গিয়েছি তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি রৌশন আছে কিনা জনস্রোতের মধ্যে। জনপথে সব থেকে বেশি ভিড়। রেফ্যুজিদের দোকান, ফুটপাথে পেপার পাল্পের পুতুল, কাগজের ফুল, তামা-পিতলের ওয়ালপ্লেটের নকল, পেপার পাল্পের ওয়ালপ্লেট, ফিরিওলা। ওরই মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ভারতীয় কুটিরশিল্পের কেন্দ্র, যেখানে কাপড়, কাগজের পুতুল থেকে কাশ্মীরী কার্পেট, পিতলের

মিনা করা টেবিল, সোনা-রূপোর কাজকরা শাল যার দাম আড়াই-তিন হাজার পর্যন্ত, তার ওধারে তিব্বতী নেপালী দক্ষিণী মূর্তির ফুটপাথের বাজার, যেখানে রৌশনের ঘোরাফেরা প্রায় নিত্য বলে আমার ধারণা। সেখানেও কদিন সে আসে কিনা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু পাইনি। চার-পাঁচ দিনের পর রৌশন সম্পর্কে একেবারেই আর চিন্তা ছিল না।

আট দিন পর হঠাৎ টেলিফোনে সাড়া পেলাম।

—হ্যালো—ইজ ইট... ?

—ইয়েস।

—শঙ্করজী ?

—হাঁ।

—ফাদার ! বাপুজী !

—রৌশন !

—হাঁ। তুমারা খারাপ লেড়কী ! বদমাস লেড়কী। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসির আমেজ।

—ভাল আছ ?

—খারাপ যারা তাবা তবিযতে খারাপ থাকে না বাপুজী।

—ভাল কি খবর বল।

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কাল যাব ?

— কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার তোমার সঙ্গে দেখা করা।

—এস। কাল এস। এবেলা বারোটা পর্যন্ত, ওবেলা চারটে থেকে ছটা।

—আচ্ছা নমস্তে।

—নমস্তে।

—নেহি। তুমি আমাকে নমস্তে বলবে কি ? তুমি পিতাজী। ধবমবাপ। বল, জিতা রহো, আনন্দ রহো।

—তাই বলছি। জিতা রহো, আনন্দ রহো।

কিন্তু বিচিত্র, না, বিচিত্র কেন, বিচিত্র মেয়ে রৌশন, তার পক্ষে এইটেই স্বাভাবিক, সে এল না। কোথায় কোন নবতর আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে কে বলতে পারে ? তার পরদিনও না।

দু'দিন পর, বেলা তখন একটা, আমি স্নান সেরে আমার শোবার ঘরে পুজোয় বসেছি, বাইরে দরজায় কলিং বেলে সাড়া উঠল। শোবার ঘরে আমার পুজোর পাট। পুজোর সময় দরজা বন্ধ করে বসি এবং যে কেউ আসুক তাকে হয় বসতে হয়, নয় ফিরে যেতে হয়। আমার লোককে এ বলা আছে। এবং এই অসময়ে কেউ আসে না কারণ দিল্লীতে এটা লাঞ্চের সময়।

চাকর দরজা খুললে, বন্ধ করলে। হয়তো কাগজপত্র হবে।

মনকে ধমক দিলাম। যে হবে, যা হবে, তুমি ওদিকে ছুটছ কোথায়? যাকে ডাকছ তাকে ডাক, ভাব।

মন চতুর। তার উত্তরের অভাব হয় না। সে বলে, যদি সেই এসে থাকে।

—না তাঁকে ডাকছি মনে। বাইরে এলে তাঁকেও বসতে হবে।

মন ফিরে এল পুজোয়। পুজো সেরে, পুজোর কাপড় ছেড়ে, একটা জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। বসবার ঘরে এসে দেখলাম রৌশন দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার সিগারেট, সে ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ওয়ালপ্লেট দেখছে নিবিষ্টচিত্তে।

ডাকলাম, রৌশন!

সে একটু চমকে উঠল। ফিরে আমাকে দেখে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে টিপে নিবিয়ে বললে, এসব তোমার এত শখ? এটা কোথায় কিনলে?

রৌশনের মুখের এমন চেহারা আমি কখনও দেখি তো নাই-ই, কল্পনাও করতে পারি না। মুখে একটা কি যেন ছায়া ফেলেছে বা ফুটে উঠেছে যেটা বিস্ময় বা জিজ্ঞাসা বা বিমুগ্ধতা যে-কোন একটা হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে মমতা আছে, তাতে ভুল নেই। আমিও ওর একটি নতুন পরিচয় যেন পেলাম। বললাম, সে কথা পরে বলছি, তার আগে আর একটা কথা বলব। মুখে আমার নিশ্চয় প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

সেও একটু হাসলে, বোধ হয় প্রতিবিম্বের মতো। কারণ সে হাসিও তার প্রসন্ন এবং চাতুর্যবর্জিত। বললে, ফরমাইয়ে।

—তুমি সত্যিকারের শিল্পী। সে আজ এই মুহূর্তে তোমার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, শিল্প আমি ভালবাসি।

—সে তোমার ওই ওয়ালপ্লেটখানা ভাল লাগাতেই বুঝেছি। ওর একটি ইতিহাস আছে। কিন্তু তার আগে তুমি দেখ, ওই জিনিস আরও আছে। চল ওই ঘরে।

এ জিনিস আরও ক'খানি ছিল। ঠিক একই জিনিস নয়। ওই একই রকমের। কাশ্মীরের পুরনো আমলের ডিজাইন—পুরনো শৈলী।

ওয়ালপ্লেট—পিতলজাতীয় ধাতুর তৈরি, ঢালের মতো ঢঙ। আকার সচরাচর দু'রকমের, একটা গোল অন্যটা ওভ্যাল। এর উপরে রিলিফে কাহিনীমূলক ছবি ফোটানো থাকে। হরপার্বতী, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-সরস্বতী ইত্যাদি এ ছাঁচের উপর ফেলে ছোট্ট হাতুড়ির নিপুণ মৃদু ঘায়ে ঘায়ে ফুটিয়ে তোলে। মূর্তির চারিধারে একটি পরিমণ্ডল রচনা করে সূক্ষ্ম বাটালি হাতুড়ির কাজ। এখন অর্থাৎ আধুনিক কালে এ শিল্পের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কাহিনীর দিক দিয়ে ওমর খৈয়ামের কবি ও সাকী, সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে, আবার সংযুক্তাহরণ পর্যন্ত এসেছে এবং ওই পরিমণ্ডলের কারুতে অনেক আধুনিক ঢঙ এসেছে। বলতেই হবে চোখে চটকদার হিসেবে এই আধুনিকগুলিই বেশি ঠেকে, চোখকে টানে। এগুলির বিক্রিও বেশি। পুরনো আমলের ঢঙের মধ্যে সেকেলে ভাব আছে, হয়তো বা গ্রাম্য মোটাও বলে অনেকে। প্রতিটি প্লেটের কাছে সে ঠিক ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একটু বিস্মিত হলাম এবার। বললাম, এগুলি কি খুব ভাল? খুব দুর্লভ মনে কর?

—আমার খুব ভাল লাগছে। আমি এ শিল্পকে খুব ভাল করে জানি। আমি নিজেই তৈরি করতে পারি। তা ছাড়া—

—তুমি পার?

—হ্যাঁ। তুমি দেখেছ আমার হাতের কাজ। তোমাকে লালকেল্লার ছবি আঁকা কাঠটা দিয়েছিলাম। এও আমি পারি। আমার সঙ্গে শ্রীনগরের খুব ভাল জিনিস রয়েছে, ডাল লেকে শিকারাতে মাঝি আর মাঝিনী। তোমার জন্যে এনেছি আমি, দেখাচ্ছি এখুনি। কাজ খুব ভাল। কিন্তু সে নয়, এগুলি একবাড়ির তৈরি আর পুরনো বাড়ির হাত।

—তোমার দৃষ্টি তো খুব তীক্ষ্ণ।

—আমি চিনি যে। এ সবের সঙ্গে—। তারপরই সে সচেতন হয়ে উঠল আমার খাওয়া হয়নি বলে। সত্যই, আমার খাবার সময় চলে যাচ্ছিল। স্নান করে পুজো শেষ হলেই ক্ষিদে যেটুক্ পাবার পেয়ে যায়। প্রাণায়াম শেষ হলেই যান্ত্রিক নিয়মে পিত্তরস ক্ষরিত হয় অভ্যাসফলে।

চাকব রামও দাঁড়িয়েছিল দরজায় কিন্তু বলতে সে কিছু পারছিল না। রৌশনের উপর সে বোধহয় চটেছিল। দরজায় একটা কডায় লাগানো চাবিসুদ্ধ তালাটা নিয়ে মোচডাচ্ছিল, এর মধ্যে চাবিটা খুলে মেঝের উপর পড়তেই তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল রৌশন। এবং বুঝতেও পেরেছিল যে লোকটি বিরক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় কারণও অনুমান করেছিল যে, খাবার সময় যাচ্ছে। সে তার কথা অসমাপ্ত রেখে বললে, ওঃ তোমার লাঞ্চের আমি দেরি করে দিচ্ছি বাপুজী। থাক ওসব কথা, চল তুমি খেয়ে নাও।

—তুমিও এস রৌশন। বাপুজী বলছ, আমার ধরম-বেটী তুমি, আমার সঙ্গে বাংলাদেশের ডাল ভাত চচ্চডি খাবে। ডোন্ট সে—নো।

হাসল সে। এবার তার হাসিতে তার স্বাভাবিক রঙ ধরেছে। বললে, ডাল ভাত নেহি বাপুজী, শুধু চচ্চডি।

—কেন? কম পডবে ভাবছ?

—না, তা ভাবিনি। তবে সেটাও ভাববার কথা। আমি তোমার মন্দ বেটী, বদমাস বেটী, খারাপ লেডকী হলেও আমি খেয়ে তোমাদের কাউকে উপোস করাব এমন ঠিক নই। তবে কথা তা নয়। আমি দুপুরে লাঞ্চে ভাত রোটী ভরপেট খাই নে। দিল্লীতে রেওয়াজই তাই—সেকালওয়ালারা খায়, একালওযালারা খায় না। ওই থোড়া-থুডি, কিছু তরকাবি, কিছু গোস, একখানা রোটী—এই খাই। কাজ করব কি করে?

সে বসে গেল একখানা চেয়ার নিয়ে।

তরকারি খুব মন্দ হলো না। ভাজা, মাছের ঝোল, আলু ছেঁচকি, স্যালাড—তার উপর রাম পাঁপড় ভেজে দিলে।

রৌশন বললে, একটু কফির জন্যে বলে দাও।

বেকুব হলাম, কফি তো নেই; রাখি নে ওটা। সে বললে, তবে চা।

খেতে খেতে বললে, জান বাপুজী, কাশ্মীর ক্র্যাফ্‌ট্‌সের আড়ৎ। শাল, গালিচা, দোপাট্টা এ সব বিশ্ববিখ্যাত। ওখানকার লোকে পুরুষ পুরুষ ধরে করে আসছে। দাদুর সুইয়ে নাতি সেলাই করে নকশা তোলে, দাদির সুই কাঁইচি পায় নাতির বউ, নাতনী। এক এক ঘরে এক এক নকশা আছে। সোনাব তারের কাজও হয়। ঠিক তেমনি আছে কাঠের কাজে হরেকরকম চিজ—বাক্স, তিনপাইয়া, ট্রে দেখেছ। তেমনি আছে পিতলের জিনিসের উপর নকশায় মিনায়। ঘরের দেমাক হচ্ছে ওই নকশা নিয়ে। যে ঘরে যে নকশার কাজের নাম ছোটে তার কারিগরির যেটুকু সব থেকে কিম্মতের কাজ তার কৌশল সেই বাড়িতেই লুকানো থাকে। সহজে বের হয় না। হলেও, ওই বাড়ির কাজের যে-কদর অন্যের কাজে ঠিক তেমন, এমন কি ভাল হলেও হয় না। ধর আমি তোমার বেটী, এই কাজ শিখে শ্বশুরালের ঘরে গিয়ে সেখানে এই জিনিস তৈরি করলাম। কিন্তু তবু ওর কদর হবে না। লোকে, মানে, যারা এই সব নিযে কারবার করে তারা তাদের ঘরের সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে দেয়। ট্রেডমার্ক বলতে পার। ওটা কেউ নকল করে না। তোমার দেওয়ালের সব প্লেটগুলি একবাড়ির। সব প্লেটে এক চিহ্ন। এ কথা সকলে জানে না। জানে যারা খুব ভাল করে এদের সঙ্গে মিশে কারবার করেছে বা এদের নিজেদের লোকেরা।

তারপর থেমে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, রাগ করো না বাপুজী, একটা সিগারেট খাব। তুমি খাচ্ছ, গন্ধে আমাব মন খাবার জন্য ছটফট করছে। আমি বড্ড সিগারেট খাই। আই অ্যাম ইওর ব্যাড ডটার!

—সে কি! খাও। এই নাও। আমারই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুমি—

—হ্যাঁ, আমি মুখের সিগারেট তখন ফেলে দিযেছিলাম। আপনাআপনি ফেলে দিয়েছিলাম। ঠিক যখন প্রথম সিগারেট খেতে শিখি তখন যেমন আমার নিজের বাপকে দেখে ফেলে দিয়েছি তেমনি ভাবে।

সে সিগারেট ধরালে। ধোঁযা ছেড়ে বললে, আমি সত্যিই মন্দ মেয়ে। সত্যিই মন্দ। আই স্মোক, আই ড্রিংক, অ্যান্ড—।

চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে রইল।

আমি কথাটা ঘোরাবার জন্য বললাম, ও সব বাত্ ছোড়ো রৌশন। এখন যে কথা হচ্ছিল তাই বল।

—ওই ক্র্যাফ্‌ট্‌সের কথা। ওগুলো তোমার পুরনো বাড়ির কাজ বটে, পুরনো ঢঙ আছে কিন্তু তৈরি হাল আমলের। আজকালকার।

আমি খুশি হযে উঠলাম। সত্যিই খুশি হলাম। এমন একটি আত্মসর্বস্ব বিলাসিনী, যাকে রঙ্গিনী বললে অত্যুক্তি হয় না তার মধ্যে এমন একটি গুণ আবিষ্কার করে খুশি হলাম। বললাম, সাবাস! ওয়ান্ডারফুল। তুমি ফুলমার্ক পেয়ে গেছ।

সে হাসলে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ছেলেবেলায় এসব আমি যে দেখেছি। আমার বাপ ছিল শিল্প-পাগল লোক, ছোটখাটো সরদার আমীর। মা ছিল না। আমি

গ্রামে ইচ্ছেমতো ঘুরতাম। এই সব কারিগর-লোকের বাড়ি গিয়ে বসে থাকতাম। কাজ দেখতাম। বলতাম, আমাকে দেখাও, আমি শিখব। লোকে আমীরের বেটী বলে ভালবাসত; শেখাত। তারা জানত, আমি তো আর এ-সব করে খাব না।

থেমে-থেমে কথাগুলি বলছিল সে। মনে মনে যেন সেই সব ছবিগুলি ভেসে উঠেছিল এবং তাড়াতাড়ি কথা বলে ছবিগুলিকে মুছে দিতে বা সিনেমার ছবির মতো পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

হঠাৎ বললে, জান, ছেলেবেলা থেকেই আমি মন্দ। দুরন্ত। আমাদের দেশে তো ঘোড়া অনেক। জাঠদের ঘরে ঘোড়া আছে। মাঠে চরে বেড়ায়। সেই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতাম। তারপর একটু থেমে বললে, একবার মেলায় গিয়েছিলাম বাপকে না বলে। এমনি একটা ঘোড়ায় চড়ে। সেখানে হঠাৎ হুজ্জৎ বাধল। ওঃ, সে যে কি বিপদ! জান, এক ছোকরা শেষে আমাকে বাঁচায়। নিজে একটা ঘোড়ায় চড়ে আমার ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে ছোটাতে ছোটাতে নিয়ে আসে। আমার কি বিপদ! এই পড়ে যাব, এই পড়ে যাব মনে হচ্ছিল। কিন্তু কষে ঘোড়ার গলাটা ধরে আর রেকাবে পা টান রেখে এসে পৌঁছেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলাম দু'জনেই। মেয়েটি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল সেদিন। যেদিন হোটেল থেকে মদ-খাওয়া অবস্থায় এসে আমাকে ধরমবাপ বলে ছুটে পালিয়েছিল সেদিনও এমন হয়নি।

কিছুক্ষণ পর আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম, তোমার বাবা বেঁচে আছেন?

—নাঃ।

—কি নাম ছিল তাঁর?

—নো, নো ফাদার! বলতে নেই। আই অ্যাম এ ব্যাড গার্ল।

তারপরই বললে, তবে—, তবে তোমাকে বলতে পারি। বলা উচিত। একটু হাসলে এবং বললে, আমার পিতাজীর নাম—শঙ্করজী।

বুঝলাম আবহাওয়াটাকে লঘু করে তুলতে চাইছে। আমি হাসলাম।

সে হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, অয় বাপ! দু' ঘণ্টা হয়ে গেছে! নাও তোমার জন্যে কাশ্মীর থেকে ওয়ালপ্লেট এনেছি যা বলছিলাম।

তার কাঁধের ঝোলা থেকে একখানি চমৎকার প্লেট বের করে টেবিলের উপর রাখলে। চমৎকার, অতি সুন্দর জিনিস। কাশ্মীর এম্পোরিয়ামে অবশ্যই থাকবে কিন্তু আমার চোখে পড়েনি। ডাল লেকে বা কোন জলস্রোতের উপর মাঝি ও মাঝিনী! তারা অবশ্য কাশ্মীরী। সুতরাং ডাল লেক বলা যায়। দাম দেখলাম ওতে আঁটা একটি কাগজের টুকরোয় লেখা, চল্লিশ টাকা কত নয়া পয়সা। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, এ যে অনেক দাম রৌশন!

—ভাল জিনিসের দাম বেশি হবেই বাপুজী।

বলে আরও কয়েকটা টুকরো টুকরো খেলনা রাখলে সে। তারপর উঠল। আমার

সিগারেটের বাক্স থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললে, তুমি আমার বাপুজী তো?

বললাম, জরুর। বুঝলাম সে উপহার দেবার দাবি খুঁজছে।

সে বললে, আমি তোমার গরীব বেটী।

—কেন? গরীব কেন? তুমি বড় বাপের মেয়ে, তুমি—

—বিলকুল বেচে বাপ ফকির হয়ে মরে আমায় পথে বসিয়ে গেছে।

চুপ করে রইলাম। দুঃখ অনুভব করছিলাম রৌশনের জন্য। রৌশন নিজে থেকেই বললে, আমি সত্যিই গরীব। জীবনে অভাব মিটল না। অভাব যার মেটে না সে গরীব নয় তো কি!

একটু চুপ করে থেকে বললে, ওই ছোট জিনিসগুলো তোমার গরীব বেটির উপহার আর ওই প্লেটটার দাম তুমি আমাকে দিয়ো। কেমন?

বললাম, বস। আমি দেবার কথাই ভাবছিলাম।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, বাপুজী, সত্যিকারের বাপ তুমি।

সে বসল।

আমি উঠে শোবার ঘরে গেলাম টাকা আনবার জন্য। হাসতে হাসতেই গেলাম। মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ব্যঙ্গ করছিলাম। আমি কিনা ওব ওই সব গরীব বেটী ইত্যাদি কথাগুলির ভণিতায় বোকার মতো ভাবছিলাম মেয়েটি সবিনয়ে বলছে, বাপুজী, আমি গরীব, তা হলেও তুমি বাপুজী। তুমি যেন এ নিতে সঙ্কোচ করো না। হায় ভগবান! কিছুদিন আগে রৌশনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। যাক! রৌশন একশোটা টাকা ফেবত দিয়েছে যখন তখন চল্লিশটে টাকা নিযে যেতে পারে।

টাকা নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম সে আবার সেই ওয়ালপ্লেটটা দেখছে। সেই তেমনি মুগ্ধ বিস্ময় বা মমতা বা এমনি একটা কিছুর সঙ্গে দেখছে। আমি বললাম, ওটা কি এত ভাল, রৌশন? নেবে তুমি ওটা?

—নাঃ। সে ঘাড নাড়লে।

—নাও! তোমার টাকাটা নাও।

টাকাটা হাতে দিয়ে বললাম, ওটার দাম কত জান?

—কত? পনের ষোল টাকা। বেশি দিযে থাক তো কুড়ি! যারা বেচে তারা ওই রকমই বলে। কুড়ি। দেয় পনেরতে।

—আমি কুড়িই দিয়েছি।

—কিছু বেশি দিয়েছ।

—ওই আমাব সব সময়ে সব ক্ষেত্রেই বিশেষত্ব।

চকিতে আমার দিকে তাকিযে সে বললে, আমাব প্লেটের দামের কাগজটা কিন্তু জাল নয় বাপুজী। হাসল সে।

—ও আমি যাচাই করব না। ওটার দাম যা দিলাম তার থেকে অনেক বেশি। ওর সঙ্গে তোমার কাহিনিয়া রইল। ওই ওয়ালপ্লেটটারও তাই। ওর ভারী মজার ইতিহাস আছে।

সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে।

আমি বললাম, বস না। চায়ের সময় হলো। চা খেয়ে যাও। রাম! চা তৈরি কর। বললাম, যার কাছে কিনেছি—

ছয়

তার নাম উধম সিং। ট্যাক্সি ড্রাইভার। ট্যাক্সি নাম্বার—। উধম সিং ট্যাক্সি ড্রাইভার হলেও আমার দোস্ত। সংসারে এক একজনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে নিবিড় যোগাযোগ ঘটে যায়। তার কার্য-কারণ খুব খতালে অবশ্যই বুঝতে পারা যায় কিন্তু খতাতে ইচ্ছে করে না। সে খতানো পুতুল ভেঙে উপকরণ দেখার মতো ব্যাপার।

আমি গাছের বাঁকাচোরা ডাল কেটে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে পুতুল তৈরি করি। এমনি একটা বাঁকা ডাল যেটা দুটো বাঁকে বাঁকা এবং যার হাত পায়ের মতো চারটে ফ্যাংড়া আছে তা থেকে একটা ফকির তৈরি করেছি। মাথায় মুখে তুলোর চুল দাড়ি পরিয়ে, কাগজ সেঁটে তাতে চোখ মুখ এঁকে, লুঙ্গি পরিয়ে, মালা পরিয়ে হাতের মতো ফ্যাংড়া ডালের ডগায় একটা বাটির মতো এঁটে দিয়েছি, চমৎকার লাগে। যে আসে সেই দেখে খুশি হয়। সেদিন এক বন্ধু এসে ওটা নেবার মতলব করতেই টেনে সাজপোশাক খুলে দিলাম, ডালটা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বন্ধু চলে গেলে ওটাকে আবার সাজালাম। এবার খরচ করলাম, খাটলাম বেশি। বেশি মনোহারি করে তুললাম। না-করে পারলাম না। উধম সিংয়ের সঙ্গে দোস্তি এমনি ব্যাপার। তুলনা যদি খুঁটিয়ে মানে ধরে করা যায় তবে হয়তো মিলবে না কিন্তু ধরনটা এমনি। আলাপ বা দোস্তিটিকে মনে হয়েছিল অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রিত বা বিধি-অভিপ্রেত।

রৌশন বললে, বড ভাল কথা বল তুমি বাপুজী।

বললাম, ধন্যবাদ। খুশি হলাম শুনে। এখন শোন।

দিল্লীতে নতুন আসছি। কালকা মেলে এসে সন্ধ্যাব সময় দিল্লীতে নেমেছিলাম। উনিশ শো পঞ্চান্ন সাল; স্টেশন থেকে— নম্বর ট্যাক্সিতে এসেছিলাম; নোট-বইয়ে নম্বরটা টোকা আছে। কারণ ঘটেছিল। ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় আমার নীলরঙের পাওয়ারওয়ালা চশমাটা ফেলে গিয়েছিলাম। হোটেলে নেমেও খেয়াল ছিল না। কালকা মেল আসে সন্ধ্যের পর। নীল রঙের চশমার প্রয়োজন হয়নি। আধ ঘণ্টা বাদে ট্যাক্সিওলা এসে সেটা দিয়ে গেল।

—বাবুজী এটা তোমার?

—হ্যাঁ।

—লিজিয়ে; নমস্তে।

কিছু বকশিস দিতে গিয়েছিলাম, নেয়নি। ওর সঙ্গে ট্যাক্সি পর্যন্ত এসেও নিতে

রাজী করাতে পারিনি। ট্যাক্সির নম্বরটা নোট করে নিয়েছিলাম আর জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপকা নাম সাব ?

—উধম সিং, বাবুজী।

বলে সে ফের নমস্কার করে চলে গিয়েছিল।

তারপর কয়েকবার দিল্লী এসেছি, তা দশ-বারো বার হবে। ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। মনেও ছিল না ওর কথা। গত বছর দিল্লী এলাম, এবার এখানে কয়েক মাস অন্তত পাকাপোক্তভাবে থাকতে হবে। কনস্টিট্যুশন হাউসে ঘর পেয়েছিলাম। এসেছিলাম রাত্রের প্লেনে। ওখানে যে ট্যাক্সি নিয়েছিলাম সেটা বড ট্যাক্সি। তারপর কাজে গেলাম। কনস্টিট্যুশন হাউসের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম।

পরের দিন শনিবার, কাজ ছিল না, ছুটির দিন। সকালবেলা যাব সোনেরিবাগ, চা খাব সেখানে। গত রাত্রে টেলিফোনে নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম, শুধু চায়ের নয়, বন্ধুর বাড়িতে দুর্লভ ক্যাকটাসের ফুল ফুটতে শুরু করেছিল রাত্রে। বন্ধু বলেছিলেন, রাত্রেই ফুটে যাবে। সক্কালেই আসবেন যেন। নিশ্চয আসবেন।

ট্যাক্সি নিলাম ; চেনে মনে হলো, কালকের সেই লোক, সেই গাড়ি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বন্ধুর ওখানে গিয়ে দেখলাম, ক্যাকটাস রাত্রে ফুটে ভোরবেলা ম্লান হযে গেছে। বন্ধুও ম্লান মুখে বললেন, বেয়াকুফ বইন গেলাম মশায। কাল রাত্তিরে আট-দশজনকে টেলিফোন করছি। তাঁরা আইয়া পডব।

ঘণ্টাখানেক গল্প করে বন্ধুর ক্লার্ককে বললাম, একটা ট্যাক্সির জন্য ফোন করে দিন।

ক্লার্ক টেলিফোন করে এসে বললে, স্ট্যান্ডে এখন ট্যাক্সি নেই, এলেই পাঠিয়ে দেবে।

বসে রইলাম। মিনিট দশেক পর বন্ধুর নিমন্ত্রিত কয়েকজন এসে হাজির হলেন ; ট্যাক্সির মিটার ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘণ্টা বাজাব শব্দ হয়, সেই শব্দ উঠতেই আমি বেরিয়ে গিয়ে বললাম, রোখো।

দেখলাম, সেই ড্রাইভার !

এবার সে হেসে বললে, নমস্তে বাবুজী।

হেসে আমিও বললাম, নমস্তে।

সে বললে, কনস্টিট্যুশন হাউস ?

—হ্যাঁ।

বিকেলে বেরিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে। গিয়েছিলাম বাজারে। জিনিস কিনে দোকান থেকে বেরিয়েই দেখলাম খালি ট্যাক্সি এবং সেই ট্যাক্সি। হাত তুললাম, দাঁড়াও।

গাড়িতে উঠতেই সে বললে, এ তো তাজ্জব বাবুজী। একদিনে এই তিনবার। এ তো বড় হয় না।

সে 'কভি' শব্দ ব্যবহার করেছিল। আমি হেসে বলেছিলাম, ধরে নাও নসীবের খেলা!

সে খুশি হয়ে বলেছিল, ইয়ে তো ঠিক হ্যায়। সাচ্ বাত।

এটা নেহাত কাকতালীয় বললে সে খুশি হত না। সে চলতে লাগল। খানিকটা দূর এসে আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

—কেন? কনস্টিট্যুশন হাউস।

—না। আমি যাব কালীমন্দিরে, বিড়লা মন্দিরের পাশে।

সে বললে, কেন বললে না আগে? কতটা ঘুর হলো বল তো।

বললাম, তা হোক। একটু ঘোরা তো হবে, চল।

গাড়ি আটকে রেখে কালীমন্দির থেকে ফেরার সময়, তখন সাড়ে সাতটা বাজছে, আমার ইচ্ছে হলো জনপথে ওই তিব্বতীদের ফুটপাতের দোকান ঘুরে যাব। টেবিলের উপর নটরাজের একটি মূর্তি রাখতে অনেকদিন থেকে ইচ্ছে। বললাম, আমাকে একবার জনপথ যেতে হবে, ওখানে চল।

নামলাম। ভাড়া দিতে গেলাম, সাড়ে চার টাকা উঠেছিল, সে বললে, না এক টাকা কম দাও তুমি।

—কেন?

—আমি ভুল করে কনস্টিট্যুশন হাউস গিয়ে ঘুরিয়েছি তোমাকে।

বললাম, সে আমার ভুল। তোমার নয়।

—নেহি; জরুর আমার ভুল। আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল কোথায় যাবে।

—সেও ঠিক, আবার আমিও বলিনি কোথায় যাব। এটা আমারও কসুর এটাও ঠিক। নাও তুমি।

নিলে সে। কিন্তু বললে, না বাবুজী, এ ঠিক নেহি।

আমি পূর্বদিকের ফুটপাথে নেমেছিলাম ভাড়া মিটিয়ে পশ্চিমদিকে এসে উঠলাম। দাঁড়ালাম তিব্বতীদের দোকানে। হেজাক বাতি জ্বেলে দোকান পেতেছে। কয়েকজন বিদেশিনী রয়েছে। এটা নাড়ছে ওটা নাড়ছে! আমি দাঁড়িয়ে দর দেখতে শুরু করলাম। বাগবাজারে খড়ঘাটে ইলিস কিনতে গিয়ে ওটা শিখেছি। পাঁচ জনে মাছের দর হাঁকলে একটা দর পাওয়া যায় যেটা দিলে ঠকেছি এমন আপসোস হবে না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, দরও করলাম কিন্তু কিনলাম না; হাতে তুলে আলোর কাছে ধরেও মনে হলো যেন ঠিক রূপটা বুঝতে পারছি না। রেখে উঠে বললাম, নাঃ। কাল দিনে আসব।

পিছন থেকে শুনলাম কেউ বললে, ঠিক বাবুজী! ওহি ঠিক হ্যায়। রাতের আলোর জলুসে মেকী জিনিস খাঁটি বলে চলে যায়। রাত্রে মানুষকে ঘুমুতে হয়। ওটা হলো জানোয়ারের খেলার কাল। ওদের চোখ রাত্রে জ্বলে। কাল দিনে কিনো।

ফিরে দেখলাম, সেই ড্রাইভারটিই পিছনে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলছে। বিস্মিত হলাম, তুমি?

সে বললে, হ্যাঁ। গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তুমি এখানে দাঁড়ালে। তাই দাঁড়ালাম। তুমি তো ফিরবে, তোমাকে নিয়েই যাব। তুমি লোক ভাল বাবুজী। নাও ওঠো গাড়িতে।

বললাম, আরও কিছু কিনব যে। দুটো অ্যাশট্রে। ফুটপাথে নেপালীরা কাঠের উপর পিতলের কাজ করা অ্যাশট্রে বিক্রি করে তাই কিনব।

—বেশ তো চল।

ঠিক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেই দর করে কিনে দিলে। একটি ছোট নটরাজের মূর্তিও তার কাছে ছিল। সেটাও কিনলাম। সে বললে, ওর দর তুমি কর, ওর কদর আমি জানি না।

লোকটিকে ভাল লাগল। গাড়িতে উঠে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা না বলে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে এক আপিসে বড়-ছোট চাকরি করবার জন্য যেন অন্যায় বা অশোভনভাবে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, সকলের হয় কি না জানি না তবে আমার হয়। আমার ভাবপ্রবণ বলে অপবাদ আছে। অনেকে ইংরিজীতে নিজেদের দিকে দায় কমিয়ে নিয়ে বলেন 'টাচি'। যাই হোক, কথা খুঁজছিলাম। প্রথম যে কথাটা খুঁজে সবাই পায় সেইটে আমিও পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি সাহেব?

—আমর নাম উধম সিং।

একমুহূর্তে নামটার ধ্বনি মনের তারে একটা পরিচিত ধ্বনির সুর তুললে। মেঝেতে কাঠ পড়লে কিছু হয় না কিন্তু ধাতুর কিছু পড়ে শব্দ উঠলে জানালার লোহার শিকে একটা সুর বয়ে যায়। কানেও ধরা পড়ে, হাত দিলে তো বেশ বুঝা যায়। ঠিক তেমনিভাবে।

—উধম সিং?

—জী হাঁ।

চুপ করে রইলাম, ওই সুরটা মনে বাজছিল। হঠাৎ মনে পড়ল। প্রথম মনে পড়ল নীল চশমাটা। তারপর সব।

এবার বলে উঠলাম, তাজ্জব কি বাত সাহেব।

—কিঁউ?

—আজ বিকেলে ওষুধের দোকানের সামনে তোমার গাড়িতে যখন তিসরিবার চড়লাম তখন তুমি বললে, তাজ্জব কি বাত। তা তার চেয়েও তাজ্জবের কথা উধম সিংজী—আমি যেবার প্রথম দিল্লী আসি, দিল্লী স্টেশন থেকে হোটেল পর্যন্ত তোমার গাড়িতে এসেছিলাম। তোমার গাড়িতে আমি একটা চমশা ফেলেছিলাম। তুমি আধঘণ্টা বাদ ঘুরে এসে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে। আমি তোমাকে কিছু দিতে চেয়েছিলাম, তুমি নাওনি। তোমার নামটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেছিলে উধম সিং। ট্যাক্সির নম্বরটাও লিখে নিয়েছিলাম, নোট বইয়ে। হ্যাঁ, এই নম্বরই তো! মনে পড়ছে তোমার? তোমার ট্যাক্সিতে চড়ে দিল্লী ঢুকেছি। আজ এইভাবে তিনবার দেখা হয়ে তোমার

গাড়ি চড়লাম, আলাপ হলো। যেন কেউ বন্দোবস্ত করে করিয়ে দিলে। তাজ্জব কি বাত নয়?

—জরুরী বাবুজী, জরুর; জরুর তাজ্জবের কথা।

বললাম, আমরা দোস্ত হয়ে গেলাম সিংজী।

—দোস্ত?

—হাঁ দোস্ত।

—আপকা মেহেরবানী!

—নেহি, উপ্পরওয়ালে কি মর্জি।

—বাস্ বাস্! ভগবান কা মর্জি।

ভগবানের মর্জিতে উধম সিং-এব সঙ্গে আলাপ। উধম সিং আমাব দোস্ত। এই লোকটিই এইসব জিনিস আমাকে এনে দিয়েছে। সে আমাকে দিল্লী দেখিয়েছে। কনস্টিট্যুশন হাউসে যতদিন ছিলাম ততদিন তার গাড়িতে বোজ বিকেলে ঘুরেছি। দিল্লীব ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে নিযম আছে যাত্রী এলে বা টেলিফোনে ডাক এলে যার পালা সেই যাবে, অন্য কেউ যেতে পায় না। উধম সিংকে বলা ছিল, সে বিকেলবেলা রাস্তা থেকে মিটাব ডাউন কবে এসে একেবাবে কম্পাউন্ডেব ভিতর ঢুকত এবং আমাব ঘবে এসে বলত, নমস্তে বাবুজী। আমি তৈবি হযে নিযে বেবিযে যেতাম।

বাম এসে চা এবং কিছু খাবাব নামিযে দিযে গেল। গল্পে ছেদ পড়ল। রৌশন চুপচাপ শুনে চলেছিল। কখনও চোখ বন্ধ কবে, কখনও জানালাব ভিতব দিযে বাইবেব বড় গাছটাব বা তাব উত্তব পাশেব খোলা ঠাঁইটুকু দিযে ওপাবের বাড়িগুলিব মাথাব উপবে আকাশেব দিকে তাকিয়েছিল। ওদিকে বাঁদিবে অল্প দূবে, সফদবজঙ, ডাইনে কযেক মাইল দূবে পালাম এবোড্রোম। এই সমযটুকুব মধ্যেই একখানা ডেট, একখানা ভাইকাউন্ট ঘুবপাক [illegible]ছে। [illegible] কি নেমেছে বলতে পাবব না। সিগাবেট সে তিনটে ধবিযেছে কিন্তু [illegible] সিগাবেট খাযান। ওব হাতে ধবা অবস্থাতেই প্রদীপেব শিখাব বাতিব মতো [illegible] ধোঁযাব শিখা তুলে পুড়েই গেছে। মধ্যে মধ্যে চেখে [illegible] বসে ফেলে দিযে জুতোয় চেপে দিযেছে, নযতো এবটা টিন [illegible]। অ্যাশট্রে সামনে থাকতেও তাতে ফেলতে তাব খেযাল হযনি। [illegible] পাযে চেপে সিগাবেট নেবানো ওর অভ্যাস। স্থান কাল [illegible] সচেতন থাকলে সতর্ক হযে অ্যাশট্রেতে ফেলতো সেটা গল্পেব মধ্যে [illegible] ফেলেছিল সে।

রৌশনকে বললাম [illegible] নাও, খাবাব নাও।

রৌশন [illegible] নেই [illegible] সে খাবে না।

[illegible]

[illegible] কি কবে

হেসে দু'তিনটে বেগুনি তুলে নিয়ে খেয়ে বললে, ভাল হয়েছে। কিন্তু তারপর বল। কি হলো তোমার উধম সিংয়ের?

—হবে আর কি? আছে, এখনও ট্যাক্সি চালায়। কিন্তু আমি চলে এলাম ওখান থেকে এখানে। সাউথ অ্যাভেনু। এখন ট্যাক্সি এখানকার স্ট্যান্ড থেকে আসে। ওর সঙ্গে বড় দেখা হয় না। তবে এদিকে যখন খালি ট্যাক্সি নিয়ে ঘোরে তখন জানালা খোলা, বারান্দার পর্দা তোলা দেখলে এসে দেখা করে যায়। চা খায়। গল্প করে।

—আসল কথাই তো বললে না। এইগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা।

—বলিনি বুঝি? ও। ও-ই এগুলি এনে দিয়েছে আমাকে।

—সে কোথা থেকে যোগাড় করলে?

—তুমি ঠিকানা চাও? তোমার ঠিকানা দাও, তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। এসব তার বাড়ির তৈরি। তার স্ত্রী দুটি ছোট ছেলে আছে বুড়ো মা আছে। তারা বাড়িতে তৈরি করে।

একটু হেসে বললাম, বললাম না, তুমি ফুলমার্ক পেয়েছ। এই কারণেই বললাম। কাশ্মীরে বাড়ি ছিল। জম্মু আর পাকিস্তানের বর্ডার ঘেঁষে। সেখানে পুরুষানুক্রমে এইসব করত। ও নিজে ড্রাইভারি করত একজন মুসলমান মার্চেন্টের। দেশভাগ, কাশ্মীরের গোলমালের সময় খেতে না পেয়ে চলে এসেছিল দিল্লী, নাইন্টিন ফিফ্‌টি কি ফিফ্‌টি ওয়ানের সময়, সাল তারিখ তো মনে নেই ওর। এখানে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভারি করছে।

চায়ের কাপটা সে ধরেই ছিল, খায়নি বিশেষ। ওই দু' এক চুমুক দিয়েছিল। এবার সেটা নামিয়ে দিয়ে বললে, এদের দারুণ অভাব। তবে জান বাপুজী, সে বোধটা এদের নেই।

—সেইটেই একটা আশীর্বাদ।

—তুমি তাই বল?

—তা বলি। অভাবকে ভাল বলি নে কিন্তু অভাবের কষ্টকে সহ্য করে জিন্দিগীর লড়াইকে ভাল বলি।

—উই ডিফার। তা এর—

—কি?

—বড় ছেলে-টেলে নেই? মানে যে সাহায্য করতে পারে? কি বড় মেয়ে? তাহলে এইগুলো করতে পারে বেশি। থেমে গিয়ে আবার বললে, এদের দুঃখ আমি জানি বাপুজী।

বাদ —নাঃ। বড় ছেলে মারা গেছে।

তুমি না করে চেয়ে রইল জানালা দিয়ে।

নম্বরটাও দি বলেই গেলাম, বড় মেয়ে একটি ছিল। সেও মরে গেছে।

তোমার ট্যাক্সিতে সে। সে ঘাড়নাড়ার অর্থ হয় না। তবু নাড়লে। আর কিই বা করতে

পারত? আমি বললাম, ঠিকানা দেবে? ওকে বলে দেব, এমনি ওয়ালপ্লেট তোমার কাছে দিয়ে আসবে!

—প্লিজ সেভ মি ফাদার। নো। প্লিজ। ওসব দুঃখীর দুঃখ মোচন-টোচন আমার কাজ নয়। আমি নিজেও দুঃখী। হয়তো ওদের থেকেও দুঃখী। আমার অভাবের দুঃখবোধ আছে। আজ আসবে, কয়েকটা টাকা দাও। কাল আসবে, কিছু ব্রাশ প্লেট কিনে দাও। পরশু বলবে, লোকে বলছে যা দাম দিচ্ছ তা কম দিচ্ছ। ওসব আমার সইবে না। পাঠিয়ো না তুমি।

বলে অনেকটা যেন হঠাৎ উঠে পড়ল।—চললাম বাপুজী। অনেক সময় চলে গেছে। তবে দিল খুশি হয়ে গেছে। একটা এনগেজমেন্ট গেছে, আপসোস নেই। সন্ধ্যের এনগেজমেন্ট ফেল করলে চলবে না।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে হেসে বললে, দুপুরটায় আজ ছেলেবেলার স্বপ্ন দেখলাম। ভারী মিষ্টি, ভেরি সুইট!

আবার একটু হেসে বললে, নমস্তে।

গগল্‌স্‌টা চোখে লাগিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

রৌশন স্টাইল ভুলবে না। বেলা পড়ে গেছে, সন্ধ্যার আমেজ লেগেছে দিনের আলোয়, এখনকার এই গোধূলিবেলার আলোয় চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু রৌশন গগল্‌স্‌ না-পরে পথে বের হবে না।

ঘণ্টা দুয়েক পর; রাত্রি তখন আটটা। টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যাঁ।

—আমি কি শঙ্করজীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—কথা বলছি।

—গুড ইভনিং স্যার। আমি একজন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর কথা বলছি।

মনটা অবশ্যই ছ্যাঁৎ করে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এই মন্দ মেয়েটিকে। এর পরই বোধ হয় টেলিফোনে তার গলা শুনতে পাব, ফাদার আই অ্যাম রৌশন, ইওর ব্যাড ডটার। প্লিজ হেল্প মি ফাদার।

নীরস কণ্ঠেই বললাম, বলুন কি প্রয়োজন আমাকে?

—আপনি কি কোন মেয়ে আর্ট ডীলারের কাছে কিছু জিনিস কিনেছেন?

সন্দেহ হলো, চোরাই মাল! যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করেই বললাম, কিনেছি। একখানা কাশ্মীরী মেটাল ওয়ালপ্লেট।

—বোটম্যান অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ।

—ইয়েস।

—জিজ্ঞাসা করতে পারি কত দাম দিয়েছেন?

—চল্লিশ টাকা অ্যান্ড সাম নয়া পয়সা।

—থ্যাঙ্ক ইউ সার। বলেই আবার বললে, আর একটা কথা।

—বলুন।

—ক'খানা কত টাকার নোট মনে আছে?

—হ্যাঁ। অল ইন ফাইভ-রূপী নোটস্।

—অনেক ধন্যবাদ স্যার। এই রাত্রে বিরক্ত করার জন্য মার্জনা করবেন।

—আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—নিশ্চয়।

—ঘটনাটা কি? অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে।

—নাথিং সিরিয়াস স্যার। আপনি বোধ হয় জানেন না এই মেয়েটির খুব সুনাম নেই। কয়েকবার আমাদের কাছ পর্যন্ত এসেছে। তবে আজ তার দোষ নেই। সেই একজনকে চড় মেরেছিল, তারপর সে তাকে মেরেছে। তারপর সে তাকে মেরেছে। তারপর চার্জ করেছে তার কাছে টাকা নিয়েছে বলে।

কথা ওখানেই শেষ হলো।

আমি রিসিভারটা নামিয়ে রেখে একটু হাসলাম এবং একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেললাম। রৌশন কথা বলেনি ফোনে কিন্তু কানের পাশে যেন শুনলাম সে বলছে, বাপুজী, আমি তোমার খারাপ বেটী, বদমাস বেটী!

রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। ওই কথাই মনে ঘুরল শুধু। বারবার মনে হতে লাগল এই বুঝি টেলিফোন বাজল! রৌশন ডাকবে।

—বাপুজী, আমাকে তুমি মাপ কর। আমি তোমার খারাপ বেটী।

আবার ভাবনা হলো, ওকে থানায় নিয়ে যায়নি তো? ইন্‌স্‌পেক্টর বললে কয়েকবারই ওকে আমাদের কাছ পর্যন্ত আসতে হয়েছে।

আজ? আজও হয়তো হাজতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ছাদের দিকে চেয়ে আছে।

সাত

পরের দিন সকালে সে এল। প্রত্যাশা করিনি। আদৌ করিনি। বুদ্ধির বিচারে এরপর রৌশনের গতিবিধির যে ছক তাতে তার আড়ালে চলার ছক। পরমুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙল। বুদ্ধি আমার সাধারণ বুদ্ধি। আমাকে যারা চেনে তারা যে বলে বুদ্ধি মোটা, সে তারা ভুল বলে না। রৌশনকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল, বুদ্ধির অঙ্কে গোলমাল হয়েছে সেখানে।

রৌশন আমার অনুমানের চেয়ে অনেক খারাপ মেয়ে এবং সে পাকা অভিনেত্রী। আমার ভুলটা সে বুঝতে পেরে সেই মতো অভিনয় করে গেছে। কাল অভিনয়ের মেকআপ যখন খসেই গেছে তখন সে সে-সব ভাল করে মুছেই এসে দাঁড়িয়েছে।

তার মাথার সযত্নবিন্যস্ত চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। মুখে কালো ছায়া পড়েছে, শুধু তাই নয় কপালে কালসিটে। গালে চড়ের দাগের চিহ্ন যেন এখনও মিলিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় পায়নি। শিউরে উঠলাম। বিতৃষ্ণা বিরক্তির মধ্যেও বেদনা অনুভব করলাম।

সকল কথা যখন আজকে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করছি তখন এটুকু বুঝতে পারছি যে তার প্রতি গভীর অন্তরে একটি মমতা ছিল। যে মমতা সম্ভবত মূর্খতার নামান্তর। অথবা তার সঙ্গে যেটুকু থাকা উচিত ছিল তার অভাব ছিল। মমতাকে বা হৃদয়াবেগকে যে শিক্ষা ও বুদ্ধির শৈত্যে জমিয়ে কঠিন করা যায় তা ছিল না। নইলে ওই সকালের আগের সন্ধ্যায় টেলিফোনে পুলিশের কাছে তার কথা শোনার পর ভাবব কেন? সেদিন সকালে তাকে দেখে তার জন্যে বেদনা অনুভব করেও বোধ করি প্রথমেই কঠিন হবার চেষ্টা করলাম।

বললাম, কোথা থেকে? ফ্রম পুলিশ লক-আপ?

সে তাকালে আমার দিকে। চাউনিতে সে কি ক্লান্তি! লাল হয়ে আছে চোখ দুটি। পাঞ্জাবের মেয়েদের চোখ বড় নয়। রৌশনের চোখ টানা চোখ। দু'পাশের সাদা ক্ষেতে লালচে আভা জেগে রয়েছে। একবার সন্দেহ হলো, সে কি এই সকালেই— ? ইচ্ছে করেই এগিয়ে গিয়ে সামনে কাছে দাঁড়ালাম যেন অসন্তুষ্ট হয়ে কৈফিয়ৎ নিতে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু না। কোন গন্ধ পেলাম না।

সে মাথা নাড়লে, যার অর্থ—না।

—এখানে কেন এসেছ? ধন্যবাদ দিতে?

এবার তার কণ্ঠস্বর নির্গত হলো, বললে, না।

—তবে?

একটু চুপ করে থেকে সে কোন উত্তর দেবার আগেই বলে দিলাম, যদি তোমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকে রৌশন তা হলে বলে রাখি, আমি দুঃখিত।

সে একটু হেসে বললে, না, তার জন্যেও আসিনি। কিন্তু তুমি কি আমাকে বসতেও বলবে না? না, চলে যেতে বলছ?

এমন শান্ত করুণ কণ্ঠ কখনও রৌশনের শুনিনি। তার কণ্ঠস্বর এবং তার ওই শেষের প্রশ্ন আমাকে একটু অপ্রতিভ করলে। বললাম, বস।

বসল সে। তারপর বললে, তুমি আমার উপর খুব গোস্বা হয়েছ। হবার কথাই বটে। কিন্তু আমি কি তোমাকে বার বার বলিনি, আমি ব্যাড গার্ল আমাকে মেয়ে বলেছ, আমার ধরমবাপ তুমি। আমি তোমার মন্দ মেয়ে।

এর যা জবাব তা আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু মন্দেরও একটা সীমা আছে রৌশন। তুমি এত উচ্ছৃঙ্খল এত মন্দ তা আমি জানতাম না।

সে মুখ তুলে আমার দিকে অসংকোচ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, তুমি বিশ্বাস কর বাপুজী, কাল আমি কোন মন্দ কাজ করিনি। কোন দোষ আমার ছিল না।

আমার অজ্ঞাতসারে আমার কপাল কুঁচকে উঠল। যখন উঠে গেছে তখন বুঝতে পারলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, এই বিশ্বাস করতে বল আমাকে? কিন্তু ওই বুঝতে পেরে সংযত করলাম নিজেকে।

সে বলেই চলেছিল, আমার সত্যিকারের বাপ-মায়ের দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমার ধরমবাপ, তোমার দোহাই দিয়ে বলছি, ঝুট বাত আমি বলছি না। যেদিন

হোটেলে আমাকে তুমি দেখেছিলে সেদিন আমি ড্রিংক করেছিলাম সেই বিদেশীর সঙ্গে। তাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছিলাম, সেদিন আমার দোষ ছিল। কিন্তু সেদিন তুমি নিজে থেকে এগিয়ে তাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলে, আমার ধরমবেটী এ মেয়ে। সেই কারণেই কাল যখন পুলিশ এসে নির্দোষ আমাকে ধরলে, আমার ব্যাগের টাকা নিয়ে প্রশ্ন করলে, তখন সত্যি কথা বলেছিলাম। তোমার নাম করেছিলাম। না-হলে তাও করতাম না। তাতে আমার যা হত হত।

—কি হয়েছিল কাল ?

—হয়েছিল। তার আগে বল তোমার মন শান্ত হয়েছে। না-হলে আমার চলে যাওয়াই উচিত হবে। কালকের নির্যাতনের চিহ্ন আমার মুখে চুলে ফুটে রয়েছে। আসবার সময় দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায় হঠাৎ নিজের চেহারা আমার চোখে পড়েছিল। কাল আমার কোন দোষ ছিল না, আমি ড্রিংক করিনি। পুলিশ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ বলেই ছেড়ে দিয়েছে আমাকে, না হলে কখনও ছাড়ত না। তাদের খাতায় আমার বদনামের কালো দাগ মারা আছে। তারপর নিজের আস্তানায় গিয়ে সারাটা রাত জেগে শুধু কেঁদেছি। ঘুম আসেনি। চোখে-মুখে তাও ফুটে আছে। সকালেও মন শান্ত করতে পারিনি। তাই এসেছি। মনে হয়েছিল—

বাধা দিলাম। বললাম, দাঁড়াও। সে থামলে বললাম, চা খেয়েছ ?

—না।

—কাল রাত্রেও কিছু খাওনি বোধ হয় ?

—খেতে বসেই তো বিপদটা ঘটেছিল। হোটেলে খাই তো। বাড়িতে তো ওসব ঝামেলা রাখলে চলে না। সবে একখানা রোটি ছিঁড়ে মুখে তুলেছি—। একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটল তার মুখে। এ বিষণ্ণ হাসি সেই হাসি যা কেবল নির্দোষ দণ্ডিত বা নিরপরাধ নির্যাতিতের মুখেই ফোটে। অতি নিষ্ঠুর ছাড়া সব মানুষকে সে-হাসির সম্মুখে বিষণ্ণ হতে হয়।

শুধু ওই বিষণ্ণতাই নয় তার সঙ্গে মমতা যা আমার দুর্বলতা এবং এমন ক্ষেত্রে জ্বরের অনুসঙ্গী উপসর্গের মতো লজ্জাও আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রামকে বললাম, রাম, কিছু খাবার দে। কি আছে? আর দুধ থেকে যদি ছানা না-করে থাকিস তবে দুধটা দে কাচের গ্লাসে করে। আগে ওটাই দে।

রাম দুধটা গরমই করছিল ছানা কাটাবার জন্য। সে দুধের প্যানটা নামাতেই বললাম, দে, আমাকে দে।

নিজেই হাতে করে নিয়ে এলাম। টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললাম, আগে এটা খাও। তারপর কথা শুনব।

দুধের গ্লাস দেখে সে আবার হাসলে। বললে—দুধ! সত্যিই তোমার কাছে আমাকে ছোট্ট মেয়ে বানিযে দিলে।

সস্নেহে বললাম, পি লেও বেটী!

দুধের গ্লাসে একটি চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে বললে, বেশি গরম আছে।

—জুড়ুক।

জানালার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, জান বাপুজী, বাপ-মা সবারই থাকে, আমারও ছিল। তা—। থেমে গেল রৌশন।

—তুমি তো বলছ তোমার বাপের কথা। মায়ের কথা অবশ্য বলনি।

মাথা নাড়ল সে। অর্থাৎ—না।

বললাম, তোমার মনে নেই, বলেছ তুমি। আমার আত্মভোলা বাপের আদরের মেয়ে, ছেলেবেলায় মাতৃহারা—

—নেহি বাপুজী। ঘাড় নাড়লে সে শান্ত দৃঢ়ভাবে। আমি সে ঝুটা বাত বলেছি তোমাকে। বাপ আমার আমীর ছিল না। ছিল ওই উধম সিং-এর মতো গরীব জাঠ। ওই একই গাঁওয়ে আমাদের বাড়ি ছিল। পাশাপাশি, হ্যাঁ একদম পাশাপাশি বাড়ি ছিল। ওর মেয়ে ছিল। সেও আমার সাথী ছিল। তুমি বললে সে মরে গেছে। কাল সব কথা মনে পড়ে গেল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল বাপুজী। খুব খারাপ। উধম সিং এখানে থাকে, ট্যাক্সি চালায় আমি জানি। ওরাও যেমন দেশ ছেড়ে এসেছিল আমরাও এসেছিলাম তেমনি। ওর মেয়ের নাম ছিল হরিপীতম, ভাল মেয়ে ছিল। মেয়ে সে বাঁচলো না। আমি জানতাম, বাঁচবে না। সংসারে শাস্ত্রে একটা ধর্মযুদ্ধ বলে কথা আছে। বাপুজী বল তো, ধর্মযুদ্ধ করে কেউ জেতে? জেতে না! সে মরে গেল। হরিপীতম! হরিপীতম।

দুধের গ্লাসটিতে একবার চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে খেয়ে শেষ করলে। তারপর জল খেলে। আবার বললে, হরিপীতম। আবার স্তব্ধ হলো। আমার ওকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হলো না। থাক।

একটু পরে আবার বললে, আমারও একটা নাম ছিল। থাক সে বলব না। বাপ-মার নামও বলব না। তারা বোধ হয় বেঁচে নেই। নাম বললে, তুমি কোনদিন উধম সিংকে বললে সে আমাকে চিনতে পারবে। হয়তো খুঁজবে। উধম সিংয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, মানে দেখেছে সে আমাকে পথেঘাটে। নিশ্চয় দেখেছে। চোখাচোখিও হয়েছে। অবশ্য আমার গগল্‌সের ভিতর দিয়ে। চিনতে সে আমাকে পারে না।

হাসলে। হেসে বলতে লাগল, কি করে চিনতে পারবে? এক গরীব জাঠের বেটী, দেহাতী, সেই দশ বছর বয়সে লম্বা বেণী ঝুলিয়ে, ছেঁড়া সালোয়ার পাঞ্জাবি, ময়লা দোপাট্টার নামে ন্যাকড়ার ফালি পরে যাকে দেখেছে তার এই মেমসাহেবী ঢঙে ছাঁটা চুল, দোকানে ড্রেস করা, এই শাড়ি এই ব্লাউজ, চোখে গগল্‌স্‌, ইংরেজী কথা, জোয়ানী চেহারার বদলি, চিনবে কি করে বল? দেখ, দামী সালোয়ার পাঞ্জাবি, হীরা-জহরৎ, বেণী হলেও সন্দেহ হত, ভাবত কেউ আমীর-টামীরের নজর পড়ে এই বদলটা হয়েছে। দেশ ছাড়ার সময় আমার উমর ছিল দশ-এগারো। সাত-আট বছর পর সরকারী আর্টস ক্র্যাফ্‌টস থেকে কাজ শিখে এই পথে পা দিই যখন তখন এই ভাবের বদল আর জোয়ানীর বদল দেখে চিনতেই পারেনি। আমিও চেনা দিইনি।

খারাপ আমি অনেকদিন আগেই হয়েছি। অনেক আগে। ওই দশ-এগারো বছর বয়সে। অথচ বাপ-মা এমন ধার্মিক ছিলেন বাপুজী! সেই কথা মনে হয়ে গেল; তোমার দেওয়ালে ওয়ালপ্লেট দেখে থেকে—।

চুপ করে গেল সে। গলা ধরে এসেছিল। একটু সামলে নিয়ে বললে, ওখানাতে আছে গৌরী মাঈ আর মহাদেওজী। আজকাল তো এসব বিলকুল মিথ্যে হয়ে গেছে। ওসবের দাম আর নেই। সত্যিসত্যিই মানেও নেই। কি মানে আছে? গাঁজা মদ খায় ঘরদোর নেই এমন যে লোক, তার নিন্দে শুনে কোন মেয়ের ঘরে যাওয়ার কি মানে আছে? ও ঘরের ওয়ালপ্লেটে রয়েছে রাম-সীতা। বল তো, সীতাব আগুনে পুড়তে যাওয়া কে মানবে, কেন মানবে আজ? রাম বনে গেল বাবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে? তার কি মানে? কেন যাবে? একালে ছেলে বিদ্রোহ করবে। সীতার আগুনে পুড়ে রক্ষা পেয়েই শেষ নয়, শেষ বনে নির্বাসন। এ সতীত্বের কোন অর্থই নেই আজ। আমার কাছে তো নেইই। সেটা আমি ব্যাড গার্ল বলেই নয়—আমি সত্যিই ওগুলিকে মূর্খতা বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু তবু আমি কেমন হয়ে গেলাম। ফিরে গেলাম সেকালে। তারপর তুমি উধম সিংহের নাম করলে, আমি চিনলাম। আমিই জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঘুরিয়ে ওর মেয়ে হরিপীতমের কথা। বললে সে মরে গেছে। মনটা কেমন হয়ে গেল। মনে আছে বলেছিলাম, পাথরের মতো শক্ত দিল, ফাটলে তার ভিতর থেকে জল বের হওয়া সহজে থামে না। বড় বড় দরিয়া ধরে গেলে শুনেছি পাওয়া যায় ওই একটি বা দুটি পাথরের ফাটল। গোমুখী থেকে গঙ্গাজী বেরিয়েছে। সেখানে শুনেছি দুটি গর্ত আছে। আমার দিলে কাল ফাটল ধরেছিল। জল ঝরছিল। চোখ দিয়ে বের হতে চাচ্ছিল। তোমার এখানে কাঁদতে পারিনি। চলে গিয়ে কনট সার্কাসের একটা পার্কে গাছতলায় বসে কেঁদেছিলাম। তারপর গেলাম খেতে একটা হোটেলে। অন্য দিন বন্ধু পাকড়াবার চেষ্টা করি, খানিকটা হাসিতে কথায় তাকে খুশি করি, চাউনি দিয়ে ভোলাই; তার পয়সায় খাই। তারপর হয়তো খানিকটা গাড়িতে বেড়িয়ে কি একটু হেঁটে হঠাৎ স্লিপ করি। বা যেখানে অনেক লোকজন সেখানে গুডনাইট বলে হাত বাড়িয়ে পুট দি ফুলস্টপ। কাল একলা ছোট কেবিনে একটা টেবিলে একটা কোণে খেতে বসেছিলাম। মধ্যে মধ্যে অবাধ্য জল চোখ থেকে বেরিয়ে আসছিল; আমি সেটা লুকোবার জন্য টেবিলে কনুই রেখে দুই হাতে মাথা রেখে মুখ নীচের দিকে করে বসেছিলাম। টপ টপ করে জল পড়ছিল টেবিল ক্লথের উপর কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। মনে মনে নিজের উপর রাগ হচ্ছিল। কেন? কেন চোখের জল পড়বে? পিছন মুছে দিয়ে এসেছি। নিজের হাতে। এসব বিশ্বাস করি নে। তবে? কেন?

হঠাৎ থেমে গেল রৌশন। চুপ করে চেয়ে রইল মেঝের দিকে। কপালে ভ্রূর রেখায় একটি কুঞ্চনরেখা ফুটেছে। ভাবছে। ভাবছে কিছু।

রাম এসে ডাকলে, চা-খাবার দিইছি।

রৌশন খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল। একটু চমকে উঠে বললে, এ্যা?

—ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। এস।

—ব্রেকফাস্ট ? দুধ তো খেলাম। আচ্ছা চল।

রাম পর্যাপ্ত খাবার দিয়েছিল। রুটি মাখন ডিম বিস্কুট ফল মিষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে সাজিয়ে দিয়েছিল। রাম এসব বিষয়ে সত্যিই হুঁশিয়ার এবং পারঙ্গম দুইই। তার উপর অভিজাত সমাজের সাহেবী সমারোহের উপর প্রবল আসক্তি আছে। ছিল খুব বড বাড়িতে। সুতরাং রৌশনের মতো মেমসাহেব কেতার মেয়েকে দেখে সে তার সকল পারঙ্গমতা দেখিয়ে দিয়েছে।

রামই বললে, কফি করব ?

বিস্মিত হলাম, কফি ? ছিল না তো !

—আনিয়েছি। কাল টেলিফোনে স্টোরে বলেছিলাম, রাতে দিয়ে গেছে।

—তবে নিশ্চয় করবি। কাল রৌশন কফি চেয়ে পায়নি।

রৌশন হাসলে। খাবার উদ্যোগে হাত বাড়িয়ে ছুরি কাঁটা তুলে নিতে নিতে বললে, বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম আমি। আমি তোমাকে বলেছি, ছেলেবেলা থেকেই খারাপ আমি। কিন্তু একটা কথা বলিনি। আমি খারাপ। দিল্লীতে এসে আমি বাপুজী এই দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না। এই ছেঁড়া লুগা পরা, ফুটপাথে শোওয়া, ভিক্ষে করে খাওয়া এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। থাকতাম কাশ্মীরী গেট যেখানে ওই এলাকায়। কিছুদিন যেতেই রাস্তাঘাট চেনা হলো। জি বি রোডও চিনলাম। নীচের তলায় বড় বড গোলদারী দোকান গদি গুদাম। উপরতলায় থাকে বাঈজী লোক। তাদের সাজ-পোশাক, বাইরের আলো, জুলুস দেখে ভারী লোভ হলো। দিনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে উপরতলার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। অছিলা—ভিখমাঙা। রাত্রেও চলে যেতাম সুবিধে পেলেই। তখন গভর্নমেন্ট আইন করে এসব তুলে দেয়নি। তখন সন্ধ্যেবেলা জি বি রোড—আলোয়, সারেঙ্গী তবলার সঙ্গতে, বাঈজীর গানে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা, তাদের রূপে রঙে পোশাকের বাহারে মনে হত—হুমেনস্ত হুমেনস্ত। আমার তো মনে হত। একদিন একজন লোককে বললাম, দিনের পর দিন দেখে ওকে চিনেছিলাম। ও ওই ওপরতলায় যায় আসে। ওদের সঙ্গে লোকটির আলাপ আছে তাও বুঝেছিলাম।

আবার থামল রৌশন, থেমে সংকোচ কাটিয়ে হেসে বললে, আই অ্যাম এ ব্যাড গার্ল। আর বাপুজী, এসব ব্যাপার আমি বুঝতাম, তখনই বুঝতাম। পাড়াগাঁয়েও এসব গল্প আছে। ছেলেবেলা থেকেই শোনা যায়। বাঈজী হলে—। বাপুজী, ওর মানে আমি জানতাম। পুরো বুঝতাম। কিন্তু আমার ভয় হয়নি। ওই লোকটিকে বললাম, আমাকে তুমি বাঈজী করে দিতে পার ? সে লোকটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি বললাম আমি গাইতে পারি। গাঁয়ের নাচও জানি। সে আমার থুতনি ধরে মুখটা তুলে আলোয় ভাল করে দেখে বললে, আয় আমার সঙ্গে। গেলাম চলে। মা-বাপ-ভাই সব পড়ে রইল ফুটপাথে, খোলায়। থাকল—থাকল। আমি সে ভাবিনি।

আবার থামল সে।

ভেবে নিয়ে বললে, সব কথা বলে লাভ নেই বাপুজী। আমি আমার স্বভাবটাকে বোঝাবার জন্যে বললাম। ওই আমার স্বভাব সেই আমার যে কাল হয়ে গেল বলতে পারব না। ছেলেবেলা হরিপীতমের মা গল্প বলত, ভারী সৎ ভারী ভাল হরিপীতমের মা, গল্প বলত রামসীতার, হরপার্বতীর, আর আমাদের বলত, এমনি যারা হয় তারা দেওতা হয়ে যায়, স্বরগলোকে উ লোকের মসনদ মেলে—ভারী ভারী মহল মেলে, দাসী বাঁদী মেলে—ওরা যেখানে পা দেয় সেখানে পদ্ম ফুটে যায়। বিশ্বাস করি না, তবু সেই সব মনে পড়ে দিল উদাস হয়ে গিয়েছিল। অকারণ। অর্থহীন। বাপুজী, তোমার কাছে ঝুটা বাত বলব না। সত্যিই আমার কাছে অর্থহীন ওই সব গল্প এবং অর্থহীন এই সব কাহিনীর কথা মনে পড়ে দিল উদাস হওয়া। আমি হরদম ঝুটা বাত বলি, সে তুমি শুনেছ, জানও বোধ হয়। কাল যে ওয়ালপ্লেট তোমাকে কাশ্মীরের বলে দিয়ে গেছি, ওটা কাশ্মীরের খুব সস্তা জিনিস। আমি নিজে ওর ওপর কিছু কাজ করে ঢঙটা অবশ্য পাল্টে দিয়েছি। দামের কাগজটাও আমার লাগানো।

এবার আমি বাধা দিলাম, তুমি জান এ কাজ?

—জানি না? আমি তো ওই উধম সিংদের ঘরের বেটী। পাঁচ বরিষ থেকে ছোট হাতৌড়ি নিয়ে ছাঁচের উপর তামা-পিতলের পাত রেখে ঠুকঠুক করে ঠোকা শিখেছি। তাছাড়া আমার হাত ছেলেবেলা থেকেই ভাল। জন্ম থেকে আমার বুদ্ধি যেমন মন্দ, তেমনি আর্টিস্টও আমি বোধ হয় জন্মাবধি। তারপর জি বি রোডে গিয়ে দু'বছর ছিলাম। এক ব্যবসাদারনী আমাদের পালছিল। আমার সঙ্গে আর তিনজন লেড়কী ছিল; হঠাৎ পুলিশ হানা দিয়ে আমাদের উদ্ধার করলে। তাদের দু'জন ফিরে গেল তাদের বাড়ি। আমি বললাম, আমার বাপ-মা মরে গেছে। সেই ফুটপাথে যেতে আমার দিল চায়নি। তখন এই আমীর বাপের গল্প বানিয়ে বলেছিলাম। তখন তো বাচ্চা লেড়কী। বারো-তেরো বছর বয়স। সুরত তখন খুলছে সবে। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করেছিল এবং পাঠিয়ে দিয়েছিল অনাথ আশ্রমে। সেখানে এই আমার হাতের কাজ, ছবি আঁকার এলেম, এই কামের এলেম দেখে আর্ট ক্র্যাফ্‌টস শিখতে পাঠিয়েছিল। চার বছর সেখানে থেকে আর্ট ক্র্যাফ্‌টসের সঙ্গে কিছু ইংরিজী আর জীবনের স্টাইল শিখে বেরিয়ে এসেছিলাম। থাক, বাপুজী পিছনের সে সব কথা খারাব লেড়কীর সবই খারাব কথা। কালকের কথা তোমাকে বলতে এসেছি। সেইটে বিশ্বাস করাবার জন্য এত কথা বললাম, বলে ফেললাম, কালকের সেই উদাস হয়ে যাওয়া দিলের আমেজ বল আমেজ আমেজের জের বল জের এখনও রয়েছে। এতটা বলবার দরকার ছিল না। এতটা কেন, কিছুটাই বলারও জরুরৎ ছিল না। সোজা বললেই হত, তুমি বিশ্বাস করতে করতে, না-করতে নাই করতে। হয়তো পেট ভরে খেলে কাল আর সমস্ত রাত্রি কাঁদতামই না, ঘুমিয়ে পড়তাম ভরাপেটের খুশিতে।

খাওয়া শেষ করে সে ন্যাপকিনে মুখ মুছছিল, রাম কফি ঢালছিল। সে তাকে বাধা দিয়ে বললে, তুম ছোড়ো জী, আমি বানিয়ে নিচ্ছি। বাপুজী, রৌশন খারাব

মেয়ে, তার লজ্জা হায়াও নেই। তবে সে কফি খুব ভাল বানাতে পারে। তুমি ভুলতে পারবে না। ক্ষুধা তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রৌশন পালটেছে। তার উদাস দৃষ্টি নেই, সে ক্লান্তি বিষণ্ণতাটুকু নেই, সে সেই ছলনাময়ী হয়ে উঠেছে।

রৌশন কফি তৈরি করতে করতে বললে, আমি কোণের টেবিলে বসে কাঁদছিলাম। মন খারাপ। ভাবছিলাম, বাপ-মায়ের খবর করি—এঃ, আই অ্যাম সরি—

কফি খানিকটা পড়ে গেল টেবিলে।

বললাম, থাক ব্যস্ত হয়ো না।

—মনটা এখনও ঠিক হয়নি বাপুজী। হ্যাঁ, উধম সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করি—তারা কোথায়?

—তা হলে তুমি মিথ্যে বলেছ, মা-বাপ মরে গেছে?

—না জেনে বলেছি। তবে অনুমান—তারা মরে গেছে। জি বি রোডে—তার লাগোয়া বাঈ পাড়ায় বাপ কিছুদিন রোজ খোঁজ করে ফিরত। শুনেও ছিলাম, দু'চার রোজ বাড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখতামও। তারপর আর না। একদম না। বেঁচে থাকলে বাপ আমায় খুঁজতে ছাড়ত না। ওইখানেই খুঁজত। আমার মতিগতি তারা ভাল করে জানত। অবশ্য নাও হতে পারে। ঘেন্নায় ও অঞ্চল থেকে চলে গিয়ে থাকতে পারে। হয়তো উধম সিংয়ের মতো ট্যাক্সিও চালাতে পারে, তবে কোনদিন নজরে পড়েনি। আমি গগল্‌স্‌ পরে, মডার্ন মেয়ে, দিল্লী চষে বেড়াই, টুরিস্টদের নিয়ে ফিরি, চোখে পড়ত।

একটু থেমে বললে, কাল ওই মেজাজের মধ্যে মনে হলো তারা অন্য কোন কাজও তো করতে পারে। অন্য কোথাও গিয়েও তো থাকতে পারে। পাঞ্জাব রেফ্যুজি তো তামাম হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবছিলাম আর কাঁদছিলাম। চোখের আঁসু প্লাস্টিকের টেবিল ক্লথের উপর জমছিল, শুষে যাচ্ছিল না। হঠাৎ এক ছোকরা, বদমাস ছোকরা, চিনি আমি এবং ওকে এড়িয়ে চলি, হোটেলে ঢুকে আমার খোঁজ পেয়ে কেবিনের পর্দা ঠেলে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল; মদের গন্ধ পেয়েও আমি মুখ তুলিনি। সে মাথায় টোকা দিয়ে ডাকলে, আজ তো পিয়ারীকে মিলে গিয়েছে। আজ তো পাকড় লিয়া।

এবার আমি চমকে উঠলাম। গলা শুনে চিনে চমকালাম। তেমনি ভাবেই মুখ নীচু করেই রইলাম। বললাম, আমাকে মেহেরবানী করে দিক করো না। আমার তবিয়ৎ ঠিক নেই, মেজাজ ঠিক নেই, যাও তুমি।

এই সময় বয় আমার অর্ডারের খাবার দিয়ে গেল। সে ছোকরা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার পাশে বসে বললে, আমার খানাও এই টেবিলে লাগাও।

আমি বললাম, না।

সে গুণ্ডা প্রকৃতির ছোকরা, সকলে ভয় করে, পয়সাও কামায়। সে জবরদস্তি বললে, আলবৎ, এই টেবিলে বসব আমি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম—না।

সে খপ্ করে হাত টেনে ধরে বললে, বস পিয়ারী। আজ তোমাকে ছাড়ছি না। লোকে বলে তুমি চতুরালিতে ব্রিজবালার চেয়েও সরেস। হেসে, গায়ে ঢলে পড়ে, রঙ্গিলা কথা বলে খেয়ে দেয়ে, কভি কভি দু'চারটে চিজ ভি প্রেজেন্ট নিয়ে বিলকুল পিছলে চলে যাও। আমাকে তো দেখে বিশ মিল দূর ভাগো। আজ পাকড়লিয়া। বইঠ যাও। খাও। উসকে বাদ চলো ট্যাক্সিতে। আমার কাছে বোতল আছে। চলো কুতুবকে তরফ, নেহি তো চলো যাঁহা দিল চায়—

আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। ভিজে মেজাজ যেন আগুনলাগা বারুদখানা হয়ে গেল। আমি কি করছি বোধ হয় তাও আমার খেয়াল ছিল না। আমি জবরদস্তি হাতখানা ছিনিযে নিলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, ছোড়ো!

সে হেসে বলল, আরও জোর দেখায় যে! বলে আমাকে টানলে তার দিকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে চড বসিয়ে দিলাম। জোর চড দিয়েছিলাম। ব্যাস, চড খেয়ে আধ মিনিট আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর চালাতে লাগল চড়-ঘুষি। পডে গেলাম তো লাথি মারলে পিঠে। ছোট কেবিনের মধ্যে হচ্ছিল এসব। আমি চিৎকার করছিলাম। হোটেলের লোক এসে টেনে ছাড়ালো। দু'জনকেই নিযে গেল ম্যানেজারের কাছে। সে বললে, ওই আমাকে ডেকেছিল। এবং আমাকে পাশে বসিয়ে হাসিখুশিতে ভুলিয়ে পিকপকেট করেছে। দশ রূপেয়ার নোটে একশো রূপেয়া ছিল। সারজেন্ট এল। তার বদনাম, আমারও বদনাম আছে। আমার ব্যাগে তোমার দেওয়া টাকাটা ছিল। পাঁচ টাকার নোট চল্লিশ টাকা। আমার নিজের ছিল পনের টাকা আর কিছু খুচরা। তাও এক রূপেযা দো রূপেয়ার নোট। আমি খারাব মেয়ে, কিন্তু কাল আমার কোন দোষ ছিল না। মন্দ হয়েছি বলেই কাঁদছিলাম। আর তুমি ওয়ালপ্লেট কিনেছ। ও ব্যবসা আমি করি। তাছাড়া, বাপুজী, তুমি আমাকে সত্যি বাপের মতোই স্নেহ কর। যদি বিপদ হয় তবে তুমি আমাকে রক্ষা করবে বলে তোমার নাম আমি করেছিলাম। পুলিশ ছেড়ে দিলে আমাকে। আমি বললাম, আমি এ নিয়ে কেসও করতে চাই না। খুব মিনতি করলাম। হাত জোড করলাম। ওকে ছেডে দাও। নইলে ও আমার হয়তো জানই নিয়ে নেবে। জানি না কি করেছে। বাডি গেলাম। পুলিশই মেহেরবানী করে পৌঁছে দিলে। ঘরে ঢুকে বুকের ভেতরটা আরও কেমন হয়ে গেল, উপুড় হয়ে সারারাত কাঁদলাম। মনে মনে কাল এও হলো, কেন এ পথ ধরলাম। দুঃখের মধ্যে মা-বাবার তো সুখ দেখেছি। হরিপীতম বিয়ের গল্প শুনত, মুখ উজ্জ্বল হত। হরিপীতমের বিয়েও দিয়েছিল উধম সিং, গাঁয়েরই এক জাঠের ছেলের সঙ্গে, তার নামও পীতম সিং। চৌদ্দা বছরের বর, ন'বছরের বউ। তাদের সে মিষ্টি হাসি, চোখে চোখে ইশারা দেখেছি, ঠাট্টা করেছি। আমার ওই জীবন হলে কি হত?

থামল সে—অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হেসে বললে, এ একটা একরাত্রের বোখারের মতো হয়ে গেল। একদম পাঁচ-ছও ডিগ্রী বোখার আর তার ঘোরে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখলাম, চেঁচালাম। সকালবেলা সেই ঘোরে তোমার কাছে এলাম।

হেসে উঠল, বললে, বোখার ছেড়ে গেছে বাপুজী। তুমি আমাকে মাফ করো। সত্যি মাফ করো। আমি আর কখনও তোমার কাছে আসব না। তোমার মতো লোকের ধরমবেটী আমার মতো মন্দ মেয়ে! না—না—না। এ হয় না।

আমিও কিছু বলতে পারলাম না। আমি তো বলেছি, আমার বদনাম আছে, আমি বুদ্ধিতে স্থূল, হৃদয়াবেগে চালিত হই। আবেগ আমার মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল। হতভাগ্য মেয়ে পাঁকে ডুবছে, অভ্যাসবশে পাঁককে চন্দন ভাবছে আনন্দ পাচ্ছে; মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ হলে হাত বাড়াচ্ছে, কেউ নেই সংসারে মমতা করবার মতো। তাকে হাত বাড়িয়ে একটু সাহায্য না-করে কি পারা যায়? তবু ভয় হচ্ছে। পালটা গল্প মনে পড়ছে;—কর্কট নাগ কার অভিশাপে দীর্ঘকাল আগুনের বেড়ার মধ্যে বন্দী ছিল। ত্রাণ কর বলে চিৎকার করছিল। কেউ উচিত মনে করেনি। তারা বুদ্ধিমান। দীর্ঘকাল পর বনে নির্বাসিত বুদ্ধিভ্রষ্ট নল রাজা হৃদয়াবেগে পরিচালিত হয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঢুকে মৃতপ্রায় নাগকে বের করে এনে বাঁচিয়েছিলেন, কর্কট নাগ পরিত্রাণ পেয়ে প্রথম কাজ করেছিল পরিত্রাতা নলকে দংশন করে! সোনার বর্ণ নল কালো হয়ে গিয়েছিলেন সেই বিষে। রৌশনের সঙ্গে কর্কট নাগের তো প্রভেদ নেই। আমি চুপ করে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলাম। ভাবছিলাম, যাক— তাই যাক রৌশন। আর যেন না আসে কখনও।

রৌশন টেবিল ছেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জানালার ধারে।

সামনে সাউথ অ্যাভেনু ধরে আমাদেব ফৌজের জোয়ানরা মার্চ করে চলছিল। সে তাই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে তাকাল। বিস্মিত হয়ে গেলাম তার চোখেব কোল থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এসেছে। আবার কেঁদেছে রৌশন। এতক্ষণ ফৌজী মার্চ দেখছিল, না কাঁদছিল।

রুমাল বের করে চোখের জল মুছে সে বললে, কাল থেকে—। সেন্টিমেন্ট—ইমোশন—বড় বেযারা ব্যাপার বাপুজী। আমি এইবার যাব।

একটু থেমে বললে, আর আমি আসব না। আসা আমার উচিত নয়।

আমি নিজেকে কঠিন শাসনে স্তব্ধ রাখলাম।

সে আবার বললে, একটা অনুরোধ করব, রাখবে?

—কি? বল?

একশো টাকার দু'খানা নোট বের করে সে বললে, তোমার দোস্তকে কোন ছুতো করে দেবে? উধম সিংকে?

চমকে উঠলাম। ওঃ! মূর্খ আমি; তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। আবার দু' ফোঁটা জল তার চোখের কোলে কোলে ছলছল করছে। সে হাত বাড়িয়ে ধরেই রইল আমি নেব বলে।

বললাম, হরিপীতম! ওই একটি শব্দ ছাড়া উচ্চারণ করবার কথা খুঁজে পেলাম না।

হেসে সে বললে, হরিপীতম মর গেয়ি বাপুজী। ও নাম তুমি মুখে এনো না। আমি রৌশন! ব্যাড গার্ল।

—রৌশন, যেয়ো না—ফেরো।

—না বাপুজী আ—র ফেরা যায় না। বিষণ্নভাবে ঘাড় নাড়লে সে। ওই জীবন, হোক বাপ-মা, তাদের জন্যেও ও-জীবনে ফেরা যায় না। সে বিষন্ন হেসে ঘাড় নাড়তে লাগলে অর্থাৎ সে নিরুপায়।

আবার বললাম, শোন, আমার বাত শোন—

—কি শুনব? দেখ আমাদের দেশে বলে, সংসার ছেড়ে বনে বা তীর্থে তপস্যা করলে ভগবান মেলে। সে তো জিন্দিগীর সেরা লাভ। তাতে সব পায়, স্বর্গ মর্ত্য সব। কিন্তু ক'জন যায়? সেই সংসারের অশান্তি দুঃখের সুখ ছাড়তে পারে না। টাকাটা দিযো।

—দাও। নিলাম টাকাটা।

—খুট শব্দ করে দরজার ছিটকিনি খুলে সে বেরিয়ে গেল। তার আগে গগল্‌স্‌টা পরে নিলে।

আট

আমার দোষ, আমি জীবনে ঘটনায় কোন জায়গায় ছেদ টেনে দিয়েও তাব সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিই না। কারও সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও আবার সে এলে তাকে দবজা খুলে সম্ভাষণ করি। অনেক ক্ষেত্রে নিজে গিয়েও সম্পর্কটা জুড়ে নিই, তাতে গিঁট থাকলেও তাকে বড বলে ধরি না। রৌশন সম্পর্কেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

দেড বছর পর। মার্চ মাস।

খবরের কাগজে দেখলাম, কুতুবমিনার হতে লাফ দিয়ে তরুণীর আত্মহত্যা। কলকাতায লেক, দিল্লীতে কুতুব আত্মহত্যার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। রোমান্টিক আত্মহত্যাকারীদের, অর্ধ উন্মাদদের, কি বলব, প্রিয় স্থান। কেমন করে লাফ দেয়, লাফ দেওয়ার পরমুহূর্ত থেকে মাটিতে পৌঁছুনো পর্যন্ত ওইটুকু সময় কি মানসিক অবস্থা হয় কল্পনা করতে পারি নে। মৃত্যুর পথ অনেক। পটাসিয়াম সাইনাইড সহজ পথ। তবু কেন যে—। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, তার আগে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। তাই ঠিক। কিন্তু তার মধ্যে লেকের জলতলে বাসর পাতার কল্পনা, কুতুবমিনারের উপর থেকে লাফ দেওয়ার প্ল্যান আসে কি করে? এক বন্ধুর কাছে তার এক বন্ধুর রোমান্টিক আত্মহত্যার গল্প শুনেছিলাম। সে আমলে কুড়ি-পঁচিশ টাকার ফুল কিনে খাটে ফুলশয্যা বিছিযে ব্লেড দিয়ে নিজের একটি ধমনী কেটে শুয়ে পড়েছিল; সে নিজে ছাত্র ভাল ছিল এবং বিজ্ঞানের ছাত্র। পটাসিয়াম সাইনাইড তার পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার ছিল না।

হেডলাইন দেখে নিয়ে আর পড়িনি। থাক, কোন হতভাগিনী ব্যর্থতায় উন্মাদ হয়ে করেছে, সে আর পড়ে কি হবে?

প্রেম ? যাকে চেয়েছে তাকে পায়নি ? এই যুগে তার জন্যে আত্মহত্যা ! কলকাতা পুলিশের একজন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বলেছিলেন, নব্বুই দিন। তরুণ আর তরুণী ; এ বলছে ওকে না পেলে বিষ খাব, ও বলছে গলায় দড়ি দেব নয় ছুড়ি দেব। পালিয়ে গেছে, পাকড়ে এনে মেয়ের বাপকে বলেছি নাইন্টি ডেজ সাবধানে রাখুন, দেখা করতে দেবেন না, চিঠিপত্র লিখতে বা পেতে দেবেন না, বাস্ তাতেই হবে ; নব্বুই দিন তিন মাস পর সে নিজেই বলবে, বাপরে কি ভুলই করেছিলাম। বিয়ের সম্বন্ধ করবেন পছন্দমতো, দেখবেন নিজেই সেজেগুজে সলজ্জ হাস্যোজ্জ্বল নত মুখে এগিয়ে যাবে কনে দেখার আসরে। গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি। ছেলেদের এক মাসও লাগে না। হাজার হলেও বেটাছেলে মানিক ছেলে।

থাক, ও নিয়ে ভাববার সময় ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। অন্য খবরে এগিয়ে গেলাম। মোটামুটি দেখে ঠেলে দিলাম কাগজ। কাজ নিয়ে বসলাম। কাজ, লেখার কাজ। এই লেখাটাই লিখছিলাম। কিছুদিন আগে একজন বন্ধু বলেছিলেন, একেবারে মডার্ন মেয়ে নিয়ে কিছু লেখ। তুমি লেখনি। অবশ্য দেখে থাক তো লেখ নইলে লিখো না। মাঝখানে বন্ধুর বাড়িতে এক মার্কিন তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছেন। শাড়ি পরেছেন তার সঙ্গে হর্স টেল খাটো চুল, পায়ে চটি। তাঁকে বন্ধু হেসে রসিকতা করে বলেছিলেন, মিস, তুমি কিন্তু ব্যাকডেটেড হয়ে গেছ ; মডার্ন যাকে বলে তা আদৌ নও। হলে এখানে ছ'মাস এসেছ, ছ'টা প্রেম তো হওয়া উচিত ছিল। তোমার মায়ের কথা ভাব তো।

আমাকে বলেছিলেন, জানেন, সম্প্রতি ওর মা দ্বিতীয়বার উইডো হয়েছেন। শোকে অভিভূত হয়েছিলেন খুবই। হঠাৎ খবর পেলেন, তিনি লটারিতে একটা এরোপ্লেন পেয়েছেন। উঠে বসলেন। এবং প্লেনটার দখল পাওয়া মাত্র সেই প্লেনে চড়ে পৃথিবী ঘুরছেন। পৃথিবী দেখা উদ্দেশ্য অবশ্যই বটে কিন্তু মূল লক্ষ্য—টু ফাইন্ড আউট সেই লোকটি যাকে তিনি চিরজীবন খুঁজছেন।

কথাটা সেই থেকেই উঠেছিল, সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন ; অন্যদিকে লেখার তাগিদ ছিল ; ভেবেছিলাম মডার্ন মেয়ে নিয়েই লিখব এবং বন্ধুকে উৎসর্গ করব ; আমার সে মডার্ন মেয়ে রৌশন। তাছাড়া আর কাকে নিয়ে লিখব ? তার শেষ কথাটা কানে আজও বাজছে, মা-বাপ কারুর জন্যেই আমি ফিরতে পারি না।

রৌশনকে নিয়েই লিখছি। মডার্ন মেয়ে বলব না। মডার্ন মেয়েদের সত্যিই জানি না, মডার্ন খোলসে একটি মন্দ মেয়ের কাহিনী। আজকেই এই বেলাতেই শেষ করব। শেষ করে উঠলাম। ওই কথাতেই শেষ, ফিরতে আমি পারি না।

ছেদ টেনে দিয়ে চায়ের কাপ এবং সিগারেট নিয়ে বসলাম। টেলিফোন বেজে উঠল। তুললাম রিসিভার—হ্যালো।

—শঙ্করজী !

—দাদাজী !

—আরে ভাই পেপারমে দেখা হ্যায় ?

—কি ?

—রৌশন ?

—রৌশন—কি ? কি করলে আবার ?

—আরে কুতুবমিনারকে উপরসে—

—এ্যাঁ— ? সে রৌশন ?

—হ্যাঁ। পড়নি ?

—হেডলাইন দেখেছি কিন্তু পড়িনি।

সে রৌশন। টেলিফোনটা রেখে কাগজটা টেনে ঝুঁকে পড়লাম। হ্যাঁ, সে রৌশন। বেলা চারটের সময়।

—আঃ—। চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা মাংস-স্তূপমাখা নীলাভ মিহি শাড়ি, কিছু চুল। দুটো-একটা প্রত্যঙ্গ শুধু গোটা। হয়তো আধখানা হাত, নয় তো—। আঃ ছি ছি, থাক, থাক। কিন্তু—কিন্তু—। রৌশন এ কাজ করলে— ?

মা হতে যাচ্ছিল ?

না। রৌশন ডাক্তার ক্লিনিক সব চেনে। তাছাড়া সে সন্তানটিকে কোন প্রসূতিভবনে প্রসব করে তাদের মারফতই কোন অরফ্যানেজে পাঠিযে দিতে পারত।

আর কি ? কোন জটিল জালে জড়িয়ে পড়েছিল ?

আজকের দিনে, রৌশন যে মেয়ে তাতে তার সামান্য পানোন্মত্ততার অপরাধ থেকে কালোবাজারের পথ ধরে কি অপরাধ তার পক্ষে অসম্ভব ? জাল পযসা নোটের ব্যবসা, বিদেশের গুপ্তচর-বৃত্তি; মনোহারিণী শক্তিতে সংবাদ সংগ্রহ কবে চাণক্য পুরীতে বিক্রি, সবই রৌশন করতে পারে। হযতো বা শেষের ওই ধরনের কোন জটিলতায় পড়ে থাকবে বৌশন নইলে এইভাবে আত্মহত্যা সে করত না।

আর একটা হতে পারে।

যাকে চাই তাকে পাই না বলে জীবনের অশান্তি ব্যর্থতা মিথ্যে না-হয মেনে নিলাম। কিন্তু যা চাই তাকে না-পেলে জীবনের অশান্তি তো আছে।

রৌশন বলেছিল, উপার্জন করি, কিন্তু অভাব আমার মেটে না। অনেক চাই আমি। অনেক।

জীবনে ফুলের মালা বদল করে বিযে হয়। কিন্তু ওই ফুলের মালার পাশে সোনার হার ছাড়া সে বিযে সুখের হয না। বিয়ের পাওনা না পেলে সুন্দরী বধূরও শ্বশুরঘরে ঠাঁই হয না, ঠাঁই হলেও শান্তি হয না। তার নিজের মনেরও হয না।

রৌশন যে চেয়েছিল অনেক। ফর্দ দেযনি। এবং সে করা সহজ নয়। তবে এক কথায় বলেছিল, অনেক টাকাব তার প্রয়োজন। সেই অশান্তির জ্বালায় ?

মনে হলো এটা সম্ভব।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। লেখাটা সেই দিনই পাঠাব ভেবেছিলাম, পাঠালাম না। দাদাজী হয়তো জানতে পারেন কিছু। আমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে আসা বন্ধ করেছিল কিন্তু দাদাজীর কাছে আসা বন্ধ করেনি। তাঁর সঙ্গে অতীত জীবনের কথার

সম্পর্ক ছিল না, বা আমার মতো ধরমবাপ-বেটীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। দাদাজী—দাদাজী, রসিক নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি, দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ বহুদিনের, নাট্য ও শিল্পলোকের অনেক শক্তি ও সূত্র তাঁর হাতে। সুতরাং রৌশন তাঁর কাছে আসত, এটা বা সেটার জন্যে। হয়তো প্রডাকশনে সাহায্য নয়তো ছোটখাটো পার্ট চাই বলে আসত। উদার দাদাজী শ্রদ্ধার বা স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ না করলেও করুণার সঙ্গে গ্রহণ করতেন।

এসব দাদাজীই মধ্যে মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে বলতেন আমাকে। আমার কাছে সে আসত সেটা তিনি জেনেছিলেন। সম্পর্ক চুকলে পর একদিন হেসে বলেছিলেন, রৌশন মাকো ভাগিয়েছ, ভাল করেছ শঙ্করজী। কত টাকা তোমার মা বলার খেসারত দিয়েছ?

—কে বললে তোমাকে?

—খুদ রৌশন, আওর কৌন। তোমার বাড়ি কখনও আসবে না, সব কুচ ফারখৎ কর দিয়া, বললে আমাকে। তা, ওর বাত তো লাখোতে একটা সত্যি।

আমি বলেছিলাম, না সত্যিই। আমিই ওকে আসতে বারণ করে দিয়েছি।

—ভাল করেছ।

—আর কিছু বলেছে?

—না। তোমাব সম্পর্কে ওর বহুৎ রেসপেক্ট। বললে, একটা ওয়ালপ্লেট সে তোমাকে ঠকিয়ে বিক্রি করেছিল, তুমি ধরে ফেলেছিলে। তারপর বলেছিলে, তুমি আর না এলেই আমি খুশি হব। বললে, ও মানুষ নিয়ে বনে না দাদাজী। বড়া কড়া ধাতকে আদমী।

বলেছিলাম, হ্যাঁ।

তারপরও মধ্যে মধ্যে বলতেন, রৌশন আয়ি থি। তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করতাম, সে কেমন আছে?

—আরে ভাই, ওবা কখনও তবিয়তে বা বাইরে খারাপ থাকে না। রোগে তো ওরা হাসপাতালে যায় না, মোটর অ্যাকসিডেন্টে পড়ে হাসপাতালে যায়। তবে দিলের কথা বলতে পারব না। নাঃ, ভুল বললাম শঙ্করজী, ওদের ও বস্তুটাই নেই। এখন থিয়েটারে মেতেছে। ইচ্ছে, বম্বেতে গিয়ে ছবিতে নসীব পরীক্ষা করবে। এখানে নাম হলে সুবিধে হবে আর আমার একটা রেকমেন্ডেশন চায়। বাড়ি খালি করে ফেললে।

দাদাজীর বম্বেতে ছবির রাজ্যে সত্যই প্রতিষ্ঠা আছে।

আমি বলেছিলাম, দিয়ো না একটু লিখে। একটা চান্স পাক না। যদি পারে।

একবার বলেছিলেন, শঙ্করজী, শী ইজ গোয়িং টু হ্যাভ এ চান্স।

—কে?

—ও, তুমি ভুলে গেছ? রৌশন। তুমি বলেছিলে, আর মেয়েটা খারাপ হলেও, আই পিটি হার।

—দাদাসাহেব ইউ আর রিয়েলি গ্রেট।

—আরে ভাই, হাজার হলেও বাচ্চা লেডকী, বাপ নেই মা নেই, অরফ্যান। দুনিয়ার ধুলোমাটি মেখেছে, মরে যায়নি, উঠেছে কোনরকমে, হাউ ক্যান ইউ হেট হার!

—নিশ্চয়। এটাই গ্রেটনেস।

দাদাজী প্রশংসার কথা চাপা দিয়ে বলেছিলেন, লিখে দিয়েছিলাম, বম্বে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট রোল দিয়েছে। তাতেই খুশি। শী ওয়াজ ড্যান্সিং লাইক এ চাইল্ড।

দাদাজীই খবর দিয়েছিলেন, ছবিতে রৌশন একদম ব্যর্থ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, পুয়োর গার্ল!

উধম সিংহের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যেমন মধ্যে মধ্যে আসে তেমনি এসেছিল।

—নমস্তে দোস্ত বাবু সাহেব। আচ্ছা হ্যায়?

—নমস্তে সিংজী দোস্ত। তোমাদের ভালবাসার দৌলতে ভালই আছি। তোমার বালবাচ্চা সব ভাল?

—হ্যাঁ। সব আচ্ছা। বড লড়কাকে ফৌজে ঢুকিয়ে দিলাম। আচ্ছা বাবুজী, এ পেলেট কোথা থেকে কিনলে?

সে এগিয়ে গেল। রৌশনের প্লেটখানার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। কোথায় পেলে বাবুজী?

—কাশ্মীর থেকে এনে একজন দোস্ত দিয়েছে সিংজী।

—জান বাবুজী, এতে আমাদের বাড়ির ফুটকি চিহ্ন রয়েছে।

মুখ তুলে ভাবতে লেগে গেল, বললে, কে আছে ওখানে? আমার চাচেরাভাইদের কেউ হবে। আমি ভেবেছিলাম তারা সব মরে গেছে। ওঃ বহুৎ নয়া ডিজাইন বানায়া। আচ্ছা চিজ।

মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করব মনে কবেও জিজ্ঞাসা করলাম না। টাকাটা দেওয়ার কথা মনে হলো। কি করে কি বলে দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে এল এবং তাই বললাম। বললাম, তোমরা নিজেরা এখানে যা তৈরি কর সে সব নতুন করে কর না কেন?

—আর বাবুজী, ওসব আচ্ছা লাগে না। সীতারাম, হরপার্বতী এসব ছেড়ে এই মাঝি আর মাঝিনী কি হবে? এ তো নদীর ঘাটে গেলেই মেলে। পথে মেলে ঘাটে মেলে। এ আবার বাড়িতে কেন?

—বেশ তো, তাই নয়া ডিজাইনে কর।

—রূপেয়া চাই বাবুজী। প্রথমে খরচ করতে হবে—তবে তো! কাম করবার লোক চাই। ভাল হাত চাই। আমার—

হঠাৎ থেমে গিয়েছিল সে। মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে এল। তারপর বলেছিল, আমার যে বড়া লেড়কী ছিল তার হাত ছিল আচ্ছা। খুব সরেস হাত। বাচ্চা বয়সে সে মরেছে কিন্তু সেই বয়েসেই তার মগজেও এসব খেলত।

আমি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করেছিলাম, হরিপীতম।

চমকে উঠেছিল উধম সিং। বলেছিল, বাবুজী?

—বল!

—এ নাম কি করে জানলে তুমি?

—তুমিই বলেছিলে সিংজী। এখানে বস।

—বলেছিলাম?

—হ্যাঁ। মনে নেই?

—কিন্তু—

—কি কিন্তু? একদিন তোমাদের সব কথা আমাকে বলেছিলে। আমি ওয়েটিং চার্জ দিতে চেয়েছিলাম, নাওনি!

—সে মনে আছে। কিন্তু আমি তো ও নাম মুখে আনি না।

বিব্রত হয়েছিলাম। কিন্তু বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের কাছে বুদ্ধিহীন হলেও উধম সিংয়ের কাছে আমি বুদ্ধিমান। বলেছিলাম সেদিন তুমি কেঁদেছিলে সিংজী, সেই তারই মধ্যে বলে ফেলেছিলে নইলে আর আমি জানব কি করে?

—তা হবে! হয় তো দারুও খেয়ে থাকব।

—বোধ হয়। চোখের জল যখন বের হয় তখন মনের ঘরের দরওয়াজাগুলো খুলে যায় সিংজী, নইলে আঁসু বেরোয় কি করে?

হেসেছিল উধম সিং। বলেছিল, তা বলেছ ঠিক। দরওয়াজা বিলকুল যদি নাই খুলবে তবে আঁখো কি আঁসু নিকালে কি করে।

একটু থেমে আবার বলেছিল, ও লেড়কীর নাম আমি মুখে আনি না। বহুত দুখ পাই। কলিজা একদম উখাড়ে যায়। মর গেয়ি!

এরপর চুপ হয়ে গিয়েছিল সব। সেও চুপ আমিও চুপ। আবার ভাবছিলাম জিজ্ঞাসা করব কি না, কি করে মরল সে? ঠিক হবে? মন বলছিল, না।

সেই বললে, বাবুজী, দিল্লীতে এসে এই দিল্লী শহরে ওরা তাকে লুঠ করে নিয়ে গেল।

—কারা?

—আবার কারা? যারা ওখান থেকে তাড়ালে আমাদের। এখান থেকে যারা চলে গেল পাকিস্তান। তারাই। মেয়ে বড় ভাল ছিল, গুণ ছিল অনেক। ভিক্ষে করতে গেল একদিন আর ফিরল না। হারিয়ে গেল। জি বি রোডে বাবুজী যে সব মুসলমানী বাঈজী থাকে তারা তাকে গায়েব করে পাকিস্তান নিয়ে যাচ্ছিল। পথে কাটাকাটির সময় আমার বেটিও কাটা পড়েছে। মর গেয়ি উ!

চুপ হয়ে গেল সে, আমিও চুপ করে রইলাম। নিজেকে সতর্ক করলাম, না, আর কোন কথা নয়। অন্তত হরিপীতমকে নিয়ে নয়।

সে হঠাৎ বলে উঠল, লোকে দেখেছে। চোখে দেখা লোকে আমাকে বলেছে। তার বুকে উল্কি ছিল। লেখা ছিল পীতম। পীতম আমার জামাইয়ের নাম। সে এক

মেলায় ওকে নিয়ে গিয়ে শখ করে নাম লিখিয়েছিল। যে দেখেছে সে বললে, একটা মরা মেয়ের বুকে সে দেখেছে উল্কির লেখা।

মনে হয়েছিল উধম সিংয়ের সন্দেহ আছে।

এবার আমি বলেছিলাম, একটা কথা বলব তোমাকে।

সে তখনও ও কথাটা ভুলতে পারেনি। বলেছিল, আমার জামাই, সে বাবুজী ওই দশ-এগার বছরের বউয়ের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল! নসীব, সব নসীব।

বলেছিলাম, ভুলে যাও সিংজী সে সব কথা। দুনিয়াতে এমনি একটা সময় আসে যখন দিন দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিই বাউরা হয়ে যান।

—ই বাত ঠিক হ্যায় বাবুজী। ঠিক বলেছ। খোদা মালিক বাউরা হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াতে মানুষও সব ক্ষেপে যায়। ওঃ! দুখ আমার জামাইয়ের জন্যে। ছেলেবেলা থেকে এক গাঁয়ের লেড়কা-লেড়কী। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল ছোট থেকে, বিয়ে হলো—। ছোট মেয়ে আমার বাড়িতেই থাকত কিন্তু দেখা তো হত দু'জনের। মহব্বতি ছিল, সে মহব্বতি বেহেস্তের মহব্বতি।

—শোন উধম সিং, একটা কথা বলব তোমাকে।

—আমাকে?

—হাঁ।

—হাঁ—হাঁ। বলেছ আর একবার। বল কি হুকুম?

—আমাকে দোস্ত বলে মান তো?

—আলবৎ? জরুর! একবার বলেছি, আবার দোসরা বাত কিসের? হাঁ তবে তুমি বড় আদমী, আমি ছোট—

—না। দুনিয়াতে মানুষ ছোট-বড় নয়। কাম আছে ছোট-বড়। সেও ভুল, কাম হলো কাম। আমার দোস্ত তুমি। তোমাকে বলবার কথা তোমার ভাল চাই, তুমি এই প্লেটের কাজ ভাল করে কর। তুমি টাকার কথা বলছ। টাকা আমি দোস্ত হিসেবে দিচ্ছি। তুমি মাল কেন, যাতে খরচ করতে হবে কর। দুশো টাকায় হবে?

—দু-শো টাকা তুমি দেবে? কেন?

—বললাম তো দোস্ত হিসেবে দেব!

—ধার?

—না। ধার নয়।

—তবে কি? মেহেরবানীর দান?

—না, দোস্ত দোস্তকে দিচ্ছে। তোমার হলে আমাকে দেবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বললে, খুব প্রেমসে দিচ্ছ তো?

—নিশ্চয়।

—তাহলে দাও। নেব। দেখ, খুব গরীব আমরা কিন্তু ভিখ মাঙি না। দাও। দেখি নসীবকে ভাল করা যায় কিনা।

টাকাটা নিয়ে নিশ্চিন্ত করেছিল আমাকে।

রৌশনও সঙ্গে সঙ্গে মনের দরজায় বলেছিল, বাপুজী, আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

হঠাৎ এতদিন পর খবরটা শুনে মনে হচ্ছে অশরীরী রৌশন আমার এই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলতে চাচ্ছে, বাপুজী, আজ এসেছি, কেউ দেখতে পাবে না বলে এসেছি। যাবার আগে দেখা করতে এসেছি। নমস্তে জানাতে এসেছি। বল, আনন্দ রহো। জিতা রহো তো নয়, জিন্দিগী শেষ হয়ে গেছে। বল আনন্দ রহো।

কলিং বেল বেজে উঠল। চমকে উঠলাম। সে চমকানো অল্প নয়। এই মুহূর্তে বেল বাজতেই মনে হলো সত্যিই রৌশন এসেছে, বেল টিপছে। উঠে গিয়ে দরজা খোলবার আগে ঘুলঘুলিটা দেখলাম, কে? মানুষের মন বিচিত্র।

দেখলাম, পিওন।

খুললাম। পিওন বললে, রেজেস্ট্রি চিঠি বাবুজী।

রেজেস্ট্রি চিঠি! কোথাকার? কলকাতা থেকে? হাতে নিয়ে দেখলাম—চমকে উঠলাম আবার। লিখছে, রৌশন কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার দিল্লী...।

রৌশন!

চিঠিখানা সই করে নিলাম। হাতে করে নিয়ে বসেই রইলাম। রৌশন লিখেছে। কাল সকালের দিকে রেজেস্ট্রি করেছে। বিকেলে কুতুবমিনারে চড়ে ঝাঁপ খেয়েছে!

আজ এসেছে চিঠিখানা। মনে হচ্ছে রৌশনও এসেছে। কথা বলছে চিঠির মধ্য দিয়ে।

কম্পিত হাতে খুললাম।

নয়

রৌশনের লেখাটি বড় সুন্দর। জন্মশিল্পী ছিল সে, এ কথা সেই মুহূর্তে অকপটে স্বীকার করেছিলাম। এবং এই চিঠি লেখার সময় মনের মধ্যে তার চঞ্চলতা অস্থিরতা ছিল বলেও মনে হচ্ছে না। বেশ ধীর চিত্তে লিখেছে। ভাষাটা গোলমেলে; বেচারী ভাল লেখাপড়া তো শেখেনি। অবশ্য তার জন্যে তার কোন দৈন্যবোধ ছিল না। উর্দু ভাল বলত কিন্তু আরবী হরফ আমি পড়তে পারিনে সে তা জানত তাই বোধ হয় হিন্দীতে লিখেছে। বিস্ময় বোধ করলাম এর জন্য। কারণ একালের ফ্যাশন ও ধারণা অনুযায়ী ইংরিজী যেখানে বৈদগ্ধ্যের চরম পরিচয় সেখানে মডার্ন মেয়ে রৌশন ইংরিজী ছেড়ে হিন্দীতে লিখলে কেন। অস্বাভাবিক এটা। কালের একটি স্বভাব আছে, সে স্বভাব মানুষের প্রকৃতি এবং দেশমাটির প্রকৃত পরিচয়কে ঢেকে দেয়। থাক ও-সব কথা। রৌশন হিন্দীতে লিখেছে, তার চিঠি পড়ছি আর আমার কল্পনাপ্রবণ মন যেন তার কান অর্থাৎ মনের কানে তার রবহীন কথা শুনতে পাচ্ছে।

পরম আদরণীয় বাপুজী,

সব আগে তোমায় নমস্তে জানাচ্ছি। আমার বহুৎ বহুৎ প্রণাম তোমাকে। আমি আজ মরতে যাচ্ছি। মরব আজ! মন আমার শান্ত; কোন অশান্তি নেই। ভেবে

ভেবে ধীরে ধীরে মরবার সিদ্ধান্ত করেছি। মরা ছাড়া আমার পথ নেই। আজ এক বছর নিদারুণ অশান্তির মধ্যে কেটেছে। তোমাকে বলেছি, অনেক জঙ্গল পাহাড় অন্ধকার আমি জীবনে একা পার হয়েছি। তখন ভয় হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু আমি তোমার শুধু মন্দ মেয়েই নয়, আমি দুর্দান্ত মেয়ে। আমার সাহস তোমাদের থেকে অনেক বেশি। আমি ভয় পেয়েও হটে পিছন ফিরিনি, ভয়ের সঙ্গে লড়াই দিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়েছি। তাতে অশান্তি ছিল না এমন বলি নে কিন্তু মজা ছিল যেন। এই মজাই আজ হারিয়ে গেছে। জিন্দিগীর নুন ফুরিয়ে গেছে। এক বৎসর দিন-রাত কেঁদেছি, অশান্তিতে ভুগেছি। ভয়ের হাঁ বড় থেকে বড় হয়েছে। মরবার সংকল্পে যেই শক্ত হয়েছি অমনি সব পালিয়ে গেছে! সব এখন সাফা হয়ে গেছে, সামনে সিধা রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কুতুবের সেই চূড়া যেখানে অনেকবার উঠেছি। মনে হয়েছে বিলকুল দুনিয়া ছোট হয়ে খেলাঘর বনে গিয়েছে। আমি উপরে দাঁড়িয়ে আছি, কত সুখ এখানে। ওখান থেকে ঝাঁপ খাব। সেদিন বলেছিলাম, বাপ হোক মা হোক কারুর জন্যেই ওদের জীবনে ফিরে আসতে পারব না। অসম্ভব। ফেরা যায় না। পাথরে গড়া কুতুবমিনারে সিঁড়ি আছে বাপুজী। জিন্দিগীতে দেমাকে আর আরামে গড়া মিনার যখন মানুষ গড়ে তখন সিঁড়ি গড়ে না। উঠে যায় আর পায়ের ধাক্কায় সিঁড়িগুলোকে ঠেলে ফেলে দিয়ে যায় পাছে কখন কারুর ডাকে নেমে আসে ভুল করে। নামতে হলে পড়তে হয়। যারা ঠেলা খেয়ে পড়ে যায় তারা মরে হাড়গোড় ভেঙেও বেঁচে থাকে কাঁদতে। আমি নিজে লাফ দেব। আমি মরে বেঁচে যাব। অনেক ভেবে স্থির মগজে খুশি দিলে রয়েছি।

দুনিয়ায় বাপ-মা ছেড়েছি। এই জীবনে কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক, সত্যকারের সম্পর্ক ছিল না। শুধু তুমি এই অল্পকালের মধ্যে আমার মতো মেয়েকে বাপুজী বলিয়েছ, কোন শরম করনি, বিদেশীর কাছে আমাকে ধরমবেটী বলেছ। তুমি আপনার লোক। আর দাদাজী সাহেব! দাদাজী আমার ভোলানাথ। তাঁর এই গোস্যা, এই মেজাজ খোস, তাঁর কাছে মন্দ পাপ বিচার নয়, তাঁর বিচার মায়ামমতার। কত মায়া যে তিনি করেছেন তার কিছু জান, সব জান না। ভেবে-চিন্তে খুব শান্তিতে খুশিতে মরতে যাচ্ছি তাই প্রথমেই আজ দাদাজীকে চিঠি লিখবার কথা মনে হলো আর তোমাকে। তুমি পিতাজী, ধরমবাপ। আমার পাপ উপেক্ষা করে এগিয়ে এসে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছ, এই মন্দ মেয়েই আমার বেটি। তোমাদের লিখে মন মানল না।

দাদাজী আমার অনেক উপকার করেছেন, অনেক ভালবেসেছেন কিন্তু তিনি আমার জীবনের কথা জানেন না। তাঁর কাছে শুধু মাফি চেয়ে গেলাম। স্রিফ ক্ষমা, মাফি। আর লিখলাম, দুঃখ করো না। প্রণাম।

তুমি আমার জীবনের কথা জেনেছ। প্রায় সবটাই বলেছি। কিছুটা বলিনি তার খানিকটা পিতাজীর কাছে বলা যায় না। হাজার বেশরমী হলেও বলতে পারে না। তা আজও বলব না। আর কিছুটা বলব! যা বলেছি এমনভাবে যে বলার মতো

বলা হয়নি। তোমার সঙ্গে নসীবের খেলে উধম সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার আসল বাপ, গরীব বাপ। আমি তার মন্দ বেটী। খারাপ বেটী। তুমি আমার কথা জেনে গেছ। তাই তোমাকে শুধু মাফি চেয়ে চিঠি শেষ করতে পারছি না। সব লিখছি।

আত্মহত্যা যারা করে তাদের বেশির ভাগ চিঠি লিখে যায়। না-লিখে বোধ হয় মরতে মন চায় না। কেউ দুনিয়াকে দুষে যায়। কেউ লেখে, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়; তারা কিন্তু এই কথা লিখেই দায়টা বেশি করে চাপিয়ে দিয়ে যায় সেই লোকটির উপর, সেই তা বুঝতে পারে, অন্য কেউ তার পাত্তা পায় না। তার বিলকুল কথা সেই লোক মনের মধ্যে ভাবে আর আপসোস করে। যে মরে ওতেই তার মন খুশি হয়। আমার তো তা নয়। দায় আমার কারুর উপর দেবার নেই। তাই তোমাকে লিখে জানিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো। মরে গিয়ে তো ভগবানের দরবারে (ভগবান যদি থাকেন) দাঁড়াতে হবে। তিনি তো পুছবেন, যে জিন্দিগী আমি তোমাকে দিলাম সে জিন্দিগী তুমি নিজের হাতে মাঝখানে বরবাদ করলে কেন? একজন অন্য জনের জান নিলে আমার কানুনে তার সাজাই হয়, তোমার জান তুমি নিয়েছ। তুমি বল, কেন নিয়েছ? তখন একটা জবানবন্দি তো দিতে হবে। এই জবানবন্দিটাই মরবার আগে সবাই তৈরি করে নেয়। আমিও তোমার কাছে পত্র লিখে তাই তৈরি করছি। এটাই সেখানে পেশ করব।

বলেছি তোমাকে সবই প্রায় মিথ্যা বলতে আমি ওস্তাদ মেয়ে। কিন্তু তোমাকে ঝুটা বাত বলিনি, অন্তত আমার কথা যা বলেছি তার ভিতর কিছু বাদ আছে।

শোন বলি।

এক গাঁওয়ে জম্মু এলাকায় থাকত উধম সিং, তার সংসার, তার স্ত্রী, মেয়ে, ছেলে। মেয়ে হরিপীতম। জন্ম থেকে মন্দ পেয়ে। মন্দ মেয়ে জন্মায় বাপুজী। গরীব জাঠের ঘর। সে সব বলেছি। তাদের পেশার কথাও বলেছি। হরিপীতম বচপন্ থেকেই মন্দ। বড় চালাক বড চতুর। বুদ্ধি খুব। তার হাত ওই কারুকামে খুব মিহি, অল্পতেই ধরতে পারে, বুঝতে পারে; আবার বুদ্ধি খাটিয়ে শেখা কারিগরির উপরেও কারিগরি করতে পারে। ছবি আঁকতেও পারত; খড়ি দিয়ে কালি দিয়ে কাগজের উপর নকশা সে আঁকত পাঁচ বছর বয়স থেকেই। আর চুরি করতে পারত খুব হুঁশিয়ারির সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে। এমনকি পাঁচজনের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে অন্য লোকেদের মুখের দিকে চেয়ে তাদের কথা শুনত, হাসত আর তার হাত চুরি করত। আর মিথ্যে এমন ভাবে বলত যে কেউ তা ধরতে পারত না, একবিন্দু সন্দেহও করত না। করতে পারত না। একটা ঘটনা বলি, তখন ছ'সাত বছর বয়স। গাঁওয়ের মধ্যে বড় সর্দারের বাড়ি নাতির অন্নপ্রাশনে গিয়েছি। সেখানে সর্দারের বাড়ির বেটী-বহুরা বসে আছে। বাচ্চাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে এ কোলে করছে ও কোলে করছে। বাচ্চার হাতের সোনার গহনার একটা ছোট সোনার ঘণ্টি কস্তার ডগায় দুলছিল। আমার লোভ হয়। মনে হলো ওটা চাই আমার। বুদ্ধি ঠিক পথ বাতলালে! বেরিয়ে গিয়ে

খুঁজে জাঙ্গাল থেকে এক টুকরো ভাঙা কাঁচ নিয়ে এলাম। আমি ভিড়ের মধ্যে ঠিক ওর পাশে পাশে ঘুরতে লাগলাম। সময় ঠিক পাচ্ছিলাম না। একবার বাচ্চার বুড়ো দাদো এলেন আর এক বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে আশিস করতে। মেয়েরা ঘোমটা দিলে। বুড়ো দু'জন সামনে এসে দাঁড়ালেন। বহুর কোলে বাচ্চা। ঘণ্টিটা ঝুলছে। আমি ফাঁক পেয়ে কাঁচ দিয়ে সেটাকে কেটে টপ করে মুখে পুরে গিলে দিলাম। এসব আমার বাবা-মা জানত না। বিশ্বাস করো। গাছে চড়তাম, ফল পাড়তাম। গান গাইতে পারতাম, নাচতে পারতাম। গাঁওয়ের লোকেদের খুশি করবার ক্ষমতা আমার ছিল। তারা আমাকে মন্দ বলে তখনও বুঝতে তো পারত না। বয়সও হয়নি। গাঁওয়েই শ্বশুরবাড়ি। বিয়ে তখন আমার হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে বিয়ে হয়েছিল। বর ছিল দশ বছরের উত্তম সিং, ডাকনাম পীতম। তার দাদো, মায়ের বাপ তাকে বলত পীতম। দাদোর ছেলে ছিল না, এই পীতম ছিল তার সব। সে ছিল ফৌজে হাওলদার। এই দাদোই আমাদের গাঁওয়ে এসে আমাকে দেখে পছন্দ করে দশ বছরের পীতমের সঙ্গে পাঁচ বছরের হরিপীতমের বিয়ে দিয়েছিল। তুমি জান আমাদের বিয়ে হলেই মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় না, 'গওনা' আছে। মেয়ে যুবতী হলে তবে শ্বশুরবাড়ি যায়। কাজেই বিয়ে হয়েও বাপের বাড়িতে ছিলাম। পীতম ছেলেবয়স, পাঁচ বছর বয়স থেকে থাকত দাদোর বাড়ি; আমাদের গাঁ থেকে দশ মাইল দূর, কিন্তু বিয়ের পর পীতম সেখান থেকে পালিয়ে আসত বাপের কাছে একটা ঘোড়ায় চড়ে। আসত আমার জন্যে। দুর্দান্ত শক্তগড়ন ছেলে। মনমেজাজ অদ্ভুত। আমার ভালও লাগত ভয়ও করত। বাপুজী, বিয়ের বাসরেই সে আমার চুলের মুঠো ধরে মেরেছিল। আমি কেঁদেছিলাম মায়ের জন্যে। সে এসে যে ক'দিন থাকত তার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হত। পথেঘাটে কি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা, দু'চারটে কথা নয়; তার সঙ্গে দু'চার ঘণ্টা কাটাতে হত। জায়গা তার ছিল। সে গাঁওয়ের নগিচে একটা গোপন স্থান ঠিক করেছিল, কোন আগেকার আমলের কোন সরদারের ভাঙা মাটির গড়। নাদীর শাহের আমলে গড়টাকে গোলা মেরে একদম মাটির ডাঁই করে দিয়েছিল। তারা নির্বংশ হয়ে গিয়েছিল। সেই গড়ের মধ্যে একটা জায়গা সে বের করেছিল। সেইখানে দিনে একবার যেতেই হত। না গেলে পরের দিন সে আমাকে মারত। নিষ্ঠুরভাবে মারত। কিন্তু তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, ভাল লাগত। হয়তো বর-বহু হয়েও ওই যে গোপনে দেখা তার মধ্যে একটা মজা ছিল। বোধ হয় গোপন অভিসারের স্বাদ আর রঙ ছিল। সেও ছিল দুর্দান্ত, আর ছিল গোঁয়ার। গল্প করত, বড় হয়ে সে ডাকাত হবে। এই গড়টাকে তলায় তলায় খুঁড়ে ঘর গড়ে নেবে। ঘোড়া রাখবে। হাতিয়ার রাখবে। রাত্রে বের হবে ডাকাতি করতে। বলত, তুই খানা তৈরি করে রাখবি—আমি এসে খাব। তোকে গহনা দেব, বলব, নে পর।

একবার মেলাতে গিয়ে সে উল্কিওলার কাছে আমার বুকে লিখিয়েছিল পীতম। আব নিজের বুকে লিখিয়েছিল হরিপীতম।

সে বড় গোঁয়ার ছিল। মুখে বলত ডাকাত হব কিন্তু বাপুজী চুরিকে সে ঘেন্না

করত। ওই যে সোনার ঘণ্টি আমি চুরি করে গিলেছিলাম সেটা পেট থেকে বের হয়েছিল। ময়লা থেকেই সেটাকে কুড়িয়ে আমি অনেকদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর একদিন সেটা আমি তাকে দিয়েছিলাম, এটা তুমি নাও। বিক্রি করে—

সে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় পেলি?

আমি হেসে বলেছিলাম, ডাকাতের বহু আমি। আমি চুরি করেছি।

—চুরি? কার ঘরে?

ঘটনাটা বলতে সে আমাকে খুব মেরেছিল। বলেছিল, চুরি আর ডাকাতি এক নয়। চুরিতে পাপ হয়, ডাকাতিতে হয় না। বলে সেটাকে গাঁওয়ের ধারের দরিয়াতে ফেলে দিয়েছিল। আমার বহুৎ দুখ হয়েছিল। সোনার কোন গহনা আমার ছিল না। বাপ দেয়নি, শ্বশুরও না। আমি মন্দ মেয়ে বাপুজী। মানুষের মনে যাদের সাধ আশ কিছুতেই মেটে না, এই আশই তাদের মন্দ করে তোলে।

এরপর বাপুজী, তার সঙ্গে তার বাপেদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল আমাদের। এমন হলো যে এ ঝগড়া মিটবে না। তার আবার বিয়ে হবে। আমার সঙ্গে ফারখৎ হবে।

সেও এই মন্দ মেয়ের দোষ। তারও দোষ। হ্যাঁ তারও দোষ। ওই যে গাঁওয়ের বড় চাষী সরদার, ওদের বাড়ি এসেছিল এক মেহমান। ওই সরদারের শালার বেটা। তারা বড়লোক, এই সরদারের চেয়েও বড়লোক। তার বয়স উত্তমের মতোই। বহুৎ খুবসুরত। কিন্তু উত্তমের মতো শক্ত নয়, আর ডাকাত নয়। গোঁয়ার নয়। আমার তখন সাত বছর বয়স। বাপুজী, গাঁওকে যত নির্দোষ সরল ভাব তা নয়। সেখানে ছেলেমেয়েরা শহরের থেকেও বোধ হয় পাকা, অল্প বয়সে সব শেখে। ওই ছেলেটা তাদের বহেনদের পুঁতির মালা দিচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে বলেছিল, তুই নিবি?

তখনই চোখের ভাষা জেনেছিলাম। সেই ভাষার সঙ্গে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখের ভাষা মিশিয়ে বলেছিলাম, দাও না!

সে বলেছিল, আমাকে চুমু দিস তো দেব।

ইশারায় ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, দেব।

তখন থেকেই আমি ঠক। ঠকাতে কোন দোষ নেই এ শিখেছিলাম। হাতে পেলে সেটা নিয়ে ছুটব, আর এমুখো হব না এই ছিল মতলব। তাই দিয়েছিলাম ছুট। ওদিক মুখো হইনি। কিন্তু তার কপালে বিপদ আর আমার কপালেও। সে কি করে জেনেছিল যে আমি পীতমের সঙ্গে দেখা করতে যাই ওই ভাঙা গড়ে ঠিক দুপুরের সময়। সে সেদিন লুকিয়েছিল। আমাকে ঠিক ধরেছিল পথ আটকে।—বেইমানী!

আমি ভয় পেয়ে বলেছিলাম, ছোড়ো ছোড়ো। কাল জরুর ময় যাউঙ্গী। ছোড়ো—

—নেহি।

—তব লেও তুমহারা মালা।

—নেহি। মালা নেব কেন? দাম নেব। তুই বলিসনি?

আমি মন্দ মেয়ে বাপুজী। বলেছিলাম, নাও। তবে জলদি চুমো খেয়ে নাও। জলদি করো।

সে আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে কাছে টেনে বলেছিল, এই তো পিয়ারী।

বাপুজী, হঠাৎ একটা ঢেলা এসে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। চমকে উঠলাম। তাকে বললাম, পালাও, ভাগো। জলদি। পীতম তোমাকে মেরে ফেলবে।

—কে?

—পীতম। আমার বর।

—আসুক না, ছোটলোক চাষীর বেটা।

বলতে বলতে পীতম এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তার উপর। আমরা জাঠ রাজপুত আর সে বড়লোকের বেটা শিখ। তার কাছে ছোট কৃপাণ ছিল। সে কৃপাণখানা খুলে মারতে চেষ্টা করেছিল পীতমকে। কিন্তু পীতমের ছিল অনেক বেশি বল। কুস্তির অনেক প্যাঁচ। সে তখনই শিখেছিল। সে তার ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখে নাকে খুব মার দিয়েছিল। আমার ভয় হয়েছিল খুব। তখন এখনকার মতো বুদ্ধির বিচার করতে শিখিনি। আমার সেদিন বিচারে মনে হয়েছিল দোষ আমার। ও ছোকরা মরে যায় তো কি হবে? আমি ওই কৃপাণখানা নিয়ে পীতমকে বলেছিলাম, ছোড়ো উসকো। ছোড়ো নেহি তো!

বলতেই পীতম তাকে ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার উপর পড়েছিল এবং কৃপাণখানা নিয়ে মেরেছিল আমার কাঁধের নীচে হাতে। সে ছোকরা এই ফাঁকে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল। বাচ্চা ছেলের ছোট কৃপাণ খুব ধারালো ছিল না, নইলে হয়তো সেই দিনই খতম হতাম। কিন্তু রক্ত পড়েছিল দরদর করে। পীতম দাঁড়িয়ে দেখে বলেছিল, আর কখনও করবি এমন?

বলেছিলাম, না।

—ওঠ। চল নদীর কিনারায়, রক্ত ধুয়ে দি।

নদীর ধারে যখন এসেছি তখন পিছনে গোলমাল শুনেছিলাম। একটা টিবির উপর উঠে সে দেখে বলেছিল, অনেক আদমী আসছে। সেই হারামী লোক নিয়ে আসছে। তুই বাড়ি যা, আমি পালালাম। চলে যাচ্ছি দাদোর বাড়ি, বুঝলি। বলে সে ঝোপঝাড় খানাখন্দের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে। দাদোর দেওয়া যে ঘোড়াটা চড়ে সে আসত সেটাকে নিয়েই আসত ওখানে। সেটাই ছিল ওর ওই ভাঙা গড়ে আসবার অজুহাত। ওখানে ঘাস ছিল অনেক। ওর বাপের ঘোড়া ছিল ছোট ঘোড়া। তার সহিস ছিল না। পীতম ঘোড়ার যত্ন করত নিজে।

বাপুজী, এই নিয়ে ঝগড়া লাগল আমার শ্বশুরদের সঙ্গে আমার বাপের।

শ্বশুর বললে, ও বহু কখনও নেব না। বাপ বললে, আয় বাপ, হে ভগবান, কি খুনের সঙ্গে বেটীর সাদি দিয়েছি। সরদারেরা চটল শ্বশুরদের উপর। তাদের দুঃখ দিতে লাগল, যেমন বড়লোক গরীবদের দেয়। আমার বাপকে বললে, তোর বেটীকে দে, আমাদের বাড়ি থাকবে কাম-কাজ করবে; সরদারনী বেটীর মতো দেখবে।

তার মানে খুব ভাল নয় বাপুজী। বাপ আমার তা দেয়নি। বলেছিল তার চেয়ে মরে যাক ও।

দু'বছর ঝগড়া চলল। পীতম কখনও কখনও গাঁওয়ে আসত লুকিয়ে। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করত না। মামার বাড়িতেই থাকতে লাগল। সেখানকার বাড়ির সেই তো সব পাবে। তার দাদো বিয়েরও সম্বন্ধ করতে লাগল। পীতম সেখানে পড়তেও লাগল। ইস্কুল ছিল সেখানে। দাদো তার খুব কড়া হয়ে গেল।

দু'বছর পর বাপুজীর সঙ্গে এক মেলাতে গিয়েছিলাম আমরা এই সব চিজ নিয়ে বেচতে আর মেলা দেখতে। তখন আমার বয়স দশের কাছাকাছি। মাথায় লম্বা ছিলাম, আমাকে বড দেখাতো। আর সাজতাম খুব। সাজতে জানতাম। আমাদের গাঁওয়ে চুড়িওয়ালী ছিল ক'ঘর, তারাও গিয়েছিল। তারা মুসলমান। সেখানে হঠাৎ অন্য এক গাঁওয়ের এক ছোকরা এসে ওই চুড়িওয়ালীদের সঙ্গে মস্করা শুরু করলে আর খারাপ কথা বললে। এতে তাদের সঙ্গে আমাদের গাঁওয়ের দলের সঙ্গে লাগল ঝগড়া। পাঞ্জাব জম্মুর এসব ঝগডা বড খারাপ। বারুদে আগুন লাগার মতো; দপ্ করে জ্বলে উঠলে বিলকুল একেবারে জ্বলে যায়। হাতে শুরু হলেই কোথা থেকে আসে লাঠি ছোরা তার সঙ্গে কৃপাণ তলোয়ার বল্লম। খুন গিরে যায়, লাশ পড়ে যায়। তবে এ ঝগডা খুব বড ঝগডা হয়নি। আমাদের গাঁয়ের লোক বেশি যায়নি। আট দশজন পুরুষ, দশ-বারোজন মেয়ে। চুডিওয়ালী বেশি। ওরা ছিল আমাদের থেকে বেশি। হার আমাদেরই হত। মেলা যে গাঁয়ের সে গাঁয়ের লোকেরা এসে মেলার ঝগডা বন্ধ করলে। কিন্তু ওরা বললে, চল্, পথে দেখা যাবে। আমরা ভয় পেলাম। বাপুজী, এই সময় এল পীতম আর তার মামার বাডির গাঁযের ছোকরার দল। সব একবয়সী, চৌদ্দ পনেব ষোল নওজোয়ান হব-হব করছে। মুখে ফিনফিনে দাড়ি-গোঁফ। হাতে লাঠি। লাঠির ভিতর গুপ্তি। শিখদের কোমরে কৃপাণ।

পীতম বললে, চলো মেহ্‌মান। দেখা যাবে। এখনি চল না মেলার বাইরে দেখা যাক।

ওরাও এসেছিল মেলা দেখতে। ছোকরার দল। হিন্দু-মুসলমান-শিখ। এক এক গাঁও এককাট্টা একদল। ফরক নেই।

ফেরবার সময় পীতমদের দল গাঁও পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। গাঁওয়ের লোকেরা বললে, গাঁওয়ের ছেলে চল গাঁওয়ে চল।

পীতম বললে, নেহি। এই বউটা কই ডাকলে?

আমি মুখ টিপে হাসছিলাম। বললাম, ফিরে এস।

সে বললে, না। তুই বড হ্। গওনা হোক তবে নিতে আসব। গাঁওয়ে সরদার আমার উপর রেগে আছে, যাব না।

বলতে ভুলেছি বাপুজী, পীতম ফেরবার সময় তার ঘোড়ার পিঠে আমাকে চড়িয়ে নিজে একটা অন্য ঘোডায় চড়ে, পিছনে আমার ঘোড়াটাকে মেরে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমি ঘোড়ায় চড়তে জানতাম। কিন্তু বড় ঘোড়ায় এত জোব ছোটা ছুটিনি। আমি

দুই হাতে ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরে এসেছিলাম। দলের লোক খুব হেসেছিল। আমাদের ঘরের মেয়ের মধ্যে মা ছিল, বাবার চাচারে বহিন আমার ফুফু ছিল। তারা হেসেছিল বেশি। পুরুষ ছিল ফুফুর এক মামা। বয়েস অনেক, বুড়া। আমাদের দাদো, সে তো হো হো করে হেসেছিল।

এগিয়ে আসতে আসতে বলেছিলাম, ময় মর যাউঙ্গী।

সে বলেছিল, যা তু মর যা। এমনি যদি মরে না যাস তো তোকে খুন করে খাদে ফেলে দেব বলেই তো এনেছি।

বলে আমার ঘোড়াটাকে আর না মেরে থামিয়ে আমাকে নামিয়ে আদরের লাঞ্ছনায় আমায় নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল।

গাঁওয়ে আমরা ফিরলাম। তারা দলবল নিয়ে সেই রাত্রেই ফিরে গেল।

আমাদের গাঁওয়ে হাওয়া ফিরল। মুসলমান জাঠ সবাই গেল সরদারের কাছে। পীতমকে আসতে দেওয়া হোক। সে গাঁওয়ের ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে।

সরদারকে বলতে হলো, আচ্ছা বেশ।

আমার বাপ জামাইয়ের নামে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কিন্তু পীতম এল না। আসা হলো না। সে তখন ইস্কুলে পড়ছে। পীতমের দাদো বললে, লেখাপড়া শিখুক। গাঁওয়ে যাওয়া হবে না। গোঁয়ার চাষা বনে যাবে। বউকে বরং সময় হলে নিয়ে আসব। তাকে যেন তরিবৎ শেখানো হয়। পীতমকে ফৌজে ঢোকাব, আপ্‌সব করে ঢোকাব। এখানকার পড়া হলে কলেজে দেব ওকে, ফৌজী কলেজে।

বাপুজী, এইটুকু তোমাকে আমি বলিনি।

কেন জানি না, শবম লেগেছিল। না, ওই ঘটনাগুলোকে বলবার মতো মনেই করিনি। এসব কথা সেদিনও মনে হযেছিল তাতে খানিকটা শরম হযেছিল, আর নিজেই নিজেকে বলেছিলাম, এ আবার বলবাব মতো কথা নাকি ? ওসব তো শ্লেটের উপর খড়ির লেখার মতো। কত দুর্যোগের পানি বর্ষালো, কত আঁখের আঁসু ঝরল, তাতে ধুয়ে গেছে বেমালুম—বিলকুল। তবে এই শেষ চিঠি আমার, গোটা জিন্দিগীর জবানবন্দি। সত্যমিথ্যা সবকিছুর হিসাব ফিরিস্তি একটা কথা, বেশরমীর মতো বেহাযার মতো শোনাতে পারে তোমার কাছে, তবে দুনিয়ার মালিকের কাছে তো শরম নেই। শরম করলে চলবে না তাই বলছি, আমার জিন্দিগীতে পীতম শুধু দশ বছরের কনেব চৌদ্দ-পনের বছরের নামের বর নয়।

সে আমার জীবনেব সত্যিকারের দুর্দান্ত পুরুষ। তার নির্যাতন প্রহার সমাদর উপহারের কথা ধোয়া শ্লেটের কালো বুকে কেটে বসে যাওয়া দাগের মতো। অস্পষ্ট কিন্তু দাগ পড়েছে। এ কথাগুলো বলিনি তোমাকে। মনে পড়ছে তোমার, সেদিন যখন কথা বলেছিলাম তখন আমি মধ্যে মধ্যে থেমে থেমে বলেছিলাম। থেমেছিলাম এই কথাগুলোতে এসে। নিজে মনে করেছিলাম, একটি ভারী মিঠা কৌতুক বলে মনে হয়েছিল ; থেমে হিসেব করে কতটা বাদ দেব ভেবে নিয়ে ফের বলেছিলাম। প্রথম দিন যেদিন ঝুটা বাপের পরিচয় দিয়েছিলাম, এক শিল্পপাগল বিপত্নীক আমীর আমার

বাপ ছিল বলে (যেটা ইদানীং সর্বত্র দিতাম) সেদিন তোমাকে এই মেলার হুজ্জোতের কথাটা বলেছিলাম।

পরে যেদিন সত্য পরিচয় দি সেদিন বিয়ের কথা বলেছিলাম এই কথাগুলি বাদ দিয়ে। আমার এই জীবনের এই পালায়, যে পালায় বাপ-মা সবকিছুকে পিছনে ফেলেছি বাপুজী, তাদের চোখে দেখতে পেতাম, তাদের দুঃখ-কষ্ট সব চোখে দেখেও পিছনে ফেলেছি যেখানে সেখানে সেই গ্রাম্যজীবনের দশ-এগার বছরের অপরিণত নারীত্বের স্বাদ-স্মৃতির কতটুকু দাম ? তাই বলিনি।

তারপর লাগল হাঙ্গামা ; দেশ ভাগ হলো। আগুন জ্বলল ; কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানা এল। হিন্দুস্তানের জোয়ানেরা ছুটল রুখতে। আমাদের এলাকা জম্মু হলেও পাকিস্তানের সীমানা থেকে পাঁচ-সাত মাইল। কাশ্মীরের মধ্যেও হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া তখন। ও এলাকাও পাঞ্জাবের বেহদ্দ হয়ে গেল। গরীবদের দেশ ছাড়তে হলো। প্রথমে খবর এল, পীতমের দাদোর গাঁয়ে বড় হাঙ্গামা হয়েছে। দাদোর বাড়ি লুঠ হয়েছে। দাদো বন্দুক নিয়ে লড়াই করার সময় গুলি খেয়েছে। পীতম জখম হয়েছে। পীতমের বাপ ছুটল। আমার যাওযার মতো মন ছিল না, তখন ভয়ে সব কাঁপছি! পীতমের মাও যায়নি। দু'দিন পর খবর হলো ওরা এই দিকে এগুচ্ছে। হানা আসবে। আসছে। সকলে দেশ ছাড়ল। শুধু ভয় নয় বাপুজী। দেশে তখন সব হয়ে গেছে। গঁহু নেই, জোয়ার নেই, কাপড়া মেলে না। ভুখা—ভুখা—ভুখা। আর ভয়—ভয়—ভয়। ঠিক হলো—চল দেশ ছেড়ে। কোথায় ?

—হিন্দুস্তানের যেখানে হোক।

এলাম চলতে চলতে দেশ্‌শী। লালকিল্লা, জামা মসজেদ, কুতুব মিনার, দিল্লী ফটক, আজমীর ফটক, কাশ্মিরী ফটক, বাপরে বাপ।

বাসা হলো ফুটপাথে ; দিল্লীর রোদ দিল্লীর শীত ওই ফুটপাথে শুয়ে পোয়াতে লাগলাম। মনে আর কিছুই রইল না। শুধু ভিক্ষে। আর ভুখা। আর জীবনের দুঃখ। ধরম ইজ্জত সব তো চোখের উপর দেখলাম যেতে লাগল দামড়ির দামে। সরকার থেকে কিছু কিছু টাকা মিলত কখনও কখনও ; কিন্তু নিয়মিত টাকা মেরে দিত দালালে আর চোর লোকেরা। সরকারী লোকও তাদের সঙ্গে ছিল।

আজ এখান, কাল ওখান। ওই দালালেরাই চালান করত চুরির সুবিধের জন্য। আর লোক তো পঙ্গপালের মতো। দিল্লীতেও তখন হাঙ্গামা চলছে। আজ নেভে কাল জ্বলে। যখন জ্বলে তখন কিছু কিছু মুসলমান পালায় পাকিস্তান। আমরা এসে পড়লাম জি বি রোডের কাছে। গান গেয়ে ভিক্ষে করতাম। ক্রমে ক্রমে মনে আগুন ধরল। প্রথম ধরল বাপুজী, দিনের বেলা দিল্লীর সাজপোশাক-করা বেটীদের দেখে। একদিন কাছে একটা ইস্কুলে ওদের অভিনয় হচ্ছিল। আমি ঢুকে পড়েছিলাম কোন রকম গলে। দেখে মনে হলো, এয় খুদা, এই নাচগানের জন্যে এদের এত সাজ, এত রঙ, এত সরঞ্জাম, এত রোশনি! হায়, হায়, হায়! তারপর দেখলাম বাঈজীদের।

হায়, হায়, হায়! কি সুখ ওদের! কত আরাম কত মজা! আর আমি ঘুরছি পথে পথে।

একদিন গিয়ে ধরলাম সেই একটা লোককে যাকে দেখতাম বাঈজীদের বাড়িতে ঢোকে, বের হয়। সে আমাকে নিয়ে গেল এক প্রৌঢ় ব্যবসাদারনীর কাছে। রাখবে একে? ও নিজে বলছে, বাঈজী হবে। গান জানে বলছে, নাচও জানে। নাম বলছে হরিপীতম। এই ফুটপাথে থাকে। কাশ্মীরী।

বাঈজী হেসে বললে, মানে জানিস? বুঝিস?

বলেছিলাম, জানি।

—বল তো।

আমি তোমার মন্দ মেয়ে বাপুজী। আমি, মাথা হেঁট করে অবশ্য বলে দিয়েছিলাম।

সে বলেছিল, আচ্ছা। বহুত আচ্ছা।

তারপর প্রশ্ন করেছিল, ভয় করবে না?

—না।

—কিন্তু এতে পাবি কি?

—অনেক টাকা। ভাল কাপড় পোশাক।

—ঠিক আছে। আচ্ছা গান শোনা তো।

গান শুনে সে বলেছিল, একে এখন থেকে বরবাদ করিস নে। ওকে গানা শিখতে দে। এর হবে। ওর নাম দে রৌশন। বাপুজী, বরবাদ, একদম বরবাদ হয়ে যেতাম কিন্তু এই গান বাঁচিয়ে দিলে। বাপুজী লাল কুঁয়রের গল্প তখন জানতাম না। তা হলে সেদিন মনে মনে ভাবতাম, লাল কুঁয়র হব। তখন তো জানতাম না, আজাদ হিন্দুস্তান ডেমোক্রেটিক দেশ, এখানে বাদশা নেই সে আমলের মতো কিংবা কাশ্মীরের মতো রাজাও নেই।

এরপর পুলিশ হানা দিলে। উদ্ধার করে নিয়ে গেল।

তখন ঐ পরিচয় তৈরি করলাম। আমি এক শিল্পপাগল আমীরের বেটী। নইলে আবার যেতে হত সেই ফুটপাথে। উধম সিং জন্মদাতা বাপ, তার সঙ্গে তার দারিদ্র্যের জন্যে তার আগেই তো সম্পর্ক ছিঁড়েছি। আবার কেন? আর ফিরে যাওয়া যায়? বাঈজীর বাড়িতে তখন কিছু সাজগোজ রঙচঙ-এর স্বাদ পেয়েছি, সামনে দেখেছি সে যেন রঙমহলের দরওয়াজা খোলা। ভিতরটা ঝলমল করছে। সাড়ে দশ বছরে এসেছি দিল্লী। এখানে এসেছি এগার বছরে, তখন বয়স বারো। আর কয়েক বছর গেলেই ওই দরওয়াজায় ঢুকবার সময় হবে, একতিয়ার মিলবে। আমি ঢুকে গিয়ে রানী হয়ে বসব। এ স্বপ্ন ভাঙল। পুলিশ পাঠালে অনাথ আশ্রমে। সেখানে মেজাজ খারাপ হলো। পালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন মিলল একখানা পিতলের থালা, সেটা লুকিয়ে রেখে দিলাম; একটা পেরেক আর পাথর জোগাড় করে তাতে ছবি আঁকলাম। সেটা পড়ল অনাথ আশ্রমের মেট্রনের হাতে। সে বললে, আর কি পার? আমি খড়ি নিয়ে ছবি এঁকে দেখালাম।

এর থেকে বদলালো জিন্দিগী। পাঠালে ওরা রেফ্যুজিদের শিল্পশিক্ষার সেন্টারে। সেখান থেকে আর্টস ক্র্যাফ্‌টসের মাঝের তলায়। স্টাইপেন্ড মিলল।

শিখলাম এখানে, অনেক শিখলাম। বুদ্ধি ছিল, ওই কাজে দখল ছিল। তাড়াতাড়ি শিখলাম। আর শিখলাম সাজাপোশাক, নতুন জিন্দিগীর মানে। বাপুজী, এসব শিখতে আমার দেরি লাগেনি। জলদি জলদি শিখেছি। আর আমার মনের সাধ বেড়েছে। অনেক, অনেক চাই আমার। তার সঙ্গে শিখলাম মেয়েদের কাছে হাসতে চলতে, পুরুষদের নিয়ে খেলতে। ওঃ কি যে মজা, কি যে আনন্দ? ঠকাতে কি করে হয় জানতাম। ছেলেবেলাতে নিজে শিখেছিলাম। আবিষ্কার করেছিলাম সেই শিখ ছোকরাকে ঠকিয়ে। ও হয়তো সব মেয়েই জানে। কিন্তু সব মেয়ে তো আমার মতো মন্দ নয়। ওটাকেই পেশা করে না। সব মেয়েই একজন বা দু'জনকে ঠকায়। আমি আর্টস্‌ ক্র্যাফ্‌টসের সঙ্গে সাজগোজ, একালের সব রুচি সব রঙ-এর সঙ্গে, সব লোককে ঠকিয়ে এ দুনিয়ার কৌতুক রসে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাব বলে নেমে পড়লাম।

বাপ-মা ভুলে গেছি। সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না।

তুমি যেদিন মা বল সেদিন ভারী খারাপ লেগেছিল আমার।

হঠাৎ বাপুজী, আমাকে যেন কে টেনে ধরলে। ডুবে গিয়ে যেন জল খেলাম খানিকটা। চমকে গেলাম একদিন। আর্টস্‌ ক্র্যাফ্‌টস্‌ থেকে বেরিয়েই দিনকতক কাজ পেয়েছিলাম সরকারী ডেকরেশনের ইউনিটে। একদিন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একটা প্যান্ডেল সাজাবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ফাংশন ছিল। ডিফেন্স মিনিস্টার কয়েকজন জোয়ান আর অফিসারকে মেডেল দেবেন।

প্যান্ডেলে আমি আর ক'জন ছিলাম, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাজসজ্জা নিখুঁত করে রাখবার জন্য। এটা পড়ে যায়, ওটা সরে যায়, সেটা বেঁকে যায়, হেলে যায়, সেগুলোকে ঠিক করে দেবার ভার আমাদের। সব ক'টিই মেয়ে। তারা শোভাও বাড়ায়। খুঁটিতে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একের পর এক জোয়ানেরা এসে মেডেল ডেকরেশন নিচ্ছিল।

হঠাৎ শুনলাম, লেফ্‌টনান্ট পীতম সিং!

চমকে উঠলাম। পীতম সিং!

দেখলাম ছ' ফুট লম্বা জোয়ান। দাড়ি কামানো, সূঁচলো গোঁফ, সবল পদক্ষেপে এসে পায়ের জুতোয় জুতোয় খট শব্দ করে দাঁড়িয়ে মিলিটারী স্যালুট করলে। আমি দেখেছিলাম। আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কিসের একটা স্রোত বয়ে গেল। সে আগুনের স্রোত না হিমের স্রোত মনে নেই। কিন্তু নিদারুণ ভয় হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হলো সামনে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি যেন আমার মুখের উপর। কাঁধের নীচে সেই ছুরির দাগের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা অনুভব করলাম। আমি বেরিয়ে পালিয়ে এলাম। এবং ওই জন্যই আমার চাকরি গেল। তা যাক। পীতম আমাকে দেখতে পেলে খুন করবে। জীবনে যা করেছি তার জন্যে কোন অপরাধ-বোধ আমার ছিল না। বাপ উধম সিংকে দেখেও তা মনে হত না। কিন্তু পীতমকে দেখে আমার

যে ভয় হলো তার অর্থ ও ছাড়া আর কি হতে পারে। আমার যুক্তি তো সে মানবে না। যে ছুরি মেরে নিজের যুক্তিকে কায়েম করে তার সামনে অপরাধ মেনে দণ্ড নিতে হয়, নয় পালাতে হয়।

মনে আছে তোমার, তোঘলকাবাদে সেই কুলুঙ্গিতে বসে থাকা? তার কারণ শুধু হুঁচোট লাগা নয়। একদল জোয়ান এসেছিল সেদিন সেখানে। তোমার এও মনে আছে বোধ হয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখানে একদল জোয়ান এসেছিল তারা চলে গেছে? ওদের আমার ভাল লাগে না।

তুমি প্রতিবাদ করেছিলে।

যেদিন তোমাকে সব কথা বলে শেষ বিদায় নিয়ে আসি সেদিনও আমি রাস্তা দিয়ে একদল ফৌজের মার্চ দেখেছিলাম। দেখেছিলাম, পীতম আছে কিনা? অথচ পীতমের থাকার কথা নয়।

পীতমের তখন আর্মি থেকে চাকরি গেছে।

কেন জান?

কাশ্মীর শ্রীনগরে সে একজন আধুনিকা তরুণীর হাত চেপে ধরেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, কে তুমি? কি নাম তোমার?

সে তাকে ধমক দিয়েছিল, ছাড অসভ্য কোথাকার!

—নাম না বললে ছাড়ব না।

মেয়েটির চেঁচামেচিতে লোকজন আসে। মিলিটারী পুলিশ আসে। তাকে অ্যারেস্ট করে। সে বলেছিল, ওর নাম হরিপীতম, আমার স্ত্রী, হারানো স্ত্রী। ওর বুকে আমার নাম লেখা আছে উল্কিতে—পীতম।

কোর্টমার্শালে পীতমের শাস্তি হয়। চাকরি যায়।

আমার ভয় বেড়ে গিয়েছিল বাপুজী। পীতম হরিপীতমকে আজও খুঁজছে। তাকে কে বোঝাবে হরিপীতম জন্মান্তরে রৌশন হয়ে জন্মেছে। আগের জন্মের স্বামীত্ব আর এ জন্মে দাবি করা চলে না। কোন মুলুকে কোন আইনে নেই। বিধাতাও এ দাবি স্বীকার করেননি। এ হয় না।

আমি এর পর দিল্লী থেকে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হলাম। কোথায় যাব? বম্বে। সিনেমায় যদি নামতে পাই! তা হলে সব পাব। সব। অর্থ পাব সুখ পাব, তামাম লোকের মনোহারিণী প্রিয়া হব।

দাদাসাহেব আমার পরম উপকারী। তুমি স্নেহ করেছ। দাদাজী করুণা করেছে, উপকার করেছে। চিঠি নিয়ে বম্বে গেলাম। পার্ট পেলাম। ছোট পার্ট। গাঁয়ের গল্প, এক চাষী বউয়ের পার্ট। নায়িকার ভাইয়ের বউ। ঘরে ননদ এবং অন্য মেয়েদের সঙ্গে একটু নাচও ছিল।

পার্ট আমার ভাল হলো না। কিন্তু তবু দমলাম না। ঘুরতে লাগলাম। অনেক মূল্য দিলাম। অনেকজনের সঙ্গে ড্রিংক করতে হলো, মোটরে বেড়াতে হলো। হোক, পার্ট আমার চাই।

হঠাৎ একদিন বাপুজী সমুদ্রের ধারে জুহুতে ছবির রাজ্যের একজনের সঙ্গে পরিহাস লাস্যের স্তাবকতা করছি, সে এসে সামনে দাঁড়াল।

আমি বিবর্ণ হয়ে গেলাম।

—হরিপীতম!

চোখে গগল্‌স্‌টা পরে বললাম, কি বলছ? কাকে বলছ!

—তোমাকে? তুমি হরিপীতম।

—না।

—তোমার নাম তো রৌশন...ছবিতে বহু সেজেছ? তাই বা বলতে হবে কেন! তুমি হরিপীতম। তোমার বুকে আমার নাম লেখা আছে।

সে হাত বাড়িয়ে ধরলে আমার জামা। বাধা দিলে আমার সঙ্গী। একটা ঘুষি মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে আমার জামা ধরে টানলে, আমি প্রমাণ বের করব। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। একা তার কত শক্তি! সে চেঁচাতে লাগল, দুনিয়া ঢুঁড়ছি ওর জন্যে। আমি নরকে যেতে হয় যাব। ছাড় আমাকে। চিৎকার করে ডাকলে, হরিপীতম! হরিপীতম!

গোলমালের মধ্যে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালাম। শুধু জুহু থেকে নয়, বম্বে থেকে। খবর অবশ্য পেলাম, পুলিশ আমার খোঁজ করছে। সাক্ষী দিতে হবে। আমি পালিয়ে গেলাম কলকাতা। তাতে মামলা আটকাল না। মারপিট এবং আমার হাত টানার সাক্ষীর তো অভাব হয়নি। ওর জেল হয়ে গেল আট মাসের!

সে বলেছে শুনলাম আদালতে, হরিপীতম আমার স্ত্রী, তাকে আমি খুঁজছি। সে আমার কাছ থেকে পালাচ্ছে। আমি তাকে সেদিন ধরেছিলাম। তার বুকে আমার নাম লেখা আছে পীতম। আমার বুকে তার নাম হরিপীতম। তাকে পেতে যে দণ্ড নিতে হয় নেব। স্বর্গ-নরক যেখানে সে যাবে তার পিছন পিছন যাব। তাকে না পেলে আমার জীবন মরুভূমি। পেতেই হবে তাকে আমাকে।

আট মাস জেল শুনে সে বলেছিল, বহুৎ আচ্ছা, আট মাস পর তাকে ধরব আমি, যদি শুনি সে মরেছে তবে আমিও মরে তার পিছনে ছুটব।

বাপুজী, আমার সারা জীবনটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে গেল সেই দিন। আট মাস আগে। নিরাশ্রয় হয়ে পথে দাঁড়ালাম। যেন সেই দিল্লীতে এসে সেই ফুটপাথের ধারে বাসা বাঁধলাম মনে মনে।

তোমাকে বলেছিলাম, আমি কারুর জন্যেই, মা-বাপ সে যেই হোক, কারুর জন্যেই ওদের জীবনে ফিরে যেতে পারি না। পারব না। কেন যাব? অর্থহীন। আমি মডার্ন মন্দ মেয়ে রৌশন বাপুজী, সেই আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, বাপুজী, দুনিয়ায় মেয়েরা বাপ ভুলতে পারে, মা ভুলতে পারে, সন্তানও ভুলতে পারে কিন্তু তার সেই দিলের আদমী প্রাণের পুরুষকে ভুলতে পারে না। দয়া মায়া স্নেহ মমতা সব ভোলা যায় ভুখের রোটীর জন্যে, দুনিয়ার সুখের জন্যে, আরামের জন্যে, খাতিরের

জন্যে, ভোলা যায় না মহব্বতি, যে প্রেম পুরুষের পৌরুষ সাহস শক্তি প্রতিষ্ঠা আর ওই মেয়ের জন্য সব দিতে পারার ত্যাগ স্বীকার দিয়ে জড়ানো।

বাপুজী, আমার মন-প্রাণ চিৎকার করতে লাগল, পীতম—পীতম—পীতম! পীতমকে চাই। পীতমকে চাই। পীতম!

মনে করলাম জেলে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু সাহস হলো না। বম্বে গিয়ে ফিরে এলাম। এসে করলাম কি জান?

সাহাদারার ওই দিকে গিয়ে গাঁয়ের মেয়ের জীবন অভ্যাস করতে লাগলাম। লম্বা চুল রেখে শুরু করলাম গাঁয়ের জীবন। হরিপীতম পীতম সিংয়ের স্ত্রী।

কিন্তু পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না। সহ্য হয় না, হলো না। আমার তপস্যা সিদ্ধ হলো না। এই জীবন ছাড়তে পারছি না। নানান মানুষ এমন ভাবে আমাকে এই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে, তারা টানছে। যেমন সেইদিন রাত্রে হোটেলে এক বদমাস আমাকে জড়িয়েছিল। নানান অভ্যাস আমাকে বেঁধেছে। দেবে না। তারা আমাকে পীতমের কাছে যেতে দেবে না। আমি কি করব?

কাল সে খালাস পাবে। আমার হিসেব সঠিক। রেমিশন বাদ দিয়ে হিসেব করেছি। আজ সাত দিন ভাবছি, কাঁদছি।

পীতমকে পেতেই হবে। মহব্বতি ভোলা যায় না!

কিন্তু এ জীবন আমাকে ছাড়বে না।

তাই জীবন থেকে ছুটি নেব: সংকল্প স্থির হতেই মন শান্ত হয়ে গেল। উঁচু থেকে নীচে নামতে হবে তো। তাই কুতুব থেকে—।

নমস্তে পিতাজী!

তোমার মন্দ মেয়ে
রৌশন

কেটে দিয়ে লিখেছে, হরিপীতম!

প্রেম ও প্রয়োজন

□●□

মাঝখানে দালাল দাঁড়াইয়াছিল মহাজন কড়ি গাঙ্গুলী। সেই এহেন অঘটন ঘটাইল, তাহারই যোগাযোগে রমণদাস বিক্রয় করিল। রমণদাস দাম পাইল মন্দ কি ?

কড়ি গাঙ্গুলীর নিকট হইতে পাঁচশো টাকার বন্ধকী দলিলখানা ফেরত পাইল, আমডহরার জোতে বিঘা সাতেক জমি, আর হালের জন্য একজোড়া গরু। তবে ভবিষ্যতের আশা বিপুল। রমণ সেই আশাতেই ভোর হইয়া কাজটা করিল। কড়ি গাঙ্গুলী বোলেচালে ভবিষ্যৎটিকে রমণের চোখের সম্মুখে সুপ্রত্যক্ষ উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে রমণদাসের কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়া বেশ মিঠা হাসির রেশ ফুটিয়া উঠিল। লোহা নরম হইয়াছে দেখিযা কড়িও সঙ্গে সঙ্গে ঘা দিয়া বসিল, কহিল—হবে কি ? সেদিন মনে কর তোর হয়েছে। কাল দেখবি যখন জুড়ি গাড়ি এসে তোর দোরে দাঁড়াবে।

রমণদাস মুগ্ধ হইয়া গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিয়া বসিল। ঘরে স্ত্রী ক্ষুণ ক্ষুণ করিতেই সে গাঙ্গুলীর কথাগুলিই তাহাকে সাড়ম্বরে বুঝাইয়া দিযা বলিল—কথাটা একটু তলিয়ে বুঝিস, বুঝলি মাগী—তলিযে বুঝিস। নইলে মাটি আর গরুর জন্যে কি রমণদাস মেয়ে বিক্রি করে ?

—রমা যেদিন গয়না পরে গাড়ি চড়ে বাড়ির দোরে এসে নামবে সেই দিনই দেখবি। আর গাঁয়ের লোক যেদিন সুপারিশের জন্য এসে জ্বালাতন করবে সেই দিন বুঝবি। ঐ কড়ি গাঙ্গুলী, ওকেও আসতে হবে, দেখিস তুই—ও-ও এসে বলবে 'দাস, রমাকে বলে ওই কাজটা আমায় করিয়ে দিতে হবে।' না হয় আমার দুটো কান তোর বঁটি দিযে কেটে দিস। কথাগুলো পরে না বোঝে তুই বুঝিস।

পরে পাঁচজনেও নির্বোধ নয়, সে কথাটা তাহাবা বেশ বুঝিয়াছিল কিন্তু পরের ঈর্ষা করা নাকি মানুষেব স্বভাব। তাহারা রমণদাসের নিন্দার আর বাকি রাখিল না। পাড়াগাঁয়ে সংবাদপত্রের অভাব আছে সত্য কিন্তু সংবাদদাতার অভাব নেই। রমণের বন্ধু হেলু মণ্ডল আসিয়া কহিল—আর দাদা, এরই মধ্যে শালাদের ছটফটানির আর অন্ত নেই।

রমণদাস পুলকিত হইয়া কহিল—কি রকম, কি রকম শুনি।

হেলু কহিল—শালারা সব রাতারাতি ধম্মের গাছ হয়ে উঠেছে। কেউ ধম্ম দেখাচ্ছে, কেউ বলছে পতিত করব। মাগীগুলোর তো ঘাটে পথে ঐ কথা ছাড়া আর কথাই নেই। গালে হাত দিয়ে সব বলছে—হায় কলিকাল,—বিধবা মেয়ে, অ্যা!

রমণদাস হাসিতে শুরু করিল—কি বলছে, পতিত করবে, না ? হি-হি-হি। ধম্ম—না কি ভায়া অ্যা-হি-হি-হি।

সে হাসি তাহার আর শেষ হয় না। স্তরে স্তরে গমকে গমকে বাহির হইতে শুরু করিল। হেলু উঠিয়া গেল। তখনও সে মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছিল। হাসিতে হাসিতে সে তাহার স্ত্রীর নিকটে আসিয়া অতি বিস্তারে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিল—দেখলি মাগী, বলেছিলাম কি না? দেখলি, এরই মধ্যে শালাদের উসখুসুনি।

গোবরে পদ্ম ফোটে না, কিন্তু গরিবের ঘরে নীচ জাতির মধ্যে রূপ দেখা যায়। রমণদাস জাতিতে নিম্নবর্ণ; অবস্থায় দরিদ্র, কিন্তু তাহার কন্যা রমা রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে রূপ অপরূপ না হইলেও সুরূপ তাহাতে সন্দেহ নেই। রমাকে কাহারও একবার দেখিয়ে আশ মেটে না। বারবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

এই রমাই বিক্রয় হইল। ক্রয় করিলেন এই অঞ্চলের জমিদার মহেন্দ্রবাবু। বিপত্নীক জমিদারের বালক পুত্রকে প্রতিপালন করিতে একটি নারীর প্রয়োজন ছিল।

পত্নীবিয়োগের পর বাবু আর বিবাহ করিলেন না। বিগতা ভাগ্যবতী পত্নীর প্রতি প্রেম তাহার একটা কারণ হয়তো বটে, কিন্তু আরও একটা কারণ ছিল। মহেন্দ্রবাবু সেটা নিজ মুখেই বলিয়া থাকেন।

—কি হবে আবার বিয়ে করে? আবার কতকগুলো ছেলেপিলের পাল বাড়ানো তো? সম্পত্তি টুকরো টুকরো করে কেটে ভাগ হবে। ও আমি পছন্দ করি না। বেশি কতকগুলো ছেলে-মেয়ে—ও হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ।

চাঁদের কলঙ্করেখার মতো ঐশ্বর্যের সঙ্গে সত্যের এ দাম্ভিকতা মানায় ভাল। সুতরাং পুত্রের জন্য এখন একটি নারীর প্রয়োজন হইল।

কড়ি গাঙ্গুলী ওরফে এককড়ি গাঙ্গুলী বাবুর মহালের মধ্যে মহাজনী কারবার করিয়া থাকে। বাবুর অনুগত বুদ্ধিমান লোক সে। বুদ্ধিমান কড়ি চট করিয়া বাবুর এই প্রয়োজনটির গুরুত্ব অনুভব করিল। বিজ্ঞাপন না দিলেও এই নারীটির কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ প্রয়োজন তাহাও সে অনুমান করিয়া লইল।

এদিকে রমণদাসের খতখানা যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে। আবার রমাও ভাসিয়া যাইতেছে। সবদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে অনুভব করিল এই সুযোগে রমার একটা গতি করিয়া দিলে সব সমস্যাই অতি সহজে মিটিয়া যায়। কারণ বাবুর মনে মনে ছকা বিজ্ঞাপনের নারীমূর্তিটির সহিত রমা যেন খুব ভাল মিলিয়া যাইতেছে। ভরসা করিয়া গাঙ্গুলী উঠিয়া পড়িল।

রমণদাসকে রাজী করিয়া সেদিন সে রমাকে লইয়া বাবুর দরবারে হাজির হইল। অজুহাত একটা নালিশের। বিধবা রমাকে দেবর ভাসুর খাইতে দেয় না, বিষয়সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই। নালিশ তাই লইয়া, খোরপোশ কিংবা বিষয়ের ভাগ রমাকে পাইতে হইবে।

মহেন্দ্রবাবু তখন তাঁহার খাস বৈঠকখানার কামরায় বসিয়াছিলেন। জনা দুই কর্মচারী সম্মুখের টিপয়টার উপর কতকগুলি খাতাপত্র ফেলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতেছিল। গাঙ্গুলী আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তারপর পিছনের পানে উদ্দেশ করিয়া একটা শোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

আয় আয়,—এগিয়ে আয়। পেন্নাম কর পেন্নাম কর। সিঁড়ির নীচে উঁচু দাওয়ায় দেওয়ালের আড়ে দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। গাঙ্গুলীর হাঁকে সে কয় পা অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইয়া গেল। গাঙ্গুলী আশ্বাস দিয়া কহিল—ভয় কিসের রে বাপু? কান্নাই বা কিসের? বাবুর পায়ে গড়িয়ে পড়, সব উপায় হবে তোর।

রমা কিন্তু আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাঙ্গুলী বিরক্ত হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল—চল ফিরে তোর বাবার কাছে। বাবা কি বলে দিলে তোকে? পায়ে চেপে ধরতে বলে দেয়নি? দয়া কি মানুষের অমনি হয়? বাবা তোর আর ভাত দেবে না তা মনে থাকে যেন।

রমা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—সম্পত্তি তারাই ভোগ করুক কাকা, আমি খেটে খাব। বাবুর সামনে আমি যেতে পারব না।

সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। কড়ি গাঙ্গুলী খাঁটি বাস্তব রাজ্যের লোক, সে রমার এই আকুলতা আমলেই আনিল না। একরকম জোর করিয়াই রমাকে সে মহেন্দ্রবাবুর সম্মুখে আনিয়া কহিল—পেন্নাম কর, পায়ের ধুলো নে।

কড়ি গাঙ্গুলীর হাঁকে ডাকে সকলেই একটা কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। কিন্তু এমনটি কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

হরিণীর মতো শঙ্কিতা, অতি কোমল ফুলের মতো একটি নারী। জটিল বিষয়-তত্ত্বটির যেন খেই হারাইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু মেয়েটির মুখ হইতে দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারেন না। কর্মচারী দুইজনও চকিতের মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। মহেন্দ্রবাবু অকারণে নড়িয়া-চড়িয়া ভাল হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর কড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, কি হয়েছে এর? বস তুমি।

কড়ি এতক্ষণে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিল—কাজটা শেষ হোক আপনার।

মহেন্দ্রবাবু কড়ির মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, হুঁ। তারপর আর একবার খাতাপত্রগুলি টানিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কিন্তু জটিল বিষয়টি আরও যেন জট পাকাইয়া বসিয়া আছে। সহসা হাতের পেন্সিলটি ফেলিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—এর পরে নিয়ে এসো। নিজেরা আগে ভাল করে বুঝে তার পরে বোঝাতে এসো।

কর্মচারী দুটিও বাঁচিল। তাহারা নিঃশব্দে খাতাপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। সিঁড়ির পথে নামিবার সময় তাহাদের চোখে চোখে কি একটা কথার আদানপ্রদান হইয়া গেল। এও একটু হাসিল, ও-ও একটু হাসিল।

মহেন্দ্রবাবু গাঙ্গুলীকে কহিলেন—কি, ব্যাপার কি?

গাঙ্গুলী রমাকে বলিল—বল, বাবুকে সব খুলে বল।

কিন্তু রমা যেন মূক হইয়া গিয়াছে।

গাঙ্গুলী একটা ধমক দিয়া কহিল—বল না রে বাপু।

রমা কিছু কহিল না। মহেন্দ্রবাবু গাঙ্গুলীকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন—তুমিই বল না হে বাপু। ছেলেমানুষকে এ রকম ধমক দিচ্ছ কেন?

ধমক খাইয়া গাঙ্গুলীর ছাতিটা দশহাত হইয়া উঠিল। আড়ম্বর করিয়া নালিশের বিবরণ সবিস্তারে গোচর করিয়া কহিল—এখন হয়েছে কি জানেন, হতভাগীর একূল-ওকূল দুকূল যেতে বসেছে। এক কূল খেলে কপাল, অন্য কূলে ভাই-ভাজ দিচ্ছে কাঁটা। বাপ-মা তো আর ফেলতে পারে না। কিন্তু ভাই-ভাজের সে সহ্য হয় না। আর তারা পুষতেই বা পারবে কোথায় বলুন। আমার কাছেই তো পাঁচশো টাকা দেনা। বাড়ি-ঘর পর্যন্ত বন্ধক রয়েছে। এখন আপনার চরণে এনেছি, ভাসিয়ে দিতে হয়, কিনারা করতে হয়—যা করতে হয় আপনি করুন।

মহেন্দ্রবাবু কাঁচা লোক নন। বিষয় জট পাকাইতে তাঁহার মতো তীক্ষ্ণধী লোক এ অঞ্চলে আর নেই। জলের ধারে দাঁড়াইয়া তিনি অথই জলের মাছের সন্ধান করিতে পারেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আবার একবার গাঙ্গুলীর মুখের পানে চাহিলেন। তারপর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, শোন—এদিকে।

অন্তরালে গাঙ্গুলীকে কহিলেন, তোমার কি চাই বল।

ভূমিকা তিনি ভালবাসেন না। পরিষ্কার সোজা কথা তাঁহার। গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইয়া একটু আমতা আমতা করিতেই তিনি সোজাসুজি কহিলেন—তোমার চেয়ে ঢের বদমাস আমি গাঙ্গুলী, তোমার মতলব কি খুলে বল দেখি।

গাঙ্গুলী প্রথমেই ধমক খাইয়া একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সে কতকগুলা অসংলগ্ন কথা জড়াইয়া একটা অর্থহীন উত্তর দিয়া বসিল—আজ্ঞে তা ওর বাপ-মা—

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—ওর বাপ-মায়ের দোহাই ছাড়ো। সে থাকলে তো ওর বাপকেই তুমি এখানে আনতে পারতে। ওকে নিয়ে এলে কেন?

—আজ্ঞে ওর নালিশ, ও বাদী—

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—বাদী বিবাদী সাক্ষী সমন উকীল আদালত ওসব ছাড়ো। তোমার নিজের কথা বল। কি চাই তোমার? সেই টাকাটা উদ্ধার তো?

গাঙ্গুলী হাত জোড় করিয়া কহিল—আজ্ঞে এব বাপও পাঁচশো টাকা ধারে।

বাবু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—অর্ধেক পাবে, আড়াই শো টাকা। খত ওর বাপকে দিতে হবে। আর যা দিতে হয় সে দেব আমি। ও থাক আমার বাড়িতে, ছেলেটাকে মানুষ করবে।

গাঙ্গুলী বাকিটা আর বাবুকে কহিতে দিল না; কৃতজ্ঞতার কলরব তুলিয়া বাবুকে নির্বাক করিয়া দিয়া কহিল—দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, সে তো ওর ভাগ্যি, মহাভাগ্যি। নে নে রমা, পেন্নাম কর, পেন্নাম কর। হতভাগা মেয়ে ইদিকে আয়। সে হিড়হিড় করিয়া রমাকে ওপাশ হইতে টানিয়া আনিয়া বাবুর সামনে আবার দাঁড় করাইয়া দিল। প্রণাম করিবার হেতু বুঝিবার কোন প্রয়োজন রমার ছিল না। দুনিয়াতে সে পায়ের তলাতেই তো পড়িয়া আছে। আজ্ঞামাত্র প্রণামও সে করিল। কিন্তু ভাগ্য যে তাহার

সহসা কেমন করিয়া সৌভাগ্য হইয়া উঠিল তাহা সে বুঝিল না। সে তো জানে ভাগ্য তাহার দগ্ধ হইয়া গেছে। পোড়াকপালী যে তাহার ডাকনাম! একান্ত সরল বিস্ময়ে রমা তাহার ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া বামুনকাকার পানে চাহিল। বামুনকাকা গদগদ হইয়া কহিল—রাজার মা, তুই রাজার মা হলি রমা। খোকাবাবুকে মানুষ করবি, এখানেই থাকবি। না বিইয়ে গোপালের মা হয়েছিল এক যশোদা আর সেই ভাগ্যি হলো তোর।

এ সংবাদে রমার বঞ্চিত চিত্তে একটা উল্লাস জাগিয়া উঠিল। সে উল্লাসের একটি তরঙ্গ তাহার অধরের তটরেখায় মৃদু উচ্ছ্বাসে দেখা দিল। মহেন্দ্রবাবু রূপের এই নব বিকাশে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গাঙ্গুলী বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল—তা হলে আজ আসি হুজুর।

একাগ্রতাভঙ্গে বাবু একটু চকিত হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন—মেয়েটি তাহলে বাড়ির ভেতরে যাক।

জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—ওর বাড়িতে একবার বলা দরকার তো। তা কাল-পরশু যেদিন হোক আমি নিজে এসে—

বাধা দিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—পরশু নয় কাল। কালই ওকে তুমি নিয়ে আসবে। আর শোন, এদিকে এসো।

আবার অন্তরালে গাঙ্গুলীকে লইয়া কহিলেন—বেশি চাল চালতে যেও না গাঙ্গুলী। তাহলে হবে সবই, মধ্যে থেকে মরবে তুমি। বুঝলে—

গাঙ্গুলী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ, সর্বনাশ। দেখুন দেখি আমার ঘাড়ে কি দশটা মাথা গজিয়েছে নাকি? কালই আমি ওকে নিজে সঙ্গে করে এনে রেখে যাব।

বাবু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—আচ্ছা।

আর নেহাত যদি কাল না হয় তবে পরশু।

বাবু কহিলেন—হুঁ—যাও।

গাঙ্গুলী কিন্তু গেল না। দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বাবু কহিলেন—হ্যাঁ—তাহলে আজ যাও।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গাঙ্গুলী আবার ফিরিল। এবার যেন মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল—আজ্ঞে আমার টাকার ব্যবস্থাটা তা হলে—

মহেন্দ্রবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া কহিলেন, ভয় নেই, সে হবে। তোমার দায়ে আমি ইনসলভেন্সি নেব না। ও যদি কাল এখানে আসে তো পরশু তোমার ব্যবস্থা হবে। টাকাটা যে দেব সে আমি ওর সম্পত্তির দাম থেকে দেব। ও এসে ওর স্বামীর সম্পত্তি আমাদের লিখে দেবে। সেই দাম থেকে তুমি টাকাটা পাবে। তারপর ওর দেওর ভাসুরের সঙ্গে বুঝে নেব। নইলে মানুষ কেনা তো আমার ব্যবসা নয়।

গাঙ্গুলী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তারপর আবার বাবুকে গিয়া কহিল—ও

আর বাড়ি গিয়ে কি করবে? আজ থেকেই এখানে থাক। আমি বাড়ি গিয়ে সব বলবখ'ন।

বাবু কহিলেন—না যাক, একবার ঘুরেই আসুক।

বেশ প্রসন্ন মন লইয়া গাঙ্গুলী ফিরিতে পারিল না। দেনাপাওনার সংসারে সে ধারে কারবার পছন্দ করে না। অন্তত ধারে দেওয়া গাঙ্গুলীর নীতি নয়; দোকানী গুপো দত্তর কথাটা তাহার খুব ভাল লাগে। দোকানে ধার চাহিলে সে বড় বড় গোঁফ জোড়াটা নাড়িতে নাড়িতে সবিনয়ে কহে—বিলাত ফেলতে আমি পারব না বাবা। বিলাত এখান থেকে অনেক দূর। সে যাবার ক্ষমতা আমার নেই।

ধার দেওয়াকে গাঙ্গুলীর দেশে বলে বিলাত ফেলা। গাঙ্গুলীও মনে মনে তাহার এই বিলাতের কথা ভাবিতেছিল। তাহার বিলাত যাইতে তো লাগিবার কথা একদিন। কিন্তু মধ্যের ব্যবধানে সমুদ্র যদি অকস্মাৎ পরিধিতে বাড়িয়া যায়! কিংবা ফাঁপিতে থাকে, তবে? লাল কাঁকর বিছানো সরকারী পাকা রাস্তা বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরিয়া বিসর্পিল গতিতে চলিয়া গিয়াছে। দুই পাশে শ্যাম শোভাময় অবারিত মাঠ। উপরে আকাশ প্রসন্ননীল। আশ্বিনের প্রথমেই আউশ ধানের সদ্যোদ্গত মঞ্জরীগুলি হইতে একটি হৃদ্য মৃদু গন্ধ উঠিতেছে। শরতের রৌদ্রের একটি সুপ্রসন্ন শুভ্রতা মানুষের চিত্তে অকারণে উল্লাস জাগিয়া তোলে। রমার চিত্তেও ঠিক এমনি মৃদু উল্লাস জাগিয়া ছিল। রাস্তায় ঠিকাদারের লোক রাস্তা মেরামত করিতে লাগিযাছে। সাঁওতাল পুরুষ-নারী সব, সকলের সবল কালো দেহে সুস্থতার একটি স্নিগ্ধ আনন্দ।

রুক্ষ চুলে জবাফুল গোঁজা, দৃঢ় দেহের সবল লীলায়িত গতির সঙ্গে সঙ্গে জবার শীষগুলি তালে তালে নাচিতেছে।

রমার বেশ লাগিল এদের। একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ার তলায় একটি নধরকান্তি শিশু একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের উপব শুইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতেছিল। তাহার মা আসিযা কৃত্রিম কোপে আপন ভাষায় তিরস্কারের মধ্য দিয়া তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। শিশুটি পরমানন্দে জননীর বুকভরা স্নেহধারা পান করিতে আরম্ভ করিল। মায়ের বুকের খাটো কাপড়খানি অবোধ শিশুর হাতের টানে খসিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কোন সংকোচ নেই মায়ের। লজ্জা যেদিক দিয়া মানুষের মনে আসে, জননীটি বোধ করি সেদিকের পানে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল।

রমা বার বার মুখ ফিরাইয়া ওই মা ও শিশুটিকে দেখিতেছিল। গাঙ্গুলীকাকা বড় খরগতিতে চলিয়াছে, নতুবা দাঁড়াইত সে ঐ গাছতলাটিতে। চলিতে চলিতে রমা সহসা প্রশ্ন করিল—বাবুর ছেলেকে দেখেছ তুমি কাকাঠাকুর? কাকাঠাকুর তখনও মনে মনে বিলাতের দূরত্ব সীমা জরীপ করিতেছিল। তবু সে অন্যমনস্কভাবেই কহিল—হুঁ!

—খুব সুন্দর না?

—হুঁ।

—কত বড় বটে?

কাকাঠাকুর আর কথা কহিলেন না।

রমা আবার প্রশ্ন করিল—আমাদের ঘেঁটুর মতো?

গাঙ্গুলী সহসা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—বকবক করে বকিস নে বাপু। এত বেহায়া তুই তা আমি জানতাম না। গলায় দড়ি দিস একগাছ।

এ তিরস্কারে মেয়েটির মৃদু আনন্দটুকু নির্বাপিত সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোর মতো মিলাইয়া গেল। বড় বড় চোখ দুটির বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া রমা এককড়ির পানে চাহিল। বিস্মিত বিষণ্ণ সে দৃষ্টি। বাক্যের রূঢ়তায় সে আঘাত পাইয়াছিল। আর সবিস্ময়ে সে ভাবিতেছিল গলায় দড়ি দিবার মতো বেহায়াপনা সে কি করিল!

মাথা অবনত করিয়া সে গাঙ্গুলীর পিছনে পিছনে চলিয়াছিল। চোখের জল যদি পড়ে তবে মা ধরণী সে অপরাধ তাঁহার আপন বুকে লুকাইবেন।

এ শিক্ষাটুকু রমা নিজে অর্জন করিয়াছে, কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় নাই।

বাবুব বাড়িতে ঢুকিয়া রমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঐশ্বর্যের এমন প্রদীপ্ত আত্মপ্রকাশ সে আর কখনও দেখে নাই। তাহাদের গ্রামের চাটুজ্যেদের ছোট ছেলে কলিকাতায় কাজ করে। তাহার ঘর দেখিয়া তাহার কত আনন্দ হইত। ঘরটিতে একখানি তক্তপোশ, দেওয়ালে ছোট-বড় কতকগুলি ছবি টাঙানো। বাক্সগুলি বৃন্দাবনী ছিটের ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা থাকে। ছোট একটি টুলের উপর একটি কলেব গান।

আর এখানকাব প্রতিটি জিনিস এত উজ্জ্বল যে স্পর্শ কবিয়া দেখিতে বমাব ভয় হইল। সাপের জিভের মতো একটি সূক্ষ্ম দীপ্ত রশ্মি যেন বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ঘরের মেঝেগুলো এত পিছল আর শীতল যে বমা চমকিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ নাই। সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া মেঝেটায় হাত বুলাইয়া দেখিল। কই, জল তো হাতে লাগে নাই। সে সবিস্ময়ে মেঝের উপর আবাব হাত বাখিয়া মর্মবেব শীতলতা অনুভব করিল।

কে পিছন হইতে কহিল—কি করছ?

পিছন ফিরিয়া রমা দেখিল ও বাড়ির নলিনী দিদিমণি।

এই নলিনী দিদিমণিই খোকাবাবুকে এতদিন মানুষ করিতেছিল। নলিনী দিদিমণি নাকি ডাক্তারি-পাশ-করা মেয়ে। গিন্নীমায়ের অসুখের সময় সে এখানে আসিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পব খোকাবাবুকে মানুষ করিবার জন্য তাহাকে রাখা হইয়াছিল। এখন আবার তাহাকে বাবুর ডাক্তারখানায় কাজ করিতে হইবে।

সলজ্জ বিস্ময়ে সে মৃদুস্বরে কহিল—এত ঠাণ্ডা!

—মার্বেল পাথর কিনা। মার্বেল পাথর ভারী ঠাণ্ডা হয়। এখানে সব ঘরেই মার্বেল দেওয়া আছে। ঘবে চলো না, দেখবে এখন মার্বেলের বেদী। গরমের সময় শোবে, দেখবে কত আরাম।

নলিনী হাসিল।

রমা সবিস্ময়ে নলিনীর পানে চাহিল। সে মার্বেল পাথব কি তাহা তো জানে না। কিন্তু সে প্রশ্ন করিতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল।

নলিনী কহিল—এস, তোমায় সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিই। আমার ওপর আবার ভার পড়েছে।

চলিতে চলিতে নলিনী আবার কহিল—জান তো একজনের জবাব হলে তাকে কাজের ভার নতুন লোককে বুঝিয়ে দিতে হয়।

রমা জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

নলিনী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। রমাকে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কসাইয়ের কাছে জানোয়ার-বাচ্চা সুন্দর হলে কি আসে যায়?

কাহাকে কি উদ্দেশ্যে কথাটা নলিনী বলিল রমা বুঝিতে পারিল না।

সে কহিল—কি বলছ দিদিমণি?

—বলছি, ভগবানের বিচারের কথা। কসাইয়ের সঙ্গে ভগবানের কোন তফাত নেই।

রমা কহিল—ছিঃ, ঠাকুর-দেবতাকে অমন কথা বলতে নেই।

নলিনী হাসিয়া কহিল—আর বলব না। এস এখন যা করতে চলেছি তাই করি।

সমুখের ঘরখানায় ঢুকিয়া রমা অপূর্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। দেওয়ালের এমন সুন্দর রঙ। আকাশের রঙের সঙ্গে কোন তফাত নেই। তাহার মধ্যে আবার এমন সুন্দর লতা পাতা ফুলের সারি। নলিনীর অলক্ষ্যে সে চট করিয়া একবার দেওয়ালে হাত বুলাইয়া দেখিল। নলিনী তখন কলের পাখা দেখাইতেছিল। কেরোসিন তেলের জোরে নাকি পাখাটা আপনি ঘোরে।

দেওয়ালের গায়ে এত বড় বড় ছবি রমা আর কোথাও দেখে নাই। একটায় যেন ঠিক সূর্য উঠিতেছে। আবার একটায় আকাশের গায়ে ঘন মেঘ জমিয়াছে। মেঘের প্রতিটি স্তর দেখা যাইতেছে। আর একদিকে চাহিয়া রমা লজ্জায় মরিয়া গেল। উলঙ্গ একটি মেয়ের ছবি রহিয়াছে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। ঠিক তাহারই পাশে আরও একটা। কিন্তু মেয়ে দুটি বড় সুন্দর। রমা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কহিল—চল দিদিমণি ও ঘরে যাই।

সে ঘরটায় প্রবেশ করিয়া রমা চমকিত হইয়া উঠিল। এ কি! চারিদিকে সে আর নলিনী দিদিমণি।

রমার সুপরিস্ফুট চমক কাহারও চোখ এড়াইবার নয়। নলিনী হাসিয়া কহিল—আয়না-ঘর এটা। এই ঘরে সাজপোশাক করতে হয়। চুল বাঁধতে হয়।

—এত বড় আয়না? মানুষের চেয়েও উঁচু?

একখানি আয়না অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করিয়া দেখিতে দেখিতে সে আবার কহিল—এত আয়না কি জন্যে দিদিমণি?

—আশপাশ পেছনে সামনে সব দেখা যায়। দেখবে যখন চুল বাঁধবে এ ঘরে বসে।

নলিনী একটা আশ্চর্য হাসি হাসিল। রমার তাহা ভাল লাগিল না। সে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তার পূর্বেই নলিনী ত্রস্তভাবে কহিল—ওমা বাবু যে! এস, এস, চলে এস।

নলিনী চকিতের মধ্যে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোটি পুরুষ চারিদিক হইতে রমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। রমাও পলাইতে গেল। কিন্তু মার্বেলের অতি মসৃণতায় পা পিছলাইয়া সে একটি অতি অস্ফুট চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। চারিদিকে দর্পণে ভীতকম্পিতা স্খলিতবাসা তরুণীর অনাবৃত যৌবন তাঁহার বুকের মধ্যে যেন একটা নেশা জাগাইয়া তুলিতেছিল। শুধু নেশা নয়,—একটা অনুকম্পা-কোমল মোহও তাহার মধ্যে ছিল। অবলা মেয়েটির এই ভীতিত্রস্ত ভঙ্গি তাঁহার বড় ভাল লাগিল। নতুবা এই পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার বিরক্ত হইবার কথা। অন্য কেহ এমনভাবে পড়িয়া গেলে তাহাকে অকর্মণ্য অপদার্থ বলিয়া ধমক দিতেন—, তাহার জবাব হওয়াও বিশেষ আশ্চর্যের কথা ছিল না। ভ্রূও তাঁহার কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই কোমল মোহটা তাঁহার সমস্ত মনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সঞ্চারিত হইতেছিল। সেই মোহবশে তিনি নিজেই আসিয়া রমাকে দুটি বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। স্পর্শেরও একটা রূপ আছে, অনুভূতি তাহা প্রত্যক্ষ করে। প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও ঘুমন্ত মানুষ সাপের শীতল স্পর্শে চমকিয়া জাগিয়া উঠে, অঙ্গ তাহার জুড়াইয়া যায় না। মহেন্দ্রবাবুর স্পর্শেও এমনি একটি রূপ ছিল; রমা শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তে মুহূর্তে মহেন্দ্রবাবুর মুঠি দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। সবল দৃঢ় পেষণে তাহার বাহু দুইটি যেন ভাঙিয়া যাইতেছিল। রমার যন্ত্রণার অবধি ছিল না। কিন্তু চিৎকার করিয়া কাঁদিতে তাহার সাহস হইল না। হাজার অবলা হইলেও সে নারী। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধের স্বরূপ যে কি, একটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আপনি তাহার জানা হইয়া গেল। ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্ষুধাবোধের মতো এ বোধ নারীর নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনি জাগে। মানুষের মধ্যে এ প্রকৃতির জাগরণ।

রমা প্রতি মুহূর্তে একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কা করিতেছিল। সমস্ত শরীর তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিদ্রোহ করিবার মতো শক্তি এ সংসারে সকলের থাকে না, কিন্তু খানিকটা বাধা দিবার উপযুক্ত শক্তি সকলেরই আছে, চিৎকার করিতেও মানুষ পারে। কিন্তু এই জাতীয় মানুষের সে সাহস কখনও থাকে না। রমা ভয়ে চোখ মুদিয়া ফেলিল। তাহার চোখভরা জল চোখের পাতার চাপে গাল বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। মহেন্দ্রবাবুর সুদৃঢ় মুঠি শিথিল হইয়া আসিল। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার দৃঢ় হইয়া উঠিল। তাঁহারও মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। অকস্মাৎ দুটি কথা রমার কানে আসিয়া পৌঁছিল—ছেড়ে দিন।

নলিনী দিদিমণির কণ্ঠস্বর।

নলিনীর কণ্ঠস্বরে একটা সম্ভ্রমপূর্ণ দৃঢ়তা ছিল। সে স্বরে আঘাত বা অমর্যাদা কাহাকেও করে না কিন্তু দৃঢ়তায় সে অলঙ্ঘনীয়। মহেন্দ্রবাবু নলিনীর সম্ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন। মৃদু আকর্ষণে রমার হাতখানি আকর্ষণ করিয়া নলিনী আবার তেমনিভাবে কহিল—ছেড়ে দিন।

মহেন্দ্রবাবু ছাড়িয়া দিলেন। কম্পিতা রমার হাত ধরিয়া নলিনী ধীরভাবে অপর দরজা দিয়ে বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবু যেন সহজ মানুষ হইয়া উঠিলেন। চিত্তের অপরাধ-বোধের ক্ষণিক দুর্বলতা তাঁহার ক্রমশ কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ তিনি ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিলেন। কর্তৃত্বাভিমানী মানুষের মনে যে সুলভ অপমানবোধ থাকে—সেই বোধ বিপুল ক্ষোভে জাগ্রত হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড উগ্রতায় তিনি ভীষণ হইয়া উঠিলেন। একটা অদ্ভুত বিকৃত স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল—নলিনী।

শান্ত, সহজ স্বরে উত্তর আসিল—আসছি আমি।

মেয়েটার স্পর্ধায় মহেন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন সহজভাবে কেহ কখনও তাঁহার ক্রোধকে উপেক্ষা করে নাই। দারুণ ক্রোধে তিনি যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু সে তাঁহার অভ্যাস নয়। ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ কখনও তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার ক্রোধ কাজ করে সাপের মতো। আলোকে সে বাস করে বিবরে; শত্রুর দুর্দশার রজনীর অন্ধকারে বিপুল গর্জনে আত্মপ্রকাশ করিয়া আক্রমণ করে।

মহেন্দ্রবাবু আর সে ঘরে দাঁড়াইলেন না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আপনার বসিবার ঘরে তিনি চলিয়া গেলেন। মুক্ত জানালার পাশে একটা ইজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন। আবার তিনি উঠিলেন। বড আলমারিটা চাবি-বন্ধ ছিল না, থাকেও না—সেখান হইতে টানিয়া বাহির করিলেন বোতল ও ছোট একাট গ্লাস। মদ তিনি খান কিন্তু অপরিমিত পানকে তিনি ঘৃণা করেন। ছোট গ্লাসটি তাঁহার পরিমাপের পরিমিত নির্দিষ্ট। গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ঢালিয়া সেটুকু পান করিলেন। তাহার পব একটা সিগারেট ধরাইয়া ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। সিগারেটটা টানিতে টানিতে তিনি ভাবিতেছিলেন এটা বোধ হয় নলিনীর বিদ্বেষ। তাঁহার অধরে মৃদু একটি হাসি খেলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পূর্বের ক্ষোভ তাঁহার আনন্দে রূপান্তরিত হইতেছিল।

সম্মুখের ভেজান দরজা খুলিয়া গেল। সে শব্দে আকৃষ্ট হইয়া চাহিয়া দেখিলেন নলিনী ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার ক্রোধের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া কেহ কখনও দাঁড়ায় নাই। নলিনী কহিল—আমায় ডাকছিলেন আপনি?

মহেন্দ্রবাবু চেয়ারের উপর খাড়া হইয়া বসিলেন। কথা তিনি মনে মনে খুঁজিতেছিলেন।

নলিনী আবার কহিল—কি বলবেন বলুন? আপনার সঙ্গে এক ঘরে এমন করে বসে থাকাটা লোকের চোখে বড় খারাপ ঠেকবে।

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন—কে তোমায় আসতে বললে? আসার ত কোন প্রয়োজন ছিল না।

একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া নলিনী একটু হাসিল। তারপর কহিল—তাহলে বোধ

হয় আমারই ভুল হয়ে থাকবে। আমি যেন শুনলাম আপনি আমায় ডাকলেন। যাক আমারও একটু দরকার ছিল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নলিনী একখানা কাগজ বাহির করিয়া চেয়ারটার হাতলের উপব নামাইয়া দিল। তারপর একটা নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্যই দরজাটা খুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু পিছন হইতে মহেন্দ্রবাবু ডাকিলেন—শোন।

নলিনী ফিরিল। মহেন্দ্রবাবু কাগজখানা ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন—এর মানে?

শান্তস্বরেই নলিনী উত্তর দিল—ওর মানে ত খুবই সহজ। আমি কাজে জবাব দিচ্ছি। আমি আর এখানে থাকতে চাই না।

—কেন? মহেন্দ্রবাবুর ললাটে বিরক্তির সারি সারি কুঞ্চিত রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

নলিনীর চোখে-মুখেও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল—এর আমি কোন জবাব দিতে চাই না। এ বিষয়ে নিশ্চয় আমাব স্বাধীনতা আছে।

মহেন্দ্রবাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বিবরের ভুজঙ্গ পরিপূর্ণ আলোকে আত্মপ্রকাশ করিতে চায় না সত্য, কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিলে সে আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। বিপুল গর্জনে তখন সে বাহিব হইযা আসে। একটা বেতনভোগিনীর বারবার এরূপ ঔদ্ধত্যে তাঁহার বাহ্যিক ক্রোধহীনতার মুখোশ সহসা যেন খসিয়া গেল। কর্কশকণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—জান তুমি, এখানে তোমায় খুন করে দিলেও আমার কিছু হয় না। স্ত্রীলোক বলে রেহাই আমাব কাছে নেই। সাবধান হয়ে কথা বল তুমি।

অকস্মাৎ এমন উত্তর নলিনী প্রত্যাশা করে নাই। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হইয়া গেল। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে কহিল—তা আমি জানি। সে ত আমার না-দেখা নয। আমি নিজের চোখেই যে তা দেখেছি।

এ কথায় মহেন্দ্রবাবু কেমন যেন হইয়া গেলেন। সর্বনাশী মেয়েটার অভিযোগটা যে ভীষণ। তিনি নলিনীর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনী বলিয়াই গেল—আপনার স্ত্রীকে যেভাবে আপনি হত্যা করেছেন, স্লো-পয়জেন করা তার চেয়ে ভীষণ কিছু নয়। আইনের চোখে এটা হত্যাপরাধ নয় কিন্তু একদিন এক জায়গায় এর বিচার হয় ত হবে।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবুর মুখে হাসি ফুটিল। তিনি কহিলেন—বিচার যদি হয় তবে তোমার নাম সাক্ষীর তালিকায় থাকবে নিশ্চয়। যাক, এসব মতলব ছাড়। আর একবার যদি এমন কথা তোমার মুখে শুনি—তোমায় সত্যিই আমি খুন করাব।

—তা হয়ত পারেন। কিন্তু সে আপনাদের ওই সরল নিরক্ষর চাষী প্রজাকে। আপনি ত আমার পরিচয় জানেন। বেশ্যার মেয়ে আমি। আপনাদের এই ধনী জাতদের সর্বনাশ করা আমার না হোক—আমার জাতের পেশা। আমার মা এখনও বেঁচে

আছেন। আমাকে খুন করা খুব নিরাপদ হবে না জানবেন। আপনাদের জমিদার জাতটাই এমন আত্মম্ভরী। আপন এলাকার মধ্যে নিজেদের রাজা বলতেও আপনাদের লজ্জায় বাধে না। তাই এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

মহেন্দ্রবাবু এবার চুপ করিয়া গেলেন। শূন্য-গর্ভ বস্তু আঘাতের উত্তরে বিপুল গর্জন করিয়া উঠে, দুনিয়া তাহাকে ভয় করে না। কিন্তু নিরেট লোহার আঘাতে যে শব্দোত্তর আসে তাহা মৃদু তবে দৃঢ়তাব একটা সুস্পষ্ট পরিচয় তাহার মধ্যে থাকে। ওই দৃঢ় মৃদুস্বরের মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত আছে। সে উপেক্ষনীয় ত নয়ই বরং আঘাতকারীর চিন্তার বস্তু।

মহেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ পর কহিলেন—আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

নলিনী ফিরিল। মহেন্দ্রবাবু আবার ডাকিলেন—হ্যাঁ খোকার গয়নাগুলো আর তোমায় কিছু গয়না দেওয়া হয়েছিল—

নলিনী বাধা দিয়া কহিল—খোকার গয়না আমি খাজাঞ্চী বাবুর জিম্মায় দিয়েছি, ক'খানা তাব গায়ে আছে। তার রসিদ আমি খাজাঞ্চী বাবুর কাছ থেকে নিয়েছি। আর আমাব, সেগুলো তো আমারই প্রাপ্য। জীবনে কৃতকর্মের গ্লানিকে আমি ভুল বলে মাথায় করে নিয়ে যেতে চাই না। আমার জন্মগত পেশা বলেই জমা খরচ করতে চাই। সে আমার কাছে আছে।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবু যেন কূল পাইলেন। তিনি চেয়ার হইতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন—পুলিশে খবব দেব আমি।

নলিনী একথার কোন জবাব দিল না। ধীরভাবে দরজা খুলিয়া সে ঘরেব বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া দরজাটায় হাত দিলেন। কিন্তু কি মনে হইল আব দবজাটা খুলিলেন না। চিন্তান্বিতভাবে চেয়ারটায় আবার বসিয়া পডিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার হাঁকিলেন—কানাই।

কানাই, বাবুর খাস খানসামা। সে আসিতেই তিনি কহিলেন—মেয়ে ডাক্তারের ফাইল নিয়ে কেরানীবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আর শোন, আলমাবি থেকে বোতলটা—না থাক্ এক গ্লাস ঢেলে দিয়ে যা শুধু।

কানাই চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দরজাটার বাহিরে কে গলা ঝাড়িয়া আপনার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিল। মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—এস।

কেরানীবাবু আসিয়া একটা ফাইল চেয়ারের হাতলটার উপর নামাইয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ফাইলটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। দেখিয়া শুনিয়া ফাইলটা বন্ধ করিয়া বলিলেন—ইনি রেজিগনেশন দিচ্ছেন। কিন্তু এগ্রিমেন্ট রয়েছে দেখছি আরও তিন মাসের। এঁকে একটা নোটিশ দিয়ে দাও যে আমরা তোমার রেজিগনেশন নিতে পারব না। তুমি যদি চলে যাও তবে ক্ষতির জন্য দায়ী হতে

হবে। আর একজন কাউকে সদরে পাঠিয়ে দাও, সে উকিলদের কাছে জেনে আসুক এর জন্য ফৌজদারী সোপর্দ করা যায় কি না। শেষ পর্যন্ত টিকুক চাই না টিকুক প্রথমটায় এমন একটা কিছু করা যায় কি না।

নীরবে কেরানীবাবু ফাইলখানা তুলিয়া লইলেন। তারপর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—একটি ভদ্রলোক এসে বসে আছেন। টিউবওয়েল কোম্পানির লোক নাকি।

মহেন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—হুঁ। কেরানীবাবুর আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। তিনি দরজার দিকে ফিরিলেন। পিছন হইতে বাবু কহিলেন—হ্যাঁ, তাকে থাকতে বল আজ। কাল তার সঙ্গে কথা কইব। গ্রামের মধ্যে তিনটে টিউবওয়েল করিয়ে দেব ভাবছি। বড় জলের কষ্ট গ্রামের মধ্যে।

কেরানীবাবু এবার দরজায় হাত দিয়েছিলেন। বাবু কহিলেন—আর তোমাদের খালি পালাই পালাই শব্দ। গভর্নমেন্ট হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে একখানা পত্র লেখ দিকি টিউবওয়েল বসানোর কথা জানিয়ে। গ্রাম ম্যালিরিয়ায় উচ্ছন্ন হয়ে গেল, কেউ যদি কিছু ভাবে?

কেরানীবাবু যাইতে যাইতে কহিলেন—কড়ি গাঙ্গুলী এসে বসে আছে।

অকস্মাৎ খড়ের আগুনের মতো মহেন্দ্রবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন—যাও, যাও, যা বললাম তাই কর গিয়ে। ওটাকে দূর করে দিতে বল কাছারী থেকে।•

ততক্ষণে কেরানীবাবু নিজের পশ্চাতে দরজার আড়াল দিয়া বাঁচিয়াছেন।

মহেন্দ্রবাবু চিন্তা করিতেছিলেন দেশের ম্যালেরিয়ার কথা। এ চিন্তা বড়লোকের সখ কি না কে জানে, কিন্তু তাঁহার এ চিন্তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। জীবনের পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়, আত্মীয়, সমাজ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন গতিতে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক এক সময়ে এই বিচিত্র মানুষটির মনে এই ধারা চিন্তা জাগিয়া উঠিত। তখন অর্থের প্রতি মমতা তাঁহার থাকিত না, আপন দেহের প্রতি দৃকপাত করিতেন না। অকস্মাৎ ভূমিকম্পজীর্ণ পাথরের বুক হইতে নির্ঝরিণী উৎসারিত হইত। আবার অকস্মাৎ সে উৎস রুদ্ধ হইয়া যাইত। সেদিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসরও তখন তাঁহার থাকিত না। তখন তিনি নিজের মনে মনেই বলিতেন—নির্বোধ—নির্বোধের কাজ হয়েছে এটা। এক এক সময় নির্বোধটা কেমন করে যে প্রবল হয়ে ওঠে।

দবজার বাহিরে আবার কাহার অতি কুণ্ঠিত মৃদু সাড়া পাওয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ঈষৎ বিরক্তিভরেই কহিলেন—কে?

দরজা অল্প ফাঁক করিয়া কড়ি গাঙ্গুলীর লম্বা মুখখানি উঁকি মারিল।

রুক্ষস্বরে মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—কি?

—আজ্ঞে আমার একটু কাজ ছিল।

—পরে এস। আমার শরীরটা ভাল নেই।

দরজাটা বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু অল্প একটু হাসিলেন। মানুষের এই ধরনের ভয় দেখিয়া বড় কৌতুক বোধ হয় তাঁহার। কিন্তু কি একটা কথা অকস্মাৎ তাঁহার

মনের মধ্যে উদিত হইতেই তিনি উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেন। দরজার ধাক্কায় ওপাশে কে একজন মৃদু আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বাবু দেখিলেন কড়ি গাঙ্গুলী নাকে হাত বুলাইতেছে। দরজার ধাক্কাটা বেচারার নাকেই আঘাত করিয়াছে। আঘাতের উপরেও বেচারা মহেন্দ্রবাবুর সহিত চোখাচোখি হইতেই চমকিয়া চোরের মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু কিন্তু তাহাকে কঠোর কিছু বলিলেন না।

বরং মৃদুস্বরেই কহিলেন—এই যে তুমি আছ। ভালই হয়েছে, শোন দিকি।

কড়ি চতুর লোক, গরজের দাম সে বোঝে। মুহূর্তে তাহার ভোল পাল্টাইয়া গেল। সে বেশ সপ্রতিভভাবেই বাবুর অনুসরণ করিয়া ঘরের মধ্যে বিনা আদেশেই একখানা চেয়ার টানিয়া জাঁকিয়া বসিল। এবং সেই প্রথম কথা কহিল—আপনার দরজাগুলো ভারী বিশ্রী।

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—একটা বাঁদরকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সেটা লাফিয়ে বসল একেবারে চেয়ারটার মাথায়। ফলে চেয়ারটা গেল উল্টে। তখন বাঁদরটাও ঠিক একই কথা বলেছিল, বুঝেছ গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিল। 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' কথাটার দাম গাঙ্গুলীর বেশ জানা আছে, বহু ক্ষেত্রেই বহু ব্যঙ্গই হাসিয়া উড়াইতে হয় তাহাকে।

মহেন্দ্রবাবু তাহার হাসিটা কমাইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, শোন—আমি তোমার সেই টাকার কথা ভাবছিলাম। এখনও ত মেয়েটির দলিল হয়নি—

গভীর অভিনিবেশের সহিত গাঙ্গুলী শুনিতেছিল, এবং কথার শেষ যে কি হইবে তাহাও সে মধ্য পথে বুঝিয়া লইয়াছিল। সুতরাং সে মধ্য পথেই বলিয়া বসিল—তার আর কি? আজই দলিল হয়ে যাক।

—হ্যাঁ, তাই বলছিলাম, তুমি এখানে এসেছ, দলিলখানা তুমিই থেকে ওর টিপ সই-টই সব করিয়ে দাও না। মেয়েটিও এখানে নতুন, কিছু ভাবতেও ত পারে।

হাসিয়া গাঙ্গুলী কহিল—আজ্ঞে না, সে ভয় কিছু নেই। জানোয়ারেও মাথা নাড়ে, কিন্তু রমা—

অকস্মাৎ বিরক্ত হইয়া বাবু কহিলেন—এইটেই আমি ঠিক পছন্দ করি না এককড়ি। মানুষের যদি আত্মা বলে বস্তু না থাকে—তবে সে কি মানুষ?

কড়ি একথার উত্তর বোধ হয় জানিত না, কিংবা সে যাহা জানে তাহা দিতে সাহস করিল না। মহেন্দ্রবাবু আবার কহিলেন—না, এই মানুষই ভাল এককড়ি। এদের রাগ কখনই হয় না। অন্যায়ে অবিচারে এরা দুঃখ করেই সন্তুষ্ট থাকে। যাক্, প্রয়োজনের পক্ষে এরা খুব ভাল। দেখ, এখানে যে মেয়ে-ডাক্তারটি আছে সে বোধ হয় মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে ভড়কে দিচ্ছে।

গাঙ্গুলী গরজের কথাটার এতক্ষণে হদিশ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার একখানা কণ্ঠস্বর দশখানা হইয়া উঠিল—দেখুন দিখি, সে হারামজাদীর কি সাধ্যি রমাকে ভাংচি দেয় আমি থাকতে! রাধে! রাধে! রমা সে মেয়েই নয়। বলুন না এখুনি তার চুলের মুঠি ধরে দিই আপনার পায়ের জুতোয় তার পিঠ ভেঙে।

দরজার বাহিরে আবার সাড়া উঠিল।

বাবু কহিলেন—কে?

—আজ্ঞে আমি। এস্টেটের নায়েবের কণ্ঠস্বর।

—এস। জরুরী কাজ আছে কি কিছু?

—কয়েকটা মামলার দিন আছে কাল।

—হ্যাঁ যাই চল। কড়ি, তা হলে তুমি ওবেলা এস।

কড়ি চুপি চুপি কহিল—একটু বসলে হত না হুজুর? আমি দিতাম আপনার সামনেই রমাকে শাসিয়ে।

বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—এখন থাক।

কড়ি ছাড়িবার পাত্র নয়, সে কহিল—আমি তা হলে বরং রমাকে ডেকে একবার—।

মহেন্দ্রবাবু কথাটা কানেই তুলিলেন না। তিনি ডাকিলেন—কানাই, দরজাটা বন্ধ করে দে। তুমি বেরিয়ে এস গাঙ্গুলী। আর কানাই,—শোন।

মৃদুস্বরে কানাইকে কহিলেন—একটা চাপরাশীকে বলে দে মেয়ে-ডাক্তারের বাড়িতে পাহারা থাকতে। ও বোধ হয় পালাবে।

নলিনী আপনার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে বসিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল। রমা একপাশে নীরবে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

নলিনী কহিল—ওই ব্রাকেটের ওপর থেকে ফুলদানী দুটো দিতে পার ভাই? আর ওই ছবিখানা। না ওখানা নয়, ওটা বাবুর ছবি। ওই যে পাশেই খোকাবাবুর ছবি—ওইখানা।

নলিনী ছবিখানা বাক্সে পুরিয়া তাহার উপর কাপড় ঢাকা দিল। তারপর আবার অন্য জিনিস গুছাইতে আরম্ভ করিল। রমা মৃদুস্বরে কহিল—দিদিমণি।

কাজ করিতে করিতেই নলিনী উত্তর দিল—কি?

—তুমি কি সত্যিই আজ চলে যাবে?

প্রশ্নটির মধ্যে এমন কিছু ছিল না, কিন্তু রমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে বাক্যের প্রত্যক্ষ অর্থ ছাড়াও যেন অনেক কিছু ছিল। নলিনী মুখ ফিরাইয়া রমার দিকে চাহিল।

নলিনীর উদ্যত চোখ দুটির উপর সকরুণ দৃষ্টি মিলাইয়া রমা বলিল—আমার কি হবে দিদিমণি!

প্রশ্নটির অভ্যন্তরের প্রচ্ছন্ন হতাশার সকরুণ সুরটুকু নলিনীকে বিশেষ করিয়া স্পর্শ করিল। সে আবার হাতের কাজ ফেলিয়া নতমুখে বোধ হয় এই প্রশ্নেরই উত্তরের সন্ধান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছ রমা?

ম্লান হাসিয়া রমা কহিল—হাজার বোকা হলেও আমি ত মেয়েমানুষ দিদিমণি।

কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও নলিনী আপন মনে ভাবিতেছিল এই পৃথিবীর বুকের উপর সে অতি বাস্তব উলঙ্গ সত্য সুকঠোরভাবে শুনাইয়া দিয়া দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম

সব যে মেকী তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবে, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেও ঠিক সেই পথটি অতি সূক্ষ্ম রেখায় রেখায় অনুসরণ করিবে। কিন্তু রমার এ প্রশ্নের উত্তরে সে-পথ ধবাইয়া দিতে সে পারিল না। সে নিজেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

রমা কহিল—দিদিমণি!

—ভাই!

—কি হবে আমার!

—সেই কথাই ত ভাবছি বোন। কিন্তু কূল-কিনারা খুঁজে যে কিছু পাচ্ছি না।

—আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল না দিদিমণি। আমি তোমার কেনা ঝিয়ের মতো থাকব।

একটু চিন্তা করিয়া নলিনী ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল—না। তোমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি আমার নেই। এখানে এলে বের হয়ে যাওয়া সহজ কথা নয় ভাই। আমিও আজ ছ' মাস ধরে পথ খুঁজছি। আজ তুমি এসেছ, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে যদি পথ পাই। তবুও সে নিয়ে আমার ভাবার অন্ত নেই।

তাবপব ঘরখানি নীরব নিস্তব্ধ। কূলহারা দুটি নারী অসীম শূন্যতার মধ্যে আজও যাহার সন্ধান হয় নাই, বাক্যে যাহাকে প্রকাশ করা যায় না, মন যাহাকে কল্পনা কবিতে পারে না—রূপহীন—আকারহীন এক আশ্রয়ের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বোধ করি তাহারই জন্য কয় ফোঁটা জল রমার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

কানাই খানসামা আসিয়া কহিল—এই যে তুমি এখানে রয়েছ। তোমাদের গাঁয়ের গাঙ্গুলী মশাই এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

গাঙ্গুলীর নাম শুনিয়া রমা বুঝিল কথাটা বলা হইয়াছে তাহাকেই, সে ব্যগ্রভাবে কহিল—কই, কোথায় কাকাঠাকুর?

কানাই কহিল—এখানে কি এসেছে সে! সে আছে ওদিকের ঘরে বসে। আমার সঙ্গে এস তুমি।

রমা উঠিয়াছিল, কিন্তু নলিনী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—বস তুমি রমা। কানাই যাও, তুমি গাঙ্গুলী মশায়কে এখানেই পাঠিয়ে দাও।

সবিস্ময়ে কানাই কহিল—এখানে?

—হ্যাঁ দোষ কি? এটা ত আমাদের অন্দর নয়, আমাদের বাসা এটা। আমি ত সকলের সামনেই বের হই।

কানাই আমতা আমতা করিয়া কহিল—কি সব ওদের ঘরোয়া কথা।

—তা হোক, আমি সরে যাচ্ছি ও-ঘরে। যাও তুমি তাকে এখানেই পাঠিয়ে দাও। রমা এখন যেতে পারবে না, ওকে আমার দরকার আছে।

কানাইকে যেন অগত্যাই যাইতে হইল। রমা নলিনীকে পরম আশ্বাসভরে কহিল—আর আমার কোন ভাবনা নেই দিদিমণি, আমি কাকাঠাকুরের সঙ্গে চলে যাব।

নলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটি অদ্ভুত হাসি হাসিয়া কহিল—তোমাকে না দেখলে ভগবান যে সরল সে আমি বিশ্বাস করতাম না।

মৃদু হাসিয়া রমা কহিল—কেন দিদিমণি?

প্রত্যুত্তরে নলিনী শুধু হাসিল।

কানাইয়ের গলা বাহির হইতে শোনা গেল—আসুন, এদিকে আসুন।

তাহার পেছন পেছন বারান্দার মোড় ঘুরিয়া গাঙ্গুলী দেখা দিল। রমাকে সম্মুখে দেখিয়া গাঙ্গুলী কহিল—এই যে রমা? বেশ ভাল লাগছে ত? তারপর—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। নলিনীকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বাইশ-তেইশ বছরের শ্যামবর্ণের মেয়েটি ত হেলা করিবার মতো নয়! না থাক তাহার রমার মতো রূপ কিন্তু এ যে সম্ভ্রম করিবার মতো নারী, মণিবেদীর উপর এই ত শোভা পায়। গাঙ্গুলী ব্যাপারটা বুঝিল। এখানে প্রয়োজন রূপসী দাসীর। সঙ্গে সঙ্গে অল্পক্ষণ পূর্বের একটা কথাও মনে পড়িল, বাবু বলিতেছিলেন—না, এই মানুষই ভাল গাঙ্গুলী। এদের অধিকারবোধ নেই, এরা জীবনে শুধু দুঃখ করেই সন্তুষ্ট।

বাবুর বুদ্ধির উপর শ্রদ্ধার পরিমাণ তাহার বাড়িয়া গেল। দৃপ্তা নারী পুরুষের জীবনে একটা অশান্তি—এ বিষয়ে গাঙ্গুলী ভুক্তভোগী।

গাঙ্গুলীর চমক ভাঙিল নলিনীর কথায়। একটি নমস্কার করিয়া সে কহিল—আপনি এই ঘরে রমার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি গাঙ্গুলী নমস্কারের ত্রুটিটা সারিয়া লইয়া কহিল—না—না—না। আপনার যাবার কোন দরকার নেই। বরং আপনি থাকাই ভাল। ভালই হবে, সে ভালই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিজেই যেন তাহার ফলোপলব্ধি করিতেছিল। তারপর সে কানাইয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—তুমি তা হলে কানাই—তা হলে—

কানাইকে চলিয়া যাও বলিতে সাহস হইল না। কিন্তু সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে ভাবটা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। কানাই তাহা গ্রাহ্যই করিল না।

নলিনী এটা লক্ষ্য করিল। সে কহিল—যাও না কানাই এখান থেকে। তোমায় উনি যাবার জন্য বলছেন।

কানাই হাসিয়া কহিল—আমার কাছে গাঙ্গুলী মশায় লুকোন না কিছু।

নলিনীর অসহ্য বোধ হইল। সে তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—তবু উনি আজ তোমায় যাবার জন্য বলছেন। না তোমার হুকুম আছে যে এখানে কেউ গোপন কথা কইতে পাবে না।

কানাই নলিনীর এই উত্তেজিত তীক্ষ্ণ ধরনটিকে বড় ভয় করিত। নলিনীর কথায় অপ্রস্তুতের মতো সে পালাইয়া বাঁচিল।

সঙ্গে সঙ্গে গাঙ্গুলী একরূপ কানাইয়ের পিঠের উপরেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, কহিল—লুকিয়ে কথা শোনা এখানকার লোকের একটা স্বভাব। এ বাড়ির ত সব বেটা গোয়েন্দা পুলিশ। আশ্চর্য দস্তুর কিন্তু!

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—আপনাদের এখানে অনেক আশ্চর্য রকমের দস্তর আছে দেখতে পাই। মানুষ কেনা-বেচা পর্যন্ত হয় দেখছি।

এমনধারা বাঁকা অথচ পরিষ্কার কথা গাঙ্গুলী কখনও শোনে নাই।

সে মহা লজ্জিত অপরাধীর মতোই কহিল—সত্যিই আমার অপরাধের অন্ত নেই। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার অনুতাপের আর সীমা নেই। আর এমন যে হবে তা আমি বুঝতে পারিনি। বাবু যে ভদ্রলোক হয়ে এত বড় পাষণ্ড। ছি—ছি—ছি। আমায় বললেন, গাঙ্গুলী, সভ্য মানুষ ওরা, ছেলে মানুষ করা ওদের পোষায় না—তা তুমি যদি একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে—ঈশ্বরের দিব্যি—মা—ভদ্রকালীর পুষ্প ছুঁয়ে আমি বলতে পারি বুঝলেন। আপনার ভাতে হাত পডবে—

নলিনী তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—আমার সঙ্গে কথা কইবার ত কোন প্রয়োজন নেই আপনার। রমাকে কি বলবেন বলুন আপনি। আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—গেলে ত চলবে না মা। সন্তানকে এ পাপ থেকে যে উদ্ধার করতেই হবে। চাষা-ভূষা মানুষ, কথার দোষ ধরলে ত চলবে না, মা।

রমা ব্যগ্রভাবে কহিল—আমার কি হবে কাকাঠাকুর ?

গাঙ্গুলীর গলা যেন ভাঙিয়া আসিতেছিল, ঘোলাটে চোখ দুটি ছলছল করিতেছিল, সে কহিল—তাই ত মা রমা, তোর কি উপায় করি আমি ?

বমা ব্যাকুলভাবে কহিল—আমায় এখান থেকে নিয়ে চল বামুন কাকা।

ব্যগ্রভাবে কডি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—পারবি ? পারবি এখান থেকে লুকিয়ে পালাতে রমা ? একবার যদি বেরুতে পারিস তুই এখান থেকে—তারপর আমি দেখে নেব। এমন লুকিয়ে রাখব তোকে। হুঁ-হুঁ বাবা আমারও নাম কডি গাঙ্গুলী।

— কেমন করে যাব কাকা ?

—এই এই এঁকে ধর। উনিই যদি পারেন কোন রকমে। বুদ্ধি দেখছিস না—তেজ দেখছিস না ?

নলিনী কহিল—মাপ করবেন। আমি বোধ হয় আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মাপ করার অনুরোধটা কড়ি বোধ হয় শুনিতেই পায় নাই, সে উত্তর করিল—আজই তা হলে ওকে এখান থেকে কোনরকমে বার করে দিন, আপনার যাবার আগেই। ভালই হয়েছে, আমিও আছি এখানে আজ।

সঙ্গে সঙ্গে রমাও মিনতি করিয়া কহিল—তোমার পায়ে পড়ি দিদিমণি।

বাহিরের রুদ্ধ দ্বারে কে আঘাত করিল।

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কড়ি কহিল—নিশ্চয় শালা কানাই, লুকিয়ে শুনেছে বেটা সব। বিকৃত মুখখানা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, বিচ্ছিন্ন দন্তপাটী বিচ্ছিন্ন হইয়াই রহিল। নলিনী অগ্রসর হইয়া দুয়ারটা খুলিয়া কহিল—কে ?

দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল সুবোধ বালকের মতো সেই কেরানীবাবুটি। একখানি বই নলিনীর সম্মুখে ধরিয়া কহিল—চিঠি আছে একখানা।

সই করিয়া দিয়া চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া নলিনী ঈষৎ হাসিল।

কেরানীবাবু কহিল—এরপর জবাব আদান-প্রদান তো আদালত মারফতেই হবার কথা। আজ্ঞে বিবেচনা করে দেখলে একবার ভাল হয়।

নলিনী নতমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর কহিল—তাই হবে। আমার চুক্তির সময় আমি শেষ করেই দিয়ে যাব।

কেরানী কহিল—তা হলে তাই গিয়ে বলি বাবুকে?

—বলবেন।

কেরানীবাবু চলিয়া গেল।

গাঙ্গুলীর আর থাকিতে সাহস হইতেছিল না। সে মৃদুস্বরে কহিল—আমিও তাহলে যাই, বুঝলেন। বেটা সরিঙ্গী আবার দেখে গেল। ওই যে দেখছেন সরিঙ্গী চেহারা আর কান্না কান্না মুখের ভাব—ও শালা একেবারে টিপে ষষ্টি—ছেলে খান দশটি। বিশ্বাস নেই বেটাকে। তাহলে আজই কোনরকমে—বুঝলেন কি না, তারপর আমি বুঝে নেব।

সে আর দাঁড়াইল না। চিরাভ্যস্ত দ্রুত পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। কানাই দরজার পাশেই ছিল। গাঙ্গুলী তাহাকে দেখিবামাত্র কহিল—বাবা এ কড়ি গাঙ্গুলীর ভেল্কী। মেয়ে-ডাক্তারের মত ফিরে গেল—সে থেকে গেল। বললাম, বাবা এত সুখ ঐশ্বর্য পাবে কোথায়?

কানাই সে কথার কোন জবাব দিল না, কহিল—বাবু ডেকেছেন আপনাকে।

কড়ির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ব্যগ্রভাবে কহিল—কেন রে কেন?

—সে আমি জানব কি করে বলুন দেখি?

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—সে আমি বেশ বুঝেছি—এ তুই বেটা দুর্মুখের কাজ।

তারপর চলিতে চলিতে সে আপন মনেই বলিল—যেমন রাজা রামচন্দ্র তেমনি হয়েছে চর দুর্মুখ। যাবেন লক্ষ্মী পাতালে। আমার করবি ঘেঁচু—আমি থোড়াই কেয়ার করি। কড়ি গাঙ্গুলীরও তেজারতি চল্লিশ হাজার, সে বাবা তোবলা মোবলা নয়। আর ভগবান এত লোককে নেন, এ বেটাকে নেন না গো।

কানাই তখন অনেকটা পিছনে একটা চাপরাশীকে হাত-মুখ নাড়িয়া কি বুঝাইতেছিল। সে সংবাদ গাঙ্গুলীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। আড়চোখে আশপাশ দেখার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহার।

রমা কহিল—কোনরকমে আমাকে এখান থেকে বের করে দাও দিদিমণি। আমি কাকাঠাকুরের সঙ্গে—

নলিনী কহিল—না রমা, বাঘের মুখ থেকে অজগরের মুখে তুলে দিতে সাহায্য

আমি করতে পারব না। এখানে থাকলে দু'মুঠো খেতে তুমি পাবে, কিন্তু গাঙ্গুলীর হাতে পড়লে জীবনে কোন দুঃখ হতেই নিষ্কৃতি তুমি পাবে না।

তারপর চোখ দুটি তুলিয়া সকরুণভাবে রমা কহিল—তবে আমার কি হবে দিদিমণি ?

হাসিয়া নলিনী কহিল—ভয় কি ভাই, তোমার অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে জড়ালাম আমি। তাতে আমার ভাগ্যে যা থাকে থাক।

রমা ব্যগ্রভাবে কহিল—তাই তুমি যাচ্ছ না দিদিমণি ?

নলিনী কহিল—হ্যাঁ। তারপরেই ডাকিল, কানাই, কানাই।

কানাই তখনও চাপরাশীটার সহিত কথা কহিতেছিল। নলিনীর ডাকে সে আসিয়া দাঁড়াইতেই নলিনী বাক্স খুলিয়া কয়খানা গহনা তাহার হাতে দিয়া কহিল—এই গয়নাগুলো খাজাঞ্চীর কাছে জমা রেখে এস ত। একটা রসিদ এনো যেন।

কানাই কহিল—আপনি তা হলে যাচ্ছেন না, কেমন দিদিমণি ?

বিষণ্ণভাবে নলিনী কহিল—এখনও আমার অদৃষ্টের ভোগ যায়নি কানাই, চুক্তির সময় পার হয়নি। কিন্তু ও চাপরাশীটা ওখানে কেন ? আমার ওপর পাহারা পড়েছে বুঝি ?

কলরব করিয়া কানাই কহিল—দেখুন দেখি, কি যে বলেন আপনি! এই বেটা ভূত, হিঁয়া কাঁহে বসকে রতা হ্যায় ? ভাগ——ভাগ হিঁয়াসে।

ঘরের দেওয়ালের ব্রাকেটের ওপর একটা টাইমপিস টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছিল। নলিনী সেটার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ছ'টা বাজিয়া গিয়াছে। নির্বাক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে রমা কখন মেঝের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নলিনী বাহিরের বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে দিবসান্তের নিষ্ক্রিয়তা ঘনাইয়া উঠিতেছে। দূরে শুধু কয়টা ছাগল তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নলিনী চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘুমন্ত রমাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল।

নিদ্রাভঙ্গে রমা চকিতের মতো উঠিয়া কহিল—কি দিদিমণি ?

—এস, উঠে এস।

—কোথায় ?

—এস না আমার সঙ্গে। একটু মাঠের দিকে যাব। ঘরের মধ্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে।

রমা গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া নলিনীর পিছন ধরিল।

সূর্য তখন অস্ত গিয়াছে। অতলের অন্ধকার মাটির বুক ভেদ করিয়া অস্তরাগদীপ্তি আকাশের দিকে উঠিতেছিল। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির সীমানার শেষপ্রান্তে বাগান-ঘেরা পুকুরটার মধ্যে ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছিল—তাহারই মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। দু'-পাশের ছোট ছোট আম-গাছগুলির মধ্যে দিয়া পায়ে-চলা সরু পথখানি ধরিয়া নলিনী আসিয়া দাঁড়াইল পুকুরটির এ প্রান্তে। তার কাঁটাতারের বেড়াটা কোনরূপে পার হইয়া একেবারে মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল।

রমা বিস্মিত হইয়া কহিল—আর কোথা যাবে দিদিমণি?

নলিনী কহিল—স্টেশনে। এই পথ ধরে গেলেই সোজা হবে, ওই দেখ সিগনালের আলো দেখা যাচ্ছে।

—স্টেশনে কেন যাবে?

—এই ট্রেনেই আমরা কলকাতা চলে যাব।

রমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সে কহিল—আবার কবে ফিরে আসবে?

—আবার কি ফিরে আসে রমা? লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছ না?

—কিন্তু তোমার জিনিস-পত্তর গয়না কাপড় সব যে পড়ে রইল।

বিরক্তিভরেই নলিনী কহিল—থাক। বেশি কথা তুমি কয়ো না রমা—কে কোথায় শুনতে পাবে।

নীরবে দ্রুত পদেই তাহারা চলিয়াছিল। কিন্তু রমা অকস্মাৎ আবার বলিয়া উঠিল—অত সুন্দর কাপডগুলো—গয়না—আক্ষেপের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বোধ করি আপনি তাহার বুক হইতে ঝরিয়া পড়িল।

চলিতে চলিতেই নলিনী বলিল—ও-গুলো তুমি নেবে রমা?

রমার লজ্জা হইল, সে চুপ করিয়া রহিল। নলিনী আবার কহিল—ও-গুলো সব তোমাকে আমি দিতে পারি।

বিস্মিতকণ্ঠে—একটা বিচিত্র স্বরে রমা বলিয়া উঠিল—সমস্ত!

—সমস্ত, সমস্তই তোমাকে আমি দিচ্ছি রমা। তুমি একটা কাজ কর।

এবার রমা যে স্বরে উত্তর দিল—সে স্বর কিন্তু পূর্বের স্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অকস্মাৎ যেন সে কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা বিষণ্নভাবে সে কহিল—ও সব নিয়ে আমি কি করব দিদিমণি?

নলিনী বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করিল—কেন—গয়না পরবে!

ম্লান কণ্ঠেই রমা উত্তর দিল—আমি যে বিধবা দিদিমণি।

নলিনী এ কথার জবাব দিতে পারিল না। একটি সকরুণ বেদনায় তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল—লজ্জাও হইয়াছিল। না ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন একটি প্রশ্ন করার জন্য মনে তাহার গ্লানির অন্ত ছিল না। দুইটি নারীই ইহার পরে নীরবে চলিয়াছিল। সকরুণ বিষণ্নতার মধ্যে যেন সমস্ত কথার উপাদান হারাইয়া গিয়াছে।

স্টেশনে আসিয়া নলিনী রমাকে লইয়া প্লাটফর্মের একপ্রান্তে অন্ধকারপ্রায় একটি স্থানে বসিয়া কহিল—বেশি কথাবার্তা বলো না রমা; রেলে না চড়লে বিশ্বাস নেই।

তখনও ট্রেন আসিতে খানিকটা বিলম্ব ছিল। এদিকে-ওদিকে দুই-চারিটি যাত্রীর দল বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল। স্টেশনের বাহিরে একটা চায়ের দোকানে একটা ছোঁড়া হাঁকিতেছিল—চা গরম—বাবু বিড়ি পান।

কোন গাড়ির একটি গরু কখন দড়ি খুলিয়া পলাইয়াছে—গাড়োয়ানটা গরুটাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমাগত তাহাকে গাল দিতেছিল—এমন শালার বে-আক্কেলের গরু তো আমি দেখি নাই।

কাহাদের একটি বউ আসিয়া রমাদের অনতিদূরে বসিল। পেটরাটি নামাইয়া সঙ্গের পুরুষটি কহিল—বস তুমি এইটার ওপর—আমি পান বিড়ি লিয়ে আসি।

রমা নলিনীকে চুপি চুপি কহিল—বউটির সঙ্গে আলাপ করব দিদিমণি ?

অন্ধকারের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়—নলিনী দৃষ্টি হানিয়া বসিয়াছিল লাইনের ধারে। সে রমার কথায় মুখ ফিরাইয়া কহিল—না। বস চুপ করে।

নলিনীর মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল একটি বিষণ্ণ চিন্তার ধারা, সেই চিন্তাতে আবার সে নিমগ্ন হইয়া গেল। টিকিটের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই নলিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল—তুমি বস রমা, আমি টিকিট করে আনি।

টিকিট ঘরের জানালার ধারে নলিনী একখানা দশ টাকার নোট আগাইয়া দিয়া কহিল—দু'খানা হাওড়ার টিকিট দেবেন তো।

চুড়ি-পরা মসৃণ-ত্বক হাত দেখিয়া আর কণ্ঠস্বর শুনিয়া টিকিটবাবুটি আলোটি জোর করিয়া দিলেন। জানালার জালতির গায়ে নাকটা চাপা পডিয়া চ্যাপ্টা হইয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি কহিলেন—কোথাকার ?

তাহার অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখিয়া নলিনী মনের এই অবস্থাতেও না হাসিয়া পারিল না। সে কহিল—হাওডাব।

—একখানা ?

—না—দু'খানা।

টিকিটের আলমারির খোপে খোপে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি হাওড়ার টিকিট অনুসন্ধান করিতেছিলেন—আর মুখে বলিতেছিলেন—হাওডা হাওডা হাওডা।

অকস্মাৎ আবার তিনি জালত্তির গায়ে নাক চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন ক্লাস ?

—থার্ড ক্লাস।

—হুঁ—থার্ড ক্লাস—হাওডা হাওডা। খুঁজিতে খুঁজিতে নলিনীব ভাগ্যক্রমে টিকিট পাওযা গেল। টিকিট দু'খানা লইয়া নলিনী বমাব কাছে আসিযা কহিল—উঠে এস রমা।

—দাঁডান আপনি।

নলিনী চমকিয়া উঠিল, প্লাটফর্মের আলোগুলো তখন সবেমাত্র জ্বলিতে শুরু করিযাছে—সেই আলোতে নলিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল দুটি লোক। একজন পুলিশের পোশাক পরা ভদ্রলোক ; অপবজন মহেন্দ্রবাবুর মোকদ্দমা সেরেস্তার কর্মচারী মিত্তির মশায।

নলিনীব মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিযা লইয়া সে কহিল—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ।

নলিনী নীববে তাহাদের বক্তব্যের অপেক্ষা করিল।

পুলিশ কর্মচারীটি কহিল—আপনার বিরুদ্ধে একটা চার্জ আছে। আপনি এখানকার

হাসপাতালের যন্ত্রপাতি আর মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির কিছু টাকা চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

নলিনীর মনে হইল পায়ের তলা হইতে মাটিটা যেন সরিয়া যাইতেছে। সে এ আশঙ্কা করে নাই। অপর যে কোন অভিযোগ শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল কিন্তু এই চুরির অভিযোগ তাহার কল্পনাতীত। এ যুগে যে এর চেয়ে ঘৃণ্য অভিযোগ আর কল্পনা করা যায় না।

কিছুক্ষণ পর সে প্রশ্ন করিল—কেউ কারও নামে চুরির অভিযোগ করলেই কি আপনারা তাকে অ্যারেস্ট করে থাকেন?

দারোগা কহিল—হ্যাঁ তাই নিয়ম। অবশ্য চুরি যে হয়েছে তার সন্তোষজনক প্রমাণ দেখিয়ে—আমাদের বিশ্বাস করাতে হবে। তারপর ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার অধিকার গৃহস্থের বা অভিযোগকারীর থাকবে।

—ও। দেখুন আমারও আজ গয়না চুরি গেছে। আমি জানি সে গয়না মজুত আছে এখানকার মহেন্দ্রবাবুর খাজাঞ্চীখানার সিন্দুকে।

এবার কথা কহিল মিত্তির মশায়—বাবুর মোকর্দ্দমা সেরেস্তার কর্মচারীটি—কবে আপনার গয়না চুরি গেল?

—আজই।

—সে সংবাদ আপনি পুলিশে দেননি কেন?

—আমার ইচ্ছা হয়নি।

মৃদু হাসিয়া কর্মচারীটি কহিল—এও যে একটা মস্ত বড় অফেন্স আপনার। এর জন্যও পুলিশ কেসে পড়তে হবে আপনাকে।

নলিনী কঠিন হাসি হাসিয়া কহিল—অর্থাৎ অপরাধ যত কিছু সবই আপনাদের রচনায় আমাকেই পাকে পাকে ধরেছে। বেশ—এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন।

দারোগা কহিল—আমার সঙ্গে আপনাকে আসতে হবে। আসুন।

—চলুন। এস রমা।

রমা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ওদিকে ট্রেনটা আসিয়া পড়িয়াছিল। যাত্রীর কলরবে স্টেশন প্লাটফর্মটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নলিনী ও রমাকে লইয়া স্টেশনঘরের মধ্যে পুলিশ কর্মচারীটি তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন।

—আপনার জিনিসপত্রগুলো একবার দেখতে চাই আমি।

নলিনী দৃপ্তভাবেই উত্তর দিতেছিল। সে উত্তর দিল—জিনিসপত্র তো সঙ্গে কিছু নেই আমার। থাকবার মধ্যে আমার পরনে যা রয়েছে—তাই। এর মধ্যে কি কিছু লুকিয়ে রাখতে পারি বলে আপনার মনে হয়?

মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—অন্য জিনিস না থাকতে পারে—কিন্তু টাকা কি নোট বা গয়না এ সব;—না কি বলছেন দারোগাবাবু এ্যাঁ?

সভয় বিস্ময়ে নলিনী চমকিয়া উঠিল, বলিল—আপনারা কি আমার দেহ তল্লাস করে দেখতে চান?

মিত্তির মশায়ই জবাব দিল—আইন তো তাই বটে। তার আর আমরা কি করব বলুন—এ্যাঁ—না কি বলছেন দারোগাবাবু?

নলিনী স্টেশনঘবের টেবিলটার উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুর লজ্জা গোপন করিল। জীবনে লজ্জাকর বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া মানুষের যখন কোন উপায় থাকে না—তখন অনেক সময় সে জোর করিয়া টানিয়া আনে কৃত্রিম একটা দম্ভপূর্ণ সাহসিকতা। কিন্তু তাহাব জীবন যেমন অল্প তেমনি যে মূল্যহীন। মুহূর্তে মুহূর্তে স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো সে ভাঙিয়া পড়ে। নলিনীব ঠিক এমনি একটি অবস্থা আসিয়াছিল। সে টেবিলের উপর মুখ গুঁজিযা উদ্যত ক্রন্দন সম্বরণের চেষ্টা করিতে চাহিল।

বাহিরেব একটা ছোঁড়া ফিরি করিয়া ফিরিতেছিল—গরম চা—চা গরম বাবু।

দাবোগা হাঁকিল—এই বেটা চা গবম—এই। দে ত এখানে চা দু'-কাপ। আপনি খাবেন চা? আমাদের লেডি-ডাক্তারকে বলছি।

নলিনী টেবিলেব উপবেই মাথা নাড়িয়া অনিচ্ছা জ্ঞাপন কবিল।

মিত্তিব মশায কহিল—তবে আর দু' কাপ নেবেন কেন?

দারোগা বলিল—আপনি?

গলার মালায হাত দিযা মিত্তিব মশায় উত্তর কবিল—আজ্ঞে না, চা কি পান, কি তামাক, বিড়ি কি সিগারেট ও আমি খাই না। ওগুলো তো জীবনে নেসেসিটি নয, না কি বলেন দাবোগাবাবু জীবনে চা খেয়েছি তিন কাপ। বুঝলেন কিনা—১২৯৫ সালে আষাঢ় মাসে। বেশ মনে আছে ২৫শে আষাঢ আমাব সর্দি করেছিল খুব—চা তখন দেশে নতুন উঠেছে, সেই একদিন এক কাপ খেয়েছি। আব সেকেন্ড কাপ খাই এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিয়ে—সে হলো আপনাব ১৩০২ সালের ১২ই মাঘ। রাত্রে পডতে পডতে ঘুম আসছিল, সেদিন খাইয়েছিল আমাদের ক্লাস ফ্রেন্ড—হরগোবিন্দ সেন—সে এখন মুন্সেফ।

দারোগা কহিল—জানি তাঁকে আমি, হুগলিতে ছিলেন তিনি—

সঙ্গে সঙ্গে মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—বোধহয় নাইন্টিন এইট থেকে নাইন্টিন ইলেভেন পর্যন্ত হুগলিতে ছিল হরগোবিন্দ। সেই দিন আমাকে খাইয়েছিল। আর একদিন বর্ষায় খুব ভিজে জিয়াগঞ্জ স্টেশনে এক কাপ চা কিনে খেয়েছি। সে বোধ হয় ১৩২৭ সালেব শ্রাবণে—১৬ই শ্রাবণ। তা নইলে আমি জীবনে চা কখনও খাইনি। দোকানে মিষ্টিও কখনও খাইনি আমি—মিষ্টির মধ্যে বাতাসা আর গুড়। হোটেলেও ভাত কখনও খাই না, যেখানে যাই আলু-ভাতে-ভাত—ওই একপাকে যা হলো আর কি—তাই খাই। আমার ব্যাগে সব থাকে—চাল, ডাল, আলু, নুন, মসলা—শিশিতে তেল—

দারোগা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—তাহলে ব্যাগও তো আপনার মস্ত বড়। চামড়ার—

জিব কাটিয়া মিত্তির মশায় বলিল—রাম রাম—ক্যাম্বিসের, চামড়ার জুতোই আমি পায়ে দিই না। ক্যাম্বিসের—

মিত্তির মশায়ের কথায় একটা বাধা পড়িল। একজন আগন্তুক দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—মাস্টার মশায় টিকিটটা কাকে দেব? কেউ নেই ত গেটে। টেবিল-ল্যাম্পের আলোক পরিপূর্ণভাবে আগন্তুকের দেহের উপর পড়িয়াছিল। একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক—গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ তাহার, শুভ্র একটি পাঞ্জাবিতে তাহাকে মানাইয়াছিল বড় চমৎকার।

দারোগা তাহাকে দেখিবামাত্র নমস্কার করিয়া বলিয়া উঠিল—নমস্কার সঞ্জীববাবু, এই ট্রেনে নাকি?

সঞ্জীবও প্রতি নমস্কার করিয়া বলিল—নমস্কার। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ট্রেনেই এলাম জামালপুর থেকে। তারপর আপনারা কোথায়?

দারোগাবাবু কোন উত্তর দেবার পূর্বেই মিত্তির মশায় চেয়ার ছাড়িয়া বিলক্ষণ হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—প্রণাম। ভাল আছেন সঞ্জীববাবু?

প্রত্যুত্তরে সঞ্জীব ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যভিবাদন করিযা কহিল—প্রণাম। হ্যাঁ ভালই আছি। তারপর আপনি কেমন?

ভদ্রলোক একেবারে আঁতকাইয়া উঠিলেন, অদ্ভুত ভঙ্গিতে কহিলেন—রাধে, রাধে, রাধে! ই—কি ব্যবহার মশায—আপনার, ই—কি ব্যবহার মশায়? ই—তো ভাল নয়? আপনি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র—

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—প্রণাম করলে আমি প্রণামই করে থাকি মিত্তির মশায়। কারও প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি না।

মিত্তির মশায় অবজ্ঞাভরে কহিল—এ-সব হলো আজকালকার ফ্যাশান—না কি বলেন দারোগাবাবু। বাঙালীর মতো ফ্যাশানের দাম আর কোনও জাতে নেই। এ্যা—না কি বলেন দারোগাবাবু—এ্যা?

সঞ্জীব উত্তর দিল—সেইটেই বাঙালীর জীবনে বড় ভবসার কথা মিত্তির মশায়। সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে পারে, নতুনকে সাগ্রহে বরণ কবে নিতে পারে—এমনি জাতই পৃথিবীকে ভবিষ্যতে নতুন কিছু দিতেও পারে। যাক মাস্টার মশায় গেলেন কোথায়? টিকিটখানা দিই কাকে?

মিত্তির মশায কিন্তু কথাটা এত সহজে ভুলিতে পারিল না। সে কহিল—আচ্ছা আপনি জাত মানেন না?

—না।

—তবে পৈতে রাখেন কেন আপনি গলায়?

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—পৈতে তো রাখি না।

—রাখেন না?

—না।

—আপনি তা হলে অতি—অতি—। যোগ্য বিশেষণ বোধহয় মিত্তির খুঁজিয়া পাইল না।

সঞ্জীব কৌতুকভরে কহিল—অতি অতি—তারপর কি বলুন মিত্তির মশায়!

দারোগাও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। মিত্তির মশায়ের অঙ্গ কিন্তু জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—জানি না মশায়, যান। বামুনকে গাল দিয়ে আমি পাপের ভাগী হই আর কি? না কি বলেন দারোগাবাবু—এ্যাঁ? নাইন্টিন ফোরে বর্ধমানে রমেশ চাটুজ্যে উকিল ব্রাহ্মধর্ম যখন নেয় বুঝলেন কিনা, তখন এমনি একদিন আমাব সঙ্গে মহা তর্ক। আমি বলেছিলাম, মশায় এর পর বুঝবেন—এখন রক্তের তেজ আছে—এর পর বুড়ো বয়সে বুঝবেন। হয়েছেও তাই—গত বৎসর মাঘ মাসে বোধ হয় ১৮ই তারিখে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। কত দুঃখই করলেন রমেশবাবু, বললেন মিত্তির মশাই, এ হয়েছে আমার সাপের ছুঁচো গেলা, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে গেলাম।

সঞ্জীব টিকিটখানা টেবিলের উপরে রাখিযা দিযা কহিল—থাক টিকিটখানা এইখানেই। আমি যাই, রাত্তির হচ্ছে।

দারোগা অনুরোধ করিয়া বলিল—আবে বসুন না মশায়, যাবেনই তো। চা খান এক কাপ।

এই—এই বেটা চা-গরম।

বাধা দিযা সঞ্জীব কহিল—থাক, দরকার হবে না দারোগাবাবু। অনর্থক ব্যস্ত হবেন না আপনি।

দারোগাবাবু প্রশ্ন করিল—তারপর ক'দিন থাকবেন এখানে? করছেন কি আজকাল?

এ প্রশ্নে সঞ্জীব হাসিযা ফেলিল। কহিল—একটা কথা মনে পড়ে গেল দারোগাবাবু। একজনের গাড়ি মেরামতের দরকার হয়েছিল, পথে কামারকে দেখে পথেই ধরেছিল যে এটা তুমি এখানেই মেরামত করে দিয়ে যাও।

দাবোগাও হাসিয়া উঠিল—তারপর বলিল—মাপ করতে হবে সঞ্জীববাবু—যে উদাহরণটা দিলেন ও অভ্যেস এ সংসাবে একটা লোক বাদ দিয়ে বোধকবি ন'শো নিবানব্বই জনের। কে বেশি খাটতে চায় বলুন?

সঞ্জীব বলিল—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

বাধা দিয়া দারোগাটি কহিল—থাক, সঞ্জীববাবু, প্রশ্ন আমি বুঝেছি। কিন্তু এ প্রশ্ন আপনার কাছে প্রত্যাশা কবিনি। পৃথিবীতে চিরদিন নতুন এবং সরলকে সন্দেহ বা চোখে চোখে সবাই রেখে এসেছে, এবং ভবিষ্যতেও বোধকরি রাখবে। যাকে বোঝা যায় না সেই এ সংসারে আশঙ্কার বস্তু।

—যাক ও কথা মশায়—ও আলোচনায় ফল নেই। আপনার কথার বরং উত্তর দিই। এখন এখানে কিছুদিন থাকব। মায়ের শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না—তার ওপরে বয়সও হয়েছে তাঁর, কোনদিন হয়ত মারা যাবেন, শেষ মুহূর্তে দেখা হবে না—বা হয়ত সৎকারই হবে না।

চট করিয়া মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—মা মারা গেলে কি করবেন আপনি—কোন্ মতে সৎকার করবেন?

সঞ্জীব বলিল—কথাটা আপনি এখনও ভোলেননি দেখছি। মায়ের সৎকার আমার হিন্দু মতেই করতে হবে, কারণ মা আমার নিষ্ঠাবতী হিন্দু। তাঁর অভিপ্রায় এবং তাঁর ধর্মপদ্ধতি অনুযায়ী, তাঁর সৎকার হওয়াই সঙ্গত। নইলে সৎকার যে কোন মতে করতে আমার বাধা নেই। যে কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বা সৎকারে আমি যোগ দিতে পারি বা দিয়ে থাকি। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন সে ভাবিল—তারপরে কহিল—বেশ লাগে আমার অন্ধকার রাত্রে নির্জন বসতিহীন প্রান্তরে জ্বলন্ত চিতার উপর শবদাহ দেখতে। চোখের ওপর দেহখানা ছাই হয়ে যায়—জ্বলন্ত আগুনের উপর থাকে শুধু ওই সত্যটি আর চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে লীন হয়ে যায় স্বার্থপর সংসাব।

অকস্মাৎ সে হাসিয়া কহিল—বড্ড বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে গেছি দেখছি। থাক চলি দারোগাবাবু।

নলিনী মুখ তুলিয়াছিল—অশ্রুর চিহ্ন তখনও মুখে পরিস্ফুটরূপে দেখা যাইতেছিল। সে কহিল—একটু দাঁড়ান।

সঞ্জীব বিস্মিত হইয়া কহিল—আমাকে বলছেন? আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে আগে—ও আপনি লেডি-ডাক্তার না?

নতমুখে নলিনী বলিল—হ্যাঁ। বড বিপদে পড়ে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

সঞ্জীব দারোগার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—দারোগা বোধ হয় প্রস্তুতই ছিল—

সে বলিল—আপনার বোধ হয় এর মধ্যে থাকা উচিত হবে না সঞ্জীববাবু। এঁর বিরুদ্ধে চুরির চার্জ দিয়ে ডায়েরি করেছেন মহেন্দ্রবাবু।

নলিনী উত্তেজিতভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—না—না—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা। আমি আর যাই হই চুরি করতে আমি পারি না। আমায় আটকে রাখতে চায় এরা। সে আর কিছু বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

সঞ্জীব দারোগার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা কবিল—কি চুরি করেছেন ইনি দারোগাবাবু?

মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—এ আপনার ইললিগাল হচ্ছে মশায়। পাবলিক সারভেন্টের কর্তব্যে বাধা দেওয়া বে-আইনি। নাইন্টিন টোয়েন্টি নাইনে ডিসেম্বরের রেকর্ড খুলে দেখবেন সিমিলার কেস এই থানাতেই হয়েছে।

সঞ্জীব সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না, সে দারোগাকেই প্রশ্ন করিল—কি চার্জ দারোগাবাবু?

দারোগা বলিল—হাসপাতালের ইনস্ট্রুমেন্ট আর কিছু নগদ টাকা ইনি নাকি চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতা।

—সে সব জিনিস কি এঁর কাছে পাওয়া গেছে?

—না। তবে কিছু টাকা—একখানা দশ টাকার নোট স্টেশন মাস্টারের কাছে

পেয়েছি, ইনি টিকিট করেছেন তা দিয়ে—নোটখানার পেছনে মহেন্দ্রবাবুর এস্টেটের স্ট্যাম্প মারা আছে।

নলিনী কহিল—সে আমাব মাইনের টাকা। ওঁদের এস্টেট থেকেই মাইনে পেয়েছি আমি।

সঞ্জীব বলিল—আপনারা এখন কি করতে চান দারোগাবাবু?

দারোগাটা প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া উত্তর দিল—আপনি কি এঁর জামিন হতে পারবেন সঞ্জীববাবু? কেসের সময় হাজির করে দেবেন। কিন্তু এ ব্যাপারটায় আপনি হাত না দিলেই ভাল হত—বোধ হয় আপোসেই মিটে যেত। আর জানেন ত মহেন্দ্রবাবুকে—

মৃদু হাসিয়া সঞ্জীব বলিল, জানি, সেই জন্যেই এঁর কথায় অবিশ্বাস করতে পারছি না আমি।

মিত্তির মশায় অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল—এই মাগীব পরিচয় জানেন?

রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব কঠিন স্বরে কহিল—চুপ করুন আপনি।

পিছনে মনিবের জোর থাকিলে কুকুর সহজে ভড়কায় না। এতবড জমিদারের কর্মচারী এতটুকুতে দমিল না, বলিয়া উঠিল—মাগী খৃস্টান—

স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব বলিল—আর কিছু বলবার আছে আপনার?

এই দৃষ্টিতে মিত্তির মশায় একটু দমিয়া গেল, সে ঈষৎ মৃদুভাবে বলিল—বাবুর—বাবুর রক্ষিতা—

—আর কিছু?

মিত্তির মশায়ের বাক যন্ত্রটার দম যেন ফুরাইয়া গেল, অতি শিথিল মৃদুভাবে সে কহিল—না।

ও-পাশে টেবিলটার উপর মাথা রাখিয়া নলিনী মুখ লুকাইয়া ছিল। রুদ্ধকণ্ঠের কয়েকটি কথা ভূমিতলে প্রতিধ্বনিত হই৷া সকলের কানে আসিযা পৌঁছিল—সত্যি সত্যি।

সঞ্জীব এক মুহূর্তের জন্য নলিনীর পানে তাকাইয়া কহিল—আমি এঁর জামিন হচ্ছি দারোগাবাবু।

দারোগা উঠিয়া কহিল—আসুন তাহলে থানায়, জামিননামায় সই করে দিতে হবে আপনাকে।

জামিনের আবশ্যকীয় কাগজপত্রে সহি ইত্যাদি শেষ করিতে রাত্রি অনেকটা হইয়া গেল। মিত্তির মশায় প্রয়োজনীয় বিবরণটুকু নীর হইতে ক্ষীরের মতো ছানিয়া ছানিয়া ছোট নোট বইখানিতে নোট করিয়া লইল। তারপর আসন ছাড়িয়া উঠিবার সময় সঞ্জীবকে বলিল—প্রণাম সঞ্জীববাবু, কাজটা আপনার মতো লোকের যোগ্য কাজ হলো। আর কি জানেন, এ কাজ মানায়ও আপনার মতো লোককে।

সঞ্জীব হাসিয়া কহিল—প্রণাম। কিন্তু আপনাদের চোখেও কি আমাদের যোগ্যতা ঠেকে মিত্তির মশায়?

মিত্তির মশায় সঞ্জীবের কথা শেষ হইবার পূর্বেই লাফাইয়া উঠিয়াছিল, রাধে রাধে, গোবিন্দ হে! আপনি যে কি করেন সঞ্জীববাবু, ছি-ছি-ছি। না—না, রাধে রাধে—এ আপনার ভারি অন্যায় মশায়। আপনি ভারি ইয়ে।

সঞ্জীব উত্তর দিল—স্টেশনে তো এর আগে অনেক কথা হয়ে গেল, তারপর যে আপনি এমনি ভুল করে বসবেন এ আমি কেমন করে বুঝব বলুন!

মিত্তির মশায় সহসা সঞ্জীবের হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিল—দোহাই সঞ্জীববাবু, আমাকে আর পাপের পঙ্কে ডোবাবেন না। পায়ের ধুলো আমায় দিন। আর রহস্য করবেন না।

সঞ্জীব ধীরভাবে কহিল—আমি কি রহস্যের ভঙ্গিতে আপনার সঙ্গে কথা কয়েছি এতক্ষণ? আমার তো তা বোধ হয় না। সত্যিই আপনাকে আমি বলছি—আপনাকে আমি বহস্য করিনি—এ আমার ধর্ম! আপনার ধর্মে যেমন কতকগুলো আচার আছে এও তেমনি আমার ধর্মের নিয়ম, আচার, আমার চেয়েও হীন বলে কারও প্রণাম গ্রহণ করি না।

মিত্তিব মশায তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পরিত্যক্ত চেয়ারটায় আবার বসিযা পড়িল। তারপর উর্ধ্বমুখে থানার চাল কাঠামোর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাদের থানাটি কিন্তু বেশ চমৎকার, দারোগাবাবু। চালের কাঠামো কি! অথচ দেখুন একশো বছরের বেশি দিনের ঘর। আঁজকাল এমন আর হয় না—না কি বলেন, এ্যাঁ?

—নবগ্রামে একখানি এমনি ঘর আছে—বুঝলেন, হারাধন চাটুজ্যের ১২২৫ সালের ঘর, অথচ এখনও কি শক্ত।

সঞ্জীব দারোগাকে নমস্কার করিয়া নলিনীকে কহিল—আসুন।

মিত্তির মশায় দারোগাকে বলিতেছিল—এরও বয়স অনেক দিনের। বড়দলে সাল সন লেখা আছে। ১৩০৩ সালে এ থানায় আমি প্রথম আসি, বুঝলেন দারোগাবাবু, তখন দেখেছি, বোধ হয় ১২৪৮ সাল লেখা আছে, নয় দারোগাবাবু, এ্যাঁ?

ততক্ষণে সঞ্জীব নলিনী ও রমাকে লইযা রাস্তার উপর নামিয়াছে। দারোগাবাবু মিত্তির মশায়ের কথার কি একটা জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু মিত্তির মশায় বাধা দিয়া বলিযা উঠিল, আগে আলোটা একবার দেন তো মশায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আলোটা তুলিয়া লইয়া একটা জায়গার মাটি লইয়া মাথা বুকে বুলাইয়া লইল। ঐ স্থানটিতেই সঞ্জীব দাঁড়াইয়া ছিল। আলোটা নামাইয়া দিয়া মিত্তির মশায় কহিল—দেখুন দেখি মশায় এঁচোড়-পক্ক বামুনের ছেলের কাজ। আরে বাপু বামুনের ছেলে তুই। দেশের অধঃপতন দেখুন দেখি একবার। রাধে রাধে! ধর্ম গেলে আর রইল কি? নমস্কার দারোগাবাবু; কিন্তু কাজটা আপনি ভাল করলেন না মশায়। জামিনটা না দিলেই হত। বড় দারোগাবাবু থাকলে—

দারোগাবাবু মৃদু হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন—ঐ ছেলেটি বড় পাকা ছেলে মিত্তির মশায়—সাহস হলো না। পরশু খবরের কাগজেই বোধ হয় যেটুকু ঘটল এ সংবাদটুকুও

দেশময় রটে যাবে। নিজের মাথার দামটা নিজের কাছে খুব বেশি মিত্তির মশায়! কি বলেন আপনি?

মিত্তির মশায় আবার চাপিয়া বসিল। কহিল—যা বলেছেন মশায়। এর একটা বিহিত—

দারোগাবাবু বলিলেন—আপনার বাবুকে বলুন না। একটা দুগ্ধপোষ্য বালককে জব্দ করতে তিনি পারছেন না! ওরে আমার খাবার তৈরি করতে বল তো। তাহলে—

জোড়হাতে বিনীত নমস্কারের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাইয়া সদর রাস্তার দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিলেন।

মিত্তির মশায় অগত্যা উঠিল। থানা হইতে পথে নামিতে নামিতে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—পড়ে ডেঁপোটা একবার একটা ফৌজদারী মামলায়!

রাস্তায় নামিয়া সঞ্জীব কহিল—তারপর আপনি এখন কোথায় যাবেন?

নলিনী অসঙ্কোচেই উত্তর দিল—আপনার বাড়ি। নইলে আর এ গ্রামে আমায় আশ্রয় কে দেবেন বলুন? আপনার পরিচয় শুনেছিলাম—দু' একবার দেখেওছিলাম—তাই স্টেশনে আপনার আশ্রয় চেয়েছিলাম। নইলে এখানে অপর কোথাও আশ্রয় নিলে ঘুমিয়ে উঠে দেখতাম যেখানকার মানুষ সেখানেই আছি।

সঞ্জীব একটু নীরব থাকিয়া বলিল—সে প্রস্তাব আমি আগেই করতাম এবং করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাতে একটু অসুবিধা—আপনাদেরই অসুবিধা হবে বলে মনে হয়।

বিচিত্র হাসি নলিনীর মুখে দেখা দিল। সে কহিল—আমাদের অসুবিধা!

—হ্যাঁ, আপনাদেরই অসুবিধা। কথাপ্রসঙ্গে শুনেছেন বোধ হয় আমার মা সেকেলে নিষ্ঠাবতী হিন্দু। তিনি হয়ত—

নলিনী বাধা দিয়া কহিল—মার কটু কথা বা ঘেন্নাই যদি তিনি করেন, সে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হবে সঞ্জীববাবু—। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার পরিচয় তো আপনার কাছে গোপন নেই—আমাদের জাতের গর্ভধারিণীদের মুখের পরিচয় আপনি জানেন না তাই এমন কথা বললেন। এক পাশে বারান্দায় শুয়ে থাকব রাত্রিটার মতো।

সঞ্জীব কহিল—কিন্তু সে যে আমার চোখে বড় খারাপ ঠেকবে। আপনারা আমার অতিথি—

হাসিয়া নলিনী কহিল—হাজতের চেয়ে যে সে অনেক ভাল সঞ্জীববাবু। তাছাড়া প্রচলিত যুগপ্রথায় অতিথিরও যে ক্লাসিফিকেশন সমাজে চল হয়ে গেছে। এইতো আপনাদের এখানে বাবুদের বাড়িতে সেদিন দেখলাম মুসলমান রাজকর্মচারীর এঁটো কাপ ধরে নিতে দশ-বারোখানা হাত একসঙ্গে এগিয়ে এল। আর তারই সঙ্গে ছিল একটি ব্রাহ্মণ কনেস্টবল—সে বেচারা চা পেলেই না সেদিন,—সে জলে ভিজেও ছিল, সেই ভিজে অবস্থায় সত্যিই হয়তো তারও এক কাপ চায়ের দরকার ছিল।

সঞ্জীব বলিল—এটাতে গৃহস্থের আতিথ্য ক্ষুণ্ন হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু যতখানি

ওজনের দোষ আপনি চাপাচ্ছেন ততখানিও সত্যি নয় বলে আমার মনে হয়। জাতিভেদ আমি মানি নে। যে মানে তার কাছেও অতিথির জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। সুতরাং স্বজাতি ভিন্ন জাতির কথাটা ধরা যায় না। তারপর যে ভেদ সেটা হয়েছে গুণ কৌলিন্যে—ধন কৌলিন্যের অপরাধ ওখানে স্পর্শ করেনি। ওইটেই আমার মনে হয় সবচেয়ে হীন কৌলিন্য—ওটা একটা অপরাধ।

সঞ্জীবের এ কথাটা নলিনীর বেশ পছন্দ হইল না কিন্তু যে লোকটি তাহাকে এ হেন বিপদে মাত্র একটি অনুরোধে জীবনের অমার্জনীয় অপরাধ উপেক্ষা করিয়া উদ্ধার করিল—আবার আশ্রয় দিতে চলিয়াছে, তাহার সহিত এ লইয়া তর্ক করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ভাবিল মতের মর্যাদার চেয়ে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ তাহার বহুগুণে বেশি হওয়া উচিত। আজ যদি সে মতের মর্যাদা করিতে চায় তবে সে নিজের অমর্যাদাই করিবে বেশি।

অবসর পাইয়া রমা মৃদুস্বরে বলিল—দিদিমণি আমাদের বাড়ি চল না?

নলিনী স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুমি কি অদ্ভুত ছেলেমানুষ রমা! এই রাত্রের অন্ধকারে—এই দেশের পথ দিয়ে তোমাদের বাড়ি যেতে তোমার সাহস হয়?

লজ্জিত হইয়া রমা কহিল—না—না। তবে বাবুর মা বকবে বলছিলে যে তাই—

সঞ্জীব ব্যস্তভাবে একথার জবাব দিলে—না না না। সে ভয় নেই। মা কটু কথা কখনও বলবেন না। তবে তিনি স্পষ্টভাষিণী। স্পষ্ট সত্য অনেক সময় রূঢ় হয়। আর ছোঁওয়া-নাড়ার বাছবিচার তিনি করে থাকেন, এই পর্যন্ত।

নলিনী হাসিয়া কহিল—কাকে কি বলছেন সঞ্জীববাবু? কটু কাকে বলে সে ও বোঝে না। সত্যই বা কি বস্তু সেও ও জানে না। ওর কথা আপনি ধরবেন না। ভাল করে না দেখলে ও যে কি সে বিচার করা যায় না।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—উনি কে?

—ও উনি নয়। জগতে ও সকলের স্নেহাস্পদা হবার যোগ্যা। ওর পরিচয় এর পরে বলব। ওর দৃষ্টিতে এ সংসারে খারাপ ও কাউকে দেখেনি। ওদের গ্রামের মহাজন এককড়ি গাঙ্গুলীও ওর কাছে দেবতুল্য ব্যক্তি।

সদর রাস্তা হইতে একটা গলির পথে মোড় ফিরিয়া সঞ্জীব কহিল—তাইতো—একটা আলো হলে ভাল হত। অচেনা গলি, পথে চলতে—

অকস্মাৎ পাশের কোন অন্ধকার গোপন স্থান হইতে একটি লোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সঞ্জীব চমকিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

চাপা গলায় উত্তর হইল—আমি—আমি গাঙ্গুলী-খুড়ো, এককড়ি গাঙ্গুলী। তারপরে ভাল আছ তো বাবা সঞ্জীব?

সঞ্জীব বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—আপনি এখানে এমনভাবে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ছিলেন? এমন ধারা চাপা গলায়—

—দেওয়ালেরও কান আছে রে বাবা, দেওয়ালেরও কান আছে। ক্ষেত্রেকর্ম

বিধিয়তে—বুঝলে বাবা। এ গাঁয়ে তুমি যে কথাটি চেঁচিয়ে বলেছ—তিন কান করেছ সেইটাই গিয়ে কাছারিতে রিপোর্ট হয়েছে।

সঞ্জীব এখানকারই মানুষ—এখানকার মানুষের পরিচয় তাহার অজ্ঞাত নয় এবং এখানকার প্রচলিত ভাষার প্রচলনগুলোর অর্থও সে জানে। কাছারির উল্লেখ করিতেই সে বুঝিল এ জাল রচনায় গাঙ্গুলীর মতো কৃতী কৌশলী ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন হস্তও আছে। সে কহিল—এ ব্যাপারে তাহলে আপনি সব জানেন?

স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতকণ্ঠে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—পাষণ্ড, পাষণ্ড, মহাপাষণ্ড, বুঝলে বাবাজী চণ্ডাল নরাধম বেটা। ধন থাকলেই কিছু মানুষ হয় না, ধার্মিক হয় না, মহাপুরুষ হয় না। জিজ্ঞাসা কর এই এঁকে—আমাদের লেডি-ডাক্তারকে, ভাল মানুষের মেয়ে উনি—নিজে অতি ভাল লোক। মুখের সামনে বললে মনে হবে তোষামোদ করছি, কিন্তু সত্যি বলছি আমি, অতি মহৎ লোক উনি। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর তুমি কি মহাপাষণ্ড চণ্ডাল—ইতর—

অনর্গল অর্থহীন প্রলাপের কোন জবাব হয় না। সঞ্জীব বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল—কি সব বাজে বকছেন আপনি? চুপ করুন।

ইহাতেও গাঙ্গুলী নিরস্ত হইল না। সে এদিক-ওদিক চাহিয়া লইয়া সঞ্জীবের কানের কাছে সহসা মুখটা লইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল—ওই শালা মহেন্দ্রবাবু।

সঞ্জীব উষ্ণভাবে কহিল—বুঝলাম, কিন্তু তার প্রতিবিধান আমি কি করতে পারি! তাছাড়া ওরকম ধারা গালাগাল দেওয়া পছন্দ করি না গাঙ্গুলী মশায়।

গাঙ্গুলী উচ্ছ্বাসভরে কহিল—সেই কথাই তো বলি—যে ধার্মিক হবে, যার মনুষ্যত্ব থাকবে, সৎশিক্ষা যার আছে, সে তো এই কথাই বলবে। এই তো তাদের কাজ। এই এত বড় গ্রামে সহায়হীনা দুটি স্ত্রীলোক বিপদাপন্ন হলো, তা কোন বেটার সাধ্যি হলো না আঙুলটি তুলতে—। যত সব গরু-ভেড়ার জাত, বিষকুম্ভ পয়োমুখম—

নলিনীর বিরক্তি বোধ হইতেছিল—সে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল—সে ধরনের মানুষ আমরা দেখেছি গাঙ্গুলী মশায়। এ নিয়ে মিছে আর চিৎকার করবেন না আপনি।

চট করিয়া গাঙ্গুলী জবাব দিল—সে তো হাজারে হাজাবে সংসারে রয়েছে—দেখবেন বৈ কি। এই আমাকেই দেখুন না। আমিও তো তাই। নইলে ওই চণ্ডাল ইতরের তাঁবেদারী করি আমি স্বার্থের জন্য—।

নলিনী অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটাকে উলঙ্গভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া দেওয়ায় সে লজ্জিত না হইয়া পারিল না। তাহার মনে সন্দেহ জন্মিয়া গেল যে হয়তো বা লোকটাকে যাহা সে ভাবিয়া আসিয়াছে ততখানি হীন সত্যই সে নয়। স্বার্থের দাস তো সংসারে হাজারে ন' শো নিরানব্বই জন। কিন্তু স্বার্থে অন্ধ সেই নয় যে স্বার্থপরতা হেতু গ্লানি অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। মানুষ তাহার অন্তরে আজও বাঁচিয়া আছে।

সঞ্জীব কহিল—আমার কাছে কি আপনার কোন দরকার আছে? অত্যন্ত শুষ্ক কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গিটি পর্যন্ত উগ্র।

গাঙ্গুলী কিন্তু বিরক্ত হইল না। সে মোলায়েম করিয়া বলিল—আছে বৈ কি বাবা। সৎকর্ম্ম করলে আশীর্বাদ করতে হয়। সেটা যে অবশ্য কর্তব্য। সেই আশীর্বাদ করব বলেই—নইলে আমার গাড়ি সন্ধ্যে থেকে এসে বসে আছে। আর এই রমাকে নিয়ে যাব। ওর বাপ-মা কেঁদে কেঁদে নদী গঙ্গা ভাসালে। মহাপাতক থেকে মুক্ত হব বাবা আমি। তোমারই দৌলতে—সৎসাহসে, নইলে মহাপাপে ডুবতে হত আমাকে।

নলিনী ইহার উত্তর দিল—কাল ওকে নিয়ে যাবেন গাঙ্গুলী মশায়। এই রাত্রে—

বাধা দিয়া গাঙ্গুলী কহিল—কোন ভয় নেই আপনার—কোন ভয় নেই। এমন পথ দিয়ে নিয়ে যাব যে কীটপতঙ্গে টের পাবে না।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—সে হবে না গাঙ্গুলী মশায়। ও যখন আমার আশ্রয়ে এসেছে তখন তো এমনভাবে আপনার হাতে দিতে পারব না আমি। কাল ওর বাপকে সঙ্গে করে এখানে আসবেন, আমি বিবেচনা করে তখন যা হয় করব।

চমকিয়া উঠিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—তার মানে ?

পরিষ্কার কণ্ঠে সঞ্জীব উত্তর দিল—তার মানে আপনাকে বিশ্বাস করে ওকে আপনার হাতে আমি দিতে পারব না।

—আমি যজ্ঞোপবীত ছুঁয়ে দিব্যি করছি—

—যজ্ঞোপবীতে আমার বিশ্বাস নেই গাঙ্গুলী মশায়—আমার নিজেরও পৈতে নেই।

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী বলিল—আচ্ছা বাপু সে তুমি নাই বিশ্বাস কর কিন্তু রমা যখন যেতে চাচ্ছে তখন তুমি আটক করবার কে শুনি ?

সঞ্জীব কোন কিছু বলিবার পূর্বেই নলিনী রমার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, রমা ? যেন তাহার বিশ্বাস করিতেই কষ্ট হইতেছিল।

মৃদুস্বরে রমা কহিল—আমি বাড়ি যাব দিদিমণি।

গদ গদ হইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—ওই ওই, শুনলে তো বাবা সঞ্জীব। রমা বলছে ও বাড়ি যাবে।

নলিনী বলিয়া উঠিল—কিন্তু উনি যে আমাদের জন্যে জামিন হয়ে এলেন সে জামিনের—

মধ্যপথেই সঞ্জীব কহিল—না, সে শুধু আপনার জন্যে। ও মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযোগও ছিল না—জামিনও আমায় হতে হয়নি।

তারপর রমাকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল—যাও তুমি তাহলে ওঁর সঙ্গে। বলিয়া সম্মুখের গৃহদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—মা মা মা।

পিছন হইতে গাঙ্গুলী আবার ডাকিয়া বলিল—ওগো বাবাজী, আর একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। আমার সেই বন্ধকী তমসুকখানা—অনেকদিন হয়ে গেল—তোমার বাবার আমলের ব্যাপার।

সঞ্জীব যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—কি—কি বলছেন আপনি ? সে তো—

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া হ্যারিকেন হাতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা বাহির হইয়া

কহিলেন—সঞ্জীব? কখন এলি বাবা? আর কার গলা শুনছিলাম? এ মেয়েটি কে রে?

সঞ্জীব কহিল—দাঁড়াও সে সবই শুনবে। গাঙ্গুলী মশায়—কই গাঙ্গুলী মশায়?

গাঙ্গুলীকে দেখা গেল না, রমাও নেই—নিরন্ধ্র অন্ধকার পিছনে থম থম করিতেছিল।

নলিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, কহিল—কাল স্নানে যখন যাবেন তখন আপনার পায়ের ধুলো নেব। আজ ভাগ্যে আমার নেই মা।

মা মেয়েটির মুখের ওপরে আলো ধরিয়া আর একবার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন—ইনি এখানকার মেয়ে-ডাক্তার নয় রে সঞ্জীব?

সঞ্জীব তখনও বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে গাঙ্গুলীর সন্ধান করিতেছিল, সে সেই অবস্থাতেই উত্তর দিল—হ্যাঁ মা।

মায়ের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি একটু সরিয়া গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—ইনি এখানে কেন?

কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় চমকিয়া উঠিয়া সঞ্জীব মুখ ফিরাইল। সে কোন উত্তর দিবার পূর্বে নলিনীই উত্তর দিয়া বসিল—আপনার বাড়ি অধিকাংশ লোকেই যে জন্যে আসে, মা আমিও সেই জন্যে এসেছি। আমি বড় বিপদে পড়েছি, মা। এখানকার মহেন্দ্রবাবু আমায় জেলে দিচ্ছিলেন আমি চুরি করেছি বলে। পথে স্টেশনে সঞ্জীববাবুর দেখা পেয়ে ওঁর আশ্রয় চেয়েছিলাম। ইনি জামিন হয়ে আমায় উপস্থিত মুক্ত করে এনেছেন।

মায়ের মুখ আরও থম থম হইয়া উঠিল। তিনি সঞ্জীবকে কহিলেন—এর পরিচয় তুমি জান সঞ্জীব?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ যেন রন্ রন্ করিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—জানি মা, স্টেশনের মহেন্দ্রবাবুর কর্মচারী সতীশ মিত্তিরের কাছে সমস্ত পরিচয় পেয়েছি। সে যত গ্লানিকর ইতিহাস ছিল সব আমায় জোর করে শুনিয়ে তবে ছেড়েছে। ইনিও অকপটে সত্য যেটুকু স্বীকার করেছেন। কিন্তু মা ইনি যাই হোন, ইনি স্ত্রীলোক আর বেশ বুঝলাম আমি, মিথ্যা ষড়যন্ত্রে এঁকে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে শুধুমাত্র বিপদাপন্ন করে এঁকে আয়ত্ত করবার জন্য। সেক্ষেত্রে—

উষ্ণভাবে কথার অবশেষটুকু যেন মা শেষ করিয়া দিলেন, কহিলেন—তাই তোমার অমনি দয়া হয়ে গেল—কেমন?

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল, এ-কথার কোন জবাব দিল না। উত্তর দিয়া মাকে সে আর অধিক উত্তপ্ত করিল না। নলিনীর বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। এতখানি কল্পনা করে নাই সে। তাহার মনে হইতেছিল এর চেয়ে থানা হাজত বহুগুণে ছিল ভাল। সেখানে যতই না দুঃখ থাকুক অনধিকারের হীনতা সেখানে তাহার ছিল না। আর চোরের অপমান তো তাহার হইয়াই গিয়াছে। লাঞ্ছনা যেখানে যতই থাকুক—গঞ্জনা সেখানে ছিল না।

মা কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন—এস বাড়ির ভেতর এস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে আর হবে কি? এস গো তুমিও এস, তোমার আর

দোষ কি বল ? আমার দয়ার সাগর ছেলে তোমায় না আনলে তো আর তুমি আসতে না বাছা। এ যদি আগে জানতাম আমি তবে যে গর্ভে আগুন ধরিয়ে দিতাম। নাও মহাপুরুষ, মুখ-হাত ধুয়ে ফেল—কাপড় ছাড়, না এই আশ্বিনের রাত্রেই স্নান হবে ?

সঞ্জীব কহিল—স্নানই করব। সে ব্যাগ খুলিয়া কাপড় গামছা বাহির করিতে বসিল।

মা নলিনীকে কহিলেন—তুমি মুখ-হাত ধোও বাছা। এস আমার সঙ্গে, এস জায়গা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

নিজেই তিনি এক বালতি জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। দুইটি ঘরের মধ্যস্থলে তিনদিক আবরিত বেশ একটি নিরিবিলি স্থান। তলদেশটি বাঁধানো থাকায় কোন অসুবিধা নেই। একদিকের দেওয়ালের হুকে একটি কেরোসিনের ডিবে ঝুলাইয়া দিয়া কহিলেন—কাপড় ছাড়বে তো বাছা ?

ঘাড় নাড়িয়া নলিনী ইঙ্গিতে জানাইল—না।

রূঢ়স্বরে মা বলিয়া উঠিলেন—খৃস্টান হও আর যাই হও বাছা—ময়লা কাপড় ছাড়াটা উচিত। একি আচারভ্রষ্ট তোমরা! এগুলোতে ধর্ম হোক আর না হোক শরীর তো ভাল থাকে। ও তোমার কাপড়-চোপড কিছু নেই বুঝি ? দাঁড়াও সঞ্জীবের কাপড একখানা এনে দি তোমায়।

অল্পক্ষণ পরেই একখানা কাপড আনিয়া হুকে ঝোলাইয়া দিলেন। একটি সাবান নামাইয়া দিয়া কহিলেন—এই নাও সাবান রইল। আর যদি দরকার হয় তবে আমায় ডেকো, বুঝলে ?

মুখ-হাত ধুইতে ধুইতে নলিনী ভাবিতেছিল এইবার মা বোধ হয় পুত্রের উপর আর একদফা ঝাল ঝাডিবেন।

এবার আর তাহার উপস্থিতি হেতু ওই দুর্দান্ত মুখরারও যেটুকু চক্ষুলজ্জা আছে—সেটুকুও থাকিবে না। সে শিহরিয়া উঠিল।

মায়ের গলাও শোনা গেল।

মা বলিতেছিলেন—কি খাওয়া হবে মহাপুরুষ ? দুটো ভাতে ভাত চড়িয়ে দিই কি বলিস ?

ছেলে কহিল—তাই দাও।

—তবে তুই পুকুরে স্নান করতে যাবি আর শম্ভু বাগদীকে বলবি দুটো আড়ার মাছ দিয়ে যাবে সে।

—সে বলব। কিন্তু তুমি বস তো একটু, একটা কথা শোন দেখি।

—কাল সকালে শুনব কথা। যা তুই এখন স্নান করে আয়—আমার অনেক কাজ। উনোনে আঁচটা দিয়ে দিই।

নলিনী এই সময় মুখ-হাত ধুইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাতা-পুত্রের কথার সুরে সে ভরসা পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সাহস করিয়া সে বলিয়া ফেলিল—আঁচটা আমি দিয়ে দেব মা ?

মা ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—না বাছা, তুমি আমার ঘরে আগন্তুক অতিথি মানুষ।

তোমাকে ও কাজ করতে দেওয়া আমার পাপ হবে। তুমি বরং বস ওখানে, সঞ্জীব তোর সতরঞ্চিটা দে তো বের করে পেতে।

সঞ্জীব ঘর খুলিয়া একখানা সতরঞ্চি বাহির করিয়া বিছাইয়া দিল, কহিল—মা ঠিকই বলেছেন, আপনি অতিথি, আমরা আপনার পরিচর্যা করব। আপনি বিশ্রাম করুন একটু। আপনার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে আজ।

উনোনের মুখে বসিয়া আঁচ দিতে দিতে মা বলিলেন—আহা কচি মেয়ে তার উপর অত্যাচার দেখ তো?

সে কণ্ঠস্বর ওই মুখরার কণ্ঠে বিস্ময়ের বস্তু। সে স্বরকারুণ্য নলিনীকে স্পর্শ করিল। সে সতরঞ্চির উপর বসিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমস্ত দিনের যুদ্ধক্লান্ত মনের অবসাদ সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহখানিকে যেন নাগপাশের মতো বেড়িয়া ধরিল। এমনি একটি মুহূর্তের শুধু যেন অপেক্ষা ছিল, সেই মুহূর্তটি পাইবামাত্র দেহটা যেন এক নিমেষে ভাঙিয়া গেল, ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া সে সতরঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল। ঊর্ধ্বদৃষ্টির সম্মুখে শরতের নিবিড় নীল আকাশভরা ঔজ্জ্বল্য তাহার ভাল লাগিল। ভাল লাগিবারই কথা—মনে মনে তখন তাহার ক্লান্ত আনন্দ, তাহার বিপদ আজ সুসহায়ের আশ্বাসের মধ্যে নিরাপদে কাটিয়া গিয়াছে। তারার মালার মধ্য দিয়া শুভ্র ছায়াপথখানি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এখনও বর্ষার বাতাস বন্ধ হয় নাই। পুবে সজল হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল। নলিনীর চোখ দুটি আসন্ন ঘুমে নিমীলিত হইয়া আসিতেছিল।

স্বপ্নহীন নিশ্চিন্ত নিদ্রা হইতে সে জাগিয়া উঠিল সঞ্জীবের মায়ের ডাকে। ডাকিয়া তুলিয়া তিনি কহিলেন—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছ মা, ডেকে তুলতে আমারই কষ্ট হচ্ছিল। ওঠ মা, মুখে দুটো দিয়ে নাও

নলিনী লজ্জিত হইয়া কহিল—বড়ড ঘুমিয়ে পডেছিলাম।

মা কহিলেন—ঘুমের আর দোষ কি মা? মুখে একটু জল দাও, ওই ঘটিটাতেই জল আছে।

মুখে-হাতে জল দিয়া নলিনী প্রশ্ন করিল—সঞ্জীববাবু খেয়েছেন?

মায়ের কণ্ঠস্বর উগ্র হইয়া উঠিল—বলো না বাছা সে আপদের কথা—আমার জীবনের অশান্তি সে। এই রাত্রে বেরিয়েছেন মহাপুরুষ, তার এক নাইট স্কুল আছে, তাই দেখতে। তুমি খেয়ে নাও বাছা—তার অপেক্ষায় তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে! রাত এগারটার গাড়ি চলে গেল। সে যখন আসবে তখন খাবে। এই রাত্রে খবর না নিলে তার ভার ঘুম হচ্ছিল না। কখনও কোন দিন যদি শান্তি সে দিলে আমায়!

সঞ্জীবের জন্য অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকিলেও সে সাহস নলিনীর হইল না। মুখ ফুটিয়া বলিতে তাহার ভয় হইল—কি জানি এই দুর্মুখী কি বলিয়া বসিবে। আহার তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় সঞ্জীব আসিয়া উপস্থিত হইল। মা কহিলেন—পায়ে জল দে ফের। যত সব ছোটলোক পাড়া মাড়িয়ে এলি তুই।

সঞ্জীব স্যান্ডেলটা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—ছোটলোক কথাটা তোমার ব্যবহার

করা উচিত নয় মা। এবার আমি ওদের বলে দেব—না খেয়ে ওরা শুকিয়ে মরবে তবু তোমার সাহায্য নেবে না আর।

মা গর্জন করিয়া উঠিলেন—এত রাত্রে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলি নাকি তুই? যা বলছি তাই কর। মুখ ফসকে ভুল হয়ে যাওয়াটা দোষের নয়।

হাসিতে হাসিতে সঞ্জীব পা ধুইয়া কহিল—গিয়েছিলাম একবার হারাধনদার বাড়ি। ও বুড়ো তো সব জানে। ও-ও বললে, বাবা কড়ি গাঙ্গুলীর টাকা সব শোধ করে দিয়েছেন। পঁচিশ টাকা কম ছিল। তা সে টাকা ভদ্রলোকের মীমাংসায় বাবা রফা পেয়েছিলেন। গাঙ্গুলী আজ-কাল করে দলিলখানা আর ফেরত দেয়নি। হারাধনদাও কতবার ওই দলিলের জন্য গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে ফিরে এসেছে। তোমায় শুনতে বললাম তখন—শুনলে না তুমি। আমি এই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—কেন? এ কথা হঠাৎ ওঠবার কারণ কি হলো? কড়ি কি ফের সেই টাকা দাবি করছে নাকি? তার গলাও যেন শুনছিলাম তখন।

আসনে বসিয়া সঞ্জীব কহিল—হ্যাঁ মা। সেই কথাই বলছিল আজ। আমার পেছনে পেছনেই আসছিল। তুমি দরজা খুললে যে সময়—সেই সময় পালাল।

ভাতের থালাটা কোলের কাছে আগাইয়া দিয়া মা কহিলেন—আরও কত হবে এর পরে। এই তো প্রথম।

সঞ্জীব একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—কি বলছ, কিছু যে বুঝতে পারলাম না, মা।

ঈষৎ হাসিয়া মা জবাব দিলেন—ভীমরুলের চাকে আজ খোঁচা দিয়েছ—তার পাল্টা আক্রমণের সময় বুঝতে পারলাম না বললে চলবে কেন?

সঞ্জীব আরও বিস্মিত হইয়া কহিল—বল কি মা? একি মহেন্দ্রবাবুর কাজ?

—হ্যাঁ বাবা। এতে ভুল নেই। কড়ি গাঙ্গুলী মহেন্দ্রবাবুর পোষা কুকুর, সে যা করে মনিবের মনস্তুষ্টির জন্যই করে থাকে। তবে তার নিজের পেট ভরাটা হলো প্রথম লক্ষ্য।

সঞ্জীব খাইতে খাইতে ভাবিতেছিল—অকস্মাৎ সে বলিয়া উঠিল—এতদূর হীন মানুষ হতে পারে? আমি তো তার কোন অনিষ্ট করিনি।

মা বলিলেন—ওরে গ্রহদেবতায় মানুষের যখন অনিষ্ট করে তখন বিপন্নের উপকার করলে তারা উপকারীর উপর সন্তুষ্টই হন। কিন্তু মানুষ যখন মানুষের অপকার করে তখন বিপন্নের উপকার করতে গেলে মানুষ হয় রুষ্ট—মানুষের রাগের ভাগ নিতে হয়।

সঞ্জীব নীরবে আহার করিয়া গেল। মা আবার তাহাকে কহিলেন—ভয় কি বাবা? ভগবান আছেন, তিনি কখনও সৎকাজে কারও অমঙ্গল করেন না।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—ভগবান তো জানি নে মা, আমি তোমাকেই আমার ভগবান বলে মানি। ভয় আমি করব না।

মা জ্বলিয়া উঠিলেন—এইটেই তোমার সবচেয়ে বড় অপরাধ সঞ্জীব। ভগবান

মানি না, কি? এ যদি কর সঞ্জীব তবে তোমার সঙ্গে আমার বাস করা চলবে না।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—মানি নে তো বলিনি আমি, বললাম জানি নে।

মা বলিলেন—ওরে তাকে আগে মানতে হয় তবেই তাকে জানতে পারা যায়।

নলিনীর চোখ ভরিয়া জল আসিল। এত গভীর নিষ্ঠার সহিত ভগবানকে নির্দেশ তাহার কাছে কেহ কখনও করে নাই। সে যেন দেবস্থলের সান্নিধ্য অনুভব করিল। আকাশভরা তারার দিকে উদ্দেশ্য করিয়া মনে মনে সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সকালে যখন নলিনী উঠিল তখনও রৌদ্র ভাল করিয়া উঠে নাই। গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষসন্নিবেশের অন্তরাল ছাড়াইয়া সূর্য তখনও সম্মুখে আকাশের কোলে দেখা দেয় নাই। কিন্তু বাহিরে আসিয়া সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সঞ্জীবের মাযের তখন স্নান হইয়া গিয়াছে। তুলসীমঞ্চের নীচে বসিয়া তিনি দেবার্চনা করিতেছিলেন। ওদিকে রান্নাঘরের বারান্দায় উনোনে কয়লা গম্ গম্ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে। কেট্‌লিতে চায়ের জল গরম হইতেছিল।

সঞ্জীবের মা পূজায় বিরতি দিয়া বলিলেন—মুখ-হাত ধুয়ে ফেল বাছা। মাঠে যেতে সঞ্জীব চায়ের জল চাপিয়ে দুধ আনতে গেছে।

নলিনী তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইবার স্থানে গিয়া দেখিল—মাজন, বাঁশের একটি জিভছোলা, সাবান সমস্ত দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালের গাযে হুকে একখানি ধোওয়া ফিতেপাড় কাপড ঝুলিতেছিল। ওপাশ হইতে মা আবার ডাকিয়া কহিলেন—মোটা কাপডই দিতে হলো বাছা, সঞ্জীবের তো খদ্দরের কাপড় ছাডা অন্য কাপড নেই। কি করব?

এই পরিচর্যায় নলিনীর লজ্জার আর সীমা রহিল না। তাহার অপরাধ যেন পাহাড় প্রমাণ হইয়া উঠিল। সে একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল তাহাব পর শুধুমাত্র কাপড়খানি ঘাডে ফেলিয়া খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে ফিরিল একেবারে স্নান সারিযা।

সঞ্জীব উনোনের কাছে বসিয়া চায়ের জল ফোটা দেখিতেছিল। সে সদ্যস্নাতা নলিনীকে দেখিয়া কহিল—এ কি আপনি কি ওই ডোবাটায় স্নান করে এলেন নাকি?

ঈষৎ হাসিয়া নলিনী তাডাতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল, তখনও ভাল করিয়া মাথা মোছা হয় নাই।

মা পূজা সারিয়া উঠিতেছিলেন—তিনি কথাটা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—ও কি বাছা—কি ধারার মানুষ গো তুমি? আমি জল রাখলাম, সব উয্যুগ করে রাখলাম—সে তোমার পছন্দ হলো না বুঝি? শেষে জ্বর হলে তোমার সেবা করবে কে বলত? নিজেরও তো একটা বিবেচনা বলে জিনিস আছে।

নলিনী হাসিমুখেই ঘরের ভিতর হইতে উত্তর করিল—আপনার তোলা জলে কি আমি স্নান করতে পারি মা? সে পাপ যে কখনও খণ্ডন হত না আমার।

সঞ্জীবের মা অতি রূঢভাবে বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু এঁদো ডোবায় ডুব দিয়ে জ্বর হলে যে তখন আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। তখন যে আমার জাত বাঁচানো দায় হবে।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—উনি ডাক্তার মানুষ মা, রোগ ওঁদের ভয় করে।

মা বলিয়া উঠিলেন—তা করবে বৈকি। সে ভয় করে না কারুর—তোদের গাঁয়ের প্রবল-প্রতাপ মহেন্দ্রবাবুকেও না। দে বাপু দে একটা কুইনিনের পিল ওকে দে। চায়ের সঙ্গে খেয়ে নাও বাছা। আমাকে আর বিপদে ফেল না।

নলিনী বাহিরে আসিয়া কি একটা বলিতে গেল। কিন্তু তাহার মুখপানে চাহিয়াই সঞ্জীবের মা বলিয়া উঠিলেন—রাম—রাম ও কি বিচ্ছিরি করে চুল ফিরিয়েছ তুমি গো? মাঠের মতন কপাল বের করে—কি ভঙি হয়েছে তোমার? যাও যাও সঞ্জীবের ঘরে আয়না চিরুনী আছে, চুলটা ভাল করে ফিরিয়ে এস—কেমন করে হাল ফ্যাশানে চুল বাঁধ গো তোমরা। একে তো ওই ছিরি তোমার রূপের—তার ওপর ও কি ভঙি করে রেখেছ? কালো কুচ্ছিত মানুষ আমি দেখতে পারি না বাপু।

সঞ্জীব ঈষৎ বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইঙ্গিতে অনুনয় করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—ও ঘরে সামনেই টেবিলের ওপর আয়না চিরুনী পাবেন। কিছু মনে করবেন না, মায়ের আমার—

নলিনী মৃদু হাসিয়া কহিল—কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন বলুন তো?

সঞ্জীব খুশি হইয়া উঠিল—সে বলিল—যাক, তাহলে শীগ্‌গির আসবেন—চা তৈরি করছি আমি।

যাইতে যাইতে নলিনী কহিল—চা খাব না আমি।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেন?

নলিনী তাহার আরক্ত চোখ দুটি ফিরাইয়া লইয়া কহিল—আপনারা আমায় মনে করেছেন কি বলুন তো? মেয়েমানুষ হয়ে আমি এতবড লজ্জাহীনা যে আপনার তৈরি চা আমি খাব।

নলিনীর চোখে জল আসিয়াছিল। সে দ্রুতপদে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সঞ্জীব মৃদুস্বরে মাকে কহিল—ছি মা লোকে কুৎসিত হলে কি—

মা দেবার্চনা শেষ করিয়া পূজার স্থান মার্জনা করিতেছিলেন—তিনি সবিস্ময়ে ঝংকার দিয়া উঠিলেন—তা বলে কালোকে কালো বলব না? ওর চোখ আর চুল ছাড়া কোন্‌খানটা মুখের ভাল বল দেখি!

সঞ্জীব মৃদুস্বরে কহিল—তা হয় তো নয়—কিন্তু মনে তো কষ্ট হতে পারে।

মা কহিলেন—ওরে না—মেয়েমানুষ এত বোকা নয়। তারা স্নেহ ঘেন্না বেশ ভাল বুঝতে পারে। ভাল যদি না বাসব তবে মুখখানি ওর যাতে সুন্দর লাগে তা করতে আমি বলব কেন?

চুল ফিরাইয়া নলিনী হাসিমুখে আসিয়া বসিল, কহিল—সরে বসুন আপনি, চা আমি তৈরি করব।

সঞ্জীব ইতস্তত করিতেছিল। মা বলিয়া উঠিলেন—দে না বাপু এগিযে—মেয়েমানুষেরই তো কাজ ওসব। আমি তো ওসব তোদের ছুঁইও না।

নলিনী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে কাপ কেটলি আগাইয়া লইয়া চা তৈয়ারি করিতে বসিল।

মা কহিলেন—দেখ তো বাছা কেমন টুকটুকে লাগছে মুখখানি। কেশ দিয়েছেন ভগবান বেশ করবার জন্য—। বেশ না করলে মানাবে কেন ? তা না উটকো-মুখী চওড়া কপাল বের করে—ছি।

এক কাপ চা সঞ্জীবকে আগাইয়া দিয়া নিজে একটা টানিয়া লইল। তারপর সঞ্জীবকে কহিল—কুইনিন ট্যাবলেট ?

মা তরকারির বঁটি পাড়িতেছিলেন—কথাটা তাঁহার কানে গিযাছিল। ঘর হইতে কাগজ-মোড়া কুইনিনের পিল আনিয়া আলগোছে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—তুইও একটা খা সঞ্জীব। আর ওগো বাছা—এগুলি বাপু তোমাকে ধুয়ে নিয়ে আসতে হবে, বুঝেছ।

নলিনীব মনের গ্লানি সব ঘুচিযা গেল। সে আনন্দে ঘাড নাড়িয়া জানাইল—বেশ।

সঞ্জীব সহসা প্রশ্ন করিল—আপনি কি আজই কলকাতা যাবেন ?

নলিনী এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—সে চকিত হইয়া উঠিল—কহিল—হ্যাঁ তাই যাব। আজই বৈকী।

উৎসাহহীন অন্যমনস্ক চিত্তে নলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কি উদ্দেশ্যে যে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে কিছুতেই তাহা স্মরণ করিতে পাবিল না। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভ্রূ-ললাট কুঞ্চিত কবিয়া সে চিন্তা কবিল। অবশেষে অকস্মাৎ মনে হইল জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া লইতে হইবে, আজই তাহার কলিকাতা যাত্রার দিন।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই সে ঘবে প্রবেশ করিয়াছে। মনে হইতে তাহার হাসি আসিল। গুছাইয়া লইবার মধ্যে আছে তাহার একখানি তোযালে। আর সবই সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। যে কাপডখানা সে পরিয়া আছে সেখানি পর্যন্ত অপরের। মনটা তাহার বিষাইয়া উঠিল—এমন করিয়া পরমুখাপেক্ষী অনুগ্রহ-ভিখারী হইয়া থাকার লজ্জাকর বেদনা মনের মধ্যে সূচের মতে বিঁধিতেছিল। কলিকাতা যাইবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ও-ঘরে দাওয়ার উপর বসিয়া মা-ছেলেতে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। মা কি বলিতেছেন আর সঞ্জীব একখানা কাগজে সেইগুলিই বোধ হয় লিখিতেছে। নলিনী বেশ সাড়া দিয়াই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।

মা মুখ তুলিয়া কহিলেন—বস। সঞ্জীব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ অভ্যর্থনা কবিল। নলিনী একপাশে বসিল। মা ছেলেকে কহিলেন—হলো, মুড়িভাজুনীর কাপড় লিখলি ?

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ। কিন্তু আর তোমার কত আছে? এই তো দশ জোড়া হয়ে গেল।

মা বলিলেন—আরও আছে। যারা চিরকাল পেয়ে আসছে তারা এ পুজোর সময় কাপড় না পেলে ছাড়বে কেন? জানিস কীর্তি না করতে পারি বৃত্তি কখনও লোপ করতে নেই।

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—মা, এই বৃত্তিতেই আমাদের সর্বনাশ হলো। দান নিয়ে নিয়ে জাতটার ভিক্ষে করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

ভ্রূকুটি করিয়া মা বলিলেন—দান কাকে বল্‌ছিস তুই? দান করে লোকে দয়া করে। আর বৃত্তি সম্মান। এ যে তারা নেয় এই আমাদের ভাগ্যি। আর শাকওয়ালী, মাছওয়ালী এদের তো হলো পাওনা। সম্বছর তারা আমাদের উপকার করে, খাটে, তার জন্য এ তো তাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

সঞ্জীব আবার হাসিল কহিল—বেশ, বল আর ক-জোড়া চাই।

—কার কার হলো বল দেখি।

ফর্দটায় চোখ বুলাইয়া সঞ্জীব পড়িয়া গেল, পুজোর শাড়ি লাল পেড়ে একজোড়া, কুমারী পুজোর শাড়ি একজোড়া। গুরু প্রণামী থান একজোড়া, পুরোহিতের ধুতি একখানা। ব্রাহ্মণডিহির রাম চাটুজ্যের বৃত্তি ধুতি একখানা। কানাই গাঙ্গুলীর বৃত্তি ধুতি—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—ধুতি নয় থান লেখ। কানাই গাঙ্গুলী মরে গেছে, বিধবা মেয়ে পরবে, থানই ভাল। তারপর?

—মাহিন্দার রাখালের মোটা ধুতি একজোড়া, গেঞ্জি একটা—

—ওদের কাপড় চওড়া পাড় নিয়ে আসবি। অভাবী মানুষ, সময়-অসময় ওর বউও যেন পরতে পায়।

সঞ্জীব সংশোধন করিয়া কহিল—ঠিক বলেছ মা। তাহলে কৃষেণদেরও ঐ রকম হবে তো?

মা কহিলেন—হ্যাঁ। তারপর পড়ে যা।

—মেছুনীর শাড়ি একখানা। রোজকার মুদীর একখানা, গয়লানীর শাড়ি একখানা, ঘাসওয়ালীর শাড়ি একখানা। তারপর তোমার মুড়ি-ভাজুনীর কাপড়—কি রকম হবে বলে দাও।

—ওখানা ধুতিপাড় নিয়ে আসবি। বিধবা মানুষ শাড়ি তো হবে না।

—বেশ তারপর?

—ধোপানীর শাড়ি লেখ। আর ভাল ধোওয়া শান্তিপুর কি ফরাসডাঙার শাড়ি একখানা। কিম্বা আজকাল খদ্দরের ঢাকাই শাড়ি বেশ ভাল দেখে তাই নিয়ে আসবি।

সঞ্জীব কহিল—কার জন্যে, ফর্দে নাম লিখব কার?

মা বলিলেন—কোন নাম লিখতে হবে না, এমনি লেখ না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলি যে? তোর বড় বদ অভ্যাস হয়ে পড়ল সঞ্জীব। কথায় কথায় তোকে আমায়

কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি। লেখ, আটপৌরে তোর আবার খদ্দর চাই বুঝি, খদ্দর দু' জোড়া। আর পোশাকী একজোড়া, ভাল জামা একটা।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমাকে কি এখনও ছেলেমানুষ পেলে মা যে পুজোতে আমার পোশাক চাই।

দৃঢ়স্বরে মা বলিলেন—হ্যাঁ চাই। আমি বলছি তুই লেখ। আমি মরি তারপর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস। হ্যাঁ, আর মেয়েদের ভাল জামা যা পাওয়া যায় নিয়ে আসবি, তার সঙ্গে সেমিজ দুটো।

সঞ্জীব লেখা শেষ করিয়া কহিল—এইবার আমি লিখি—মায়ের গরদের থান একখানা, আটপৌরে দু' জোড়া—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—আটপৌরে একজোড়া লেখ, আমার কাপড় জমে আছে, তোর পুরনো কাপড়ে আমার অনেক চলে যায় যে। আর তোর পুরনো কাপড় আমায় সব দিয়ে যাবি। ওয়াড় দেব, সলতে পাকাতে হবে।

সঞ্জীব কহিল—বেশ। কিন্তু ফর্দ শেষ হলো তো?

—হ্যাঁ। আর মসলাপাতি যা, সে গাঁয়ের থেকে আনলেই হবে।

এতক্ষণে অবসর পাইয়া নলিনী বলিল—আমি তা হলে আজকেই যেতে চাই, মা।

গম্ভীরভাবে মা বলিলেন—পুজোর পর যাবে। চার দিন পর পুজো, এ সময় ঘর থেকে কাউকে যেতে দিতে আছে?

নলিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল. সে কহিল—তা হোক, আমি তো দৈবক্রমে আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি, আমার যাওয়া-আসায়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—বড় জেদী ছেলে-মেয়ে তোমরা বাপু এ কালের। পুজোর সময় কুকুর-বেড়াল মানুষ বাড়ি থেকে তাড়ায় না, তা তুমি তো মানুষ। না বাছা, ও সব মতলব ছাড় তুমি। তিনি চলিয়া গে'লন।

নলিনী কহিল—সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব বলিল- -এ ক'দিন এখানেই থেকে যান।

—না।

মৃদুস্বরে সঞ্জীব কহিল—আপনার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে এখানে?

দৃঢ়স্বরে নলিনী উত্তর দিল—হ্যাঁ। অশুচির মতো—

বিবর্ণমুখে সঞ্জীব বলিল—সে তো আমি আপনাকে বলেছিলাম—

—হ্যাঁ বলেছিলেন। কিন্তু অশুচি অস্পৃশ্যকে এত সেবাযত্ন করে আরও অপমানের বোঝা অসহ্য করে তুলবেন এ তো বলেননি। সঞ্জীববাবু, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

ও-ঘর হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন—ওগো ও মেয়ে, তোমার ময়লা কাপড়-চোপড় কি কি আছে বের করে দাও দেখি। আজ সব ধোপার বাড়ি যাবে। পুজোর পর আট দিন আবার কাপড় দিতে নেই।

নলিনী উত্তর দিল না।

সঞ্জীব কহিল—উনি আজই চলে যাবেন, মা।

ভ্রূকুটি করিয়া মা বলিলেন—যাব বললেই যাওয়া হয় না। আমার সংসারেরও একটা কল্যাণ-অকল্যাণ আছে। আর বলি হ্যাঁ গা বাছা—তোমাকে কি এখানে কেউ কাঁটার ওপর বসিয়ে রেখেছে যে, যাই যাই ছাড়া আর কথা নেই তোমার? এস জল খাবে এস, আর কি কি ময়লা কাপড় আছে বের করে দাও।

নলিনী মৃদুস্বরে কহিল—আমার কাপড় তো এই একখানি ছাড়া—

মা বলিলেন—ওরে সঞ্জীব, গাঁয়ের দোকান থেকেই ধোওয়া সুতীর কাপড় একজোড়া এনে দে এখুনি। সেমিজ আনবি দুটো। ওগো বাছা, এস না, তোমার জলখাবার হাতে নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমি? বড় বেয়াড়া স্বভাব তোমাদের।

নলিনীকে উঠিতে হইল।

সঞ্জীব হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। আহার নলিনীর মুখে উঠিতেছিল না। বার বার ভিতরের উদ্বেলিত অশ্রুরাশি তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দু' চোখের তটভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া প্লাবন বহাইতে চাহিতেছিল।

সঞ্জীব ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এখনও খাওয়া হয়নি! নিন, নিন, শেষ করে নিন। একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিল। সঞ্জীব কহিল, বাগ্দী পাড়ায় একটা ডেলিভারী কেস আছে। কাল সকাল থেকে ব্যথা খাচ্ছে।

নলিনী আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতেছিল, মা পাশ হইতে বাধা দিয়া কহিলেন—আগে খেয়ে নাও তারপরে যাবে। কতক্ষণে হবে তার ঠিক কি?

নলিনী কহিল—আমি আর খেতে পারব না, মা।

মা কহিলেন—খেয়ে নাও বলছি, খুব খেতে পারবে। নইলে আমি জোর করে খাইয়ে দেব তোমাকে। আমি এখনও স্নান করিনি তা মনে রেখ।

নলিনী আবার বসিল।

রোগিণীর অবস্থা সত্য সত্য খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পরমায়ুর বলেই হউক আর নলিনীর কৃতিত্বের জন্যই হউক নলিনী নিরাপদে প্রসব করাইয়া হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সঞ্জীব কহিল—আপনার মুখের হাসিতে বুঝতে পারছি—সংবাদ সুসংবাদ।

উচ্ছ্বসিত হইয়া নলিনী বলিল—ভগবানের দয়া, আমার শক্তিতে কিছু হত না সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—ভগবানকে মনে মনে প্রণাম করুন। হাত আপনার ক্লেদাক্ত, কপালে স্পর্শ করে সেখানে ক্লেদের ছাপ মারবেন না।

নলিনী নিষেধ মানিল না। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—এ ক্লেদের ছাপ ধুলে মুছে যায় সঞ্জীববাবু।

কিন্তু উত্তাপ হইতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া সঞ্জীব বাধা দিয়া বলিল—হাত-পা ধুয়ে ফেলুন আগে।

নলিনী দেখিল সাবান, তোয়ালে, গামলায় জল, সব প্রস্তুত হইয়া আছে। গামলার জল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল। তাহারই একপাশে একখানা নতুন ধোওয়া সুতীর লাল পাড় শাড়ি ও একটি সেমিজ রাখা হইয়াছে।

সঞ্জীব কহিল—বসুন আপনি, আমি জল তুলে দি।

নলিনী লজ্জিত সুরে বলিযা উঠিল—না—না সে হবে না। আপনি জল তুলে দেবেন সে হবে না।

আশ্চর্য হইয়া সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেন?

সলজ্জভাবে নলিনী বলিল—না—ছি, পুরুষেব সেবা কি স্ত্রীলোক গ্রহণ করতে পারে সঞ্জীববাবু?

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—আপনি ভুল করছেন, আমরা কর্মসাথী, কমরেডস্।

খাস বৈঠকখানার বারান্দাব ইজিচেয়ারের উপর বসিয়া মহেন্দ্রবাবু দাঁত দিয়া আঙুলের নখ কাটিতেছিলেন। এই আচরণটুকু তাঁহাব গভীর চিন্তামগ্নতার পরিচায়ক। সম্মুখে টি-পয়টার উপর কযেকখানা বই পডিয়াছিল। একখানা তাহার Criminal Procedure Code, একখানা How to make money. একখানা Goatkeeping, অপর দুইখানা বাংলা বই—একখানা জ্যোতিষ দর্পণ, অপরখানি সংক্ষিপ্ত বেদান্তসার।

মিত্তির মশাই আসিযা আভূমিনত নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিযা তাহার দিকে চাহিয়া বাবু সজাগ হইয়া উঠিলেন। খাড়া হইয়া বসিয়া কহিলেন—এই যে এসেছ। মামলাটা কতদূর কি হলো?

মিত্তির মশায় বলিল—পুজোর ছুটি সামনে, ছুটির আগে আর কিছু হবে না। তবে রিপোর্ট সেখানে গিয়েছে—পুলিশ অফিসে।

বাবু আবার নখ কাটিতে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পব কহিলেন—মামলাটি চালিয়ে ফল নেই। ওটা এইখানেই চেপে দাও। অনেক কিছু কেলেঙ্কারি হবে—দাবোগাবাবুব কাছে একবার যাও—তুমি। আর ধীরেন কেরানীকে একবার ডেকে দাও।

মামলায় মিত্তির মশাযের নিষ্ঠা প্রবল। সে কহিল—আজ্ঞে থেফট্ কেস, ডায়েরি করে মামলা তুলে নিতে গেলে শেষে যে বিপদে পডতে হবে। সঞ্জীব পিছনে রয়েছে, যদি পাল্টা মামলা কিছু রুজু করে?

বাবু কহিলেন—হুঁ! তা হলে লেডি-ডাক্তারকে বাদ দিয়ে হাসপাতালের চাকরটাকে ঠেলে দাও। জেল হলে ওর মেয়ে-ছেলেকে কিছু টাকা দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্চ করিয়ে দাও—বুঝলে?

মিত্তির মশায়ের তাহাতে আপত্তি ছিল না। ব্যক্তিবিশেষকে আসামী করিতে মস্তিষ্ক পীড়ার তাহার কোন হেতু ছিল না। মামলা চলিলেই তাহার হইল।

সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—যে আজ্ঞে। নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

পিছন হইতে ডাকিয়া বাবু বলিলেন—ধীরেন কেরানীকে পাঠিয়ে দাও। তারপর জ্যোতিষ দর্পণখানা তুলিয়া লইয়া কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া একটা নির্দিষ্ট স্থান নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে বসিলেন। স্থানটায় Napolean's Fate Book-এর প্রশ্নোত্তরে মীমাংসার নিয়ম ও কুণ্ডলী চক্র অঙ্কিত ছিল। কয়েক বার বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে অন্তরের কোন গোপন সমস্যার ফলাফল দেখিলেন। হয় তো উত্তর মনঃপূত হইল না, বইখানাকে সজোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিযা খুলিলেন বেদান্তসার বইখানা। বেদান্তেও বোধ করি চিত্ত স্থির হইল না।

বই বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খুলিলেন বোতলের ছিপি। গ্লাস দুই পানীয় পান করিয়া খাটখানার উপর বসিয়া গুনগুন করিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের গান একখানি।

বাহিরে আসিয়া দুর্বল কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়ার ইঙ্গিতে ধীরেন কেরানীকে কহিলেন—ও তুমি।

মাথা চুলকাইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—শোন, এক কাজ কর দেখি। নতুন যে অ্যান্টিম্যালেরিয়া সোসাইটি হয়েছে সেই সোসাইটির তরফ থেকে আমাদের সঞ্জীব মুখুজ্যেকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে এস। লেখ যে আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা যে আপনার মতো কর্মী এই সোসাইটির ভার গ্রহণ করেন। আপনার সম্মতি পেলে আমরা সেই মতো ব্যবস্থা করব। বুঝলে ?

ঘাড় নাড়িয়া বেচারী ধীরেন জানাইল—হ্যাঁ সে বুঝিয়াছে।

হাতের নখ কাটিতে কাটিতে বাবু বলিলেন—এই বেলাতেই পাঠিয়ে দেবে বুঝলে ?

সম্মুখের প্রকাণ্ড হাতাটার ওপাশেই সরকারী রাস্তার ওপব একটা কোলাহল জাগিয়া উঠিতেই কথাটা আব অগ্রসর হইল না। দেখা গেল প্যাকাটির মতো গলা ফাটাইয়া একটা মানুষ বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, আর লাফ মারিযা মারিয়া আকাশের দিকে উঠিতেছে! লোকটা চিৎকার করিয়া বলিতেছে, জান না বেটা তুমি আমাকে জান না ? ধারো না তুমি আমার কাছে বেটা বদমাস ? নালিশ করব আমি। যা তা পেয়েছ তুমি আমাকে ? আমার নাম এককড়ি গাঙ্গুলী।

বাবু কহিলেন—দেখ তো হে—কার সঙ্গে কি হলো গাঙ্গুলীর।

ধীরেন কহিল—ডাকব এখানে ?

হাসিয়া বাবু কহিলেন—ডাকবে বৈকী। ওর আগমন সংবাদ জানাবার জন্যই ও ঠিক এই জায়গাটিতেই এমন করে লাফ মেরে চিৎকার করছে। ডাক এখানে।

ধীরেন অগ্রসর হইয়া গেল। তখনও গাঙ্গুলী চিৎকার করিতেছিল এবং লাফ দিতেছিল। মধ্যে মধ্যে হাতার দেওয়ালের ওপরে তাহার ছোট্ট মাথাটি পুতুল নাচের পুতুলের মতো দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ সব পরিবর্তিত হইয়া গেল, আস্ফালন নীরব, ছায়াছবির মতো গাঙ্গুলীর মাথাও আর উপরে ঠেলিয়া উঠিল না। বাবু বুঝিলেন ধীরেন ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই গাঙ্গুলী হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাবু প্রশ্ন করিলেন—কি হলো কি, গাঙ্গুলী ?

গাঙ্গুলী ভণিতা আরম্ভ করিল—আজ্ঞে আপনার রাজ্যের বিচারই এই। বুকে বসে সব দাড়ি ছিঁড়তে চায়। পাওনাদারের পাওনা—পাওনাই নয়—সে চোথা কাগজে আছে—ইচ্ছে হয়তো দেব নইলে দেব না। এখন আমার যা পাওনা তাই তুমি দাও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু কহিলেন—এ তো হলো ভণিতা। তারপর ঘটনাটা কি শুনি ?

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে এ বেটা তারা মোদক। রমা বলেছিল,—কাকা, খোকার জন্য চার আনাব মিষ্টি নিয়ে এস। খোকা মানে রমার ভাইপো—তাকে সে মানুষ করছে কিনা। পয়সা বেচারাব হাতে ছিল না, বললে—দু'দিন পরে পয়সাটা দেব কাকা। তাই বললাম বেটাকে—ওরে, দে চার আনার মিষ্টি। লিখে রাখ রমণ দাসের নামে—দু'দিন পরে দামটা পাবি। বেটা বলে কিনা—আজ্ঞে না, ধার দিতে পারব না।

মোদক ছোকরাও পিছন পিছন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে করজোড়ে কহিল—হুজুর, আমি বললাম, আপনার নামে লিখে রাখি। তা গাঙ্গুলী মশায় বললেন—না আমার নামে লিখবি কেন ? ঐ রমণ দাসের নামে লিখে রাখ। তোর গরজ তো ভারী রে ব্যাটা। মোয়া খাবেন কিষণচাঁদ আর কড়ি গুণব আমি ? আজ্ঞে যার তার নামে—।

বাবু বলিলেন—যা তুই, ভাল মিষ্টি এক টাকার বেশ করে হাঁড়িতে বন্ধ করে এখানে এনে দিয়ে যা। খাতায় লিখে রাখবে।

রোকাটা লইয়া মোদক দেখিল—বাবু সহি করিয়াছেন গাঙ্গুলীব হইযা—শ্রীএককড়ি গাঙ্গুলী, বঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বুকের হাসিটা মুখে ঠেলিয়া উঠিবার পূর্বেই সে চলিয়া গেল।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—মিষ্টিগুলো তোমার বাড়িতে আর খালি হাঁড়িটা ওদের কাছে পৌঁছবে না তো এককড়ি ?

অকস্মাৎ গাঙ্গুলী প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিল—সে হাসি তাহার আর থামিতে চায় না। হাসিতে হাসিতেই সে বলিল—বেশ বলেন আজ্ঞে আপনি। শুধু হাঁড়িটা ওদের বাড়ি পৌঁছবে না তো—এ্যা-হি-হি-হি। বেশ বলেন।

তারপর হাস্য সম্বরণ করিয়া কোঁচায় মুখ মুছিয়া বলিল—কেমন বংশ হুজুরদের দেখতে হবে। স্বর্গীয় কর্তাবাবুর রসিকতায় নাকি মরা মানুষকেও হাসতে হত।

বাবু উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন—গাঙ্গুলীকে বলিয়া গেলেন—বস তো তুমি, কথা আছে।

অল্পক্ষণ পরেই একটা সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া ইজি চেয়ারটায় চাপিয়া বসিলেন।

গাঙ্গুলী কহিল—আমাকে কি বলবেন বলছিলেন?

সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছাড়িতে ছাড়িতে বাবু বলিলেন—হুঁ। মুখের ধোঁয়াটা নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেলে বলিলেন—তুমি শেয়াল পণ্ডিতের কথা জান, এককড়ি?

পরম বিস্ময়ে গাঙ্গুলী বলিল—সে আবার কি আজ্ঞে?

সিগারেটে আর একটা টান মারিয়া বাবু বলিলেন—শোন। এক অতি ধূর্ত শেয়াল ছিল। সে নদীর ধারে গর্তের মধ্যে লেজ পুরে দিত। গর্তের মধ্যে কাঁকড়াগুলো রাগে তার লেজের রোঁয়া কামড়ে ধবত। অমনি সে লেজটিকে বের করে কাঁকড়াগুলিকে ভক্ষণ করে ভাবত, কি পণ্ডিত সে। বনের সাধারণ জন্তুগুলোও ভাবত কি বুদ্ধিমান শেয়াল পণ্ডিত; ক্রমশ তার সাহস বাড়তে লাগল। চাতুরি খেলে কুকুর বাচ্চা বেড়াল বাচ্চা—ভালুক বাচ্চা খেয়ে দেমাক চরমে তার বেড়ে গেল।

গাঙ্গুলী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে ছেলে বয়সে কি আমোদই হত এই সব গল্প শুনে।

বাবু বলিলেন—দেখ তো ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপরে বোতল গেলাসটা আছে, নিয়ে এস তো গাঙ্গুলী। কানাইটা যে কোথায় যায়?

গাঙ্গুলী বোতল গ্লাস আনিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বোতল গ্লাস লইয়া ফিরিবার মুখে দেখিল, দুয়ারের দুই বাজুতে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া বাবু দাঁড়াইয়া। ঘরের চারিদিকের অপর দেওয়ালগুলি বন্ধ। এদিকের দেওয়ালের গায়ে কতকগুলো শিকার করা জানোয়ারের চামড়া টাঙানো রহিয়াছে। তাহারই ঠিক মধ্যস্থলে দুইখানা তলোয়ার গুণচিহ্ন রেখার মতো পরস্পরকে কাটাকাটি করিয়া ঝুলিতেছে। তাহারই উপরে ঢাল। দুয়ারের পাশেই র‍্যাকের মধ্যে সারি সারি বন্দুক ঊর্ধ্বমুখে শোভা পাইতেছে।

বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—শোন তারপর বাকি গল্পটা তোমায় বলি শোন। বনের কতকগুলো নির্বোধ জানোয়ারকে প্রতারণা করে তার সাধ হলো বাঘের সঙ্গে চাতুরী খেলবে। পণ্ডিত নাম তার সার্থক করবে। বাঘের কাছে সে একদিন এল, হুজুর ভাল শিকার আছে। কিন্তু আমার একটা শিকার পাঁকে পড়ে গেছে সেটা উদ্ধার করে দিতে হবে আগে। বাঘ রাজী হলো কিন্তু বললে, আমার শিকার আগে এনে দাও। এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলো ক্রমে।

তারপর—অদ্ভুত বিকৃত স্বরে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—বড় তেষ্টা পেয়েছে আমার হুজুর, একটু জল—।

ঈষৎ হাসিয়া বাবু বলিলেন—বোতলে জল—গেলাস তোমার হাতেই রয়েছে গাঙ্গুলী, একটু খাও। গলাও ভিজবে—বুকেও একটু বল পাবে।

সত্যই গাঙ্গুলী গ্লাসে পানীয় ঢালিতে ঢালিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করিয়া লইয়া গাঙ্গুলী দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল বাবুর হাতে বন্দুক।

একটা দরজার পিঠে হেলান দিয়া সম্মুখের দরজায় একটি পা তুলিয়া এবার তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। দুই-হাতে বন্দুকটা লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছেন।

চোখে চোখ পড়িতেই বাবু কহিলেন—জান এককড়ি—এই বন্দুকটা আমার বহুদিনের বন্দুক। এতে কখনও একটি গুলিও আমার নষ্ট হয়নি।

গাঙ্গুলী মেঝের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল—দোহাই হুজুর রক্ষে করুন। আমি আজই সন্ধ্যে তক রমাকে এনে দিয়ে যাব। দোহাই হুজুর।

—দেখো।

—নইলে আমার দশটা বাবা।

—আরও চাই আমার, সঞ্জীবের বাপের সেই তমসুকখানা, বুঝলে?

—সে আমার কাছেই আছে মা-বাপ।

বন্দুক রাখিয়া দিয়া পথমুক্ত করিয়া দিয়া বাবু কহিলেন—বাইরে এস।

বাহিরে আসিয়া জোড় হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—কিছু দেবেন না হুজুর—সঞ্জীবের দলিলটার জন্য? সুদে আসলে পাঁচশো হয়েছে হুজুর।

সে বাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

বাবু বলিলেন—পা ছাড় এককড়ি। দেব—কিছু দেব তোমাকে। আজই দেব।

অপরাহ্নের দিকে সঞ্জীব বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। নলিনী চায়ের পেয়ালাটা আগাইয়া দিয়া কহিল—একবার রোগীটিকে দেখতে হত যে।

চায়ের পেয়ালাটা লইয়া সঞ্জীব বলিল—সত্যি কথা, চলুন, দেখে আসবেন, চলুন।

নিজের জন্য চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে নলিনী বলিল—চলুন। তারপর আবার বলিয়া উঠিল—আপনাদের দেশ কিন্তু আমার বড় ভাল লাগে। লাল মাটির দেশ—তারই মাঝে মাঝে সবুজ মাঠ বড় চমৎকার।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া সঞ্জীব বলিল—যাবেন বেড়াতে, আমার সঙ্গেই চলুন না।

একটু ইতস্তত করিয়া মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—মা রাগ করবেন না তো?

সম্মুখে ওদিকে ভাঁড়ার ঘরে মা পূজার পাতি গুছাইয়া ভাণ্ডারে তুলিতেছিলেন। সঞ্জীব ডাকিল—মা।

—কি রে?

—আমাদের মেয়ে-ডাক্তারকে আজ একবার আমাদের দেশের মাঠ দেখিয়ে নিয়ে আসি। কোন কাজ নেই তো তোমার?

—ও আবার আমার কি কাজ করবে? তা যা না। যাবার মুখে বাগ্দীপাড়ার হারাণকে বলে যাস বাগ্দী-বউকে যেন পাঠিয়ে দেয় একবার। আর দুটো মাছের জন্য বলে যাবি—নলিনীর বড় কষ্ট হচ্ছে খাবার।

সঞ্জীব নলিনীকে তাড়া দিয়া বলিল—নিন, নিন—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, দেরি করবেন না।

একটু উচ্ছ্বসিতভাবেই নলিনী বলিয়া উঠিল—আগে আপনি নিন—চা খেয়ে পেয়ালাটা আমায় দিন দেখি। চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে আনতে হবে না?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়া সঞ্জীব বলিল—আমার এঁটো কাপ আমি ধোব আজ—আপনার কাপটা যদি আমায় না দেন তো নিজে ধুয়ে ফেলুন।

হাতের কাপটা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া নলিনী বলিল—ভারী অবাধ্য আপনি—

কথাটা অর্ধসমাপ্তই থাকিয়া গেল। পরমুহূর্তেই সে একরকম ছুটিয়া খিড়কির পথে কাপ-কেটলি হাতে বাহির হইয়া গেল। ঘাট হইতে ফিরিয়া সে একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সঞ্জীব হাঁকিল—হলো আপনার? কোন উত্তর আসিল না। আবার কিছুক্ষণ পরে ডাক দিল—আসুন বেলা যায় যে!

নলিনী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—চলুন।

তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সঞ্জীব মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—বাঃ চমৎকার! চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে। নার্সের বাংলা সংস্করণ দেখেছি। কিন্তু রূপে শোভায় এমন সেবিকামূর্তি এর আগে দেখিনি মিস গাঙ্গুলী।

নলিনীর পরিধানে ছিল শুভ্র বেশ—হাফ হাতা একটি ব্লাউস, তাহার উপর মিহিপাড় সঞ্জীবের ধুতি একখানি হাল ফ্যাশানে বেড় দিয়ে পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, আর মাথায় ছিল সাদা একখানি রুমাল ইরানী মেয়েদের ছাঁদে বাঁধা। তাহার দীঘল সুশ্যাম দেহখানি শুভ্র পরিচ্ছেদে সত্যই মানাইয়াছিল চমৎকার। কিন্তু মাথায় ওই ইরানী মেয়েদের ছাঁদে বাঁধা রুমালখানি তাহার সে শোভা শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নার্সদের মতো মস্তক আবরণ বাঙালীর মেয়েকে এমন মানায় না।

নলিনীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—ওতে আমি লজ্জা পাই, সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আমরা কমরেডস মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তা হলেও আমি স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ।

মৃদু ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জীব বলিল—না মিস গাঙ্গুলী, কর্মক্ষেত্রে কর্মের সমারোহের মধ্যে থাকে শুধু মানুষ। কর্মের প্রকৃত অধিকারবোধ ছাড়া অপর সমস্ত সত্তা ভুলে যেতে হয়। কমরেডস কথাটির গুরুত্ব বড় বেশি।

সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী দেখিল—প্রশান্ত উচ্ছ্বাসহীন মুখ।

ধীরে ধীরে সে বলিল—কিন্তু মার্জনা করবেন সঞ্জীববাবু, সেখানে তা হলে তো সৌন্দর্যের মোহে উচ্ছ্বাস প্রকাশের অধিকার বা অবকাশ না থাকাই উচিত।

দূরে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সঞ্জীব বলিল—উচ্ছ্বাস নয় আনন্দ, আনন্দ উপলব্ধির পথ যে রোধ করা যায় না মিস গাঙ্গুলী। এ পথ রোধ করতে পারে কে জানেন—পারে এক মৃত্যু। আর পরস্পরকে দেখে আনন্দ পাওয়াই হলো বন্ধুত্ব। কমরেডস হতে হলে ওটা চাই, না হলে চলে না।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। কেন জানি না কোন যুক্তিই তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিল না। সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছিল। অপ্রশস্ত লোক-চলা

আঁকা-বাঁকা পথে সঞ্জীব চলিয়াছিল আগে, সে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল পিছনে পিছনে।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—কি হারাণদা, রোগী কেমন আছে?

নলিনী দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল বাগ্দী পাড়ায় তাহারা আসিয়া গিয়াছে। সম্মুখের বড় বাঁশঝাড়ের ছায়াঘন পরিচ্ছন্ন তলদেশটিতে তাহাদের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। পাশেই অদূরে তার পাঁচটি দিগম্বর ছেলে পরস্পরের গায়ে ধূলা ছিটাইয়া কলহ করিতেছিল। বড় ছেলেটি অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—এই এই—দাদাঠাকুর আইচে। চুপ, চুপ, সব চুপ কব।

একজন বলিল—এই শালা সতে, হুঁকোটা নামা কেনে। শালা টানছে দেখ লবারের মতো।

হাবাণ সঞ্জীবকে কহিল— বোগী আপনাদের কিপাতে ভালই, দাদাভাই।—আহা মেম ডাক্তারের যে যতন।

স্মিত হাস্যে নলিনী কহিল—চল, একবাব দেখে আসি চল।

হারাণ সঙ্কুচিত হইযা কহিল—এ অবেলাতে থাক মা। ছুঁলে তো চান করতে হবে। কাল ববং চানের আগে—-

বাধা দিয়া নলিনী বলিল—না, না, না, কে বললে আমাকে চান করতে হবে? মানুষ ছুঁলে কি মানুষকে চান করতে হয?

হারাণ বলিল—তবুও এ বেলা থাক মা। কাল সকালেই দেখবেন। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের পূজা-আচ্চা হবে।

নলিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই অস্পৃশ্য জাতি—যাহারা আপন অস্পৃশ্যতার কাল্পনিক অপরাধ নির্বিবাদে মাথায করিয়া অসঙ্কোচে বিশ হাত দূরে সরিয়া যায—তাহাদেব নিকটও কি সে অস্পৃশ্য! ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ কবিয়া সে বলিল—বেশ তো সঞ্জীববাবু, আপনি একবার পাল্‌সের বিটটা গুণে দেখে আসুন না।

জোড হাত করিয়া হারাণ বলিল—আজ থাক মা, যে দিন আমাদের দেবতার পুজো হয় সেদিন ডাক্তার কবরেজ সব বন্ধ। তাঁব উপর নির্ভর করে চিরদিন তো থাকতে পারি না, একটা দিন কি একটা বেলা তাও যদি না থাকতে পারি তবে আর তাঁকে মান্য করা কেনে।

কথা কয়টিতে নলিনীর মনের গ্লানি এক মুহূর্তে যেন ধুইয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বলিল—তাই হবে হারাণদা। তোমাদের বউকে একবার মা ডেকেছেন। কিছু মাছ দিয়ে আসতে বলেছেন।

তারপর সঞ্জীবের হাতখানি নিঃসঙ্কোচে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কহিল—আসুন, আসুন সঞ্জীববাবু, বেড়াবার সময় চলে যাচ্ছে। আপনাদের দেশ আমার বড় ভাল লাগে।

চলিতে চলিতে সঞ্জীব বলিল—কি কুসংস্কার দেখুন। এ ওদের ভাঙা দরকার।

দৃঢ়কণ্ঠে নলিনী বলিল—মাফ করবেন সঞ্জীববাবু, ওখানে ওদের চেয়ে আপনি অনেক দুর্বল। ওখানে ধরে নাড়া দিতে গেলে অক্ষমতায় নিজের কাছেই লজ্জা পাবেন আপনি।

সঞ্জীব মৃদু স্বরে কহিল—কিন্তু ভাঙতে হবে ওদের আত্মধ্বংসী হীনত্ববোধ। ওদের মধ্যে আশ্রয় গেড়ে রয়েছে।

নলিনী উচ্ছলিতভাবে বলিয়া উঠিল—যা করবেন ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে করুন সঞ্জীববাবু। ভুলবেন না—এ ভারতবর্ষ—আর্যভূমি।

সঞ্জীব কথায় বাধা দিল, সে বলিল—মাটি, মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীর একটা অংশ। রাজা ভরতের শাসনাধীন থেকে নাম পেয়েছে ভারতবর্ষ।

নলিনী আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—সে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—ভুল, ভুল, এ আপনার ভুল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—ভুলের পর ভুল রচনা করেই তো মানুষ প্রগতির ইতিহাস রচনা করে চলেছে। হয়ত আমার মত ভুল। কিন্তু সে নিয়ে ঝগড়া কবার যোগ্যস্থান এটা নয়, মিস গাঙ্গুলী। ওরা সব কেমনভাবে আমাদের দিকে চেয়ে আছে দেখুন।

নলিনী দেখিল উলঙ্গ শিশুব দল হাঁ করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে।

যে ছেলেটা প্রকাণ্ড হুঁকাটা টানিতেছিল সে হুঁকা পর্যন্ত টানিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ঘরের দুয়ারে দুয়ারে শান্ত বধূর দল অবগুণ্ঠানান্তরাল হইতে কৌতুকোজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে।

সঞ্জীব বলিল—তার চেয়ে চলুন নির্জন মাঠে গলা ফাটিয়ে তর্ক করা যাবে।

একটা উলঙ্গ ছেলে অকস্মাৎ হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল—হি হি হি, বর-কনেতে ঝগড়া লেগে গেছে মাইরি—হি হি হি।

মুহূর্তে নলিনী আপনার হাতখানি টানিয়া লইল।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আপনি ছেলেমানুষ, মিস গাঙ্গুলী। ওই হাড়িদের কথায় কান দেন আপনি ?

গ্রামের বসতি ছাড়াইয়াই আশ্বিনের সবুজ অবারিত মাঠ বিপুল আলস্যে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটা শ্রেণীবদ্ধ তালগাছ শরতের প্রসন্ন নীলাভ শূন্য পথে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, সম্মুখে দিকচক্রবালে গ্রাম-বন-শোভার ঘন সবুজের সহিত আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ।

চলিতে চলিতে নলিনী বলিয়া উঠিল—সকল সত্তা ভুলে কমরেড হওয়া যায় সঞ্জীববাবু। কিন্তু যাকে আপনি অস্বীকার করতে চান সেই ঈশ্বরকে বুকের মধ্যে অহরহ অনুভব করা চাই।

সঞ্জীব বিস্মিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নলিনী বলিয়া গেল—হারাণের কথা শুনলেন ? সে সত্যি সত্যিই আজ ভগবানের উপর নির্ভর করে আছে। তাঁকে আজ সে অনুভব করছে। তাঁরই ছোঁয়াচ আমাকেও

লাগল। মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত সত্তাকে ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম এতগুলো লোক আমাদের দিকে চেয়ে আছে। নিঃসঙ্কোচে আপনার হাত ধরলাম।

মৃদু হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—কিছু মনে করবেন না। আপনি বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল।

হাসিমুখেই নলিনী উত্তর দিল—সেন্টিমেন্ট ভাবের উচ্ছ্বাসই হলো জীবনের লক্ষণ সঞ্জীববাবু। সমুদ্রে নদীতে তাই প্রাণের উচ্ছ্বাস ওঠে তরঙ্গের পর তবঙ্গে। ঘটি-বাটির জলে তরঙ্গ ওঠে না। মাটির বুকে ওঠে ফসলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু পাথরের বুকে ওঠা শেওলার দাগও স্থায়ী হয় না। তাতে গড়া হয় শুধু মৃতের ওপর কবর, স্মৃতিমন্দির।

সঞ্জীব মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

সবুজ মাঠের বুকচেরা আলপথ পায়ে পায়ে শেষ হইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা। দু'ধারের ঘন সবুজ মাঠের মধ্য দিয়া বিসর্পিল-গতি লাল কাঁকরের পথ ক্রমশ উঁচু হইয়া চড়াই-এর উপরে উঠিয়াছে। দু'ধারে বনফুলের গাছগুলি সবুজ ফলভাবে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বড় শিরীষ, বেল, অশ্বত্থ ও আউচ ফুলের গাছ। আউচ ফুলেব গাছগুলি মুক্তার মতো ছোট ছোট ফুলের স্তবকে স্তবকে যেন আলো হইয়া আছে। পথের ধারেই হাতেব কাছে একটা গাছ হইতে নলিনী একটা ফুলের স্তবক ভাঙিয়া লইল।

একটি সরু ডালের মাথায় অজস্র ফুলে-পাতায় কে যেন তোড়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

স্তবকটা দেখাইয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—এ ফুলের গোছাটাকে কি বলবেন সঞ্জীববাবু ? এ থেকে বোধ হয় ফল হয় না। একে কি বলবেন প্রকৃতিব সেন্টিমেন্ট-এর সৃষ্টি, শক্তিব অপচয় ?

স্বভাবগত মৃদু হাস্য সহকারে সঞ্জীব উত্তর দিল—প্রকৃতিব সেন্টিমেন্ট কখনও মাত্রা ছাড়ায় না নলিনী দেবী, মাত্রাবোধেই সংসারে হয়েছে ছন্দেব সৃষ্টি। এই ছন্দকে অতিক্রম করলেই সংসারে যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। সেন্টিমেন্ট-কে আমি নিম্নস্থান দিই না। সেন্টিমেন্ট-ই সংসারের বৃহৎ কর্মের প্রেরণা দেয়। কিন্তু সেন্টিমেন্ট অতি মাত্রায় হলেই কর্ম হয় পণ্ড। প্রকৃতিকে সর্বশক্তিব মূল আদ্যাশক্তি বলে মানি আমি। কিন্তু ইচ্ছাময়ী বলে ফুলে-ফলে পূজা করতে পারি নে।

চড়াইয়ের মাথায় উঠিয়া পথটা প্রকাণ্ড একটা বাঁক ফিরিয়াছে। সঞ্জীব বলিল—আসুন বাঁ দিকে ভাঙি। আর পথ নয়, অসমতল প্রান্তর। একটু সাবধানে চলবেন।

নলিনী সঞ্জীবের কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার কথায় সে চিন্তা ছাড়িয়া সম্মুখের দিকে সজাগ দৃষ্টি প্রসারিত করিল। লাল কাঁকরের টিলা, ছোট পাহাড়ের মতো খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট কাঁটাবন। লাল মাটির বুকটা কালো রঙের গোল কাঁকর আর নানা বর্ণের পাথরে সমাচ্ছন্ন। সন্তর্পণে স্যান্ডেল চালাইয়া টিলার মাথার উপর উঠিয়া নলিনী মুগ্ধ হইয়া গেল। সম্মুখে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় টিলার পর টিলা, এ উহার বুকে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুইটা টিলার মধ্যস্থলে উপত্যকার মতো সমতল ভূমিতে শস্যক্ষেত্রে হিল্লোলিত-শীর্ষ ধান্য-লক্ষ্মীর অপরূপ শোভা। ক্ষেত্রগুলির বেড়ায় তাল-বৃক্ষের সারি।

নলিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—চলুন, চলুন আগে ওই টিলাটার ওপরে গিয়ে উঠি।

টিলাগুলির গা বাহিয়া ঝর্ণার জলধারার পথে পথে নদীর জন্মকথার ইতিবৃত্ত লেখা। ক্ষুদ্র রেখাগুলি নীচে নামিতে নামিতে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া ক্রমশ গভীর ও পরিসর হইয়া চলিয়াছে। এ যেন ভূপৃষ্ঠের একখানি মানচিত্র।

নালার গর্ভে নামিয়া পড়িয়া নলিনী বালুকারাশির উপর ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল। নালাটার দুই পার্শ্বে জলে-কাটা মাটির গায়ে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের কোনটি লাল, কোনটি প্রগাঢ় হলুদ, কোনটি কালো। এখানে ওখানে বিবিধবর্ণ আকারের উপলখণ্ডের স্তূপ। বাছিয়া বাছিয়া নলিনী পাথর কুড়াইয়া আঁচল ভরিতেছিল। সহসা একটা কাঁটাবন হইতে ফর ফর শব্দে দুইটা পাখি উড়িয়া গিয়া দূরে টিলার মাথায় বসিয়া কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। নলিনী চমকাইয়া উঠিল।

অদূরে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—তিতির পাখি।

নলিনী হাসিয়া আবার পাথর কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিছন হইতে সঞ্জীব ডাকিল—একটা জিনিস দেখুন।

নলিনী দেখিল সঞ্জীবের হাতে বড় একটা লাল কাঁকরের চাপ। একটা পাথরের উপর সেটাকে রাখিয়া আর একটা পাথর দিয়া আঘাত করিতেই কাঁকরের ঢেলাটা ভাঙিয়া চুর চুর হইয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল সুকোমল গভীর রক্তবর্ণের মৃৎপিণ্ড। সেই মৃৎপিণ্ড দিয়া একটা পাথরের গায়ে গভীর রক্তবর্ণের দাগ টানিয়া দিয়া সঞ্জীব বলিল—এই হলো গিরিমাটি। হলুদ রঙের এই মাটিও পাওয়া যায়।

নলিনী আবদারের সুরে বলিল—দিন না, দিন না দেখে দেখে সংগ্রহ করে দিন না, সঞ্জীববাবু।

কয়েকটা টুকরা সংগ্রহ করিয়া লইয়া সঞ্জীব বলিল—চলুন ওপরে ওঠা যাক।

সরু একখানি রাস্তা। দু' পাশে খৈরী কাঁটার বন। মাঝে মাঝে শরবন বায়ু আন্দোলনে শির শির করিয়া দুলিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—ডাক্তার মানুষ আপনি—একটা ওষুধ চিনে রাখুন। এর নাম হচ্ছে ষড়পঙ্ক—ব্যথায় খুব ভাল ওষুধ।

নলিনী বিস্মিত হইয়া কহিল—এ কি শরবন নয়!

কোন উত্তর না দিয়া একটা পাতা ছিঁড়িয়া সঞ্জীব দু'হাতে দলিয়া নলিনীর নাকের কাছে ধরিল। চমৎকার একটা গন্ধে নলিনীর বুক ভরিয়া গেল। গোটা কয়েক পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া নলিনী প্রশ্ন করিল—কি নাম বললেন ষড়পঙ্ক—নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু এদিকে দেখুন—সূর্য অস্তে চলেছে। তখন তাহারা টিলাটার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে।

নলিনী বলিয়া উঠিল—কিন্তু একি চমৎকার ফল সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব ঘুরিয়া দেখিল একটা বড় খৈরী কাঁটার গাছ আচ্ছন্ন করিয়া একটা লতা উঠিয়াছে, আর সেই লতায় ধরিয়া আছে অপরূপ রাঙা রাঙা ফল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—এ ওর ধার করা রূপ নলিনী দেবী। আপনাদের অধর শোভা চুরি করে ওর এত শোভা—ওর নাম হচ্ছে বিম্বফল।

নলিনী কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটির দিকে চাহিয়া ধীবে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—আমরা কমরেড সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—নিশ্চয়। নইলে বিম্বফল না বলে বলতাম তেলাকুচার ফল। চলিত ভাষায় আমাদের এখানে ওর নাম তেলাকুচা।

দূরে আর একটা টিলার উপর দিয়া একখানা গরুর গাড়ি চলিয়াছিল। তাহারই পাশে সাঁওতালদেব একটা পল্লী। দিবসান্তে, কুটীরে কুটীরে ধোঁয়া উঠিতেছে, এতক্ষণে উহাদের রান্না চড়িল। সম্মুখে একটা টিলার অন্তরালে সূর্য ঢলিয়াছে।

সঞ্জীব বলিল—চলুন বাড়ি ফেরা যাক।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘনাইয়া আসিলেও পূর্ব দিগন্তে শুক্লা শারদ চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্রকলাব আলোক দেখা দিয়াছিল। সন্তর্পণে পথ চলিতে চলিতে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—কে?

ওদিক হইতে একজন মানুষ চলিযা আসিতেছিল। সে অস্ফুট চিৎকার করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কে? কে তুমি?

তারপর মৃদুস্বরে আত্মগতভাবেই বলিল—স্ত্রীলোক বলে বোধ হচ্ছে।

নলিনী অগ্রসর হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত মানুষটিকে লক্ষ্য করিযা বলিল—কে রমা?

ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া রমা কহিল—দিদিমণি?

নলিনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন কবিল—তুমি, এখানে, এমন সময় কোথায় চলেছ রমা?

কাঁদিতে কাঁদিতেই বমা কহিল—আ'''য় বাঁচাও দিদিমণি। অ'বাব গাঙ্গুলী কাকা আমায় বাবুদেব বাড়ি পাঠাবে। বাবু বাবাকে টাকা দিযেছে। বাবা আমায বিক্রি করেছে, আজই সন্ধ্যেবেলা আমায় নিতে গাডি আসবে। তখন আমি বুঝতে পারিনি, আমায় বাঁচাও তোমরা।

নলিনী প্রশ্ন করিল—কিন্তু এ পথে এই সন্ধ্যেবেলা তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?

—আমার মাসিব বাড়ি। ঐ সামনের গাঁয়ে আমার মাসির বাড়ি!

সঞ্জীব কহিল—সেখানে যাবে তুমি?

আকুলস্বরে বমা বলিল—না, না বাবু। তখন আমি বুঝতে পারিনি। মায়ের জন্য মন কেমন করেছিল তাই চলে গিয়েছিলাম বাবু!

নলিনী কহিল—সঞ্জীববাবু।

প্রশান্ত স্বরে সঞ্জীব উত্তর দিল—এস রমা।

বিজয়া দশমীর দিন।

এখানে নবপত্রিকা ও ঘট বিসর্জনান্তেই বিজয়া সম্ভাষণ হয়, এই চিরদিনের প্রথা। সঞ্জীব বিজয়া সম্ভাষণের জন্য নতুন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া ডাকিল—মা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। সে আবার ডাকিল—মা।

এবার সম্মুখের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল নলিনী, বলিল—মা ত এখনও অঞ্জলি দিয়ে ফেরেননি।

সঞ্জীব সে কথার কোন জবাব দিল না, বলিয়া উঠিল—একি, আপনি এখনও কাপড়চোপড ছাড়েননি যে?

নলিনী কহিল—কেন?

—বেশ যা হোক। এত বড় পুজোটা গেল সে দেখলেন না। এদিকে দেখি ঈশ্বর পূজায় আপনার দারুণ নিষ্ঠা। তার ওপর আজ বিজয়া দশমী বাঙালী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বদিন। আজ নববস্ত্র পরিধান করে নতুন উদ্যম নিয়ে আমাদের হয় নব বৎসর।

নলিনী চুপ করিয়া রহিল। সঞ্জীবের চোখের দৃষ্টি তখন উল্লাসে উচ্ছ্বসিত, সহজ দৃষ্টশক্তি থাকিলে সে দেখিতে পাইত কালো মেয়েটির বর্ণ বিষণ্ণতার ঘন ছায়ায় সজল মেঘের মতো ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

সে উৎসাহ ভরেই বলিয়া গেল—দেখবেন, এক্ষুণি রাস্তা দিয়ে দলে-দলে গ্রামের লোক দুর্গা মায়ের ঘাটে চলবে। সেখানে জীবনের জয় কামনা করে হাতে অপরাজিতার বলয় পরবে, হরিদ্রার প্রসাদ খেয়ে দেহের পবিত্রতা রক্ষা করবে। তারপর বিজয়া সম্ভাষণ আরম্ভ হবে। স্ত্রী পুরুষ দলে দলে সাজসজ্জা করে বাড়ি বাডি প্রণাম করে ফিরবে। পুজো আপনি দেখলেন না—আজ আপনাকে বেরুতেই হবে। কাপড়চোপড়—তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্বেই নলিনী ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সঞ্জীব বিস্মিত হইয়া গেল। মেয়েটির গতির মন্থরতা এতক্ষণে তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া সে ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী। কোন উত্তর আসিল না। সঞ্জীব এবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নলিনী স্তব্ধ হইয়া তক্তপোশখানির উপরে বসিয়াছিল। সঞ্জীব স্নেহ-কোমল স্বরে আবার ডাকিল—নলিনী দেবী।

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া নলিনী তাহার দিকে চাহিল; বলিল—বলুন।

—কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন, বিজয়ার সময় আর বেশি নেই। আজ নতুন সাজসজ্জা করতে হয়, উঠুন।

নলিনী একটু হাসিল—উদয়াকাশের বিলীয়মান তারকার মতোই সে হাসি সকরুণ ক্ষীণ। সে হাসিটুকুর রেশ তাহার অধরতটে থাকিতে থাকিতেই সে বলিল—না।

—কেন? আপনার কি হলো—

অস্থির হইয়া 'নলিনী বলিয়া উঠিল—না, না, আমায় মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। আমি যেতে পারব না।

তাহার চোখ ছল ছল করিতেছিল। উচ্ছ্বসিত কয়টি ফোঁটা মাটির উপর ঝরিয়াও

পড়িল। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো নলিনীর বেদনার কারণটুকু সঞ্জীবের মনে সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সে নত মুখেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

পিছন থেকে নলিনী বলিল—আমায় একটু কাঁচা হলুদ এনে দেবেন ?

সঞ্জীব বলিল—দেব। কিন্তু মনকে এমনভাবে পীড়িত করবেন না মিস গাঙ্গুলী। যে ভুল যে ভ্রান্তি পিছনে ফেলে এসেছেন তার দিকে ফিরে চাইতে গেলে সম্মুখের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হয়। তাতে জীবন হয় পঙ্গু। ভুলে যান, ও কথা ভুলে যান আপনি।

অতি কাতরস্বরে পিছন হইতে উত্তর আসিল—পারি নে, পারছি নে, বোধ হয় সে পারা যায় না সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব মুখ ফিরাইতে দেখিল, অন্তরের উচ্ছ্বসিত বেদনার আবর্তে ছোট্ট নদীটির মতোই সে ব্যাকুল হইযা উঠিয়াছে। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নলিনী কাঁদিতেছিল। সঞ্জীব নিকটে দাঁড়াইয়া কোমলস্বরে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ছি কাঁদবেন না মিস গাঙ্গুলী, কাঁদবেন না।

নলিনী তবুও কাঁদিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—কিসের লজ্জা আপনার ? কার চেয়ে ছোট আপনি ? দয়া মায়া মহত্ত্ব সত্যনিষ্ঠায আপনি তো কারও চেয়ে ছোট নন! উঠুন, উঠুন কাঁদবেন না। নলিনীর হাত ধরিয়া সে একবার মৃদু আকর্ষণ করিল।

নলিনী বলিয়া উঠিল—না, না। আমায় একটু একা থাকতে দিন।

—দিদিমণি!

ডাক শুনিয়া সঞ্জীব মুখ ফি াইয়া দেখিল, দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া রমা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কিছু বলছ রমা ?

ত্রস্তভাবে দৃষ্ট নত করিয়া কুণ্ঠিত স্বে রমা বলিল—দিদিমণিকে ডাকছিলাম, তা থাক।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মুখ বাড়াইয়া নলিনী বলিল—আমায় ডাকছ রমা ?

বমা তখন চলিয়া গিয়াছে।

সঞ্জীব বলিল—আমি যাই তা হলে। মনকে কিন্তু এমনভাবে অনর্থক পীড়ন করবেন না। আমার অনুরোধ রইল।

সে চলিয়া গেল। নলিনী আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল—রমা! রমা!

দরজার পাশ হইতে রমা উঁকি মারিয়া বলিল—দাদাবাবু চলে গিয়েছেন দিদিমণি ? আমি যাব ?

এই মুহূর্তে অন্য কেহ এ কথা বলিলে নলিনী অপমান বোধ না করিয়া পারিত না। কিন্তু এই নির্বোধ মেয়েটার কথায় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল. সে কহিল—হ্যাঁ চলে গেছেন তিনি। এস তুমি। কিছু বলছিলে আমায় ?

ঘরের মধ্যে রমা প্রবেশ করিয়া বলিল—বিজয়া দেখতে যাবে না দিদিমণি? কাপড়-চোপড় ছাড়।

নলিনী কহিল—না ভাই আমি যাব না। আমার শরীর খারাপ করেছে, তুমি বরং যাও।

রমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর একান্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিল—তোমার ওই পুরনো কাপড আর সেমিজটা আমি আজ পরব দিদিমণি? আমার কাপডটা বড মোটা। আর তোমার কাপডের পাডটা কেমন ভাল।

নলিনী পরম স্নেহভরে স্বল্প হাস্যেব সহিত ঘাড দোলাইযা সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

প্রবল উৎসাহে রমা বলিয়া উঠিল—নেব দিদিমণি?

হাসিয়া নলিনী স্পষ্টাক্ষরে সম্মতি দিল—নাও। তোমায দিলাম ও-গুলো।

চঞ্চলা বালিকার মতোই লঘুপদে রমা চলিয়া গেল। ওই চঞ্চল গতিব স্পর্শ ছোঁয়াচের মতো যেন নলিনীর মনে রঙ ধরাইয়া দিল। সে চাহিয়া রহিল রমার ওই চঞ্চল গতি চিহ্নিত গমন পথটিব দিকে, মৃদু হাসির রেশটুকু মুখে তার লাগিয়াই ছিল। কতক্ষণ পব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা সম্মুখেব খোলা জানালার দিকে সে চাহিল। সে ভাবিতেছিল—সে কেন রমা হইতে পাবে না? অপরাধ-বোধহীন এমন একটি অকুণ্ঠিত শিশুচিত্ত কেন তাহার নয়? মনশ্চক্ষুব কেন এমন একটি অকলঙ্ক শুভ্র দৃষ্টি তাহার নেই? রমার দৃষ্টিতে তাহাব গাঙ্গুলী কাকা ভাল মানুষ, মহেন্দ্রবাবুকেও সে ভাল লোক ভাবে।

অকস্মাৎ একটি কথা তাহার মনে পডিযা গেল। সে ব্যস্ত হইযা ডাকিল—বমা! রমা! রমা!

হাসিমুখে বমা আসিয়া দাঁডাইল। বলিল—আমায ডাকছ দিদিমণি?

নলিনী দেখিল তাহার কাপড বদলানো হইযা গিয়াছে—পরনে তাহার সেমিজ আর তাহারই মাদ্রাজী শাডিখানা। অপটু হাতেব বিন্যাসে সেমিজটা কুঁকডাইয়া গিযাছে। পরিধান করিবাব অপকর্ষ ভঙ্গিতে কাপডখানা শ্রীহীনভাবে বিন্যস্ত, কিন্তু রূপ যাহাব আছে—পরিচ্ছদ বিন্যাসের শ্রীহীনতা তাহার শ্রীকে পীডিত করিতে পারে না। এই বেশ-বিন্যাসেই তাহাকে মানাইযাছে বড চমৎকাব।

নলিনী বলিল—আমার তখন মনে হযনি রমা। তুমি সঞ্জীববাবুকে জিজ্ঞাসা করে তবে যেন বেরিও।

রমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন দিদিমণি?

একটু বিরক্ত হইয়া নলিনী কহিল—এত ছেলেমানুষ তো তুমি নও বমা? জান তো—এটা হলো মহেন্দ্রবাবুর রাজ্য। তাব বিপক্ষে যে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে বেরিয়ে যদি কোন বিপদ ঘটে তখন কি হবে?

রমা নীরবে চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পব আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—তুমি দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দাও দিদিমণি।

কেন, কে জানে বেশ-বিন্যাসপরায়ণা রমাকে নলিনীর ভাল লাগিতেছিল না।

নলিনী এবারও বিরক্তিভরে বলিল—কেন? তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর না।

রমা মুখ নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—আমার বড় লজ্জা লাগছে দিদিমণি। তখন দাদাবাবু কি মনে করেছেন বল ত?

—কখন? এই ছন্নছাড়া মেয়েটির কথাবার্তার অর্থও যেন ছন্নছাড়া। সে অর্থ নলিনীর বোধগম্য হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—কখন?

—যখন সেই তোমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি এসে পড়লাম। রমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুস্পষ্ট লজ্জার রেশ গুঞ্জন করিয়া করিয়া ফিরিতেছিল।

কঠিনস্বরে তিরস্কার করিযা নলিনী বলিয়া উঠিল—ছি রমা, তুমি এত নীচ!

রমার মুখ ম্লান হইয়া গেল—সে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিতে চেষ্টা করিল নলিনীর মুখের দিকে। কিন্তু পারিল না, অবশেষে নতমুখেই মন্থর পদক্ষেপে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আর কখনও বলব না দিদিমণি।

নলিনী একান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল—এই রমা! হায় রে হতভাগ্য মানুষ! পাপকে এড়াইবার পথ নাই—কোন পথ নাই! মনের কোন অন্ধকার কোণে সে লুকাইয়া থাকে, অকস্মাৎ সুযোগমতো বীভৎস হাসি হাসিযা মুখ তুলিয়া একদিন আত্মপ্রকাশ করে। চিন্তা করিতে করিতে পক্ষ বিস্তার করিয়া মন চলিয়া যায় কত দূর-দূরান্তরে। একসময় তাহাব মনে হয় ইহার জন্য দায়ী মানুষ নিজে। শিক্ষা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের প্রবেশেব গোপন পথ রচনা করিয়াছে সেই স্বযং? রমার বুকেও সে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে।

বাড়িব বাহির হইতে কে ডা[illegible]তোছল, সঞ্জীববাবু! সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব বাড়িতে ছিল না। মাথায় ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া মা দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণ স্বর অপেক্ষা উচ্চকণ্ঠেই কহিলেন—কে?

—আমি মহেন্দ্রবাবুর কর্মচারী।

মা বলিলেন—সঞ্জীব তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফিরে আসুক বলব তাকে আমি। কি দরকার আমায় বলে যেতে পার। এস না বাবা, ভেতরে এস।

লোকটি দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—তিনি এলেই আসব বরং আমি, দেনা-পাওনার ব্যাপার।

একটু হাসিয়া মা বলিলেন—দেনা-পাওনার ব্যাপার হলে আমিই জানব ভাল। সে তো বাইরে বাইরে ফেরে, সে এসব জানেও না। কিসের দেনা-পাওনা, কার সঙ্গে দেনা-পাওনা?

—আজ্ঞে একখানা তমসুক আছে। বারো বছর হতে চলল উশুলের পর। তামাদী হবে, তাই বাবু পাঠালেন।

—কে? মহেন্দ্রবাবু? কিন্তু তাঁর কাছে তো ঋণ আমরা কখনও করিনি।

মাথা চুলকাইয়া কর্মচারীটি জবাব দিল, আঁজ্ঞে দলিলখানা হচ্ছে এককড়ি গাঙ্গুলীর। সে বাবুকে দলিলখানা বিক্রি করেছে। প্রায় পাঁচশো টাকা বাকি দাঁড়াচ্ছে।

এই সময়ে এদিকের দরজা দিয়া সঞ্জীব প্রবেশ করিয়া কহিল—বেশ যা হোক তুমি, মা। সমস্ত ঠাকুরবাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। বাবুর কর্মচারীটিকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—কি ব্যাপার মা? আপনি যে এ সময়ে ঘোষ মশায়?

ঘোষ মশায় বলিল—বাবু পাঠালেন আপনার কাছে। এককড়ি গাঙ্গুলীর একখানা বন্ধকী দলিল তিনি কিনেছেন। সেখানা তামাদির মুখে। তাই খবর দিয়ে পাঠালেন তিনি। আপনার বাবার সম্পাদন করা তমসুক, আপনি জানেন বোধ হয়।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সঞ্জীব উত্তর করিল—বাবা সে ঋণ শোধ করেছেন বলেই আমাদের ধারণা। তবে যদি সত্যিই পাওনা থাকে তবে নিশ্চয় শোধ দেব আমি। বাবার ঋণ কখনও রাখব না।

বাধা দিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—তুই চুপ কর সঞ্জীব। শোন গো বাছা, তোমার বাবুকে গিয়ে বলবে সে দলিলের টাকা সঞ্জীবের বাপ শোধ দিয়ে গেছেন। পঁচিশ টাকা বোধ হয় বাকি ছিল, কিন্তু সে টাকা রফা পাওয়ার কথা ছিল। গাঙ্গুলী আজ-কাল করে দলিলখানা ফেরত দেয়নি। ও টাকা আমাদের দেয় নয়—আমরা দেব না।

বাবুর কর্মচারী ঘোষ মশায় বিজ্ঞ হাস্যের সহিত বলিল—কিন্তু মা, দলিলে যখন বাকি রয়েছে, দলিলও যখন ফেরত হয়নি, তখন আদালতে গেলে যে আদায় হবেই; তখন আদালত খরচাও লাগবে।

মা এবার তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার সহিত বলিলেন—তাই দেব। পঁচিশ টাকার বাকিতে যদি পাঁচশো টাকা দিতেই রাজার হুকুম হয় তাই দেব। কিন্তু সে মীমাংসা না হলে এক পয়সাও দেব না। বল গিয়ে তোমার বাবুকে।

কর্মচারীটি সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সঞ্জীববাবু।

মা উত্তর দিলেন। বলিলেন—ও আর নতুন উত্তর কি দেবে বাবা? আমি থাকতে ও কে? ওই ওর উত্তর। এই কথাই তোমাদের বাবুকে গিয়ে জানাও তুমি।

লোকটি তবুও সঞ্জীবকে প্রশ্ন করিল—এই জবাবই কি ঠিক সঞ্জীববাবু? একটা আপোষ করলে হত না?

মা বলিয়া উঠিলেন—দেখ বাবা, আজ বিজয়া দশমীর দিন, আজ কাউকে রুক্ষ কথা বলতেও নেই—কারও কাছ থেকে শুনতেও নেই। যাও তুমি বাবা, যা বললাম তাই গিয়ে তুমি বল।

জমিদারের কর্মচারী আর বাস্তু-ঘুঘুতে বড় বেশি নাকি তফাত নেই। বাস্তু-ঘুঘু তাড়াইলেও যায় না, একটু সরিয়া গিয়া আবার গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ডাকে। ঘোষ মশায় এতটুকু বলাতে দমিবার পাত্র নয়, বেশ একটু মোলায়েম করিয়া সে বলিল, বললেই তো হয়ে গেল মা, হাতের তীর বেরিয়ে গেল। ঝগড়া-বিবাদ বাধানো সোজা মা, মেটানোই কঠিন। তার চেয়ে একটা আপোষ, সঞ্জীববাবু একবার গেলেই—

মা বলিলেন—জানি, কিন্তু সঞ্জীব যাবে না। তুমি যাও।

গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি বাড়িটা ব্যাপ্ত করিয়া যেন রন্‌ রন্‌ শব্দে বাজিতেছিল। ঘোষ মশায় আর অপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। ছোট একটা নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের বারান্দায় ঠাঁই করিয়া দিয়া মা বলিলেন—আয় খেয়ে নে সঞ্জীব। বিজয়ার সময় আর বেশি নেই।

আসনের উপর বসিয়া সঞ্জীব বলিল—একটা কথা ভেবে দেখবার আছে মা। তুমি ভেবে দেখো। মহেন্দ্রবাবুকে মোকর্দমায় হারিয়ে জিততে পারা যাবে না। আপীলের পর আপীল করে আমাদের তিনি ধ্বংস করবেন। এটা হলো তাঁর একটা অস্ত্র। এই করেই বহুলোকের সর্বনাশ তিনি করেছেন। অথচ মাথা উঁচু করে চলেন। উনি হারেন কোন্‌খানে জান মা—যেখানে লোকে ওঁর মিথ্যে-অন্যায় দাবি জেনেও টাকা ফেলে দিয়ে আসে সেখানে। সেখানে উনি মাথা হেঁট করেই থাকেন—আর মাথা তুলতে পারেন না।

দৃঢ়স্বরে মা বলিলেন—না।

সঞ্জীব বলিল—তাছাড়া পঁচিশ টাকা তো বাকি ছিল। রফার কথা সত্যি কি না কে বলবে? বাবাকে ঋণী করে রাখা—

বাধা দিয়া মা কহিলেন—তার পাপ তোকে স্পর্শ করবে না সঞ্জীব—সে পাপ আমার।

সঞ্জীব আর কোন কথা কহিল না। নিশ্চিন্ত হইয়া নীরবে সে আহার করিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরে মা বলিলেন—নলিনীকে তুই কলকাতায় রেখে আয়। আমাদের যা হয় হবে—কিন্তু আশ্রয় যখন দিয়েছি—তখন বিপদের আঁচ যেন ওদের গায়ে না লাগে।

পরদিন সঞ্জীব নলিনী ও রমাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

রমার সম্পর্কে কি করা হইবে বহুক্ষণ চিন্তার পর নলিনী বলিয়াছিল—রমাকে আমি নিয়ে যাই সঞ্জীববাবু। ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে যদি নার্স করে তুলতে পারি তাহলে ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সঞ্জীব উল্লসিত আগ্রহে বলিয়াছিল—এই, এই কথাটাই যেন আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলাম মিস গাঙ্গুলী। তাই হোক—এর চেয়ে ভাল কিছু ওর পক্ষে হতে পারে না।

ট্রেনে চড়িয়া সঞ্জীব ও নলিনী তর্কবিতর্কে কামরাখানা যেন মাতাইয়া তুলিল। সুবিধাও হইয়াছিল বেশ—তাহারা তিনটি প্রাণী ব্যতীত অপর কেহ সে গাড়িতে ছিল না। রমা এক কোণে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে উল্কা বেগে। সম্মুখ হইতে গ্রামের পর গ্রাম ছুটিয়া আসে আবার পিছনে পড়িয়া যায়। প্রতি গ্রামখানিকেই রমার মনে হয় ওই আমাদের গ্রাম। ক্রমশ

দেশের রূপ পরিবর্তিত হইতেছিল। এবার গ্রামগুলি আরও নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন—মৃত্তিকার রঙ কালো। সে গেরুয়া মাটির দেশ আর নেই।

এদিকে সঞ্জীব তখন বলিতেছিল—আর নয় মিস গাঙ্গুলী, বর্ধমান এগিয়ে আসছে। চিৎকার করে ক্ষিধেকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। এতেই পকেট অনেক খালি হয়ে যাবে।

নলিনী বলিল—যে আপনার খাওয়া! পাখিতেও বোধ হয় আপনার চাইতে বেশি খায়।

সঞ্জীব হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—হয়েছে। খাওয়া নিয়ে বাড়িতে দিবারাত্র মায়ের গার্জেনীর ঠেলায় অস্থির। গাড়িতেও শেষকালে বান্ধবী গার্জেন হয়ে উঠলেন। আমার অদৃষ্ট।

নলিনীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—না, আপনাকে পারবার জো নেই। সকল কথাকেই আপনি হাসির ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

উচ্চ হাসির শব্দে রমা জানালা হইতে মুখ ফিরাইয়া এদিকে চাহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথার ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া আবার জানালার বাহিরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সঞ্জীব বলিল—না, না, এমন করে বাইরে ঝুঁকে থেকো না রমা। চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে। হয়তো লাইনের পাশের গাছপালার ডালে আঘাতও লাগতে পারে।

রমা একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিল, কিন্তু মুখ ফিরাইল না। মৃদু কণ্ঠিত স্বরে কি যে বলিল তাও বেশ বোঝা গেল না।

নলিনী তাহাকে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিল—দেশের জন্যে মন কেমন করছে রমা?

মৃদু হাসিয়া রমা বলিল—না।

—তবে, তবে এমন করে রয়েছ যে?

অতি মৃদুস্বরে রমা বলিল—তোমরা কথা কইছ—। আর সে বলিতে পারিল না।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কি?

নলিনীর মুখখানাও রাঙা হইয়া উঠিল, সেও কথার কোন জবাব দিল না।

বিজয়া দশমীর পর দিন কাছারিতে বসিয়া মহেন্দ্রবাবু পরামর্শ করিতেছিলেন সদর-নায়েবের সঙ্গে। একটি জাল রচনার প্রণালী ও কৌশলই ছিল আলোচ্য বিষয়।

বাবু বলিলেন—দেখ, ওকে টাকা দিলে জলে পড়বে বলে আমার মনে হয় না। সে হ্যান্ডনোটেই হোক আর মর্টগেজেই হোক। প্রথমেই মর্টগেজে নিতে চাইলে ও এগুবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া বলিলেন—মানী লোক তো। মানের ভয়টা এ জগতের লোকের সবচেয়ে বেশি।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল।

বাবুই বলিতেছিলেন—এই সব ইডিয়টদের কথা মনে হলে আমার হাসি পায় হরিচরণ। ধর্ম দেখায় এরা। আত্মনং সততং রক্ষেৎ—এই কথাটাই হলো বাস্তব জগতের সবচেয়ে বড় ধর্মের কথা অথচ এটাকেই করে ওরা অবহেলা।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার হাসিয়া বলিলেন—আমায় এরা বলে অধার্মিক পাপী, অথচ আমার ঐশ্বর্য সম্পদের ঈর্ষা করতে ছাড়ে না। আঙুর ফল টক গল্পটা খুব ঠিক, যাক, এক কাজ কর তুমি, কোনও থার্ড পার্টিকে দিয়ে ওর কাছে প্রস্তাব করে পাঠাও যে টাকা হ্যান্ডনোটেই দেওয়া হবে। সেই যেন অনুরোধ উপরোধ করে এটা করে দিচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক হওয়া চাই। ওই সব লোকের মতো ইডিয়ট ধর্মপরায়ণ গর্দভ হলে সব মাটি হবে।

নায়েব এতক্ষণে কথা কহিল। সে অতি মৃদুভাষী লোক। শ্রোতার যে কানটি তাহার দিকে থাকে সেটি ভিন্ন অন্য কানে তাহার কথা যায় না।

সে বলিল—এতগুলো টাকা, একটু ভেবে দেখা উচিত। হ্যান্ডনোটে টাকা দেবেন, কিন্তু কাল যদি সে সম্পত্তি হস্তান্তর করে কি বেনামী করে ফেলে।

পেন্সিলের প্রান্তদেশটি ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া মহেন্দ্রবাবু নীরব হইয়া রহিলেন। কপালের রেখাগুলি কুঁচকাইয়া চিন্তারেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে তিনি বলিলেন, না। তারপর বলিলেন স্পষ্ট ভাষায়, এ বুদ্ধি ওর হবে না। বললাম তো ও একটা গর্দভ।

মৃদু হাসিয়া নায়েব বলিল—এ কালে বুদ্ধি দেবার তো লোকের অভাব নেই। বুদ্ধি অপরে দেবে।

হাসিয়া বাবু বলিলেন—তুমি ছেলেমানুষ। বাস্তব সংসারের অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি তোমার।

আইনের কূটকৌশল যত্ত কিছু, সবই তো আইনের বইয়েই আছে। সে সব বই উকিলই পড়ে কিন্তু সবাই রাসবিহারী ঘোষ হয় না কেন? বুদ্ধি দিলেও সে নেবার ক্ষমতা ওর নেই।

নায়েব চুপ করিয়াই রহিল। স্বল্পভাষী লোক। তর্ক ভালবাসে না।

বাবু বলিলেন—এসব বুদ্ধি ওর কানে ঢুকবে কিন্তু মাথায় যাবে না। মন সায় দেবে না। বললাম তো ধর্মভীরু মানী লোক ওরা, প্রথমে ভাববেন ধর্ম, তারপর ভাববেন সুনামের কথা, তারপর হবে ভয়, কি জানি ফন্দি যদি না টেঁকে।

নায়েবের এসব মন্তব্য তবুও বেশ মনোমতো হইল বলিয়া বোধ হইল না, কুণ্ঠিতভাবেই সে বলিল—দেখুন যা আপনার ইচ্ছা হয়।

বাবু বলিলেন, পাশার ঘুটি আড়ি না দিয়ে গেলে উপায় নেই। আড়ি দিয়েও মার খায় আক্ষেপ করে না। কিন্তু পার হয়ে গেলে ষোল আনাই লাভ। দাও ওকে, হ্যান্ডনোটেই ওকে টাকা দাও। এক বছর পরে তুমি মর্টগেজ আমার কাছে করে নিয়ো।

তারপর আবার ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া বলিলেন—লোক চেনার ক্ষমতা তোমাদের হয়নি এখনও। ওরা সব বড় মজার লোক। মরাল অব্লিগেশনের দড়ি একবার পরাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সে দড়ি ওরা কখনও ছিঁড়বে না, ছিঁড়তে চেষ্টা পর্যন্ত করবে না, ভাববে লোহার শিকল। হাঁসের মতো, জান তো হাঁসের ঘরে দড়ি ফেলে দিলে হাঁসগুলো ভয়েই মরে যায়, দড়িটাকে সাপ ভেবে।

নায়েব এবার বলিল—তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি।

—হ্যাঁ। মৌজা বনমালীপুর আমার চাই। ঘর থেকে বেরিয়েই পরের সীমানায় পা দিতে হয়। আর লাভও, মৌজাটাও ভাল। যে কোন উপায়ে, কে? কি বলছ তুমি?

সঞ্জীবের উত্তর বাহক ঘোষ মশায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে সঞ্জীব মুখুজ্যের ওখানে গিয়েছিলাম আমি। সে বললে—

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু বলিলেন—পরে শুনব। এর চেয়ে ওটা জরুরী বিষয় নয়। যাও, ও ঘরে আপনার জায়গায় গিয়ে বসে কাজ কর এখন।

ঘোষ মশায় চলিয়া গেল।

নায়েবের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া ঘোষ মশাযকে ডাকিলেন। বলিলেন—কি বললে, সঞ্জীব? জ্ঞান হয়েছে একটু?

সঞ্জীব ও তাহার মায়ের কথাগুলি অলংকার দিয়া বর্ণনা করিয়া ঘোষবাবু বলিল—আজ্ঞে ছেলের চেয়ে দেখলাম মায়েব তেজই বেশি।

মহেন্দ্রবাবু গুম হইয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পবে বলিলেন—আচ্ছা যাও তুমি।

নায়েবকে বলিলেন—সঞ্জীবের নামে একটা আর্জি করে দাও।

নায়েব বলিল—ওর মা যা বলেছে সেটা একবার ভেবে দেখবার কথা। শেষ পর্যন্ত এতে ঠকতে হবে হুজুর।

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বাবু বলিলেন—হাইকোর্ট পর্যন্ত আপীল লড়তে সঞ্জীবের খড়ের চাল বিক্রি হবে না?

—তার চেয়ে একটা ক্রিমিনাল কেস করলেই বোধ হয় ঠিক হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে মহেন্দ্রবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিলেন।

এবার অতি মৃদু স্বরে কয়টি কথা তাঁহাকে বলিয়া নায়েব সহজ স্বরে বলিল—ওর বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সবাই আমাদের পক্ষে রয়েছে। মেয়েটা হাতে আসে ভালই, নইলে ওকে মাইনর বলে চালিয়ে দিতে হবে। এ সেকশনে আর পার নাই। পাঁচ-ছ বছর নির্ঘাত।

বাবু আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, কড়ি গাঙ্গুলীর কাছে একটা লোক পাঠিয়ে দাও।

মনে উচ্ছ্বাসের বাহ্যিক প্রকাশকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন। খাস বৈঠকখানায়

বসিয়া ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড খুলিয়া তাহার নীরস ধারাগুলি নাগপাশে বাঁধিয়া মনের উচ্ছ্বাসটুকু নিথর করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় সঞ্জীবকে পনের-ষোল দিন অপেক্ষা করিতে হইল। একটা মধ্যমশ্রেণীর হোটেলে উঠিয়া নলিনীর জন্য একটা বাসার সন্ধান করিতেই প্রথম আট-দশ দিন কাটিয়া গেল। বাসা তখনও ঠিক হয় নাই। সেদিন তখন কথা হইতেছিল বাসা লইয়াই।

নলিনী বলিল—বড় রাস্তার ওপরে হলেই ভাল হয়। প্রথম প্র্যাকটিসের মুখে আগে প্রয়োজন ডাক্তারের অস্তিত্বটা লোককে জানানো। খান দুই ঘর, রান্নাঘর, কলঘর, বাথরুম এই হলেই যথেষ্ট আমার পক্ষে। বাসার খরচ চালানো তো বড় সোজা কথা হবে না। একটু হাসিয়া নলিনী আবার বলিল—আর চাকরি নয় সঞ্জীববাবু। কষ্ট অবশ্য কিছু হবে। কিন্তু পুরুষের তাঁবেদারী করার চেয়ে সে কষ্ট অনেক সহনীয়।

সঞ্জীব বলিল—চাকরি করলেই যে পুরুষের তাঁবেদারী করতে হবে, এর কোন মানে নেই মিস গাঙ্গুলী।

তেমনি হাসিয়া নলিনী বলিল—আছে বৈকি সঞ্জীববাবু। সমস্ত পৃথিবীটারই যে এখনও ষোল আনার মালিক আপনারা। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে যে দেশ যতই চিৎকার করুক, সকল দেশেই স্ত্রী-স্বাধীনতা আসলে একটি শূন্যগর্ভ পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইরে দেখাবার জন্য মঙ্গল-কলসের মতো সৌখীন পাত্রই একটা তৈরি হযেছে, কিন্তু অন্তঃসার-শূন্য। তাই চিৎকারটাও খুব প্রবল আর উচ্চ। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিন—সব দেশেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক হলো পুরুষ। অবশ্য এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। কারণ তারা স্ত্রীলোকের চেয়ে বলশালী।

সঞ্জীব বলিল—বলপ্রয়োগ করাটাই যে নীতিবিগর্হিত হয়ে উঠছে দিন দিন, মিস গাঙ্গুলী।

হাসিয়া নলিনী বলিল—ও কথার কোন অর্থ হয় না সঞ্জীববাবু। পৃথিবীতে যদি নীতি প্রচার হয় যে, লোভেব মূল হলো দৃষ্টি, অতএব সবাই চোখ বন্ধ করে থাক, সেটা যেমন অসম্ভব এটাও ঠিক তাই। দৃষ্টিশক্তি থাকতে অন্ধ হওয়ার কল্পনা যেমন হাস্যকর, বল থাকতে সে বল প্রয়োগ কববে না, এ কল্পনাও ঠিক তাই। না, চাকরি আর নয়। আমাদের দেশে প্রভুর সেবা করতে হয় আবার সর্বভাবে।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আপনি যে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলেন। অদূর ভবিষ্যতে পুরুষের সঙ্গে যদি নারীর কখনও যুদ্ধ হয়, তবে আপনিই বোধ হয় হবেন বিদ্রোহের ধ্বজা-বাহিনী।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল, কি যেন সে ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে বলিল—পুরুষ জাতটাকে আমি ঘৃণা করি না সঞ্জীববাবু। তাকে প্রভু বলে নারীকে মানতেই হবে। তাকে মানতে চাই আমি পিতারূপে—স্বামীরূপে, পরিণত বয়সে সন্তানরূপে। প্রতিপালক প্রভুরূপে তাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি—ভয় করি।

বন্ধুরূপেও তাকে আমি পেতে চাই না। বন্ধুত্বের আবরণের মধ্যেও পুরুষ নারীর অজ্ঞাত শত্রু।

সঞ্জীবের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল—মিস গাঙ্গুলী, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এ আলোচনা এখন থাক।

সেই গাঢ়স্বরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো অকম্পিত দৃষ্টি মেলিয়া নলিনী বলিয়া গেল—সাপের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের মতো এ বন্ধুত্ব ভয়ানক। সাপও পোষ মানে না—মানা সম্ভব হয় না; কিন্তু কি করবে সে. তার বিষ দাঁতের জন্য তো সে দায়ী নয়। বন্ধুত্বের বিনিময় করতে গিযে সে বিষ দাঁত একদিন না একদিন মানুষের দেহে বিঁধে যায়। নারী-পুরুষেরও তাই, সঞ্জীববাবু। অসতর্ক মুহূর্তে ব্যবধান ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেই সে পুরুষের বন্ধুত্ব হয়ে দাঁড়ায় উন্মত্ত মোহ। নারীরও বুকে বিষ আছে, কিন্তু সে বিষ নীলকণ্ঠের মতো গোপন করে রাখে তারা। মোহে নারীর উন্মত্ততা আসে না, সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। নলিনীর রূঢ় বাক্যে সে আঘাত পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে নাই। নির্যাতিতা মেয়েটির বুকের অসহনীয় বেদনার জন্য, তার করুণার আর অন্ত ছিল না। ঘরের মধ্যে নলিনী একাই বসিয়া রহিল। নির্জনতার অবকাশের মধ্যে আছে একটি উচ্ছ্বাস প্রকাশের মোহ।

নলিনীর ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আয়ত চোখ দুইটির কূল ভরিয়া অশ্রু টলমল করিতেছিল।

রমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশভূষায় একটি বিশেষত্ব ছিল। মাথার এলানো চুলগুলি রুক্ষ ধূসর সৌন্দর্যে মেঘের মতো ফুলিযা উঠিয়াছে। দেহের তৈলমসৃণ সুগৌর বর্ণ মসৃণতাহীন উগ্রতায় ঈষৎ রক্তিম।

নলিনী তখনও আপনার কথাই ভাবিতেছিল। সে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।

রমাই সলজ্জভাবে হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চুলে বড় আঠা ধরেছিল তাই সাবান দিলাম আজ' কিন্তু মুখ-হাত যে বড জ্বলছে দিদিমণি।

কোলের আঁচলে চোখের জলের লজ্জাটুকু মুছিয়া লইয়া সে বলিল—ওই দেখ টেবিলের ওপর স্নো রয়েছে, একটু মেখে ফেল। দেখেছিস বোধ হয় আমি মুখে মাখি, হ্যাঁ ওইটে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে সঞ্জীব আসিয়া বলিল—একটা সুসংবাদ আছে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী বলিল—আপনি মঙ্গলের অগ্রদূত সঞ্জীববাবু। মঙ্গল আপনার অনুসরণ করে, আর আপনাকে লঙ্ঘন করে যেতে হয় রাজ্যের অমঙ্গল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আজ এত বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন কেন বলুন তো? রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ'-এ পড়েছিলাম অ্যাসিডিটি বেশি হলে এই রকম লক্ষণ দেখা দেয়। ওষুধও তিনি বাতলেছেন, বাই কার্বোনেট অফ সোডা। তাই বরং একটু খেয়ে দেখুন।

হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নলিনী বলিল—মহাকবির চরণে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁর প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ আমি খেতে পারব না। উচ্ছ্বাস আসে বৈকি সঞ্জীববাবু। সত্য যে সুন্দর, সুন্দরই আনে মোহ, আর মুগ্ধ অন্তরই হলো উচ্ছ্বাসের উৎপত্তিস্থল। মিথ্যা তো বলিনি আমি, অসীম পৃথিবীর জন্য বিরাট মঙ্গল আপনি আনতে পারেন না, সে শক্তি আপনার নেই। সমগ্র দেশও তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দু' দশটি মানুষের মঙ্গল সেও তো সংসারে দুর্লভ, সেই বা ক'জনে—

বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—শুনুন শুনুন, আমার সংবাদটা শুনুন আগে। একটি ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। কথায় কথায় তিনি বললেন, তাঁরা ক'জন বন্ধু মিলে একটা ডাক্তারখানা খুলেছেন। অনেকটা ডক্টরস্ ব্যুরো গোছের ব্যাপার। আসল উদ্দেশ্য হলো পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁরা লেডী ডাক্তারের সাহায্যও নেবেন। আমি আপনার নাম করলাম। কিন্তু আপনার মত না নিয়ে কথা দিতে পারলাম না।

নলিনী বলিল—কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাকে, আমি যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ভবিষ্যতের চিন্তার অর্ধেক ভার লাঘব করে দিলেন।

সঞ্জীব তেমনি লঘুভাবে বলিল—এখন একটা বাসা ঠিক করতে পারলেই ব্যস্, আমি খালাস। কি বলেন?

মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—হ্যাঁ। সে উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—ব্যাঙ্কে যাবেন, বলছিলেন না?

—হ্যাঁ যাব একবার। কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে আমার। পাশ বইখানা আছে, চেক বই নেই। চেক বই একখানা নিযে আসব আর টাকাও কিছু বার করতে হবে।

—বেশ, আপনি তৈরি হয়ে নিন তাহলে।

—আপনার পাওনার হিসেব একটা তৈরি করে দেবেন দয়া করে। কত টাকা হবে জানালে টাকাটা আনার সুবিধা হত।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস গাঙ্গুলী! এখন সে শোধ করবার দরকার নেই। সঞ্চয় যেটা আছে সে নষ্ট করবেন না। উপার্জন থেকে বরং ক্রমে ক্রমে শোধ করবেন।

মুখ ফিরাইয়া নলিনী বলিল—না। উপকারের ঋণ শোধ করবার অহঙ্কার আমার নেই সঞ্জীববাবু। আজীবন সে ঋণ আপনাদের কাছে আমার থাক। কিন্তু অর্থের ঋণ অতি হেয় জিনিস, সে আমি রাখতে চাই না।

এবার সঞ্জীব ঈষৎ ক্ষুব্ধ না হইয়া পারিল না। তবুও সে নীরব রহিল।

ঘরের বন্ধ দরজাটা ঠেলিয়া নলিনী বলিল—কে? রমা? কি করছিলে তুমি এখানে?

বিবর্ণ মুখে রমা কি বলিল বেশ বুঝা গেল না। কিন্তু সেদিকে মনযোগ দিবার মতো অবসর বা মনের অবস্থা নলিনীর ছিল না। সে কাপড় বদলাইতে ও ঘরে

চলিয়া গেল। কাপড়চোপড় পাল্টাইয়া বাহির হইবার মুখে রমাকে বলিল—আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। একি রমা, কাপড়ের নিচে সেমিজ পরনি, ছিঃ। সেমিজ পরে ফেল একটা আর এ ঘরে চাবি বন্ধ করে ও ঘরে বসে থাক। সাবধানে থাকবে, বুঝলে। অন্য কোন ঘরে যাবে না।

রমা বলিল—আমার জন্য একটা স্নো আনবে দিদিমণি।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—সময়ে সময়ে অদৃষ্টকে দেবতা বলে মানতে ইচ্ছা করে। যখন তিনি সুপ্রসন্ন দৃষ্টি দেন তখন কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না।

সামান্য কতক কতক আসবাবপত্র কিনিয়া বাসাখানিকে বাসোপযোগী করিয়া বাসায় আসিয়া ওঠা হইল।

সঞ্জীব বলিল—গৃহপ্রবেশের দিন আপনার আজ। বেশ ভাল করে রান্নাবান্না করুন। আমি হলাম ব্রাহ্মণ, ভোজন করে দক্ষিণা নিয়ে আশীর্বাদ করে বিদায় হব।

নতমুখে নলিনী বলিল—আমার হাতে ভাত খাবেন আপনি ?

তাহার মুখের উপর অকুণ্ঠিত পরিপূর্ণ দৃষ্টিখানি নিবদ্ধ করিয়া সঞ্জীব অভ্যাস মতো হাসিযাই উত্তর দিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর হাস্যস্পর্শে লঘু নয়, গভীর আন্তরিকতায় মর্মস্পর্শ করে সে স্বর। সে বলিল—আমরা কমরেড, মিস গাঙ্গুলী। আপনি আমার চেয়ে হীন নন, আমার চেয়ে অস্পৃশ্যা নন, পৃথিবীব সমতল বুকের উপর আমরা মানুষ।

উজ্জ্বল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সঞ্জীবের চোখে চোখ রাখিয়া নলিনী বলিল—অপরাধ যদি করি মার্জনা করবেন দয়া করে। আপনি কি বিপ্লববাদী ?

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—না, আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ মিস গাঙ্গুলী। বিরাট দেশের দৈন্য-দুর্দশা দেখবার মতো দৃষ্টি আমার নেই। আমি আমার পল্লীটুকুর মধ্যে কাজ করি। আর করি যারা চারদিক থেকে সমাজের সকল স্তরের চাপে পিষ্ট। পল্লীকে আমি নতুন রূপ দিতে চাই। তাতে যদি ভেঙে যায় পুরাতন, যাক ভেঙে। ভেদাভেদহীন মানুষের একটি বসতি শ্রীময়ী, শক্তিময়ী, শান্তিময়ী পল্লী আমি গড়ে তুলব।

নলিনী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। কথা শেষ হইবার পরও সে কথা কহিতে পারিল না।

সঞ্জীবই আবার বলিল—প্রয়োজন হলে সাহায্যের প্রার্থনা করব মিস গাঙ্গুলী। আমার বিশ্বাস আপনার সাহায্য পাব।

নলিনী গাঢ় স্বরেই বলিল—আমার জীবন কৃতার্থ হবে সেদিন, সঞ্জীববাবু।

হাত বাড়াইয়া সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—হাতে হাত দিন, আমরা কমরেড।

নিঃসঙ্কোচে হাত দিয়া নলিনী বলিল—কমরেডের জন্যে কি রান্না করব বলুন। কমরেড কি খেতে ভালবাসেন।

সঞ্জীব বলিল—ভাল রান্না হলে সবই আমার ভাল লাগে। তবে পাতের প্রথম দিকে যেগুলো থাকে সেইগুলোর ওপর আমার লোভ বেশি। কারণ শেষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পেট আসে ভরে। তখন সেগুলো আর ভাল লাগে না।

নলিনী হাসিয়া উঠিয়া গেল। পাশের ঘরটার দরজা ঠেলিয়া সে ডাকিল—রমা।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া রমা কি করিতেছিল, নলিনীর কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

নলিনী দেখিল, সে তাহার কেশ প্রসাধনের সামগ্রীগুলি লইয়া আধুনিক রুচি অনুযায়ী কেশবিন্যাসের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। নলিনীর কিন্তু আজ রাগ হইল না। তাহার মন ছিল তুষ্ট, সে স্নেহসিক্ত স্বরেই বলিল—ও বেলা ভাল করে চুল বেঁধে দেব তোমার। এখন এস তো ভাই, রান্নার বাটনাগুলো বেটে দেবে এস তো।

মাসখানেক পরে সেদিন অপরাহ্ণে সঞ্জীব বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। মা বলিলেন—আজ আবার ধোওয়া কাপড় ভাঙলি যে সঞ্জীব? যে কাপড় পরছিলি সে তো তেমন ময়লা হয়নি।

সঞ্জীব বলিল—নিচের দিকটা রাঙা ধুলোয় লাল হয়ে গেছে মা। তাছাড়া কাল সকালেই একবার কলকাতা যাব তাই—

কথা শেষ না হইতেই মা বলিয়া উঠিলেন—এখন কলকাতা কি জন্যে আবার?

ছেলে হাসিয়া বলিল—কোথাও যাব বললেই তোমার মাথা ধরে। না মা?

স্থির দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন—কাজটাই বা কি শুনি?

—আমাদের কো-অপারেটিভ স্টোরের জিনিসপত্র আনতে হবে মা।

মা বলিলেন—এতদিন তো এই সদর শহর থেকেই জিনিসপত্র আসছিল। এখন আর কলকাতা না হলে চলছে না।

ছেলে কহিল—তখন আমাদের পুঁজি ছিল কম, জিনিসপত্রও আসত কম। কলকাতা আসা-যাওয়ার খরচ পোষাত না। এখন আমাদের আয় বেড়েছে। কলকাতা গেলেই এখন সুবিধে হবে।

মা প্রশ্ন করিলেন—কবে ফিরবি?

—পাঁচ-সাত দিনের বেশি হবে না বোধহয়।

—উঠবি কোথায়?

—কেন বন্ধুব বাড়ি, কিম্বা কোন মেসে উঠব। ঠিক করিনি কিছু।

মা বলিলেন—অ।

তারপর ওঘরে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মা বলিয়া উঠিলেন—চুলগুলো আজকাল কি ফ্যাশনে কাটাচ্ছিস রে? একেবারে ঘাড়ের চামড়া বের করে—ছিঃ।

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আচ্ছা, সামনের দিকটা খানিকটা কেটে ফেলব কলকাতায়।

মা বলিলেন—চার আনা পয়সা দিয়ে? তুই আজকাল বড় বাবু হয়ে উঠেছিস সঞ্জীব।

হাসিয়াই সঞ্জীব বলিল—চার পয়সাতেও চুল কাটা হয় মা সেখানে।

গম্ভীরভাবে মা বলিলেন—চার পয়সা কিম্বা চার আনার জন্যই শুধু বলিনি আমি। সত্যিই তুই আজকাল বাবু হয়ে উঠেছিস। এ ভাল নয়।

আশ্চর্য হইয়া সঞ্জীব বলিল—বাবুগিরি তো কিছু করিনি মা। নিজেই নিজের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ পর পুনরায় বলিল—সত্যিই কি আমি বাবু হয়ে পড়েছি মা? কিন্তু তুমিই তো আমায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য তিরস্কার করতে।

ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর বিলাসিতায় পার্থক্য আছে বাবা। তারপর সস্নেহে আবার বলিলেন—ছেলেকে মা মানুষ করে তোলে কারিগরের হাতের পুতুলের মতো। সে পুতুল যদি মনের মতো না হয় সঞ্জীব, তবে আর আক্ষেপের সীমা থাকে না বাবা। মায়ের মনে হয় এর চেয়ে আমাব মৃত্যু হলো না কেন?

সঞ্জীব নীববেই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পব সে ডাকিল—মা!

মা আর সেখানে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন না। ঘরের মধ্যে তিনি আপনার কাজ করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতেই উত্তর দিলেন—কিছু বলছিস আমায়?

ঘরের দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব বলিল—আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি মা?

সস্নেহ হাস্যে মায়েব মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তুই আমার পাগল ছেলে রে! মা কি ছেলেকে উপদেশ দেয় না?

রাত্রে সঞ্জীব খাইতে বসিলে মা বলিলেন—মহেন্দ্রবাবু নালিশ করেছেন। বিকেলবেলা তুই বেড়াতে গেলে সমন জারি করে গেল।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—মামলা-মোকর্দমার কিছুই জানি নে আমি মা। তুমিই এই ঝঞ্ঝাট টেনে আনলে, এ পোযানো আমার পক্ষে ভারী কঠিন হবে।

মা উত্তর দিলেন কঠিন স্বরে—তা তো হবেই বাবা। এতে তো আর দেশোদ্ধাব হবে না।

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। মা বলিলেন—বেশ আমিই যাব আদালতে। তোমাব সংসারে এসে সুখ তো হলো আমার ষোল আনা। এইটুকু বা বাকি থাকে কেন? এও হবে।

সঞ্জীব বলিল—সে তো আমি বলিনি মা। আমি বলছি— আইন-কানুন সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না।

রুষ্টভাবে মা বলিলেন—তুই মানুষ না জানোয়ার? মোকর্দমাব কিছুই জানি না বলে হাঁ করে চেয়ে রইলি যে! সবই কি লোকে মায়ের পেট থেকে শিখে আসে? কলকাতা যাবি তুই পরে। কালই তুই সদরে যা। সেখানে উকিল আছে, আইনের পরামর্শ দেবার জন্যই। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করতে হবে, করে আয়।

সঞ্জীব বলিল—বাঃ রে! তুমি বলে না দিলে এই পথই বা আমি জানব কি করে?

অত্যন্ত কঠোরভাবে মা বলিয়া উঠিলেন—ন্যাকামি করিস না সঞ্জীব। সব আমি সইতে পারি, ন্যাকামি আমার সহ্য হয় না। বাবা, আসলে এ ব্যবস্থাটাই তোমার মনঃপূত হয়নি। নইলে আইন না জানার জন্যে কিছু যেত আসত না। আইন না

জানলেও শেখা যায়। কই বাবা, নলিনীর জামিন হবার সময় তো আইন না জানায় কিছু যায় আসেনি। মায়ের পরামর্শের দরকারও হয়নি। সেদিন তো আইনের ধারা নিজেই জেনে নিয়েছিলে।

নতমুখে সঞ্জীব বলিল—তাই হবে মা, কালই সদরে যাব।

মা বলিলেন—এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সঞ্জীব। নিজের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার যদি না করতে পার, তবে পরের অধিকার রক্ষা করতে যাবে কোন্ সাহসে? আর আইন-আদালত তো ছোট জিনিস নয় বাবা। যে কোন রাজ্যে বাস করতে গেলে সে রাজ্যের আইন যে না জানে তাকে বলি আমি মূর্খ।

সঞ্জীব বলিল—তাহলে উকিলকে কি ভাবে কি বলতে হবে সে সব বলে দাও আমায়, আমি নোট করে নেব।

মা বলিলেন—রচনা করে শিখিয়ে দেবার তো কিছু নেই এতে। সত্য যা, উকিলকে তাই বলবে। সে সবই তো জান তুমি। তবে মনোবিবাদ হেতুই যে মহেন্দ্রবাবু এ মোকর্দমা করেছেন, সত্য হলেও এটুকু আমাদের না বলাই ভাল। তাতে তাঁর দুর্নাম রটবে, আর নলিনী-রমারও কলঙ্ক রটবে।

সঞ্জীব বলিল—সত্য যা ঘটেছে সেইগুলোই আমি লিখে নিতে চাচ্ছিলাম মা। যদি ভুলেই যাই কোনটা। লিখে নেওয়াটা ভাল।

—আচ্ছা সেইগুলোই আমি লিখে দিচ্ছি। তুই তা হলে কাল এখানে ফিরে পরশু কলকাতায় যাবি।

—না মা। তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমি বরং ওই পথেই কলকাতায় চলে যাব। তোমায় চিঠিতে খবর দিয়ে যাব বরং।

হারাণ বাগদী এই সময় বাড়িতে প্রবেশ করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া একটা হাঁড়ি নামাইয়া দিল। বলিল—খেজুরের গুড় আছে মা খানিকটে। দাদাবাবু বলেছিলেন কলকাতায় নিয়ে যাবেন।

সঞ্জীব বলিল—নলিনীকে দিয়ে আসব মা।

মা প্রশ্ন করিলেন—নলিনীর ঠিকানাটা কি রে? ওখানে চিঠি দিলেই তুই পাবি বোধ হয়?

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ মা, সেই ভাল হবে। দরকার হলে ওখানেই চিঠি দিয়ো তুমি। যেখানেই থাকি রোজ একবার খবর নেব নলিনীর বাসায়।

মহকুমায় উকিলের সাহায্যে মোকর্দমার কাজকর্ম শেষ করিয়া সঞ্জীব কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল রাত্রে। উঠিয়াছিল সে ভবানীপুরে একটা মেসে। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া অভ্যাসমতো সে বেড়াইতে বাহির হইল। শীত সবে পড়িতেছে। বিলাসিনীর সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বসনের মতো ক্ষীণ কুয়াশায় শহরের সর্বাঙ্গ আবৃত। অভ্যাস ও নিয়মমতো দ্রুতপদে সঞ্জীব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের পাশ দিয়া পূর্বমুখে বড় গির্জাটার নিকট চৌরঙ্গিতে আসিয়া উঠিল। ট্রাম, বাস তখন চলিতে শুরু করিয়াছে। একখানা ট্রাম

চলিতেছিল ধর্মতলার দিকে। রাস্তার জংশনের উপর ট্রামস্টপে ট্রামখানা বোধ হয় সঞ্জীবকে দেখিয়াই থামিয়া গেল। অকস্মাৎ সঞ্জীব বিনা কারণে ট্রামখানায় উঠিয়া পড়িল। কন্ডাক্টর আসিয়া টিকিটের জন্য দাঁড়াইতেই সঞ্জীবের সে কথাটা খেয়াল হইল। তাইতো, কোথায় যাইবে সে? পরক্ষণেই একটি সিকি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—শ্যামবাজার।

শ্যামবাজারে নলিনীর বাসায় আসিয়া ঘরের বাহির হইতেই সে বলিয়া উঠিল—সুপ্রভাত মিস গাঙ্গুলী।

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল রমা। আড়ম্বরহীনা, একান্ত সঙ্কুচিতা সরলা পল্লীর সে মেয়েটি তো এ নয়। সযত্ন মার্জনায়, সুচারু প্রসাধনে শান্ত সৌন্দর্য তাহার উগ্র, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে. দেহের বর্ণলাবণ্যে রক্তাভা যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। তৈলহীন চুলগুলি রেশমের মতো কোমল ও চিক্কণ। সূক্ষ্ম সরলরেখার মতো সিঁথি টানিয়া হালফ্যাশনে সযত্ন-বিন্যাসে বিন্যস্ত। হাতে দু'গাছা চুড়ি।

রমা আনন্দে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—দাদাবাবু! কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুপরিস্ফুট লজ্জার পরিচয়।

সঞ্জীবের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। এই সেই রমা!

মুখ নত করিয়া রমা আবার বলিল—বসুন দাদাবাবু। দিদিমণি স্নান করছেন। আসবেন এক্ষুণি।

এতক্ষণে সঞ্জীব বলিল—তোমায় আমি চিনতেই পারিনি রমা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলে আর চিনবার উপায় নেই তোমাকে।

রমা মুখ নত করিয়াই রহিল। কিন্তু তাহার অনাবৃত মুখের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল সেইটুকুরই রক্তাভ বর্ণ হইয়া উঠিল সুরক্তিম।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃষ্টমনে সঞ্জীব বলিল—এদিকে তো দেখতে শুনতে শহুরে হয়েছ। কিন্তু কাজে কর্মে কতদূর এগুলে পরীক্ষা দাও দেখি। চায়ের জল চড়িয়ে দাও। চা তৈরি করতে শিখেছ?

হাসিমুখে রমা বলিল—চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে এসেছি। চা তো এখন আমিই তৈরি করি।

—আর কি কি শিখলে বল। নার্সের কাজ শিখছ তো?

ঘাড় নাড়িয়া রমা বলিল—হ্যাঁ। থারমোমিটার দিতে পারি, দেখতে পারি। ফুটবাথ দিতে শিখেছি। মাথায় জলপটি দিতে পারি। এখন ফার্স্ট এড শিখছি, দাদাবাবু।

উৎসাহ প্রকাশ করিয়া সঞ্জীব বলিল—বাঃ বাঃ। এ যে অনেক শিখে ফেলেছ দেখছি! তারপরে লিখতে পড়তে শেখাও যে দরকার। সেটা আরম্ভ করেছ?

রমা বলিল—দিদিমণির কাছে পড়ছি—প্রথম ভাগ আরম্ভ করেছি। কালো জল, লাল ফুল পড়ছি এখন। ঐ যা—চায়ের জল পড়ে যাচ্ছে বোধ হয়।

রান্নাঘরের দিক হইতে একটা সোঁ সোঁ শব্দ উঠিতেছিল।

রমা লঘুপদে বাহির হইয়া গেল। সে গতির মধ্যে তরঙ্গায়িত একটি ভঙ্গি আছে।

সঞ্জীবের সেটুকু বড় ভাল লাগিল। পরম স্নেহভরে রমার গমনপথের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

—নমস্কার! সদ্যস্নাতা নলিনী ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল।

সঞ্জীব আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—শুধু নমস্কার নয়, সুপ্রভাত কমরেড।

অপরাজিতার ফুলটি যেন মৃদু বাতাসে দুলিয়া উঠিল। লাজনম্র মৃদু হিল্লোলে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া শ্যামলা মেয়েটি হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—কমরেড। তারপরে পাশের চেয়ারে বসিয়া সে বলিল—ভারী মন কেমন করে কিন্তু সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমাদের বুঝি করে না মনে করেন? সত্যি মিস গাঙ্গুলী, এখান থেকে বাড়ি গিয়ে বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকত। আপনি যখন ছিলেন তখন বাড়ির একটা নতুন শ্রী হয়েছিল। অভাবের মধ্যে প্রতিনিয়তই সেটা এখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

নলিনী পিছন ফিরিযা কি যেন একটা দেখিয়া লইল। তারপর বলিল—মা ভাল আছেন সঞ্জীববাবু? তিনি আমার নাম করেন?

সঞ্জীব বলিল—অসংখ্যবার। বলেন মেয়ে কি বউ নইলে সংসার মানায় না। নলিনী থেকে সেটা আমি বেশ বুঝেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিপদ। বলেন, বিয়ে কর তুই। কি, ওটা কি কুড়োচ্ছেন আপনি?

নত হইয়া নলিনী কি একটা কুড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল। সে বলিল—একটা পায়রার পালক। ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সে বলিল—বিয়েতে নেমন্তন্ন করবেন তো আমাদেব?

সঞ্জীব হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অকস্মাৎ গম্ভীর হইযা সে বলিল—তপস্বী শিব আমাদের দেবতা, নলিনী দেবী। আমাদের দেবতার কোপানলে মদন হয়েছিল ছাই। প্রেমে আমাদের অধিকার নেই নলিনী দেবী। নিমন্ত্রণের আশা আপনার একান্ত দুরাশা বলেই মনে হয়।

নলিনী সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে ধীরভাবে বলিল—মদন ছাই হয়েছিল—কিন্তু অতনু অবিনাশী সঞ্জীববাবু। গৌরীর তপস্যা শিবের বরদান ইত্যাদি যত কৈফিয়তের দোহাই দিন আপনারা, অতনুর জয়-গৌরব তাতে ঢাকা পড়ে না। যাক ও কথা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নারী জাতিকে এত তুচ্ছ মনে করেন কেন?

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—অবিচার করছেন আমার ওপর। নারী জাতিকে তুচ্ছ আমি মনে করি নে। না হলে আপনাকে কমরেড বলতাম না কখনও। নারী জাতিকে সহকর্মিণী বলে গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করি না, মিস গাঙ্গুলী। কিন্তু সহধর্মিণীরূপে কল্পনা করতে পারি না, তাতে আমার ভয় হয়। ভুজলতার বন্ধন শৃঙ্খলের চেয়ে কঠিন এবং দৃঢ়।

নলিনী একথার কোন উত্তর দিল না। নীরবে সে পালকটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

রমা ঘরে চা লইয়া প্রবেশ করিল। পরিপাটি শৃঙ্খলার সহিত কাপ দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল—ময়দা মেখে রেখেছি, লুচি ক'খানা ভেজে নিয়ে আসি। চলে যাবেন না দাদাবাবু।

চা পান করিতে করিতে নলিনী বলিল—ক'দিন ধরে আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি। আপনার পরামর্শ না নিয়ে কিছু স্থির করতে পারিনি সঞ্জীববাবু। রমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন আপনি ?

সঞ্জীব কোন উত্তর দিল না, জিজ্ঞাসুব দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিয়া সে নলিনীর মুখের দিকে চাহিল।

নলিনী বলিল—বাইরের মতো বোধ করি ওর মনেও একটা পরিবর্তন এসেছে। এখন ওর দায়িত্ব নিতে আমার ভয় হচ্ছে সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—না, না, মিস গাঙ্গুলী। একান্ত সরল ও।

নলিনী বলিল—সরলের চেয়েও বেশি, রমা বুদ্ধিহীনা। সেখানেই বিপদের ভয় বেশি। আপনাদের চেয়ে ওদিকে আমাদের দৃষ্টি অনেক প্রখর। এতদিন ও ছিল শিশু। এখন কিন্তু ওর ভেতরে ক্রমে ক্রমে মনের বয়স বাড়ছে। হয় তো দেহের বয়সের সঙ্গে মনও ওর এতদিনে সমবয়সী হয়েই উঠল।

সঞ্জীব চিন্তান্বিতভাবে বলিল—প্রতিকারের কি করা যায় বলুন তো ?

নলিনী বলিল—প্রতিকারের প্রকৃষ্ট পন্থা ছেড়ে দিযেই আজ এ অবস্থা। বিধবা বিবাহ কি আপনি সমর্থন করেন সঞ্জীববাবু ? সেই হবে এখন প্রকৃষ্ট উপায়।

সঞ্জীব আনন্দে বলিয়া উঠিল—সেই সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে ভাল মিস গাঙ্গুলী। এর চেয়ে ভাল সত্যি কিছু হতে পারে না। আহা হা, এমন সুন্দর ফুলের মতো মেয়েটি মা হয়ে সংসারে ধন্য হোক। ওর রূপের প্রতিবিম্ব পেয়ে পৃথিবীও সুন্দর হবে।

নলিনী কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর সে অকস্মাৎ উঠিয়া চায়ের পেয়ালা দুটি লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—পেয়ালা দুটো ধুয়ে ফেলা দরকার।

সঞ্জীব বলিল—আমিও তাহলে উঠি।

নলিনী তখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সঞ্জীব একটু আহত হইল। সে অনুভব করিল, নলিনীর অন্তরের মধ্যে কোথায় আছে যেন চোখে না ঠেকার মতো অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণধার একটি কাঁটা। ব্যবহারের মধ্যে সুতীক্ষ্ণভাবে পর পর যেন সেটা বিঁধিতে থাকে। ফিরিবার পথে বার বার সে এই কথাটাই চিন্তা করিল। সে স্থির করিল অপ্রয়োজনে সে আর নলিনীর ওখানে যাইবে না।

সেদিন সকালেই নলিনী একটা কলে বাহির হইয়াছিল। ফিরিতে হইয়া গেল বারোটারও বেশি। রমাও সঙ্গে গিয়াছিল, সে পিছনে পিছনে ওষুধ ও যন্ত্রপাতির

বাক্সটা হাতে করিয়া আসিতেছিল। ঘরের দরজাটা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই নলিনীর নজরে পড়িল একখানা খামের চিঠি।

কাহাকেও না পাইলে পিয়ন দরজার ফাঁক দিয়া এমনিভাবে চিঠিপত্র ভিতরে ফেলিয়া দিয়া যায়। চিঠিখানি সে কুড়াইয়া লইল। দেখিল তাহাকেই কে লিখিয়াছে। হস্তাক্ষর পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। চিঠিখানি ছিঁড়িয়া প্রথমেই সে দেখিল লেখকের নাম। সেখানে লেখা ছিল—আশীর্বাদিকা, শুভার্থিনী 'সঞ্জীবের মা'। চিঠিখানা সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িয়া গেল।

"কল্যাণীয়াসু,

মা নলিনী, আমার অসংখ্য আশীর্বাদ জানিবে। আশা করি তুমি ও রমা কুশলেই আছ। তোমাকে আজ একটি বিশেষ গুরুতর বিষয় জানাইতেই এই পত্র লিখিতেছি। তুমি বুদ্ধিমতী, আশা করি ভুল বুঝিবে না। তোমরা আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মেয়ে। কিন্তু মা, সংসারের অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে আমাদের অনেক বেশি। মা, একটা বয়স আছে, যে বযসে সম্বন্ধহীন স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা আমরা ভাল মনে করি না। এমন ক্ষেত্রে বিপদও অধিকাংশ স্থলেই হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবেচনা করিযা আমি মনে কবি সঞ্জীব ও তোমার মধ্যে বন্ধুত্বের জের আর না চলাই ভাল। তাহাতে তোমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমার ছেলেকে আমি জানি। সে কখনও তাহার সচেতন বুদ্ধিতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না। কিন্তু মা, কোন তুচ্ছতম বস্তুই তো মানুষ জ্ঞাতসারে হারায না। হারাইলে তাহাকে হাবানো বলে না, বলে বিসর্জন দেওযা। তাহা সে কখনও করিবে না। কিন্তু যদি অজ্ঞাতসারেই সে কোনদিন নিজেকে হারাইয়া ফেলে, তবে তাকে দোষ দিব কি করিয়া?

সঞ্জীবকে এ বিষযে সচেতন করিতে যাওযা আমাব পক্ষে লজ্জার কথা। আর আকর্ষণ যদি ইতিমধ্যে প্রবলই হইযা থা ক তবে মায়ের অবাধ্য হওযা বা মিথ্যার আশ্রয লওযা যুবক পুত্রেব পক্ষে বিচিত্র নয।

একদিন সে তোমার উপকার করিযাছে। আজ তাহার প্রতিদান আমি দাবি করি। তুমি তাহার পথ হইতে সরিযা যাও। তুমি নিজেও তোমাদের সমাজের মধ্যে বিবাহ করিয়া সুখী হও এই আমার উপদেশ। আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও। ইতি।"

নলিনীর পায়ের তলায় বসুন্ধরা যেন দুলিতেছিল। বিবর্ণমুখে শূন্য দৃষ্টিতে সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া। চোখের সম্মুখে সব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু একটি মুখ—অবশ্য অগণ্য অসংখ্য হইয়া সারি সারি সে ভাসিযা চলিয়াছে। নিস্পন্দ দেহের মধ্যে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল শুধু দুটি ঠোঁট, দুটি বাযুতাড়িত বটপত্রের মতো।

রমা লজ্জিত স্বরে ডাকিল—দিদিমণি!

সেই বিহ্বলতার মধ্যেই নলিনী উত্তর দিল—এ্যাঁ।

—কি হয়েছে দিদিমণি?

নলিনী উত্তর দিল না।

রমা আবার ডাকিল—দিদিমণি!

এবার নলিনী সচকিত হইয়া উঠিল। কহিল—রমা? কিছু বলছ?

—কি হয়েছে দিদিমণি?

তখন নলিনীর ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছিল। কোনরূপে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল—কিছু হয়নি রমা। তুমি রান্নাটা চড়িয়ে ফেল গিয়ে। আমার একটু কাজ আছে, সেরে ফেলি।

রমা চলিয়া গেলে টেবিলের উপরে মাথা রাখিয়া সে যেন ভাঙিয়া পড়িল। তারপর সে যখন মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল, তখন সম্মুখের দেওয়ালের আয়নায় দেখিল তাহার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র এক হাসি। পত্রখানার অতর্কিত আঘাতে নিজের ক্ষণিক বিমূঢ়তার জন্য বার বার তাহার প্রতিবিম্বখানি ব্যঙ্গ হাস্যের তীক্ষ্ণ সায়কে তাহাকে যেন জর্জর করিয়া তুলিতেছিল।

ধূমকেতুর বিরহে পৃথিবীর শোক! এই সম্পূর্ণ সজাগ মুহূর্তে সঞ্জীবের সহিত জীবন সূত্রে গ্রন্থি দেওয়াব কল্পনা যে কতবড় হাস্যকর তাহা ক্ষণপূর্বেব অশ্রুসজল চোখের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আরও হাসি পাইল তাহার সেই পল্লীবাসিনী প্রৌঢ়ার আশঙ্কার কথা ভাবিয়া। কত মূল্য দেন তিনি তাঁহার এই স্বপ্নবিলাসী ভাবপ্রবণ অক্ষম সন্তানটির পরে।

যাক, উপকারের প্রত্যুপকার তাহাকে করিতে হইবে। স্বপ্নবিলাসের মধ্যে একখানা কাঁচকে সে রত্নের যত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়াছিল। সেই অঞ্চলপ্রান্তটুকু কাটিয়া দিতে হইবে।

দোয়াত কাগজ কলম টানিয়া লইয়া সে পত্র লিখিতে বসিল।

আটটার সময় নলিনীর ডিসপেন্সারী যাইবার সময়। কিন্তু উত্তেজনাবশত গত রাত্রে নলিনীর ভাল ঘুম হয় নাই। প্রাতঃকালেই নিয়মমতো স্নান সারিয়াও দেখিল শরীর তখনও যেন তেমন সুস্থ নয়। সে স্থির করিল ডিসপেন্সারীতে আজ আর সে যাইবে না।

চিঠিখানি গতকালই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালে সঞ্জীব পাইবে। তাহার মনে আবাব ঐ চিন্তা আসিয়া পড়িল।

সঞ্জীবেরও কি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল তাহার উপর? না, তাহার অতি সাবধানী মায়ের কল্পনা এ? আবার তাহার ঠোঁটে দেখা দিল সেই হাসি। উঃ, কত বড় মূর্খের মতো অন্ধ আবেগে ছুটিয়াছিল সে?

—নমস্কার মিস গাঙ্গুলী!

নলিনী চমকিয়া উঠিল। দরজা ঠেলিয়া সঞ্জীব ভিতরে প্রবেশ করিল। মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া নলিনী বলিল—আপনি?

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ। অবাঞ্ছিত অতিথিই বটে। আপনার পত্র আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি মর্যাদাহানি সহ্য করতে পারি নে। সেইজন্য তার কৈফিয়ত নিতে এসেছি।

নলিনীও মাথা তুলিল দৃপ্ত ভঙ্গিতে। তারপর ধীরে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল—বলুন।

সঞ্জীব বলিল—শুধুমাত্র যদি আপনি আমায় এখানে আসতে নিষেধ করে চিঠি লিখতেন তা হলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু কারণের উল্লেখ করে আপনি আমার মর্যাদায় আঘাত করেছেন। আপনার সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই আমি সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম কমরেড-এর। কর্মের পাকে আর বিপাকেই বলুন আপনার সঙ্গে আমার দেখা।

নলিনী বাধা দিয়া বলিল—সে ঋণ, সে কৃতজ্ঞতা আমি অস্বীকার করি নে সঞ্জীববাবু। কিন্তু নারী-পুরুষের কমরেডশিপে আমার আস্থা নেই।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—এইখানে আপনি আমায সবচেয়ে বড় অপমান করেছেন। আমার অন্তরের আন্তরিকতায় দোষারোপ করেছেন।

নলিনী বলিল—যদি করেই থাকি সঞ্জীববাবু তবু সে মিথ্যা করিনি। আপনার মনের দিকে ভাল করে চেযে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। নইলে আমি চলে এলে আপনার বাড়ি অকস্মাৎ শ্রীহীন হয়ে উঠল কেন শুনি ?

সঞ্জীব দৃঢভাবে বলিল—আমার দুর্ভাগ্য যে আপনি স্ত্রীলোক। আপনি পুরুষ হলেও আপনার বিদাযেব পর আমার বাড়ি ঠিক এমনি শ্রীহীনই ঠেকত নলিনী দেবী।

নলিনী সহসা এতবড অপমানজনক কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতাব পর সে ধীরে ধীরে বলিল— তাহলে তো আর আপনার মর্যাদাহানির কথাই উঠতে পারে না সঞ্জীববাবু। আমার নিক্ষিপ্ত বিষবাণ আমার বুকেই ফিরে এসে বিঁধল।

সঞ্জীব কথার উত্তর দিল না। মনে তাহার রুক্ষতাব জন্য অনুতাপ দেখা দিয়াছিল।

নলিনী বলিল—আর পত্রেও তো আপনি আমার প্রতি আকৃষ্ট এমন কথা লিখিনি আমি। আমি লিখেছি---

আর সে বলিতে পারিল না। অবরুদ্ধ অশ্রুর পীডনে রক্তিম মুখে সে অন্য দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিল।

অনুতাপে লজ্জায় সঞ্জীব আপনাকে এবার অপরাধী না ভাবিয়া পারিল না।

সে তাডাতাডি উঠিয়া নলিনীর হাতদুটি ধরিয়া বলিল---আমায় মাপ করুন নলিনী দেবী।

ধীর আকর্ষণে হাত দুইটি ছাডাইয়া লইতে লইতে নলিনী বলিল—ছাড়ুন। তারপরে মুখ ফিবাইয়া মৃদু হাসিয়া সে কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু সে বলা তাহার হইল না। তাহার পবিবর্তে রোষে ক্ষোভে রক্তিম হইয়া সে বলিয়া উঠিল—রমা !

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সঞ্জীব দেখিল ও ঘরেব অর্ধোন্মুক্ত জানালার অন্তরালে জাগিয়া রহিয়াছে রমার মুখ। সমস্ত মুখে তাহার কে যেন সিঁদুর মাখাইয়া দিয়াছে। বিচিত্র একাগ্র দৃষ্টিতে সে এই দিকেই চাহিয়াছিল।

নলিনী আবার ডাকিল—রমা।

রমা যেন সম্বিত পাইয়া সরিয়া গেল।

নলিনী দ্রুতপদে ও-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সঞ্জীব শুনিল নলিনী বলিতেছে—এতবড় নির্লজ্জ তুমি রমা ! ছি, তোমায় আমি ভাল মনে করতাম।

নলিনী এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সঞ্জীবকে বলিল—ওকে কি আপনি আজই নিয়ে যাবেন?

সঞ্জীব বলিল—সে কথার আলোচনাও করবার আছে মিস গাঙ্গুলী। ওর ভার আপনি নিন। দেখে শুনে বিয়ে দিন।

নলিনী হাত জোড় করিয়া বলিল—মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। রমার দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তাছাড়া ও এখানে থাকা মানেই আপনার আমার মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখা। সে সূত্র ছিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

সঞ্জীব বলিল—তাহলে নমস্কার মিস গাঙ্গুলী। কাল এসে ওকে আমি নিয়ে যাব।

পরদিন গাড়িতে জিনিসপত্র তুলিয়া রমা ও সঞ্জীব গাড়িতে চড়িয়া বসিল। দুয়ারের সম্মুখেই নলিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সঞ্জীব হাস্যমুখেই বলিল—নিজেদের সমাজে বিবাহ করবেন লিখেছেন। কায়মনোবাক্যে কামনা করি আপনি সুখী হন। কিন্তু কমরেডকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলবেন না। আমরা ইতরজন, শুধু মিষ্টান্নের প্রত্যাশী।

নলিনী দুটি হাত জোড করিয়া বলিল—কমরেড আর নন সঞ্জীববাবু। ও সম্পর্কের আজ থেকে অবসান হোক।

সঞ্জীব বলিল—এর চেয়ে বড কোন সম্পর্ক আপনার সঙ্গে যে ধারণা করতে পারি নে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী তখন আর সেখানে ছিল না।

সঞ্জীবদের গ্রামের স্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল বেলা পাঁচটায়। রমাকে সঙ্গে লইয়া সঞ্জীব বাড়ি আসিয়া ডাকিল—মা।

সম্মুখেই ঘবেব মধ্যে চোখে চশমা দিযা মা সেলাই কবিতেছিলেন। ছেলের ডাকে তিনি মুখ তুলিলেন। মুখ তুলিয়া কিন্তু আর উত্তর দেওযা তাঁহার হইল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিযা তিনি দেখিতেছিলেন রমাকে। কিছুক্ষণ পব তিনি বলিলেন—রমা নয?

মাযের বিস্মযের হেতু সঞ্জীব বুঝিযাছিল। সে হাসিযা বলিল –হ্যা। সে রমা আর নেই মা।

গম্ভীরভাবে মা উত্তর দিলেন-—তাই দেখছি। কিন্তু ওকে নিযে এলি যে? টেনে জঞ্জাল ঘাডে করা কি তোর স্বভাবে দাঁডিযে গেল সঞ্জীব?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে সঞ্জীব বলিল—নলিনী আর ওকে রাখতে চাইলেন না, মা।

—কেন?

একটু ইতস্তত করিয়া সঞ্জীব বলিল—সে অনেক কথা মা। মোট কথা তিনি আর আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। রমাও তো আমাদের লোক।

সঞ্জীব আবার বলিল—-যতখানি বস্তু নলিনীর মধ্যে প্রত্যাশা করেছিলাম মা, তা তাঁর মধ্যে নেই। নিতান্ত সাধারণ মেযে নলিনী।

মা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মানুষের চরিত্র কাঁচের মতো জিনিস

নয়, তাকে এক নজরে চেনা যায় না বাবা। কাজ দেখেও বিচার করা সম্ভব নয়। কাজের আড়ালে থাকে কারণ। সেই কারণ না জেনে বিচার করতে গেলে ঠকতে হয় বাবা।

সঞ্জীব একথার কোন উত্তর দিল না। সে রমাকে বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন রমা ? বস তুমি।

মৃদুস্বরে রমা কহিল—হাত-পা ধুয়ে আসি আমি।

সে চলিয়া গেলে সঞ্জীব বলিল—ওর বিয়ে দেবার কথা ভাবছিলাম মা। নলিনীও আমায় সেই কথাই বলছিলেন।

মা বলিলেন—হুঁ। কিন্তু এ কথাটায় কি তুই আমার সম্মতি পেতে আশা করিস সঞ্জীব ?

—উচিৎ যা, তাই তোমার কাছে প্রত্যাশা করি মা।

দৃঢ়কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন—বিধবার বিয়ে আমার কাছে অধর্ম। উচিৎ-অনুচিতের অনেক উপরে।

—তা হলে ওর কি ব্যবস্থা করব মা ?

—যা তোমাদের খুশি। আমার মতের সঙ্গে এখানে তোমাদের মতের মিল হবে না। ওকে এখানে আনাই তোমার ভুল হয়েছে।

একটু চিন্তা করিয়া সঞ্জীব বলিল—সত্যিই কাজটা অবিবেচনার হয়ে গেছে মা। এখন উপায় এক তোমার আশ্রয়।

মা বলিয়া উঠিলেন—না সঞ্জীব, ওকে বাডিতে আমি রাখতে পারব না। ওকে তুমি ওর বাপের ওখানে রেখে এস।

—সে যে ওর সর্বনাশ করা হবে মা।

অকস্মাৎ রুক্ষ হইয়া মা বলিলেন—দেশের লোকের সর্বনাশ দেখবার আমার কিছু কথা নেই সঞ্জীব ; ও আগুনের খর্পর আমি বাড়িতে রাখতে পারব না।

সঞ্জীব এমন কথা তাহার মায়ের নিকট হইতে প্রত্যাশা করে নাই। মায়ের জন্য অন্তরে অন্তরে তাহার একটা অহঙ্কার ছিল। হোন তিনি কটুভাষিণী কিন্তু সঞ্জীবের ভাল কাজে কখনও তিনি বিদ্রোহ করেন নাই। এমন কি আপন ধর্মাচরণের প্রবল নিষ্ঠা, সুকোঠার শুচিতা বিপন্ন হইলেও না। আজ তাঁহার কথায় সঞ্জীব একটু আঘাত পাইল। সে মায়ের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের গন্ধ পাইল। সে উত্তপ্ত স্বরেই বলিল—একটা দিন অপেক্ষা কর মা। কালই ওকে নিয়ে আমি কলকাতায় যাব। কোথাও না কোথাও ওর স্থান হবেই।

মা বলিলেন—বেশ তাই যেয়ো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার স্বর এত উগ্র হলো কেন ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব বলিল—তোমার ওপর অভিমান করবারও কি অধিকার নাই আমার, মা ?

মা উত্তর দিলেন, কিন্তু পূর্বের কণ্ঠস্বরে নয়। বিচিত্র এ কণ্ঠস্বর। বর্ষার পরিপূর্ণ

নদীর মতো মমতায় উজ্জ্বল বেগবতী, মুমূর্ষের অকপটোক্তির মতো সকাতর মর্মস্পর্শী সে স্বর। তিনি বলিলেন—সঞ্জীব, সংসারে সকল মায়ের সবচেয়ে বড কাম্য কি জানি নে বাবা। কিন্তু তোর মায়ের কাম্য শুধু তোর চরিত্র, তোর সুনাম। সেই বস্তুতে যদি কেউ মিথ্যের কালিও মাখিয়ে দেয়, তা হলে যে মৃত্যু ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না বাবা।

দিনের উপর মৃত্যুর স্পর্শের মতো রাত্রির ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। ম্লান সন্ধ্যালোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ না দেখিলেও সঞ্জীব স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার তেজস্বিনী মায়ের চোখে জল দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই বাড়িব বাহিব হইতে কে ডাকিল—বাবাজী, রয়েছ নাকি বাড়িতে ? ওগো বাবাজী সঞ্জীব।

একটা হ্যারিকেন হাতে লইয়া সঞ্জীব বাহিরে আসিল। দেখিল বাহিরের দাওয়ার ওপর আলো হাতে দাঁডাইয়া কডি গাঙ্গুলী। মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মৌখিক ভদ্রতা প্রকাশ করিল সঞ্জীব।

এককডি গাঙ্গুলী বলিল—এলে কখন বাবা কলকাতা থেকে ? শবীর ভাল আছে ?

শুষ্কভাবেই সঞ্জীব বলিল—আজ বিকেলেই এসেছি। শরীরও বেশ ভালই আছে।

—বেশ, বেশ। তোমাদেব ভাল হলেই আমাদেব ভাল। তাবপব, তোমাব সঙ্গে যে কথা ছিল বাবাজী। দাঁডিয়ে দাঁডিযে, একটা কিছু আন না বাবাজী, পেতে বসা যাক।

বাহিবের ঘব হইতে একখানা কম্বল আনিযা সঞ্জীব অগত্যা বিছাইযা দিল। গাঙ্গুলী তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া বলিল—বস বাবাজী বস। উঃ শীতও আচ্ছা পডেছে এবার। বুড়ো হাড আমাদের কনকন কবছে। তাব ওপর বাতব্যাধি, ক'দিনই বা বাঁচব আর—হরিবোল হরিবোল।

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। এ-কথার উত্তবে বলিবাব মতো কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না।

গাঙ্গুলী বলিল—তাবপর বাবাজী, রমা আমাদের বেশ ভাল আছে তো ? আহা বাবা, তোমার কৃপাতেই হতভাগিনীর একটা গতি হলো।

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ, ভালই আছে রমা। তাহার মনের মধ্যে আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমন নির্লজ্জ পাষণ্ড যে মানুষ হইতে পারে এ ধারণা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। কড়ি গাঙ্গুলী তাহার অপরিচিত নয়, পাষণ্ড বলিয়াই তাহাকে সে জানিত। কিন্তু তবু তাহাব ধারণা ছিল কডি গাঙ্গুলী আর তাহার চোখে চোখ জুডিতে পারিবে না।

গাঙ্গুলী বলিতেছিল—তাই তো বলি বাবা, আমাদেব সব ছেলেগুলোকে, শিখবি যদি তবে আমাদের সঞ্জীবকে দেখে শেখ। বিদ্যের গুণ দেখ। বর্ষার জলভরা মেঘ যেন, যে দিকে যাবে ছায়ায় জলে সব শীতল করে দিয়ে যাবে।

সঞ্জীবের মনের মধ্যে বিরক্তি ঘৃণা ফুলিয়া উঠিতেছিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ

করিয়াও বাঁকা ভাবেই সে বলিয়া ফেলিল—আপনার স্নেহের কথা আমি ভাল করেই তো জানি গাঙ্গুলীকাকা!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাঁটুতে হাত দিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—গুরুর দিব্যি, ইস্ট দেবতার দিব্যি! মিথ্যে বলি তো মাথায় বজ্রাঘাত হবে বাবা, এই কাজ আমার নয়। ওই পাষণ্ড আমাকে ঘরে ভরে বন্দুক দেখিয়ে দলিলখানা কেড়ে নিলে আমার কাছ থেকে।

সঞ্জীবের বিরক্তির মাত্রা ক্রমশ বাড়িতেছিল।

গাঙ্গুলী আবার বলিল, যে জবাব তুমি দিয়েছ বাবাজী, বুঝেছ কিনা, ওতেই কিস্তি মাৎ। ওর চৈলা—

—বামুনকাকা!

গাঙ্গুলীব কথা অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া দবজার আলোকিত মধ্যস্থলে রমাকে দেখিযা হতবাক হইয়া চাহিয়া বহিল। কিছুক্ষণ পব সাবিস্ময়ে সে যেন প্রশ্নই কবিল—বমা? বমা তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইযা প্রণাম করিল। লণ্ঠনেব আলোটা তুলিযা ধবিযা তাহাকে ভাল কবিযা দেখিযা গাঙ্গুলী কহিল—আহা-হা-মা, চোখ জুড়োল তোকে দেখে। এমন হয়েছিস তুই, এ্যা! একেই বলে সৎসঙ্গে কাশীবাস।

বমা সলজ্জভাবে বলিল—আমাদেব বাড়িব সব ভাল আছে কাকা?

—আব ভাল মা! তোব জন্যে কেঁদে কেঁদে তোর মা নদী গঙ্গা ভাসিয়ে দিলে। চাবিদিকে খোঁজখবর কবে কোন পাত্তা পাই না। কেউ বলে মবেছে! কেউ কিছু—কেউ কিছু। একটা খববও তো দিতে হয বাপু। তাবপব খবব পেলাম, সঞ্জীব দযা কবে তোকে কলকাতায রেখে ডাক্তারী না কি শেখাচ্ছে।

বমা প্রশ্ন কবিল—খোকা ভাল আছে?

—হ্যা। দিন-রাত তোব নাম কবে' বলব আমি তোর বাবাকে—হ্যাঁ দেখে এস গিযে তোমাব মেযেকে। দেখে চক্ষু জুড়িযে এস।

সঞ্জীব বলিল—যাও এখন ভেতবে যাও বমা।

কুণ্ঠিতভাবে বমা বলিল—যাই। কিন্তু তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভিতর হইতে সঞ্জীবেব মায়েব ডাক আসিল—বমা।

রমা আব দাঁড়াইতে সাহস কবিল না ভিতরে চলিযা গেল।

গাঙ্গুলী বলিল—একটা কথা বলছিলাম বাবাজী।

—বলুন।

—একটা মিটমাট করে ফেল বাবাজী। জান তো দুষ্টকে দূর হতে করি পরিহার।

সঞ্জীব বলিল—আমাব শবীরটা বেশ ভাল নেই গাঙ্গুলীকাকা। আমি উঠছি। মাপ করবেন আমাকে। সে আলোটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—দাঁড়াও বাবা। হ্যারিকেন বদল হলো কিনা দেখেনি, দু' মাস হলো কিনেছি—আমার আবার নতুন আলো।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমারটা আরও নতুন। আজই কলকাতা থেকে এনে জ্বেলেছি।

তবুও গাঙ্গুলী আপন হ্যারিকেনটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া রাস্তায় নামিল। যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাবাজী।

সঞ্জীব তখন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ভোরবেলায় সঞ্জীবের তখনও ঘুম ভাঙে নাই। মা ডাকিলেন—সঞ্জীব, সঞ্জীব।

সঞ্জীবের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উত্তর দিল- -মা।

—উঠে আয় শীগ্‌গির!

গায়ের কাপড়টা জড়াইয়া লইয়া সঞ্জীব দরজা খুলিয়া বলিল—কি মা?

—বাড়ির চারিদিকে পুলিশ!

সবিস্ময়ে সঞ্জীব বলিল—পুলিশ! পুলিশ কেন মা?

মা বলিলেন—বলতে তো পারব না বাবা। গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মে গণনা করে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের ষড়যন্ত্রের কথা কোন শাস্ত্রমতেই তো জানা যায় না বাবা। দেখ তুই এগিয়ে দেখ।

বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিল—সম্মুখেই দাঁড়াইয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টরবাবু।

সঞ্জীবকে দেখিয়ে তিনি বলিলেন—নমস্কার, সঞ্জীববাবু। আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে। বাড়িটাও সার্চ করে দেখতে হবে।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—অপরাধটা কি শুনতে পাই না?

সাব-ইন্সপেক্টর বলিলেন—বলতে আমারও লজ্জা হচ্ছে সঞ্জীববাবু। অপরাধ আপনার দাঁড়াচ্ছে নারীহরণ। রমণদাসের নাবালিকা কন্যা রমা দাসীকে অসদভিপ্রায়ে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন—। সে কি আপনার বাড়িতে আছে?

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আছে। রমা—রমা। মা রমাকে পাঠিয়ে দাও তো।

রমা বাহিরে আসিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার পিতা রমণদাস তাহাকে দেখিয়া একটা কৃত্রিম ক্রন্দনে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সাব-ইন্সপেক্টর তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন—চুপ কর বেটা বদমাস চোর! তারপর সঞ্জীবকে বলিলেন—তাই তো সঞ্জীববাবু, শেষ পর্যন্ত আপনার মাকেও না জড়ায়।

সঞ্জীব বলিল—অপরাধ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি সাব-ইন্সপেক্টরবাবু। তারপর আবার বলিল—একটু অপেক্ষা করুন, আমি গায়ে জামাটা দিয়ে মাকে প্রণাম করে আসি।

সাব-ইন্সপেক্টর বলিল—তাই তো সঞ্জীববাবু, আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের যে সীমা দেখতে পাচ্ছি না। এমন একটা অপরাধ—

ম্লান হাসি হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—অপরাধ কারও নয় সাব-ইন্সপেক্টরবাবু, এ আমার স্বখাত সলিল।

মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া সঞ্জীব ডাকিল—মা।

তেজস্বিনী মায়ের ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নীরবে তিনি ছেলের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রব সংযত হইলেও রোদন বাঁধ মানিল না, দর দর ধারে দুই চোখ বাহিয়া সঞ্জীবের নত মস্তকে ঝরিয়া পড়িল।

দিন কয় পর।

সেই আয়না ঘরের মধ্যে রমাও আজ আবার দাঁড়াইয়াছিল। রমা বাবুর বাড়িতে আসিয়াছে। সঞ্জীবের গ্রেপ্তারের পর সে বাড়ি গিয়াছিল। সমস্ত ঘটনা সে বুঝিয়াছিল কিনা কে জানে কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ উদ্বেগ তাহার ছিল না। রমার মা বলিয়াছিল—খোকাবাবুকে মানুষ করবার জন্যে আবার তোকে নিতে লোক পাঠিয়েছেন বাবুরা। দেখ, যাবি তুই?

মায়ের মুখের উপর চকিত একটি দৃষ্টি হানিয়া সে সলজ্জভাবে মুখ নত করিয়াছিল। মায়ের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিতের আভাস তাহার কাছে আজ অপ্রকাশ রহিল না।

বুকের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ঘন আবেগ গর্জনমান উতলা মেঘের মতো মুখর হইয়া উঠিল। সে অনুভব করিল বাহির পর্যন্ত তাহার সে গর্জনের প্রতিধ্বনিতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। হৃদস্পন্দন ঘনবেগে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিতেছিল।

চকিতে তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল সেই ঘর সেই দুয়ার। ঘরের মধ্যে চেয়ারেব উপর যেন বাবু বসিয়া আছেন, টেবিলের উপর চায়ের কাপে সে যেন সলজ্জ নত মস্তকে চা ঢালিয়া দিতেছে। সে অনুভব করিল বাবুর সস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি যেন তাহার সর্ব অবয়বের আরতি করিয়া ফিরিতেছে। সলজ্জ পুলকে তাহার অন্তর ভবিয়া উঠিয়াছিল।

পট পরিবর্তিত হইয়া গেল।

তাহার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল—খোকাবাবুর সুকুমার ছবিখানি। খোকাবাবুকে কোলে লইয়া সে যেন মৃদুস্বরে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। অকস্মাৎ যেন বাবু আসিয়া গেলেন। অনাবৃত মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে গিয়াও যে দিতে পারা যায় না। দুষ্টু খোকা যে কাপড় চাপিয়া ধরিতেছে। বাবুর অধবে মৃদু হাস্যরেখা! সমস্ত দেহ তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দেহে রক্তধারা যেন উত্তাল তরঙ্গে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার পট পরিবর্তিত হইয়া গেল।

তাহার মনে হইল—সেই আয়না ঘরে বসিয়া সে যেন চুল বাঁধিতেছে। হাতের কাছে সরু-দাঁড়ার চিরুনীটা যে নাই। ঝি-কে ডাকিয়াও যে পাওয়া যায় না। ঝিটা বড় অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে তিরস্কার করা দরকার। এ কল্পনায় মন তাহার ভরিয়া উঠিয়াছিল।

আজ আয়না ঘরে দাঁড়াইয়া সেই সব ছবিগুলি আবার তাহার মনের চোখে ভাসিয়া

উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অধরে বিকশিত হইয়া উঠিল হাসির কুঁড়ি। উপরে দেওয়ালের গায়ে সেই ছবিগুলি। আজ রমা ভাল করিয়া ছবিগুলিকে দেখিতে লাগিল। পুরুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ মেয়েটির মুখে কি বিচিত্র হাসি। রমার মুখ হইয়া উঠিল গাঢ় রক্তিম।

এপাশে আর একখানি ছবি। অর্ধনগ্ন একটি মেয়ে। তাহার এলানো চুলের কয়টা গোছা নগ্ন বুকের উপর ঘুমন্ত কালো সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়া আছে। বুকের কাপড সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে আপন শুভ্র-সুন্দর বক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। ছবিখানি দেখিতে রমার বিমূঢ় মনে কি ইচ্ছা হইল কে জানে। সেও আপনার বক্ষবাস মুক্ত করিযা নগ্ন বুকের দিকে চাহিযা দেখিল। দর্পণে দর্পণে সেই প্রতিবিম্ব। বমা মুখ তুলিয়া দর্পণের দিকে চাহিতেই তাহার অধরে ফুটিয়া উঠিল সলজ্জ মৃদু হাসি।

অকস্মাৎ দরজা খোলার শব্দে সে চমকিযা উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে দশ-বারোটি পুরুষ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

রমা চিনিল—চারিদিকের দর্পণে বাবুর প্রতিবিম্ব। সলজ্জ ত্রস্তভাবে সে বক্ষাবরণ সুবিন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই সে পুরুষের নিবিড আলিঙ্গনের মধ্যে লীন হইয়া গেল।

দর্পণে দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইযা উঠিল। রমা এক সময সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার কমনীয় হাত দু'খানি কখন পুরুষটির কণ্ঠ বেষ্টন করিযা ফেলিয়াছে। লজ্জায় সে চোখ বুজিল।

নলিনী বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত নির্বাক হইয়া গেল, সঞ্জীবের প্রতি বিচারকের দণ্ডাদেশ শুনিয়া। পাঁচ বৎসরের কঠোর কারাবাসের আদেশ। সঞ্জীব যেমন স্থির গম্ভীরভাবে দাঁডাইয়াছিল, তেমনি দাঁডাইয়া রহিল। সঞ্জীবের তরফের উকিল নলিনীকে পত্র দিয়া আনাইযাছিলেন। সঞ্জীবের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে সকলেব চেয়ে বড সাক্ষী সেই। লাঞ্ছনার তাহার সীমা রহিল না। আদালতের কঠোর বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান তাহার ছিল না। কাজেই এতখানি সে প্রত্যাশা করে নাই।

বিপক্ষ হইতে সরকারী উকিল তাহাকে প্রশ্ন করিলেন —তুমি কি মহেন্দ্রবাবুর উপপত্নী ছিলে? নলিনীর মুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। মাথা যেন তাহার আপনি নত হইয়া মাটির বুকের মধ্যে মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। মনে হইল পৃথিবীর বায়ু যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে। উকিল ধমক দিলেন—চুপ করে থাকলে চলবে না, উত্তর দাও।

আপনাকে সংযত করিয়া নলিনী দৃপ্তভাবে মাথা তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু বাধা দিল সঞ্জীব। সে কোন কিছু উচ্চারণ করিবার পূর্বেই সঞ্জীব বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল—মহামান্য বিচারকের কাছে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইয়াছিল সে রমার এজাহার শুনিয়া। সেই রমা—সুদীর্ঘ একটা

মিথ্যা ইতিহাস সুচারুভাবে গুছাইয়া গুছাইয়া তোতা পাখির মতো আওড়াইয়া গেল। এক চুল এদিক-ওদিক করিল না। চকিতা হরিণীর মতো সে এক একবার সঞ্জীবের দিকে চাহিতে লাগিল। আর এক একবার চাহিতেছিল সে, যেদিকে মহেন্দ্রবাবু বসিয়াছিলেন সেইদিকে।

রায়ে বিচারক রমার সম্বন্ধে মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, আসামীর মতো দৃঢ় চরিত্রের শিক্ষিত যুবককে এই জঘন্য অপরাধে অপরাধী বিশ্বাস করা যেমন কঠিন, বাদিনী রমার মতো একান্ত সরল মেয়েটির বর্ণিত সকরুণ ইতিহাস অবিশ্বাস করাও তেমনি কঠিন।

এমনি করিয়া বিচারের অভিনয় শেষ হইয়া গেল।

নলিনী নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া বিচারালয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। চেতনা হইল তাহার সঞ্জীবের ডাকে।

ডক হইতে বাহির হইয়া সঞ্জীব ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী।

নলিনীব চোখের জল আর বাঁধ মানিল না।

সঞ্জীব বলিল—যেটুকু অসম্মান আপনার হয়ে গেল তার ওপর আমার হাত ছিল না। আমায় মাফ কববেন।

নলিনী কোন কথা কহিল না। কহিল না নয়, কহিতে পাবিল না। একটা শোকার্ত আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বব পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সঞ্জীব সেটুকু বুঝিল। সান্ত্বনা দিযাই সে বলিল—হাসিমুখে উৎসাহ দিয়ে বিদায় দিন মিস গাঙ্গুলী। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পাথেয় চাই আমার। আপনাদের উৎসাহ—মায়ের আশীর্বাদ আমার সেই পাথেয।

বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া নলিনী এতক্ষণে বলিল—এ কি করলেন আপনি? আমার লাঞ্ছনা নিবারণ করতে মিথ্যা দোষ আপনি স্বীকার করে নিলেন?

সঞ্জীব বলিল—দোষ স্বীকাব না করলেও এ জাল থেকে উদ্ধারের আমার উপায় ছিল না। বড় সুকৌশলে জাল রচনা করেছিলেন মহেন্দ্রবাবু।

একটু নীরব থাকিযা নলিনী বলিল—কিন্তু এরই নাম কি বিচার?

—ভুলকে এডাবার পথ যে মানুষের নেই নলিনী দেবী। বিচারকও যে মানুষ। আর তাঁরই বা দোষ কি বলুন? মানুষ যতদিন মিথ্যা বলতে না ভুলবে, বিচারককেও ততদিন ভুল করতে হবে। তবু মানুষের মহত্ত্ব যে সে বিচাব করবার চেষ্টা করে।

কনেস্টবল সঞ্জীবকে বলিল—চলিয়ে, চলিয়ে।

সঞ্জীব হাস্যমুখে বলিল—তাহলে নমস্কার মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী বলিয়া উঠিল—মাকে কিছু বলবেন না?

সঞ্জীব চলিবার জন্য বিপরীত মুখে ঘুরিয়াছিল, সে আবার ফিরিল, এবার কাঁপিয়া উঠিল। চোখের বুকে বিন্দুর মতো ছোট হইয়া আকা প্রতিবিম্বে ধরা দিয়াছে।

একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—না, কিছু বলব না। জেলের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার সে দাঁড়াইল।

নলিনী তাহার গমনপথের দিকেই চাহিয়াছিল, চোখে চোখ মিলিতেই সঞ্জীব বলিল—বলবেন, সঞ্জীব আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছে।

সঞ্জীবের বার্তা সে বহন করিবার ভার গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু যাইবার মুখে পথে পা দিয়া সে অনুভব করিল—কি ভীষণ সে গুরুভার। তাহার বুক যে সে গুরুভারের পেষণে ভাঙিয়া যাইতেছে। মায়ের সম্মুখে এই বার্তা লইয়া দাঁড়াইবার কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া উঠিল। সে তো জানে, কত আশা কত কল্পনা, কত অহঙ্কার এই সন্তানটিকে লইয়া সেই তেজস্বিনী প্রৌঢ়ার। আবার তেমনি সুগভীর মমতায় অন্ধ তিনি। আজও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানটিকে শিশুর মতো নিজের উপদেশে চালিত করার প্রবৃত্তি তাঁহার যায় নাই। না হইলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, শঙ্কা যায় না। নলিনীর ইচ্ছা হইল একখানা পত্রে সমস্ত জানাইয়া তাহার কর্তব্য শেষ করে। কিন্তু তাও সে পারিল না। দ্বিধার মধ্যেই ট্রেনে চলিয়াছিল। অবশেষে পরের ট্রেনে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় সে সঞ্জীবের গ্রামে আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়া একান্ত একাকী সে সঞ্জীবের বাড়ির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতেছিল কেমন করিয়া সে বাড়ি ঢুকিবে! বারবার তাহার মনে হইল, না আসিলেই সে ভাল করিত।

বাড়িখানা নিস্তব্ধ—যেন থম্‌থম্ করিতেছে। ম্লান সন্ধ্যালোক গৃহবেষ্টনীর মধ্যে গাঢ় অন্ধকারের রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নলিনী ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাঝ আঙিনায় দাঁড়াইল।

কোথাও কোন সাড়া নাই। জনহীন নীরবতার মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক নিস্তরঙ্গ প্রবাহের মতো একটানা তীক্ষ্ণস্বরে অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। নলিনী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই। শুধু মাটির বুক হইতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঘনাইয়া ঘনাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—অবরুদ্ধ প্রগাঢ় বেদনার মতো।

সহসা তাহার মনে হইল ও-পাশের মুক্তদ্বার ঘরখানার মেঝের উপর কে যেন পড়িয়া আছে। বুকখানা তাহার চমকিয়া উঠিল।

শঙ্কিত পদে অগ্রসর হইয়া সে দেখিল সত্যই তিনি মা। অনুচ্ছ্বসিত গভীর বেদনায় স্থিরভাবে মাটির বুকে উপুড়.হইয়া পড়িয়া আছেন। স্পর্শ করিতে তাহার হইল না। সে সকরুণ স্বরে ডাকিল—মা।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা মুখ তুলিতে তুলিতে বলিলেন—কে?

উত্তর নলিনীর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে নীরবে আপনার উচ্ছ্বাস দমিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টায় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা মুখ তুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—নলিনী? এস মা বস। তারপর চারিদিকের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—উঃ সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে

গেল যে। এখনও সন্ধ্যে জ্বালা হয়নি! তুমি একটু বস মা নলিনী। আমি সন্ধ্যেটা জ্বেলে ইস্ট স্মরণ করে নিই।

নলিনী বিমূঢ়ার মতো বসিয়া রহিল। সে শুধু ভাবিতেছিল মাকে সে সংবাদ দিবে কেমন করিয়া?

সমস্ত কর্তব্য শেষ করিয়া আলো হাতে মা আসিয়া বলিলেন—মুখে-হাতে জল দাও মা নলিনী। ট্রেনে এসেছ, কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি উনোনটা ধরিয়ে ফেলি, তুমি চায়ের জল একটু চড়িয়ে দাও।

নলিনী মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল—না মা, চা আমি খাব না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন—আজ দু' মাস চায়ের সরঞ্জাম নামানো হয়নি আমার। আবার পাঁচ বছর পার না হলে আর নামানো হবে না। জান কি মা নলিনী, জেলে চা দেয় কি না?

নলিনী নীরব হইয়া রহিল।

প্রদীপের আলোয় মা দেখিলেন নলিনীর চোখের তলের মৃত্তিকা, বিন্দু বিন্দু করিয়া ভিজিয়া উঠিতেছে। তিনি বলিলেন—কাঁদছ মা নলিনী? আমিও অনেক চেষ্টা করলাম কাঁদবার কিন্তু কান্না এল না। একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঊর্ধ্বমুখে শীত শেষের গভীর নীল আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি নীরব হইলেন।

আকাশেব পশ্চিমপ্রান্তে শুক্রগ্রহ দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহার প্রভায় রাত্রির অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল। সেই প্রায়ান্ধকার আলোকের মধ্যেও সে অনুভব করিল মায়ের প্রশান্ত মুখখানি বেদনার্ত গভীর উদাসীনতায় সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে, কৃষ্ণরাত্রির সমুদ্রের মতো। আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিযাই তিনি বলিলেন—হারাণ এসে আমায় খবর দিলে। আমি শুকনো চোখে তার মুখের দিকে চেযে থাকলাম শুধু। মুখে কথা এল না, কান্না এল না। সে বোধ হয় আশ্চর্য হয়েই চলে গেল। তারপর এই এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে সঞ্জীবের বাল্যকাল থেকে এ পর্যন্ত কত কথাই একে একে মনে করলাম। বুকের মধ্যে কান্না তোলপাড় করছে কিন্তু বাইরে বেরুবার পথ যেন পাচ্ছে না।

নলিনী ডাকিল—মা। তাহার শঙ্কা হইল মায়ের সংজ্ঞা বোধ হয লোপ পাইতেছে।

মা বলিলেন—সঞ্জীব আমায় কিছু বলে যায়নি? হারাণ বলছিল, যাবার সময় তোমার সঙ্গেই শুধু তার কথা হয়েছিল।

একান্ত অপরাধীর মতো নলিনী বলিল—বলেছেন।

মা ধীরভাবে কথাটি শুনিবার অপেক্ষায় রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে নলিনী বলিল—বলেছেন, মা যেন আমার ফেরবার অপেক্ষায় বেঁচে থাকেন।

মায়ের চোখ দিয়া অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া চোখ মুছিযা তিনি বলিলেন—তার দোষ নাই। সে ভেবেছে এ আঘাত আমি সইতে না পেরে

আত্মহত্যা করব। এ কথা যে কতবার বলেছি আমি তাকে। যেদিন সে গ্রেপ্তার হয় তার আগের দিন রাত্রেও একথা তাকে আমি বলেছিলাম, মা। বলেছিলাম, সঞ্জীব, সংসারে আমার সবচেয়ে বড় কাম্য তোর চরিত্রের—সুনাম। সেই বস্তুতে যদি কেউ মিথ্যের কালিও মাখিয়ে দেয়, তবে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর পথ থাকবে না বাবা। নীরব হইয়া আবার তিনি কাঁদিলেন। তারপর বলিলেন—সেই মিথ্যের কালিই সেই বস্তুতে মাখিয়ে দিলে, তবুও আশ্চর্য এই নলিনী, কই আমি তো মরবার কল্পনাও করতে পারছি না।

নলিনী বলিল—তিনি আপনাকে বেঁচে থাকতে বলে গেছেন মা।

মা বলিলেন—ভয় নাই মা, সে কল্পনা আমি করিনি। আঘাতের ভয়ে ধর্মকে লঙ্ঘন করতে আমি পারব না। আত্মহত্যা মহাপাপ। আর তার যে কথা সেও আমি হেলা করব না মা। বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব। তার দুঃখে দুঃখ আমি পেয়েছি, কিন্তু সে আমায় দুঃখ দেয়নি, একথা তাকে বলবার জন্য আমি চেষ্টা করব।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মা সংসারের বন্দোবস্তে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিলেন। হারাণ বাগদীকে ডাকিয়া নানা বন্দোবস্তের কথা হইতে লাগিল। সঞ্জীবের পাশের গ্রামবাসী এক বন্ধুকে ডাকিযা কি সব পরামর্শ হইল। নলিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। এ সংসারে শোভন বলিয়া একটা কথা আছে। তাহাকে নলিনী ভুল বুঝিল না কিন্তু এই সময়ে সংসারের প্রতি এতটা গভীর অনুরাগ তাহার যেন কেমন মনে হইল।

দিন দুই পরে বলিল—মা আমি আজ যাব মনে করছি।

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন—কাজের ক্ষতি যদি হয় তোমার, তবে মা বারণ করব না। কিন্তু যদি সে ভয় না থাকে তাহলে কি আর পাঁচটা দিন থেকে যেতে পার না!

যতই অসন্তোষ মনে থাক তাহার, অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিল না। মৃদুস্বরে সে বলিল—তাই হবে।

মা বলিলেন—একা এই ঘরে থাকতে হবে ভাবতেও আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে মা। মনে হয় ঘর যেন আমায গ্রাস করে ফেলবে। ভাবছি কোথাও চলে যাব।

নলিনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবেন মা?

—কাশী।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। এ কয়দিনের অবিচারের জন্য অন্তরে অন্তরে অপরাধ বোধ না করিয়া সে পারিল না।

মা বলিলেন—অবলম্বন ভিন্ন তো সংসারে বাস করা যায় না মা? একমাত্র অবলম্বন যখন বিশ্বনাথ আমাকে কোলছাড়া করে দিলেন তখন তাঁকে ছাড়া আর কাকে অবলম্বন করব বল?

গাঢস্বরে নলিনী বলিল—দয়া করে আমায় সঙ্গে নেবেন মা?

মা মুখ তুলিয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—যাবে? তারপর আবার ধীরে ধীরে বলিলেন—আচ্ছা চল।

রমার জীবনে—তারপর ?

তারপর উন্মত্ত ব্যভিচারের একটা সুদীর্ঘ বিচিত্র কাহিনী। রমা উন্মত্তভাবে বাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। যৌবনের আকস্মিক জাগরণে সে চাহিয়াছিল আত্মসম্মানের জন্য পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনী, সংসার, সন্তান, জীবজগতে কৈশোর-অতিক্রান্ত নারীর কল্পনার বস্তু যাহা কিছু—সব। প্রেম সে বোঝে নাই। কাহাকেও পাইতে কামনা সে করে নাই। সে কামনা করিবার মতো আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠতা তাহার ছিল না। সংসারের ঘটনার প্রবাহের মুখে যেখানে আসিয়া ঠেকিল, সেইটুকুকেই সে অবলম্বন করিল। সঞ্জীবের ছায়া তাহার অন্তরে পড়িতে পারে নাই। প্রখর সূর্যের কিরণদাহে শ্রান্ত ক্লান্তের মতো সসম্ভ্রমে ছায়ার আড়ালে আড়ালেই সে থাকিত। কোনদিন দীপ্ত সূর্যের দিকে ঊর্ধ্বমুখ হইতে তাহার সাহস হয় নাই। মহেন্দ্রবাবুকেও যে সে কামনা করিয়াছিল তাও নয়। কর্মচক্রে যেদিন তাহাকে তাহার বাপ-মা শতমুখে তাহাব সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়' এখানে পাঠাইয়া দিলেন, সেদিন সে কিশোরী নববধূটির মতোই আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া অচেনা-অজানা একটি পুরুষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিযাছিল। বিবেচনা করে বিচার করে নাই, করিযাছিল শুধু বাপ-মায়ের কথার প্রতিধ্বনি, আপন ভাগ্যের প্রশংসা। এখানকাব আদর লাঞ্ছনা সবই একান্ত আপনার বলিয়া সে গ্রহণ করিল। তাই মহেন্দ্রবাবু যখন একটি সুরচিত মিথ্যা কাহিনী পাখির মতো পড়াইয়া গেলেন তখন সে সত্যের দিকে তাকাইতে সাহস করে নাই। সভয়ে ক্লিষ্ট অন্তরেও সে পাখির মতো সে কাহিনীটি আযত্ত কবিল, আপত্তি করিতে পারিল না। শুধু একবার অভ্যাসমতো ভীরু সরল চোখেব চকিত দৃষ্টি তুলিল কিন্তু পরমুহূর্তেই আপনা হইতেই সে দৃষ্টি নত হইয়া নিবদ্ধ হইল ধরিত্রীর বুকে।

অপরপক্ষে মহেন্দ্রবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব রাজ্যের সজাগ মানুষ। জীবনে আয়োজন করেন তিনি প্রয়োজনের জন্য। প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আযোজন তাঁহার চক্ষে আবর্জনার সামিল। হয়তো সংসারের অধিকাংশ মানুষেরই তাই। কিন্তু এদিকে তাঁহার কঠোরতা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি সবল। বৎসর তিনেক পর সেদিন তিনি কড়ি গাঙ্গুলীর সহিত কথা কহিতেছিলেন—কোন কষ্ট ওর হবে বলে আমি মনে করি নে গাঙ্গুলী। ঘর একখানা কিনে দিযেছি। তাব ওপর কিছু টাকাকড়ি হলেই দিন ওর বেশ চলে যাবে।

কথা হইতেছিল রমাকে বিদায় করিবার। এই অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই রমার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে। সে আজ ভোগজীর্ণ।

গাঙ্গুলী বলিল—সেটা কি ঠিক হবে হুজুর ? ও কি আর সমাজে ঠাঁই পাবে ?

বাবু হাসিলেন। বলিলেন—শাসন করে দেব সমাজকে।

গাঙ্গুলী বলিল—কিন্তু ধর্ম বলেও তো...

বাবু সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। গাঙ্গুলীর কথা আর শেষ হইল না। বাবু হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—তুমিও ধার্মিক হয়ে উঠলে গাঙ্গুলী ! দোহাই তোমার, ভুল আইনের ভয় যত পার দেখাও, কিন্তু ধর্মের কাহিনী তুমি বল না। তা হলে হয় তো বয়স আর আমার বাড়বে না। এই বয়সেই অমর হয়ে থাকতে হবে।

গাঙ্গুলীর মুখ দিয়া আর কথা ফুটিল না।

বাবু আবার বলিলেন—ধর্মাধর্মসমাযুক্ত লোভ মোহসমাবৃত মানুষ আমরা গাঙ্গুলী। আমাদের এই ধর্ম। কায়মনোবাক্যে তাই পালন করি। এর বেশি কিছু ধর্ম বলে মানি না। পালন করতে প্রবৃত্তিও হয় না।

কথাগুলা গাঙ্গুলীর মাথায় হয় তো ঢুকিল না। সে নির্বোধের মতো মাথা চুলকাইতে লাগিল।

মহেন্দ্রবাবু অকস্মাৎ উগ্র হইয়া উঠিলেন। উত্তেজনাভরেই তিনি বলিয়া গেলেন—বলতে পার গাঙ্গুলী, একটা মানুষ বেশি জীব হত্যা করে, কী একটা বাঘ বেশি জীব হত্যা করে! অবলীলাক্রমে অলস অবসরে টিপে টিপে পিঁপড়ে পতঙ্গ মেরে থাকে। আমি তো মেরে থাকি। পশুর ব্যভিচারের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, নিয়ম আছে, কিন্তু মানুষের ব্যভিচারের সময় নেই, নিয়ম নেই। হিংস্র পশু খায় শুধু রক্ত মাংস, উদ্ভিদ পশু জলচর খেচর কীট পতঙ্গ মানুষের অখাদ্য কিছু নয়। ধর্মের দোহাই আমাকে দিয়ো না গাঙ্গুলী। এইগুলোই মানুষের ধর্ম—এই ধরেই মানুষ বেঁচে আছে আসলে।

গাঙ্গুলী একান্ত নির্বোধের মতো বলিল—আজ্ঞে তা তো বটেই, তা তো বটেই।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—কথাগুলো তোমার হয়তো কানে গেল না। তা না যাক ক্ষতি বিশেষ নেই। থাক ও কথা, তোমায় যা বললাম তাই ঠিক। রমার জবাব হয়ে গেল। ওকে তুমি নিয়ে যাও। যদি কখনও কিছু দরকাব হয় তুমি এসে জানিয়ো বা জানাতে বলো।

গাঙ্গুলী বলিল—আপনার বাড়িতে তো দশটা-বিশটা দাসী-বাঁদী রয়েছে। ও যদি এইখানেই—

দৃষ্টিটা একটু তুলিয়া বাবু বলিলেন—তোমাব এত সঙ্কোচ হচ্ছে কেন বলত?

গাঙ্গুলী কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বোধ করি সেই চিন্তাই করিল। অবশেষে বলিল—কেমন যেন লজ্জা হচ্ছে আমার বাবু।

খানিকটা ব্যঙ্গহাস্যে বাবু হাসিলেন। তারপর গম্ভীর হইযাই বলিলেন—না, তা হয় না এককড়ি। পুরাতন কাপড় বাক্সে তুলে রেখে পরিত্যাগ করা আমি পছন্দ করি নে। তুমি ওকে ডেকে বলে দাও। ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও বরং।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—আমাকে মাপ করুন হুজুর।

বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

গাঙ্গুলী মিনতি ভরে বলিল—হুজুর।

মহেন্দ্রবাবু অনুরোধের সুবে বলিলেন—তোমাকেই বলতে হবে গাঙ্গুলী। তিনি ঘর হইতে বাহির হইযা চলিযা গেলেন।

একা নির্জনতাব অবকাশ পাইযা গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—পাষণ্ড। বেটা মহা পাষণ্ড রে। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। ক্ষেত্র এবং কাল সম্বন্ধে চেতনা তাহার মুহূর্তে ফিরিয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে দরজাটা অর্ধোন্মুক্ত করিয়া উঁকি মারিয়া

দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। মনের আক্ষেপ মিটাইয়া সকল কথা বলা তাহার হয় নাই, মৃদুস্বরে সে আবার আরম্ভ করিল—বলে, পাপ নাকি বাপকে ছাড়ে না। তা একি পাপের কর্তাবাবা না কিরে বাপু। বিন্ধ্যগিরির মতো বেটা বেড়েই চলেছে।

তারপর এদিকের দরজাটা ঠেলিয়া সে ডাকিল—কানাই! কানাই!

ভিতর হইতে সাড়া আসিল—যাই।

গাঙ্গুলী আবার বলিয়া উঠিল—আর এ বেটাও কি জুটেছে রে বাবা! ধম্মরাজের চর বেহ্মদত্যি! পেভুভক্ত বটে বাবা।

কানাই আসিয়া বলিল—রমাকে ডেকে দিতে হবে নাকি?

—হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। তুই কাজটা সেরে দিলেই তো পারতিস। রমাকে বলে দিগে, ওর জবাব হয়ে গেছে এ বাড়ি থেকে। কি আছেটাছে গুছিয়ে নিয়ে আজই যেতে হবে আমার সঙ্গে। বুঝলি।

কানাই বলিল—যা বলবেন আপনিই বলুন। বাবু তো আপনাকেই বলতে বলে গেলেন। আমি ডেকে দিচ্ছি। সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না। দরজা বন্ধ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর রমা আসিয়া প্রবেশ করিল। সত্যই রমা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। সে লাবণ্য শুকাইয়া গিয়াছে। মাথায় সে ঘন কেশশোভা নাই। শীর্ণ মুখের মধ্যে এখনও জাগিয়া আছে সেই হরিণীর মতো সরল ভীরু দুটি চোখ ও তাহার চাহনি।

রমা কহিল—আমায় ডাকছিলে বামুনকাকা?

গাঙ্গুলী শুধু বলিল—হুঁ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রমা বলিল—খোকার দুধ চড়িয়ে এসেছি আমি, বামুনকাকা।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—সে আর নামাতে হবে না তোকে। তোর জবাব হয়ে গেল।

রমা একদৃষ্টে গাঙ্গুলীর দিকে চাহিয়া রহিল।

গাঙ্গুলী মাথা নত করিল। নত শিরেই সে বলিল—বাবু বলতে বলে গেলেন আমাকে। বুঝলি? চকিতের মতো দৃষ্টি তুলিয়া গাঙ্গুলী দেখিল রমা এখনও তেমনিভাবে চাহিয়া আছে। সে আবার বলিল—বুঝলি?

আবার গাঙ্গুলী চাহিয়া দেখিল রমা এখনও তেমনি দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া আছে। তাহার আর সহ্য হইল না। সে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—ড্যাব ড্যাব করে গরুর মতো চেয়ে আছে দেখ। আমি কি করব তা? চোখ নামা রে বাপু, চোখ নামা। বলি যা বললাম শুনলি তো? আজই আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখানে আর থাকা হবে না।

এতক্ষণে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রমা প্রশ্ন করিল—আমার জবাব হয়ে গেল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমার সঙ্গেই যেতে হবে তোকে।

—চল।

গাঙ্গুলী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ভাল বিপদ রে বাবা। চল না—চল। একেবারে যেতে হবে। কি কি আছে তোর ভাল করে গুছিয়ে-টুছিয়ে নে, বুঝলি।

রমা বলিল—কিছু তো নিয়ে আসিনি আমি।

আরও দেড় বৎসর পর।

অরুণোদয়ের পরই বন্দীশালার দুয়ার উন্মুক্ত হইল। জীবনের নবপ্রভাতে সেদিনের কারামুক্ত কয়েকজন বন্দীর সহিত বাহির হইয়া আসিল সঞ্জীব, শীর্ণ দেহ, বিশৃঙ্খল দীর্ঘ রুক্ষ চুল, মুখের নিম্নাংশ দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন। সুন্দর রঙ পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। যেন মরিচাধরা তীক্ষ্ণধার দীর্ঘফলা বিগতগৌরব তরবারী একখানি।

মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল—আঃ।

চারিদিকে দেখিতে দেখিতে সহসা সে বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—মিস গাঙ্গুলী!

দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ির নিকট আসিয়া ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী গাড়িখানার পাশে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রত্যাশায় এদিক-ওদিক চাহিতেছিল। কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরাইয়া নলিনী যেন বেদনার্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে সকরুণ স্বরে শুধু বলিল—আপনি? সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

ম্লান হাসি হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ, আমি।

—আপনি এমন হয়ে গেছেন?

—উঃ। যে শালার পরিশ্রম! কথাটা বলিয়াই সে যেন চকিত হইয়া উঠিল। বলিল—মাফ করবেন মিস গাঙ্গুলী। আজ সাড়ে চার বছর বাস করেছি জঘন্য ইতরমির মধ্যে। ভেতরে এতটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারিনি, সে রোগের বীজাণু আমার মধ্যেও প্রবেশ করেছে।

নলিনী বলিল—ও সব সাময়িক সঞ্জীববাবু।

বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—আমার তা মনে হয় না। বাইরে যেমন দেখছেন, সে মানুষের কঙ্কাল [illegible]আমি, ভেতরেও ঠিক তাই। জীবনের যা কিছু সঞ্চয় সমস্ত নিঃশেষে অপব্যয় করে রিক্ত হয়ে ফিরে এসেছি। চেতনা আছে, চিত্ত নেই। বুকের মধ্যে রাশি রাশি বেদনা যেন রয়েছে কিন্তু বোধশক্তি নেই। অনুভব করতে পারছি নে। আপনার সঙ্গে কথা কইছি, আমার ভয় হচ্ছে, সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করে সংযত হয়ে কথা ভেবে বলতে হচ্ছে।

নলিনী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও সে বলিল—আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সঞ্জীববাবু। স্থির হোন আপনি।

সঞ্জীব জর্জর ব্যক্তির মতো বলিয়া উঠিল—উত্তেজনা যে দুর্বলেরই ব্যাধি। মুক্ত স্বাধীন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আমার দেহ-মন কেঁপে কেঁপে উঠছে শুধু।

ক্ষণিক নীরবতার পর সে বলিয়া উঠিল—আজ আমার সব চেয়ে বড় আশ্বাস কি জানেন ? শুনলে ঘৃণা করবেন আমাকে। সব চেয়ে বড় আশ্বাস মা আমার বেঁচে নেই। এই মূর্তি নিয়ে তাঁর সামনে আমায় দাঁড়াতে হবে না।

নলিনী শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

সঞ্জীব বলিল—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ?

নলিনী এতক্ষণে বলিল—আপনাকেই নিতে এসেছি কমরেড।

—কমরেড। সঞ্জীব একটু হাসিল।

নলিনী বলিল—গাড়িতে উঠে বসুন।

—গাডিতে উঠতে হবে ? ভাল। সঞ্জীব গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পিছনে পিছনে নলিনী গাডিতে উঠিয়া কোচম্যানকে বলিল—হোটেলে নিয়ে চল।

সঞ্জীব বলিল—আপনার কাছে ঋণের আমার শেষ নেই। আপনার নিয়মিত পত্রেই শেষের দিকটায় সান্ত্বনা পেযেছি, আশ্বাস পেয়েছি। নইলে মায়েব সংবাদ না পেলে আমি পাগল হযে যেতাম। আপনি তো বরাবর মাযের কাছে ছিলেন। মা সে কথা আমায় জানিয়েছিলেন।

মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—আমার সৌভাগ্য সঞ্জীববাবু তিনি আমায সঙ্গে নিয়েছিলেন।

সঞ্জীব বলিল—আপনাকে ধন্যবাদ দেব না। কৃতজ্ঞতার ঋণ ধন্যবাদে শোধ হয় না। কিন্তু কযেকটা কথা জিজ্ঞাসা কবব আপনাকে। মিথ্যে বলবেন না দয়া করে। মা কি আমার খুব কষ্ট পেয়ে মাবা গেছেন ?

নলিনীর চক্ষু সজীব হইয়া উঠিল। রুদ্ধস্বরে সে কহিল—এই কথা বলবার ভার মা আমায় দিযে গেছেন। তাঁব সমস্ত ভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

অসহিষ্ণুভাবে সঞ্জীব বলিযা উঠিল—তাঁর মৃত্যুব কথা বলুন আগে। কত কষ্ট---

বাধা দিয়া নলিনী বলিল—সত্যিই আপনাব অন্তরে বহু বিকৃতি ঘটেছে সঞ্জীববাবু। আপনাব মাকেও আপনি স্মরণ কবতে পারছেন না। কষ্ট কি তাঁকে স্পর্শ করতে পারত সঞ্জীববাবু ? যেদিন আপনার কথাগুলো বয়ে নিয়ে গেলাম তাঁব কাছে, তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন আকাশের দিকে চেয়ে। সেদিন বুঝতে পারিনি কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, তাঁব বক্তব্য আমার সঙ্গে ছিল না। ছিল উপরের সঙ্গে। তার পরদিন থেকেই কাশী যাবার উদ্যোগ আরম্ভ করলেন। বললেন—নলিনী, নিরবলম্বন হয়ে তো মানুষ থাকতে পারে না মা। আমি বিশ্বনাথকে অবলম্বন করতে কাশী যাব। আমার বহু ভাগ্য, আমায়—দয়া করে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন। আপনি দেখেননি, ভগবানে আমার বিশ্বাস নেই, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, কি গভীর কি বিপুল সে নিষ্ঠা।

শুনিতে শুনিতে দরদব ধারে সঞ্জীবের চোখ দিয়া অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া গেল। নলিনী নীরব হইলে বলিল—আমার কথা, আমার কথা কি বলতেন মা, আমায় বলুন।

নলিনী বলিল---আপনার কথা মানুষের কাছে কোনদিন বলতেন না তিনি। আপনার

কথা তিনি বলতেন তাঁর বিশ্বনাথের সঙ্গে। তবে আপনাকে বলতে বলে গেছেন তিনি—উদগত আবেগে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সঞ্জীব ব্যগ্রভাবে বলিল—বলুন বলুন, থামলেন কেন?

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—মৃত্যুর পূর্বদিন আমায় বললেন, কয়েকটা কথা বলে যাই, সঞ্জীবকে বলো মা তুমি। তোমায় ভার দিয়ে যাচ্ছি। বলো—তার মা হয়ে কোনদিন অনুশোচনা করতে হয়নি আমাকে। সে যে দুঃখ-ক্লেশ পেল তারই জন্য দুঃখ আমার। নইলে সে আমায় দুঃখ কোনদিন দেয়নি।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সঞ্জীব বহুক্ষণ কাঁদিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—তাঁর সৎকার?

নলিনী বলিল—তাঁর নির্দেশ মতোই করিয়েছি। তিনি বলে গিয়েছিলেন—নলিনী, মনিকর্ণিকা ঘাটে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে শ্মশান চণ্ডাল দিয়ে—

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—চণ্ডাল!

—হ্যাঁ চণ্ডাল। আমিও সে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। তিনি বললেন—চণ্ডাল বলে ঘৃণা কবো না। চণ্ডালের মধ্যে থাকেন আমার বিশ্বনাথ। সঞ্জীব আমার ছোট জাতকে অস্পৃশ্য বোধ করতে নিষেধ করত। জীবন থাকতে তো সংস্কাব ত্যাগ করতে পাবলাম না। মরে সেই অনুরোধ রাখব। এই নিন তাঁর চিতাভস্ম।

একটি সুদৃশ্য কৌটা হইতে ভস্ম লইয়া সঞ্জীবেব ললাটে তিলক পরাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি আসিয়া হোটেলে থামিল।

অপবাহ্নে ট্রেনে চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া সঞ্জীব ও নলিনী দেশে ফিরিতেছিল। ক্ষৌরকর্মের পব সুপরিচ্ছন্ন শুভ্র পোশাকে কৃশ সঞ্জীবকে দেখিয়া নলিনী এক সময়ে বলিল—আপনাকে কেমন বোধ হচ্ছে জানেন?

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেমন?

—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো।

ম্লানভাবে সঞ্জীব হাসিল। বলিল—বহ্নি এখনও আছে, বলছেন নলিনী দেবী?

নলিনী বলিল—নিশ্চয়। বহ্নির বিনাশ নেই সঞ্জীববাবু।

অন্যমনস্কভাবে সঞ্জীব বলিল—হবে।

দু' পাশের প্রান্তর বহিয়া হু হু শব্দে ট্রেনখানা চলিয়াছে। জানালার উপর হাত দুটি ভাঁজিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া সঞ্জীব কি যেন ভাবিতেছিল। নলিনী বাহিরে পিছনপানে ধাবমান পারিপার্শ্বিকের দিকে একান্ত অন্যমনস্কের মতো চাহিয়াছিল। একটা স্টেশনে আসিয়া ট্রেনখানা থামিল। কয়কজন যাত্রী কামরাখানাকে প্রায় শূন্য করিয়া নামিল। মিনিট দুই বিরতির পর ট্রেন আবার চলিল।

অকস্মাৎ সঞ্জীব ডাকিল—নলিনী দেবী!

নলিনী মুখ ফিরাইল। সঞ্জীব তখন মাথা তুলিয়া তাহারই দিকে চাহিয়াছিল। সঞ্জীবের

সে দৃষ্টি দেখিয়া নলিনী শিহরিয়া উঠিল। প্রশান্ত দৃষ্টি তাহার অস্বাভাবিক উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। দেহের মধ্যে একটা অস্থিরতা সংযমের শাসন উচ্ছেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। নলিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল—শরীর কি অসুস্থ হয়ে পড়ল সঞ্জীববাবু?

সঞ্জীব বলিল—না।

—তবে এমন করছেন কেন আপনি?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব বলিল—কিছু নয়। আপনি আমার মায়ের কথা বলুন।

নলিনী তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ কিছুই বুঝিল না। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার অন্তরালে বেদনার সন্ধান যেন সে পাইল। সে সুগভীর সহানুভূতির সহিত বাছিয়া বাছিয়া মায়ের জীবনের এই কয় বৎসরের খুঁটিনাটি নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

আর একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিল।

সঞ্জীব বলিল—মায়ের কথা মনে করলে দেহে-মনে শক্তি পাই আমি। মাতৃভাগ্যে আমার মতো ভাগ্যবান কম লোকই আছে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী গাঢ় স্বরে উত্তর দিল—সে কথা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

নলিনী আবার বলিল—তিনিও তাঁর সন্তানভাগ্যেব প্রশংসা করে গেছেন। মনকে আপনি পীড়িত করবেন না।

ইহার পর একটা নিস্তব্ধতায দু'জনেই যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গর্জনমান গতিশীল গাড়িখানার গতি, গর্জন কিছুতেই সে আচ্ছন্নতাকে যেন স্পর্শ করিতে পারিল না। বাহিরে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছিল। গৈরিকবর্ণ অসমতল প্রান্তর যেন নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

নলিনী সচেতন হইয়া উঠিল। বলিল—আমাদের নামতে হবে সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীবও সচেতন হইয়া বলিল—হঁ্যা। এই যে, এসে পড়েছি দেখছি। এইখানে একদিন বেড়াতে এসেছিলাম মনে আছে? এই বাংলোটা? এটা তো ছিল না। এই বাংলোটা নূতন হয়েছে দেখছি।

একটা টিলার উপর সুদৃশ্য একটি বাংলো দেখা যাইতেছিল।

নলিনী বলিল—এটা মহেন্দ্রবাবুর বাংলো। এইখানেই তিনি থাকেন এখন। থাইসিস হয়েছে তাঁর।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—থাইসিস হয়েছে! তারপর আবার বলিল—শক্তিমান পুরুষ। ওঁর মতকে পথকে আমি ঘৃণা করলেও ওঁর শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি মিস গাঙ্গুলী।

ঠিক সেই সময়ই ওই বাংলোটার মধ্যে খাটে শুইয়া মহেন্দ্রবাবু কথা কহিতেছিলেন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে। তাঁহার অসুখ লইয়াই কথা। তিনি বলিতেছিলেন—ও ডাক্তারদের

কথা বাদ দাও তুমি। ওরা যে যা বলে বলুক এ সারবার রোগ নয়। ওয়াল্টেয়র, পুরী, সিমলে, নৈনীতাল যাওয়া, ও শুধু টাকার শ্রাদ্ধ করা। আমি এখানেই বেশ আছি।

কর্মচারীটি পুরনো লোক। বাবুর বাপের আমল হইতে এখানে কাজ করিয়া চুলে পাক ধরিয়াছে। সে বলিল—সারবে বলেই তো লোকে যায়। অন্তত উপশমও তো হবে।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—সে উপশম এখানেও হবে। রোদ আর মুক্ত বাতাসের এখানে অভাব নেই। থাইসিসের বীজাণু—থাক, এত তুমি বুঝবে না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি আবার বলিলেন— কালই তাহলে তুমি সদরে যাও। না। কলকাতাই যাও, এটর্নির বাড়ি। বিষয় বন্দোবস্তের খসড়াটা করে নিয়ে এস। বিষয় যেন ভবিষ্যৎ পুরুষেও কেউ ভাগ করতে না পারে—নষ্ট করতে না পারে। আমার বংশ যেন চিরদিন মাথা উঁচু করে থাকতে পারে। এখানে আর কেউ প্রভুত্ব করছে এ আমি মনে করতেও শিউরে উঠি। গোপীনাথপুরের কি হলো? ওটা ও এখনও দিতে চাচ্ছে না?

—না।

—যেমন করে পার যত দাম লাগে—ওটাকে কিনে ফেল। চাকলাব মধ্যে বাড়ির দোরে ঐটুকু—ও আমি বাদ বেখে যাব না। বাদ রেখে গেলে ও আর হবে না। যেমন করে হোক—বুঝলে? ধর্ম-অধর্ম বাছতে গেলে চলবে না।

কর্মচারীটি নীরবে আদেশ শুনিল, কোন উত্তর দিল না। মহেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন—হাসপাতাল, স্কুল, কুয়ো, টিউবওয়েল যা যা সব করা হয়েছে সেগুলোব আলাদা একটা দলিল হবে। দেবোত্তরের কতগুলো সম্পত্তি নিয়ে ঐগুলোর মধ্যে দিতে হবে। তাব থেকে এ সবের খরচ নির্বাহ হবে।

কর্মচাবী শুনিয়া গেল। কিন্তু যেমন নীববে দাঁড়াইয়াছিল তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—দাঁড়িযে রইলে যে। কিছু বলবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা মুস্কিল হচ্ছে—

—কি?

—আপনাব সেবা-শুশ্রূষা কববার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কানাই একলা পেরেও উঠছে না।

—হুঁ। মহেন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিযা বাহিবেব দিকে চাহিয়া বহিলেন। সূর্য পাটে বসিযাছে। অস্তবাগ রঞ্জিত আকাশে বিচিত্র বর্ণশোভা।

কর্মচাবীটি বলিল—পিসীমা বলেছেন তিনি এসে থাকতে চান। বলেছেন—আমার বযস হলো, মরতে চলেছি, আমাব আবাব বোগেব ভয়। তা তিনি—

—না। পরিবারের মধ্যে ছাঁড়িয়ে পড়লে একেব পর এক আর একজনকে ধরবে। সে হবে না।

—তা হলে কি কলকাতা থেকে একজন নার্সের ব্যবস্থা—

—না। সেও সুবিধে হবে না।

অকস্মাৎ যেন চিন্তার ঘোর হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন—। বলিলেন—এক কাজ কর। কড়ি গাঙ্গুলীর কাছে লোক পাঠিয়ে দাও।...না। একেবারে লোক পাঠিয়ে দাও, রমা বলে যে ঝিটি এখানে ছিল তার কাছে। সে হয় তো আসতে পারে।

সঞ্জীবের শরীর ও মনের অবস্থা দেখিয়া যাই-যাই করিয়াও নলিনী যাইতে পারিল না। একমাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। নলিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল। এইবার তাহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা আসিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ আছে। তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার কর্তব্য যথাসাধ্য সে করিয়াছে।

কিন্তু এদিকে সঞ্জীবের অবস্থা দেখিয়া চিন্তা উদ্বেগ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ভগ্ন শরীরের এতটুকু উন্নতি হয় নাই। বরং যেন অবনতিই ঘটিয়াছে। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়ে সে। একটা বিমর্ষতার মধ্যে সদাসর্বদাই যেন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহাকে প্রফুল্ল সজীব করিবার জন্য নলিনীর চিন্তার আর অবধি রহিল না। কিন্তু তাও যেন সে চায় না। তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা যেন সঞ্জীবের অহরহ। নলিনীর চিকিৎসকের মন, নানা কঠিন ব্যাধির উপক্রমণিকা এই অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করিল। কর্মে প্রবৃত্তি নেই, প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কোন বস্তুই যেন তাহাকে আকর্ষণ করে না।

প্রত্যহই নলিনী তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিত। সেদিন সে তাহাকে জোর করিয়া ধরিল।

—চলুন সঞ্জীববাবু একটু বেড়িয়ে আসি। আজ আপনাকে যেতেই হবে। সেই টিলার উপরে যাব, চলুন।

সঞ্জীব তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল—না।

—কমরেডের আহ্বান—এ আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

সঞ্জীব নীরব হইয়া রহিল। নলিনী বলিল,—আমার অনুরোধ রাখবেন না সঞ্জীববাবু ? দু'-একদিনের ভেতরেই চলে যাব আমি। আপনাদের সেই টিলার ছবি বড় ভাল লাগে আমার।

সঞ্জীব আর না বলিতে পারিল না।

বৈশাখের অপরাহ্ণ। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়া রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও প্রখরতার শেষ নেই। পায়ের তলায় মাটির বুকে বসন্তে উদ্গত ঘাসগুলির মাথায় ছোট ছোট ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। আশেপাশে বহু আকন্দফুলের গাছ। সেখানেও সব ফুলের স্তবক শুকাইয়া গিয়াছে। তপোভঙ্গে রুদ্রের রোষবহ্নিতে বসন্তশোভার অন্তরালে মদন যেন ভস্ম হইয়া গেল। দিগন্তে এখানে ওখানে কালো মেঘ মাঝে মাঝে যেন ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিতেছিল।

সঞ্জীবের কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে চলিয়াছিল নতমুখে নীরবে।

একস্থানে নলিনী বলিয়া উঠিল—এইখানেই আমাকে সেদিন ফুল পেড়ে দিয়েছিলেন, না?

সঞ্জীব বলিল—হুঁ।

নলিনী বলিল—আপনার কি হয়েছে সঞ্জীববাবু? অনেকদিন থেকেই জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। সঙ্কোচের জন্য তা পারিনি। আজ কিন্তু আর থাকতে পারলাম না।

সঞ্জীব শুষ্কস্বরে বলিল—কিছু তো হয়নি।

—আমার কাছে লুকোবেন না। শরীরে কি অসুস্থতা অনুভব করেন?

—না।

—তবে?

সঞ্জীব কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—মনের অসুস্থতা আমার। কিন্তু সে বলতে আমায় অনুরোধ করবেন না মিস গাঙ্গুলী।

ব্যথিত চিত্তে নলিনী বলিল—আমায় এত পর ভাবেন আপনি?

সঞ্জীব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—সাবধানে এবার মিস গাঙ্গুলী। টিলা আরম্ভ হলো।

নলিনী হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—দুর্গম পথের যাত্রী আমরা। হাতে হাত দিন কমরেড।

টিলার পর টিলা অতিক্রম করিয়া তাহারা চলিয়াছিল।

নিস্তব্ধ গুমোট অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ একখানি ছায়া যেন মমতার মতো তাহাদের সঙ্গে আসিয়া পড়িল।

নলিনী বলিল—আঃ ছায়াটি বড় মধুর লাগল, না সঞ্জীববাবু? দেখুন, দেখুন, সঞ্জীববাবু কি ঘন কালো মেঘ।

সঞ্জীববাবু মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল—একি? এ যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে। উপরের দিকে তো তাকাইনি। ফিরুন, ফিরুন।

নলিনী তখনও আকাশের দিকেই চাহিয়াছিল। পুঞ্জিত নিকষ-কালো মেঘ তুলার মতো ফাঁপিয়া দ্রুত বিস্তারে পরিধিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। চারিদিক বিষণ্ন নিথর। দলে দলে পাখিরা ত্রস্তস্বরে কলরব করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে লোকালয়ের দিকে। ঊর্ধ্বে আকাশের কোলে ঘূর্ণায়মান বিন্দুর মতো চিল-শকুনেরা পাক খাইয়া খাইয়া ত্বরিত বেগে নিচে নামিয়া পড়িতেছিল। দূর দিগন্তে একটা গর্জনমান শব্দ ক্রমশ যেন নিকট হইয়া আসিতেছে।

দ্রুতপদে দু'জনে ফিরিয়া চলিয়াছিল। গর্জনমান শব্দটা ক্রমশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ চারিদিকের মেঘাচ্ছন্নতার ছায়ার ম্লানিমা চকিত হইয়া উঠিল একটি তীব্র নীল দীপ্তিতে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল গর্জনধ্বনি।

সঞ্জীব দাঁড়াইল। পিছন পিছন দেখিয়া সে বলিল—ঝড় যে এসে পড়ল। আশ্রয়—আশ্রয় কোথায় পাই?

নলিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্ত একটি প্রগাঢ় ধূলার যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

সঞ্জীব উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছিল।

নলিনীই তাহাকে ডাকিল—সঞ্জীববাবু, আসুন, আসুন, ঐ গর্তটার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিই। রাস্তার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজনে কাহারা টিলার পার্শ্বদেশ কাটিয়া কাঁকর লইয়া গিয়াছে। তাহারই ফলে ছোট একটি গহ্বরের মতো আশ্রয়। তাহারই মধ্যে উভয়ে গিয়া আশ্রয় লইল। দেখিতে দেখিতে গর্জনমান ঝড় টিলার মাথার উপর দিয়া বিপুল বেগে বহিয়া গেল।

ঝঞ্ঝাতাড়িত উপলখণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষে বিচিত্র শব্দ উঠিতেছিল। ঝড়ের প্রবাহের মধ্যে একটা উন্মত্ত হা হা রব। ধূলার প্রবাহে চারিদিক অন্ধকার। ছোট গহ্বরটির মধ্যে দুটি নর-নারী শঙ্কাতুর বিস্ময়ে ঝড়ের এই উন্মত্ত লীলা দেখিতেছিল।

অকস্মাৎ নলিনী বলিয়া উঠিল—অদ্ভুত, এ অদ্ভুত, সঞ্জীববাবু।

—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ? আমার মনে হচ্ছে আদিম যুগের মানুষ আমরা। ঝড়েব তাডনায আজই সর্বপ্রথম নীড আবিষ্কার করলাম এই গহ্বরের মধ্যে। একাগ্র দৃষ্টিতে তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সঞ্জীবের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

বিপুল উত্তেজনায কম্পিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ নলিনী হ্যাঁ। আদিম যুগের মানুষ আমরা—আমি নর—তুমি নারী। ঝঞ্ঝার তাডনায গহ্বরের মধ্যে অকস্মাৎ একত্র হযেছি নীড রচনাব জন্য। ভবিতব্যতার বিধানে—প্রকৃতির ইঙ্গিতে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে নলিনী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাব হাত দুটি ধরিয়া সঞ্জীব কম্পিত স্ববেই বলিল— নলিনী আমি তোমায় ভালবাসি।

তাহাব স্পর্শে নলিনী চমকিযা উঠিল। ব্যস্তভাবে বলিল—উত্তেজিত হবেন না সঞ্জীববাবু, আমরা কমরেড।

উত্তেজনাভরেই সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ —কমরেড, কর্মসাথী। নীড় বচনা করব আমরা দু'জনে। আমি বযে নিযে আসব উপাদা", তুমি কববে রচনা। আমরা সত্যিই কমরেড।

নলিনী বলিল— -সঞ্জীববাবু—সঞ্জীববাবু।

—শুনতে পাচ্ছি, তোমার ডাক। কিন্তু জান নলিনী, প্রবৃত্তির তাডনাকে সংযত করা চলে কিন্তু প্রকৃতিব প্রেরণাকে অবহেলা কববাব সাধ্য কারও নেই। একদিন তোমাকে বলেছিলাম, রুদ্রেব অনুচর আমরা, আমাদের তপোবনে মদনের প্রবেশ নিষেধ, ভুল—ভুল। স্বীকার করছি সে ভুল। তোমাব কথাই সত্য, মদন ভস্ম হয়, কিন্তু প্রকৃতির দুলাল অতনুর গতি অবারিত।

নলিনী বলিল—সঞ্জীববাবু তা হয় না। আর তা হয় না। মায়ের কাছে যে পথ আমি পেয়েছি—সে পথ ত্যাগ কবব না, করতে পারব না। পথ ছাড়ুন আপনি।

সঞ্জীবের চোখ দুইটা আগুনের মতো জ্বলিতেছিল। সে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—না।

দৃপ্তভাবে নলিনী বলিল—আপনি অতি বর্বর, অতি নীচ—অতি হীন হয়ে গেছেন।

সঞ্জীব বলিল—হয়েছি। জান, জেলে বসে বসে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কল্পনায় তোমায় নিয়ে আমি নীড় রচনা করে এসেছি। এ ক'দিন সেই কথা নিবেদন করবার জন্য পাগলের মতো অস্থির হয়ে ফিরেছি। বর্বর, হীন, নীচ যা বল তুমি, হয়েছি তোমার জন্য, তোমায় আমার পেতে হবে।

নলিনী দৃঢ়স্বরে বলিল—পথ ছাড়ুন।

—না।

নলিনী দৃপ্তভাবে এবার সঞ্জীবকে ঠেলিয়া পথ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। সঞ্জীব যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রতিরোধকল্পে নলিনীকে ধাক্কা দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। সে ধাক্কা নলিনী সহ্য করিতে পারিল না। ঘুরিয়া উপুড় হইয়া সে শুইয়া পড়িল। সঞ্জীব দাঁড়াইয়া ছিল পাথরের মূর্তির মতো।

নলিনী ধীরে ধীরে উঠিল। কপালে একটা ক্ষত হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছিল। রক্তের উত্তপ্ত স্পর্শে নলিনী কপালে হাত বুলাইয়া দেখিল রক্ত। সে বলিল—দেখুন তো পাগলের মতো কি করলেন ? ছিঃ !

রক্ত দেখিয়া সঞ্জীবের যেন জ্ঞান ফিরিল। সে নত মস্তকে বলিল—সত্যিই আমি বর্বর, নীচ, হীন, মিস গাঙ্গুলী। আমায় মাফ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মত্ত ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল। দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে আকাশচারী বিহঙ্গের মতো দূর-দূরান্তে সে যেন ভাসিয়া চলিয়াছিল। পিছন হইতে বাতাসের সঙ্গে ভাসিযা আসিল—সঞ্জীববাবু—সঞ্জীববাবু ! সে দাঁড়াইবাব চেষ্টা করিল। দেখিল তাহার পশ্চাতে নলিনী তাহাকে আর্তস্বরে আহ্বান করিতেছে।

—এই ঝড়ের মধ্যে নির্জন প্রান্তরে আমাকে ভাসিয়ে দিযে কোথায় যাবে তুমি ? ফিরে এস—নয়তো দাঁড়াও। আমায় সঙ্গে নাও।

বহু কষ্টে সঞ্জীব ফিরিল। নলিনীর চোখ দিযা জল গডাইতেছিল। সে বলিল—এত বড শাস্তি দিতে চাও কেন তুমি আমাকে ? কী করেছি তোমার আমি ? কোথায় যাবে তুমি ? জান, মা তোমার ভার আমায দিয়ে গেছেন।

সঞ্জীব স্থির দৃষ্টি তাহার উপর স্থাপন করিল এবং বলিল—সত্যি কথা নলিনী ?

নলিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিল—ঝড় এখনও থামে নাই। এস ওখানে যাই। যে নীড বচনা করেছি আজ এত শীঘ্র তাকে ভেঙে দিযো না।

গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিযা নলিনী বলিল—হ্যাঁ, মা তোমায় আমার উপর ভার দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তুমি আমায কমরেড হিসাবে চেয়েছিলে, তারই উপযুক্ত করে আমাকে গড়ে তুলেছি আমি।

কয় ফোঁটা রক্ত তাহার নাক বাহিয়া নীচে নামিযা আসিতেছিল। সেটুকু অনুভব করিয়া বলিল—কিন্তু একি করলে বল তো ?

রক্তের ধারা সে মুছিতে গেল। বাধা দিযা সঞ্জীব বলিল—মুছো না। এস ওই রক্ত নিয়ে আমি তোমার সীমন্তের সিঁদুর রচনা করে দিই। গুহার মধ্যে মিলন

আমাদের—এই আমাদের বিবাহ। আমি নর—তুমি নারী। আমি বর—তুমি বধূ। এক সঙ্গে দু'জনে নীড় রচনা করব। এক কর্মে আমাদের চারখানি হাত অগ্রসর হয়ে আসবে। আমরা কমরেড—এস।

*　　　　*　　　　*

আরও কয়টা টিলার পরে—একটা টিলার উপর সেই বাংলোটার মধ্যে তখন মহেন্দ্রবাবু শয্যায় শুইয়া ঝড়ের আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। রমা আসিয়া শার্সিগুলি বন্ধ করিয়া দিতেছিল।

রমা আসিয়াছে—আজই আসিয়াছে। আহ্বান মাত্রেই সে আসিয়াছে। মহেন্দ্রবাবু মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন তখন।

কর্মরতা রমার দিকে চাহিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—রমা।

রমা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তিনি বলিলেন—তুমি থাকবে তো রমা?

মৃদু অনুচ্চ স্বরে শান্ত মেয়েটি বলিল— থাকব।

তাহার হাত ধরিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—উইলে তোমায় আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবো রমা।

তিনি তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া রমা বলিল—না।

বাবু বলিলেন—ঈশ্বরের দিব্যি রমা—

রমা শুধু হাসিল। বিচিত্র তিক্ত হাসি।

তারপর বলিল—ওষুধ খাবার সময় হয়েছে আপনার।

তারাশঙ্কর : গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি

তারাশঙ্কর সম্পর্কে বিরূপ কথাবার্তা কম হয়নি। কেউ কেউ তাঁকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন, কেউ বা হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। 'মোটা তুলিতে কাজ করেন' বলে পরোক্ষে তাঁকে মোটা দাগের লেখকই বলতে চাওয়া হয়েছিল। তারাশঙ্করকে 'গ্রাম্য ভাবাপন্ন' বা 'সেকেলে' ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবনায় ভাবিত সমালোচককুলের মনে হতেই পারে। স্বীকার করা ভাল, সমসাময়িক অনেক কবি-লেখকের মতো বিশ্বসাহিত্যের দুয়ার তারাশঙ্করের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। এ সব দোষের না হয়ে তাঁর কাছে গুণের হয়ে উঠেছে। দু' চোখ ভরে তিনি বাংলার গ্রামকে দেখেছেন, মানুষকে বুঝেছেন। এই দেখা বা বোঝার মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না। গ্রামজীবনের এমন যথার্থ রূপকার বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। তাই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনেক সময় মনে হয় তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি।' তারাশঙ্কর বাংলার মুখ দেখেছিলেন। পৃথিবীর রূপ দেখতে যাননি আর।

তারাশঙ্করের আবির্ভাব কালটি খুব সুখের ছিল না। বড়ই টালমাটাল, সে এক বিভ্রান্ত সময়। শুধুই সমাজজীবনে নয়, সাহিত্যের ভাবধারা-গতিপ্রকৃতিতেও অদল-বদল, পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গড়া জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির লেখকরা যথেষ্ট সচেষ্ট ও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নিম্নগত মধ্যবিত্ত-সংসারে তাঁরা ঢুকে পড়েন। নাগরিক জীবন, নাগরিক জীবনের কুটিলতা-জটিলতা তাঁদের কথাসাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেমচেতনার সঙ্গে দেহকামনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

তারাশঙ্কর ক্ষমতাবান লেখক। ঐ গড্ডলিকা প্রবাহে মিশে না-গিয়ে নিজস্ব এক জগৎ নির্মাণ করলেন তিনি। পল্লী জীবনাশ্রয়ী আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা, আপাতভাবে আঞ্চলিক হলেও শেষ পর্যন্ত তা অবিশ্যি আঞ্চলিক থাকেনি। এক মহার্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে কথাসাহিত্যের আসরে এলেন তারাশঙ্কর। বিভূতিভূষণও পল্লী-জীবনাশ্রয়ী। কিন্তু কখনোই তারাশঙ্করসদৃশ নয়। বিভূতিভূষণও বড় লেখক। তাঁর জগৎ একেবারেই নিজস্ব, মৌলিকতায় উজ্জ্বল।

তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী। কিন্তু কখনোই অন্ধ-অনুসারী নন। পল্লীজীবন তারাশঙ্করের কলমে নতুনতর মাত্রা পেয়েছে। রাঢ় বাংলার কাঁকুর রুক্ষতা এমনভাবে তাঁর আগে আর কে এঁকেছেন! পল্লীসমাজের চিত্রমালা অঙ্কনের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধতা ছিল। রয়েছে ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। শরৎচন্দ্রের আন্তরিকতা, মানুষের প্রতি সুগভীর ভালবাসায় অবিশ্যি ঘাটতি পড়েনি কখনো। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য-পটভূমি রাঢ় বাংলায় ঘোরা-ফেরা করলেও অনায়াসে তা

ব্যাপ্তি পায়, বিস্তৃত হয়। ধ্রুপদী উপন্যাসের মহাকাব্যিক মেজাজ তারাশঙ্করের কোনও কোনও উপন্যাসকে আরও মহার্ঘ করে তুলেছে।

উপলব্ধির গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতাই তারাশঙ্করকে ঐ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। 'মাটিকে এবং মানুষকে ও জানে, এর সঙ্গে ওর যোগ আছে'—রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ন-স্বীকৃতি যথার্থ। 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে জানা যায় তারাশঙ্করকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিকঠিক লিখেছ। আর বড় কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।'

তারাশঙ্কর সাহিত্যকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে তাঁকে কম কষ্ট সইতে হয়নি। অনেকানেক লিখতেও হয়েছে। সাহিত্য যদি অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মান হারায়, সুলভ জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তারাশঙ্কর পুরোপুরি ব্যতিক্রমী। কখনোই নিজের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াননি। স্খলন ঘটেনি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিসেব মতো তারাশঙ্কর উপন্যাস লিখেছেন সাতান্নটি। গল্প একশো আঠাশটি। এর বাইরে কয়েকটি স্মৃতিচর্চা ছাড়াও আছে রকমারি রচনা। রয়েছে কবিতা ও গান।

বরাবরই তারাশঙ্করের দৃষ্টি মানুষ ও মৃত্তিকার প্রতি। সর্বত্রই এই দৃষ্টিভঙ্গি কম-বেশি বাঙ্ময়। আমরা আমাদের আলোচনাকে উপন্যাসগণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখবো।

যে রাঢ় বাংলা তারাশঙ্করের অবলম্বন, তা বড়ই বিচিত্র। যতই রুক্ষ হোক না কেন, এরই মাঝে রয়ে যায় প্রাণের স্পন্দন, জীবনের উত্তাপ। কৃষিজীবী থেকে চির-অবহেলিত অন্ত্যজ শ্রেণী—কে নেই, কার কথা ভাবেননি তারাশঙ্কর?

সমস্যা-কণ্টকিত রাঢ় বাংলার মানুষের কথা পরম আন্তরিকতায় ভেবেছেন। বলিষ্ঠ জীবনবোধে তারাশঙ্কর অনন্য। গ্রাম্যজীবনের চারণ-কবি শেষের দিকে অবিশ্যি কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের দিকে ঝুঁকেছেন। সে আরেক প্রসঙ্গ।

তারাশঙ্করের সাতান্নটি উপন্যাসের সব ক'টিই বিশালায়তন মহাকাব্যিক মেজাজের নয়। কিছু ছোট উপন্যাসও আছে। গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন বা ছায়াপথের পাশাপাশি কবি, সপ্তপদী বা বিচারক অপেক্ষাকৃত ছোটমাপের উপন্যাস। তারাশঙ্করের আত্মপ্রকাশ গল্প দিয়ে, কল্লোলে প্রকাশিত হয় 'রসকলি'। 'শ্মশানের পথে' গল্প থেকেই তৈরি হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি'। প্রথমে গল্প, গল্পকাহিনী অবলম্বনে পরে উপন্যাস তারাশঙ্কর আরও করেছেন। সুখ্যাত 'কবি' উপন্যাসটি প্রথমে গল্পাকারে রচিত হয়, এ তথ্য হয়তো অনেকের জানা নেই। অনালোচিত রয়ে গেছে—সুপরিচিত গল্প 'না' তারাশঙ্করের দক্ষ-হাতে কী অনায়াসেই না উপন্যাস হয়ে উঠেছে!

সরাসরি উপন্যাস বা গল্পাবলম্বনে উপন্যাস যাই হোক না কেন, সর্বত্রই মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতি। মাটির আশ্চর্য ঘ্রাণ। এই মাটি ও মানুষ নিয়েই তারাশঙ্করের জগৎ। নিজস্ব জগৎ।

এই জগৎ পুরোপুরি অভিজ্ঞতার্জিত। অভিজ্ঞতার সঙ্গে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির মিশেল আছে, থাকাই স্বাভাবিক। কল্পনার জাল বুনে অলীক জগৎ কখনো নির্মাণ করেননি

তিনি। একাধিক রচনায়, বিশেষ করে 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে রয়েছে কীভাবে তিনি নিরক্ষণ করেছেন নিচুতলার মানুষের আপাত সাদামাঠা, আসলে বহুমাত্রিক জীবনধারা। জীবন যতই ছোট হোক না কেন, ঐ এক জীবনেই তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছেন, সেই রাঢ়-বাংলার কাঁকুরে রুক্ষতা, রুক্ষতার আড়ালে প্রাণের স্পন্দন হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন।

তারাশঙ্কর চৈতালী ঘূর্ণি উপন্যাসটিকে তাঁর 'জীবনের ভবিষ্যৎ পথের'...'প্রথম মাইল পোস্ট' বলেছেন। ক্ষয়িষ্ণু পল্লীজীবন, পল্লীজীবনের রুক্ষতা-রুগ্নতার সঙ্গে মিশেছে তারাশঙ্করের নিজের কোলিয়ারি-অভিজ্ঞতা। চৈতালী ঘূর্ণির নায়ক গোষ্ঠ আবহমানকালের কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। গোষ্ঠকে সামনে রেখে তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার কী নির্মম-হৃদয়হীন। মুক্তি নেই কোথাও। শহরে এসে শ্রমিক হয়েও শান্তি মেলে না তার। সেই অত্যাচার শোষণ গোষ্ঠের পিছু নেয়। গোষ্ঠ বলিষ্ঠ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়। ধর্মঘট করে। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে মারামারিতে প্রাণ হারায়। চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর, তাই উপন্যাসের সংকেতময় সমাপ্তি ঘটে।

ঐতিহ্যময় পল্লী সমাজ, পল্লীর মানুষ ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছিলো, প্রচলিত জীবনধারায় নবীনশক্তির অভিঘাত শুরু হয়েছিল, তারই ধারাভাষ্য মেলে চৈতালী ঘূর্ণির মতো বেশ কিছু উপন্যাসে। ঔপনিবেশিক আইনী শাসনের মধ্যেও গ্রামসমাজ জেগে ওঠে, শোনা যায় জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি। ধাত্রীদেবতা, কি গণদেবতা সর্বত্রই প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত এক নতুনতর গ্রামসমাজের ছবি দেখা যায়। যা তারাশঙ্করের আগে তেমনভাবে দেখা যায়নি। এই দেখার মধ্যে নিজস্বতা আছে, আছে মৌলিকতার দীপ্তি।

যে অঞ্চল তারাশঙ্করের উপন্যাসের পটভূমি, সেই রাঢ় অঞ্চলকে বাংলার অন্যান্য আর পাঁচটা গ্রামের সঙ্গে মেলানো যায় না। ভৌগোলিক কারণে পরিবেশের যে বৈপরীত্য, তা গভীরভাবে ছাপ ফেলে জনজীবনে। ভাগ-চাষীদের লড়াই করতে হয় সাঁওতালদের সঙ্গে। সামন্ততন্ত্র ক্রমেই জাঁকিয়ে বসে। শেকড ছড়িয়ে পড়ে। কালিন্দীতে সেই ছবি ধরা রয়েছে। গণদেবতা বা ধাত্রীদেবতা দুই উপন্যাসেও এই একই ছবির পুনরাবৃত্তি। রাঢ় অঞ্চল, মানুষজন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই কাঁকুরে রুক্ষতায় দরিদ্র-নিঃস্ব-রিক্ত মানুষই সুলভ, অনেকে পুরোপুরি জীবিকাহীনও বটে, বাউল-বোষ্টম-কবিগান বা ঝুমুরের দল সঙ্গত কারণেই বাড়ে। মাটির কাছাকাছি তারাশঙ্করের অবস্থান। লোকজীবনের প্রতি তাঁর অপরিসীম আকর্ষণ। আশ্চর্য দক্ষতায় লোকায়ত জীবনের ছবি আঁকেন নাগিনীকন্যার কাহিনী, রাধা, কবি বা হাঁসুলিবাঁকের উপকথায়। হাঁসুলিবাঁকে কাহারপল্লী, করালীদের নতুন জীবনের কথা যেভাবে তারাশঙ্কর শুনিয়েছেন, তা প্রকৃতই তুলনারহিত। এই সব মানুষজন, তাদের দুঃখের বারোমাস্যার কথা এভাবে পূর্বে লেখা হয়নি, নিঃসন্দেহে তা নতুনতর সংযোজন।

এই যে নতুনতর সংযোজন, এর মধ্যে চেষ্টাকৃত বা আরোপিত কিছু নেই, সবই অন্তর থেকে প্রকাশিত অভিজ্ঞতাজাত। মানুষের সান্নিধ্যে মানুষকে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। 'রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলি'-র মাঝেই 'সাক্ষাৎ দেবতা'-র